প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সপ্তদশ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড
১৩২৪ সাল, কার্ত্তিক—চৈত্র

প্রবাসী-কার্য্যালয়
২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

প্রবাসী ১৩২৪ কার্ত্তিক—চৈত্র

১৭শ ভাগ ২য় খণ্ড,

বিষয়-সূচী

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

চিত্র-সূচী

বিষয়। পৃষ্ঠা।

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩২৪

১ম সংখ্যা

পরিত্যাগ

(গল্প)

(১)

তার নাম মালতী। যেখানে মেয়েদের নাম বুধনী, ভুসিয়া, মোচনী, সেখানে তাহার নাম মালতী হইল কেমন করিয়া তাহা বলা কঠিন। তাহার নামটিও যেমন দেশছাড়া, তাহার চেহারাটাও তেমনি দেশছাড়া ছিল। চারিদিকের কালো-পাথরে কোঁদা ভারি ভারি মুখগুলির মধ্যে, তাহার ছোট্ট ফুটফুটে মুখ, আর ধাইয়া-ফুলের পাপড়ীর মত টুকটুকে পাতলা ঠোঁট দুখানি, ঠিক একটি ফুলের মতই দেখাইত। পাঁচ বছর বয়সে মালতীর যখন বিবাহ হইল, তখন তাহার স্বামী কুঁজলার বয়স আট বছর। বিবাহের পরেই কুঁজলা তাহার মা ও বাবার সহিত কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। অনেকে মনে করিত তাহাদিগকে আড়-কাঠিতে ভুলাইয়া আসামের চা-বাগানে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর দশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। মালতী এখন পোনের বছরের—একটি মহুয়া-ফুলের মত নিটোল। তাহার মুখে দিনরাত্তি গান ও হাসি লাগিয়াই থাকিত; সে-হাসিতে মহুয়া-ফুলের মতই একটা মাদকতা ছিল।

ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মালতী তাহাদের বারান্দায় বসিয়া, জোনরা পিষিতে পিষিতে গান গাহিতে-ছিল, "বড়ি দাগা দিলেই শাঁওন বাদরিয়া।" দূরের শালবন একখণ্ড মেঘের মত আকাশের গায় লাগিয়া আছে। মালতী দেখিল, সেই শালবনের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া, কে যেন একজন লোক তাহাদের বাড়ীর পাশের মহুয়া-গাছের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কাপড়, জামা, জুতা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। মালতী দেখিল সে তাহাদের দেশের লোক নয়। গাছের নীচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লোকটা অনেকক্ষণ ভিজিল, কিন্তু বৃষ্টি থামিল না দেখিয়া, অবশেষে তাহাদের গোয়াল-ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। অপরিচিত বিদেশীকে বাড়ীর উপরে দেখিয়া, মালতী শঙ্কিত হইল। সে ধীরে ধীরে তাহার মাকে ডাকিল, "মাইয়া গে।"

মা ঘর হইতে উত্তর দিল, "কি গে?"

মালতী চাপা গলায় বলিল, "এনে আ।"

মা বাহির হইয়া আসিল এবং গোয়াল-ঘরের দিকে চাহিয়াই চুপে চুপে মেয়েকে বলিল, "বাঙ্গালী বাবু।" মালতী এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বাবু দেখে নাই, সুতরাং এই নূতন প্রাণীটিকে সে বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিল।

আগন্তুক বাঙালী, নাম সুপবিত্র। এই অঞ্চলে অভ্রের ব্যবসা করে।

মালতীর মা প্রথম-বয়সে একবার রাণীগঞ্জ গিয়াছিল এবং সেখান হইতে সভ্য-জগতের যতগুলি নূতন তত্ত্ব জানিয়া আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি হইতেছে, বাঙালী মাত্রেই বড়লোক। সুতরাং এই বড়লোকটিকে তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া সে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মালতীর বাবা বাড়ীতে নাই, ক্ষেতে বাঁধ বাঁধিতে গিয়াছে। কাজেই মালতীর মা একখানা খাটিয়া আনিয়া গোয়াল-ঘরের মেঝেয় পাতিয়া দিল। সুপবিত্র তাহার ভিজা জামা জুতা খুলিয়া ফেলিল এবং ভিজা ধুতিখানি বেশ করিয়া নিঙড়াইয়া লইল। মালতীর মা দেখিল, সে শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সে মেয়েকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রশমা হথে গে, মালতী?"

মালতী কতকগুলি শুকনা কাঠ আনিয়া আগুন জালিয়া দিল। সুপবিত্র সেই আগুনে তাহার কাপড়খানা শুকাইতে লাগিল। এমন সময় মালতীর বাবা আসিল। বাড়ীর উপর একজন বাঙ্গালী বাবুকে দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি তাহার "কুদারি" ও "ঘোঘো" নামাইয়া রাখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল।

সুপবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি মাহাতো?"

সে বলিল, "আমার নাম ডাম্‌রা।"

সুপবিত্র বলিল, "আজ সারা দিন জলে ভিজেছি মাহাতো।"

ডাম্‌রা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুর আসা হলো কোথা হতে?"

সুপবিত্র বলিল, "পরমা হতে।"

ডাম্‌রা বলিল, "কোন্ পরমা, ছোট্‌কী না বড়কী?"

সুপবিত্র উত্তর করিল—"ছোট্‌কী।"

ডাম্‌রা বলিল, "তবে তো অনেক দূর হতে আসছেন। যাবেন কোথায়?"

সুপবিত্র বলিল, "যাবো কাথাড়ির অভ্রকের খাদে।"

ডাম্‌রা বলিল, "কাথাড়ি? তাহলে এ পথে এলেন কেন? এ তো অনেক ঘুর।"

সুপবিত্র বলিল, "আমি পথ ভুলে এসেছি মাহাতো। আমার সাথে গাড়ী ছিল, পাঁড়ে-টোলার কাছে এসে মনে করলেম্ একটু পাওদল দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই। কিন্তু বনের মধ্যে এসে পথ ভুল হয়ে গেল, বৃষ্টিও আরম্ভ হ'লো। গাড়ী খুঁজে না পেয়ে, আস্‌তে আস্‌তে তোমাদের গাঁয়ে এসে পড়েছি। কাথাড়ি এখান হতে কত দূর হবে?"

ডাম্‌রা উত্তর করিল, "প্রায় বার ক্রোশ।"

সুপবিত্র বলিল, "আজ আর তা হলে যাওয়া হয় না দেখ্‌ছি।"

ডাম্‌রা বলিল, "আজ তো রাতই হয়ে এসেছে, আর আর কি করে যাবেন বাবু? তবে আমরা গরিব কাঙাল মানুষ, আমাদের এখানে থাকৃতে আপনার খুব কষ্ট হবে। খাটিয়ার উপর কিছু বিছিয়ে যে আপনাকে বস্‌তে দেবে তাও আমাদের ঘরে নেই।"

ডাম্‌রার কথা শুনিয়া মালতী ঘরের মধ্যে গেল। গত হাটে ডাম্‌রা তাহাকে একখানা নূতন শাড়ী কিনিয়া দিয়াছিল, তাহা সে তেমনি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। সেই শাড়ীখানি আনিয়া, ডাম্‌রার হাতে দিয়া বলিল, "এইখানা বিছিয়ে দাও।"

সুপবিত্র মালতীর দিকে চাহিল। সে লজ্জিত হইয়া, মুখ ফিরাইল।

ডাম্‌রা খাটিয়ার উপর কাপড়খানা বিছাইয়া দিল। সুপবিত্র সে রাত্রে কিছু খাইল না, ডাম্‌রার ঘরে তাহাকে দিবার মত কিছু ছিলও না। সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, খাটিয়ার উপর শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। ডাম্‌রা সে রাত্রি তাহার "ডাঙ্গর পশু" আঙ্গিনায় বাঁধিয়া রাখিল।

সকালে উঠিয়া সুপবিত্র দেখিল, তাহার খুব জ্বর হইয়াছে এবং সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে। সে ডাম্‌রাকে বলিল, "ডামর মাহাতো, আমার বড় জ্বর হয়েছে। এখানে পাল্‌কী পাওয়া যাবে?"

ডাম্‌রা বলিল, "না বাবু, এখানে পাল্‌কী পাওয়া যায় না—ভাল গরুর গাড়ী পাওয়া যায়।"

সুপবিত্র বলিল, "আমার গায়ে যেমন বেদনা হয়েছে, তাতে গরুর গাড়ীতে যেতে পারিবো না।"

ডাম্‌রা বলিল, "তাহলে বাবু, আজকার দিনটা এখানেই

বিশ্রাম করে যান। কিন্তু এখানে থাকতে আপনার খাবার-দাবার বড় কষ্ট হবে।"

সুপবিত্র দেখিল, পাল্‌কী ছাড়া এখন তাহার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব—কাজেই থাকা ভিন্ন উপায় নাই। সে বলিল, "আমার জ্বর হয়েছে, মাহাতো, আমি কিছু খাব না, তুমি সে ভাবনা করো না। খুব ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছে, কাল্‌কেই হয়তো সেরে যাবে।"

সুপবিত্র সেদিন সেখানেই থাকিয়া গেল। কিন্তু ক্রমে তাহার জ্বর এত বাড়িয়া উঠিল যে, সে অজ্ঞানের মত খাটিয়ার উপর পড়িয়া রহিল।

ডাম্‌রা ও তাহার স্ত্রী দেখিল, এ এক বিপদ! কিন্তু বিপদ এড়াইবার কোন পথ নাই দেখিয়া, মালতীকে বাড়ীতে রাখিয়া তাহারা ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল। মালতী তাহাদের ঘরের সেই বারান্দায় বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আহা পরদেশী, না জানি কোথায় ওর ঘর, কোথায় ওর মা ভাই বোন!" এমন সময় সুপবিত্র বলিল "একটু জল।" মালতী তাহাদের কাঁসার বাটিটা বেশ করিয়া মাজিয়া এক বাটি জল সুপবিত্রের নিকটে লইয়া বলিল, 'জল এনেছি।"

সুপবিত্র চোখ মেলিয়া চাহিল এবং মালতীর হাত হইতে বাটিটা লইয়া সবটুক জল এক চুমুকে খাইয়া ফেলিল। মালতী তাহার হাত হইতে বাটিটা লইল। সুপবিত্র পূর্ব্বের মত চোখ বুজিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। শিয়রে দাঁড়াইয়া মালতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিল। রোগীর মুখ জ্বরে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কপালের দুই পাশে শিরা দুইটা উঠিতেছে পড়িতেছে, সমস্ত শরীর দিয়া যেন আগুনের ঝলক্ বাহির হইতেছে। রোগীর সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর যেন সেই তাপে এলাইয়া পড়িয়াছে। মালতী তাহার দিকে চাহিয়া কেমন যেন একটা কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে আসিতে লাগিল, "আহা পরদেশী!"

সুপবিত্র আর-একবার চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল, তাহার শিয়রের কাছে কাহার যেন স্নিগ্ধ দুইটি চক্ষু অতি করুণ দৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বশরীর হইতে জ্বরের সমস্ত যন্ত্রণা মুছিয়া লইতে চাহিতেছে। সে তাহার কপাল দেখাইয়া বলিল, "বড় বেদনা।" মালতী শঙ্কিত হস্তে কপালের রগ দুইটা চাপিয়া ধরিল। সুপবিত্র "আঃ" বলিয়া চোখ বুজিল। রোগীর দেহস্পর্শে মালতীর বুকের মধ্যে যেন গুরগুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

সে দিন-রাত সেই ভাবেই গেল। পরের দিন রোগী অনেক ভাল হইল,—তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। গায়ের বেদনাও কমিয়া গেল। সে খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিয়া মালতীর মাকে বলিল, "বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

মালতীর মা বলিল, "কি দেবো বাবু, আমরা যা খাই তা কি তুমি খেতে পারবে?"

সুপবিত্র বলিল, "দুধ আছে?"

ঘরে দুধ ছিল, মালতীর মা তাহাই একটু গরম করিয়া দিল। সুপবিত্র খাইয়া সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। তাহার পরের দিনও সুপবিত্র সেই বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

মালতী একেবারেই লাজুক নয়—বাঙালীর মেয়েদের মত লজ্জা এ দেশে নাই। নূতন লোক দেখিয়া সে প্রথম দিন একটু সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল, কিন্তু এই অল্প দিনের পরিচয়ে তাহার মুখের উজ্জ্বল হাসি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। মালতীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নিটোল দেহের অমল লাবণ্য মুক্তার আভার মত টল্‌মল্ করিতেছিল। তাহার ব্রীড়াসঙ্কোচশূন্য মুক্ত হাসি, পাহাড়ের ক্ষুদ্র স্বচ্ছ ঝরণার মত, হেলিয়া দুলিয়া ফেনাইয়া হাজার হাজার হীরার কণায় আলোক ঝল্‌কাইয়া, ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সেই মুক্তার আভায় সুপবিত্রের অন্তর রঙ্গিন হইয়া উঠিল, সেই হীরার কণার ঝলকে তাহার বুকের মধ্যে লক্ষ হীরার আলোক ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল।

বিকালে সুপবিত্র বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, ডামরা তাহার জন্য গরুর গাড়ী আনিয়া খবর দিল। মালতী ও তাহার মা ভিতরের আঙ্গিনায় বসিয়া জোনরা পিষিতেছিল। সুপবিত্র তাহাদের কাছে যাইয়া বলিল, "মালতীর মা—"

তাহার কথা শুনিয়া মালতী তাহার মার গায় হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, "এগে মাইয়া, কৈছন বুলি!"

মালতীর মা মেয়েকে ধমক দিয়া বলিল "চুপে রহ্।"

তবু মালতী হাসিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, "মালৌতী! মহলাতী!"

আগন্তুক বাঙালী, নাম সুপবিত্র। এই অঞ্চলে অভ্রের ব্যবসা করে।

মালতীর মা প্রথম-বয়সে একবার রাণীগঞ্জ গিয়াছিল এবং সেখান হইতে সভ্য-জগতের যতগুলি নূতন তত্ত্ব জানিয়া আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি হইতেছে, বাঙালী মাত্রেই বড়লোক। সুতরাং এই বড়লোকটিকে তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া সে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মালতীর বাবা বাড়ীতে নাই, ক্ষেতে বাঁধ বাঁধিতে গিয়াছে। কাজেই মালতীর মা একখানা খাটিয়া আনিয়া গোয়াল-ঘরের মেঝেয় পাতিয়া দিল। সুপবিত্র তাহার ভিজা জামা জুতা খুলিয়া ফেলিল এবং ভিজা ধুতিখানি বেশ করিয়া নিংড়াইয়া লইল। মালতীর মা দেখিল, সে শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সে মেয়েকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রশমা হথে গে, মাল্‌তী?"

মালতী কতকগুলি শুকনা কাঠ আনিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল। সুপবিত্র সেই আগুনে তাহার কাপড়খানা শুকাইতে লাগিল। এমন সময় মালতীর বাবা আসিল। বাড়ীর উপর একজন বাঙ্গালী বাবুকে দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি তাহার "কুঁদারি" ও "ঘোঘো" নামাইয়া রাখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল।

সুপবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি মাহাতো?"

সে বলিল, "আমার নাম ডাম্‌রা।"

সুপবিত্র বলিল, "আজ সারা দিন জলে ভিজেছি মাহাতো।"

ডাম্‌রা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুর আসা হলো কোথা হতে?"

সুপবিত্র বলিল, "পরমা হতে।"

ডাম্‌রা বলিল, "কোন্ পরমা, ছোট্‌কী না বড়কী?"

সুপবিত্র উত্তর করিল—"ছোট্‌কী।"

ডাম্‌রা বলিল, "তবে তো অনেক দূর হতে আস্‌ছেন। যাবেন কোথায়?"

সুপবিত্র বলিল, "যাবো কাথাডির অভ্রকের খাদে।"

ডাম্‌রা বলিল, "কাথাডি? তাহলে এ পথে এলেন কেন? এ তো অনেক ঘুর।"

সুপবিত্র বলিল, "আমি পথ ভুলে এসেছি মাহাতো। আমার সাথে গাড়ী ছিল, পাড়ে-টোলার কাছে এসে মনে করলেম্ একটু পাওদল দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই। কিন্তু বনের মধ্যে এসে পথ ভুল হয়ে গেল, বৃষ্টিও আরম্ভ হলো। গাড়ী খুঁজে না পেয়ে, আস্‌তে আস্‌তে তোমাদের গাঁয়ে এসে পড়েছি। কাথাডি এখান হতে কত দূর হবে?"

ডাম্‌রা উত্তর করিল, "প্রায় বার ক্রোশ।"

সুপবিত্র বলিল, "আজ আর তা হলে যাওয়া হয় না দেখ্‌ছি।"

ডাম্‌রা বলিল, "আজ তো রাতই হয়ে এসেছে, আজ আর কি করে যাবেন বাবু? তবে আমরা গরিব কাঙালী মানুষ, আমাদের এখানে থাকৃতে আপনার খুব কষ্ট হবে। খাটিয়ার উপর কিছু বিছিয়ে যে আপনাকে বস্‌তে দেবো, তাও আমাদের ঘরে নেই।"

ডাম্‌রার কথা শুনিয়া মালতী ঘরের মধ্যে গেল। গত হাটে ডাম্‌রা তাহাকে একখানা নূতন শাড়ী কিনিয়া দিয়াছিল, তাহা সে তেমনি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। সেই শাড়ীখানি আনিয়া, ডাম্‌রার হাতে দিয়া বলিল, "এইখানা বিছিয়ে দাও।"

সুপবিত্র মালতীর দিকে চাহিল। সে লজ্জিত হইয়া, মুখ ফিরাইল।

ডাম্‌রা খাটিয়ার উপর কাপড়খানা বিছাইয়া দিল। সুপবিত্র সে রাত্রে কিছু খাইল না, ডাম্‌রার ঘরে তাহাকে দিবার মত কিছু ছিলও না। সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, খাটিয়ার উপর শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। ডাম্‌রা সে রাত্রি তাহার "ডাঙ্গর পশু" আঙ্গিনায় বাঁধিয়া রাখিল।

সকালে উঠিয়া সুপবিত্র দেখিল, তাহার খুব জ্বর হইয়াছে এবং সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে। সে ডাম্‌রাকে বলিল, "ডামর মাহাতো, আমার বড় জ্বর হয়েছে। এখানে পাল্‌কী পাওয়া যাবে?"

ডাম্‌রা বলিল, "না বাবু, এখানে পাল্‌কী পাওয়া যায় না—ভাল গরুর গাড়ী পাওয়া যায়।"

সুপবিত্র বলিল, "আমার গায়ে যেমন বেদনা হয়েছে, তাতে গরুর গাড়ীতে যেতে পারিবো না।"

ডাম্‌রা বলিল, "তাহলে বাবু, আজকার দিনটা এখানেই

বিশ্রাম করে যান। কিন্তু এখানে থাকতে আপনার খাবার-দাবার বড় কষ্ট হবে।”

সুপবিত্র দেখিল, পাল্‌কী ছাড়া এখন তাহার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব—কাজেই থাকা ভিন্ন উপায় নাই। সে বলিল, “আমার জ্বর হয়েছে, মাহাতো, আমি কিছু খাব না, তুমি সে ভাবনা করো না। খুব ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছে, কাল্‌কেই হয়তো সেরে যাবে।”

সুপবিত্র সেদিন সেখানেই থাকিয়া গেল। কিন্তু ক্রমে তাহার জ্বর এত বাড়িয়া উঠিল যে, সে অজ্ঞানের মত খাটিয়ার উপর পড়িয়া রহিল।

ডাম্‌রা ও তাহার স্ত্রী দেখিল, এ এক বিপদ! কিন্তু বিপদ এড়াইবার কোন পথ নাই দেখিয়া, মালতীকে বাড়ীতে রাখিয়া তাহারা ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল। মালতী তাহাদের ঘরের সেই বারান্দায় বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল, “আহা পরদেশী, না জানি কোথায় ওর ঘর, কোথায় ওর মা ভাই বোন!” এমন সময় সুপবিত্র বলিল “একটু জল।” মালতী তাহাদের কাঁসার বাটিটা বেশ করিয়া মাজিয়া এক বাটি জল সুপবিত্রের নিকটে লইয়া বলিল, “জল এনেছি।”

সুপবিত্র চোখ মেলিয়া চাহিল এবং মালতীর হাত হইতে বাটিটা লইয়া সবটুক জল এক চুমুকে খাইয়া ফেলিল। মালতী তাহার হাত হইতে বাটিটা লইল। সুপবিত্র পূর্ব্বের মত চোখ বুজিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। শিয়রে দাঁড়াইয়া মালতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিল। রোগীর মুখ জ্বরে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কপালের দুই পাশে শিরা দুইটা উঠিতেছে পড়িতেছে, সমস্ত শরীর দিয়া যেন আগুনের ঝলক্ বাহির হইতেছে। রোগীর সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর যেন সেই তাপে এলাইয়া পড়িয়াছে। মালতী তাহার দিকে চাহিয়া কেমন যেন একটা কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে আসিতে লাগিল, “আহা পরদেশী!”

সুপবিত্র আর-একবার চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল, তাহার শিয়রের কাছে কাহার যেন স্নিগ্ধ দুইটি চক্ষু অতি করুণ দৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বশরীর হইতে জ্বরের সমস্ত যন্ত্রণা মুছিয়া লইতে চাহিতেছে। সে তাহার কপাল দেখাইয়া বলিল, “বড় বেদনা।” মালতী শঙ্কিত হস্তে কপালের রগ দুইটা চাপিয়া ধরিল। সুপবিত্র “আঃ” বলিয়া চোখ বুজিল। রোগীর দেহস্পর্শে মালতীর বুকের মধ্যে যেন গুরগুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

সে দিন-রাত সেই ভাবেই গেল। পরের দিন রোগী অনেক ভাল হইল,—তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। গায়ের বেদনাও কমিয়া গেল। সে খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিয়া মালতীর মাকে বলিল, “বড় ক্ষিদে পেয়েছে।”

মালতীর মা বলিল, “কি দেবো বাবু, আমরা যা খাই তা কি তুমি খেতে পারবে?”

সুপবিত্র বলিল, “দুধ আছে?”

ঘরে দুধ ছিল, মালতীর মা তাহাই একটু গরম করিয়া দিল। সুপবিত্র খাইয়া সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। তাহার পরের দিনও সুপবিত্র সেই বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

মালতী একেবারেই লাজুক নয়—বাঙালীর মেয়েদের মত লজ্জা এ দেশে নাই। নূতন লোক দেখিয়া সে প্রথম দিন একটু সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল, কিন্তু এই অল্প দিনের পরিচয়ে তাহার মুখের উজ্জ্বল হাসি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। মালতীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নিটোল দেহের তরল লাবণ্য মুক্তার আভার মত টলমল্ করিতেছিল। তাহার ব্রীড়াসঙ্কোচশূন্য মুক্ত হাসি, পাহাড়ের ক্ষুদ্র স্বচ্ছ ঝরণার মত, হেলিয়া দুলিয়া ফেনাইয়া হাজার হাজার হীরার কণায় আলোক ঝল্‌কাইয়া, ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সেই মুক্তার আভায় সুপবিত্রের অন্তর রঙ্গিন হইয়া উঠিল, সেই হীরার কণার ঝলকে তাহার বুকের মধ্যে লক্ষ হীরার আলোক ঝলমল্ করিতে লাগিল।

বিকালে সুপবিত্র বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, ডামরা তাহার জন্য গরুর গাড়ী আনিয়া খবর দিল। মালতী ও তাহার মা ভিতরের আঙ্গিনায় বসিয়া জোনরা পিষিতেছিল। সুপবিত্র তাহাদের কাছে যাইয়া বলিল, “মালতীর মা—”

তাহার কথা শুনিয়া মালতী তাহার মার গায় হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, “এগে মাইয়া, কৈছন বুলি!”

মালতীর মা মেয়েকে ধমক দিয়া বলিল “চুপ্‌কে রহ্।”

তবু মালতী হাসিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, “মালোতী! মালোতী!”

সুপবিত্র হাসিয়া বলিল, "কেন, তোমার নাম মালতী নয় ?"

মালতী তেমনি হাসিতে-হাসিতে বলিল, "মালোতী না—মাল্‌তী, মাল্‌তী।"

সুপবিত্র হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই, মাল্‌তীর মা, আমি এখন যাচ্ছি।"

তারপর পকেট হইতে দশটা টাকা বাহির করিয়া ডাম্‌রার হাতে দিয়া বলিল, "মাংতো, তোমাদের বাড়ীতে একটু জায়গা না পেলে এ বিদেশে হয়তো মারা যেতেম।"

ডাম্‌রা কিম্বা তাহার স্ত্রী এ পর্য্যন্ত এতগুলি টাকা একসঙ্গে হাতে করিতে পায় নাই। আজ তাহা পাইয়া তাহারা সুপবিত্রকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিল। মালতীর মা জিজ্ঞাসা করিল, "আর এ দিকে আস্‌বে না বাবু ?"

ঠিক্ এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মালতী ছট্‌ফট্ করিতেছিল। লাজুক না হইলেও আজ কেন যেন কথাগুলি তাহার গলায় বাধিয়া যাইতেছিল। সুপবিত্র মালতীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আবার যেদিন জ্বর হবে, সেইদিন আস্‌বো।"

কথা শুনিয়া সকলেই হাসিল, কিন্তু মালতী চুপ করিয়া রহিল। মহুয়া-গাছের তলা পর্য্যন্ত সুপবিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহারা বিদায় লইল। সেই বিদেশী যেমন সন্ধ্যায় আসিয়াছিল, তেমনি সন্ধ্যায় চলিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়া ডাম্‌রা পত্নীর হাতে টাকা দশটা দিয়া বলিল, "ভারি আদ্‌মি গে !"

মালতীর মা কোন জবাব দিল না, সে তখন দশ ভরির হাঁশুলি গড়াইবার মৎলব আঁটিতেছিল।

মালতীর সে দিন আর কিছু ভাল লাগিল না। মা ও মেয়ে আবার যাঁতায় বসিল, কিন্তু মালতী গান গাহিতে পারিল না। রাত্রে সকলে যখন ঘুমাইল, সে তখন তাহার সেই নূতন শাড়ীখানা দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল।

তার পর এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। মালতী প্রতি রাত্রে সেই কাপড়খানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া শ্লথ তন্দ্রায় এলাইয়া পড়ে। তাহার সেই তন্দ্রার মধ্যে, রামধনুর মত রঙ্গিল এবং বাঁশীর গানের মত বেদনা-ভরা, কতশত স্বপ্ন ফুটিয়া উঠে।

একদিন তেমনি ঘুম-ভাঙা স্বপ্নজড়িত চোখে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখিল, কে যেন ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছে। মালতীর বুকের রক্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বানের জল যেমন বাঁধ ভাঙিয়া সব ভাসাইয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া চলে, তেমনি করিয়া তাহার শিরায় শিরায় ছুটিতে লাগিল। ঘোড়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সুপবিত্র ডাকিল—"মাল্‌তী ?"

মালতী হাসিয়া বলিল, "আইল্যা ?"

আজকার ভোরের স্বপ্ন যে এমন সার্থকতা লইয়া আসিবে, তাহা সে আশা করে নাই।

ডাম্‌রা আসিয়া ঘোড়া বাঁধিল। মালতীর মা আঙ্গিনায় একখানা খাটিয়া পাতিয়া দিল। মালতী তাহার সেই শাড়ীখানি আনিয়া আবার অতিথির জন্য বিছাইয়া দিল। এক মাস পরে, এই আজ সে আবার গান গাহিল, "নীল-বরণ ঘোড়াওয়া হো, সুরয-বরণ আসোয়ার !"

ডাম্‌রা ও তাহার স্ত্রীর সহিত সুপবিত্র অনেকক্ষণ কি যেন পরামর্শ করিল, তার পর ঘোড়ায় চড়িয়া সেইদিনই কাথাড়ি চলিয়া গেল।

(২)

একটা উঁচু টাঁড়ের উপরে ছোট্ট বাঙ্গলাখানি, গ্রামের কলরব হইতে দূরে, মহুয়া-গাছের শ্যামবেষ্টনের মধ্যে যেন তন্দ্রামগ্ন হইয়া আছে। বাঙ্গলার বারান্দায় টবে করিয়া ক্রোটন সাজান, কাঠের থামগুলিতে ঝুমকা-লতা জড়াইয়া উঠিয়াছে। বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুপবিত্র, তাহার পাশে মালতী। ঝুম্‌কা-লতার ডগাগুলি নুইয়া তাহার মাথা স্পর্শ করিয়াছে; আর ঝুম্‌কা-লতার ডগার মতই নধর কোমল পুষ্ট একটি দুই বছরের ছেলে, তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কোলে উঠিতে চাহিতেছে। মালতীর আজ বুকভরা তৃপ্তি। সেই তৃপ্তি ও নির্ভরতায় তাহার মুখে আনন্দের যে স্নিগ্ধজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কাছে তাহার দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য হার মানিয়াছে।

মালতী সুপবিত্রের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলো না কার চিঠি ?"

সুপবিত্র বলিল, "কারবারের চিঠি।"

মালতী বলিল, "না না সত্য করে বলো। কারবারের চিঠি তো তুমি রোজই পাও, তাতে তো তুমি ভাবো না?"

সুপবিত্র বলিল, "এ থানায় যদি ভাব্‌বার কথা থাকে?"

মালতী দুই হাতে সুপবিত্রকে জড়াইয়া ধরিল, কেন যেন তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল। সে তাহার জলভরা চোখ দুইটি তুলিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "তুমি ফাঁকি দিচ্ছ। সত্য করে বলো না, কার চিঠি?"

সুপবিত্রের চোখেও জল আসিতেছিল, সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বল্‌বো, চল, ঘরে যাই।"

সুপবিত্র ঘরে যাইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, মালতী তাহার চেয়ার ধরিয়া পাশে দাঁড়াইল।

সুপবিত্র বলিল, "মালতী, তোমার কাছে গোপন কর্‌লে চল্‌বে না, তোমাকে বল্‌তেই হবে। চিঠি আমার ভাই লিখেছে, সে মাকে নিয়ে এখানে আস্‌ছে।"

মালতী বুঝিতেই পারিল না যে ইহাতে মানুষের কোনরকম ভাবনা হইতে পারে। সে তবু জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বল্‌ছো?"

সুপবিত্র বলিল, "সত্যই বল্‌ছি মালতী।"

মালতীর অশ্রুসিক্ত মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল, "এই জন্য ভাবনা? তোমরা বাঙ্গালী, যাতে ভাব্‌তে নাই তাতেও ভাবো। আমার মা ভাই আস্‌ছে শুন্‌লে আমি কেবল হাস্‌তেম্‌।"

সুপবিত্র মনে মনে বলিল, "আমিও যদি তোমার মত ভালবাসার কাছে জাতি সমাজ, আচার বিচার, লজ্জা শঙ্কা, সব বিসর্জ্জন দিতে পারতেম্‌!" কিন্তু বিসর্জ্জন করা দূরে থাক্‌, মা ও ভাই আসিতেছেন শুনিয়া জাতিসমাজ-লজ্জা-সঙ্কোচের বন্ধন তাহার মনকে আরো আঁটো করিয়া বাঁধিয়া তাহার সমস্তটুক স্বাধীনতা একেবারে লোপ করিয়া দিল।

মালতী বলিল, "এতদিন তোমার কাছে কেবল তাঁদের গল্পই শুনেছি, এইবার দেখা হবে। আমার কিন্তু বড় আহ্লাদ হচ্ছে। কবে আসবেন তাঁরা?"

সুপবিত্র বলিল, "ছয় সাত দিন পরে।"

মালতী ছেলের মুখে চুমো খাইয়া বলিল, "বিদেশীয়ারে, তোর সব আপনার লোক আসছে, দেখ্‌লে চিন্‌তে পারবি তো?"

মালতী ছেলের নাম রাখিয়াছিল বিদেশীয়া।

সুপবিত্র টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। কি বিশ্বাসভরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মালতী সেই নির্ম্মম ব্যাধের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল!

একটু পরে মাথা তুলিয়া সুপবিত্র বলিল, "মালতী, আমার একটা কথা শুন্‌বে?"

মালতী বলিল, "তোমার সব কথাই তো শুনি।"

সুপবিত্র বলিল, "তুমি কিছুদিন বেনাডিতে যেয়ে থাকো।"

মালতী বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ? তোমার মা ভাই আস্‌ছেন, এখন আমি চলে যাবো!"

সুপবিত্র বলিল, "যাওয়াই ভালো, মালতী।"

মালতী হাসিয়া বলিল, "কি—ঠাট্টা কচ্ছো!"

সুপবিত্র দেখিল, এ বনের হরিণী কিছু বোঝে না। বলিল, "ঠাট্টা না মালতী, তোমাকে তাঁরা ভালবাসবেন না।"

মালতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তোমার বউ, ছেলে, তাঁরা ভালবাসবেন না!"

"বৌ"! "ছেলে"! কি উপহাস! সে যে সুপবিত্রের "বউ" এবং বিদেশীয়া যে তাহার "ছেলে" এ কঠোর সত্য তো কেবল একটা কথায় মিথ্যা হইতে পারে না—কিন্তু তবু তাহা কত মিথ্যা!

সুপবিত্র নিতান্ত নির্লজ্জের মত বলিল, "মালতী, তারা আমাদের সম্বন্ধ স্বীকার করবেন না।"

মালতীর মনটা যেন কেমন ভারি হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কাতর হইল না। অসীম নির্ভরে সুপবিত্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাঁরা যদি স্বীকার না করেন, নাই করবেন, কিন্তু তোমার আমার সম্বন্ধ তো কোনদিন টুটবে না।"

সুপবিত্র মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমরা বাঙালী, বাঙালী-মতে বিয়ে না হ'লে আমাদের কোন সম্বন্ধ হয় না। তাঁরা এসে তোমাকে দেখ্‌লে আমার মুখ দেখাবার জায়গা থাক্‌বে না।"

শেষের কথাগুলি মালতীর কানে গেল না। তাহার কানে প্রলয়ের সর্ব্বধ্বংসী মেঘগর্জ্জনের মত কেবল গর্জ্জিতেছিল, "বিয়ে না হলে সম্বন্ধ হয় না!" তবে এতদিনের যে বিরহের বেদনা, মিলনের তৃপ্তি, এতদিনের যে স্নেহ, আদর,

সর্ব্বত্যাগী আকর্ষণ, সে সব মিথ্যা, সব ভুল! বিদেশীয়া, সেও মিথ্যা! তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। ছেলেকে বুকে আঁটিয়া ধরিয়া, সে সুপবিত্রের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

মালতী কোন উত্তর দিল না দেখিয়া, সুপবিত্র বলিল, "যে কয়দিন তাঁরা এখানে থাকেন, সে কয়দিন তুমি বেনাডিতে তোমার বাবার কাছে যেয়ে থাকো।"

মালতী তবু কোন উত্তর দিল না,—নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সুপবিত্র আজ তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, নিতান্ত কাঙালের মত বিদায় করিয়া দিতেছে। এ কাঙালের বেশে সে কেমন করিয়া বেনাডিতে ফিরিয়া যাইবে? তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। একদিন মালতীকে পাইবার জন্য সুপবিত্র যেমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্য আজ সে ততোধিক অস্থির হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি বলো মালতী?"

মালতী কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তাহার ঠোঁট দুইখানি কাঁপিয়া উঠিল—কিন্তু কথা ফুটিল না। করুণ দৃষ্টিতে সুপবিত্রের দিকে চাহিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। সুপবিত্র চেয়ার হইতে নামিয়া মালতীর পাশে বসিল এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মালতী আমাকে এ কলঙ্ক হতে রক্ষা কর।"

মালতী দেখিল, সুপবিত্রের চক্ষে কি কাতর মিনতি! সে কাতর মিনতি মালতীর বুকে সকল দুঃখ অপেক্ষা বেশী বাজিল। সে সুপবিত্রের সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত গ্লানি, মাথায় তুলিয়া লইয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিল।

তিন-চার দিন পরে ডাম্‌রা সুপবিত্রের বাঙ্গলায় আসিল। মালতী নিজের ও ছেলের গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া সুপবিত্রের পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল। তার পর একখানি মলিন ছিন্ন কাপড় পরিয়া, নগ্নদেহ পুত্রটিকে কোলে লইয়া, বাঙ্গলা ত্যাগ করিল।

(৩)

আবার সেই বেনাডির মহুয়া-তলা, সেই শালবন! একদিন মালতী ঐ শালবনের দিকে কেমন তৃষিত চক্ষে চাহিয়া থাকিত! এখন ঐ শালবন তাহারই জীবনের কাহিনীর মত দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভরা! সেই মহুয়া-তলায় বসিয়া, বসিয়া সে ভাবিত, "যদি এমনি করে ধূলায় ফেলে দেবে, তবে মাথায় তুলে নিয়েছিলে কেন?" মালতী কাহারো সঙ্গে কথা বলিত না। দিনরাত তাহার বুকের মধ্যে একটা হাহাকার কাঁদিয়া ফিরিত। যখন সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সেই হাহাকার তাহার বুক ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিত, তখন সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বিদেশীয়াকে বুকে আঁটিয়া ধরিত।

এক বৎসর গেল—সুপবিত্র মালতীর কোন সংবাদ লইল না। ডামরার সহিত কিন্তু তাহার প্রতিমাসে দেখা হইত। ডামরার সংসার বেশ সচ্ছল ভাবে চলিতে লাগিল। মালতী ক্রমে রুগ্ন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

চৈত্রের দুপ্রহর, রোদে কাঠ ফাটিতেছে, এমন সময় একটি লোক আসিয়া ডামর মাহাতোর "গোড় লাগিল"। ডাম্‌রা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ হো?"

আগন্তুক বলিল, "হাম্ কুঁজলা।"

কুঁজলা যে কে ডাম্‌রা তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। চৌদ্দবছর আগে কুঁজলার সহিত মালতীর যে বিবাহ হইয়াছিল, সে কথা প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মালতীর মা খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কুঁজলা—মালতীকা দুল্‌হা?"

কুঁজলা উত্তর করিল—"হাঁ।"

মালতী বারান্দায় বসিয়া ছিল; তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত এক মুহূর্ত্তে ঘূর্ণি পাকাইয়া, একটা আগুনের হল্কার মত মাথায় যাইয়া উঠিল। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। মেয়ের অবস্থা দেখিয়া ডাম্‌রা ভয়ানক চটিয়া গেল। আগন্তুক যেই হোক্ সে যে তাহার মেয়ের উপর "ডাইনী লাগাইয়াছে" সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। সে রাগিয়া বলিল, "বের হ আমার বাড়ী হতে। কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, আজ চোদ্দবছর পরে এসে বল্লো কি না আমি কুঁজলা, মালতীর দুল্‌হা, আর আমি অমনি মেনে নিলাম তুই মালতীর দুল্‌হা! বের হ আমার বাড়ী হতে জুয়াচোর।"

ডাম্‌রার সকল কথা কুঁজলার কানে গেল না। সে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। জ্ঞানশূন্য মালতী মাটিতে পড়িয়া আছে, তাহার ক্লিষ্ট শুষ্কমুখে মৃত্যুর ছায়া নৃত্য করিতেছে, তবু কি সুন্দর! কুঁজলা নম্র হইয়া বলিল, "চোদ্দ বছরের কথা, তোমরা ভুলেই যেতে পারো। বিয়ের পরেই আমরা আসামের চা-বাগানে গিয়েছিলাম। মা বাবা মারা গেছে। আমি এতদিনে ছুটি পেয়েছি।"

ডাম্‌রা ও তাহার স্ত্রী সে-সব কথা শুনিল না, তাহাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিল। কুঁজলা কিন্তু অত সহজে তাহার ন্যায্য দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। সে ভয় দেখাইয়া গেল যে, গাঁয়ের সকলকে ডাকিয়া সে পঞ্চায়েৎ করিবে, এবং তাহারা যদি তাহার "বহুরিয়া"কে না দেয়, তাহা হইলে কাছারিতে যাইয়া নালিশ করিবে।

মূর্চ্ছা ভাঙিলে মালতীর মনে হইতে লাগিল, "আহা যদি মরে যেতেম!" তাহার জীবন এখন বড় দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। প্রতিদিন তাহার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল, প্রতিদিন সে মৃত্যুর অপেক্ষায় কাটাইতে লাগিল।

একদিন ডাম্‌রা ও তাহার স্ত্রী ক্ষেতে গিয়াছে, মালতী একা একা বাড়ীতে বসিয়া আছে। এমন সময় কুঁজলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুঁজলাকে দেখিয়া মালতীর শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। পাছে সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে এই ভয়ে সে তাহার সমস্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া শক্ত হইয়া বসিল। কুঁজলা বলিল, "মালতী, আমি তোর স্বামী।"

মালতী বলিল, "না না, তুমি আমার কেউ নও— কেউ নও।"

বিদেশীয়াকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "বিদেশীয়ার বাবা আমার স্বামী, তুমি আমার কেউ নও।"

মালতীর সব ঘটনা কুঁজলা শুনিয়াছিল। সে বলিল, "সেই বাঙ্গালীবাবু তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তোকে বিয়ে করেছিলাম, ধর্ম্মতঃ আমিই তোর স্বামী। চল্ মালতী, তোর বিদেশীয়াকে নিয়ে আমার ঘরে চল্, আমি ওকে ছেলের মত মানুষ করবো।"

কুঁজলার প্রত্যেকটি কথায় লজ্জা ও অপমানে মালতীর শরীর ও মন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। সে অস্থির হইয়া উঠিল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় অশ্রু তাহার বুক ভাসাইতে লাগিল। কোন উত্তর না পাইয়া কুঁজলা বলিল, "তোর মা বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু পঞ্চায়েৎরা বল্‌লে তো আর না দিয়ে পারবে না। তখন তোকে যেতেই হবে।"

মালতী দৃঢ়স্বরে বলিল, "তা হলে আমি 'মাহুর' খেয়ে মরবো।"

কুঁজলা তাহার মুখে অপূর্ব্ব দৃঢ়তা দেখিয়া বুঝিল, দরকার হইলে সে মাহুর খাইতে পারে। সর্ব্বাশ্রয় মৃত্যুর নামে মালতী যেন অনেকটা সাহস পাইল—তাহার মুখ এক নূতন আশায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই প্রদীপ্তমূর্ত্তি দেখিয়া কুঁজলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন উগ্র, সর্ব্বত্যাগী ভালবাসা সে কখনো দেখে নাই। ক্রমে মালতী তাহার চক্ষে স্বর্গের দেবীর মত মহামহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিল—কুঁজলা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল।

(৪)

কুঁজলার সহিত দেখা হইবার পর মালতীর মূর্চ্ছার আক্রমণ ক্রমে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, তাহার মৃত্যুর দিন নিকটে আসিতেছে। একদিন মালতী ডাম্‌রাকে বলিল, "বাবা, আমাকে একবার কাথাড়ির বাঙ্গলায় নিয়ে চলো, এর পরে আমি আর যেতে পারবো না।"

ডাম্‌রা জানিত মালতীর এখন কাথাড়ি যাওয়া নিষেধ, কিন্তু মেয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহার বড় কষ্ট হইল। সে বলিল, "আচ্ছা, আমি গাড়ী ঠিক করি।"

মালতী বলিল, "গাড়ীর দরকার নাই, আমি হেঁটে যাবো।"

ডাম্‌রা বলিল, "তা হলে তুই পথেই মরে যাবি।"

মালতী এখন মরিতেই চায়। সে বলিল, "যদি মরি তা হলে বিদেশীয়াকে বাঙ্গলায় রেখে এসো।"

সে কিছুতেই গাড়ীতে যাইতে সম্মত হইল না। কাজেই পরদিন তাহারা হাঁটিয়া কাথাড়ি রওনা হইল। এই বার-ক্রোশ যাইতে মালতীর তিন দিন লাগিল। সে যখন কাথাড়ির বাঙলার সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছে, প্রাণটা বাহির হইবার জন্য বুকের কাছে আসিয়া ধুক্‌ধুক্ করিতেছে।

বাঙ্গলার পাশেই দশ-বারোটা পলাশ-গাছ, একটা হরিতকী গাছকে বেষ্টন করিয়া, একটি সুন্দর কুঞ্জ রচনা করিয়াছে। সেই কুঞ্জের পাশে আসিয়া মালতী মাটিতে শুইয়া পড়িল। তাহাকে সেইখানে রাখিয়া ডাম্‌রা সুপবিত্রকে সংবাদ দিল যে মালতী একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।

সুপবিত্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় মালতী? এখানে এসেছে?"

ডোম্‌রা বলিল, "তার চলবার শক্তি নাই বাবু, অনেক কষ্টে এসেছে। ঐ পলাশবনের কাছে এসে সে একেবারে অশক্ত হয়ে পড়েছে।"

পাছে মালতী বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সুপবিত্র তাড়াতাড়ি ডাম্‌রার সঙ্গে চলিল। পলাশগাছের ছায়ায় মালতী শুইয়া আছে—কি পরিবর্ত্তন! সুপবিত্র দেখিয়া চমকিয়া উঠিল; তাহার বুকের মধ্যে কাহার যেন রুদ্ধশ্বাস গর্জ্জিয়া বলিতে লাগিল, "বিশ্বাসঘাতক! খুনী!" খুনীর মতই সে আসিয়া মালতীর পাশে দাঁড়াইল।

সুপবিত্রের মা সেই সময়ে সেই পলাশবনে হরিতকী-গাছের নীচে বসিয়া হরিতকী কুড়াইয়া কুড়াইয়া আঁচলে তুলিতেছিলেন। তাঁহার যেন বোধ হইল বাহিরে সুপবিত্র কথা বলিতেছে। তিনি তাহার কাছে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু পাতার ফাঁক দিয়া যে দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতে তিনি অচল হইয়া রহিলেন।

মরণাহত মালতী মাটিতে পড়িয়া আছে—তাহার পাশে বিদেশীয়া। ডাম্‌রা বলিল, "মালতী, বাবু এসেছে।"

মালতী চোখ মেলিয়া দেখিল, সুপবিত্র। সে সুপবিত্রের পায়ের দিকে হাত বাড়াইল, কিন্তু তাহার ক্লান্ত হাত অত দূরে পৌঁছিতে পারিল না, শ্লথ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অনেক কষ্টে মালতী বলিল, "আমি তার কাছ হতে পালিয়ে এসেছি—রক্ষা কর, আশ্রয় দাও।"

সুপবিত্র বুঝিতে না পারিয়া ডাম্‌রার দিকে চাহিল। ডাম্‌রা বলিল, "পাঁচ বছর বয়সে কুঁজলার সাথে মালতীর বিয়ে হয়েছিল। এতদিন কুঁজলা কোথায় ছিল, তা কেউ জানতো না। আমরা মনে করেছিলাম সে মরে গেছে। এখন সে ফিরে এসে মালতীকে তার ঘরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।"

কথাগুলি সুপবিত্রের কানে গেল—কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক সেগুলিকে কেবল ওলট্-পালট্ করিয়া গোল পাকাইয়া ফেলিতে লাগিল। এমন সময় আর-একজন লোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সে কুঁজলা। সেদিন মালতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে ভাবিতে লাগিল, "মালতী যে আমাকে চায় না। সে মরতে চায়—তবু আমাকে চায় না। আহা বেচারা, তার দোষ কি, সে তো কিছু জানে না! সেই ছেলেবেলাকার ছেলেখেলার মতন একটা মিছে বাঁধন—সে কবে খসে পড়ে গেছে। আমি তাকে এ মিথ্যা বাঁধন হতে মুক্তি দেবো।" বেনাড়িতে আসিয়া সে শুনিল, মালতী কাথাড়ি গিয়াছে, তাই সেও কাথাড়ি আসিয়াছে।

সুপবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সে উত্তর করিল, "আমি কুঁজলা, মালতীর স্বামী।"

কুঁজলার কণ্ঠস্বরে মালতী চমকিয়া উঠিল. চোখ মেলিয়া কুঁজলাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। মৃত্যুর অবসাদ দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া সে উঠিয়া সুপবিত্রের পায়ের উপর গিয়া পড়িল। দুই হাতে পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ষা কর—রক্ষা কর, তুমি যে আমার সব।"

সুপবিত্র মাথা নীচু করিয়া রহিল। মালতী বলিল, "আশ্রয় দেবে না?"

সুপবিত্র বলিল, "মালতী, আমার সে অধিকার নেই।"

মালতী বলিল, "তোমার নেই? তবে কার আছে? তুমি যে শিখিয়েছিলে, মেয়েমানুষের স্বামী এক, সে কি মিথ্যা শিখিয়েছিলে? না না, আমি আমার নিজের মনে বুঝতে পারছি—স্বামী এক, এর চেয়ে সত্য আর নাই। তুমি স্বামী—তবু এ বিপদে আশ্রয় দেবে না?"

সুপবিত্র তেমনি দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার অধিকার নেই।"

হতাশ হইয়া মালতী কুঁজলার পায়ের কাছে জোড় হাত করিয়া বলিল, "তবে তুমিই মাফ করো। কেন আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করবে? আমার যে আর সময় নাই, বলো, বলো, মুক্তি দিলে? মরবার আগে আমাকে জেনে যেতে দাও, আমি মুক্ত—আমার স্বামী এক।"

কুঁজলার চোখে জল আসিল। সে বলিল, "মালতী, তুই মুক্ত—তোর সাথে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে "মা" বলিয়া, মালতী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

কুঁজলার আগুনের মত চক্ষু দুইটা সুপবিত্রকে দগ্ধ করিতে লাগিল। অসভ্য অর্দ্ধনগ্ন কুঁজলা, সুপবিত্রের চক্ষে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে এক বিরাট পুরুষের মত তাহার সমস্ত দৃষ্টি অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল; আর সে যেন ক্ষুদ্র হইতে হইতে তাহার পায়ের ধূলিকণার সহিত মিশিয়া গেল। সুপবিত্র কুঁজলার মুখের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

কুঁজলা সেখান হইতে চলিয়া গেল। সুপবিত্রের মা এতক্ষণ যেন চেতনাশূন্য হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন। সংজ্ঞাহীন মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয় নারীর মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বজ্রের মত কঠোর স্বরে ডাকিলেন—"সুপবিত্র!" মায়ের কণ্ঠ শুনিয়া সুপবিত্র সেখান হইতে লজ্জায় পলাইল। সুপবিত্রের মা বাহিরে আসিয়া, সস্নেহে মালতীর মাথা কোলে তুলিয়া বসিলেন। মালতী চোখ মেলিয়া চাহিল। জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

তিনি বলিলেন, "আমি সুপবিত্রের মা।"

পরিচয় দিতে লজ্জা ও ঘৃণায় তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। মালতী অনেক কষ্টে পুত্রকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার কোলে ফেলিয়া দিল। সুপবিত্রের মা তাহাকে বুকে উঠাইয়া লইলেন। মালতীর মৃত্যুক্লিষ্ট মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে বলিল, "আমি জানি ভালবাসবেন।" তাহার পরই সেই হাসির জ্যোতি মৃত্যুর কালিমায় ডুবিয়া গেল।

বিদেশীয়াকে বুকে করিয়া সুপবিত্রের মা বাঙ্গলায় গেলেন। ছোট ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন "সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী চল্।"

সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওটি কে মা?"

মা বলিলেন—"ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

সেই রাত্রেই তাঁহারা চলিয়া গেলেন। সুপবিত্রের সহিত তাহার মা দেখা করিলেন না।

বেহারী সিং।

ভাবী সাহিত্য সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা

(১)

মনুষ্যলোকে আমাদের কাল আছে মোটে তিনটে, কিন্তু মানুষের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে বিশেষ বিশেষ দেশে এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ওরি মধ্যে কোন-একটা কাল মানুষের মনের ও কল্পনার ঝোঁকে এমনি একান্ত হইয়া ওঠে যে তাকে রোখে কার সাধ্য! কোন দেশ মানুষের "স্ব" হইলে মনের উপর তার প্রভাব যেমন নিবিড় হয়, তেম্নি কোন একটা কাল সম্বন্ধে "এটা আমার স্বকাল" কেবলমাত্র এই অনুভূতির প্রভাব মানুষের মনের উপর সামান্য নয়।

ইতালীয়ন রেনেসাঁসের সময় কোন্ সেই অতীতকালের গ্রীসের মধ্যে ইতালীয়গণ যাত্রা করিয়াছিল—ইতালীয় সহরে সহরে যেখানে পূর্ব্বে ছিল মধ্যযুগীয় চর্চ্চের অচলায়তন, সেখানে গ্রীক্ জ্ঞানবিজ্ঞানের দীপালি উৎসবের ধুম লাগিয়া গেল। মধ্যযুগের চর্চ্চের নিয়ম-সংযমের সমস্ত রসারসি কশাকশি আল্‌গা হইয়া গিয়া গ্রীকসভ্যতার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও রূপবিলাস ইতালীয়দিগকে কি ভাবে অভিভূত করিয়াছিল, তাহা সাইমণ্ড্‌স্-রচিত ইতালীয়ন্ রেনেসাঁসের সুবিস্তৃত ইতিহাসের "সামাজিক ও গার্হস্থ্যনীতি" সম্বন্ধীয় অংশ পাঠ করিলেই বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর, ফরাসী বিপ্লবের কালে অতীতটা এমনি মুছিয়া গেল যে, মানুষ year one, ইতিহাসের সেই প্রথম বৎসর আরম্ভ হইল বলিয়া, ঘোষণা করিতে লাগিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পৃথিবীতে যে অনেক বৎসর চলিয়া গেছে, তাহা যেন না মানিলেও কোন ক্ষতি নাই—তার সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেলেও যেন কিছুই আসে যায় না, এই ভাব। তখন চর্চ্চে গিয়া পবিত্র পাত্রে (Chalice) হইল মদ্যপান; ম্যাস-বুক—প্রার্থনার গ্রন্থবিশেষ—ছিঁড়িয়া তৈরি হইল কার্ট্রিজ-পেপার!

ভবিষ্যৎটা এমনি একান্ত ভাবে কোন দেশকে বা কোন জাতিকে কোন সময়ে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, প্রাচীনকালের ইতিহাস হইতে এমন নজির হাজির করা শক্ত। শোনা যায়, যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ইহুদী জাতের মনে ভবিষ্যতের জন্য একটা একান্ত আবেগের সঞ্চার

হইয়াছিল। কিন্তু সে শুধু একজন 'মেসায়া' বা পরিত্রাণ-কর্ত্তার আবির্ভাবের আশায়। সুতরাং এটা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, এই হালে, আধুনিক কালে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানুষ যতটা ভাবনা ভাবিতেছে, ভবিষৎ সম্বন্ধে নানা দিক্ হইতে যত জল্পনা জপিতেছে, এমন পূর্ব্বকালে কোন সময়েই জপে নাই। শুধু ভাবী সাহিত্য কেন, ভাবী সমাজ-তন্ত্র, ভাবী রাষ্ট্রতন্ত্র, ভাবী মানুষের বাসস্থান, ভাবী ভাষা, ভাবী আশা, ভাবী পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাবী ব্যবসাবাণিজ্য, ভাবী যানবাহন, ভাবী যুদ্ধপ্রণালী বা শান্তির ব্যবস্থা—এ সমস্ত লইয়াই মানুষের জল্পনাকল্পনার আর অন্ত নাই।

আধুনিক সাহিত্যে তার মস্ত সাক্ষী, এইচ্ জি ওয়েল্‌সের 'Anticipations' বইখানি। তাতে আগামী ২০০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় সভ্যতার চেহারা কি-রকম হইবে, সমাজে রাষ্ট্রে সাহিত্যে কি কি বদল হইবে, ওয়েল্‌স্ সাহেব তার কতক কতক পূর্ব্বাভাস কল্পনায় আঁচিয়াছেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে, বোয়ার-যুদ্ধের পূর্ব্বে এই বইখানি তৈরি হয় এবং তার পরে কয়েক বছরের মধ্যে এমন অনেকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাতে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কিছু-কিছু ফলিয়াছে দেখা যায়। যেমন তাঁর একটা কথা ছিল যে, boomsters আর থাকিবে না; এ কথাটা ফলিয়াছে। সাহিত্যে Boomster অর্থে আমরা যাকে বলি সাহিত্য-সম্রাট। ওয়েল্‌স্ বলেন, এই-সব সম্রাটের জায়গায় ছোটদের ক্রমশঃ আদর ও কদর বাড়িবে! কিন্তু এ কথাটা যে ফলিয়াছে তা ঠিক বলিতে পারি না, কারণ বাইরনের কাব্য বা স্কটের ওয়েভার্‌লি উপন্যাসাবলীর মত একালেও তাঁর দেশেই রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি"ও boomed অর্থাৎ ঘোষিত হইয়াছে কম নয়। ওয়েল্‌স্ তাঁর "Boon, The Mind of the Race" ইত্যাদি ইত্যাদি—লম্বা নাম-যুক্ত সম্প্রতি-প্রকাশিত একটা নূতন বইয়ে সে-কথা আংশিক ভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন দেখিয়াছি। প্রথমতঃ তিনি লিখিয়াছেন যে, "শরীরের দিক্ হইতে আমরা পূর্ব্বপুরুষদের সন্তান, কিন্তু মনের দিক্ হইতে আমরা জাতীয় মনের সন্তান এবং এই জাতীয় মনটাকে সাহিত্যিক-মাত্রেই বিচিত্রভাবে তাঁর নিজের নিজের রচনায় ব্যক্ত করিয়া তুলিবেন।" সুতরাং ওয়েল্‌সের মতে এমনও এক সময় আসা বিচিত্র নয়, যখন জাতীয় মনের পরিস্ফুটন এমনি উজ্জ্বল হইবে যে, গ্রন্থকর্ত্তার নামের আর দরকার হইবে না। অর্থাৎ তখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, রচনা-বিশেষের লেখক কে? উত্তর হইবে, Race-Mind, জাতীয় মন। তখন সাহিত্য-সম্রাট বা বড় লেখকের আর স্থান থাকিবে না। কিন্তু তার পরেই, এই-সব কথা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই, তিনি লিখিয়াছেন—"Doubtful case of Rabindra Nath Tagore"—রবীন্দ্রনাথের কেস্‌টা কিছু সন্দেহজনক বটে!

যাই হোক্, ওয়েল্‌সের "Anticipations" একটা উপ-ভোগ্য বই বটে। তার মধ্যে ভাবী ইউরোপ সম্বন্ধে ভাবিবার যথেষ্ট কথাই আছে। এখন তার সব ভবিষ্যৎ-উক্তিগুলো ফলুক আর নাই ফলুক! এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সাহিত্যে ভবিষ্যদ্বাণী ফলাটাই খুব বড় কথা নয়। আমাদের সাহিত্য-গীতাতেও বলে যে কল্পনাতেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়। বাস্তবিক ওয়েল্‌সের ঐ জল্পনাকল্পনাগুলোর মধ্যে যে রস আছে, সে রস 'বস্তুতন্ত্র' রস নয়। সে কেবল কল্পনার আকাশে মনের এরোপ্লেনে চড়িয়া অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় খানিকটা ঘুরিয়া আসার আনন্দ মাত্র। তার দ্বারা যাই ফল থাক্ আর না থাক্, তাতে যে মনের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয় এবং মনের প্রসার বিস্তীর্ণ হয়,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ধরণের লেখার পরিবর্ত্তে যদি একটা রীতিমত সাহিত্য-সংহিতা বানানো যায়, যদি জোর করিয়া তাল ঠুকিয়া বলা যায় যে, ভাবী সাহিত্য এই এই ধরণ ধরিবে বা ভাবী সমাজ এই এই গড়ন গড়িবে, তবে তাতে রস পাওয়া যায় না। কেননা, লেখকের ঐ কৃত্রিম জোরটা তখন পাঠকের মনের মাংসপেশীগুলাকেও শক্ত করিয়া তোলে। সে বলে, এ ব্যক্তি ভবিষ্যতের উপরেও এতটা জুলুম করিতে চায়, সমস্তই স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে চায়, অস্পষ্টতার কোন স্থান রাখে না—এর স্পর্দ্ধা ত কম নয়? মনটা কাজেই বাঁকিয়া বসে। এইজন্য ভাবী লোকের কল্পপুরী তৈরি করিলে তাতে বরং পাঠকের মনটা আশ্বস্ত হয়, কিন্তু আস্ত বস্তুতন্ত্রপুরী ভবিষ্যতের ঘাড়ের উপর চাপাইলে সেটা বিশ্বস্ত ভাবে মানিয়া লইতে সে রাজি হয় না।

(২)

"বাংলার ভাবীসাহিত্য" সম্বন্ধে চিন্তাশীল সুলেখক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সবিস্তরে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভাবী সাহিত্যের একটা পরিষ্কার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "বাঙালী লেখকের একটা বহুদিনসঞ্চিত ভুল ধারণা যে, বাঙালীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুধু গৃহজীবনের ক্ষেত্রেই হইয়াছে।" কিন্তু "বাঙালীর ব্যক্তিত্ব এখন নানাক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে... এই বিচিত্র বিকাশের ছাপ সাহিত্যে এখনও পড়ে নাই। অথচ বাঙালীর জীবন পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক Complex জটিল হইয়া পড়িয়াছে—নানা ভাঙ্গাগড়া নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া বাঙালী আজ তাহার জীবন অতিবাহিত করিতেছে। এই ভাঙ্গাগড়া এই পরিবর্ত্তনের ছবি যতদিন সাহিত্যে প্রতিফলিত না দেখিব ততদিন সাহিত্যের প্রাণ নাই বুঝিব।" অতএব, তাঁর মতে "বাঙালীর জীবনে যে-সকল সমস্যা এখন খুব বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেইগুলিই হইতেছে আমাদের ভাবীসাহিত্যের আসল উপকরণ।" সুতরাং সেই সমস্যার তালিকা সাজাইলেই ভাবী সাহিত্যের নক্সা আঁকা সম্পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে বলিয়া তাঁর বিশ্বাস।

ক। সমস্যা নং ১—"বাঙালীর অন্তর্জীবনের এখন প্রধান সমস্যা হইতেছে এই, হিন্দুর যুগযুগান্তরের একক ধর্ম্মসাধনা ও বর্ত্তমান যুগের সেবাধর্ম্মের বিরোধ।"

এ সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া কোন উপন্যাস-সাহিত্য রচিত হয় নাই, এজন্য লেখক অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছেন। ভাবী সাহিত্যিকেরা এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলে পারেন।

খ। সমস্যা নং ২—"নারী মাতা হইয়া সমাজের নিকট দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবে, না রাষ্ট্র শিল্প সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সহচরী হইয়া?"

এ সমস্যা-বিষয়ে—

"রবীন্দ্রনাথ "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে নারীজীবনের আলোচনা করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য আদর্শকে অত্যন্ত খাটো করিয়া লইয়াছেন।" কারণ "পুরুষ ও নারীতে যে প্রেম আবদ্ধ তাহাতে কোন সমাজ প্রাচ্যই হউক বা পাশ্চাত্য হউক টিঁকে না।" "সমাজ, কুল, জাতি ও মানের বন্ধন সৃষ্টি করিয়া প্রেমের গতিকে বিশ্বের দিকে ধাবমান রাখিয়াছে" ইত্যাদি। অতএব 'ঘরে-বাইরে' নামঞ্জুর। তার পর "বন্ধন অনেক সময় এমন হয় যে প্রেমের বিকাশ সাধন দূরে থাক্ তাহা প্রেমকে পরিহাস করে মাত্র। টলষ্টয়ের Kreutzer Sonata এই দিক্‌কার একটা ভীষণ চিত্র।" সুতরাং সে উপন্যাসও বাতিল।

গ। সমস্যা নং ৩—জাতীয়তা ও সার্ব্বভৌমিকতা। "জাতীয়তার নিবিড় উপলব্ধির পূর্ব্বে বিশ্বধর্ম্ম লাভের অধিকার জন্মে না।" অতএব সিদ্ধান্ত এই—

"তুর্গেনিভের সাহিত্যের সঙ্গে পরবর্ত্তী টলষ্টয় ডষ্টয়ভেস্কির সাহিত্যের যে প্রভেদ, আমার মনে হয় আধুনিক রবীন্দ্র-সাহিত্য ও আমাদের ভাবীসাহিত্যের সেই প্রভেদই লক্ষিত হইবে।" কারণ, লেখকের মতে টুর্গেনিভ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বপ্রেমিক। সেইজন্য তিনি "রুশিয়ায় টিঁকিলেন না।"

লেখক আশ্বাস দিয়াছেন যে "জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষার এই কাজ সাহিত্যে এখন বেশ চলিতেছে"—কাদের দ্বারা চলিতেছে তাহা নাম করিয়া বলেন নাই।

ঘ। সমস্যা নং ৪—সাহিত্যে শ্রমজীবীদিগের স্থান। (ইহার আগে প্রসঙ্গতঃ লেখক বলিয়াছেন যে, বাংলা-সাহিত্যে শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে এবং পলিটিক্স সম্বন্ধে কোন নাট্য উপন্যাস নাই।)

তিনি আশা করেন যে Les Miserables ও Poor Folkএর মত বই বাংলা সাহিত্যে দেখা দিবে। এ সম্বন্ধে তিনি শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩)

আধুনিক সাহিত্য অনেক পরিমাণে সমস্যার সাহিত্য, ইহা সত্য। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে কোন "সমস্যার উত্তর" ত পাওয়া যায় না। সেই কারণে লেখককে ভাবী সাহিত্যের উপর সমস্যাপূরণের বরাত দিতে হইয়াছে। অবশ্য সমস্যার আলোচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ কি না, সে প্রশ্ন আমি এখন তুলিব না—সে সম্বন্ধে পরে অনেক কথা ভাবিবার আছে। উপস্থিত-মত যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে সাহিত্য-স্রষ্টা মাত্রেই সমস্যার সন্ধান ও সমাধানের জন্যই তপস্যায় রত আছেন, তবে এই কথাই জিজ্ঞাসা

করিতে হয় যে, কোনো যুগেই সেই সন্ধানের পার কেউ পায় কি না, এবং সমাধানটাও পুরোদস্তুর মেলে কি না। এইটেই বরং দেখা যায় যে, দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত এক সমস্যা-মোচনের সঙ্গেসঙ্গেই অন্য সমস্যা অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়। এক সমস্যার বিশেষ কোন সমাধানের প্রস্তাব আসিলেই আরো পাঁচ সাতটা উল্টা-গোচের প্রস্তাব আপনিই জাগিয়া ও জমিয়া ওঠে। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও রুচির বৈচিত্র্যের অন্ত নাই; সেইজন্য মানুষের মধ্যে কোন জিনিসকে দেখিবার বা বুঝিবার ধরণেরও বৈচিত্র্য অশেষ। সাহিত্য-সমালোচনা বল, রস-বিচার বল, সমস্তেরই ভেদের মূলে এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য। প্রফেসার জেম্‌স্ বলেন যে, দর্শনও এক হিসাবে মানুষের প্রকৃতি ও রুচি-বৈশিষ্ট্যেরই ফল মাত্র।

সেইজন্য দেখি, যে, কোন সমস্যার খুব পাকাগোচের মীমাংসাও সব মানুষের মনঃপূত হয় না। যখন প্রথম সোস্যালিজ্‌মের আবির্ভাব হইয়াছিল, যখন শোনা গিয়াছিল যে সোস্যালিজ্‌মের ব্যবস্থায় মানুষের রোগশোক দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান ঘটিবে, তখন ষ্টিভেন্‌সন্ তাঁর Lay Morals বইটিতে এই বলিয়া সোস্যালিজ্‌মের নিন্দা করিয়াছিলেন, যে, সোস্যালিজ্‌মের স্বপ্ন সত্য হইলে সমাজের ভবিষ্যৎটা বড়ই একঘেয়ে গোচের হইবে। কারণ,

"Danger, enterprise, hope, the aleatory, are dearer to man than regular meals....... Pinches, buffets, the glow of life, the shoals of disappointments, furious contention with obstacles; these are the true elixir for all vital spirits...... Much then, as the average of the proletariate would gain in this new state of life, they would also lose a certain something, which would not be missed at the beginning, but would be missed progressively and progressively lamented."

অর্থাৎ নিয়মিত আহারের চেয়ে বিপদ, দুঃসাহসিক কাজ, আশা, ভাগ্যপরীক্ষা, এগুলো মানুষের কাছে বেশি প্রিয়।......চিম্‌টিটা, ঘুসিটা, জীবনের উজ্জ্বলতাটা, জীবনের ঝাঁকে ঝাঁক ব্যর্থকামতা, বাধার সঙ্গে প্রবল লড়াই,—এগুলো যাদের প্রাণটা জীবন্ত তাদের পক্ষে সত্যিকারের সঞ্জীবনী সুধা।......অতএব, এই নূতন জীবনের অবস্থায় দরিদ্রশ্রেণীরা গড়ের উপর কিছুটা লাভবান্ হইবে বটে, কিন্তু কিছুটা ক্ষতিগ্রস্তও হইবে—সে ক্ষতিটা গোড়ায়-গোড়ায় ততটা অনুভূত না হইতেও পারে, কিন্তু ক্রমশ হইবেই, এবং ক্রমশ তার জন্য খেদও বাড়িতে থাকিবে।

ধনী ও শ্রমীর সমস্যা-পূরণ সম্বন্ধে ষ্টিভেন্‌সনের এই কৌতুকপূর্ণ উক্তিটে এতই ঠিক্ যে, ইহা হইতেই বোঝা যায় যে মানুষ না চায় পুরোপুরি বন্ধন, না চায় পুরোপুরি মুক্তি। অর্থাৎ সমস্যার নিঃশেষে সমাধান ব্যাপারটা আসলে মানুষের কাম্য নয়। সেইজন্য সমস্যাই সমস্যাকে জন্ম দেয়; সমাধানের চেষ্টাই নবতর সমস্যার আবির্ভাব ঘটায়। আমরা বলি আধুনিক যুগটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ, কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্মতন্ত্র প্রভৃতি বড় বড় সমষ্টির পাক হইতে মানুষের ব্যক্তিত্বটা ক্রমশ আল্‌গা হইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যে স্বরাট হইয়া এ যুগে প্রকাশ পাইতে চায়। অথচ এই আধুনিক যুগটাই mass movementএরও যুগ—অনেক মানুষ, অনেক জাতিকে লইয়া বড় বড় সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান গড়িবার যুগ। এদিকে মানুষের ব্যক্তিত্ব-বোধটা এমনি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, একমাত্র-পলিটিক্‌স্-প্রধান এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, জীবনের অন্যান্য সকল বিভাগের উপর আধিপত্য করিবে, এটা মানুষ চায় না বলিয়াই নানান্ সমবায় গড়িয়া তুলিয়া রাষ্ট্রকে বিচিত্র ও বহুকেন্দ্রিক করিবার চেষ্টায় আছে। যেমন দর্শনে সে আর অদ্বৈতবাদ বা monism মানিতে চায় না, কিন্তু অসংখ্যবাদ বা pluralismএর দিকেই তার ঝোঁক; তেম্নি রাষ্ট্রেও সে আর monistic state বা ষ্টেট্ স্বয়ম্ভূকে মানিতে চায় না, কিন্তু pluralistic state, বহুকেন্দ্রিক ষ্টেটের দিকেই তার ঝোঁক। অথচ ওদিকে আবার ট্রিট্‌স্কে, নয়ম্যান-প্রমুখ জর্ম্মান রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ এবং তাঁদের সমর্থকদল বলেন, "The coming solidarity is the domination of the state"—একমাত্র ষ্টেটের আধিপত্যেই বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিতন্ত্র উঠিয়া গিয়া একটা বৃহৎ সমষ্টি-তন্ত্র রচিত হইয়া উঠিবে। সেই সমষ্টিতন্ত্রই ভাবী বিশ্বসৌরাষ্ট্রের পূর্ব্বসূচনা হইবে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন, তেম্নি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে। মানুষ ক্রীডের (ধর্ম্মমতের) বন্ধন তথৈব চর্চ্চের বন্ধন আর মানিতে চায় না—কারণ, ক্রীড্ জিনিসটা প্রতি ব্যক্তিত্বের ভিতরকার সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিশেষত্বটুকু স্বীকার করে না; ক্রীড্ মানেই অনেক ব্যক্তির ধর্ম্মবিশ্বাসের মোটমাট্ একটা চেহারা। একদিকে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য; অন্যদিকে ধর্ম্মসম্প্রদায় ক্রমশই ব্যাপক ও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। তারপর সমাজে, সমাজধর্ম্মে ও ব্যক্তি-ধর্ম্মে এই চিরন্তন বিরোধটা অন্য আকারে লাগিয়াই আছে।

ব্যক্তিধর্ম্ম সমাজধর্ম্মের নীচে কি উপরে, অর্থাৎ কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, ইহা লইয়া তর্কের ও পরীক্ষার বিরাম দেখি না। যাঁরা সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী, ব্যক্তিতান্ত্রিকেরা তাঁদের বলেন, আগে ব্যক্তিত্ববোধ, ব্যক্তির স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব-বোধ; পরে সমাজ-বোধ, সমবায়-বোধ। ব্যক্তির স্বাধীন কর্ত্তৃত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ না জন্মিলে সমবায় দাঁড়ায় কিসের উপরে? সমাজতান্ত্রিকেরা জবাব দেন্, ওরে বাস্‌রে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্রয় দিলে স্বার্থের প্রকোপকে কি কিছুমাত্র নরম করা যাইবে এবং তখন কি কোন-রকমের সমষ্টি-তন্ত্র গড়া সম্ভব হইবে? দেখনা কেন, অর্থনীতিতে, সেই Laissez faire, সেই যে-যা-ইচ্ছা-করুক নীতি অবলম্বন করার ফলেই ত ধন ও শ্রমের সমস্যা আজ এমন উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এখনো মূলধনওয়ালাদের সর্ব্বগ্রাসী চেষ্টার বিরুদ্ধে শ্রমীরা যখন সমবায় গড়ে, তখন তারাও যে তাদের ব্যক্তিধর্ম্ম, তাদের স্বার্থবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়, কৈ, তা তো বলা যায় না। মানুষের ব্যক্তিত্ব মানেই তার সামাজিক ব্যক্তিত্ব; সমাজ-তন্ত্রের ভিতর দিয়া সেই বড় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিবে। অন্য পক্ষ বলিবেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথেই যদি এই বড় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তবেই ভাল, নহিলে ব্যবস্থার ভিতর দিয়া এইরূপ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিয়া তোলার চেষ্টায় মানুষকে যন্ত্র করিয়া ফেলা হইবে। ভারত-বর্ষ ও চীনের সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থায় মানুষ এইরূপ যন্ত্রের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। মানুষকে শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা দাও, ভয় পাইয়ো না, স্বাধীনতার ফল ভাল বই মন্দ হইবে না। সমাজের তরফের লোকেরা বলিবেন, স্বাধীনতা তো স্বেচ্ছাচারিতা নয়; কোন সমাজই মানুষকে অনিয়ন্ত্রিত স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলিবেন, ইউরোপ ফরাসীবিপ্লবের পর হইতে সেই স্বাতন্ত্র্য দিয়াছিল বলিয়াই সেখানকার সভ্যতার এত উৎকর্ষ হইয়াছে, সেখানে ব্যক্তিত্ব জাগিয়াছে। এবং যদিবা ব্যক্তিত্বের কোন উচ্ছৃঙ্খল বিকার দেখা দিয়া থাকে, মানুষ তাহা সংশোধনের চেষ্টাতেও লাগিয়া আছে। সমবায় কারা গড়িতেছে? যারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বাদ পাইয়াছে, তাঁরাই নয় কি? এইরূপে উত্তর-প্রত্যুত্তর বাড়িয়াই চলিবে, তার কিনারা পাওয়া যাইবে না। একপক্ষে মিল, হর্বার্ট স্পেন্‌সারকে, অন্যপক্ষে বেঞ্জামিন্ কিড বা বোসাঙ্কোয়েকে দাঁড় করাইলে ব্যক্তিতন্ত্র ও সমষ্টিতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে হরেক রকমের যুক্তি শোনা যাইতে পারে।

এম্‌নি করিয়া যে-কোন ক্ষেত্রের দিকে তাকাই, তর্কের বিরাম নাই। সমস্যার অন্ত নাই। সাহিত্য-আর্টের ক্ষেত্রেও কেউবা আভিজাত্যের পক্ষপাতী, কেউবা গণতন্ত্রতার পক্ষপাতী। কেউ ভাবেন স্বাতন্ত্র্যটাই যত অভিব্যক্ত হয়, ততই আর্টের বিকাশ ঘটে; কেউ ভাবেন ঐ অভিব্যক্তিতেই আর্টের বিনাশ ঘটে। সভ্যতা সম্বন্ধেও কারো মতে মানুষ ক্রমশ অগ্রসর, কারো মতে মানুষ ক্রমশ অনগ্রসর, কারো বা মতে মানুষ না-অগ্রসর না-অনগ্রসর। ফিনো প্রমাণ করিবার চেষ্টায় আছেন যে মানুষ ক্রমশ সভ্য ও উন্নত হইতেছে না। এভোলুশন-বাদটাকে ভুল জানার দরুন তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে একটা উন্নতির সংস্কার দাঁড়াইয়া গেছে। জীব-অভিব্যক্তির ধারায় মানুষের পরেও এমন সব জীব ও জীবাণুর উৎপত্তি ঘটিয়াছে যাদের কোনমতেই মানুষের উন্নত সংস্করণ বলা চলে না। এমার্সনের মতে "সমাজ জিনিসটা কখনই অগ্রসর হয় না। সে একদিকে যতই দ্রুতবেগে এগোয়, অন্যদিক ততই দ্রুতবেগে পিছোয়।"

তারপর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিচার এবং স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার কতটা হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধের অন্ত নাই। কেউ-কেউ বলেন যে বিবাহ জিনিষটা কিছুকালব্যাপী হওয়া উচিত; অন্ততপক্ষে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার ব্যবস্থাটা খুবই সহজ-রকমের থাকা ভাল। Constancy বা একনিষ্ঠতা প্রভৃতি ভাব অনেকের মতেই একটা কুসংস্কার—মেটারলিঙ্কও এইরূপই মনে করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বিস্তর মতবৈচিত্র্য আছে। আবার উল্টাদিকে কারো-কারো মতে স্ত্রীলোকের মাতৃত্বই সব চেয়ে বড় অধিকার এবং তার আন্তঃপুরিক কর্ত্তব্য ছাড়া তার আর কোন কর্ত্তব্যই নাই; ফেমিনিজ্‌ম্, সাফ্রেজিস্‌ম্ প্রভৃতি আন্দোলন অসার ও ভুয়ো। ফরাসী লেখক মসিয়ো জেরার্দ এ সম্বন্ধে বিস্তর ঐতিহাসিক নজির পাড়িয়া ও ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স ঘাঁটিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক যখনি অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাইরের ক্ষেত্রে কাজ করিতে যায়, তখনি সমাজে জন্মের হার ক্রমশঃ কমিয়া আসে এবং তার পরে

সমাজের মৃত্যু ঘটে। এথেন্স ও রোমের পতন-সময়ে যখন স্ত্রীলোকদের বাইরের চিকণ্‌চাকণ বিলাসিতা বাড়িয়া উঠিল এবং ঘরের বাইরেই তাদের সেই বিলাস-বিহার-ক্ষেত্র তৈরি হইল, তখন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে জন্মের হার কস্ করিয়া এমনি নামা নামিল যে, তার পর হইতে ষ্টেট হইতে উপর্য্যুপরি নামা-আইন পাস হওয়া সত্বেও কোন ফলই হইল না। প্রাচীন স্পার্টায় যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গে বাইরে public mealsএ সাধারণ ভোজ-শালায় স্থান করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হয় নাই, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যোগ দেয় নাই, ততদিন ছিল ভাল। তার পর স্পার্টার ঘরে-ঘরে আর শিশুর হাসিকান্না শোনা যায় নাই এবং দুই পুরুষের মধ্যেই স্পার্টা-জাতির নির্ব্বাণোন্মুখ শেষ বাতিটি গেল নিভিয়া। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভেনিসের ইতিহাসেও এই-রকম সাক্ষ্যই মেলে। এখনকার ইংলণ্ড-ফ্রান্সের ইতিহাসে ত যথেষ্ট পরিমাণেই মেলে। ট্রাইট্‌স্কেও এই মতবাদী দলের মধ্যেই পড়েন—স্ত্রীপুরুষের সাম্যবাদটা তাঁর মতেও কাম্য নয়।

এমনি করিয়া যে দিক্ দিয়াই দেখি, আমাদের এ যুগে একই সমস্যা সম্বন্ধে এত মতবৈচিত্র্য দেখিতে পাই যে, শেষটা মনে হয় সমাধান বুঝি কোন কালেই হইবার নয়। অবশ্য সমাধানের চেষ্টা দর্শনের কাজ। এ কালে ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সমস্তকে জড়াইয়া একটা বড়গোছের দর্শন তৈরি হইবে, তারি অপেক্ষা আছে। হর্বার্ট স্পেন্সারের Synthetic Philosophy অথবা সমন্বয়-দর্শনের চেয়ে সে দর্শনের কাজ অনেক বেশি বড়, অনেক বেশি দূরগামী। কিন্তু সমাধান কোন কালেই শেষ হইতে পারে না বলিয়াই দর্শনের পর দর্শন তৈরি হইতে থাকিবে, ইহাও নিশ্চিত সত্য।

সমস্যার সমাধান-চেষ্টা সাহিত্যের কাজ নয়। যে পরি-মাণে কোন সমস্যা সাহিত্য-স্রষ্টার কল্পনাকে রস জোগায়, সেই পরিমাণেই তাহা সাহিত্যের অন্তর্গত হয়। কথাটা ভাল করিয়া বোঝা দরকার।

(৪)

সাহিত্যের একমাত্র কাজ এবং চিরকালের কাজ, রস-সৃষ্টি। রাধাকমল বাবু অবশ্য বলেন যে ভাবী আর্টে, "আর্ট জীবনের শিক্ষক হইবে," অর্থাৎ আর্ট পাদ্রী পুরুত ও স্কুল-মাষ্টারের কাজ করিবে। আমরা বলি আর্টের কাজ ভবিষ্যতে হঠাৎ বদ্‌লাইবে না; আর্টের কাজ রসসৃষ্টি, রসব্যঞ্জনা—তাহা চিরকাল বজায় থাকিবে।

রস বলিতে অবশ্য আমি সংস্কৃত অলঙ্কারের নয় রস বুঝি না, রস বলিতে বুঝি বিচিত্র জীবনের বিচিত্র রস। বেশ তো, জীবনের সমস্যার মধ্যে যিনি রস পান্, তিনি সমস্যা-রসকেই গল্প উপন্যাসের মধ্যে দিয়া হোক্, নাটকের মধ্যে দিয়া হোক্ সৃষ্টি করিবেন, তাঁর সেই রস। তার মধ্যে আদি, হাস্য, করুণ, রুদ্র প্রভৃতি সব সেকেলে রসেরও চমৎকার সমাবেশ থাকিতে পারে। কিম্বা তত্ত্বের মধ্যে যিনি রস পান্, তাঁর রসসৃষ্টিতে সেই তত্ত্বরসেরই বিচিত্র আর্ট-রূপ দেখিতে পাইব। সেকালে দান্তে, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের মধ্যে এই তত্ত্বরস প্রচুর পরিমাণে ছিল; একালে ব্রাউন্, ওয়াট্‌সন্, এ ই, প্রভৃতি কবিদের মধ্যেও এই রসের কাব্য তৈরি হইতেছে। কারো বা রচনার বিষয় অধ্যাত্মরস হইতে পারে—মানুষের গভীরতম ও সূক্ষ্মতম অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিগুলিকে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টির বিষয়ীভূত করিতে পারেন। এমনি করিয়া দেখিতে গেলে, রস যে কত-রকমের হইতে পারে তাহা শ্রেণীবদ্ধ করা শক্ত। বস্তুত জীবন যত বিচিত্র, রসও ততই বিচিত্র।

ঠিক্ এই কথাটা মেটারলিঙ্ক যেমন সুন্দর করিয়া ও পরিষ্কার করিয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন, এমন আর কেহই বলিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। অতএব তাঁর কথাটা এখানে উদ্ধার করিয়া দিলে ভাল হয়। আধুনিক সাহিত্যের প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন :—

"At the present time, nothing is more striking than the disarray which troubles our instincts and sentiments, and even our ideas...... We find in this disarray some sentiments that do not correspond any longer to living, precise and accepted ideas—such as those that refer to the existence of a well-defined God, more or less anthropomorphic, attentive, personal and providential. We find there sentiments that are still half ideas, such as those that refer to fatality, to destiny...... We also find some ideas that are on their way to becoming sentiments, such as those that refer to......the laws of evolution and selection, the will of the race, etc."

অর্থাৎ—আধুনিককালে আমাদের সংস্কার ভাব ও' রসের মধ্যে যে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তার চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কিছুই নাই। এই বিশৃঙ্খলায় আমরা এমন কতগুলি রস দেখিতে পাই, যে-গুলো কোন জীবন্ত, যথার্থ অথচ চলতি আইডিয়ার অনুগামী নয়—যেমন ধর' কতকটা মানুষরূপী, ব্যক্তিগত, বিধাতৃশক্তিবিশিষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আইডিয়া। আবার কতগুলি রস আছে যে-গুলো এখনো আধা আইডিয়া, যেমন অদৃষ্টবাদ, নিয়তি প্রভৃতির কথা। আবার এমন কতগুলি আইডিয়া আছে যেগুলি রস হব-হব করিতেছে, এখনও হয় নাই—অভিব্যক্তিবাদ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, জাতীয় ইচ্ছা প্রভৃতি এই ধরণের আইডিয়া।

মেটারলিঙ্কের কথায় দেখা যায় যে, যে আইডিয়াগুলি রস হব-হব করিতেছে, এখনও হয় নাই, তাহাও সাহিত্যে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি,—যাই ধরা যাক্‌না কেন—সাহিত্যের মধ্যে সমস্তেরই স্থান আছে। রসের আকারে যাহাই পাইব, তাকেই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিব। রসের আকারে যতক্ষণ কোন তত্ত্বকে পাওয়া যাইবে না, ততক্ষণ তাকে সাহিত্য বলা চলিবে না। এ-সব কথাও কিছুমাত্র নূতন শিল্পসূত্র নয়; তত্ত্বরসাত্মক রচনাকে যদি সাহিত্য বাদ দিত, তবে দান্তের রচনা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা, সংস্কৃত সাহিত্যে মহাভারত, সাহিত্য হইতে বাদ পড়িত কোন্ কালে।

এই যে আপনাকে নানাদিক হইতে সমস্ত জীবনের মধ্যে বিচিত্রভাবে ছড়াইয়া দেওয়া এবং সকল জায়গা হইতে আপনার প্রাণের উপকরণ সংগ্রহ করা, এবং সেই নানাভাবের নানা মালমশলা লইয়া আপনার সৃষ্টিটিকে অপূর্ব্ব করিয়া গড়িয়া তোলা, সাহিত্যের এই নৈসর্গিক চেষ্টাকে যখন কোন সংহিতা আসিয়া বাধা দেয়, যখন বিশেষ কোন একটা ধারা বা ধরণ কিংবা বিশেষ কতগুলি সমস্যাপূরণের জন্যই সাহিত্যের প্রয়োজন আছে এইটে মনে করা হয়, তখনই সাহিত্য তার নৈসর্গিকতা ছাড়িয়া কৃত্রিমতা আশ্রয় করে। সম্প্রতি বাংলাদেশে সাহিত্যের কাজ সম্বন্ধে এবং আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কতগুলি গোলমেলে ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। কোন কোন সংহিতাকার সাহিত্যের কাজ লোকশিক্ষা দেওয়া, সাহিত্যের কাজ সমাজতন্ত্র, সমাজনীতি প্রচার করা, সমাজ-বোধের আনুকূল্য করা ইত্যাদি নানা-রকম সূত্র বাঁধিয়া দিতেছেন। এঁরা যে আধুনিক এবং ভাবী-সাহিত্য সম্বন্ধে এই-সমস্ত সূত্র জারি করিতেছেন তার একটা প্রধান কারণ আমার মনে হয়—আধুনিক সাহিত্যটা অত্যন্ত বেশি-সমস্যামূলক, তথৈব উদ্দেশ্যমূলক, এই ধারণা-টাই তাঁদের অনেকেরই মনের মধ্যে বদ্ধমূল। তাঁরা বলিবেন ইব্‌সেন প্রভৃতি সমাজদ্রোহ প্রচার করিয়াছেন, টল্‌স্টয় লোকশিক্ষা দিয়াছেন, বার্ণাড শ সোস্যালিজ্‌ম্ প্রচার করিতেছেন ইত্যাদি। কথাগুলো একেবারেই মিথ্যা নয়। তাঁরা আরও বলিবেন যে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের পূর্ব্বকালে এখনকার মতন এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, সেই জন্য পূর্ব্বকালের সাহিত্যে সমস্যা লইয়া কোন মাথা-ব্যথা ছিল না, তার উদ্দেশ্যমূলক হইবারও কোন দরকার ছিল না। এমনি করিয়া তাঁরা ভূত সাহিত্যকে ভূত করিয়া দিয়া, আধুনিক সাহিত্যকে প্রভূত পরিমাণে মূল্য দেন এবং আধুনিক সাহিত্যটাও ভাবী সাহিত্যের মহড়া দিতেছে মাত্র, এই সিদ্ধান্ত খাড়া করেন।

আধুনিক সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক বা সমস্যামূলক কিনা এ-সব কথার বিচার পরে হইবে। আমি ভাবিতেছি, এই-সব বিধিনিষেধ, এই-সব বিশেষ বিশেষ মানদণ্ড, এই-সব canons and codes, সাহিত্যে যখনি গড়িয়া তোলা হয়, তখন সাহিত্যের উপর তার ফল ভাল হয় কি মন্দ হয়। যখন সাহিত্য-রসিকের কথা এই যে, সকল-রকম রসের প্রতি একটা ঐকান্তিক অনুরাগ জাগাইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উৎস যে কবিকল্পনা তাকে অবাধ উন্মুক্ত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গতি দেওয়াটাই সাহিত্য সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা, তখনই বা সাহিত্যের চেহারা কি-রকমটা হয়, আর যখন ঐ বিধিনিষেধ ঐ মানদণ্ডগুলো সাহিত্যের প্রাণদণ্ডের জোগাড় করে তখনই বা তার চেহারার রকমটা কি দাঁড়ায়! সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যেই এর দৃষ্টান্ত মেলে। এর দৃষ্টান্তের জন্যে বেশি দূরে যাওয়ার দরকার করে না—সকল দেশের সাহিত্যেই 'ক্লাসিক' যখন নৈসর্গিক ভাবে আর দেখা দেয় না, তখনও বিধিবিধানের দ্বারা ক্লাসিক গড়িবার অদ্ভুত চেষ্টা দেখা দেয়, সেই কৃত্রিম চেষ্টাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বিধিবিধানের দৌরাত্ম্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। মিল্টনের একটা grand manner, একটা গম্ভীররীতি ছিল, তাঁর পক্ষে সে রীতিটা কৃত্রিম ছিল না মোটেই। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিতে

একটা 'ক্লাসিক' ঐশ্বর্য্য ও সমারোহ দেখা গিয়াছিল এবং টেনিসন্ যে তাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি 'Mighty-mouth'd inventor of harmonies', তিনি 'God-gifted organ voice of England' সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু তাঁর পরে পোপ-ড্রাইডেনের সম্বন্ধে তো সে-কথা বলা যায় না। মিলটনের প্রাণটা ড্রাইডনের মধ্যে প্রথায় দাঁড়াইয়া গেছে। ঠিক্ তেমনি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের বরাতে তৈরি যে সংস্কৃতসাহিত্যের নমুনা আমরা পাই, তার কৃত্রিমতা যে কি-রকম অসহনীয়, সংস্কৃত সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই তাহা জানেন।

অথচ সব দেশেই ক্লাসিকের বন্ধন ছাড়াইয়া রোমাণ্টিক সাহিত্যের স্বাধীন বিকাশ যখনি দেখা দিয়াছে, তখনি একদল লোকে হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ শেলি কীট্‌সের কবিতা ইংলণ্ডের তৎকালীন সমালোচক-বর্গের দ্বারা কম নিন্দিত হয় নাই। ভিক্‌তর হুগো ফরাসী সাহিত্য মাটি করিতে বসিয়াছেন বলিয়া ফরাসী সমালোচকেরা প্রচুর নিন্দা করিয়াছিল। কিন্তু তাঁরা যে সকল-রকমের কৃত্রিম বিধিবিধান অগ্রাহ্য করিয়া, চারি পাশের সমস্ত সংস্কারকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, নিজের অন্তরতর আত্মার আদর্শকেই সবচেয়ে বড় আদর্শ জানিয়া, জীবনের ও বিশ্বপ্রকৃতির একেবারে মর্ম্মস্থানে গিয়া পৌছিয়াছিলেন—সেই জন্যই আজ চিরন্তন মানব-সভায় তাঁদের আসন অক্ষুণ্ণ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। শেলি কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বাইরন কি ভিক্তর হুগো, গ্যয়টে কি হাইনে কি শিলার, কেউ একথা ভাবেন নাই যে, তাঁদের সৃষ্টিতে সমাজের সংস্কার আহত হইতেছে কি না এবং তাতে সমাজ-সমস্যার কোন্ দিকটা বাদ পড়িল, কোন্ দিকটাই বা রক্ষা পাইল এবং ভবিষ্যৎ সমাজতাত্ত্বিক বা সমাজতত্ত্বপ্রিয় সাহিত্যিকের সেজন্য কি পরিমাণ অসুবিধা হইতে পারে। শেলি কি হুগো কি গ্যয়টে যখন কাব্যে বা নাট্যে প্রেমের জয়গান করিয়াছেন তখন ভাবেন নাই যে, 'কুল জাতি ও মানের বন্ধন সৃষ্টি করিয়া প্রেমের গতিকে বিশ্বের দিকে ধাবমান রাখা' হইল কি না, এ প্রেম শুধুই 'অবাধ প্রেম' বা বাধ-বাধ প্রেম বা আর কিছু। শেলির নাট্য প্রমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড বা কাব্য এপিসিকিডিয়ন, গ্যয়টের উপন্যাস ইলেক্‌টিভ্ এলফিনিটিজ্ বা নাট্য টাসো, হুগোর কাব্য Contemplations বা নাট্য হারনেনি,—'জাতি-কুল-মানভাঙা' প্রেমই বটে এবং সেইজন্যই অপূর্ব্ব প্রেমের কাব্য নাট্য ও উপন্যাস। এই-সকল সাহিত্যে সমস্যা-রস যথেষ্টই আছে। জীবনের সঙ্গে এ সকল সাহিত্য সম্পূর্ণভাবেই জড়িত। তার পর শেলি প্রভৃতি ইহাও ভাবেন নাই যে, তাঁদের বিশ্বানুভূতিটা দেশানুভূতিকে আশ্রয় করিতেছে কি না, তাঁদের মধ্যে জাতীয়তার নিবিড় উপলব্ধি হইতেছে কি না, ইত্যাদি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের তো এক সময়ে ফরাসী বিদ্রোহের সঙ্গেই পূরো সহানুভূতি ছিল, শেলি ত দেশ ছাড়িয়া ইতালীতে গিয়া স্বাধীন উপনিবেশ স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, গ্যয়টে সম্বন্ধে তো অপবাদ আছে যে, জেনার যুদ্ধে হার হইয়া যখন তাঁর দেশের স্বাধীনতা গেল, তখন সে ঘটনাটা তাঁকে কিছুমাত্র বিচলিত করে নাই এবং ফরাসী কাল্‌চারের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাকে এতটুকু পরিমাণে টলায় নাই। বরং বিজয়ী নেপোলিয়নের শক্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই হইয়াছিল। আর ভিক্তর হুগো সম্বন্ধে শোনা যায় যে ফরাসীরা বলিয়াছিল যে, তাঁর ভাষাও ফরাসী নয়, তাঁর ভাবও ফরাসী নয়। তবু আজ ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আসন সর্ব্বোচ্চদিগের মধ্যে এবং গ্যয়টে ও হুগো জর্ম্মান ও ফরাসী সাহিত্যের মুকুটমণি হইয়া আছেন। গ্যায়টেকে বাদ্ দিলে জর্ম্মান সাহিত্যের থাকে কি?

সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইলেই এই-সব কৃত্রিম জাতীয়তা, শ্লীলতা, সামাজিকতা, সামস্থিকতা প্রভৃতির শৃঙ্খল যে কোন বড় সাহিত্যই মানে নাই তাহা বুঝিতে তিলমাত্রও বিলম্ব হয় না।

(৫)

"জাতীয়তা" এবং জাতীয়তা-বিরুদ্ধতার লড়াই যে কোন দেশের সাহিত্যেই কোনকালেই দেখা দেয় নাই এমন কথা বলা চলে না। রুশসাহিত্যে এ লড়াই হইয়া গেছে, আধুনিক কেল্‌টিক পুনরুত্থানের সাহিত্যে এ লড়াই চলিতেছে।

রুশ দেশে—serf emancipation—দাসদিগের মুক্তি লাভের পর হইতে একটা জাতীয় আন্দোলন আস্তে আস্তে

ধাঁয়াইয়া ওঠে। ক্রমে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় দেখা দেয়, ক্রমে বিদ্রোহীদল গড়িয়া ওঠে। একদল রুশ যুবক তখন জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া এই কথা বলিতে সুরু করিয়া দেয় যে, রুশের জনসাধারণের ভিতরেই রুশের ভাবী গৌরব ও মহত্বের সকল বীজ নিহিত হইয়া আছে, বাহির হইতে রুশকে আর কিছুই লইতে হইবে না। এতদিন পর্য্যন্ত রুশকে ভাব ও আদর্শের পুষ্টিসাধনের জন্য ইউরোপের দিকে তাকাইতে হইত। এই নব্য রুশ-স্বাদেশিক বা Slavophil-গণ বলিতে লাগিল যে, রুশের মূঢ় গণসমূহের মধ্যেই রুশের গূঢ় মুক্তি-মন্ত্র গোপনে রহিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধ পক্ষও অবশ্যই ছিল এবং তারা সম্পূর্ণ উল্টা কথা বলিত।

আমার ত মনে হয় যে রুশ-স্বাদেশিকদের সঙ্গে আমাদের স্বাদেশিকদের একটা বাহ্য সাদৃশ্য আছে। আমাদের মধ্যেও একটা জাতীয় আন্দোলন কিছুকাল হইল হইয়া গেছে। এবং আমাদের মধ্যেই একদল তারস্বরে বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, হিন্দুসভ্যতায় যে জিনিষ আছে তাহা আর কুত্রাপি নাই—বাহির হইতে আমাদের বিশেষ কিছু লইবার দরকার নাই।

এই-রকম জাতীয় আন্দোলনের মুখে কোন বড় সাহিত্য-স্রষ্টা যদি উদার ও সংস্কারবর্জ্জিত মন লইয়া নিজের দেশের এইসব আন্দোলন, এই ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাত, গল্পে ও উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, তবে স্বাদেশিক-পক্ষ এবং স্বাদেশিক-বিপক্ষ, কোন পক্ষকেই বোধ করি তিনি সম্পূর্ণরূপে খুসি করিতে পারেন না। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে' এ দেশের স্বাদেশিকদের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই, ঠিক সেই কারণেই টুর্গেনিভের Fathers and Children, Smoke প্রভৃতি উপন্যাস নব্য রুশ স্বাদেশিকদের বিরাগের কারণ হইয়াছিল।

কিন্তু টুর্গেনিভের প্রথম উপন্যাস 'Rudin' বিশ্বপ্রেমের উপন্যাস ত নয়ই এবং সেই "রুডিনের চরিত্রাঙ্কণে টুর্গেনিভের নিজ চরিত্রের ছায়াপাত হইয়াছে" এমন অদ্ভুত কথা মনে করিবার কোনই সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না; কেননা, রুডিন্-চরিত্র আঁকিয়া টুর্গেনিভ ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, যে-মানুষের বুদ্ধি এবং অসাধারণ বাক্-পটুতা আছে, অথচ সেই সঙ্গে-সঙ্গে চরিত্র নাই, কর্ম্মশক্তি নাই, সে তার বোধের তীক্ষ্ণতা, ওজস্বিতা, রসগ্রাহিতা প্রভৃতি গুণের দ্বারা কিছুকালের মত লোককে মুগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু তার জীবনের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। কেবল ঐ কর্ম্মশক্তিহীন ওজস্বিতার একটিমাত্র দিক্ হইতে দেখিলে রুডিন্-চরিত্র 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ-চরিত্রের সদৃশ। রুডিনের উপাখ্যান-ভাগের শেষে ব্যর্থকাম, সহায়হীন, অর্থহীন, ভগ্নস্বাস্থ্য রুডিনকে তার বন্ধু হঠাৎ বিদেশে আবিষ্কার করিল; তখন সে রুডিনকে যাহা বলিয়াছিল, টুর্গেনিভও এই করুণ চরিত্রটি আঁকিয়া সেই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে—রুশের পক্ষে রুডিনের মত লোকের সে সময়ে প্রয়োজন ছিল। বাক্যের দ্বারা উন্মাদনা জন্মাইবার, বক্তৃতার দ্বারা উৎসাহ সঞ্চার করিবার একটা প্রয়োজন জাতীয় উদ্বোধনের দিনে খুবই দরকার হয়; সেই প্রয়োজন রুডিন সাধন করিয়াছে, তার জীবন সে হিসাবে ব্যর্থ হয় নাই।

রুডিনে বা তার পরের উপন্যাস A House of Gentle Folkএ টুর্গেনিভ নব্য রুশকে চটান্ নাই। তার Fathers and Children বাহির হইবার পরেই রুশে একটা তুমুল সোরগোল উপস্থিত হইয়াছিল। Fathers and Children উপন্যাসে তিনি নব্যরুশে নিহিলিজমের সূত্রপাত দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাদেশিকেরা তাঁর নায়ক 'ব্যাজারভ্'কে তাদেরই ব্যঙ্গ-চিত্র বা Caricature মনে করিয়া বিষম চটিল; অন্য পক্ষে যারা স্বাদেশিক-বিপক্ষ দল তারা মনে করিল যে টুর্গেনিভ নিহিলিজমের প্রতি প্রকাশ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। রুশের কোথাও কোথাও দুটা-চারটা দাঙ্গাহাঙ্গামা, অগ্নিকাণ্ড দেখা দিতেই তারা টুর্গেনিভের উপন্যাসকেই এইসব উপদ্রবের হেতু বলিয়া স্থির করিল। টুর্গেনিভের "ব্যাজারভ" এবং রবীন্দ্রনাথের "গোরা"র মধ্যেও সেইজন্য বাহ্য সাদৃশ্য আছে। 'গোরা'র প্রতি লেখকের শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মনের একান্ত অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে যে আইরিশের ছেলে করিয়া দেখানো হইয়াছে, এই কারণেই অনেক স্বাদেশিক সেটা "গোরা"চরিত্রের প্রতিই লেখকের বিদ্রূপ

মনে করিয়াছেন। আবার ব্রাহ্মপক্ষে অনেকে, শেষ পর্য্যন্ত গোরারই ত জয় হইল—সুতরাং রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁর প্রতি এই অন্যায় অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

টল্‌স্টয়-ডষ্টয়ভ্‌স্কি টুর্গেনিভের চেয়ে রুশের জাতীয়তাকে তাঁদের উপন্যাসে নিবিড়তর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই যে রুশ টুর্গেনিভের চেয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছে, এ কথা সত্য নয়। ডষ্টয়ভ্‌স্কি এবং টল্‌স্টয়ের উপন্যাসের পাশে টুর্গেনিভের উপন্যাসগুলিকে অত্যন্ত ফিকে এবং জোলো বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক রুশ-জীবনের কতটুকু অংশ টুর্গেনিভ দেখিয়াছেন? কতটুকু অংশকে তাঁর উপন্যাসে প্রকাশ করিয়াছেন? অতি সামান্য একটু অংশ। টল্‌স্টয়—বিশেষভাবে ডষ্টয়ভ্‌স্কির তুলনায়—তিনি রুশের ভিতরকার জীবনের খবর কিছুই পান নাই। দু'চারটে ভাসা-ভাসা type, দুচারটে অভিজাত বংশীয়দের জীবনযাত্রার টুক্‌রা—এইটুকুই টুর্গেনিভের সম্বল। আর ডষ্টয়ভ্‌স্কির উপন্যাসে সমস্ত রুশদেশের mass বা সমূহ যেন আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের মত তার সমস্ত দাবদাহ, গলিত ধাতুদ্রব্য, বিকারবিকৃতি, সমস্ত পাপ অন্যায় দুর্জ্জয়তা ও ভীষণতা লইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। টুর্গেনিভের মধ্যে জীবনের সে প্রচণ্ড আবেগ কোথায়? তাঁর লেখার রকমটা যেন midvictorian—মধ্যভিক্টোরীয় যুগের লেখকদের রচনার মত। যেমন টেনিসনের। তার রস শুদ্ধমাত্র idyllic রস। শব্দে, বর্ণে, গানে, কল্পনার সম্মোহনে, প্রকৃতির চিত্রে, একটি কল্পপুরী নির্ম্মাণ করা তাঁর কাজ, সেই কল্পপুরীর কল্পরসই তাঁর রস। অতএব রুশে এবং আধুনিক ইউরোপে টুর্গেনিভের চেয়ে ডষ্টয়ভ্‌স্কির প্রভাব পাঠকসমাজের উপর বেশি দেখিয়া এ সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, টুর্গেনিভের মধ্যে জাতীয়তার অভাব ছিল বলিয়াই তিনি পিছাইয়া পড়িলেন। তাঁর পিছাইয়া পড়িবার কারণ তাঁর বাস্তবতার অভাব, তাঁর প্রসারের অভাব, তাঁর জীবনাবেগের অভাব। টুর্গেনিভের পূর্ব্বগামী ত গোগোল। কিন্তু রুশের জীবন-চিত্রণে ডষ্টয়ভ্‌স্কির চেয়ে তিনি যে কিছুমাত্র কম তা তো বলা যায় না। তাঁর "Dead Souls" উপন্যাস ডষ্টয়ভ্‌স্কির যে-কোন উপন্যাসের চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়। বরং 'জাতীয়তা' গোগোলের মধ্যেই বেশি উজ্জ্বল, যদিচ তিনি পূর্ব্বগামী। অথচ টুর্গেনিভও যে রুশের নব জাতীয়তার একজন উদ্বোধয়িতা, একথা Fathers and Children প্রকাশের সময়ে তখনকার রুশ স্বীকার না করিলেও, এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। তারপর আর্টিষ্টহিসাবে তাঁর স্থান সর্ব্বোচ্চে,—একথা আজও সকল সমালোচকই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় গল্প ও উপন্যাস রচনার আর্ট তার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে টুর্গেনিভে, সমস্ত ইউরোপ একথা মানিয়া লইতে কোন দিনই কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

সুতরাং জাতীয়তার সাহিত্যই যে ভাবী সাহিত্য হইবে, রুশ সাহিত্য হইতে এমন কথা মনে করার কোন হেতু আমি পাই না। যে টুর্গেনিভ তাঁর Fathers and Children উপন্যাসে নিহিলিজ্‌মের প্রতিও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তিনি জাতীয়তার সমর্থক ছিলেন না, এ কথা বলা কোনমতেই চলে না। তবে তাঁর জাতীয়তা Slavophilদিগের সংকীর্ণ বিশ্ববিমুখ জাতীয়তা না হইতে পারে। এজন্য স্বাদেশিক ও অ-স্বাদেশিক দুই পক্ষই তাঁকে এক সময়ে দোষী করিয়াছিল ও তাঁকে ভুল বুঝিয়াছিল। নব্য রুশের তিনি যেমন বিরাগ-ভাজন ছিলেন, সরকারেরও তেম্নিই বিরাগ-ভাজন ছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী গোগোল ও তাঁর পরবর্ত্তী ডষ্টয়ভ্‌স্কি এই হিসাবে তাঁর চেয়ে বড় যে, তাঁদের উপন্যাসে রুশদেশটাকে বেশি করিয়া পাওয়া যায়। তাঁদের উপন্যাসে বেশি জীবন, বেশি বাস্তবতা, বেশি বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। কিন্তু আর্টিষ্ট-হিসাবে কি গোগোল, কি ডষ্টয়ভ্‌স্কি কেউই তাঁর সমকক্ষ নন্।

আর্টহিসাবে উপন্যাসের দর যাচাই হইবে, না বাস্তবতা হিসাবে হইবে—সে একটা ঝগ্‌ড়ার প্রশ্ন; অর্থাৎ ফ্লোবেয়ার, মোপাসাঁ, টুর্গেনিভ, এঁরা বড়, না, মেরেডিথ্, বাল্‌জাক্, ডষ্টয়ভ্‌স্কি, এঁরা বড়? বোধ হয় কাউকেই নিরপেক্ষ ভাবে বড় বলা যায় না। বোধ হয় দুয়ের সম্মিলনে তবেই যথার্থ বড় ঔপন্যাসিক ভবিষ্যতে দেখা দিবেন।

(৬)

আচ্ছা, জাতীয়তার তর্ক চাপা থাকুক্। আধুনিক সাহিত্য যে সমস্তার সাহিত্য, একথা তো না মানিয়া উপায় নাই? কারণ, ইব্‌সেন, ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গ, বার্ণার্ডশ, গলস্‌ওয়ার্দ্দি, হাউপ্‌ট্‌ম্যান, সুদারম্যান, ব্রিয়ো, মেটারলিঙ্ক, ডানান্‌ৎসিয়ো, শেকফ্, লিওনিড আন্‌দ্রিফ ইত্যাদি ইত্যাদি—সমস্ত ইউরোপ জুড়িয়া এঁরা যে সামাজিক নাট্যের প্রচণ্ড ঢেউ তুলিয়াছেন, তার মধ্যে কেবলি বিচিত্র সমাজ-সমস্তার উদ্‌ঘাটন ছাড়া আর কি পাওয়া যায়? অতএব এ-সমস্ত সাহিত্য যে উদ্দেশ্য-মূলক সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোনই হেতু থাকে কি? ইহাতেই পরিচয় যে ভবিষ্যতে "আর্ট জীবনের শিক্ষক" হইবে।

এ সম্বন্ধে আমার প্রথম কথা এই যে, এই-সকল সামাজিক নাট্যকে সমাজের সঙ্গে একান্ত ভাবে জড়াইয়া দেখাটা ঠিক নয়। কোন আর্টই যখন জীবনের ফোটোগ্রাফ নয়, তখন এ সকল সামাজিক নাট্যকে আধুনিক সমাজের "বস্তুতন্ত্র" ফোটোগ্রাফ মনে করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। ইব্‌সেনের Ghosts বা The Pillars of Society, বা A Doll's House; ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গের Father কিংবা Countess Julie কিংবা There are Crimes and Crimes; হাউপ্‌ট্‌ম্যানের The Rats বা Rose Berntd; বার্ণার্ডশ'র The Devil's Disciple; ব্রিয়োর The Maternity প্রভৃতি সামাজিক নাট্য পড়িয়া ইউরোপীয় সত্যিকারের সমাজের চেহারাটাকে ঐসকল নাট্যবর্ণিত কদর্য্য বীভৎস চেহারা মনে করিলে তার মত প্রমাদ আর কিছুই হইতে পারে না। ধরুন, শেক্সপীয়রের কালে ইংলণ্ডে গিয়া পথেঘাটে যদি কেহ প্রত্যাশা করিতেন যে, হ্যামলেটের মত হৃদশটা পাগল কিংবা লিয়রের মত দুদশটা রাগী লোক দেখিতে পাইবেন, কিংবা বড় জোর ফল্‌ষ্টাফ্‌ পেচেরই একটা মানুষ দেখিতে পাইবেন, তবে তাঁকে যেমন ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইত, ঠিক্ তেমনি ঐসব নাট্যের চরিত্র এবং নাট্যের ঘটনা অবিভাবেই আকসার ইউরোপে ঘটিতেছে এটা মনে করিলেও ঠকিতে হইবে। কারণ, আর্টের রিয়ালিজ্‌ম্ বা বস্তুতন্ত্রতা সমাজের বাস্তবতার সামিল নয়।

তবে এ-সকল 'সামাজিক' নাট্য-উপন্যাসের মানেটা কি? মানে পরিষ্কার। এগুলো নাট্য এবং উপন্যাস—তাহা ছাড়া অন্য কোন মানের প্রয়োজন দেখি না। এখনকার কালে চারিদিকে নানা সমস্তা একেবারে জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তার কিছু আলোচনা আমি গোড়াতেই করিয়াছি এবং ভাবীকাল সম্বন্ধেও ভাবনাটা নানারকমেই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তারও আভাস দিয়াছি। তাতে সাহিত্য-স্রষ্টার পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হইয়াছে এই যে, তিনি কতকগুলা নূতন মালমসলা পাইয়াছেন। তাঁর কল্পনার কতগুলি নূতন খোরাক জুটিয়াছে। সমাজের কতগুলি বিশেষ সমস্তা, মানব-চরিত্রের কতগুলি অদ্ভুত প্রচ্ছন্ন দিক্—যাহা সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনার দ্বারা একালে সবারই গোচর হইয়া পড়িয়াছে—সেই-সব নূতন উপকরণ ইব্‌সেন্ প্রভৃতি এই-সমস্ত আধুনিক সাহিত্যিকদের কল্পনাকে নূতন নূতন আর্ট-রূপ সৃষ্টি করিবার দিকে উত্তেজিত করিয়াছে এবং তার ফলে এই সামাজিক নাট্যগুলি তৈরি হইয়াছে। সুতরাং এগুলি কল্পনার সৃষ্টি, আর কিছুই নয়।

তারপর এই সামাজিক নাট্য-উপন্যাস সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহা বিশুদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টি তাহা কোন উদ্দেশ্য বহন করে না এবং এসকল আধুনিক সাহিত্যও যেখানে বিশুদ্ধ আর্ট-সৃষ্টি সেখানে কোন উদ্দেশ্য বহন করিতেছে না। একথা এইজন্য বলিলাম যে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও উদ্দেশ্যমূলক রচনা বিস্তর আছে—টল্‌স্টয়ের, বিশেষতঃ বার্ণার্ডশ প্রভৃতি লেখকদের মনে সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজ-সংশোধনের অভিপ্রায় যে নাই তা বলা যায় না। কিন্তু যেখানেই এই উদ্দেশ্যগুলা উগ্র, সেখানেই আর্টের খর্ব্বতা ঘটিয়াছে, একথা বলিতেই হইবে। কারণ আর্ট-সৃষ্টির মধ্যে এমন একটা নৈসর্গিক অনির্ব্বচনীয়তা, অভাবনীয়তা, অবশ্যম্ভাবিতা আছে, যার মধ্যে কোন কষ্টকল্পিত উদ্দেশ্যের আরোপ কল্পনা করিতেই পারি না। কিন্তু আধুনিক সব সামাজিক নাট্য-উপন্যাস সম্বন্ধেই এই উদ্দেশ্যের আরোপ খাটে না। ইব্‌সেনের রচনাবলী হইতে 'ইব্‌-সেনিজম্' নামক একটা পদার্থ বাহির হইয়াছে বটে; কিন্তু স্বয়ং বার্ণার্ডশ সেটার প্রধান ব্যাখ্যাতা হইলেও ইব্‌সেন

বাদটা আমার কাছে নিতান্তই প্রবাদ বলিয়া মনে হয়। কারণ ইবসেনের ব্যক্তিত্ব এমনি অ-সাধারণ এবং তাঁর সৃষ্টিও সেই কারণে এমনি বিচিত্র যে, তাঁকে সাধারণের অনুকরণ-যোগ্য রে কেমন করিয়া করা যায় তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। তবে তাঁর অনুকরণ যে ইউরোপে ছাইয়া গেছে তার প্রধান কারণ—তাঁর সৃষ্টি অত্যন্ত অভিনব বলিয়া লোকের মনকে সহজেই ধরিয়াছে।

আধুনিক নাট্য-উপন্যাসগুলি যে সৃষ্টি, সমালোচনা নয়, সেগুলো যে বেদ অর্থাৎ বাণী, বাদ নয়, তার এই তো প্রমাণ। এই নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের সকলেরই ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত বিশিষ্ট এবং তাঁদের প্রত্যেকের সৃষ্টিই বিচিত্র। তাঁদের সকলের কল্পনাই যে সমাজের সমস্যা বা মানব-চরিত্রের প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় দিক্‌গুলির উপরে সমভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তা তো নয়। তারপর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁদের আর্টের আদর্শও অত্যন্ত বিভিন্ন হইয়াছে। যেমন সিঙ্গ তো একজন প্রসিদ্ধ আধুনিক নাট্যকার—তিনি ইবসেনের সামাজিক নাট্যও পছন্দ করেন না, মেটার-লিঙ্কদের রূপক-নাট্যও পছন্দ করেন না। তিনি পুরাণো নাট্যকার, বেঞ্জেনসন্-মলিয়ারের পক্ষপাতী, কারণ তাঁরা কোন বিশেষ মতবাদে আপনাদিগকে বাঁধেন নাই। তাঁরা যেমন জীবন দেখিয়াছেন, তেমনি তার নাট্যরস আদায় করিয়া নন্দনা কল্পমূর্ত্তিতে তার লীলাকে লীলায়িত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁর The Tinker's Weddingএর ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"**Analysts with their problems and teachers with their systems are soon as old-fashioned as the pharmacopaea of Galen—look at Ibsen and the Germans—but the best plays of Ben Johnson and Moliere can no more go out of fashion than the blackberries on the hedges.**"

আবার এনড্রেফ তাঁর "Letter on the Theatre"এ action জিনিসটা ড্রামার পক্ষে অনাবশ্যক, কেননা ভবিষ্যৎ ড্রামা Panpsyche বা চিন্তা-সর্ব্বস্ব ড্রামা হইবে, এই মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, Benvenuto Cellini'র জীবনে খুনখারাপি পলায়ন প্রভৃতি বিচিত্র ক্ষতক্ষতির বৃত্তান্তের কোন অভাব নাই—সেইসব বাহিক ঘটনাই পুরানো থিয়েটারের উপজীব্য ছিল। পুরাণো থিয়েটারের নায়ক তাই ছিলেন চেলেনি। কিন্তু নিট্‌শে'র জীবনে এত ঘটনাবাহুল্য নাই বটে, অথচ তাঁর কি আশ্চর্য্য নাট্যের যোগ্য জীবন! নীট্‌শেই তাঁর মতে নূতন থিয়েটারের নায়ক। তাঁর "Black Maskers" নাটকে এনড্রেফও মানুষের জীবনের প্রচ্ছন্ন গোপন দিক্‌গুলি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁর উদ্‌ঘাটনের প্রণালী ষ্ট্রীনড্‌বার্গ বা সুদারম্যানের সঙ্গে মেলে না।

যাই হোক্ এই সব সাহিত্যই আর্ট; এর মধ্যে প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য, আদর্শ-বৈশিষ্ট্য, রচনা-বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো সমাজ-বিজ্ঞানও নয়, সমাজ-নীতিও নয়, এমন কি সমাজ-চিত্রও নয়। এই সহজ কথাটা ভোলার দরুনই আমরা এই-সব সাহিত্যের ঘাড়ের উপরে কতগুলো উদ্দেশ্যের বোঝা চাপাইয়াছি। অথচ এদের স্রষ্টাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সাহিত্য-সৃষ্টি তথৈব রসসৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর, এটাও মনে করা ঠিক্ নয় যে, এই ধরণের তথাকথিত সামাজিক সমস্যার সাহিত্য একালেই দেখা দিয়াছে। এ-সমস্ত সাহিত্যের এক হিসাবে মূলে আছেন সেই সাহিত্যিককুলচূড়ামণি গ্যয়টে। Sex-problem অর্থাৎ মিথুনতা-সমস্যা সম্বন্ধেও গ্যয়টেই প্রথম উপন্যাস রচিয়াছিলেন; তার নাম "Elective Affinities"। সুতরাং 'ঘরে-বাইরে' যে একটা অভিনব উপন্যাস, এ ধরণের উপন্যাস যে আর কেউ কখনো দেখেন নাই, এবং ইহাতে পাশ্চাত্য আদর্শকে যে অত্যন্ত খাটো করা হইয়াছে তাহা মনে করার কোনই হেতু নাই।

(৭)

আমার শেষ কথা এই যে, ভাবী সাহিত্য সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করা খুবই চলিতে পারে বটে, কিন্তু বিধি-বিধান নির্দ্দেশ করা আদৌ চলে না। ভাবী সাহিত্য যে বিশেষ কোন ধারা ধরিবে তাহা হইতেই পারে না, কারণ তাহা হইলেই সাহিত্যের মৃত্যু ঘটিবে। আমার সমস্ত আলোচনার মধ্যে আমি এইটুকু ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিলাম যে, ভাবী সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যেরই মত বিচিত্র জীবনের বিচিত্র রসকেই সৃষ্টি করিবে। তবে রসের বৈচিত্র্য আরও ঢের বাড়িয়া যাইবে, সাহিত্যের পরিধির মধ্যে আরও অনেক জিনিস আসিয়া পড়িবে যাহা এখন

স্কুলমাস্টার—পাখী তোর বসন্তের গান থামা ; পড়্‌ বসে A B C D।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

আসিতে পারিতেছে না। কোন কালেই ভাবী সাহিত্য একমুখী, এক ধারার সাহিত্য হইবে না; সে বহুমুখী বহুধারা হইয়া প্রবাহিত হইবে। এই একটা কথা। আর একটা কথা যাহার ইঙ্গিত করি নাই বটে, কিন্তু তবু বলিতে ইচ্ছা হয়—তাহা এই যে, ভাবী সাহিত্য বাস্তবিকই একক প্রতিভার সাহিত্য হইবে না, তাহা ওয়েল্‌স্‌-কথিত "race-mind"এর সাহিত্য হইবে। অর্থাৎ তাহা সমগ্র জাতিটারই সুপ্ত-মনকে স্রষ্টা-মন করিয়া তুলিবে। জল্পনা কল্পনা এই পর্য্যন্তই চলে— তার বেশি চলে বলিয়া আমার বিশ্বাস নয়।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

বেলজিয়মের দুটি বিহঙ্গশাবক

(Pierre Loti-র "ক্রুদ্ধ হায়েনা" নামক ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

একদিন সায়াহ্নে, দক্ষিণ অঞ্চলের কোন এক নগরে, বেলজিয়মবাসী পলাতকে-ভরা একটা ট্রেন, ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। বেচারীরা একে একে, ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে, অপরিচিত প্ল্যাটফর্মের উপর নামিতেছিল। সকলেই শীর্ণকায় ও ভয়বিহ্বল। তাহাদিগকে লইবার জন্য কতকগুলি ফরাসী প্ল্যাটফর্মের উপর অপেক্ষা করিতেছিল। যা কিছু কাপড় হাতের কাছে পাইয়াছিল তাহাই টানিয়া লইয়া উহারা এই-সব গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছিল—গাড়ী কোথায় তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছে সেকথা একবার ভাবেও নাই। পলায়নের তাড়ায় উহারা উঠিয়া পড়িয়াছিল। মৃত্যুর ভয়ে, আগুনের ভয়ে, অবাচ্য অঙ্গচ্ছেদের ভয়ে, পাশব অত্যাচারের ভয়ে,—সেই সমস্তের ভয়ে যাহা ধরাতলে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু যাহা জর্মানের ধর্ম্মনিষ্ঠ [illegible]কে আলোড়িত হইয়া আদিম বর্ব্বরতার শেষ-বমনের ন্যায়, তাহাদের নিজের দেশে ও আমাদের দেশের উপর হঠাৎ উদ্‌গারিত হইয়াছিল। এই-সকল পলাতকদিগের এখন গ্রাম নাই, ঘর-দুয়ার নাই; তাহারা ভবঘুরের ন্যায়, বৃক্ষচ্যুত শুষ্কপত্রের ন্যায় লক্ষ্যশূন্য। সকলেরই চোখে ভীতিবিহ্বল-কষ্টের ভাব। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি শিশু, অনেকগুলি ছোট ছোট মেয়ে,—যাহাদের বাপ মা অগ্নিদাহে ও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; আর কতকগুলি পিতামহী;—এক্ষণে যাহারা একা, দুনিয়ায় যাহাদের আপন বলিতে আর কেহ নাই, যাহাদের জীবনে আর কোন আসক্তি নাই। কেবল আত্মরক্ষার একটা অন্ধ আবেগের প্রেরণায় উহারা পরিচালিত হইয়াছে। উহাদের মুখে কোন ভাবই প্রকাশ পায় না—এমন কি নৈরাশ্যের ভাবও না। মনে হয় যেন উহাদের আত্মাটা সত্যই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, উহাদের মস্তক যেন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই শোচনীয় জনতার মধ্যে লুপ্তপ্রায় দুটি শিশু পরস্পরের হাত কষিয়া ধরিয়াছে—দেখিলেই মনে হয়, ছোট দুটি ভাই। বড়টি, যাহার বয়স বোধ হয় পাঁচবৎসর সে, ছোটটিকে সাম্‌লাইতেছে। ছোটটির বয়স প্রায় তিন বৎসর। কেহই তাহাদের দাবীদার নাই, কেহই তাহাদিগকে জানে না। এই নিঃসঙ্গ দুই শিশু কেমন করিয়া বুঝিল যে, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, এই ট্রেনেই উঠিয়া পড়া আবশ্যক। উহাদের পরিচ্ছদ ঋতুর উপযোগী; উহারা খুব গরম পশমের মোজা পরিয়া আছে। বেশ অনুমান করা যায়, উহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান—এবং সন্তানের প্রতি সেই গৃহস্থের বেশ যত্ন ছিল। নিশ্চই উহারা সেই মহানুভব কোন-এক বেল্‌জীয় সৈনিকের সন্তান, যে ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে এবং মৃত্যুর মুহূর্ত্তেও নিজ সন্তানের প্রতি যাহার অতুল স্নেহ মমতা ছিল। এই দুটি শিশুর চোখে অশ্রুমাত্র নাই,—এতই উহারা ক্লান্তি ও নিদ্রাবেশে অভিভূত। অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া আছে। কোন কথা উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উহারা উত্তর দিতে পারে না—কিন্তু পরস্পরের হাত সেই যে কষিয়া ধরিয়া আছে তাহা একটুও আল্‌গা করিতে চাহে না—কিছুতেই না। বড়টি ছোটটির হাত মুঠিয়া ধরিয়াছে, পাছে সে হারাইয়া যায়। হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে উহার অভিভাবক; তাই, উহার দিকে যে-মহিলাটি ঝুঁকিয়া ছিল, তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য একটু বল পাইল।

অর্দ্ধ ঘুমের ঘোরে, অপরিস্ফুট মৃদু মিনতির স্বরে সে বলিল:—"মা-ঠাকরুণ, আমাদের কি এখন শুইয়ে দেওয়া

হবে?" উপস্থিতক্ষেত্রে উহারা ঐটুকুই এখন চাহিতে পারে, ঐটুকুমাত্র মানব-দয়ার প্রত্যাশা করিতে পারে; উহাদিগকে একত্র শুয়াইয়া দেওয়া হইল। শুইবামাত্র, দুইজনে সেইরূপ পরস্পরের হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া গায়ে-গায়ে ঠেসাঠেসি করিয়া তখনই ঘুমাইয়া পড়িল। দুইজনই মুহূর্ত্তের মধ্যে শৈশব-নিদ্রাসুলভ প্রশান্ত অচৈতন্যের মহা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইল......

একবার অনেক দিন হইল, চীন-সমুদ্রে, যুদ্ধের সময়, দুটি পথশ্রান্ত ছোট পাখী, খুব-ছোট দুটি পাখী, কে জানে কেমন করিয়া আমাদের লৌহবর্ম্মাবৃত জাহাজে, অ্যাড্-মিরালের কামরায় আসিয়া পড়িয়াছিল। এবং প্রতিদিন কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা না করিলেও, একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, ওড়া-উড়ি করিত। উড়িয়া কখন কার্ণিসের উপর, কখন সবুজ তক্তার উপর বসিত।

রাত্রি হইলে, আমি উহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অ্যাড্‌মিরাল, আমাকে তাঁহার ওখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই ক্ষুদ্র আগন্তুক দুটি তাঁহার কামরায় শুইতে আসিয়া-ছিল। একটা রেশমের দড়ি যাহা তাঁহার শয্যার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—সেই দড়িতে একটা পা লাগাইয়া উহারা স্থিরভাবে ঝুলিতেছিল। দুটি পাখী খুব কাছাকাছি, খুব ঘেঁসাঘেঁসি থাকায় মনে হইতেছিল যেন ছোট দুটি পালোকের গোলা। দুটিই পরস্পরকে ছুঁইয়া আছে—প্রায় একাকার হইয়া গিয়াছে। উহারা নির্ভয়ে ঘুমাইতেছে; আমাদের দয়ার উপর যেন উহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস...এই দৃশ্যটি দেখাইবার জন্য স্নেহার্দ্রচিত্ত অ্যাড্‌মিরাল আমাকে ডাকিয়াছিলেন। এখন এই দুটি বেল্জীয় শিশুকে পাশা-পাশি ঘুমাইতে দেখিয়া, চীন-সমুদ্র-মাঝে পথশ্রান্ত সেই বিহঙ্গশাবক দুটির কথা আমার মনে পড়িল। সেই একই-রকম বিশ্বাসের ভাব, সেই একই-রকম নিষ্পাপ নিরুদ্বেগ নিদ্রা;—কিন্তু উহাদের উপর যে একটি সোৎকণ্ঠ সস্নেহ দৃষ্টি নিপতিত ছিল, তাহা আরো সুমধুর।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুই তার

(১৮)

বিলাসপুরের জমিদার রসময় রায়ের দুই সংসার বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় এবং পত্নী-দিগের বয়স পঞ্চাশের কোটায় পৌঁছাতে তাঁহাদিগের আর পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা না থাকায়, তিনি বংশ রক্ষার ও পিতৃ-পুরুষের পিণ্ড প্রাপ্তির জন্য বাধ্য হইয়া তৃতীয় বিবাহ করিবেন। দশ বৎসরের মায়াকে দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইয়াছে এবং গুণময়ও তাঁহাকে কন্যাদানে স্বীকৃত হইয়া-ছেন। বিলাসপুরের জমিদারের সঙ্গে সীমানা লইয়া গুণ-ময়ের প্রায়ই দাঙ্গা খুন জখম হইয়া থাকে; দুই পক্ষেরই ইচ্ছা তাহা এইরূপে আপোষে মিটিয়া যায়। রসময় রায় শ্বশুরের সমস্ত বিষয়ই একদিন পাইবেন এই আশায় গুণময় তাঁহার সীমানা যতখানি চাপিয়া দখল করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকেই ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন, এবং গুণময় বিনা দাঙ্গাহাঙ্গামা বা মামলা-মোকদ্দমায় অনেকখানি জমি পাইয়া যাইবেন বলিয়া তেজবরে বুড়োকে শিশু কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। অঘ্রাণ মাসে অকাল; পৌষ মাসে বিবাহ হইবার নয়; মাঘ মাসে মলমাস; অতএব স্থির হইল এই ফাল্গুন মাসে তাঁহার নিজের ও কন্যার উভয়েরই শুভ বিবাহ হইবে!

গুণময়ের মুখে হাসি আর ধরে না, তাঁহার দুপাটি বাঁধানো দাঁত ক্ষণে ক্ষণে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। যদিও অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ না হওয়াতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া ছিলেন, তথাপি সেই দুঃখের মধ্যেও তাঁহার সুখের আশা বর্ত্তমান ছিল—ইতিমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় দয়াদেবীর মৃত্যু হইয়া তাঁহার লজ্জার কারণ ঘুচিয়া যাইতে পারে, এবং নিষ্কণ্টক হওয়াতে রাজবালাকে পোষ মানাইয়া তুলিবারও যথেষ্ট সময় ও সুযোগ মিলিতে পারিবে। তিনি পঞ্চাননকে বলি-লেন—দেখ পাঁচুদা দু-দুটো বিয়ে, খরচ ত হবে মবলগ! কি করে' খরচের টাকাটা জোগাড় করা যায় বল দেখি!

পঞ্চানন বলিল—সে জন্যে তুমি কিছু ভেবো না ভায়া! প্রজাপতির হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন প্রজাদের তার উপকরণ জোগাতেই হবে। নবান্নের পরই আমাদের

পুণ্যাহ হবে, সেই দিন বাকি খাজনা কারো বাকি থাকবে না; আর স্বয়ং রাজার বিয়ে, একমাত্র রাজকন্যার বিয়ে, এ ত প্রজাদের আনন্দের দিন, তারা সবাই মিলে বিয়ের খরচটা তুলে দেবে, এতে ত তাদেরই গৌরব। একটা মাথট আদায় করতে হবে—খাজনার নিরিখে ধর টাকায় দু আনা। যখন তিন মাস সময় পাওয়া গেছে তখন আমি আর কিছু ভাবিনে। একটি পয়সাও তোমার ঘর থেকে খরচ হতে দেবো না।

পঞ্চাননের কথায় গুণময় খুসী হইয়া উঠিলেন। গুণময় যখন বিবাহ-উৎসবের বাহিরকার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পঞ্চাননের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন অন্দরে তাঁহার ভাবী শাশুড়ী রাজবালার মা ব্যস্ত হইয়া অন্দরের জোগাড়ে লাগিয়া গিয়াছিলেন—বড়ি দেওয়া, সুপারি কাটা, ছিরি গড়া, বরণডালা সাজানো, আনন্দ-নাড়ুর জন্য চাল কোটা, তিল ঘসা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হইয়া তিনি আর বসিবার অবসর পাইতেছিলেন না। তিনি আসিয়া সেই প্রথম দিন যে দয়াদেবীর ঘরে গিয়াছিলেন, তার পর আর তিনি যান নাই—তিনি রাজবালাকে দয়াদেবীর সতীন করিয়া দিতে সম্মত হইয়া অবধি দয়াদেবীর সম্মুখে যাইতে লজ্জা ও ভয় পাইতেছিলেন।

দুটি বৃদ্ধ জমিদারের শুভবিবাহের এই আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছিল অনেকেই—দয়াদেবী, রাজবালা, মায়া, এমন কি মোহিনী পর্য্যন্ত, এবং বেশী করিয়া নিরানন্দ হইয়াছিল দরিদ্র ভীত প্রজারা। দয়াদেবীর চোখের জল আর শুকাইতেছিল না; দুধের মেয়ে মায়া এক অতিবৃদ্ধের হাতে পড়িতে যাইতেছে, বাপ যে কশাইএর কাজ করিতে যাইতেছেন মা হইয়াও তাঁহার তাহাতে প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই, প্রতিবাদ করিলেও তাহা নিশ্চয়ই টিকিবে না। তবু তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন একবার স্বামীর পায়ে ধরিয়া কন্যার কল্যাণ ভিক্ষা করিবেন, মেয়ের প্রতি বাপের মমতা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যেদিন হইতে রাজবালাকে গুণময়ের বিবাহ করিবার কথা তিনি জানিতে পারিয়াছেন সেদিন হইতে আবার তাঁহার স্বামীর দর্শন দুর্লভ হইয়াছে; এখন গুণময় রাজবালার লোভে ঘরের বাহিরে ঘুরঘুর করেন, কিন্তু আর ঘরে ঢুকিতে পারেন না।

রাজবালা এই ঋষ্যমূক-পর্ব্বতের ন্যায় নিরাপদ ঘরে আশ্রয় লইয়া এখন নিরুপদ্রবে প্রাণপণ যত্নে দয়াদেবীর সেবা করিতেছিল এবং দয়াদেবীর অবিরাম অশ্রুধারার সঙ্গে অশ্রু ঢালিয়া নীরবে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। রাজবালা ঔষধ ঢালিয়া দয়াদেবীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—দিদি, ওষুধটুকু খেয়ে ফ্যালো।

দয়াদেবীর চোখ দিয়া জল উথলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন—আর আমি ওষুধ খাব না, মরণেই আমার সকল জ্বালা জুড়োবে, ওষুধ খেয়ে মরণকে বাধা আর দেবো না।

এই কথা রাজবালার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। তাহার এমন নম্রপ্রকৃতির দিদির এই যেটুকু দুঃখের বিলাপ মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে তাহা যে কতখানি দুঃখে তাহা রাজবালা অনুভব করিল, এবং সেই দুঃখের কারণ সে-ই বলিয়া তাহার মন পীড়িত হইয়া উঠিল। রাজবালা উচ্ছ্বসিত অশ্রু আঁচলে মুছিয়া বলিল—দিদি, আমার জন্যে তুমি মরবে! তার চেয়ে আমি......

দয়াদেবী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—বালাই ষাট! আমি ত মরতে বসেছি ভাই, আর তোর এই কচি বয়েস! অমন কথা মনেও আনিসনে। তোর ওপর আমার একটুও রাগ নেই। বীরেন ছাড়া আমার এমন সেবা আর কেউ করতে পারত না......

রাজবালা দুই হাতে আঁচল ধরিয়া চোখ ঢাকিয়া মৃদু স্বরে বলিল—আমি ত তার দেখেই শিখেছি; সে আমায় বলে গেছে তোমার সেবা করতে; তাই করছি; নইলে আমি কোন্ মুখে তোমার কাছে আসতাম দিদি!

দয়াদেবী মমতায় দ্রব স্বরে বলিলেন—আমি তা বুঝতে পেরেছি রাজু। তাই, তুই আমার সতীন হলেও তোকে আর ভয় নেই। আমার এখন দুঃখ শুধু মায়ার জন্যে! মনে করেছিলাম মায়াকে বীরেনের হাতে দিয়ে আমাদের কতক ঋণ শোধ করব, সকল অপরাধ মার্জ্জনা চেয়ে নেব; তারপর দেখলাম প্রথম দেখাতেই তোদের দুজনের মন কী আনন্দে সাড়া দিয়ে উঠেছে! তখন মনে করলাম আমার দুঃখী ছেলেকে তোকে দিয়ে সুখী করব! সে সাধেও প্রবল অন্তরায় ঘটল—যে তাকে ভিটেছাড়া মাতৃহীন করেছিল

সেই তার এই সুখটুকুও সইতে পারলে না। আমি কি বুঝতে পারিনি রাজু, কী দুঃখে বাছা আমার বলে গেল 'মা, আমি বিয়ে করব না, বিয়ের আশা আমার ঘুচে গেছে!' আমি কি বুঝতে পারছিনে রাজু, কেন তুই রাজার রাণী হতেও চাচ্ছিসনে, কী দুঃখে তোর চোখের জল শুকোচ্ছে না!

রাজবালা দয়াদেবীর কোলের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া বড় কান্নাটাই কাঁদিতে লাগিল; এতদিন যাহা তাহার একলার মনে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, সেই গোপন দুঃখের দরদী অংশী পাইয়া তাহার কান্না যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার মনে হইতে লাগিল রুক্মিণী বা সুভদ্রার মতন তাহাকে হরণ করিয়া বীরেন্দ্র কি তাহাকে এই অনিচ্ছার বিবাহ হইতে বাঁচাইতে পারে না! তা যদি না পারে তবে কি সে কৃষ্ণকুমারীর মতন মরিয়া এই বাড়ীর সকল অমঙ্গল মুছিয়া দিয়া যাইতে পারে না। রাজবালা কাঁদিতে-কাঁদিতে মুখ না তুলিয়াই অতি মৃদু স্বরে বলিল—ওঁই দিদি আমাকে বারণ করে গেছে তোমার সতীন হতে! আমাকে দিদি তুমি বাঁচাও।

তাহাঁর প্রতি বীরেনের মমতা দেখিয়া দয়াদেবীর মন স্নেহে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; তিনি রাজবালার মাথায় শান্তিজল বর্ষণের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে-করিতে নীরবে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এমন সময় চেলির কাপড়ে জড়িত ও আপাদমস্তক রূপা সোনা জহরাতে নিপীড়িত মায়া মায়ের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—মা, আমি ও-বুড়োকে বিয়ে করব না, বীরেন-দাকেই বিয়ে করব!

(১৯)

পঞ্চানন জমিদারীর সকল ডিহির তহশীলদারদের উপর পরোয়ানা জারি করিল যে 'যেহেতু সরকার মালিক মহোদয়ের ও রাজকন্যার শুভ বিবাহ আগামী মাহায় হইবেক, সেহেতু অত্র মাহার মধ্যে সমস্ত বাকি বকেয়া ও মাথট টাকায় মাত্র দু-আনা হিসাবে জরুর আদায় করিয়া সদর খাজনা-খানায় বে-ওজর দাখিল করিবা—হাজা শুখা ফৌত মৌত নাগা হাজত কোনো ওজর শুনিবা না; যে তহশীলদার ইহাতে গাফিলি করিবেক তাহাকে বরতরফ করা হইবেক ও যে ব্যক্তি মালিকের কার্য্য ষোল আনা হাসিল করিতে পারিবেক তাহাকে হজুরের নজরানা মকুফ করা যাইবেক।'

রাজকন্যার বিবাহের জন্য ঘটক নিযুক্ত হইয়াছে শুনিয়াই সমস্ত প্রজার বুকের রক্ত হিম হইয়া উঠিয়াছিল, না জানি তাহাদের নিকট হইতে কত নিরিখে মাথট আদায় করা হইবে! তারপর যখন তাহারা শুনিল যে স্বয়ং মালিকেরও শুভবিবাহ তখন নিদারুণ অশুভের আশঙ্কায় বেচারারা প্রমাদ গণিতে লাগিল। তাহারা কখনো জমিদারের সাক্ষাৎ পায় না, পঞ্চাননের কাছে রোদন অরণ্যে রোদনের চেয়েও নিষ্ফল, পঞ্চানন যাহা করিতে চায় তাহা সম্পন্ন করিতে সে কত কঠোর হইয়া কি-রকম অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে, তাহা ত সকল প্রজাই জানে, এই ত সেদিন বীরেন রায়ের কি দুর্দ্দশা হইল তাহা ত তাহাদের সকলের জানা আছে, সুতরাং ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলের প্রাণে আতঙ্ক ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল।

সে বৎসর দেশে ভালো বৃষ্টি না হওয়ায় ধান ভালো হয় নাই; জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ গণিয়া কাচ্চা-বাচ্চার খাইবার সংস্থান তাহাদের থাকিবে না, তাহারা টাকায় দুআনা নিরিখে মাথট দিবে কোথা হইতে! কিন্তু না দিলেও নয়, না দিলে হাল গোরু ক্রোক হইবে, বেটি জোরু বে-ইজ্জত হইবে, বীচন ধান বাজেআপ্ত হইবে, মা.. লুঠ হইবে, ঘরে আগুন লাগাইবে, মিথ্যা মকদ্দমায় জেরবার করিয়া জেল খাটাইবে। ক্ষেতে খামারে চাষায় মজুরে ঐ কথা, বারোয়ারি-তলায় সন্ধ্যার জটলায় সকলের ঐ ভাবনা, পুকুর-ঘাটে ও ঢেঁকিশালে মেয়েদের মধ্যেও সেই একই আলোচনা।

সেই অঞ্চলের গরিব প্রজাদের সকল-রকম সুখে দুঃখে ভয়ে ভাবনায় বন্ধু ও সহায় হইয়া দাঁড়াইত সাঁড়াশিয়া মৌজার পতিত মণ্ডল। সে জাতে হাড়ি। তার বয়সও বেশী নয়, বড় জোর পঁচিশ বৎসর হইবে। সে হাতীকান্দার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া দিনকতক কলিকাতায় কলেজেও পড়িয়াছিল। তারপর তাহার বাবা তারণ মণ্ডলের মৃত্যু হওয়াতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিতে হইয়াছে। সে নানা-রকম বই পড়িয়াও নিজের

পরীক্ষা ও পরিশ্রমের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই তাহার চাষবাস ক্ষেতখামার খুব উন্নত ও ফলাও করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার গ্রামে জঙ্গল নাই, পচা ডোবা পানাপুকুর নাই; পথে কোথাও জল জমে না, কাদা হয় না—সে নিজে গ্রামের সকল লোককে সঙ্গে লইয়া সমস্ত পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করে, কূয়ো ঝালায়, রাস্তা ঘাট মেরামত করে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা জমিদারের মুখ চাহিয়া বসিয়া দুঃখ ও রোগ ভোগ করে না; গ্রামে একটা পাঠশালা করিয়াছে, তাহাতে দিনে একবার ও সন্ধ্যার পর একবার ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া শেখানো হয়, যাহারা বাড়ীঘরের কাজের জন্য দিনে পাঠশালায় আসিতে পারে না তাহারা রাত্রে পড়ে; পতিতের অনুরোধে বুড়ো বুড়ো চাষারাও সেই পাঠশালায় পড়িতে আসে, পতিত নানাবিধ কৃষি-পুস্তক ও কৃষিপত্রিকা পড়িয়া শুনাইয়া তাহাদিগকে নব নব কৃষিতত্ত্ব বুঝাইয়া দ্যায়। পতিতের বাড়ীতে একবাক্স হোমিওপ্যাথি ঔষধ, কুইনাইন ক্যাষ্টর অয়েল প্রভৃতি মোটামুটি এলোপ্যাথি ঔষধ ও খানকতক চিকিৎসার বইও আছে; সে গ্রামের ডাক্তারও বটে। গ্রামের বারোয়ারি পতিতের উদ্যোগেই হয়। গ্রামের কুস্তি আর কসরতের আখড়ায় পতিতই নিয়মিত পাকা খেলোয়াড়—সে সকলকে কুস্তি লড়ায়, লাঠি হাডুডুডু দাণ্ডাগুলি ফুটবল খেলায়; সে হাড়ির ছেলে, লাঠিখেলা তাহাদের কৌলিক ব্যবসা, তাহাতে পতিত বাপ-খুড়ার কাছে তালিম হইয়া পাকা হইয়া উঠিয়াছে, তারপর স্কুলে কলেজে পড়িবার সময় ফুটবল খেলাতেও দক্ষ বলিয়া তাহার নামডাক হইয়াছিল। এইসবের জন্য পতিতের চেহারাটিও বেশ বলিষ্ঠ, মজবুত, আর তাহার মনটিও বেশ সাহসে ভরা। পতিতের এই-সব গুণের জন্য সে সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিল, সকল লোকই তাহাকে ভালো বাসিত, সে যে হাড়ির ছেলে তাহা সেইসব চাষা-গাঁয়ের ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত কতকটা ভুলিয়া বসিয়াছিল।

জমিদারের বিবাহের খরচ তুলিবার জন্য সকল ডিহির তহশীলদারদের উপর মাথট আদায়ের পরোয়ানা জারি হইয়াছে শুনিয়া পতিত সকল গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিল। একদিন পঞ্চানন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে পতে, কি মতলবে তুই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস রে!

পতিত খুব নীচু হইয়া প্রাতঃপ্রণাম করিয়া নায়েব মহাশয়কে জানাইল—আজ্ঞে, মালিকের বিয়ে, তার সব খরচ ত আমাদেরই দেওয়া উচিত; এবার অজন্মা হয়েছে, সবাই হয়ত মাথট দিতে পারবে না; যারা পারবে না, তাদের টাকাটাও আমরাই চাঁদা করে তুলে দেবো; তারই পরামর্শ আমি করে বেড়াচ্ছি নায়েব মশায়!

পঞ্চানন খুসী হইয়া বলিল—তুই তারণের উপযুক্ত ছেলে হয়েছিস! হাজার হোক একটু লেখাপড়া শিখেছিস কিনা! একেই ত বলে রাজভক্তি! তোর যেমন মতিগতি, দেব-দ্বিজে ভক্তি, তোর ভালো হবে!

পতিত আবার নত হইয়া প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—সে আপনার আশীর্ব্বাদের জোরেই নায়েব মশায়।

পঞ্চাননের দিকে পিঠ ফিরাইয়াই পতিতের মুখে ঈষৎ একটু ক্রুদ্ধ কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল।

পতিত ফিরিয়া যাইতে যাইতে লছমন দুলের বাড়ীর মধ্য হইতে জমিদারের পাইকের তর্জ্জন শুনিতে পাইল। পতিত থমকিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল পাইক বলিতেছে—নায়েব মশায় সকল প্রজার জমা হিসেব করে মাথটের ফর্দ্দ করেছেন; তোমাদের বাকি খাজনা আর হাল সনের খাজনা মিলে ১০৮৶০, আর টাকায় দু আনা হিসাবে মাথট পৌনে বারো আনা; মোট ১২৷৷১৫ তোমাকে আজ দিতেই হবে। এই নেও দাখিলা চেক আর এই নেও মাথটের চিঠি,...

লছমন কাতর হইয়া বলিতেছে—এই সেদিন আমার ঘর পুড়ে গেছে, এখনো চালে খড় দিতে পারিনি, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে এই কাত্তিকে হিম বুকে হাঁটু দিয়ে কাটাচ্ছি; এবার ক্ষেতখামারে একদানা ফসল মিলচে না; পেটের ভাতই জোটাতে পারব না, তা খাজনাই বা শুধবো কোত্থেকে আর মাথটই বা জোগাব কেমন করে......

পাইক বলিয়া উঠিল—গায়ে ময়লা মাখলে কি যমে ছাড়ে! নায়েব-মশায়ের হুকুম, টাকা না দিলে গলায় গামছা দিয়ে জুতো মারতে মারতে কাছারীতে নিয়ে যাব......

পতিত তাড়াতাড়ি লছমনের চালশূন্য মাটির দেয়াল-

ঘেরা পোড়া বাড়ীর উঠানে গিয়া পাইককে বলিল—এই যে রামধন-দা, মাথট আদায় করতে এসেছ বুঝি? আমি নায়েব মশায়কে বলেছি, যে প্রজা মাথট দিতে পারবে না, তার হিস্‌সা আমরা চাঁদা করে তুলে দেবো; তুমি লছমনকে আজ কিছু বোলো না, ওর হিস্‌সা আমি তুলে দেবো।

রামধন বলিয়া উঠিল—"তুমি ত বললে মোড়লের পো; কিন্তু"—রামধন একবার এদিক-ওদিক সন্তর্পণে তাকাইয়া গলার স্বর নামাইয়া বলিল—"কিন্তু নায়েব মশায়টি ত সোজা লোক নয়! লছমনকে না পেলে আমার পিঠেই জুতো জোড়া ছিঁড়বে আর আমার মাইনে থেকে জুতোর দাম আর লছমনের হিস্‌সার মাথট কেটে আদায় করে নেবে!"

পতিত বলিল—চল, আমি তোমার সঙ্গে নায়েব মশায়ের কাছে যাচ্ছি।

রামধন আর আপত্তি করিল না। পতিত মণ্ডল সাঁড়া-শিয়া মৌজার প্রধান মাতব্বর প্রজা; জোত জমা ক্ষেত খামার গুড়ের বাইন প্রভৃতিতে তাহার ফলাও কারবার। সে জামিন হইলে আর ভাবনা কি?

পতিত কাছারিতে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল—কিরে পতে, আবার কি মনে করে?

পতিত হাত জোড় করিয়া বলিল—আপনি গরিবের মা-বাপ! অভয় দ্যান ত একটি কথা হুজুরের কাছে নিবেদন করি?

পঞ্চানন গম্ভীর হইয়া বলিল—কি বল্?

—মাথট কি বাকি-বকেয়ার জন্যে কারো ওপর আপনি জুলুম করবেন না; যে যে দিতে পারবে না তার হিস্‌সা আমি যেমন করে পারি সরকারে দাখিল করে দেবো; আমি সকলকার জামিন হচ্ছি।

পঞ্চানন ভ্রু নাচাইয়া বলিল—তোর বড্ড টাকা হয়েছে দেখছি!

পতিত হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা সবাই গরিব; কিন্তু আমরা তঞ্চকতা জানিনে, আমাদের যা দেয় সে হেতু অত্র মাথট আদায় করবই, আজ নয় কাল; যারা এখন টাকাটা মাত্র দু-চার্য্যমানেই পারছে না; সময় হলে দিয়ে খাজনা-খানায় দেবে এখন আমরা চাঁদা তুলে চালিয়ে দি, মৌত নাগা হাজত দের কাছ থেকে আদায় করে নেবো।

পঞ্চানন বলিয়া উঠিল—তুই এ বেশ বুদ্ধি ঠাউরেছিস, এমনি করেই ত তেজারতি ফলাও করতে হয়। তা হাজার হোক সবাই গরিব, সুদটা একটু কম নিরিখে ধরিস, দেখিস দরিদ্রপীড়ন যেন না হয়।

পতিত তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া খুব কাশিতে লাগিল। কোনো কথাই বলিতে পারিল না।

পঞ্চানন বলিল—আচ্ছা, ঐ কথাই রইল, যা অনাদায় থাকবে তা তুই অঘ্রাণ মাসের সাত তারিখের মধ্যে সদরে কড়ায় গণ্ডায় জমা করে দিয়ে যাবি। যা বাকি পড়বে তোর জমি ক্রোক করে আদায় হবে জেনে রাখিস।

পতিত প্রণাম করিয়া বলিল—যে-আজ্ঞে!

কাছারী হইতে বাহির হইয়া দাঁতে দাঁত রাখিয়া পতিত বলিয়া উঠিল—শালা!

(২০)

ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত গুণময়ের আর ত্বর সহিতেছিল না; পণ্ডিতের কাছে পাঁতি লইয়া স্থির হইয়াছে, যে-মাসে অকাল তাহার তেরো দিন বাদ দিয়া শুভকার্য্য করা যাইতে পারে। তাই অগ্রহায়ণ মাসের পনরই মায়ার ও সতেরই গুণময়ের বিবাহ স্থির হইয়াছে। আর ত বেশী দেরী নাই। বাহিরে পঞ্চানন, অন্দরে রাজবালার মা, ও সদর-অন্দরে গুণময় ব্যস্ত হইয়া সমস্ত আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছে।

ওদিকে মায়াও মায়ের ঘরে পুতুলের বিয়ের জোগাড়ে লাগিয়া গিয়াছে, তাহার ছেলের সঙ্গে রাজু-মাসীর মেয়ের কাল বিয়ে হইবে ঠিক হইয়াছে। দয়াদেবী কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই, বুকের বেদনা বড় বাড়িয়াছিল, ভোর বেলায় একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, তাই আজ তাঁহার ঘুম ভাঙিতে এত বেলা হইয়া পড়িয়াছে। রাজবালা তাঁহার গায়ের বালাপোষ-খানি নিজের কোল পর্য্যন্ত টানিয়া তাঁহার পা-দুখানি কোলে তুলিয়া আস্তে-আস্তে হাত বুলাইতেছে। খাটের পাশেই একটি ছোট টেবিলের উপর ঔষধের শিশি, মাপের গেলাস, জলের রূপার ঘটী আছে; তাহারই এক-পাশে একটা স্পিরিট ষ্টোভের উপর জল গরম হইতেছে, দয়াদেবীর ঘুম ভাঙিলে মুখ ধুইবেন, মেলিন্স ফুড খাইবেন; একখানা টুলের উপর রূপার ছোট রেকাবিতে

দাঁতের মাজন ও রূপার জিবছোলা ও ধোয়া তোয়ালে ভাঁজকরা রহিয়াছে। ঘরের কোণে একটা তাকের উপর একটা ঘড়ীতে আটটা বাজিয়া গেল। রাজবালা সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া একবার ঘড়ীর দিকে ও একবার মায়ার দিকে তাকাইয়া ক্লান্তভাবে একবার পিঠটাকে সোজা করিয়া হাই তুলিল। ঘড়ীর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মায়াও মুখ ফিরাইয়া ঘড়ীর দিকে চাহিল এবং তাহাতে রাজবালার সঙ্গে চোখোচোখি হইল। মায়া অমনি বলিয়া উঠিল—মাসী, ছেলের গায়ে হলুদ দেবে এস, আটটা বেজে গেল, এর পর বারবেলা পড়বে যে!......

রাজবালা নীরবে হাত নাড়িয়া মায়াকে কথা থামাইতে ইঙ্গিত করিল।

ঘড়ীর শব্দে ও মায়ার কথায় দয়াদেবীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি চট করিয়া চোখ মেলিয়াই দেখিলেন রাজবালা তাঁহার পা কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তিনি দেখিলেন, যে-রাজবালা প্রথম এই বাড়ীতে আসিয়াছিল এ যেন সেই রাজবালা নয়। তাহার সেই তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ মলিন হইয়া পড়িয়াছে, চোখের কোল বসিয়া গিয়াছে, নিটোল গাল দুটি ভাঙিয়া পড়িয়াছে; তাহার সে প্রফুল্ল চঞ্চলতা নাই, বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য তাহাকে প্রৌঢ়া করিয়া তুলিয়াছে। দয়াদেবী তাহার দিকে দেখিতে-দেখিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজু, তোর এখনও নাওয়া হয়নি?

—না, দিদি।

—তুইও এই উঠলি বুঝি?

রাজবালা সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়াই কাটাইয়াছে; সুতরাং সে দয়াদেবীর প্রশ্নের কি উত্তর দিবে সহসা ঠিক করিতে না পারিয়া একটু থতমত খাইয়া শুধু বলিল—না।

—তবে তুই একেবারে নেয়ে এলেই ত পারতিস। এতখানি বেলা হল, খাবি কখন? মড়ার হাওয়া লেগে তুইও যে শুকিয়ে উঠছিস, রাজু!

রাজবালা দয়াদেবীর স্নেহের স্পর্শে লজ্জিত হইয়া বলিল—তোমায় ওষুধ পথ্যি দিয়ে আমি যাব দিদি।

—আমি ত এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলাম, ততক্ষণে তুই ত নেয়ে খেয়ে আসতে পারতিস।

রাজবালা একটু হাসিয়া বলিল—তোমার পা কোলে ছিল, নামাতে গেলে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে আমি নড়তে পারিনি।

দয়াদেবী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—তুই কি তবে সমস্ত রাত আমার পা কোলে করে ঠায় বসে আছিস রাজু?

রাজবালা মাথা নত করিয়া একটু শুধু হাসিল।

দয়াদেবী রাজবালার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ডাকিলেন—রাজু, তুই আমার কোলের কাছে সরে আয়।

রাজবালা তাঁহার কাছে সরিয়া যাইতেই দয়াদেবী দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া নিজের মুখের কাছে সরাইয়া আনিয়া তাহার কপালে চুম্বন করিলেন। তারপর ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া মায়াকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—মায়া, যা ত মা, তোর দিদিমাকে একটু ডেকে আন্ ত।

মায়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

দয়াদেবী রাজবালার মুখে মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন—বীরু ছাড়া এমন যত্ন আমি আর কারো কাছে পাইনি!

বীরেন্দ্রের নামে দয়াদেবীর মমতা অশ্রুতে গলিয়া পড়িতে লাগিল; রাজবালা দয়াদেবীর কান্না দেখিয়া নিজের বেদনা আর গোপন করিতে পারিল না, তাহারও চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

মায়ার পিছনে পিছনে রাজবালার মা হাতময় কলায়ের দালবাঁটা মাখিয়া সেই ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াই দয়াদেবী ও রাজবালাকে কাঁদিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মায়াও অবাক হইয়া দাঁড়াইল; সে এই দেখিয়া গেল মা ও মাসী কথা বলিতেছে, এখনি আবার কাঁদিবার কি কারণ ঘটিল? বেচারা এই কয়দিন হইতে দেখিতেছে থাকিয়া থাকিয়া তাহার মা কাঁদেন, তাহার মাসী লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে, মোহিনী ঝিও বাদ যায় না; তাহার বীরেন-দাদাও কাঁদিতে-কাঁদিতেই কলিকাতা গিয়াছে; ইহার কারণ সে কিছুই ধরিতে পারে না। সকলের কান্না দেখিয়া-দেখিয়া তাহারও কেমন কান্না পায়, কিসের একটা ভয়ে তাহার মনের মধ্যে ছমছম করিতে থাকে; সেই ভয়টা আকার ধরিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে যখন তাহার মনে হয় সেই পাকা গোঁপ-ওয়ালা

মোটা বুড়োটার সঙ্গে তাহার বিয়ে হইবে! রাজবালার মা মনে করিলেন তাঁহার বোনঝি আর মেয়ের এই যে কান্না ইহা শুভময়ের সহিত রাজবালার বিবাহে আপত্তি ছাড়া আর কিছু না; দয়াদেবী ডাকিয়াছেন তাঁহাকেও দলে টানিবার জন্য। কিন্তু রাজবালার মা মনে মনে বলিয়া উঠিলেন—"আমি তেমন কাঁচা মেয়ে নইগো বাছা, যে, চোখের জলে গলে গিয়ে আমার মেয়ের সুখ ভাসিয়ে দেবো।" রাজবালার মা এ বাড়ীতে পা দিয়াই বুঝিয়া লইয়াছেন যে জামাইএর কথার বিরুদ্ধে তাঁহার বোনঝির একটা কথাও চলে না; সুতরাং জামাইকে পৃষ্ঠবল পাইয়া বোনঝিটিকে তাঁহার আর ভয় ছিল না; ছিল একটু চক্ষুলজ্জা, তাও দয়াদেবী শয্যাগত হইয়া থাকাতে সে লেঠাও চুকিয়া গিয়াছিল, তিনি নিজে দিনান্তেও একটিবার দয়াদেবীর ঘরের চৌকাঠ ডিঙাইতেন না। আজ ডাকিয়া পাঠানোতে আসিতে হইয়াছে, এবং আসিয়াই দেখিলেন কান্নার পালা। তিনি ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—শুভকর্ম্মে এ কি অলক্ষণ বাছা! রাতদিন চোখের জল ফেলা! এ ত আর কেউ পরের বিয়ে নয়—এক নিজের সোয়ামী আর এক নিজের মাসতুতো বোন—তাতে এত তোর খোট কন দো! এত আপ্তগরজে হওয়া ভালো নয় বাছা!

দয়াদেবী চোখের জল মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লিলেন—সেইজন্যই তোমায় ডেকেছি মাসিমা, আমার ামীর হাতে আমার বোনটিকে আমিই সম্প্রদান করব—মি দয়া করে আমায় এই অনুমতিটি দাও।

দয়াদেবীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে াগিল। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া রাজবালার মা খুসী ইয়া বলিয়া উঠিলেন—তা আর অনুমতির অপিক্ষে কি মা, মি সতী লক্ষ্মী ভাগ্যিমানী, তুমি তোমার বোনকে সম্প্রদান রবে এ ত রাজ্যর ভাগ্যির কথা! আশীর্ব্বাদ কর, ওও যেন তামার মতন শাঁখা-সিঁদূর নিয়ে সোয়ামী-পুত্তুর রেখে যেতে ারে!

এই কথায় মর্ম্মাহত হইয়া রাজবালা অশ্রুপ্লাবিত মুখ লিয়া রূঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল—মা, তুমি এ ঘর থেকে যাও।

—আমি ত যাচ্ছিই বাছা, দু-দুটো বিয়ের করুণা একলা রতে হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে! ভট্চাজ্যিদের বৌকে পিঁড়িতে আলপনা দিতে বসিয়ে আমি দুটি বড়ি দিতে বসেছিলাম, মায়া গিয়ে ডাকলে বলেই ত এলাম। আমার কি মাথা চুলকোবার সময় আছে যে এই ঘরে দাঁড়িয়ে থাকব!—বলিয়া রাজবালার মা ঘর হইতে হাসিমুখে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজবালা দয়াদেবীর কোলের কাছে মাথা লুকাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, আমি জামাই-দাদাকে কিছুতে বিয়ে করব না, তুমি বললেও না, আমি যে ওর কাছে দিব্যি করেছি!

মায়াও আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিয়া মায়ের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—মা, আমিও সেই মোটা বুড়োটাকে বিয়ে করব না, আমি বীরেন দা'কেই বিয়ে করব!

দয়াদেবী দুই হাত দুজনের গায়ে রাখিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

মোহিনী দাসী ঘরে আসিয়া বলিয়া উঠিল—মাসিমা, মায়ের যে এখনো ওষুধ-পথ্যি খাওয়া হল না, এতখানি বেলা হয়ে গেল।

রাজবালা তৎক্ষণাৎ আপনার সকল দুঃখ মুছিয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। মায়ের মতন যত্ন, দাসীর মতন সেবা, দিদির মতন শুশ্রূষা লইয়া রাজবালা আপনাকে দয়াদেবীর কাজে নিযুক্ত করিয়া দিল।

(২১)

পঞ্চানন পতিত হাড়িকে ডাকিয়া আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে পতে, আজকে ত দোসরা অঘ্রাণ হয়ে গেল; যার কাছে মাথট চাওয়া যাচ্ছে সেই বলছে আমরা পতিত মণ্ডলকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো; তোর-মতলব কি বল্ দেখি?

পতিত হাত জোড় করিয়া বিনীত ভাবে বলিল—আজ্ঞে, সবাই ত পুরো দিতে পারছে না, বাকিটা আমাদের চাঁদা করে পুরিয়ে দিতে হবে, তাই এক জায়গায় জড়ো করছি; সাতই তারিখের মধ্যে আপনাকে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে যাব।

পঞ্চানন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় চতুর খানসামা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কর্ত্তা-মা মারা গেছেন, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

পঞ্চানন আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল—এঁ! বলিস কিরে? রাণী-বৌ মারা গেলেন? কখন?

চতুর বলিল—না না, রাণী-মা নন, কর্ত্তা-মা। কাশী থেকে তার এয়েছে।

পঞ্চানন বলিল—ওঃ! বাবুর মা মারা গেছেন? তা বয়েস হয়েছিল, কাশী পেলেন, ভালোই। কিন্তু বাবুর বিয়ের বিলম্ব পড়ে গেল।

এই কথা শুনিয়া পতিতের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি দমন করিয়া বলিল—তা হলে এমাসে ত বিয়ে হবে না, আমাদের যদি দয়া করে আর কিছুদিন সময় দ্যান।

পঞ্চানন অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—অঘ্রাণ পোষ দুটো মাস পেয়ে গেলি।

পতিত কাছারী হইতে বাহির হইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—জয় বাবা বিশ্বেশ্বর! তোমার দয়াতে দুটো মাস সময় পাওয়া গেল!

বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া পঞ্চানন দেখিল গুণময় খালি-গায়ে একখানা শাল জড়াইয়া খালিপায়ে পায়চারি করিতেছেন। পঞ্চাননকে আসিতে দেখিয়াই গুণময় বলিয়া উঠিলেন—বুড়ি আর একটা মাস সবুর করে মরতে পারলে না! অঘ্রাণ মাস অশুচে কাটবে, পোষ মাসে বিয়ে হবে না, মাঘ মাস মলমাস, বিয়ে হতে সেই ফাগুনে! আমি আর কালাশৌচ মানছিনে!

পঞ্চানন কি বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

গুণময় পায়চারি করিতে-করিতে হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিলেন—দুদুটো বিয়ের খরচের ওপর আবার শ্রাদ্ধের খরচ এসে চাপল! কোত্থেকে হবে?

পঞ্চানন বলিল—তাই ত সমিস্যে! আজকালকার যে আইন তাতে প্রজাদের কাছে বাজে আদায় করবার জো নেই। যে মাথট ধরা হয়েছে, অজন্মার জন্যে তাই আদায় হয়ে উঠছে না। যা মাথট আদায় হবে তাইতে বিয়ের খরচ চলে যাবে; শ্রাদ্ধের খরচটা এখন ঘর থেকে চালিয়ে পরের বছর আদায় করে নিতে হবে।

—তাই হবে, শ্রাদ্ধের একটা ফর্দ্দ তৈরি কর। আর বিলাসপুরে রসময়কে একখানা চিঠি লিখে দাও, ফাগুনের এদিকে বিয়ে হবার আর জো নেই।

পঞ্চানন চলিয়া যাইতেছিল, গুণময় নিজের মনে বলিয়া উঠিলেন—পূছ্! সব পণ্ড! সব মাটি! মা এতকাল বেঁচে থাকলেন আর পনেরটা দিন বাঁচতে পারলেন না! এমন হঠাৎ মরাই বা কেন? ছেলের হাতের আগুন পর্য্যন্ত পেলেন না, ছেলের কপালে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেলেন।......দেখ পাঁচু-দা, বীরে ছোঁড়ার একজামিন হয়ে গেছে, সে এসে পড়লে রাজুকে সামলে রাখা ভার হবে। তাকেও একখানা চিঠি লিখে দাওগে এবাড়ীতে তার আর জায়গা হবে না। চিঠি দুখানা লিখে নিয়ে এস, আমি দস্তখত করে দেবো।

পঞ্চানন চলিয়া গেল। গুণময়ও বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

ঠাকুর-ঘরের সামনে রাজবালার মা বসিয়া দুখানি কুলোতে বরণডালার মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সাজাইতেছিলেন, এবং ভটচায্যি-বৌ বড় বড় চারখানা নূতন কাঁঠালকাঠের পিঁড়ির উপর খড়কে দিয়া বিবিধ রং দিয়া অতি সূক্ষ্ম আলপনা চিত্র করিতেছিল। ঠাকুরঘরের মধ্যে রাজবালা গলায় কাপড় দিয়া ঠাকুরের চরণতলে মাথা খুঁড়িতে-খুঁড়িতে প্রার্থনা করিতেছিল—হেই ঠাকুর, জামাই-দাদার সঙ্গে আমার যেন বিয়ে না হয়! আত্মহত্যা করা মহাপাপ, মরতে চাওয়াও পাপ—আমি মরতে চাই না; আমার বসন্ত হোক, আমাকে তুমি কুৎসিত করে ঐ লোভীর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও!

এমন সময় গলায় কাচা দিয়া খালিপায়ে গুণময় সেই দালানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুণময় খালিপায়ে আসাতে কেহ তাঁহার আসা আগে হইতে টের পায় নাই, তিনি একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়াতে রাজবালার মা ও ভটচায্যি-বৌ তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া বসিলেন।

গুণময় হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—কার শ্রাদ্ধ কে করে, খোলা কেটে বামুন মরে! আর ওসব পণ্ডশ্রম কেন মাসিমা!

রাজবালার মা মুখ তুলিয়া গুণময়ের শুরুদশা দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ওকি বাবা! কি হল! বেয়ান কি কাশী পেয়েছেন নাকি?

গুণময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মা ত মরলেন না, আমায় মেরে গেলেন! একমাস অশুচ, তার পরে পোষ মাস, মাঘমাস মলমাস—বিয়ে হতে সেই ফাগুন মাসে! এর মধ্যে আবার কি হবে না-হবে কে জানে?

রাজবালার মা কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ সব আমারই পোড়াকপালের লিখন 'বাবা, আমারই বরাতের ফের! দয়া পর্য্যন্ত খুসী হয়ে রাজুকে সম্প্রদান করতে চাইলে, আর কোথা থেকে এ এক শুকনো বিপদ্ এল বল দেখি? যমের কি একটু কাল অকাল জ্ঞান নেই! দয়ার শিয়রে ত যম বসে ধন্না দিচ্ছে, আবার কবে কি হয় কে বলবে! সুভালাভালি তোমাদের দুহাত এক হয়ে গেলে যে আমি নিশ্চিন্দি হই! কিন্তু বাবা, তুমি একটা কাজ কোরো, সেই বীরু ছেলেটি যেন বিয়ের আগে এখানে না আসে, সে এলে আবার রাজুর মন বিগ্‌ড়ে দেবে!

গুণময় বলিলেন—সে ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি, এ বাড়ীতে তাকে আর কখনো আসতে দেবো না!

রাজবালার মা নিশ্চিন্ত আরামের নিশ্বাস ছাড়িলেন।

ঠাকুরঘরের ভিতর হইতে রাজবালা তাহার মাতা ও ভগ্নীপতির সব কথা শুনিতে পাইতেছিল। যখন সে ঠাকুরের কাছে বিবাহ হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা করিতেছিল সেই মুহূর্ত্তে তিন মাস বিবাহ স্থগিত হইয়া যাওয়ার সংবাদ যেন ঠাকুরেরই বরদান বলিয়া মনে হইল; সেই সংবাদে আনন্দ-ভক্তি-কৃতজ্ঞতায় ভরা মনে, বীরেন্দ্রকে এ বাড়ীতে আসিতে, না দেওয়ার সম্বন্ধে তাহার মায়ের প্রস্তাব ও গুণময়ের সমর্থন, যে দুঃখ বিরক্তি ও ঘৃণার প্রতিঘাত তুলিল তাহাতে অভিভূত হইয়া রাজবালা ঠাকুরের সামনে মাথা লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেই কান্নার শব্দ শুনিয়া গুণময় রাজবালার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুরঘরে কাঁদে কে?

রাজবালার মা কান পাতিয়া শব্দ শুনিয়া বলিলেন—রাজু বোধ হয়।

গুণময় ঠাকুরঘরে ঢুকিলেন; রাজবালার মা চোখের ইসারায় ভটচায্যি-বৌকে ডাকিয়া লইয়া সে তল্লাট ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

গুণময় রাজবালার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—রাজু, বিয়েতে দুমাস দেরি পড়ে গেল, তার জন্যে কান্না কেন ভাই? বিয়ে আমাদের হয়েই গেছে মনে কর। তোমার কান্নায় আমার বুক ফেটে যায়—তুমি চুপ কর।

অশুচি কিছু গায়ে ঠেকিলে যেমন গা ঘিন-ঘিন করে, গুণময়ের স্পর্শে রাজবালার তেমনি মনে হইল। সে গা মোড়া দিয়া গুণময়ের হাত ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। যখন আঁচল দিয়া রাজবালা চোখ মুছিতেছিল সেই অবসরে গুণময় রাজবালাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে হঠাৎ চুম্বন করিলেন। রাজবালা দুই হাতের প্রাণপণ জোর দিয়া গুণময়ের বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া এক ছুটে সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যেদিন মাতার মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছে সেই দিন গলায় কাচা পরিয়া ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সামনে যে লোক এমন ব্যবহার করিতে পারে তাহার প্রতি ঘৃণায় রাজবালার সমস্ত দেহমন ভরিয়া উঠিয়াছিল; সে ছুটিয়া গিয়া দয়াদেবীর পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়াদেবী পা সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হল রাজু, তুই কাঁদছিস কেন?

রাজবালা অনেকক্ষণ কাঁদিয়া দয়াদেবীর বারম্বার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—জামাই-দাদার মা মারা গেছেন, তিন মাস আমি বেঁচে গেছি দিদি!

দয়াদেবী আরাম ও দুঃখে মিশানো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মা এতদিনে বিশ্বেশ্বরের চরণে ঠাঁই পেলেন! আঃ জুড়োলেন! মা, আমায় তোমার কাছে ডেকে নাও!

দয়াদেবীর চোখ দিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রোগীর পথ্যাদি গরম রাখার সুলভ ও সহজ উপায়

অসুখের সময় রোগীর জন্য দুগ্ধ, সাগু ইত্যাদি জলীয় বা অন্যপ্রকারের পথ্য মৃদু উত্তাপে গরম রাখা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। নানা জনে নানা উপায়ে ঐ-সমস্ত পথ্য গরম রাখিতে প্রয়াস পান। কেহ বা কয়লার অথবা কাঠের আগুনের মৃদু জ্বালে, কেহ বা উত্তপ্ত বালির উপর, কেহ বা কেরোসিন-ষ্টোভের উপর বসাইয়া রাখেন। আবার কেহ বা সুবিধা হইলে তাপরোধক 'থার্ম্মোস্-ফ্লাস্ক' নামক বোতলেও পুরিয়া রাখেন। কেহ বা অন্যান্য উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যবহার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে—ইহাদের মধ্যে কোনটিরই সরঞ্জামের মূল্য বা দৈনিক খরচ নিতান্ত অল্প নহে,—অন্ততঃ দরিদ্রের পক্ষে নহে। অধিকন্তু সমস্তগুলিই যে প্রয়োজনমত সমভাবে কার্য্যকর এ কথাও বলা যায় না। এমতাবস্থায় অল্পমূল্যে সর্ব্বত্র সহজ-প্রাপ্য কোন সরঞ্জামের সাহায্যে যদি অভিলষিত ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে নিম্নলিখিত সাধারণ কয়েকটি সরঞ্জামের সাহায্যে অতি সুচারুরূপে অভিলষিত ফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি তিন-প্রকারের মাত্র—(১) লম্বা চিম্নি বা তৎপরিবর্ত্তে ডোম সহ যে-কোন একটি নাতিবৃহৎ লেম্প, যথা সাধারণ দেওয়ালগির অথবা ষ্টিমারের জুয়েল লেম্প অথবা হিঙ্ক্সের চিমনী-বিহীন লম্বা ডোম-ওয়ালা লেম্প; (২) একটি মুখকাটা কেরোসিনের শূন্য টীন; এবং (৩) ইষ্টক বা মৃত্তিকাখণ্ড কয়েকটি। টীনটি সচ্ছিদ্র হইলে বায়ু-চলাচল ভাল হয়, ধোঁয়া হয় না।

প্রথমতঃ লেম্পটিকে কোন সুবিধাজনক স্থানে বসাইয়া প্রদত্ত ছবির ব্যবস্থা অনুসারে বায়ু চলাচলের জন্য ব্যবধান রাখিয়া উহার চারিদিকে চারিখণ্ড ইষ্টক বা মৃত্তিকাখণ্ড বসাইতে হইবে। লেম্পের সলিতার উপর আলো অবস্থা-ভেদে শিখা হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ হইলেই

সুলভ ও সহজ তাপন-যন্ত্র।
প—পথ্যাদি; ট—টিন; আ—আলো;
ল—লেম্প; ই—ইট।

যথেষ্ট। টিনটী লেম্পের নিকট সন্নিবিষ্ট করিয়া দেখিতে হইবে যে টীনের উপরিভাগ লেম্পের (চিমনীর শীর্ষদেশ) অপেক্ষা অন্ততঃ চারি অঙ্গুলি দীর্ঘতর কি না। যদি প্রয়োজনানুযায়ী হয় তবে এখন টীনটি আলোর উপর উপুড় করিয়া রাখিলেই এই সুলভ তাপন-যন্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। এই টীনের উপর পথ্য সহ আধারগুলি রাখিয়া দিলে এবং প্রয়োজনমত সময় সময় লেম্পটি তৈল-পূর্ণ করিয়া দিলে যতক্ষণ ইচ্ছা পথ্যগুলি মৃদু উত্তাপে উত্তপ্ত রাখা যাইবে। যদি চিমনীসহ লেম্প খর্ব্বাকার হয় তবে প্রয়োজনমত ২।১টি ইষ্টকখণ্ড বা মৃত্তিকাখণ্ডের সাহায্যে লেম্পটিকে যথোপযুক্ত উচ্চ স্থানে অবস্থান করাইতে হইবে। আর যদি চিমনী সহ লেম্প টীনের অপেক্ষা দীর্ঘতর হয় তবে আর কয়েকটি ইষ্টকখণ্ডের সাহায্যে টীনটি উচ্চ করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যেন সলিতা-কাটার দোষে ধোঁয়া না হইতে পারে।

খরচের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে এই সরঞ্জামগুলির মূল্যও পূর্ব্বোক্ত ষ্টোভ্ ইত্যাদির তুলনায় নিতান্ত অল্প এবং সর্ব্বত্রই সহজপ্রাপ্য—এমন কি অনেক গৃহস্থের বাটীতেই এইগুলি সাধারণতঃ থাকে। সুতরাং সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য বা ব্যয়সাধ্য নহে। ব্যবহারের দৈনিক খরচও ✓০ এক আনার অধিক নহে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে কেরোসিনের সাধারণ কুপী ব্যবহারে ধোঁয়া বড় বেশী হয় এবং আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায় না। স্পিরিটের কুপী ব্যবহার করিলে দৈনিক খরচ অন্ততঃ ৶০ তিন আনা হইতে।০ চারি আনার বেশী পড়িবে না।

এই সুলভ তাপনযন্ত্র ব্যবহারে জলীয় অংশের খুব অল্পই হ্রাস হইয়া থাকে এবং পথ্যগুলিও পুনর্ব্বার সিদ্ধ হওয়ার বা পুড়িয়া যাওয়ার মত উত্তপ্ত হইবার আশঙ্কা নাই। এ ক্ষেত্রে তাপ এত মৃদুভাবে রাখা যায় যে প্রজ্বলিত লেম্প সহ সরঞ্জামগুলি রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাখিলেও রোগীর কোনরূপ অসুবিধা হয় না। ইহার সাহায্যে শুধু রোগীর পথ্য কেন, পরিমিত পরিমাণ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দৈনিক খাদ্যও প্রয়োজন হইলে স্বচ্ছন্দে গরম রাখা যাইতে পারে। অধিকন্তু ইহা যথা-তথা ব্যবহার করা যাইতে পারে, বায়ু চলাচলের পথে রাখিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না; কিন্তু এককালে প্রচণ্ডবেগে অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিয়া যাহাতে আলো না নিবাইয়া ফেলিতে পারে সেজন্য বায়ু চলাচলের পথ সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে। যদি তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন না থাকে তবে ঢাকনীযুক্ত পাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া তন্মধ্যে অন্য পাত্রে পথ্যাদি রক্ষিত হইলে জলীয় অংশ হ্রাস হওয়ার আশঙ্কা নিতান্ত অল্প বা নাই বলিলেও চলে। আর যদি তাড়াতাড়ি করার আবশ্যক হয় তবে উত্তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় ইহারও কার্য্যকরী ক্ষমতার একটা সীমা আছে।

শ্রীপ্যারীমোহন দেব বর্ম্মা।

ফরাসী রণাঙ্গনে বাঙ্গালী-গোলন্দাজ

আমি জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসীতে" চন্দননগর ভলান্টিয়ার সম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদের বর্ত্তমান কার্য্যাদির কিছু বিবরণ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

চন্দননগরের সৈনিকদল ফরাসী প্রজা হইলেও তাহারা বাঙ্গালী। এক বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল তাহারা আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত হইয়া যে কঠোর ব্রত শিক্ষা করিয়াছে—আজ তাহার ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার দিন! ফরাসীদেশের আল্‌সাস লোরেনের নিকটবর্ত্তী সেণ্ট মিহিয়েলে তিনখানি গ্রাম রক্ষার ভার আজ ২৬ জন বাঙ্গালীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া, ফরাসীসেনা-পতিগণ তাহাদের উপস্থিত বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও সাহসের প্রশংসা করিতেছে। ফরাসীর যে বিখ্যাত ৭৫ মিলিমিটরের কামানের গর্জ্জনে জর্ম্মনজাতির হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়, আজ বাঙ্গালী সেই কামান পরিচালনা করিয়া শত্রুর ব্যূহ ভেদ করিতে অগ্রসর। সংলগ্ন চিত্রের পতাকাচিহ্নিত স্থানগুলি—সেণ্টমিহিয়েলের তিনখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, ৪ অঙ্কিত গ্রামখানিই বিখ্যাত সেণ্টমিহিয়েল—উহা এক্ষণে জর্ম্মনীর করতলগত, ঐ গ্রামখানির পুনরুদ্ধারকল্পে ফরাসীসৈন্য আজ কৃতসঙ্কল্প। ছবিখানি দেখিলেই পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন—গ্রাম তিনখানিকে সুরক্ষিত রাখিয়া ফরাসীবাহিনী জর্ম্মনীর দিকে কিরূপে অগ্রসর হইতেছে। জর্ম্মন চমূ হইতে ফরাসীসৈনিকগণ মাত্র অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছে—একস্থানে ১৫ মিটার মাত্র উভয় ট্রেঞ্চের ব্যবধান—ইহা ৩২ হাত মাত্র। ট্রেঞ্চে পদাতিকসেনা অগ্রসর হইতেছে—গিরিশৃঙ্গে বাঙ্গালী-গোলন্দাজ শত্রুপরিখায় গোলাবর্ষণ করিতেছে। ছবির দক্ষিণপ্রান্তে যে ব্যাটারীতে ৫ জন গোলন্দাজ বাঙ্গালী অবস্থান করিতেছে উহা সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ-সঙ্কুল স্থান—জর্ম্মন গোলন্দাজগণ ঐ স্থানটি হইতে ফরাসীবাহিনীকে বিতাড়িত করিবার জন্য মুহুর্মুহু শ্র্যাপনেল নিক্ষেপ করিতেছে—বৃষ্টিধারার মত শ্র্যাপ্‌নেলের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া বাঙ্গালী গোলন্দাজগণ ফরাসী পদাতিকগণকে ৪ নম্বর গ্রাম সেণ্টমিহিয়েল অধিকার করিতে সহায়তা করিতেছে।

ফরাসী রণাঙ্গনে বাঙ্গালী-গোলন্দাজ।

সংবাদপত্র-পাঠক মাত্রেই চন্দননগরের বীরযোদ্ধা যোগেন্দ্রনাথ সেনের কথা অবগত আছেন—যিনি একবৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া রণপ্রাঙ্গণে চিরবিশ্রাম করিয়াছিলেন—দ্বিতীয় স্থানের গিরিশৃঙ্গে যে ব্যাটারীতে অমিতাভ-প্রমুখ বাঙ্গালী গোলন্দাজ অবস্থান করিতেছে, ঠিক ঐ স্থানেই সেই বীরদেহের পতন ঘটিয়াছিল।

ফরাসীরণক্ষেত্র হইতে একজন গোলন্দাজ-বন্ধু আমায় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিই, উহা পাঠ করিলে যুদ্ধ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের একটি মোটামুটী ধারণা জন্মিতে পারে।

"আমরা ২রা জুলাই এসে পৌঁছাই। আমরা ঠিক ভার্দ্দুনে নাই, ভার্দ্দুন এখান থেকে ৩০।৩৫ কিলোমিটার দূরে, আমরা বরং আল্‌সাস-লোরেনের কাছাকাছি আছি। আক্রমণ করবার সময়ে আমাদের প্রথম পরিখায় দাঁড়িয়ে হাউইএর মত একরকম "ক্রাপুরো" ছুড়তে হয়—এ কার্য্যটা ভলান্টিয়ারদেরই কর্‌তে হয়—কারণ এই কাজের মত বিপজ্জনক কাজ ট্রেঞ্চে আর নাই। গ্যাস থেকে মানুষ বাঁচে, কিন্তু একটিক্রাপুরো এসে বিঁধলে মানুষ আর বাঁচে না। অনেকের ধারণা যে কামানের গোলা একদল লোকের মধ্যে এসে পড়্‌লে সবাই মারা যায়—কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা নয়; যুদ্ধ অতটা সহজ হলে এতদিন একপক্ষ-না-একপক্ষের জয়পরাজয় দেখা যেত। গোলা দুই-রকম ভাবে ছোড়া হয়; এক-রকম ভাবে ছুড়্‌লে গোলা মাটিতে লেগে ফাটে—এই সময়ে শুয়ে পড়্‌লে বেশী কিছু হয় না, তবে যদি কারু মাথাতে এসে পড়ে সে কথা আলাদা। আসল কথা, গোলা যে একটা খুব ভয়ের জিনিষ তা নয়। আর-একরকমের গোলা ছোড়ার পর যে-রকম fusant দেওয়া থাকবে সেই-রকম উঁচুতে এসে একেবারে ফেটে যায়। এইসব অবশ্য খুব বিপজ্জনক। সেই সময়ে যেখানে আছি, সেখানে যদি দাঁড়িয়ে পড়া যায়, বিপদ খুব কম হয়। Fusant প্রায় মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তবে এ থেকেও মানুষ বাঁচে যদি মাটির নীচের ঘরে আশ্রয় নেয়। আমাদের ব্যাটারীর নায়ক একজন লেফ্‌টেনেন্ট আছেন। তিনি বলেন যে ওরা চারিখে আধ ঘণ্টার মধ্যে জর্ম্মনী প্রায় ৪০৫র উপর গোলা নিক্ষেপ করে—তাতে মাত্র একজন মারা যায়। জর্ম্মনীর আয়োজন যাই হোক্, আর French offensive ভাঙ্‌তে পারবে না—এক্ষণে ফরাসীজাতি সকল দিকেই প্রস্তুত হয়েছে। ৪নং গ্রাম ছাড়া সব গ্রামগুলি একেবারে ধ্বংস হয়েছে। ৪নং গ্রামে এখনও ১৮০০ ফ্রেঞ্চ আছে। সেইজন্য ঐ গ্রাম শত্রুহস্তে থাকা সত্ত্বেও আমরা গোলাবর্ষণ কর্‌তে পার্‌ছি না এবং গ্রামখানির পুনরুদ্ধারের জন্যই এই স্থানে এত Re-inforcement করা হয়েছে।"

শ্রীমতিলাল রায়।

স্মৃতির সৌরভ

নয়ের পরিচ্ছেদ।

মিঃ গিলফিলের মনটা তখন বড়ই খারাপ। প্রবীণারা গাড়ী করিয়া বাহির হইয়া গেলে কখন্ টিনাকে একলা লেডি শেভারেলের বসিবার ঘরে পাইবেন সেই খোঁজেই তিনি ঘুরিতেছিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইতেই তিনি দরজায় ঘা দিলেন।

মিষ্ট মধুর স্বরে ডাক আসিল, "ভিতরে এস।" 'জল-ধারার কলস্বরে' তৃষিতের মন যেমন পুলকিত হইয়া উঠে, এই 'সুধাকণ্ঠস্বরে' তাঁহার মন তেমনি পুলকিত হইয়া উঠিত।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন টিনা যেন কেমন অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়াইয়া; হঠাৎ যেন চমক্ ভাঙিয়া কিসের ধ্যান ছাড়িয়া উঠিয়াছে। মেনার্ডকে দেখিয়া সে যেন একটু আশ্বস্ত হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিল, মেনার্ড আবার কেন তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া তাহাকে ভয় পাওয়াইতে আসিল। টিনা বলিল, "ওঃ তুমি, মেনার্ড! লেডি শেভারেলকে খুঁজছ?" তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "না ক্যাটেরিনা, আমি তোমাকেই চাই। তোমাকে আমার বিশেষ কিছু বলবার আছে। তোমার কাছে আধঘণ্টাটেক্ বস্‌তে পারি কি?"

টিনা অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "হাঁ, প্রচারক মহাশয় পার বৈকি।' ব্যাপারখানা কি?"

টিনার মুখোমুখি বসিয়া মিঃ গিলফিল বলিলেন, "টিনা আমি আজ বল্‌তে এসেছি, আশা করি তা' শুনে তুমি বেদনা পাবে না। তোমাকে আমি সত্যি সত্যি স্নেহ করি, তোমার জন্যে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন তাই একথা বলছি, অন্য কোনো ভাব থেকে নয়। আর-সব কথা আমি এখন ধরছিই না। তুমি তো জানই, জগতের সব-কিছুর চেয়ে আমার কাছে তুমি বড়। কিন্তু যে ভাবের প্রতিদান তুমি কর্‌তে পারছ না, তা' আমি জোর করে তোমায় শোনাব না। দশ বছর আগে যে মেনার্ড ছিপের সুতোয় জট পাকিয়ে দিলে তোমায় বকত সেই মেনার্ডই আজ ভাইএর মতন তোমায় কিছু বল্‌তে চায়। যে-সব কথায় তুমি কষ্ট পাও এমন কথা আমি যে কোনো নীচ অভিপ্রায় থেকে স্বার্থের খাতিরে বলছি তা' বোধ হয় তুমি বিশ্বাস করবে না ?"

টিনা অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "না, না, তুমি খুব ভাল।"

মিঃ গিলফিল্‌ একটু ইতস্ততঃ করিয়া মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "কাল সন্ধ্যায় যা দেখলাম তাতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে—আমার ভুল হয়ে থাকলে, টিনা দয়া করে আমায় ক্ষমা কোরো—আমার মনে হচ্ছে যে তুমি···কাপ্তেন উইব্রো এত নীচ যে সে তোমার ভালবাসা নিয়ে খেলা করতে পারে, সে তোমার প্রেমের অপমান করছে, সে তোমার সঙ্গে এখনো এমন ব্যবহার করে যা অন্য কোনো মহিলার ভাবী স্বামীর পক্ষে করা অন্যায়।"

রাগে চোখ ঘুরাইয়া টিনা বলিল, "মেনার্ড, তুমি বল্‌তে চাও কি ? তুমি কি বল্‌তে চাও যে আমি তাকে আমার কাছে ভালবাসার কথা বল্‌তে দি ? আমার সম্বন্ধে এ-রকম ভাব্‌বার তোমার কি অধিকার আছে ? তুমি কাল সন্ধ্যায় কি দেখেছ বল্‌তে চাও ?"

"টিনা, রাগ কোরো না। তুমি কোনো অন্যায় করেছ এ সন্দেহ আমি করিনি। আমার কেবল সন্দেহ হয় যে ওই হৃদয়হীন পশুটা তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে, যাতে তোমার তার প্রতি ভালবাসাটা জেগে থাকবে, এবং ফলে তোমারো মনের শান্তি দূর হবে, অন্য অনেকেরো অমঙ্গল হবে। তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি যে তোমাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে, মিস্ আশারের সে দিকে বেশ নজর আছে, তিনি নিশ্চয় তোমায় হিংসে করতেও সুরু করেছেন। টিনা, আমি তোমায় করজোড়ে অনুরোধ করছি, খুব সাবধানে থেকো, ও-লোকটার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কোরো কিন্তু ওকে আমল দিও না। এতদিনে বোধ হয় বুঝেছ যে তুমি তাকে যে ধন দিয়েছ, ও তার কিছুমাত্র যোগ্য নয়। এই-রকম আহাম্মকের মতো হেলাফেলা করে ও তোমায় যে দুঃখ দিয়েছে তাতে ওর বোধ হয় একটুও দুশ্চিন্তা হয়নি, নাড়ীর স্পন্দন একবার বাড়লে ওর তার চেয়ে ঢের বেশী ভাবনা হয়।"

টিনা রাগিয়া বলিল, "মেনার্ড, তার সম্বন্ধে তোমার এ-রকম বলা ঠিক নয়। তুমি তাকে যা ভাবছ সে তা' নয়। সে বাস্তবিকই আমার কথা ভাব্‌ত। সে বাস্তবিকই আমায় ভালবাস্‌ত। কেবল তার মামার ইচ্ছামত কাজ করা তার ইচ্ছা।"

"ও তা তো নিশ্চয়। আমি জানি ওর যাতে সুবিধা হয় সেটা ও কেবলমাত্র সৎ-উদ্দেশ্যেই করে।"

মিঃ গিলফিল চুপ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রাগিয়া উঠিয়া তিনি নিজের উদ্দেশ্যই মাটি করিতেছেন। আবার তখনি শান্ত ও স্নেহার্দ্র স্বরে বলিতে লাগিলেন, "টিনা, আমি তার সম্বন্ধে যা ভাবি সে কথা আর বলব না। সে তোমায় ভালবাস্‌ত কি না বাস্‌ত জানি না, তবে মিস্ আশারের সঙ্গে তার যা সম্বন্ধ তাতে তুমি তার প্রতি একবিন্দু ভালবাসা পুষে রাখ্‌লেও দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাবে না। ভগবান জানেন, আমি এক মুহূর্তের কথায় তোমার ভালবাসা দূর করতে বলছি না। সময়, দূরত্ব ও সত্যপথে চলবার চেষ্টাই এর প্রতিকার। এখন বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চাইলে যদি স্যর ক্রিষ্টফার আর লেডি শেভারেল বিরক্ত না হতেন, তবে আমি তোমায় এই সময় একবার আমার বোনের বাড়ী বেড়িয়ে আসতে বলতাম। তারা স্বামীস্ত্রী দুজনেই খুব ভাল লোক, তোমায় ঠিক ঘরের মেয়ের মতো আদর যত্নে রাখত। কিন্তু বিশেষ একটা কোনো কারণ না দেখিয়ে তো আর অনুরোধ করতে পারি না; আমার বিশেষ ভয়, পাছে এতে স্যর ক্রিষ্টফারের মনে অতীত ঘটনা সম্বন্ধে কিম্বা তোমার বর্তমান মনের ভাব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ

জাগিয়ে ফেলি। তোমারো বোধ হয় তাই মনে হয়, না টিনি ?"

মিঃ গিলফিল আবার চুপ করিলেন, কিন্তু টিনা কোনো কথা বলিল না। সে জানালার বাহিরে আর-একদিকে চাহিয়া ছিল, তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। মিঃ গিলফিল উঠিয়া তাহার কাছে আসিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "টিনা, গায়ে পড়ে তোমার মনে ব্যথা দিলাম, আমার ক্ষমা করো। মিস্ আশারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তোমার চোখে পড়েনি মনে করে আমার বড় ভয় হচ্ছিল। আমার এইমাত্র ভিক্ষা, তুমি এই কথাটি মনে রেখো যে তোমার নিজেকে সাম্‌লে রাখার শক্তির উপরে সমস্ত পরিবারের শান্তি নির্ভর করছে। যাবার আগে বল যে আমায় ক্ষমা করেছ।"

টিনা ছোট হাতখানি বাড়াইয়া তাঁহার বড় বড় দুটি আঙুল চাপিয়া ধরিল; তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; সে বলিল, "মেনার্ড, বন্ধু তুমি কত ভাল! আমি তোমার সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমার হৃদয় যে ভেঙে যাচ্ছে। আমি কি যে করি তা নিজেই [illegible] পাই না। বিদায়।"

গিলফিল নীচু হইয়া ছোট হাতখানি চুম্বন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পিছন দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে দিতে দাঁতে দাঁত ঘসিয়া তিনি বলিলেন, "পাজি কোথাকার! স্যর ক্রিস্টফার না থাকলে আমি ওকে পিটিয়ে ছাতু করে ফেলতাম।"

দশের পরিচ্ছেদ।

সেদিন সন্ধ্যায় মিস আশারের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া লম্বা একটা চক্কর দিয়া অ্যান্টনি বাড়ী ফিরিয়াই নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ঘরে একখানা মস্ত আয়না; অ্যান্টনি অত্যন্ত ক্লান্ত দুর্ব্বলের মতন তার সম্মুখে গিয়া বসিল। আয়নায় তাহার সুন্দর চেহারার যে ছায়া পড়িয়াছিল সেটা অন্যদিনের চেয়ে একখানি ম্লান শ্রান্ত ও অবসন্নই বটে; সে যে-রকম রাগের সঙ্গে নিজের নাড়ী দেখিতেছিল, ও বুকে হাত রাখিয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করিতেছিল, সেটাও এ-রকম চেহারার পক্ষে নিতান্ত অশোভন নয়।

চেয়ারে হেলান দিয়া হাতদুটা মাথার পিছনে রাখিয়া আয়নার দিকে চাহিয়া সে পড়িয়া ছিল। মনের ভিতর কত চিন্তার স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। "দুই হিংসুটে সন্দিগ্ধ মেয়ের মাঝখানে প'ড়ে আচ্ছা বিপদ বাধিয়েছি যা হোক্! দু'জনেই একেবারে মার-মূর্ত্তি, ছুঁতে-না-ছুঁতেই দপ করে' জ্বলে ওঠে। আর আমার ত এই শরীরের অবস্থা। সব ছেড়েছুড়ে এমন একটা দেশে পালাতে পারলে বাঁচি, যেখানে মেয়েমানুষের নামগন্ধ নেই, কুঁড়ের বাদশার মতো বেশ চোখ বুজে পড়ে থাকা যায়। নেহাৎ যদি মেয়েমানুষ থাকে, তবে তারাও যেন একেবারে ঘুমের দেশের হয়, হিংসা কি সন্দেহ করবার মতো টন্‌টনে নজর থাক্‌লে মুস্কিল। এই তো আমি সারাক্ষণটি আর-সকলের ভালর চেষ্টায় রয়েছি, নিজেকে খুসী রাখবার দিকে নজরটিও দিইনা; তা' পুরস্কার পেলাম কি? না মেয়েমানুষের চোখের আগুন আর মুখের বিষবর্ষণ। বিয়েট্রিসের মাথায় যদি আবার কিছু-একটা সন্দেহের ভূত চাপে—আর চাপাটা কিছু আশ্চর্য্যও নয়, টিনা যে অবুঝ মেয়ে—আমি যে তা' হলে কি করব তার ঠিক নেই। বিয়েট্রিস তো প্রলয়-কাণ্ড করে ছাড়বে। আর এ বিয়েতে যদি কোনো বাধা পড়ে,—বিশেষ করে ওই ধরণের বাধা হ'লে বুড়ো ভদ্রলোক তো নিঘ্‌ঘাত মারা পড়বে। হাজার হ'লেও আমি ওঁকে এমন ঘা কিছুতেই দিতে দেবো না। তা' ছাড়া পুরুষ-মানুষের বিবাহিত জীবন ব'লে তো একটা কিছু চাই; বিয়েট্রিসকে বিয়ে করা ছাড়া ভাল উপায় এর আর কি হতে পারে? চমৎকার দেখ্‌তে যা হোক, অমন প্রায় দেখা যায় না। আমার ওকে বাস্তবিকই খুব ভাল লাগে। রাগ আছে বটে, তা' আমি ওর কোনো কাজেই বাধা দেবো না, কাজেই তাতে কিছু আসে যাবে না। বিয়েটা চুকে গেলে বাঁচতাম বাবা! এ-সব গোলমেলে জ্বালাযন্ত্রণা আমার মোটেই সয় না। আজকাল তো শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। সকাল বেলা টিনার কাণ্ড নিয়ে মাথাটা একেবারে ঘুরে গিয়েছিল। বেচারী টিনা! কি বোকা মেয়ে, আমায় কি না অমন করে ভাল বাস্‌তে গেল! ওর বোঝা উচিত ছিল,

যে, ব্যাপারটা এই-রকম ছাড়া অন্য-রকম হওয়া ঠিক সম্ভব নয়। আমি যে ওকে কতটা দয়া মায়া করি তা যদি ও বুঝত! মনটাকে ঠিক করে বন্ধুভাবে দেখ্‌লেই তো হয়!—তা' মেয়েমানুষ তেমন জিনিষই নয় যে বুঝিয়ে পড়িয়ে সোজা পথে চালানো যায়। বিয়েট্রিসের স্বভাব বেশ ভাল; আমার তো মনে হয় টিনার সঙ্গে ও ভাল ব্যবহারই করবে। টিনা যদি আমার ওপর রাগ করে' গিল্‌ফিল্‌কে ভাল বাসে, তা' হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। লোকটা টিনার স্বামী হবার উপযুক্ত বটে। ওকে খুব সুখে রাখ্‌বে; আর ক্ষুদে কড়িংটিকে সুখে সংসার করতে দেখ্‌তে আমারো খুব ইচ্ছা করে। আমার অবস্থা যদি অন্য-রকম হ'ত তা হ'লে আমি নিজেই ওকে বিয়ে করতাম। কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফারের প্রতি তো আমার একটা কর্ত্তব্য আছে, তার দায়িত্ব ঠেলা কিছুতেই সম্ভব নয়। মামা একটু জোর করলে বোধ হয় ও গিল্‌ফিল্‌কে বিয়ে করতে রাজি হ'তে পারে। মামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ও কথা কইতে পারবে না তা' আমি ঠিক জানি। আর একবার যদি বিয়েটা হয়ে যায় তা' হ'লে আর কোনো ভাবনা নেই; টিনার যে-রকম স্নেহপ্রবণ স্বভাব; স্বামীর আদরে সোহাগে আমার নামও ভুলে যাবে। ওদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চয় ওর সুখের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। যাদের কোনো মেয়েমানুষে কথনো ভালবাসেনি তাদের কিন্তু খুব কপাল-জোর। বাবা! এ এক বিষম দায়!" এই সময় সে ঘাড়টা ফিরাইয়া আয়নায় নিজের মুখের পাশের দিকটা দেখিল। দেখিয়া কি কষ্টকর কর্ত্তব্যবোধে জানি না, খানসামাকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টাটা বাজাইয়া দিল।

ইহার পর কয়েক দিন কোনো-রকম উৎপাতের চিহ্ন দেখা যায় নাই। কাজেই কাপ্তেন উইব্রো ও মিঃ গিল্‌ফিল্‌ দুজনেরই উদ্বেগটা একটু কমিয়াছিল। পার্থিব সকল জিনিষেরই শান্তি হয়। ঝড়ের রাত্রে ক্রুদ্ধ পবনদেবও গাছ-পালা কাঁপাইয়া দরজা জানালা ভাঙিয়া পথহারা অসংখ্য দৈত্যশিশুর মতন গর্জ্জন করিবার আগেও এক-একবার মুহূর্ত্তের জন্য শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন।

মিস্ আশারের আজকাল খুব খোস মেজাজ। কাপ্তেন উইব্রোরও আগের চেয়ে তাঁহার দিকে মনোযোগটা খুব বেশী; টিনার সম্বন্ধে ব্যবহারও খুব সতর্ক। মিস্ আশারেরও টিনার প্রতি অসীম দয়া। দিনগুলিও বেশ পরিষ্কার ছিল। রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ার ধুম পড়িয়া যাইত, সন্ধ্যায় প্রত্যহই ভোজ। লাইব্রেরী-ঘরে স্যর ক্রিষ্টফার ও লেডি আশারের পরামর্শটাও বোধ হয় বেশ পাকিয়া উঠিতেছিল; আর দিন পনের পরেই বোধ হয় ভাবী কুটুম্বিনীরা বিদায় লইবেন; তাহার পর ফার্লেতে বিবাহের আয়োজন লাগিয়া যাইবে। জমিদার মহাশয় দিনদিনই তাজা হইয়া উঠিতে-ছেন। যাহারা তাঁহার মতলবের উপকরণরূপে দেখা দেয় সে-সব লোকদের প্রতি তাঁহার খুব সুনজর। নিজের ইচ্ছাশক্তি ও উজ্জ্বল আশার আলোকে তিনি তাহাদের মধ্যে কোন মন্দ দেখিতে পান না। ভবিষ্যৎ মোহিনী-মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায়। তাই মিস্ আশারের মধ্যে সুগৃহিণী ও মিষ্টস্বভাবা বধূর উপাদানই কেবল তাঁহার চক্ষে পড়িল। মিস্ আশার বাহিরের সকল বিষয়ে সুরুচির পরিচয় দিয়া স্যর ক্রিষ্টফারের স্নেহ জয় করিয়া লইলেন। লেডি শেভারেলের মধ্যে কোনো ভাবেরই উচ্ছ্বাস কথনো দেখা যায় না; তিনি শান্তভাবে থাকেন; মুখে সন্তোষের ভাব ফুটিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হয়। তাহার উপর রমণীর সমালোচনা রমণীরা একটু সূক্ষ্ম ভাবেই করিয়া থাকেন বলিয়া লেডি শেভারেলের মতটা অতখানি উপরে উঠিতে পারে নাই; সুন্দরী বিয়েট্রিসের স্বভাবটি তাঁহার বেশ উদ্ধত ও ঝাঁজালো বলিয়াই সন্দেহ হইত। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও শ্রদ্ধা রাখা সকল স্ত্রীর উচিত বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং আত্মসংযমের গুণে তিনি কোনো-দিন আর-কোনো অনুচিত ভাবকে প্রকাশ পাইতেও দেন নাই বলিয়া অ্যান্টনির উপর বিয়েট্রিসের কর্ত্তৃত্বের ভাবটাও তাঁহার চোখে মোটেই ভাল ঠেকিত না। যে-রমণী সাধ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে শিখিয়াছে, অধীনতার গৌরবেই তাহার গর্ব্ব; রমণীর দাম্ভিকতা তাহার চোখে নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। লেডি শেভারেলের সমালোচনাটা অবশ্য তাঁহার মনের বাহিরে প্রকাশ্যে কথনো দেখা দেয় নাই। তাঁহার চিন্তার অন্তঃপুরেই তাহার বাস। কথাটা বিশ্বাস-যোগ্য না মনে হইলেও

এটা সত্যই, যে, ভাষার আশ্রয় লইয়া নিজের সমালোচনার জোরে তিনি স্বামীর মনের সুখটি হরণ করেন নাই।

টিনার খবর কি? শরতের নির্ম্মল আকাশের উজ্জ্বল আলোক যখন এই পরিবারের আনন্দে শুভ্র হাসি ছড়াইতেছিল, টিনার দিন তখন কি ভাবে কাটিতেছিল? মিস আশারের ব্যবহারে এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনের সে কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইত না। তাঁহার সদয় ব্যবহারে ও হাসিমুখের কৃপাবর্ষণে টিনার অসহ্য যন্ত্রণা হইত, ইচ্ছা করিত, রাগিয়া চটিয়া দুই কথা শুনাইয়া দেয়। সে ভাবিত, "অ্যাণ্টনি হয়ত ওকে বলেছে, বেচারী টিনাকে একটু দয়া কোরো।" এ অসহ্য অপমান! তাহার বোঝা উচিত ছিল যে টিনার পক্ষে মিস্ আশারের উপস্থিতিটুকুই যন্ত্রণাদায়ক, মিস্ আশারের মিষ্ট হাসিতে তাহার অঙ্গ জ্বলিয়া যায়; মিস্ আশারের মিষ্ট কথায় তাহার গায়ে যেন বিষাক্ত হুল ফুটায়, সে পাগল হইয়া উঠে। আর অ্যাণ্টনি—সেদিন সকাল বেলাকার ব্যাপারটা ধরা পড়িয়া যাওয়াতে—সে যে টিনার প্রতি ওটুকু ভালবাসা দেখানোর জন্য অনুতাপ করিতেছে তাহা তো স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। বিয়েট্রিসের সন্দেহ দূর করিবার জন্য সে আজকাল টিনার সঙ্গে নিতান্ত পরের মতন উদাসীন ভাবে একটু ভদ্রতা করিয়াই সরিয়া পড়ে। তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া আছে এই বিশ্বাসেই তো বিয়েট্রিস টিনার প্রতি অত অপার কৃপা বর্ষণ করে। বেশ, তাহাই হউক! এই-রকম হওয়া উচিতও বটে। টিনার ত অন্য-রকম ইচ্ছা করা উচিত নয়। কিন্তু যাহাই হউক, তবু একথা স্বীকার না করিয়া যে সে পারে না,—অ্যাণ্টনি বড় নিষ্ঠুর। টিনা কখনো অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিত না। অমন করিয়া ভালবাসাইয়া—অত মিষ্ট কথা বলিয়া, অত আদর সোহাগ দেখাইয়া—আজ নিষ্ঠুরের মতন এমন ব্যবহার করিতেছে যেন অতীতে এসব কিছুই ঘটে নাই। সে যে তাহাকে অমৃত বলিয়া বিষ পান করাইয়াছে, তখন তা' বড়ই মধুর লাগিয়াছিল—কিন্তু আজ বিষ যখন তাহার সমস্ত শরীরে রক্তের অণু-পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছে, তখন নিষ্ঠুর সে তাহাকে অসহায় ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সারাদিন বুকের মধ্যে এই ঝড় পুষিয়া দুঃখিনী বালিকা রাত্রে একাকী আপনার নির্জ্জন ঘরে আশ্রয় লইত। রুদ্ধ ঝড় তাহাকে দলিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে অর্দ্ধেক রাত্রি ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইত। কঠিন শীতল ভূমি ছিল তাহার শয্যা, শ্রান্তি ও অবসাদ তাহার সঙ্গী। তাহার একলার দুঃখের কথা ত কোনো প্রাণীকে শুনাইবার জো ছিল না, তাই স্তব্ধ উৎকর্ণ রাত্রিকেই সে তাহার দুঃখের গাথা শুনাইত। তাহার একমাত্র সান্ত্বনা নিদ্রা আসিয়া অবশেষে দুঃখিনীকে কোলে টানিয়া তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিত। রাত্রে দুঃখ নিবেদন করিয়া প্রতিদিন প্রভাতের কাছে সে যে শান্তির প্রতিদান পাইত, তাহাই তাহাকে সারাদিন চালাইয়া লইত।

তরুণ কোমল দেহগুলি যে কত দীর্ঘদিন ধরিয়া গোপন দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কোনো মানুষের মমতা-মাখা চক্ষেই তাহাদের সংগ্রামের চিহ্ন ধরা পড়ে না। টিনার চেহারা স্বভাবতই একটু দুর্ব্বল ধরণের, গায়ের রংও তাহার ম্লান, ধরণধারণও শান্ত চুপ্‌চাপ। কাজেই তাহার বেদনার কি অবসাদের কোনো চিহ্ন বাহিরে সহজে ধরা পড়িবার নয়। একমাত্র গানটাতেই তাহার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিত, কিন্তু সেদিকে তাহার কোনো শক্তিক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যায় নাই। এটা যে কেমন করিয়া হইত, তাহা সে নিজেই অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। দুঃখে ভাঙিয়াই পড়ুক কি রাগে জ্বলিয়াই মরুক গানে তাহার অরুচি হইত না। অ্যাণ্টনির ঔদাসীন্যে যখন বুক ফাটিয়া কান্না আসিত, কিম্বা মিস্ আশারের অযাচিত দয়ায় রাগে যখন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত, তখনও গান তাহার দুঃখ-হরণ করিয়া হৃদয় জুড়াইয়া দিত। হৃদয়মন পূর্ণ করিয়া মধুর গম্ভীর স্বরলহরী উঠিয়া যেন তাহার হৃদয়ের সকল ব্যথা মুছিয়া লইত, পাগল-করা সকল উন্মাদনা ঘুচাইয়া দিত।

কাজেই লেডি শেভারেলের চক্ষে টিনার কোনো পরিবর্ত্তনই ধরা পড়ে নাই। একমাত্র মিঃ গিল্‌ফিল মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতেন যে জ্বরের অগ্রদূতের মূর্ত্তি ধরিয়া

তাহার গাল দুটিতে রক্তের ঢেলার মতন লাল ছাপ দেখা দিতেছে, চোখের কোলে ঘন হইয়া কালি পড়িতেছে, অমন সুন্দর চোখের দৃষ্টিও যেন কেমন উদাস উদাস, স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল আভা আর তাহাতে নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মন কিসের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিত।

কিন্তু বাহিরে যেটুকু দেখা দিয়াছিল, সে ত কিছুই নয়। প্রতি রাত্রির এই প্রবল উত্তেজনা, এই আকুল ক্রন্দন, এর চেয়ে অনেক গভীর দুঃখের সৃষ্টি করিতেছিল।

(১১)

সে দিন রবিবার। সকালবেলাই বৃষ্টি নামিয়াছে। তাই এবার আর গির্জ্জায় যাওয়া হইল না। মিঃ গিল-ফিলের সন্ধ্যায় একবার কাজ আছে, সকালে বাড়ীর মন্দিরের কাজটাও আজ তিনিই করিবেন।

সকাল এগারটার সময় উপাসনা। ঠিক তার দু'-চার মিনিট আগেই টিনা ড্রয়িংরুমে আসিয়া ঢুকিল; আজ তাহার মুখখানা যেন কালীবর্ণ হইয়া গিয়াছে, এমন চেহারা দেখিয়া লেডি শেভারেল ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "টিনা, তোমার হয়েছে কি?" টিনা বলিল, "মাথাটা আজ বড় বেশী ধরেছে।" লেডি শেভারেল আর তাহাকে কিছুতেই উপাসনায় যোগ দিতে দিলেন না; যত্ন করিয়া ঢাকাঢুকি দিয়া আগুনের কাছে একটা সোফায় তাহাকে শোয়াইয়া হাতের কাছে একটা ধর্ম্মপুস্তক রাখিয়া বিদায় লইলেন। ঠিক্ সময়োপযোগী বই বটে। তবে টিনার মনের অবস্থা অনুকূল হওয়াও ত চাই!

বইখানা মানসিক রোগের খাসা ঔষধ। তবে দুঃখের বিষয়, টিনার বেলা ঠিক খাটে না। টিনা বইখানা কোলে করিয়া দেয়ালের গায়ে টাঙানো সেকালের সেই প্রসিদ্ধ স্যর অ্যান্টনির স্ত্রীর ছবিখানার দিকে বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া উদাসভাবে চাহিয়া রহিল। ছবিখানার দিকে তাহার চোখ ছিল বটে, কিন্তু মন ছিল না। সুখী রমণী যেমন করিয়া দুঃখিনী দুর্ব্বলা ভগিনীর দিকে একটু সদয় ঔদাসীন্য ও একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকায়, তুলিতে আঁকা এই সুন্দরী গৌরীও যেন তেমনি করিয়া টিনার দিকে চাহিয়া ছিলেন।

টিনা তখন আসন্ন ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, অ্যান্টনির বিবাহের কথা আর নিজের দুঃখের কথা।

টিনা ভাবিতেছিল, "তার আগে খুব একটা বড়-রকম অসুখ করে যদি আমি মরে যাই তা হ'লে বেশ হয়। অসুখের সময় বেশ কোনো ভাবনা থাকে না। প্যাটির যখন খুব অসুখ তখন ত তাকে খুব সুখী মনে হ'ত। যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল, তার বোধ হয় সে তখন কোনো খোঁজখবরই রাখ্‌ত না। ফুলের গন্ধে তার বড় আনন্দ ছিল, তাই আমি তার জন্যে ফুল নিয়ে নিয়ে যেতাম। হা ভগবান্, আমার কি কিছু ভাল লাগতে নেই! যদি আর-কিছুর কথা ভাব্‌তে পারতাম—! মনের এই অসহ্য জ্বালাটা যদি জুড়োয় তা হ'লেই বাঁচি; সুখী না হয় নাই হলাম। আমার কিছু চাই না, স্যর ক্রিষ্ট-ফার আর লেডি শেভারেল যাতে খুসী হবেন আমি তাই করব। কিন্তু ওই দারুণ হিংস্র রাগটা যখন আমায় পেয়ে বসে তখন যে আমার জ্ঞান বুদ্ধি কিছু থাকে না। কি করব ভেবে পাই না; মনে হয় পৃথিবীটা যেন পায়ের তলা থেকে সরে গেছে। মাথা আর বুকের ভিতর কিসের একটা তাণ্ডব নৃত্য কেবল বুঝতে পারি, ভীষণ একটা কিছু করে বস্‌বার জন্যে মনটা যেন পাগল হয়ে ওঠে। উঃ, আমার মতন এমন ভীষণ ইচ্ছা বোধ হয় আর কারো কখনো হয়নি। আমার মনটা বোধ হয় পাপে পূর্ণ। কিন্তু ভগবান্ নিশ্চয় আমায় দয়া করবেন; আমার যে কি দুঃখ সইতে হচ্ছে তিনি ত তা জানেন।"

এমনি করিয়া কতক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ ঘরের বাহিরে কাহার গলার স্বর শুনিয়া টিনার চমক্ ভাঙিল, দেখিল উপদেশের বইখানা কোলের উপর হইতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। নীচু হইয়া বইখানা তুলিতে গিয়া দেখে পাতাগুলো মুড়িয়া গিয়াছে; ভয়ে মুখখানা কেমন করিয়া খাড়া হইয়া বসিতে-না-বসিতে লেডি আশার বিয়েট্রিস আর অ্যান্টনি আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। মুখে সকলেরি হাসি, চলাফেরাতেও বেশ একটা চটপটে ভাব? মন্দিরের উপদেশ শেষ হইয়া গেলে শান্তি ও মুক্তির যে চিহ্নগুলি শ্রোতাদের মুখে ফুটিয়া ওঠে, তাঁহাদের মুখেও তাহার আভাস।

লেডি আশার ঘরে ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি টিনার পাশে আসিয়া বসিলেন। একচোট ঝিমাইয়া তিনি বেশ তাজা হইয়া উঠিয়াছেন; এখন খানিকটা কথা বলিয়া লইতে পারিলে যেন বাঁচেন।

"হ্যাঁ, তারপর মিস্ সার্টি, এখন কেমন আছ?—একটু ভালই তো, দেখাচ্ছে। তুমি একলাটি চুপ্ করে বসে আছ ভেবে এলাম। এই মাথা ধরাটরা ওসব আর কিছু নয়, সব দুর্ব্বলতার ফল। নিজের ওপর বেশী চাপ দিও না, আর একটু তেতোটেতো খেয়ো। তোমার বয়সে আমারো এমনি মাথা ধরা রোগ ছিল, বুড়ো স্থামসন ডাক্তার মাকে বলতেন, 'দেখুন ঠাকরুণ, আপনার মেয়ের রোগের গোড়া হচ্ছে দুর্ব্বলতা। স্থামসন ডাক্তার লোকটি ভারি মজার ছিলেন। যাক্, আজ সকালে উপদেশটা যদি শুনতে—চমৎকার! বাইবেলের সেই দশকুমারীর কথা বলছিলেন; পাঁচজন ছিল বোকা, আর পাঁচজন বুদ্ধিমতী জানই তো। মিঃ গিলফিল সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। ভারি চমৎকার ছেলেটি কিন্তু। যেমন, শান্ত স্বভাব তেমনি মিষ্টি ব্যবহার, আবার তাস খেলাতেও হাত বেশ। আহা, আমাদের ফার্লেতে যদি থাকতেন। স্থর জন বোধ হয় একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতেন; তাস খেলার সময় এঁকে কেউ রাগ্‌তে দেখে না, তাঁরও এতে খুব ঝুঁক ছিল। আমাদের ওখানের পুরোহিতটা ভারি খিট্‌খিটে। খেলতে বসে টাকা হারলে চটে অস্থির হয়। পাদ্রী মানুষের টাকা গেলে চটাটা তো আমার মোটেই উচিত মনে হয় না; তোমার মনে হয় নাকি? কি বল?"

মিস্ আশার মাঝে পড়িয়া মুরুব্বিআনা চালে বলিয়া উঠিলেন, "আহা মা, কি যে কর! দোহাই তোমার, রাজ্যের বাজে প্রশ্ন করে বেচারী টিনাকে হায়রান করে তুলো না।—তোমার এখনো মাথাটা ভারি ধরে রয়েছে, না ভাই টিনা? আমার এই ওষুধের শিশিটা নিয়ে পকেটে রাখ। মাঝে মাঝে ওটাতে আরাম পাবে বোধ হয়।"

টিনা বলিল, "না, ধন্যবাদ, আপনারটা কেড়ে নেবো না।"

"না ভাই, সত্যি বলছি, আমি ওটা ব্যবহার করি না; তোমায় নিতেই হবে।" মিস্ আশার জেদ করিয়া টিনার হাতে সেটা গুঁজিয়া দিতে গেলেন। টিনার মুখখানা ঠিক সিঁদুরের মতন লাল হইয়া উঠিল। একটু বিরক্তভাবে শিশিটা ঠেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে; আমি ওসব কখনো ব্যবহার করি না। ওসব আমি মোটেই ভালবাসি না।"

মিস্ আশার আশ্চর্য্য হইয়া রূপার শিশিটা নিজের পকেটে রাখিলেন। গর্ব্বে এমন ঘা পড়াতে তাঁহার মুখখানা অন্ধকার; কথা একেবারে বন্ধ। অ্যান্টনি একটু ভয়ের সঙ্গেই ব্যাপারটা দেখিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দেখ, দেখ, বাইরে আকাশ কেমন পরিষ্কার হয়ে গেছে। খাবার আগে এখনো বেশ একপাক ঘুরে আসা যায়। এস বিয়েট্রিস, টুপি আর ক্লোকটা নিয়ে বেরিয়ে এস, আধঘণ্টাটাক বাঁধানো রাস্তাটায় বেড়িয়ে আসি।"

লেডি আশার বলিলেন, "হ্যাঁ, যাওন, আমিও যাই দেখি গিয়ে স্থর ক্রিষ্টফার বারান্দায় বেড়াচ্ছেন কি না।"

দরজাটা ভেজাইয়া মহিলাদুটি বাহির হইবা মাত্র অ্যান্টনি আগুনের দিকে পিছন ফিরিয়া টিনার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া আপত্তির সুরে বলিয়া উঠিল, "দেখ টিনা, একটু দয়া করে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা কোরো। তুমি মিস্ আশারের সঙ্গে বেশ অভদ্র ব্যবহার করেছ, তিনি এতে বেশ ব্যথা পেয়েছেন। একবার ভেবে দেখদিখি তোমার ব্যবহারটা তাঁর কাছে কি-রকম অদ্ভুত ঠেকেছে। এর কারণ তিনি ভেবেই পাবেন না।" একটু কাছে আসিয়া টিনার হাতখানা ধরিতে চেষ্টা করিয়া সে আবার সুরু করিল, "লক্ষ্মীটি টিনা, নিজের ভাল ভেবেই আমার অনুরোধটা রেখো, তাঁর আদরযত্নগুলো একটু ভদ্রভাবে নিয়ো। তিনি বাস্তবিক তোমার প্রতি খুব সদয়, তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হ'তে দেখলে আমিও সুখী হব।"

দুর্ব্বল রোগী যেমন ছোট একটি পাখীর পাখার ঝাপটেও চমকাইয়া উঠে, তেমনি অল্পেতেই ঘা খাওয়া যেন তখন টিনার রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; অ্যান্টনির কথাগুলি নিতান্ত নির্দ্দোষ হইলেও বোধ হয় সে চটিয়া উঠিত, এরকম হিতৈষী সাজিয়া আপত্তি করিতে আসা তো একেবারেই অসহ্য। সে তাহার যা' অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ত কথায় প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য একটুও

অনুতাপ না করিয়া আজ কিনা আবার হিতৈষী সাজিয়া বসিল। এ আবার এক নূতন অত্যাচার! এমন হিতৈষী সাজাই ত তাহার আস্পর্দ্ধা।

টিনা হাতখানা টানিয়া লইয়া রাগিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না, কাপ্তেন উইব্রো! আমি তো আপনাকে বিরক্ত করতে যাই না।"

"টিনা, অমন চটে উঠো না, আমার উপর অমন অবিচার কোরো না। তোমার জন্যেই ত আমার এত ভাবনা। তুমি যে আমাদের দু'জনের সঙ্গেই কি এক অদ্ভুত রকম ব্যবহার কর, মিস আশার তা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন। এতে আমায় যে কি মুস্কিলের অবস্থায় পড়তে হয়···আমি তাঁকে কি যে বলব তার ঠিক নেই।"

কথা শুনিয়া টিনা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে উঠিয়া পড়িয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি বলবে? বোলো যে আমি একটা বোকা হতভাগা মেয়ে, তোমায় ভালবেসে ফেলেছি, তাই তাঁর হিংসায় জ্বলে মরি; আর বোলো যে তুমি আমার সঙ্গে চিরকাল বন্ধুর মত ব্যবহার করে এসেছ, এক দয়া ছাড়া তোমার মনে আমার সম্বন্ধে আর কোনো ভাবেরই কখনো উদয় হয়নি। তাঁকে এই বোলো, তা হলেই তাঁর তোমার সম্বন্ধে আরো ভাল ধারণা হবে।"

বড় নিষ্ঠুর কঠিন বিদ্রূপ মনে করিয়াই টিনা কথাগুলি বলিয়াছিল; এ বিদ্রূপে যে সত্যের বিষ একবিন্দুও আছে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। ভাবিয়া বিচার করিয়া সে নিজেকে কোনো দিন অত্যাচারিত মনে করে নাই, আপনা হইতেই তাহার মনে এই ব্যথাটি জাগিয়া উঠিয়াছিল। ঐই বেদনার আড়ালে, ঈর্ষার উন্মাদনার আড়ালে, প্রতিহিংসার অদম্য ইচ্ছার আড়ালে, এই অসহ্য যন্ত্রণার আড়ালে এখনো লাঞ্ছিতার মনে স্বচ্ছ শিশিরকণার মত অ্যান্টনির প্রতি বিশ্বাস উজ্জ্বল হইয়া ছিল। এখনো সে এইসকল চিন্তার জন্য মনে মনে নিজেকেই দোষী করিত, তাহার এখনো এই বিশ্বাস ছিল যে অ্যান্টনি যাহা করিতেছে তাহা ভালর জন্যই। এখনো হৃদয়ের প্রতিবিন্দু প্রেম বিদ্বেষের ইন্ধন জোগাইতে যায় নাই। টিনা মনে করিত, বাহিরে দেখিলে অ্যান্টনিকে তাহার সম্বন্ধে যতখানি উদাসীন মনে হয় বাস্তবিক সে তা' নয়, মনে মনে এখনো নিশ্চয় তাহার টিনার উপর টান আছে; প্রেমে নিষ্ঠার অভাবের চেয়েও যে জিনিষটায় রমণীর বেশী ঘৃণা, অ্যান্টনিকে সেই কঠিন অপরাধে অপরাধী মনে করা টিনার পক্ষে এখনো অসম্ভব। রাগে পাগল হইয়া উঠিয়া এর চেয়ে বড় এর চেয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর কিছু সে খুঁজিয়া পায় নাই বলিয়াই একথা বলিয়াছিল।

সে যখন ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাগে উত্তেজনায় তাহার ছোট শরীরখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, ঠোঁট দুখানায় রক্তের লেশ মাত্র নাই, চোখ দুটা জলজল করিতেছে। হঠাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল; ফুটন্ত ফুলের মত হাসি ছড়াইয়া ইন্দ্রাণীর মত সুন্দরী মিস্ আশার নূতন সাজে সাজিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তরুণী সুন্দরী যখন মনে করেন যে তাহার উপস্থিতিতে কাহারো মনে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইবে, তখন সে এমনি মনভুলানো হাসি হাসিয়াই দেখা দিতে আসে। টিনার দিকে চোখ পড়িতেই বিস্ময়ে তাহার মধুর হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল; রাগিয়া উঠিয়া সে সন্দিগ্ধভাবে কাপ্তেন উইব্রোর দিকে তাকাইল, তাহার মুখে তখন কেমন একটা শ্রান্তি ও বিরক্তির ভাব।

"কাপ্তেন উইব্রো, আপনি বোধ হয় এখন ব্যস্ত আছেন? আমি তবে একলাই বেড়াতে যাই।"

অ্যান্টনি ছুটিয়া তাঁহার দিকে আসিয়া বলিল, "না, না, এই যে, চল আমি আসছি।" তাহার পর মিস আশারকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বেচারী হতভাগিনী টিনা তখন একলা পড়িয়া আপনার উন্মত্ত ব্যবহারে আপনি লজ্জায় ঘৃণায় মরিতেছিল।

(১২)

কাঁকরবাঁধান পথের উপর আসিয়া পড়িয়াই মিস আশার বলিল, "তোমাদের অভিনয়ের এর পরের দৃশ্যটা কি হ'বে জানতে পারি কি? পরের দৃশ্যটা সম্বন্ধে আগে থেকে কিছু জানা থাকলে বেশ লাগে।"

কাপ্তেন উইব্রো একেবারে চুপ। সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই-সব ব্যাপারে তার জ্বালাতন ধরিয়া গিয়াছিল। মানুষের জীবনে একএকটা এমন মুহূর্ত্ত

আসে, যখন সে ক্রুদ্ধ রমণীর কোনো কথার আর প্রতিবাদ করিতে চাহে না; নীরবতাই তাহার একমাত্র সম্বল। অ্যাণ্টনি মনে মনে ভাবিতেছিল, "দূর-কর-ছাই, আর পারা যে দায় হ'ল! এইবার আবার উল্টা দিকে গুঁতো খাই!" সে দূরে দিক্‌চক্রবালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, ভ্রূদুটা কুঞ্চিত, মুখখানায় ভয়ানক বিরক্তির ভাব। মিস আশার তাহাকে এত বিরক্ত হইতে কখনো দেখে নাই।

দুই তিন মিনিট চুপ করিয়া মিস আশার আবার উদ্ধতভাবে বলিতে লাগিল, "কাপ্তেন উইব্রো, আপনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে এই ঘটনার আমি একটা ভালোরকম জবাবদিহি চাই।"

নিজেকে সামলাইয়া লইবার জন্য একটা প্রবল চেষ্টা করিয়া অ্যাণ্টনি বলিল, "বিয়েট্রিস, আমি তোমায় আগেই যা বলেছি, তার বেশী আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি আশা করেছিলাম, যে, তুমি আর এ বিষয়ে কথা তুলবে না।"

"তুমি যা কৈফিয়ৎ দিয়েছ, সেটা মোটেই সন্তোষজনক নয়। আমার কেবল এইটুকু বলবার আছে যে, তোমার সম্বন্ধে মিস সার্টির চালচলন যে-রকম, তাতে তার অধিকারটা তোমার ও আমার এই সম্পর্কটার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। আর সে আমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করে, তার চেয়ে বেশী অপমান আর কিছুতে হ'তে পারে না। এ-রকম অবস্থায় আমি কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকব না; আর মাকে এর কারণগুলোও স্যর ক্রিষ্টফারকে বলতে হবে।"

অ্যাণ্টনির বিরক্তি ভয়ে পরিণত হইল; সে বলিয়া উঠিল, "বিয়েট্রিস, দয়া করে শান্ত হও, এ-রকম ব্যাপারে একটু বুঝেসুজে চলতে চেষ্টা করো। আমি জানি এ বড় কষ্টকর ব্যাপার, কিন্তু তুমি যে টিনা বেচারীর কোনো অমঙ্গল চাও না সে কথাও আমি নিশ্চয় জানি, মামার কোপে তাকে ফেলতে তুমি নিশ্চয় চাও না। একবার ভেবে দেখ, বেচারার অসহায় অবস্থাটা। সে যে নিতান্তই পরের অনুগ্রহের ভিখারী।"

"তুমি যে খুব চালাক লোক তা' বেশ বুঝতে পারছি; আর ছল করে এড়াতে হবে না। ওসব কথায় আমায় ভোলাতে পারবে না। তুমি যদি মিস্ সার্টির কাছে প্রেমের ভান না করতে যেতে, যদি তাকে ভালবাসা না দেখাতে, তবে সে কখনো তোমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করতে সাহস পেত না। আমার ত মনে হয়, আমার সঙ্গে তোমার বাগ্‌দানটা সে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়ই মনে করে। আমায় মিস্ সার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী করে দেওয়ার জন্যে আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। কাপ্তেন উইব্রো, তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ।"

"বিয়েট্রিস, আমি শপথ করে বলছি যে টিনা আমার প্রতি খুব অনুরক্ত বলে' আর মেয়েটিও বেশ বলে' আমি তাকে স্বভাবতই একটু স্নেহের ও দয়ার চক্ষে দেখি, আমার কাছে সে তার বেশী আর কিছু নয়। কালই যদি গিল্‌ফিলের সঙ্গে তার বিয়ে হ'য়ে যায় তাহ'লে আমি খুব খুসী হই। আমি যে তাকে ভালবাসি না, এটা বোধ হয় তার খুব বড় প্রমাণ। অতীতের কথা বল্‌তে হ'লে বলি, হ্যাঁ, হয়ত আমি মাঝে-মাঝে তাকে একটু বেশী টান দেখিয়েছি, কিন্তু সেটার অর্থ ও ভুল বুঝেছে আর জিনিষটাকেও একটু বাড়িয়ে দেখেছে। এমন কোন্ পুরুষমানুষ আছে যে অমন একটু-আধটু না করে থাকতে পারে?"

"কিন্তু তার ওরকম ব্যবহারের ভিত্তি কি? আজ সকালে কাঁপতে-কাঁপতে মুখ-চোখ শাদা করে ও তোমায় কি এমন কথা বল্‌ছিল?"

"জানি না। খিট্‌খিটে স্বভাবের জন্যে আমি ওকে কি একটা বলছিলাম। ইটালীর রক্ত কি না মেয়ের; কোন্ কথায় যে কি ভাবে চটে ওঠে বলা যায় না। ও মেয়ে একেবারে রণচণ্ডী; দেখতেই অমন শান্ত।"

"কিন্তু ওর ব্যবহার যে কি-রকম নির্লজ্জ আর অভদ্র, তা' ওর জানা উচিত। বল্‌তে কি, লেডি শেভারেল যে ওর মুখেমুখে উত্তর আর ঠ্যাকার দেখ্‌তে পান্ না, ভেবে আমি অবাক্ হয়ে যাই।"

"বিয়েট্রিস, দোহাই তোমার, তাঁর কাছে এসব কথার এতটুকু উল্লেখ কোরো না। মামীর কি-রকম সব বিষয়ে কড়াকড়ি দেখেছ ত। যে পুরুষ তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেনি তাকে যে কোনো মেয়ে ভালবাস্‌তে পারে, এমন তাঁর মাথায় ঢোকেই না।"

"আচ্ছা, আমি মিস্ স ...ে নিজেই বুঝিয়ে দেবো যে তার ব্যবহারটা আমি ভাল করেই লক্ষ্য করেছি। এটা তার প্রতি দয়াই হবে।"

"না, লক্ষ্মী, ওতে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হবে না। ওকে আপন মনে থাক্‌তে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল ওষুধ। ওটা ক্রমে কেটে যাবে। আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস অল্পদিনের মধ্যেই ওর গিল্‌ফিলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। বালিকার মোহ অল্পেতেই একজনের উপর থেকে আর-একজনের উপর গিয়ে পড়ে। ওরে বাপরে! বুকটা যা ধড়াস্-ধড়াস্ করতে সুরু করেছে। ভাল হওয়া ত দূরে থাক্ দিন-দিন ধড়ফড়ানি বেড়েই চল্‌ল।"

টিনার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা এইখানেই থামিয়া গেল। কাপ্তেন উইব্রো সেইসঙ্গেই বেশ একটা পরিষ্কার ফন্দি আঁটিয়া রাখিলেন। তার পরদিন লাইব্রেরী-ঘরে স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গে নিজের বিবাহ সম্পর্কীয় কথা বলিতে গিয়াই ফন্দিটা কাজে লাগাইবার পথও হইয়া গেল।

দরকারি কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবার পর অ্যাণ্টনি দুই পকেটে হাত দিয়া দেয়ালের গায়ে আলমারীতে সাজানো বইগুলির নাম দেখিতে দেখিতে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর পাইচারী করিতেছিল। হঠাৎ কি একটা কথা মনে আসাতে একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল, "ভাল কথা, টিনা আর গিল্‌ফিলের বিয়েটা কবে হচ্ছে? বেচারা মেনার্ডের অবস্থা দেখ্‌লে দুঃখ হয়। আমাদের বিয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁদেরটাও হয়ে যাক না কেন? টিনার সঙ্গে ওর বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে বলেই ত মনে হয়।"

স্যর ক্রিষ্টফার বলিলেন, "আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল, ক্রিচ্‌লি বুড়ো মরার পর কাজটা হয়; বুড়ো ত আর বেশী দিন বাঁচবে না। তাহ'লে মেনার্ডের সংসারে প্রবেশ আর পাদ্রীর পদ লাভ দুটোই একসঙ্গে হয়। তা যাক, ওটা কোনো কাজের কথাই নয়। বিয়ে হয়ে গেলেই যে ওদের এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে এমন কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। আমার ক্ষুদে বাঁদরী ত এখন দেখ্‌ছি বড়-সড়ই হয়ে উঠেছে। বেরাল-ছানার মত ছোট্ট একটা খোকা কোলে ক্ষুদে গিন্নিটিকে খাসা দেখাবে।"

"কিছুর অপেক্ষায় কাজটা ফেলে রাখা আমার মোটেই ভাল বলে মনে হয় না। আপনি যদি টিনাকে কিছু দিয়ে যেতে চান, তাহ'লে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার কাজে সাহায্য করতে রাজি আছি।"

"বাবা, তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। তা মেনার্ড তো নিজেই যথেষ্ট পাবে। তার উপর আমি যা শুনেছি—কথাটা ঠিকই শুনেছি—তাতে সে নিজের হাতে উপার্জ্জন করে টিনাকে সুখে রাখতে চায় বলেই মনে হয়। যাক্, তুমি আমার মাথায় কথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে ভালই করেছ; আগে একথা ভাবিনি বলে নিজের উপরই রাগ হচ্ছে। এই গাধা ছেলেটার আর বিয়েট্রিসের কথা ভাবতে-ভাবতে এমনি মজে গিয়েছিলাম যে বেচারা মেনার্ডকে একেবারে ভুলেই মেরে দিয়েছি। বয়সে তো সেই বড়—বাড়ীর কর্ত্তা হয়ে বসবার সময় এখন বেশ হয়েছে।"

স্যর ক্রিষ্টফার চুপ করিয়া একবার নস্যের কৌটাটার সদ্ব্যবহার করিলেন, তাহার পর প্রায় নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়ীর সব কটা কাজ এক-সঙ্গে সেরে নিলে বেড়ে হবে।" অ্যাণ্টনি তখন দূরে এক কোণে দাঁড়াইয়া গুনগুন করিয়া কি একটা সুর গাহিতে ব্যস্ত।

সেদিন সকালেই মিস্ আশারের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার সময় অ্যাণ্টনি কথায় কথায় বলিল যে, স্যর ক্রিষ্টফার টিনার বিয়েটা তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন, সেও কাজটা আগাইয়া দিতে যথাসম্ভব সাহায্য করিবে। টিনার পক্ষে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হইতে পারে না—সে তাহার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত,—সে কি আর বোঝে না!

স্যর ক্রিষ্টফারের মাথায় একটা কথা আসিলে হয়! তৎক্ষণাৎ সেটা না সারিয়া ফেলিলে তিনি বাঁচেন না। মনস্থির করিতেও তিনি যেমন তৎপর, কাজেও তেমনি চট্‌পটে। দুপুরবেলা খাওয়ার পরই মিঃ গিল্‌ফিলকে বলিলেন, "মেনার্ড, আমার সঙ্গে একবার লাইব্রেরীতে এস দেখি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

ঘরে ঢুকিয়া দুজনে বসিবামাত্রই স্যর ক্রিষ্টফার নস্যের কৌটাতে একটা টোকা দিয়া, যেন হঠাৎ কি একটা

সুখবর দিতে যাইতেছেন এমনি ভাবে হাসিয়া সুরু করিলেন, "বাবা, মেনার্ড, এই শরৎকালটা কাট্‌বার আগেই বাড়ীতে দুটি সুখী দম্পতির প্রতিষ্ঠা করলে হয় না? একজোড়ার চাইতে সেই ত ভাল। কি বল?"

এক চিম্‌টি নস্য লইয়া এক মুহূর্ত্ত থামিয়া একটু দুষ্টু-দুষ্টু হাসিয়া তিনি আবার খুব টানা সুরে বলিলেন, "কি বল হে?"

মেনার্ডের মুখখানা শাদা হইয়া উঠিতেছিল। নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই একটু বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "আপনি কি বল্‌ছেন, বুঝতে পার্‌ছি না।"

"দূর ধূর্ত্ত কোথাকার! বুঝছনা বৈকি? অ্যান্টনির পরেই আমার হৃদয়ে কার স্থান তা তুমি বেশ উত্তম রূপেই জানো। অনেক কাল আগেই তো তোমার মনের কথা আমায় বলেছ, আজ আর নূতন করে কিছু বল্‌বার নেই। টিনা দিব্যি বড়সড় হয়ে উঠেছে, বেশ ক্ষুদে গিন্নিটি হবে এখন্। পাদ্রীর পদটা খালি হয়নি অবিশ্যি—তা' তাতে কিছু আসে যায় না। তোমাদের কাছে রাখতে পেলে আমরা কর্ত্তাগিন্নি দুজনেই খুব খুসী হব। আমাদেরি তো সুখ্‌টাতে বেশী। পাপিয়াটি হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে উড়ে গেলে আমাদের বড় কষ্ট হবে।"

মিঃ গিল্‌ফিলের অবস্থাটা যেমন মুস্কিলের, তেমনি কষ্টকর। স্যর ক্রিষ্টফার পাছে টিনার মনের অবস্থাটা জানিয়া কি বুঝিয়া ফেলেন সেই ভয়ে তিনি অস্থির; অথচ তাঁহার জবাবটাও ওই অবস্থার ভিত্তির উপরেই নির্ভর করিতেছে।

গলাঝাড়া দিয়া অনেক চেষ্টার পর তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপনার শুভকামনা আমি অন্তরের সঙ্গেই বুঝেছি—আপনি যে পিতার মতন আমার সুখের জন্য ব্যস্ত সেজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ—এসব বিষয়ে আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। কিন্তু আমার প্রতি টিনার মনের ভাব এমন নয় বোধ হয়, যাতে সে আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারে। এই আমার একমাত্র আশঙ্কা।"

"তুমি কি কোনো দিন তার মত জানতে চেয়েছিলে?"

"আজ্ঞে না; কিন্তু এসব কথা না জিগেস্ করলেও বোধ হয় জানা যায়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেখে দাও গিয়ে! ও বাঁদরী তোমায় নিশ্চয় ভালবাসে। তুমিই না তার প্রথম খেলার সাথী! তোমার আঙুল কেটে গেলে ও কি-রকম কাঁদত তা আমার এখনো মনে আছে। তা'ছাড়া তোমাকে সে সরবে না হোক নীরবে বাগ্‌দত্ত স্বামী বলে জানিয়েছে। জানোই ত, তোমার কথা তার কাছে বলতে হ'লে আমি ওটা ধরে নিয়েই সর্ব্বদা কথা বলি। তোমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে বলেই আমি ধরে নিয়েছি। অ্যান্টনিও তাই বলে। অ্যান্টনির ত বিশ্বাস, টিনা তোমায় ভালবাসে; আর দেখ, ওর অল্পবয়সীর চোখ,—এসব বিষয় পরিষ্কার দেখ্‌বারই ত কথা। আজ সকালে আমার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলছিল; তোমার আর টিনার প্রতি তার বন্ধুভাব দেখে আমি বেশ খুসীই হয়েছি।"

শরীরের সমস্ত রক্তটা যেন ছুটিয়া আসিয়া মিঃ গিলফিলের মুখখানা রাঙাইয়া দিল। দাঁতে দাঁতে পিষিয়া হাত দুটা শক্ত মুঠি করিয়া কোনো-রকমে তিনি নিজেকে সাম্‌লাইয়া রাখিলেন। রাগে তখন তিনি প্রায় অন্ধ। স্যর ক্রিষ্টফার তাঁহার মুখের চেহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তিনি অবশ্য অর্থটা বুঝিলেন উল্টা-রকমের। মনে করিলেন, টিনাকে পাওয়ার আশা ও না-পাওয়ার আশঙ্কার সংগ্রামেই তাঁহার এ মনোভাব। তিনি বলিলেন, "মেনার্ড, তুমি বড় বেশী লাজুক। তোমার মত ষণ্ডামার্কার অমন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া সাজে না। তুমি নিজে যদি তাকে নাই বল্‌তে পার, আচ্ছা আমার উপর ভার দিয়ে যাও।"

বেচারা মেনার্ড ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "স্যর ক্রিষ্টফার, আপনি যদি দয়া করে টিনাকে এখন এ বিষয়ে কিছু না বলেন, তবে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌ব। আমার মনে হয়, অসময়ে এমন প্রস্তাব করলে, সে আমার কাছ থেকে আরো দূরেই সরে যাবে।"

এই-রকম বিরুদ্ধ ভাবের কথায় স্যর ক্রিষ্টফারের মনটা একটু চটিয়া উঠিতেছিল। তিনি একটু তীব্র সুরে বলিলেন, "তোমার এই ধারণা ছাড়া টিনা তোমায় এখনো যথেষ্ট ভালবাসে না একথা বলার কোনো কারণ দেখাতে পার কি? না, শুধুশুধুই বকে যাচ্ছ?"

"সে আমাকে বিবাহ করার মত ভালবাসে না, আমার

এই দৃঢ় ধারণা। এর বেশী আমি কিছু বলতে পারি না।"

"তা হ'লে সে ধারণার কোনো মূল্যই নেই। আমি লোকের সম্বন্ধে যা ভাবি, সেগুলো সচরাচর ঠিক বলেই প্রমাণ হয়; টিনাকে যদি আমি নিতান্তই ভুল না বুঝে থাকি, তবে সে যে কেবল তোমাকেই স্বামীরূপে পাবার আশায় আছে, এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি। আমি যা ভাল বুঝি তাই করতে দাও। মেনার্ড, আমায় বিশ্বাস কর, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।"

আর বেশী কিছু বলিবার সাহস মিঃ গিলফিলের ছিল না। কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্কল্পের ফলে আবার কি হয় সেই ভয়েই তাঁহার প্রাণ কাতর। অ্যান্টনির উপর তাঁহার যে কি রাগ হইতেছিল বলা যায় না। টিনার ও নিজের দুঃখের কথা ভাবিয়াও তিনি কূল পাইতেছিলেন না। রাগে দুঃখে পাগল হইয়া তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। টিনা তাঁহাকে কি মনে করিবে? হয়ত সে ভাবিবে যে তিনিই স্যর ক্রিষ্টফারের প্রস্তাবের মূলে; অন্তত সায় দিয়াছেনও তো ভাবিতে পারে। এ বিষয়ে হয়ত যথাসময়ে টিনার সঙ্গে কোনো কথা বলার ভাগ্য তাঁহার ঘটিবেই না। যাহা হউক, একখানা চিঠি লিখিয়া পোষাক পরার ঘণ্টা পড়ার পর টিনার ঘরে দিয়া আসিলে বোধ হয় কাজ চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে হয়ত সে বেশী-রকম উত্তেজিত হইয়া পড়িবে; খাইতে আসিতে পারিবে না; সন্ধ্যাটাও অশান্তিতে কাটিবে। রাত্রে শুইতে যাইবার সময় দিয়া আসিলে হয়! মন্দিরে উপাসনার পর মিঃ গিলফিল কোনো-রকমে সুবিধা করিয়া টিনাকে ড্রয়িং রুমে লইয়া আসিয়া চিঠি-খানা দিলেন। টিনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া উপরে গিয়া সেখানা পড়িল,—

"স্নেহের টিনা,—স্যর ক্রিষ্টফার যদি তোমাকে আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলেন, সেটা আমার বলানো মনে কোরো না। তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত করবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বেশী জোর দিয়ে বলতে সাহস হলো না। হয়ত এমন সব প্রশ্ন তা'তে উঠ্‌ত, যার উত্তর দিতে গেলে তোমার দুঃখের ভরা বাড়ানো বই কমানো হ'ত না। স্যর ক্রিষ্টফারের কাছে যা শুনবে তার জন্য তোমার আগে থাক্‌তে একটু প্রস্তুত করে দিতে আর তোমার মনের প্রত্যেকটি ভাব যে আমার কাছে কতখানি পবিত্র তাই জানাতে এই চিঠি লিখ্‌লাম। আমার এ কথাটি তুমি নিশ্চয় আগেই বিশ্বাস করেছ। আমার জীবনের যে আশাটি সবচেয়ে প্রিয় তাও আমি ছেড়ে দিতে পারি; কিন্তু তোমার দুঃখের ভার আমি নিজের হাতে এক বিন্দুও বাড়াতে পারব না।

কাপ্তেন উইব্রোই স্যর ক্রিষ্টফারকে এমন সময় এ কাজ করাতে চেষ্টা করছে। সেই তাঁর মনে এ কথাটা তুলে দিয়েছে। স্যর ক্রিষ্টফারের কাছে পাছে আচম্‌কা কথাটা শোনো তাই আগে থেকে বলে রাখলাম। দেখ্‌ছ ত কাপুরুষটার হৃদয় কেমন! টিনা তুমি আমার সকলের প্রিয়, আমায় সকল কাজে বিশ্বাস কোরো। যত বড় দুঃখই আসুক না কেন, তোমার বিশ্বাসী বন্ধু মেনার্ডকে হঠাতে পারবে না।"

কাপ্তেন উইব্রোর কথাটা পড়িয়া টিনার বুকে এমন গভীর আঘাত লাগিয়াছিল যে নিজের আসন্ন বিপদের কথা ভাবিবার তাহার অবসরই হয় নাই। স্যর ক্রিষ্টফার যে কি বলিবেন, আর সেই বা কি উত্তর দিবে তাহা সে ভাবিলই না। এত বড় অন্যায়ের আঘাতে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; ভয়ের জন্য এক বিন্দু জায়গাও তখন তাহার মনে ছিল না। বিষাক্ত পোষাকের কবলে পড়িয়া মানুষ যখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করে, তখন আসন্ন মৃত্যুর ভাবনা কোথায় থাকে?

অ্যান্টনি এমন কাজ করিল!—ইহার কারণ স্যর কি হইতে পারে? তাহার ভালবাসাকে সে হেলায় তুচ্ছ করিয়া গিয়াছে; মিস্ আশারের সঙ্গে সম্বন্ধটা সহজ করিবার জন্য সে টিনার প্রতি তাহার সকল কর্ত্তব্য সকল ভাল-বাসাকে আজ এমন নীচ ভাবে বলি দিয়াছে! না, না। এ তাহার চেয়েও নীচ অভিপ্রায়ের কাজ! সে ইচ্ছা করিয়া গায়ে পড়িয়া বুঝি এই নিষ্ঠুর আঘাত দিয়াছে! টিনাকে সে কতখানি ঘৃণা করে, তুচ্ছ ভাবে, তাই বোধ হয় এই উপায়ে দেখাইয়াছে। অ্যান্টনি তাহাকে কোনো দিন ভাল বাসিয়াছিল, তাহার এই নির্ব্বোধের মত বিশ্বাসকে অ্যান্টনিই আজ এমনি করিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে।

টিনা ভাবিতেছিল, স্বচ্ছ একটি শিশিরবিন্দুর মত যে বিশ্বাস ও প্রেমটুকু এতদিনও উজ্জ্বল হইয়া ছিল, আজ

তাও শুকাইয়া গেল। আজ তাহার হৃদয় মরুভূমির মত শুষ্ক; তাহাতে সুধু বিদ্বেষ আগুনের মত জ্বলিতেছে। অ্যান্টনির উপর অবিচার হইবে মনে করিয়া ভয়ে এখন আর নিজের মনের প্রবল বিদ্রোহ চাপিয়া রাখিবার কোনো দরকার নাই। মেনার্ড ঠিক কথাই বলিয়াছে, সে আজ তাহাকে অনায়াসে পথের ধূলির মত তুচ্ছ করিয়াছে, এতদিন উদাসীনভাবে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে; আজ সে নীচের মত, নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করিয়াছে। টিনার রাগ করিবার তীব্র বেদনায় জ্বলিয়া উঠিবার কারণ যথেষ্টই আছে; এতদিন যে-সব চিন্তা তাহার অন্যায় বলিয়া মনে হইয়াছিল আজ তাহা ন্যায় বলিয়াই মনে হইতেছে।

বিকারগ্রস্ত রোগীর ভীষণ যন্ত্রণার মত এই চিন্তাগুলি যখন টিনার মনের ভিতরটা পুড়াইয়া বহিয়া যাইতেছিল, তখন সে একফোঁটাও চোখের জল ফেলে নাই। হাতদুটা শক্ত মুঠি করিয়া অভ্যাসমত অধীরভাবে সে পাইচারি করিতে লাগিল। আগুনের মত চোখ দুটা অস্থির ভাবে কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; সামনে পাইলেই বাঘিনীর মত ঘাড়ে গিয়া পড়িবে।

দাঁতে দাতে পিষিয়া বিড়বিড় করিয়া সে বলিতে লাগিল, "একবার যদি কথা বল্‌তে পাই ত বলব, যে, তাকে আমি ঘৃণা করি, অতি জঘন্য মনে করি, তাকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।"

হঠাৎ যেন কি একটা নূতন চিন্তা তাহার মাথায় আসিল, পকেট হইতে চাবিটা বাহির করিয়া একটা দেরাজ টানিয়া খুলিয়া ফেলিল; ছেলেবেলা হইতে কত স্মরণ-চিহ্ন সে এইখানে যত্নে রাখিয়াছিল। দেরাজের ভিতর হইতে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো একটি ছোট ছবি বাহির করিল, তাহার একধারে ছোট একটি আংটা, হারে গাঁথিয়া পরিবার জন্য উল্টা দিকে কাচের আড়ালে দুই গোছা চুল কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের গাঁট করিয়া বাঁধা। একটা গুচ্ছ কালোচুলের, আর একটি একটু লাল্‌চে সোনালি ধরণের। এক বৎসর আগে অ্যান্টনি গোপনে এইটি উপহার দিয়াছিল। টিনার জন্যই বিশেষ করিয়া ছবিখানা করানো। মাসখানেকের মধ্যে ছবিখানা সে বাহির করে নাই। অতীতকে উজ্জ্বল করিয়া চোখের উপর ধরিয়া কি লাভ! আজ সে ছবিটাকে বজ্রমুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া চিমনীর তলার পাথরটাতে ছুড়িয়া মারিল। এই বুঝি পায়ে দলিয়া জুতার ঠোক্করে সেটাকে গুঁড়া করিয়া নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকের শেষ চিহ্নটুকুও লোপ করিয়া দিবে?

না, তাহা নয়, টিনা ছুটিয়া ঘরের অন্যদিকে চলিয়া গেল। গিয়া দেখে তাহার এত যত্নের এত আদরের অমূল্যরত্নের আজ কি দশা! কতদিন সে এই ছোট ছবিটুকুকে আদরে সোহাগে চুম্বনে ভরাইয়া দিয়াছে; তাহার বিছানায় বালিশের তলায় কত রাত ইহার কাটিয়া গিয়াছে; ভোর না হইতেই সবার আগে এই মুখখানিই তাহার মনে জাগিয়া উঠিত। অতি সুখের সেই যে দিন-গুলি, আর ত ফিরিয়া আসিবে না, তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া এই যে একটিমাত্র চিহ্ন ছিল, তাহার আজ কাচখানা ভাঙিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা, চুলগুলি বাহিরে পড়িয়া, হাতীর-দাঁতের পাতলা পাতটাও ফাটিয়া গিয়াছে। টিনার সে তীব্র জ্বালা হঠাৎ নিবিয়া গেল; অনুতাপে সে আবার চোখের জলে ভাসিতে লাগিল।

বেচারী আস্তে আস্তে গিয়া এত আদরের ছবিটিকে কুড়াইয়া আনিল; আবার সযত্নে সাজাইয়া রাখিবার জন্য চুলগুলি খুঁজিতে লাগিল। ফাটিয়া চটিয়া ছবিখানা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। টিনা ম্লান মুখে তাহার অতীতের আদরের মূর্ত্তিটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। চুল আর ছবি দুই এখন আল্‌গা; কাচের ঢাকা ত আর নাই। কি আর করে, বেচারী অতি সন্তর্পণে একখানা কাগজে জড়াইয়া আবার সেই দেরাজের কোণে ছবিটি লুকাইয়া রাখিয়া দিল। আহা বেচারী! যাহা করিয়া ফেলিয়াছে তাহা ত আর ফিরিবে না। ভগবান যদি দয়া করিয়া আগেই মনটা নরম করিয়া দিতেন?

টিনা এইবার শান্ত হইয়া বসিয়া আবার মেনার্ডের চিঠি পড়িতে লাগিল। দুইবার পড়িল, তিনবার পড়িল, কিন্তু কি যে পড়িল তাহার ঠিক নাই। মনের উপর দিয়া এতক্ষণ যে ভীষণ ঝড় বহিয়াছে তাহা যেন টিনার বোধশক্তিটাও উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। কথাগুলির যে কি মানে তাহা আর সে এখন কিছুতেই মনে আনিতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পরে যেন সব পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গে দেখা করার কাল ত ঘনাইয়া আসিল। যাঁহার ভয়ে বাড়ীর সকলে তটস্থ, তাঁহাকে সে কি করিয়া চটাইয়া দিবে। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা যে টিনার পক্ষে অসম্ভব। কি যে করিবে তাহার ঠিক নাই। তাঁহার বিশ্বাস টিনা মেনার্ডকে ভালবাসে; কথায় বার্ত্তায় সর্ব্বদাই সেটা একেবারে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া রাখেন। টিনা তাঁহাকে কি করিয়া বলিবে যে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন? সে আর কাহাকেও ভালবাসে কি না যদি জিজ্ঞাসা করেন? স্যর ক্রিষ্টফার রাগিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন, এ দৃশ্য টিনা কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারে না। তিনি যে চিরকাল তাহাকে হাসিমুখে কাছে ডাকিয়াছেন। টিনা ভাবিল, তাহার ব্যবহারে তাঁহার না জানি কত কষ্টই হইবে। স্বার্থমাখা ভয়ের ব্যথা কাটিয়া গিয়া স্নেহের ব্যথার উদয় হইল। নিঃস্বার্থ অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। স্যর ক্রিষ্টফারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় যে তাহার প্রাণ পূর্ণ! এই বেদনাভরা কৃতজ্ঞতাই তাহাকে মিঃ গিল-ফিলের ভালবাসা ও মহৎ হৃদয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিল।

"আহা মেনার্ড কি-রকম ভাল! তাহার অমূল্য দানের তুচ্ছ প্রতিদানও আমি করতে পারিনি। তার এ ঋণের বোঝা যদি ভালবাসা দিয়ে শোধ করতে পারতাম!—কিন্তু সে যে অসম্ভব—আর আমি কোনো মানুষকে ভালবাসতে পারব না। কোনো কিছুর দিকেই আমার মন আর যেতে পারবে না। হৃদয় যে ভেঙে গেছে!" (ক্রমশ)

শ্রীশান্তা দেবী।

স্বরলিপি

এই ত ভালো লেগেছিল
আলোর নাচন পাতায় পাতায়,
শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়া
এই ত আমার মনকে মাতায়।

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোট মেয়ে ধূলায় বসে
খেলার ডালি একলা সাজায়,—
সামনে চেয়ে এই যা দেখি
চোখে আমার বীণা বাজায়।

আমার এযে বাঁশের বাঁশী
মাঠের সুরে আমার সাধন,
আমার মনকে বেঁধেছে রে
এই ধরণীর মাটির বাঁধন।

নীল আকাশের আলোর ধারা
পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া
নিয়েছি মোর দুচোখ পূরে,
আমার বীণার সুর বেঁধেছি
ওদের কচি গলার সুরে।

দূরে যাবার খেয়াল হলে
সবাই মোরে ঘিরে থামায়,
গাঁয়ের আকাশ সজনে-ফুলের
হাতছানিতে ডাকে আমায়।

ফুরায়নি ভাই কাছের সুধা
নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা;
এই যে এসব ছোটো খাটো
পাইনি এদের কূল কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা
আজো আমার হয়নি সারা।

লাগলো ভালো মন ভোলালো
এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই;
দিনে রাতে সময় কোথা,
কাজের কথা তাইত এড়াই।

মজেছে মন মজলো আঁখি,
মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি;
ওদের আছে অনেক আশা
ওরা করুক অনেক জড়ো,
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই
চাইনে হতে আরো বড়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II গা -মা পা -া। -া -া ^সনা -না I ^ধপা -ধা না -^সনা। ^সনা -া ^ধপা -া I
এই ০ ত ০ ০ ০ ভা লো লে ০ গে ০ ছি ০ ল ০

I পা -া ধা -া। ^ধপা -া ^পধা পা I ^পমা -া পা -া। ^পধা -^ধপা মা -গা I
আ ০ লোর ০ না ০ চ ন পা ০ তায় ০ পা ০ তায় ০

I গা -মা পা -া। -া -া -া -া I ^ধপা -র্সা র্সা -া। ^পর্সা -া র্সা র্র্সা I
এই ০ ত ০ ০ ০ ০ ০ শা ০ লের ০ ব ০ নে ০

I ^সনা -র্সা ^সনা -ধা। পা -ধা না -া I ^ধপা -ধা -না। -া -া -া -া I
ক্ষ্যা ০ পা ০ হাও ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ^মগা -া -া মা। ^মপা -া না -া I না -া র্সা -া। ^মগা -মা পা -া
এই ০ ০ ত আ ০ মার ০ মন্ ০ কে ০ মা ০ তায় ০

I ^মগা -মা পা -া। -া -া -া -া II
এই ০ ত ০

II ^রসা -া সা -া। রা -া গা -া I মা -া পা -া। ধা -া না -া I ^পর্সা -া র্সা -া।
রা ০ ঙা ০ মা ০ টির ০ রা ০ স্তা ০ বে ০ য়ে ০ হা ০ টের ০

I র্সা -া র্সা -র্রা I ^সনা -র্সা ^সনা -ধা। ^ধপা -ধা -না -র্সা I ^ধনা -া -া -া।
প ০ থিক্ ০ চ ০ লে ০ ধে ০ ০ ০ য়ে ০ ০ ০

I -া -া -া -া I ^পনা -া ^নর্সা -না। ^নধা -না ^ধপা -া I পা -া ধা -পা।
ছো ০ ট ০ মে ০ য়ে ০ ধূ ০ লায় ০

I ^পমা -া পা -মা I ^মগা -া মা -গা। ^গরা -া গা -া I মা -া -া পা।
ব ০ সে ০ খে ০ লার ০ ডা ০ লি ০ এক্ ০ ০ লা

I ^পমা -দা পা -া I পা -া -দা দা। দা -া দা -^পদা I ^দপা -পা -া পা।
সা ০ জায় ০ সাম্ ০ ০ নে চে ০ য়ে ০ এই ০ ০ ঘা

I ^পদা -া পা -া I পা -ধা ধা -র্সা। র্সা -া র্সা -র্রা I ^সনা -র্সা র্রা -া।
দেঁ ০ খি ০ চো ০ খে ০ আ ০ মার ০ বী ০ ণা ০

I ^সনা -র্সা -র্রা -র্জ্ঞা I ^সর্রা -া -া -া। -া -া -া -া I ^মগা -মা পা -া। -া -া -া -া II
বা ০ ০ ০ জায় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এই ০ ত ০ ০ ০ ০ ০

I র্জ্ঞা -া র্রা -া I র্সা -া র্ধা -া I র্জ্ঞা -া -া -র্রা I র্না -া -া -া । -া -া -া -া I
মো ॰ রে ॰ ঘি ॰ রে ॰ থা ॰ ॰ ॰ মায় ॰ ॰ ॰

I র্না -া না -র্সা । র্সা -া -া -া I র্সা -া -া -র্সা । -র্না -া -া -া I
গাঁ ॰ য়ের ॰ আ ॰ ॰ ॰ কা ॰ ॰ শ ॰ ॰ ॰ ॰

I না -র্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা -র্সা I র্সা -া -া না । না -া না -র্না I ধা -র্সা র্না -া ।
সজ্ ॰ ॰ নে ফু ॰ লের ॰ হাত ॰ ॰ ছা নি ॰ তে ॰ ডা ॰ কে ॰

I ধনা -ধা ধপা -মা I মগা -মা মা -পা । পা -া -া -া I পা -দা দা -া । দা -া দা পদা I
আ ॰ মায় ॰ ফু ॰ রায় ॰ নি ॰ ॰ ॰ ফু ॰ রায় ॰ নি ॰ ভাই ॰

I ধপা -পা পা -া । পদা -া পা -া I পা -ধা -র্সা র্সা । র্সা -া র্সা -র্সা I র্না -র্সা র্রা -া ।
কা ॰ ছের ॰ সু ॰ ধা ॰ নাই ॰ ॰ যে রে ॰ তাই ॰ দূ ॰ রের ॰

র্না -র্সা -র্রা -র্জ্ঞা I -র্রা -া -া -া । -া -া -র্সা -না I না -র্সা -া -র্সা ।
সু ॰ ॰ ॰ ধা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ এই ॰ ॰ যে

I র্সা -া র্সা -া I র্রা -া র্সা -া । র্সা -া র্সা -র্সা I র্সা -া -া র্সা । র্সা -া না -র্না I
এ ॰ সব ॰ ছো ॰ টো ॰ খা ॰ টো ॰ পাই ॰ ॰ নি এ ॰ দের ॰

I ধা -র্সা -া র্না । ধনা -া ধপা -া I পনা -া -া র্সা । ধনা -া ধপা -া I পনা -া র্সা -র্না ।
ফুল ॰ ॰ কি না ॰ রা ॰ তু ॰ ॰ চ্ছ দি ॰ নের ॰ গা ॰ নের ॰

I ধনা -া ধপা -মগা I গা -মা মা -পা । পা -া পা -া I ধপা -ধা -া না । ধনা -া ধপা -মগা I
পা ॰ লা ॰ আ ॰ জো ॰ আ ॰ মার ॰ হয় ॰ ॰ নি সা ॰ রা ॰

I পমা -া পা -া । -া -া -া -া II
এই ॰ ত ॰

II রসা -া -া রা । রা -া -গা -মা I মগা -া -া -া । -া -া -া -া I রসা -া -া রা ।
লাগ ॰ ॰ লো ভা ॰ ॰ ॰ লো ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ মন ॰ ॰ ভো

I গরা -া -গা -মা I মগা -া -া -া । -া -া -া মগা I গরা -া -া গা । রা -া পা ধপা I
লা ॰ ॰ ॰ লো ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ এই ॰ ॰ ক থা ॰ টাই ॰

I মপা -া মা -মগা। গরা -গা রস্না -া I সা -া -া রা। রা -া -গা -মা I মগা -া -া -া।
গে ০ রে ০ বে ০ ভাই ০ লাগ ০ ০ লো ভা ০ ০ ০ লো ০ ০ ০

I -া -া -া -া I মগা -মা মা -পা। পা -া পা -া I পা -ধা ধা -া। ধা -া ধা -নধা I
০ ০ ০ ০ দি ০ নে ০ রা ০ তে ০ স ০ ময় ০ কো ০ থা ০

I ধপা -ধা ধা -র্সা। র্সা -া র্সা র্রর্সা I র্সনা -র্সা -া নধা। পা -মা গা -রা I
কা ০ জের ০ ক ০ থা ০ তাই ০ ০ ত ০ এ ০ ভাই ০

I রসা -া -া রা। রা -া -গা -মা I মগা -া -া -া। -া -া -া -া I ধপা -া ধা -র্সা।
লাগ ০ ০ লো ভা ০ ০ ০ লো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম ০ জে ০

I র্সা -া -নর্সা -র্রর্গা I র্রর্সা -া -া -া। -া -া -া -ধপা I ধপা -া -া -র্সা। র্সনা -া ধা -নধা I
ছে ০ ০ ০ মন ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মজ ০ ০ ০ লো ০ আঁ ০

I ধপা -া -া -া। -া -া -া -া I ধপা -া -া -র্সা। র্সনা -া নধা -নধা I ধপা -া -া -া।
খি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মি ০ ০ ০ থ্যে ০ আ ০ মার ০ ০ ০

I -া -া -া ধপা I পমা -া -া -ধা। ধপা -া পমা -পমা I মগা -া -া -া। -া -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ডা ০ ০ ০ কা ০ ডা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I রসা -া রা -া। রা -া রা -া I গরা -া গা -া। গমা -া পা মগা I মগা -মা মা পা।
ও ০ দের ০ আ ০ ছে ০ অ ০ নেক ০ আ ০ শা ০ ও ০ রা ০

I পা -া পা -া I ধপা -ধা না -া। ধনা -া ধপা -া I পা -ধা ধা -র্সা। র্সা -া র্সা -র্রর্সা I
ক ০ রুক্ ০ অ ০ নেক ০ জ ০ ড়ো ০ আ ০ মি ০ কে ০ বল ০

I র্সনা -র্সা র্সনা -নধা। ধপা -ধা -না -র্সা I ধনা -া -া -া। -া -া -া ধপা I
গে ০ রে ০ বে ০ ০ ০ ভাই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধপা -না -া না। নধা -া পা -ধপা I পমা -ধা ধপা -া। পমা -পা মগা -মা I
চাই ০ ০ নে হ ০ ০ তে আ ০ রো ০ ব ০ ড় ০

I মা -া পা -া। -া -া -া -া II II
এই ০ ত ০ ০ ০ ০ ০

তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)

২৯ অধ্যায়।

দেবালয়ের পথে।

আমার মনে হইল আবার সভ্যদেশে আসিলাম। অদূরে প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ আর দুর্গ দেখিতে পাইলাম। দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রস্তর-নির্ম্মিত বিহার দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম, কারণ তিব্বতের এ অঞ্চলে প্রস্তর অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। এই প্রেতপুরী;—ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য পলদ্ অতীস এখানে আসিয়া এইস্থানের নাম প্রেতপুরী রাখেন। তিব্বতের লোকদের প্রেত বলিলে কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না, তিব্বতীরা যথার্থই প্রেত। আমি ভূমণ্ডলে এমন ম্লেচ্ছজাতি কোথাও দেখি নাই। যে-কেহ এদেশে আসিবেন, এই জঘন্য কদর্য্য অপরিচ্ছন্ন লোকদের প্রেত বলিয়া ডাকিয়া বসিবেন। তিব্বতীরা সংস্কৃত ভাষা জানে না, তাই প্রেতপুরী তাহাদিগের নিকট এক মহা গৌরবজনক নাম। প্রেতপুরীর পাথরের বিহারগুলি বেশ জমকাল দেখিতে। আমি এখানে একরাত্রি যাপন করিলাম। আমার সঙ্গীরা বিদায় লইল। আহারান্তে আমি সেখানকার একজন পুরোহিতের সঙ্গে দর্শনীয় স্থান-সকল দেখিতে গেলাম। দর্শনীয় ব্যক্তির মধ্যে শাক্যমুনি ও তিব্বতের পুরাতন এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা পদ্মচুংনের দুইটি মূর্ত্তি দেখিলাম। পদ্মচুংনে অতি জঘন্য চরিত্রের পুরোহিত—তার নাম স্মরণ করিলে হৃদয় ঘৃণায় পূর্ণ হয়। শাক্যমুনির পার্শ্বে এই পাপের মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইলাম। ইনি ধর্ম্মের পুরোহিত নন, পাপের পুরোহিত। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্গতি দেখিয়া ব্যথিত হইলাম। আমার জাপানে কি পাপাত্মা পুরোহিত নাই? আছে বটে, তবে পাপীর এত সমাদর আর কোথাও দেখি নাই।

প্রেতপুরীর প্রেতদিগের অবস্থা যত হীন হোক না কেন, চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর, অতি পবিত্র। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলে মন পবিত্র হইয়া যায়। তিব্বতীরা বলে প্রেতপুরী দর্শন না করিলে কৈলাশ পর্ব্বত ও মানস সরোবর দর্শন করা বৃথা। বাস্তবিক প্রেতপুরী দর্শনীয় স্থান বটে। এরূপ অপর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাদান আর সচরাচর দেখা যায় না। প্রকৃতির কি ছবিই এখানে দেখিলাম তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা আমার পক্ষে অসাধ্য। প্রেতপুরীর উপকণ্ঠে এক পশ্চিমবাহিনী নদী দেখিলাম। নদীর ওপারে বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরখচিত পর্ব্বত-মালা নানা স্তরে-স্তরে উঠিয়াছে। লাল নীল হলদে সবুজ কত রংএর যে প্রস্তর! কি অপরূপ শোভা! স্থানে-স্থানে দেখি কোন পর্ব্বত যেন পা বাড়াইয়া জলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক-এক স্থান এক-এক দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত। সেই নদীর তীর হইতে ২৫০ গজ দূরে এক-স্থানে কতকগুলি বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তার মধ্যে কোন-কোনটার জল অত্যন্ত গরম, এত গরম যে স্পর্শ করা যায় না, উত্তাপ ১০০ ডিগ্রির কম হইবে না। জল অতি স্বচ্ছ। প্রস্রবণের আশেপাশে সাদা লাল সবুজ নীল নানা রংএর স্তর পড়িয়াছে। লোকেরা ঔষধ বলিয়া এই-সকল গুঁড়া লইয়া যায়। আমারও মনে হইল নিশ্চয় এই উষ্ণ প্রস্রবণের জলে ঔষধের গুণ আছে। দর্শনীয় সমুদায় দেখিয়া আমি আবাসে ফিরিয়া আসিলাম।

সেদিন রাত্রে প্রেতপুরীতে থাকিয়া পরদিন সঙ্গীদের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। ৫ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত চলিয়াও যে, নদী তিনঘণ্টার মধ্যে পার হইবার কথা তার দর্শন পাইলাম না। বুঝিতে পারিলাম ভুল পথে আসিয়া পড়িয়াছি। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম উত্তর-পূর্ব্বে না গিয়া উত্তরের দিকে আসিয়াছি। আবার নূতন পথে যাত্রা করিলাম। সূর্য্য অস্ত যায়-যায়, এমন সময় সেই নদী পার হইতে হইল। রাত্রে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সঙ্গীদিগের তাঁবুতে পৌঁছিলাম। সেদিন সারাদিন উপবাসী থাকিয়া তাঁবুতে পৌঁছিয়া দেখি তাঁবুর অধিকারীর কন্যা—শ্রীমতী দাবা কয়েকটি মেষ লইয়া আমাকে খুঁজিতে বাহির হইতেছে। আমাকে দেখিয়া তার আনন্দ আর ধরে না। তার মনে হইয়াছিল যে নদী পার হইবার সময় আমি স্রোতের মুখে ভাসিয়া গিয়াছি।

৩০ অধ্যায়।

প্রকৃতির দেবমন্দির।

রাত্রে শুনিলাম, এবার যে পবিত্র তীর্থস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, সে স্থান আমাদের দলের সমুদয় স্ত্রী পুরুষ একা একা ঘুরিয়া আসিবে। ৪।৫ দিনে যে যতবার পারে তুষার-শৃঙ্গটি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবে। সেই পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিবার তিনটি পথ আছে। একবার ঘুরিয়া আসিলে ৫০ মাইল। একদিনে ৫০ মাইল পথ পার হওয়া আমার শক্তিতে কুলাইবে না। কিন্তু আমাদের দলের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত দুই তিন দিনে অন্ততঃ দুইবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবে—পুরুষেরা তিনবারের কম নয়! স্থির হইল মধ্য রাত্রিতে বাহির হইয়া পরদিন রাত্রি ৮টার সময় একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। আমার সাধ্য নাই যে আমি ইহাদের সঙ্গে ঘুরিয়া আসি। আমি ৪।৫ দিনের আহারের সম্বল সঙ্গে লইয়া একাই যাত্রা করিলাম। আমি তিনটি পথের মধ্যে বাহিরের পথটি দিয়া চলিলাম। যে তুষারশৃঙ্গ প্রদক্ষিণ করার কথা, তাহা দেখিতে যেন এক মানুষের আকৃতি। এ দেশের লোকে বলে শাক্যমুনির মূর্ত্তি। ভিতরের যে দুই পথ আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ, অতিক্রম করা মানুষের একপ্রকার অসাধ্য। আমি যে-পথে যাত্রা করিলাম, তাহার চারিসীমায় চারটি মন্দির আছে। প্রথমেই আমি পশ্চিমের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম, তাহা বুদ্ধ অমিতাভের নামে উৎসর্গীকৃত। এই মন্দিরের উপস্বত্ব কিছু কম নয়। গ্রীষ্মের তিন মাসে প্রায় দশ হাজার ইয়েন দর্শনী লাভ হয়। জাপানেও বুদ্ধ অমিতাভের মন্দিরে যাত্রী অধিক হয়। এই দুর্গম দেশে তিন মাসে ১০ হাজার ইয়েন লাভ বড় সহজ কথা নয়। শুনিলাম এই মন্দিরের উপস্বত্ব ভুটান-রাজসরকারে লইয়া থাকে। ভুটানের সঙ্গে এই সম্বন্ধের ইতিহাস এই যে, একদা ভুটানের দুগ্‌পা সম্প্রদায় এখানে আধিপত্য করিত। অমিতাভের মূর্ত্তিটি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই দেশের পক্ষে কারুকার্য্য উত্তম বটে। অমিতাভের মূর্ত্তিটিতে একটি শান্ত কমনীয় ভাব দেখিলাম, তাঁহাতে আমার বড়ই ভাল লাগিল। মূর্ত্তির সম্মুখে ৫ ফুট দীর্ঘ দুই গজদন্ত, তাহার পশ্চাতে প্রায় ১০০ খানি ধর্ম্মগ্রন্থ সজ্জিত রহিয়াছে। সে পুস্তক কেহ পাঠ করে না, পূজার অর্ঘের মত সেখানে বিরাজ করিতেছে। আমি তার মধ্য হইতে পুস্তক লইয়া কিঞ্চিৎ পাঠ করিলাম। তৎপরে আবার "সুবর্ণ উপত্যকা" দিয়া যাত্রা করিলাম। এ সোনার দেশে সোনা পাওয়া যায় না, কিন্তু চারিদিকের সৌন্দর্য্য দেখিলে সোনার দেশ বলিতে ইচ্ছা হয় বটে। তুষারমণ্ডিত "তীষ" শিখরের অপরূপ শোভা অবর্ণনীয়। তীষের আশেপাশে আরও কত শিখর। আর একটি অপরূপ শোভা এখানে দেখিলাম—জলপ্রপাত। হাজার হাজার ফুট উচ্চ হইতে শুভ্র জলরাশি লাফাইয়া পড়িতেছে—তন্মধ্যে ৭টি অতি প্রশস্ত। কোন কোনটি প্রচণ্ডবেগে লাফাইয়া পড়িতেছে, কোন কোনটিকে দূর হইতে দেখিলে মনে হইতেছে—পাহাড়ের গায়ে কে একখানি সাদা চাদর ঝুলাইয়া দিয়াছে। চারিদিকের অপরূপ বিরাট সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমি কি পৃথিবীতে আছি না স্বর্গে আসিয়াছি—দক্ষিণে বামে যে দিকে চাই, পর্ব্বত-গাত্রে এই সৌন্দর্য্যময় জলপ্রপাতের খেলা। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমার সকল কষ্ট সার্থক! যথার্থই এ পবিত্র তীর্থ বটে। এইবারে "তীষে"র উত্তর দিকে যাত্রা করিলাম—এখানে আর-এক মন্দির দেখিলাম, ইহার নাম "রিরাপুরী"। এ মন্দিরের উপস্বত্বও অল্প নহে, যদিও অমিতাভের মন্দিরের ন্যায় নহে। এ স্থানে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এইখানেই রাত্রিবাস করিলাম। সে রাত্রিতে যে অপূর্ব্ব সুখসম্ভোগ করিলাম তাহা আর বলিবার নয়। নির্ঝরিণীর কুলুকুলু শব্দে অপার শান্তিসম্ভোগ করিতে-করিতে তুষারশৃঙ্গের উপর চন্দ্রোদয় দেখিলাম। একি চন্দ্রোদয়! হৃদয় আমার সেদিন যে কোন্ স্বর্গরাজ্যে আরোহণ করিল! সকল পার্থিব মলিনতা ভুলিয়া গেলাম! এই না স্বর্গ! স্বর্গ ত মনের ভিতর, এই শান্তিময় পবিত্রতায় স্বর্গের আভাস পাইলাম। তৎপরদিনও সেখানে বাস করিলাম—আবার সম্মুখে যাত্রা। মন্দিরের পুরোহিত লামার নিকট বিদায় লইলাম। নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে আমার কেহ ছিল, এমন প্রাণগত যত্ন ত দেখি নাই। সম্মুখেই "মুক্তির পথ" নামে এক খাড়া পাহাড়। আমার পক্ষে

সে পথ অতিক্রম করা দুরূহ ভাবিয়া সাধু আমায় একটি চমরী ও একজন পথপ্রদর্শক দিলেন—কত যে সুখাদ্য সঙ্গে দিলেন। পর্ব্বতের উপর দেখি বিস্তর যাত্রী—কি নিষ্ঠা তাহাদের। সে পর্ব্বত অত্যন্ত দুরারোহ, এক পা অগ্রসর হওয়া কঠিন—আমি দেখি পুরুষনারী সে-পথে একপা করিয়া উঠিতেছে আর দণ্ডবৎ হইতেছে!' কি আয়াসসাধ্য ব্যাপার! আমি চমরীর উপর বসিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম, সেখানকার বাতাস এত লঘু যে নিঃশ্বাসের কষ্ট হইতে লাগিল। ৫ মাইল উঠিতে-না-উঠিতে আমার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। আমি বিশ্রাম না করিয়া আর পারিলাম না। পথপার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম, ঔষধ বাহির করিয়া সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দেখি এক যমদূতের আকৃতি ভীষণ-দর্শন পুরুষ, তীষের দিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া নিজের জীবনের দুষ্কৃতির কথা বলিতেছে। আমার সঙ্গী বলিল, লোকটি খাম হইতে আসিতেছে; ডাকাতের দেশের এ লোকটা দেখিতেও ঠিক ডাকাত। উচ্চস্বরে পাপ স্বীকার করিতেছে বটে—কিন্তু চোখমুখের কি ভীষণ ভাব। 'খামে'ও বুঝি এমন ডাকাত আর দ্বিতীয় নাই। লোকটার পাপের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। একটা বিষয় দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। লোকটা যে কেবল অনুষ্ঠিত পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে তা নয়, যুত পাপ করিতে বাকি আছে, তার জন্য দেবতার নিকট হইতে একটা মুক্তিপত্র আদায় করিয়া রাখিতেছে। এক দণ্ডবৎ আর ভূতভবিষ্যতের সব পাপ খণ্ডন। লোকটা চীৎকার করিয়া অনর্গল বলিতেছে, "হে প্রভু শাক্যমুনি, দিকদশে যে বোধিসত্ত্ব আছ, ত্রিকালেস্থিত বুদ্ধ যে-যেখানে আছ শোন, আমি মহাপাতকী, কত যে মানুষ মেরেছি, কত যে লুটপাট করেছি, কত যে লোকের স্ত্রী চুরি করে এনেছি, কত পাপ করেছি, যে, আর বলে উঠতে পারি না—আমি যে এত কষ্ট করে "মুক্তির পথে" উঠছি আমার সব পাপ ক্ষমা করো—এই পুণ্যফলে যত পাপ করবো সব ক্ষমা হয়ে যায় যেন।" লোকটা চতুর বটে! শুনিলাম ডাকাতের দেশের লোকেরা এই জন্যই তীর্থ করে। পাহাড়ে উঠিবার সময় দেখি—দক্ষিণে কৈলাস পর্ব্বত—তার উত্তরে এক তুষারশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহার নাম "কুবেরের আলয়"। কালিদাস "মেঘদূতে" কুবেরের আলয়ের সহিত ভারত-বাসীদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। "কুবেরের আলয়" দেখিয়াই কালিদাসের মেঘদূতের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম নীল আকাশের গায়ে ঐ যে সোনার পাহাড় উঠিয়াছে, ওখানে ছাড়া "কুবেরের আলয়" আর কোথায় হইবে? ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা ওখানে!

"তীষ" ২২৩০০ ফুট উচ্চ হইবে। এস্থানের বাতাস লঘু এবং অত্যন্ত শীতল। ভাগ্যে আমি চমরীতে চড়িয়া উঠিতেছি নচেৎ নিশ্চয়ই আমি এই পর্ব্বতে উঠিতে পারিতাম না। কিন্তু তিব্বতীরা অনায়াসে উঠিতেছে, তাহাদের শ্বাসযন্ত্র না জানি আয়তনে কত বড়। পর্ব্বতের পাদদেশে এক জায়গায় দেখিলাম একটা পুকুরের জল একেবারে জমাট। "তীষে"র পূর্ব্বদিকে "বিস্ময়কর গুহা" নামে একস্থানে পৌছিলাম। এই স্থানের সহিত তিব্বতের এক সাধু কবির স্মৃতি জড়িত। তাঁর নাম মিলারাসপা—ইনিই তিব্বতের এক মাত্র কবি। মিলারাসপার কবিতা ইউরোপীয়েরাও আদর করিয়া নিজ-নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছে। তথা হইতে "শ্বেত বজ্রেশ্বরী"র মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থান হইতে এক মাইল দূরে "দারচেন তাজাম" নামক স্থান, সেখান হইতে ডাক যায়। এই স্থানে প্রায় ৩০ খানি বাড়ী ও অনেকগুলি তাঁবু দেখিলাম। সে অঞ্চলের খাজনাও এখানে আদায় হয়। এ স্থানটা মানস-সরোবরের উত্তর-পশ্চিমে এবং লাকগুল হ্রদের উত্তরপূর্ব্বে। পরদিন যাত্রীদল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিল। পরদিন আমরা আর-এক তুষার-শৃঙ্গের পাদদেশে পৌছিলাম। সেখানে এক প্রকাণ্ড মন্দির। এ অঞ্চলে নানা-প্রকার ব্যাংএর ছাতা দেখিলাম—দেখি যে মেয়েরা খুব তুলিতেছে। লবণ মাখিয়া মাখন দিয়া ভাজিয়া আমায় খাইতে দিয়াছিল—যথার্থই বড় সুখাদ্য। এতক্ষণে তীর্থস্থান আমরা পার হইলাম। সহযাত্রী পুরুষেরা বলিল এবার বিষয়কর্ম্মে মন দিতে হইবে। তাহার সূচনা-স্বরূপ তাহারা হরিণ শিকারে প্রবৃত্ত হইল।

আমার সহযাত্রী তিন ভ্রাতা (সাবা'র বাপ-জ্যেঠারা) যেরূপ উৎসাহের সহিত শিকার করিতে আরম্ভ করিল,

আমার ভয় হইতে লাগিল হরিণের চেয়ে বড় জীব বা শিকার করিয়া বসে। প্রাণে ভয় হইল, ভাবিলাম যত শীঘ্র পারি ইহাদের সঙ্গে ত্যাগ করিব। তার পরদিন আমার সাক্ষাতেই একজন লোক 'চাংকু' নামে একপ্রকার পাহাড়ে নকড়ে শিকার করিল। চাংকু মারিয়া তাদের কি আনন্দ। এ শিকারে হত্যার আমোদ বই ভোজনের আমোদ নাই। চাংকু কেহ খায় না। মৃত চাংকু দেখিয়া আনন্দে তাদের যখন চক্ষু জ্বলিতে লাগিল, তখন হঠাৎ মনে হইল মানুষ শিকার করিলে ইহাদের চক্ষু আনন্দে এমনই জ্বলে হয় ত?

৩১ অধ্যায়।

মৃত্যুর মুখে।

তার পরদিন ১৪ই সেপ্টেম্বর বরফ পড়িতে লাগিল। কাজেই সে দিনও সেখানে থাকিতে হইল। শিকারী কুকুরগুলো খরগোস শিকার করিতে বাহির হইল, এবং রক্তমাখা মুখে খানিক পরে ফিরিয়া আসিল। তার পরদিন তুষারপাত থামিলে আমরা পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে তাহার চূড়ায় উঠিলাম। এখানে পৌছিয়াই আমাদের দলের সর্দ্দার (দাবা'র জ্যেঠা) বলিলেন "এখানেই আমাদের তীর্থযাত্রা শেষ।" আমি বলিলাম, "কেন, এখানে শেষ কেন?" "পশ্চিমের দিকে চাহিয়া দেখ ঐ মানস-সরোবর, দক্ষিণে ঐ মনরীর চূড়া, এইবার শেষ দেখা দেখিয়া লও—আজ থেকে প্রতিদিন প্রার্থনা কোরো যেন আমার এই তীর্থদর্শন হয়।" বলিয়াই তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আমরা সকলেই তাহা করিলাম। আমিও আজ প্রাণ ভরিয়া জন্মের মত পবিত্র তীর্থ দেখিয়া লইলাম। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—তারপর দেখিতে দেখিতে যেই অপর দিকে নামিতে লাগিলাম, অমনি সব অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। তবে কি তীর্থদর্শন শেষ! আমার সঙ্গীরা বলিল "তীর্থদর্শন শেষ, যে যার আপন পথে যাও এবং সংসারে কাজ কর্ম্ম কর।" আমরা সেদিন যেখানে পৌছিলাম সেখানে আরও ১০।১২টা তাঁবু পড়িয়াছে দেখিলাম। আমি মুষ্টিভিক্ষার ছলে প্রত্যেক তাঁবুর দ্বারে গিয়া দেখিয়া আসিলাম। দাবা'র বাপ জ্যেঠা সব শিকার করিতে বাহির হইয়া গেল। আমি তাঁবুতে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলাম। তাঁবুর বাহিরে দাবা ও তার কাকা কি কথাবার্ত্তা বলিতেছিল—হঠাৎ "লামা লামা" শুনিয়া আমার মনোযোগ সেদিকে গেল। আমি কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম দাবা বলিতেছে—"এই লামা বলেছে আমার মা মারা-গিয়েছে, আমি তাকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করব।" তাহার জ্যেঠী হাসিয়া বলিল "তোমায় ঠাট্টা করেছে, তুমি যে তার ভক্ত। জানো দাবা, তোমার জ্যেঠা কি বলেছে? ঐ লামাকে তোমায় বিয়ে করতে বলবে। যদি বাছাধন কথা না শোনে তবে গর্দ্দানটি যাবে।" আমি শুনিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। নিশ্চয় আমায় শুনাইয়া বলা হইয়াছে, কারণ কথাগুলি খুব জোরেই বলা হইয়াছিল। ক্ষণেকের জন্য মনটা কেমন হইয়া গেল, তখনই আত্মসংবরণ করিলাম। প্রাণ দিতে হয় সেও স্বীকার, কখনই ব্রত ভঙ্গ করিব না। প্রভু বুদ্ধের নিকট বল ভিক্ষা করিয়া শান্ত হইলাম। আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। সে-দিন, তার পরদিনও আমায় হত্যা করিবার কোন চেষ্টাই দেখিলাম না। আমরা "তোক্‌চেন তাজাম" নামক স্থানে পৌছিলাম। সেখান হইতেও ডাক ঘর। সেদিন দাবা ছাড়া আর কেহই তাঁবুতে ছিল না। দাবাকে তাঁবুতে রাখিয়া সকলের প্রস্থান করিবার অর্থ কি? আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম চক্রান্ত ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ভাবিলাম দাবার কাছে পরিষ্কার করিয়া সব কথা খুলিয়া বলিব। আমি ধর্ম্মগ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে বসিলাম। দাবা কতকগুলি ব্যাঙের ছাতা ভাজা একটা বাটিতে করিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া বলিল, "তুমি এগুলো খেতে ভালবাস বলে আমি আজ সকালে এগুলো এনেছি।" আমি ধন্যবাদ দিয়া তার হাত হইতে বাটিটি লইলাম। তার পর দাবা আস্তে-আস্তে বলিল, "বড় গুরুতর কথা আছে—আমার মনটা বড় অস্থির হয়েছে, আমার কাকা নাকি জোর করে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, তুমি অস্বীকার করলে তোমায় নাকি মেরে ফেলবে।" আমি অত্যন্ত সহজভাবে হাসিমুখে উত্তর করিলাম "তা ভালই হবে। আমার তীর্থদর্শন হয়ে গেছে, এই পবিত্র স্থানে যদি মরণ হয় তার বাড়া আর সৌভাগ্য কি? তোমার বাবা কাকা আমায়

যদি মেরে ফেলেন বেশ ত, তাঁদের শুভকামনা করতে করতে আমি মরব। মরতে হয়ত এখানে মরাই সৌভাগ্য। তাঁদের বোলো আজই যেন আমায় মেরে ফেলা হয়।" দাবার চক্ষু স্থির—এই কি তার কথার উত্তর! সে আমায় কত বুঝাইল, "মৃত্যু ভাল? তবু তাকে বিয়ে করা এমনি ভয়ঙ্কর!" বেচারার প্রাণ দমিয়া গেল। বেলা প্রায় ৪টার সময় তার বাবা কাকা সব আসিয়া উপস্থিত। বোধ হয় তাঁরা তাঁবুর বাহিরে দাঁড়াইয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, কারণ তাঁবুতে ঢুকিয়াই তার এক কাকা গর্জ্জন করিয়া দাবাকে বলিয়া উঠিল, "অন্য পুরুষের সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়া হচ্ছে!" অমনি দাবার বাবা হুঙ্কার করিয়া উঠিল "তুমি আমার মেয়েকে বকবার কে? জন্মে ওকে এক পয়সার জিনিষ দিয়েছ নাকি যে বড় বকতে এসেছ?" কথায় কথায় দুই ভাইএ তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হল। কথা কাটাকাটি হতে হাতাহাতি, শেষে পাথর ছোড়াছুড়ি। নারী দুটি এক কোণে পলাইয়া গিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল—আমি মধ্যে পড়িয়া ঝগড়া থামাইতে গেলাম। দাবার কাকা আমার মুখে এমন এক প্রকাণ্ড ঘুসি মারিল যে কোথায় যে ছিটকাইয়া গিয়া পড়িলাম বুঝিলাম না। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝন-ঝন করিতে লাগিল। উঠিবার শক্তি রহিল না। ক্রমে তারা চূড়ান্ত মারামারি করিয়া শান্ত হইল। সূর্য্যও অস্ত গেল।

তারপরদিন আমাদের দল ভাঙ্গিয়া গেল। সকলের ছাড়াছাড়ি হইল। দাবার বাবা দাবাকে লইয়া একদিকে গেল। ভাইরা যে যার পথে গেল। আমি দক্ষিণপশ্চিমদিকে একা চলিলাম। জিনিষপত্র বহিবার জন্য দুটো মেষ কিনিলাম। আমি সেরাত্রি বরফের উপর খোলা জায়গায় যাপন করিলাম। সুখের পরে দুঃখ বড় বিষম। এতদিন আরামে তাঁবুর ভিতর ছিলাম—আজ এই প্রচণ্ড শীতে বাহিরে থাকিতে বড় কষ্ট হইল। কিছুতেই নিদ্রা হইল না। তারপরদিন শাচিন খামরা নামে এক বিহারে উপস্থিত হইলাম। দুদিন সেখানে থাকিলাম। এই বিহারে আসিয়া আমার একটি ভেড়া মরিয়া গেল। অগত্যা আর একটিকে বিক্রয় করিলাম। মৃত মেষের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলাম। সেখানে আরও যাত্রী ছিল, মৃত মেষের মাংস তাহাদের খাইতে দিলাম, তাহারা বড় খুসী হইল। বিহারে আসিয়া আমার লাভ হইল। এই যাত্রীদলের সঙ্গে রওনা হইলাম। তাহারা আমার জিনিষপত্র বহিয়া লইয়া চলিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে যাত্রা করিয়া এক জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হইলাম, তাহার দক্ষিণদিক দিয়া আর এক লম্বা হ্রদ দেখিলাম। এ-হ্রদের চারিদিকেই পাহাড়। এখানেও একরাত্রি বরফের উপর যাপন করিতে হইল। আমার চক্ষে নিদ্রা আসিল না, সারারাত ধ্যানস্থ হইয়া কাটাইলাম। পরদিন যাত্রা করিয়া এমন এক খাড়া পাহাড়ে উঠিতে হইল যে তিব্বতীরা পর্য্যন্ত কাতর হইল। ভাগ্যে তাহারা আমায় চমরীতে চড়িয়া উঠিতে দিয়াছিল, নচেৎ আমার পক্ষে পাহাড়ে উঠা দুঃসাধ্য হইত।

সেই পর্ব্বত হইতে নামিবার সময় দূরে শুভ্রবর্ণ এক জলাশয় দেখিলাম। সঙ্গীরা বলিল এই হ্রদে সোডা পাওয়া যায়। হ্রদে পৌছিয়া আমার সঙ্গীরা চামড়ার থোলে করিয়া বিস্তর সোডা সংগ্রহ করিয়া বলিল চায়ে দিয়া খাইতে হয়। আমরা এখন দিনে ২৫ মাইল করিয়া যাইতে লাগিলাম। আমি অধিকাংশ পথ চমরীতে চড়িয়া গিয়াছি, সুতরাং ২৫ মাইল দিনে চলা আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হয় নাই। শরৎকালে প্রচণ্ড শীতে বরফের উপর রাত্রিবাস আমার পক্ষে বিষম কষ্টকর বলিয়া মনে হইত। দক্ষিণ-পূর্ব্বে আরও কিছুদূর গিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌছিলাম। সেখানে জল বেশী গভীর ছিল না, চমরীতে চড়িয়া পার হইলাম। ব্রহ্মপুত্রের তীরে কতকগুলি তাঁবু দেখিলাম। তাহার একটিতে রাত্রি যাপন করিয়া বড় আরাম বোধ হইল। কত রাত অনিদ্রায় কাটাইয়াছি। সেদিন জ্যোৎস্না ছিল না, আকাশ তারকাময়, হিমালয়ের শৃঙ্গসকল আকাশের গায়ে ছবির মত দেখাইতেছিল। পরদিন আমার সঙ্গীরা অন্যপথে চলিয়া গেল, আমি একাকী পৃষ্ঠে বোঁঝা লইয়া যাত্রা করিলাম। আজ মনটা বড়ই বিষণ্ণ, পথ যেন আর শেষ হয় না, বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম।

৩২ অধ্যায়।

দুর্দ্দিনের সূচনা।

দেহ অবসন্ন, পথের ধারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দেখি যে একজন তিব্বতী একটা চমরী হাঁকাইয়া আমার দিকে আসিতেছে। কাছাকাছি আসিয়ে অভিবাদন

করিয়া বলিলাম, "চমরীর পৃষ্ঠে আমার বোঝা বহিয়া দিতে পার যদি তোমায় পুরস্কার দিব।" সে সম্মত হইল। পৃষ্ঠের বোঝা নামাইয়া বাঁচিলাম। তিন মাইল যাইতে-না-যাইতে দেখি তিনজন সশস্ত্র ঘোড়সোয়ার আমাদের দিকে আসিতেছে। নিশ্চয়ই ইহারা তীর্থযাত্রী নয়, ব্যবসায়ী নয়, তাহা হইলে দল বাঁধিয়া আসিত। ইহারা নিশ্চয়ই ডাকাত। আমার সঙ্গীও বলিল তাহাই হইবে। ডাকাতের হাতে পড়া কিছু আমোদের ব্যাপার নয়। মনে মনে স্থির করিলাম যথা-সর্ব্বস্ব দিয়া প্রাণটা বাঁচাইব; আমায় প্রাণে বধ করিয়া ত ওদের কোন লাভ হইবে না। তাহারা আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, আমি কে, কোথা হইতে আসিতেছি। আমি বলিলাম "আমি মানস-সরোবর ও কৈলাশ পর্ব্বত দর্শন করিয়া আসিতেছি।" জিজ্ঞাসা করিল, "পথে কোন বণিক-দল দেখেছ কি? আমরা সেই সন্ধানে বেড়াচ্ছি।" আমি যখন বলিলাম, "আমি কোন বণিক দেখি নাই," তখন বলিল "তুমি দেখছি লামা। শুনে বল দেখি কোন্ পথে গেলে তাদের সঙ্গে দেখা হবে।" আমি কি আর করি, একটা পথ বলিয়া দিলাম, যে পথে সাধারণতঃ বণিকগণ যায় না। যা হোক ডাকাতেরা ভারি খুসী হইল, বলিল "তোমায় বকসিস পরে দেবো।" তারা ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। আমার সঙ্গীটি এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। তারা চলিয়া গেলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকাতেরা তোমায় কি বলিল?" আমি সব বলিলাম। পরদিন আট মাইল গিয়া আমার সঙ্গীর তাঁবুতে পৌছিলাম। সেখানে একদিন বিশ্রাম করিয়া, ২৬এ সেপ্টেম্বর একটা ছাগল কিনিয়া তার পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া যাত্রা করিলাম। রওনা হইবার কিছুক্ষণ পরেই আবার তুষার-ঝঞ্ঝার ভিতর পড়িলাম। আমার চক্ষুদুটি একেবারে অন্ধ হইয়া গেল,—পথ দেখিতে পাই না—কম্পাস হারাইয়া ফেলাতে কোন্ দিকে যাইব বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু যে-কোন প্রকারেই হোক চলিতেই হইবে, অগত্যা অন্ধের মত চলিতে লাগিলাম। এমন সময় একজন ঘোড়সোয়ার সে-পথে আসিয়া পড়িল। আমার দুর্গতি দেখিয়া বলিল "চল, আজ রাত্রে আমার তাঁবুতে থাকবে, তোমার বোঝা কিছু আমার ঘোড়ার পিঠে দাও।" আমি বাঁচিলাম। ছাগলের দড়ি ধরিয়া তার সঙ্গে চলিলাম। তাঁবুতে পৌছিতে দেরী হইল না। সে-রাতটা সেখানে কাটাইলাম। আমার উপকারী বন্ধুটি ভোরেই বাহির হইয়া গেল। তাঁবুতে আরও ৪।৫ জন লোক ছিল; তারা তাঁবু উঠাইয়া চলিল। ইহারা লাসার যাত্রী। আমি ইহাদের সঙ্গ লইলাম। পথে তাদের সহিত কোন কথা হইল না। ১৫ মাইল গিয়া সন্ধ্যার সময় একস্থানে পৌছিয়া তারা তাঁবু গাড়িবার জোগাড় করিল। আমি মনে-মনে ভাবিলাম, "আজ রাত্রেও আমায় তাঁবুতে থাকিতে দিবে।" কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিলাম "আজ আমায় দয়া করে তোমাদের তাঁবুতে থাকতে দেবে ত?"—তখন তারা পরিষ্কার বলিল "না, তা হবে না।" নিকটে আরও ৪।৫টা তাঁবু ছিল, কেহই আমায় আশ্রয় দিতে সম্মত হইল না। তখন দেখিলাম আর একটি মাত্র তাঁবু আছে। সেখানে গিয়া দেখিলাম একজন বৃদ্ধা এবং তাঁহার কন্যা সেই তাঁবুতে আছে। আমি অত্যন্ত কাতরভাবে আশ্রয় চাহিলাম, বলিলাম "দয়া করে আমায় এক কোণে স্থান দাও, এই শীতে বাহিরে থাকলে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হবে।" বৃদ্ধার মন গলা দূরে থাক একেবারে ক্রোধে অগ্নিবর্ণ "কোথাকার বদমায়েস! পুরুষদের তাঁবু থাকতে সেখানে যেতে পার না? মেয়েমানুষ দেখে অপমান করতে এসেছ? দূর হও এখান থেকে।" আমি যত দয়া-ভিক্ষা করিতে লাগিলাম, ততই মারমূর্ত্তি! শেষে একটা চিমটা লইয়া আমায় মারিবার জন্য বৃদ্ধা ছুটিয়া আসিল। আমি সরিয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমলতা দেবী।

জীবন মরণ

জীবন মরণ—আসা যাওয়া,
ভোরের আলো, সাঁঝের হাওয়া!
জীবন, শুধুই চেয়ে থাকা,
মরণ, তারে বুকে পাওয়া!

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

শ্রীমতী আনি বেসান্টের মুক্তিতে জনতা।

পঞ্চশস্য

জাপানে হাতীর-দাঁতের কাজ—

হাতীর-দাঁতের কাজ জাপানে ভারত হইতে চীনের মারফতে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু জাপানী কারিগরেরা দেশীভাবের নৈপুণ্যে ও বাস্তবিকতার খুঁটিনাটিতে ও বিষয়-কল্পনায় কৌতুকরসে হাতীর-দাঁতের শিল্পকে শীঘ্রই জাপানের নিজস্ব করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সমঝদারের অনাদরে জাপানী হাতীর-দাঁতের শিল্প মাঝে মন্দা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকায় উহার আদর বাড়াতে আবার তাহার চর্চ্চায় শিল্পীরা মন দিয়াছে। জার্মানী সেলুলয়েড দিয়া নকল হাতীর-দাঁতের জিনিস তৈয়ারী করে; তাহা তেমন সুন্দর ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হয় না; কিন্তু সস্তা হয় বলিয়া হাতীর-দাঁতের শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহার ক্ষতি করে। অধিকন্তু জাপানে হাতী জন্মে না, সমস্ত হাতীর-দাঁত বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়, তাহাতে দাম বেশী পড়ে। জাপানের বাড়ী ও গৃহসজ্জা এমন যে সেখানে হাতীর-দাঁতের জিনিস খাপ খায় না, সুতরাং জাপানে তাহার গ্রাহক নাই বলিলেই হয়; জাপানের সমস্ত হাতীর-দাঁতের জিনিস বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজারের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। ইহাতে শিল্পীদের উৎসাহ কম হইলেও কাজ অপকৃষ্ট হইতে পারে না।

জাপানী কারিগর আগে শুধু নস্যদানী গড়িত। তাহাতে তাহাকে অতি অল্প পরিসরে বস্তুর রূপ ফুটাইতে অতি সূক্ষ্ম নিপুণতা প্রকাশ করিতে হইত। কিন্তু এখন সে বিদেশী বাজারের জন্য এক-একটা গোটা দাঁতই খুদিয়া নানাবিধ সুসমঞ্জস সুদৃশ্য বস্তুরূপ প্রকাশ করে। তবে সাধারণত তাহার তৈরী সামগ্রী ছয় ইঞ্চি আকারের হয়। তাহারা প্রধানত সুন্দরী নারী, প্রাকৃতিক দৃশ্য, যোদ্ধা, পশুপক্ষী প্রভৃতির আকার খুদিয়া প্রকাশ করে। এই-সমস্ত রচনা যেন সৃষ্টির মতন, প্রাণবান্ জীবন্ত ও ভাবব্যঞ্জনায় অত্যাশ্চর্য্য; বাস্তবিকতায়ও এগুলি চমৎকার। পাকা কলার এক-চিল্‌তে খোসা ছাড়ানো আছে, তাহার উপর নেংটি ইঁদুর বসিয়া আছে; খোসা ও শোঁয়া-সুদ্ধ আধ-ছাড়ানো ভুট্টা; নরনারীমূর্ত্তি; গ্রাম্য দৃশ্য; প্রভৃতি রঙে আকারে ভাবব্যঞ্জনায় এমন বাস্তব সুন্দর যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ভারতের নানা স্থানে—মুরশিদাবাদ, ঢাকা, কটক, আগ্রা, তাঞ্জোর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে—হাতীর-দাঁতের শিল্পসামগ্রী হয় বটে; কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটা কেমন আড়ষ্ট পুতুলের ভাব থাকে; কিন্তু জাপানী কারিগর এমন নিপুণ যে সেগুলিকে আকারে ও হাবভাবে একেবারে জীবন্ত বাস্তব করিয়া তোলে।

জাপানী কারিগর দাঁত জুড়িয়া জুড়িয়া প্রমাণ আকারেরও মূর্ত্তি গড়িতে পারে। সানফ্রান্সিস্কো প্রদর্শনীতে তিন ফুট উঁচু একটি চাষীর মূর্ত্তি পাঠানো হইয়াছিল; সেটি বষ্টনের মিউজিয়াম দশহাজার ইয়েন দাম দিয়া কিনিয়াছে।

জাপানে খেলনা ছাড়া হাতীর-দাঁতের বাক্স, কৌটা, বুরুশ, চিরুণী ও আয়নার বাঁট, ছড়ির বাঁট, খাওয়ার কাঠি, বাদ্যযন্ত্রের অঙ্গ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়।

জাপানী কারিগর ফারফোর (perforated) কাজেও খুব দক্ষ। হাতীর-দাঁতের টুকরা এপার-ওপার ফুঁড়িয়া ছিদ্র-পরম্পরায় সন্নিপাতে বিবিধ দৃশ্য পুষ্পপত্রপল্লব প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া তোলে।

যে জিনিসের আকার হাতীর-দাঁতের উপর খোদাই করিয়া তুলিতে হইবে তাহার আদরা দাঁতের উপর আঁকিয়া লইয়া, জাপানী কারিগর

জাপানী কারিগরের তৈয়ারী হাতীর-দাঁতের (১) বুড়ো ফকির, (২) ঘট, (৩) যাত্রী, (৪) সঙ্গীত-শিক্ষা। বুড়ো ফকির, যাত্রী ও সঙ্গীত শিক্ষার মূর্ত্তি হুটি কেমন জীবন্ত ভাবপ্রকাশক।

করাত দিয়া চিরিয়া, উখা দিয়া ঘসিয়া, বাটালি দিয়া কুঁদিয়া, বস্তুর আসল রূপটি হুবহু ফুটাইয়া তোলে এবং তাহা মসৃণ চিক্কণ সুসমঞ্জস সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্য এক-রকম খসখসে পাতা ও হরিণের শিঙের ছাই দিয়া পালিশ করে। ওস্তাদ কারিগরেরা আগে মাটির মডেল গড়িয়া লইয়া একেবারে দাঁত-কুঁদিয়া সেই মডেলের নকল গড়ে। এরূপ করা শক্ত। এক-একটা জিনিস গড়িয়া সম্পন্ন করিতে দু-তিন মাস সময় পরিশ্রম ও ধৈর্য্য দরকার হয়।

জাপানী কারিগরদের মধ্যে ওস্তাদ হোমেই য়োশিদা; তার হাতের কাজ পাওয়া যায় তোকিওতে ৎসুতায়া দোকানে ও আসাকুসাতে কিতামোতোমাচি দোকানে। য়োশিদা বিখ্যাত শিল্পী শিমামুরার শিষ্য।

ৎসুতায়া দোকানীরা ভারত ও শ্যামদেশ হইতে হাতীর-দাঁত আমদানী করে। ভারতের হাতীর-দাঁত কড়া; শ্যামদেশের কোমল। এজন্য শ্যামদেশের হাতীর-দাঁতের চাহিদা বেশী।

(জাপান ম্যাগাজিন)।

জাপানী কারিগরের তৈয়ারী হাতীর দাঁতের (১) মঞ্জুশ্রী, (২) পল্লীপথ, (৩) ব্যাধ, (৪) বনদেবতার আবির্ভাবে রমণীর বিস্ময়। পল্লীপথের চালাঘর, গাছপালা, পথিক, পল্লীর নিখুঁত ছবি; ব্যাধ ও বনদেবতার আবির্ভাব মূর্ত্তিদুটি চমৎকার ভাবব্যঞ্জক।

মূর্ত্তি-গঠনের ডাক্তারী—

মানুষের বিকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মেরামত করিয়া আবার গড়িয়া তোলা চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটা অঙ্গ; এইরূপ কাজ বহু প্রাচীন কাল হইতেই সকল দেশের চিকিৎসকেরা করিয়া আসিতেছিলেন। য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরা বিজ্ঞানের জ্ঞানবলে উহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। এক্ষণে যুদ্ধে সুস্থ মানুষগুলা দলে দলে হঠাৎ বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া ডাক্তারদের চিন্তা ও চেষ্টা বিকলাঙ্গের মূর্ত্তি সংশোধনের দিকে বেশী করিয়া ঝুঁকিয়াছে। ডাক্তারেরা এখন যেন মূর্ত্তিগঠনকারী ভাস্কর হইয়া উঠিয়াছেন। লোহা-কাঠ-পাথরের হাত পা চোখ সংযোগ করা বহুদিনই চলিতেছিল; এখন অঙ্গহীনের হীন-অঙ্গ রক্ত-মাংসেরই অপর অঙ্গ দিয়া পূরণ করা হইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে টাটকা মৃত সুস্থ মানুষের অঙ্গ হইতে চর্ম্ম টিশু ছেদন করিয়া বিকলাঙ্গের অঙ্গে যথাযথ স্থানে সংযোগ করিয়া তাহার অঙ্গহীনতা পূরণ করা হইতেছে। এইরূপ কয়েকজন দক্ষ ডাক্তারের মধ্যে নামজাদা হইয়া উঠিয়াছেন ফ্রান্সের মোরস্তাঁ (Dr. H. Morestin) ও রিচার্ড ডারবী (ইনি কর্ণেল রুজভেল্টের জামাই)। ইঁহারা মানুষের মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া গেলে মেরামত করিয়া তাহাকে সুদর্শন করিয়া দিতেছেন; মানুষের সকল অঙ্গের বিকৃতি ও বিকলতা অপেক্ষা মুখের বিকৃতি অপরের চক্ষুর অপ্রীতি উৎপাদন করে, এবং তাহার ফলে বিকলাঙ্গ ব্যক্তি লোক-সমাজে কুণ্ঠিত ও মনমরা হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়; সেইজন্য উঁহারা মুখটাকে সুদর্শন করিবার ব্রত লইয়া যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা করিতেছেন।

মুখ মেরামতের জন্য তিনটি জিনিস দরকার—উপরের আবরণ বা চামড়া, হাড় বা হাড়ের বদল কোনো শক্ত জিনিস, এবং মাংস বা মাংসের বদল কোনো সংহত নমনীয় পদার্থ যা ভরিয়া চামড়া ও হাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পূরণ করিয়া অঙ্গের সেই অংশকে নিটোল স্বাভাবিক আকারের করা যাইতে পারে।

প্রথম জিনিসটা পাওয়া কঠিন নয়, রোগীর নিজের অঙ্গের অন্যস্থান হইতে বা কোনো বন্ধুর অঙ্গ হইতে চামড়া উঠাইয়া জুড়িয়া দেওয়া বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—গা বেশী পুড়িয়া গেলে এইরূপ উপায়ে যুদ্ধের আগেও চিকিৎসা হইত।

হাড়ের সঙ্গে অপর হাড় জোড়া লাগানো ডাক্তারীর নূতন কারসাজি
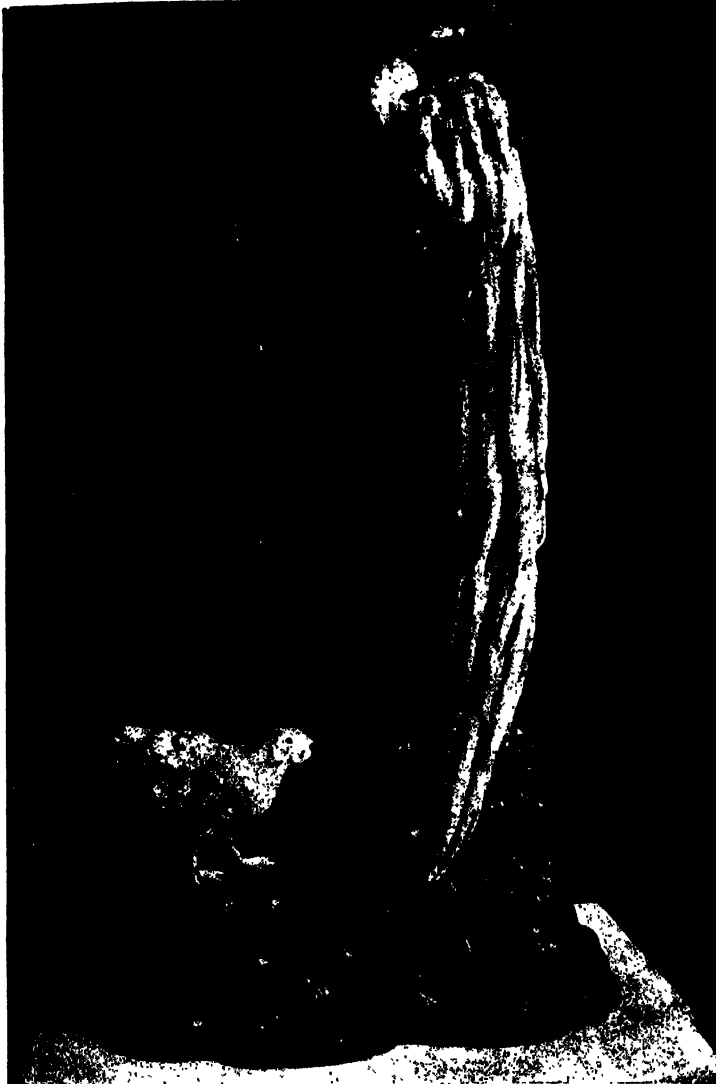
জাপানী কারিগরের তৈয়ারী হাতীর দাঁতের মোরগ-মুরগী।
মুরগীটি ভারি জীবন্ত-রকমের হইয়াছে।

হইলেও ডাক্তার ক্যারেল মোরস্ত্যাঁ প্রভৃতি ইহাতে দক্ষতা দেখাইয়া চুকিয়াছেন, এবং এমন কি মানুষের হাড়ের সঙ্গে পশুর হাড় জোড় লাগাইয়া দিয়াছেন। মানুষের হাড়ের সঙ্গে পশুর হাড় জুড়িয়া দিলে পশুর হাড়টা মানুষের অঙ্গে তাহার নিজের হাড়ের যা কাজ তা সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহা কেবল ভগ্ন স্থানে কঠিন ঠেক্‌নো মাত্র হইয়া থাকে; কিন্তু মানুষের হাড় ক্রমশ বাড়িয়া পরকীয় হাড়কে ঢাকিয়া একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, হাড় না দিয়া অপর কোনো কঠিন পদার্থের ঠেক্‌নো দিলে তেমনভাবে আত্মসাৎ করিতে পারে না। ভাঙা হাড়ে অপর হাড় জোড়া দিতে হইলে রোগীর নিজের শরীরের অপরাংশের একটা হাড় লইয়া জোড়া লাগাইলে খুব উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়: এজন্য পাঁজরের হাড় কাটিয়া লইয়া অভস্থানের ক্ষতিপূরণ করা হয়। নিজের শরীরের হাড় কাটিয়া অপর অংশে হাড়ের সঙ্গে জোড় লাগাইলে সে হাড় বাড়ে না, কমে না, চট করিয়া জোড় লাগে, সহজে তাহার নূতন স্থানে আপনাকে মানাইয়া চলিতে পারে। কিন্তু অপরের হাড় লইয়া জোড়া লাগাইলে কিছুকাল পরে পরকীয় হাড়টা সঙ্কুচিত খাটো হইয়া পড়ে।

চামড়া ও হাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূরণের জন্য জীবশরীরের টিশু সংগ্রহ করা হয়।

এই তিন-রকম উপকরণ লইয়া ডাক্তার পরম ধৈর্য ধরিয়া একটির পর একটি অস্ত্র করিয়া করিয়া বহুদিনে বিকলাঙ্গ সুদৃশ্য করিয়া তোলেন। একটা বোঁচা নাক টিকোলো করিতে দুই বৎসর লাগিয়াছিল। এসব চিকিৎসায় রোগীকে ইংরেজীতে যাহাকে বলে patient বা ধৈর্য্যশীল তাহাই হইতে হয়। ডাক্তার মোরস্ত্যাঁ বলিয়াছেন যে সেই লোকটা নাক হারাইয়া একেবারে মনমরা স্ফূর্ত্তিহীন হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু দিন দিন একটু একটু করিয়া তাহার নাক যেমন যেমন গড়িয়া উঠিতে লাগিল সেও তেমনি ক্রমশ খুসী ও স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সুতরাং এইরূপ বিকলতা মেরামতে মানুষের দেহই যে শুধু সুশ্রী সুদর্শন হয় তা নয়, তাহার মনও নিরানন্দ হতাশা হইতে বাঁচিয়া যায়, লোকটা কাজের বাহির হইয়া পড়িতে পারে না। (বিব্লিয়োতেক্ য়ুনিভার্সেল্।)

* *
*

ক্ষুধা কি ও ক্ষুধার পরিমাণ—

আমেরিকার ডাক্তার কার্লসন সম্প্রতি একখানি বই লিখিয়াছেন, তার নাম The Control of Hunger in Health and Disease; পুস্তকের প্রকাশক শিকাগো-বিশ্ববিদ্যালয়। এই পুস্তকে ডাক্তার ক্ষুধার প্রকার ও পরিমাণ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে দেহযন্ত্রে আহারের অভাব ঘটিলে পাকস্থলীতে ঢেউ-খেলানো সঙ্কুচন-প্রসারণ চলিতে থাকে; তাহার অনুভূতিকেই আমরা বলি ক্ষুধা। ডাক্তার কার্লসন মানুষের সুস্থ অবস্থায় ও রোগের কালে, জাগ্রত অবস্থায় ও সুষুপ্তির কালে, গণ্ডেপিণ্ডে আহারের পর ও উপবাস অনাহারের পর, সদ্যজাত শিশুর, বিবিধ পশুপক্ষী সরীসৃপ জীবজন্তুর পাকস্থলীর সঙ্কুচন-প্রসারণের ঢেউ মাপিয়া ক্ষুধার পরিমাণের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। রবারের ডবল-দেয়াল বেলুনে দুই পুরু পর্দার মাঝে বিসমাথ-কর্দ্দম ভরিয়া সেই বেলুনটাকে পাকস্থলীতে ঢুকাইয়া দিয়া ডাক্তার কার্লসন পাকস্থলীর ক্ষুধার স্পন্দন নির্ণয় করিয়াছেন ও একস্-রে ফটোগ্রাফে তাহার চিত্র পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজে অনেক দিন নিরম্বু উপবাস থাকিয়া অনাহারের দরুণ পাকস্থলীর স্পন্দন নির্ণয় করিয়াছেন। পাকস্থলীর
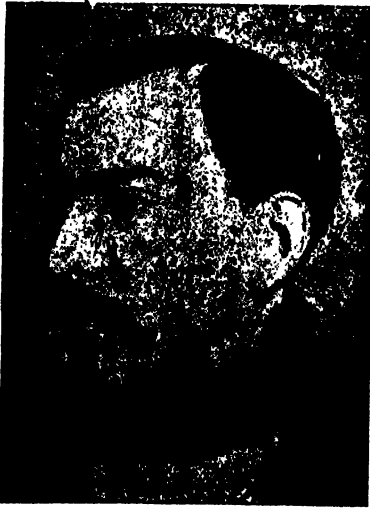
মানুষের মেরামত-করা মুখ।
এই লোকটির নাক থেঁৎলাইয়া গিয়াছিল, চোয়াল গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার রিচার্ড ডার্বী (কর্ণেল্ রুজ্‌ভেল্টের জামাই) নিপুণ সার্জ্জারী দ্বারা তাহার নাক গড়িয়া দিয়াছেন, ও একজন নিপুণ দাঁতের-ডাক্তার তাহার দাত বাঁধাইয়া তাহার মুখ ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

স্পর্শানুভূতি কিরূপ ঠিক করিবার জন্য শক্ত তারের ডগায় কড়া বুরুশ লাগাইয়া নিজের পাকস্থলীতে ঢুকাইয়া আঁচড়াইয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ক্ষুধা পাকস্থলীর সঙ্কুচন-প্রসারণে ঢেউখেলানো স্পন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। সেই স্পন্দন বন্ধ করিতে পারিলেই ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করা যায়। ক্ষুধার সময় পেটে কষিয়া বেল্ট বা পেটী বা কোমরবন্দ বাঁধিলে ক্ষুধা কমিয়া যায়; তামাক খাইলেও ক্ষুধা কমে; যারা তামাকখোর তাদের কড়া তামাক খাইতে হয়। ব্যায়াম পরিশ্রম ও শীতল জলে স্নান করিলে ক্ষুধা বাড়ে; কিছুদিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিলে ক্রমে ক্ষুধার জ্বালা কম হইয়া আসে।

ডাক্তার কার্ল্‌সন যাহাকে পরীক্ষা-পাত্র নির্ব্বাচন করেন, তাহাকে একটা ছোটো রবারের বেলুন গিলাইয়া দ্যান; সেই বেলুনের সঙ্গে একটা খুব নমনীয় রবারের নল লাগানো থাকে; সেই বেলুনটা পাকস্থলীতে পৌঁছিলে নলে ফুঁ দিয়া বেলুনটাকে ফুলাইয়া তোলা হয় ও নলের মুখটা একটা ইউ-টিউবের এক মুখে পরাইয়া দেওয়া হয়। ইংরেজি ইউ অক্ষরের ন্যায় U আকারের নলকে ইউ-টিউব বলে। ঐ ইউ-টিউবের মধ্যে ক্লোরোফর্ম ভরা থাকে; তরল পদার্থের ধর্ম্ম অনুসারে নলের দুই বাহুতেই ক্লোরোফর্ম সমান উঁচু হইয়া থাকে। ইউ-টিউবের এক মুখ লাগানো থাকে বেলুনে সংলগ্ন রবার-নলের মুখে; অপর মুখের ভিতর একটা সোলা ক্লোরোফর্মে ভাসাইয়া রাখা হয়। সেই সোলার একটা খাড়া কাটি বেঁধা থাকে; সেই কাটির মাথায় একটা হাল্কা লেখনী সংযুক্ত থাকে। সেই লেখনীটি একটি ঘূর্ণমান ঢোলের গায়ে ঠেকিয়া তাহার উপর আঁচড় কাটে। সাধারণত ঢোলের গায়ে লেখনীটির সোজা সমান দাঁড়ি টানিয়া যাইবার কথা। কিন্তু পাকস্থলীর সঙ্কুচন-প্রসারণের স্পন্দনে বেলুনটিতে চাপ পড়ে; তাহাতে তাহার ভিতরকার বাতাসে ঠেলা লাগে; বাতাস বাহির হইয়া আসিয়া ইউ-টিউবের তরল পদার্থে ধাক্কা লাগায়; তাহাতে যে-বাহুতে সোলা ভাসিতেছে সেই বাহুতে তরল পদার্থ উঁচু হইয়া উঠে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে সোলা ও লেখনীও উঁচু হইয়া ভাসিয়া উঠে; এবং লেখনী ঘূর্ণিত ঢোলের গায়ে ঢেউখেলানো রেখা অঙ্কন করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে পাকস্থলীর প্রত্যেক স্পন্দনের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব ঢোলের গায়ের রেখাতরঙ্গ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়।

একজন লোক বাল্যকালে দৈবাৎ খুব কড়া কষ্টিক-সোডা খাইয়া ফেলিয়াছিল; তাহাতে তাহার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে আর কোনো খাবার গিলিতে পারিত না। তখন তাহার পেটে একটি ছিদ্র করিয়া পৌনে এক ইঞ্চি মোটা একটা রবারের নল তাহার পাকস্থলীতে ঢুকাইয়া সমস্ত খাদ্য একেবারে তাহার পাকস্থলীতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ডাক্তার কার্ল্‌সন এই লোকটিকে পাইয়া তাহার পেটের ফুটোর মধ্যে বিদ্যুতের আলো ঢুকাইয়া তাহার পাকস্থলী দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই পরীক্ষার ফলে এই তত্ত্বগুলি নির্ণীত হইয়াছে।
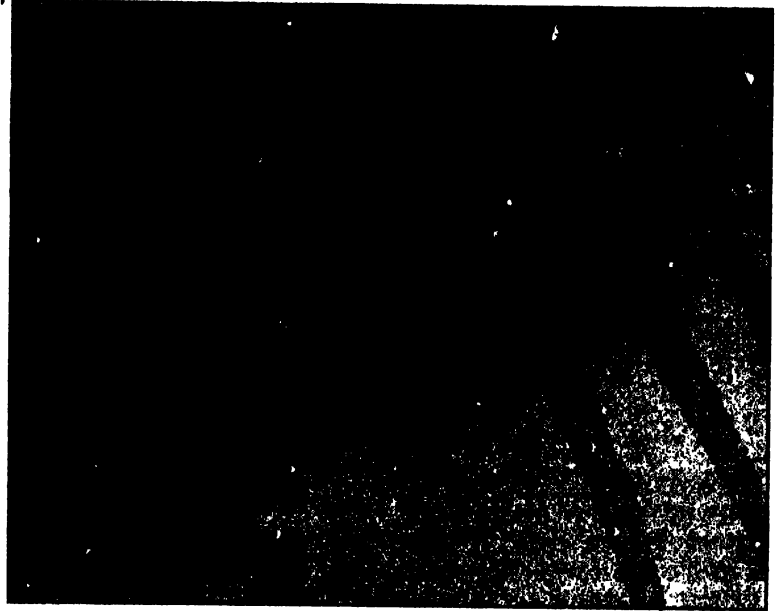
ক্ষুধা কি?—শূন্য পাকস্থলীর ঢেউ-খেলানো আকুঞ্চন-প্রসারণের অনুভূতি।
একস্-রে দিয়া লওয়া ক্ষুধিত পাকস্থলীর ফটোগ্রাফ।

পাকস্থলী খাদ্যশূন্য হইলেই প্রথমে আস্তে আস্তে সঙ্কুচন আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বেগ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক আকুঞ্চনের ঢেউ ৩০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়, এবং মোটের উপর ৩০ মিনিট হইতে ৪৫ মিনিট

চলে। প্রথম-প্রথম প্রত্যেক সঙ্কুচন ছাড়া-ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে থামিয়া-থামিয়া হয়, এক সঙ্কুচনের পর আর-এক সঙ্কুচনের মধ্যে ২ হইতে ৫ মিনিট ব্যবধান থাকে। ক্রমশ সঙ্কুচনগুলি কাছাকাছি হইতে হইতে একেবারে লিপ্ত একটানা হইয়া পড়ে। সমর্থ বয়সের জোয়ালো লোকের পাকস্থলীর সঙ্কুচন শেষের দিকে এমন প্রবল ও একটানা অবিচ্ছেদে হয় যে কয়েক মিনিট ধরিয়া পাকস্থলীতে সঙ্কুচনের "ধনুষ্টঙ্কার" বা "খালধরা" চলিতে থাকে। ইহাই শিশুদের ক্ষুধায় ভোকচানি যাওয়া।

দুর্ভিক্ষের দারুণ ক্ষুধার যন্ত্রণার বর্ণনা অনেকেই শুনিয়াছেন। অনাহারে উপবাসে কি-রকম বোধ হয় তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত ডাক্তার কার্লসন পাঁচ দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া দেখিয়াছেন। সে সময়ে পাকস্থলীর সঙ্কুচন খুব প্রবল হয়; তিন দিন পরে ক্ষুধা-সঙ্কুচন কমে ও এমন কি খাদ্য দেখিলে গা কেমন করে! উপবাসের পর প্রথম আহার করিতেই সকল যন্ত্রণার নিবারণ হয়, এবং তাহার পরদিন মনে হয় যেন পাহাড়ে মাস খানেক ছুটি উপভোগ করিয়া তাজা হইয়া আসা গিয়াছে।

ভরাপেটের সাড়া।

রাত্রির উপবাসের পর প্রভাতে জল-খাবার খাইয়া ক্ষুধা শান্তির পরের অবস্থা।

এই যে পাকস্থলীর সঙ্কুচন ইহাই ক্ষুধার জ্বালা, এবং যে সময় পর্য্যন্ত সঙ্কুচন চলে তাহাই ক্ষুধার সময়, এবং সঙ্কুচন থামিয়া যাওয়াকেই আমরা ক্ষুধা পড়িয়া যাওয়া বলি। সুস্থ বয়স্ক লোকের আধঘণ্টা হইতে আড়াই ঘণ্টা অন্তর ক্ষুধা বোধ হয় অর্থাৎ পাকস্থলীতে সঙ্কুচন হয়। শিশুদের আরো ঘন-ঘন হয়।

ডাক্তার কার্লসন পাকস্থলীতে কৃত্রিম আকুঞ্চন ঘটাইয়া দেখাইয়াছেন যে পরীক্ষিত ব্যক্তি তখন মনে করে তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। অতএব ক্ষুধা পাকস্থলীর সঙ্কুচন ছাড়া আর কিছু নয়।

খাটো দৃষ্টির চিকিৎসা—

ফ্রান্সে খাটো-দৃষ্টি লোকের চোখের তারার উপর চাপ দিয়া তাহার দৃষ্টি স্বাভাবিক করা চলিতেছে। চোখের তারা দৃষ্টি-রেখার সম্মুখ দিকে লম্বা হইয়া পড়িলে চোখের মধ্যে দূরের জিনিসের যে ছায়া পড়ে তাহা রেটিনা নামক পর্দ্দার উপর না পড়িয়া তাহার সম্মুখে পড়ে; তাহাতে দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না; এবং সেইজন্ত খাটো-দৃষ্টি লোক চোখ কুঞ্চিত করিয়া দূরের জিনিস দেখিবার চেষ্টা করে। এখন,

খালিপেটের সাড়া।

মাঝারি ক্ষুধা—সকালে জলখাবার খাওয়ার ৪ ঘণ্টা পরে।

ডাক্তার কার্লসন ক্ষুধা (hunger) ও লালসা (appetite) পৃথক করিয়া তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লালসা অনেকটা মনের ব্যাপার; অতীতকালে সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণের যে আনন্দ আমাদের স্মৃতিতে মুদ্রিত থাকে তাহার পুনর্ব্বার ভোগের ইচ্ছা লালসা। চাটনি প্রভৃতি সেই অনুভূতির স্মৃতিকে উদ্রিক্ত করিয়া তোলে, আর লোকে মনে করে ক্ষুধার উদ্রেক করিতেছে। ডাক্তার কার্লসন পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন চাটনি (appetizer) প্রভৃতি খাইলে তখনকার মতন পাকস্থলীর সঙ্কুচন স্থগিতই হয়, বৃদ্ধি হওয়া ত দূরের কথা; এবং এমন একটি অনুভূতি বা সুড়সুড়ি (sensation) জাগ্রত করে যাহাতে যে জিনিসের দ্বারা ঐরূপ হইয়াছে তাহা আরো খাইবার লালসা বাড়ে।

যদি খাটো-দৃষ্টি লোকের চোখের লম্বাটে তারার উপর চাপ দিয়া সম্মুখে বর্দ্ধিত তারাকে তাহার স্বাভাবিক আয়তনে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে লোকের দৃষ্টিও স্বাভাবিক হইয়া যাইবে।

অধ্যাপক হির্শ্‌মান প্রথমে প্রকাশ করেন যে, চোখের সামনে ঠিক-মাপের দুপিঠ খ্যুব্জ (bi-concave) কাচের চশমা পরিলে বস্তুর ছায়া পিছাইয়া ঠিক রেটিনার উপর পড়িলে বস্তুর আকার স্পষ্ট অনুভব করা যায় যখন, তখন কোনো-রকমে চোখের পেশী ও স্নায়ুর ব্যায়ামের দ্বারা চোখের তারাকে স্বাভাবিক আয়তন দিতে পারিলেই দৃষ্টির ক্ষীণতা সারিয়া যাইবার কথা। তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে ডাক্তারেরা চক্ষু-গোলকের কোনো কোনো মোটর পেশী কাটিয়া বা চোখের crystalline
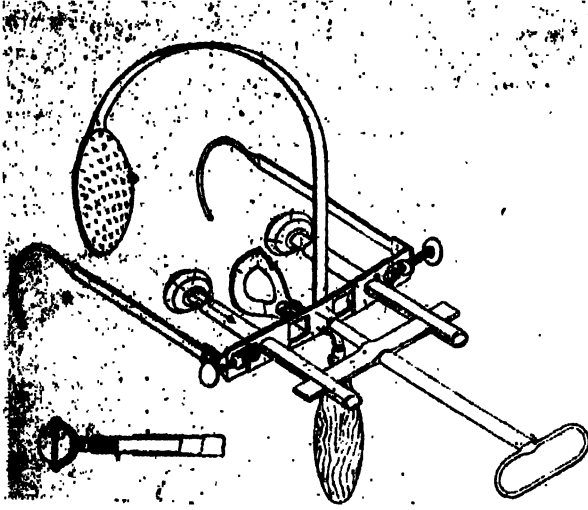
খাটো-দৃষ্টির চিকিৎসার যন্ত্র।

lens কাটিয়া বাদ দিয়া চোখের গোলকের চাপ কমাইয়া দৃষ্টি দান করিয়াছেন—কিন্তু এ চিকিৎসা কঠিন ব্যাধির। সাধারণ খাটো-দৃষ্টির চিকিৎসার জন্ত বাকাই ও দ' আঁস। নামক দুই ব্যক্তি এক কল তৈয়ার করিয়া চিকিৎসা পরিষদে গত জানুয়ারী মাসে প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঐ যন্ত্রটি যেন একজোড়া কান-আঁকড়ানো চশমা। চশমার কাঁচের জায়গায় দুটো দাঁট আছে, চোখের তারায় চাপ দিবার জন্ত। দাঁট দুটির মধ্যে একটা গদি নাকের উপরে চাপ দিয়া সমতা রক্ষা করে। মাথার পিছনেও একটা গদি মাথার সঙ্গে চোখের যন্ত্রটাকে চাপিয়া রাখে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে এক বা দু সেকেণ্ড চোখে চাপ দিয়া আবার সেই পরিমাণ সময় জিরান্ দেওয়া হয়; এইরূপে প্রত্যহ দশ মিনিট চিকিৎসা চলে। যতদিন পর্য্যন্ত দৃষ্টি স্বাভাবিক না হয় ততদিন এই চাপ লইতে হয়। এই উপায়ে বুড়োদের পর্য্যন্ত অতি পুরাতন খাটো-দৃষ্টি আরোগ্য করা হইয়াছে।—(লা নাতিয়ুর্)।

* *
*

মৌমাছির 'ফায়ার-ব্রিগেড'—

মৌমাছিরা খুব গরমের সময় অতি দ্রুত পাখা নাড়িয়া বাতাস করিয়া মৌচাক ঠাণ্ডা রাখে, যেন ভিতরে রাণী-মাছি ও বাচ্চা-কাচ্চারা ক্লেশ না পায়, ভাণ্ডারের মোম ও মধু নষ্ট হইয়া না যায়। এইরূপে পাখা নাড়িয়া তাহারা যে চাককে কতখানি শীতল রাখিতে পারে তাহার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। য়ুরোপ-আমেরিকার লোকেরা প্রকৃতির উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে না, তাহারা প্রকৃতিকে দাসীর মতন নিজের কাজে লাগাইয়া খাটাইয়া লয়। কোথায় কবে মৌমাছিরা চাক বাঁধিবে তাহাই খুঁজিয়া মধু মোম সংগ্রহ করিব বলিয়া বসিয়া না থাকিয়া, তাহারা নিজের নিজের ঘরে কৃত্রিম চাকের মধ্যে মৌমাছি পোষে ও পালন করে। এইরূপ একটি চাকের বাক্সে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আগুনের তাত এমন উগ্র হইয়াছিল যে বাক্সের কাঠ সব পুড়িয়া গিয়াছিল, বাক্সের ভিতরেও চাকের ফ্রেমের লোহা টিন পুড়িয়া গলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অতি আশ্চর্য্য যে চাকটির কিছুই হয় নাই, এক কোণের একটু মোম ছাড়া আর কোথাও মোম পর্য্যন্ত গলে নাই। সেই চাকের মধ্যে সমস্ত মৌমাছি এণ্ডা বাচ্চা লইয়া দিব্য সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া ছিল। সুতরাং অনুমান হয় আগুনের তাত অনুভব করিবামাত্র মরণ-বাঁচন সমস্যা আঁচিয়া প্রত্যেক মৌমাছি প্রাণপণে পাখা নাড়িয়া বাতাস করিয়া আগুনের আঁচ কমাইয়া আগুনের তাতের বিস্তার প্রতিরোধ করিয়াছিল! (গ্লীনিঙ্গস্ ইন্ বী-কাল্চার।)
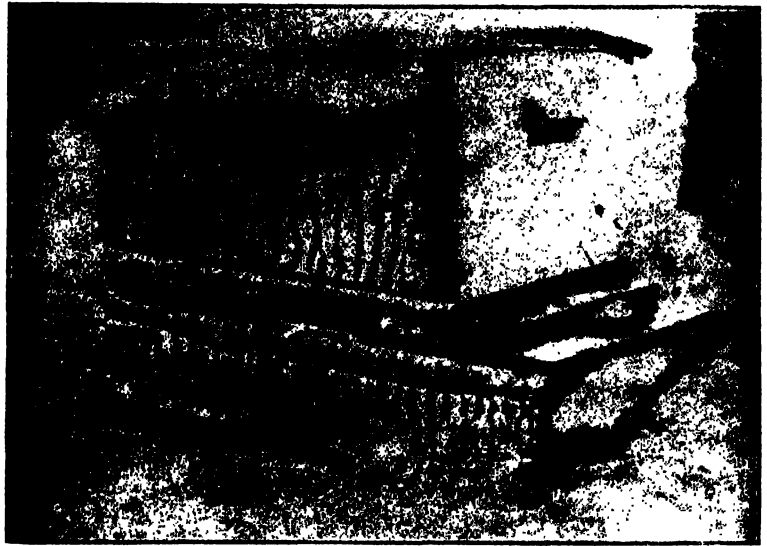
আধ পোড়া মৌচাকের ভিতরটা মৌমাছিরা ঠাণ্ডা রাখিয়া বাচাইয়াছে।

"ত্রিদোষ মার্জ্জনা"

অরূপ তোমার রূপের মাধুরী ধরিতে চেয়েছি ধ্যানে,
অবাঙ্মানস-গোচর, তথাপি বর্ণনা করি গানে।
সর্ব্বভূতের ব্যাপক তাঁহারে তীর্থের মাঝে আমি
খুঁজিয়াছি, এই অপরাধত্রয় ক্ষমিও আমার স্বামী॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

সাংখ্যের তত্ত্ব-সোপানের দ্বিতীয় পৈঁটায় অবতরণের উদ্‌যোগ

'পুরুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ প্রধানত তিন প্রকার—(১) দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সম্বন্ধ, (২) ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ, (৩) কর্তৃ-কার্য্য সম্বন্ধ। দ্রষ্টৃ দৃশ্য সম্বন্ধ হইতে যাত্রারম্ভ করা যা'ক্।

সাংখ্য-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের ১৬১ম সূত্রের বিজ্ঞান-ভিক্ষু-কৃত প্রবচন-ভাষ্যে লেখে

"পুরুষস্য যৎ সাক্ষিত্বং উক্তং তৎসাক্ষাৎ সম্বন্ধ-মাত্রাৎ, ন তু পরিণামতঃ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেন বুদ্ধিমাত্র সাক্ষিতা অবগম্যতে। সাক্ষাৎ-দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াং ইতি সাক্ষিশব্দ-ব্যুৎপাদনাৎ। সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃত্বং চ অব্যবধানেন দ্রষ্টৃত্বং। পুরুষে চ সাক্ষাৎ সম্বন্ধঃ স্ববুদ্ধিবৃত্তেরেব ভবতি। অতো বুদ্ধেরেব সাক্ষীপুরুষঃ অন্যেষাং তু দ্রষ্টৃমাত্রং ইতি শাস্ত্রীয়ো বিভাগঃ।"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

শাস্ত্রে এই যে বলা হইয়াছে "পুরুষ"—সাক্ষি-চৈতন্য, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ কেবলমাত্র আপনার বুদ্ধিরই সাক্ষী—"সাক্ষী" কি না **সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা**। অর্থাৎ দ্রষ্টা পুরুষ আপনার বুদ্ধি-রূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে, যেরূপ, তৃতীয় কোনো-কিছুর মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করে ("দর্শন করে" কি না জ্ঞানে উপলব্ধি করে)—অপর কোনো বস্তুকে, সেরূপ, **সাক্ষাৎ সম্বন্ধে** দর্শন করে না; পরন্তু বুদ্ধীতর বস্তু যখন যাহা দর্শন করে তাহা বুদ্ধির মধ্য দিয়াই দর্শন করে। সামান্যত এ কথা সত্য যে, দ্রষ্টা পুরুষ দুয়েরই দ্রষ্টা:—স্বীয় বুদ্ধিরও দ্রষ্টা, আর, স্বীয় বুদ্ধিস্থ ঘটপটাদি বিষয়-সকলেরও দ্রষ্টা; তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, স্বীয় বুদ্ধির তিনি **সাক্ষাৎ দ্রষ্টা**, এক কথায়—**সাক্ষী**; পরন্তু স্বীয় বুদ্ধিস্থ বিষয়-সকলের তিনি দ্রষ্টামাত্র ছাড়া তাহার অধিক আর কিছুই না—**সাক্ষাৎ** দ্রষ্টা না—**সাক্ষী** না॥ অনুবাদ সমাপ্ত॥

জিজ্ঞাসু॥ তাহা যেন বুঝিলাম—কিন্তু ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষুকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে দ্রষ্টা পুরুষ **আপনাকে** দর্শন করেন কী-রকম করিয়া? স্বীয় বুদ্ধিকে যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করেন—সেই রকম করিয়া, না আর-কোনো রকম করিয়া? তবে তাহার তিনি কী উত্তর দ্যা'ন?

প্রশ্নোত্তরিতা॥ ঐ অধ্যায়েরই ১৩৮শ সূত্রের প্রবচন-ভাষ্যে তিনি তোমার ঐ কথাটির উত্তর দিয়াছেন এইরূপ;—

"যত্র বস্তুনি সামান্যতো বিবাদো নাস্তি, ন তস্য স্বরূপতঃ সাধনম্ অপেক্ষ্যতে—ধর্ম্মস্যেব ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ:—যথা প্রকৃতেঃ সামান্যেনাপি সাধনং অপেক্ষিতং, ধর্ম্মিণি অপি বিবাদাৎ, নৈবং পুরুষস্য সাধনং অপেক্ষিতং। চেতনাপলাপে জগদান্ধ্য-প্রসঙ্গতো ভোক্তরি অহংপদার্থে সামান্যতো বৌদ্ধানামপি অবিবাদাৎ।......'সংহত পরার্থত্বাৎ পুরুষস্য' ইত্যুক্ত সূত্রেণাপি বিবেকানুমানমেব অভিপ্রেতং; ন তু তত্র পুরুষস্য সর্ব্বথৈব অপ্রত্যক্ষত্বং অভিপ্রেতং।"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত তাহা স্বতঃসিদ্ধ এবং যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহা প্রমাণ-নিরপেক্ষ:—কেননা সিদ্ধের সাধন তৈলাক্ত মস্তকে তৈল-প্রদানের ন্যায় নিতান্তই একটা অর্থহীন কার্য্য। প্রকৃতির বাস্তবিকতা সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার মতভেদ আছে, তাই তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ; পক্ষান্তরে, আত্মার বাস্তবিকতা সর্ব্ববাদিসম্মত তাই তাহা প্রমাণ-নিরপেক্ষ। আত্মার অপলাপে চেতনের অপলাপ হয়, এবং চেতনের অপলাপে সমস্ত জগৎ অপরিহার্য্য চিরান্ধকারে পর্য্যবসিত হয়—ইহা দেখিয়া, এমন কি, বৌদ্ধেরাও আত্মার বাস্তবিকতা স্বীকার করিতে অগত্যা বাধ্য হয়। আত্মার পারমার্থিক সত্তা অথবা, যাহা একই কথা, আত্মার স্বরূপ-সত্তা যদিচ সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু তথাপি আত্মার ধর্ম্মাদি-সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার মতভেদ আছে, আর, সেই-জন্য আত্মার **ধর্ম্মাদি বিষয়ক** মতামত প্রমাণ-সাপেক্ষ। শেষোক্ত বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছেও অত্র-দর্শনে:—তার সাক্ষী পরবর্ত্তী ১১০ম সূত্রে দেখানো হইয়াছে যে, প্রকৃতি যেহেতু ত্রিগুণের সংঘাত, আর, সংহত বস্তু মাত্রই যেহেতু পরভোগ্য—যেমন শয্যাদি, এইহেতু প্রকৃতির ভোক্তা অবশ্যই আছে। ভোক্তাকে কিন্তু কেহ যে সংহত বস্তু বলিবেন, তাহার জো নাই; কেননা ভোক্তাকে যদি সংহত বস্তু বলা যায়, তবে তাহাতে দাঁড়াইবে এই যে, ভোক্তাও শয্যাদির ন্যায় পরভোগ্য; আর তাহা হইলে লাভের মধ্যে হইবে কেবল এই যে, ভোক্তার ভোক্তা দ্বিতীয় ভোক্তা, দ্বিতীয় ভোক্তার ভোক্তা তৃতীয় ভোক্তা, এইরূপে ভোক্তার স্কন্ধে ভোক্তা আরোহণ করিয়া আদি-ভোক্তাকে ধরিবার উদ্দেশে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে যতই হাত

বাড়াইতে থাকিবে—আদি ভোক্তা ততই আকাশ হইতে আকাশান্তরে পিছাইয়া পড়িতে থাকিবে, তা বই, আপনাকে ধরা দি'বার একটিবার নামও করিবে না। অতএব প্রকৃতির ভোক্তা = অসংহত বস্তু = আত্মা, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই সূত্রটিতে (১১০ম সূত্রে) আত্মা যে, প্রকৃতি হইতে ভিন্নধর্ম্মা, এই কথাটির ('মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' বিধির অনুপন্থীদিগের ন্যায়) প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে যৌক্তিক প্রমাণ প্রদর্শন করাই সূত্রকারের অভিপ্রেত; তা বই, স্বয়ং আত্মাও যে, একান্ত পক্ষেই অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং আত্মার বাস্তবিক সত্তারও যে ঐ রকম একটা যৌক্তিক প্রমাণ দর্শানো আবশ্যক, এরূপ একটা অসঙ্গত অতিবাদ সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে॥ অনুবাদ সমাপ্ত॥

জিজ্ঞাসু॥ সাংখ্যাদি-শাস্ত্রের মতে, আত্মার বাস্তবিক স্বরূপ এবং অবাস্তবিক প্রতিরূপের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ কিপ্রকার, তাহার যদি একটা সাদা-সীধা গোচের দৃষ্টান্ত আপনি আমাকে দ্যাখান্, তবে বড়ই ভাল হয়, কেননা, দার্শনিক আচার্য্যেরা তাঁহাদের আপনাদের সূক্ষ্মদর্শী চক্ষুর কাজে-লাগিতে পারিবার-মতো-করিয়া তাত্ত্বিকী ভাষার উপনেত্র-যেগুলি গড়িয়া প্রস্তুত করিয়াছেন—সেগুলি ব্যবহার করিলে আমার তাহাতে অপকার বই উপকার দর্শে না বলিয়া, তাঁহাদের সে উপনেত্র-গুলিকে আমি অপনেত্র নামে সংজ্ঞিত করিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি—সেগুলির কোনোটির মধ্য দিয়া দেখিলে মধ্যাহ্ন দিবালোকেও সম্মুখের দৃশ্যরাজি আমার ভারাক্রান্ত চক্ষে ভূতের নাচের মতো বিকটমূর্ত্তি ধারণ করে।

প্রবোধয়িতা॥ দৃষ্টান্তের অভাব নাই:—তোমার অভিলাষের অনুরূপ সাধা-সীধা যতদূর হইতে হয় সেই রকমের একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে আমি দেখাইতেছি প্রণিধান কর:—

রাজা দশরথ পাত্র-মিত্র-গণের মধ্যে রাজধর্ম্মপরায়ণ মহীপতি; পুত্র-কলত্রের মধ্যে গৃহধর্ম্মপরায়ণ গৃহপতি; যুদ্ধযাত্রী সৈন্যসামন্তের মধ্যে ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ যোদ্ধৃপতি; বন-বিহারী মৃগ-বরাহের মধ্যে ব্যাধবৃত্তিপরায়ণ পশুহন্তা! তাঁহার বাহিরের অযোধ্যাপুরীতে তিনি তো এইরূপ বহুরূপী;—তাঁহার ভিতরের অযোধ্যাপুরীতে তিনি কিরূপ? এ অযোধ্যাপুরীর মন্ত্রপূত গণ্ডির মধ্যে—ভূপতি দশরথ, গৃহপতি দশরথ, সেনাপতি দশরথ, পশুহন্তা দশরথ, এই-সকল নানা উপাধিগ্রস্ত নানা দশরথের প্রবেশাধিকার আদবে নাই। এ অযোধ্যাপুরীর (অর্থাৎ ভিতরের অযোধ্যাপুরীর) অধিষ্ঠাতা তবে কে? এ অযোধ্যাপুরীর অধিষ্ঠাতা সেই দশরথ রাজা—যিনি না-ভূপতি, না-গৃহপতি, না-সেনাপতি, না-পশুহন্তা; যাঁহার নামও নহে দশরথ—যাঁহার ধামও নহে অযোধ্যা। ও-অযোধ্যা-পুরীর দশরথ এক সময়ে একরূপ আর-এক সময়ে আর-একরূপ, এ-অযোধ্যাপুরীর দশরথ সর্ব্বকালে একই রূপ; ও-অযোধ্যাপুরীর দশরথ নানা উপাধিতে উপহিত, এ-অযোধ্যাপুরীর দশরথ একেবারেই উপাধি-বর্জ্জিত। শয্যাগত রোগী রোগমুক্ত হইলে যেমন শয্যার অবলম্বন অগ্রাহ্য করিয়া পদ-দ্বয়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তেম্নি অবিদ্যা-গ্রস্ত সোপাধিক চৈতন্য অবিদ্যা-মুক্ত হইলে উপাধির অবলম্বন অগ্রাহ্য করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, প্রতিরূপ-স্থানীয় দশরথ-রাজা যেমন উপাধি-ভেদে নানারূপী, তার সাক্ষী—সিংহাসনে তিনি ভূপতি দশরথ, সুখাসনে বা পর্য্যঙ্কে তিনি গৃহপতি-দশরথ, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বীর-দশরথ, ইত্যাদি; সাংখ্য-মতে, তেম্নি, প্রতিরূপ-স্থানীয় পুরুষ উপাধি-ভেদে প্রধানত তিন-রূপী—মনোরাজ্যে তিনি ভোক্তাপুরুষ, কর্ম্মরাজ্যে তিনি কর্ত্তাপুরুষ, জ্ঞান-রাজ্যে তিনি বোদ্ধাপুরুষ। ভোক্তাপুরুষের উপাধি = মন; কর্ত্তাপুরুষের উপাধি = অহঙ্কার; বোদ্ধা-পুরুষের উপাধি = বুদ্ধি। পক্ষান্তরে, স্বরূপ-স্থানীয় পুরুষ উপাধি-বর্জ্জিত, আর, সেইজন্য, একই রূপ; স্বরূপ-স্থানীয় পুরুষ = কূটস্থ চৈতন্য।

জিজ্ঞাসু॥ এই যে তিনটি উপাধি'র আপনি অবতারণা করিলেন—(১) মন, (২) অহংকার, (৩) বুদ্ধি—এ তিনটি উপাধির পরস্পরের সহিত পরস্পরের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ যে, কিরূপ, তাহা আমি স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; আপনি যদি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দ্যা'ন্, তবে ভাল হয়।

প্রবোধয়িতা॥ সাংখ্য-কারিকা'র ২৫শ সূত্রের তত্ত্ব-কৌমুদী-ভাষ্যে লেখে—

"ঘটাদয়ো হি পরিমিতা মৃদাদি অব্যক্তকারণকা দৃষ্টাঃ। উক্তমেতৎ, গা—কার্য্যস্ত অব্যক্তাবস্থা কারণমেবেতি। যন্ মহতঃ কারণং তৎ রমাব্যক্তং।"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

ঘটাদি পরিমিত বস্তু-সকলের অব্যক্ত কারণ যে, ত্তিকাদি, ইহা সকলেরই দেখা কথা; বলা হইয়াছেও র্ব্বে যে, কার্য্যের অব্যক্তাবস্থার নামই কারণ। তাহা ইতেই আসিতেছে যে, মহৎ-তত্ত্বের যাহা কারণ [তাহা সর্ব্ব-গতের মূল কারণ] তাহা **পরম অব্যক্ত** [অর্থাৎ ার আর কারণ যে অংশে কারণ সেই অংশেই শুধু অব্যক্ত -**প্রধান** অর্থাৎ মূল-প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে অব্যক্ত— **পরম অব্যক্ত**]॥ ইতি অনুবাদ সমাপ্ত॥

সাংখ্য দর্শনের এই-কথাটিকে আমাদের এখানকার াজে খাটাইয়া আমরা এইরূপ পাইতেছি যে, প্রকৃতি হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইয়া চুকিলেও—শেষোক্তের (অর্থাৎ ্যক্তভাবাপন্ন জগতের তলে তলে মূল প্রকৃতি অব্যক্ত াবে কার্য্য করিতে ক্ষান্ত হয় না; তেমি আবার, হঙ্কার হইতে মন অভিব্যক্ত হইয়া চুকিলেও—শেষোক্তের অর্থাৎ ব্যক্তভাবাপন্ন মনের) তলে তলে অহঙ্কার অব্যক্ত াবে কার্য্য করিতে ক্ষান্ত হয় না; তথৈব, বুদ্ধি হইতে হঙ্কার অভিব্যক্ত হইয়া চুকিলেও—শেষোক্তের (অর্থাৎ ্যক্ত-ভাবাপন্ন অহঙ্কারের) তলে তলে বুদ্ধি অব্যক্তভাবে ার্য্য করিতে ক্ষান্ত হয় না। এ যাহা আমি বলিলাম—এ থার মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য যাহাতে তোমার সহজে হৃদয়ঙ্গম ইতে পারিবে, সেই রকমের একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে আমি দখাইতেছি, প্রণিধান কর :—

মনে কর একজন সাপুড়িয়া ভেঁপু বাজাইয়া সাপ খলাইতেছে, আর, একজন দর্শক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহা দখিতেছে। এরূপ অবস্থায় **হইতেছে যাহা** তাহা াই :—যে-যে মুহূর্ত্তে, ভেঁপু হইতে যে-যে স্বর বাহির হইয়া র্শকের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত করিতেছে আর সেই-াজে সর্পের যে-যে মূর্ত্তি হইতে রূপ-রশ্মি বাহির হইয়া দর্শকের ক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত করিতেছে—দর্শকের মনোবৃত্তি সই সেই মুহূর্ত্তে সেই সেই স্বরাকারে এবং সেই সেই মূর্ত্তি-ারী সর্পাকারে পরিণত হইতেছে। মনে কর সাপুড়িয়ার ভঁপু হইতে "সা" "রে" "গা" এই তিন স্বর পরে পরে বাহির হইল; আর, মনে কর—প্রথম মুহূর্ত্তে ভেঁপু হইতে যেই "সা" বাহির হইল, সেই-অমি সর্পটা ফণা ধরিয়া উঠিল; দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে ভেঁপু হইতে যেই "রে" বাহির হইল, সেই-অমি সর্পটা'র ফণা হেলিতে দুলিতে আরম্ভ করিল; তৃতীয় মুহূর্ত্তে ভেঁপু হইতে যেই "গা" বাহির হইল, সেই-অমি সর্পটা সাপুড়িয়ার হস্তে দ্রুতবেগে ছোবল মারিল। এ যেমন হইল দর্শকের বাহির-অঞ্চলে—দর্শকের ভিতর-অঞ্চলে, তেমি, তাহার **মনোবৃত্তি** প্রথম মুহূর্ত্তে ষড়্‌জ স্বরাকারে এবং উদ্যন্ত সর্পাকারে পরিণত হইল; দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে ঋষভ স্বরাকারে এবং দোলন্ত সর্পাকারে পরিণত হইল; তৃতীয় মুহূর্ত্তে গান্ধার স্বরাকারে এবং নিম্নন্ত সর্পাকারে পরিণত হইল। তা ছাড়া, বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এখানে এই যে, কোনো-ই ইন্দ্রিয়-গোচর-বিষয়, পথের মাঝখানে, দুই মুহূর্ত্ত-কাল দাঁড়াইয়া থাকে না; আর, সেইজন্য মনোবৃত্তির পরিগৃহীত কোনো-ই বিষয়াকার দুই মুহূর্ত্ত-কাল স্থির নহে। অধুনাতন কালের বিদ্যালয় মহলে এটা না-জানে এমন বালকই নাই যে, প্রতিক্ষণে নূতন নূতন বায়ু-স্পন্দনের আঘাতে শ্রোতার কর্ণপটহে নূতন নূতন শব্দ উৎপন্ন হয়, আর, সেইজন্য, দুই মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া একই অভিন্ন শব্দ শ্রোতার শ্রবণ-পথে বর্ত্তমান থাকিতে পারা অসম্ভব। এটাও কাহারো আবিদিত নাই যে, প্রতিক্ষণে নূতন নূতন আলোক-তরঙ্গের আঘাতে দর্শকের চক্ষু-গোলকে নূতন নূতন ছবি উৎপন্ন হয়, আর, সেইজন্য, দুই মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া একই অভিন্ন দৃশ্য দর্শকের নয়ন-পথে বর্ত্তমান থাকিতে পারা অসম্ভব। অত কথায় কাজ কি—এই যে প্রস্ফুটিত পদ্ম-ফুলটি তুমি আজ আমাকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপে প্রদান করিলে, ইহার বহির্ভাগের যে-পরমাণুগুলি বিগত মুহূর্ত্তে আমার হস্তের স্পর্শ-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ছিল—সমস্তগুলিই পদ্ম-ফুলটির গাত্র-বিনির্গত গন্ধের সহিত অ্যাক-যৌট হইয়া আকাশে উড়িয়া পলাইয়াছে; আর, তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানে পদ্মফুলটির যে-পরমাণুগুলি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমার স্পর্শ-গোচরে উপস্থিত—সবগুলিই নূতন। এটা যখন স্থির যে, ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, মনোবৃত্তির পরিগৃহীত বিষয়াকার-পরম্পরাও প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন। এখন আমরা এটা বেশ বুঝিতে

পারিতেছি যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচালনা জীব-শরীরের যেমন একটি আটপহুরিয়া ব্যাপার—আকার হইতে আকারান্তরে পরিণতি মনোবৃত্তির তেম্নি একটি আট-পহুরিয়া ব্যাপার। মনোবৃত্তির এই যে অষ্টপ্রহর ঘড়ি ঘড়ি নূতন নূতন বিষয়াকারে পরিণতি, ইহাকে বলা যাইতে পারে একপ্রকার মানসিক ভাঙন-গঠন—পুরাতন আকারের ভাঙন এবং নূতন আকারের গঠন। এইরূপ মানসিক ভাঙন গঠনের নাম, দার্শনিক ভাষায়, সংকল্প-বিকল্প অর্থাৎ কল্পনা-বিকল্পনা। অতঃপর মন এবং অহঙ্কারের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ কিরূপ তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

সকল শাস্ত্রেই বলে যে, মন=সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি; অহঙ্কার=অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তি। এ কথা যদিচ সত্য যে, মনোবৃত্তির বিষয়াকারে পরিণত হওয়ার নামই বিষয়-কল্পনা, কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ-একটি দ্রষ্টব্য এই যে, স্বপ্নাবস্থাতেই বা কি, আর, জাগরিতাবস্থাতেই বা কি, মন যখন বিষয়ের টানে পড়িয়া বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন "এ বিষয়াকারটি আমারই কল্পনা-সম্ভূত" এরূপ বোধ, অর্থাৎ আকার-পরিণতি-কার্য্যে নিজের কর্তৃত্ব-বোধ, মনের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পায় না। তাই বলি যে, সংকল্প-বিকল্প বা কল্পনা-বিকল্পনা যেমন গোড়া হইতেই মনের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম—কর্তৃত্বাভিমান সেরূপ নহে। আমাদের অন্তঃকরণের ক্রম-বিকাশের পথে কর্তৃত্বাভিমান যোটে-আসিয়া কখন্? না, আমরা যখন কোনো-একটি সখের বা কাজের বা ধ্যানের বিষয় (যেমন পদ্মফুল বা বাস-গৃহ বা দেব-প্রতিমা) প্রথমে মনের মধ্যে ভাবিয়া দাঁড় করাই, আর, তাহার পরে হাতে-কলমে গড়িয়া দাঁড় করাই, তখনই আমাদের অন্তঃকরণ-বিকাশের পথের মাঝখানে মনের একজন দোসর যোটে: কে সে? মনের দোসর—মান—অভিমান=কর্তৃত্বাভিমান। এই যে কর্তৃত্বাভিমান, ইহাই অহঙ্কারের প্রধান পরিচয়লক্ষণ। মনের ধর্ম্ম=সংকল্পবিকল্প; অহঙ্কারের ধর্ম্ম=কর্তৃত্বাভিমান। অতঃপর মন এবং অহঙ্কারের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ কিরূপ তাহার যাহাতে সহজে সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে, সেই-রকমের একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, প্রণিধান কর :--

কোনো কবি যদি একজন কাব্য-রসিক শ্রোতা'কে স্বরচিত কাব্যখানি পাঠ করিয়া শুনাইতে থাকেন, তাহা হইলে শ্রোতা কাব্যের নায়ক-নায়িকার সুখে সুখী হ'ন, দুঃখে দুঃখী হ'ন, এবং হয়-তো ঘণ্টা-দুঘণ্টা ধরিয়া উদীর্য্যমান শ্লোকাবলীর ছন্দোলালিত্যে এবং ভাব-মাধুর্য্যে এরূপ নিমগ্ন থাকেন যে, তাঁহার তখনকার বিবেচনায় ঘড়ির দুই ঘণ্টা তাঁহার দুই মিনিটও না। এরূপ অবস্থায় শ্রোতার অন্তঃকরণে অহঙ্কারের প্রবেশ-দ্বার যে একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। অহঙ্কার কিন্তু স্বরচিত-কাব্য-পাঠকটির মনের সঙ্গের সঙ্গী। এ যাহা বলিলাম ইহার যদি একটি আদর্শ-স্থানীয় দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে মালতী-মাধবের রচয়িতা কবি-কেশরী তাঁহার ঐ নাটক-খানির গৌর-চন্দ্রিমা করিতেছেন কিরূপ মর্ম্মভেদী গর্জ্জন-রবে, শ্রবণ কর :—তিনি বলিতে-ছেন

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা।
কালো হ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

"আমার সমান-ধর্ম্মা (অর্থাৎ আমার সমকক্ষ-শ্রেণীর ব্যক্তি) ভবিষ্যতে কেহ কোনো সময়ে জন্মিলেও জন্মিতে পারে অথবা বর্ত্তমানকালে কেহ কোনো দেশে থাকিলেও থাকিতে পারে, যেহেতু কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবী বিশাল॥" [অনুবাদ সমাপ্ত]

অধ্যেতা কবি—মনে কর যেন—কেন্দুবিল্ব-কুঞ্জকুটীরের জগদ্বিখ্যাত কোকিলকুলতিলক, আর, মনে কর—তিনি স্বরচিত পদাবলী অনুরাগ-ভরে পাঠ করিতে করিতে "ধীর সমীরে যমুনা-তীরে বসতি বনে বনমালী" এই স্থানটিতে উপনীত হইলেন। এ অবস্থায়, বক্তা এবং শ্রোতার দোঁহার দুইরূপ মনের ভাবের মধ্যে কোন্‌খানটায় কিরূপ মিল, এবং কোন্‌খানটায় কিরূপ অমিল, তাহা দণ্ডদুয়েকের আয়াস স্বীকার করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মীমাংসা-পথে আমি অনেকটা দূর নির্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে পারিব—এমন কি মাঝগঙ্গা পার হইয়া গম্য কূল চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান দেখিতে পাইব। অতএব, আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই বিষয়টির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

বক্তা এবং শ্রোতার উপরিউক্ত অবস্থায়—উভয়েরই নোমধ্যে "ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" ই বৃন্দাবন-ব্যাপারটির কল্পনা জুড়ি-ঘোড়ার ন্যায় একসঙ্গে লিতেছে—এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে; আর এটাও শ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বক্তার অন্তঃকরণে—চার্য্যমান শ্লোকটির রসাস্বাদনের সঙ্গে "আমি এই াকটির রচয়িতা" এই নিরীহ-শ্রেণীর অভিমানটুকু মমতা'র াটায় জোড়া লাগানো রহিয়াছে। এইসঙ্গে এটাও দ্রষ্টব্য , রসাস্বাদন = ভোগ-বিশেষ, রচনা = কর্ম্ম বিশেষ; আর, াহা হইতেই আসিতেছে যে উপরিউক্ত অধ্যেতা কবি = চাক্তা এবং কর্ত্তা দুইই একাধারে। বক্তা যেন হইল ইই একাধারে, কিন্তু শ্রোতা কী? তুমি হয় তো বলিবে , শ্রোতা কেবলমাত্র ভোক্তা—কর্ত্তা মূলেই না। ামি কিন্তু তাহা বলি না। আমি বলি এই যে, বক্তা বং শ্রোতা উভয়েই কর্ত্তা এবং ভোক্তা একাধারে:—প্রভেদ কেবল এই যে, শ্রোতার মনের অবস্থা ভোগ-প্রধান —বক্তা'র মনের অবস্থা কর্ম্মপ্রধান। "ভোগপ্রধান অবস্থা" লিতে এরূপ বুঝায় না যে, সে-অবস্থা-সুলভ ভোগের সহিত **কর্ম্মের** আদবেই কোন সম্পর্ক নাই; "কর্ম্মপ্রধান অবস্থা" বলিতেও এরূপ বুঝায় না যে, সে-অবস্থা-সুলভ কর্ম্মের সহিত **ভোগের** আদবেই কোনো সম্পর্ক নাই। কী তবে বুঝায়? "ভোগপ্রধান অবস্থা" বলিতে বুঝায় —**যে অবস্থায়** ভোগ নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করে এবং কর্ম্ম নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তলে তলে চলিতে থাকে; "কর্ম্ম-প্রধান অবস্থা" বলিতে বুঝায়—**যে অবস্থায়** কর্ম্ম নিজমূর্ত্তি ধারণ করে এবং ভোগ নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তলে তলে চলিতে থাকে।

জিজ্ঞাসু॥ আমার একটি কথার আপনি উত্তর দি'ন:—একজন ভক্ত বৈষ্ণব যখন ভাবে ভোর হইয়া জয়দেবের পদাবলী শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার মন শ্রূয়মাণ শ্লোকের রসাস্বাদনে যেরূপ ভরপূর নিমগ্ন থাকে—মনের সেরূপ মগ্নাবস্থায়—কর্ম্ম দূরে থাকুক—কর্ম্মের গোড়ার বনিয়াদ যে, "অহং" বলিয়া একটা পাষাণ-জিনিষ্ কঠিন পদার্থ, তাহা পর্য্যন্ত গলিয়া জল হইয়া ভাবাশ্রু-সাগরে **আত্মবিসর্জ্জন** করে। এইরূপ যখন দেখিতেছি যে, মনের ভরপূর ভোগাবস্থায় কর্ম্ম তাহার কাছ-ঘেঁসিতেই পারে না, তখন, কেমন করিয়া বলিব যে, মনের সে-অবস্থাতেও তাহার তলে তলে কর্ম্ম চলিতে থাকে।

প্রবোধয়িতা॥ তোমার শেষের এই তর্কটি শুনিয়া কাণ্টের একটি উপমা আমার স্মরণ হইতেছে। উপমাটি সে এই:—

> "The light dove, piercing in her easy flight the air and perceiving its resistance, imagines that flight would be easier still in empty space."

কাণ্টের এই উপমাটিকে—**কাণ্ট্** প্রয়োগ করিয়াছেন অতীন্দ্রিয়ভক্তদিগের উপরে—**আমি** প্রয়োগ করিতে চাই তোমার ন্যায় একদিক্‌দর্শী তর্কবাগীশদিগের উপরে। আকাশের উচ্চতর প্রদেশের লঘু বায়ুতে উড্ডয়ন-ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বাধা-মুক্ত হয় দেখিয়া কাণ্টের কপোতটি যেমন মনে করিল যে, "বায়ু যদি একেবারেই না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের মতো খেচর জীবের আকাশে চলা-ফেরার পক্ষে সুবিধার চূড়ান্ত হইত—আমাদের জাতির উড্ডয়ন-ক্রিয়া একেবারেই নির্বাধা হইত;" তেম্নি, কর্ম্ম যেখানে অগত্যা-সুলভ, সেখানে ভোগ অপেক্ষাকৃত অবাধে চলিতে থাকে দেখিয়া তুমি মনে করিতেছ যে, ভোগের সহিত কর্ম্ম যদি মূলেই লিপ্ত না থাকিত তবে ভোগ একেবারেই নিষ্কণ্টক হইত। কপোত যেমন দেখিতেছে না যে, পক্ষ চালনার মূলে বায়ু বর্ত্তমান না থাকিলে পক্ষ-চালনাটি সমূলে ব্যর্থ হইয়া যায়; তুমি তেম্নি দেখিতেছ না যে, ভোগের মূলে বুভুক্ষা-জনিত কর্ম্ম-চেষ্টা বর্ত্তমান না থাকিলে ভোগ-টি সমূলে ব্যর্থ হইয়া যায়। তোমার জানা উচিত—

প্রথমতঃ, শরীরের মধ্যে যেমন রক্তের প্রবাহ যথা-নিয়মে চলা-ফেরা করিতে থাকিলে শরীরে স্বাস্থ্যের ভোগ হয়, জয়দেবের পদাবলী তেম্নি যথা-নিয়মে উচ্চারিত হইতে থাকিলে বৈষ্ণব শ্রোতার মনে আনন্দের ভোগ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উপবাস-ক্লান্ত শরীরে রক্তের পুঁজি ফুরাইলে উপবাসীর মনে যেমন রক্তের খাঁক্তি-পূরণের বাসনা আবির্ভূত হয়, আর, তাহারই নাম যেমন ক্ষুধার উদ্রেক; তেম্নি পাঠক্লান্ত পাঠকের পাঠ বন্ধ হইলে, ভাবগ্রাহী শ্রোতার

মনে বাকি-পূরণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়, আর, তাহারই নাম কাব্যরস-লিপ্সা।

তৃতীয়তঃ, পথ-যাত্রীর উপোষিত জঠরে ক্ষুধার প্রাবল্য হইলে তাঁহার মনোমধ্যে যেমন ভোজ্য অন্নের কল্পনা-বিকল্পনা মুহুর্মুহু চলিতে থাকে, তেম্নি ভাবুকের উপোষিত শ্রবণে কাব্যরস-লিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিলে, তাঁহার মনোমধ্যে জয়দেবের বা বিদ্যাপতির বা কালিদাসের বা অপর কোনো বিখ্যাত কবির সরস পদাবলীর আবৃত্তি-প্রত্যাবৃত্তি মুহুর্মুহু চলিতে থাকে।

চতুর্থতঃ, সুস্থদেহ ব্যক্তির স্বাস্থ্য-ভোগের তলে-তলে যেমন তাঁহার রক্তের পরিভ্রমণ-কার্য্য অব্যক্ত ভাবে চলিতে থাকে, ভাব-গ্রাহী শ্রোতার অন্তঃকরণ-মধ্যে তেম্নি শ্রূয়মান পদাবলীর রসাস্বাদনের তলে-তলে সেই পদাবলীর মানসিক উচ্চারণ-কার্য্য অব্যক্ত ভাবে চলিতে থাকে। আবার, যেমন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে সুস্থদেহ ব্যক্তির মনে ভোক্তব্য অন্নের কল্পনা জাগিয়া ওঠে, তেম্নি, পাঠারম্ভের ঘণ্টা বাজিলে শ্রবণেচ্ছু ভাবুকের মনে শ্রোতব্য কাব্য-কাহিনীর কল্পনা জাগিয়া ওঠে। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত মানসিক উচ্চারণ-কার্য্যও যেমন, আর শেষোক্ত সুব্যক্ত কল্পনাকার্য্যও তেম্নি, দুইই **কর্ম্ম-বিশেষ**। **ভোগের** আষ্টে-পৃষ্ঠে **কর্ম্ম**, এইরূপ, নাগ-পাশের ন্যায় জড়ানো রহিয়াছে, অথচ, তুমি তোমার দুর্দমনীয় তর্ক-প্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না—এটা বড় ভাল কথা নহে।

জিজ্ঞাসু॥ আমার **তর্কপ্রবৃত্তি-বাছাটি** চির-জীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকুক্! রামচন্দ্রের ভক্ত অনুচর যেমন গন্ধমাদন পর্ব্বতের মস্তক হইতে তাহার ওষধি-ভূষিত মুকুট একজন রিয়া রামচন্দ্রের হর্ষোৎফুল্ল বিস্মিত নয়নের সম্মুখে অভিমান স্থিত করিয়াছিল—আমার **কৃতি-শ্রেষ্ঠ** অহঙ্কারের **প্রতিভূটি**, তেম্নি, আপনার চক্ষু-রাঙানি এবং অহঙ্কারের ধর্ম্মবিদ্যুৎবজ্রে না টলিয়া আপনার বিজ্ঞানময় অহঙ্কারের মধ্যে কটি মূল্যবান সত্য হরণ করিয়া আমার সহজে সন্ধান পাওয়ার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, —

কোনো কবি যদি সম্মুখস্থিত ঐ শূন্য উপহার-ডালিটাতে মিনিটপাঁচেক পূর্ব্বে রাশীকৃত-করিয়া-সাজাইয়া-রাখা আম্র-নিচয়ের তলে আম্রসৌরভ যে চাপা দেওয়া ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, ডালিটার চারিদিকে এখনো পর্য্যন্ত মাছি ভন্‌ভন্ করিতে ছাড়িতেছে না, তেম্নি, ভক্ত শ্রোতার অন্তঃকরণ-ডালিতে শ্রূয়মান জয়দেব-পদাবলীর রসাস্বাদন-রূপ **ভোগের** তলে যে, পদাবলীটির রচনা-কার্য্য চাপা-দেওয়া ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, পদাবলীটির পাঠ বন্ধ হইলেও কেবলমাত্র বাসনা-মূলক কল্পনার বলে তাহার রচনাকার্য্য শ্রোতার মনে মনে চলিতে থাকে। আমার তর্কপ্রবৃত্তিটির দুর্দমনীয়তা'র গুণে এক্ষণে—ভরপুর ভোগের অবস্থাতেও ভোক্তা পুরুষের অন্তঃকরণে **কর্ম্ম** যে, অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় তলে-তলে চলিতে ক্ষান্ত হয় না—এটা আমি বেশ্ বুঝিতে পারিয়াছি। একটি বিষয় কিন্তু এখনো আমার বুঝিতে বাকি আছে; সংকল্প বিকল্পাত্মক মন এবং অভিমানাত্মক অহঙ্কার এই দুইটি অন্তঃকরণ-বৃত্তির মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ কিরূপ—এটা এখনো আমার বুঝিতে বাকি আছে। এইটি আপাতত আমাকে আপনি বুঝাইয়া দি'ন্;—বুদ্ধির সহিত অহঙ্কারের কিরূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, তাহা পরে বুঝাইবেন।

প্রবোধয়িতা॥ এ তো তুমি জানিতেইছ যে, কর্ত্তা অনেক সময়ে কর্তৃত্ব ফলাইবার জন্য কর্ম্ম করেন:—এটাও তেম্নি তোমার জানা উচিত যে, ভোক্তা কোনো সময়েই আপনার ভোক্তৃত্ব ফলাইবার জন্য ভোগ করেন না।

ভোগ তমোগুণপ্রধান কামনা এবং বাসনার—সাদা কথায় প্রবৃত্তির ঝোঁকের—এক-যা-কেবল নিবাস-স্থান, তা বই, তাহা অহঙ্কারের নিবাস-স্থান নহে; **অহঙ্কারের** নিবাসস্থান কোনো যদি থাকে, তবে তাহা **কর্ম্ম**। এটাও কিন্তু দেখা চাই যে, ভোগ অহঙ্কারের নিবাস-স্থান না হউক্—**ভোগ** অহঙ্কারের একপ্রকার প্রবাস-স্থান, তাহাতে আর ভুল নাই। অজ্ঞাতবাসের স্বল্পাবশেষের সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির যেমন বিরাট রাজার রাজ-সভায় অব্যক্ত মহিমায় দিন-যাপন করিতেন, ভোগের রাজ-প্রাসাদে তেম্নি **অহঙ্কার** আপনার নিজমূর্ত্তি গোপন করিয়া প্রভাতের তারকা-নিকরের ন্যায় অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকে।

রাজা দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডবগণের নিমন্ত্রণ-মতে ইন্দ্রপ্রস্থে

যমন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক বহুল যত্নসমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হইয়া ময়দানবের বিনির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য প্রাসাদের অন্তর্ভূত বিচিত্র সভাঘর, বিচিত্র বৈঠকঘর, বিচিত্র ভোজনঘর, বিচিত্র শয়নঘর, দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন প্রত্যেক ঘরের চমৎকার শোভা-সৌন্দর্য্য শিল্পকারীকরী এবং উপকরণ-পারিপাট্য দেখিয়া তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। যে-যে মুহূর্ত্তে যে-যে দৃশ্য তাঁহার নয়ন-পথে আবির্ভূত হইতে লাগিল, সেই সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনোবৃত্তি সেই সেই দৃশ্যাকারে পরিণত হইতে লাগিল। এইরূপ নানাবিধ বিচিত্র মনোহর দৃশ্যের কল্পনা-বিকল্পনার তরঙ্গের তোড়ে—তিনি যে মহা-মহীপতি দুর্য্যোধন—এ কথাটি ডুবন্ত নৌকার ন্যায় তাঁহার মনের অনেক হাত নীচে চাপা পড়িয়া গেল। তাহার পরে তিনি যখন পাণ্ডবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তখন পশ্চাতে-ফেলিয়া-আসা দৃশ্যাবলীর দর্শন-বাসনা, ঝঞ্ঝা-বায়ুর ন্যায়, তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল, আর তাহার প্রত্যেক দমকে সেইসকল দৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীর সংকল্প-বিকল্প, তরঙ্গমালার ন্যায়, ওঠাপড়া করিতে লাগিল। ইহারই নাম জাগ্রৎস্বপ্ন। রাজা দুর্য্যোধনের মনের অবস্থা ইন্দ্রপ্রস্থে যেরূপ হইয়াছিল, তাহাকে বলা যাইতে পারে ভোগাবস্থা; রথারোহণের কিয়ৎপরে তাঁহার মনের অবস্থা যেরূপ হইল তাহাকে বলা যাইতে পারে বাসনাবস্থা। এ কই দৃশ্যাবলীর সংকল্প-বিকল্প যাহা ভোগাবস্থায় তাঁহার বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি-স্রোতের নিম্নস্তরে চাপা-দেওয়া ছিল—বাসনাবস্থায় তাহাই তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয়ের উপরি-স্তরে ভাসিয়া উঠিল। এ দুই অবস্থার এটাতেও যেমন—ওটাতেও তেম্নি, দুটা'র কোনটাতে সংকল্প-বিকল্পের মধ্য হইতে অহঙ্কার মাথা তুলিতে অবকাশ পাইল না। তাহা পরে হস্তিনা-পুরে উপনীত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন যখন পারিষদমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাসীন হইলেন, তখন "কী দেখিলেন" এ কথাটা তাঁহার মনের একপার্শ্বে সসংভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইয়া, "কে দেখিলেন" এই কথাটাকে সম্মুখে এগিয়া-দাঁড়াইতে পথ ছাড়িয়া দিল; আর তৎক্ষণাৎ অহঙ্কার অপর পার্শ্ব হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"দেখিলেন যাঁহা তাহা নগণ্যের মধ্যে; দেখিলেন যিনি তিনি রাজা দুর্য্যোধন; সেই রাজা-দুর্য্যোধন—যিনি ইচ্ছা করিলেই উহা অপেক্ষা কোটি গুণ উৎকৃষ্টতর কোটি-কোটি অট্টালিকায় হস্তিনাপুরী ছাযিয়া ফেলিতে পারেন রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে।" মাস-খানেক পরে সুবিখ্যাত শকুনি-মামা রাজধানীস্থ প্রধান প্রধান স্থাপত্য-শিল্পীর পরামর্শ মতে আপনার প্রবল-প্রতাপান্বিত ভাগিনেয়-মহারাজের পছন্দসই প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকা নগরপ্রান্তে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন; আর যখন সেই অট্টালিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী দৃশ্য-শালাটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে বিদুর'কে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কোথায় যাইতেছ? এক মুহূর্ত্তকাল আমার সঙ্গে আইস:—সম্মুখে চাহিয়া দেখ;—সে অট্টালিকাও তুমি দেখিয়াছ, আর, এ অট্টালিকাও তুমি দেখিতেছ—কোন্‌টা তোমার মতে উৎকৃষ্টতর?" বিদুর বলিলেন—"দুয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে আমার এই-রূপ মনে হয় যে, সে অট্টালিকার নির্ম্মাণকর্ত্তার অন্তঃকরণের পুঁজি পোনেরো আনা অভিজ্ঞতা + এক আনা অভিমান; এ অট্টালিকার নির্ম্মাণকর্ত্তার অন্তঃকরণের পুঁজি = এক আনা অভিজ্ঞতা + পোনেরো আনা অভিমান। আমি তাই বলি যে, অভিমান অপেক্ষা অভিজ্ঞতা যদি উৎকৃষ্টতর অন্তঃকরণ-বৃত্তি হয়, তবে সেই অট্টালিকাটা উৎকৃষ্টতর; আর, যদি অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অভিমান উৎকৃষ্টতর অন্তঃকরণ-বৃত্তি হয়, তবে এই অট্টালিকাটা উৎকৃষ্টতর।"

এই দৃষ্টান্তটির আলোকে দ্রষ্টা পুরুষের মুখ্য তিনটি অন্তঃকরণ-বৃত্তির কাহার সহিত কাহার কিরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাহা দেখিতে পাইয়াছ কি? না, এখনো তাহা দেখিতে পাও নাই?

জিজ্ঞাসু॥ আপনার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটির আলোকে এটা আমি বেশ্ দেখিতে পাইতেছি যে, ইন্দ্রপ্রস্থের দৃশ্য-দর্শন-কালে দুর্যোধনের বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি-পথের নিম্নস্তরে তাঁহার সংকল্পবিকল্পাত্মক মনোবৃত্তি অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় অলক্ষিত-ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, আর, তাহারো অভ্যন্তরে কর্ত্তৃত্বাভিমান ভূগর্ভশায়ী অনলের ন্যায়

চাপা-দেওয়া ছিল। তাহার পরে যখন তাঁহাকে লইয়া তাঁহার রথ হস্তিনাপুরের অভিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তখন পশ্চাতের দৃশ্যাবলী হইতে তাঁহার বহিরিন্দ্রিয় যদিচ বিয়োজিত হইয়াছিল, তথাপি ফুলের সাজি হইতে সঞ্চিত-পূর্ব্ব ফুলের পুঁজি বাহির করিয়া লওয়া হইলেও সাজিটা যেমন ফুলের বাসে ভরা থাকে—দুর্যোধনের মন তেমি পশ্চাতে-ফেলিয়া-আসা দৃশ্যাবলীর বাসনায় ভরা-থাকা কারণে সেইসকল রমণীয় দৃশ্যাবলীর সংকল্প-বিকল্প তাঁহার মনোমধ্যে ঢেউ খেলিতে লাগিল। তাঁহার রথ হস্তিনা-পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল কিন্তু তাঁহার মনের টান ইন্দ্রপ্রস্থের দৃশ্যাবলীর মাঝখান হইতে তাঁহার আপনার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এখনো পর্য্যন্ত সময় পাইল না। তাহার পরে যখন তিনি রথ হইতে নাবিয়া পারিষদ-মণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাসীন হইলেন, তখন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি পশ্চাতে-ফেলিয়া-আসা রমণীয় দৃশ্যাবলীর মাঝখান হইতে তাঁহার আপনার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সুযোগ পাইল; আর, সেই সুযোগে তাঁহার মনোমধ্যে অহঙ্কার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। যে অহংকার এযাবৎকাল পর্য্যন্ত চিত্তচমৎকারিণী দৃশ্যাবলীর কল্পনা-বিকল্পনার নীচে চাপা-পড়িয়া আপনাতে আপনি ছিল না বলিলেই হয়, **সেই অহঙ্কার** এক্ষণে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। অহঙ্কার করিল কি? অহঙ্কার শিল্পবিজ্ঞানের কোনো ধার ধারে না—সুতরাং ইন্দ্র-প্রস্থের রাজপ্রাসাদের ন্যায় অমন একটা চিত্তচমৎকারী মহাশ্চর্য্য ব্যাপার গড়িয়া তোলা দূরে থাকুক্, তাহা মনে ভাবিয়া উঠাও তাহার সাধ্যের অতীত; কিন্তু তা বলিয়া সে পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নহে:—ইন্দ্রপ্রস্থ পুরীকে গ্রাস করিবার মানসে সে মহাবীর মস্ত একটা মণিরত্ন-বিভূষিত দ্যূতশালা গড়িয়া দাঁড় করাইয়া আপনার অজেয় ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিল। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটির আলোকে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন এবং অভিমানাত্মক অহঙ্কারের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ যে, কিরূপ, তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি।

প্রবোধয়িতা॥ তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—"দুয়ের মধ্যে অভেদই বা তুমি কী দেখিলে—প্রভেদই বা তুমি কী দেখিলে?" তবে তুমি তাহার কী উত্তর দ্যাও?

জিজ্ঞাসু॥ দুই কথায় আমি তাহার উত্তর দিই এইরূপ:—দুয়ের মধ্যে অভেদ **মূলস্থানে**—"দুইই অন্তঃকরণ-বৃত্তি" এইস্থানে; দুয়ের মধ্যে প্রভেদ **অবান্তর স্থানে**—"সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন—বিষয়-ঘ্যাঁসা অন্তঃকরণবৃত্তি, অভিমানাত্মক অহঙ্কার—বিষয়ী-ঘ্যাঁসা অন্তঃকরণ-বৃত্তি" এইস্থানে।

প্রবোধয়িতা॥ প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটির সঙ্গে তোমার শেষোক্ত কথাটির মিল কোন্‌খানটায়?

জিজ্ঞাসু॥ প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটির সঙ্গে আমার শেষোক্ত কথাটার যে-স্থানটিতে মিল, সেস্থানটি এই:—দুর্যোধনের ভোগাবস্থায় এবং বাসনাবস্থায় তাঁহার অন্তঃকরণবৃত্তি যখন ইন্দ্রপ্রস্থের দৃশ্যাবলীর প্রতি একটান বেগে ধাবমান হইতে-ছিল, **তখনই** সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনোবৃত্তি তাঁহার অন্তঃকরণে ঢেউ খেলিতেছিল; আর, তাঁহার বিমর্শাবস্থায় (অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে reflection সেই reflectionএর অবস্থায়) তাঁহার অন্তঃকরণ-বৃত্তি যখন পশ্চাতের দৃশ্যাবলী ছাড়িয়া তাঁহার **আপনার** প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিল, **তখনই** তাঁহার অন্তঃকরণে অহঙ্কার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

প্রবোধয়িতা॥ ফের আবার যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে—"দেখিতে **পাইতেছ না** তবে তুমি কী?" তাহার তুমি কী উত্তর দ্যাও?

জিজ্ঞাসু॥ তাহার আমি উত্তর দিই এই যে, মন এবং অহঙ্কারের সহিত **বুদ্ধির** যে কিরূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ —প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটির মধ্যে তাহার কোনো স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না।

প্রবোধয়িতা॥ তাহা যদি তুমি না-দেখিতে পাইয়া থাক, তবে তাহা আমি তোমাকে দেখাইতেছি—কিন্তু একটু ধীরে সুস্থে রহিয়া বসিয়া; তা বই, তাহা তড়িঘড়ির কর্ম্ম নহে। বাস্তবিকই—বুদ্ধিকে বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে বাগাইয়া আনা বড্ড একটা কঠিন সমস্যা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উদ্যান রচনা

উদ্যান রচনা করাও একটি বিশেষ শিল্প। একটি বিশেষ নক্সা অনুসারে সৌন্দর্য্য ও সঙ্গতির সমাবেশ করিয়া উদ্যান রচনা করিতে হয়। সুতরাং উদ্যান রচনায় সৌন্দর্য্যবোধ ও সঙ্গতিবোধ দুই মিলাইয়া উদ্যান রচক একটি উদ্দেশ্যকে রূপদান করিতে চেষ্টা করে। উদ্যানের নক্সা সরল-রেখাবদ্ধ বা বক্ররেখাবদ্ধ, মিল রাখিয়া (symmetrical) বা অমিল করিয়া (asymmetrical) হইতে পারে।

হ্রদ, ধারাযন্ত্র, সরিৎ, বন্য প্রভৃতি থাকিত। তারপর মোগল আমলে ভারতবর্ষ উদ্যান রচনায় কিরূপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় শালিমার বাগ, খস্রু বাগ, তাজ-মহলের হাতার বাগিচা প্রভৃতি দেখিলে ও ভিলিয়ার্স ষ্টুয়ার্ট সাহেবের লেখা Gardens of the Great Mughals নামক পুস্তকপাঠ ও তাহাতে সংগৃহীত চিত্রাবলী দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মোগলের উদ্যান রচনার নক্সা প্রায় সবই সরলরেখাবদ্ধ ও মিল রাখিয়া করা। ভারতবর্ষের আধুনিক বাগানগুলি প্রায় বক্ররেখাবদ্ধ ও অমিল করিয়া রচিত।
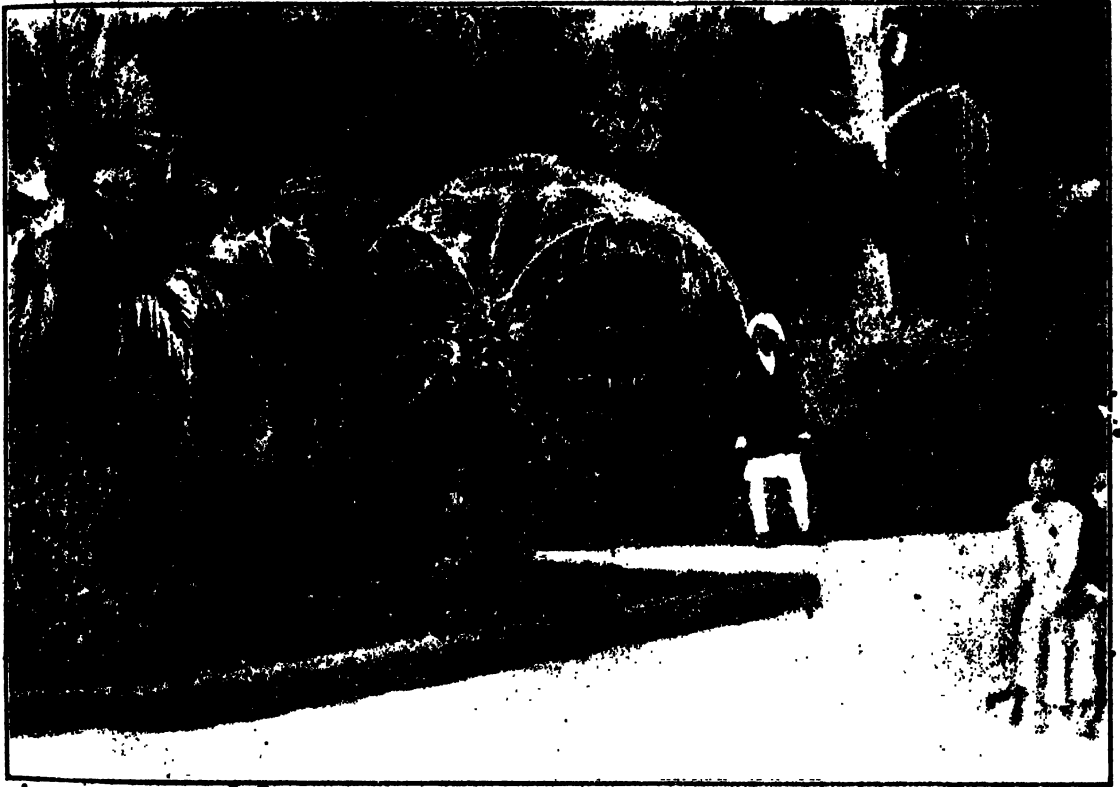
১। বাগানের পথের চৌমাথার লতাবিতান।
(পঞ্জাব রাজসরকারের-বাগান)

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই উদ্যান-রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত, আমরা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে জানিতে পারি। কাব্যে নাটকে কথায় প্রায়ই উদ্যানের বর্ণনা থাকিতে দেখা যায়—শকুন্তলা, রত্নাবলী, কাদম্বরী প্রভৃতি পড়িলেই উদ্যানের একটা আভাস আমরা পাইতে পারি। উদ্যানে বৃক্ষবাটিকা, লতাবিতান, কুঞ্জ, ক্রীড়াশৈল,

ভারতবর্ষ অতি প্রকাণ্ড দেশ; ইহার আব-হাওয়া সর্ব্বত্র সমান নয়; জমি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যও নানাবিধ; কোনো অংশে বৎসরে ৩০০ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে, কোনো অংশে বা সারা বৎসরে এক ইঞ্চি বৃষ্টিও হয় না। সুতরাং এখানে স্থান ও আবহাওয়া ভেদে নানা-রকমের বাগান হইতে পারে। ভারতবর্ষের নামজাদা অনেক উৎকৃষ্ট বাগান সেইগুলি,
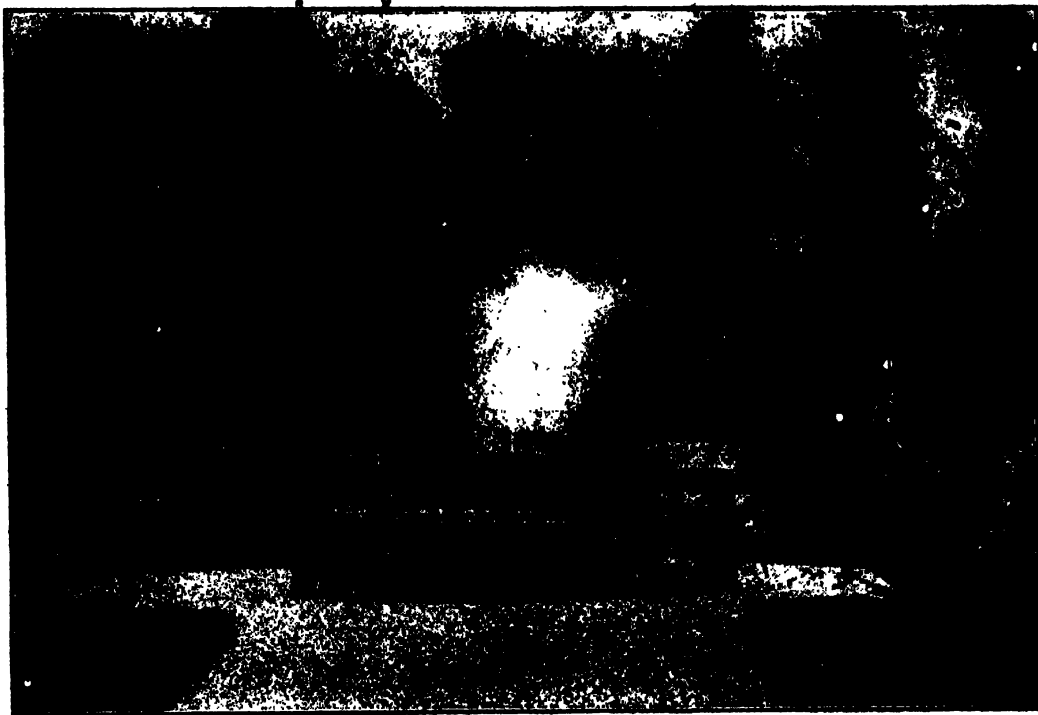
২। ফোয়ারার পিছনে গাছের দেয়াল।
(গওাল রাজসরকারের বাগান)
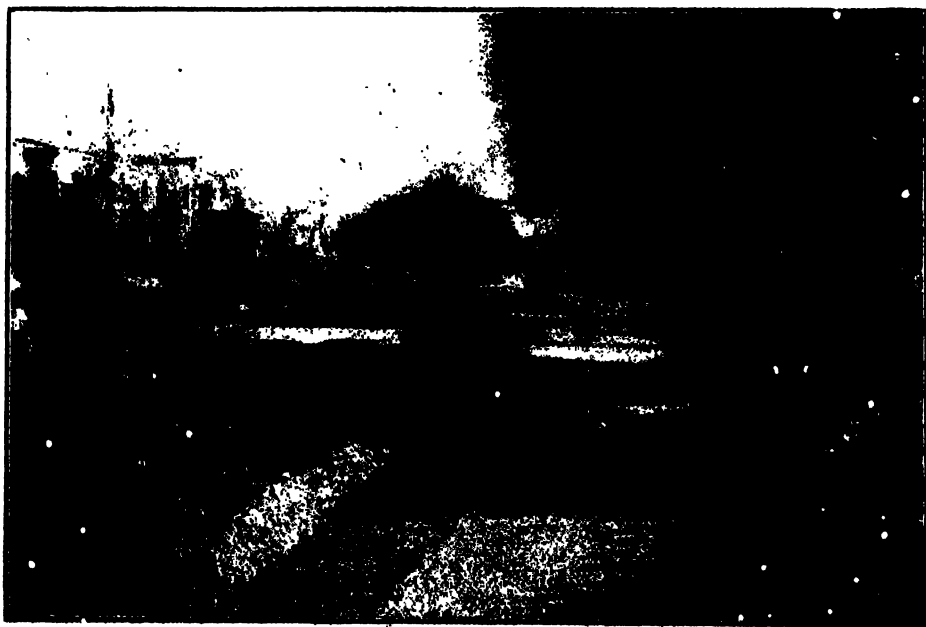
৩। ঘাস-জমি, ফুলের কেয়ারি, পাড় ও গাছ।
(পুনায় গভর্মেণ্ট হাউসের বাগান)
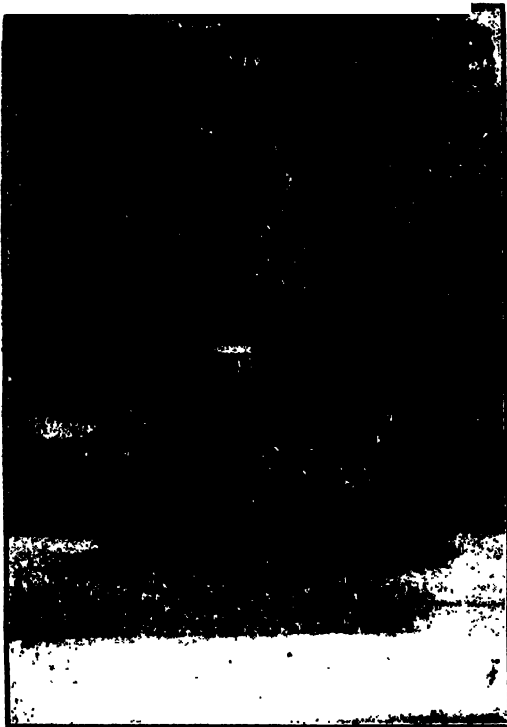
৪। বাড়ী ও গাছের বিপরীত সুষমা
(জুনাগড় রাজসরকারের বাগান)
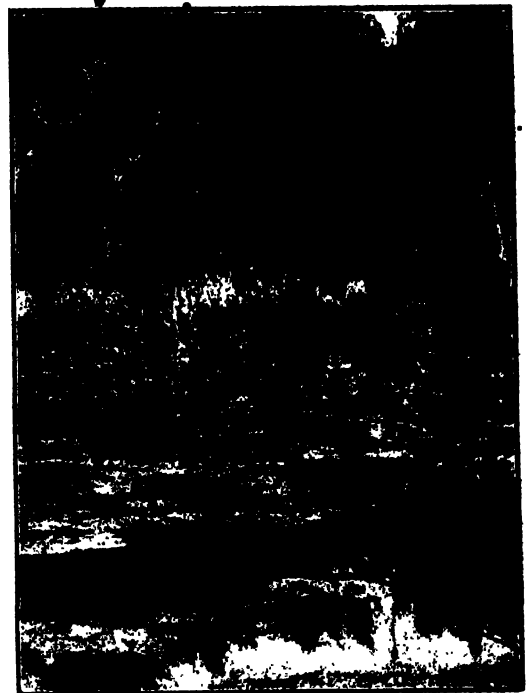
৫। পদ্মপুকুর।
(পুনার গভর্মেণ্ট হাউসের বাগান)

৬। সবজী-ঘর বা পর্‌গোলা। (পুনায় সার্ দোরাব তাতার বাগান)
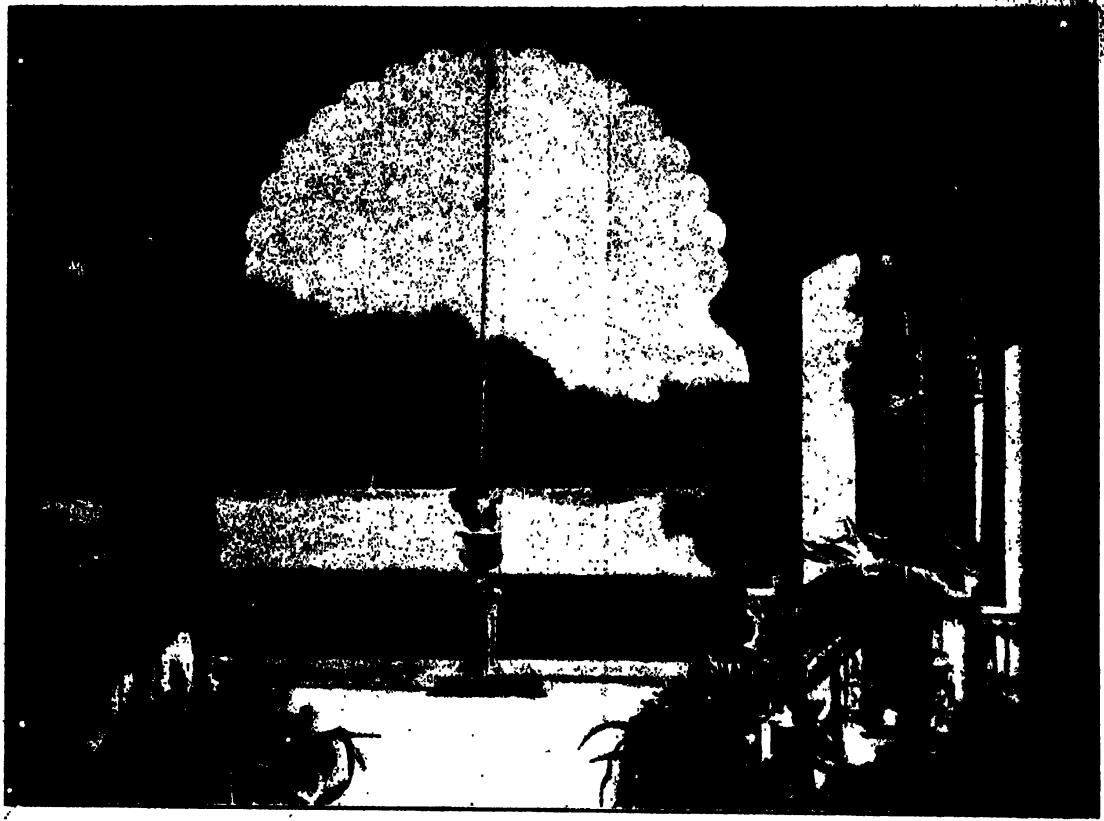
৭। বাগানবাড়ী ও বাগানের বাহিরের দৃশ্য।
(কোটা রাজসরকারের বাগান)

যেগুলিকে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর না রাখিয়া জলসেচনের দ্বারা রক্ষা করা হইতেছে। উদ্যানে জলসেচনের জন্য নহর, কূপ, হ্রদ প্রভৃতি নিকটে থাকা ও জল উত্তোলনের সুব্যবস্থা থাকা দরকার।

যখন বাতাস ও জমি গরম অথচ রসা থাকে তখন বাগানে এমন বেশী আগাছা জন্মে যে চটপট হাতাহাতি সেগুলি উৎপাটন না করিলে বাগান জঙ্গল হইয়া অনায়ত্ত হইয়া পড়ে। যখন বাতাস ও জমি গরম ও শুষ্ক থাকে তখন গাছপালা কয়েক ঘণ্টা জল না পাইলেই আমলিয়া পড়ে। যখন বর্ষা বেশী হয় তখন জলনিকাশের জন্য পৈঠা ও নালি কাটা না থাকিলে গাছপালা পচিয়া উঠে।

গাছপালার শত্রু কীটপতঙ্গ ও ছাতা পরগাছা প্রভৃতির দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা মালীর কর্ত্তব্য।

য়ুরোপে একজন শিক্ষিত দক্ষ মালী একাই ৬ কাঠা জমির বাগান রক্ষা করিতে পারে। ভারতবর্ষে এখন শিক্ষিত দক্ষ মালীর নিতান্ত অভাব। যাহারা মালীর কাজ করে তাহারা বাগানে কুলির কাজ করিতে করিতে মনে করে মালী হইয়া উঠিয়াছি। ভালো করিয়া উদ্যান-রচনা ও উদ্যান পালন শিখিতে পারিলে মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা বেতন অনায়াসে মিলিতে পারে।

উদ্যান-রচনায় যেখানে নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা আছে সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন উদ্যানের পত্তন করিতে পারিলে ভালো হয়। (১) জমি অন্তত তিন ফুট গভীর পর্য্যন্ত খুব সারালো উর্ব্বরা হইবে, এবং তাহার নীচের স্তর বেলে সচ্ছিদ্র হইবে; যেখানকার জমি খুব গভীর পর্য্যন্ত সারালো সেখানকার নিম্নস্তর আঁটালো হইলেও ক্ষতি নাই। (২) সস্তায় সহজপ্রাপ্য প্রচুর জলের ব্যবস্থা নিকটেই থাকিবে। (৩) বাগান জমিতে বাতাসের

ঝাপটা না লাগে এমন আড়াল থাকিবে। (৪) যে ও যাহাদের জন্য উদ্যান রচিত হইবে সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সম্পন্ন হয় ও সেই লোকেরা যাহাতে অনায়াসে ইচ্ছামাত্র সেই বাগানে যাইতে পারে এমন জায়গায় বাগান হওয়া উচিত।

উদ্যানকে সুসজ্জিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির সুসমাবেশ ও সুসঙ্গতি হওয়া উচিত। (১) অলিগলি ও পথ; (২) গাছ, ঝোপ, বেড়া; (৩) ফুলের কেয়ারি ও তাহার পাড়; (৪) টবের গাছ; (৫) লতা ও পরগাছা; (৬) শষ্পক্ষেত্র বা ঘাস-জমি; (৭) জল, ঝিল, ফোয়ারা; (৮) ইমারত, মূর্ত্তি ও জড় অলঙ্কার; (৯) সজীঘর ও পরগোলা। এখন একে একে এই নবাঙ্গের আলোচনা করা যাক।

৮। ঘাস-জমির মাঝে ফোয়ারা ও ঘাস-জমির কিনারে পাড়।
(পুনায় সার্ দোরাব তাতার বাগান)

(১) উদ্যানের অলিগলি ও পথ।

যে জায়গায় উদ্যানের পত্তন হইবে সেই জায়গায় আগে সমস্ত অলিগলি ও পথ ছকিয়া লইয়া পথের সীমায়-ঘেরা জায়গায় ফুলের কেয়ারি, ফোয়ারা, ঝিল, সজীঘর বা পরগোলা, মূর্ত্তি ও অপর অলঙ্কার সুসজ্জিত করা দরকার। পথ কোথাও সোজা, কোথাও আঁকাবাঁকা করিতে হয়। মোগল আমলের বাগানের সব পথই সীধা সোজা সমস্ত পথ সরলরেখা হইলে সব বাহু মিলাইয়া বিচিত্র জ্যামিতিক নক্সা তৈরি করা যাইতে পারে। পথের মধ্যে যাহাতে ঘাস না জন্মে, ধুলা না হয়, আবার বর্ষার সময় উপরকার মাটি ধুইয়া না যায়, জল না জমে, পিছল না হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। একেবারে পাথর বা ইট খাজরি করিয়া পথ গাঁথিয়া দিলে বা উপরে সিমেণ্ট বা কংক্রীট করিয়া দিলে ঐসব ত্রুটি শীঘ্র ঘটিতে পারে না বটে, কিন্তু দেখিতে তেমন প্রীতিকর হয় না; মোটা সুরকী ফেলা কাঁকরের রাস্তা দেখিতে বেশ সুশ্রী ও ঐসকল ত্রুটিও তাহাতে থাকে না। সমতল জমিতে মিথ্যা আঁকাবাঁকা পথ ভালো দেখায় না; তাই সেখানে হয় সোজা সোজা পথই করা উচিত, নয় মাঝে মাঝে ঢিপি ঝিল ফোয়ারা সজীঘর বা ঝোপ ঝাড় কুঞ্জ করিয়া পথিকের প্রত্যয় জন্মানো উচিত যে ঐসব বাধার জন্যই পথটাকে বাঁকাইয়া চালাইতে হইয়াছে। পথের বাঁকের মুখে আড়াল দিয়া পথের দুই মুখ ঢাকা দেওয়া দরকার, নতুবা পথিক বাঁকের মুখে আসিয়া পথের অপর দিক দেখিতে পাইলেই বাঁক ছাড়িয়া ঘুর বাঁচাইয়া সোজা সটান পথ নিজেই তৈরি করিয়া লইবে, তাহাতে ঘাস-জমি বা কেয়ারি দলিত হইয়া খুঁত হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক বাগানে একটি নিবিড় ছায়াশীতল যথাসম্ভব দীর্ঘ পথ থাকা উচিত, সেখানে শান্ত নিরুপদ্রবে পথিকদের পদচারণা ও গল্পগুজব চলিতে পারে। পথের চৌমাথার উপর কুঞ্জ রচনা করিয়া পথের শ্রী বাড়াইতে পারা যায় (১ নম্বর ছবি)।

৯। ঘাস-জমি ও গাছ এবং বাড়ী ও জলের সুসঙ্গতি। (জামনগর রাজসরকারের বাগান)

১০। বাগানে আলঙ্কারিক টব ও মূর্ত্তির সুসঙ্গতি। (জামনগর রাজসরকারের বাগান)
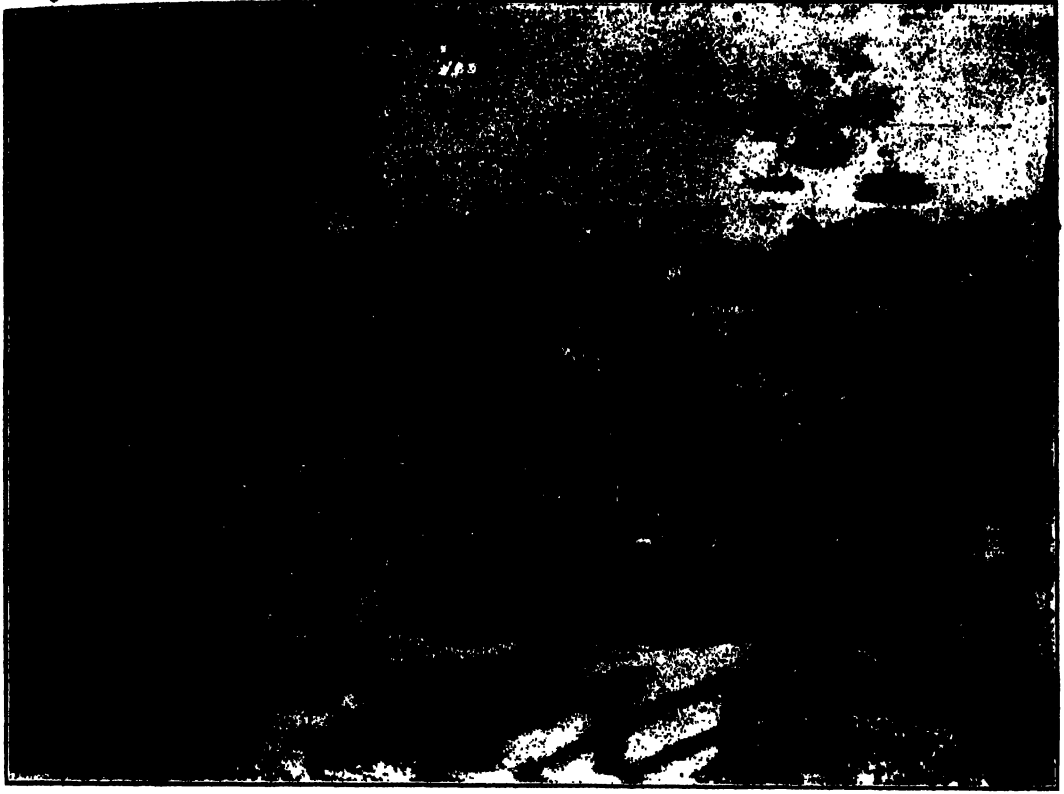
১১। গাছের মাঝে মূর্ত্তির সুসঙ্গতি।
(পুনায় সার্ দোরাব তাতার বাগানের সজীবর)

(২) গাছপালা, ঝোপঝাড়, বেড়া।

সুসজ্জিত উদ্যানে বড় গাছ রোপণ করা হয় কোনো বিশেষ দৃশ্যকে পশ্চাতে থাকিয়া (background) ফুটাইয়া তুলিবার জন্য (২নং ছবি), বাতাসের ঝাপটা প্রতিরোধ করিবার জন্য, পর্দ্দা বা আড়াল রচনার জন্য, দৃশ্যের চারিধারে ছবির ফ্রেমের মতন দেখাইবার জন্য। গাছ রোপণ করা হয় সারবন্দি, গুচ্ছ, কুঞ্জ ও বীথি বা পথের দুধারি দুসারি করিয়া।

গুচ্ছ বা কুঞ্জ রচনার জন্য সমস্ত গাছ সমান অন্তর অন্তর পোঁতা বা গাছগুলি মাথায় সমান হইবে না ; এক-জাতীয় গাছের গুচ্ছ বা কুঞ্জ রচনা করিলে গাছগুলি অসমান হওয়া নিতান্তই আবশ্যক, নতুবা সুন্দর দেখায় না। কোনো গুচ্ছে বা কুঞ্জে যতগুলি গাছ থাকে তাহারা যদি প্রত্যেকে ভিন্নজাতীয় হয় এবং আকার ও পত্রপুঞ্জের বিন্যাসে পরস্পরের বিপরীত হয় তবে দৃশ্য খোলে ভালো। এই রকমের কুঞ্জে আলোছায়ার সুষমা চূড়ান্ত রকমে খেলে।

বিশেষ কোনো জাতীয় গাছ একটি দুটি মাত্র নমুনা-স্বরূপ বাগানে রাখিতে হইলে তাহাদের একক স্বতন্ত্র ভাবে রাখা উচিত, ভিড়ে হারাইয়া যাইতে দেওয়া উচিত নয়। নমুনার গাছগুলি নিখুঁৎ হওয়া দরকার, নতুবা স্বতন্ত্র গাছের একটু খুঁতই চোখে বড় হইয়া লাগে। রোগা হট্‌কা পত্রবিরল গাছ একক থাকিবার উপযুক্ত নয়। আম, বট অশথ পাকুড়, মেহোগিনী, কৃষ্ণচূড়া, কদম, বকুল প্রভৃতি গাছ স্বতন্ত্র একক থাকিলে শোভমান হয়।

পথের দুধারি দুসারি গাছ রোপিয়া বীথি করিলে বড় সুন্দর দেখায়। বীথিতে তাল নারিকেল সাল প্রভৃতি বিলম্বে-বাড়ের গাছ রোপিলে একটা অন্তর ক্ষিপ্রবাড়ের গাছ রোপণ করা উচিত ; তাহাতে ছোট বড় গাছের সারি দেখিতে সুন্দর হয়, কেবল ছোটগাছ থাকিলে দর্শকের

১২। বাগানে জড় অলঙ্কার। (কোয়েটার বাগান)

মন পীড়া ও অস্বস্তি অনুভব করে। বিলম্বে-বাড়ের গাছগুলি বেশ বড় হইয়া উঠিলে, অপর গাছগুলির গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া ফেলিয়া তাহাদের গা মেলিবার জায়গা করিয়া দিতে হয়। পথের দুধারি গাছের ডাল যাহাতে পথের উপর মিশিয়া বিতান রচনা করে সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গাছের ডাল ছাঁটা উচিত। গাছের ডাল মিশিয়া গাছের গোড়ায় ছায়া করিলে গাছের কাণ্ড হইতে সরু ডাল বাহির হইতে পারে না, গাছের গোড়ায় ও পথে আগাছা জন্মিতে পায় না।

ঝুপি ও ঝাড় গাছ ফুলের কেয়ারির পিছনের মেড় (background) বা কাঠামো রূপে অথবা পাড়ের মতন করিয়া রোপণ করিতে হয়। খোলা জমির মাঝখানে বা ঘাসজমির মাঝখানে, নেড়া মাথায় টিকির মতন, একটা ঝোপ বা ঝাড় গাছ লাগাইলে বেশ দেখায়। বড় গাছের ন্যায় ঝোপ ও ঝাড় গাছের কতকগুলি ফুল-বাহারি, কতকগুলি পাতা-বাহারি। কোথায় কোন্-রকম গাছ বা ঝাড় মানাইবে তাহা বিচার করিয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য।

যেসব গাছে ঘন পাতা হয় ও ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া বাড়ে সেইরকম গাছ বেড়ায় লাগাইয়া ছাঁটিয়া রাখিলে সুন্দর দেখায়; তাহাতে পশুর প্রবেশ সম্পূর্ণ রোধ না হইলেও কতকটা হয়, তাহার পাশে কাঁটাতারের বেড়া দিলে পশুর প্রবেশ-নিবারণ সম্পূর্ণ হয়। বেড়ার ঝুপি সারির কোলে বাগানের সীমানায় বড় গাছ থাকিলে বেড়াটা বড় গাছের বেদীর মতন কাজ করে। বেড়ায় মেহেদি-জাতীয় গাছ লাগানো হয়। দুসারি বেড়ার বীথি করিলে ঝুপি তুঁতগাছ বেশ উপযুক্ত।

বেড়ায় এক ফুট তফাতে দুসারি উঁচু আলের মাথায় গাছ লাগাইতে হয়, দুসারি উঁচু আলের মধ্যেকার জোল দিয়া জল সেচন করা যায়। বেড়ার গাছ মাথা চাড়া দিয়া উঠিলেই মাথা নোয়াইয়া বাঁকাইয়া দিতে হয়, তাহাতে নীচের দিক ঘন ঠাস-বুনন হইয়া উঠে।

(৩) ফুলের কেয়ারি ও পাড়।

আজকাল দেশবিদেশের এতরকম মরসুমি ফুল এদেশে আমদানী হইয়াছে যে বছর ভরিয়া বারোমাসই ফুলের কেয়ারিতে রঙের জলুস জাগাইয়া রাখিতে পারা যায়। ঘাস-জমির মাঝে-মাঝে বিবিধ জ্যামিতিক ক্ষেত্র আঁকিয়া ফুলের কেয়ারি লাগাইলে চমৎকার দেখায়। স্বস্তিক, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ, পদ্মদল, গোলাপদল প্রভৃতি বিবিধ জ্যামিতিক ক্ষেত্র যে-কোনো Experimental and Practical Geometry বা ব্যবহারিক জ্যামিতি খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। বর্ষাতি ফুলের কেয়ারি বেদীর মতন একটু উঁচু ঢিপির উপর করিলে জল নিকাশের সুবিধা হয়; বেদীর পাশ ঢালু করিয়া তাহার গায়ে রঙিন শাক বা ঘাস লাগাইয়া ছাঁটিয়া রাখিলে ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতন সুন্দর দেখায়।

ফুলের কেয়ারির ধারে ধারে খুব খাটো রঙিন শাক লাগাইয়া পাড় করিয়া দিলে দেখিতে বেশ হয়; কাঁকর বা ইটের কুচি বা শাদা নুড়ি বা পাথরের কুচি ছড়াইয়াও কেয়ারির পাড় করা চলে।

পথের ধারে ফুলের গাছেরই পাড় দেওয়া যাইতে পারে; দূরে বড় ঢেঙা গাছ দিয়া ক্রমশ বেঁটে খাটো গাছ লাগাইয়া পথের দিক ঢালু করিয়া নামাইয়া আনিতে পারিলে আর ফুলের রং অনুযায়ী সুসঙ্গতি আন্দাজ করিয়া গাছ লাগাইতে পারিলে দৃশ্য চমৎকার হয়।

পাড়ে লাগাইবার চার-রকম গাছ নির্ব্বাচন করিতে হয়—লম্বা ঢেঙা, মাঝারি, বেঁটে, মাটিশই। লম্বা পথের দুধারি বড় গাছ, ঝোপঝাড়, ফুলন্ত পাড় প্রভৃতি রং ও আকারের সুসঙ্গতি রাখিয়া লাগাইতে পারিলে অতি সুন্দর দেখায়। লম্বা পথ যদি বাগানের বাহিরের বিস্তৃত দেশের ইঙ্গিত পথিকের চক্ষে লাগাইতে পারে (৫, ৭, ১০ নম্বর ছবি) তবে অসীমের আভাসে পথিকের সৌন্দর্য্যবোধ উদ্বুদ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়া উঠে। পথের ধারে ফার্নের পাড়ও বেশ সুন্দর হয়।

(৪) টবের গাছ।

যে বাগানের জমি পাথুরে, সেই বাগানে টবে গাছ আজ্জানো দরকার হয়। বাগান-বাড়ীর বারান্দায় সিঁড়িতে বাঁধানো-উঠানে গাছ রাখিয়া বাগানের সঙ্গে সুসঙ্গতি রাখিবার জন্য টবে করিয়া গাছ লাগাইতে হয়। যে বাগানের জমি সারালো, সেখানে টবে গাছ আজ্জাইবার দরকার হয়

না। কিন্তু গাছের গোড়ার বেদীর ধারে, সিঁড়ির মতন থাকে থাকে, বা বিস্তৃত ঘাসজমির মধ্যে আলঙ্কারিক হিসাবে (১০ নম্বর ছবি) গাছ বসাইবার জন্য টবে গাছ লাগানো দরকার হইতে পারে। সিঁড়ির মতন থাকে থাকে গাছ লাগাইবার জন্য টব ব্যবহার না করিলেও চলে,—মাটির ঢিপি সিঁড়ির মতন ধাপে ধাপে উঁচু করিলে তাহাতে গাছ লাগানো চলে; কিন্তু ইহাতে জায়গা জুড়ে অনেকখানি, আর ইট বা কাঠ দিয়া ধাপ গড়িয়া তাহাতে টব সাজাইয়া দিলে অল্প জায়গাতেই হয়।

(৫) লতা ও পরগাছা।

বারান্দার থাম রেলিং বা খিলানে, বাহিরে দেয়ালের গায়ে, পর্‌গোলা বা সব্জীঘরের বেড়ায় ও চালে, গাছের গুঁড়িতে লতা চড়াইয়া দিলে দৃশ্য খোলে ভালো (৬ নম্বর ছবি)। লতা ধরাবাঁধা কাটাছাঁটা নির্দ্দিষ্ট আকারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না; তাই সে আপনার নমনীয়তায় প্রাচুর্য্যে কমনীয়তায় আড়ষ্ট থাম বা অকষ্টবদ্ধ খিলানের গা ঢাকিয়া তাহাদিগকে রমণীয় সুন্দর করিয়া তোলে। কদর্য্য দর্ম্মার বেড়া বা কুৎসিত করোগেটেড লোহার ছাদ লতার মাধুর্য্যে ঢাকিয়া সুন্দর করা যায়। জাফরীর গায়ে লতা চড়াইলে অতি সুন্দর দেখায়। বলিষ্ঠ দীর্ঘ গাছের গায়ে লতা লাগাইলে দর্শকের মনে কবিত্বের উদয় হয়। অনেক লতা বিনা অবলম্বনে দেয়ালের গায়ে লাগিয়া যায়; অনেক লতা আঁকড়া দিয়া ধরিয়া ধরিয়া জাফরী প্রভৃতিতে উঠে; অনেক লতা থাম বা গাছের গুঁড়ি বেড়িয়া বেড়িয়া উঠিতে পারে। সুতরাং লাগাইবার সময় বিবেচনা করা উচিত কোথায় কোন্ লতা লাগানো ঠিক হইবে।

বড়-বড় গাছের গুঁড়িতে ও ডালে মাঝে-মাঝে পরগাছা ও বাঁদরি (Epiphytes ও Orchids) লাগাইলে ভালো দেখায়।

(৬) ঘাস-জমি।

ঘাস-জমি বা লন্ তৈরি ও রক্ষা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। জমি সর্ব্বদা রসা না থাকিলে আর ঘন-ঘন না নিড়াইলে ও না ছাঁটিলে ঘাসজমি ভালো থাকে না, দেখিতেও ভালো লাগে না। সুরক্ষিত ঘাসজমি বা লন্ বড়ই প্রিয়দর্শন। তিন বৎসর অন্তর পুরাতন ঘাস উবড়াইয়া ফেলিয়া জমি চষিয়া চৌরস করিয়া নূতন দূর্ব্বা বা হরিয়ালি ঘাস লাগাইতে হয়। দূর্ব্বার সঙ্গে অপর ঘাস মিশাল থাকে; তাহা ভালো করিয়া বাছিয়া ফেলা দরকার; এবং জমিতেও অপর ঘাসের শিকড় বীজ বা অঙ্কুর না থাকিয়া যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। জমির উপরের তিন ইঞ্চি মাটি ৬০ ডিগ্রি শতকিয়া তাতাইয়া লইলে ফল ভালো হয়। বিস্তৃত ঘাসজমির মাঝে-মাঝে এখানে একটা বড় গাছ, ওখানে একটা ঝুপি গাছ, সেখানে একটা ফুলের কেয়ারি থাকিলে ভালোই দেখায়। কিন্তু ঘাসজমির উপর গাছপালার ভিড় লাগানো মোটেই উচিত নয়।

(৭) জলা, ঝিল, ফোয়ারা।

গাছপালার সঙ্গে জলের বড় নিকট-সম্পর্ক। এজন্য বাগানের মাঝে জল থাকিলে শোভন ও দর্শকের প্রীতিকর হয়। জল দুরকমে রাখিতে পারা যায়—১) কৃত্রিম, যেমন ফোয়ারা, চৌবাচ্চা, নহর (ছবি ২, ৭ ও ৯); ও (২) স্বাভাবিক, যেমন ঝিল, হ্রদ, পুষ্করিণী (ছবি ৫ ও ৯)। ইহাদের দুইরকমই সুন্দর। ফোয়ারা, চৌবাচ্চা, নহর প্রকাশ্য সদর জায়গায় থাকা উচিত যাহাতে দর্শকের দৃষ্টি চট্ করিয়া উহাদের উপর পড়ে। আর পুষ্করিণী ঝিল হ্রদ যদি একটু আড়ালে ঝোপঝাপের পিছনে লুকানো থাকে তবে দর্শক অকস্মাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া আনন্দিত ও বিমুগ্ধ হইয়া যায়। কৃত্রিম সরিৎ অর্দ্ধগুপ্ত অর্দ্ধপ্রকাশ্য স্থান দিয়া বহাইতে হয়; কিন্তু তাহার মূল উৎস গোপন স্থানে থাকা উচিত। গোপন ছায়াশীতল স্থানে পদ্মপুকুর (ছবি ৫) ও তাহার পাড়ে নল ও তাল-নারিকেল গাছের বন থাকিলে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া দর্শকের চমৎকার লাগে। পুষ্করিণী ঝিল হ্রদ সরিৎ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আকারের না করাই ভালো; যত আঁকা-বাঁকা হয় ততই স্বাভাবিক মনে হয়; উহাদের কাছাকাছি কোনো-রকম কৃত্রিম রচনাও যেন না থাকে। চৌবাচ্চার মধ্যে রঙিন মাছ রাখিয়া ও জলজ উদ্ভিদ লাগাইয়া তাহার জড়ত্বকে প্রাণবান্ সুন্দর করা কর্ত্তব্য। ফোয়ারার গঠনে জলদেবতা ও জলচর পশুপক্ষীর মূর্ত্তি

অলঙ্কাররূপে সংযোজন করা যাইতে পারে। ৯ নম্বর ছবিতে জলের কৃত্রিম ও স্বাভাবিক সংস্থানের সমবায়ে দৃশ্যের শোভনতার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(৮) ইমারত, মূর্ত্তি, প্রতিমা ও অপর জড় অলঙ্কার।

বাগানের মধ্যে বাড়ীঘর তৈয়ারি করার সময় তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সঙ্গে সুসঙ্গতি রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। সুসঙ্গতি দুরকমে হইতে পারে—(১) মিল রাখিয়া, আর (২) তুলনায় বৈপরীত্য ফুটাইয়া। গাছপালা যে পরিমাণ আছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাড়ী তৈয়ারি করা যাইতে পারে (ছবি ৩, ৭), আর গাছপালার পরিমাণের তুলনায় ক্ষুদ্র করিয়াও বাড়ী তৈয়ারি হইতে পারে (ছবি ৪)। বাগান-বাড়ী ক্ষুদ্র ও বাহুল্য-বর্জ্জিত হইলেই বাগানের সঙ্গে বেশী খাপ খায়।

মূর্ত্তি ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তরসাস্পদ স্থানে ভয়ানক বা বীভৎস রস উৎপাদক কোনো মূর্ত্তি বা প্রতিমা রাখা উচিত নয়। দৃশ্য ও স্থানের উপযোগী মূর্ত্তি বা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা উচিত; সবুজ পত্র-পুঞ্জের সম্মুখে শ্বেতবর্ণের মূর্ত্তি একটানা সবুজের মধ্যে বৈচিত্র্য দান করে (ছবি ১১)। ১০ নম্বর ছবিতে বেদীতে সন্নিবিষ্ট ষাঁড়ের মূর্ত্তি ও থামের উপর বড় বড় টব, ১২ নম্বর ছবিতে পথের মাঝখানে একটা কামান আর তার দুপাশে গোলার পিরামিড দুটি, সম্মুখ ও পশ্চাতের দৃশ্যের সঙ্গে দিব্য সুসঙ্গত অলঙ্কার হইয়াছে। অদ্ভুত আকারের লণ্ঠন (ছবি ১৩) দিয়াও অনেক বাগান অলঙ্কৃত করা হয়।

(৯) সব্জীঘর ও পর্‌গোলা।

সব্জীঘর ও পর্‌গোলা ভালো বাগানের আবশ্যক অঙ্গ। যেসব গাছ বেশী তাতে বা শীতে খোলা জায়গায় হাওয়ার ঝাপটায় বাঁচে না, তাহাদের ছায়া ও আশ্রয় দিবার জন্য যে ঘর তৈয়ারি হয় তাহাকে সব্জীঘর বা Green House বলে। আর নানান দেশের বিভিন্ন-রকমের গাছপালা আনিয়া তাহাদের স্বদেশের জমি ও আবহাওয়া কৃত্রিম উপায়ে জোগাইয়া তাহাদিগকে যেখানে আজ্ঞাইয়া রাখা হয় তাহাকে পর্‌গোলা বা Conservatory বলে। এই দুটিই কুঞ্জকুটীরের কাজ সম্পন্ন করে। এই কুঞ্জকুটীরের মাঝখানে চৌবাচ্চায় রঙিন মাছ ও ফোয়ারা, পাশে পাশে নহর ও উপরে বিচিত্র রঙের পড়া-পাখী রাখিতে পারিলে সে স্থান অতীব মনোরম শান্তিরসাস্পদ সুন্দর হয়।

বাগান প্রকৃতি ও আর্টের সম্মিলনক্ষেত্র; তাহা জ্ঞান-লাভের ক্ষেত্রও বটে। এইজন্য সেখানে বিচরণ করিলে মানুষের মন শান্তি পায়, স্নিগ্ধতায় নয়ন মন অভিষিক্ত হইয়া উঠে। যাঁহারা মস্তিষ্কচালনায় ক্লান্ত তাঁহাদের পক্ষে উদ্যান-ভ্রমণ ও উদ্যানরচনা পরম রসায়ন।

এই প্রবন্ধ প্রধানত দি এগ্রিকাল্‌চারাল্ জার্নাল্ অফ্ ইণ্ডিয়াতে প্রকাশিত, বোম্বাইর একনমিক বোটানিষ্ট ডব্‌লিউ বার্ন্‌স্ ডি-এসসি ও গভর্মেণ্ট হাউস বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ই লিট্‌ল কর্ত্তৃক লিখিত অরনামেণ্টাল গার্ডেনিং ইন্ ইণ্ডিয়া নামক প্রবন্ধ ও এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় হর্টিকাল্‌চার নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

চ. ব।

স্মৃতিরক্ষা

(গল্প)

শম্ভুচরণের বাল্যকালে সে যে পরে অতবড় একজন আচারনিষ্ঠ হিন্দু হইয়া উঠিবে তাহার কোনো লক্ষণই দেখা যায় নাই। গোব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি তাহার একেবারেই সাধারণ ছেলের চেয়ে বেশী ছিল না এবং নিষিদ্ধ দ্রব্য খাইতেও তাহার উৎসাহের অভাব কখনও চোখে পড়িত না। পাড়ার শুচিবায়ুগ্রস্ত মজুমদারগৃহিণীর তপস্যার বিঘ্নকারীরূপে ইন্দ্রদেব যে-কয়টি দেবদূত পাঠাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে শম্ভুর জায়গা সবার শেষে নিশ্চয়ই ছিল না।

শম্ভুর বাপমা নিতান্তই সাধারণ মানুষ ছিলেন। যতটা করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল তার বেশী উৎপাত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা কোনোদিনই করিতেন না। এবিষয়ে তাঁহাদের চিত্ত বিশেষ সজাগ ছিল না। ভাত খাওয়া এবং ঘুমাইতে যাওয়ারই মত না ভাবিয়া তাঁহারা অবশ্যকর্ত্তব্য সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি করিয়া যাইতেন। অতএব শম্ভুর যৌবনের অত্যুগ্র হিন্দুয়ানীটা তার পৈত্রিক সম্পত্তিও ছিল না।

পলাশপুর গ্রামটি ছোট। তাহাতে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িবার কোনো সুবিধা ছিল না। কাজেই গ্রাম্য সরস্বতীর কৃপা নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়া নব বিদ্যালাভের

আশায় শম্ভুকে কলিকাতা যাইতে হইল। সেখানে তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় খুড়া তাহার ভার লইলেন।

'কলিকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর এক স্যাঁৎসেঁতে ছোট দোতলা বাড়ীতে শম্ভুর কয়েকটা বছরই কাটিয়া গেল। এগুলোর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। খুড়াখুড়ীর আদর অথবা অনাদর কোনোটাই উল্লেখযোগ্য নহে। স্কুলের পড়াটাও আর-পাঁচটা ছেলের যতখানি সুবিধাজনক লাগে শম্ভুরও তাহাই লাগিত।

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় আসার দরুণ শম্ভুর বয়স একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। এণ্ট্রান্স পাশ করিতেই তাহার কুড়ি বছর পার হইয়া গেল। এতদিন তাহার জীবনটা নেহাৎই একঘেয়ে ভাবে কাটিতেছিল, বিধাতা এইবার ক্ষতিপূরণের ভার লইলেন।

কলেজে উঠিয়াই শম্ভু টেরী মুছিয়া টিকি রাখিল, একজোড়া খড়মও জোগাড় করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যা-আহ্নিকের ঘটা প্রচণ্ড হইয়া উঠিল এবং সকালে উঠিয়া খুড়াখুড়ীকে প্রণাম করাটাও একটা নিত্যকর্ম্ম করিয়া তুলিল। ভাসুরপোর এহেন ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া খুড়ী ব্যস্ত হইয়া দেশে জাকে চিঠি লিখিলেন, "দিদি, তোমার ছেলে দিনদিন কি-রকম হয়ে যাচ্ছে, ওর শিগ্‌গির বিয়ে দাও; তা না হলে ও কোন্‌দিন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে।" খুড়া একে সওদাগর আফিসের বড়বাবু-ও-ছোটসাহেব-লাঞ্ছিত কেরানী, তার উপর তিনটি অবিবাহিতা কন্যার পিতা, কাজেই তাঁহার ভাইপোর বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। কিন্তু তাঁহার ছেলে অতুলের এ বিষয়ে কোন ত্রুটি দেখা যায় নাই। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া এবং একক্লাসে পড়িয়া—তাও আবার ক্লাশে অতুলই সর্ব্বদা শম্ভুর উপরে থাকিত—মেজদা যে কেবল একজোড়া খড়ম, একটা টিকি এবং কতকগুলা অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা কথার তোড়ে পাড়ায় এতখানি নাম কিনিয়া ফেলিবে, এ অতুলের ন্যায়পরায়ণ মনে অত্যন্তই অন্যায় বলিয়া ঠেকিল। এও সহ্য করিতে পারিত, যদি মা তাহাকে মেজদার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অহরহ সদুপদেশ না দিতেন। অতুল নিজে সংস্কৃত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল না। সে একদিন সন্ধ্যায় নিজেদের সংস্কৃত ক্লাশের 'ফার্ষ্টবয়' সুরেশকে আনিয়া লুকাইয়া শম্ভুর মন্ত্রোচ্চারণ শুনাইয়া দিয়া, পরদিন সগর্ব্বে প্রচার করিল যে মেজদাটার আগাগোড়া ভণ্ডামী, কারণ স্বয়ং সুরেশ বলিয়াছে যে শম্ভুর উচ্চারণ ত সমস্ত ভুল হয়ই, তার উপর মন্ত্রগুলিও অধিকাংশই তার স্বরচিত। তাহাতেও মাতাকে ও বুড়ী পিসীমাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া সে একদিন আসিয়া খবর দিল যে মেজদার অকস্মাৎ ধর্ম্মবুদ্ধি হইবার কারণ একমাত্র এই যে একদিন ক্লাশের বড়লোকের ছেলে যামিনীর সঙ্গে হোটেলে খানা খাইতে গিয়াছিল, তাহাতে ছুরী দিয়া মাংস খাইতে গিয়া জিব কাটিয়া ফেলায় সকলে তাহাকে এত ঠাট্টা করে যে সে আর কোনো উপায় না দেখিয়া এখন সাধু সাজিয়াছে। শম্ভুর কানে একথা আসাতে সে নিন্দুকের রসনা সম্বন্ধে একটা প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করিয়াই নিরস্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমাগুণে তাহার যশ এবং অতুলের অযশ বাড়িল বই কমিল না।

শম্ভুর হিন্দুয়ানিতে তাহার পরকালের সুবিধা কতখানি হইল তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহকালে যে একটা লাভ হইল তাহা চোখেই দেখা গেল। শম্ভুর মা ছোট জায়ের চিঠি পাইয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিলেন। ফলে গ্রীষ্মের ছুটিতে শম্ভু বাড়ী আসিবামাত্র নিকটেরই এক গ্রামের বেচারাম চক্রবর্ত্তী সদলবলে আসিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন এবং মাসখানেকের মধ্যেই উক্ত ভদ্রলোকের একটি ক্ষীণকায়া অল্পভাষিণী কন্যা এবং হাজার-তিন টাকা এই বাড়ীতে আসিয়া পড়িল।

ইহার পর শম্ভুর কলিকাতা-বাস বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাহার শরীর আর ভাল থাকিতেই চায় না, সহরের জলবায়ু তাহার পক্ষে বিষের মত অনিষ্টকারী হইয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্য যে কত ভাল তাহা সে সময়ে অসময়ে প্রচার করিতে লাগিল।

বিধাতা এবারেও দয়া করিলেন। পরীক্ষার একমাস আগে পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাহাকে কলিকাতা ছাড়িতে হইল, এবং দিন দশ পরে পিতা পরলোক গমন করাতে কলিকাতা আসার পথও চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গেল। পিতার মৃত্যু ও পড়াশুনা অকালে শেষ হইয়া যাওয়াতে শম্ভুর মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহাকে অবিমিশ্র দুঃখ বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হয় না।

শম্ভুচরণ এখন বাড়ীর কর্ত্তা। তাঁহার পিতা জমিজমা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাই দেখিয়া শুনিয়া চালাইতে পারিলে, খাইবার পরিবার ভাবনা থাকে না। শম্ভুচরণ সেইদিকেই মন দিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার আচার নিষ্ঠা আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। স্ত্রীর বাক্সে নিতান্ত আধুনিক দুখানা নভেল দেখিয়া তাঁহাকে এমনি শাসন করিলেন যে ভদ্র-মহিলার নভেল পড়ার সখ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইল এবং প্রতিবেশিনী সরলাকে যে কলিকাতা হইতে লেস্-দেওয়া গোলাপী সেমিজ আনাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ কাঁদিতে-কাঁদিতে প্রত্যাহার করিলেন।

শম্ভুচরণের প্রথম যখন কন্যা হইল তখন তিনি প্রসূতির প্রতি যথোচিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাহার নাম রাখিলেন ক্ষান্তমণি। পত্নীর প্রতি ভরসা করিয়া অন্ততঃ আর-একটি কন্যা হয় কি না তাহা দেখিবার সাহস তিনি করিতে পারিলেন না। শিশু-কন্যার মা কিন্তু এ নাম স্বীকার করিলেন না। পরম হিন্দু স্বামীর ঘরে যে ক্ষুদ্র মানুষটি তাঁর হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহাকে এ-রকম একটা অনাদরের নামে ডাকিতে তাঁহার মন কিছুতেই উঠিল না। মেয়ের মা মেয়ের নাম রাখিলেন উমা, এবং এই নামটাই বাহাল হইয়া গেল।

ক্ষুদ্র উমা সংসারে কিছুদিন বাস করিয়াই বুঝিয়া লইল যে মা ছাড়া তাহার আশ্রয়স্থল কেউ নাই। পারতপক্ষে বাপের কাছে সে যাইতে চাহিত না, কারণ তিনি উমাকে হিন্দুকন্যার উপযুক্ত করিয়া গড়িবার চেষ্টা বিশেষভাবে করিতেন। অল্পবয়স হইতেই উমার একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে তাহার যা-কিছু করিতে ভাল লাগে সে সবই অন্যায়, কারণ সবেতেই বাবার কাছে বকুনি খাইতে হয়। এমন কি বাপের সামনে থাইতে দিলেও সে সাহস করিয়া খাইতে পারিত না, সেটাও হিন্দুকন্যার করা কর্ত্তব্য কি না সে বিষয়ে সে মনের সন্দেহ দূর করিতে পারে নাই। তাহার মা স্বভাবতঃই কম কথা বলিতেন, স্বামীর শাসনে সে-কমকথা আরও কমিয়া গিয়াছিল। উমার কিন্তু এই অল্পভাষিণী মায়ের কাছে বক্তৃতার অবধি ছিল না। তাহার শিশু ভাইকে নিতান্তই শিশু মনে করিয়া সে কোনোদিন তাহাকে নিজের খেলার সাথী করিতে চাহিত না। বালকজাতির সম্বন্ধে তাহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। পুতুল খেলিতে গেলে যে-জীব বেনে-বৌএর ছোপানো কাপড় দিয়া বল্ তৈয়ারী করে এবং রাঁধিবার হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া গুলিডাণ্ডা খেলিতে চায়, তাহাকে কোন্ মেয়ে কবে শ্রদ্ধা করিতে পারে? কাজেই উমার মা-ই উমার একমাত্র সম্বল ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার উৎপাত চুকিয়া গেলেই তাহাকে উমার সঙ্গে খেলিতে বসিতে হইত। পুতুল-খেলার সাথী ত হইতে হইতই, এমন কি মাঝে-মাঝে পুতুলও সাজিতে হইত। স্বহস্তে বিচিত্র-সেলাই-করা পুতুলের তোষোকখানি পাতিয়া দিয়া উমা বলিত, "মা তুমি আমা খুকী, তুমি শোও।" মাকে সেই রুমালের সমান তোষোকে একবার অন্ততঃ শুইতেই হইত, তা না হইলে ক্ষুদ্র জননীটির আর অভিমানের সীমা থাকিত না।

এই-রকম করিয়া উমার জীবনের সাত আট বছর কাটিয়া গেল। একদিন সে সকালে উঠিয়া দেখিল বাড়ীতে মহা ধুমধাম, বাহিরে বাজনা বাজিতেছে, লোকজনের কোলাহলে বাড়ী একেবারে সরগরম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হইল সে ইহাই দেখিয়া যে আজ সকলেই তাহার প্রতি মনোযোগী। রাত্রি হইয়া আসিল, পাড়ার যত কিশোরী ও তরুণী মিলিয়া তাহাকে লাল কাপড়, সোনার গহনা, ফুলের মালা, কত কি দিয়া সাজাইতে বসিয়া গেল। উমার ইহাতে খুসী ছাড়া অখুসী হইবার কোনো কারণ ছিল না, মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সে এত আদর কোনো দিনই পায় নাই। এমন সময়ে ঘরে মা আসিয়া ঢুকিলেন, মেয়ের লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মুখশ্রী তাঁহার চোখে পড়িল, মাকে দেখিয়া উমাও সাজের গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল। মায়ের মুখে হাসি দেখা গেল না, তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

শম্ভুচরণ গৌরীদান করিতেছিলেন। স্বর্গের সিঁড়ি প্রায় সব কটা ধাপ এক লাফে ডিঙাইবার ইচ্ছায় তিনি এক মহা কুলীনের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ স্থির করিয়াছেন সকল দিক দেখিতে গেলে এমন ভাল সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। বর টাকা অল্পই লইবেন এবং তাঁর পত্নীর সংখ্যা

তিনটির বেশী নয়। বরের বয়সও যে খুব বেশী তাও নয়, শম্ভুচরণের অপেক্ষা বছর চারের যদি বড় হয়। ইহাই ত পুরুষের পক্ষে উপযুক্ত বয়স। এমন জামাই পাইয়াও গৃহিণী যদি স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক নির্ব্বুদ্ধিতার গুণে কাঁদিতে বসেন, তাহা হইলে তিনি আর কি করিবেন? মেয়েমানুষের চুকোঁটা চোখের জল দেখিয়া তিনি কি এমন স্বর্ণ-সুযোগ ছাড়িয়া দিবেন নাকি?

লগ্ন রাত বারোটারও পরে। সজ্জিতা উমা পিঁড়ির উপর ঢুলিতে-ঢুলিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার মা পাশের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, বিয়ে-বাড়ীর কোলাহলে যোগ দিতে তাঁহার আর ক্ষমতা ছিল না।

হঠাৎ একটা তুমুল বাজনার শব্দে এবং সেইসঙ্গে অনেকের গলায় তাহার নাম একসঙ্গে শুনিয়া উমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অর্দ্ধ-ঘুমন্ত অবস্থায় সে বুঝিল যে এইবার তাহার বিবাহ হইতেছে। সাত পাক ঘোরানো প্রভৃতিতে তাহার কোনো আপত্তি হয় নাই; তবে মাথার উপর একখানা চাদর ঢাকা দিয়া যখন সকলে তাহাকে ভাল করিয়া চোখ চাহিতে বলিল, তখন সামনে তাকাইয়া একজোড়া লাল লাল চোখ দেখিতে পাইয়া সে ভয়ে চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিল।

উমার শ্বশুরবাড়ী বেশী দূরে নয়, সেখানে তাহাকে বেশী দিন থাকিতেও হইল না। যে কদিন ছিল তাহাতেই তাহার প্রাণ ভয়ে শুকাইয়া উঠিয়াছিল, বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার পুতুলের সংসার আবার তাহার অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইল। সেই কালো মুখে লাল চোখের ভীষণ দৃষ্টির বিভীষিকাও ক্রমে তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল।

সেদিন তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বেশী রাতে বাড়ীর অন্য-সকলে যখন খাইতে বসিত, উমা তাহার ঢের আগেই ঘুমাইয়া পড়িত বলিয়া তাহার মা তাহাকে সন্ধ্যা বেলাই খাওয়াইয়া দিতেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া সে খাইতে বসিয়াছে, মা ঘরের ভিতর তখনও কাজে ব্যস্ত। উমা মুখের দুই-রকম ব্যবহারই একসঙ্গে করিয়া চলিয়াছিল। ভাত খাওয়া ত হইতেছিল; তাহার সঙ্গে-সঙ্গে রাধারাণীর নূতন মাকড়ীর গড়ন, সইয়ের পুতুলের জরিপেড়ে কাপড়, শৈলীর আশ্চর্য্য নির্ব্বুদ্ধিতা প্রভৃতি তাহার মায়ের অবশ্যজ্ঞাতব্য সব-রকম খবর দিতেও ত্রুটি করিতেছিল না।

এমন সময় বাইরে কর্ত্তার খড়মের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে-সঙ্গে উমার বাক্যস্রোতও একেবারে বন্ধ। উমার মা দরজার কাছে আসিয়া দেখিলেন, কর্ত্তা এই দিকেই আসিতেছেন।

"একবার এদিকে শুনে যাও ত গো!"

স্বামীর ডাক শুনিয়াই গৃহিণী বাইরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "রোসো, উমাকে এই মাছের ঝোল দিয়েই আসছি।"

"থাক্, আর মাছ দিতে হবে না, এ দিকে এসো।"

উমার মা কম্পিত পদে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, স্বামীর সব কথা কানে পৌঁছিবার আগেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। উমা অবাক হইয়া একদৃষ্টে মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। শম্ভুচরণ দ্রুতপদে আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া পিঁড়ি হইতে উঠাইয়া দিলেন।

ভয়ে উমার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। এত দিনে সে বুঝিল যে তার খাওয়াটাও বাস্তবিক অন্যায়. তা না হইলে বাবা অমন করিবেন কেন? তাহার বাবা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেই মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। উমা কাঁদ-কাঁদ মুখে মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এক হাত দিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি কেঁদ না, বাবা অমনি শুধু-শুধু সবাইকে বকেন। এর পর আমি ভাঁড়ারের সিন্দুকের আড়ালে লুকিয়ে খাব এখন, তা হলেই বাবা আর দেখতে পাবেন না।"

(২)

রাত্রির অন্ধকার তখনও একেবারে দূর হইয়া যায় নাই, ভোরের ধূসর আলোর সবেমাত্র একটুখানি আভাস পাওয়া যাইতেছে। শম্ভুচরণের বাড়ীর খিড়কী-দরজা খুলিয়া একটি তরুণী লঘুপদে বাহির হইয়া আসিল। বাড়ীর কিছু দূরেই নদীর ঘাট, মেয়েটি সেইদিকে চলিল। অস্পষ্ট আলোয় তার চেহারার আর-কিছু বোঝা গেল না, কেবল দেখা গেল বিধবার সাদা কাপড় আর কালো কোঁকড়া একরাশ চুল।

নদীর ঘাটে তখনও একটিও পল্লিবাসিনীর আগমন হয় নাই। উমা নিজের মনে অনেকক্ষণ জলে পা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল। পূর্ব্বাকাশ ক্রমে রাঙা হইয়া উঠিল। গ্রামের বৈরাগী ঠাকুরের বৈতালিক খঞ্জনির শব্দ কানে আসিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া গোটাকতক ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িল। এক কলসী জল তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

ভিজা কাপড় শুকাইতে দিয়া আসিয়া দেখিল মায়ের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। ফিরিয়া গিয়া রান্নাঘরের কাজে মন দিল, কারণ এ কাজটা এখন তাহারই। উমা যাহাতে হিন্দুবিধবার অবশ্যকর্ত্তব্য কোনো কাজে অবহেলা না করে সে দিকে শম্ভুচরণ অতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ঘরের কাজকর্ম্ম সারা হইয়া গেলে উমার যেটুকু সময় থাকিত তখন শম্ভুচরণ তাহাকে লইয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেন, এবং ব্রহ্মচারিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। উমার বেশভূষা আহারবিহার কিছুতেই তিনি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য সহ্য করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার নির্ম্মলকুলে কোন্ ছিদ্র দিয়া কখন্ শনি প্রবেশ করিবে তাহা ত বলা যায় না। একটা সামান্য মেয়ের প্রাণ অপেক্ষা কুলগৌরব যে ঢের বড় জিনিষ এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ মাত্র ছিল না।

উমার ছোট ভাই বিষ্ণুচরণ রান্নাঘরের উঠানে একটি শিউলি-গাছ লাগাইয়াছিল, তাহা অজস্র ফুলে আলো হইয়া উঠিয়াছে। ভোরের বাতাসে শিশিরের সঙ্গে ফুলগুলি টুপ্ টুপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। উমা রান্না চড়াইয়া আসিয়া গাছতলা হইতে ফুলগুলিকে সযত্নে কুড়াইতে লাগিল।

হঠাৎ সশব্দে একটা দরজা খুলিয়া গেল, একজন গৌর-বর্ণা স্থূলাঙ্গী মহিলা বাহির হইয়া আসিলেন। হাই তুলিয়া চোখ কচ্‌লাইতে-কচ্‌লাইতে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, উমার দিকে চোখ পড়িবামাত্র কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ লা উমি, সকালে উঠেই ও কি ন্যাকা-পনা হচ্ছে? আজ আর রান্না-বান্না চড়বে না?" উমা ব্যথিত হইয়া তাড়াতাড়ি গাছতলা হইতে উঠিয়া পড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিল "মা, রান্না ত আমি অনেকক্ষণ চড়িয়েছি, ভাত ফুটছিল, তাই একটু বাইরে এসে বসে-ছিলাম।"

মা গজেন্দ্র-গমনে আবার গিয়া ঘরে ঢুকিলেন। এটি শম্ভুচরণের দ্বিতীয় পক্ষ, উমার মা মেয়ে বিধবা হইবার এক বছরের মধ্যেই মারা যান। বিধবা বালিকাকন্যার ব্রহ্মচর্য্যের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া শম্ভুচরণ দুই মাস কাটিতে-না-কাটিতেই প্রতিবেশী নরোত্তম ভট্টাচার্য্যের বয়স্থা কন্যা শতদলবাসিনীকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। তিনি স্বামীর ঘরে আসিয়াই উমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন, আর বছর ফিরিতে-না-ফিরিতেই সংসার-রক্ষার ভার উমাকে গ্রহণ করিতে হইল। অতবড় মেয়ের শুধু বসিয়া থাকা ভাল নাকি? তাহা হইলেই লুকাইয়া নভেল পড়িতে শিখিবে এবং মনে যত কুচিন্তার উদয় হইবে। বিধবা মেয়ে লইয়া ঘর করা যে কি যন্ত্রণা তাহা পরে কি বুঝিবে, যাহার করিতে হয় সেই জানে। এদের শাসনে না রাখিলে কি আর রক্ষা আছে?

আঁচলে শিউলিফুলের রাশ লইয়া উমা রান্নাঘরে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িল, তার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। বিমাতার ব্যবহারটা তাহার এত দিনেও অভ্যস্ত হইয়া ওঠে নাই, তাঁহার বাক্যের জ্বালা এতদিনেও তাহার সহিয়া যায় নাই। তাহার নিজের মা মারা যাইবার পর হইতে গত আট বৎসর ধরিয়া প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে তিরস্কার সহ্য করিতে হয় আর পরলোকগতা মাকে মনে করিয়া তাহার চোখের জলও শুকাইতে চায় না।

উমার কোলের ফুলগুলি আগুনের তাপে কখন্ শুকাইয়া উঠিয়াছিল সে দিকে তাহার লক্ষ্যও ছিল না, সেও যেন তাদেরি একটি বড় বোন, একরাশ রূপ লইয়া অকালে মায়ের কোল হইতে খসিয়া পড়িয়া সংসারের তাপে শুকাইয়া উঠিয়াছে।

গৃহিণীর ডাকে উমা চোখের জল মুছিয়া বাহিরে আসিল। বেশী কিছু নয়, মা বলিলেন, "ও উমি, বেশী করে চাল নিস, আর-একজন লোক খাবে।" উমা ঘরে ঢুকিয়া ভাবিল, "নিশ্চয়ই মার সেই ভাই আসবে। বাবা, তার জন্যে ত বেশ বেশী করেই চাল নিতে হবে। ভাত যে হয়ে গেছে আবার চড়াতে হবে।"

এমন সময় বই বগলে করিয়া লাফাইতে-লাফাইতে বিষ্ণুচরণ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। শম্ভুচরণের আমলে

মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুল এখন হাইস্কুল হইয়াছে, কাজেই বিষ্ণুচরণকে বিদ্যালাভ করিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিতে হয় নাই। সে আসিয়াই ধপ্‌ করিয়া বইখাতা চৌকাঠের উপর ফেলিয়া বলিল, "দিদি ভাই, আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ভাত দিতে হবে, আজ আমাদের নতুন মাষ্টার আসবে কিনা তাই আমরা সব আগে থেকে গিয়ে হাজির হব।"

উমা থালায় ভাত বাড়িতে-বাড়িতে বলিল, "এত সকালেই খাবি? এখনও যে কিছু রান্না হয়নি। তোদের আবার নতুন মাষ্টার কবে এল?"

"আহা তাও ছাই জানো না? আজই এসেছেন, আর তিনি যে আমাদের বাড়ীতেই থাকবেন, জমিদার বাবুর চিঠি নিয়ে সকালে যখন এলেন তখন আমি নিজের চোখে দেখলাম!" বিষ্ণুচরণ সহপাঠীদের কাছে নূতন মাষ্টারের সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও অজ্ঞাতব্য খবর সবার আগে দিবার লোভে কথা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি মস্ত-মস্ত ডেলা পাকাইয়া গরম ভাত গিলিতে আরম্ভ করিল।

দুপুরে শম্ভুচরণ স্নানাদি শেষ করিয়া অতিথিকে লইয়া খাইতে বসিলেন। বাড়ীতে আর লোক নাই, গৃহিণী অসুস্থা, উমাই পরিবেষণ করিতে চলিল। বাপের খড়মের শব্দ পাইয়াই সে একবার বাহিরে উঁকি মারিয়া নূতন মাষ্টারকে দেখিয়া লইল। স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার হরিশবাবু পীড়িত হইয়া পড়ায় কিছুদিন ছুটি লইয়াছেন, তাঁহারই জায়গায় এই নূতন মাষ্টারের আগমন। বৃদ্ধ হরিশ বাবুকে উমা ভাল করিয়াই চিনিত, সে যে তাঁহার রাঙাদিদি। কিন্তু তাঁহার পদে একি মাষ্টার আসিল? এর বয়স ত চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হইবে না।

শম্ভুচরণ অতিথিকে আপ্যায়িত করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো। তুমি ঘরের ছেলে, এত লজ্জা কিসের? উমা ভাত নিয়ে এসো।"

শম্ভুচরণ স্বভাবতঃ এমন মিষ্টভাষী এবং অমায়িক প্রকৃতির মানুষ নন, কিন্তু আজ তাঁহার মধুর ব্যবহারের একটু কারণ ছিল। বিশ্বনাথ স্থানীয় জমিদারের ভাগিনেয়। স্বয়ং শম্ভুচরণও ঐ জমিদারেরই একজন প্রজা, তা ছাড়া নানা দিকেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। জমিদার মামা থাকিতেও বিশ্বনাথের চাকরী করার কি দরকার সেটা অনেকেই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু জন্মাবধি বিশ্বনাথের চেহারা এবং চরিত্র জমিদারের ভাগ্নে হইবার একান্ত অনুপযুক্ত ছিল। সযত্নে রক্ষিত ফুলের বাগানের মধ্যে এক-একটা আগাছা যেমন বিনা যত্নে নিজের তেজেই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, বিশ্বনাথের দশা ছিল সেই-রকম। বিধবা জননীর সঙ্গে আবাল্য জমিদার-বাড়ীতে মানুষ হইয়াও সেখানকার হাওয়া তাহাকে কাবু করিতে পারে নাই, সিল্ক-সাটীনে সজ্জিত মোটাসোটা জমিদার-পুত্রদের দলে তাহার দীর্ঘাকৃতি রোগা শ্যামবর্ণ চেহারাটা কিছুতেই মানাইত না। নিজের কোঁচার ফুল এবং মাথার টেরী ঠিক রাখার অপেক্ষা তাহার দৃষ্টি গাছে চড়া, সাঁতার দেওয়া এবং হাডুডু খেলার দিকে বেশী ছিল। কাহারও উপর সর্দ্দারী করা অথবা কাহারও সর্দ্দারী সহ্য করা, কোনোটাই তাহার অভ্যাস ছিল না।

এই ভাবে দিন কাটাইয়া যখন একদিন সে দেখিল যে এম্-এ পাশ করিয়া অন্ততঃ কলেজে পড়াটা শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন হইতে বাড়ীতে সে কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। চাকরী লইয়া বিদেশে যাইবার জোগাড় করাতে বিধবা মা কাঁদিয়া আকুল হইলেন, মামাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্বনাথ সব দিকে বাধা পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পাড়ার যত মুচী ও মুসলমানের ছেলেকে নিজের ঘরে ধরিয়া আনিয়া পড়াইতে বসিয়া গেল। মানুষের শাসন এবং সমাজের শাসন কোনোটাই তাহার কাছে কোনো দিন গ্রাহের জিনিষ ছিল না, কাজেই জমিদার বাবু দেখিলেন রোজ হাঁড়ী ফেলা নিবারণ করিতে হইলে অন্য উপায় দেখিতে হইবে। কাছাকাছি সকল গ্রামের লোকই তাঁহার অনুগত, তাহারা সাহায্য করিতে ক্রটী করিবে না। ইতিমধ্যে পলাশপুর ইস্কুলে মাষ্টারের কাজ খালি হইল। জমিদার বাবু তৎক্ষণাৎ কাজটা ভাগিনেয়ের জন্য জোগাড় করিলেন এবং শম্ভুচরণের বাড়ীতে তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। এইবার বন্দোবস্ত সকলেরই মনের মত হইল। বিশ্বনাথ বসিয়া-খাওয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহার মা

খুসী হইলেন যে ছেলে নিকটেই থাকিবে, সপ্তাহে একদিন ইচ্ছা করিলে বাড়ী আসিতেও পারিবে এবং পরিচিত গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিবে, কাজেই তাঁহার বিশ্বনাথ ভাত খাইতে ভুলিয়া গেলেও তাহারা ডাকিয়া খাওয়াইবে। মামা খুসী হইলেন একটা আপদের শান্তি হইল বলিয়া। শম্ভুচরণ মনে মনে খুসী হইয়াছিলেন, কারণ খানিকটা জমি ব্রহ্মোত্তর করিয়া লইবার চেষ্টা তিনি কিছুদিন যাবৎ বিশেষভাবে করিতেছিলেন; এই ব্যাপারে তাহার কিছু সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া তিনি বিশ্বনাথকে সাদরেই অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

বিষ্ণুচরণ এমন আশ্চর্য্য নূতন ধরণের মাষ্টারকে হাতের এত কাছে পাইয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া উঠিল। উমা প্রথমে নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু বিশ্বনাথের ব্যবহারে সে ক্রমে মনে মনে কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিল। এ যেন এক আলাদা রাজ্যের মানুষ। কোনো নিঃসম্পর্কীয় যুবাপুরুষের সঙ্গে তাহার যদিও কিছু সংস্রব কখনও ছিল না, তবুও গাঁয়ের সকল ছেলেকে সে চোখে অন্ততঃ দেখিতে পাইত এবং যতটুকু দেখিয়াছিল তাহাতে তাহাদের প্রতি উমার শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। ঐ লোকগুলির জীবনে টেরী চুরুট এবং পরালোচনা ছাড়া আর-কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কিন্তু বিশ্বনাথের এ তিনটার একটাও ছিল না। চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক অতি অল্প ছিল; আর যে-মানুষ ভাত খাইতেই ভুলিয়া যায়, তাহার মনে করিয়া চুরুট খাইবার কথা নয়। ইস্কুলের কাজ করিয়া সে যেটুকু সময় পাইত, তাহা হয় বই পড়িয়া, নয় ছাত্রদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলিয়া কাটাইয়া দিত।

উমাকে রোজই পরিবেষণ করিতে হইত। সে ঘোমটার আড়াল হইতে প্রায়ই লক্ষ্য করিত এই রোগা ছেলেটি ভাল করিয়া খায় না, বিশেষ করিয়া শম্ভুচরণের পাশে তাহাকে নিতান্তই অল্পাহারী মনে হইত। বিশ্বনাথ যাহা খাইত তাহাও নিতান্ত দায়সারাভাবে, কোনো বিশেষ তরকারীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া অথবা তরকারীর পর্য্যায়-অনুসারে খাওয়া তাহার দ্বারা হইবার জো ছিল না। উমা নিজের হাতের রান্নার প্রতি এতটা উপেক্ষা দেখিয়া মনে মনে পীড়িত হইয়া উঠিত, কারণ তাহার বাপভাইয়ের হাজার দোষ থাকিলেও এ দোষটা ছিল না। উমার ইচ্ছা করিত এই অন্যমনস্ক ছেলেটিকে ঠেলা দিয়া নিজের খাওয়া সম্বন্ধে একটু সচেতন করিয়া তোলে।

শম্ভুচরণ একদিন খাইতে বসিয়া মাছের তরকারীটা বড়ই পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। উমা চাহিয়া দেখিল বিশ্বনাথ ঠিক আগেরই মত খাইয়া চলিয়াছে, তাহার মুখে বিশেষ কোনো তৃপ্তির চিহ্ন নাই। কর্ত্তা বলিলেন, "উমা, বিশ্বনাথকে আরও একটু মাছ দেও ত।" বিশ্বনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না দরকার নেই।" উমা নিষেধ সত্ত্বেও খানিকটা তরকারী তাহার পাতে ফেলিয়া দিল। বিশ্বনাথ হঠাৎ সহাস্য মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন দিলেন? মিথ্যে ফেলা যাবে।"

উমার সঙ্গে তাহার এই প্রথম কথা। উমা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। রান্নাঘরে আসিয়া ভাবিল, "মাগো, ছেলেটা যেন কি! কি-রকম হাস্‌লে, যেন ও খেলে কি না-খেলে তাতে আমার কতই বয়ে যাচ্ছে।" ঠিক করিল কাল হইতে না চাহিলে উহাকে কখনই কিছু দেওয়া হইবে না। জমিদারের ভাগ্নে কি না, তাই গরীব মানুষের রান্না পছন্দ হয় না।

কিন্তু কাল হইবামাত্র সে আবার যথাসাধ্য সযত্নে রাঁধিতে বসিল। বিশ্বনাথের হাসির অপরাধ সত্ত্বেও তাহার মনে এই ইচ্ছাই প্রবল হইয়া উঠিল যে আজ তাহাকে যাহা দেওয়া হইবে সব সে যেন ভাল করিয়া খায়। বিষ্ণু যখন আসিয়া বলিল, "দিদি, আমার সঙ্গে মাষ্টার-মশায় তাঁকেও ভাত দিতে বল্লেন, রুটীন কিনা বদলে গেছে, বাবার সঙ্গে খেলে তাঁর দেরী হয়ে যাবে," তখন উমা রান্না শেষ না হওয়ার জন্য দুঃখিত হইয়া যাহা ছিল তাহাই বাড়িয়া দিল। বাকী রান্নার জন্য তাহার আর কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

কিন্তু আজ এ লোকটির হইল কি? কিছু রান্না হয় নাই, তবু আজই ইহার এত খাইবার উৎসাহ কেন? কাল উমার তরকারীকে অবহেলা করিয়া বিশ্বনাথের একটু অনুতাপ হইয়াছিল। খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল, তাঁহার ব্যবহারটা ঠিক হয় নাই, বেচারী ছেলেমানুষ তাহার রান্নার অপমানে নিশ্চয়

দুঃখিত হইয়াছে। তাই আজ সে ঠিক করিয়া আসিয়াছে জোর করিয়াই চাহিয়া খাইবে। অন্য জিনিষের অভাবে আজ সে যখন বলিয়া বসিল "আর-একটু ডাল দিন," তখন উমা তাহার বাটিতে এতখানি ডাল ঢালিয়া দিল যাহা পেটুক দামুর পক্ষেও অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইত।

রান্নাখাওয়ার মধ্য দিয়া যে পরিচয় আরম্ভ হইল তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। উমার বাবা জমির ভাবনায় ইদানী বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কন্যার ব্রহ্মচর্য্যপালনের তত্ত্বাবধান তত ভাল করিয়া করিতে পারিতেন না। উমার মা নভেল পড়ার জন্য কঠিনভাবে শাসিত হইয়াও মেয়েকে লিখিতে-পড়িতে শিখাইয়া গিয়াছিলেন। পিতার অনবসরে উমা দুপুরে নিজেই রামায়ণ পড়িতে বসিত, বইখানার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগবশতঃ নয়, আর কোনো বই হাতের কাছে ছিল না বলিয়াই।

বিষ্ণু একদিন 'হাফ্ হলিডে' পাইয়া সকাল-সকাল বাড়ী আসিয়া দিদির হাতে রামায়ণ দেখিয়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "কি যে দিদি দিনের পর দিন একই বই পড়, আমার কাছে মাষ্টার মশায়ের কেমন সুন্দর একখানা বই আছে, সেইটে দেবো এখন, পড়ে দেখো, রামায়ণের চেয়ে ঢের মজার।" মাষ্টার বইখানি আর-কিছু নয়—বঙ্কিমের আনন্দমঠ। উমা বই লইয়া পড়িতে বসিয়া গেল, গৃহিণীর কলকণ্ঠের ঝঙ্কার কানে আসিবার আগে কিছুতেই উঠিতে পারিল না।

সন্ধ্যাবেলা বইয়ের অধিকারী ঘরে ফিরিয়া বইয়ের খোঁজ করাতে বিষ্ণু অম্লান বদনে বলিল, "আমি সেটা দিদিকে পড়তে দিয়েছি।" বিশ্বনাথ অনাবশ্যক উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তোমার দিদি বই পড়েন নাকি? আচ্ছা আমার কাছে আরও ঢের বাংলা বই আছে, সব তাঁকে দিও।" বই দিদির কাছে খুব বেশী না পৌঁছিলেও বিষ্ণু অনুমতি পাইয়া সাহিত্যচর্চ্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করিল।

বিশ্বনাথের অন্যমনস্ক মন এই মাস দুয়ের মধ্যেই এ বাড়ীর অন্ততঃ একটি লোক সম্বন্ধে ক্রমেই বেশ সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। এই যে সুন্দর মেয়েটি সারাদিন মুখ বুজিয়া সংসারের সকল খাটুনি খাটিয়া যায় আর সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর সকলের গঞ্জনা সহ্য করে, ইহার জন্য বিশ্বনাথ মনে ভারি একটা বেদনা অনুভব করিত। তাহার সামনেই শম্ভুচরণ অথবা তাঁহার পত্নী উমাকে কতদিন কঠোর ভর্ৎসনা করিতেন, কারণ বিশ্বনাথকে এখন তাঁহারা নিজেদের একজন বলিয়াই মনে করিতেন, তাহার সামনে রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা বলাটা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ স্পষ্ট দেখিতে পাইত উমার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছে, মুখ রৌদ্রতপ্ত ফুলের মতন শুকাইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ফল রাগে তার সারা অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত, সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া যাইত। প্রতীকারের চেষ্টায় যে উমার যন্ত্রণা বাড়িবে বই কমিবে না ইহা সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারটা বসিয়া-বসিয়া দেখাও তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। এটা শুধু দুর্ব্বলের প্রতি করুণাবশতঃই যে নয় এই-রকম একটা সন্দেহ ক্রমেই তাহার নিজের মনেও জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার বিদ্রোহী মনের তাপ সোজাপথ না পাইয়া মাঝে-মাঝে অত্যন্ত অযথা-ভাবে বাহির হইয়া পড়িত। বিষ্ণুচরণ এবং তাহার একটি বৈমাত্রেয় ভাই বিশ্বনাথের সঙ্গে একই ঘরে শুইত। বিছানা করার ত্রুটী লইয়া একদিন গৃহিণী উমাকে আক্রমণ করিলেন, "হ্যাঁ লা, পরের ছেলে বাড়ীতে রয়েছে তার একটু যত্ন করতে নেই? হাতপা কি এই বয়সেই খসে গিয়েছে তোর?" বলা বাহুল্য পরের ছেলে বিশ্বনাথ এ স্থলে নিতান্ত উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। তাহার কানে কথাটা পৌঁছিবামাত্র সে ঘরে আসিয়া খাট হইতে বিছানাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বিষ্ণু তাহার দিকে অত্যন্ত অবাক হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া বলিল, "আমার বিছানায় শুতে ভারী গরম লাগে, আজ থেকে শুধু-খাটেই শোব।"

উমার মনও অল্পদিনেই এই বাহিরের লোকটিকেই এই বাড়ীর মধ্যে একমাত্র আপন বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছিল। সে যে সর্ব্বদাই কোনো-প্রকারে উমাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিত, তাহা উমার চোখ কোনো দিন এড়াইত না।

গৃহিণীর পুত্রকন্যা নান্টু এবং টুনুর ভোরে উঠিয়া খাবারের জন্য চীৎকার একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল। দ্বাদশীর দিন উপবাস-ক্লিষ্ট উমা সকালে উঠিয়া খাবার করিতে পারে নাই, ইহা লইয়া বাড়ীতে তুমুল গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। উমা কাঁপিতে

কাঁপিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বিশ্বনাথ অন্দরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল ঐ হাঁ-করিয়া-চীৎকার-পরায়ণ ছেলে-মেয়ে দুটার গালে খুব জোরে দুই চড় লাগাইয়া দেয়। কিন্তু চীৎকার বন্ধ করার সেটা প্রকৃষ্ট উপায় নয় জানিয়া সে না খাইয়াই বেড়াইতে বাহির হইল এবং প্রায় তিন মাইল মাঠে-মাঠে ঘুরিয়া আসিল।

পরের দ্বাদশীর ভোরে উমা জোর করিয়া নিজের ক্লান্ত শরীরকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিল। মায়ের গালাগালি সহ্য করার অপেক্ষা তাহার উনানের আগুনে পুড়িয়া মরাও শ্রেয় মনে হইতেছিল। দরজা খুলিয়া বাহির হইতে যাইবে এমন সময় বাহিরে বিশ্বনাথের গলা শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি নান্নু-টুন্নুকে ডাকিতেছিল, "এই নান্নু টুন্নু, দেখ্ তোদের জন্যে কি এনেছি, আর সেই যে বড়পুকুরে কাল পদ্মের কুঁড়ি দেখে এসেছিলাম না, সেগুলো আজ ভোরে ফুটে কি সুন্দর হয়েছে, চল্ তোদের তুলে দিই গিয়ে।" নান্নু এবং টুন্নুর ইহাতে আপত্তি কিছুই ছিল না, তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। উমা নিজের ঘরের মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মা চলিয়া যাইবার পর হইতে, সেও যে একটা রক্তমাংসের গড়া মানুষ তাহা ত সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে এই মানুষটিকে কি মা মেয়ের দুঃখ দেখিয়া এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন? সে গলবস্ত্র হইয়া লুটাইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল, সে প্রণাম যে কাহার উদ্দেশ্যে তা সে নিজের মনেও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল না।

স্নান করিয়া রান্নার জন্য এক কলসী জল লইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে উমা দেখিল, বিশ্বনাথও একটা গামছা কাঁধে করিয়া সেই পথেই ঘাটের দিকে চলিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়াই আবার উমার চোখ সজল হইয়া উঠিল। এই একটুখানি অযাচিত করুণা তাহাকে আজ কেন এত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া একবার এই মানুষটিকে সে প্রণাম করে, কিন্তু সঙ্কোচে অগ্রসর হইতে না পারিয়া জড়সড় হইয়া সে পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথ একটু ইতস্তত করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই সকালেই জল টান্‌তে বেরিয়েছেন কেন? আপনার নিশ্চয় এখনও খাওয়া হয়নি।"

উমা শেষ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তা না হলে ইস্কুলের ভাত দেবো কি করে?"

"অমন মানুষ খুন করে ভাত খাওয়া আমার কোনো-দিন অভ্যাস নেই, তা-ছাড়া আজ আমার একটু জ্বর হয়েছে, ভাত হয়ত খাবই না," এই কয়েকটা কথা বলিয়াই সে হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

উমা ত্বরিতপদে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বিশ্বনাথের হঠাৎ জ্বর হওয়ার কারণ সে আজ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল।

সুখের দিনে দেখা হইলে হয়ত এ-দুটি মানুষ পরস্পরের জীবনে কোনো চিহ্ন রাখিয়া যাইত না, কিন্তু দুঃখের বাঁধন তাহাদের বড়ই কাছাকাছি আনিয়া ফেলিল।

(৩)

"উমি, শুন্‌ছিস, আরাম ছেড়ে উঠে একটু সকাল-সকাল উনুনে আগুন দে, আজ সুরেশ আর দিদি আস্‌বে, এসে কি শেষে মুখে জল দিতে পাবে না?"

উমা ঘরে বসিয়া কি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, তা সেই জানে। ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, রান্না-ঘরে গিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বিশ্বনাথ ইস্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, একটি লোক তাহার খাটে বসিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে তামাক খাইতেছে। তাহার মাথার সামনে টেরী এবং পিছনে টিকি, পরিধানে খুব সৌখীন ধুতি এবং পাঞ্জাবী। লোকটার দিকে একবার চাহিয়াই বিশ্বনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুরেশ হুঁকা নামাইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিল "এই বুঝি তোদের নতুন মাষ্টার? থাক্ ত ছেলে পড়িয়ে, কিন্তু জমিদারবাড়ীর চাল ছাড়তে পারেননি, মানুষকে যেন চোখেই দেখেন না।"

গৃহিণীর এই ভাইটির নানা-কারণে বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত হইত। এখানে আসিয়াও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। ছেলে-পিলেদের খাওয়া হইয়া গেলে গৃহিণী

উমাকে বলিলেন, "সুরেশের খাবার আমার ঘরে ঢাকা দিয়ে রাখ, বিশ্বনাথেরও রাখ, দুটি এক-বয়সী, বেশ একসঙ্গে খাবে এখন।"

রাত দশটার পর সুরেশচন্দ্র যখন সান্ধ্যভ্রমণ সারিয়া বাড়ী ফিরিলেন, তখন বাড়ী একেবারে চুপচাপ, উমা সব কাজ সারিয়া নিজের রাত্রির আহার মুড়ী ও গুড় লইয়া খাইতে বসিয়াছে। সুরেশ আস্তে-আস্তে দরজার কাছে আসিয়া দুপাটী দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "কি গো, আছ কেমন, এবার যে আর চিনতেই পারলে না।"

উমা চমকাইয়া উঠিল, তীব্রদৃষ্টিতে একবার দরজার দিকে চাহিয়াই খাওয়া ছাড়িয়া সশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। সুরেশের মুখে একটা পৈশাচিক হাসি খেলিয়া গেল, সে সরিয়া গিয়া দিদির ঘরে হাজির হইল।

ডাক পড়াতে বিশ্বনাথ আসিয়া দেখিল এই নরপুঙ্গবটির সঙ্গে আজ তাহাকে খাইতে হইবে। স্বয়ং গৃহিণী আজ পরিবেষণকারিণী। যে কারণেই হোক ভাইয়ের সামনে উমাকে তিনি বাহির করিতে চাহিতেন না।

সুরেশ খাবারের থালা সামনে আসিতেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ কি, ভাত কেন? রাত্রে যে আমি ভাত খাই না তা এরি মধ্যে ভুলে গেলে নাকি? এত রাতে ভাত খেলে কাল সকালে আর আমায় উঠতে হবে না।"

গৃহিণী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া গেলেন, তাঁহার বিধবা ভগিনী কপাটের আড়াল হইতে বলিলেন "সুরুর আমার যে শরীর, ওর কি কোনো অনিয়ম সয়, মেয়েকে দুখানা লুচি করে দিতে বল্লে না কেন?"

গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তা কি আর আমি বলিনি দিদি? বড়মানুষের বৌ কি আমার কথা কানে তোলেন? ও মুখপুড়ি গেল কোথায়? এর মধ্যেই পিণ্ডি গিলতে বসেছে, আর-কেউ খেলে কি না-খেলে সে দিকে চোখ নেই? উঠে আয় বল্‌ছি এখুনি। সুরু, আর-একটু বোসো ভাই, আমি লুচি এখুনি ভাজিয়ে দিচ্ছি।"

উমা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে ভাঁড়ারঘরে গিয়া ঢুকিল। গৃহিণীর দিদি তাহাকে দেখিয়াই আবার মুখ খুলিলেন, "ও বাবা, মেয়ের রাগ দেখ! একেবারে ফরকাতে-ফরকাতে গিয়ে ঘরে ঢুকল। বিধবা মানুষের আর সারাদিন অত নিজের আরাম নিয়ে থাকলে চলে না। এই যে আমরা আছি, সারাদিন মুখ বুজে কাজ করছি, কখনও কথাটি বলিনে।"

বিশ্বনাথ একবার উমার মুখের দিকে চাহিল, তারপর দু এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া ভদ্রতার খাতির সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে শুনিতে লাগিল দুই ভগিনীর বক্তৃতার স্রোত উমাকে লক্ষ্য করিয়া খুব খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

বিশ্বনাথ সারারাত ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষ রাত্রে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। প্রায় দেড় ঘণ্টা বেড়াইয়া নদীর ধার দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ঘাটে এখনও লোকজন আসে নাই বোধ হয়। কিন্তু সিঁড়ির নীচের ধাপে শাদা কাপড় পরিয়া কে বসিয়া, কালো চুলের রাশ কঠিন পাথরের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মুখ দেখা যায় না। বিশ্বনাথ ঘাটের প্রথম সিঁড়িতে নামিয়া ডাকিল "উমা।"

উমা এতক্ষণ নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত বসিয়া ছিল, বিশ্বনাথের ডাক কানে পৌঁছিবামাত্র সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ধীরে-ধীরে তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসিল। কথা বলিয়া উমাকে সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা যেন তাহার লোপ পাইয়াছিল। উমা মুখ না তুলিয়াই বুঝিতে পারিল বিশ্বনাথের চোখের জল তাহার খোলা চুলের রাশে ঝরিয়া পড়িতেছে।

একটু পরে বিশ্বনাথ জোর করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার ডাকিল, "উমা।" এবারও উমা উত্তর দিল না। হঠাৎ তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মাথায় তার এ কার স্পর্শ? চুলের রাশ ভেদ করিয়া যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল।

উমার মাথায় হাত রাখিয়াই বিশ্বনাথ বলিল, "উমা, তোমার এ যন্ত্রণা আর আমি চোখে দেখতে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি বড়লোক নই, কিন্তু আমার স্ত্রী হলে তোমার অন্ততঃ মনের শান্তি থাকবে।"

উমার সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া আসিল। পর মুহূর্ত্তেই সে উঠিয়া বসিয়া একবার ভয়চকিত দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া বিদ্যুতের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নিজের ঘরে পৌঁছিবামাত্র মূর্চ্ছিতের মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিবামাত্র একটা প্রচণ্ড ধিক্কারে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। ছি, ছি, নিজেকে সে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে! তাহার আবাল্য ব্রহ্মচর্য্যের আর তার পিতার এত শিক্ষার ফল কি এই? হিন্দুবিধবা হইয়া সে একটু কষ্ট সহিতে পারে না, আর তার এই দুর্ব্বলতা লোকের কাছে সে এমন ভাবে প্রকাশ করিয়াছে! ব্রাহ্মণের কন্যা ব্রাহ্মণবংশের বধূ সে, একজন তাহার কাছে স্বচ্ছন্দে বিবাহের প্রস্তাব করিল! ছি, ছি, এ কথা শুনিবার আগে তাহার মরণ হইল না কেন? আর, যে তাহাকে এমন কথা বলিতে পারিল, সেই বা কেমন?

উমা মনের সমস্ত রাগ আর ঘৃণা পুঞ্জীকৃত করিয়া অপরাধী বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে চিত্তকে কঠিন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়রে অপমানিত ব্রহ্মচর্য্যের অহঙ্কার! তাহার দুঃখে বিশ্বে একমাত্র যে-মুখ ব্যথায় কাতর হইয়া উঠিত সেই মুখ উমার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিবামাত্র তাহার দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে যতই অন্যায় করুক, উমার মন যে তাকে দণ্ড দিতে একেবারেই অসমর্থ। নিজের চিত্তের দুর্ব্বলতার এই আর-একটা পরিচয় পাইয়া উমার মন নিজেরই বিরুদ্ধে আরও কঠিন হইয়া উঠিল। নিজের দুঃখ এত করিয়া জাহির করিয়া সে-ই ত এই ভীষণ অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিয়াছে। দোষ ত আর-কাহারও নয়! শাস্তি যেন সে একলাই বহন করে। তাহার প্রায়শ্চিত্তে যেন সব পাপ দূর হইয়া যায়।

হঠাৎ তাহার জানলার কাছে বিশ্বনাথ আসিয়া দাঁড়াইল। ধূলি-লুণ্ঠিত উমার দিকে চাহিয়া ব্যথিত কণ্ঠে ডাকিল, "উমা!" উমা মাথা তুলিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল "যাও, যাও, আমায় আর পাপের পথে টেনো না।"

বিশ্বনাথের মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল। সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আর-একজন লোক এতক্ষণ উভয়ের অলক্ষিতে দুজনকে খুব মন দিয়াই দেখিতেছিল, সেও এখন সরিয়া গেল।

গৃহিণীর দিদি তখন সবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছেন। মালা হাতে করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিবামাত্র সুরেশ দাঁত বাহির করিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিরে, এত হাসি কেন?"

"নাঃ, হাসি আর কিসের। এই কতই দেখছি, চির-কাল আমিই পাজী বদমায়েস জানতাম, এখন দেখি সবাই এক গোয়ালের গরু।"

দিদি হরিনাম একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "কেন রে, কি হয়েছে?"

"কি আবার হতে বাকী আছে, এই যে তোমাদের সাধু বিশ্বনাথ,......" সুরেশ জমকাইয়া বসিয়া বক্তৃতা সুরু করিল।

(৪)

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন কালো মেঘের ছায়ায় আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। বাতাসের চিহ্নমাত্রও ছিল না, সমস্ত প্রকৃতি যেন কিসের ভয়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল।

শম্ভুচরণের বাড়ীতে একটা কিসের যেন চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। সকলেই নিজের-নিজের কাজ করিতেছিল, কিন্তু সে কাজগুলায় মন কাহারও ছিল না। কেবল নানু আর টুনু উঠানে অকৃত্রিম মনোযোগ-সহকারে কাদার ঘর গড়িতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া গৃহিণী হঠাৎ তাঁহার ঘরের সভা ভঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার দিদি ঘর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "তা হলে ঐ ঠিক রইল ত?" গৃহিণী উত্তর দিলেন, "ঠিক না করে আর করি কি? সব দিক ত দেখ্‌তে হবে।"

ঝড়টা দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর সবকটা দরজা জানলা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। কেবল উমা নিজের ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ গৃহিণী কি জানি কেন তাহাকে সকল কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, তাঁহার দিদি আজ রান্নাঘরে গিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন।

আকাশ বাতাস তখন যেন দারুণ আক্রোশে গর্জ্জন করিতেছিল। উমা একেবারে অনাবৃত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইল। নদীর পথে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া, আবার কি মনে করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘরের কাজে ডুবিয়া নিজকে ভুলিয়া থাকার পথ আজ তার বন্ধ, বাহিরের এই প্রলয়রূপ তাই আজ তাহার মন ভুলাইয়া পথে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে।

বাড়ীর ঝি বামা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, মা তোমাকে ডাকছেন।" উমা তাঁহার ঘরে পৌছিয়া দেখিল তাঁহারা দুই বোনে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন। উমা ঘরে ঢুকিবামাত্র গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "তোমার জিনিষপত্র কি আছে গুছিয়ে নাও বাছা, কাল ভোরের গাড়ীতেই তোমাকে বিদায় হ'তে হবে।" উমা বজ্রাহতের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল "কেন মা, আমায় বিদায় করছ কেন? আমি কোথায় যাব, কার সঙ্গে?"

গৃহিণীর দিদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ন্যাও বাপু আর ন্যাকা সাজতে হবে না, তোমার সব বিদ্যেই জানা গিয়েছে। আমি পৈরাগ হয়ে কাশী যাচ্ছি। তুমিও সেইখানে যাবে। পৈরাগে মাথা মুড়িয়ে ত্রিবেণীতে ডুব দিয়ে সব পাপ ধুয়ে যাবে, তারপর কাশী বাস করবে, বিধবা মানুষের এর বাড়া আর আছে কি? তোমার বাবাই বলেছেন বাছা, আমার দিকে অমন করে তাকালে কি হবে? আমি ত আর সাধ করে তোমার মত গুণবতীকে ঘাড়ে নিচ্ছি না।"

উমা নিজের ঘরে আসিয়া দেখিল, বৃষ্টির ছাট আসিয়া ঘরের মেজেয় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া সে আস্তে-আস্তে জানলার কাছে গিয়া বসিল। বিদ্যুতের আলোয় একবার চাহিয়া দেখিল সামনের ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। ও-ঘরের দরজা যে তাহার কাছে চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গিয়াছে এই কথাটাই নিজের অলক্ষিতে তাহার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিল। বিচ্ছেদের দুঃখ আর সেই দুঃখ-পাওয়ার অপরাধ দু-ই যেন তাহার মনে গঙ্গাযমুনার মত মিশিয়া গিয়া প্রয়াগতীর্থ রচনা করিয়াছিল।

বাহিরে একটা কিসের গোলমাল ঝড়ের শব্দকেও ছাপাইয়া উঠিল। শম্ভুচরণ দ্রুতবেগে ভিতর-বাড়ীতে ছুটিয়া আসিলেন। উমা তাহার বিমাতার গলার স্বর শুনিতে পাইল, "হ্যাগা কি হয়েছে, অমন করছ কেন?"

পিতা উত্তর করিলেন, "হয়েছে আমার মাথা। পরের বোঝা ঘাড়ে করে আমি এখন মরি। জমিদারবাবুর কাছে কি জবাবদিহি করব এখন?"

গৃহিণী বলিলেন "কে জানে বাপু, আজ ত তার বাড়ী যাবার কথা, তাই হয়ত গেছে, সকাল থেকে তাকে দেখিনি।"

"দেখবে কোথা থেকে, এজন্মে তাকে আর দেখতে পেলে হয়। বাড়ী যাবে ত নৌকা করে, তা হলে এতক্ষণ হয়ে গেছে, একখানা নৌকা ডুবেছে বলে শুনে এলাম।" কর্ত্তা যেমনভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে ফিরিয়া গেলেন।

বিমাতার সামান্য কটু কথায় যে-উমার চোখে জল আসিত, সে আজ নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। মাঝ রাত্রে বিষ্ণু ছুটিয়া তাহার ঘরে আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ও ভাই দিদি, বিশ্বনাথ-দা জলে ডুবে গিয়েছেন। ভোলা আমাকে বললে, আমি ভিজতে ভিজতে নদীর ধারে গিয়েছিলাম। সবাই বললে নৌকা উল্টে যাবার পর তিনি একটা ছোট মেয়েকে জল থেকে তুলতে গিয়ে একেবারে তলিয়ে গেলেন।" বিষ্ণু সেই ভিজে মেজের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উমা দুই হাতে জানলার লোহার গরাদে শক্ত করিয়া ধরিয়া সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভোর হইবার আগেই সুরেশ ও তাহার দিদি যাত্রা করিয়া বাহির হইবেন। গৃহিণী উমার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, মেজের উপর বিষ্ণুচরণ পড়িয়া ঘুমাইতেছে, ঘরে আর কেহ নাই। ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া সকল ঘর খুঁজিলেন, কোথাও সে নাই। তখন নিজের ঘরে আসিয়া ঠেলা মারিয়া শম্ভুচরণকে তুলিয়া দিলেন।

গোলমালে ক্রমে বাড়ীর সকলেই উঠিয়া পড়িল। ঘরের বাহিরের কোন জায়গাই খুঁজিতে বাকী রহিল না। অবশেষে বামা ঝি চোখ মুছিতে-মুছিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এই একটু আগে কে যেন খিড়কীর দোর খুলে বেরিয়ে গেল, আমি তখন ঘুমের ঘোরে ভাবলাম বুঝি বেরালটা।"

আঁধারের ঘোমটায় তখনও চারিদিক ঢাকা। শম্ভুচরণ একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া বলিলেন, "সেখানে থাকুক সে, আমি তাকে খুঁজে আনছি, কাউকে আমার সঙ্গে যেতে

হবে না।" তিনি বাহির হইয়া যাইবামাত্র বিষ্ণুচরণও অন্ধকারে তাঁহার পিছনে চলিল।

শম্ভুচরণ নদীর ধারের এবং পথের সমস্ত ঝোপ ঝাড় খুঁজিয়া শেষে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লণ্ঠন তুলিয়া এধার-ওধার তাকাইতে লাগিলেন। ঘাটের সিঁড়ির একেবারে শেষে, জলের প্রান্তে একটা শাদা কি যেন দেখা গেল। শম্ভু নামিয়া আসিয়া দেখিলেন উমাই বটে। পায়ের কাছে মৃত্যুর স্রোতের মত নিবিড় কালো জল গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, মাথার উপর মেঘের ঘন কালো আবরণ, ঝড়ের হাওয়া তাহার ক্ষীণ তনুকে ঘিরিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাগ্‌লা হাওয়ার টানে যেন সন্ধ্যাতারা আকাশের কোল ছাড়িয়া পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।

শম্ভুচরণ গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন "উমা, উঠে এস, যাবার সময় হয়েছে।" উমা উঠিয়া দাঁড়াইল, কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শম্ভুচরণের পিছন পিছন চলিল। বাড়ীর কাছে আসিবামাত্র বিষ্ণু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" শম্ভুচরণ কঠিন হাতে তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দিদির সঙ্গে কথা বোলো না, ঘরে যাও।"

ভোর হইবার আগেই, উমা আজন্মপরিচিত গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ট্রেনের সংকীর্ণ মেয়েদের গাড়ীতে বসিবার স্থানের অকুলান হওয়াতে তাহার সঙ্গিনী অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিলেন। উমা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ চোখে বাহিরে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে পলাশপুর চোখের আড়াল হইয়া গেল।

(৫)

ত্রিবেণীর ঘাটে লোকের ভিড় এখনও কমে নাই। তবে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে বলিয়া যাত্রিণীরা ঘরে ফিরিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। তিনটি বাঙ্গালীর মেয়ে ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনজনই বিধবা। একজন যে ঝি তাহার চেহারা এবং কণ্ঠস্বর অত্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতেছিল। অন্য দুজনের মধ্যে একজন স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া, মুখ অতিশয় গম্ভীর, আর একটি তরুণী, তার বিস্ফারিত চোখ যেন পৃথিবীর দিকে কিছু না বুঝিয়াই তাকাইয়া আছে।

প্রৌঢ়া ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন, "পাণ্ডা মিন্সে গেল কোথায়? নাপিত আন্‌তে গিয়ে তার আর দেখা নেই, বাড়ী ফিরব কখন্?" তাহার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই মোটা-সোটা পাণ্ডাজী এক হিন্দুস্থানী নাপিত সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। সে নিজের থলি খুলিয়া চট্‌পট্ চিরুণী, ক্ষুর, কাঁচি প্রভৃতি বার করিতে লাগিল। প্রৌঢ়া তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো মেয়ে, এগিয়ে এস, আর দেরী কোরো না, রাত হয়ে এল।"

যমুনার কালো জল গঙ্গার শাদা জলে মিলিয়া যেখানে কল্লোল তুলিয়াছিল, তরুণী একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া ছিল, সে নড়িল না। প্রৌঢ়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। নাপিত কাঁচি বাহির করিল, তরুণীর ঘন কালোচুলের রাশ মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, সে হাত দিয়া তাহা তুলিয়া ধরিল।

নাপিতের হাত তাহার চুল স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সমস্ত শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। "আমার চুলে কেউ হাত দিও না," বলিয়া সবলে নিজের চুল নাপিতের হাত হইতে ছাড়াইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে তাহার সঙ্গিনীর মুখ কালো হইয়া উঠিল, পাণ্ডা একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে যুবতীর দিকে অগ্রসর হইল।

ব্যাধবেষ্টিত হরিণীর মত চকিত চোখে একবার সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। চারিদিকে শুধু হিংস্র কঠোর চাহনি, বিশ্বসংসারে তাহার জন্য আর একবিন্দুও করুণা অবশিষ্ট নাই।

পাণ্ডা তাহার কাছে আসিবামাত্র সে তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই আকাশ-ভ্রষ্ট তারার মত তীব্রবেগে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার রক্তহীন শুভ্রমুখ যমুনার কালো জলে একবার শ্বেতপদ্মের মত ফুটিয়া উঠিল, তারপর যম-ভগিনীর গভীর আলিঙ্গনে সে চিরদিনের মত তলাইয়া গেল।

শ্রীসীতা দেবী।

রূপকথা

(১)

রাজা পুরুষোত্তমের প্রাসাদে আজ উৎসব লেগে গেছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমা। লক্ষ্মীর বরপুত্রের চক্ষে আজ নিদ্রা নেই; তিনি সরস্বতীর শতদল আসন আজ শতহস্তে লুট করে এনেছেন। লক্ষ্মীর স্বর্ণভাণ্ডারের অজস্র সম্পদেও যে এ উৎসবের মাধুরী ফুটে উঠবে না, তাই শুভ্র পূর্ণিমা-রজনীকে আজ শুভ্র শতদল ও শেফালির মালায় সাজিয়ে তুলতে হবে।

ফুলে ফুলে প্রাসাদ-অঙ্গন ভরে উঠেছে; পূর্ণিমার চাঁদ শেফালিবনের সবুজ পাতায় আলোর হাস ছড়িয়ে দিয়ে দূরে কাশবনের শুভ্র অঙ্গে জ্যোৎস্নার ধারা ঢেলে দিচ্ছে। শরৎলক্ষ্মী আজ কোমল কাশের মৃদু তালে-তালে শত-হস্তে বিশ্ববাসাকে তাঁর উৎসবে ডাক দিচ্ছেন! রাজপুরীর যেখানে যে ছিল সবাই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত। জরা যার মাথায় শরতের মেঘের মত শাদা পাগড়ী পরিয়ে দিয়েছে সেও উৎসবের আনন্দে পাগল, আবার ধরণী যাকে সবে তার শ্যাম বাহু মেলে কোলে তুলে নিয়েছে, সেও ছোট কচি দুটি হাত মেলে উৎসবের আনন্দেই যোগ দিয়েছে। বর্ষার জলধারায় স্নান করে গাছের মাথা যেমন সবল সতেজ হয়ে উঠেছে, যৌবনের স্পর্শে তরুণ-তরুণীরা তেমনি শোভন হয়ে উঠে উৎসবে প্রাণসঞ্চার করেছে।

যার যেমন বয়স সে তেমনি করেই তার উৎসব করবে। তাই কিশোরী কুমারীরা আজ তাদের সুন্দর হাতের নিপুণস্পর্শে রাজপুরী শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে চায়। ফুলের স্তূপ যেখানে শুভ্র তুষার-পর্ব্বতের মত চাঁদের আলোয় গা ঢেলে পড়ে আছে, প্রজাপতির পাখার মত অসংখ্য বিচিত্র রঙের হাল্কা পোষাকে তরুণ তনুগুলি সাজিয়ে তারা সেইখানেই ভিড় করেছে। পলকে পলকে হাতে হাতে কত ফুলের মালা, অলঙ্কার, আসন, পাখা, ঝালর সব গড়ে উঠ্ছে; কলালক্ষ্মী আজ যেন তাঁর সমস্ত নৈপুণ্য এই আনন্দ-প্রতিমাদের হাতে ঢেলে-দিয়েছেন।

পুরুষোত্তমদেবের সভায় নেপালরাজ্য থেকে এক শিল্পী তরুণ বয়সে এসে উদিত হয়েছিলেন। পাষাণে প্রাণের উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে তোলাতেই তাঁর বিশেষ আনন্দ ছিল; কিন্তু তাই বলে নক্সা-কাটা, ছবি আঁকা, কি রঙের খেলা খেলানোতে যে তাঁর হাতযশ ছিল না, তা বলা যায় না। সেই শিল্পী বীরভদ্র যেদিন প্রথম এই রাজসভায় দেখা দিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গের সামান্য সরঞ্জামের মধ্যে একটি জিনিষ ছিল, যাকে শিল্পীর কোন আনুষঙ্গিক জিনিষ বলা চলে না। অধিকন্তু উপদ্রব বলা যেতে পারে। বীরভদ্রের কোলে ছিল একটি মাতৃহারা ছ'মাসের কচি মেয়ে। এই মেয়েটিকে তার তরুণ পিতা শিল্পলক্ষ্মীর চেয়ে কিছু কম ভাল বাসতেন না। জগতে ওই দুটিতেই তাঁর সমস্ত আনন্দ নিবিড় হয়ে ছিল। ওই দুটিকে এক করে দেখবার জন্যে বোধ হয় তিনি তুলির ক্ষুদ্র লিখনের মত এই আনন্দ-কণাটির নাম রেখেছিলেন চিত্রলেখা। তবে চিত্রা নামেই সে পরিচিত। রাজসভায় আসন পেয়ে বীরভদ্র তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে চিত্রকলা ও চিত্রলেখার সেবায় লেগে গেলেন। বাহিরে রাজসভায় তাঁর যশগৌরব তাঁকে নিত্যই নূতন আনন্দ পরিবেষণ করতে লাগল, ঘরে তাঁর চিত্রলেখা লোকের চোখের আড়ালে দিনে-দিনে চন্দ্রলেখার মত উজ্জ্বল হয়ে পিতার প্রাণ আনন্দময় করে তুল্‌ল।

বীরভদ্রের একান্ত ইচ্ছা ছিল, চিত্রা তাঁর মত শিল্পরসের অনুরক্ত হয়। সকল শিষ্যের চেয়ে যত্নে প্রাণের আগ্রহ দিয়ে তিনি চিত্রাকে শিক্ষা দিতেন। কিশোরী চিত্রার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখে রাজসভা স্তব্ধ হয়ে থাক্‌ত। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা যখন বালিকা চিত্রার প্রশংসায় রাজসভা মুখরিত করে তুলতেন, তখন তরুণ শিল্পীদের প্রশংসমান চোখ বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে তার প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে স্থির তারকার মত চেয়ে থাক্‌ত, আর গর্ব্বে বীরভদ্রের মুখ রক্তপদ্মের মত রাঙা হয়ে উঠত। চিত্রার কিন্তু নিজের এ নৈপুণ্য দেখাবার বড় আগ্রহ ছিল না, সে চাইত নিভৃতে নিজের ঘরের নিরালা কোণে বসে মনের বিচিত্র কল্পনারাজি রেখা ও রঙের যোগে প্রাণময় করে তোলে আর তার সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোর হয়ে থাকে; কিন্তু তার পিতার সকল আনন্দ, সকল গর্ব্বের আধার যে শুধু সে-ই; তাই তাঁর আনন্দের একটি কণাও পাছে খসে পড়ে, এই ভয়ে সে সর্ব্বদা তাঁর মন জুগিয়েই চল্‌ত। কিন্তু যতটুকু দরকার তার বেশী বড়

কেউ তাকে করতে দেখেনি। তার কথাও বড় বেশী কেউ শোনেনি। তার গলার স্বর বীণার ঝঙ্কারের মত মধুর কি জলকল্লোলের মত গভীর তা' তার মুগ্ধ পূজারীর দল জানত না। হৃদয় তার পাষাণের মতন কঠিন কি কুসুমের মতন কোমল তার পরিচয় এক প্রৌঢ় বীরভদ্র ছাড়া বড় কেউ জানত না। তবে তার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টির আড়ালে কেমন যেন সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির মতন একটা প্রদীপ্ত ভাব সকলের চোখেই পড়ত।

কোজাগর পূর্ণিমার উৎসবের দিনে তরুণীদের ফুলের মেলায় চিত্রার আসন ছিল সকলের আগে। তার আঁকা নক্সা, তার গাঁথা মালা দেখেই সকলে সেদিন উৎসব-সজ্জা শোভন করতে নেমেছিল। চিত্রা নিজের হাতে তৈরী করছিল একটি ফুলের দোলা। দোলার আসনে আর দুই পাশের বাঁধনে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল বিচিত্র ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে রূপের পশরা খুলে দুলছিল। প্রতি বৎসর শারদ পূর্ণিমায় রাজকুমার বিক্রমদেব নিজের হাতে এই দোলা নদীর ধারের ঘন নিমগাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতেন। এ কাজে চিত্রাই তাঁর সহায়। আর-সব ফুলের খেলায় চিত্রা কেবল সঙ্গীদের উপদেশ দিয়ে দিত; এ কাজটায় কিন্তু সে আর কাউকে হাত দিতেও দিত না। যশ গৌরবের জন্য তাকে কেউ কোনো দিন লালায়িত হতে দেখেনি; তার হাতের কাজ সুন্দর কি অসুন্দর এ বিষয়ে কোনো কথা শুনতে এতটুকু আগ্রহও সে কখনও দেখায়নি। কিন্তু সমস্ত বৎসরের মধ্যে এই একটি দিন সে যে প্রাণভরা আগ্রহ দিয়ে কাজ করত, সে তার শিল্পদেবতার তুষ্টির জন্য নয়, নিজের সৌন্দর্য্যতৃপ্তির জন্য নয়, সে শুধু গর্ব্বভরা মুখে একজনের অতি নিকটে দাঁড়িয়ে তার হাতে হাতে এই শিল্পরচনাটিকে তুলে দেবার জন্য, আর প্রতিদানে একবার তার প্রশংসমান হাসিভরা দৃষ্টিলাভের জন্য। সারা বৎসর চিত্রা তার প্রিয়কে স্বর্গের দেবতার মত দূর থেকেই প্রণাম করে। কেবল বৎসরান্তে একটি দিনের মত এই দেবতা মর্ত্ত্যের পূজারিণীকে তাঁর প্রসন্ন হাস্যে ধন্য করে দিয়ে যেতেন। এই নিমেষের দানে তিনি যা দিয়ে যেতেন তাই ছিল চিত্রার সারা বছরের খোরাক।

বর্ষার জলভারে ভৈরবী নদীর দু'কূল ছাপিয়ে-উঠেছিল, শরৎকালেও তার উচ্ছ্বাস কমেনি। পূর্ণিমায় নদীর জল যখন ফুলে-ফুলে দুলে-দুলে উঠছিল, আর চাঁদের আলো ঢেউয়ের মাথায় আছড়ে পড়ে হীরার কণার মত হাজার টুকরা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল, ঠিক সেই সময়ে নদীর বাঁকের কাছের সেই ঝাঁকড়া-মাথা ঘন নিমগাছটার তলায় মহা ভিড়। এ-রাজ্যে আজ কত বছর ধরে যে ওই বুড়ো নিমগাছটার তলায় তরুণী কুমারীদের নূপুর প্রতি শরতে মধুর নিক্কণ তুলে আসছে, আর কত রাজকুমার তার ওই প্রকাণ্ড হেলানো ডালটায় ফুলের দোলা টাঙিয়ে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাকে লক্ষ্মীর সম্মান দিয়ে দোল দিয়েছেন, তার হিসাব বোধহয় এক ওই বুড়ো নিমগাছটাই রাখে। তাকে ঘিরে তরুণ প্রাণের এ আনন্দ-উৎসব তার যৌবনকাল থেকেই হয়ত চলে আসছে, তাই তাদের স্পর্শে আজও সে প্রতি-বৎসরে নব যৌবনের সঞ্চারে বৃদ্ধ বয়সেও পুলকিত হয়ে ওঠে। হিন্দোলের দোলাও বর্ষায়-বর্ষায় তারি শাখায় আনন্দে দোল দেয়। যাকে ঘিরে চিরচঞ্চলদের চপলতা চলেই আসছে, সে স্থবির হয় কি করে?

কুমার বিক্রম যখন তাঁর বলিষ্ঠ বাহুর সমস্ত জোর দিয়ে দোলার দড়িটা গাছের ডালের দিকে ছুড়ে দিলেন, দোলার ফুল-সাজটা তখন চিত্রার হাতে। চিত্রা তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। দড়িটা ঘুরে নেমে আসতেই তার দুটো মুখ সমান করবার জন্য বিক্রম সজোরে এক টান দিলেন। কি জানি কেন আজ এ-আনন্দের আঘাত বুড়ো নিমটার সইল না। তার এত কালের বাঁকা ডালটা আজই মড়মড়িয়ে ভেঙে গেল। নদীর বাঁকের ঢেউয়ের ঘা খেয়ে-খেয়ে সেখানে গাছের পাশে জমি খুব কমই ছিল। রাজকুমার নিজের টানের জোর সামলাতে না পেরে ডালটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে নদীর গর্ভেই পড়লেন। প্রকাণ্ড ডালটা ঠিক তাঁর মাথার উপরে এসে পড়ল। কালো-জলের মধ্যে সব যেন মিশে অন্ধকার হয়ে গেল। গাছতলার ওই ভিড়ের মধ্যে আর দ্বিতীয় পুরুষ নেই। কুমারকে তোলে কে? ওই প্রচণ্ড আঘাতের পর নিজে ওঠবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। কিশোরীকুমারীদের কলকণ্ঠের কোলাহলই বা শোনে কে তখন? তাঁদের ক্ষীণ বাহুতেও এত শক্তি নেই যে বিক্রমের বিশাল শরীর টেনে তোলেন। চিত্রা কিন্তু এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করেই

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার দীর্ঘ দেহে বলের অভাব ছিল না, সুপুষ্ট বাহুতেও শক্তি যথেষ্ট। পাহাড়ী মেয়ের রক্তের জোর তার শরীরে আজও ছিল। ডালপালা ঠেলে দুই হাতে জল কেটে সে চারদিকে বেড় দিয়ে একবার দেখে নিলে। তারপর যখন একডুব দিয়ে সে উঠে এল, তখন গাছের ডালের ছড় লেগে তার হাত পা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, কঠিন পরিশ্রমে মুখখানা সিঁদূরের মত রাঙা, সাধের উৎসব-সজ্জা ছিন্ন ভিন্ন বিবর্ণ, কিন্তু দৃঢ় মুষ্টিতে তখন সে কুমারের অবশ দেহ ধরে আছে।

(২)

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রাজপুরীর ঘরে-ঘরে দাসীরা প্রদীপ জেলে দিয়ে গেল। সন্ধ্যাবন্দনার শঙ্খ আজ ভয়ে-ভয়ে বাজছে। রাজকুমার আজ দশদিন পীড়িত, তাই দাসদাসী সকলের কাজকর্ম্ম চলাফেরা কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

হাতীর দাঁতের উপর সোনার পাতের নক্সাকাটা উঁচু পালঙ্কে ধপধপে শাদা বিছানায় রাজকুমার শুয়ে আছেন। মাথার কাছের খোলা জানলা দিয়ে মন্দ সমীরণ শিউলির গন্ধে ঘর মাতিয়ে তুলছে। চিত্রা সেই ঘরে রাজকুমারের সেবায় ব্যস্ত। হাতে ছোট একটি সোনার বাটিতে চন্দন, চিত্রা থেকে-থেকে বিক্রমের কপালে চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছে। তার দুটি হাতই কাজে নিযুক্ত; হাতে জড়ানো এলো-চুলের খোঁপা খসে পড়ছে, চিত্রা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মাঝে-মাঝে চুলগুলো ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু তাদের সংযত করতে পারছে না। তার বাসন্তী রঙের শাড়ীর আঁচল-খানা উড়ে-উড়ে রাজকুমারের গায়ে এসে পড়ছিল, আবার আপনি সরে যাচ্ছিল।

চিত্রা দেখছিল, আজ সকাল থেকেই বিক্রমের মুখে মাঝে-মাঝে চেতনার ভাব ফুটে উঠ্‌ছে। তার আশা হচ্ছিল, আজ তার সেবা, তার প্রতীক্ষা সবই ধন্য হবে। আনন্দে তার সে আগুনের মত দৃষ্টিও আজ কোমল হয়ে এসেছে। তার চোখ জলে টলটল করছিল, পাছে কুমারের মুখে তার চোখের জল পড়ে তাই বার বার মুখখানা ঘুরিয়ে সে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। প্রকাণ্ড নীল আকাশ তখন শূন্য, এক কোণে কেবল একটি তারা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ছিল। ক্রমে উপরের মেঘ নেমে নেমে তারাটিকে তার কালো কোলের নিবিড় আঁধারের মধ্যে লুকিয়ে নিলে। শূন্য গগনের একটি তারার মত একটি আশার শিখা চিত্রার শূন্য মনে উর্দ্ধমুখী হয়ে জলছিল, কিন্তু মেঘের ভয় সে কাটাতে পারেনি। শরৎকালের ফুলে-ভরা শিউলির ডাল যেমন একটু নাড়া পেলেই সবকটি ফুল উজাড় করে গাছতলায় ঢেলে দেয়, চিত্রার হৃদয়ও তেমনি উন্মুখ হয়ে ছিল, একটু নাড়া পেলে সে আজ তার পূর্ণডালি বিক্রমের চরণে শূন্য করে সঁপে দিয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে স্নেহের পরশ না পায়?

ধীরে কুমারের চোখ খুলে এল। চন্দনপাত্র নামিয়ে রেখে, এলোচুল জড়িয়ে নিয়ে, চিত্রা তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। বিক্রমের দৃষ্টি তখনও অর্থশূন্য। কোনো মানুষ কি জিনিসের ছায়া তাঁর চোখে যে পড়েছিল এমন মনে হয় না; চিত্রা দীনা ভিখারিণীর মত তাঁর মুখের বাণীর কাঙাল হয়ে সেই সুন্দর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেঘে যখন আকাশ ঢেকে গেছে, ঘরের সোনার প্রদীপ জালিকাটা ঢাকার আড়াল থেকে আলোর ফোঁটা ছড়াচ্ছে, এমন সময় কুমার একটু সরে এসে বল্লেন, "কে তুমি, মালতী না বিজয়া? কথা কও না যে? আমি এ কোথায় রয়েছি?"

চিত্রা অতি ধীরে উত্তর দিল, "আমি চিত্রা।"

বিক্রম একটু বিস্মিত হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্লেন, "চিত্রা? কই চিত্রা বলে' কোনো দাসীকে ত মনে পড়ছে না! শিল্পী বীরভদ্রের কন্যা এক চিত্রা আছে বটে!"

চিত্রা মুখখানা রাঙা করে বল্লে, "আমিই সেই চিত্রা।"

"তুমি এখানে কেন? আমি কি তোমাদের বাড়ী রয়েছি না কি? আশ্চর্য্য ত!"

"আপনি ভৈরবীর জলে পড়ে গিয়েছিলেন, পূর্ণিমার উৎসবে দোলা টাঙাচ্ছিলেন মনে নেই? সেখানে আর লোকজন পাওয়া গেল না, তাই আমিই আপনাকে জল থেকে তুলতে……"

বিক্রমের মুখের উপর কিসের যেন একটা ছায়া খেলে গেল, "বুঝেছি" বলে তিনি চুপ করে রইলেন।

চিত্রা রূপার বাটিতে করে সুগন্ধি সরবৎ কুমারের মুখের কাছে এনে ধরলে। কুমার পান করে আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে চিত্রার মনে হচ্ছিল, আনন্দের আভায় পাণ্ডুর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এতটুকু প্রদীপের আলোতে যেমন প্রকাণ্ড ঘরের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়, ওইটুকু আনন্দের দীপ্তি দেখে চিত্রার নিরাশ মনও তেমনি আশায় ছাপিয়ে উঠেছিল। স্বর্গের দেবতা আজ তার পূজায় প্রসন্ন হয়েছেন, আর তার চাইবার কি আছে, ভাববারই বা কি আছে। সমস্ত ভবিষ্যৎ আজ আনন্দময়; আর সে দীনা ভিখারিণী নয়, শ্রেষ্ঠা পূজারিণী। দেবতার বর এখনি সহস্র ধারায় ঝরে পড়বে; তার ক্ষুদ্র হৃদয়পাত্রে এত দান সে কোথায় রাখবে?

রাজকুমার ঘণ্টা দুই পরে আবার চোখ মেলে বল্লেন, "চিত্রা, শোন, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আজ আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে। তুমি শুনবে কি?"

চিত্রা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চেয়ে সরে এসে তাঁর পায়ের কাছে বস্‌ল। আনন্দে তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। বিক্রমদেব বল্লেন, "জান চিত্রা, আজ কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে আমি কি পেয়েছি? আমি স্বপ্নে দেখলাম, কোজাগরের লক্ষ্মী আমার জাগরণ সার্থক করেছেন, তিনি মুক্ত কেশে স্বর্ণভাণ্ড হাতে আমারি শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন, ধানের শীষ যেমন মৃদু বাতাসের ঘায়ে দুলে-দুলে ওঠে, তাঁর স্বর্ণাঞ্চল তেমনি দুলে-দুলে আমার অঙ্গ স্পর্শ করে গেল। তাঁর চিরউজ্জ্বল দীপ্তি জ্যোৎস্না-রাত্রের গগনভরা আলোর তলায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। তিনি নত হয়ে আমার ম্লান ললাটে নিজ হাতে জয়টীকা এঁকে দিয়ে গেলেন। সে পুণ্য করস্পর্শে আমার আঁধার জগৎ শত সূর্য্যের আলোয় আলো হয়ে উঠ্‌ল।"

শুনতে শুনতে চিত্রার প্রাণ পুলকে নেচে উঠ্‌ছিল; সে ভাবছিল সে লক্ষ্মী কে? এখনি শুনবে, আর দেরী নেই।

বিক্রম আবার বললেন, "ক্লান্ত মুদিত নয়ন মেলে কি দেখ্‌লাম জানো?"

চিত্রা উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল। বিক্রম বল্লেন, "দেখ্‌লাম আমার সে লক্ষ্মী আর নেই; চারিদিকে শুধু শূন্য। কিন্তু আজ পূর্ণিমার দিনে আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে একটি বাণী বাজছে 'লক্ষ্মী লাভ হবে, লক্ষ্মী লাভ হবে।' কিশোর বয়স হ'তে যে-রূপমাধুরী ধ্যান করে এসেছি, সে আমার কল্পনারই সৃজন, কল্পলোকেই সে সুন্দরীর বাস। আজ তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছি; আমার এ স্বপ্ন ত প্রত্যক্ষ দেখাই। আজ আমার সাধনা পূর্ণ হয়েছে; সিদ্ধি, আমারি সে মানসীর হাতে; আমি তা লাভ করবই। জ্যোতিষী গোপালভট্ট আমায় আজ সাত বৎসর ধরে বলে আস্‌ছেন,—লক্ষ্মী প্রসন্ন হলে স্বপ্নে তোমায় স্বহস্তে টীকা দিয়ে যাবেন। সেই দিন থেকে একবৎসরের মধ্যে তুমি তোমার মানসী সুন্দরীকে লাভ করবে। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার সে বাণী আজ সার্থক হয়েছে। তাই আনন্দে আমি অধীর হয়ে উঠেছি। এ পৃথিবীতে আমার চক্ষে আর কোনো দুঃখ কোনো দৈন্য নেই। সব আজ মধুময়। কার কি দুঃখ আছে বল; আমি মুক্তহস্ত; সর্ব্বস্ব দিয়ে সকলের অভাব মোচন করে দেবো। আমি যেদিকে তাকাব সেই দিকেই আনন্দ-উৎসব দেখ্‌তে চাই। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা সকলের চেয়ে বেশী। বল কি চাও, রাজভাণ্ডার লুটিয়ে আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব; তোমার কোনো খেদ রাখব না। ধন, জমি, মান, যশ, কি চাও বল? কোন্ শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে তোমার চির-অনুচর করে দেবো বল? তোমা হতেই আমার সব, তুমি কিসে তুষ্ট হবে তাই বল।"

চিত্রা যে কি চায়, এর পরে তা' আর সে কি করে বলে? যে তারি হাতে সব পেয়েছে বলে নিজ মুখে স্বীকার করলে, তার এ পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে চিত্রার সব আনন্দ আঁধারে তলিয়ে গেছে। তার আশার আলো এ আনন্দের ঝোড়ো হাওয়ার বেগ সামলাতে না পেরে প্রথম ফুৎকারেই নিবে গেছে। এ ঘোর অন্ধকারে আলো আর কেউ জ্বালাবে না। চির অন্ধের মত এইখানেই তাকে হাতড়ে বেড়াতে হবে; যদি কোনো দিন প্রদীপে হাত ঠেকে যায়, যদি কোনো দিন আর-কারো আলোক-শিখায় ঠেকিয়ে তার আলোটিও জ্বালিয়ে নিতে পারে। জগৎটা আশ্চর্য্য বটে! যে দুটি মানুষের জীবন-সূত্র এমন করে জড়িয়ে আস্‌ছিল, যাদের একজনের সুখ-দুঃখই আর-একজন অম্লান বদনে

নিজের সুখদুঃখ করে নেবে বলে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল, কোথাকার কি একটা সামান্য আঘাতে দেখা গেল তারা দুজনে যেন বিপরীত গতিতে ঘুরে চলে গেল। বিক্রমের জগৎ আজ আনন্দময় বলেই ত চিত্রার জগৎ চির-অন্ধকার।

চিত্রা কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিলে, "আমি দরিদ্র শিল্পীর কন্যা, রাজ-ভাণ্ডারে আমার আর চাইবার কি আছে? আপনার সেবা করবার সুযোগ আর অধিকার পেয়েই আমি ধন্য। আর কিছু আমি চাই না। শুধু আশীর্ব্বাদ করবেন যেন আমার এত দিনের শিল্পশিক্ষা সার্থক হয়। আমি যা চাই, তার হাতেই তা পাব।"

কুমার বল্লেন, "তোমার শক্তি অক্ষয় হোক। শিল্পের অপূর্ব্ব সৃষ্টি যেন তোমারি হাতে গড়ে ওঠে।"

চিত্রা নীরবে রাজকুমারকে প্রণাম করে সরে দাঁড়াল।

(৩)

প্রায় এক বৎসর ধরে রাজকুমার বিক্রম তাঁর মানসীর সন্ধানে ফিরছেন। দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে কুমারের অনুচর আর দূতদের পা ক্ষয়ে যাবার জো হয়েছে। বেচারা জ্যোতিষী গোপালভট্ট ত খড়ি পেতে পেতে হাতে কড়া পড়িয়ে ফেলেছেন। আর স্বয়ং কুমার ত আজ এক বৎসর ধরে লক্ষ্মীর আশায় নিশিপালন করছেন। নিদ্রাদেবীর সঙ্গে যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সতীন সম্পর্ক তা' বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কেউ কোনো দিন মনে করেনি। বিক্রমের ঘরে লক্ষ্মীস্বরূপাদের অজস্র চিত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাঁদের এ হতাদর স্বচক্ষে দেখ্‌লে বিক্রমকে যে তাঁরা কত বড় অভিসম্পাত করতেন তা বলা যায় না।

চিত্রা এখন আর কুমারের দর্শনের আশায় ফেরে না। বিমুখ দেবতাকে প্রসন্ন করবার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সে বোধ হয় এখন কলালক্ষ্মীর সেবাতেই তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিয়েছে। গুটিপোকা যেমন অন্ধকার কোটরের মত গুটির মধ্যে বন্দী হয়ে বসে একদিন প্রজাপতির বেশে অজস্র সৌন্দর্য্য নিয়ে আলোর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চিত্রাও তেমনি করে তার নির্জ্জন কুটিরের কোণে বসে সৃষ্টি-রচনায় মগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছে, কি গোপনে তার পুরাতন প্রিয়ের উদ্দেশে অশ্রুজলের নৈবেদ্য সাজাচ্ছে কে জানে?

তখন বর্ষাকাল। রাজপ্রাসাদের বাঘমুখো নল দি[য়ে] ছাদের জল সারাদিনরাতই গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। বাঁধা[নো] সানের উপর নলের জল পড়ে খই ফোটার মত ছট্‌-ছ[ট্‌] শব্দে চারিদিক ধ্বনিত করে তুলছে। বাদল দিনে রা[জ]কুমারের এ দীর্ঘ প্রতীক্ষা অসহ্য হয়ে উঠছে। তি[নি] কোলের কাছে সাতরাজ্যের রাজকন্যা মন্ত্রীকন্যাদের ছ[বি] জড়ো করে মেঘলা আকাশের গুরু গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন,—জ্যোতিষীর বাক্য বুঝি বৃথা হয়ে গেল কই আজও ত সে লক্ষ্মীস্বরূপার সন্ধান পেলাম না। মিথ্যা সবি মিথ্যা। সে স্বপ্ন স্বপ্নের মতই ফাঁকা। এ ছলনা[য়] ভুলে থাকা পুরুষের পক্ষে শোভা পায় না।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত অনেক হয়ে গেল। কুমারের অজ্ঞাতে কখন্ বৃষ্টিধারার উন্মত্ত নৃত্য থেমে গেছে; মেঘের ঘোমটা ঠেলে কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ বৃষ্টির জলে নিজের মুখের বিকৃতি দেখে হেসে কুটিকুটি হচ্ছেন। বিক্রমের মনে হ'ল, দূরে কোথায় যেন কে বীণার ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল; বর্ষার বিরহ-গাথা বীণার তারে তারে গভীর সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। সে বিরহ-গাথায় কত গোপন-দুঃখের অশ্রু যেন সুর ধরে ফুটে উঠছে। কুমার ভেবেই পেলেন না, এমন গভীর রাত্রে কে বীণার তারে তার প্রাণের কথা গেয়ে গেল। দিনের আলো কি তার গানে কান দিত না? তাই স্তব্ধ উৎকর্ণ রাত্রির দরবারে এমন অপূর্ব্ব সঙ্গীত সৃষ্টি?

শেষরাত্রের রঙীন নেশা কাটতে-না-কাটতেই বীণা থেমে গেল। ভোরের বেলা কুমারের দূত অনেক খোঁজ করেও কিছু খবর দিতে পারলে না। সেদিন রাত্রেও আবার বাঁশীর মন-ভুলানো সুর কাকে যেন ডেকে-ডেকে প্রাসাদের চারিদিকে ঘুরে ক্রমে দূরে অতিদূরে সরে গিয়ে বনের ধারে মিলিয়ে গেল। তারপর আবার সেই বীণার ঝঙ্কার। পাঁচ দিন সাতদিন এমনি ভাবেই চল্‌ল। কুমার বল্লেন, আসছে রাত থেকেই এর খোঁজ নিতে হবে।

একদিন দূত এসে খবর দিলে, পুরানো শিব-মন্দিরের পিছনে শালবনের গায়ের কাছে মহারাজের প্রপিতামহ যে বিদেশিনী ভুবনমোহিনী রাজকন্যার জন্যে গোলক-

ধাঁধার মত বাড়ী করেছিলেন, সেই বাড়ীর ঘরে-ঘরে, বন্দিনী কুমারীর জীবিতকালের মত আবার আলোর মালা ফুটে উঠেছে। সেখানে না জানি আবার কোন্ সুর-সুন্দরীর আবির্ভাব হয়েছে, যে-সে লোকে যে সেখানে প্রাণ ধরে ঢুকবে তা' ত মনে হয় না। ঘরে কি শুধু কেবল আলোর ছটা?—ধূপের গন্ধে শালবন ভরে উঠেছে। আর ফুলের সুবাস ত কোণে-কোণে। মানুষ কিন্তু বড় দেখা যায় না। তবে অলঙ্কারের মৃদু ঝঙ্কার যেন এক-একদিন কানে আসে বলে মনে হয়। নূপুর-পায়ে মাঝে-মাঝে কে যেন চঞ্চল চরণে ঘুরে বেড়ায়। তার হাতের কাঁকণও যেন মাঝে মাঝে অধীর হয়ে বেজে ওঠে। কিন্তু সারাদিনরাতের মধ্যে এই ক্ষণিক সাড়াগুলি এত অল্প মেলে যে কেউ আছে কি না তা' ঠিক করে বলা শক্ত।

কুমার বল্লেন, "আমি দেখব কিসের এ মায়াজাল।"

দূত বল্লে, "দিনের বেলা কিন্তু বাড়ীর চারিদিক বন্ধ থাকে, ঠিক যেন সেই পুরাকালের কারাগার, দুঃখিনী রাজ-কন্যার কঠিন কারাবাসের কথা মৌন মুখে আজও জানিয়ে দিচ্ছে। রাত্রি না হলে সে অপ্সরার নিকেতনের আভা মিল্‌বে না।"

কুমার তাইতেই রাজি।

মাঝরাত্রি অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। দূরে শালবনের পাশে সেই পোড়ো বাড়ীটার মধ্যে আজও বীণা বেজে উঠ্‌ল। কুমার পথে বেরিয়ে পড়লেন। বুড়ো নিমগাছটার আড়াল থেকে চাঁদের আলো পথের মাঝে আলোর ডোরা কেটে দিচ্ছিল। সেই ঝাপসা আলোয় কষ্টে পথ দেখে কুমার বিক্রম বন্দিনী রাজকন্যার বাড়ীর পাশে এসে পৌঁছলেন। এ-পথে কতকাল যে লোক চলেনি তার ঠিকানা নেই। কুমার বীণার শব্দ লক্ষ্য করে অপথ কুপথ দিয়ে কোনো-রকমে সেই বীণাবাদিনীর জানলার তলাতেই এসে পড়ছিলেন। শত বৎসর ধরে শীতের আগমনে গাছের পাতা ঝরে-ঝরে সেখানে পৃথিবীর শ্যাম-অঙ্গ একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। একে ত রাজার ছেলে, অন্ধকারে পথচলা কোনো কালেই অভ্যাস নেই, তার উপরে ঝরা পাতার স্তূপে হঠাৎ এসে পা দেওয়া। শুকনো পাতা আর ডালপালার মড়-মড় শব্দে সুরমুগ্ধার সুরের নেশা টুটে গেল বোধহয়। হঠাৎ দেখা গেল একরাশ খোলা চুল আর একখানা সোনালি আঁচল দুলিয়ে কে যেন এসে জানলাটা টেনে বন্ধ করে দিলে। তার মুখ দেখা গেল না, দেখা গেল শুধু হীরার কঙ্কণ-পরা একখানা গৌর হাত। ঘরের প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় হীরার কাঁকণ ঝলসে উঠ্‌ল। জানলা বন্ধ হয়ে যেতেই ভাঙা প্রাসাদ আবার তেমনি চিরকালের মত অন্ধকার। আশায়-আশায় অপেক্ষা করতে করতেই কাক কোকিল জগৎকে জাগরণের বার্ত্তা জানিয়ে দিলে। অগত্যা কুমারকে রুদ্ধ দরজার বাহির থেকেই ফিরতে হল।

পরদিন প্রায় ভোর রাত্রে আবার বনের বীণার তারে বিচিত্র রাগিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল। সে-সুরের টানে কুমার আপনি পথে এসে নামলেন। আজ কিন্তু জানলার পাশে এসে দাঁড়াতে বীণার সুর ভঙ্গ হ'ল না। বীণাবাদিনী সুরের মোহে মুগ্ধ হয়ে আপন মনে ঝঙ্কার দিয়েই চলেছেন। খোলা জানলার উল্টাদিকে দেয়ালের গায়ে ডানা মেলে রূপার পরী উড়তে-উড়তে শিকলে বাঁধা পড়ে আছে। তার দুই হাতে দুটা আর মাথায় একটা সোনার প্রদীপ। তিনটি প্রদীপের আলোই সুন্দরীর মুখে এসে পড়েছে। তিনি পাশ ফিরে বসে আছেন। কোলের উপর বীণা নিয়ে মুখ নীচু করে বাজিয়ে চলেছেন: শুধু আধখানা মুখ দেখা যাচ্ছে। সুন্দরীর মুখের রঙে প্রদীপের আলো যেন লজ্জায় ম্লান। ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের মাঝখানে সোনার পদ্মের মত মুখখানি দেখে কুমারের ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে তার মুখখানা সোজা করে ধরে একবার দেখেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছানো তাঁর সাধ্যের বাইরে। কুমার দুই পায়ে ডাল-পালার উপর চাপ দিয়ে খড়-খড় শব্দ করে বীণার বাজনায় ব্যাঘাত করবার চেষ্টা করলেন, আজ কিন্তু বীণা থাম্‌ল না, সুন্দরী নিমেষের জন্যও চোখ তুলে তাকালেন না। আজ একদণ্ড কাটতে না কাটতেই সূর্য্যের প্রথম রশ্মি ফুটে উঠ্‌ল। অমনি ঘরের আলো কার আঁচলের ঘায়ে নিবে গেল। বীণাও তখন নীরব হ'ল। কুমারের মনে হ'ল অন্ধকারে তাঁর মনোমোহিনী উঠে দাঁড়িয়ে জানলা বন্ধ করে দিলেন। তরুণীর ক্ষীণ দীর্ঘ তনু ছায়ার মত দেখা গেল, মুখ অন্ধকারে অস্পষ্ট। আজ প্রাসাদ থেকে আসবার

সময় কুমার একখানা লিপি লিখে এনেছিলেন, "অয়ি অপরিচিতা, নিমেষের তরে আমি তোমার দর্শনভিখারী। মুগ্ধ ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করবে কি?" জানলার কাছে লিপিখানা রেখে কুমার সেদিনও বাড়ী ফিরলেন।

তৃতীয় দিন যখন কুমার তাঁর তীর্থস্থলে এসে উপস্থিত, তখন জানলা বন্ধ। তাঁর পায়ের শব্দেই সশব্দে জানলা খুলে গেল। কুমার মুখ তুলে চেয়ে দেখেন কপাটের গায়ে একখানা হাত রেখে হাসিভরা মুখে উজ্জ্বল চোখ মেলে সেই অনিন্দিতা সুন্দরী দাঁড়িয়ে। অসংখ্য রত্ন-অলঙ্কারে তাঁর দেহ সুসজ্জিত। অমন ভুবনমোহন রূপ কুমারের চোখে ত কোনো দিন পড়েইনি, স্বপ্নে তিনি যে সুরসুন্দরীকে দেখেছিলেন, তার রূপও এর কাছে অতি ম্লান। কিন্তু এ কি হ'ল! কুমার নির্ব্বুদ্ধির মত নিমেষের দেখা চেয়েছিলেন বলেই কি চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে তাঁর তৃষিতদৃষ্টিকে অবহেলা করে সুন্দরীর ঘরের জানলা বন্ধ হয়ে গেল! ব্যথিতচিত্তে কুমার সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। উপর থেকে ছবির মত সুন্দর একখানা লিপি তাঁর উষ্ণীষে এসে পড়ল; চেয়ে দেখলেন হীরার কঙ্কণ-পরা সেই বিদ্যুৎবরণীর হাতখানা জানলার এতটুকু ফাঁকের মধ্যে মিলিয়ে গেল। লিপিখানায় লেখা ছিল, "তৃপ্ত হয়েছ কি? আর কি চাই?" কুমার ডেকে বল্লেন, "তোমার দর্শনসুখ চাই।" সেদিন কিন্তু তাঁর আশা মিটল না।

পরের রাত্রে বর্ষার বারিধারা অবিশ্রাম ঝরছিল। কুমার সেই দুর্য্যোগে পথহারা পথিকের মত ঘুরতে-ঘুরতে সুন্দরীর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন একখান উঁচু পালঙ্কের উপর জানলার দিকে মুখ করে নিদ্রিতা সেই ভুবন-মোহিনী; কালো চুল রেশমের গোছার মত পালঙ্কের গা দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। হীরার কাঁকণ-পরা হাতখানি বুকের উপর লতার মত লতিয়ে আছে, আর একখানা হাত অলসভাবে মাথার তলায় পড়ে। শিয়রে দাসী পিছন-ফিরে বসে মুক্তার ঝালর-দেওয়া পাখায় মৃদু বাতাস দিচ্ছে। জলের ঝাপটায় কুমারের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে, তিনি বারবার চোখ মুছে, সেই স্থির সৌদামিনীর রূপমাধুরী দেখছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন আকাশ ছেড়ে চাঁদের পাশ থেকে রোহিণী আজ খসে এসে পৃথিবী আলো করছেন। ভোর হতেই বৃষ্টি থেমে এল, বীণাবাদিনীর দাসী বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে জানলার কপাট বন্ধ করে দিলে। কুমার আজ তাঁর মনের কথা সোনার অক্ষরে লিখে এনেছিলেন। সেই লিপি জানলায় রেখে চলে গেলেন।

সারাদিনটা কাটলে তবে আবার রাত আসবে, সেই ভাবনায় দিনটা কুমার কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। সময়ের চঞ্চল পাখায় আজ যেন কেউ হিমাচল পর্ব্বতের ভার ঝুলিয়ে দিয়েছে। গতি আজ তার বড় মন্থর। রাজপ্রাসাদে বন্দীরা আজ যেন এক এক যুগ পরে প্রহর ঘোষণা করছে। সন্ধ্যায় বৈতালিকের গান আজ আর কি প্রাণ আনন্দে মাতিয়ে দেবে না? সূর্য্যদেবেরও আজ কি হয়েছে, তাঁর মুখের হাসি কিছুতেই শেষ হয় না, বর্ষার ঘনমেঘও আজ তাঁর মুখে অন্ধকারের আবরণ এনে দেয় না।

যেমন করেই হোক দিন যখন কাটবেই, তখন এক-রকমে কেটে গেল। প্রাসাদের স্বর্ণচূড়া অস্তমান সূর্য্যের বিদায়চুম্বনে এমন মধুর হাসি বোধ হয় আর কোনো দিন হাসেনি। কুমারের হৃদয়ের প্রতি-তন্ত্রী আজ সে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রাত্রির আগমনের সঙ্গেই কুমারের বরসজ্জা সুরু হল। রাজভাণ্ডার তোলপাড় করে শ্রেষ্ঠ রত্নহার তিনি নিয়ে এসেছেন, তাঁর প্রেয়সীর কণ্ঠে পরিয়ে দেবার জন্যে। শত সূর্য্যের আলোর মত তার প্রভা। আজ পায়ে হেঁটে তিনি যাবেন না, অশ্বশালা থেকে তুষারের মত শুভ্র বাহন তিনি নিজে বেছে এনেছেন। উষ্ণীষে আজ তাঁর হীরামণি ঝলক দিয়ে উঠছে।

শেষরাত্রে যখন পথে বেরোলেন, তখন ভোর হতে বড় বেশী দেরী নেই। কিন্তু চাঁদের আলো নেই বলে আজ চারিদিক কেমন কুয়াসায় ঢাকা। কুয়াসার শীতল স্পর্শ আজ কুমারের কাছে তাঁর প্রেয়সীর হাতের শীতল স্পর্শ বলেই মনে হচ্ছিল। দূর থেকে দেখা গেল জানলার নীচে এতকাল পরে আজ একটা গুপ্ত দরজা হঠাৎ খুলে গেছে; অকালে-ফোটা পদ্মের পাপ্ড়ির মত সেই দরজার কপাটগুলি তাঁর চোখে সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

কুমার দরজার কাছে এসে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে একেবারে তীরের মত বেগে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। সামনেই সেই তন্বী তরুণী ঊষার আলোর মত লাল্‌চে শাড়ীতে সুগঠন দেহখানি বেষ্টন করে লজ্জানত মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাত দুখানি বুকের কাছে জড়ো করা; হাতে সদ্য-ফোটা ফুলের মালা, তার পাপড়ির জল তরুণীর আঁচলে জলের ছোপ ধরিয়ে দিচ্ছে। রূপের নেশায় কুমার তখন পাগল। তরুণী তাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবার আগেই তিনি ছুটে গিয়ে তার গলায় হীরার হার দুলিয়ে দিলেন। তারপর সে ফুলের মালা তুলে ধরল কি না না দেখেই তিনি সেই কুসুম-কোমল হাতদুখানি চেপে ধরতে গেলেন।

কি আশ্চর্য্য! তরুণীর হাত তুষারের মত শীতল, পাষাণের মত কঠিন। কুমার বিস্মিত নেত্রে চেয়ে দেখলেন, তাঁর মনোমোহিনী প্রেয়সী পাষাণী! ঘরের চারিধারে তারি ছাঁদে গড়া অসংখ্য মূর্ত্তি,—সমাপ্ত, অর্দ্ধসমাপ্ত, অসমাপ্তভাবে ছড়ানো। তারি মুখের ছবি নানারঙে মোহন ভঙ্গীতে আঁকা ঘরের মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। মাঝখানে তপঃক্লিষ্টা সন্ন্যাসিনীর মত চিত্রা বসে। তার একখানা হাতের রঙ তুষারের মত শুভ্র। পাষাণীর মত তারো হাতে হীরার কাঁকণ।

শ্রীশান্তা দেবী।

প্রভাতী

ঊষার তরুণ-অরুণ-কিরণ মাখি'
কমল যেমন বিকাশে রাঙিয়া লাজে,
শিশুর নিশীথ-স্বপন-নিমীল আঁখি
ফুট' ওঠে ধীরে নবীন ভুবন মাঝে।

ঊষার পাখী সে যেমনি উঠিল গাহি',
আকুল হরষ জাগি ওঠে কলতানে;
শিশুর কাকলী, সুদূর-আভাষ-বাহী,
চিরমানবের বারতা জাগায় প্রাণে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

অধিকার ও কর্ত্তব্য।

যাহারা কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত, তাহাদের পক্ষে সেই অধিকার লাভ করিবার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। অধিকার-লাভের চেষ্টার উপর খুব বেশী ঝোঁক দেওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল অধিকার-লাভের দিকেই মন দিলে চলিবে না। প্রত্যেক অধিকারের সঙ্গে তদনুযায়ী কর্ত্তব্যপালনের অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। এই-সকল কর্ত্তব্য-পালনের দিকে দৃষ্টি না থাকিলে মানুষের কল্যাণ হয় না। আমরা পৌর, জানপদ ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথাই বলিতেছি।

বাস্তবিক এমন কতকগুলি অধিকার আছে, যাহা পাইলে, যাহারা অধিকার পায় সাক্ষাৎভাবে তাহাদের ব্যক্তিগত কোন আর্থিক লাভ হয় না, বরং ঐ অধিকার-সংসৃষ্ট কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাহাদিগকে অনেক সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে হয়। নানাবিধ পৌর, জানপদ ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের বিষয় বিবেচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভ্যেরা, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যেরা, মিউনিসিপাল কমিশনারেরা, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, ফৌজদারী বিচারে আসেসর ও জুররগণ বেতন পান না, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনের জন্য যত সময় দিতে হয়, তাহা অর্থ-উপার্জ্জনে নিয়োগ করিলে কিছু রোজগার হইতে পারে। তাঁহাদিগকে এই রোজগার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতে হয়। অসাধু লোকে এই-সব অবৈতনিক কাজকেও রোজগারের উপায় করিয়া থাকে বটে; কিন্তু তাহা বিবেচ্য নহে। যে-সব বেসরকারী লোক প্রাদেশিক এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হন, তাঁহারাও কোন বেতন পান না; সামান্য অর্থ যাহা পান, পাথেয় এবং বাসাখরচ তাহা অপেক্ষা বেশী পড়ে। অধিকন্তু তাঁহারা ব্যারিষ্টারী, ওকালতী, ডাক্তারী, প্রভৃতি ব্যবসা হইতে যত রোজগার করিয়া থাকেন, সরকারী কাজে যতদিন ব্যাপৃত থাকেন, ততদিন সেই উপার্জ্জন করিতে পারেন না।

গ্রাম্য পঞ্চায়েত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা পর্য্যন্ত নানা সমূহ বা সমিতির সভ্য যাঁহারা হন, তাঁহারা সম্মান পাইয়া থাকেন বটে। ইহা আর্থিক লাভ না হইলেও একপ্রকার লাভ বটে।

আর একপ্রকারের অধিকার আছে, যাহা সাক্ষাৎভাবে আর্থিক লাভের কারণ। আমরা যদি ভারতবর্ষে থাকিয়াই সিবিলসার্বিস পরীক্ষা দিতে পারি, তাহা হইলে এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ভারতবাসী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জজ হইতে এবং মোটা মাহিনা পাইতে পারে। এখন খাঁটি ভারতীয় কোন ব্যক্তি, পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগার্থ লণ্ডনে যে পরীক্ষা হয়, তাহা দিতে পারে না। আমরা যদি এই অধিকার পাই, এবং এই পরীক্ষা ভারতবর্ষে গৃহীত হয়, তাহা হইলে অনেক ভারতবাসী পুলিস বিভাগের মোটা বেতনের অনেক বড় কাজে নিযুক্ত হইতে পারে। অন্যান্য আরো অনেক বিভাগের ভাল কাজগুলি হইতে এখন ভারতবাসীরা বঞ্চিত আছে। সেগুলিতেও আমাদের ন্যায্য অধিকার আছে। সম্প্রতি সেই অধিকার পাইলে অনেকের রোজগার বাড়ে বটে। কিন্তু যে-সব মোটা মাহিনার কাজে সাধারণতঃ ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীরা নিযুক্ত হয়, তাহার সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজারের বেশী হইবে না। সৈনিক বিভাগের উচ্চতর ও উচ্চতম কাজগুলি হইতে ভারতবাসীরা এখনও বঞ্চিত আছে। কেবল মাত্র নয় জনকে এই-প্রকারের নীচের দিকের কাজ দেওয়া হইয়াছে। এই-সব উচ্চতর ও উচ্চতম কাজের সংখ্যা কত, আমাদের তাহা জানা নাই। কিন্তু তাহা বোধ হয় তের চৌদ্দ হাজারের বেশী হইবে না। তাহা হইলে ভারতবর্ষের সিবিল ও মিলিটারী, অর্থাৎ অসৈনিক ও সৈনিক বিভাগে, ধরুন, কুড়ি হাজার মোটা বেতনের কাজ হইতে ভারতবাসীরা বঞ্চিত আছে। কিন্তু সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে কুড়ি হাজার লোকের আর্থিক লাভ হইবে বলিয়া আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহা বলিলে কি আমাদের প্রয়াসের মূলীভূত কারণটা ঠিক্ বুঝা যায়?

অন্যদিকে, যে-সব অবৈতনিক জানপদ, পৌর ও রাষ্ট্রীয় কাজে কেবল সম্মানমাত্র লাভ হয়, তাহারই বা সংখ্যা কত? কোটি কোটি লোকের মধ্যে কয়জন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারে, কয় জন মিউনিসিপালিটির সভাপতি বা কমিশনার ইত্যাদি হয়? সুতরাং সম্মানভূতিক কাজগুলির সম্মানটুকু কয়েক হাজার লোকে পাইবে বলিয়া, কোটি কোটি লোকের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের প্রয়াস হইতেছে, ইহা বলিলেও আমাদের প্রচেষ্টার ঠিক্ প্রকৃতি বুঝা যাইবে না।

সম্মান বা অর্থলাভের উপায়স্বরূপ অধিকারগুলি আমরা পাইলে, আমরা সবাই সম্মানিত বা ধনী না হইলেও সকলেরই যে সম্মান বা অর্থলাভের সুযোগ হইতে পারে ইহা সত্য। কিন্তু তাহাও আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার মূলীভূত কারণ নহে।

আসল কারণ প্রধানতঃ তিনটি। (১) প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তা একজন হইলেও, পরিবারভুক্ত সকলে মনে করে যে কর্ত্তা নিজের লোক, সুতরাং তিনি পরিবারের কাজ করিলে কাহারও অগৌরব হয় না; কিন্তু বাহিরের কেহ আসিয়া পরিবারের কাজের অতি সুব্যবস্থা করিলেও পরিবার আত্মকর্ত্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ায় অগৌরব ও অপমান বোধ করে। আমাদের দেশের ও জাতির কাজ আমরা প্রত্যেকে না করিলেও, আমাদের প্রতিনিধি ও নেতৃস্থানীয়েরা করিলে, আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব বজায় থাকে, এবং পরকর্ত্তৃত্বের অগৌরব ও অপমান হইতে আমরা রক্ষা পাই। জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের চেষ্টার একটি প্রধান কারণ রাষ্ট্রকে ও জাতিকে পরকর্ত্তৃত্বের অগৌরব ও অপমান হইতে মুক্ত করিয়া আত্মকর্ত্তৃত্ব স্থাপন ও রক্ষা করা। (২) প্রথম প্রথম যাহাই ঘটুক, আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আরম্ভের কিছু কাল পরে, দেশের লোক দ্বারা দেশের কাজ যেমন ভাল করিয়া সম্পন্ন হয়, এবং তাহার দ্বারা কোন জাতি যেমন সুস্থ সবল, জ্ঞানী ও সমৃদ্ধ হয়, পরকর্ত্তৃত্বে তাহা হইতে পারে না। এই কারণেও আমরা আত্মকর্ত্তৃত্ব বা স্বরাজ লাভের চেষ্টা করিতেছি। (৩) কোন জাতির কাজ অন্যে করিয়া দিলে, কেবল যে তাহার অগৌরব ও অপমান হয়, কেবল যে কাজ ভাল হয় না, তাহা নয়; তদপেক্ষাও গুরুতর কুফল ফলে। শক্তির যথাসম্ভব পূর্ণ বিকাশ না হইলে, চরিত্রের

দৃঢ়তা, পরার্থপরতা ও উদারতার যথাসম্ভব বিকাশ না হইলে, যেমন ব্যক্তিবিশেষের মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, জাতির পক্ষেও তেমনি শক্তির এবং চরিত্রের যথাসম্ভব বিকাশ না হইলে তাহাকে অমানুষ থাকিয়া যাইতে হয়। জাতির অঙ্গস্বরূপ মানুষগুলা যদি ছোটছোট ব্যক্তিগত বা পরিবারগত স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, যদি তজ্জনিত ঝগড়া বিবাদ, হিংসা দ্বেষে, এবং দৈহিকসুখের অন্বেষণে, ব্যসনে তাহাদের কাল কাটে, তাহা হইলে জাতিটা শক্তিমান ও চরিত্রবান্ হইবে কেমন করিয়া? কিন্তু জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব না থাকিলে মানুষগুলা ঐরূপ না হইয়া, বড় হইবে কেমন করিয়া? অতএব, শক্তির ও চরিত্রের বিকাশের জন্য জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব বা স্বরাজ আবশ্যক বলিয়া, আমরা আত্মকর্তৃত্ব লাভে চেষ্টিত।

দেখা গেল, যে, আত্মকর্তৃত্ব লাভের চেষ্টার মূল কারণ সম্মানলিপ্সাও নহে, অর্থলিপ্সাও নহে। মূল কারণ এই, যে, ইহা দ্বারা আমাদের জাতি অগৌরব ও অপমান হইতে মুক্ত হইবে, ইহা দ্বারা পরিণামে দেশের কাজ ভাল হইবে ও আমাদের জাতি এখনকার চেয়ে সুস্থসবল, জ্ঞানী ও সমৃদ্ধ হইবে, এবং ইহা দ্বারা সকলদিকে জাতীয় শক্তির অবাধ বিকাশ হইতে থাকিবে, ও জাতীয় চরিত্র দৃঢ়, উদার ও পরার্থপর হইবে।

কিন্তু আমরা সর্ব্ববিধ অধিকার লাভ করিলেও, যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ না হই, যদি আমরা, নিজের নিজের প্রকৃত কল্যাণ ও সকলের মঙ্গলের জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখের চিন্তা ছাড়িয়া, পৌর, জানপদ ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যপালনার্থ সময় ও শক্তি নিয়োগ না করি, তাহা হইলে আত্মকর্তৃত্ব আমাদের কোনই কাজে লাগিবে না। আমরা যখন গ্রাম্য পঞ্চায়েতে, গ্রাম্য ইউনিয়নে, মিউনিসিপালিটি, লোক্যাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে, এবং প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাই, তখন আমাদের দেখা উচিত, যে, কেবলমাত্র যোগ্যতা দেখিয়াই যেন উপযুক্ত লোককে ভোট দিতে পারি, অনুরোধ উপরোধ প্রলোভন বা ভয়ে নহে। আত্মকর্তৃত্ব আলীবাবার গল্পের "সিসেম, দ্বার খোল" মন্ত্র নহে, যে, উচ্চারণ করিবামাত্র সর্ব্ববিধ সিদ্ধি আমাদের করতলগত হইবে। ইহা আমাদিগকে মানুষ হইবার সুযোগ দিবে, উপায় দিবে মাত্র; কিন্তু মানুষ হইতে হইবে কর্ত্তব্য করিয়া। আলস্য, স্বার্থপরতা, হিংসাদ্বেষ, ব্যসন, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, সংকীর্ণতা, দলাদলি, না ছাড়িলে, কেমন করিয়া অগ্রসর জাতিরা আপনাদের দেশের কাজ করিয়া আসিতেছে অধ্যয়ন দ্বারা তাহা না জানিলে, এবং কেমন করিয়া আমাদের দেশের কাজ আমরা করিতে পারি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া তাহা স্থির না করিলে, আত্মকর্তৃত্বরূপ সুযোগ ও উপায়ও আমাদের জাতিকে মানুষ করিতে পারিবে না।

রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সমস্যা।

যেসকল দেশ স্বাধীন এবং যেখানকার অধিবাসীদের সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে, তাহাদেরও সামাজিক কর্ত্তব্য আছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা সচ্চরিত্র, জ্ঞানী, সুস্থ, ও সমৃদ্ধ, দেশের দূষিতচরিত্র, মূর্খ, রুগ্ন, ও দরিদ্র লোকদের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য আছে; এবং এই-সব দেশে অল্পাধিক পরিমাণে এই কর্ত্তব্য সাধিত হইয়া থাকে। আমরা যদি স্বাধীন হইতাম, এবং আমাদের সকল-রকমের রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকিত, তাহা হইলেও এই-সব কর্ত্তব্য না করিলে আমরা অমানুষ বলিয়াই পরিচিত হইতাম। কিন্তু আমাদের জাতীয়-আত্মকর্তৃত্ব নাই, এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারও না-থাকারই মধ্যে। ইহাও নিশ্চিত, যে, নারীদের এবং "নিম্ন"শ্রেণীর লোকদের অবস্থা উন্নত না হইলে আমরা পূর্ণমাত্রায় জাতীয়-আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিব না। যদিই বা আমরা কতকগুলি অধিকার পাই, তাহা আমরা রাখিতে পারিব না, এবং তাহা হইতে সুফল পাইব না, যদি আমাদের দেশে সকলে, পুরুষনারীনির্ব্বিশেষে, সামাজিক স্তরনির্ব্বিশেষে, উন্নত না হয়। সকলে উন্নত না হইলে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কতকগুলি চক্রী, ক্ষমতাপ্রিয়, স্বার্থপর, অসৎ লোকের হাতে যাওয়া অনিবার্য্য। তাহাতে অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না।

আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের শ্রমজাত অর্থের সাহায্যে, আমরা যে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাই তাহাও অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত লোকদের পরিশ্রমের ফলে।

গত ১৬ই আশ্বিন কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "নিম্ন"শ্রেণীর লোকদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এরূপ বক্তৃতা শুনিলে সদাশয় বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেরই মনে এই বিশ্বাস জন্মে, যে, আমাদের এমন অনেক গুরুতর কর্ত্তব্য আছে, যাহা আমরা করিতেছি না বলিলেও হয়। দুঃখের বিষয় বক্তৃতাটি যথাযথ লিখিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। "সঞ্জীবনী"তে যে ইহার কিয়দংশের তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা মন্দের ভাল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নাই, ভাব ও চিন্তা কতক কতক আছে। ইহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আমাদের দেশে অসংখ্য লোক অশিক্ষিত। তাহাদের উন্নতির জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই আলোচনা এখন আর নূতন নহে।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান।

এ কথা মনে করিয়াও আমার লজ্জা হয় যে, গোখ্‌লে যখন অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন এই বঙ্গদেশ হইতেই তাহার প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। এই দেশের কোন কোন বিশিষ্ট ভদ্র লোক বলিয়াছিলেন, ছোটলোকেরা যদি বিদ্যাশিক্ষা করে, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথায়?

আমাদের দেশে অশিক্ষিত কৃষক ও নিম্নবর্ণের লোকই অধিক। দেশের যে রাজস্ব হইতে আমাদের উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার বেশির ভাগ অর্থ আমাদের ঐ অশিক্ষিত কৃষকেরাই জোগাইতেছে। বড়মানুষের ঘরে থাকিয়া তাহাদের ব্যয়ে যেমন কোন কোন দরিদ্র বালকের বিদ্যাভ্যাস হয়, ভাবিয়া দেখিলে আমরাও তেমনি আমাদের অনুন্নত ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের টাকায় লেখাপড়া শিখিতেছি। কারণ, শিক্ষায় যে টাকা ব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশ তাহারাই দেয়। এই যে তাহাদের ব্যয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছে, তাহার কি কোন প্রতিদান আমরা করিব?

আমাদের দেশে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে ব্যবধানের যে উচ্চ পর্ব্বত রচিত হইয়াছে, বিদ্যালোচনার মেঘরাশি ঐ পাহাড়ে ঠেকিয়া এক পার্শ্বেই বারিবর্ষণ করে। উর্ব্বরতা, শ্যামলতা এক পার্শ্বেই দেখা যায়। অপর পার্শ্বে মরুভূমি ধূধূ করিতেছে।

পূর্ব্বের কথা।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধনী ও দরিদ্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এখনকার মত ব্যবধান ছিল না। তখন এমন-সকল আয়োজন ছিল যাহার দ্বারা সকল-প্রকার জ্ঞানধর্ম্মমূলক কথা আপনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। উহার ফলে, পাশ্চাত্যদেশে ধনীদরিদ্রে যে প্রভেদ, পণ্ডিতে মূর্খে যে প্রভেদ রহিয়াছে, আমাদের দেশে তেমন প্রভেদ কখনও হইতে পারে নাই।

বর্ত্তমান অবস্থা।

এখন ক্রমশঃ সেই প্রভেদ বাড়িতেছে। পল্লীর সমৃদ্ধেরা নগরের মুখে ছুটিয়াছেন। পল্লীর শিক্ষিতেরা জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে বাস করিতেছেন। যাঁহারা পল্লীকে সঞ্জীবিত করিবেন, তাঁহারাই নগরে গিয়াছেন। এই কারণে পল্লী নির্জ্জীব।

ফল।

ইহার কুফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। পল্লীবাসী কৃষকে আমাদিগকে বিশ্বাস করে না। তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করি কেন? তাহারা স্থানে যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া তাহারা যা উপার্জ্জন করে, জমিদার গোমস্তা, উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার সকলে তাহা শোষণ করিয়া সেই টাকায় বাঁচিয়া আছে। সুতরাং আমি এখন যখনই হঠাৎ তাহাদের দুয়ারে হাজির হইয়া বলি, আমি তোমাদের উপকারের জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহারা স্বভাবত আমাদিগকে সন্দেহ করে। করিবে না কেন? তাহাদের শ্রমে ধন আমরা ভোগ করি, কিন্তু বিনিময়ে কি দিয়াছি?

বিপ্লবের সূচনা।

ইহা এক ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূচনা করে। এক জায়গায় যখন বা একান্ত শুষ্ক, অন্য স্থলে অত্যন্ত সরস, তখনই প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত উথি হইয়া বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সাম্য আনয়ন করে। এইরূপ বৈষম্য হইতে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার প্রভেদের জন্য আমাদের দেশে স্বামীস্ত্রীর মনের মিল কমিতেছে, নিম্নবর্ণে উচ্চবর্ণে ব্যবধান ভীষণ বাড়িতেছে।

ব্যবধান দূর করিবার উপায়।

এই ব্যবধান দূর করিবার উপায় শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যাল প্রতিষ্ঠা। একটি দুইটি নহে, দেশের মধ্যে এইরূপ সহস্র সহস্র বিদ্যাল স্থাপন করিয়া উন্নত ও অবনতের ব্যবধান দূর করিয়া দিতে হইবে।

ভিত্তি ফাটা।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। সাম্রাজ্যে পুনর্গঠনের সময়ে আমরা কিছু কিছু অধিকার পাইতেও পারি। এই দেশে রাজনৈতিক সৌধনির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে, অনেক মিস্ত্রী সেই কার্যে লাগিয়াছেন, রাজকীয় মিস্ত্রীও আমাদের অনুকূল। আমাদের এই সৌধ যত সুন্দর হউক, ইহার কারুকার্য্য যত নিপুণ হউক, মনে রাখিতে হইবে যে ঐ সৌধের ভিত্তিই ফাটা। আমাদের দেশের নিম্নস্তরে যে কোটি কোটি লোক আছে, তাহাদিগকে টানিয়া না তুলিলে আমাদের কোন উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না।

কলিকাতা শ্রমজীবী-বিদ্যালয়।

কলিকাতা আণ্টনীবাগান লেনের ২১-এ সংখ্যক গৃহে যে শ্রমজীবী-বিদ্যালয় আছে, তাহারই পুরস্কার বিতরণ-সভার কথা উপরে বলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয় ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়। গত বৎসর (১৯১৬ এপ্রিল হইতে ১৯১৭ মার্চ্চ পর্য্যন্ত) প্রথমে ইহাতে ৩৬ জন ছাত্র ছিল; পরে তাহা বাড়িয়া ৪৯ হয়। ছাত্রদের বয়স ৭ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত। তাহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান, বেহারী, ওড়িয়া ও বাঙালী আছে। তাহারা দপ্তরী, মুচি, গাড়োয়ান, ছাপাখানার জমাদার, প্রভৃতির কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা, সাধারণ এবং শ্রামিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত। সাধারণ বিভাগে বাংলা, পাটীগণিত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, এবং সুনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রামিক বিভাগের ছাত্রেরা

দপ্তরীর কাজ শিখে। যাহারা এই কাজ শিখে তাহারা শিক্ষাকালে বরাবর মাসে মাসে কিছু বৃত্তি পাইয়া থাকে। দপ্তরীর কাজ শিখিয়া এখানকার কোন কোন ছাত্র আফিসে, কারখানায় ও ছাপাখানায় চাকরী পাইয়াছে। ইহারা যে বেশ ভাল বহি-বাঁধিতে পারে, মিঃ পি, সি, লায়ন, মিঃ এ, সী, আওারউড্ প্রভৃতি বহি বাঁধাইয়া তাহার সার্টিফিকেট দিয়াছেন। গত বৎসর বিদ্যালয়ের মোট আয় ৯৪৭ টাকা এবং মোট ব্যয় ৮৫৮৷৷৹ হইয়াছিল। শ্রামিক বিভাগের মোট আয় ২৬৬৬৶৩ এবং মোট ব্যয় ২৬৫৮৸৶৩ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার জন্য ৬০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আরও অনেক টাকা চাই। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক।

দলাদলির মিটমাট।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে কংগ্রেসঘটিত দলাদলির একটা মিটমাট হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট বিধিসঙ্গতভাবে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশ কর্ত্তৃক আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদিন গোলমালে কাজ এগোয় নাই। এখন, উভয় পক্ষের লোকেরা নিজের নিজের দলের জয়ের জন্য যেরূপ সচেষ্ট হইয়াছিলেন, দেশের কাজে তাহা অপেক্ষাও অধিক চেষ্টিত হউন। তাহা হইলে সব কাজই সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। বাহিরের দলাদলি মিটিলেও ভিতরের তাপ সহজে দূর হয় না। সবাই একই কাজে প্রবৃত্ত হইলে আন্তরিক মিলও আসিবে।

যে দিন মিটমাট হইয়াছে, সে দিন পর্য্যন্তও উভয়-পক্ষের কাগজে ঝগড়া চলিয়াছিল। তাহার পরেও যে জের মিটিয়াছে, এমন বলা যায় না। সে সম্বন্ধে অনেক কথা লিবার থাকিলেও এখন আর বলা উচিত হইবে না; সুতরাং বলিব না।

১৮ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর যে সভায় রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের সভাপতিত্বে শ্রীমতী বেসাণ্ট কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহার প্রথম প্রস্তাবটি এরূপ ভাবে লিখিত হওয়া উচিত ছিল, যেন তাহাতে এরূপ কোন আভাস না থাকে যে পুরাতন বা নূতন দলের জিত বা হার হইয়াছে। দুঃখের বিষয় উহা তেমন করিয়া লেখা হয় নাই। উহা পুরাতন দলের দিকে ঝুঁকিয়া লেখা হইয়াছে, এইরূপ মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব।

এই দলাদলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার মান-অপমানের কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান না দিয়া অতি সহজে অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া যেরূপ মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত মানবপ্রেমিক ও দেশভক্তের উপযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যাঁহাকে বাস্তবিক সম্মানার্হ করিয়াছেন, তিনি লোকের কাছে সম্মান পাইতেছেন কি না, সে চিন্তা কেন মনে স্থান দিবেন? নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে তাঁহার বিরোধীরাও বুঝিতে পারিবেন যে তিনি বরাবর কর্ত্তব্যবুদ্ধি-ও-সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অনাসক্তভাবে কাজ করিয়াছেন। সভাপতিত্বটাকে মরণ কামড় দিয়া ধরিয়া থাকিবার লোক তিনি নহেন। বাংলাদেশের এবং বঙ্গের বাহিরের অনেক কাগজে তাঁহার মহাশয়তা স্বীকৃত হইতেছে।

যাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের দলের সভাপতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান সকল লোকেরই ব্যবহারের প্রশংসা করিতে পারিলে সুখী হইতাম। যাহাতে তাঁহার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন; ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু অনেকে তাঁহাকে নির্ব্বাচন করার পর হইতেই, তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অশোভন ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পদত্যাগ-পত্রে লিখিত আছে, "আমার এই পদত্যাগ স্বীকার করিয়া আপনারা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিষ্কৃতি দিবেন।" এখন তিনি নানা-প্রকারেই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন; তন্মধ্যে একটা প্রধান নিষ্কৃতি, এমন কোন কোন কৌশলী লোকের সাহচর্য্য যাঁহারা তাঁহাকে ভাল বাসেন না এবং বর্ত্তমানক্ষেত্রে কেবল তাঁহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক্ কখন কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার দ্বারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে

খুব বড় কাজ হয় নাই, একথা বলা যায় না। তাঁহার অভিভাষণ ও অন্যবিধ গদ্য প্রবন্ধে, কবিতায় ও গানে দেশ উদ্বোধিত হইয়াছে। "ইংরেজ ও ভারতবাসী", "কণ্ঠরোধ," "অত্যুক্তি", "পথ ও পাথেয়", "স্বদেশী সমাজ", প্রভৃতি প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের পাঠকদিগের সুপরিচিত। তাঁহার সঙ্গীত ও ললিতকলাবিষয়ক বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধে পর্য্যন্ত স্বদেশপ্রীতি ও দেশের দুর্দ্দশায় তাঁহার মর্ম্মপীড়ার কথা এবং ইংরেজ আমলাদের ক্রটির কথা আছে। আমেরিকায় পঠিত তাঁহার The Cult of Nationalism নামক বক্তৃতা এবং জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং ভারতের জীবনাদর্শ জগতের গোচর করিয়াছে। তাঁহার জাতীয়-সংগীতসমূহের উল্লেখই যথেষ্ট, প্রশংসার কোন প্রয়োজন নাই। "নৈবেদ্যে"র অনেক কবিতা, "কথা ও কাহিনী"র অনেক কবিতা, এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। সর্ব্বশেষে এই সেদিন যখন বঙ্গের গবর্ণর টাউনহলে শ্রীমতী বেসান্টের স্বাধীনতা-লোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম জারী করেন, তখন বাক্যস্ফূর্ত্তি "রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষানবীস" ("novice in politics") রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরীতে "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।

স্বরাজের জন্য আবেদন।

গত মাসের প্রবাসীতে আমরা গুজরাটে স্বরাজের আবেদনের খবর দিয়াছিলাম। মহারাষ্ট্র এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতেও এইরূপ বহুজনের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন প্রস্তুত করিবার আয়োজন করা হইতেছে। ইহাতে আর কোন ফল হউক বা না হউক, স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের সর্ব্বত্র আলোচনা ও জ্ঞানবিস্তার হইবে। অন্ততঃ এই নিমিত্তই সকল প্রদেশে এইরূপ আবেদন দেশভাষায় লিখিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাক্ষর লইবার বন্দোবস্ত করা দরকার। বলা বাহুল্য, স্বাক্ষর লইবার আগে, প্রয়োজনমত, স্বাক্ষরকারীকে ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিতে হইবে। সুখের বিষয় বাংলা দেশেও এইরূপ আবেদনের কথা উঠিয়াছে। কংগ্রেস ও মস্লেম লীগ যেভাবে যতটুকু স্বায়ত্তশাসন চাহিয়াছে তাহা ইংরেজীতে লেখা আছে। শুনিতেছি, ভারত-স[ভা] তাহার বাংলা অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন। আবে[দনে] দস্তখত করাইবার সময় এই অনুবাদটি পড়িতে দি[লে] আবেদনের উদ্দেশ্য বুঝাইতে বেশী পরিশ্রম করি[তে] হইবে না। ভারত-সভার এই কাজটি সময়োচিত হইয়াছে। এখন তাঁহারা একটি আবেদন লিখিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র স্বা[ক্ষর] সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। ইহাতে যোগ দি[তে] কোন দলের লোকেরই আপত্তি হইবে না।

মান্দ্রাজ শহরে স্বাক্ষর সংগ্রহের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। সমুদয় শহরটিকে অনেকগুলি পাড়ায় ভাগ করিয়া, প্রত্যে[ক] পাড়ার কাজের ভার কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের উপ[র] দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাড়ার স্বেচ্ছাসেবকেরা একজ[ন] পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে কাজ করিবেন। এইরূপ বন্দোব[স্ত] সব শহরে ও গ্রামে করা আবশ্যক।

বালিকাদের শিক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব দান।

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমুদয় বালিকাকে ৫ হইতে ১[?] বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দিবার জন্য গয়া জেলার অন্তঃপাতী টিকারীর মহারাজ-কুমার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাহার জন্য তিনি তাঁহার সমুদ[য়] সম্পত্তি দান করিয়া ট্রষ্টীদের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। সমুদয় ঋণ শোধ করিয়া এবং আত্মীয় ও অনুচরদের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও, সম্পত্তি হইতে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা আয় হইবে। শিক্ষার জন্য এরূপ দান ভারতবর্ষে আর কখনও কেহ করেন নাই। ট্রষ্টীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছেন। বাঙালী আছেন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। টিকারীর মহারাজকুমার নিঃসন্তান। তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতীয় ভূমিহার-ব্রাহ্মণেরা এবং বিহারের অন্য অনেক লোক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা না করিয়া, যে, দেশের বালিকাগণকে কন্যাস্থানীয়া জ্ঞানে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা খুব সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে।

একজন "মুক্তিপ্রাপ্ত" নজরবন্দীর আত্মহত্যা।

শচীন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত নামক একজন কলেজের ছাত্র পুলিসের সন্দেহভাজন হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে নজরবন্দী করেন। তাহার পিতা রংপুরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাহার তত্ত্বাবধানের ভার লইতে রাজী হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে তাহার পিতার গৃহেই নজরবন্দী করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দেন। তাহার পর সে "মুক্তি" লাভও করে। কিন্তু ইহা নামমাত্র মুক্তি। সে গবর্ণমেণ্টের নিকট রংপুরের কলেজে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি চায়। অনুমতি পায় নাই। পুলিস তাহাকে কোন সমবয়স্ক সঙ্গীর সহিত খেলা করিতে নিষেধ করে, কথা কহিতে নিষেধ করে, সাধারণ পাঠাগারে গিয়া পড়িতে নিষেধ করে। এইরূপ "মুক্তি" তাহার পক্ষে অসহ্য হওয়ায় সে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে সে যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইবে না, অধিকন্তু তাহার পিতার বাড়ী পুনঃ পুনঃ খানাতল্লাসী হইবার আশঙ্কা থাকিবে, এবং যাহাদের সঙ্গে সে মিশিবে তাহারাও সন্দেহভাজন এবং দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে। মৃত্যু-কালে তাহার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছিল। সে মাজিষ্ট্রেটকে, একজন পুলিসের কর্ম্মচারীকে, এবং পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়া রাখিয়া যায়। কোন কোন পত্র কাগজে বাহির হইয়াছে। পুলিসের একজন কর্ম্মচারীকে ইংরেজীতে লিখিত পত্রে আছে, "আমি যে-দেশে যাইতেছি, সেখানে তুমি কিম্বা আর কোন পুলিশের লোকে আমাকে জালাতন করিতে পারিবে না।"

শচীন্দ্র তাহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়া গিয়াছে, আমরা তাহার একটি নকল পাইয়াছি। তাহার কোন-কোন অংশ আমরা মুদ্রিত করিতেছি। যাহা ছাপিতেছি, তাহাতে কোন- ...কার সংশোধন করা হয় নাই। কেবলমাত্র যে-যে-বাক্যে গবর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোচনা আছে, বা গবর্ণ-মেণ্টের প্রতি স্পষ্ট অবিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাদ দিয়াছি। তাহাতে এরূপ কথা আছে যে তেজস্বী ও শক্তিমান ছেলেদের মুক্তি দিতে রাজকর্ম্মচারীরা রাজী হই-বেন না, দুর্ব্বলপ্রকৃতির লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন; এবং যাহারা মুক্তি পাইবে, তাহারা যাহাতে কেবলমাত্র আহার নিদ্রাদি দ্বারা পশুবৎ জীবনই প্রধানতঃ যাপন করে, সে ব্যবস্থা পুলিস করিবে। ইহাও এক জায়গায় আছে যে বর্ত্তমান ধরণের শাসনপ্রণালী টিকিতে পারে না, কারণ ইহাতে অবিচার ও উৎপীড়ন হইতেছে। চিঠিখানির ভাব ভাষা অপেক্ষা মানসিক পরিপক্কতার পরিচায়ক। এই জন্য বোধ হয়, নকল করিতে কিছু ত্রুটি হইয়া থাকিবে।

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

"বাবা, আমি যে আত্মহত্যা করিতেছি তাহাতে আপনি যে কতদূর শোকে অভিভূত হইবেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। আমি যে কেন আত্মহত্যা করিতেছি তাহা জানিলে হয়ত আপনার শোকের কিছু উপশম হইতে পারে।

"আমি যে আজকাল নিষ্কর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছি তাহাতে আমি বড়ই অসন্তুষ্ট এরূপভাবে জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কাহারও সঙ্গে বেড়াইলে সেটি পুলিশের তদন্তের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। আমি সংশয়ে (সংসারে ?) কাহারও কোন উপকার করিতে গেলে পুলিশ ভাবিবে যে পরের উপকার করিতেছে দেশের লোকের sympathy পাইবার জন্য। পুলিশ অথবা Gvt. চায় যে আমি পশুপক্ষীর মত আমার নিজের উদর পূরণ করিয়া আমার জীবনটি কাটাইয়া দিই, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সংসারে যখন আসিয়াছি তখন শুধু নিজের জন্য আসি নাই মানবের হিতার্থেই আসিয়াছি। আমার কোন দিনই অনেক টাকাকড়ি উপার্জ্জন করিবার কিম্বা সম্মান অর্জ্জন করিবার আশা ছিল না। আমার চিরকালই ইচ্ছা যে আত্মার উন্নতি এবং পরের উপকার সাধন করিয়া এ জীবন অবসান করিব। কিন্তু এ-জীবনে আর তাহা হইবার নহে। এ জীবনে প্রত্যেক কাজে আমাকে Gvt.এর বাধা পাইতে হইবে। আপনারা আশা করিতেছেন যে Montagu সাহেব আসিয়া সব ঠিক করিয়া দিবে। কিন্তু সে আশা বৃথা।

* * * *

"আপনি বেশ জানেন যে সংসারে শুধু বাঁচিয়া থাকা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ফুল যে ফোটে তাহার চরম সার্থ-

কতা সেইখানে যেখানে সে আপনার গন্ধে দশদিক আমোদিত করে অথবা ভগবানের পায়ে আত্মদান করে। আমাদেরও সেইরূপ। আমাদের মত এই বয়সে অনেক উচ্চকথা মনে আসে, আর পরে তাহা সংসারের চাপে নষ্ট হইয়া যায়। তখন সমস্ত মনটুকু আপনার সংসারের চিন্তায় থাকে, অন্য কথা ভাবিবার অবসর হয় না। এমন কি আপন সংসারের উন্নতির জন্য অকাতরে অপরের অনিষ্টের জন্য প্রস্তুত হয়। আপনি কি আমাকে সেইরূপ জীবন যাপন করিতে বলেন? এইরূপে বাঁচিয়া থাকাই কি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে? আমার এই বয়সে ভালমন্দ হইবার দুই পন্থা পড়িয়া রহিয়াছে। যদি এরূপ অলসভাবে আমাকে সমস্ত সৎসংসর্গ ছাড়িয়া কিছুদিন আরও কাটাইতে হয় তাহা হইলে আমি পশুত্বের স্তরে উপনীত হইব। আমি মনে করি যে ইহা হইতে আজ যে আমি পবিত্র জীবন যাপন করিয়া আর এক জন্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছি ইহা আপনার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আপনি সকলের সামনে মুখ উঁচু করিয়া বলিতে পারিবেন যে আমার পুত্র অসৎ ত্যাগ করিবার জন্যই মৃত্যুর পথে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছে। যদি আমি কোনরূপ পাপ করিয়া অথবা কলঙ্কযুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন যাপন করিতে পারিতাম তাহা হইলে বোধহয় আপনার পক্ষে দুঃখের বিষয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি জীবন ত্যাগ করিতেছি এই উদ্দেশ্য লইয়া যে আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারিব, হৃদয় লইয়া অপরিমিত দৈহিক ও মানসিক শক্তি লইয়া বিশ্বের মঙ্গলে আত্মবিসর্জ্জন করিব। ইহা হইতে আর উচ্চ আশা হয় না। আশা করি আপনিও যেন ভগবানের নিকট আমার এইরূপ ভবিষ্যৎ জীবনের কামনা করেন। আপনার হয়ত আশা ছিল যে আমরা কয় ভাই বড় হইয়া উপার্জ্জন করিলে সংসারের দুঃখ কষ্টের অবসান হইত। কিন্তু এইসঙ্গে এই কথাও ভাবিয়া দেখিবেন যে এই ভারতবর্ষে ১০ কোটি লোক এক বেলার বেশী খাইতে পায় না। শীত ও বর্ষায় তাহারা বনের পশুপক্ষীর মতই কষ্টভোগ করে। আর কোনও দেশ এত সুজলা সুফলা হইয়া তাহার অধিবাসীদিগকে এত কষ্ট দেয় না। কিন্তু ইহাতে আমাদের কোনই হাত নাই। আমরা তবুও অনেক পরিবার হইতে অনেক সুখে আছি। এইভাবে যদি দিন কাটাইতে পা[ই] তাহা হইলে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।

"তাহার পর আমরা আট ভাই সেই আট জ[নের] মধ্য হইতে আজ আমি একজন যাইতেছি যাহা দ্ব[ারা] সংসারের খুব বেশী কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা ছি[ল] না। আর সাতজন বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের কোন ক[ষ্ট] থাকিবে না। এমন সংসার খুব কমই আছে যে সংসা[রে] সুখের (দুঃখের?) ছায়াপাত হয় নাই। শান্তিবাবুর দাদা[র] কথা মনে করুন তাহা দ্বারা সংসারের কত উপকার হই[ত] কিন্তু অকালে তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল। আ[র] আমা দ্বারা এখন কাহারও কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমি যদি এখন কোন ছেলের অসুখের জন্য দু[ই] তিন রাত্রি কাটাই তাহা হইলেও আমাকে তাহার জন্য শাস্তির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি কোন ভাল কাজ করি তাহা হইলেই C. I. D. আমাকে কুচক্ষে দেখিবে। এরূপভাবে আমি আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সময় নষ্ট করিতে পারিব না। তাই জীবন বিসর্জ্জন করিতেছি যে আবার নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জীবনের মহৎ আশাগুলি পূর্ণ করিব। এই সকল কারণে আপনি মোটেই শোক করিবেন না। জানিবেন যে আমার মৃত্যুকালের শেষ প্রার্থনা যে আপনি আমার জন্য বৃথা শোক করিয়া শরীর ক্ষয় না করেন। আপনার মুখের দিকে চাহিয়া এই এত বড় সংসারটি বাঁচিয়া আছে। আপনার আশায় এই সংসারের ছোট ছোট শিশুরা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

"আমি আজ বড়ই গৌরবান্বিত। আজ আমি এই আনন্দের সহিত মরিতে পারিতেছি যে এমন পিতা আমার যাঁহার আদর্শে যাঁহার শিক্ষায় আজ আমি অসৎজীবন যাপন করিব না বলিয়া প্রাণ দিতেছি।"

"তাহার পর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে কোন Political ব্যাপারে মিশিব না। কিন্তু যে দিন কাল আসিতেছে তাহাতে Politics ছাড়া কেহ উঠিতে পারিবে না। তবে যাহারা স্বার্থময় পশুজীবন যাপন করিতে চাহে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি আজ মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলাম। * * * * ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখুন, ইটালি, Belgium, France, Russia

এবং আজকাল Irelandএর কথা মনে মনে চিন্তা করুন। Gvt আমাকে যে পড়িতে দেয় নাই তাহাতে Gvt* কোন আইন অনুসারে [কাজ] করেন নাই।

* * * * * * তাহার পর আপনারা আমার অবস্থা লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন ও ভাবিতেন। আর কাহারও অবস্থা প্রাণের সহিত ভাবিতেন না। আজ আমার এই মৃত্যু আপনাদের দুঃখ বিশ্বজনীন করিয়া তুলিবে। আপনাদের প্রাণ আমার সমাবস্থাপন্ন সকলের জন্য কাঁদিয়া উঠিবে। ভগবান আপনাদের মন সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে বৃহৎ গণ্ডীতে লইয়া যাইবেন।

"আমি দাদাকে ইন্দুকে ও বৌদিদিকে আমার সম্বন্ধে চিঠি লিখিয়া দিয়াছি। আপনি সংসারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থির ধীর ও বুদ্ধিমান আপনি তাহাদিগকে বুঝাইবেন। আপনি আমাকে কতদূর ভালবাসিতেন তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। আমি যে আপনার মত না লইয়াই এ পথে যাত্রা করিতেছি সেজন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

"আমার এ মৃত্যুতে দেশের মধ্যে একটি প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইবে। আমার এ মৃত্যুতে Gvtএর আর এরূপ বে-আইনী কাজ করিতে বেগ পাইতে হইবে। যদি আমার এই মৃত্যুতে আমার অবস্থাপ্রাপ্ত আর কাহারও কোন উপকার হয় তাহা হইলে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। আপনারা হয়ত বলিবেন যে আমি আত্মহত্যা করিয়া নির্ব্বোধের কাজ করিতেছি। কিন্তু আমি যে সকল কথা লিখিলাম সেই সকল কথা চিন্তা করিয়া দেখিবেন সত্যই আমি নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছি কিনা। আমার মৃত্যুতে আপনাদের গর্ব্ব উচ্চ বই খর্ব্ব হইবে না। আমি আপনাদের কাছে এই মিনতি করিতেছি আপনি যেন শেষে অত্যধিক কাতর না হন। আমার মৃত্যুকালীন শেষ প্রার্থনা আপনি রাখিবেন বলিয়া আমার ধারণা। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন এবং বড়মাকেও দিবেন। বড়মা যেন শোক কাতর না হন। আপনি যেন সকল কথা বুঝাইয়া বলেন। আমার সকল কথা বলা হইয়াছে। আপনার পদে আমার শতকোটি প্রণাম। নিবেদনমিতি।

সেবক 'সদা'"

এই তেজস্বী, মানবহিতৈষী, সদাশয় যুবকের আত্মহত্যা গভীর শোকের বিষয়। স্বাধীনদেশে জন্মিলে ইহার দ্বারা মহৎ কাজ হইতে পারিত; এ-দেশে আত্মহত্যা দ্বারা সে নিষ্কৃতি পাইল।

ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করিয়া যাহারা জেলে যায়, তাহারাও জেলে কোন-না-কোন কাজ করে, এবং খালাস পাইয়া কোন কাজ করিয়া খায়। এই যুবকের জীবনটিকে আলস্যের দ্বারা ব্যর্থ করিবার বন্দোবস্ত পুলিস কাহার হুকুমে কোন্ আইন অনুসারে করিয়াছিল? এরূপ হুকুম বা আইন থাকিলে, তাহা কি পরমেশ্বরের বিধানের অনুযায়ী?

শচীন্দ্র এই আশা লইয়া মরিয়াছে যে তাহার মৃত্যুতে দেশের মধ্যে একটি প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইবে। তাহা হইতেছে কি না, সকলে বুকে হাত দিয়া দেখুন।

নজরবন্দীদের জন্য কি করা যায়।

ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে, কিম্বা ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশ্যন অনুসারে, যাহারা স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য কি করা যায়? এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের অনেক কর্ত্তব্য আছে। অনেক পরিবারের প্রতিপালক আবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ হইয়াছে। এই কষ্ট দূর করা কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে প্রথমতঃ আবদ্ধ লোকদের নাম ধাম ও সাংসারিক অবস্থা, এবং তাহাদের পরিবারের বর্ত্তমান অবস্থা জানা প্রয়োজন। তাহার পর আবশ্যকমত সাহায্য দিতে হইবে। এই-সব সংবাদ সংগ্রহ করা একজন মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। অন্যান্য কারণেও এই-সব সংবাদ ভারত-সভার মত কোন বিশ্বাস-যোগ্য সভা দ্বারা সংগৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতসভা এই কার্য্যের ভার লইতে না পারিলে এইরূপ কাজ করিবার জন্য একটি সমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত; কিন্তু লইতে না পারিবার কোন কারণ নাই। গতমাসে আমরা যে অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা স্থাপিত হইলে তাহার দ্বারাও এই-সব কাজ হইতে পারে। এই সমিতি স্থাপনের কথা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে প্রথমে বলিয়াছিলেন, এবং তিনি ইহার কর্ম্মী

সভ্য হইতে প্রস্তুত ছিলেন। কলিকাতার ও মফঃস্বলের *প্রধান প্রধান লোকদিগকে ইহার সভ্য করিতে হইবে। যে যে ক্ষেত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করা চলে, সেখানে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া, এবং যে ক্ষেত্রে তাহাদের সঙ্গে দেখা করা চলে না, সে ক্ষেত্রে তাহাদের বাড়ীর লোকদের সহিত দেখা করিয়া,* তাহারা কি কারণে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার পর গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদের মুক্তির জন্য যথাযোগ্য আবেদন প্রেরণ আবশ্যক। কোন আবদ্ধ ব্যক্তির কোন পীড়া বা অন্যবিধ অসুবিধা হইয়া থাকিলে তাহাও গবর্ণমেণ্টকে জানান ভারত-সভার বা এই সভার একটি কর্ত্তব্য হইবে। এই ভাবে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকিলে সুফল হইবার সম্ভাবনা। আবদ্ধ থাকা কালে বা "মুক্তি" পাইবার কিছু পরে, যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, যাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা যাহারা পাগল বা চিররুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পুরা তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদের সেরূপ দশা ঘটিবার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করাও ভারত-সভার বা প্রস্তাবিত সমিতির কর্ত্তব্য।

সমুদয় আবদ্ধ ব্যক্তিদের নাম-ধাম তাহাদের আত্মীয়েরা ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্ ঠিকানায়, ভারত-সভার সম্পাদকের নামে পাঠাইতে থাকুন। বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার কোন সভ্যও এইরূপ নামধাম-সম্বলিত পূরা তালিকা গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিলে ভাল হয়।

সাধারণভাবে খবরের কাগজে এবং প্রকাশ্য সভায় আমরা এই বলিতে পারি, যে, আবদ্ধ ব্যক্তিদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ যখন কোন আদালতের প্রকাশ্য বিচারে প্রমাণিত হয় নাই, তখন তাহাদের কাহাকেও আমরা দোষী মনে করিতে পারি না। আমরা গবর্ণমেণ্টকে বলিতে পারি, হয় প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের বিচার হউক, নতুবা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। আইনের গ্রাহ্য প্রমাণ থাকিলে নিশ্চয়ই আবদ্ধ ব্যক্তিদের প্রকাশ্য বিচার হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। হইতে পারে যে, আবদ্ধ লোকদের মধ্যে কেহ কেহ দোষী আছে; কিন্তু কেহ কেহ দোষী থাকিতে পারে বলিয়া বিনা বিচারে বহুসংখ্যক লোককে আটক করিয়া রাখা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। একটি গ্রামে একটি মৃত দেহ পাওয়া গে[ল] *প্রকৃত অপরাধীকে ধরিতে না পারিলে কি গ্রামের লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে?*

প্রকাশ্য বিচার কিম্বা মুক্তি, এই দুই পন্থার কোন[টি] গবর্ণমেণ্টের মনঃপূত না হইলে, অন্ততঃ তৃতীয় একটি উ[পায়] অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। সরকারী কর্ম্মচ[ারী] ও স্বাধীনচেতা বেসরকারী লোক লইয়া এক বা একা[ধিক] কমিটি নিযুক্ত হউক। কমিটির সমক্ষে আবদ্ধ ব্যক্তি[দের] বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রমাণ উপস্থিত করা হউক, এ[বং] আবদ্ধ ব্যক্তিকে নিজে কিম্বা উকীল বা ব্যারিষ্টার দ্ব[ারা] আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হউক। তাহার [পর] কমিটি যাহাকে মুক্তি দিতে বলিবেন, সে মুক্তি পাই[বে]; যাহাকে আবদ্ধ রাখিতে বলিবেন, সে আবদ্ধ থাকি[বে]। মফঃস্বলের শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রা[য়], মৌলবী ফজলল হক্, প্রভৃতির মত লোকদিগকে কমি[টির] সভ্য নিয়োগ করা উচিত।

তিনটি উপায়ের মধ্যে কোনটিই যদি গবর্ণমেণ্ট অবল[ম্বন] না করেন, তাহা হইলে, বড় লাট সাহেব তাঁহার ব্যবস্থাপ[ক] সভার শারদীয় অধিবেশনের শেষ বক্তৃতায় সর্ব্বসাধারণ[কে] গবর্ণমেণ্টের শুভ ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের অকপটতায় বিশ্ব[াস] করিতে যে অনুরোধ করেন, সেই অনুরোধ, ভারতব[র্ষের] অন্যান্য প্রদেশে যাহাই হউক, বঙ্গদেশে যথেষ্ট পরিমা[ণে] ফলপ্রদ হইবে না। ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব এদে[শে] আসিয়া যতদিন এখানে থাকিবেন, ততদিন দেশে যাহা[তে] রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংক্ষুব্ধ ভাব না থাকে, তজ্জ[ন্য] শাসনকর্ত্তারা ব্যগ্র হইয়াছেন। কিন্তু দেশে শান্তভা[ব] আনিতে হইলে উত্তেজনা ও অসন্তোষের কারণ দূর করি[তে] হইবে।

রাজনৈতিক গুপ্তহন্তারা দেশের লোককেই মারে, রাজনৈতিক ডাকাতরা দেশের লোকেরই ধন লুটিয়া লয়। আমরা ইহা চাই না যে দেশে এরূপ হন্তা বা ডাকাত[রা] অবাধে বিচরণ করে। কিন্তু আমরা কেবল অপরাধীদে[র] শাস্তি চাই।

শ্রীমতী বেসাণ্ট ও তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মীকে ছাড়িয়া দিয়া মুসলমানদের নেতা মেহমেদ আলী ও শৌকত আলী

প্রভৃতিকে ছাড়িয়া না দেওয়ায় মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে-কারণে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না বলিতেছেন, তাহা আমাদের নিকট ঠিক্ মনে হয় না। ধর্ম্মঘটিত কারণে তাঁহাদের ও সমুদয় মুসলমান সম্প্রদায়ের তুরস্কের সহিত সহানুভূতি থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা ও মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোনও বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। মুসলমানেরা অন্যান্য সম্প্রদায়েরই মত সৈন্য ও অর্থাদি জোগাইয়াছেন। মুসলমানদিগকে সন্দেহ না করিয়া বরং একথা বলিলেই ন্যায্য কথা বলা হয়, যে, তাঁহারা একদিকে ধর্ম্মবিষয়ক আনুগত্য ও অন্যদিকে রাজনৈতিক আনুগত্য, এই উভয়সঙ্কটে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা ইংরেজদের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা পাইবার যোগ্য। এইজন্য আমাদের বোধহয় গবর্ণমেণ্ট মেহমেদ আলী, শৌকৎ আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলবী ইমাম উদ্দীন, প্রভৃতি মুসলমান নেতাকে মুক্তি দিলে সুবিবেচনার কাজ হইবে। নতুবা দেশে শান্তভাব স্থাপন সম্ভবপর বোধ হইতেছে না।

শ্রীমতী বেসাণ্ট প্রভৃতির মুক্তি।

শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট এবং মিঃ এরাণ্ডেল ও মিঃ ওাডিয়া মুক্তিলাভ করিয়া আবার যে ভারতবর্ষের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। সকল প্রদেশ হইতে তাঁহাদের স্বাধীনতা লোপের প্রতিবাদ তাঁহাদের মুক্তির অন্যতম কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ বলিয়া আমরা মনে করি না। শ্রীমতী বেসাণ্ট ও মিঃ এরাণ্ডেল ইংরেজ, তাঁহাদের নিজের খ্যাতি ও প্রভাব আছে, এবং বিলাতে তাঁহাদের অনেক প্রভাবশালী বন্ধু আছে। এইসব কারণেও তাঁহাদের মুক্তি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ওাডিয়া পার্সী হইলেও তাঁহাদের সঙ্গে একই কারণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকেও ছাড়িয়া না দিলে ভাল দেখাইত না বলিয়া তাঁহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। গবর্ণমেণ্টের শাসননীতির পরিবর্ত্তন তাঁহাদের মুক্তির কারণ নহে। এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে সর্ব্বসাধারণের পরিচিত আর একজন আবদ্ধ ব্যক্তিও কেন এপর্য্যন্ত মুক্তি পাইলেন না? (ইহা অক্টোবর, ২১শে আশ্বিন, লিখিত।)

মিসেস্ বেসাণ্ট প্রভৃতি বিনা সর্ত্তে খালাস পান নাই তিনি বড়লাটের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যে, তিনি ভারতসচিবের ভারত-ভ্রমণকালে দেশে শান্তভাব উৎপাদনে কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিবেন। সেইজন্য বোধ হয় তাঁহার বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, মধ্যপ্রদেশ ও বেহার প্রদেশে যাইবার বিরুদ্ধে যে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাহা রহিত করা হইয়াছে।

তাঁহার এই প্রতিশ্রুতিদান আমাদের ভাল লাগে নাই আমরা রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অসন্তোষের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার লাভ এবং উন্নততর শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য যদি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়, এবং যদি তাহাতে কতকটা নির্দ্দোষ উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে তাহা অপরিহার্য্য এবং তজ্জন্য আমাদের চেয়ে গবর্ণমেণ্টই বেশী দায়ী। আন্দোলনের প্রয়োজন এখনও খুব রহিয়াছে; ইহা না কমাইয়া বরং বাড়ানই দরকার। এ-অবস্থায় ভারতবর্ষের প্রতি কর্ত্তব্য করিয়াও শান্তভাব কেমন করিয়া আনিতে পারা যায়, জানি না। তা ছাড়া, শান্ত-ভাবের মানে সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজেরা এই করিবে যে, দেশে ছাপাখানা বা বক্তৃতার সাহায্যে কোন আন্দোলন হইবে না। শ্রীমতী বেসাণ্ট সম্ভবতঃ এ-অর্থে প্রতি-শ্রুতি দেন নাই। কিন্তু প্রতিশ্রুতির মানে করিবার ভার যে অপর পক্ষের হাতে। তিনি কি অর্থে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা দেশের লোককে বলুন। যাহা হউক, তিনি যে-অর্থেই প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকুন, তজ্জন্য তাঁহার ও তাঁহার অনুচরদের এবং অন্য কাহারও বৈধ ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য না আসিলে সুখের বিষয় হইবে।

সার্ সুব্রহ্মণ্য আইয়ারের পত্র।

মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ নেতা সার্ সুব্রহ্মণ্য আইয়ার ইংরেজী দৈনিক "হিন্দু"তে, আবদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, একটি বিজ্ঞজনোচিত পত্র লিখিয়াছেন। তিনি যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, নজর-

বন্দীদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য তাহার প্রধান-প্রধান কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কোন-কোন বন্ধু প্রস্তাবিত অনুসন্ধান ও সাহায্যদানের কার্য্যে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন।

মিসেস্ বেসান্ট তাঁহার স্বাধীনতালোপের আদেশ রদ করিবার জন্য প্রিভি কৌন্সিলে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। সেই দরখাস্তে এই একটি যুক্তি ছিল, যে, ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে তাঁহাকে আবদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু ওরূপ আইন করিবার ক্ষমতা ও অধিকার ভারত গবর্ণমেণ্টের না থাকায় আইনটাই বে-আইনী; অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে আদেশ টিকিতে পারে না। এই যুক্তি সম্বন্ধে প্রিভি কৌন্সিলের ক্লার্ক অব্ দি কৌন্সিল সার্ আল্মেরিক ফিজ্‌রে মিসেস বেসাণ্টের সলিসিটারকে সরকারী পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে ভারতরক্ষা আইনের বৈধতা বা অবৈধতার বিচার করিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষীয় হাইকোর্টগুলির আছে; কোন হাইকোর্ট যদি বলেন যে আইনটি বৈধ, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপীল হইতে পারিবে। তজ্জন্য সার্ সুব্রহ্মণ্য আইয়ার পরামর্শ দিয়াছেন, যে, যে কোন অবরুদ্ধ ব্যক্তির আত্মীয় হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়া ঐ আইনের অবৈধতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করুন; তাহার পর প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত লড়া যাইতে পারিবে। আমাদেরও ইহা করা খুব কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। সার্ সুব্রহ্মণ্য আইয়ার নিজে বড় উকীল ছিলেন এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাজ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হওয়া আবশ্যক। তাঁহার পত্র ৬ই অক্টোবরের অমৃতবাজার পত্রিকায় এবং ৭ই অক্টোবরের বেঙ্গলীতে "হিন্দু" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-সংরক্ষণপ্রয়াসী কোন আইনব্যবসায়ী এই বিষয়টিতে মন দিলে বড় ভাল হয়।

রাজা রামমোহন রায়।

কয়েক বৎসর হইল হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় যদি এখন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই হোমরুল-প্রয়াসী হইতেন। বাস্তবিক রামমোহন রা[য়ের] মত সকল দেশের সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতালিপ্সু মা[নুষ] সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু অ্যাড[াম] সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—"He would be free [or] not be at all"; "তিনি বরং বাঁচিয়া থাকিবেন না ত[াহাও] স্বীকার, কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতিরেকে বাঁচিয়া থাকিতে রা[জি] ছিলেন না।" এই স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীন[তা] নহে, ধর্ম্ম, সমাজ, প্রভৃতি সকল বিষয়ে স্বাধীনতা।

২৭ শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে তাঁহার প্র[তি] শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ সভা হইয়া থাকে। ১১ই আ[শ্বিন] কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীতে সভা হইয়াছি[ল।] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন[।] স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডি[ত] প্রমথনাথ তর্কভূষণ বক্তৃতা করেন, এবং শ্রীযুক্ত অজি[ত] কুমার চক্রবর্ত্তী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শেষে সভাপ[তি] একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দুঃখের বিষয় এই সুন্দ[র] বক্তৃতাটি কেহ লিখিয়া লন নাই। তত্ত্বকৌমুদীতে [ও] সঞ্জীবনীতে ইহার যেরূপ তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে, তা[হা] হইতেই পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কিছু আভা[স] পাইবেন।

"এদেশে যে কিরূপে রাজা রামমোহনের জন্ম হইল, তাহা বুঝা যা[য়] না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই, তিনি সে অবস্থার বহু উচ্চে অবস্থিত। অরুণচ্ছটা যেমন নিম্নভূমি অন্ধকা[রে] সমাচ্ছন্ন থাকা কালেও উন্নত পর্ব্বতশিখরকে অনুরঞ্জিত করে, সেইরূ[প] স্বর্গীয় আলোক তাঁহার উন্নত আত্মাকে আলোকিত করিয়াছিল—বি[শ্ব] মানবের মুক্তির বাণী তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল। মানবজীবনে যেম[ন] একটা সময় আছে, যখন তাহাকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই বর্দ্ধি[ত] হইতে হয়, বাহিরে গেলেই তাহার বিপদ, তেমনি মানবসমাজেও এরূ[প] শিশুকাল আছে। যে সকল সমাজ সেরূপভাবে রক্ষিত ও বর্দ্ধি[ত] হইয়াছে তাহারাই আজও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু শিশুকাল অতিক্রা[ন্ত] হইলে যেমন তাহাকে বাহিরে বিশ্বজগতের মধ্যে যাইতে হয়, তাহা ন[া] হইলে তাহার উন্নতি ও বিকাশ হইতে পারে না, তেমনি যে সমাজ চিরকাল আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে, বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হ[য়] না, তাহারও উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠে। ভারতকে বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্যই রামমোহন আসিয়াছিলেন। শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্বমানবের জন্য মুক্তির বাণী লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র আদর্শ, সমগ্র দৃষ্টি, সমগ্র ভবিষ্যৎ আপনার মধ্যে ধরিয়াছেন। চারিদিকের অন্ধকার মধ্যে দাঁড়াইয়া যেন তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বলিয়াছেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"
"এই অন্ধকারের পরপারস্থিত জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।" সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাতেই সুখ, ক্ষুদ্রে সুখ নাই। আমরা ক্ষুদ্র লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি না। ক্ষুদ্র দেশে আবদ্ধ থাকিলে হইবে না। দেশকে বিশ্বের অন্তর্গত করিয়া ভাল বাসিতে হইবে। সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে। রামমোহন যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন সে শস্য আমরা কর্ত্তন করিব। আমরা অনেক সময় দুঃখ করি, আমাদের উপযুক্ত নেতা নাই। রামমোহনই আমাদের নেতা, আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া চলি, তাঁহার বাণী শুনিয়া চলি। আমরা ক্ষুদ্রে ডুবিয়া থাকিতে পারি না। মহান ব্রহ্ম আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়দ্বারে অতিথি রূপে উপস্থিত। এই অতিথিকে স্থান দিতে হইবে। প্রত্যাখ্যান করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা কেহ ছোট নই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যাহারা বড় তাহারাও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অহঙ্কারী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, আর যে ছোট সে বড় হইয়াছে। ইতিহাসে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ রহিয়াছে। আমরাও ছোট নই, ছোট থাকিব না। সেই মহাবাণী শুনিয়া চলি, সেই নেতার অধীন হইয়া চলি, আমরাও বড় হইয়া উঠিব, এ দেশ বড় হইয়া উঠিবে।"

—তত্ত্বকৌমুদী।

"শিশু মায়ের কোলে বাড়িতে থাকে। প্রত্যেক জাতি তেমনই আপন আপন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাড়িয়া থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি ও পরিণতির প্রয়োজন আছে। এক সময়ে পৃথিবীর সকল জাতি এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়াছে। কিন্তু এই বৃদ্ধিই চরম বৃদ্ধি নহে। সকল জাতিকেই বিশ্বের মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য জোগাইতে হইবে।

"আপনারা শুনিয়াছেন যে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে রামমোহন জন্মলাভ করেন। ঐ বিপ্লবের যুগে যে বিশ্ববাণী ধ্বনিত হইতেছিল তাহা কেমন করিয়া শিশু রামমোহনের প্রাণ স্পর্শ করে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

"উষার অরুণরশ্মি যেমন উচ্চ শিখরগুলিকে আলোকমণ্ডিত করে, তেমনি সেই যুগে পৃথিবীর কতিপয় মহাত্মা বিশ্ববোধের আলোক লাভ করিয়াছিলেন। শিখরে যখন প্রথম আলোকসম্পাত হয় তখন নিম্নভূমি গভীর অন্ধকারে আবৃত থাকে। বঙ্গভূমি যখন নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন বালক রামমোহন অলৌকিক রূপে বিশ্ববোধের আলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান লাভের পক্ষে দেশ অনুকূল ছিল না, বরং সমস্তই তাঁহার প্রতিকূলে ছিল। তিনি যেন দৈবশক্তি-বলে এই জ্ঞান লাভ করিলেন।

"বঙ্গদেশের এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে কেমন করিয়া বিশ্ববোধ লাভ করিলেন তাহা বিস্ময়কর। তিনিই এই দেশে তখন ভূমার বাণী ঘোষণা করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সেই অন্ধকারের পরপারের মহান্ পুরুষকে তিনি জানিয়াছিলেন। অন্ধকারের পরপার হইতে জ্যোতির্ময় পুরুষের আলোক আসিয়া এই শিখরের উপর পতিত হইয়াছিল।

"পৃথিবীর কোন জাতি এখন আপনার সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারিবে না। উহাতে যে হীন দেশাত্মবোধ জাগাইয়া থাকে তাহা হইতেই হানাহানি মারামারির সৃষ্টি হয়। এখন প্রত্যেক দেশকে আপন গৃহদ্বার খুলিয়া দিয়া বিশ্বকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। ছোট হইয়া থাকার [illegible]

"ভূমৈব সুখম্ নাল্পেসুখমস্তি"

"পৃথিবীর কোন জাতি হীনতার মধ্যে চিরকাল থাকিবে না বাঙ্গালীর নিরাশার কারণ নাই। বাঙ্গালীর গৃহে রামমোহন জন্মগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ গৌরব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যাঁহারা মহৎ তাঁহারা অগৌরবের মধ্যে গৌরবকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে প্রত্যক্ষ করেন। এখন পৃথিবীতে যে রণকোলাহল চলিতেছে ইহার মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃসঙ্ঘের ছবি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তখন জাতিতে জাতিতে কিরূপ মৈত্রী স্থাপিত হইবে তাহার আলোচনা চলিতেছে।

"বঙ্গের ভবিষ্যৎ গৌরব তখনকার গভীর অন্ধকারের মধ্যেই রামমোহন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালীকে বিশ্বের রাজপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর কোন নিরাশার কোন আশঙ্কার কারণ নাই, বাঙ্গালী বৃহৎ মনুষ্যত্বের পথে যাত্রা করিয়াছেন।"—সঞ্জীবনী।

কলিকাতায় মিসেস বেসাণ্টের অভ্যর্থনা।

কলিকাতায় মিসেস বেসাণ্টের আগমন উপলক্ষ্যে যেরূপ জনতা হইয়াছিল, তেমন প্রায় দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে ইংরেজরা এবং বাঙালীদেরও কেহ কেহ বলিতেছেন যে বেশীর ভাগ লোক তামাসা দেখিতে গিয়াছিল, মিসেস বেসাণ্টের গুণাগুণ বা স্বরাজের প্রয়োজন তাহারা বুঝে না। মন্তব্যকারীরা যখন অধিকাংশ লোককে ডাকিয়া এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন নাই, তখন তাঁহাদের কথার মূল্য যাচাই করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। বস্তুতঃ ছোট বড় জনতা যখনই হউক,—তাহা সম্রাটের আগমন উপলক্ষ্যেই হউক, অন্য কোন বড় ইংরেজের আগমন উপলক্ষ্যেই হউক, বা কোন জননায়কের আগমন উপলক্ষ্যেই হউক,—তখনই কতক লোক যে ভীড় দেখিবার জন্য ও হুজুক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সমবেত হয়, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমানটা, যাহাকে দেখিতে পারি না, কেবল তাহার আগমন উপলক্ষ্যেই প্রবলভাবে প্রয়োগ করা অসঙ্গত। তামাসা দেখিবার লোক যখন সকল জনতার মধ্যেই থাকে, তখন জনতার বিশালতা অনুসারে জনতার কারণেরও প্রবলতা অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীমতী বেসাণ্ট হিন্দু-ধর্ম্মের সমর্থক, এই বিশ্বাস একটা কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবর্ষের লোকদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ও নিগৃহীত হইয়াছেন, ইহাও অন্যতম কারণ। আর একটা খুব প্রবল কারণ, দেশের লোক স্বরাজ চায়, স্বরাজ তাহাদিগকে আকৃষ্ট [illegible]

অন্যান্য সমর্থকেরা ইহলোক হইতে যখন চলিয়া যাইবেন, তখনও স্বরাজ থাকিবে, এবং উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিবে।

রাজনারায়ণ বসু।

এমন অনেক মানুষ পৃথিবীতে জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের কাজের চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁহাদের কাজ এবং তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে তাঁহাদের মহত্ত্বের ঠিক ধারণা হয় না। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই-রকমের মানুষ ছিলেন। তাঁহার আত্মচরিত এবং তাঁহার রচিত নানা গ্রন্থ হইতে তাঁহাকে অনেকটা বুঝা যায় বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে জানিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থাবলী হইতে লব্ধ এই ধারণা অপেক্ষা তাঁহাকে বড় বলিয়াই জানেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়ে, ততই ভাল। এইজন্য আমাদের মনে হয়, তাঁহার বার্ষিক স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বক্তৃতা করেন, তাহা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হইলে ভাল হইত। তদভাবে আমাদিগকে সঞ্জীবনীতে প্রদত্ত চুম্বকেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা।

রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থ ও জীবনী পড়িয়া তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহার কথা আমি বলিব না। শিশুকালে আমার বয়স যখন ৮ বছর তখন হইতে আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে দেখিতাম। তখনই তাঁহার পককেশ-গোঁপদাড়ি। তবু তিনি যেন শিশুভাবে আমাদের সহিত মিশিতেন।

জীবনের পরিণতি।

তিনি যে অতি বড় লোক তখন আমরা তাহা বুঝিতাম না। এখনকার মত তখন সংবাদপত্র, সভাসমিতি, সমালোচনা, প্রভৃতি ছিল না, সুতরাং মানুষ লোকচক্ষুর আড়ালে বাড়িতে পাইত। শকুনি যেমন শবদেহ লইয়া টানা-হেঁচড়া করে, এখন জীবিতদের লইয়া সংবাদপত্র সেইরূপ করে। রাজনারায়ণ বাবুর আমলে "সোমপ্রকাশ" প্রভৃতি কাগজ ছিল বটে, তবে ঐ-সকল কাগজ সংযত ছিল। অন্ততঃ এখন যেমন কাগজে সত্যমিথ্যায় জোড়াতাড়া দিয়া এক-একটা লোকের সম্বন্ধে লেখা হয় তখন তেমন হইত না। তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার সুযোগ ছিল। এইরূপভাবে রাজনারায়ণ বাবু মহৎ হইয়াছিলেন বলিয়া লোকের মধ্যে তিনি তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই। এমন কি অমন মহৎ ব্যক্তির নামও হয়ত এই কালে অনেকে জানেন না।

পরিপূর্ণ জীবনের ছবি।

রাজনারায়ণ বাবু দিবারাত্র কার্য্য করিতেন। ভাঙ্গাগড়ার এক বিশেষ যুগে তিনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সকল-প্রকার দেশের কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। আমার পূর্ব্বে যাঁহারা বলিয়াছেন তাঁহাদের মুখে আপনারা শুনিয়াছেন যে, স্বদেশী মেলা, এবং নানা-প্রকার সভার সহিত তাঁহার যোগ ছিল; কিন্তু তবু তাঁহার মুখে কোন চাঞ্চল্য ছিল না।

জাপান যাত্রার সময়ে দেখিয়াছি, অতি ভীষণ ঝটিকার মধ্যে জাপ জাহাজের কর্ণধার আমার সহিত তখনকার বায়ুর গতির বেগ ইত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। এত বড় প্রবল ঝড় সাধারণতঃ না। ঐ ঝড় সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন চিন্তা ছিল না তাহা ন কিন্তু সকল কার্য্যের ব্যবস্থা, এমন কি জাহাজ জলমগ্ন হইলে যাত্র যাহা পরিয়া জলে ঝাঁপ দিবে, তাহার আয়োজন হইয়াছিল; তবু ি আমার সহিত গল্প করিতেছিলেন।

রাজনারায়ণ বাবু তখনকার সেই প্রবল ভাঙ্গাগড়ার যুগে স কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও আমার মত বালকের সহিত মেলামেশা ক মনে করিতেন। শিশুদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল।

ইহা যে তিনি কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে করিতেন তাহা নহে, ঐ কর্ত্ত বুদ্ধির পশ্চাতে তাঁহার একটা পরিপূর্ণ জীবন রহিয়াছে। কর্ত্ত বুদ্ধি অনেক সময়ে সঙ্কীর্ণভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। রাজনার বাবুর কর্ত্তব্যবুদ্ধি তেমন সঙ্কীর্ণ নহে। তিনি আমার পিতার স কার্য্যের সঙ্গী ছিলেন; আমার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ আমার অপে বয়সে অনেক বড়, তিনি তাঁহার সুহৃদ ছিলেন; আবার আমার শিশুরও তিনি বয়স্য ছিলেন। সকলের সহিত মিশিবার জন্য যে সরসতার দরকার তাহা তাঁহার ছিল।

আনন্দ সৃষ্টি করে।

উপর হইতে যে বারিবর্ষণ হয় উহাই পৃথিবীর সজীবতা রক্ষা ক তাহা নহে, পৃথিবীর ভিতরেও নিত্যপ্রবাহিত রসের ধারা আছে কর্ত্তব্যের চাপে নহে, আনন্দেই সংসারের সৃষ্টি হইতেছে। উপনিষ আছে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অর্থাৎ আনন্দ হই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবুর জীবনে এই আনন্দ-রসে প্রাচুর্য্য ছিল।

ক্ষেত্রের প্রতি শ্রদ্ধা।

যাহাকে কিছু উৎপন্ন করিতে হয় তাহার নিজের পদতলের ভূমি উপর শ্রদ্ধা থাকা যাই। এই ভূমি বালুকাময়, এই ভূমি অসা এইরূপ যিনি মনে করেন তাঁহার ভূমিকর্ষণ ও শস্যোৎপাদনে মনোযো হয় না।

এই দেশের প্রতি রাজনারায়ণ বাবুর শ্রদ্ধা ছিল; শ্রদ্ধা ছি বলিয়াই তিনি এই দেশের মঙ্গলের জন্য বিবিধ কার্য্য করিতে পারিয় ছিলেন।

তাঁহার সময়ের শিক্ষিতেরা দেশকে ভুলিয়া বিদেশী ইতিহাসে উপাড়িয়া এই দেশে আনিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়াছিলে ইতিহাসের রূপ দেশকে আশ্রয় করিয়া এক এক স্থলে এক এক ভা প্রকাশিত হয়। এই রূপ অনুসরণ করা যায় না। ইতিহাসের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে ঐ সত্য সকল দেশেই এক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ।

রাজনারায়ণ বাবুর বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি ডিরোজিয়োর শিষ্য, ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ঐ ভাষাতেই চিরদিন ভাব প্রকাশে অভ্যস্ত। অথচ তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় আত্মশক্তি নিয়োগ করেন।

তিনি যখন এই সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন, তখন এই সাহিত্যের শিশু অবস্থা। তখন ইহার মধ্যে আকর্ষণের কিছু ছিল না। তাঁহাকে যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইত —"এই ভাষায় কি আছে যে তুমি এই ভাষার সেবা করিবে?" উত্তরে তিনি কিছুই দেখাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি ত অমন

ভাবে দেখেন নাই। এই শিশুর সূতিকাগৃহে যখন মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়াছিল তিনি সেই ধ্বনির মধ্যে ভবিষ্যতের গৌরববাণী নিঃসন্দেহ শুনিয়াছিলেন, তিনি শিশুর মুখমণ্ডলে ভবিষ্যতের গৌরবচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেই শিশুকালেই ইহাকে যে আসন প্রদান করিয়াছিলেন এখনও বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই গৌরব দান করিতে চাহেন না। এই জন্য তিনি ঐ সময়েই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান না করিলে বাঙ্গালীর উন্নতি হইতে পারে না ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতেন।

আমার তিনি বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। ১৮ বছরের সময় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আমি ভারতীতে যাহা লিখিতাম, তাহা পাঠ করিয়া আমার লজ্জা হয়, তাহা এখনও ছাপার অক্ষরে আমার প্রতি চাহিয়া আমাকে লজ্জিত করে। রাজনারায়ণ বাবু তাহা পরম আগ্রহে পড়িতেন, প্রত্যেকটি বাক্যের সমালোচনা করিয়া দেওঘর হইতে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ পত্র পাইবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতাম।

শিশুর প্রতি অনুরাগ।

ছোট শিশুদের প্রতি রাজনারায়ণ বাবুর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। যাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তাঁহারা অনেকে শিশুদের মধ্যে কেবল দোষই দেখেন, তাহাদের উপর কেবল অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বাবু যখন পক্ককেশ বৃদ্ধ, তখন আমার বয়স ৮ বছর; ঐ বয়সে তিনি আমার বয়স্য ছিলেন, আমার সহিত তাঁহার মেলামেশার কোন বাধা ছিল না। তাঁহার এই শিশুপ্রীতির মূলে অসীম বিশ্বাস ছিল। শিশুদের মধ্যে যে মহৎ পরিণাম আছে তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। জগতের একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন—"শিশুদের আমার নিকট আসিতে দাও।"

আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি যে এখন শিশু ও যুবকদিগকে ভালবাসিতে পারি, ইহার মূলে দুই ব্যক্তি আছেন।

প্রথম আমার পিতা। তিনি কোন দিন আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করেন নাই। তাঁহার সহিত আমার আলাপ আলোচনা হাস্য পরিহাস সকলই চলিত। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন। আমাকে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহিত করিতেন।

দ্বিতীয় রাজনারায়ণ বাবু। তিনি আমার সহিত সমবয়সীর মত মিশিতেন।

আমাদের গৃহের দক্ষিণের কক্ষে দ্বিপ্রহর সময়ে তিনি শুইয়া থাকিতেন। তখন আমরা নির্ভয়ে ঐ কক্ষে কোলাহল করিতাম। হয়ত তাঁহার সম্বন্ধে কত কথা বলিতাম। তিনি সময়ে সময়ে চক্ষু মেলিয়া চাহিতেন। যেন বলিতেন, তোমরা ভাবিয়াছ আমি ঘুমাইয়া আছি, তাহা নহে, এই দেখ আমি দিব্য জাগিয়া আছি।

আমার সহিত সেই সময়ের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আনন্দস্মৃতি বহন করিয়া আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি এবং আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

নজরবন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ।

যখন ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে সভা করিয়া কেবল মিসেস্ বেসাণ্ট এবং তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মীর মুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছিল, তখন আমরা বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার পত্রিকায় পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলাম যে আর যত লোককে বিনা বিচারে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহাদিগকেও মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা উচিত। তাহার পর আমরা প্রবাসী ও মডার্ণরিভিউ কাগজেও এই কথা লিখি। কলিকাতার মহিলাগণ মিসেস বেসাণ্টের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য থিয়সফিক্যাল সোসাইটির হলে যে সভা করেন, তাহাতে তাঁহারা এই প্রস্তাব ধার্য্য করেন যে, যে-সকল নিরপরাধ ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। প্রকাশ্য সভা হইতে এরূপ দাবী ভারতবর্ষে ইহাই সর্ব্বপ্রথমে করা হয়। ইহা নারীদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। ইহার পর মুক্তিপ্রাপ্তা শ্রীমতী বেসাণ্টকে অভিনন্দন করিবার জন্য কলিকাতার টাউন হলে যে সভা হয়, তাহাতেও বিনাবিচারে অবরুদ্ধ সমুদয় লোককে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। এখন ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিরাট সভা করিয়া মেহমেদআলী, শৌকৎআলী প্রভৃতি মুসলমান নেতাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলা হইতেছে। গত ২১শে আশ্বিন কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানদের একটি বিরাট সম্মিলিত সভা হয়। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি সাহসের সহিত অনেক স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। এই সভায় হিন্দুমুসলমান বিখ্যাত অবিখ্যাত সমুদয় আবদ্ধ লোককে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। এরূপ অনুরোধ আমরা অসঙ্গত মনে করি না। আয়ার্লণ্ডে যাহারা সত্য সত্য বিদ্রোহ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৈনিকদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এরূপ কয়েদীদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এখানে যাহাদের বিরুদ্ধে আইনের-গ্রাহ্য কোনই প্রমাণ নাই, বিনা বিচারে কেবলমাত্র সন্দেহ করিয়া কেন তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখা হইবে?

বিলাতে জাডীগ্ নামক একজন জার্মেনবংশীয় দেশীকৃত (naturalised) লোককে বিলাতী দেশরক্ষা-আইন অনুসারে আবদ্ধ করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে আপীল হয়। অধিকাংশ জজদের মতে আপীল নামঞ্জুর হয়। কেবল একজন জজ, লর্ড শ, স্বতন্ত্র রায়ে এইপ্রকারে মানুষের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁহার রায় হইতে [illegible]

রঞ্জন দাশ যে-সকল মন্তব্য উদ্ধৃত করেন, তাহা বেশ দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী হইয়াছিল। লর্ড শ জিজ্ঞাসা করেন, যে, দেশকে নিরাপদ করিবার জন্য যদি বিনাবিচারে গবর্ণমেণ্ট যাহাকে ইচ্ছা স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিতে পারেন, তাহা হইলে, তজ্জন্য বিনাবিচারে তাহার প্রাণদণ্ড দিতেও পারেন কি না? ("But does the principle or does it not, embrace a power not over liberty alone, but also over life?") লর্ড শ এটর্নী জেনারেলকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কেবলমাত্র এই উত্তর পান, যে, তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও এই নীতি অনুসারে হইতে পারে বটে। অবশ্য বিলাতে কিম্বা ভারতে দেশরক্ষা-আইন বিনাবিচারে কাহারও প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টকে দেয় নাই। কিন্তু প্রকারান্তরে জীবনটা দুর্ব্বহ করিবার ক্ষমতা দিয়াছে, এবং তাহার ফলে তিন জন বাঙালী আত্মহত্যা করিয়াছে। কেবলমাত্র সন্দেহবশতঃ কাহারও সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করা যে কিরূপ গুরুতর দায়িত্বের কাজ, তাহা গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বোধগম্য হইতেছে না। তাঁহাদের কাহারও পুত্র আবদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিলে হয়ত এরূপ ব্যবস্থার ভীষণতা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইত।

মোহম্মেদ আলী ও শৌকৎ আলী।

আলী-ভ্রাতাদ্বয়ের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা দিয়াছিলেন; কিন্তু অধিকন্তু এই একটি সর্ত্ত তাঁহারা করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুজ্ঞাপালন তাঁহারা সকল অবস্থাতেই করিবেন। ইহাতে হয়ত রাজ-কর্ম্মচারীরা মনে করিয়া থাকিবেন, যে, মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে যদি ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলে, তাহা হইলে ত এই দুজন মুসলমান নেতা তাহা করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। কেন না, মুসলমান ধর্ম্মে এরূপ কথা বলে না, এবং হাজার হাজার মুসলমান তুরস্কের বিরুদ্ধে ও ইংরেজের পক্ষে লড়িতেছে, ও অনেকে প্রাণ দিয়াছে। মহমুদাবাদের রাজার সহিত কথাপ্রসঙ্গে মোহম্মেদ আলী একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তিনি কংগ্রেস্-মস্লেমলীগের মত ভারতবর্ষের ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত থাকাই চান, তিনি অন্য কোন বিদেশী জাতি এমন কি তুর্কদেরও, ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব স্থা[পন] বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। তিনি আরও বলেন যে তু[র্ক] যদি ভারতবর্ষের সীমায় আসিয়া ভারতবর্ষ আক্র[মণ] করে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং ইংরেজের সৈন্যদলভু[ক্ত] হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এ অবস্থায় তাঁহা[কে] ও তাঁহার ভ্রাতাকে আর আবদ্ধ করিয়া রাখা বিজ্ঞ[তার] কাজ হইতেছে না। এখন তাঁহাদিগকে বন্ধ কা[রিয়া] রাখায় কেবল এই ফল হইতেছে যে হাজার হাজার মুসলমা[ন] সভা করিয়া বলিতেছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের তু[রস্কের] সমধর্ম্মীদের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করেন, য[দি] তাঁহারা এপর্য্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, এ[বং] ভবিষ্যতেও করিবেন না।

বিনাব্যয়ে উচ্চতম শিক্ষা লাভ।

কোন কোন সভ্যদেশে দরিদ্রতম বালক বা বালি[কা] ইচ্ছা করিলে এবং শিক্ষালাভ করিবার ক্ষমতা থাকি[লে] বিনাব্যয়ে উচ্চতম শিক্ষালাভ করিতে পারে। সেই-[সব] দেশে প্রাথমিক, মধ্য, ও উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য অবৈতনি[ক] পাঠশালা, বিদ্যালয়, ও কলেজ আছে। আমেরিক[ার] সম্মিলিত-রাষ্ট্রসমূহে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সেখা[নে] বেতন দিয়া পড়িতে পারা যায়, এরূপ শিক্ষালয়ও আছে। সম্প্রতি বিলাতের ওয়েল্‌স্ দেশে কলেজের শিক্ষা অবৈতনিক করিবার চেষ্টা হইতেছে।

শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করিবার তিনটি ধাপ আছে। প্রথমে বালকবালিকাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনি[ক] করা দরকার। তাহার পর মধ্য শিক্ষা অবৈতনিক করি[য়া] সর্ব্বশেষে কলেজের শিক্ষাও অবৈতনিক করা আবশ্যক। বাড়ীতে থাকিয়াই যাহাতে সকল ছাত্র ও ছাত্রী মোটাম[ুটি] উচ্চশিক্ষা পাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে দেশের নানাস্থা[নে] শিক্ষালয় স্থাপন, সকল সভ্যদেশের চরম লক্ষ্য হও[য়া] উচিত। কোন দেশে এইরূপ ব্যবস্থা যতদিন না হ[য়] ততদিন, সে দেশের যত লোকের যত বিষয়ে যেরূপ প্রতিভা বিকাশ হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইয়াছে বলা যায় না।

আমাদের দেশে, ব্রিটিশশাসিত ভারতে, প্রাথমি[ক] শিক্ষাও এখনও কোথাও অবৈতনিক হয় নাই; কোন কো[ন]

দেশী রাজ্যে হইয়াছে। ব্রিটিশভারতে ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও কলেজে ছাত্রদের বেতন মোটের উপর বাড়িয়াছে। আরও বাড়াইবার প্রস্তাব হইতেছে। রায় বাহাদুর পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সিমলার একটি শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণাসভায় ইংরেজী স্কুলসকলের বেতন বাড়াইয়া ইংরেজ হেডমাষ্টার ও কয়েকজন করিয়া ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী রাখিবার প্রস্তাব করেন! যেন উচ্চারণে ও ইংরেজী লেখায় নকল ইংরেজ না হইলে মোক্ষলাভ হইবে না, এবং যেন ইংরেজ হেড্-মাষ্টার ও ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীদের কাছে না পড়ায় আমাদের দেশের নানা ব্যবসায়ে ও কার্য্যক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় লোকেরা অকেজো হইয়া আছেন! আমাদের দেশের সমুদয় বড় বড় অধ্যাপক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি ও অন্য সাহিত্যিক, বক্তা, ব্যারিষ্টার, উকীল, শিক্ষক, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, সংবাদপত্র-সম্পাদক, রাজনীতিজ্ঞ, দেশীরাজ্যের মন্ত্রী, বণিক, কারখানাপরিচালক, রাজকর্ম্মচারী, হাকিম, বিচারক, প্রভৃতির একটা তালিকা প্রস্তুত করা হউক; এবং তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বাল্যকালে ইংরেজ হেড্ মাষ্টার ও শিক্ষয়িত্রীর কাছে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা লিখিত হউক। তাহা হইলেই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে, যে, শিক্ষা দিবার জন্য রায় বাহাদুরের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; অন্য রকমের প্রয়োজন থাকিতে পারে। এই প্রস্তাব অত্যন্ত অপমানকর। যেন আমাদের দেশে ভাল হেড্ মাষ্টার কেহ কখন হন নাই, এবং এখনও নাই, বা হইতে পারেন না! যে দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ক খ শিখিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পায় না, সেই দেশের টাকার এরূপ অপব্যয় হওয়া কখনই উচিত নয়। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তাহাতে বাধা পড়িবে। স্নেহের আলোকে এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের হাওয়ায় না বাড়িলে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় না। আমাদের দেশী শিক্ষক ও অধ্যাপকদের মধ্যেও অনেকে বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে যথেষ্ট স্নেহ শ্রদ্ধা বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের ভ্রূকুটিতেই অনেক অনিষ্ট হয়। ইহার উপর এক-একজন হেড্ মাষ্টাররূপী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জুটিলে ছাত্রদের মনের উপর সাংঘাতিক চাপ পড়িবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যে-যে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে নিজেদের মত জানাইবেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য উপায় নির্দ্দেশ করিবেন, তাহার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান-নির্দ্দেশ এবং কলেজসকলের স্থান-নির্দ্দেশ, এই দুটি বিষয়েরও উল্লেখ আছে। [illegible] অধ্যাপক ওটেনকে প্রহার সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার ভার যে কমিটির উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহারা বলিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলিকাতা হইতে সরাইয়া ফেলা উচিত। মতলব এই, যে, কোন একটা নিরিবিলি জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ছেলেরা খুব ভাল-মানুষ হইবে। ছেলেরা বড় হইয়া যখন সংসারেরই মানুষ হইবে, সন্ন্যাসী হইবে না, তখন এরূপ ব্যবস্থার ঐকান্তিক প্রয়োজন বুঝা কঠিন। বিলাতের প্রাচীন কেম্ব্রিজ ও অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বড় শহরে স্থাপিত নহে; কিন্তু তাহার পর আধুনিক যত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সবগুলিই মানুষের নানাবিধ কর্ম্মের ক্ষেত্র বড় বড় শহরে অবস্থিত। পৃথিবীর কোন বড় দেশ নাই, যাহার রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয় নাই। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিয়া কেবল মাত্র জ্ঞানচর্চ্চা করিলে তাহার একটা সার্থকতা আছে বটে। কিন্তু ইহা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর অনুপযোগী ব্যবস্থা। এরূপ ব্যবস্থা যাহাদের উপযোগী, তাহাদের জন্য এরূপ শিক্ষাক্ষেত্র থাকুক; কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যাহাতে অভিভাবকদের বাসস্থান বা কর্ম্মস্থান বা অন্য সুবিধাজনক স্থানে থাকিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, প্রধানতঃ তাহারই ব্যবস্থা হওয়া চাই। ইহাও বিবেচ্য, যে, শিক্ষা কেবল পুস্তক, অধ্যাপকের ব্যাখ্যান, বা বিজ্ঞানমন্দির হইতেই হয় না। বহুজনাকীর্ণ লোকালয়ের কারখানা, দোকানআদি বাণিজ্যের নানা উপায়, ট্রাম ষ্টিমার রেলওয়ে প্রভৃতি লোকচলাচলের উপায়, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, জীবনিবাস, হাসপাতাল মিউজিয়াম, চিত্রশালা, বায়োস্কোপ, আদালত, প্রভৃতি হইতেও শিক্ষা হয়। আমরা এগুলিকে শিক্ষার উপায় করি না; বড় বড় আইনব্যবসায়ী, ডাক্তার, বণিক্, এঞ্জিনীয়ার, রেলওয়ের ম্যানেজার, জাহাজের কাপ্তেন, জীবনিবাসের অধ্যক্ষ, মিউজিয়মের অধ্যক্ষ, চিত্রশালার অধ্যক্ষ, বিজ্ঞানশিক্ষোপযোগী উদ্যানের অধ্যক্ষ, প্রভৃতিকে ছাত্রছাত্রীদিগের শিক্ষার সহায় করি না; সেটা আমাদের দোষ। তথাপি বড় বড় শহরের সাধারণ বুদ্ধিমান বিশিষ্ট ছেলেরা না পড়িয়াও যত বিষয় জানে এবং যেরূপ সপ্রতিভ চালাক চতুর হয়, পল্লীগ্রামের অধিকতর বুদ্ধিমান ছেলেরা তাঁহা হয় না।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে একটা নিয়ম আছে যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট শহর ভিন্ন অন্য কোথাও কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাই। আইনের খসড়ায় ত একেবারে ঐ শহরগুলি ছাড়া অন্য কোথাও কলেজ স্থাপন নিষিদ্ধই হইয়াছিল; ইহার বিরুদ্ধে দেশে খুব আন্দোলন হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট অল্প একটু নরম হইয়াছেন। বাংলা দেশেও কি গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিতে

আইন সংযুক্ত আন্দোলনে তাহা বুঝা গিয়াছে। আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে বিস্তর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ আছে। তথাপি সেখানে প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীতে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, এবং ইতিমধ্যেই কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট শহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে তাহা হইলে ছাত্রেরা নিজেদের বাড়ীতে থাকিয়াই অল্প ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা পাইতে পারিবে। ধনশালী শিক্ষাসুযোগবহুল আমেরিকায় এইরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে; সুতরাং দরিদ্র নিরক্ষর যথেষ্ট-শিক্ষালয়-বিহীন ভারতবর্ষে শিক্ষালয় বৃদ্ধির কোন-প্রকার বাধা থাকা উচিত নয়। যেখানে ছাত্র জুটিবে, এবং যেখানকার লোক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহা চালাইতে পারিবে, সেখানেই কলেজ স্থাপিত হইতে দেওয়া উচিত।

ভূগোল ও ইতিহাস না জানিয়া যাহাতে কেহ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না পারে, ভূগোল ও ইতিহাসে অনভিজ্ঞ কেহ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি পাইতে না পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এখন ভূগোল ও ইতিহাস অবশ্যশিক্ষণীয় না থাকায়, দেশ ও কালে যাহারা কূপমণ্ডুক, দেশ ও কালে যাহাদের মানসিক দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ, তাহারাও বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্‌এ, বি-এস্‌সী, পী-এইচ্‌-ডী হইতে পারে। ইহা বড়ই অনিষ্টকর ও লজ্জার বিষয়।

সব ছাত্রছাত্রীরই শিক্ষার ভিত্তিটা মোটামুটি সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া উচিত। তাহার পর তাহাদের কেহ বা বিজ্ঞানে, কেহ বা সাহিত্য ইতিহাস দর্শনাদিতে বিশেষভাবে মন দিতে পারে। কিন্তু এখন যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বাংলাদেশের ইংরেজী স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান শিখাইবার কোনই ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। গবর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসী শিক্ষিত ও সম্পন্নলোকদিগের সহযোগিতায় ইংরেজী স্কুলগুলিতে এবং সমুদয় কলেজের প্রথম দুই শ্রেণীতে সকল ছাত্রেরই কিছু বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের দেশ এখনও বহু বৎসর মধ্যযুগের মধ্যেই পড়িয়া থাকিবে। অবশ্য কোন একটা বিজ্ঞান তন্ন তন্ন করিয়া এই সব ছাত্রকে শিখান যাইবে না, এবং তাহার প্রয়োজনও নাই; যাহাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানান্বেষণ-রীতি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা জন্মে, এরূপ কিছু শিক্ষাই যথেষ্ট। ইহুর সহিত মানব-শারীরতত্ত্ব (human physiology) এবং দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও গৃহের ও গ্রামনগরাদির স্বাস্থ্যরক্ষা (hygiene and sanitation) শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষা দেশভাষার সাহায্যে, না ইংরেজী ভাষার সাহায্যে, হওয়া উচিত, সে বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে ও হইতেছে। ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দেশভাষার সা[হায্যে] শিক্ষা দেওয়া উচিত। নতুবা ভাব চিন্তা জ্ঞান অধি[কাংশ] মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব হইবে না। এই উপায়ে শিক্ষা সহজ হইবে। যদি শক্ত হইত, তাহা হইলেও এই স্বাভ[াবিক] উপায়ই আমরা অবলম্বন করিতে বলিতাম। ইহা না [হইলে] দেশের সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে, পুরুষ ও নারীর [মধ্যে] চিন্তা ভাব ও জ্ঞানের যোগ স্থাপিত হইয়া দেশে এ[কতা] স্থাপিত হইতে পারিবে না। এখন ফল দাঁড়াই[য়াছে] এই, যে, দেশের অল্পসংখ্যক ইংরেজীশি[ক্ষিত] পুরুষেরা এক মানসিক জগতে বাস করেন, বাকী পুরুষেরা ও প্রায় সমুদয় স্ত্রীলোক আর [এক] মানসিক জগতে বাস করেন। সুতরাং আমরা এক [দেশে] ও একসমাজে থাকিয়াও পরস্পরকে চিনি না, [এবং] পরস্পর সম্বন্ধে বিদেশী বা পরদেশী। এই দূর দূর[ত্ব] যে-কোন উপায়ে হউক নষ্ট করিতে হইবে। দেশভ[াষার] সাহায্যে উচ্চতম শিক্ষা পর্য্যন্ত দান, তাহার প্রধান উ[পায়।] এমন সময় ছিল, যখন ইংরেজীতেও সব ভাব, [সব] দার্শনিক তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞান প্রকাশ [করা] যাইত না। ক্রমশঃ ইহার এই বিষয়ে উপযো[গিতা] বাড়িয়াছে। বাংলা ভাষারও বাড়িবে। প্রতিবৎ[সর] যাহাতে বাংলার এই উপযোগিতা বাড়ে ও তাহা স্বী[কৃত] হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই। অন্ত[র্বাণিজ্য,] বহির্বাণিজ্য ও রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ, ভারতের ভিন্ন [ভিন্ন] প্রদেশের লোকের মধ্যে মানসিক আদান প্রদান ও [যোগ-] যোগস্থাপন ও রক্ষণার্থ, বিশ্বমানবের সহিত যোগস্থাপ[ন ও] রক্ষণার্থ, এবং সকল বিষয়ে নব নব জ্ঞানলাভের [জন্য] আমাদিগকে ইংরেজীও শিখিতে হইবে। অতএব ইং[রেজী] ভাষা শিখিবার এবং ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করি[বার] যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা হওয়া চাই।

বিহার, ছোটনাগপুর ও ওড়িষ্যা এখন কলিকাতা [বিশ্ব-] বিদ্যালয়ের এলাকার বাহিরে চলিয়া গেল। ব্রহ্মদেশও [চলিয়া] যাইবে। সিংহল এবং আসামও পরে যাইতে পারে। [এখন] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ বাংলাভাষীদের [বিশ্ব-] বিদ্যালয় হইল। এখন ইহাতে দেশভাষার ব্যবহার বি[স্তার] ও প্রাধান্য স্বীকার আগেকার চেয়ে অনেক সহজ [হইয়া] আসিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিবর্ত্তে শি[ক্ষা-] বিভাগের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার [চেষ্টা] অনেক দিন হইতে চলিতেছে। এই পরিবর্ত্তন অনাব[শ্যক] এবং নানা অনিষ্টের কারণ হইতে পারে।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

২য় সংখ্যা

ছোট ও বড়

যে-সময়ে দেশের লোক তৃষিত চাতকের মত উৎকণ্ঠিত; যে সময়ে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার পর্য্যবেক্ষকেরা খবর দিলেন যে, হোম-রুলের প্রবল মৈসুম-হাওয়া আরবসমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া; ঠিক সেই সময়েই মুষলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা।

অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া মাঝে-মাঝে তুমুল দ্বন্দ্বের কথা শুনি। আমাদের দেশে যে বিরোধ বাধে সে ধর্ম্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্ব্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্ম্ম-বিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই। বর্ত্তমানকালে পশ্চিম মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে বিরোধ বাধে তাহা অর্থ লইয়া। সেখানে খনির শ্রমিকেরা, সেখানে ডক্‌ ও রেলোয়ের কর্ম্মিকেরা মাঝে-মাঝে হুলস্থুল বাধাইয়া তোলে; তাহা লইয়া আইন করিতে হয়, ফৌজ ডাকিতে হয়, আইন বন্ধ করিতে হয়, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। সে দেশে এইরূপ বিরোধের সময় দুই পক্ষ থাকে। এক পক্ষ উৎপাত করে, আরেক পক্ষ উৎপাত নিবারণের উপায় চিন্তা করে। বাঙ্গপ্রিয় কোনো তৃতীয়পক্ষ সেখানে বাহির হইতে ছুয়ো দেয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখের বাসরঘরে শুধু যে বর ও কনের দ্বৈততত্ত্ব তাহা নহে, তৃতীয় একটি কুটুম্বিনী আছেন, অট্টহাস্য এবং কান-মলার কাজে তিনি প্রস্তুত।

ইংলণ্ডে একসময় ছিল, যখন একদিকে তার রাষ্ট্রযন্ত্রটা পাকা হইয়া উঠিতেছে এমন সময়েই প্রটেস্টাণ্ট ও রোমান-ক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সেই দ্বন্দ্বে দুই সম্প্রদায় যে পরস্পরের প্রতি বরাবর সুবিচার করিয়াছে তাহা নহে। এমন কি বহুকাল পর্য্যন্ত ক্যাথলিকরা বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই কাটাইয়াছে। আজও কোনো বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক চার্চ্চের ব্যয়ভার ইংলণ্ডের সমস্ত লোককে বহন করিতে হইতেছে, সেদেশের অন্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি ইহা অন্যায়। অশান্তি ও অসাম্যের এই বাহ্যিক ও মানসিক কারণগুলি আজ ইংলণ্ডে নিরুপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে কেন? যেহেতু সেখানে সমস্ত দেশের লোকে মিলিয়া একটি আপন শাসনতন্ত্র পাইয়াছে। এই শাসনভার যদি সম্পূর্ণ বিদেশীর পরে থাকিত তবে যেখানে জোড় মেলে নাই সেখানে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি বাধিয়া বিচ্ছেদ স্থায়ী হইত। একদিন ব্রিটিশ পলিটিক্সে স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডের বিরোধ কম তীব্র ছিল না। কেননা উভয় জাতির মধ্যে ভাষা, ভাব, রুচি, প্রথা ও ঐতিহাসিক স্মৃতিধারার সত্যকারই পার্থক্য ছিল। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই দ্বন্দ্ব ক্রমে ঘুচিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ঘুচিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজ এবং স্কচ্‌ উভয়েই একটা শাসনতন্ত্র পাইয়াছে যাহা উভয়েরই স্বাধিকারে; যাহাতে সম্পদে বিপদে উভয়েরই শক্তি সমান কাজ করিতেছে। ইহার ফল হইয়াছে এই, যে আজ ইংলণ্ডে স্কটিশ চার্চ্চে ও ইংলিশ

চার্চ্চে প্রভেদ থাকিলেও, রোমানক্যাথলিকে প্রটেস্ট্যান্টে অনৈক্য ঘটিলেও, রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে শক্তির ঐক্যে মঙ্গল-সাধনের যোগে তাহাদের মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের মাথার উপর একটি তৃতীয়পক্ষ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া আপন ইচ্ছামত ইহাদিগকে চালনা করিত, তাহা হইলে কোনো কালেই কি ইহাদের জোড় মিলিত? আয়র্লণ্ডের সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া জোড় মেলে নাই কেন? অনেক দিন পর্য্যন্তই আয়র্লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সাম্য ছিল না বলিয়া।

একথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম্ম লইয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম্ম যত বড় অশান্তির কারণ হয় এমন আর কিছুই না। এই "ডগ্‌মা" অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন করা লইয়া য়ুরোপের ইতিহাস কতবার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম্ম বল, তবে সেটাকে কর্ম্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সেদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্ম্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম্ম আচার-প্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

অল্পদিন হইল রেলগাড়িতে আমার এক ইংরেজ সঙ্গী জুটিয়াছিল। তিনি বেহার অঞ্চলের হাঙ্গামার প্রসঙ্গে গল্প করিলেন—সাহাবাদে কিম্বা কোনো একটা জায়গায় ইংরেজ কাপ্তেন সেখানকার এক জমিদারকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার রায়তদের তোমরা ত ঠেকাইতে পারিলে না! তোমরাই আবার হোমরুল চাও!" জমিদার কি জবাব করিলেন শুনি নাই। সম্ভবত তিনি লম্বা সেলাম করিয়া বলিয়াছিলেন, "না সাহেব, আমরা হোমরুল চাই না, আমরা অযোগ্য অধম! আপাতত আমার রায়তদের তুমি ঠেকাও!" বেচারা জানিতেন হোমরুল তখন সমুদ্র-পারের স্বপ্নলোকে, কাপ্তেন ঠিক সম্মুখেই, আর হাঙ্গামাটা কাঁধের উপর চড়িয়া বসিয়াছে।

আমি বলিলাম, "হিন্দুমুসলমানের এই দাঙ্গাটা হোমরুলের অধীনে ত ঘটে নাই। নিরস্ত্র জমিদারটি অক্ষমতার অপবাদে বোধ করি একবার সেনাপতি সাহেবের ফৌজের দিকে নীরবে তাকাইয়াছিলেন! উপায় রহিল একজনের হাতে আর প্রতিকার করিবে আর-একজনে, এমনতর শ্রমবিভাগের কথা আমরা কোথাও শুনি নাই। বাংলা-দেশেও ঠিক স্বদেশী উত্তেজনার সময়, শুধু জামালপুরের মত মফস্বলে নয়, একেবারে কলিকাতার বড়বাজারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের উপদ্রব প্রচণ্ড হইয়াছিল—সেটা ত শাসনের কলঙ্ক, শুধু শাসিতের নয়। এইরূপ কাণ্ড যদি সদাসর্ব্বদা নিজামের হাইদ্রাবাদে বা জয়পুর বরোদা মৈশূরে ঘটিতে থাকিত তবে সেনাপতি সাহেবের জবাব খুঁজিবার জন্য আমাদের ভাবিতে হইত।"

আমাদের নালিশটাই যে এই। কর্ত্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই, কর্ত্তা বাহির হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। ইহাতে আমরা ক্রমশই অন্তরের মধ্যে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতেছি; সেজন্য উল্টিয়া কর্ত্তারাই আমাদিগকে অবজ্ঞা করিলে ভয়ে-ভয়ে আমরা জবাব দিই না বটে, কিন্তু মনে-মনে যে ভাষা প্রয়োগ করি তাহা সাধু নহে। কর্ত্তৃত্ব যদি থাকিত তবে তাহাকে বজায় রাখিতে ও সার্থক করিতে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই সমান গরজ থাকিত, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার দায়িত্ব সকলে মিলিয়া অতি সাবধানে বহন করিতে হইত। এমনি করিয়া শুধু আজ নহে চিরদিনের মত ভারতবর্ষের পোলিটিকাল আশ্রয় নিজের

ভিত্তিতে পাকা হইত। কিন্তু এমন যদি হয়, যে, একদিন ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্ত্তনকালে যাইবার বেলায় ইংরেজ তার সুশাসনের ভগ্নাবশেষের উপর রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণ-সাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নর-নারীকে,—রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নবউদ্যমে জাগ্রত, নবশিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী, তবে আমাদের সেই চিরদৈন্য-পীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকে আমরা দায়ী করিব? আর যদি কল্পনাই করা যায় যে, মানবের পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাসের মাঝখানে এক-মাত্র ভারতে ইংরেজসাম্রাজ্যের ইতিহাসই ধ্রুব হইয়া অনন্ত ভবিষ্যৎকে সদর্পে অধিকার করিয়া থাকিবে, তবে এই কি আমাদের ললাটের লিখন যে, ভারতের অধিবাসীরা চিরকাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দেশের কল্যাণকর্ম্মবন্ধনের কোনো যোগ থাকিবে না; চিরদিনের মতই তাহাদের আশা ক্ষুদ্র, তাহাদের শক্তি অব-রুদ্ধ, তাহাদের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, তাহাদের ভবিষ্যৎ পরের ইচ্ছার পাষাণপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত?

এ পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজত্বে আমরা এক শাসন পাইয়াছি কিন্তু এক-দায়িত্ব পাই নাই। তাই আমাদের ঐক্য বাহিরের। এ ঐক্যে আমরা মিলি না, পাশে-পাশে সাজানো থাকি, বাহিরে বা ভিতরে একটু ধাক্কা পাইলেই ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়। এ ঐক্য জড় অকর্ম্মক, ইহা সজীব সকর্ম্মক নয়। ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক মাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য, ইহা সজাগ মানুষের একপথে চলিবার ঐক্য নহে। ইহাতে আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই; সুতরাং ইহা আনন্দ করিবার নহে; ইহাতে কেবল স্তুতি করিতে পারি, নতি করিতে পারি, উন্নতি করিতে পারি না।

একদিন আমাদের দেশে যে সমাজ ছিল তাহা সাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্বের আদর্শকে সচেষ্ট রাখিয়াছিল। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ, তখন আমাদের জন্ম-গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম। তা হউক্, সেই ছোট সীমার মধ্যে ধনীর দায়িত্ব ছিল তার ধন লইয়া, জ্ঞানীর দায়িত্ব ছিল তার জ্ঞান লইয়া। যার যা শক্তি ছিল তার উপরে চারিদিকের দাবী ছিল। সচেষ্ট জীবনের এই যে নানাদিকে বিস্তার, ইহাতেই মানুষের যথার্থ আনন্দ ও গৌরব।

আমাদের সেই দায়িত্ব সমাজ হইতে বাহিরে সরিয়া গেছে। একমাত্র সরকার-বাহাদুরই আমাদের বিচার করেন, রক্ষা করেন, পাহারা দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, শাস্তি দেন, সম্মান দেন, সমাজে কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু আদালত হইতে তার বিধান দেন, মদের ভাঁটির বন্দোবস্ত করেন এবং গ্রামের লোককে বাঘে ধরিয়া খাইতে থাকিলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সবান্ধবে শিকার করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। সুতরাং এখন আমাদের সমাজ আমাদের উপর যে-পরিমাণে ভার চাপাইয়াছে সে-পরিমাণে ভার বহিতেছে না। ব্রাহ্মণ এখনো দক্ষিণা আদায় করেন কিন্তু শিক্ষা দেন না, ভূস্বামী খাজনা শুষিয়া লন কিন্তু তাঁর কোনো দেয় নাই, ভদ্রসম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ হইতে সম্মান লন কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না। ক্রিয়াকর্ম্মে খরচপত্র বাড়িয়াছে বই কমে নাই, অথচ সেই বিপুল অর্থব্যয় সমাজব্যবস্থাকে ধারণ ও পোষণের জন্য নয়, তাহা রীতিরক্ষা ও সমারোহ করিবার জন্য। ইহাতে দেশের ধনীদরিদ্র সকলেই পীড়া বোধ করে। এদিকে দলাদলি, জাতে ঠেলাঠেলি, পুঁথির বিধান বেচাকেনা প্রভৃতি সমস্ত উৎপীড়নই আছে। যে গাভীর বাঁধাখোরাক জোগাইতেছি সে দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধ করিল, কিন্তু বাঁকা শিঙের গুঁতা মারাটা তার কমে নাই।

যে-ব্যবস্থা সমাজের ভিতরে ছিল সেটা বাহিরে আসিয়া পড়াতে সুব্যবস্থা হইল কি না সেটা লইয়া তর্ক নয়। মানুষ যদি কতকগুলা পাথরের টুক্‌রা হইত তবে তাহাকে কেমন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ সাজাইয়া কাজে লাগানো যায় সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা হইত। কিন্তু মানুষ যে মানুষ। তাকে বাঁচিতে হইবে, বাড়িতে হইবে, চলিতে হইবে। তাই একথাটা মানিতেই হইবে যে, দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিয়া যে নিরানন্দের জড় ভার দেশের বুকে চাপিয়া বসিতেছে সেটা শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, সেটা রাষ্ট্রনীতি হিসাবে নিন্দনীয়। আমরা যে অধিকার চাহিতেছি তাহা ঔদ্ধত্য করিবার বা প্রভুত্ব করিবার অধিকার নহে; আমরা সকল ক্ষুধাতুরকে ঠেকাইয়া জগৎ-

সংসারটাকে একলা তুলিয়া লইবার জন্য বাঁধা লাঠি কাঁধে লইতে চাই না; যুদ্ধে নরঘাত সম্বন্ধে বিশ্বের সকলের চেয়ে বড় শক্তি, বড় উদ্যোগ ও বড় উৎসাহ রাখি বলিয়া সয়তানকে লজ্জা দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই; নিরীহ হিন্দু বলিয়া প্রবল পশ্চিম আমাদের উপরে যে-শ্লেষ প্রয়োগ করে তাহাকেই তিলক করিয়া আমাদের ললাটকে আমরা লাঞ্ছিত রাখিব—; আধ্যাত্মিক বলিয়া আমাদের আধুনিক শাসনকর্তারা আমাদের পরে যে কটাক্ষবর্ষণ করিয়াছেন তারই শরশয্যায় শেষ পর্য্যন্ত শয়ান থাকিতে আমরা দুঃখ বোধ করিব না,—আমরা কেবলমাত্র আপন দেশের সেবা করিবার, তার দায়িত্বগ্রহণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার চাই। এই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আশাহীন অকর্ম্মণ্যতার দুঃখ ভিতরে-ভিতরে অসহ্য হইয়াছে। এইজন্যই সম্প্রতি জন-সেবার জন্য আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাই। নিরাপদ শান্তির আওতায় মানুষ বাঁচে না; কেননা যেটা মানুষের অন্তরতম আবেগ তাহা বাড়িয়া চলিবার আবেগ। মহৎলক্ষ্যের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়া দুঃখ স্বীকার করাই সেই বাড়িয়া চলিবার গতি। সকল বড় জাতির ইতিহাসেই এই গতির দুর্নিবার আবেগ ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলবন্ধুর পথে গর্জ্জিয়া ফেনাইয়া, বাধা ভাঙিয়া চুরিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসের সেই মহৎদৃশ্য আমাদের মত পোলিটিকাল পঙ্গুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখা অসম্ভব। এইজন্য যে-সব যুবকের প্রকৃতিতে প্রাণের স্বাভাবিক উত্তেজনা আছে, মহতের উপদেশ ও ইতিহাসের শিক্ষা হইতে প্রেরণালাভ করা সত্ত্বেও *নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাদের কাছে যে, মৃত্যুর চেয়ে দারুণতর, সে কথা আত্মহত্যাকালে শচীন্দ্র দাসগুপ্তের* মর্ম্মান্তিক বেদনার পত্রখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু কেবল ক্ষণে-ক্ষণে বন্যাদুর্ভিক্ষের নৈমিত্তিক উপলক্ষ্যে অন্তর্গূঢ় সমস্ত শুভচেষ্টা নির্ম্মুক্ত হইতে পারে না। দেশব্যাপী নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই মানুষের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রভাবে সফল হয়। নতুবা তার অধিকাংশই বদ্ধ হইয়া আন্তরিক নৈরাশ্যের উত্তাপে বিকৃত হইতে থাকে। এই বিকার হইতে দেশে নানা গোপন উপদ্রবের সৃষ্টি। এইজন্য দেখা যায় দেশের ধর্ম্মবুদ্ধি ও শুভচেষ্টার প্রতিই কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ সুতীব্র। যে লোক স্বার্থপর বেইমান, যে উদাসীন নিশ্চেষ্ট, বর্ত্তমানের গুপ্ত ব্যবস্থায় তারই জীবনযাত্রা সকলের চেয়ে নিরাপদ, তারই উন্নতি ও পুরস্কারের পথে সকলের চেয়ে বাধা অল্প। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষার জবাবদিহি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। কেননা সন্দিগ্ধের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন যে, "মহৎ অধ্যবসায়ে তোমার দরকার কি? তুমি খাইয়া দাইয়া বিয়া-থাওয়া করিয়া আপিসে আদালতে ঘুরিয়া মোটা বা সরু মাহিনায় যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পার, তখন ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতে যাও কেন?" বস্তুত কর্ত্তৃপক্ষ জানেন, এই আলো এবং ঐ ধোঁয়া একই কারণ হইতে উঠিতেছে। সে কারণটা, নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ হইতে দেশের শুভবুদ্ধির মুক্ত হইবার চেষ্টা। ন্যায়শাস্ত্রে বলে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।" গুপ্তচরের যুক্তি বলে, "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ।" কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক্, মাটির তলায় ঐ যে দারুণ সুড়ঙ্গপথ খোলা হইল, যেখানে আলো নাই, শব্দ নাই, বিচার নাই, নিষ্কৃতির কোনো বৈধ উপায় নাই, এইটেই কি সুপথ হইল? দেশের ব্যাকুল চেষ্টাকে বিনা বাছনিতে একদমে কবরস্থ করিলে তার প্রেতের উৎপাতকে কি কোনোদিন শান্ত করিতে পারিবে? ক্ষুধার ছটফটানিকে বাহির হইতে কানমলা দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া চিরদুর্ভিক্ষকে ভদ্র আকার দান করাই যে যথার্থ ভদ্রনীতি এমন কথা ত বলিতে পারিই না, তাহা যে বিজ্ঞনীতি তাহাও বলা যায় না।

এই-রকম চোরা উৎপাতের সময় সমুদ্রের ওপার হইতে খবর আসিল আমাদিগকে দান করিবার জন্য স্বাধীনশাসনের একটা খসড়া তৈরি হইতেছে। মনে ভাবিলাম কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, শুধু দমনের বিভীষিকায় অশান্তি দূর হয় না, দাক্ষিণ্যেরও দরকার। দেশ আমার দেশ, সে ত কেবল এখানে জন্মিয়াছি বলিয়াই নয়, এদেশের ইতিহাস-সৃষ্টি-ব্যাপারে আমার তপস্যার উপরে সমস্ত দেশের দাবী আছে বলিয়াই এদেশ আমার দেশ, এই গভীর মমত্ববোধ যদি দেশের লোক অনুভব করিবার উৎসাহ পায় তবেই এদেশে ইংরেজরাজত্ব অন্তরেবাহিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশকে অক্ষম দুর্ব্বল অকিঞ্চন এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অনাসক্ত করিয়া রাখিলে সঙ্কটের সময়

তার সাহায্য নগণ্য হয় অথচ তার ভার দুঃসহ হইয়া উঠে। তা ছাড়া নিরতিশয় দুর্ব্বলেরও প্রতিকূলতা নৌকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মত। শান্তির সময় নিরন্তর জল সেঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়, কিন্তু তুফানের সময় যখন সকল হাতই দাঁড়ে হালে পালে আটক থাকে তখন তলার অতিতুচ্ছ ফাটলগুলিই মুস্কিল বাধায়। রাগ করিয়া তার উপরে পুলিসের রেগুলেশন বা নন্-রেগুলেশন লাঠি ঠুকিলে ফাটল কেবল বাড়িতেই থাকে। ফাঁকগুলিকে বুজাইবার জন্য সময়মত সামান্য খরচ করিলে কালক্রমে অসামান্য খরচ বাঁচে। এই কথা যে ইংলণ্ডের মনীষী রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না তাহা আমি মনে করি না। বুঝিতেছেন বলিয়াই হোমরুলের কথাটা উঠিয়াছে।

কিন্তু রিপু অন্ধ; সে উপস্থিত কালকেই বড় করিয়া দেখে, অনাগতকে উপেক্ষা করে। ধর্ম্মের দোহাইকে সে দুর্ব্বলতা এবং সৌখীন ভাবুকতা বলিয়া অবজ্ঞা করে। অভাবনীয় প্রত্যাশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ইংরেজের এই রিপুর কথাটাকে ভারতবর্ষ সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। যে সমস্ত ইংরেজ এদেশে রাজসেরেস্তার আমলা বা পণ্যজীবী, তাহারা ভারতবর্ষের অত্যন্ত বেশি নিকটে আছে। এই নিকটের দৃশ্যের মধ্যে তাদেরই প্রতাপ, তাদেরই ধনসঞ্চয় সকলের চেয়ে সমুচ্চ, আর ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষ তাদের সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া ছায়ার মত অস্পষ্ট, অবাস্তব ও ম্লান। এই কাছের ওজনে, এই উপস্থিতকালের মাপে ভারতবর্ষের দাবী ইহাদের কাছে তুচ্ছ। তাই যে কোনো বরের প্রভাবে ভারতবর্ষ কিছুমাত্র আত্মশক্তি লাভ করিবে তাহা ক্ষীণ হইয়া, খণ্ডিত হইয়া, রক্তশূন্য হইয়া আমাদের কাছে পৌঁছিবে অথবা অর্দ্ধপথে অপঘাতমৃত্যুতে মরিয়া ভারতভাগ্যের মরুপথকে ব্যর্থ সাধুসঙ্কল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।

এই বাধা-দিবার শক্তি যারা বহন করিতেছে অব্যাহত প্রতাপের মদের নেশায় তারা মাতোয়ারা, সাম্প্রদায়িক কঠিন সংস্কারের স্তরসঞ্চিত আবরণে তাহাদের মন ভারতবর্ষের মানুষসংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষ ইহাদের কাছে একটা অতিপ্রকাণ্ড সরকারী বা সওদাগরী আপিস। এদিকে ইংলণ্ডের যে ইংরেজ আমাদের ভাগ্যনায়ক তার রক্তের সঙ্গে ইহাদের রক্তের মিল, তার হাতের উপর ইহাদের হাত, তার কানের কাছে ইহাদের মুখ, তার মন্ত্রণাগৃহে ইহাদের আসন, তার পোলিটিকাল নাট্যশালার নেপথ্যবিধান-গৃহে ইহাদের গতিবিধি। ভারতবর্ষ হইতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে হইতে ইংলণ্ডের ইংরেজসমাজের পরতে পরতে ইহারা মিশিয়াছে; সেখানকার ইংরেজের মনস্তত্ত্বকে ইহারা গড়িয়া তুলিতেছে। ইহারা নিজের পক্ককেশের শপথ করে, অভিজ্ঞতার দোহাই পাড়ে এবং "আমরাই ভারত-সাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি" এই বলিয়া ইহারা অপরিমিত প্রশ্রয় দাবী করে। এই অভ্রভেদী অভিমানের ছায়ান্তরালে আমাদের ভাষা, আমাদের আশা, আমাদের অস্তিত্ব কোথায়? ইহাকে উত্তীর্ণ হইয়া, আপিসের প্রাচীর ডিঙাইয়া, ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া দেখিতে পায় এমন অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি কার কাছে প্রত্যাশা করিব?

যে দূরবর্ত্তী ইংরেজ য়ুরোপীয় আবহাওয়ার মধ্যে আছে বলিয়াই অন্ধস্বার্থের কুহক কাটাইয়া ভারতবর্ষকে উদার-দৃষ্টিতে দেখিতে পায় ইহারা তাহাদিগকে জানায়, যে, নীচের আকাশের ধূলানিবিড় বাতাসের মধ্য দিয়া দেখাই বাস্তবকে দেখা, উপরের স্বচ্ছ আকাশ হইতে দেখাই বস্তুতন্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতশাসনে দূরের ইংরেজের হস্তক্ষেপ করাকে ইহারা স্পর্দ্ধিত অপরাধ বলিয়া গণ্য করে। ভারতবাসীকে এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজ বলিয়া যে একটি মহৎ-জাতি আছে প্রকৃতপক্ষে সেই যে ভারতশাসন করিতেছে তাহা নহে; ভারত-দফতরখানার বহুকালক্রমাগত সংস্কারের এসিডে কাঁচাবয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে একটি আমলাসম্প্রদায় আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রজা। যে-মানুষ তার সমস্ত মন-প্রাণ-হৃদয় লইয়া মানুষ সে নয়, যে-মানুষ কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের মাপে মানুষ সেই ত কৃত্রিম মানুষ। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ বলিতে পারি। সেই ক্যামেরা খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, তাহা চলতিকে দেখে না, যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে দেখে না। এইজন্য বলা যায় যে, ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে। সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ আছে বলিয়া তাহার দেখা কোনো আংশিক প্রয়োজনের পক্ষে যত অসম্পূর্ণ হোক মানুষের

সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যবহারক্ষেত্রে তাহাই সম্পূর্ণতর। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চোখের বদলে আমাদিগকে ক্যামেরা দেন নাই। কিন্তু হায় ভারতশাসনে তিনি এ কি দিলেন? যে বড় ইংরেজ ষোলো আনা মানুষ, আমাদের ভাগ্যে সে থাকে সমুদ্রের ওপারে, আর এপারে পাড়ি দিতেই প্রয়োজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো আনা ছাঁটিয়া সে এতটুকু ছোট হইয়া বাহির হইয়া আসে। সেই এতটুকুর পরিমাণ কেবল সেইটুকু যাতে বাড়তির ভাগ কিছুই নাই, অর্থাৎ মানুষের যেটা স্বাদ গন্ধ লাবণ্য, যেটা তার কমনীয়তা ও নমনীয়তা, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা নিজেও বাড়িতে থাকে অন্যকেও বাড়াইতে থাকে, সে সমস্তই কি বাদ পড়িল? এই ছোট-খাটো ছাঁটা-ছোঁটা ইংরেজ কোনোমতেই বুঝিতে পারে না এমন অত্যন্ত দামী ও নিখুঁৎ ক্যামেরা পাইয়াও সজীব চোখের চাহনির জন্য ভিতরে-ভিতরে আমাদের এত তৃষ্ণা কেন? বোঝে না তার কারণ, কলে ছাঁট পড়িবার সময় ইহাদের কল্পনাবৃত্তি যে বাদ পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের সরকারী অনাথ-আশ্রমে যারা থাকে তাদের মন কেন পালাই-পালাই এবং প্রাণ কেন ত্রাহি-ত্রাহি করে? কেননা ঐ workhouse সম্পূর্ণ ঘরও নয়, সম্পূর্ণ বাহিরও নয়। উহা আত্মীয়তাও দেয় না, মুক্তিও দেয় না। উহা কড়ায়গণ্ডায় হিসাব করিয়া কেবলমাত্র আশ্রয় দেয়। আশ্রয়টা অত্যন্ত দরকারী বটে, কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষ সেইজন্য সে ঘরকে চায়, অর্থাৎ দরকারের সঙ্গে বহুল পরিমাণে অ-দরকারকে না পাইলে সে বাঁচে না। নহিলে সে অপমানিত হয়, সুবিধা সুযোগ ফেলিয়াও সে পালাইতে চেষ্টা করে। অনাথ-আশ্রমের কড়া কার্য্যাধ্যক্ষ এই অকৃতজ্ঞতায় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয় এবং কেবল তার ক্রোধের দ্বারাই দুঃখকে দমন করিবার জন্য সে দণ্ডধারণ করে। কেননা, এই কার্য্যাধ্যক্ষ পুরা মানুষ নয়, ইহার পুরা দৃষ্টি নাই, এই ছোট মানুষ মনে করে দুর্ভাগা ব্যক্তি কেবলমাত্র আশ্রয়ের শান্তিটুকুর জন্য মুক্তির অসীম আশায় ব্যাকুল আপন আত্মাকে চিরদিনের মতই বণিকের ঘরে বাঁধা রাখিতে পারে।

বড় ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না—সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোট ইংরেজকে। এইজন্য বড় ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্য ইতিহাসের ইংরেজি পুঁথিতে, এবং ভারতবর্ষ বড় ইংরেজের কাছে আপিসের দপ্তরে এবং জমাখরচের পাকা খাতায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার কাছে স্তূপাকার ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সের সমষ্টি। সেই ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সে দেখা যায় কত আমদানি, কত রপ্তানি; কত আয় কত ব্যয়; কত জন্মিল কত মরিল; শান্তিরক্ষার জন্য কত পুলিস, শাস্তি দিবার জন্য কত জেলখানা; রেলের লাইন কত দীর্ঘ, কলেজের ইমারত কয় তলা উচ্চ। কিন্তু সৃষ্টি ত শুধু নীলাকাশ-জোড়া অঙ্কের তালিকা নয়। সেই অঙ্কমালার চেয়ে অনেক বেশির হিসাবটা ভারত-আপিসের কোনো ডিপার্টমেণ্ট দিয়া কোনো মানবজীবের কাছে গিয়া পৌঁছায় না।

এ কথা বিশ্বাস করিতে যত বাধাই থাক্ তবু আমাদের দেশের লোকের ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বড় ইংরেজ বলিয়া একটা বড় জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে। প্রবলের প্রতি দুর্ব্বল যে অবিচার করে তাহাতে তার দুর্ব্বলতারই পরিচয় হয়—সেই দীনতা হইতে মুক্ত থাকিলেই আমাদের গৌরব। একথা শপথ করিয়া বলা যায় যে, এই বড় ইংরেজ সর্ব্বাংশেই মানুষের মত। ইহাও নিশ্চিত যে, জগতের সকল বড় জাতিই যে-ধর্ম্মের বলে বড় হইয়াছে ইংরেজও সেই বলেই বড়; অত্যন্ত রাগ করিয়াও একথা বলা চলিবে না যে সে কেবল তলোয়ারের ডগায় ভর করিয়া উঁচু হইয়াছে কিম্বা টাকার থলির উপরে চড়িয়া। কোনো জাতিই টাকা করিতে কিম্বা লড়াই করিতে পারে বলিয়াই ইতিহাসে গৌরব লাভ করিয়াছে একথা অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যত্বে বড় না হইয়াও কোনো জাতি বড় হইয়াছে এ কথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিস্‌মিস্ করা যাইতে পারে। ন্যায়, সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজজাতির অন্তরের আদর্শ। সেই আদর্শ ইহাদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে নানা আকারে ও অধ্যবসায়ে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আজিকার মহাযুদ্ধেও সেই আদর্শ তাহাদিগকে শক্তিদান করিতেছে।

এই বড় ইংরেজ স্থির নাই, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্ত্তন ও প্রসার ঘটিতেছে। সে কেবল তার রাষ্ট্র এবং বাণিজ্য লইয়া নয়,

তার শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্ম ও সমাজ লইয়া পূর্ণ প্রবাহে চলিয়াছে। সে সৃজনধর্ম্মী; য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরাট যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা। বর্ত্তমান যুদ্ধের মহৎশিক্ষা তার চিত্তকে প্রতি মুহূর্ত্তে আন্দোলিত করিতেছে। মৃত্যুর উদার বৈরাগ্য-আলোকে সে মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইল। সে দেখিল অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতিকূলে স্বাজাত্যের আত্মাভিমানকে একান্ত করিয়া তুলিবার অনিবার্য্য দুর্য্যোগটা কি? সে আজ নিজের গোচরে বা অগোচরে প্রত্যহ বুঝিতেছে, যে, স্বজাতির যিনি দেবতা সর্ব্বজাতির দেবতাই তিনি, এইজন্য তাঁহার পূজায় নরবলি আনিলে একদিন রুদ্র তাঁর প্রলয়রূপ ধারণ করেন। আজ যদি সে নাও বুঝিয়া থাকে, একদিন সে বুঝিবেই যে, হাওয়া যেখানেই পাংলা, ঝড়ের কেন্দ্রই সেই জায়গাটায়—কেননা চারিদিকের মোটা হাওয়া সেই ফাঁক দখল করিতেই ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি পৃথিবীর যে-সব দেশ দুর্ব্বল, সবলের দ্বন্দ্বের কারণ সেখানেই; লোভের ক্ষেত্র সেখানেই; মানুষ সেখানে আপন মহৎস্বরূপে বিরাজ করে না; মানুষ প্রত্যহই সেখানে অসতর্ক হইয়া আপন মনুষ্যত্বকে শিথিল করিয়া ত্যাগ করিতে থাকে। সয়তান সেখানে আসন জুড়িয়া ভগবানকে দুর্ব্বল বলিয়া বিদ্রূপ করে। বড় ইংরেজ একথা বুঝিবেই, যে, বালির উপর বাড়ি করা চলে না, একের শক্তিহীনতার উপরে অপরের শক্তির ভিত্তি কখনই পাকা হইতে পারে না।

কিন্তু ছোটইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না। যে-দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দেশের সঙ্গে সে আপনি বাঁধা। তার জীবনের এক পিঠ আপিস, আরেক পিঠে আমোদ। যে-পিঠে আপিস সে-পিঠে সে ভারতের বহু কোটি মানুষকে রাষ্ট্রিকের রাজদণ্ডের বা বণিকের মানদণ্ডের ডগাটা দিয়া স্পর্শ করে, আর যে-পিঠে আমোদ সে-পিঠটা চাঁদের পশ্চাদ্দিকের মত, বৎসরের পর বৎসর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তবু কেবলমাত্র কালের অঙ্কপাত হিসাব করিয়া ইঁহারা অভিজ্ঞতার দাবী করে। ভারত-অধিকারের গোড়ায় ইঁহারা সৃজনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর বহুদীর্ঘকাল ইঁহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে। নিরন্তর রুটিনের ঘানি টানিয়া ইঁহারা বিষয়ীলোকদের পাকা প্রকৃতি পাইয়াছে, সেই প্রকৃতি কঠিন অসাড়তাকেই বল বলিয়া থাকে। তারা মনে করে তাদের আপিসটা সুনিয়মে চলিতেছে এইটেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘটনা; কিন্তু আপিসের জানলার বাহিরে রাস্তার ধূলার উপর দিয়া বিশ্বদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতি দীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন সেই চালনাকে তারা অশ্রদ্ধা করে। অক্ষমের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া একথা তারা ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে যেমন তারা বর্ত্তমানের মালিক তেমনি তারা ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। আমরা এখানে আসিয়াছি এই কথা বলিয়াই তারা চুপ করে না, আমরা এখানে থাকিবই এই কথা বলিয়া তারা স্পর্দ্ধা করে।

অতএব, ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা, বড় ইংরেজের কাছ হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে কেবল এই আশাটাকে বুকে করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অত বেশি কলরব করিতে-করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকেও মনে রাখিয়ো যে, ভারত-সাগরের তলায়-তলায় ছোট ইংরেজের "মাইন্" স্থির বাঁধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে তোমার ভাগ্যে জাহাজের যে ভাঙা কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনের অন্ত্যেষ্টিসংস্কারের কাজে লাগিতে পারে। তারপরে জাহাজের দুঃসাহসিক কাপ্তেনটি লোনাজলে পেট ভরাইয়া দেশে ফিরিতে পারিলেই আমাদের অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।

বড় ইংরেজের দাক্ষিণ্যকেই চরম সম্পদ গণ্য করিয়া দেখিতে পাই আমাদের লোকে চড়া চড়া কথায় ছোট ইংরেজের মুখের উপর জবাব দিতে সুরু করিয়াছেন। ছোট ইংরেজের জোর যে কতটা সেটা খেয়াল করিতেছেন না। ভুলিয়াছেন মাঝখানের পুরোহিতের মামুলি বরাদ্দের পাওনা উপরের দেবতার বরকে বিকাইয়া দিতে পারে। এই মধ্যবর্ত্তীর জোর কতটা এবং ইঁহাদের মেজাজটা কি ধরণের সে কি বারে বারে দেখি নাই? দৃষ্টান্তগুলো একবার আবৃত্তি করিয়া দেখা যাক্। ধরিয়া লও,আনি বেসান্ট অপরাধী। কিন্তু আনি বেসান্ট্‌কে বড় ইংরেজ ক্ষমা করিয়াছেন। ছোট ইংরেজ তাই লইয়া আজও গর্জ্জাইতেছে। অপ্রিয় হইলেও accomplished factকে

শেলের মত বুকে বিঁধাইয়া গোপালের মত চুপ করিয়া থাকিতে মর্লি আমাদিগকে পার্টিশেনের সময় উপদেশ দিয়াছিলেন। ছোট ইংরেজকে ইস্কুল-মাষ্টারের গম্ভীর গলায় সে-উপদেশ দিতে কেহ সাহসই করে না। তাই তাঁরা এই ক্ষমার কথা লইয়া পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত ক্ষণে-ক্ষণে ভূমিকম্প বাধাইতেছেন। ইঁহারা ক্ষমা করার অপরাধ কোনোমতেই ভুলিতে পারেন না, কিন্তু নির্ব্বিচারে শাস্তি দিবার জন্য ইঁহারা কারো কৈফিয়ৎ তলব করেন না। তাঁরা বলেন শাস্তি যখন দেওয়া হইয়াছে তখন ধরিয়া লইতে হইবে অপরাধ আছেই। যে তাহাতে আপত্তি করে সে extremist। আবার দেখ, পাঞ্জাবের ছোটলাট বড়লাট-সভার রাজতক্তের পাশে দাঁড়াইয়া ভারতের প্রজাদের সম্বন্ধে মুখ সামলাইয়া কথা কহেন নাই, সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ খুব মৃদুস্বরে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহারই খেদ ছোট-ইংরেজ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। অথচ মণ্টেগু সাহেব তাঁর বর্ত্তমান পদপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ভারত-আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে দুই-চারটে স্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন, তাই লইয়া কেবল যে গালি-গালাজের সাইক্লোন বহিতেছে তা নয়, মণ্টেগু সাহেবের যুক্তি ও স্বাধীনতার চূড়া ভাঙিয়া গিয়াছে। ছোট ইংরেজের জোর কত সেটা যে কেবল আমরা লর্ড রিপনের এবং কিছু পরিমাণে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দেখিলাম তাহা নহে, আর-একদিন লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলেও দেখা গেছে।

তাই দেশের লোককে বারবার বলি "কিসের জোরে স্পর্দ্ধা কর? গায়ের জোর? তাহা তোমার নাই। কণ্ঠের জোর? তোমার যেমনি অহঙ্কার থাক্ সেও তোমার নাই। মুরুব্বির জোর? সেও ত দেখি না। যদি ধর্ম্মের জোর থাকে তবে তারই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রাখ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ পাইবার মহৎ অধিকার হইতে কেহ তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, লোক-শ্রেয়ের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার গৌরব দুর্গম-পথের প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বর যদি পাই তবে অন্তর্যামীর কাছ হইতে পাইব।"

দেখ নাই কি, বরদানের সঙ্কল্পব্যাপারে ভারত-গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম বিভাগের যোগ আছে শুনিয়া এদেশী ইংরেজের সংবাদপত্র অট্টহাস্যে প্রশ্ন করিতেছে, "ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটল নাকি? এমনি কি উৎপাতের কারণ ঘটিয়াছে যে বজ্রপাত-ডিপার্টমেণ্ট হইতে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের আয়োজন হইতেছে?" অথচ আমাদের ইস্কুলের কচি ছেলেগুলোকে পর্য্যন্ত ধরিয়া যখন দলে-দলে আইনহীন রসাতলের নিরালোকধামে পাঠানো হয় তখন ইঁহারাই বলেন, "উৎপাত এত গুরুতর যে, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের আইন হার মানিল, মগের মুল্লুকের বেআইনের আমদানি করিতে হইল।" অর্থাৎ মারিবার বেলায় যে আতঙ্কটা সত্য, মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়। কেননা মারিতে খরচ নাই, মলম লাগাইতে খরচা আছে। কিন্তু তাও বলি, মারিবার খরচার বিল কালে মলমের খরচার চেয়ে বড় হইয়া উঠিতে পারে। তোমরা জোরের সঙ্গে ঠিক করিয়া আছ যে, ভারতের যে-ইতিহাস ভারতবাসীকে লইয়া, সেটা সামনের দিকে বহিতেছে না; তাহা ঘূর্ণির মত একটা প্রবল কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিতে-ঘুরিতে তলার মুখেই ঝুঁকিতেছে। এমন সময় আপিস হইতে বাহির হইবার কালে হঠাৎ একদিন দেখিতে পাও স্রোতটা তোমাদের নক্সার রেখা ছাড়াইয়া কিছুদূর আগাইয়া গেছে। তখন রাগিয়া গর্জ্জাইতে-গর্জ্জাইতে বল, পাথর দিয়া বাঁধো উহাকো, বাঁধ দিয়া উহাকে ঘেরো। প্রবাহ তখন পথ না পাইয়া উপরের দিক হইতে নীচের দিকে তলাইতে থাকে—সেই চোরা প্রবাহকে ঠেকাইতে গিয়া সমস্ত দেশের বক্ষ দীর্ণ-বিদীর্ণ করিতে থাক।

আমার সঙ্গে এই ছোট-ইংরেজের যে-একটা বিরোধ ঘটিয়াছিল সে-কথা বলি। বিনাবিচারে শত শত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে একখানি ছোট চিঠি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে ভারতজাবা কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল। ইঁহারা ভারতশাসনের তক্‌মাহীন সচিব, সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা ইঁহাদের পক্ষে অনাবশ্যক, অতএব আমি ইঁহাদিগকে ক্ষমা করিব। এমন কি, আমাদের দেশের লোক, যাঁরা বলেন আমার পদ্যেও অর্থ নাই গদ্যেও বস্তু নাই, তাঁদের মধ্যেও যে-দুইএকজন ঘটনাক্রমে আমার লেখা

পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তত একথাটুকু কবুল করিতেই হইবে যে, স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে-ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনই শেষ পর্য্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ঙ্কর ভারী হইয়া উঠে। সে যাই হোক্, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালীতেই হোক্ না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই extremism বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সেকথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি, সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, extremism গবর্মেণ্টের নীতিতেও অপরাধ। আইনের রাস্তা বাঁধা-রাস্তা বলিয়া মাঝে-মাঝে তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বেল্‌জিয়মের বুকের উপর দিয়া সোজা হাঁটিয়া রাস্তা সংক্ষেপ করার মত extremism কাহাকেও শোভা পায় না।

ইংরেজিতে যাকে short cut বলে আদিম কালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল। "লে আও, উস্‌কো শির লে আও" এই প্রণালীতে গ্রন্থি খুলিবার বিরক্তি বাঁচিয়া যাইত, এককোপে গ্রন্থি কাটা পড়িত। য়ুরোপের অহঙ্কার এই যে, সে আবিষ্কার করিয়াছে এই সহজ প্রণালীতে গ্রন্থি কাটা পড়ে বটে কিন্তু মালের গুরুতর লোকসান ঘটে। সভ্যতার একটা দায়িত্ব আছে, সকল সঙ্কটেই সে-দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়বিচারপ্রণালীর ফিল্টারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও পক্ষপাতপরিশূন্য করিয়া সভ্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে। তাহা না হইলেই লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্ত্তার ন্যায়দণ্ডের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

স্বীকার করি, কাজ কঠিন হইয়াছে। বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা-অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো লজ্জিত এই জন্য যে, দেশের প্রতি কর্ত্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্ত্তব্য নাই একথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মত মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম্ম লইয়া টিক্‌টিক্ করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্ব্বলতা, ইহা সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্,— বর্ব্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্ম্মকে দিয়াই ধর্ম্মকে মজ্‌বুৎ করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কেবল অধর্ম্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা নহে, আমাদের গুরুমশায়দের যেখানে বীভৎসতা, সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি। নিজের মনের জোরে ধর্ম্মের জোরে গুরুমশায়ের উপরে দাঁড়াইয়াও একথা বলিবার তেজ ও প্রতিভা আমাদের আজ নাই যে,

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অর্থাৎ অধর্ম্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া উঠে, অধর্ম্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্ম্মের দ্বারা সে শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে মূল হইতে বিনাশ পায়।—তাই বলিতেছি, গুরুমশায়দের কাছে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিরও যে এতবড় পরাভব হইয়াছে ইহাতেই আমাদের সকলের চেয়ে বড় লজ্জা। বড় আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার কোণ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে; দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া অজস্র আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে এবং দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য্য এক পা এক পা করিয়া আপনার রাজপথ নির্ম্মাণ করিবে; নিষ্ঠুর আচারের ভারে এদেশে মানুষকে মানুষ যে অবনত অপমানিত করিয়া রাখিয়াছে অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দময় শক্তির দ্বারা সেই ভারকে দূর করিয়া সমস্ত দেশের লোক একসঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু আমাদের

ভাগ্যে এ কি হইল? দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়—এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা? যে দৈন্য যে-জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিকাল ভিক্ষাবৃত্তিকেই সম্পদলাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নববসন্তেও সেই দৈন্য সেই জড়তা সেই আত্ম-অবিশ্বাস পৌলিটিকাল চৌর্য্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না? এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতায় এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি, কিন্তু বিধাতার দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সে কথা মনে রাখিতে হইবে; আর বাহ্য ফললাভই যে চরমলাভ একথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, তার পরে পোলিটিকাল মুক্তি যদি পাই ত ভাল, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড় মুক্তির পথকে কলুষিত পুলিটিক্সের আবর্জ্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।

কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনো দিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেণ্টের চাকরী বা রাজ-সম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সঙ্কটময় দুর্গমপথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না; তারা মহৎত্যাগের উচ্চশিখরে নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির সম্বল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই, ছোট ইংরেজ ইহাদের শুভসঙ্কল্পকে ঠিকমত বুঝিবে কিম্বা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই। অন্য সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হইয়া দিকে দিকে চলিয়া গেছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার ক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এই-রকমের দৃঢ়সঙ্কল্প, আত্মবিসর্জ্জনশীল, বিষয়বুদ্ধিহীন, কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড় সম্পদ। আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিমের চিঠি পড়িলে বুঝা যায় যে, এ ছেলেকে যে-ইংরেজ সাজা দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত। আদিম কালের বা এখনকার কালের যে-কোনো রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া দলন করিয়া দেশকে এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই সহজ, কিন্তু ইহা ভদ্র নয়, এবং আমরা শুনিয়াছি ইহা ঠিক ইংলিশ নহে। যারা নিরপরাধ অথচ মহৎ, অথবা মহৎ উৎসাহের ক্ষণিক বিকারে যারা পথ ভুল করিয়াছে, যারা উপরে চড়িতে গিয়া নীচে পড়িয়াছে এবং অভয় পাইলেই যারা সে-পথ হইতে ফিরিয়া একদিন জীবনকে সার্থক করিতে পারিত, এমন-সকল ছেলেকে সন্দেহমাত্রের পরে নির্ভর করিয়া চিরজীবনের মত পঙ্গু করিয়া দেওয়ার মত মানবজীবনের এমন নির্ম্মম অপব্যয় আর কিছুই হইতে পারে না। দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতর রাষ্ট্রনীতি? এ যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাত দুপুরে কাঁচা ফসলের ক্ষেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া। যার ক্ষেত সে কপাল চাপড়াইয়া হায় হায় করিয়া মরে, আর যার মহিষ সে বুক ফুলাইয়া বলে—বেশ হইয়াছে, একটা আগাছাও আর বাকী নাই!

আর-একটা সর্ব্বনাশ এই যে, পুলিস একবার যে-চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে-চারায় কোনো কালে আর ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার

যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে জীবন কাটাইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তার কাছে ব্রিটিশরাজের একচুলমাত্র আশঙ্কার কারণ ছিল না, অথচ তার কাছ থেকে আমাদের দেশ বিস্তর আশা করিতে পারিত। পুলিসের মারের ত কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। কিছুকাল পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলাস্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিসের লোক আর কিছুই না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর বেশি কিছু করিবার দরকার নাই; উহাদের নিঃশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে সুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না। এমন কি, যে মরিয়া মানুষকে বৃদ্ধ রুগ্ন দরিদ্র কুশ্রী কুচরিত্র কেহই পিছু হঠাইতে পারে না, বাংলা দেশের সেই কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে। সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিন্তু দান করিতে বিপদ গণি। দেশের কোনো হিতকর্ম্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম্ম নষ্ট হইবে।

যে-অধ্যক্ষদের পরে এই বিভীষিকা-বিভাগের ভার তাঁরা ত রক্তমাংসের মানুষ; তাঁরা ত রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত মহাপুরুষ নন। রাগ বা আতঙ্কের সময় আমরাও যেমন অল্পপ্রমাণেই ছায়াকে বস্তু বলিয়া ঠাহর করি, তাঁরাও ঠিক তাই করেন। সকল মানুষকে সন্দেহ করাটাই যখন তাঁদের ব্যবসায় হয় তখন সকল মানুষকে অবিশ্বাস করাটাই তাঁদের স্বভাব হইয়া ওঠে। সংশয়ের সামান্য আভাস মাত্রকেই চূড়ান্ত করিয়া নিরাপদকে পাকা করিতে তাঁদের স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয়—কেননা, উপরে তাঁদের দায়িত্ব অল্প, চারিপাশের লোক ভয়ে নিস্তব্ধ, তার পিছনে ভারতের ইংরেজ হয় উদাসীন নয় উৎসাহদাতা। যেখানে স্বাভাবিক দরদ নাই অথচ ক্রোধ আছে এবং শক্তিও অব্যাহত, সেখানে কার্য্যপ্রণালী যদি গুপ্ত এবং বিচারপ্রণালী যদি বিমুখ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রেই যে ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে এবং সাধুনীতি পালিত হইতেছে এ কথা কি আমাদের ছোট ইংরেজও সত্যই বিশ্বাস করেন? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস এই যে, কাজ উদ্ধার হইতেছে। কারণ, দেখিয়াছি, জর্ম্মনিও এই বিশ্বাসের জোরে ইণ্টারন্যাশনাল আইনকে এবং দয়াধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ জিতিবায় নিয়মকে সহজ করিয়াছে। তার কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে জর্ম্মনিতে আজ বড় জর্ম্মানের চেয়ে ছোট জর্ম্মানের প্রভাব বড় হইয়াছে, যে-জর্ম্মান কাজ করিবার যন্ত্র এবং যুদ্ধ করিবার কায়দা মাত্র। আবার বলি, "শির লে আও" বলিতে পারিলে রাজকার্য্য উদ্ধার হইতে পারে যে-রাজকার্য্য উপস্থিতের, কিন্তু রাজনীতির অধঃপতন ঘটে, যে-রাজনীতি চিরদিনের। এই রাজনীতির জন্য ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইংরেজ লড়াই করিয়াছে, এই রাজনীতির ব্যভিচারেই জর্ম্মনির প্রতি মহৎ-ঘৃণায় উদ্দীপ্ত ইংরেজযুবক দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যাত্মদৃষ্টি যাহাতে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বালকদের পক্ষে দুর্ব্বল বা কলুষিত না হয় আমি এই লক্ষ্য দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্য্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন-উপহার দাবী করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই। পরম সত্যকে আমি কোনো বড় নামের দোহাই দিয়া খণ্ডিত করিতে চাই নাই, ইহাতে আমার ধর্ম্মনীতিকে নিজ্‌ঝে ও টাট্‌স্কের ইংরেজ ও এ-দেশী শিষ্যগণ দুর্ব্বলের ধর্ম্মনীতি ও মুমূর্ষুর সান্ত্বনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন। আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক; আমাদের বর্ত্তমানের ক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের আশা চারিদিকে সঙ্কীর্ণ; আমাদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তিবিকাশের উৎসাহ ক্ষীণ ও সুযোগ বাধাগ্রস্ত; বড়-বড় উদ্ধত পদমান ও দায়িত্বের নিম্নতলের আওতায় কৃশ খর্ব্ব হইয়া আমরা যে-ফল ফলাইয়া থাকি জগতের হাটে তার প্রয়োজন তুচ্ছ, তার দাম যৎকিঞ্চিৎ; অথচ সেই খর্ব্বতাটাই আমাদের চিরস্বভাব এই অপবাদ দিয়া সেই আওতাটাকে চিরনিবিড় করিয়া রাখা আমাদের মত দুর্ব্বলের

পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা চলিতেছে। এই অবস্থায় যে অবসাদ আনে তাহাতে দেশের লোকের মন অন্তরে-অন্তরে গুরুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই কারণেই, ভয়দ্বেষবিবর্জ্জিত আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনের উপদেশ এদেশে আজকাল শ্রদ্ধা পায় না। তবু আমার বিশ্বাস, এই-সকল বাধার সঙ্গে লড়াই করিয়াও আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। কেননা বাধা দুরূহ হইলেও পরমার্থের সত্যটিকে মানুষের সাম্‌নে উপস্থিত করিলে সে তাকে একেবারে অশ্রদ্ধা করিতে পারে না—এমন কি, আমাদের দেশের অত্যন্ত আধুনিক ছেলের পক্ষেও তাহা কঠিন হয়। আমাদের এই স্বভাব-সম্বন্ধে পাঞ্জাবের লাটের সঙ্গেও আমার মতের মিল আছে। কিন্তু একএক সময়ে এমন দুর্য্যোগ আসে যখন এই বাঙালীর ছেলের মত অত্যন্ত ভালমানুষের কাছেও উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হইয়া উঠে। কেননা রিপুর সংঘাতে রিপু জাগে, তখন প্রমত্ততার উপরে কল্যাণকে স্বীকার করা দুঃসাধ্য হয়। আমাদের আশ্রমে দুটি ছোট ছেলে আছে। তাদের অভিভাবকদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ জোগাইয়াছে। কিছুকাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ন হইয়াছে। এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগান ছেলে দুটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহারাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল। এই ছেলে দুটি কেবল যে নিজের গ্লানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ কত তা তারা জানে। যে ব্যথায়, অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই। বাপকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাতে তাঁকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই সমস্ত দুশ্চিন্তার দুঃখ এই শিশুদুটিকেও পীড়া দিতেছে। এ সম্বন্ধে ছেলে দুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না—কিন্তু এই ছেলেরা যখন সাম্‌নে থাকে তখন ধৈর্য্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্ব্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুণ্ঠাবোধ হয়, তখন সেই-সকল লোকের বিদ্রূপহাস্য-কুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যাঁরা পাঞ্জাবের লাটের মতই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন। এম্‌নি করিয়া রিপুর সহিত রিপুর চক্‌মকি ঠোকায় আগুন জ্বলিতেছে; এম্‌নি করিয়া বাংলাদেশের প্রদেশে প্রদেশে দুঃখে আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অন্তরের নিত্যভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতেছে। শাসনকর্ত্তার অদৃশ্যমেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে বোমাগুলা আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিস্তর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু। ইহাদিগকে কি non-combatants বলিবে না?

যদি জিজ্ঞাসা কর এই দুষ্টসমস্যার মূল কোথায়, তবে বলিতেই হইবে স্বাধীনশাসনের অভাবে। ইংরেজের কাছে আমরা বড়ই পর; এমন কি, চীন-জাপানের সঙ্গেও তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক সামীপ্য অনুভব করেন একথা তাঁদের কোনো কোনো বিদ্বান ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন। তার পরে আমাদের আধ্যাত্মিকতা আছে, শুনিতেছি তাঁদের সে বালাই নাই—এতবড় মূলগত প্রভেদ মানুষে মানুষে আর-কিছু হইতেই পারে না। তারপরে তাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, আমাদের সঙ্গ রাখেন না। যেখানে এত দূরত্ব, এত কম জানা, সেখানে সতর্ক সন্দিগ্ধতা একমাত্র পলিসি হইতে বাধ্য। সেখানে দেশের যে-সব লোক স্বার্থপর ও চতুর, যারা অবৈতনিক গুপ্তচর-বৃত্তি করাই উন্নতির উপায় বলিয়া জানে, তাদের বিষাক্ত প্রভাব শাসনতন্ত্রের ছিদ্রে ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মিথ্যায় এবং মিথ্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর অর্দ্ধসত্যে ভরিয়া রাখে। যারা স্বার্থের চেয়ে আত্মসম্মানকে বড় জানে, যারা নিজের উন্নতির চেয়ে দেশের মঙ্গলকে শ্রেয় বলিয়া জানে, তারা যতক্ষণ না পুলিশের গ্রাসে পড়ে ততক্ষণ এই শাসনব্যবস্থা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকে। এই নিয়ত পা টিপিয়া চলা এবং চুপিচুপি বলা, এই দিনরাত আড়ে আড়ে চাওয়া এবং ঝোপে ঝাড়ে ঘোরা—আর কিছু নয়, এই যে অবিরত পুলিশের সঙ্গ করা—এই কলুষিত হাওয়ার মধ্যে যে শাসনকর্ত্তা বাস করেন তাঁর মনের সন্দেহ কাজে নিদারুণ হইয়া উঠিতে কোনো স্বাভাবিক বাধা পায় না। কেননা, তাঁদের কাছে আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন সত্তা, আমরা কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়। সেইজন্য আমাদের ঘরে যখন মা

কাঁদিতেছে, ভাই কাঁপিতেছে, স্ত্রী আত্মহত্যা করিতেছে, শিশুদের শিক্ষা বন্ধ; যখন ভাগ্যহীন দেশের বহু দুঃখের সৎচেষ্টাগুলি সি, আই, ডির বাঁকা ইসারামাত্রে চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে; তখন অপরপক্ষের কোনো মানুষের ডিনারের ক্ষুধা বা নিশীথনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না এবং ব্রিজ খেলাতেও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা দোষারোপ করিয়া বলিতেছি না, ইহা স্বাভাবিক। এইসব মানুষই যেখানে ষোল আনা মানুষ, সেখানে আপিসের শুক্নো পার্চমেণ্টের নীচে হইতে তাদের হৃদয়টা সম্ভবত বাহির হইয়া থাকে। ব্যুরোক্রেসি বলিতে সর্ব্বত্রই সেই কর্ত্তাদের বোঝায় যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্যলোক লইয়া কারবার করে না, যারা নিজের বিধানরচিত একটা কৃত্রিম জগতে প্রভুত্ব-জাল বিস্তার করে। স্বাধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি সর্ব্বপ্রধান নয়, এইজন্য মানুষ ইহাদের ফাঁকের মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে। অধীন দেশে এই ব্যুরোক্রেসি কোথাও একটুও ফাঁক রাখিতে চায় না। আমরা যখন খোলা আকাশে মাথা তুলিবার জন্য ফাঁকের দরবার করি, তখন ইঁহাদের ছোটবড় শাখাপ্রশাখা সমুদ্রের এপারে-ওপারে এমনি প্রচণ্ড-বেগে আন্দোলিত হইতে থাকে যে তখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবি,—ফাঁকে কাজ নাই, এখন ঐ ডালের ঝাপটা খাইয়া ভাঙিয়া না পড়িতে হয়!—তবু শেষ কথাটা বলিয়া রাখি;—কোনো অস্বাভাবিকতাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে অত্যন্ত বলবান জাতিও শেষ পর্য্যন্ত সঙিনের আগায় সোধা রাখিতে পারে না। ভার বাড়িয়া ওঠে, হাত ক্লান্ত হয়, এবং বিশ্বপৃথিবীর বিপুল ভারাকর্ষণ স্বভাবের অসামঞ্জস্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

স্বাভাবিকতাটা কি? না, শাসনপ্রণালী যেমনি হোক্ আর যারই হোক দেশের লোকের সঙ্গে দেশের শাসন-তন্ত্রের দায়িত্বের যোগ থাকা,—দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের লোকের মমত্ব থাকা। সেই শাসন নিরবচ্ছিন্ন বাহিরের জিনিস হইলে তার প্রতি প্রজার ঔদাসীন্য বিতৃষ্ণায় পরিণত হইবেই হইবে। আবার সেই বিতৃষ্ণাকে যাঁরা বাহিরের দিক হইতেই দমন করিতে থাকেন তাঁরা বিতৃষ্ণাকে বিদ্বেষে পাকাইয়া তোলেন। এমনি করিয়া সমস্যা কেবলি জটিলতর হইতে থাকে।

বর্ত্তমান যুগসত্যের দূত হইয়া ইংরেজ এদেশে আসিয়াছেন। যে-কালের যাহা সবচেয়ে বড় বিশ্বসম্পদ তাহা নানা আকারে নানা উপায়ে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবেই। যাঁরা সেই সম্পদের বাহন, তাঁরা যদি লোভের বশ হইয়া কৃপণতা করেন, তবে তাঁরা ধর্ম্মের অভিপ্রায়কে অনর্থক বাধা দিয়া দুঃখ সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু তাঁরা যে আগুন বহন করিতেছেন তাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। যাহা দিবার তাহা তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে, কেননা এ-দানে তাঁহারা উপলক্ষ্য, এদান এখনকার যুগের দান। কিন্তু অস্বাভাবিকতা হইতেছে এই যে, তাঁদের ঐতিহাসিক শুক্ল পক্ষের দিকে তাঁরা যে সত্যকে বিকীর্ণ করিতেছেন, তাঁদের ঐতিহাসিক কৃষ্ণপক্ষের দিকে তাঁরাই সেই সত্যকে শাসনের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছেন। কিন্তু নিজের প্রকৃতির এক অংশকে তাঁরা আরেক অংশ দিয়া কিছুতেই প্রবঞ্চিত করিতে পারিবেন না। বড় ইংরেজকে ছোট ইংরেজ চিরদিন স্বার্থের বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা করিলে দুঃখ দুর্গতি বাড়াইতে থাকিবেন। ঐতিহাসিক খেলায় হাতের কাগজ দেখাইয়া খেলা হয় না। তার পরিণাম সমস্ত হিসাবের বিরুদ্ধে হঠাৎ দেখা দিয়া চমক লাগায়। এইজন্য মোটের উপর এই তত্ত্বটা বলা যায় যে, কোনো অস্বাভাবিকতাকে দীর্ঘকাল প্রশ্রয় দিতে দিতে যখন মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আমার তৈরি নিয়মই নিয়ম, তখনই ইতিহাস হঠাৎ একটা সামান্য ঠোকর খাইয়া উল্টাইয়া পড়ে। শত বৎসর ধরিয়া মানুষ মানুষের কাছে আছে অথচ তার সঙ্গে মানব-সম্বন্ধ নাই; তাকে শাসন করিতেছে অথচ তাকে কোনোমতেই আত্মীয় করিতেছে না; পূর্ব্বধরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ীর ভিতরে আসিয়া পড়িল অথচ এ মন্ত্র ছাড়িল না যে, "never the twain shall meet"; এত বড় অস্বাভাবিকতার দুঃখকর বোঝা বিশ্বে কখনই অটল হইয়া থাকিতে পারে না। যদি ইহার কোনো স্বাভাবিক প্রতিকার না থাকে তবে একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির পঞ্চমাঙ্কে ইহার যবনিকা পতন হইবে। ভারতবর্ষে আমাদের দুর্গতির যে মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি, তারও ত পালা অনেক যুগ ধরিয়া এমনি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আমরাও মানুষকে কাছাকাছি রাখিয়াও দূরে ঠেকাইবার

বিস্তারিত আয়োজন করিয়াছি; যে-অধিকারকে সকলের চেয়ে মূল্যবান বলিয়া নিজে গ্রহণ করিলাম, অন্যকে কেবলি তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি; আমরাও "স্বধর্ম্ম" বলিয়া একটা বড় নাম দিয়া মানুষের অবমাননা করিয়া নিত্যধর্ম্মকে পীড়িত করিয়াছি। শাস্ত্রবিধির অতি কঠিন বাঁধন দিয়াও এই অস্বাভাবিকতাকে, এই অপবিত্র দেব-দ্রোহকে আমরা নিজের ইতিহাসের অনুকূল করিয়া তুলিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম আমাদের বল এইখানেই, কিন্তু এইখানেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্ব্বলতা। এইখানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতিপদে কেবল আপনাকে মারিতে মারিতে মরিয়াছি।

বর্ত্তমানের চেহারা যেমনি হউক তবু এই আশা এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্ব্বের সহিত মিলিবে। কিন্তু এইখানে আমাদেরও কর্ত্তব্য আছে। আমরা যদি ছোট হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোট হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোট ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোট শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন, যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে-মানুষ তার পরাভব হইবে, দুঃখ পায় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর সহিত আত্মার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে। এই মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে। পূর্ব্ব-পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের উপরে হইবে না। এবং কামান বন্দুক এবং রণতরীর উপরও হইবে না। দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন। আমরা যদি শক্তি না পাই তবে অশক্তের সহিত শক্তের মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। একতরফা আধিপত্যের যোগ যোগই নহে। তাহাই সকলের চেয়ে কঠোর বিচ্ছেদ। যে-সাম্রাজ্যগঠনে আমরা ইঁটকাঠের মত কেবল উপকরণ মাত্র সে সাম্রাজ্য আমাদের নহে। যে-সাম্রাজ্যগঠনে আমাদিগকেও কারিগর নিযুক্ত করা হইবে তাহাই আমাদের। সেই সাম্রাজ্যে আমরা প্রাণ পাইব এবং সেই সাম্রাজ্যের জন্য আমরা প্রাণ দিব। আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই পরের শক্তির সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে। সেই শক্তি ধার-করা শক্তি, ভিক্ষা-করা শক্তি না হউক্! সেই শক্তি আমাদের অন্তরের শক্তি, ধর্ম্মের শক্তি হউক্! তাহা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার অপরিসীম শক্তি হউক। জগতে কাহারও সাধ্য নাই, দুঃখের শক্তিকে ত্যাগের শক্তিকে ধর্ম্মের শক্তিকে বলির পশুর মত শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা মরিয়া অমর হয়, এবং মাংসপেশী আপন জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিস্মৃত তীর্থ

(Blake হইতে)

প্রাণ দেছে যারা সাধিতে দেশের কাজ
শায়িত তাহারা রয়েছে ধূলির মাঝে,
নাহি হায় তথা স্তম্ভ মীনার তাজ
তাহা হতে উঁচু গৌরব সেথা রাজে।
মধুমাস তারে সাজায় কুসুমহারে
এত মনোরম স্বপ্নও নাহি পারে।

অপ্সরীগণ ফুল-চন্দন-দানে
আত্মাগুলিরে নিয়াছে স্বর্গে বরি',
বন্দিছে চির জয়মঙ্গল-গানে
মহিমা হেথায় তীর্থযাত্রা করি'।
স্বাধীনতা হেথা যোগতপব্রত পালে
আশ্রম রচি শিশির-অশ্রু ঢালে।

শ্রীকালিদাস রায়।

স্বরলিপি

র্সা রা II গা -া -া। গা -মা রা I গজ্ঞ -পা -া। -া মা গা I
আ মি চ ৲ ৹ চ ৹ ল হে ৹ ৹ ৹ আ মি

I গা গা -মা। মধপা -পমপা মা I মগা রা মা। মগা গা না I
সু দূ ৹ রে ৹ র পি য়া ৹ সী আ মি

I না -া -া। র্সনা -পা নধনা I নর্রা -া -া। -র্সা র্সনা ধা I পা গা -মা I
চ ৹ ৹ ৹ চ ৹ ল হে ৹ ৹ ৹ আ মি সু দূ ৹

I মধপা -পমপা র্মা I মগা রা -মা। মগা গা র্গা I র্গা -া -া। র্গর্রা র্মর্গা র্রনা I
রে ৹ র পি য়া ৹ সী আ মি চ ৹ ৹ চ ৹ ল

I নর্রা -া -া। -র্সা না ধা I পা পগা -মা। মধপা -পমপা মা I মগা -রা -মা I
হে ৹ ৹ ৹ আ মি সু দূ ৹ রে ৹ র পি য়া ৹

I মগা সা রা II
সী "আ মি"

-া -া II প্‌া -া -া। ধ্‌া -া ন্‌া I সা -া -া। -া -া -া I -স্ন্‌া সা -া। রা -া গা I
৹ ৹ দিন ৹ ৹ চ ৹ লে যায় ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ আ মি ৹ আ ৹ ন

I গরা -পমা -গরা। গা -া -া I গপা পা -া। পা -া জ্ঞা I জ্ঞপা -া পজ্ঞা I
ম ৹ ৹ নে ৹ ৹ তা রি ৹ আ ৹ সা চে ৹ ৹

I ধপা -া -া I সা সা -া। রা -া রপা I পমা -া গরা। গা -া -া I
য়ে ৹ ৹ থা কি ৹ বা ৹ তা য় ৹ ৹ নে ৹ ৹

I গা গা গা। র্সা না না I না র্সা র্সনা। নধা ধা -া I ধা ধনা নধা I
ও গো প্রা ণে ম নে আ মি যে তা হার ৹ প র শ

পজ্ঞা ধপা -মা I গা গা -জ্ঞা। পা গা গা I গা গা -মা। মধপা -পমপা র্মা I
পা বার ৹ প্র য়া ৹ সী আ মি সু দূ ৹ রে ৹ র

মগা রা -মা। গা গা গা I গা গা -র্সা। র্সা র্সা র্রা I র্রা র্রা -র্গা I
পি য়া ৹ সী ও গো সু দূর ৹ বি পু ল সু দূর ৹

-া -া -া I -া -া -া। র্গরা র্সা না I ধা ধর্রা -র্সা। র্সা র্সা র্রা I
৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ তু মি যে ৹ বা জাও ৹ ব্যা কু ল

I র্গা -র্রপা র্মপা। র্গা -া -া I র্গা -র্গা র্গর্মা। র্মর্গা র্রা -া I র্রর্সা না নর্রা।
বাঁ ॰ শ রী ॰ ॰ মোর ॰ ডা না নাই ॰ আ ছি এ

। র্রর্সা না -র্সনা। ধনধা পা পক্ষা। পা ক্ষপা -ধা I ধপা -মপা পমা।
ক ঠাঁই ॰ সে ক থা যে যাই ॰ পা ॰ শ

। গা সা রা II
রি আ মি

পা় ধা় II না় -া -া। সা -রা র্না I সা -া -া। -া না় সা I
আ মি উন্ ॰ ॰ ম ॰ না হে ॰ ॰ ॰ হে সু

I রা -া -া। -া রা গা I গরা রগ -মা। গা -া -া I সা -গা গা। গা গা ক্ষা I
দূর ॰ ॰ ॰ আ মি উ দা ॰ সী ॰ ॰ রৌ ॰ দ্র মা খা নো

I পা ধা ধা। ধা ধা -া I ধা ধনা ধনা। -ধা পক্ষা ধপা I গা গক্ষা -পধপা।
অ ল স বে লায় ॰ ত রু মর্ ॰ ম রে ছা য়ার ॰

। পমা গা -া I গপা পা পা। পক্ষা পা পা I পা -ক্ষা ক্ষধা। ধপা -ক্ষা পা I
খে লায় ॰ কি মু র তি ত ব নীল ॰ আ কা ॰ শে

I গা মধা ধপা। ক্ষা গা রসা I রা গা -ক্ষা। পা মগা গা I গা গা -মা।
ন য় নে উ ঠে গো আ ভা ॰ সি আ মি সু দূ ॰

I মধপা -পমপা মা I মগা রা -মা। গা গা গা I গা গা -সা। র্সা র্সা র্রা I র্রা র্রা -র্গা।
রে ॰ র পি য়া ॰ সী ও গো সু দূর ॰ বি পু ল সু দূর ॰

-া -া -া I -া -া -া। র্গরা র্সা না I ধা ধর্রা -র্সা। র্সা র্সা র্রা I র্গা -র্রপা র্মপা।
॰ ॰ ॰ তু মি যে বা জাও ॰ ব্যা কু ল বাঁ ॰ শ

। র্গা া -া I র্গা -া র্গর্মা। র্মর্গা র্রা -া I র্রর্সা না নর্রা। র্রর্সা না -র্সনা I
রী ॰ ॰ ক ॰ ক্ষে আ মার ॰ রু ॰ দ্ধ দু য়ার ॰

I ধনধা পা পক্ষা। পা ক্ষপা -ধা I ধপা -মপা পমা। গা সা রা II II
সে ক থা যে যাই পা ॰ শ রি "আ মি"

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণবৃত্তান্ত।)

৩৩ অধ্যায়।

মৃত্যুর দ্বারে।

কেহই আমাকে তাঁবুতে আশ্রয় দিল না। এখন উপায় কি? দূর হইতে দেখিতে লাগিলাম তাঁবুর ভিতরে সকলে কেমন আরামে রহিয়াছে আর আমি বাহিরে শীতে পড়িয়া মরিতেছি, আমার জন্য কারও প্রাণে একটু দরদ নাই, কেনবা হইবে, আমি কে তাহাদের। তখন মনে পড়িল ভগবান বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন "যাহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমি তাহাদের মুক্তিপথের সহায় হইতে পারি না" ঠিক বটে। আমাকে আজ যাহারা তাড়াইয়া দিল, তাদের কোন্ উপকার আমি করিতে পারি? তাদের সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কি করিবার আছে; ধর্ম্মপুস্তক খুলিয়া মন্ত্র পাঠে মন দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে-বৃদ্ধা আমায় চিমটা লইয়া তাড়া করিয়াছিল তাহার কন্যাটি একবার আসিয়া তাঁবুর বাহিরে উঁকি মারিয়া গেল। আবার দ্বিতীয়বার দেখা দিল। এবার বরাবর আমার দিকে আসিয়া বলিল "তুমি বুঝি আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য শয়তান ডাকবার মন্ত্র পড়ছ? আমার মা বলেছে তোমায় তাঁবুতে থাকতে দেওয়া হবে, তুমি কিন্তু আর শয়তান ডেকো না।" আমার সদভিসন্ধির কি অপূর্ব্ব অর্থ। আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ সেই মেয়েটির সঙ্গে তাদের তাঁবুতে গেলাম। পরদিন ভোরেই দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলাম। আড়াই মাইল পথ চলিবার পর হঠাৎ ঝোপের ভিতর হইতে দুজন ছুটিয়া বাহির হইল। কি সর্ব্বনাশ! তারা সশস্ত্র ডাকাত। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নিকট কি আছে?"

আমি বলিলাম "বৌদ্ধ ধর্ম্ম।" তাহারা সে কথার অর্থ বুঝিল না।

"বলি ঐ তোমার পিঠে কি?

"আমার খাবার সামগ্রী।"

"বুকে তোমার ঐ কি উঁচু দেখা যাচ্ছে?"

"আমার টাকার থলি।"

এই কথা বলিতে-না-বলিতে তাহারা আমার লাঠি কাড়িয়া লইল। তখন আমি শান্তভাবে বলিলাম "তোমরা বুঝি আমার কাছে কিছু চাও?"

তারা দাঁত খিঁচাইয়া বলিল "তা আর বলতে? নিশ্চয়ই!"

"কাড়াকাড়ি করবার দরকার নেই। স্থিরভাবে বল, কি কি চাই—আমি সব দিচ্ছি।"

"তোমার পিঠে নিশ্চয়ই দামীদামী জিনিস আছে, সব দেখাও।"

আমি সবই দেখাইলাম। ছাগলের পিঠে যে বোঁচকাটি ছিল, তাহাও দেখিল। যতকিছু লইবার সব তাহারা লইয়া কেবল আমার ধর্ম্মগ্রন্থগুলি ও ভারি ভারি বিছানা তাহাদের যা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল তাহাই ফেলিয়া রাখিল। আমার খাদ্যসামগ্রী সব আত্মসাৎ করিয়া বলিল "আমাদের খাবার জিনিষের বড় দরকার, এসব আমাদের চাই।" আমার বিনা আহারেই বা কেমন করিয়া চলিবে? তা কে শোনে?

তিব্বতের ডাকাতদের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে লুট করিয়া তাহারা তিন দিনের মত খাবার জিনিষ দেয় যদি নাকি সে ব্যক্তি ডাকাতদের কল্যাণের জন্য মন্ত্র পড়িয়া আহার্য্য চায়। আমি ভাবিলাম আমি তাহাই করিব। ধর্ম্মপাল আমায় দলাই লামাকে দিবার জন্য যে রৌপ্যনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দির দিয়াছিলেন তাহাও তাহাদের দেখাইলাম এবং বলিলাম "তোমাদের মত লোক এ মন্দির রাখতে পারে না, তাতে ভারি বিপদ হয়।" একথা শুনিয়া তাহারা ভয়ে তাহা স্পর্শও করিল না, বলিল "আমাদের মাথায় ছুঁইয়ে মন্ত্র পড়ে দাও।" আমিও তাহাদের মাথায় ছুঁয়াইয়া প্রার্থনা করিলাম যেন তাঁহাদের সকল পাপের স্খালন হয়। তারপর দাঁড়াইয়া তাহাদের নিকট কিছু আহার্য্য চাহিয়া লইব ভাবিতেছি, অমনি দুই জন ঘোড়সোয়ার অদূরে দৃষ্ট হইল। ডাকাত দুজন তৎক্ষণাৎ সব লইয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। আমি ভাবিলাম এই অশ্বারোহীদের নিকট কিছু আহার্য্য ভিক্ষা করিয়া লই। তাহারা অন্যদিকে চলিয়া গেল। আমি হাতপা নাড়িয়া কত ডাকাডাকি করিলাম। সব বৃথা। আমার নিকট তখনও

আটটি সোনার মোহর ছিল, তা আমি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাই এখন আমার একমাত্র সম্বল। ৮ মাইল গিয়া সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের ধারে গিয়া বসিলাম। সারাদিন অভুক্ত। পরদিন ভাবিলাম উত্তর-পূর্ব্বে যাইব, কম্পাস নাই, দক্ষিণ দিকে গিয়া পড়িলাম। বেলা তিনটার সময় বরফ পড়িতে আরম্ভ করিল; ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। অন্ধকার হইয়া আসিল, পথে জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ নাই। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া বরফ খাইতে লাগিলাম। কিছু খাইতে পাইলে বাঁচিতাম—দুইদিন অভুক্ত—প্রাণ যায়! রাত্রি আসিয়া পড়িল। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতর শুইলাম, বাহিরে থাকিলে নিশ্চয় মৃত্যু হইত। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইলাম—আশ্চর্য্য, সেই গর্ত্তের মধ্যেও ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন উঠিয়া দেখি ভয়ানক বরফ পড়িয়াছে, কিন্তু দিন বেশ উজ্জ্বল! ৫ মাইল চলিলাম। কোন প্রাণীর দর্শন নাই—কেবল বরফ আর বরফ! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, তবু চলিতেই হইল, ক্ষুধার জ্বালায় মুঠা করিয়া করিয়া বরফ খাইতে লাগিলাম। কাবাংচু নদীর তীরে আসিয়া পড়িলাম। এই নদীর কাছেই আলচু লামাকে পাইব আশা হইল। আসিবার সময় এই নদী যেখানে পার হইয়াছিলাম, তাহার ৯ মাইল উপরে এবার পার হইলাম। নদীর জল জমিতে আরম্ভ করিয়াছে, কঠিন হইয়া জমিলে ত কথাই ছিল না, অনায়াসে পার হইয়া যাইতাম। পাতলা বরফ লাঠি দিয়া ভাঙ্গিয়া অতি সাবধানে, অতি কষ্টে পার হইলাম। কষ্টের একশেষ,—ছাগলের পৃষ্ঠে যে বিছানা-পত্র ছিল, কোথায় হারাইয়া গেল—কত খুঁজিলাম পাইলাম না। আমার যা কিছু ছিল সব গেল। ভাবিলাম আজ যদি তাঁবু না পাই—নিশ্চিত মৃত্যু। ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। ২০ মাইল গেলাম, রাত হইয়া গেল, তবু কোন প্রাণীর সাক্ষাৎ নাই। আবার এক যন্ত্রণা উপস্থিত, সারাদিন বরফের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া এমন ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষের পীড়া উপস্থিত—সে কি বিষম যন্ত্রণা। চক্ষু যেন ফাটিয়া বাহির হইবে। বরফ দিয়া চক্ষু চাপিয়া ধরিলাম। চক্ষু ক্ষণমাত্র খুলি সাধ্য কি? যন্ত্রণায় অধীর হইলাম। সেই দারুণ শীতেও যন্ত্রণায় আমার দেহ হইতে ঘাম ছুটিল। এমন ভীষণ যন্ত্রণা কখনও এ জীবনে ভোগ করি নাই। তিন দিন অভুক্ত, শীতবস্ত্র নাই, তার উপর আজ চক্ষের যন্ত্রণায় পাগল। এত দুঃখের ভিতর কবিতার স্রোতে প্রাণ ঢালিয়া আরাম পাইলাম। ধন্য আমার মাতৃভাষা! বরফের উপর বসিয়া রাত কাটাইলাম। পরদিন ২রা অক্টোবর আবার যাত্রা। সেদিন বরফ পড়ে নাই। উজ্জ্বল সূর্য্যোদয় হইয়াছে, তাহাতে আমার চক্ষের যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইল। চক্ষু বুজিয়া পথ চলিতে পারি না, আবার সাধ্য কি যে একটুও খুলি। চক্ষু মুদিয়া চলিতে গিয়া কত আছাড় খাইলাম—৪ দিন কিছু খাই নাই—এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, যে, একটা ঢিল পায়ে ঠেকিলেই পড়িয়া যাইতেছি; কিন্তু তবু সম্মুখের দিকে চলা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু এমন হইল যে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চক্ষের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বরফের উপর বসিয়া পড়িলাম। নড়িবার সাধ্য রহিল না। তখন ভাবিলাম এই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত! কিন্তু মৃত্যু কোথায়? মস্তিষ্ক এমন পরিষ্কার যে মৃত্যু তাহার ত্রিসীমায় নাই—এমন উজ্জ্বল জ্ঞান লইয়া মৃত্যু হয় কি? এমন সময়ে সেখানে এক অশ্বারোহী আবির্ভূত হইল। অতি কষ্টে তাকাইয়া দেখিলাম, এবং তাহাকে আমার নিকট আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। চীৎকার করিয়া ডাকিতে চেষ্টা করিলাম, কণ্ঠ আমার শক্তিহীন, অতি কষ্টে কি-এক ক্ষীণ বিকৃত ধ্বনি উঠিল—কিন্তু ব্যাকুল ভাবে হাত নাড়িয়া ডাকিতে লাগিলাম। অশ্বারোহী আমার দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিল। আঃ, আমি রক্ষা পাইলাম। সে ব্যক্তি আমায় জিজ্ঞাসা করিল "এই তুষার-মরুতে তুমি কিজন্য আসিয়াছ?" অতি কষ্টে আমি ডাকাতের হাতে পড়া হইতে সব বলিলাম—৪ দিন আমি অভুক্ত। আমার কষ্টের কথা শুনিয়া সেই যুবা পুরুষের বড়ই দয়া হইল। তাহার নিকট খাবার জিনিষ অনেক ছিল বটে, কিন্তু সে আমায় একটু মিষ্টান্ন খাইতে দিল। সে আমায় একটুকরা দিতে না দিতে আমি এমন তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিলাম যে আমি তাহার আস্বাদ মাত্র টের পাইলাম না। সে অঞ্চলে কোথাও একটু আশ্রয় পাওয়া যায় কি না, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ব্যক্তি বলিল "আমি পথিক, ঐ পাহাড়ের ধারে আমার বাবা থাকেন, সেখানে যদি যেতে পার তবে আশ্রয় পাবে।" এই বলিয়াই তাড়াতাড়ি সে

চলিয়া গেল। সে স্থান হতে ২ মাইল দূরে তাহারা ছিল—কি কষ্টে সেদিন ২ মাইল পথ গিয়াছি—পথে কতবার পড়িয়া গিয়াছি, কতবার বসিয়াছি, কতবার বরফ খাইয়াছি। দু মাইল যাইতে তিন ঘণ্টার উপর সময় লাগিল। প্রায় রাত ১১টার সময় তাহাদের তাঁবুতে উপস্থিত হইলাম। সেই যুবা-পুরুষটি আমায় ভিতরে লইয়া গেল। তার বাপমা আমায় বড় যত্ন করিলেন। গরম ভাতের উপর মাখন চিনি ও কিসমিস দিয়া আমায় খাইতে দিলেন। ভয়ে আমি বেশী খাইলাম না, যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া একটু গরম দুধ খাইয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করিলাম। চক্ষের দারুণ যন্ত্রণায় চক্ষে নিদ্রা আসিল না। এত আরামের মধ্যেও আমি অনিদ্রায় রাত কাটাইলাম। ইহারা পথিক, সুতরাং যাত্রাই ইহাদের কাজ। পরদিন প্রাতে ইহারা তাঁবু গুটাইয়া যাত্রার উদ্যোগ করিল; আমাকেও যাইতে হইল। প্রাতে একটু চা খাইয়া বাহির হইলাম। আশপাশের ৩৪টা তাঁবু অতিক্রম করিতে না করিতে সাত-আটটি ভীষণ কুকুর আমার চারিদিক দিয়া তাড়া করিয়া আসিল। চক্ষের যন্ত্রণায় আমার চক্ষু খুলিয়া রাখা অসম্ভব, যতক্ষণ চক্ষু খুলিয়া লাঠি ঘুরাইতে লাগিলাম ততক্ষণ রক্ষা পাইলাম—যাই একবার চক্ষু বুজিয়াছি, অমনি একটা কুকুর আমার লাঠিটা টানিয়া লইল, আর-একটা কুকুর আমার ডান-পা কামড়াইয়া আমায় মাটিতে ফেলিয়া দিল। আমি অতি ক্ষীণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তা শুনিয়া কয়েকজন লোক ছুটিয়া আসিয়া কুকুরগুলোকে পাথর মারিয়া তাড়াইয়া দিল। কিন্তু আমার ক্ষত হইতে ভয়ানক রক্ত-স্রাব হইতে লাগিল, আমি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলাম। আমার আর উত্থানশক্তি রহিল না। একটি বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ ঔষধ লইয়া আসিল, তাহা দিয়া ক্ষত বাঁধিয়া ফেলিলাম। কিন্তু আর যে উঠিয়া দাঁড়াই এমন শক্তি রহিল না। কিন্তু সেখানে পড়িয়া থাকাও চলে না। আমি উপস্থিত লোক-দের জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন উপায় কি? এ অঞ্চলে না আলচু লামা থাকেন, সেখানে যেতে পারলে হয়।" আলচু লামার নাম শুনিয়া একজন বলিল "আলচু লামা কাছেই আছেন, তিনি ভাল ঔষধ জানেন, সেখানে গেলেই ভাল।" সে ব্যক্তি তার ঘোড়ার উপর করিয়া আমায় লইয়া গেল। গিয়া দেখি দুটো তাঁবু পড়িয়াছে, কিন্তু আলচু লামার তাঁবুর মত বড় নয়। আমি তাঁবুর দ্বারের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আলচু লামার তাঁবু এই?" লোকে বলিল "না, আলচু লামার শ্বশুরের তাঁবু।" আলচু লামা দু মাইল দূরে থাকেন। আমার গলা শুনিয়া আলচু লামার স্ত্রী বাহির হইয়া আসিয়া বলিল "তুমি লামার কাছে যেতে চাও, পথ বলিয়া দিতেছি, সঙ্গে লোক তোমায় লইয়া যাইতে পারে।" আমি বলিলাম "তুমি নিজের বাড়ী যাবে না?" "না, লামা বড় খারাপ লোক, তার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নাই।" আমি কত উপদেশ দিলাম—তারপর আহারাদি করিয়া লামার তাঁবুতে গেলাম। আমি গিয়া দেখি লামা বাড়ীতে নাই। তিনি আসিয়া আমার সমুদায় কষ্টের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ ঔষধ দিয়া পায়ের ক্ষত বাঁধিয়া দিলেন। তার-পরদিন আমায় জোলাপ দিয়া বলিলেন "কুকুরের বিষ শরীর হতে বাহির করা চাই।" ১৭ দিন সেখানে থাকিয়া অনেকটা সুস্থ হইলাম। শারীরিক ক্লেশও চূড়ান্ত ভোগ করিলাম, বুঝিতে বাকি রহিল না এই-প্রকার ক্লেশ আরো ভাগ্যে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই কষ্টের ভিতরও একটা তৃপ্তি পাইলাম। মনের আনন্দে কবিতা রচনা করিলাম। আমি লামাকে বলিলাম, স্ত্রীকে কেন বাপের বাড়ী পাঠাইয়াছ। লামা স্ত্রীর অশেষ গুণকীর্ত্তন করিতে বসিলেন। আমি বলিলাম "স্ত্রীলোকের ওসব দোষ ত্রুটি সহ্য করা পুরুষের কর্ত্তব্য—স্বামীর উদারতা থাকা চাই।" অনেক বুঝাইলাম, আমার কথার ফল ফলিল। লামা স্ত্রীকে আনিবার জন্য দুজন চাকর পাঠাইলেন। সুন্দরী অনেক ওজরআপত্তি করিয়া সেই দিনই আসিয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাদের ধর্ম্মকথা শুনাইলাম—তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে আমার উপদেশ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম আমার কথার ফল ফলিয়াছে। সেখানে ১০দিন বাস করিয়া বিদায় লইলাম।

৩৪ অধ্যায়।

গুহাবাসী সাধুর পুনর্দর্শন।

দেহ যখন সুস্থ হইল, তখন আলচু লামার নিকট গিলং ক্লিন পোচি সাধুর চরণ দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিলাম। লামা ও তাঁহার স্ত্রী আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তত হইলেন। সকলে অশ্বারোহণে চলিলাম। শীঘ্রই ১৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ১১টার সময় সাধুর গুহায় পৌঁছিলাম। দেখি সাধুর দর্শন-প্রত্যাশায় প্রায় ৩০জন লোক উপস্থিত। সকলে চলিয়া গেলে সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমায় থাকিতে বলিলেন, তখন লামা ও তাঁহার স্ত্রী বিদায় হইলেন। আমি একাকী রহিলাম। সাধুর সম্মুখে গিয়া বসিলাম। সাধু ধ্যানে মগ্ন। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলিলেন না। আলচু লামার নিকট শুনিয়াছিলাম, যে, সে-অঞ্চলে এইরূপ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল যে আমি চীনে নই, ইংরেজের চর। নিশ্চয় সাধুর কর্ণে একথা গিয়াছে, তাই বুঝি এত চিন্তা। হঠাৎ সাধু চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার লাসায় যাবার উদ্দেশ্য কি?"

আমি বলিলাম "বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা করে সকল জীবের পরিত্রাণের উপায় করব।"

"সকল জীবের পরিত্রাণের জন্য এত ব্যাকুল হবার কারণ কি?"

"জীবের যন্ত্রণা যে অসীম!"

"তাহলে সকল জীবেরই পরিত্রাণের কথাই ভাবছ?"

"অহংজ্ঞানবর্জ্জিত আমি, আমার অন্য ভাব সম্ভব নয়।"

সাধু হাসিয়া বলিলেন "সাধু! সাধু! ভাল, এক কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রণয়ব্যাপারে কখন পড়েছিলে কি?"

বলিলাম "এক সময় এ যন্ত্রণা ভোগ করেছি, এখন ও-সব উপদ্রব নাই—আর কখন হবার সম্ভাবনাও নাই।"

আবার প্রশ্ন:—

"ডাকাতেরা যখন তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল, তাদের উপর ঘৃণা হয় নাই? মনে-মনে তাদের অভিসম্পাত কর নাই?"

"কেন করিব? তাদের কল্যাণকামনা করিয়াছি। পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে আজ আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহারা আমায় পাপমুক্ত করিল!"

"ভাল! ভাল! তবু বলি লাসায় তুমি যেও-না, ও-পথে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত, তুমি নেপালে ফিরিয়া যাও। আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি লাসার পথে তোমার মৃত্যু।"

আমি কোন কথায় বিচলিত হইলাম না; তখন লামা আমায় ২০টি টাকা, বিস্তর খাদ্যসামগ্রী দিয়া বিদায় করিলেন এবং বলিলেন "পথে পথে আমার বিস্তর শিষ্য আছে, তাদের নিকট সাহায্য পাবে।"

আমি কিন্তু যে-পথে তাঁর শিষ্যরা আছে সে-পথে যাত্রা করিলাম না, পূর্ব্বদিকে সোজা লাসার পথে যাত্রা করিলাম। ১৯০- সালের ১৯এ অক্টোবর ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলাম। সেদিন যে-বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহার বৃত্তান্ত পরে বলিব।

৩৫ অধ্যায়।

সহজ সুবিধার দিনে।

আমি লাঠি দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ব্রহ্মপুত্রের জল স্থানে-স্থানে বড় গভীর। যেখান দিয়া সহজে পার হওয়া যাইবে মনে হইল সেইখান দিয়া আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম। কি সর্ব্বনাশ! দুপা যাইতে-না-যাইতে একেবারে চোরা বালির ভিতর ডুবিতে লাগিলাম, যত চেষ্টা করি তত আরও নীচের দিকে বসিয়া যাই। তখন পৃষ্ঠের বোঝা অপর পারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। কাপড়চোপড় ছাড়িয়া সব পারে ফেলিয়া দিলাম। বরফ-জলে, বরফের নিঃশ্বাসের মত বাতাসে আমার গায়ে একটু কাপড় থাকিল না। লাঠির সাহায্যে অনেক কষ্টে পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম। শীতে কাঁপিয়া মরি। ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া কোনরকমে পরিয়া আবার যাত্রা। অদূরে দেখি তাঁবু। পরম সৌভাগ্য আমার। সেখানে আতিথ্য পাইলাম। এবার তিব্বতের বড় রাস্তা ধরিয়া যাত্রা। তিব্বতে বড় রাস্তা বলিয়া কোন রাস্তা নাই—মানুষের পায়ের চিহ্ন থাকাতেই বড় রাস্তা। গাড়ীর বা রিক্স চলে এমন পথ একেবারে নাই। ৪ বৎসর পূর্ব্বে নেপালরাজ দলাই লামাকে এক চার-ঘোড়ার বিলাতী গাড়ী উপহার দেন। তাহা দলাই লামার প্রাসাদে আজও এক দর্শনীয় পদার্থের মত সজ্জিত আছে, কারণ সে গাড়ী চালাইবার পথ সে-দেশে নাই। লাসার পথে চলিয়াছি—পথে মরুভূমির মধ্যে দেখি এক তাঁবু! সে তাঁবু মদের দোকান। সম্প্রতি সেখানে এক মেলা হইয়া গিয়াছে, সেই উপলক্ষে ইহার অধিষ্ঠান। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল,

তন্মধ্যে সারেংএর এক বৃদ্ধা। আমাকে দেখিয়া তাঁর আনন্দ আর ধরে না, আমায় কত যে আদর করিলেন তাহা বলা যায় না।

পরদিন সেই বৃদ্ধা আমায় একটি চমরী ও একজন পথপ্রদর্শক দিলেন। আমি দক্ষিণ-পূর্ব্বে যাত্রা করিলাম। দিবাশেষে গয়ালবাস নামে একটি সে দেশের ধনীর তাঁবুতে পৌছিলাম। সে-রাজ্যে সে একজন বড়লোক—তার ২০০০ চমরী ৫০০০ ভেড়া, আর বিস্তর সম্পত্তি আছে। তার তাঁবু প্রকাণ্ড। লোকটির বয়স ৭৫, তার স্ত্রীর বয়স ৮০র উপর হইবে, সে বেচারী একেবারে অন্ধ! ইহারা নিঃসন্তান। তিব্বতে পোষ্যপুত্র গ্রহণের নিয়ম নাই। আমাকে এই স্থবির দম্পতি তাদের শাস্ত্র পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। আমারও বিশ্রাম চাই, আমি সহজেই রাজি হইলাম। বৃদ্ধ বলে "আমার নিকট এক বৎসর থাক।" সেই তাঁবুতে সেই প্রচণ্ড শীত কাটান অসম্ভব। আমি বৃদ্ধের নিকট লোমের জামা দুইটা লইলাম, তবু শীত ভাঙ্গে না। তার পর যে ঘটনা হয় তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না, যে, আমার পক্ষে সেখানকার শীত সহ্য করা অসম্ভব। একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময়ে গলার ভিতর কি যেন আটকাইতেছে মনে হইল, তখনই খানিকটা রক্ত উঠিল। তারপর সে কি রক্ত মুখ দিয়া পড়িতে লাগিল। আমার মহান ধর্ম্মের এমনি শিক্ষা, আমি একটুও বিচলিত হইলাম না, স্থির শান্তভাবে ঘাসের উপর বসিয়া রহিলাম, অনেক রক্ত উঠিল।

আমি যখন তাঁবুতে ফিরিলাম বৃদ্ধ গয়ালবাস আমার রক্তহীন ফ্যাকাসে চেহারা দেখিয়া একেবারে চমকাইয়া উঠিল। বলিল সে দেশের হাওয়ায় চীনেদের কাহারও কাহারও এমন হইয়া থাকে। বৃদ্ধ আমায় এক চমৎকার ঔষধ দিয়া বলিল, আর দুই-একদিন কিছু রক্ত উঠিতে পারে, কিন্তু তুমি তার পর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে। তার কথা ঠিক। লাসায় যতদিন ছিলাম আর রক্ত উঠে নাই। বৃদ্ধ আমায় দুধ-ঘী প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করাইয়া ৭ দিনে সবল করিয়া তুলিল। যাত্রার সময় লোমের জামা, টাকাকড়ি, আহারসামগ্রী উপহার দিল। ঘোড়া করিয়া লোক দিয়া আমায় অনেক দূর পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিল।

দশ মাইল গিয়া ১৯০০শালের ৯এ অক্টোবরে আজোপু নামক এক ব্যক্তির বাড়ী পৌছিলাম। দক্ষিণ-পূর্ব্বে যা। করিয়া ক্রমে নামিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌছিলাম। তখন দেখি নদীর উপরের জল জমিয়া রৌদ্রে চক্ চক্ করিতেছে। ব্রহ্মপুত্রের পারে এক তাঁবু দেখিলাম। তাঁবুস্বামীর নাম গয়ালপো। সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বালুকাময় জলাভূমি পদব্রজে পার হওয়া বড় কঠিন। গয়ালপো আস্তরণবিহীন এক ঘোড়া আমায় চড়িতে দিলেন। উত্তম ঘোড়সোয়ার আমি কোন কালে নই, তবু সাহস করিয়া চড়িলাম। সে যে কি কষ্ট, পায়ের ব্যথায় মরি। ঘোড়াচড়া আর পোষাইল না, এক লম্ফে নামিয়া পড়িলাম। তখন আমার নিজেরই পদদ্বয় কোন-রকমে আমায় লইয়া চলিল। ক্রমে ব্রহ্মপুত্রের সংকীর্ণ উপত্যকায় পড়িলাম। সেখান হইতে ব্রহ্মপুত্র হঠাৎ দক্ষিণের দিকে মুখ ফিরাইল—আমাদের গতি পূর্ব্বে, সুতরাং এইখানেই ব্রহ্মপুত্রের নিকট বিদায় লইলাম। ২০ মাইল পথ সেদিন চলিলাম। পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সমভূমিতে পড়িলাম। সন্ধ্যার সময় আবার বরফ গলা নদী পার হইলাম। পরদিন ১১ মাইল পথ গিয়া বেলা ১০টার সময় ১২০ গজ চওড়া এক নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। উপরে পাৎলা বরফ—আমার সঙ্গী বলিল রোদ উঠিয়া বরফ না গলিলে এ নদী পার হওয়া অসম্ভব। নদীর তীরে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া দ্বিপ্রহরের পর অনেক কষ্টে নদী পার হইলাম। বরফে পা কাটিয়া গেল। বরফজলে পা অবশ হইয়া গেল। তবু ১৮ মাইল চলিয়া এক তাঁবুতে উপস্থিত হইলাম। পরদিন ১লা নবেম্বরে ৯টার সময় যাত্রা করিয়া দ্বিপ্রহরে আর-এক নদী পার হইলাম। তার পর ১২ মাইল পথ গিয়া তাচুথ সহরে পৌছিলাম। সেখানে দেবমন্দির আছে—সেখানেই সে অঞ্চলের রাজস্ব আদায় হয়, বলিতে কি এত বড় সহর এ অঞ্চলে আর নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা দেবী।

পুস্তক-পরিচয়

চিত্রপট—শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত গল্প গ্রন্থ। প্রকাশক রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত ২০৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর পরিপাটি। সে হিসাবে মূল্য কমই হইয়াছে।

এই গল্পগ্রন্থে 'চিত্র', 'স্মৃতি' প্রভৃতি বারোটি গল্প আছে। ইতিপূর্ব্বে গল্পগুলি নানা মাসিকে ও 'কুন্তলীন পুরস্কারে' প্রকাশিত এবং পুরস্কৃত হইয়াছিল। লেখিকার শক্তি আছে। এক একটি গল্প চিত্রের মত নানা ভাব বর্ণ ব্যঞ্জনার উৎস ও উপভোগ্য। সহজ সলীল ভাষায় ও বিচিত্র রসের সমাবেশে গল্পগুলি বেশ জমিয়াছে। গল্পগুলি পড়িয়া আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

ছোট বড়—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এ, এ প্রণীত উপন্যাস। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত ৪৫৩ পৃষ্ঠা। প্রকাশক—সাহিত্য প্রচার সমিতি লিমিটেড, ২৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ছাপা কাগজ বাঁধাই চলনসই। মূল্য দেড় টাকা।

এই বিপুলকায় অনর্থকস্ফীত-কলেবর উপন্যাসটি দুটি জমিদার-ভ্রাতার অধঃপতন ও পুনরুত্থানের কাহিনী। উপন্যাসে যাঁহারা পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় দেখিতে চান, এ পুস্তক তাঁহাদের ভাল লাগিতে পারে। পতিতা 'বেলা'র চরিত্র ছাড়া আর কোন চরিত্র-সৃষ্টিতেই লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু মোহিতকে ভাল-বাসিয়া অভাগিনীর ব্যর্থ জীবনে যদি বা রমণীজন্মের সার্থকতা আসিল, গ্রন্থকার গঙ্গাগর্ভে তাহার সমাধি রচনা করিলেন! ইহাতে আপদ চুকিল বটে কিন্তু সমস্যা মিটিল না। বইখানির বর্ণনাভঙ্গী ও ভাষা মন্দ নহে।

উমা ও রমা—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিং হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ছাপা, কাগজ সুন্দর; বাঁধাই মামুলী সিল্কের। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৩৯৯ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

উমা ব্রাহ্মকন্যা, হিন্দুয়ানি বজায় রাখিয়া শিক্ষাপ্রাপ্তা; আর রমা হিন্দুর মেয়ে কিন্তু হিন্দু-নিয়মবহির্ভূত শিক্ষায়—অর্থাৎ বালিকা-বোর্ডিং-স্কুলের শিক্ষায় দীক্ষিতা। উমা পিতার নিকট সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, সমুদয় আয়ত্ত করিয়াছেন আর রমা স্কুলে সামান্য কয়েকখানা ইংরেজী কেতাব ইত্যাদি পড়িয়াছেন। উমার পিতা উমাকে গৌরীদান করিলেন আর রমার পিতা মৃত্যুকালে উইল করিয়া গেলেন যে বয়স্থা না হইলে যেন তাহার বিবাহ না হয়। তাই রমার কৈশোর উত্তীর্ণ হইলে বিবাহ হইল। উমার সঙ্গে বিবাহ হইল সুরপতির এবং "কালীর কৃপায়" ওকালতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া সুরপতি একেবারে যে শুধু চটপট হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকীল হইলেন তাহা নহে, যেদিনই তাঁহার ওকালতির দশ বৎসর পূর্ণ হইল সেই দিনই চীফ জষ্টিস তাঁহাকে খাস কামরায় ডাকাইয়া লইয়া হাইকোর্টের জজিয়তি দিতে চাহিলেন। কিন্তু দাসত্ব স্বীকারে সুরপতি সম্মত হইলেন না! আর ওদিকে রমার সঙ্গে বিবাহ হইল সুরপতির বন্ধু মন্মথের। মন্মথ বেচারা কোনমতেই বি, এ পাশ করিতে পারিল না; ব্যবসা ফাঁদিল, কিন্তু তাহাতেও ফেল মারিল। সুরপতি যাহা ধরেন তাহাতেই সোনা ফলে, আর মন্মথ সোনা ধরিলেও ছাই হইয়া যায়। উমা স্বামীগত-প্রাণ, স্বামীর পদধূলি সর্ব্বক্ষণই অঙ্গে লেপন করিতেছে; আর রমা স্বামীকে অপমান তো অল্প কথা, গাড়ীতে বসিয়া রাস্তার মাঝখানে পদাঘাতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হয় না! উমা মৃত্যুমুখে পতিত সুরপতির জন্য গায়ের রক্ত দিয়া তাহাকে বাঁচাইল, আর রমা নিজের গায়ের একখানা গহনা দিয়াও মন্মথকে জেল হইতেও বাঁচাইল না। উমা সতী সাধ্বী থাকিয়া সুরপতির কোলে মাথা রাখিয়া স্বর্গে গেল, কিন্তু রমা বিধবা হইয়া পুনরায় বিবাহ করিল; এবং আবার সে স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্য একজনের সঙ্গে বিলাত পলাইল এবং কুৎসিত রোগাক্রান্ত হইয়া বহু ক্লেশ পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ইহাই হইল গ্রন্থের মোটামুটি আজগুবি আখ্যান। এখন দেখা যাক্ গ্রন্থকারের কারসাজি কতদূর। 'বিজ্ঞপ্তি'তে গ্রন্থকার নিবেদন করিতেছেন যে "কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমাজের সম্মুখে নারীগণের ভীষণ অধোগতির বীভৎস নগ্ন চিত্রপটের আবরণ উন্মোচন করিতে অগ্রসর হইয়াছি।" নারীগণের ভীষণ অধোগতির বীভৎস নগ্ন চিত্রটা গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত। এ উপন্যাসে গ্রন্থকার তাঁহারই মনের নগ্ন চিত্রপটের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন এবং অসুস্থ ইন্দ্রিয়-বিকারের বীভৎস পরিচয় দিয়াছেন। উমাকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা আর রমাকে সর্ব্বদোষদুষ্টা করিয়া আঁকিয়া তিনি যে-সমাজকে ও সামাজিক আদর্শকে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন সে-সমাজের সম্বন্ধে তাঁহার এতটুকুও অভিজ্ঞতা নাই। উমা ও রমার চরিত্র দুটিতেই তাহার প্রমাণ।

উমা ও রমার মত সৃষ্টিছাড়া চরিত্র বাস্তব মানবচরিত্রের ধার দিয়াও ঘেঁষে না। আলো-অন্ধকারের সমাবেশেই মানবচরিত্রের সৃষ্টি। উমার চরিত্রে অত্যুজ্জ্বল আলোক নিক্ষেপ ও রমার চরিত্রে অন্ধকারের গাঢ় প্রলেপ নিতান্তই অস্বাভাবিক; জগতের কোনো লোকই নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা মন্দ নয়; কোনো সমাজই নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা মন্দ নয়, একথা গ্রন্থকারের জানা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মিথ্যা বকিতেছি; গ্রন্থকার তো সাহিত্য রচনা করিতে বসেন নাই, তিনি সম্প্রদায়-বিশেষকে ও ইংরেজী শিক্ষা আর আধুনিক সামাজিক রীতিকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য কলম ধরিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এ উদ্দেশ্যও সিদ্ধিলাভ করিবে না। এ যুগে বাংলা দেশের শিক্ষিতসমাজের মধ্যে এমন ব্যক্তি অনেক আছেন যিনি এই অস্বাভাবিক ও আজগুবি বীভৎস ও বিকৃত চরিত্রসৃষ্টি দেখিয়া গ্রন্থকারের রুচি ও বিদ্যাবুদ্ধিকে ধিক্কার দিবেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন —"ইংলণ্ডে উমার ন্যায় রমণীরত্ন দুর্লভ।" তিনি কি ইংলণ্ডের সকল রমণীর খবর রাখেন না কি? এমন উক্তি হয়তো উকীলের মুখে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু উপন্যাস ওকালতী নহে।

ভবিষ্যতে পুস্তক-রচনায় গ্রন্থকার যদি মার্জ্জিত রুচি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবিহীনতার পরিচয় না দেন তবে তিনি যতই আশা করুন, তাঁহার মত "অকিঞ্চনের যত্ন ও শ্রম কোনো কালে সার্থক" হইবে না। এ কথাটা তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত যে ছাপাখানার বিল মিটাইলেই ঔপ-ন্যাসিক হওয়া যায় না, এমন কি "কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে"ও নয়।

ইন্দুমতী—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল, বি, এ প্রণীত "গার্হস্থ্য উপন্যাস"। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৮৩ পৃষ্ঠা। প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যমুনা-পুস্তক-বিভাগ, ১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ টাকা। কাগজ ও বাঁধাই বেশ কিন্তু মুদ্রণপারিপাট্য তদনুরূপ নহে, মুদ্রাকরপ্রমাদ অনেক রহিয়া গিয়াছে।

প্লটটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই:- 'ইন্দুমতীর দেহে রূপ ঠিকরাইয়া পড়া' সত্ত্বেও অর্থাভাবে তাহার বিবাহ হইল না। বহু চেষ্টার পর এম, এ পাশ ললিতচন্দ্রের সহিত ইন্দুমতীর বিবাহ হইল। বিবাহটা হইল কিন্তু পাত্রের জননীর সম্পূর্ণ অমতে। এজন্য বেচারী ইন্দু তাহার শাশুড়ীর সকল রোষ ও ক্ষোভের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল এবং কিছুদিন পরে তিনি মিথ্যা অপবাদ দিয়া অন্তঃসত্ত্বা ইন্দুকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিলেন। ললিতচন্দ্র তখন অনুপস্থিত, ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত শুনিল।

সে বিশ্বাস ঠিক করিল না; কিন্তু সত্যমিথ্যা অনুসন্ধানের সাহস তাহার কুলাইয়া উঠিল না; কিছুদিন পরে সুবোধ বালকের মত আবার বিবাহ করিল। এ পাত্রী তাহার মাতার পূর্ব্বনির্ব্বাচিতা ধনীর কন্যা। নূতন বধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া প্রতিপদে ধন-ঝঙ্কার দিয়া চলিতে লাগিল। কথায় কার্য্যে ব্যবহারে সে বারবার বুঝাইয়া দিল—"এ দীন কুটিরে আমি থাকতে পারব না, পারবনা। আমি ধনীর মেয়ে, যত গরীব লোক সব তফাৎ থাক।" শাশুড়ীর মনে তখন ইন্দুর জন্য অনুতাপ আসিল। সুবোধ বালক 'এম, এ পাশ' ললিতচন্দ্র স্ত্রীর উদ্ধত ব্যবহার সহিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে গৃহবিতাড়িত ইন্দু নানা মিথ্যা নিন্দা কলঙ্কের বোঝা বহিয়া ফিরিতে লাগিল। এমন অবস্থায় তাহার সন্তান হইল। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে সে পুনরায় 'পতিদেবতার' গৃহেই ফিরিয়া আসিল। নববধূর ব্যবহারে বিরক্তা ও অনুতপ্তা শাশুড়ী তাহাকে আবার ঘরে তুলিয়া লইলেন; নববধূ আমোদিনী পিতৃগৃহে চলিয়া গেল।

এই উপন্যাসটির আগাগোড়া চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক। গ্রন্থকারের অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। বইখানি পড়িলে মনে হয় সকলেই যেন একটা বাঁধা ভূমিকা অভিনয় করিতেছে। তাহার পর নানাপ্রকার অসঙ্গতিতে বইখানি আগাগোড়া পূর্ণ। "ইন্দুর এগার বৎসর বয়স হইতে পাত্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে দীর্ঘ চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু তাহার উপর প্রজাপতির কৃপা বর্ষিত হইল না।" অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর ইন্দুর বিবাহ হইল। কিন্তু ৮৫ পৃষ্ঠায়, ইন্দুর শাশুড়ী যখন ইন্দুকে তাড়াইয়া দিতেছেন তখন, দেখিতেছি "ইন্দু এইমাত্র পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।" ১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া এতকাল শ্বশুরবাড়ী থাকিয়াও ইন্দুর আর সেই ১৫ বৎসর শেষ হইল না? আশ্চর্য্য বটে। এইরকম অসঙ্গতি অনেক আছে কিন্তু আর তালিকা বাড়াইতে চাই না।

সই-মা—ও অন্যান্য গল্প। শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহৃষিকেশ মিত্র, মিত্র এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস বিলডিং, কলিকাতা।

এ বইখানিও 'ইন্দুমতী'-রচয়িতার হাত হইতে বাহির হইয়াছে; অথচ কি আশ্চর্য্য তফাৎ!

এই ছোট গল্পগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই এমন একটি স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত যাহা হৃদয়কে স্পর্শ করে। লেখার ভঙ্গীটাও সুন্দর, কোথাও ভাবের বা ভাষার আতিশয্য নাই। গল্পের প্রত্যেকটি লোক সজীব ও স্বাভাবিক। 'সই-মা' ও 'গৃহলক্ষ্মী' গল্পদুটি আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে। যাঁহারা ছোটগল্প ভালবাসেন এ বইখানি পড়িলে তাঁহারা খুসী হইবেন। আমাদের মনে হয়, উপন্যাস লেখা ছাড়িয়া ছোট গল্প লিখিতে থাকিলে লেখক খ্যাতিলাভ করিতে পারেন।

অহম্।

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য—প্রথম খণ্ড। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এবং পপুলার লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ৩ টাকা। ৪৫৬ পৃষ্ঠা।

মুসলমান আমলে রাজকীয় সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। বাঙ্গালা দেশের সাময়িক পত্রের সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এখনও অনেক কম। এ কথা শুনিয়া হয়ত অনেকে বিস্মিত হইবেন, কিন্তু ইহা সত্য। লেখকের মতে ইংরেজী ও ফরাসি সাময়িক পত্র জাতীয় উন্নতির বিষয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সদেশে যতটা সহায়তা করিয়াছে, বাঙ্গলা সাময়িক পত্র এদেশে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়াছে। মিশনরিগণই বাঙ্গালাদেশে শিক্ষা ও সাময়িক পত্রের প্রথম প্রচার করেন। তাঁহারা স্কুল স্থাপন করিলে প্রথমতঃ এই আপত্তি হয়, ব্রাহ্মণগণ কিরূপে অন্য জাতির সহিত একাসনে বসিয়া পড়িবে? ছাপার পুঁথি পড়িতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজই আপত্তি করিয়াছিল। সেকালের গুরু মহাশয়দের বিগর্হিত আচরণ ও দুর্নীতিদুষ্ট শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্মজীবনীতে অনেক কথা জানা যায়। ঈশ্বর গুপ্তই প্রথমতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এরূপ বলা যায়।

"এই সময়ে বঙ্গীয় সমাজের রুচি কবির টপ্পা ও খেয়ালের উপরই আবদ্ধ ছিল। অশ্লীল গালাগালি, কবির লড়াই, খেউড় সাধারণের পাঠের ও উপভোগের সামগ্রী ছিল।......ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁহার বন্ধু গৌরীশঙ্কর সমাজের অবস্থা ও রুচি প্রত্যক্ষ করিয়াই "প্রভাকর" ও "ভাস্কর" "রসরাজ" ও "পাষণ্ডপীড়ন" সেই সাময়িক রুচির স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।" এদিকে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র এবং রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিতে দেখা যায়, মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান শিক্ষিত সমাজের নিকট সভ্যতা ও সমাজসংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইলে অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবক বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভাষাতেও গভীর ভাব প্রকাশ করা যায় এবং তাহারও একটা শক্তি আছে।" ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থসংগ্রহ" ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে "বামাবোধিনী পত্রিকা", ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের "ধর্ম্মতত্ত্ব" এবং ১২৭৯ সালে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকে এইসকল কথা বিবৃত করিয়া লিখিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদপত্রের জীবনসংগ্রাম ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। দ্বিতীয় অংশে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "বেঙ্গল গেজেট" হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ বিশেষ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সূচী, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি দ্বারা গ্রন্থকার পাঠকের যথাসম্ভব সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। বহুতর উৎকৃষ্ট চিত্র সংযোগে পুস্তকখানি সুদৃশ্য হইয়াছে। মলাট ও বাঁধাই সুন্দর, ছাপা কাগজ ভাল। গ্রন্থকার যেরূপ অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক প্রশংসার্হ। বক্তব্য বিষয়গুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা-কিছু জ্ঞাতব্য ও কৌতূহলোদ্দীপক তাহা তাঁহার পুস্তকে আছে। ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাময়িক সাহিত্যের বিবরণ এই খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তৎপরবর্ত্তীকালের বিবরণ পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় খণ্ড লেখা হইয়াছে আশা করি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নকল্পে বর্ত্তমান গ্রন্থখানি অপরিহার্য্য হইবে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

প্রহেলিকা—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। মূল্য বাঁধাই ২৲ টাকা। ১৩২৬ সাল।

এই উপন্যাসখানি ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—এত বড় উপন্যাস বঙ্গভাষায় কচিৎ দৃষ্ট হয়। আখ্যানবস্তু সরল ও আড়ম্বরহীন—সহজ কথা সহজ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠককে এক নিশ্বাসে শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্র করিয়া তোলে না। পূর্ব্ববঙ্গের একটি বৃহৎ নদী কত কানন প্রান্তর, কুঞ্জ, কুটির প্রভৃতির পার্শ্ব দিয়া অনাবিল গতিতে বহিয়া গিয়াছে সেই নিভৃত শ্যামশস্যক্ষেত্র-পরিবৃত প্রচ্ছন্নভূমির সম্মুখে লেখক নবী

ভাবের নবীন চিন্তার বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা কেবল বাংলার পল্লীজীবনের অলস দিনগুলির স্বপ্নময় কাহিনী নহে, ইহাতে বর্ত্তমান বাংলার কঠোর জীবনসমস্যাগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া দেখান হইয়াছে। যে-সকল বিষয়ে সমাজ মূক, স্বাধীনচিন্তা পঙ্গু, যেখানে ধর্ম্ম বাঙ্গালীর কণ্ঠে সুবর্ণশৃঙ্খল, 'প্রহেলিকা'য় তাহা প্রচারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রধান চরিত্রসমূহের মুখে গ্রন্থকার এই-সকল সমস্যা সমাধানের মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। স্বদেশহিতৈষণা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে কিরূপে নবীন কর্ম্মপথে প্রধাবিত করিতেছে, নির্ব্বীর্য্য জাতি কিরূপে আবার নবশক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পাইতেছে, আমরা এই উপন্যাসখানিতে তাহার পরিচয় পাই। কোম্‌তের দার্শনিক মত গ্রন্থকারের অবলম্বন, বিশ্বমানবের হিতচিন্তা তাঁহার আদর্শ। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই এই পুস্তকে উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বরহস্য তাঁহার নিকট প্রহেলিকাই রহিয়া গিয়াছে। ভগবান তথাগতের নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক এসম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়ার বিফল চেষ্টা না করিয়া বাস্তব জগতের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার জন্যই তিনি ব্যগ্র হইয়াছেন—বাঙ্গালী কিসে সার্থকজন্মা হইতে পারে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার তূলিকা প্রতিরেখাপাতে দেখাইয়াছে যে স্থবির হিন্দুজাতি তাহাদের তথাকথিত পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিয়া, সংসার অসার ও জীবন দুঃখময় এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে জাতীয় জীবনকে ব্যর্থ করিয়াছে। রাজনীতির আপাতরম্য অন্তঃসারশূন্য বাক্‌চাপল্যে তিনি মুগ্ধ হন নাই; তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন যে, ভিত্তি হইতে গড়িয়া না তুলিলে জাতীয় উদ্বোধন কখনই সম্ভবপর নহে। তাই তিনি কহিয়াছেন—জাতিভেদ দূর কর, যুগে যুগে সঞ্চিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের দাসত্ব পরিহার কর, প্রাচীন শাস্ত্রবেত্তাগণ যে-সকল অর্থশূন্য যুক্তিহীন ক্রিয়া-কাণ্ড প্রিয়জ্ঞানে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন সে-সমুদায় বর্জ্জন কর। সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্ত্তন, অধঃপতিত জাতিসমূহের উত্থানের ব্যবস্থা, স্বাধীন চিন্তার প্রসার, এবং বিচারবিহীন শাস্ত্রানুশাসন লঙ্ঘন করিবার শক্তি ও সাহস, এগুলি জাতীয় উন্নতির পক্ষে যে কতদূর আবশ্যক, তাহা এই স্বদেশপ্রেমিক লেখক পুনঃ পুনঃ ওজস্বী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থকার যে বহু অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়াছেন, এই বইখানিতে তাহার অনেক পরিচয় বর্ত্তমান। চিন্তাশীল পাঠকের উপভোগ্য অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লেখকের ধর্ম্মসমস্যা কেবল তাঁহারই নিজস্ব নহে—ইহার কতকটা এই যুগেরই বিশেষত্ব। ধর্ম্মান্ধতা অপেক্ষা এই সংশয় অধিকতর মানসিক স্বাস্থ্যেরই পরিচয় দান করে। মানব-হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর রহস্যগুলির সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করিতে গিয়া তিনি আদৌ সন্ধির কল্পনা করেন নাই, বিশ্বাসে যে শান্তি তাহা অপেক্ষা জ্ঞানে যে মুক্তি তিনি তাহাই বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন। এরূপ নির্ভীক, স্যায়নিষ্ঠ, স্পষ্টবাদী লেখক বাঙ্গালায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধযুক্তিমূলক ধর্ম্মবাদ পাশ্চাত্য জগতেও এখন আর আদর্শ বলিয়া গণ্য হয় না, তথায় শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকগণ ধর্ম্মের উচ্চতর সমন্বয় সন্ধানে ব্যাকুল। এই ভক্তিপ্রবণ ভারতভূমিতেও এ তথ্য নূতন নহে; যে দেশের প্রাচীন ঋষিগণ বার্হস্পত্য ও সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, যে দেশ একদা বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র ছিল, যে দেশের বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ নিরীশ্বরবাদ হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে, হেতুবাদ সে দেশে কোন নূতন তত্ত্ব বহন করে না। বস্তুতঃ সামাজিক সমস্যার সমাধানেই লেখকের চেষ্টা সবিশেষ ফলবতী হইবে।

গ্রন্থের নায়ক বিজয় ও হেমেন্দ্র পল্লীগ্রামের দ্বারে দ্বারে স্বাস্থ্য সম্পদ ও জ্ঞান বিতরণ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করি দিতেছেন। সমাজে যে সুখ শান্তি ও সরলতা ছিল, চিত্তে যে সন্তো বিরাজ করিত, যাহার কল্যাণে জীবন একটি স্নিগ্ধ সুন্দর স্বপ্নের ম কর্ম্ম জগতের অন্তরালে নিঃশব্দে ভাসিয়া যাইত, লেখক তাহার সহি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে মনুষ্যত্ব বিকশিত হই উঠিলে আমরা বিশ্বসভায় কৃতী পুরুষদিগের সহিত একাসনে উপবেশনে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব, লেখকের আশাদৃপ্ত দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

গ্রন্থের কতকগুলি চরিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিজয় ও অন দুটি বিপরীত আদর্শ প্রকটিত করিতেছে। একটি আধুনিক-শিক্ষি উন্নতিমার্গাবলম্বী তেজস্বী পুরুষ,—সে মনে করে ইহসংসারই সক সংসারের সার, এখানে থাকিয়াই নিজের ও অপরের জীবনকে সুখ সার্থক ও পূর্ণ করিতে হইবে। বিজ্ঞানের খড়্গ লইয়া মনুষ্যত্বের ম উদ্বুদ্ধ হইয়া সে দৃঢ়পদে যুদ্ধের জন্য অবস্থিত। আর-একজন যাহা কিছু দুর্জ্ঞেয় তাহাতেই আস্থাবান, সর্ব্বদা দুঃখী; সে মনে করে আমাদের দুঃখদৈন্য সকলই অপার কারুণিক পরমেশ্বরের অভ্রান্ত নিয় সংঘটিত হইতেছে, এ শাসনে মূকের ন্যায় অবস্থান করাই পরমধর্ম্ম এই দুটি চরিত্র, হেতুবাদের যুগ ও অসীম বিশ্বাসের যুগের প্রতিমূর্ত্তিরূপে লেখক নানা অবস্থার ভিতর দিয়া সুন্দর ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়া ছেন। প্রভাবতী ও তাহার স্বামীর ভালবাসার চিত্রটি অতি মনোর কলঙ্কহীন ও সুন্দর। বাংলার পল্লীজীবনের দৈনন্দিন ঘটনাগু সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সূক্ষ্মদৃষ্টি সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। তিনি প্রকৃতির উপাসক শোভন সংযত ও সুন্দর গার্হস্থ্যজীবন বর্ণনায় সুদক্ষ, মানুষের কর্ম্মে চিন্তায় যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ তৎপ্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ তাঁহার লেখনীকে সার্থক করিয়াছে।

উপাখ্যান-বস্তুর মনোহারিত্ব অথবা ভাষা ও চরিত্রচিত্রণে কৌশলের জন্য পাঠক এ পুস্তক পড়িবেন না; ইহার নানাস্থানে যে ভাবসম্প বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাহাই পাঠককে আকর্ষণ করিবে। গ্রন্থকারের রচনানীতি সরল ও ভাবব্যঞ্জক; তবে অনেকস্থলে গ্রাম্যতা-দোষ-দু এবং স্থানে স্থানে মনে হয় এখনও তিনি দৃঢ়তার সহিত তূলিকা ধারণে অভ্যস্ত নহেন। ভাবসম্পদে পুস্তকখানি যেরূপ সুন্দর, তাহাতে দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার এই-সকল ত্রুটির সংস্কার করিলে সুখের বিষয় হইবে

শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এই বইখানির বিশেষ আদর হইবে। যাঁহারা কেবল কালহরণ অথবা ক্ষণিক আমোদের জন্য উপন্যাস পাঠ করেন না, জ্ঞানলাভও উদ্দেশ্য থাকে, তাঁহারা ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। যে-সকল সামাজিক সমস্যা এখন হিন্দুজাতির সম্মুখে বিশেষরূপে উপস্থিত হইয়াছে, সামাজিক জীবনের স্বাস্থ্য ও উন্নতির পক্ষে যাহার সমাধান একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে যাঁহারা ভাবেন, সেই-সকল স্বজাতিপ্রেমিক চিন্তাশীল পাঠকগণ অনেক দিন এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পান নাই।

পুস্তকখানির বাঁধাই ভাল এবং দেখিতেও সুন্দর; কিন্তু মুদ্রাকর-প্রমাদের অত্যন্ত বাহুল্য আছে।

শ্রী—।

প্লেটো—সোক্রাটীসের কারাবাস

(ক্রিটোন—মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত।)

১। সোক্রাটীস—ক্রিটোন, তুমি এ সময়ে কেন আসিয়াছ ? না এটা প্রত্যূষকাল নয় ?

ক্রিটোন্—হাঁ, খুবই প্রত্যূষ বটে।

সোক্রা—এখন রাত্রি কয় দণ্ড ?

ক্রি—উষার প্রথম মুহূর্ত্ত।

সোক্রা—কি করিয়া কারারক্ষক দ্বারে আঘাত শুনিয়া দ্বার খুলিল, ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি।

ক্রি—আমি এখানে সচরাচরই আসি কি না, সোক্রাটীস্, এজন্য সে আমাকে জানে; তা ছাড়া, সে আমার নিকটে কিছু উপকারও পাইয়াছে।

সো—তুমি কি অনেকক্ষণ হইল আসিয়াছ ?

ক্রি—হাঁ, কিয়ৎক্ষণ হইল আসিয়াছি।

সো—তবে তুমি আমাকে কেন তখনি জাগাও নাই ? তুমি চুপ করিয়া বসিয়া ছিলে কেন ?

ক্রি—হাঁ, সোক্রাটীস্, তোমাকে জাগাই নাই বটে; আর আমিও চাই যে আমাকে এমনতর অনিদ্রা ও উদ্বেগে কালযাপন করিতে না হয়; আমি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, যে, তুমি এমন সুখে ঘুমাইতেছ। তুমি যাহাতে পরমসুখে থাকিতে পার, এজন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই তোমাকে জাগাই নাই। পূর্ব্বে বহুবার এবং তোমার সমস্ত জীবন আমি তোমার মন দেখিয়া তোমাকে সুখী বলিয়াছি, আর এক্ষণে এই প্রত্যাসন্ন মহাবিপদ তুমি কেমন অক্লেশে ও প্রসন্নচিত্তে বহন করিতেছ, ইহাতে আমি যে তোমার মনের কত প্রশংসা করিতেছি, বলিতে পারি না।

সো—না, ক্রিটোন্, এই বয়সে মরিতে হইবে বলিয়া যদি আমি ক্ষুব্ধ হইতাম, তবে তাহা নিতান্তই অশোভন হইত।

ক্রি—সোক্রাটীস্, অপর অনেকেই এই বয়সে এই-প্রকার বিপদের গ্রাসে পতিত হয়; কিন্তু তাহারা যে এই বিপদে ক্ষুব্ধ হয়, তাহাদিগের বয়স তো তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না।

সো—সে কথা ঠিক্। কিন্তু তুমি এত প্রত্যূষে কেন আসিয়াছ ?

ক্রি—বড় দুঃখের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, সোক্রাটীস্; বোধ করি তোমার নিকটে ইহা দুঃখের সংবাদ নয়, কিন্তু আমার ও তোমার অন্য সুহৃদের পক্ষেই সংবাদটি দুঃখময় ও দুর্ভর; বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে, যে, আমার পক্ষে উহা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ।

সো—সংবাদটি কি ? তবে কি ডীলস্ হইতে পোত ফিরিয়া আসিয়াছে ? উহা ফিরিয়া আসিলেই তো আমাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

ক্রি—না, একেবারে আসিয়া পঁহুছে নাই; কিন্তু যাহারা সৌনিয়মে পোত রাখিয়া আসিয়া এখানে সংবাদ দিয়াছে, তাহাদিগের কথায় আমার বোধ হইতেছে, যে, উহা আজই আসিবে। তাহাদিগের বার্ত্তা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, উহা অদ্যই আসিয়া পঁহুছিবে; তাহা হইলে তো, ও সোক্রাটীস্, নিশ্চয়ই আগামী কল্যই তোমার জীবনের অবসান হইবে।

২। সো—আচ্ছা, ক্রিটোন্, কল্যাণ হউক; যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই হউক। কিন্তু আমি বিবেচনা করি না, যে, পোত আজই আসিবে।

ক্রি—কিসে তোমার এই-প্রকার প্রতীতি হইল ?

সো—আমি তোমাকে বলিতেছি। যে দিন পোত আসিয়া পঁহুছিবে, তাহার পরদিনই না আমায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে ?

ক্রি—কারাধ্যক্ষ রাজপুরুষেরা তো এইরূপই বলিতেছেন।

সো—তবে আমি বিবেচনা করি, যে, উহা আজ আসিবে না, কিন্তু আগামী কল্য আসিবে; আজ রাত্রিতেই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা হইতেই আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে। তুমি যে আমাকে জাগাও নাই, এজন্য ইহা বিলক্ষণ সময়োচিতই হইয়াছে।

ক্রি—স্বপ্নটা তবে কি ?

সো—আমার বোধ হইল যে সুন্দরী ও সুদর্শনা শ্বেত-বসনপরিহিতা কোনও নারী আমার নিকটে আগমন করিয়া আমাকে ডাকিলেন ও বলিলেন, "হে সোক্রাটীস্, অদ্যাবধি তৃতীয় দিবসে তুমি উর্ব্বরা ফ্থিয়া দেশে উপনীত হইবে।"

ক্রি—অদ্ভুত স্বপ্ন, সোক্রাটীস্।

সো—কিন্তু, ক্রিটোন্, আমার তো বোধ হয়, ইহার অর্থ সুস্পষ্ট।

৩। ক্রি—হাঁ, খুবই সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে বৈ কি। কিন্তু, হে দেব সোক্রাটীস্, এখনও আমার কথা শুন ও আপনাকে রক্ষা কর। কারণ, তুমি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে তাহাই আমার পক্ষে একমাত্র বিপদ নহে; আমি তোমার মত সুহৃদে তো বঞ্চিত হইবই—এমন সুহৃদ্ আমি আর কখনও পাইব না—তা ছাড়া, যাহারা আমাকে ও তোমাকে ভাল করিয়া জানে না, এমন বহুলোকে মনে করিবে যে আমি অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছুক হইলেই তোমাকে বাঁচাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি তাহাতে অবহেলা করিয়াছি। এই অখ্যাতি অপেক্ষা, অথবা আমি প্রিয়জন হইতে অর্থকেই অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করি, লোকে যে আমার সম্বন্ধে ইহাই ভাবিবে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জার বিষয় আর কি আছে? কেন না, লোকে ইহা কখনই বিশ্বাস করিবে না, যে, তুমি নিজেই এস্থান হইতে পলায়ন করিতে চাহ নাই, যদিচ আমরা তোমার সহায়তা করিতে খুবই ব্যগ্র ছিলাম।

সো—কিন্তু, হে ভাগ্যধর ক্রিটোন, আমরা লোকের খ্যাতিকে এত গ্রাহ্যই বা করিব কেন? যাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহাদিগের মত অধিকতর বিবেচনাযোগ্য, তাঁহারা, আমরা যাহা যেমন করি, তাহা তেমনই ভাবিবেন।

ক্রি—কিন্তু, সোক্রাটীস, তুমি তো দেখিতে পাইতেছ, যে, লোকের মতকেও গ্রাহ্য করিতে হয়। এক্ষণে এই উপস্থিত ব্যাপার হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে, কেহ যদি জনসাধারণের নিকটে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তবে তাহারা যে তাহার বড় অল্প ক্ষতি করিতে পারে, তাহা নহে, বরং তাহারা বলিতে গেলে যৎপরোনাস্তি গুরুতর ক্ষতিই করিয়া থাকে।

সো—ক্রিটোন্, আমি তো চাই-ই, যে, জনসাধারণ যেন যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়, কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা যতদূর সম্ভব কল্যাণ করিতেও সমর্থ হইবে; তাহা হইলে তো ভালই হইত। কিন্তু এখন তাহারা এই দুইয়ের কোনটিই করিতে পারে না; তাহারা কাহাকে জ্ঞানীও করে না, মূর্খও করে না; দৈব-বশে যখন যাহা করিতে হয় তাহারা তাহাই করিয়া থাকে।

৪। ক্রি—আচ্ছা তাহাই হউক; কিন্তু, সোক্রাটীস আমাকে এই কথাটা বল। তুমি অবশ্যই আমার ও অন্যান্য সুহৃদের জন্য এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হও নাই, যে, তুমি যদি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, তাহা হইলে গুপ্তচরেরা আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে; তাহারা বলিবে, যে, আমরাই তোমাকে অপহরণ করিয়াছি; তখন বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইবে, এমন কি আমরা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইব, অথবা ইহা ছাড়া আরও দণ্ডভোগ করিব; তুমি কি ইহাই ভাবিতেছ? যদি তোমার এই-প্রকার আশঙ্কা হইয়া থাকে, তাহা দূর কর। কেন না, তোমাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগের পক্ষে এইপ্রকার, এবং আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বিপদ আলিঙ্গন করা ন্যায়সঙ্গত। অতএব, আমার কথা শুন, উহার অন্যথা করিও না।

সো—হাঁ, ক্রিটোন্, আমি এইরূপ ভাবিতেছি বৈ-কি; তা ছাড়া আরও কত কথা ভাবিতেছি।

ক্রি—তবে এরূপ আশঙ্কা মনে স্থান দিও না। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন নাই—এমন লোক আছে যাহারা অল্প কিছু পাইলেই তোমাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবে। তারপর, তুমি তো দেখিতে পাইতেছ, যে, এই গুপ্তচরগুলি সুলভ, ইহাদিগের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না? আমার যাবতীয় অর্থ তোমার জন্য নিয়োজিত হইতেছে; আমি বিবেচনা করি, উহাই যথেষ্ট। আর যদিই বা তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন বলিয়া আমার অর্থ ব্যয় করিতে না চাও, এই নগরে তোমার পরিচিত এমন বিদেশী লোক আছে, যাহারা অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত; তাহাদিগের মধ্যে একজন, থীব্‌স্-নিবাসী সিম্মিয়াস, এই উদ্দেশ্যেই পর্য্যাপ্ত অর্থ লইয়া আসিয়াছে; কেবীস এবং আরও বহু ব্যক্তি অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত। অতএব, আমি বলি, যে, তুমি এই-প্রকার আশঙ্কা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইও না, অথবা তুমি বিচারালয়ে যাহা বলিয়াছিলে তাহাও একটা দুরতিক্রম্য-প্রতিবন্ধক মনে করিও না, যে, তুমি নির্ব্বাসিত হইলে

আপনাকে লইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছ না। কারণ, অন্যত্রও এমন বহুস্থান আছে, যেখানে উপস্থিত হইলে তোমাকে লোকে ভালবাসিবে। যদি তুমি থেসালী-প্রদেশে যাইতে চাও, সেখানে আমার বন্ধুগণ আছে; তাহারা তোমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিবে ও আশ্রয় দিবে, সুতরাং থেসালীর অধিবাসীরা তোমাকে কিছুমাত্র ক্লেশ দিতে পারিবে না।

৫। তারপর, সোক্রাটীস, আমার নিকটে ইহা সঙ্গত কার্য্য বলিয়াও বোধ হইতেছে না, যে, যখন আত্মরক্ষা করা সাধ্যায়ত্ত, তখন তুমি আপনার জীবন সমর্পণ করিতে যাইতেছ। তোমার শত্রুরা যেজন্য ব্যগ্র, যাহারা তোমাকে বিনাশ করিতে চাহে, তাহারা যেজন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তুমি আপনার বিষয়ে তাহাতেই ত্বরান্বিত হইতেছ। তাহা-ছাড়া আমার বিবেচনায় তুমি তোমার পুত্রদিগকেও বিসর্জ্জন করিতেছ; তুমি তাহাদিগকে লালন-পালন ও শিক্ষাদান করিতে পারিতে; কিন্তু এক্ষণে তুমি এই করিতেছ, যে, তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, আর তাহারা নিয়তিক্রমে যাহা ঘটে, তাহাই করিবে। পিতৃমাতৃহীন বালকদিগের ভাগ্যে যেমন ঘটিয়া থাকে, সম্ভবতঃ তাহাদিগের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। হয় সন্তান উৎপাদন করাই উচিত নহে, না হয় তাহাদিগকে লালন পালন ও শিক্ষাদানের ক্লেশ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমার বোধ হইতেছে, তুমি সহজতম পন্থাই গ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু তুমি বলিয়া আসিতেছ, যে, সারাজীবন তুমি ধর্ম্মের জন্যই যত্নশীল রহিয়াছ; তোমার এমন পন্থাই গ্রহণ করা উচিত ছিল, যাহা সাধু ও বীর্য্যবান্ পুরুষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমি কিন্তু তোমার ও তোমার বন্ধুজন আমাদিগের জন্য লজ্জা বোধ করিতেছি; লোকে বা ভাবে যে তোমার পক্ষে যাহা ঘটিয়াছে,—তোমার বিচারের মুখবন্ধ; তোমার বিচারালয়ে আগমন, যদিও তুমি বিচারালয়ে না আসিয়াও পারিতে; তৎপরে তোমার বিচার-পরিচালন ও তাহার পরিণাম, এবং পরিশেষে, এই ব্যাপারটিকে যেন পূর্ব্বাপর উপহাসাস্পদ করিবার জন্যই এই অন্তিম দৃশ্য—এ সমস্তই আমাদিগের কাপুরুষতার ফল; লোকে মনে করিবে, যে, আমাদিগের ভীরুতা ও মনুষ্যত্বহীনতার জন্যই তুমি আমাদিগের নিকট হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছ; কেন না, আমরাও তোমাকে রক্ষা করি নাই, তুমিও আপনাকে রক্ষা কর নাই, যদিচ, আমাদিগের যদি কিছুমাত্রও পদার্থ থাকিত, তাহা হইলেই তোমাকে রক্ষা করা সম্ভব ও সাধ্যায়ত্ত ছিল। অতএব, সোক্রাটীস, দেখিও, এগুলি শুধু অকল্যাণকর নয়, কিন্তু তোমার ও আমাদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয়ও কি না। অতএব ভাব; অথবা ভাবনার সময় অতীত হইয়াছে; ভাবনা করা হইয়া গিয়াছে। পন্থা কেবল একটি; যাহা করিবার, সমুদায় এই রাত্রিতেই করিতে হইবে। আমরা যদি এখন বিলম্ব করি, তবে আর কিছুই করা সম্ভব ও সাধ্যায়ত্ত হইবে না। হে সোক্রাটীস, মিনতি করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার কথা রাখ, কদাচ উহার অন্যথা করিও না।

৬। সো—হে প্রিয় ক্রিটোন, তোমার উৎসাহ যদি কোনও ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে হয়, তবে উহা পরম আদরণীয়; কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে উহা যত প্রবল, ততই বিপজ্জনক। অতএব, আমাদিগের দেখা উচিত, যে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা করণীয় কি না। আমি চিরকাল যেমন ছিলাম, এখনও তাহাই আছি—আমি বিচার করিয়া যে যুক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই যুক্তি ভিন্ন আমার যাবতীয় ব্যাপারে আমি আর কাহারও কথাই শুনি না। আমি পূর্ব্বে যে-সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছি, আমার ভাগ্যে এক্ষণে এই নিয়তি ঘটিয়াছে বলিয়া আমি সেগুলি অগ্রাহ্য করিতে পারি না; বরং তদনুরূপ যুক্তি এখনও আমার নিকটে শ্রেষ্ঠ বোধ হইতেছে, এবং আমি পূর্ব্বের মত সেগুলিকেই শ্রদ্ধা ও পূজা করি; আমরা যদি এখন সেগুলি অপেক্ষা সঙ্গততর কিছু বলিতে না পারি, তবে তুমি বেশ জানিও, যে, আমি কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না; শিশুগণকে যেমন লোকে ভূতের ভয় দেখায়, তেমনি জনসাধারণের প্রতাপ যদি আমাদিগকে শতবার কারাবাস, মৃত্যু-যন্ত্রণা ও অর্থদণ্ডের ভয় দেখাইয়া ভীত করিতে চাহে, তথাপি নহে। তবে আমরা কি করিয়া উপস্থিত প্রশ্নটির খুব সঙ্গতরূপে পরীক্ষা করিব? তুমি লোকের মতামত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, আমরা কি প্রথমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব? আমরা যে

মানিয়া লইয়াছি, যে, কোন কোন মত বিবেচনাযোগ্য, এবং কোন কোন মত বিবেচনাযোগ্য নহে; এ কথাটা প্রত্যেক স্থলেই ঠিক কি না, আমরা কি পূর্ব্বে ইহাই বিচার করিয়া দেখিব? না আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবার পূর্ব্বে কথাটা সঙ্গত ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে বস্তুতঃ জাজ্বল্যমান দেখা যাইতেছে, যে, আমরা কেবল তর্কের জন্যই বৃথা তর্ক করিয়াছি, এবং যাহা কিছু বলিয়াছি, সে সমস্তই প্রকৃতপক্ষে কেবল বালকের ক্রীড়া ও তুচ্ছ বাগ্‌বিতণ্ডা? ক্রিটোন, আমিও তোমার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, যে, আমি এই বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া আমার পুরাতন যুক্তিগুলি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, না যেমন ছিল তেমনি আছে; এবং আমরা এক্ষণে উহা বর্জ্জন করিব, না উহাই মানিয়া চলিব। আমি বোধ করি, যে, যাহারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই, আমি এই মাত্র যাহা বলিলাম, তাহাই সঙ্গত বলিয়া আসিতেছে। সকলেই বলিতেছে, যে, লোকে যে-সকল মত প্রকাশ করে, তন্মধ্যে কতকগুলি বহুমূল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, কতকগুলি নয়। দেবতার দোহাই, ক্রিটোন্, বল দেখি, তোমার কি বোধ হইতেছে না, যে, তাহারা কথাটা ভালই বলিয়াছে? কেন না, মানুষের বুদ্ধিতে যতদূর বুঝা যাইতেছে, তোমাকে তো আর আগামী কল্যই মরিতে হইবে না, সুতরাং এই প্রত্যাসন্ন বিপদ তোমাকে বিপথগামীও করিবে না; তবে দেখ, তোমার নিকটে কি কথাটা সন্তোষজনক বোধ হইতেছে না, যে, লোকের সকল মতই আমাদিগের শ্রদ্ধা করা উচিত নয়, কিন্তু কতকগুলি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য ও কতকগুলি অকর্ত্তব্য। তুমি কি বল? কথাটা কি ঠিক বলা হয় নাই?

ক্রি—হাঁ, ঠিকই বলা হইয়াছে।

সো—এবং যে-সকল মত উত্তম, তাহাই শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু যাহা অধম, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য নহে?

ক্রি—হাঁ।

সো—কিন্তু জ্ঞানীদিগের মতই উত্তম, এবং অজ্ঞানদিগের মতই অধম?

ক্রি—তা' নয় তো কি?

৭। সো—আচ্ছা, আমরা পূর্ব্বে এ বিষয়ে কি বলিয়াছি? যে ব্যক্তি ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে ও তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে, সে কি সকল লোকের নিন্দা-প্রশংসাতেই কর্ণপাত করে, না কেবল একজনের অর্থাৎ বৈদ্য বা শিক্ষকের নিন্দা ও প্রশংসা গ্রাহ্য করে?

ক্রি—কেবল একজনের।

সো—তাহার তবে একজনেরই নিন্দাতে ভীত ও প্রশংসাতে আহ্লাদিত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু জনসাধারণের নিন্দা বা প্রশংসায় নহে?

ক্রি—সুস্পষ্টই তাই।

সো—তাহা হইলে এই এক ব্যক্তি—যিনি বিষয়টি অবগত আছেন ও তাহাতে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন—তিনি যেমন আদেশ করেন, সেই রূপেই তাহার আচরণ, ব্যায়াম, আহার ও পান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অপর সাধারণের মতানুসারে নহে?

ক্রি—হাঁ, ঠিক কথা।

সো—বেশ। কিন্তু সে যদি এই এক ব্যক্তির অবাধ্য হয় এবং তাঁহার মত ও প্রশংসাকে অশ্রদ্ধা করিয়া জনসাধারণের মত ও প্রশংসাকেই শ্রদ্ধা করে, তবে কি তাহাতে তাহার অকল্যাণ হইবে না?

ক্রি—নিশ্চয়ই।

সো—এই অবাধ্য ব্যক্তির কি অকল্যাণ হইবে? যদি হয়, তবে কোন্ দিকে এবং কোন বিষয়ে?

ক্রি—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাহার দেহের অকল্যাণ হইবে; কেন না, দেহটিই বিনষ্ট হইবে।

সো—তুমি ঠিক বলিয়াছ। তাহা হইলে, আমরা কি, ক্রিটোন্, সংক্ষেপে বলিতে পারি না যে অন্যান্য বিষয়েও এই কথাই ঠিক? বিশেষতঃ আমরা যে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম, সেই ন্যায় ও অন্যায়, উত্তম ও অধম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ে আমাদিগের কি জনসাধারণের মত অনুসরণ করা ও উহাকেই ভয় করা কর্ত্তব্য, না যদি কেহ উহা সম্যক্ অবগত হইয়া থাকেন, তবে বিশ্বজগৎ অপেক্ষা কেবল সেই এক জনের নিকটেই লজ্জা বোধ করা ও তাঁহাকেই ভয় করা উচিত? যদি আমরা তাঁহার অনুসরণ না করি, তবে আমরা সে বস্তুরই অনিষ্ট ও

অকল্যাণ সাধন করিব, যাহা ন্যায় দ্বারা উন্নত ও অন্যায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। না, কথাটা ঠিক নয়?

ক্রি—হাঁ, সোক্রাটীস্, আমি তো মনে করি কথাটা ঠিক্।

৮। সো—আচ্ছা, যাহারা অজ্ঞ, তাহাদিগের কথা শুনিয়া আমরা যদি সেই বস্তুর হানি করি, যাহা স্বাস্থ্যদ্বারা উৎকৃষ্টতর ও রোগদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে, এই বস্তুর অনিষ্ট ঘটিলে আমাদিগের পক্ষে কি জীবন আর ধারণযোগ্য থাকিবে? এই বস্তুটি দেহ; নয় কি?

ক্রি—হাঁ।

সো—রুগ্ন ও ভগ্ন দেহ লইয়া জীবন কি আর আমাদিগের পক্ষে ধারণযোগ্য বলিয়া বোধ হয়?

ক্রি—কখনই নয়।

সো—তবে যাহা অন্যায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ন্যায় দ্বারা উপকৃত হয়, তাহার অনিষ্ট ঘটিলে জীবন কি আমাদিগের পক্ষে ধারণযোগ্য থাকে? না আমাদিগের সেই অংশ—সে যাহাই হউক না কেন—যাহার সম্পর্কে 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' প্রযোজ্য, তাহা আমরা দেহ অপেক্ষা তুচ্ছ বিবেচনা করি?

ক্রি—কখনই নয়।

সো—তবে তাহা দেহ অপেক্ষা মূল্যবান্?

ক্রি—হাঁ, বহুগুণে।

সো—তাহা হইলে, হে পুরুষোত্তম, জনসাধারণ আমাদিগকে কি বলিবে, তাহা আমাদিগের পক্ষে খুব অবধানযোগ্য নয়; কিন্তু যিনি ন্যায় ও অন্যায় সম্যক্ অবগত আছেন, এক তিনি কি বলেন, এবং সত্য কি বলে, কেবল তাহাই আমাদিগের প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। সুতরাং তুমি যে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, যে, ন্যায় ও উত্তম ও কল্যাণ এবং এগুলির বিপরীত বিষয়ে আমাদিগের জনসাধারণের মতে মনোনিবেশ করা উচিত, প্রথমে তোমার এই সূচনাটাই ঠিক হয় নাই। বেশ কথা। কিন্তু কেহ হয় তো বলিবে, জনসাধারণ তো আমাদিগকে বধও করিতে পারে?

ক্রি—তাহা তো সুস্পষ্ট। হাঁ, সোক্রাটীস, সে এরূপ বলিতে পারে।

সো—তুমি যথার্থ বলিয়াছ। কিন্তু, হে বিচিত্রবুদ্ধি, আমার বোধ হইতেছে, যে, আমরা এই মাত্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা পূর্ব্বের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে, এখনও আমাদিগের এই সিদ্ধান্ত স্থির রহিয়াছে কি না, যে, শুধু জীবন ধারণ নয়; কিন্তু উত্তমরূপে জীবন যাপন করাই বহুমূল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

ক্রি—হাঁ, স্থির আছে।

সো—উত্তম জীবন যাপনের অর্থ জীবনকে মহত্ত্বের পথে, ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা; এই সিদ্ধান্ত স্থির আছে, না নাই?

ক্রি—স্থির আছে।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

জাতক *

যতদিন নির্ব্বাণ বা মুক্তি না হয় ততদিন জীব নানা আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ-পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করিতে থাকে। বুদ্ধদেবেরও এই গতি হইয়াছিল, তিনিও জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া ঘুরিতেছিলেন, শেষে গোতমবংশে উৎপন্ন হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধদেব কোন্ জন্মে কোন্ জীবের আকারে জাত হইয়া কি-কি কার্য্য করিয়াছিলেন, জাতক নামে প্রসিদ্ধ গল্পসমূহে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রদান করাই এই সমস্ত গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতকের রচয়িতারা এই সকল গল্পকে নানাপ্রসঙ্গে বুদ্ধদেবেরই মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই গল্পগুলি পালি ভাষায় লিখিত (কতকগুলি জাতক সংস্কৃতেও আছে)। ইহাদের মোট সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ফৌসবল সাহেব ছয় খণ্ডে ৫৪৭টি জাতক অর্থবর্ণনা অর্থাৎ প্রাচীন পালি-ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশ করিয়া সপ্তম খণ্ডে তাহাদের বিস্তৃত সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন। রবার্ট চামারস (Robert Chalmers), রাউজ (W. H. D. Rouse) প্রভৃতি সাহেবেরা ইহাদের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছেন। বাঙ্লার লেখক ও পণ্ডিতেরা প্রধানত এই ইংরেজী অনুবাদই নাড়াচাড়া করিয়া কাজ চালাইতেছিলেন। সম্প্রতি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্.এ. মহাশয় জাতকের প্রথম খণ্ড (মোট ১৫০টি জাতক) পালি হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় ঈশান বাবু, "বয়োভারাক্রান্ত দেহে" ও শোকসন্তপ্ত চিত্তে বঙ্গবাসীকে যেদান দিতে সমর্থ হইলেন, কৈ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নব নব পালিপণ্ডিতদের মধ্যে ত কাহারো নিকট হইতে আমরা এপর্য্যন্ত তাদৃশ কিছু পাইলাম না। ইঁহারা যদি ঈশান বাবুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে অবশিষ্ট জাতকগুলিও আমরা মাতৃভাষায় পাইতে পারি।

---

* জাতক অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত, ফৌসবোল সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত, প্রথম খণ্ড, শ্রীঅনুকূল ঘোষকর্ত্তৃক ১।৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ২॥৵০+৩০৯।

আলোচ্য অনুবাদটি যাহাতে "বাঙ্গালী মাত্রেরই সুখপাঠ্য হয়" অনুবাদক তজ্জন্ত যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন, এবং আমরা বলিতে পারি তিনি অনেকটা ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জাতকগুলি সবই কাহিনীর মত গল্প, মূল গল্পটা ঠিক রাখিয়া যদি তাহার অন্তর্গত দুই-চারিটা অপ্রধান কথাকে একটু এদিকে-ওদিকে বদলাইয়া দেওয়া যায়, অথবা দুই-চারিটা অপ্রধান নূতন কথাও যোজনা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে স্থানবিশেষে কিছু ক্ষতি না হইলেও অপরস্থানে হইতে পারে। যদি ইহা না করিয়াই অনুবাদটা সুখপাঠ্য করিতে পারা যায়, তবে তাহাই ভাল। যে স্থানে নিজের কিছু কথা যোগ না করিলে অর্থ-পরিগ্রহেরই বাধা হয়, সেখানে অবশ্যই সেইরূপ করিতে হয়, কিন্তু যেখানে মূলের কথাতেই সুস্পষ্টভাবে অর্থপ্রতীতি হয়, সেখানে ঐরূপ যোজনা করিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষত, যদি নব সংযুক্ত অংশ বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে পাঠকেরা তাহা মূলেরই মধ্যে গণ্য করিয়া ভ্রান্ত হইতে পারে। আলোচ্য অনুবাদে বহুস্থানে এইরূপ হইয়াছে। একটা উদাহরণ দিই। মূলে আছে (চুল্লসেট্‌ঠি জাতক, ৪; কৌসবোল, জাতক, ১ম খণ্ড, ১২০ পৃ.)—

"অঞ্ঞতরো দুগ্‌গতকুলপুত্তো তং সেট্‌ঠিস্‌স বচনং সুত্বা
'নায়ং অজানিত্বা কথেস্‌সতীতি' মূসিকং গহেত্বা এককস্মিং
আপণে বিলালস্‌স-থায় দত্বা কাকণিকং লভি।"

ইহার অনুবাদ আলোচ্য পুস্তকে এইরূপ:—

"ঐ সময়ে এক ভদ্রবংশীয় অথচ নিঃস্ব যুবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া ভাবিল, 'ইনি ত কখনও না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা বলেন না। মরা ইন্দুরটা লইয়া গিয়া দেখি কপাল ফিরে কি না।' অনন্তর সে ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটে এক দোকানদার তাহার পোষা বিড়ালের জন্য খাবার খুঁজিতেছিল। সে যুবকের নিকট হইতে এক পয়সা দামে ইন্দুরটা কিনিল।"

এস্থানে অনুবাদে মূলের ভাবটা বজায় আছে, কিন্তু অনেক অতিরিক্ত কথা যোজনা করা হইয়াছে। ইহা না করিলেও কোনো ক্ষতি হইত না। ইংরেজী অনুবাদে ওরূপ করা হয় নাই, ঠিক মূলকেই অনুসরণ করা হইয়াছে:—

"His words were overheard by a young man of good family but reduced circumstances, who said to himself, "That's a man who has always got a reason for what he says." And accordingly he picked up the mouse which he sold for a farthing at a tavern for their cat."

এই জাতকেরই অন্যত্র (অনুবাদ, ১৮ পৃ.) লিখিত হইয়াছে;— "সে উহা বেচিয়া যে পয়সা পাইল তাহা দিয়া পরদিন বেশী গুড় কিনিল এবং ফুলের বাজারে গিয়া মালাকারদিগকে আবার খাওয়াইল। মালাকারেরা সেদিন তাহাকে কতকগুলি ফুটন্ত ফুলের গাছ দিয়া গেল।"

মূলে এখানে বে শী গুড় কেনার কথা নাই। ফুলের বা জা রে র ও কথা নাই, পু প্‌ফা রা ম অর্থাৎ পুষ্পারামের কথা আছে। মূলে ফু ট ন্ত ফু লে র গা ছ বলা হয় নাই। সেখানে আছে, মালাকারেরা পুষ্পবনে ফুল তুলিতে গিয়াছিল, এবং সেখানে তাহারা তাহাকে কতকগুলি "অড্‌ঢো চিতকে পুপ্‌ফগচ্ছে" দিয়াছিল, অর্থাৎ এমন কতকগুলি ফুল-গাছ তাহাকে (ছাড়িয়া) দিয়াছিল, যাহাদের অর্দ্ধেক ফুল তাহারা তুলিয়া লইয়াছিল আর অর্দ্ধেক তুলিতে বাকী ছিল। ফুলের বাজারে ফুটন্ত ফুলের গাছ দেওয়া সম্ভবও হয় না, নিতান্ত কষ্টকল্পনা না করিলে।

অনুবাদের মধ্যে এমনো স্থান আছে, যেখানে মোটেই অর্থ পরিগ্রহ হয় না। যেমন (১০৪ পৃ.), "এদিকে ক্ষিতিজের প্রাচীমূলে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল," এখানে ক্ষি তি জে র প্রা চী মূ ল কি বুঝা যায় না। মূলে আছে—"পাচীনলোকধাতুতো পরিপুণ্ণং চন্দমণ্ডলং উট্‌ঠহি", ইহার অর্থ হইতেছে—পূর্ব্ব দিগ্বলয় (বা দিক্‌চক্রবাল) হইতে পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল উঠিল। "কমনীয় ব্রহ্মস্বরে ধর্ম্মকথা আরম্ভ করিলেন" (২ পৃ.) "অনন্তর তিনি সুমধুর ব্রহ্মভাষে ভিক্ষুদিগকে...বলিলেন (১৮ পৃ.) এস্থলে ব্র হ্ম স্ব র শব্দে কি, সাধারণে বুঝিবে না। মূলে "ব্রহ্মস্সরেন" আছে। এস্থলে ব্র হ্ম শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ (দ্রষ্টব্য—অভিধান প্রদীপিকা, ৮১২)। "ব্যামপ্রমাণপ্রভাপরিবৃত ব্রহ্ম কলেবর" (১ম পৃ.), এখানেও ব্র হ্ম শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধের শরীর ব্রহ্মার সদৃশ, এরূপ অর্থ কষ্টকল্পিত মনে হয়, এবং তাহার কোনো প্রমাণ আছে বলিয়া জানি না। ইংরেজীতে অনুবাদক এখানে ঐ শব্দটার অর্থ এড়াইয়া গিয়াছেন

দান-শীলাদি দশ পারমিতার একটি হইতেছে নে ক্‌খ ম্ম, ইহার সংস্কৃত করা হইয়াছে (৪পৃ. পাদ টীকা) নৈ ক্র ম্য, কেহ কেহ এইরূপই করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুত ইহার সংস্কৃত নৈ ক্র ম্য অথবা নৈ ষ্ক র্ম নহে, কিন্তু নৈ ষ্ক্রা ম্য। *

স্থানে-স্থানে দেখা যায় মূল পালি অপেক্ষা ইংরেজী অনুবাদকেই অধিকতর অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং তাহাতে ভুলও করা হইয়াছে। মূলে আছে (৩২৬ পৃ.) "একস্‌স তন্তুবায়স্‌স ত ন্ত বি ত ত ট্‌ ঠা নং গন্ত্বা," ইহার অর্থ হইতেছে—একটি তাঁতীর তাঁতবোনার জায়গায় গিয়া। কিন্তু ইহার ইংরেজী অনুবাদ করা হইয়াছে—"so he betook himself to the *weavers' quarter*", এবং ইহা হইতেই বাঙ্‌লা অনুবাদ করা হইয়াছে—"তন্তুবায়পল্লীতে গমন করিলেন।" বস্তুত এখানে তন্তুবায়-প ল্লী র কথা নাই। এই জাতকেরই অন্যত্র (মূল ৩৫৯ পৃ.) আছে —"অজ্জ ময়া পাকটেন ভবিতুং বট্টতি", ইহার অর্থ—আজ আমাকে প্রকট অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু ইংরেজীতে অনুবাদ করা হইয়াছে—"And now to win renown this day (!)", বাঙ্‌লায় এই ইংরেজীরই অনুবাদ করিয়া লেখা হইয়াছে (১৫৭ পৃ.) "আমি অদ্য যশস্বী হইব।" এই জাতকেই অন্যত্র (মূল ৩৫৭ পৃ.) আছে—"অহং তে উপ্পন্নকম্মং করোন্তো তব পিট্‌ঠিচ্ছায়ায় জীবিস্‌সামি," ইহার অর্থ—তোমার যে সব কাজ উপস্থিত হইবে তাহা আমি করিব এবং তোমার পিঠের ছায়ায় অর্থাৎ আশ্রয়ে অথবা আড়ালে থাকিয়া জীবন ধারণ করিব। ইংরেজী অনুবাদ করা হইয়াছে—"Meantime *I shall be behind you* to perform the duties that are laid upon you, and so shall earn my living in your shadow," বাঙ্‌লায় অনুবাদ (১৭৪ পৃ.) এইরূপ:—"আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব......।" এখানে এই অংশটুকু ইংরেজীর অনুবাদ, মূলে ইহার কিছুই নাই।

পদ্যের অনুবাদে বহু স্থানেই মূলের অতিরিক্ত নানা কথা যোগ করা হইয়াছে, অর্থেরও ব্যতিক্রম হইয়াছে। দুই একটা উদাহরণ দিই। মূলের (১১৬ পৃ.) শ্লোকটি এই:—

"পদুমং যথা কোকনদং সুগন্ধং
পাতো সিয়া ফুল্ল-মবীতগন্ধম্।
অঙ্গীরসং পস্‌স বিরোচমানং
তপন্তমাদিচ্চমিবন্তলিক্‌খে।"

---

* "ন তত্থ রাখং অভিজনেতি মুত্তিং যেব গবেসতি." (মূল জাতক; ৫১ পৃ, ১৩৮ শ্লোক), ইহাতে নৈ ষ্ক্রা ম্য ই সূচিত হয়। See Vinaya Text (S B E) Part 1. p. 104, note.

ইহার অনুবাদ (১৫ পৃ,)—

"অনাঘ্রাতগন্ধ যথা প্রফুল্ল কমল
প্রভাতে তড়াগ বক্ষে করে টলমল;
কিংবা অন্তরীক্ষে যথা শোভার আকর
বিতরে সহস্ররশ্মি দেব দিবাকর
সেইমত তথাগত ভব কর্ণধার
উজলিছে দশদিক্ প্রভায় তাঁহার।"

এখানে মূলের অবীতগন্ধ শব্দের অর্থ 'যাহার গন্ধ চলিয়া যায় নাই, অনপগতগন্ধ' ; অনুবাদে অর্থ লিখিত হইয়াছে-অনাঘ্রাতগন্ধ, ইহা ঠিক নহে। মূলের "সুগন্ধং" শব্দের অর্থ অনুবাদে পাওয়া যায় না। তাহার পর বিশ্লিষ্টভাবে লিখিত পদগুলির মূলের সহিত কোনো সম্পর্ক নাই, একেবারে অতিরিক্ত নূতন যোজনা। ইংরেজী অনুবাদটি (p. 6) বেশ :—

"Lo ! like a fragrant lotus at the dawn
Of day, full blown with virgin wealth of scent,
Behold the Buddha's glory shining forth,
As in the vaulted heaven beams the sun !"

মূলে (p. 117) আছে :—

রাগো রজো, নচ পন রেণু বুচ্চতি,
রাগস্সেতং অধিবচনং রজোতি,
এতং রজং বিপ্পজহিত্বা ভিক্খবো
বিহরন্তি তে বিগতরজস্স সাসনে ॥"

ইহার অর্থ—রজ বলিতে রাগ (অর্থাৎ তৃষ্ণা, আসক্তি, বা কাম), ইহা দ্বারা রেণু অর্থাৎ ধূলি উক্ত হয় না ; রজ, ইহা রাগের নাম। হে ভিক্ষুগণ, তাহারা এই রজকে পরিত্যাগ করিয়া বিগতরজের অর্থাৎ রজোবিমুক্ত বুদ্ধদেবের শাসনে (উপদেশে) বিচরণ করে।

আলোচ্য পুস্তকে ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে :—

"ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়,
কামরূপ মল হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যে জন যতনে এই কামমল মন হ'তে দূর করে
পুণ্যাত্মা সে জন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে ॥"

মূল হইতে অনুবাদ কত দূরে গিয়া পড়িয়াছে, পাঠকগণ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। স্বেদজল শব্দটি একেবারে বাহিরের। এখানে রজ (রজঃ?) শব্দের প্রয়োগে মূলে যে বৈচিত্র্য ছিল- যাহা বঙ্গানুবাদেও টিকিতে পারিত, মল-শব্দ প্রয়োগ করায় অনুবাদে তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই দোষটি ইংরেজী অনুবাদ হইতেই বঙ্গানুবাদে সংক্রান্ত হইয়াছে :—

"Impurity in Lust consists, not in dirt ;
And Lust we term the real Impurity.
You, Brethren, who so drives it from his breast,
He lives the gospel of the Purified."

ইংরেজী অনুবাদে "the Purified" শব্দে যাহা লক্ষিত হইয়াছে, বঙ্গানুবাদে তাহাও লক্ষ্য করা হয় নাই। বঙ্গানুবাদের "মন হ'তে দূর করে," ইহা ইংরেজীরই "drives it from his breast" হইতেই গৃহীত, যদিও মূলে ইহা নাই। এই পদ্য বঙ্গানুবাদের ছন্দ শ্রুতিমধুর হয় নাই।

"দোসো রজো ...," ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকের (p=118) অনুবাদে মূলের দোস শব্দের অর্থ ক্রোধ ধরা হইয়াছে ("ক্রোধরূপ বল যারে...," ১৩ পৃঃ), কিন্তু এতাদৃশ স্থলে পালি দোস=সংস্কৃতে দ্বেষ, দোষ নহে। এই ভুলটিও ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণ করার ফল, ইহাতেও ভুল করিয়া লিখিত হইয়াছে। (p. 17)—

Impurity in Wrath consists, not dirt ;
And Wrath we term......"

২২ পৃষ্ঠায়* পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—"পালিটীকাকার বলেন......।" বস্তুত ইহা কোনো পালিটীকাকারের কথা নহে, মূল জাতকেরই কথা। ইংরেজী অনুবাদক (p. 2) মূল গল্পের স্বল্পমাত্রও বিচ্ছেদ না হয়, এই অথবা অপর কোনো উদ্দেশ্যে অনুবাদেরই মধ্যে বন্ধনী দিয়া আলোচ্য অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদক, খুব সম্ভব, এই বন্ধনী দেখিয়াই প্রতারিত হইয়া পালিটীকাকারের কথা বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। আরো, এখানে ইংরেজী অনুবাদে ভুল আছে, তাহা অনুসরণ করায় বাঙ্‌লা অনুবাদেও ভুল হইয়াছে। বাঙ্‌লা অনুবাদে আবার একটা অতিরিক্ত ভুল করা হইয়াছে, দ্বাদশ যোজনের স্থানে নয় যোজন লিখিয়া। ইংরেজী-অনুবাদকের ভুলের কারণ এই মনে হয় যে, মূলের (p. 125) "ইদমস্সা অন্তরবাহিরং পন তিযোজন...," এই পাঠকে তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। মূলের পাদটীকায় প্রদত্ত পাঠান্তর দেখিলে ইহার অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া যাইত। C^kC^v পুস্তকের পাঠ "অন্তরংবাহিরং ('অন্তরবাহিরং' নহে)। এখানে শব্দ দুইটিকে পৃথক করিয়া পাঠ করিতে হইবে—"অন্তরং বাহিরং," তাহা হইলেই সমগ্র পাঠটি এইরূপ দাঁড়ায়—"ইদমস্সা অন্তরং, বাহিরং পন...," এবং এইরূপ হইলে আর কোনো গোলমাল থাকে না।

খুঁটি নাটি করিয়া দেখিতে হইলে এইরূপ আরো কিছু-কিছু ছোট-বড় দোষ লক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও আলোচ্য অনুবাদ'কে আমরা অবজ্ঞেয় বা অপাঠ্য বলিতে পারি না। যাঁহারা পালিভাষা শিক্ষা করিতে চাহেন, মূল জাতক পড়িতে এই অনুবাদ তাঁহাদের অনেক সাহায্য করিবে। যাঁহারা মূল জাতকের উপন্যাসগুলিকে পড়িতে চাহেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ ইহা পড়িয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। যাঁহারা জাতক-পাঠে সেই সময়ের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদেরও ইহাতে প্রচুর উপকার হইবে। একটু সাবধান হইয়া স্থানবিশেষে মূলের সহিত মিলাইয়া লইলে ইঁহাদের ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

পরিশিষ্ট অংশ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার পাঠকবর্গকে বহু উপকৃত করিয়াছেন। স্থানে-স্থানে কিছু-কিছু ত্রুটি আছে, * তথাপি ইহা যে ভাল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জনপদকল্যাণী (২৮২ পৃঃ) কাহারো নাম নহে, বিশেষণ শব্দ, বিশেষণও কখনো বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়। কল্যাণী=সুন্দরী (অভিধানপ্পদীপিকা, ৬৯৩—৪)। যে স্ত্রী জনপদের মধ্যে খুব সুন্দরী, তিনিই জনপদ-কল্যাণী। ইত্যাদি।

---

* যেমন "মহা পজাপতি" শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে মহা প্রজাপতী (২৯৭ পৃঃ)। ইহা ভুল। ইহার আসল সংস্কৃত হইতেছে মহা প্রজাবতী। গৌতমীই মায়াদেবীর মৃত্যুর পর বুদ্ধদেবকে লালন-পালন করেন। বুদ্ধদেব মহান্, তিনি মহা প্রজা অর্থাৎ মহাসন্তান, মহাপুত্র, এই মহাপুত্র পাওয়ায় গৌতমী মহা প্রজাবতী। প্রজাবতী হইতেই, আমার মনে হয়, বাঙ্‌লা পোয়াতি (কেহ বলেন প্রসূতি হইতেই)। বুদ্ধদেব মহান্ বলিয়া তাঁহার পরিনির্ব্বাণ মহা পরিনির্ব্বাণ, তাঁহার অভিনিক্রমণ মহা-ভিনিক্রমণ

গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, পালি শব্দের অনুবাদে স্থানে-স্থানে ত্রুটি হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহার অবশ্য সংশোধন হইবে। বর্ত্তমান সংস্করণে এক নি পা ত শব্দটিকে শীর্ষকরূপে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বরাবর এক নি পা ঠ করা হইয়াছে, শুদ্ধিপত্রে ইহা সংশোধিত হয় নাই দেখিয়া মনে হয় অনুবাদক ইহা লক্ষ্য করেন নাই। অন্যত্রও (পৃঃ-১৪১) সুত্র নি পা ত স্থলে সুত্র নি পা ঠ করা হইয়াছে। ইংরেজী অক্ষরে ছাপা (nipāta) বই পড়াতেই এরূপ ভুল হইয়াছে।

জাতকের এই খণ্ডে স্ত্রীবর্গ (৬১—৭০ জাতক) নামক অংশের কয়েকটি জাতকে স্ত্রী জাতিকে অত্যন্ত নিন্দা করা হইয়াছে, তাঁহাদের চরিত্রে অতি বীভৎসভাবে (দ্রঃ—অশাতমন্ত্রজাতক) দোষারোপ করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি? বুদ্ধধর্ম্মে কি স্ত্রীজাতির বস্তুতই এই স্থান? আমার তাহা মনে হয় না। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ভিক্ষু-ধর্ম্ম। গৃহস্থ থাকিয়া এ ধর্ম্মের সম্যক্ সাধন হয় না, দার-পরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম্মে থাকিলে ভিক্ষু-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা চলে না। স্ত্রীসঙ্গ সংসারধর্ম্মের অনুকূল হইলেও ভিক্ষুধর্ম্মের অত্যন্ত প্রতিকূল; ভিক্ষু হইতে হইলে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু লোকের স্ত্রী-সঙ্গে আসক্তি বড় দৃঢ়, ইহাকে সহজে ছেদন করিতে পারা যায় না, অথচ না করিলেও উপায় নাই। এইজন্যই, স্ত্রীসংসর্গে একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য বৌদ্ধ-সাহিত্যে স্থানে-স্থানে স্ত্রীজাতিকে কদর্য্যভাবে বর্ণন করা হইয়াছে; এবং এই বর্ণনা এত তীব্র যে, বর্ণনাকারীদের এ বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃতের ন্যায় পালি-প্রাকৃত সাহিত্যেও লেখকগণের অত্যুক্তিপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশী। যখন যাহা বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করেন তখন সেইটিকেও এরূপভাবে বর্ণনা করেন যে, সেই বর্ণনীয় বিষয়টির বর্ণনার মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, কিন্তু ঐরূপ বর্ণনায় যে, অপর দিকে একটা বিষম দোষ আসিয়া পড়ে, তাহা তাঁহাদের মনেই হয় না। কিন্তু বস্তুতই যে, সর্ব্বত্র এইরূপ দোষারোপ করা তাঁহাদের অভিপ্রেত তাহা মনে হয় না, মনে করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান বিষয়টির আলোচনাতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা একটি মাত্র শব্দের উল্লেখ করিব।

স্ত্রীজাতিকে বুঝাইতে বৌদ্ধসাহিত্যের একটি শব্দ আছে, ইহা মা তু গা ম (পালি) বা সংস্কৃত (মা তৃ গ্রা ম)। ইহার আক্ষরিক অর্থ মাতৃসমূহ, বা মাতৃশ্রেণি, বা মাতৃজাতি। যাহারা বৌদ্ধসাহিত্যের আদিম স্রষ্টা তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে মা তা র ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, ইহাই কি এই শব্দে বুঝাইতেছে না? যাঁহারা সমগ্র স্ত্রীজাতিকে মাতার ন্যায় দেখেন, যাঁহাদের সাহিত্য এই কথাটা স্পষ্ট ভাবে ঐ শব্দে প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারা যে, সত্য-সত্যই পূর্ব্বোল্লিখিত জাতকের বর্ণনার মত তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীনের মধ্যে এই বৌদ্ধসাহিত্য ভিন্ন অপর কোনো সাহিত্যই জানি না, যেখানে স্ত্রীজা তি কে মাতৃবাচক-শব্দে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। প্রাচীন ভাষাসমূহে স্ত্রীজাতিকে সাধারণতঃ প্র সূ তি অর্থাৎ প্র স ব কা রি ণী ভাবেই দেখা হইয়াছে।*

পালির এই মা তু গা ম শব্দই বাঙলায় মা উ গ (মালদ অঞ্চলে), মাগু (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে) মা গ, ও মা গী হইয়াছে। কালক্রমে এই-সকল শব্দ আজকাল অশিষ্টভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু মূলত ইহা অতি মহান্ ভাব প্রকাশ করিতেছে।

বঙ্গভাষায় এইরূপ আরো দুইটি শব্দ আছে। স্ত্রীজাতি অ[র্থে] মা য়া, মা য়্যা, মা ই য়া * মে য়ে শব্দ বাঙলায় সুপ্রসিদ্ধ। বলা বাহু[ল্য] ইহা সংস্কৃত মা তা, হইতে হইয়াছে। প্রথমে যাঁহাদের নিকট এ কথাটা ঐ অর্থে বাঙলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, নিশ্চয় তাঁহারা সমগ্র স্ত্রীজাতিকে মাতার ন্যায় মনে করিতেন।

অপর শব্দটি তি রি মা ত, (দ্রুত উচ্চারণ তি র্ মা ত) ব[ঙ্গ]দেশের অন্য কোনো স্থলে ইহার প্রয়োগ আছে কি না জানি না, মালদ[হ] অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রীজাতি অর্থে এই শব্দটি খুবই প্রচলিত আছে তি রি = স্ত্রী, পদাবলীরও মধ্যে ইহার প্রয়োগ আছে, তি রি হই[তে] তি র্, এবং মা তা হইতে মা ত; তি রি মা ত, তি র্ মা ত, অর্থা[ৎ] স্ত্রী মাতা।

ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যা[য়] স্ত্রীজাতিকে মাতৃবাচী শব্দে প্রকাশ করা হইয়াছে:—মৈথিলী মৌ[গ] মা গু (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহা বাঙলাতেও আছে; উভয়ই পূর্ব্বো[ক্ত] পালি মা তু গা ম শব্দ হইতে), উড়িয়া মা ই, মা ই কি নি অ[...] নেপালী আই-মা ই (=আধ্যা-মাতা), হিন্দী ও মারাঠীতে মা [ই] (একটু বেশী বয়সের স্ত্রীলোক), মারাঠীতে বা য় কো (স্ত্রীজাতি) বা ঈ (ইহা সম্মানসূচক পদ, মাতা ও একটু বেশী বয়সে[র] স্ত্রীকে বুঝায়; মাঈ—বাঈ, ম—ব, ব—ব), ত্রিপুরা জেলায় ঠাকুরমাকে বা ঈ বলে, (কালক্রমে হিন্দীতে ইহা পেশাদার গায়িকাকে বুঝায়) বা ঈ জী কাঠিয়াওয়াড়ীতেও বা ঈ, গুজরাটী বাইড়ী, সুরাটী বা ই রী ভত্তরী (উড়িয়ার অবান্তর ভেদ) বা ই লী (মারাঠীতে ইহা অবজ্ঞা সূচনা করে) তেলেগুতে অ ম্মা (অম্বা), মালয়ালমেও অ ম্ম (ইহা আমাদের দেবী শব্দের ন্যায় প্রযুক্ত হয়, যথ অ ম্মা কামাক্ষী)।

এইরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে বলিতেই হইবে, বৌদ্ধসাহিত্য (পালি ও সংস্কৃত) স্ত্রীজাতিকে মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়া বস্তুত তাহার গৌরবই বৃদ্ধি করিয়াছে, অবজ্ঞা করে নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত জাতক কয়টি বা তাদৃশ অপর কোনো বর্ণনার উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। স্ত্রীজাতির কল্যাণের জন্য বৌদ্ধসাহিত্যে বহু কথা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকে কিরূপে আদর্শ গৃহিণী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, পালি সাহিত্যে তাহারো বিধান রহিয়াছে (অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪৬—৫০, P T S, Part IV. pp. 265—273) এই প্রসঙ্গে "সিগালোবাদসুত্তে"র উপদেশও উল্লেখ করিতে পারা যায়। স্ত্রীজাতি একেবারে অবজ্ঞার পাত্র হইলে এসব বিধানের কোনো আবশ্যকতা থাকিত না।

---

* দ্রষ্টব্য—সংস্কৃত জ নি অথবা জ নী, অবেস্তা জে নী, ফারসী জ না না (তুলঃ—জ়ন নী) Gr. *gune*, (gen.) *gunaikos*, O. Pruss. *gan-na*, O-Slav. *gena*. এই-সমস্ত শব্দ স্ত্রী বা স্ত্রী-জাতি-বাচক এবং সংস্কৃত √জ ন্ (বা Eur. aryan √*Gen*. √*gn*. √*gan*, to beget, bring forth children. etc) হইতে হইয়াছে। (see Baly's—Eur-Aryan Roots, Vol. I, pp. 337-340), ইংরেজী woman শব্দের মূল wifman (A. S.) = wife-man.

সম্ভবত সংস্কৃত স্ত্রী, (অবেস্তা স্ত্রি, স্ত্রী) শব্দও মূলত প্রসবার্থক √সূ (√সু, হইতে (√সূ+তৃ+ঈ)। C. f. Lat. Sator (begetter).—Brugmann, Vol. 1. p, 254; Schrader and Jevons, Prehistoric Antiquities of the Aryan Peoples, p. 386. এই শব্দের আমাদের সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পিত:—"স্ত্যায়তি গর্ভোঽস্যাম্ ইতি স্ত্যায়তেড্রট্ (উণাদি ৪।১৬৬।"—ভানুজীদীক্ষিত-কৃত অমরকোষ টীকা।

* Cf. *Maia*, 'mother' goddess of the earth known among the Latins. Baly's Eur-Aryan Roots, Vol. I. p 38.

পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধা সবই অতিসুন্দর। যাঁহারা জাতকগুলির ইংরেজী অনুবাদের সংস্করণ দেখিয়াছেন, ইহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদি মলাটে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম বাঙ্‌লা অক্ষরে না লিখিয়া ইংরেজীতে লেখা হইত, তাহা হইলে কেবল বাহ্য আকার দেখিয়া বাঙ্‌লা সংস্করণখানি চিনিয়া লওয়া সহজ হইত না; দুইখানিই একরকম। পালির বঙ্গানুবাদের এরূপ সুন্দর আকারে প্রকাশ ইহাই প্রথম।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

স্মৃতির সৌরভ

তেরর পরিচ্ছেদ।

যে মুহূর্ত্তের আগমনের ভয়ে টিনার চক্ষে ঘুম নাই পরদিন দিনের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে সে ভীষণ মুহূর্ত্তও দেখা দিল। কালকার যন্ত্রণায় টিনা আজ যেন কেমন জড়বুদ্ধি। তীব্র বেদনার ফলে মনের যে একটা অসাড় অবস্থা আসে টিনারও তাহাই ঘটিয়াছে। লেডি শেভারেলের ঘরে বসিয়া সে কি একটা দানের হিসাব নকল করিতেছিল; এমন সময় স্বয়ং তিনিই আসিয়া বলিলেন, "টিনা, স্যর ক্রিষ্টফার তোমায় ডাকছেন; লাইব্রেরীতে একবার যাও।"

টিনা কাঁপিতে-কাঁপিতে চলিয়া গেল। স্যর ক্রিষ্টফার লিখিবার টেবিলের সামনে বসিয়া ছিলেন, টিনা ঘরে ঢুকিতেই বলিলেন, "আয় রে, বাঁদরী, কাছে এসে বোস। তোর সঙ্গে কথা আছে।" টিনা একটা ছোট পিঁড়ি আনিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল। এই-রকম নীচু আসনে বসাই তাহার অভ্যাস আর ইহাতে মুখখানাও ভাল করিয়া লুকানো চলে। ছোট হাত দুখানি দিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া, হাঁটুর উপর গাল দিয়া সে বসিল।

"টিনা, তোকে যে আজ কেমন মন-মরা মত দেখাচ্ছে, কি হয়েছে রে?"

"কিছু না জ্যাঠামশায়; এই মাথাটা একটু ধরেছে।"

"আহা রে! আচ্ছা, আমি যদি বেশ একটি খাসা বর, সুন্দর একটি বিয়ের পোষাক, আর একটা বাড়ীও যোগাড় করে দিতে পারি তা'হলে কি মাথাটা সারে না? বেশ কেমন ছোট্ট গিন্নিটি হয়ে থাকবি; জ্যাঠামশায়ও মাঝে মাঝে দেখা করতে যাবে।"

"না, না, আমি কোনো কালেও বিয়ে করতে চাই না। আমি তোমার কাছেই চিরকাল থাকব।"

"আরে দূর, বোকা কোথাকার! আমি ত বুড়ো খিট্‌খিটে হয়ে যাব; আবার অ্যাণ্টনির ছেলেপিলে হবে, তারা তোর মাথাটাও খারাপ করে তুলবে। তোকেই যে সবচেয়ে ভালবাসবে এমন একজন লোকের জন্যে তোর মন তখন কাঁদবে, আবার নিজে ভালবাসবার জন্যে তোর নিজের ছেলেপিলেরও সাধ হবে। বুড়ো-কাল অবধি আইবুড়ো থেকে শুকিয়ে মরতে আমি তোকে কিছুতেই দিতে পারব না। আইবুড়ো-বুড়ীগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। ওদের দেখ্‌লে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। শার্প বুড়ীটাকে যখনি দেখি তখনি আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আমার কালো-চোখী বাঁদরী অমন করে জীবনটা মাটি করতে কখ্‌খনো জন্মায় নি। এই ত মেনার্ড গিল্‌ফিল রয়েছে; সারা গাঁয়ে অমন আর দুটি মিলবে না; সোনা দিয়ে ওজন করলেও ওর দাম ওঠে না। ও যে তোকে প্রাণটা দিয়ে ভালবাসে। আর বাঁদরী, মুখে যতই বল্‌না 'বিয়ে করব না' তুইও ত ওকে ভালবাসিস্‌।"

"না, না, জ্যাঠামশায়, অমন কথা বলবেন না। আমি ওকে বিয়ে করতে পারব না।"

"কেন পারবি না রে, বোকা মেয়ে? তুই নিজের মন নিজেই বুঝিস্‌ না। আহা, এ ত সবাই পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছে, যে, তুই ওকে ভালবাসিস্‌। গিন্নি ত অনেক কাল আমায় বলেছেন—তুই যে ওর কাছে কেমন গরবিনী রাজকন্যের মত ঢঙ্‌ দেখাস্‌ তা' উনি দেখেছেন রে। আর অ্যাণ্টনিও ত বলে তুই গিলফিলকে ভালবাসিস্‌। শোন্‌, শোন্‌, ওকে য় করতে পারবি না কি আবার? এসব তোর মাথায় কে ঢোকালে?"

টিনা তখন আকুলভাবে কাঁদিতেছে; উত্তর আর কে দিবে? স্যর ক্রিষ্টফার তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "হয়েছে, রে হয়েছে। টিনা, তোর শরীরটা দেখছি আজ ভাল নেই। যা বাছা, একটু বিশ্রাম করগে যা। ভাল হয়ে উঠ্‌লেই আবার সব অন্যরকম ঠেকবে।

আমার কথাটা একবার ভেবে দেখিস্। মনে রাখিস্, অ্যাণ্টনির বিয়ের ভাবনার পরে তোর আর মেনার্ডের ঘর সংসার পাতিয়ে দেওয়ার সাধটাই আমার মন জুড়ে আছে। ওসব খেয়াল আর বোকামি কিছু আমি শুন্‌তে চাই না। বাজে কথা আমার কাছে খাট্‌বে না।"

একটু কড়া সুরেই তিনি শেষ কথাটা বলিলেন। আবার তখনি কিন্তু সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, "আরে, আরে, আর কাঁদিস্ নে রে। লক্ষ্মী সোনা যাও গিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোও গিয়ে।"

টিনা পিঁড়ির উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া হাঁটু গাড়িয়া বৃদ্ধ জমিদারের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তাহার পর তাঁহার হাতখানা টানিয়া লইয়া চোখের জলে ভিজাইয়া ও চুম্বনে ছাইয়া ছুটিয়া ঘরের বাহিরে পলাইয়া গেল।

টিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের খবরটা সন্ধ্যার আগেই অ্যাণ্টনি মামার কাছে শুনিল। সে ভাবিল, "আমি যদি বেশ খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে পাই, তা হ'লে বোধ হয় ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ব্যাপারটা ভাল কোরে পরিষ্কার কোরে দিতে পারি। কিন্তু এ বাড়ীতে কথা বল্‌তে গেলেই ত যত বাধা বিপত্তি। বিয়েট্রিসের চোখ এড়িয়ে ওকে কোথাও পাওয়াও ত মুস্কিল।" শেষে ভাবিল মিস্ আশারকে মনের কথাটা বলিয়া তাহাকে বিশ্বাস দেখানো ভাল—বলিবে টিনাকে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে নিভৃতে কিছু বলা দরকার, যদি কোনো-রকমে গিল-ফিলের ভালবাসার দিকে একটু ভিড়ানো যায়। নিজেই এমন সোজা আর সুযুক্তিপূর্ণ উপায় বাহির করিতে পারিয়া ত সে বেজায় খুসী। সন্ধ্যার মধ্যেই স্থান কাল সব ঠিক হইয়া গেল; মিস্ আশারকে বলাও হইল; দেখা গেল এ বিষয়ে তাহার খুবই মত আছে। তিনি মনে করিলেন, —অ্যাণ্টনি যদি সোজাসুজি সব কথা মিস্ সার্টিকে বুঝাইয়া দেয় তবে ত ভালই হয়। ও-মেয়েটা যে-রকম ব্যবহার [illegible]াহাতে অ্যাণ্টনিকে ত খুব দয়ালু আর সহিষ্ণুশীল [illegible]ন সারাদিনের মধ্যে আর ঘরের বাহির [illegible]ক্রিষ্টফার গিন্নিকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলাতে [illegible]রাগীর মত অতি যত্নে সেবাশুশ্রূষা করিয়া রাখা হইয়াছে। এত সেবাযত্ন টিনার বড়ই বিরক্তি লাগিতেছিল; ভুল বুঝিয়া সবাই তাহাকে এত আ[illegible] যত্ন করিতেছে দেখিয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি[illegible] অসোয়াস্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মা[illegible] ধরা ও বুক-কাঁপানি থাকা সত্ত্বেও পরদিন সে সকা[illegible] নীচে খাইতে নামিল। ঘরের ভিতর বন্দী হইয়া থা[illegible] অসহ্য ব্যাপার! সকলের চোখে পড়া, সকলের ব[illegible] শোনা, অবশ্য খুবই কষ্টের ব্যাপার, কিন্তু একলা ঘ[illegible] পড়িয়া থাকা যে আরো কষ্ট। নিজের মনের অবস্থা দেখি[illegible] সে নিজেই ভয় পাইয়া গেল। কল্পনায় বর্ত্তমান [illegible] ভবিষ্যতের উদ্ধত উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া সে ভয়ে কাঁপি[illegible] ছিল। আর একটা কারণেও তাহার নীচে গিয়া ঘুরি[illegible] বেড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল। হয়ত নিভৃতে একবা[illegible] অ্যাণ্টনির দেখা মিলিতেও পারে—জিবের আগায় [illegible] ঘৃণামাখা কটু কথাগুলো নাচিতেছিল, সেগুলো একবা[illegible] তাহাকে শুনাইয়া দিবে। সুযোগটাও অকস্মাৎ মিলি[illegible] গেল।

লেডি শেভারেল টিনাকে তাঁহার ঘর হইতে কয়েকট[illegible] সেলাইয়ের নমুনা আনিতে পাঠাইতেই অ্যাণ্টনিও তাহা[illegible] পিছন-পিছন বাহির হইয়া পড়িল। সিঁড়ি দিয়া যখন [illegible] নামিয়া আসিতেছে তখন দুজনে দেখা।

তাহার দিকে না তাকাইয়াই টিনা তাড়াতাড়ি নামিয়[illegible] আসিতেছিল; অ্যাণ্টনি টিনার হাতের উপর হাত দিয়[illegible] বলিল, "টিনা, তুমি একবার বারটার সময় আমার সঙ্গে বাগানে দেখা করতে পারবে কি? তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা বিশেষ দরকার, আর সেখানে বেশ নির্জ্জনও হবে। বাড়ীতে তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার সম্ভব নয়।"

অ্যাণ্টনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, প্রস্তাবটায় টিনার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দৃঢ়ভাবে এক কথায় "হাঁ" বলিয়া হাতটা টানিয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

মিস্ আশার আজ রেশমী সুতার গুলি পাকাইতে ব্যস্ত। লেডি শেভারেলকে সেলাইয়ের কাজে হারাইতে হইবে। লর্ড আশার হাস্যমুখে নীরবে সুতা ধরিয়া

ভাবে
* দ্রষ্টব্য—
ন না না তুল
O. Pruss. gu
জাতি-বাচক এবং
√gan, to beget
(see Baly's—Eu
ইংরেজী woman শ

রহিয়াছেন। লেডি শেভারেলের সব সরঞ্জামই তখন হাতের কাছে; টিনা দেখিল তাহাকে এখন কোনো দরকার হইবে না, তাই সে বসিবার ঘরে গিয়া বাজাইতে বসিল। গভীর মধুর সুরের ধ্বনি তুলিয়া বারটা বাজিবার আগের এই দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি বোধ হয় অতি সহজেই কাটাইয়া দিতে পারিবে। বাজানোর নেশায় সে মাতিয়া গেল। অতি সুখের দিনে এমন করিয়া বাজাইতে সে কিছুতেই পারিত না। মনের মধ্যের যত-রকম তুমুল ঝড় আজ তাহাকে এত বেদনা দিতেছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় সে-সকলের সমস্ত জোর সে সঙ্গীতের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। হারিবার সময় বেদনাই যেমন কুস্তিগীরের হাতের দৃঢ়মুষ্টিতে নূতন বল আনিয়া দেয়, ভয় যেমন দুর্ব্বলের ক্ষীণকণ্ঠের ধ্বনিও সুদূরে ধ্বনিত করিয়া তুলে, তেমনি বেদনাই আজ টিনার সঙ্গীত মধুময় করিয়া তুলিল।

সাড়ে এগারটার সময় লেডি শেভারেল আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন, "টিনা, একবার নীচে গিয়ে মিস্ আশারের রেশমটা ধরবে কি? লেডি আশার আর আমি আজ খাবার আগেই বেড়াতে যাচ্ছি।"

টিনা নীচে চলিয়া গেল; বারটার আগে কোন্ ছুতায় উঠিয়া পড়িবে তাহার এই ভাবনা। আজ না যাইতে পারিলে কিছুতেই চলিবে না; এই অমূল্য মুহূর্ত্তই হয়ত তাহার শেষ অবসর, এ অবসর হারাইলে কিছুতেই চলিবে না—আজ তাহার সকল কথা সে বলিয়া লইবে। তাহার পর আর না; নীরবে সব সে সহ্য করিবে।

হলদে রেশমের সুতার গোছাটা হাতে করিয়া বসিতে না বসিতে মিস্ আশার খুব অমায়িকভাবে বলিলেন, "কাপ্তেন উইব্রোর সঙ্গে তোমার আজ কাজ আছে, জানি। আমি তোমায় সময় হওয়ার পরে কিছুতেই ধরে রাখ্‌বো না।"

টিনা ভাবিল, "আমায় নিয়ে এঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে দেখ্‌ছি।" সুতা ধরিতে ধরিতে তাহার হাত দুখানা কাঁপিতে লাগিল।

আবার তেমনি সদয় কণ্ঠে মিস্ আশার বলিয়া চলিলেন, "কাজটা বড় একঘেয়ে। সত্যি আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ।"

রাগে তখন টিনা দিশাহারা; সে বলিয়া উঠিল, "না, আপনার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কোনো দরকার নেই, লেডি শেভারেল বলেছেন বলেই আমি করছি।"

মিস্ সার্টির অসঙ্গত ব্যবহার সম্বন্ধে দুকথা শুনাইয়া দিবার গভীর ইচ্ছাটা এখন আর চাপিয়া রাখা চলে না। রাগে মিস্ আশার জ্বলিয়া আগুন! দরদীর মত অতি মোলায়েম সুরে মিহি গলায় বিদ্বেষের বিষ ঢালিয়া বিদ্রূপ করিয়া মিস্ আশার বলিলেন, "মিস্ সার্টি, তুমি যে আর-একটু ভালভাবে নিজেকে সংযত করতে শেখোনি এতে আমি বাস্তবিক দুঃখিত। তোমার মনের এসব অন্যায় ভাবগুলি প্রকাশ পেতে দিয়ে নিজেকেই ছোট করছ। বাস্তবিক! নিজেকে হীন করছ।"

টিনা রেশমের গোছা হইতে হাত দুখানা ছাড়িয়া দিয়া স্থিরদৃষ্টিতে মিস আশারের দিকে বড় বড় চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "কি অন্যায় মনের ভাব?"

"বেশী কিছু বলবার কোনো দরকার দেখছি না। কি বলছি বুঝতেই ত পেরেছ। কর্ত্তব্যজ্ঞানটা একটু ঝালিয়ে নিলেই চলবে। তোমার সংযমের অভাবের জন্যে কাপ্তেন উইব্রো বেশ ব্যথা পান।"

"আমি তাঁকে ব্যথা দিই, তিনি বলেছেন নাকি?"

"হাঁ, নিশ্চয়, বলেছেনই ত। তুমি আমার সঙ্গে এমন-ভাবে ব্যবহার কর যেন আমি তোমার শত্রু। এতে তিনি বেশ ব্যথা পান। তিনি চান যে তুমি আমার বন্ধু হও। আমরা দু'জনেই তোমার ভাল চাই, তোমার এ-রকম ধরণধারণে আমরা বেশ দুঃখিত।"

টিনা তীব্রস্বরে বলিল, "তিনি খুব ভাল, বোঝা গেছে! আমি কি রকম ভাব পোষণ করি, বলেছেন তিনি?"

এ রকম তীব্র বিদ্রূপের স্বরে মিস আশারের বিরক্তি আরো বাড়িয়া উঠিল। নিজের কাছেও স্বীকার না করিলেও মনের মধ্যে যে অ্যান্টনির সম্বন্ধে তাঁহার একটু সন্দেহ ছিল না তা বলা যায় না। অ্যান্টনি হয়ত নিজের মনের ভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে কথাগুলা মিথ্যাই বলিয়াছে। ক্ষণিক রাগের চেয়ে এই সন্দেহটাই তাঁহাকে এমন কোনো একটা কথা বলাইতে চেষ্টা করিতেছিল—যাহাতে অ্যান্টনির কথার সত্য-মিথ্যাটা পরখ করা হইয়া যায়। এইসঙ্গে টিনাকে

একটু খাটো করিবার লোভটাও বিয়েট্রিসের প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

"মিস্ সার্টি, এসব বিষয়ে কথা বলতে আমি ভালবাসি না। যে পুরুষ কোনো দিন এতটুকু ধরা-ছোঁয়াও দেয় নি, কোনো ভিত্তি না পেয়েই তাঁর সঙ্গে যে কি জোরে কোনো মেয়েমানুষ প্রেমে পড়তে পারে তা আমি বুঝতেও পারি না। এক্ষেত্রেও এই-রকম ঘটেছে বলেই কাপ্তেন উইব্রোর কাছে শুন্‌লাম।"

একটু নীচু গলায় খুব পরিষ্কারভাবে টিনা বলিল, "তিনি আপনাকে একথা বলেছেন? সত্যি না কি?" টিনার ঠোঁটে তখন রক্তের লেশমাত্র নাই। চেয়ার ছাড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল।

"হ্যাঁ, সত্যি তিনি বলেছেন; তোমার এরকম অদ্ভুত ব্যবহার দেখে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন।"

টিনা কোনো কথা বলিল না, কিন্তু হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীর বারান্দা ও সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া নিঃশব্দে নিষ্প্রভ উল্কার মত সে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার জ্বলজ্বলে চোখ, রক্তহীন ঠোঁট, লঘুদ্রুত পদক্ষেপ দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন রমণী নয়; কোনো ভীষণ উদ্দেশ্যের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। উপরের দালানের বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্রের উপর তখন দুপুরের প্রখর রোদ পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছিল; তলোয়ারের বাঁটের তোলা কাজের উপর ও বর্ম্মের পালিশকরা কোণগুলিতে সূর্য্যের অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দালানে অনেক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সাজানো। টিনার ইটালীয় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আজ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আলমারীর মধ্যে একটা ছোরা আছে সে জানে; ভালরকমই জানে। আলমারীর কাছে গিয়া ছোঁ দিয়া ছোরাটা তুলিয়া সেটাকে সে পকেটে পুরিয়া লইল। তারপর তিন মিনিটের মধ্যেই টুপি জামা পরিয়া পাথর-বাঁধানো রাস্তায় আসিয়া হাজির। এইবার সে বাগানের এক টেরে নির্দ্দিষ্ট জায়গার দিকে ছুটিয়া চলিল। ক্ষেতের পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাস্তাটা চলিয়াছে; টিনার মাথার উপর সোনালি পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই; পায়ের তলায় পায়ে পায়ে সে ধরণীকে ছুঁইয়া যাইতেছে, সেদিকেও দৃষ্টি নাই। হাতখানা পকেটের ভিতর। মুঠি করিয়া ছোরার বাঁটটা চাপিয়া ধরিয়া আছে; খাপের বাহিরে আধখানা টানিয়া তোলা।

বাগানের সেই ঘন গাছে ঘেরা কোণে পৌছিয়া ডালে জড়ানো চাঁদোয়ার তলাটা কেমন যেন অন্ধকার ঠেকিল। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, যেন এখনি ফাটিয়া যাইবে—প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে এই তাহার নাড়ীর শেষ স্পন্দন। কিন্তু এই একটা কাজ যে বাকি আর একটু সময় চাই! এখনি সে আসিবে, টিনার সামনে এই মুহূর্ত্তেই আসিয়া পড়িবে। মিথ্যা হাসির জালে মুখ ভরিয়া এখনি আসিবে—মনে করিবে টিনা বুঝি তাহার ঘৃণিত নীচতার কথা কিছুই জানে না;—অমনি তাহার বুকে টিনা ছোরাটা বসাইয়া দিবে।

আহা বেচারা! জালে তোলা মাছগুলিকে আবার জলে ছাড়িয়া দিবার জন্য যে কাঁদিয়া সকলকে অনুরোধ করিত—অতি ক্ষুদ্র জীব, এমন কি পোকা মাকড়ও যে কোনো দিন ইচ্ছা করিয়া মারে নাই—আজ কিনা অন্ধ উন্মাদনায় পড়িয়া সে-ই খুন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে—যাহার গলার স্বরটুকু শুনিয়াও সে বিচলিত হইয়া উঠিত, তাহারি সম্বন্ধে আজ এমন কল্পনা!

ঘাড় ফিরাইতেই টিনা দেখিল,—হাত পাঁচ ছয় দূরে রাস্তার ভিজে পাতার গাদার উপর ওটা কি পড়িয়া?

হা ভগবান! এ যে সে—আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে—টুপিটা মাথার উপর হইতে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। অসুখ করিয়াছে বুঝি—মূর্চ্ছা গিয়াছে? টিনার হাতের মুঠি ঢিলা হইয়া ছোরাটা খসিয়া পড়িল, সে ছুটিয়া সেইদিকে চলিল। অ্যান্টনির চোখ দুটো স্থির; সে ত টিনাকে দেখিতেছে না। টিনা পাতার মধ্যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে তাহার প্রিয়ের মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া ঠাণ্ডা কপালের উপর একটি চুম্বন করিল।

"অ্যান্টনি, অ্যান্টনি! কথা বল—আমি যে টিনা—আমার সঙ্গে কথা বল। হে ভগবান, এ যে আর নাই।"

চোদ্দর পরিচ্ছেদ।

লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া মিঃ গিলফিলের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে স্যর ক্রিষ্টফার বলিলেন, "হ্যাঁ মেনার্ড,

বাস্তবিক আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে যে আমার জীবনে আমি এমন কোনো কাজের কল্পনা করিনি, যেটা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। ভাল করে মনে মনে সব ঠিকঠাক্ করে নিয়ে, তারপর তার'থেকে একচুলও এদিক-ওদিক করি না—এই হচ্ছে গিয়ে আমার নিয়ম। খুব জবরদস্ত মনই এ বিষয়েও একমাত্র বাদুমন্ত্র। মনে মনে কল্পনায় গড়ে তোলায় খুবই আনন্দ; কিন্তু জগতে যদি ঠিক তার পরেই আর কোনো আনন্দের স্থান থাকে, সে হচ্ছে কাজটি সুসম্পন্ন হতে দেখায়। যে বছর আমি এই বাড়ীর মালিক হই, আর হেনরিয়েটাকে বিয়ে করি, এক সেই '৫৩ সালটার পর এই বছরটাই হ'ল গিয়ে আমার জীবনের সকলের চেয়ে সুখের বছর। বাড়ীর ওপর শেষ যা এক পোঁছ দেবার ছিল, তা' ত হল। আমার সকলের বড় সাধ—অ্যাণ্টনির বিয়ে —তাও বেশ মনের মতনি ঠিকঠাক হয়েছে। আর এর পর তুমিও শীগ্‌গির টিনার বিয়ের আংটি কিন্‌তে যাবে। ও কি! অমন অসহায়ের মত মাথা নেড়ো না;—জানো আমি ভবিষ্যৎ বাণী করলে, সেটা প্রায় বিফল হয় না। ওহো, এদিকে যে বারটা বেজে পনের মিনিট হয়ে গেল—মার্খামের সঙ্গে গাছ কাটা বিষয়ে পরামর্শ করতে আমায় এক্ষুনি বেরতে হবে। আমার বুড়ো ওক গাছগুলিকে এই বিয়ের জন্যে দেখছি কাঁদতে হবে; কিন্তু—"

ধড়াম্ করিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল, টিনা ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার মুখখানা বিবর্ণ; ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, ভয়ে চোখ দুটো আরো বড় দেখাইতেছে। দুইহাত বাড়াইয়া স্যর ক্রিষ্টফারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে—"অ্যাণ্টনি··· · বাগানের কোণে... ...মরে......বাগানে," বলিয়াই সে অজ্ঞান হইয়া মেজেতে পড়িয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই স্যর ক্রিষ্টফার ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন; মিঃ গিল্‌ফিল্ দুইহাতে করিয়া টিনাকে তুলিয়া ধরিলেন। মাটির উপর হইতে তুলিতে গিয়া তাহার পকেটে কি যেন একটা শক্ত ভারী-মত হাতে ঠেকিল। এটা আবার কি? এর ভারেই যে তাহার ব্যথা লাগিবে। টিনাকে তুলিয়া সোফায় শোয়াইয়া পকেটে হাত দিয়া দেখেন—একটা ছোরা।

ভয়ে মেনার্ড শিহরিয়া উঠিলেন। টিনা কি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল, না...... একটা ভীষণ সন্দেহ তাঁহার মনে জোর করিয়া জাগিয়া উঠিল। "বাগানে—মরিয়া পড়িয়া আছে।" যে সন্দেহ তাঁহাকে জোর করিয়া খাপের ভিতর হইতে ছোরাটা টানিয়া বাহির করাইল, তাহা মনে করিয়া নিজের উপরই তাঁহার ঘৃণা হইতে লাগিল। না, না! এক ফোঁটা রক্তের দাগও ত কোথাও নাই। আনন্দে তাঁহার নির্দোষ ইস্পাতটাকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। নিজের পকেটের মধ্যে তিনি সেটা পুরিয়া রাখিলেন। উপরের দালানে যথাসম্ভব শীঘ্র গিয়া ঠিক জায়গায় রাখিয়া আসিলেই হইবে। কিন্তু,—টিনা এটা কিসের জন্য লইয়া গিয়াছিল? বাগানেই বা কি হইয়াছে? এটা কি কেবল টিনার বিকারের স্বপ্ন নাকি?

ঘণ্টা বাজাইয়া লোক ডাকিতে তাঁহার কেমন ভয় করিতে লাগিল—টিনার সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকিতে তাঁহার বড় ভয় হইতেছিল। মূর্চ্ছা ভাঙিলে সে না-জানি কি বলিয়া বসিবে? হয়ত পাগলের মত প্রলাপ বকিবে। টিনাকে ছাড়িয়া যাইতে যে তাঁহার পা সরে না! অথচ স্যার ক্রিষ্টফারের সঙ্গে ব্যাপারটা দেখিতে না যাওয়াটাও যে অপরাধ মনে হয়। কেবলমাত্র একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই সব-কটি চিন্তা তাঁহার মাথার ভিতর দিয়া খেলিয়া গেল— কিন্তু সেই একটি মুহূর্ত্তই তাঁহার কাছে সুদীর্ঘ যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিয়াছিল, টিনার জ্ঞান ফিরাইবার জন্য কিছু না করিয়া এতটুকু সময় নষ্ট করাও তাঁহার অপরাধ মনে হইল। সুখের বিষয় স্যার ক্রিষ্টফারের টেবিলের উপর জলের পাত্রটা ঠিক মজুত ছিল। তিনি ভাবিলেন—মুখে চোখে জল দিয়া দেখাও ত উচিত। কাহাকেও না ডাকিয়াও হয়ত তাহার জ্ঞান ফিরানো যাইতে পারে।

এদিকে স্যার ক্রিষ্টফার প্রাণপণ শক্তিতে বাগানের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। এই এক মুহূর্ত্ত আগে তাঁহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল, এখনই আবার কি একটা অস্পষ্ট ভয়ের সন্দেহে আহত। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রিউপার্ট কুকুরটা ভয় পাইয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়াছে; তাহার চীৎকার শুনিয়া মিঃ বেট্‌স্ কি একটা আকস্মিক ঘটনার আশঙ্কায় বাড়ীর পথ ছাড়িয়া সেই দিকে ছুটিয়া

চলিল। বাগানের সেই কোণের কাছেই স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গে তাহার দেখা। তাঁহার মুখ দেখিয়াই বেচারার চক্ষু স্থির। কিছু না বলিয়াও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। রিউপার্ট শুক্‌নো পাতার গাদার মধ্যে লুকাইয়া কি শুঁকিতে লাগিল। সে চোখের আড়াল হইতে না হইতে তাহার ডাকের সুরের হঠাৎ পরিবর্ত্তনে বোঝা গেল সে কিছু একটা পাইয়াছে। আর একমুহূর্ত্ত পরেই দেখা গেল একটা উঁচু টিপির উপর দিয়া সে লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছে। রিউপার্টকে পথপ্রদর্শক করিয়া তাঁহারাও সেখানে উঠিতে লাগিলেন। দাঁড়কাকগুলোর কা কা ডাক, আর পায়ের তালে তালে শুক্‌নো পাতার খস্‌খসানি তাঁহার কানে কেমন যেন অমঙ্গলের লক্ষণের মত মনে হইতেছিল।

টিপির উপর উঠিয়া উল্টাদিকে সকলে নামিতে লাগিল। স্যর ক্রিষ্টফারের চোখ পড়িল,—দূরে নীচের রাস্তার উপর হলদে পাতার গাদায় বেগুনি রঙের কি একটা পড়িয়া আছে। রিউপার্ট ইতিমধ্যেই সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে। কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফারের আর জোরে হাঁটিবার শক্তি নাই। তাঁহার অমন সবল হাত-পাও আজ কাঁপিতে আরম্ভ হইয়াছে। রিউপার্ট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কম্পমান হাতখানি চাটিতে লাগিল যেন বলিতে চায়, "সাহস কর।" তাহার পরই আবার ছুটিয়া গিয়া সেই দেহটা শুঁকিতে লাগিল। সেটা দেহই বটে,……অ্যান্টনির দেহ। ওইত সেই হীরার আংটিপরা শুভ্র সুন্দর হাতখানি শুক্‌নো পাতাগুলো মুঠো করিয়া পড়িয়া আছে। চোখ দুটি আধখানা খোলা, কিন্তু গাছের ডালের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো আসিয়া যে সোজা তাহার মধ্যে পড়িতেছে, সেদিকে সে-চোখের কোনই লক্ষ্য নাই।

স্নেহশীল বৃদ্ধ ভাবিলেন—হয়ত শুধু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে; হয়ত শুধুই মূর্চ্ছা। স্যর ক্রিষ্টফার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার গলার 'টাই' গায়ের জামা সব খুলিয়া ফেলিয়া বুকের উপর হাত রাখিলেন। মূর্চ্ছাই হইবে বোধ হয়। মৃত্যু নয় বোধ হয়—মৃত্যু!—মৃত্যু হইতে পারে না। না না; ও চিন্তাও দূরে ঠেলিয়া রাখিতে হইবে।

"বেট্‌স্ যাও, লোকজন ডেকে আন; ওই কুঁড়েটাতে তুলে নিয়ে যেতে হবে!—মিঃ গিলফিল আর ওয়ারেনকে খবর দিতে কাউকে পাঠিয়ে দাও! তাঁরা যেন ডাক্তা হার্টকে আন্‌তে লোক পাঠান, আর গিন্নিকে আর মি আশারকে বলেন যে অ্যান্টনির অসুখ করেছে।"

মিঃ বেট্‌স তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল; স্যর ক্রিষ্টফা একলা সেইখানে বসিয়া রহিলেন। অ্যান্টনির তরুণ দেহে কোমল নমনীয় হাতপাগুলি, পূর্ণ মুখখানি, টক্‌টকে লা ঠোঁট, শুভ্র মসৃণ হাত, সবই ঠাণ্ডা, সবই আড়ষ্ট। বৃদ্ধে যন্ত্রণাকাতর মুখখানি নীরবে তাহার উপর ঝুঁকিয়া আছে বার্দ্ধক্যের কঠিন অসংখ্যশিরাময় হাত-দুখানি কাঁপিয় কাঁপিয়া তরুণ দেহখানির মধ্যে প্রাণের সামান্য স্পন্দ খুঁজিয়া ফিরিতেছে।—যদি জীবনের এক কণাও আশ থাকে।

রিউপার্টও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেখানে বসিয়া বসিয় দেখিতেছিল; একবার করিয়া মৃত্যুশীতল হাতখানি আর একবার করিয়া জীবন্তের হাতখানা চাটিতেছিল। খানিক পরেই হঠাৎ মিঃ বেটসের পায়ের দাগ ধরিয়া ছুটিয়া গেল, যেন সে শীঘ্র তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। শেষ পর্য্যন্ত যাইতেও কিন্তু পারিল না, প্রভুর এ দুঃখের সময় কি ছাড়িয়া যাওয়া যায়! আবার ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিল।

পনরর পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানহীন অচেতন শরীরে যখন চেতনা ফিরিয়া আসে, তখনকার সে দৃশ্য কি আশ্চর্য্য। যে মুখে চোখে চেতনার কি বুদ্ধির কোনো চিহ্ন নাই, শূন্য চিত্রপটের মত যাহা পড়িয়া আছে, কোনো মানুষ যখন প্রথম সেই-রকম শরীরে চেতনার সঞ্চার দেখে তখন গভীর-অন্ধকারে ঢাকা নিঃঝুম নিস্পন্দ পাহাড়ের চূড়ায় ঊষার প্রথম আলোকপাতের কথা তাহার মনে পড়ে। সামান্য একটু স্পন্দন, তাহার পরই বরফের মত জমাট চোখ দুটিতে স্বচ্ছ আলো ফিরিয়া আসে; চোখে আলো পড়িবামাত্র, প্রথমে শিশুর মত অর্দ্ধচেতনভাবে শুধু একবার চোখ মেলে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চমকিয়া চাহিয়া দেখে। বর্ত্তমানটা তাহার চোখে পড়ে বটে, কিন্তু সে যেন কি একটা অজানা ভাষার লেখার মত; স্মৃতি আসিয়া তখনও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দেয় না।

টিনার মুখের উপর দিয়া যখন এমনি একটু একটু

করিয়া পরিবর্ত্তন আসিতেছিল; তখন আনন্দে মিঃ গিল্‌ফিলের শরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল। তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার ঠাণ্ডা হাত দুখানি ঘসিয়া গরম করিয়া তুলিতেছিলেন; তাঁহার স্নেহমাখা কোমল দৃষ্টি তখন তাহার মুখের উপর স্থাপিত। ধীরে ধীরে কালো চোখ দুটি মেলিয়া টিনা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। তিনি মনে করিলেন খাইবার ঘরে হয়ত এই বেলা দিবার মত কোনো উত্তেজক পানীয় পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া ঘর ছাড়িয়া যাইতেই টিনা চোখ ফিরাইয়া জানালার কাছে স্যর ক্রিষ্টফারের চেয়ারের দিকে তাকাইল। ওই-খানেই ত তাহার স্মৃতির ধারা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; তাহার চিহ্নটুকু দেখিতেই ভোরের স্বপ্নের মত অস্পষ্টভাবে সকালের ঘটনাগুলি একে একে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল; তখনই মেনার্ড খানিকটা উত্তেজক পানীয় লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাহার পর টিনাকে তুলিয়া ধরিয়া সেটুকু পান করাইয়া দিলেন। টিনা কিন্তু তখনও নীরব; অতীত স্মৃতিগুলি জাগাইবার চেষ্টায় সে মগ্ন। এই সময় দরজা খুলিয়া ওয়ারেন আসিয়া ঢুকিল। তাহার মুখের চেহারায় দুঃসংবাদের গভীর ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। সে পাছে টিনার কাছেই কোনো কথা বলিয়া ফেলে এই ভয়ে মিঃ গিল্‌ফিল্‌ মুখে আঙুল দিয়া ইসারা করিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে খাইবার ঘরে লইয়া চলিয়া গেলেন।

পান করার পর শরীরটা বেশ টাট্‌কা হইয়া ওঠাতে টিনার স্মৃতিশক্তি সজাগ হইয়া উঠিল। বাগানের সব কথা মনে পড়িল। অ্যান্টনির প্রাণহীন দেহ সেখানে পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়াই সে স্যর ক্রিষ্টফারকে বলিতে আসিয়াছিল। তাঁহারা কি করিতেছেন গিয়া দেখিয়া আসিতেই হইবে। হয়ত সে মরে নাই—হয়ত শুধু মূর্চ্ছা; লোকে ত' মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়ে শোনা যায়। মিঃ গিল্‌ফিল্‌ যখন লেডি শেভারেল ও মিস্‌ আশারকে কেমন করিয়া খবর দেওয়া ভাল, এই বিষয়ে ওয়ারেনকে উপদেশ দিতে দিতে, নিজে টিনার কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, টিনা তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরের খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের খোলা হাওয়ায় চলিতে চলিতে তাহার শক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল, শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনের আবেগও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; তাহার মন যেখানে পড়িয়া শরীরও সেইখানে যাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল,—বাগানে অ্যান্টনির কাছে যাইবার জন্য তখন সে পাগল। তাড়াতাড়ি সে সেইদিকে চলিতে লাগিল; মনের প্রবল আগ্রহ ও উত্তেজনায় দুর্ব্বল শরীরেও একটা ক্ষণিক শক্তি জাগিয়া উঠিল। তাহারই জোরে সে ছুটিতে লাগিল।

হঠাৎ শুনিল, কি যেন একটা ভারী জিনিষ বহিয়া আনার শব্দ; চাহিয়া দেখে গাছের ছায়ায় ছায়ায় কাঠের সাঁকোর কাছ দিয়া অনেক লোকে মিলিয়া কি-একটা জিনিষ আস্তে-আস্তে বহিয়া আনিতেছে। শীঘ্রই তাহারা টিনার সামনে আসিয়া পড়িল। অ্যান্টনি আর সেখানে নাই। সকলে মিলিয়া তাহাকে একটা কপাটের উপর শোয়াইয়া তুলিয়া আনিতেছে, স্যর ক্রিষ্টফার দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া তাহাদের পিছনে পিছনে আসিতেছেন; তাঁহার মুখখানা মড়ার মত শাদা, চোট দুটি যন্ত্রণাকাতর; শক্তিশালী পুরুষের অন্তরে রুদ্ধ গভীর শোকের ছায়া সেখানে ফুটিয়া রহিয়াছে। যে মুখে টিনা কোনো দিন বেদনার চিহ্ন দেখে নাই, আজ সেই মুখে শোকের এমন গভীর দাগ দেখিয়া টিনার মনে একটা নূতন ভাবের স্রোত আসিয়া পড়িল, মুহূর্ত্তের জন্য আর-সব চিন্তা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে কোমল পদক্ষেপে তাঁহার কাছে গিয়া ছোট হাতখানি দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাঁহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। স্যর ক্রিষ্টফার তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিতে পারিলেন না, কাজেই সেও এই শোকযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে 'মসল্যাণ্ডে' বেট্‌সের ঘরে গিয়া উঠিল, সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল, সত্য-সত্যই অ্যান্টনি মৃত কি না।

পকেটে যে ছোরাটা নাই তাহা সে এখনও লক্ষ্য করে নাই। সে কথা একবার ভাবেও নাই। অ্যান্টনিকে মৃত্যুর কোলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার নূতন বিদ্রোহ ও ঘৃণার ভাব কোথায় চলিয়া গিয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে অতীতের সেই মধুর ভালবাসার স্রোত ফিরিয়া আসিয়াছে। জীবনের প্রথমে যে ভাব বহুদিন ধরিয়া মানুষের মন জুড়িয়া

বসিয়া থাকে, পরেও তাহা মনের উপর অনায়াসেই প্রভুত্ব করে। ওই যে স্থির মৃত্যুমলিন চোখ দুটি, ও-দুটির সঙ্গে অতীতের যে স্মৃতি জড়িত, সে কেবল অতীতের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির স্মৃতি। মাঝের অন্যায় আচরণ, হিংসা, ঘৃণা, সব-কথাই সে ভুলিয়া গিয়াছে—নির্ব্বাসিত যেমন করিয়া গৃহের মধুর সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নির্জ্জন নিরানন্দ শাস্তির দেশে গিয়া মাঝের দুর্গম পথের কথা ভুলিয়া যায়, তেমনি করিয়া সেও অ্যান্টনির নিষ্ঠুরতা ও নিজের প্রতিহিংসার ইচ্ছার কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

ষোলর পরিচ্ছেদ।

রাত্রির আগমনের আগেই সকল আশা ফুরাইয়া গেল। ডাক্তার হার্ট বলিয়াছেন এ মৃত্যুই। অ্যান্টনির দেহ বাড়ীতে আনা হইল, বাড়ীর সকলেই তাহাদের এ দুর্দ্দিনের কথা শুনিল, ডাক্তার হার্ট টিনাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; উত্তরে সে বলিয়াছে যে অ্যান্টনিকে সে এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে। সে যে অমন সময় সেখানে বেড়াইতেছিল, এটা এক মিঃ গিল্‌ফিল্ ছাড়া সকলেই দৈব ঘটনা ধরিয়া লইয়াছিলেন। ওই উত্তরটি দেওয়া ছাড়া টিনাও আর কোনো কথা বলে নাই। মালীর রান্না-ঘরের একটা কোণে সে নীরবে বসিয়া ছিল; মেনার্ড উঠিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেই কেবল মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিতেছিল। অ্যান্টনির বাঁচা সম্ভব কি না এই এক চিন্তা ছাড়া আর কোনো কথাই বোধ হয় তখন তাহার ভাবিবার শক্তি ছিল না। দেহ তুলিয়া লইয়া সকলে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার আশাও ফুরাইয়া গেল। আবার সে স্যর ক্রিষ্টফারের সঙ্গী। এমন শান্তভাবে সে চলিল যে ডাক্তার হার্টও তাহার উপস্থিতিতে কোনো আপত্তি করিলেন না।

কাল সকালে অপঘাত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান পর্য্যন্ত লাইব্রেরী-ঘরে দেহ রাখাই স্থির হইল; রাত্রির মত দরজা বন্ধ হইয়া যাওয়ামাত্র টিনা উঠিয়া উপরের দালান দিয়া নিজের উপর-তলার ঘরের দিকে চলিল; ওই জায়গাটিতেই সে মন খুলিয়া দুঃখ-শোক করিতে পারে। সকালের সেই ভীষণ উত্তেজনার পরে এই তাহার সেখানে প্রথম পাদক্ষেপ। সেই জায়গা ও চারিদিকের সেই-সব জিনিষ-পত্র দেখিয়া তাহার লুপ্তপ্রায় স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সূ[র্য্যের] আলো নিভিয়া গিয়াছে, বর্ম্মের উপর পড়িয়া আর ঝক্[ঝক্] করিতেছে না; গভীর অন্ধকারে আলমারীর গায়ে ব[র্ম্মগুলা] মৃত্যুর মত ভীষণ রূপ ধরিয়া স্থির হইয়া ঝুলিয়া আছে। আলমারীর ভিতর হইতেই টিনা ছোরা লইয়া গিয়াছি[ল]। এখন আস্তে আস্তে সব-কথা তাহার মনে আসিতেছে তাহার গভীর দুঃখের কথা, তাহার ভীষণ অপরাধের ক[থা]। কিন্তু ছোরাটা এখন গেল কোথায়? টিনা পকেটে হ[াত] দিয়া দেখিল; পকেটে ত নাই। তবে কি এ সমস্ত এই ছোরার কথা, সবই কল্পনা? সে আলমারীর ভি[তর] খুঁজিল; সেখানেও যে নাই। হায়, হায়! এযে কল্প[না] হইতেই পারে না; সে সত্যই এই ভীষণ অপরা[ধে] অপরাধী। কিন্তু ছোরাটা কোথায় যাইতে পারে? সে কি পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে? হঠাৎ টিনা শুনি[ল] সিঁড়ি দিয়া কে যেন উঠিতেছে; সে তাড়াতাড়ি ছুটি[য়া] নিজের ঘরে গিয়া বিছানার কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসি[য়া] পড়িল। আলো এখন তাহার চক্ষের বিষ; মুখটা চাব[া] দিয়া বসিয়া বসিয়া সে সকালের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ঘট[না] মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

একে একে সব মনে পড়িল; এই একমাস ধরিয়া অ্যান্টনি যাহা কিছু করিয়াছে, আর সে যত-কিছু কষ্টভো[গ] করিয়াছে, সমস্তই মনে পড়িল—সেই জুন মাসের এ[ক] সন্ধ্যায় অ্যান্টনির সঙ্গে এই দালানে তাহার যে দিন শেষ-কথ[া] হইয়াছে তাহার পরে এই এত মাস ধরিয়া যাহা-কিছু ঘটিয়াছে আজ সব মনে পড়িল। টিনার মনে পড়িল, তাহার সে ভীষণ মানসিক ঝড়ের কথা, তাহার দুর্দ্দমনীয় আবেগের কথা, মিস আশারের প্রতি হিংসা ও ঘৃণার কথা, অ্যান্টনির উপর প্রতিশোধ তুলিবার ইচ্ছার কথা। টিনার মনে হইল—সে কি ভীষণ অপরাধই করিয়াছে; তাহার মন কি-রকম নীচ, সেই ত যত পাপ করিয়াছে, সেই ত অ্যান্টনিকে এই-সব কথা বলিতে ও এই-সব কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে, আর সেই-সবের জন্যই কি-না সে এত রাগে অন্ধ হইয়া বসিল। ধরা গেল না-হয় অ্যান্টনি অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করিয়াছে, কিন্তু সে-ই বা কি কমটা করিতে যাইতে-ছিল। সে এত মন্দ কাজ করিতে যাইতেছিল যে তাহার

কোনো ক্ষমাই নাই। তাহার ইচ্ছা করিতেছে, এখনি গিয়া সব পাপ স্বীকার করে, তবেই তাহার উপযুক্ত শাস্তিভোগ হইবে; আজ তাহার অধমের অধম হইয়া মাটিতে মিলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে—এমন কি মিস আশারের কাছে মাথা হেঁট করিতেও আজ সে প্রস্তত। স্যর ক্রিষ্টফার যদি সব কথা জানিতে পারেন, তবে তিনি তাহাকে দূর করিয়া দিবেন—কোনো দিন আর মুখও দেখিবেন না। তাই ভাল; বুকের মধ্যে অপরাধ লুকাইয়া রাখিয়া আদর পাওয়ার চেয়ে তাঁহার বিষ-নয়নে পড়িয়া শাস্তিভোগ করাতেই আজ তাহার বেশী সুখ। কিন্তু স্যর ক্রিষ্টফার সব-কথা জানিতে পারিলে তাঁহারই যে শোকের ভার বাড়িবে, তিনি যে শোকে দুঃখে ভাঙিয়া পড়িবেন। না! কোনো কথা বলাই অসম্ভব—তাহা হইলে যে অ্যাণ্টনির কথাও বলিতে হয়। কিন্তু এ বাড়ীতে থাকা যে তাহার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়—তাহাকে যাইতেই হইবে; স্যর ক্রিষ্টফারের অমন দৃষ্টি সে সহ্য করিতে পারিবে না—এই যে চারিধারের সব দৃশ্যই কেবল অ্যাণ্টনির কথা ও টিনার পাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে সে সহ্য করা যায় না। সে হয়ত শীঘ্রই মরিবে; তাহার যে বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছে; তাহার আর বেশীদিন বাঁচা সম্ভব নয়। টিনা ঠিক করিল, বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া কোনো জায়গায় অতি দীনভাবে দিন কাটাইবে আর ভগবানের কাছে ক্ষমা ও মৃত্যু ভিক্ষা করিবে।

বালিকা টিনা আত্মহত্যার কথা একবার ভাবিতেও পারিল না। প্রচণ্ড রাগটা চলিয়া যাইতেই তাহার স্বভাবের কোমলতা ও দুর্ব্বলতা ফিরিয়া আসিল, এখন এক ভালবাসা আর শোকই তাহার সম্বল। জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার নাই বলিলেই চলে, কাজেই গ্লেভারেল-প্রাসাদ হইতে সে লুকাইয়া চলিয়া গেলে যে পরে কি হইবে সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোনো কল্পনাই আসে নাই, চারিদিকে যে ভীতি, দুঃখ আর খোঁজের একটা সাড়া পড়িয়া ভীষণ একটা ব্যাপার গড়িয়া উঠিবে সে কথা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিল না। সে মনে মনে বলিল, "ওরা মনে করবে, আমি হয়ত মরেই গিয়েছি; আর, কিছুদিন পরে সবাই আমায় ভুলে যাবে, মেনার্ডও আবার সুখী হবে, আবার আর-কাউকে ভালবাসবে।"

দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া ঘা দিয়া কে তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া দিল। উঠিয়া দেখিল—মিসেস্ বেলামী—মিঃ গিল্‌ফিল্ তাহাকে মিস্ সার্টির খবর লইতে ও কিছু খাবার ও পানীয় দিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বুড়ী বলিল, "বাছা, তোমাকে যে বড় খারাপ দেখাচ্ছে; ওমা, শীতে যে ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপছ। যাও, যাও, শুয়ে পড় গিয়ে, চট করে। মার্থা এখুনি এসে আগুন জ্বেলে ঘর গরম করে' দিয়ে যাবে। আমার আবার এখুনি ত যেতে হবে, এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত আর চল্‌বে না। কত কাজকর্ম্ম; এদিকে মিস্ আশার ত ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন, আর তাঁর ঝিটি বিছানায় পড়ে। তাই শার্প-বুড়ীর এক দণ্ড নিস্তার নেই। যাক্, আমি মার্থাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে; তুমি এখন কাপড়চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড় ত; যাও লক্ষ্মী মেয়ে, ভাল করে নিজের যত্ন নিও।"

বুড়ীর শুক্‌নো গালে একটি চুম্বন দিয়া টিনা বলিল, "ধন্যবাদ মাসি; আমি 'এরারুট'টা খেয়ে ফেল্‌ব এখন, আজ আর আমার জন্যে মিথ্যে ব্যস্ত হয়ো না। মার্থা আগুন দিয়ে গেলেই আমি বেশ থাক্‌ব। মিঃ গিল্‌ফিল্‌কে বোলো যে আমি অনেকটা ভাল আছি। আমি এই শুলাম বোলো; তোমায় আর আস্‌তে হবে না—এলে হয়ত আমারি অসুবিধা হবে।"

"বেশ, বেশ, মা ভাল করে থাক, ভগবান করুন্, চোখে যেন একটু ঘুম আসে।"

মার্থা আসিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল, টিনা পথ্যটুকু খাইয়া লইল। অনেকখানি হাঁটিতে হইবে, গায়ে একটু জোর করিয়া লইবারই তাহার ইচ্ছা। বিস্কুট ক'খানা সঙ্গে লইবার জন্য রাখিয়া দিল। এবাড়ী ছাড়িয়া যাইবার চিন্তাতেই এখন তাহার মনটা পরিপূর্ণ; তাহার ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় যাহা কিছু উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছিল, তাহারি ভাবনাতেই সে ব্যস্ত।

তখন সবে গোধূলি। ভোর রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে; অন্ধকারে যাইতে তাহার বড় ভয় করে; তবে বাড়ীতে কোনো লোকজন উঠিবার আগেই যাওয়া ঠিক। লাইব্রেরী-ঘরে অবশ্য অ্যাণ্টনির কাছে লোক থাকিবে, তা খিড়কির দরজা দিয়া বাগানে বাহির হইয়া পড়িলেই ত চলিবে।

গরম জামা, টুপি, ওড়না, সব টিনা গুছাইয়া রাখিল। একটা মোমবাতি জ্বালিয়া দেরাজ খুলিয়া কাগজে-জড়ানো সেই ভাঙা ছবিখানা বাহির করিল। পেন্‌সিলে-লেখা অ্যান্টনির দুখানা চিঠিতে সেখানা আরো জড়াইয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া লইল। দেরাজে ডরকাসের উপহার সেই চীনা-মাটির ছোট বাক্সটি, একজোড়া মুক্তার দুল, একটা রেশমের থলি আর তাহার মধ্যে পনেরোটি মোহর ছিল। মোহরগুলি তাহার জন্মদিন উপলক্ষে স্যর ক্রিষ্টফারের উপহার। সে যে-বৎসর এখানে আসিয়াছে, তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর একটি করিয়া পাইয়া আসিয়াছে। টিনা ভাবিল—দুল আর মোহর কখানা নেওয়া কি ঠিক? কিন্তু সেগুলি ছাড়িয়া যাইতেও যে টিনার প্রাণ চায় না। তাহার মনে হইতেছিল, ঐগুলির মধ্যেই যেন স্যর ক্রিষ্টফারের অনেকখানি ভালবাসা মাখানো আছে। মৃত্যুর পর ওগুলি সঙ্গে করিয়াই যদি তাহাকে কবর দেওয়া হয়, তবে বুঝি সে তৃপ্তি পায়। টিনা দুল জোড়া কানে পরিয়া ডরকাসের বাক্স আর টাকার থলিটা পকেটে পুরিয়া লইল। সেখানে আর-একটা থলি ছিল, সেটা বাহির করিয়া নিজের তহবিলটা ঠিক করিয়া লইল, ও-মোহরগুলি ত সে প্রাণ ধরিয়া খরচ করিতে পারিবে না। থলিতে গোটা কুড়ি-একুশ টাকা ছিল; টিনা ভাবিল, ইহাই যথেষ্ট।

ভোরের অপেক্ষায় সে বসিয়া রহিল, শুইলে যদি বেশী ঘুমাইয়া পড়ে এই ভয়। যদি আর একবারটি অ্যান্টনিকে দেখিতে পাইত, যদি তাহার মৃত্যুশীতল কপালে একটি চুম্বন দিয়া যাইতে পারিত। টিনার কেবল এই একটি বাসনা। কিন্তু সে যে হইতে পারে না। সে এ অধিকারের যোগ্য নয়। তাহাকে সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই হইবে, স্যর ক্রিষ্টফার, লেডি শেভারেল, মেনার্ড, আর যে কেহ তাহাকে ভালবাসিত, তাহাকে ভাল মনে করিত, সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে।' সে যে মনে মনে ঘোর পাপী, তাহাদের মনে স্থান পাইবার যোগ্য ত সে নয়। এইসব ভাবিতে ভাবিতে টিনা রাত্রি কাটাইল। (ক্রমশ)

শ্রীশান্তা দেবী।

রাজনারায়ণ বসু *

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু নয় বছর পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করে এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীটা প্র শেষ করিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। অতএ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, রাজা রামমোহন রায়ে যুগ হইতে এযুগ পর্য্যন্ত এদেশে শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে যতগুলি বড় ব আন্দোলন হইয়া গেছে, সমস্ত আন্দোলনগুলিরই ঢে ইঁহার জীবনের তটে কোন-না-কোন সময়ে আঘা করিয়াছে। কখনো বা কোন কোন আন্দোলনের ঢে তাঁর জীবন-বেলার উপর দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বন্যার মত বহিয়া গেছে; কখনো বা কোন কোন আন্দোলনের ঢেউ তাঁর দৃঢ়িষ্ঠ চরিত্রের শৈলতটমূলে প্রতিহত হইয়া ফেনায়িত ও গর্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁর জীবনে গ্রহণবর্জ্জনের এই লীলা পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করা যায়, কেননা তিনি গতানুগতিক মানুষ ছিলেন না। তিনি যাহা ধরিতেন তাহা জোরের সহিত ধরিতেন; তিনি যাহা ছাড়িতেন তাহাও জোরের সহিতই ছাড়িতেন।

সুতরাং আগে এই মানুষটির ব্যক্তিত্বের পূরো পরিচয় না পাইলে কালের হিসাবে নানা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর কৃতকীর্ত্তির কোন পরিচয়ই পাওয়া যাইতে পারে না। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দানের রূপ সম্বন্ধে খবর লইতে গেলে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে গোড়ায় কিছু জানা দরকার।

সৌভাগ্যক্রমে যাঁহাকে আজ আমরা এই স্মৃতি-সভার সভাপতিরূপে পাইয়াছি, তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে রাজনারায়ণ বাবুর যে একখানি চমৎকার ছবি তিনি আঁকিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত মানুষটি, মানুষটির অন্তর এবং বাহির একেবারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাজনারায়ণ বাবুর ব্যক্তিত্বের অমন সম্পূর্ণ সুন্দর প্রতিকৃতি আর কোথাও দেখি নাই বলিয়া অগত্যা সেই ছবিখানিই আপনাদের সামনে ধরিতেছি। "জীবনস্মৃতি"র রচয়িতা লিখিতেছেন:—

* ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

"ছেলেবেলার রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক্ হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুল দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোট তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোন অনৈক্য ছিল না।......এমন কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না— না বয়সের গাম্ভীর্য্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনাশ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।..... রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ, কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক্ আর না লাগুক্ সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

আপনারা সকলেই জানেন যে, রাজনারায়ণ বাবুর শৈশবেই এদেশে ইংরেজীশিক্ষার দ্বারা চিন্তার স্বাধীনতার এক নূতন উদ্বোধনে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটা ভয়ানক সমাজবিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। সেই বিদ্রোহের মূলে ছিলেন ডিরোজিও, তিনিই তাঁর ছাত্রদিগকে চিন্তার স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, রাজা রামমোহন রায়ের পরে সেই আন্দোলনই এদেশে সবচেয়ে বড় আন্দোলন। তখন হইতেই বাংলাদেশে Rationalismএর যুগ সুরু হইল, এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যায়। রাজনারায়ণ সেই হিন্দুকালেজেই শিক্ষা পান, তিনি রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র, এবং তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন মাইকেল মধুসূদন এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি, যাঁরা যৌবনেই দেশীয় সমাজের নোঙর ছিঁড়িয়া দেশবিদেশে ভাসিয়া পড়িয়াছিলেন। সেই না-মানিবার যুগে, সেই বিদ্রোহের ঝোড়ো হাওয়ায় বহুপুরুষের বদ্ধমূল শতপাকেজড়ানো সংস্কারের খুঁটিখোঁটা রসারসিগুলা যে কেমন করিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, হিন্দুধুবার হিন্দুত্বের সংস্কার পর্য্যন্ত যে কেমন করিয়া এক নিমেষের মধ্যে খসিয়া গেল, তাহা এখন কল্পনা করাও শক্ত। রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে এই সময়কার কথাপ্রসঙ্গে লিখিতেছেন :—

"এখন যেখানে সেনেটহাউস হইয়াছে, সেখানে কতগুলি শিক্‌কাবারের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদিঘির রেল টপ্‌কাইয়া (ফাটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজসংস্কারের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম।"

যেমন আচার ভাঙা সম্বন্ধে তেম্‌নি ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও তিনি লিখিতেছেন যে, প্রথমে হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁর বিশ্বাস টলিল, তারপর রামমোহন রায় ও চ্যানিংএর গ্রন্থ পড়িয়া তিনি কিছুদিন ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টান হইলেন, মাঝে আবার কিছুদিন "ঈষৎ মুসলমান"ও হইয়াছিলেন (এটা তাঁরি কথা) এবং তার পরে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হন্। অবশেষে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখনও দেখি তাঁর ঐ সংস্কার ভাঙার জেদ্‌টা যায় নাই। তিনি লিখিতেছেন—

"যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও শেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়।"

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষার ইতিহাসে একসময়ে শেরী-অভিষেকের ব্যাপারও ছিল, ইহা মনে করিলে এখন হাসি পায়! অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পর হইতে রাজনারায়ণের জীবনে সমাজ-সংস্কারের চেয়ে সমাজ সংরক্ষণের চেষ্টাই প্রবলতর আকারে দেখা দিয়াছিল। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেমন conservative বা রক্ষণশীল ছিলেন, রাজনারায়ণও সেই-রকমই ছিলেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রাজনারায়ণকে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রধান সহায় ও অনুচর রূপেই দেখিতে পাই। মহর্ষির প্রদর্শিত পন্থাতেই তিনি চিরজীবন চলিয়াছেন, সে পথ হইতে ডাইনে কিংবা বাঁয়ে কোন দিকেই একদিনের জন্যও হেলেন নাই।

প্রথম যৌবনে যিনি চিন্তার স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া বীরের মত জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পান্থশালায় আসিয়া সে ধ্বজা কি তিনি ফেলিয়া দিলেন, সে যাত্রা হইতে কি তিনি ক্ষান্ত হইলেন? কিম্বা বড় কোন বনস্পতির ছায়ায় কোন অপেক্ষাকৃত ছোট গাছ যেমন

বাড়িবার অবকাশ পায় না এবং শেষটা সেই বড় বনস্পতির শাখায় শাখা জড়াইয়া আলোকের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনই কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বৃহত্তর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের দরুণ, রাজনারায়ণের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আপনার স্বাতন্ত্র্যের পথে আপনি ফুটিতে পারে নাই? এ প্রশ্ন অনিবার্য্যভাবেই মনে উদয় হয়।

কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণের আজীবন নিবিড় বন্ধুত্বের কারণ এ নয় যে, রাজনারায়ণ সকল বিষয়েই তাঁর ছায়ার মত ছিলেন, তাঁর প্রতিধ্বনি করিতেন—কেননা, ছায়াটা কায়ার অনুবর্ত্তী, সমবর্ত্তী নয়। বন্ধুত্বের সম্বন্ধে, দিবার জন্য যত ব্যাকুলতা পাইবার জন্যও ততই আকাঙ্ক্ষা—একপক্ষ শুধুই দিতেছে আর একপক্ষ শুধুই নিতেছে, এ সম্বন্ধ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ নয়—এ সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ অথবা দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ হইতে পারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণের যেখানে ধর্ম্মের যোগ ঘটিয়াছিল, সেখানে তিনি দাতা রাজনারায়ণ গ্রহীতা। কিন্তু মহর্ষির সঙ্গে রাজনারায়ণের যেখানে কর্ম্মের যোগ ঘটিয়াছিল,—স্বদেশের হিতসাধন, স্বদেশ-আত্মার উদ্বোধন, এই বিশেষ কর্ম্মের যোগ যেখানে ঘটিয়াছিল—সেখানে রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রেমের জলন্ত পাবকশিখা হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশপ্রেমের, স্বদেশের আত্মোদ্বোধনের হোমাগ্নিশিখাটিকে অনেক সময়েই জ্বালাইয়া লইয়াছেন, দেখা যায়।

রাজনারায়ণের জীবনের শ্রেষ্ঠ দান কি, এই প্রশ্ন দিয়া আমি সুরু করিয়াছি। এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর এই যে, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দান তাঁর স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশচর্য্যা। তিনি আমাদের দেশের মধ্যে দেশাত্মবোধকে জাগাইয়া দিয়া গেছেন। তিনিই প্রথম "জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা" স্থাপন করেন এবং তাঁর প্রণীত "জাতীয়-গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা"র অনুষ্ঠানপত্র পড়িয়া পরে তাঁর বন্ধু নবগোপাল মিত্র মহাশয় প্রধানতঃ তাঁরি সহযোগিতায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত "হিন্দুমেলা"র আয়োজন করেন। দেশের সাহিত্যের চর্চ্চা, সঙ্গীতের চর্চ্চা, দেশীয় শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতির প্রদর্শনী, দেশীয় গুণী লোকদিগকে পুরস্কৃত করা সেই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। এই 'হিন্দুমেলা' বাংলার জাতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা; কারণ স্ব প্রেমের সেই প্রথম উদ্বোধন। স্বদেশী আন্দোলনের ত উদ্যোগপর্ব্ব। কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির তং আরম্ভ হয় নাই।

তারপর, ব্রাহ্মসমাজে সমাজসংস্কারের আন্দোলা ইতিহাসেও দেখি যে, রাজনারায়ণ কোন সময়েই স্বাজা বোধকে খর্ব্ব করিয়া বিজাতীয় সংস্কারকে গ্রহণ করি পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তিনিই প্রাণপণে স্বাজা বোধকে জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তঁ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পরেই ১৮৪৫ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টা পর্য্যন্ত অক্ষয়কুমারের দলের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে বেদ লইয়া তুমুল বিবাদ হয়। বাংলাদেশের ইতিহা সেও আর-একটা মস্ত আন্দোলন। রাজনারায়ণ তথ অক্ষয়কুমারের চেয়ে কোন অংশে কম যুক্তিবাদী ছিলে না, তবু যে তিনি বেদকে খর্ব্ব করিবার প্রস্তাবের বিরু লড়িয়াছিলেন তার একমাত্র কারণ এই যে, বেদ-বেদান্ত যদি রক্ষা না পায়, তবে যে ভারতবর্ষের প্রাচীনের সঙ্গে তার বর্ত্তমানের যোগসূত্র একেবারেই ছিঁড়িয়া যায় টেনিসন-কথিত "Love thou thy land, with love far-brought from out the storied past" সুদূর অতীত হইতে যে স্বদেশ-প্রেমের ধারা প্রবাহিত—সেই প্রেমেই তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল।

স্বদেশের প্রতি এই প্রবল অনুরাগের জন্য, স্বাজাত্য-বোধের এই একান্ত প্রাবল্যের জন্যই তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সমাজসংস্কারের আন্দোলনে পুরোপুরি যোগ দিতে পারেন নাই এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইনের বিবাহবিলের বিরুদ্ধে অমন প্রবল, অমন প্রচণ্ড প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁর প্রতিবাদের কারণ এ নয় যে, সমাজসংস্কার তিনি চান নাই কিংবা অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিবাহবিলের "আমি হিন্দু নই" এই স্বীকারোক্তিতে তাঁর সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়াছিল। তিনি একান্ত মনে চাহিয়াছিলেন যে, অসবর্ণ বিবাহই হিন্দু বিবাহ বলিয়া এদেশে গণ্য হয়। এইজন্য তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত Conservative Reformer অথবা রক্ষণশীল সমাজসংস্কারকের আদর্শই গ্রহণ করা সঙ্গত মনে

করিয়াছিলেন। সমাজকে ত্যাগ করিয়া নয়, কিন্তু সমাজের ভিতর হইতেই তার কুরীতিগুলিকে ধীরে ধীরে উন্মূলিত করিতে হইবে—এই ছিল তাঁর আদর্শ। মনে রাখিতে হইবে যে, যেমন radical reform অথবা আমূলসংস্কারের আদর্শ একটা মহৎ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আদর্শ, conservative reform অথবা রক্ষণশীল সংস্কারের আদর্শও তেমনি একটা বড় আদর্শ। অনেক দেশেই এই দুই আদর্শ একযোগে কাজ করে বলিয়াই দুদিক্কার পাষাণ ভাঙিয়া মোটের উপর কাজের ওজন সমান থাকিয়া যায়। রুশোর radical reformএর আদর্শ বড়, না বার্কের conservative reformএর আদর্শ বড়—ইহা লইয়া তর্ক করা বৃথা। কেননা, মানবসমাজের ক্রমাভিব্যক্তিতে দুই আদর্শেরই স্থান আছে; দুই আদর্শের যোগেই সমাজ অগ্রসর হইয়া থাকে।

শুধু ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া নয়, সাহিত্যের ভিতর দিয়াও রাজনারায়ণ স্বাদেশিকতার উদ্বোধন করিয়াছেন। রাজনারায়ণবাবুর যে রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে,—যেমন তাঁর 'একাল ও সেকাল', তাঁর "বঙ্গসাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা", তাঁর "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" প্রবন্ধ, তাঁর "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা", তাঁর "আত্মচরিত",—সমস্তগুলির মধ্যেই তাঁর সরল কৌতুকহাস্য, তাঁর অসাধারণ গল্পপ্রিয়তার ও গল্পপটুতার নিদর্শন পাই বটে, কিন্তু সকলের চেয়ে তাঁর স্বাদেশিকতার ছাপ এই রচনাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া আছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়াও তিনি দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বক্তৃতায় সমস্ত দেশময় এতই উত্তেজনা হইয়াছিল যে, সাকারবাদী কলিকাতার সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভাও ব্রাহ্ম রাজনারায়ণকে সেই বক্তৃতা তাঁদের সভায় পুনরায় পড়িবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁকে হিন্দুকুলচূড়ামণি, কলির ব্যাসদেব প্রভৃতি সম্ভাষণে সম্ভাষিত করা হয়। বিলাতের কাগজে পর্য্যন্ত ঐ বক্তৃতার আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছে।

এই যে প্রবল দেশাত্মবোধ তিনি আমাদের দেশের মধ্যে জাগাইয়া গেছেন, তাঁর পর হইতে এই বোধ কখনো খুবই সঙ্কীর্ণ কখনো ঈষৎ ব্যাপকভাবে আমাদের সমাজের নানা চেষ্টা নানা উদ্যোগের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়াই ক্রমশঃ এই দেশবোধের এমন একটি প্রশস্ত আধার প্রস্তুত হইয়া উঠিবে, যে আধারের সাহায্যে একদিন বিশ্বমানবের জ্ঞানপ্রেমকর্ম্মের বিচিত্র রসধারা এ দেশের জনে জনের মনে মনে পরিবেষিত হইবে।

কারণ এখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছি স্বাদেশিকতার বিপদ কোথায়! পৃথিবীতে দুরকমের স্বাদেশিকতা দেখিতে পাই, এক স্থাবর আর এক জঙ্গম। একের আড্ডা প্রাচ্যে, অন্যের আড্ডা পশ্চিমে। স্থাবর স্বাদেশিকতা প্রাচীনের দাঁড়ে শিকল-বাঁধা হইয়া প্রথা ও আচারের চিরকেলে দানাপানি পাইয়া আরামে থাকিতে চায়। আর জঙ্গম স্বাদেশিকতা অন্য দেশের বা অন্য জাতির পরে একটা বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবকে জাগাইয়া রাখিয়া আপনার প্রতিপত্তি ও প্রভাবকেই সর্ব্বত্র জয়ী করিতে চায়। দুইই বিশ্ববিমুখ, সুতরাং সত্যবিমুখ—দুয়ের বিপদই ঐ এক জায়গায়।

কিন্তু রাজনারায়ণের স্বাদেশিকতা বিশ্বমানবিকতার অভিমুখী না হইলেও, তাহা কোন কোন অংশে সঙ্কীর্ণ হইলেও, তাহাকে স্থাবর স্বাদেশিকতা বলা চলে না। তাহা প্রথার অন্ধ অনুবর্ত্তন ছিল না। তাহা যৌবনে আচারের শাসনকে কাটাইয়াছে, কিন্তু প্রাচীনের সঙ্গে যোগবিচ্ছিন্ন হয় নাই। বেদবিরোধী আন্দোলনেই তার প্রমাণ পাইয়াছি। অথচ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন রাজনারায়ণ সর্ব্বপ্রথমে পরম উৎসাহের সঙ্গে তাঁর সহোদর ও জেঠ্‌তুতো দুই ভাইকেই বিধবা-বিবাহ দেন। গ্রামের লোকে তাঁকে মারিবার ভয় দেখাইলে তিনি বলেন, "তাহা হইলে আমি খুসী হইব। আমি বাঙালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা ঘটিলে আমি স্থির করিব যে, এক্ষণে তাঁহাদিগের বিধবা-বিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল, তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে।" ইহা স্থাবর স্বাদেশিকতার কথা নয়!

"হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতায়" বক্তৃতায় তিনি মহাকবি

মিল্‌টনের এক উক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বলিয়াছিলেন—

"আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।"

হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎকে যিনি এমন আশাপূর্ণ হৃদয়ে দেখিয়াছিলেন, তাঁর পুণ্যস্মৃতিসভায় তাঁর জয়োচ্চারণ করিয়া আমিও এইখানেই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধানিবেদন শেষ করিতেছি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

তামাকের পাইপ

(Andre Theurietর মূল ফরাসী গল্প হইতে)

আমাদের কালে তের চৌদ্দ বছর বয়সে ছেলেদের ঘাড়ে তামাক খাবার ঝোঁকটা যেন ভূতের মত চেপে বস্‌ত। আজকালকার ছেলেগুলোর তেমন হয় কি না কে জানে? এখন হয়ত আর ও-সব সখের চলন নেই। কিন্তু আমার যখন সবে চার বছর বয়স, তখন থেকেই আমাদের কাছে ওটা যেন নিষিদ্ধ ফলের মত মনোহরণ রূপ ধরে দেখা দিত। আমাদের ছোট শহরটির রাস্তায়-রাস্তায় সিগারেট মুখে করে বেড়ানোর ভবিষ্যৎ আনন্দে—পূর্ণ বয়সের অমন অপরূপ অধিকারের আনন্দে তখন আমরা বিভোর। ছুটির দিনে আমাদের কাজ ছিল সুখদুঃখে-উদাসীন সন্ন্যাসীর মত এক মনে সাধনা করা—এই সুকঠিন সাধনাটি ছিল তামাক খাওয়ার। তার মধ্যেও অবশ্য একটা কথা আছে; মা-বাপের আদুরে মাথার মণি আমরা মোটেই ছিলাম না; পকেটে পয়সারও কিছু কমতি ছিল; কাজেই দামী সিগারেটের বদলে সস্তাতেই আমাদের কাজটা সারতে হত। তাই আমরা বুনো আগাছার শুকনো আগাগুলো মুখে দিয়ে নীল ধোঁয়ার স্বপ্ন দেখ্‌তাম। কিন্তু তা'তেও সুগন্ধের অভাবটা বড় লাগত; আমি এক শুভদিনে এক পয়সা দিয়ে একটা তামাক খাবার নল কিনে আন্‌লাম। বুনো আ[গাছা] সেইদিন থেকেই বিদায়। এক পয়সার নলে পিপুল[পাতা] পাতা ভরে আমি তার অভাব পূরণ করলাম। বি[...] এই নূতনত্বের আনন্দেই কেটে গেল; তারপর আর [...] গন্ধওয়ালা নকল সিগারেটে মন উঠত না। এবার [...] মাত্রাটা কিছু উঁচু দরের; সখ হ'ল সত্যিকারের নলে সত্যিকারের তামাক খাব। তামাক খাওয়ার তোড়[জোড়] সরঞ্জামগুলি এমন সুন্দর এমন সূক্ষ্মশিল্পের নিদর্শন হবে, যে খাবে তার মান বেড়ে যাবে—আমাদের পাড়ার বিখ[্যাত] তামাকখোরদের মুখে যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনি।

এঁদের মধ্যেই একজন বিশেষ করে আমার মন [হরণ] করেছিলেন। লোভটা তাঁকে দেখেই আমার বেশী-র[কম] জেগে উঠত। তার ছিটের কাপড়ের ব্যবসা ছিল; [নাম] বিজেয়ার; রাস্তার উপর তাদের আর আমাদের বাড়ী [ছিল] মুখোমুখি। রোজ ডাকের সময় দেখতাম, বিজেয়ার গো[ল] গাল শরীরটি নিয়ে হাসিমুখে এসে দরজায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ি[য়ে] দাঁড়িয়ে চিঠি বিলি দেখ্‌ছে। মুখে তার একটা তামাকে[র] নল, মাঝে মাঝে লম্বা টান দিয়ে এক রাশ ঘন ধোঁয়া ছে[ড়ে] দিচ্ছে। রোদ যখন পড়-পড়, তখন দিনমজুর কারিগ[র] সকলের ফেরবার পালা; তাদের আনাগোনায় রাস্তা[টা] যেন সজীব হয়ে উঠ্‌ত। তখনও তাকে সেই জায়গাটিতে[ই] দেখা যেত। ধূম্রলোকের মধ্যে পড়ে দুপুরের খাওয়া[টা] হজম করছে। আমার চোখে তার সেই নলটার রূপে[র] দোসর ছিল না, বুনো চেরী কাঠের ডাঁট, সুন্দর চীনে-মাটি[র] খোলটি, তা' আবার রূপো দিয়ে বাঁধানো। সেদিকে চে[য়ে] চেয়ে আমার আর চোখের পলক পড়ত না। রাত্রে স্বপ্নেও তারি রূপ দেখতাম।

বাবা বল্‌তেন, "উঃ, বিজেয়ার লোকটা কি কুড়ে। মুখে নলটা লেগেই আছে।......তামাক টান্‌তে ওর যত সময় যায়, ব্যবসাবাণিজ্যে ও তার ঢের কম সময় দেয়।"

আমার বাবা ছিলেন শুক্‌নো রোগা মানুষটি; খুব চট্‌পটে; বিজেয়ারের ঠিক উল্টো। সারাদিন ওষুধের দোকানে খেটে খেটে হয়রান হতেন। বাড়ীতে এক বুড়ী আইবুড়ো বোন ছিলেন, আর ছিলেন আমার বুড়ো ঠাকুরদাদা; তাঁদের নিয়ে বেচারার জীবনটা ভার হয়ে' উঠেছিল। ঠাকুরদাদা

পেশোয়া এখন আর কাজকর্ম্ম করেন না, অবসর-কালটা বাড়ীর পেছনের বাগানটা নিয়েই কাটিয়ে দেন। পিসী অনরিন্ আর ঠাকুরদাদা আদর দিয়ে দিয়ে আমার মাথাটি খেয়েছিলেন; বাবার কাছে কিন্তু একচুল এদিক-ওদিক হবার জো ছিল না। ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে তাঁর মত ছিল ঠিক স্পার্টানদের মত; এতটুকু দোষত্রুটি হ'লেই খুব বিষম-রকম তাড়ার ব্যবস্থা হ'ত। কুড়ে লোক তাঁর দুচক্ষের বিষ। বিজেয়ারের সেই চিরন্তন নল আর অফুরন্ত কুড়েমি দেখে ত তাঁর হাড় সুদ্ধ জলে উঠ্‌ত। আমাদের দোকানের কাচের শিশিগুলির ভিতর দিয়ে যখন দেখ্‌তেন যে প্রতিবেশীটি রোদে মুখখানা দিয়ে তামাকের ধোঁয়ার মেঘের আড়ালে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে, তখন তিনি প্রায়ই ঘাড় নেড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌তেন, "এর ফল ভাল হবে না।"

সত্যি-সত্যিই ফল ভাল হ'ল না। একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্‌তেই দেখি, সাম্‌নের দোকানের বন্ধ জানালার গায়ে একখানা বড় হল্‌দে কাগজ মারা।

বিজেয়ার দেউলে হয়েছে; হল্‌দে কাগজখানা হতভাগ্য কাপড়ওয়ালার গুদামের সব মাল আর বাড়ীর সব আস্‌বাব-পত্রের নীলাম ঘোষণা করছে।

বাবা যেন একটু সন্তুষ্ট হয়েই বল্লেন, "আমি ত আগেই বলেছিলাম। এই দেখ, তামাক আর কফি আর হরেক রকমের সব কুড়েমির ফল কি হয়। ক্লোদ, এ দেখে শেখো! বিজেয়ার ত গেল, একেবারে শেষ,—অতলে চলে গেল—সে আর রইল কি? একটা দেউলে।" দেউলে কথাটা বাবা এমন ভাবেই উচ্চারণ করলেন যে তাঁর মত খাঁটি মানুষ আর সৎব্যবসায়ীর কাছে যে এটা কতখানি অপমানের কথা তা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল।

আর আমি? সত্যি কথা স্বীকার করলে বলা উচিত, এই ব্যাপারের মধ্যে ওই সুন্দর নলটির ভাগ্যের ভাবনাই আমায় সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলেছিল। সেটাও কি নীলামে চড়বে না দেউলের সান্ত্বনারূপে তারি আশ্রয়ে থাক্‌তে পাবে? তার ভাগ্য নির্ণয় করবার জন্যে আমি ছটফটিয়ে মরছিলাম; নীলামে একবারটি হাজির হ'বার সুবিধা যদি আমায় করে দিত, তা হ'লে বোধ হয় আমি সব দুঃখ মাথায় পেতে নিতাম। দুঃখের বিষয়, পাঠশালার সময়েই নীলামের সময় আর বাবার কাছে কোনো-রকম বাজে কথা খাটে না। কাজেই সোনা-হেন মুখ করে ভালয় ভালয় পড়তেই গেলাম। সেখানে সারাদিন বসে বসে ভাবলাম, সেই চীনে-মাটির খোলওয়ালা নলটির কথা আর তার ভাগ্যবান নূতন অধিকারীটির কথা। অমনোযোগের ফলে সেদিন আমাদের কড়া মেজাজের মাষ্টার দরদেলিয় আমাকে দু'শ লাইন ভার্জিলের কবিতা নকল করতে দিলেন। প্রথম কাব্যের যখন এই লাইনটা লিখ্‌ছি,

"দূরে গোলাবাড়ীর চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া উঠ্‌ছে"

তখন আমি কল্পনায় বিজেয়ারের নলের ধোঁয়া আকাশে উঠ্‌তে দেখ্‌ছিলাম।

আট দিন ধরে' ওই চিন্তাই নেশার মত আমায় ঘিরে রইল। তারপর যখন কমে আস্‌ছে, তখন একদিন সকাল-বেলা পাঠশালা থেকে ফিরবার পথে মিরুফ্লের পুরানো পোষাকের দোকানের বড় কাচের জানলার উপর হঠাৎ চোখ পড়ল। হরেক রকমের জিনিষের এই দোকানটি ধুলোয় ভরা; এলোমেলোভাবে এদিকে ওদিকে কত কি জিনিষ পড়ে আছে—ভাঙা পুরোনো আরাম-কুর্সি, রঙ-বেরঙের পুরোনো পোষাক, ফুলকাটা চীনে-মাটির বাসন, খড়ভরা মরা পাখী, পুরোনো পিস্তল, আরো কত কি; দেখতে আমার বেশ লাগত; আমি একটু খুসী হয়েই সেখানে দাঁড়াতাম। এবার সার্সীর উপর চোখ পড়তে না পড়তেই আমি একেবারে চম্‌কে উঠেছি।

সার্সীর আড়ালে একটা সেকেলে ধরণের বড় ঘড়ীর মুখ আর একটা সুপের খোরার মাঝখানে গোলাপীরঙের তুলোর গায়ে সযত্নে ঠেসান রয়েছে—বিজেয়ারের সেই মনমোহন তামাকের পাইপটি।

সেটা কি আর আমি ভুল করতে পারি!—এ সেই! ......অমন নক্সাকাটা কাজ, চেরী গাছের ডাঁট, চীনে-মাটির খোল, নিপুণ হাতের সোনালি রং আর তার উপর সেই রূপোর ঢাকনা, দেখেই আমি তাকে চিনেছি। এও দেখছি তাহ'লে নীলামে চড়েছিল—আর হতভাগা মিরুফ্‌ল্ কিনা সেইটি কিনে বসেছে।

আর কি আমি থাক্‌তে পারি? গট্‌গট্ করে' দোকানে

গিয়ে ঢুকে পড়লাম। উলের গেঞ্জি গায়ে, খরগোশের চামড়ার টুপি মাথায় দিয়ে, মিরুফল্ যেখানে বসে মর্চেপড়া একটা চিম্‌টে পরিষ্কার করছিল, একেবারে সেইখানে গিয়ে হাজির!

মুখখানা লাল করে' আমি একটু লজ্জিতভাবে বললাম, "দোকানের সামনে ওই যে তামাকের পাইপটা রয়েছে ওর দাম কত?"

মিরুফল্ মাথাটা তুলে সন্দিগ্ধভাবে ধূসর চোখ দুটো তুলে কট্‌মটিয়ে আমার দিকে তাকালে। নাক সিঁটকে বল্‌লে,

"ওহে ছোক্‌রা, তোমার জন্যে ওসব জিনিষ নয়। ওর দাম ঢের, তোমার আর কিন্‌তে হয় না।"

আমি বিরক্ত হয়ে জেদ সুরু করলাম, "আচ্ছা, অত কথায় কাজ কি? আমি যদি দাম দিতে পারি, তাহ'লে কতয় দেবে?"

পাইপটা নামাবার জন্য এগিয়ে গিয়ে দোকানদার উত্তর দিল, "বারো ফ্রাঙ্ক; এক পয়সাও কমে কিন্তু ছাড়ব না।" যেন কত মহামূল্য ধন এমনিভাবে সে পাইপটা তুল্‌ছিল।

"একবার চেয়ে দেখ! খাঁটি চীনেমাটির তৈরি, তা' আবার রূপো দিয়ে বাঁধানো; এর জুড়ি মিল্‌বে না...... আর এতে করে তামাক খেতে যা আরাম! মধু'র মত মিষ্টি লাগবে।"

কথা শুনে আমার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠ্‌ল; বুকের ভিতর টিপ্‌টিপ্ করতে লাগ্‌ল!......কিন্তু বারো ফ্রাঙ্ক! বারো 'সু'ও যে আমার নেই।

আম্‌তা আম্‌তা কোরে বল্‌লাম, "সত্যি বল্‌ছি আমি আবার আসব......"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি; রাঙা শুক্রবারে আসবে, না?" ঠাট্টা করতে করতে মিরুফল্ তামাকের নলটা নিয়ে তুলোর বিছানায় রাখ্‌তে গেল।

"ছোঁড়াটার আস্পর্দ্ধা দেখ! এরি মধ্যে তামাক খাবার ভাবনা। জন্মাতে-না-জন্মাতে পাকামি; কপাল আমার!"

(২)

লোভটা আরোই বেড়ে উঠতে লাগল। এখন আর শুধু নিষ্ফল স্বপ্ন দেখা নয়। পাইপটা ত পুরোনো মালের দোকানে হাতের কাছেই মজুত রয়েছে। মিরুফ্লের বারোটি ফ্রাঙ্ক দিতে পারলেই আমার হাতে এসে প... কিন্তু অত টাকা একসঙ্গে পাওয়া যায় কোথায়?—ত সপ্তাহে কটি করে পয়সা মোটে হাতখরচ ... হাজার বাঁচিয়ে খরচ করলেও বারো ফ্রাঙ্ক জমাতে কত লেগে যাবে তার ঠিক নেই। ইতিমধ্যে ভারী পকেট ... কোথাকার কে এসে আমার সাধের জিনিষটি হরণ ... নিয়ে যাবে। আঃ ওই সোনালি নলটি মুখে দিয়ে আরাম! নলটিকে পকেটে করে নিয়ে যত্নে তুলে সঙ্গীদের দেখাতে কি সুখ! তারা হিংসেয় মরেই যা... কি গর্ব্ব! কি আনন্দ! ক্লাশের সমস্ত ছেলের চে... আমার তখন কত উচ্চ স্থান! সবি ঠিক বটে......কি... বারো ফ্রাঙ্ক!

বাড়ী ফেরবার পথে কত সম্ভব অসম্ভব কল্পনাই করলাম; দোকানের পেছনের ঘরে বসে অতিকষ্টে ল্যা... অনুবাদ করতে করতেও উল্টে-পাল্টে সব-কিছু ভে... নিলাম। এই সময় ঠাকুরদাদা আরাম-কুর্সিটা ছে... উঠ্‌লেন। খবরের কাগজ পড়া শেষ হয়ে গেছে, এব... বাগানের কাজের পালা। ক্ষুধাটা ভাল-রকম হবে ব... রোজই তিনি দু'এক ঘণ্টা এ কাজ করতেন। চশমা-জো... খুলে রাখ্‌লেন, কোটটা খুলে শুধু শার্ট পরলেন; বাইরে জুন মাসের প্রখর রোদে মাটি কোপাতে সুবিধা হবে।—জামাগুলো ছেড়ে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রাখ্‌লেন তিনি চলে যাবার পর অভিধানখানা আন্‌তে গিয়ে হঠা... আমি ঠাকুরদাদার চেয়ারে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। ঠোকর লেগে ওয়েষ্ট-কোটটা মেজেয় এসে পড়তেই ঝন্‌ঝন্ করে পকেটের মধ্যে রূপোর শব্দ শোনা গেল। বুঝলাম, একটা পকেটে টাকা আছে।

চম্‌কে উঠে জামাটা তুলে নিলাম। কেমন একটা কৌতূহল হল; পকেটগুলো হাতড়াতে লাগ্‌লাম। দেখি কি—না, একটা পকেটে দুটো পাঁচফ্রাঙ্ক, আর খুচরো কয়েকটা রেজ্‌কি। সবসুদ্ধ তের ফ্রাঙ্ক। বিজেয়ারের পাইপটা কিন্‌তে ঠিক যত লাগ্‌বে, তার চেয়ে একটু বেশী। আমার ভাবনাচিন্তার সুর ত একেবারেই ফিরে গেল। নিজের হাতের মুঠোর ভিতর টাকাগুলো নিয়ে আর চক্‌চকে

রূপোর মুখ দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ। মাথার মধ্যে আস্তে আস্তে কেমন একটা সয়তানী বুদ্ধি ঢুকতে লাগ্‌ল। টাকা ক'টা যদি নিয়ে নি? হ্যাঁ, নেওয়া চলে বটে; কিন্তু পরে যে সব ধরা পড়ে যাবে। দুষ্টুবুদ্ধি যখন মাথায় আসে তখন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়েই আসে। আরো খারাপ এক বুদ্ধি ঠাওরালাম। ঠাকুরদাদাকে যদি বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারি যে টাকা ক'টা হারিয়ে গেছে!—তা' হ'লেই ত ঠিক হয়!—ধর যদি জামার পকেটের তলার সেলাই-গুলো কোনোখানে খুলে গিয়ে থাকে, তা হ'লে ত ফুটো দিয়ে টাকা পয়সা বেশ স্বচ্ছন্দে গলে যেতে পারে? কেউ টেরও পায় না। সম্ভাবনাটা মনে হবামাত্র, ভাগ্যদেবীর কাজটাও নিজেই সেরে ফেলবার ইচ্ছা হ'ল। ছুরিখানা খুল্‌লাম। জামার কাপড়টা বেশ পুরোনোই হয়ে এসেছে। ছুরির ফলার গোটা দুই খোঁচা পড়তেই সেলাই গেল কেটে, পকেটও গেল ফুটো হয়ে। এইবার সয়তানীর চূড়ান্ত! ফুটোর ভিতর দিয়ে টাকা-পয়সাগুলো গলে কিনা দেখতে ত হবে! তবে ত এদের অকস্মাৎ অদর্শনের কারণটা ঠিক বোলে লোকের বিশ্বাস হবে!—আস্তে আস্তে সেগুলো ফুটোর ভিতর দিয়ে গলিয়ে দেখ্‌লাম।

মন কিন্তু কিছুতেই শান্ত হ'ল না; কখন্ ঠাকুরদাদা এসে জামার শূন্য পকেট দেখ্‌বেন তারি জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে হাঁ করে বসে রইলাম। বারোটার সময় ভদ্রলোক ফিরে এলেন পোষাক পরতে; ক্ষিধের জ্বালায় তখন তাঁর পেট চোঁ চোঁ করছে। ওয়েষ্ট-কোটে বোতাম লাগাতে লাগাতে তাঁর নিশ্চয় জামাটা হাল্কা-হাল্কা ঠেক্‌ল, তাই তাড়াতাড়ি পকেটে আঙুল চালিয়ে দেখ্‌লেন। আমি ত তখন ভয়ে কাঁপছি। তবু তারি মধ্যে একবার আড় চোখে দেখে নিলাম,—ঠাকুরদাদা বেজায় অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, আঙুলগুলো কিনা পকেটের ভিতর দিয়ে সোজা ফুটোয় ঢুকে বাইরে বেরিয়ে এল।

তিনি বল্‌লেন, "হা ভগবান!" তারপর পিসীমাকে টেবিল সাজাতে আস্‌তে দেখে বলে উঠলেন, "দেখদিখি একবার এদিকে! এমনি করেই তুমি আমার কাজ কর বটে। ওয়েষ্ট-কোটটার সেলাই কেটে গিয়েছে, আর আমার টাকা ক'টা গেল হারিয়ে......বই মুখে করে' না ঘুমিয়ে আমার জামা-কাপড়গুলো মেরামত করে' দিলে ঢের কাজ দেখে।"

বেচারী অনরিন পিসী কি বিষম তাড়াটাই খেলেন! ঠাকুরদাদা রাগের সমস্ত ঝালটাই তাঁর উপর দিয়ে মিটিয়ে নিলেন। যাক্ তাতে আমার মনের ঝড় কিন্তু থাম্‌ল না। মনের মধ্যে কেবলি যেন কিসে খোঁচা দিচ্ছিল; পিসীকে আমি বড্ড ভাল বাসতাম কিনা।.....কিন্তু বিজেশ্বরের অপূর্ব্ব পাইপ যে দূর থেকেই আমায় টানছিল; ঠিক যেন চুম্বকের টান। তাকে পাবার প্রবল আগ্রহই ক্রমে আমার মনটাকে শক্ত করে তুল্‌লে।—

চারটার সময় পাঠশালার ছুটি হবার পরেই, সেটা আমার সম্পত্তি হয়ে গেল, ঠাকুরদাদার টাকাগুলো তখন মিরুস্কের বাঁকা আঙুলের মুঠোর মধ্যে বেজে উঠ্‌ল।—আনন্দে তখন আমি দিশাহারা! উন্মত্ত আনন্দের স্রোতে বিবেকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কোথায় ভেসে গেল। তামাক আর দেশলাই জোগাড় করে নিয়ে চল্লাম এক মেঠো রাস্তা দিয়ে। বুনো জংলী ঘাসে ছাওয়া মাঠ একেবারে আঙুরক্ষেত আর জিরের বন পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। চল্‌তে চল্‌তে পকেটের ভিতরের পাইপটার উপর দিয়ে হাতটা একটু বুলিয়ে নেবার জন্য মাঝে মাঝে থামছিলাম। পালিশ-করা মসৃণ চীনা-মাটির গায়ের উপর দিয়ে আঙুলগুলি চালিয়ে আমার তখন কি ফূর্ত্তি। এযে এখন আমার; এতদিন পরে আজ যে আমি সত্যি-সত্যি ধোঁয়া উড়িয়ে তামাক খাব!

পোড়ো মাঠের উঁচু ডাঙাটার উপরে এসে বনের ধারে বসে পড়লাম; তারপর ধীরে ধীরে পাইপে তামাক সাজতে লাগলাম। গাছের ছায়ায় নরম শেওলার উপর আরামে শুয়ে পড়েছিলাম; আমার চোখের সাম্‌নে দিয়ে আঙুরের ক্ষেত বরাবর নেমে গিয়ে একেবারে উপত্যকার তলা অবধি চলে গিয়েছে। রোদে সেখানটা ভরা; রোদের আভায় ছোট একটি নদী পপ্‌লার গাছের ভিতর দিয়ে ঝিক্ ঝিক্ করে বয়ে চলেছে। মাথার উপরে আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুক্‌রোয় কে যেন ছিট বুনে রেখেছে। লার্ক পাখী-গুলির গানের আর বিরাম নেই। আমি তখন সুখে আনন্দে ভরপুর, অনুতাপের লেশও আর ছিল না।

পাইপের বাতিটা ভরে উঠতেই, মহা আড়ম্বর করে

গম্ভীরভাবে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। তারপর সমস্ত মন দিয়ে সেই যে প্রথম কটা টান!—কি চমৎকার তামাক! মহাগর্ব্বে গাছের মাথার দিকে কি সুন্দর শাদা ধোঁয়ার রাশি উড়িয়ে দিচ্ছিলাম! মিরুফ্‌ল্ বলবে না ত' কি?—সত্যি এ যে একেবারে মধু!......

মিনিট পনের পরে কিন্তু একটু একটু করে অমন উৎসাহও কমে আসতে লাগ্‌ল। মাথাটা যে কেমন ভার-ভার হয়ে আসছে। কেমন যেন অদ্ভুত-রকম একটা ছটফটানি লাগতে লাগল। গা বমি-বমি সুরু হল। নলটা শেওলার উপর রেখে দিলাম; ভাবলাম একটু পরে বুঝি ও-সব কেটে যাবে। হায়রে হায়, কিছুই কাটে না যে। মাথা ঘুরতে আরম্ভ হল; চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এল; বমি ঠেলে একেবারে ঠোঁটের আগায় এসে উঠ্‌ল; পেটটাও ফেঁপে উঠ্‌ল। যেটুকু শক্তি ছিল তারি সাহায্যে কোন-প্রকারে গিয়ে গড়ানের দিকে হেঁট হয়ে বসলাম;...... অসুখটা যা হয়েছিল সে আর কি বলব! বমি করতে করতে ট্রামের চোটে পেটের নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ উল্টে আসবার জোগাড়। এইবার আমার শাস্তির পালা আরম্ভ।

প্রথম ধাক্কার চোটটা কেটে গেলে, ক্ষীণহাতে পাইপটা পকেটে তুলে, টলতে টলতে বাড়ী-পানে চললাম। আমার স্ফুর্ত্তি তখন কোথায়! দেখলাম বিজেয়ারের পাইপের মধুও যেন হঠাৎ আশ্চর্য্য-রকম তেতো হয়ে উঠেছে। মুখখানা কালো শুক্‌নো করে দোকানের পেছনে গিয়ে ঢুকতেই দেখি,—হা কপাল, বাড়ীসুদ্ধ সবাই সেখানে হাজির। ঠাকুরদাদা পড়ছেন, বাবা একটা ওষুধ শোধন করছেন, আর অনরিন পিসী সেই সুবিখ্যাত ওয়েষ্ট-কোটটি মেরামত করতে ব্যস্ত।

আমায় দেখেই পিসীমা বলে উঠ্‌লেন, "ওমা গো, মুখ-খানা যে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! তোর অসুখ করেছে নাকি রে?"

"না, না, পিসীমা......"

বাবা আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বল্লেন, "এদিকে আয় দেখি একবার!—উঃ, তোর গায়ে যে তামাকের গন্ধ!"

তারপর হঠাৎ এসে হাতখানা চেপে ধরে বলে উঠ্‌লেন, "পাজি কোথাকার, তামাক খাওয়া হচ্ছিল!"

তারপর আমায় ধরে এমন জোরে এক ঝাঁক দিলেন যে পাইপটা তিন টুক্‌রো হয়ে ছিট্‌কে পকেট থে বেরিয়ে এল। সেটা তুলে ধরতেই বাবা চিন্‌তে পারলে তারপর আমায় না ছেড়েই বলতে লাগ্‌লেন—

"এ ত দেখ্‌ছি বিজেয়ারের পাইপ......একটা দেউ পাইপ!"

রাগে বাবা চীৎকার করে উঠ্‌লেন, "হতভাগা, ে আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! এতে করে তামাক খেয়েছিস্ তু কোথায় পেলি এটা? টাকা কোথায় পেলি?......শীগ্ উত্তর দে বলছি—লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।"

ফুলগাছ যেমন করে' নাড়া দেয় বাবা আমায় তে করে ঝাঁকরানি দিচ্ছিলেন। ধড়ে আমার তখন কত প্রাণ বাকি ছিল কে জানে? আর এক বিপদও ঘনি আসছিল। চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছিলাম, এই আম সয়তানী বিদ্যে ধরা পড়ল বলে; তার ফলে যা শা হবে, উঃ তার ভীষণ মূর্ত্তি যেন চোখের উপর জ্বল পিসীর আর ঠাকুরদাদার দিকে করুণ কাতরদৃষ্টি তাকাতে লাগলাম। তাঁরা নিজেরাই যেন তখন মুষ পড়েছেন।

হঠাৎ ঠাকুরদাদা বলে উঠ্‌লেন, "পেশোয়্যাঁ থা থাম; ও টাকাটা......আমার কেমন একটি দুর্ব্বল ওকে না দিয়ে পারলাম না; আমিই এর জন্যে প্রধান দোষী।"

"বাবা বল্‌লেন, তোমার অন্যায় হয়েছে দেওয়া এরকম করে একটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলেকে আস্কারা দি তার যত বদ্‌মাইসীর সুবিধে বাড়িয়ে দেওয়া তোমার ভা অন্যায়। এর ফল ভয়ানক খারাপ হবে!"

তারপর বিজেয়ারের পাইপটা ছুড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন; সেটা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল।

"এই দেখ, দেউলের পাইপের এই পরিণাম! তোকে এই-রকম করে আছড়ে মারতে আমার বেশী কিছু লাগে না। যা, পাজি, হতভাগা, উপরে নিজের ঘরে যা। আজ না খেয়ে তোকে ঘুমতে হবে।"

আমায় আর দুবার বলতে হয়নি। এত সহজে পার পেয়ে আমি খুসী হয়ে ছাতের ঘরের পাশে নিজের

কুঠরীটিতে গিয়ে উঠ্‌লাম। মিনিট পনের পরে দেখি, কে অতি সন্তর্পণে দরজাটি খুল্‌ছে; তার পরেই ঠাকুরদাদা ঘরে ঢুকলেন।

তিনি গম্ভীরভাবে বলতে লাগ্‌লেন, "ক্লোদ, দেখ, আমার চোখে অত সহজে ধূলো দেওয়া যায় না। জামার সেলাইটা যে কেমন করে কেটেছে, আর টাকাটা যে কোথায় গিয়েছে তা আমি জানি। কিন্তু তোর জন্যে আমার প্রাণটা কেমন করে উঠ্‌ল, তোর বাবা যে মানুষ! খুন করেও ফেল্‌তে পারত।……এ ব্যাপার কেবল, তোর পিসী, তুই, আর আমি এই তিনজনের মধ্যেই শেষ হবে।—কিন্তু বাছা, তুই বড় নীচ কাজ করেছিস্‌। আর কোনো দিন যদি এমন কাজ করবার প্রলোভন হয়, মনে রাখিস্‌ শুধু তোকে বাঁচাবার জন্যেই আমি মিথ্যা কথাও বলেছি। আমি আমার এই বুড়ো বয়সে শুধু তোরি জন্যে এ কাজ করেছি! তোর চুরীর আমিও আজ ভাগীদার হয়েছি।"

উঃ, কি আশ্চর্য্য মানুষ, কি মহৎ হৃদয়। আমি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কোলের উপর গিয়ে পড়লাম। সে কি কান্নার চোট! আমার কান্না আর চোখের-জলে ধোয়া চুম্বনের ঘটা দেখে তিনি বুঝলেন কথাটা আমার মনে ঠিক বিঁধেছে আর আমি কোনো কালে এমন কাজ করব না।

শ্রীশান্তা দেবী।

বিদ্রোহীর শাস্তি

(গল্প)

পিসীমার ঘরের দরজার গোড়ায় অনিলের কেবলি দেরী হতে লাগল। পিসীমার মেয়ে রেণুর সঙ্গে খুব ছেলেবেলায় তার জানাশোনা, ঢাকায় পাশাপাশি বাড়ীতে তারা থাক্‌ত, কিন্তু তারপর বছর পাঁচেক তারা পরস্পরের কোনো খোঁজ খবর পায়নি। রেণু আজ আর 'রেণু' নেই, সে বড় হয়েছে, একরাশ খোলা চুলের ওপর এখন আর সে চওড়া লাল ফিতা পরে না, সেগুলোকে বেণী করে পিঠে দুলিয়ে রাখে। তার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করা শোভন হবে, এই নিয়ে লাজুক অনিল যে ভাবনায় পড়বে সে আর আশ্চর্য্য কি?

ছোট্ট সহরটির একটি নিভৃত প্রান্তে রেণুদের রম্য বাড়ীখানি আশেপাশেকার সমস্ত অশোভনতার মধ্যে থেকে সন্ধ্যাতারাটির মতো ফুটে উঠেছিল। ঠিক সামনেটাতে সবুজ তৃণে-ছাওয়া খানিকটা জায়গা; বিকেল বেলা সমস্ত বাড়ীটার ছায়া এসে সেখানে পড়ে। দুদিকে দুসারি সুপুরি গাছ, তার মাঝে-মাঝে ক্রোটনের চারা, সমস্তই সুন্দর সুশৃঙ্খল, কেবল এক কোণে একটা প্রকাণ্ড লিচু-গাছ সমস্ত ধারাবাহিকতাকে অগ্রাহ্য করে মস্ত একটা বিদ্রোহেরই মতো দোতলার ছাদ অবধি মাথা তোলা দিয়ে উঠেছে। রেণু তাদের হিন্দুস্থানী চাকর ছোকরাটাকে কিছু লিচুর জন্যে গাছে উঠিয়ে দিয়ে দোতলার জানালা থেকে ঝুঁকে পড়ে তাকে ফরমাইস করছিল। হঠাৎ পেছন ফিরে দরজার গোড়ায় অনিলকে দেখে ততখানি দূর থেকেই চেঁচিয়ে বল্‌লে "এসো অনিল দা।"

অনিল এসে ঘরে ঢুকতেই সে এগিয়ে গিয়ে তাকে নমস্কার করে বল্‌লে "আজো একটিবার বেরিয়ে জায়গাটা দেখে উঠতে পারিনি। এখানে পৌঁছেই খবর পেলুম, তুমি এখানে রয়েছ; কিন্তু তোমাকে খবর দিয়েও ভয় হলো তুমি বুঝি আসবে না। মা বল্‌লেন তিনি তোমার সত্যিকার পিসীমা নন্‌ বলে তুমি আমাদের পর মনে কর, কিন্তু তোমার বাবা নাকি কখনো তাঁকে পর ভাবতেন না। এই পাতানো সম্বন্ধটা সত্য হয়ে উঠেছিল বলেই, তাঁদের মধ্যে স্নেহের বন্ধনটা এমন বড় হয়ে উঠেছিল।"

অনিল আমতা আমতা করে বললে "সময় পাইনে, বড় কাজের তাড়া, বেজায় খাটতে হচ্ছে।"

রেণু খুব সন্দেহ দেখিয়ে বললে "এখানে ছুটিতে এসে বেড়াতে, রয়েছ বন্ধুর বাড়ী………"

অনিল তাড়াতাড়ি বললে "নিভৃতে কাজ করার সুবিধা হবে বলেই এখানে আসা, বেড়াতে ঠিক নয়। এগ্‌জামিনেশ্যনের জন্যে তৈরি হয়ে উঠতে পারছি না, আর দুটি মাস মোটে সময়!"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রেণু বললে "তা হোক্‌, আজকে সন্ধ্যার আগে তুমি ছুটি পাবে না, এইটুকু খাতির আমায় করতেই হবে, কোনো ওজর আমি শুনব না।"

হঠাৎ ছুটে গিয়ে দুমদাম্‌ করে ডেস্কের উপরকার বই-

গুলোকে উল্টে পাল্টে একটা কাগজের তাড়া এনে অনিলের হাতে গুঁজে দিয়ে সে বললে "তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। এই আবৃত্তিটা আমি কতক তৈরি করেছি; কাউকে শোনানো হয়নি। তুমি আমায় বলবে কোন্‌খানটায় ঠিক হচ্চে না। নিজের দোষটা নিজে ঠিক-ঠিক ধরা যায় না কিনা।"

আজ তাঁদের চড়িভাতি। লিচু, আবৃত্তি, এসব তারি আয়োজন। অনিলকে কোনো কথা কইবার অবকাশ না দিয়েই সে গড়গড় কোরে আবৃত্তি কোরে যেতে লাগল! পিসীমা বাড়ী ছিলেন না, তিনি যখন এসে পৌছোলেন তখন সে শ্রান্ত হয়ে একটা সোফায় শুয়ে পড়েছে এবং অনিল তার পাশে দাঁড়িয়ে কোনো কথা খুঁজে পাচ্চে না।

পিসীমা বললেন "বেশ করেছ অনিল, কোনো খবর দিয়ে যে আসনি ওতেই আমি খুব খুসী হয়েছি। তুমি সব সময় এমনি নিজে থেকেই এসো, আমরা ডাকব তবে আসবে বলে বসে থেকো না।"

রেণু অনিলের কানে-কানে বললে "আমি যে তোমায় ডেকেছি, মা তার কিছুই জানেন না। এতে তোমার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই; তিনি কিছু মনে করেননি।"

সেখানকার এক জমিদারের বাগান-বাড়ীতে পিক্‌নিকের আয়োজন হয়েছিল। রেণুরা সেখানে গিয়ে যখন পৌছাল, তখন দুপুর উৎরে গেছে। অভ্যাগতদের মধ্যে প্রায় সকলেই মহিলা; পুরুষ কেবল দুচারজন, মেয়েদের সঙ্গে খুব বেশী আন্তরিকতা যাদের। এদের মাঝখানে পড়ে অনাহূত অনিল, তার অনধিকারের লজ্জা নিয়ে অস্বাভাবিক বিব্রত হয়ে উঠতে লাগল। সে যেন অপরাধী। সবাই যেন তাকে অনাবশ্যক কুগ্রহ বলে মনে করছে, রেণুও যে তার এই অসহায় অবস্থাটা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছে, এই ভেবেই সে মনে মনে আরো বেশী ক্লিষ্ট হতে লাগ্‌ল। কিন্তু তার সবচেয়ে মুস্কিল হলো এই —সে যতই লুকিয়ে বেড়াতে যায়, রেণু ততই জোরের সঙ্গে তাকে লোকের চোখে বেশী করে ধরিয়ে দেয়। সমস্তটা সন্ধ্যা পাকে পাকে এসে সে তাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। বাগানের মধ্যে বোটিংএর জন্যে খালের মতো কোরে খানিকটা জায়গা তৈরি করা ছিল। অনিলের সমস্ত আপত্তিকে তুচ্ছ কোরে সে শেষটা তাকে দিয়ে সেখানে ঘণ্টাখানেক দাঁড় টা[নিয়ে] তবে ছাড়লে। যখন অন্ধকার হতে একটু বাকী, অনি[ল] দুখানি হাতের সাহায্য নিয়ে নৌকো থেকে নামতে না[...] সে বললে "তুমি পুরুষ, তোমার কেন এত লজ্জা- লজ্জাকে ভেঙে না দিয়ে আমি ছাড়ব না।"

দলের মাঝবয়সী মহিলাদের মধ্যে এদের প্রসঙ্গ [নিয়ে] খুব কানাকানি ফিসফিসের সাড়া পড়ে গেল। রেণু দেখে একেবারে মরীয়া হয়ে বসল। সবার সামনে টান করে একেবারে অনিলের গায় গায় ঘেঁষে সে বেড়াতে লাগল। সে বেচারি দুচারবার ত্রস্ত হয়ে সট্[কে] যাওয়ার উপক্রম করতেই তার ওপর অত্যাচারের ম[াত্রা] দ্বিগুণিত হয়ে উঠল। অগত্যা সে ব্যাপারটা জন্মান্ত[রের] কর্ম্মফলের মতো মাথা পেতে গ্রহণ করলে।

রেণুকে তাদের বাড়ীর গেটের কাছে নামিয়ে দিতে[ই] সে বললে "কালকে বিকেলে একবার এসো অনিল-দা!"

অনিল নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে "যদি সময় পাই।"

রেণু বললে "যদি সময় পাই কেন? বিকেল বে[লা] বেড়াতে ত বেরোও? না হয় আমার খাতিরে রাত্তি[রে] একটি ঘণ্টা বেশীই জাগবে।"

অনিল চুপ করে রইল দেখে হাসির লহর তুলে, তা[র] তার এই জয়টাকে সে কিছুক্ষণ ধরে উপভোগ করলে হঠাৎ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনিল বললে "সত্যি বল[ছি] পিসীমাকে না জানিয়ে যদি তুমি আমায় ডাকো, তাহ[লে] আর আসতে পারব কি না জানিনে।"

পিসীমাকে না জানিয়ে তাকে ডাকার কথা বলার সম[য়] অনিলের মনে কোনো অর্থই হয়তো ছিল না, কিন্তু তা[র] এই কথা কয়টিতে রেণুর আজ্‌কের এই ভুলটুকুর প্রতি যে নির্ম্মম ইঙ্গিত প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখনি সেটা বুঝ্‌তে পেরে সে লজ্জায় অনুতাপে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

২

অনিল ছেলেটির উপর অনেকদিন থেকেই পিসীমা[র] একটু রোখ ছিল। যখন তার উপর তিনি একটু প্রসন্ন হতেন তখন অনিল না বলে তাকে বলতেন অণু। এতে কোরে অণু এবং রেণুর অর্থগত যে একটা মিল আছে সেট[া]

তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে তাঁকে আরাম দিত। অনিলের সেদিনকার বিব্রত ভাবটা ভালো করেই তাঁর চোখে বিঁধেছিল। তিনি নিজে ছিলেন গরীবের মেয়ে, এবং শিশুকাল থেকেই মা হারা, তাই কেমন হলে লোকের মনে আঘাত লাগে এটা চমৎকার বুঝতেন। কিন্তু অনিলের মনে যতই লাগুক, তাঁর মেয়ে যে ব্যাপারটাকে একেবারেই আমল দেবে না একথাটাও তিনি জানতেন, এবং এই মনে করে তিনি বেশ একটু ভীতও হয়ে পড়লেন। অনিলের এটা এগজামিনের বছর, আর দুটি মাস মোটে সময়; এ অবস্থায় রেণুর ওপর তার যদি একটু ঝোঁক পড়ে যায় সেটা কিছুতেই কল্যাণের হতে পারে না।

রেণুকে একেবারে অতটা কথা বলা চলে না। অনিলের সঙ্গে এতটা মাথামাথি করলে লোকে কানাঘুষো করবে, একথা বলতেই সে একটা চেয়ারকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে তখুনি অনিলকে চিঠি লিখতে বসে গেল। লিখলে :—

মাকে না জানিয়ে তোমাকে আর ডাকলে তুমি আসবে না বলেছ; তোমার এই অন্যায় লজ্জাটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্যে মাকে না জানিয়েই তোমাকে আবার আসতে ডাকাটা আমি কর্তব্য বলে মনে করছি।—আজ বিকেলেই এসো। তোমার লজ্জা করাটা কি ঠিক? তুমি যদি আমাদের এমন পর ভাবো, তা হলে আমরা সকলেই খুব দুঃখিত হব। তুমি নিশ্চয় এসো।"

চিঠিটিকে মুড়ে হাতের মুঠোতে করে নিয়ে অনিল তার পড়বার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। বইগুলোকে বালিশের মতো করে জড়ো করে তার ভিড়ের ভিতর ভারাক্রান্ত মাথাটাকে গুঁজে দিয়ে সে ভাবতে চেষ্টা করলে—এই দীপ্ত সুন্দর মেয়েটি কেন তাকে আজ এমন ভাবে আপন কোরে নিতে চাইছে, তার মুক্ত মনটাকে এমন ভাবে শৃঙ্খলিত করার জন্যে তার এ চেষ্টা কেন?

অনিলকে ঠিক-সময়টিতে উপস্থিত হতে দেখে পিসীমা একেবারে ভড়্‌কে গেলেন; অনিল যে পথে চলেছে, তার ভবিষ্যৎকে সে খোয়াবেই। দুটি মাসের জন্যে এতবড় একটা অনর্থ ঘটলে বড় ক্ষোভের কথাই হবে।

লাজুক অনিল! কারো একটুখানি অনুরোধকে অগ্রাহ্য করবার মতো মনের জোর তার ছিল না। নচেৎ তার ভবিষ্যৎকে পিসীমার চেয়ে সে কম ভালো বাসত না। একটা ওজর খাড়া কোরে একবার সে কলকাতায় ফিরে যেতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তার বন্ধু তাকে ছাড়বে কেন? কাজেই এই ভাবে দোটানার মধ্যে পড়ে তার দিনগুলো দোল খেয়ে খেয়ে চলতে লাগল। কোথায় বা এগজামিন, কোথায় বা কি! দুরদৃষ্ট যতটুকু সময় জুড়ে থাকে তার ভাবনা থাকে দ্বিগুণ সময় জুড়ে, কাজ আর এগোয় না!

একদিন তাকে একলা পেয়ে একটুখানি কেশে পিসীমা বললেন "তোমায় একটা কথা বলব মনে করেও, মুখ ফুটে বলতে পারিনি অণু। তোমার ত আর মোটে দুটি মাস সময়? এমন অবস্থায় পড়াশোনায় গাফিলি কোরে শেষটা কি আমাদের দোষের মধ্যে ফেলবে?"

সে বললে "হ্যাঁ, আমার কাজ মোটেই এগচ্ছে না; কিন্তু—"

তিনি তাকে বাধা দিয়ে বললেন "এর মধ্যে কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই বাবা। ছেলেদের পড়াশোনাই হচ্ছে সব, আর যা কিছু তা সব পরে।"

অনিল অধীর হয়ে বললে "আপনি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারেননি। এসব কথা আমাকে না বলে রেণুকে বললে হয়ত কতক সুবিধা হতে পারে।"

পিসীমা চোখদুটিকে বড় করে বললেন "এ কথাটা তাকে কী কোরে আমি বলি, সে তো হতে পারে না!"

অনিল তার এই মুক্তির সুযোগখানিকে শক্ত করে চেপে ধরে বললে "তা না হলে যে আর উপায় নেই!"

কিন্তু পিসীমা অনেক চেষ্টা কোরেও রেণুকে একথা বলতে পারলেন না। তাঁর এই দুরন্ত মেয়েটি এই নিয়ে যদি বিদ্রোহ করে তবে তার পরিণামটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা মনে কোরেই তিনি চকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনিও সহজ ছিলেন না। একদিন রেণুকে ডেকে কথায় কথায় বললেন "তুই কি নিজের মান-অপমানটাও বুঝিস-নে? তুই যার নাম করতে অজ্ঞান সে যে তোকে এড়াতে পারলে বাঁচে!"

রেণু চোখদুটি তুলে তাঁর মুখের দিকে চেয়েই ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেল। পিসীমা এরপর আর কিছু বলতে

সাহসী হলেন না, কিন্তু তিনি খুসী হলেন এই দেখে যে রেণুর উপর তাঁর এই কথা কয়টিই ওষুধের মতো কাজ করেছে। বিরোধ করা যাদের স্বভাব, নিজের জয়গর্ব্বই তাদের বিরোধের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, অবহেলা তারা সইতে পারে না। তাই অনিল তাকে তুচ্ছ করে, এই চিন্তাটা এক মুহূর্ত্তে রেণুর মনটাকে তার বিরুদ্ধে একান্ত বিষিয়ে তুল্‌লে।

এদিকে পিসীমার কথা কয়টি নিয়ে অনিলের মনেও কিছুদিন ধরে নাড়াচাড়া চলেছে, এরপরও রেণুর আহ্বানকে অমান্য না করা চল্‌বে কি না এই চিন্তাটা তাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে। কিন্তু দুতিনদিন যখন রেণুর কাছ থেকে কোনো খবরবার্ত্তা পাওয়া গেল না, তখন সে মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়েও একটা বিস্ময়ের আর অস্বস্তির ভাবকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারলে না। একটা দুর্দ্দম্য কৌতূহল আর একটা অবুঝ-বেদনার টান একদিন তাকে টেনে রেণুদের বাড়ীতে নিয়ে উপস্থিত করলে।

পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে রেণু সেলাই নিয়ে বসেছিল, অনিলকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটিকে প্রায় শুনিয়ে শুনিয়েই বললে "তুমি এখন যাও, লজ্জাকে তোমার গ্রাহ্য না থাকলেও পাড়ার মেয়েদের গ্রাহ্য থাকতে পারে, একথাটা তোমার বোঝা উচিত।"

পেছন থেকে আততায়ী ছোরার আঘাত করলে সেটা যেমন বাজে, রেণুর কাছ থেকে হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত অপমান অনিলের বুকেও ঠিক তেমনি ভাবে বাজল। তার মনখানি ছিল কুঁড়িটির মতো কোমল, একটুখানি নিঃশ্বাসের তাপে যা নিঃসাড় হয়ে নেতিয়ে পড়ে। দেয়ালটাকে আশ্রয় করে একটু স্থির হয়ে নিয়ে সে কলের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে বেরিয়ে চলে এল।

৩

এরপর কিছুদিন ধরে রেণুর ভিতর পিসীমা একটুখানি ভাবান্তর লক্ষ্য করে এসেছেন; কিন্তু তাকে তিনি দস্তুর-মতো ভয় করে চলতেন বলেই এসব কথা নিয়ে তাকে ঘাঁটাতে যাননি। এরই মধ্যে অনিলের চিঠি পেয়ে তিনি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। সে লিখেছে—"আমার এগজামিন খুব কাছে, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে ক[illegible] চলেছি। আপনার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া হলোনা আমার যে কত কষ্ট হচ্ছে—; কিন্তু সে অধিকারকে হাতে আমি ক্ষুণ্ণ করেছি বলেই আমার বিশ্বাস। কোনোদিন ভুলে কোনো অপরাধ করে থাকি [illegible] করবেন।"

রেণুকে চিঠিখানি দিতেই সে পিসীমাকে সেটা [illegible] দিতে-দিতে বললে "এ তোমার চিঠি, তুমি বোঝ। [illegible] এসকলের মধ্যে টানা কেন?"

পিসীমা একটু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললেন "আমি এর [illegible] বুঝিনে বাপু! তুমি বেশ জানো তুমিই আমায় হাঙ্গামার মধ্যে টান্‌ছ।"

মাথাটাকে জোরে ঝাঁকিয়ে রেণু বল্‌লে "তোমায় কোনো কিছুতে টানিনি, তুমি কেন ওরকম—" [illegible] কোনো কিছুতে গলার কাছেই কথাটা বাধ্‌ল। [illegible] ঘরে গিয়ে দুম করে দরজাটাকে বন্ধ করে দিয়ে সে বিছ[illegible] উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়্‌ল। তার ঘরের পাশ [illegible] যেতে যেতে পিসীমা তাকে উদ্দেশ করে ভয়ে ভয়ে [illegible] বলে গেলেন "আমার ওপর চটা কেন? আমি ত [illegible] যেচে কিছু বলতে আসিনি। ছেলেটা অমন করে লি[illegible] তাই। তুমি নিশ্চয় তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার ক[illegible] নয়তো অনিলের মতো ছেলে—"

কিন্তু যাই ঘোটে থাকুক, এযে কতকটা তাঁরই ঘটেছে একথাটাও পিসীমা বুঝলেন। রেণুর কাছে [illegible] অপরাধী, এই চিন্তাটা ভিতরে ভিতরে তাঁকে পীড়া [illegible] লাগল। রেণুর চোখের দিকে চোখ তুলে তিনি চা[illegible] পারলেন না। এক একদিন মনে হোত তার কাছে [illegible] কথা কবুল করে তিনি মাপ চাইবেন। বলবেন [illegible] সুখের জন্যেই আমার এসব করা; তবু মানুষের [illegible] আর কতটুকু? নিয়তি তাকে যে ছাঁচে গড়ে সেই ছাঁ[illegible] সে তৈরি হয়।

অনিলের সেদিন এগজামিনের তারিখ। সমস্তটা স[illegible] মনটাকে একটু বিশ্রাম দিতে চেষ্টা করে সে সবে স্ন[illegible] ঘরে ঢুকেছে, এমনি সময় রেণুর কাছ থেকে 'তার' উপস্থিত:— •

'আমি মরতে বসেছি, তুমি নিশ্চয় আসবে, তা না হলে আর দেখা হবে না।'

তার বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে সে তার পড়বার ঘরে এসে বসল। আর ছেলে যারা ছিল ছুটাছুটি করে এসে তার কাছ থেকে সেই রক্তের রঙের কাগজখানা নিয়ে পড়ল। কারো মুখে কথা ফুটল না।

একজন সহানুভূতি দেখিয়ে বললে "তাইত! তুমি কি করবে অনিল?"

তার কথার জবাব না দিয়েই অনিল বললে "দশটায় গাড়ী, তোমরা কেউ আমায় ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌছে দেবে চল।"

মুমূর্ষুর তুচ্ছ এই অনুরোধ! তার কথা মনে কোরে আর অনিলের মুখের দিকে চেয়ে কেউ তর্ক তুলতে সাহসী হলো না।

রেণুদের ষ্টেশনে সে যখন নাম্‌ল, তখন রাত্রির অন্ধকারকে নিবিড়তর করে আকাশের সমস্তটা জুড়ে মেঘ করেছে। ষ্টেশন থেকে অনেকখানি রাস্তা ঘুরে সহরে পৌছানো যায়। একটা ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানকে প্রচুর বকশিশের লোভ দেখিয়ে রাজি কোরে সে রওনা হলো। মাঝ পথে আকাশটাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে ঝড় এল, বাতাসের ঝাপটায় সামান্য আশ্রয়খানির জীর্ণ কাঠের দেয়ালগুলো আর্ত্তনাদ করে উঠতে লাগল, আশেপাশে ঝড়ের উন্মত্ত গর্জ্জন, তার ফাঁকে ফাঁকে উপর থেকে তীক্ষ্ণতর চাবুকের শব্দ!

দুদিকে খোলা মাঠ, তার মাঝখানে একটুখানি উঁচু জমির ওপর স্বল্পপরিসর পথখানি। হঠাৎ সামনে একটা কিছু পড়াতে ঘোড়াগুলো ত্রস্ত চকিত হয়ে উঠল। একটা প্রবল ঝাঁকানি, তারপর আরোহী সমেত গাড়ীখানি রাস্তার পাশে উল্টে গড়িয়ে পড়ল।

অনিলকে ধরাধরি কোরে যখন পিসীমার শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, তখনো তার হুঁস নেই। মাথায় অনেকটা জায়গা ছিঁড়ে গিয়েছিল, ডাক্তার এসে ওষুধের ব্যবস্থা করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেল। মাঝ রাত্তেই আগুনের মতো হয়ে জ্বর এল। পিসীমা সমস্ত রাত তার শিয়রের কাছটিতে বোসে তাকে বাতাস করলেন। পরদিন রেণু যখন তার পায়ের কাছে এসে বস্‌ল তখন সে প্রলাপ বক্‌ছে; প্রলাপের ঘোরেও কেবলি রেণু···রেণু···রেণু।

যখন ঘরে আর কেউ থাকত না, তার পা দুটোকে বুকে চেপে ধোরে রেণু চোখের জলে সেগুলোকে স্নান করিয়ে দিত। দুটি হাতকে জোড় করে অস্ফুট স্বরে সে তাঁকে ডাকৃত মানুষের কোনো বেদনা যাঁর কাছে কোনোদিন লুকানো থাকে না, তার প্রতিটি তুচ্ছ ভাববিপর্য্যয়ের ওপর যাঁর চোখের আলো আশীর্ব্বাদের মতো এসে পড়ে।

ওগো দেবতা! যার আর-সব থেকে তাকে বঞ্চিত করলে, একটি মুহূর্ত্তে চিরদিনের জন্যে তাকে চোখের আড়াল করে দিয়ো না প্রভু!

একটা রাত ভয়ানক উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে কাটল। সকলে স্তব্ধ হয়ে সেই মুহূর্ত্তটির জন্যে অপেক্ষা কোরে বসে রইল, মানুষ সমাধান করতে চেষ্টা করেই যুগে যুগে যাকে আরো বেশী সমস্যা করে তুলেছে, তবু বোঝেনি এত অন্ধকারের মধ্যে অমন চরম সত্য কি ভাবে লুকিয়ে থাকে।

ভোর হতে যখন একটু বাকী তখন হঠাৎ প্রচুর ঘাম হয়ে জ্বরটার নিবৃত্তি হয়ে গেল। প্রভাতের আলো অনিলের নিদ্রানিলীন চোখদুটির উপর এসে যখন পড়্‌ল, তখন নূতন স্বাস্থ্যের জ্যোতিতে তার শীর্ণ মুখখানি তাজা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তখন থেকেই রেণুকে সেখানে আর দেখা গেল না। পিসীমা তাকে খুঁজতে এসে দেখলেন সে তার নিজের ঘরটিতে স্থাণুর মতো অচল হয়ে বসে আছে, তার মুখে হর্ষ কি বিষাদ কিছুরি এতটুকু আভাস নেই। সে মুখ পাথরে কোঁদা মুখের মতো নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ।

দীপ্ত রেণু, অসংযত রেণু! তার দেওয়া-নেওয়া দুয়েতেই আগুনের জ্বালা, তার উপহাস অবধি মৃত্যুদণ্ডের মতো ভয়ঙ্কর! আজ তার মনের সবটুকু আঘাত দিয়ে নিজের ওপর কৃত-অপরাধের শোধ তুল্‌ছে সে!

যারা জোর দিয়ে অপরাধ করে, অনুতাপও তারা জোর দিয়েই করে, রেণুকে বুঝ্‌তে হলে একথাটুকু আমাদের মনে রাখা চাই।

অনিল প্রথম চোখ চেয়েই বল্‌লে "রেণু কেমন আছে পিসীমা?"

"ভালো আছে বাবা।"

"আর ত কোনো ভয় নেই?"

"তার কোনো অসুখ করেনি?" "কিসের ভয় অণু?"

"না বাবা।"

কথাটাকে ধারণা করতে চেষ্টা কোরে, পিসীমা না শুনতে পান এমনি মৃদুস্বরে অনিল বললে "তবে কোন্ অপরাধে আমার এ শাস্তি?"

কিন্তু পিসীমা শুন্‌লেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন "তুমি এজন্যে তাকে দোষী কোরো না অণু, সব দোষ আমারই; আমি তাকে জেনে বুঝেও তোমারি কল্যাণের জন্যে তার মনকে তোমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলুম। মনে করেছিলুম তোমার এগ্‌জামিনটা সারা হয়ে গেলেই সব খোলসা করে মিটিয়ে দেবো। যে এগ্‌-জামিনের জন্যে এত করলুম তার মূলোকুঠারাঘাত কোরে সে আমার ওপর শোধ তুলেছে—এ শাস্তি আমারই!"

তারই দিন দুই পরে রেণুর ঘরের চৌকাটের কাছে দাঁড়িয়ে অনিল ডাক্‌লে "রেণু!"

বিছানার উপর আড়ষ্ট হয়ে রেণু পড়ে ছিল; আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে, কোনো কথা না বোলে সে-ঘর থেকে সে বেরিয়ে চলে গেল। পাশের ঘরের ভিতের ওপর বেদনাতুর বুকখানিকে দুহাতে চেপে ধোরে সে শুয়ে পড়ল। এই দেয়ালটার ওপাশেই অনিল, তারই অনিল, তার সব। সেইখানে ক্ষমা, শান্তি, স্নিগ্ধতা। কিন্তু এ সমস্তে তার অধিকারকে আজ সে নিজ হাতে চূর্ণ করবে, এই তার প্রায়শ্চিত্ত।

অনিলের বুকটা একটা দীর্ঘশ্বাসে ভার হয়ে উঠল। হঠাৎ রেণুর ডেস্কের উপরকার একখানা চিঠির উপর চোখ পড়াতে সে ত্রস্ত হয়ে সেখানা নিয়ে পড়লে। রেণু লিখেছে:—

"আমার মনে একটা ধারণা ছিল, কেড়েকুড়ে যারা নিতে জানে না, পৃথিবী ঠকায় তাদেরকেই। কিন্তু মনের রাজত্বের ত্রিসীমায় যে এ আইন খাটে না সে কথাটা এতদিন পরে শিখছি। আমি জানি তুমি আমায় ক্ষমা করবে না। জোরের অভিমানকে আঘাত করাই মনটার স্বভাব। একথাটা জেনেছি বোলেই তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ কিছু নেই। যা স্বাভাবিক তুমি তাই করেছ। কোরে আর কিছু পেতে যাব না; যদি কিছু আশীর্ব্বাদের মতো কোরে পাব, নিজে থেকে যা এসে পড়ে।"

আকাশের ধোঁয়াটে লালের মধ্যে থেকে একটি কোরে তারা ফুটে উঠল। একটুখানি বাতাস এসে জা[নালা]টার বাইরে লিচুগাছের পাতাগুলিকে ঝির্‌ঝির্ কোরে দিয়ে গেল। সেই একটি মুহূর্ত্তে অভিমানী রেণুর [সমস্ত] বেদনা অনিলের তিক্ত মনটাকে অশ্রুটুকুর মতো এসে [সিক্ত] কর্‌লে। সেইখানে কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো দাঁ[ড়িয়ে] থেকে রেণুকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা কোরে সবটুকু বুক [দিয়ে] তাকে ভালোবাস্‌লে।

রেণুর পাশে এসে যখন সে বস্‌ল, তখন একা[ন্ত] অশ্রুর আবেগে ঝড়ের নদীটির মতো সে ফুলে ফুলে উ[ঠছে]। সান্ত্বনার স্বরে অনিল বললে "তুমি যদি কিছু মনে কো[রে না] রাখ, আমিও কিছু মনে কর্‌বনা রেণু!"

তার বুকের আশ্রয়টিতে নিজেকে সঁপে দিয়ে [রেণু] রেণু ফোঁপাতে ফোঁপাতে উত্তর কর্‌লে "তুমি কেন [আমায়] ক্ষমা করতে এলে? নিষ্ঠুর হয়ে আমায় শাস্তি দি[লে না] কেন? তাহলেই যে আমার কোনো ক্ষোভ থাক্‌[ত না]। এ শাস্তি যে আমার পাওয়া চাই!"

অনিলের স্নেহপ্রবণ মন বুঝল এ শাস্তি পেতে আর বাকী নেই।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

একটি ঐতিহাসিক সামরূপ্য

(Historical parallel)

রাবণের কর্ণে যেমন বিভীষণ-ভায়ার হিতবা[ক্য] আংগ্লবিন্দীয় প্রভুদিগের কর্ণে তেমি অন্ন-সেন্তী ব[াবুর] হিতবাক্য—দুইই তপ্তশিলায় বারিবিন্দু।

শ্রীদ্বি—

সাংখ্য-দর্শনের দ্বিতীয় পৈঁঠায় পদ-নিক্ষেপ।

জিজ্ঞাসু॥ মন এবং অহংকারের মধ্যে কিরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাহা আপনি যথেষ্ট বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন; এক্ষণে, বুদ্ধির সহিত অন্তঃকরণের অপর দুইটি বৃত্তির কিরূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, সেই কথাটি বলুন্।

প্রবোধয়িতা॥ সাংখ্য-কারিকার ৩৫শ সূত্রে লেখে

"সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়ং অবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি, দ্বারানি শেষাণি॥"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

মনোঽহঙ্কার-সহবর্ত্তিনী বুদ্ধি যেহেতু সমস্ত বিষয়ে অবগাহন করে, এই হেতু বহিরিন্দ্রিয়=দ্বার-দশ—মনোঽহংকার-বুদ্ধি-সমন্বিত অন্তঃকরণ=দ্বারী॥ অনুবাদ সমাপ্ত॥

তত্ত্বকৌমুদী-ভাষ্যে ইহার তৎপর্য্য ব্যাখ্যার উপসংহার-স্থলে বলা হইয়াছে যে,

"ন কেবলং বাহ্যানি ইন্দ্রিয়াণি অপেক্ষ্য প্রধানং বুদ্ধিঃ, অপিতু যে অপ্যহংকার-মনসী দ্বারিণী তে অপি অপেক্ষ্য বুদ্ধিঃ প্রধানং।"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

বুদ্ধি, দ্বারী বলিয়া, শুধু যে কেবল বহিরিন্দ্রিয়রূপ দ্বার-দশেরই অপেক্ষা প্রধান, তাহা নহে; পরন্তু তাহার সহযোগী আর যে দুই দ্বারী, অহংকার এবং মন, তাহাদের অপেক্ষাও তাহা প্রধান।

জিজ্ঞাসু॥ এটা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দ্বার যেহেতু বহিরিন্দ্রিয়, আর, দ্বারী যেহেতু বুদ্ধি অহংকার এবং মন, এই হেতু বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মন শ্রেষ্ঠ; পরন্তু মন এবং অহঙ্কার অপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইল যে, কেন, তাহার আমি বিশেষ কোনো কারণ দেখিতে পাইতেছি না। অহংকার বলিতে পারে যে, "বুদ্ধি **অহঙেরই** বুদ্ধি, অতএব বুদ্ধি অপেক্ষা **আমি** শ্রেষ্ঠ;" মন বলিতে পারে যে, "আমি প্রসন্ন হইলে বুদ্ধি খোলে, আমি অপ্রসন্ন হইলে বুদ্ধির দ্বারে কপাট পড়িয়া যায়;—**আমিই** বুদ্ধির মরণ-কাঠি বাঁচন-কাঠি।"

প্রবোধয়িতা॥ পঞ্চদশীর বৈদান্তিক গ্রন্থকার বলেন—

"অহংবৃত্তি রিদংবৃত্তি রিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃত্তি রিদংবৃত্তি র্মনো ভবেৎ॥
অহংপ্রত্যয়-বীজত্বং ইদংবৃত্তে রতিস্ফুটং।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ নতু কচিৎ॥"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

অন্তঃকরণ বৃত্তি-ভেদে দ্বিবিধ; তাহার মধ্যে—অহংবৃত্তি =বিজ্ঞান (অর্থাৎ বুদ্ধি), ইদংবৃত্তি=মন। এটা খুব স্পষ্ট যে, অহংপ্রত্যয়ই ইদংবৃত্তির **বীজ**। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, আপনাকে না জানিয়া কেহ কদাপি বাহ্য বিষয় জানে না। ইতি অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশীর গ্রন্থকার স্বলীলাক্রমে এই যে একটি কথা বলিলেন—যে, "আপনাকে না জানিয়া কেহ কখনও বাহ্য বিষয় জানে না"—কেবল মাত্র এই কথাটির রীতিমত প্রমাণ প্রদর্শন করিতে গিয়া নবকান্টী (neo kantian) সম্প্রদায়ের একজন পাকা দর্শনকার ফেরিআরের (Ferrier-এর) প্রণীত Institute of Metaphysics-নামক অর্দ্ধ-সহস্রাধিক-পৃষ্ঠা-সমাকীর্ণ গোটা গ্রন্থখানির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সুপাঠ্য গ্রন্থখানির গোড়ার কথাটাই তাহার **ক** এবং তাহাই তাহার **ক্ষ**! সে কথাটি আর কিছু না—

"Along with whatever any intelligence knows, it must, as the ground or condition of its knowledge, have some cognizance of itself."

শেষোক্ত ফেরিআরের কথাটি এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশীর কথাটি একসঙ্গে অনুবাদ করিয়া পাইতেছি যে,

দ্রষ্টা পুরুষ, অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে, আপনাকে না জানিয়া বাহ্য বিষয় জানিতে পারে না:—অহংজ্ঞানই ইদং জ্ঞানের (অর্থাৎ এটা-ওটা-সেটা বিষয়ক জ্ঞানের) "**বীজ**" কিম্বা নিয়ামক—"*ground or condition*"।

কি আশ্চর্য্য! পঞ্চদশী-প্রণেতা দেশেও প্রাচীন, * কালেও প্রাচীন,—Ferrier দেশে প্রতীচীন, কালে অর্ব্বাচীন †; অথচ দোঁহার দুই কথা নিক্তির ওজনে সমান! পঞ্চদশীর এই যে দুইটি বেদান্ত-বচন—(১) অহংবৃত্তি=বুদ্ধি, (২) ইদংবৃত্তি=মন, ইহার সাংখ্য-পাঠান্তর হ'চ্চে—(১) বুদ্ধি অহংগর্ত্ত কেননা বুদ্ধি হইতেই অহংকার জন্মগ্রহণ করে, (২) মন ইদংগর্ভ কেন না মন হইতেই বিষয়গ্রাহী বহিরিন্দ্রিয় অভিব্যক্তি লাভ করে। রূপকের ভাষায়—বুদ্ধি মাতার পুত্র অহংকার, পৌত্র মন, প্রপৌত্র বিষয়োপরক্ত ইন্দ্রিয়-দশ। আটপছরিয়া লৌকিক ভাষায়—বুদ্ধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অহং'কে উপলব্ধি করে, অহঙের মধ্য দিয়া মন'কে উপলব্ধি করে, মনের মধ্য দিয়া বিষয়োপরক্ত ইন্দ্রিয়গণ'কে উপলব্ধি করে। সাংখ্য কারিকা'র ৩৬ সূত্রে লেখে

"এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর-বিলক্ষণা গুণ-বিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি॥"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

প্রকৃতির এই যে তিনটি বিশেষ বিশেষ গুণ-পরিণাম—(১) অহঙ্কার, (২) মন, এবং (৩) বহিরিন্দ্রিয়, ইহারা বিভিন্ন-স্বভাব হইলেও সর্ব্বদাই একযোট হইয়া একেরই উদ্দেশে কার্য্য করে:…প্রদীপের যেমন শিখা, তৈল, এবং বর্ত্তিকা পরস্পরের সাহায্যে বৈঠক-ঘরের দ্রব্যাদি প্রকাশ করিয়া গৃহপতির চক্ষুগোচরে সমর্পণ করে, প্রকৃতির তেম্নি ঐ তিন প্রকার গুণ-পরিণাম পুরুষার্থ (অর্থাৎ পুরুষের ভোগের সামগ্রী) প্রকাশ করিয়া পুরুষের বুদ্ধি-গোচরে সমর্পণ করে। এই গেল সূত্রের অনুবাদ। তত্ত্বকৌমুদী-ভাষ্যে ইহার তৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইরূপ:—

"যথা হি গ্রামাধ্যক্ষঃ কৌটুম্বিকেভ্যঃ করং আদায় বিষয়াধ্যক্ষায় প্রযচ্ছন্তি, বিষয়াধ্যক্ষশ্চ সর্ব্বাধ্যক্ষায়, স চ ভূপতয়ে; তথা বাহ্যেন্দ্রিয়াণি আলোচ্য মনসে সমর্পয়ন্তি, মনশ্চাহংকারায়, অহঙ্কারশ্চাভিমত্য বুদ্ধৌ সর্ব্বাধ্যক্ষভূতায়াং।"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

গ্রামাধ্যক্ষ যেমন কৌটুম্বিকগণের নিকট হইতে (অর্থাৎ স্ব স্ব জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের উপরে যাহাদের কর্ত্তৃত্ব থাটে সেই সকল মোড়ল-শ্রেণীর কৃষকগণের নিকট হইতে) রাজ আদায় করিয়া বিষয়াধ্যক্ষকে (অর্থাৎ নানা গ্রামের বি মোট বিষয়-সম্পত্তির অধ্যক্ষকে) প্রদান করে, বিষয়া তাহা সর্ব্বাধ্যক্ষকে প্রদান করে, সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজ-ভাণ সমর্পন করে, তেম্নি, বহিরিন্দ্রিয়গণ আলোচনা-রস নানাবিধ বিষয়ের পোট্‌লা বাঁধিয়া মনের গোচরে স করে, মন অহংকারের গোচরে সমর্পণ করে, অহংকার অভিমানের ডালিতে সম্বৃত করিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ-পদবীস্থ বু গোচরে সমর্পণ করে॥ ইতি অনুবাদ সমাপ্ত॥

জিজ্ঞাসু॥ ভাবের লোকেরা রূপকের ভাষা পছন্দ ক কাজের লোকেরা লৌকিক ভাষা পছন্দ করে; জ্ঞা ব্যক্তির কিন্তু ও-দুটার কোনোটাই পছন্দ সই নহে; জ্ঞা ব্যক্তিকে সন্তোষ দিতে পারে কেবল বৈজ্ঞানি ভাষা। দুইজন বাবা-ভালুকো শ্রেণীর বৈজ্ঞা পণ্ডিত সম্প্রতি আমার পাড়া-প্রতিবাসী হইয়াছেন তাঁহাদের হ্যাপায় পড়িয়া আমার কাণের তার বিগড়া গিয়াছে এম্নি যে, কী আর বলিব! রূপকের ভ শুনিলে আমার মনে হয়—যেন অলীক উপন্যাস শুনিতে লৌকিক ভাষা শুনিলে মনে হয়—যেন অন্ধ কর্ত্তৃক নীয় অন্ধের দলে মিশিতেছি। আমার এই প্রকার শোচ অবস্থার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আপনার বক্তব্য কথ আপনি যদি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলেন তবে বড়ই আ উপকার করেন।

প্রবোধয়িতা॥ কাণ্টের ভাষার ন্যায় বৈজ্ঞানিক ভ দ্বিতীয় একটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কাণ্ট্ কী বলি ছেন—শ্রবণ কর:—

"There are three original sources, or c them faculties or powers' of the soul, whi contain the conditions of the possibility all experience, and which themselves cann be derived from any other faculty, namel sense (বহিরিন্দ্রিয়), imagination (সংকল্পবিকল্পাত্ম মন=ইদংবৃত্তি,) and apperception (self-consciou ness)=অহংবৃত্তি।' এইরূপ, স্পষ্ট দেখিতে পাও যাইতেছে যে, পঞ্চদশীর বৈদান্তিক ভাষায় যাহার ন

* যেমন নবীন=নব্য, তেম্নি প্রাচীন=প্রাচ্য।
† অর্থাৎ এ-কালের মানুষ—সেদিনকার ছেলে।

ইদংবৃত্তি এবং অহংবৃত্তি—কাণ্টের বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহারই নাম যথাক্রমে imagination and apperception। বেদান্তের এই ইদংবৃত্তি এবং অহংবৃত্তির সঙ্গে সাংখ্যের মন অহঙ্কার এবং বুদ্ধির তলে তলে মিল রহিয়াছে যে, কেমন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত "সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত সার-সংগ্রহ" এই বৃহৎ নামের ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকা'তে এইরূপ :—

"তদন্তঃকরণং বৃত্তি-ভেদেন স্যাচ্ চতুর্বিধং।
মনো বুদ্ধি রহংকারশ্ চিত্তং চেতি তদুচ্যতে॥
সংকল্পান্ মন ইত্যাহুঃ, বুদ্ধি রর্থস্য নিশ্চয়াৎ।
অভিমানাদ্ অহঙ্কারশ্ চিত্তং অর্থস্য চিন্তনাৎ॥
মনস্যাপি চ বুদ্ধৌ চ চিত্তাহংকারয়োঃ ক্রমাদ্।
অন্তর্ভাবোঽত্র বোদ্ধব্যঃ.................॥"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

অন্তঃকরণ—বৃত্তিভেদে চারি প্রকার, (১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার, (৪) চিত্ত :—মনের ধর্ম্ম সংকল্প, বুদ্ধির ধর্ম্ম অর্থ-নিশ্চয়, অহংকারের ধর্ম্ম অভিমান, চিত্তের ধর্ম্ম অর্থ-চিন্তন। বোঝা চাই এখানে এই যে, চিত্ত—মনের অন্তর্ভূত, অহংকার—বুদ্ধির অন্তর্ভূত॥ অনুবাদ সমাপ্ত॥

উদ্ধৃত শ্লোক-তিনটির শেষেরটিতে শঙ্করাচার্য্য এই যে বলিতেছেন—যে, "অহংকার বুদ্ধির অন্তর্ভূত," এ কথাটি আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু সেইসঙ্গে আর-একটি কথা এই যে তিনি বলিতেছেন—যে, "চিত্ত—মনের অন্তর্ভূত", এ কথাটিতে আমার মন সায় দিতে ইতস্তত করিতেছে। আমার বিবেচনায়—"কাঁটাল ফল কাঁটাল বিচি'র অন্তর্ভূত" না বলিয়া, যেমন, বলা উচিত "কাঁটাল-বিচি কাঁটাল-ফলের অন্তর্ভূত"—"চিত্ত মনের অন্তর্ভূত" না বলিয়া, তেমি, বলা উচিত "মন চিত্তের অন্তর্ভূত"; কেননা, বুদ্ধি যেমন অহংকার অপেক্ষা ব্যাপক-শ্রেণীর অন্তঃকরণ-বৃত্তি - চিত্ত তেমি মন অপেক্ষা অথবা, যাহা একই কথা, চিন্তা—কল্পনা-অপেক্ষা, ব্যাপক-শ্রেণীর অন্তঃকরণ-বৃত্তি। উদ্ধৃত শ্লোকটি'র শেষেরটি'কে আমি তাই আমার পছন্দ-সই করিয়া গড়িয়া-পিটিয়া লইলাম এইরূপ :—

(১)

পদ্ম যেমন পদ্মিনীর অন্তর্ভূত—অহংকার তেমি বুদ্ধির অন্তর্ভূত।

(২)

পদ্মের বীজ-কোষ যেমন পদ্মের অন্তর্ভূত মন তেমি চিত্তের অন্তর্ভূত।

(৩)

পদ্মের দশটি বীজ যেমন বীজ-কোষের অন্তর্ভূত—দশটি ইন্দ্রিয় তেমি মনের অন্তর্ভূত।

অন্তঃকরণের চারিটি বৃত্তিকে, এইরূপে, তিনটি পৃথক্ পৃথক্ থাকে সাজাইয়া রাখা-গতিকে চিত্তের স্থানটি পঞ্চদশী-সম্মত অহংবৃত্তি এবং ইদংবৃত্তির মাঝে পড়িয়া গেল এইরূপ :—

(১) অহংকার'কে ক্রোড়ে করিয়া থাকা **বুদ্ধি** = অহংবৃত্তি। (২) দুয়ের মাঝে পড়িয়া যাওয়া **চিত্ত** = উভয়-ধর্ম্মিণী বৃত্তি। (৩) দশেন্দ্রিয় ক্রোড়ে করিয়া থাকা **মন** = ইদংবৃত্তি।

জিজ্ঞাসু। অন্তঃকরণ গৃহের ইঁট কাঠ চুণ সুর্কি প্রভৃতি গঠনোপকরণগুলি আপনি আমার সম্মুখে থাকে থাকে সাজাইয়া দিলেন দিব্য পরিপাটী শৃঙ্খলা-ক্রমে; কিন্তু শুধু কেবল ইট কাঠ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রীগুলি সাজানো দেখিলে, গৃহের কোন্ অঙ্গের সংগঠনে কোন্ বস্তুটার কিরূপ কার্য্যকারিতা তাহা বুঝিতে পারা সম্ভবে না। তাই বলি যে, ঐ উপকরণ সামগ্রীগুলির যোগাযোগ-দ্বারা অন্তঃকরণ-গৃহটি কিরূপে গড়িয়া তোলা হইতে পারে তাহার যদি একটা দৃষ্টান্ত আমাকে দেখান্ তবে ভাল হয়।

প্রবোধয়িতা॥ মনে কর রাত্রিকালে হরিদাস গোস্বামীকে তাঁহার ইষ্টদেবতা বংশীধরবেশে, স্বপ্নে দেখা দিলেন; আর, মনে কর যে, প্রাতঃকালে তিনি আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট বংশীধর-মূর্ত্তিটির ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, স্বপ্নের সেই যে বংশীধর মূর্ত্তি, আর, ধ্যানের এই যে বংশীধর মূর্ত্তি—দুয়ের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ তোমার কিরূপ মনে হয়?

জিজ্ঞাসু॥ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আমি দেখিতেছি এই যে, স্বপ্নের বংশীধর মূর্ত্তিটির উদ্‌ভাবন-কার্য্য হরিদাস

গোস্বামীর অযত্ন-সুলভ; পক্ষান্তরে, ধ্যানের বংশীধর মূর্ত্তিটির উদ্‌ভাবন-কার্য্য গোঁসাইজির প্রযত্ন-সাপেক্ষ। দুয়ের মূল-স্থানে অভেদ আমি দেখিতেছি এই যে, দুইই অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়—দুয়ের কোনটিই বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে।

প্রবোধয়িতা॥ স্বপ্নের বংশীধর মূর্ত্তিটির উদ্ভাবনাই বা অন্তঃকরণের কোন্‌তর বৃত্তির কার্য্য—ধ্যানের বংশীধর মূর্ত্তিটির উদ্‌ভাবনাই বা অন্তঃকরণের কোন্‌তর বৃত্তির কার্য্য?

জিজ্ঞাসু॥ মাঘী পূর্ণিমায় আমি যখন ভাবনাচিন্তা-বিরহিত স্বচ্ছন্দ মনে দক্ষিণের অলিন্দে বসিয়া মৃদুমন্দ সন্ধ্যা-সমীরণে গা ঢালিয়া দিই, তখন আমার অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে জয়দেবের "কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীর" প্রত্যক্ষবৎ দেখা দ্যায়; আমার তাই মনে হয় যে, স্বপ্নের বংশীধর মূর্ত্তিটিও সেইরূপ ভাবনাচিন্তাবিরহিত মনঃকল্পনার ভেল্কি কারীকরী; আর, তাহার বিপরীতে, ধ্যানের বংশীধর মূর্ত্তিটি যে, ধ্যানকর্ত্তার প্রযত্নসম্ভূত, তাহা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

প্রবোধয়িতা॥ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দেশীয় আচার্য্যেরা পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভাবনা-চিন্তা-বিরহিত কল্পনাবৃত্তির নাম দিয়াছেন মন, আর, শেষোক্ত প্রকার প্রযত্ন-সাধ্য চিন্তা-বৃত্তির নাম দিয়াছেন চিত্ত। চিত্ত এবং মনের মধ্যে অভিধান-ঘটিত ভেদাভেদ-সম্বন্ধ এই তো দেখিলে—এখন, দুয়ের মধ্যে কার্য্যঘটিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ তোমার কিরূপ মনে হয়, তাহা ঠাহরিয়া বলো।

জিজ্ঞাসু॥ আমার মনে হইতেছে যে, ধ্যান বা চিন্তা ধ্যাতার কর্ত্তৃত্ব-সাপেক্ষ; পক্ষান্তরে, কল্পনা-বিকল্পনা কর্ত্তৃত্ব নিরপেক্ষ। মনে করুন্—হরিদাস গোস্বামী নবোদ্যম-সহকারে মিনিট দশেক ধরিয়া বংশীধর মূর্ত্তিটি ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ধ্যানপ্রবর্ত্তনী কর্ত্তৃত্ব-শক্তি ক্রমশ অবসান প্রাপ্ত হইতে লাগিল, আর, সেই অবসরে বংশীধারী ধ্যেয় মূর্ত্তিটি তাঁহার মন হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িয়া তাহার স্থানে তাঁহার ইষ্টদেবতার রাখাল-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল; কিয়ৎপরে, আবার, রাখাল-মূর্ত্তিটিও তাঁহার মন হইতে সরিয়া পড়িয়া তাহার স্থানে ননিচোরা মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল; তাহার পরে যখন আবার ননিচোর-মূর্ত্তিটি তাঁহার মন হইতে সরিয়া-পড়িয়া তাহার স্থানে যশোদা রাণীর মাতৃমূর্ত্তি আবির্ভূত তখন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে, তাঁহার বৃন্দাবনস্থা ঠাকুরাণীকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ঘণ্টাখানে মধ্যেই তাঁহাকে ট্রেনে রওনা হইতে হইবে, আর, তৎক্ষ তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। এইরূপ দেখা যাইতেছে গোঁসাইজির ধ্যান-প্রবর্ত্তনী কর্ত্তৃত্ব-শক্তিটি যতক্ষণ প সতেজ ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ধ্যান-কার্য্যটি নির্বি চলিতেছিল; যেই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-শক্তিটি ক্লান্ত হইয়া পা আর অমি তাঁহার অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রে কল্পনা-বিকল্পনার উপস্থিত হইয়া তাঁহার যত্নের ধ্যানটিকে গ্রাস করিয়া ফেলি

প্রবোধয়িতা॥ তবেই হইতেছে যে, চিত্তের চিন্ত ধ্যান কর্ত্তৃত্বাভিমান-ঘ্যাঁসা—অহঙ্কার ঘ্যাঁসা—অন্তঃকরণ-বৃ অতঃপর তোমার জানা উচিত যে, মনের কল্পনা-বিক বহিরিন্দ্রিয় ঘ্যাঁসা অন্তঃকরণ-বৃত্তি।

জিজ্ঞাসু॥ আপনার শেষের কথাটির একটি দৃ দেখা'ন্।

প্রবোধয়িতা॥ এবার দৃষ্টান্তের জন্য বেশী দূরে যাই হইবে না দৃষ্টান্ত হাতের কাছে মৌজুদ্। গোসাঁইজি তাঁহার ইষ্টদেবতা স্বপ্নে দেখা দিবার দুইদিন পূর্ব্বে এক ফেরিওয়ালা বংশীধর কৃষ্ণমূর্ত্তির একখানি চিত্রিত পট তাঁ নিকটে বিক্রয়ার্থে আনয়ন করিয়াছিল। গোসাঁইজি— সেই পটাঙ্কিত বংশীধর মূর্ত্তিটিকে নয়নদ্বারা গ্রাস করিতে —এইরূপ আগ্রহান্বিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ই মূল্য কত?" ফেরিওয়ালা বলিল "আপনি কী দেবেন্ বলুন গোসাঁইজি বলিলেন "দুই টাকা"। ফেরিওয়ালা বলিল "ইহার জুড়ি ধাঁচার একখানি কৃষ্ণমূর্ত্তির ছবি পর্শু আমি বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকটে ৫০শ টাকা মূল্যে বি করিয়াছি; আপনি পরম বৈষ্ণব—সাধু পুরুষ;—আ যদি এ-খানি ল'ন, তবে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও টাকা মূল্যে এ-খানি আপনাকে দিতে পারি—তাহার ক কিন্তু দিতে পারি না।" দুই টাকার জায়গায় দশ টা শুনিয়া গোসাঁইজি পিছাইলেন। ছবিটি তাঁহার লওয়া হ না বটে—কিন্তু অর্থাভাবে তাহা না লইতে পারা'র তাঁহার মনের মধ্যে জোঁকের ন্যায় লাগিয়া রহিল। এখ এ-কথা তোমাকে বলা বাহুল্য যে, গোসাঁইজির সেই ম

খেদটি মিটাইবার জন্ম তাঁহার ইষ্ট দেবতা ঠিক্ সেইপটাঙ্কিত বংশীধর-বেশে স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিলেন। আমি তাই বলি যে, স্বপ্নের মনশ্চক্ষে দেখা বংশীধর মূর্ত্তিটি, জাগ্রৎকালের চর্ম্মচক্ষে দেখা বংশীধর মূর্ত্তিটিরই দ্বিতীয় সংস্করণ। এমতে পাইতেছি যে, চিত্তের চিন্তা যেমন অহংকার-ঘাঁসা (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান-ঘাঁসা) অন্তঃকরণ-বৃত্তি — মনের কল্পনা-বিকল্পনা তেমি বহিরিন্দ্রিয় ঘাঁসা অন্তঃকরণ-বৃত্তি। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, চিত্ত যেমন অহঙ্কার-ঘ্যাঁসা অন্তঃকরণ-বৃত্তি — অহঙ্কার তেমি বুদ্ধি-ঘাঁসা অন্তঃকরণ-বৃত্তি।

জিজ্ঞাসু॥ সেটা আবার কিরূপ ?

প্রবোধস্মিতা॥ চিন্তা এবং কল্পনার মধ্যে একটা রকমের প্রভেদ এই যে তুমি দেখিয়াছ—যে, চিন্তা—ধ্যাতা পুরুষের কর্ত্তৃত্ব-সাপেক্ষ পরন্তু কল্পনা কর্ত্তৃত্ব-নিরপেক্ষ, ঠিক্ই দেখিয়াছ; কিন্তু তদ্ব্যতীত দুয়ের মধ্যে আর-এক রকমের প্রভেদ আছে—সেটাও তোমার দেখা উচিত। সে প্রভেদ এই যে, ধ্যানপ্রবর্ত্তনী কর্ত্তৃত্ব-শক্তি জ্ঞাতা পুরুষের জ্ঞানের সাক্ষাতে স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়,—কল্পনা-শক্তি জ্ঞানের অসাক্ষাতে স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। তার সাক্ষী—রাত্রিকালে গোসাঁইজির কল্পনা-শক্তি তাঁহার জ্ঞানের অসাক্ষাতে কার্য্য করিয়া বংশীধর মূর্ত্তিটিকে সহসা তাঁহার মনোনেত্রের সম্মুখে স্থাপন করিল; পক্ষান্তরে প্রাতঃকালে গোসাঁইজির ধ্যান-প্রবর্ত্তনী কর্ত্তৃত্ব-শক্তি তাঁহার জ্ঞানের সাক্ষাতে চরণে চরণ—কটিতে পীতধড়া—অধরে মুরলী—ললাটে শিখিপুচ্ছ—জোড়া দিয়া ত্রিভঙ্গ বংশীধর মূর্ত্তির সংগঠন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, চিত্তের চিন্তন-ক্রিয়া বা ধ্যান-ক্রিয়া জ্ঞানালোকে আলোকিত; মনের কল্পনা-ক্রিয়া জ্ঞানালোকে অসংস্পৃষ্ট। এমতে পাইতেছি যে, চিত্ত যেমন কর্ত্তৃত্বাভিমান-ঘ্যাঁসা—কর্ত্তৃত্বাভিমান তেমি জ্ঞান-ঘাঁসা অথবা, যাহা একই কথা, বুদ্ধি-ঘ্যাঁসা।

জিজ্ঞাসু॥ তা যেন বুঝিলাম—"অহংকার বুদ্ধি-ঘ্যাঁসা" এটা যেন বুঝিলাম—কিন্তু তাহাতে আমার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না;—অহঙ্কার এবং বুদ্ধির মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ কিরূপ সেইটিই আমার প্রকৃত জিজ্ঞাস্য।

প্রবোধস্মিতা॥ "অহঙ্কার বুদ্ধি-ঘাঁসা" বলাতেই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধির প্রান্তস্থানীয় কিয়দংশ অহঙ্কার-ঘাঁসা। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে :—এটা যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, সমুদ্রের তরঙ্গিত বহিস্তর-টাই কেবল জাহাজাদি জলযান-সঙ্ঘের সহিত সংস্পৃষ্ট, তা বই, তাহার প্রশান্ত অন্তস্তর পোতাদির সহিত সংস্পর্শ-বর্জ্জিত, এটাও তেমি দেখা চাই যে, বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব-প্রবণ বহিরঙ্গটিই কেবল অহংকারের সহিত সংস্পৃষ্ট, তা বই, তাহার জ্ঞান-প্রবণ মুখ্য অঙ্গটি—অন্তরঙ্গটি—অহঙ্কারের সহিত সংস্পর্শ-বর্জ্জিত।

জিজ্ঞাসু॥ এ যাহা আপনি বলিতেছেন, ইহার একটি দৃষ্টান্ত আমাকে দেখা'ন।

প্রবোধস্মিতা॥ দৃষ্টান্ত হাতে হাতে! সেদিন সেই যে প্রতিমা-বিসর্জ্জন এবং মহরমের সংঘর্ষ-ঘটনা-সূত্রে রাস্তার মাঝখানে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছিল, "তাহার দুই পক্ষের কোন্ পক্ষ অপরাধী" তোমাকে জিজ্ঞাসা করা'তে তুমি বলিলে "আমার বুদ্ধিতে মুসলমানেরা অপরাধী"—আতা-উল্লা-দর্জীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল "আমার বুদ্ধিতে হিন্দুরা অপরাধী।" এরূপ স্থলে তোমার বুদ্ধিতেও যেমন, আর, আতা-উল্লার বুদ্ধিতেও তেমি, দুজনার বুদ্ধিতেই অহঙ্কারের আধিপত্য নিক্তির ওজনে সমান। কিন্তু, তোমার বুদ্ধিতে মুসলমানেরা অপরাধী বলিয়া কিছু-আর এরূপ প্রমাণ হইতেছে না যে, সত্যসত্যই মুসলমানেরা অপরাধী, আর, আতা-উল্লার বুদ্ধিতে হিন্দুরা অপরাধী বলিয়া কিছু-আর এরূপ প্রমাণ হইতেছে না যে, হিন্দুরা সত্যসত্যই অপরাধী; স্বপক্ষ সমর্থন করাই—ওকালতি করাই—কিছু আর বুদ্ধির মুখ্য কার্য্য নহে; বুদ্ধির মুখ্য কার্য্য—তত্ত্বের নির্দ্ধারণ। বুদ্ধির অহঙ্কার-গর্ভ বহিরঙ্গটি কেবল স্বপক্ষ-সমর্থনের জন্যই আগ্রহান্বিত হয়, পরন্তু, বুদ্ধির অহংকার-মুক্ত মুখ্য অঙ্গটি—অন্তরঙ্গটি—পক্ষাপক্ষ-নিরপেক্ষ তত্ত্বনির্দ্ধারণ-কার্য্যেই সর্ব্বতোভাবে ব্যাপৃত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্ধির চক্ষু হইতে অহঙ্কার-মদের নেশার ঘোর ছাড়িয়া না যায়—ততক্ষণ-পর্য্যন্ত বুদ্ধি প্রকৃত তত্ত্বের নির্দ্ধারণ-কার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত হয় না।

জিজ্ঞাসু॥ আপনার এই শেষের কথাটি শুনিয়া আমার এইরূপ মনে হইতেছে যে, অহঙ্কার-রোগের ঔষধ নাই। বুদ্ধির গ্রীবা হইতে অহঙ্কার-টিকে ছাড়ানো, আর

হরিণের গ্রীবা হইতে জ্যান্ত বাঘের থাবাটিকে ছাড়ানো —দুইই আমার মনে হয় যার পর নাই সুকঠিন।

প্রবোধয়িতা॥ মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭।২৮ শ্লোক-দুটিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন'কে বলিতেছেন

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥"

ইহার বাংলা অনুবাদ।

কার্য্য যতকিছু করিবার সবই করিতেছে **প্রকৃতির গুণত্রয়**; মাঝে হৈতে দ্রষ্টাপুরুষ অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া মনে করিতেছে "**আমি কর্ত্তা**"। তত্ত্ববিৎ কিন্তু জানেন যে, ত্রিগুণে ত্রিগুণে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিলেই পরস্পরের সহিত পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য—ইহা জানিয়া কর্ম্মফাঁদে ধরা দা'ন্‌ না।

জিজ্ঞাসু॥ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা যদি হিন্দুমুসলমানেরা নহে—তবে তাহার প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা **আর-যে, কে**, তাহা তো আমি জানি না।

প্রবোধয়িতা॥ তোমার তাহা না-জানিতে পারিবারই কথা—কিন্তু ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণের তাহা জানিতে বাকি নাই। তিনি জানিতেছেন যে, "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে"—ত্রিগুণের সহিত ত্রিগুণের—পৈতৃক সংস্কারের সহিত পৈতৃক সংস্কারের—চোখোচোখি হইলেই উভয়পক্ষেরই মনের উষ্মা প্রথমে মুখামুখিতে এবং পরিশেষে হাতাহাতিতে পরিণত না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; অতএব, প্রতিমা-বিসর্জ্জন এবং মহরমের সংঘর্ষসূত্রে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তাহার প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তবে, দুইপক্ষের আবহমান-কালের পৈতৃক সংস্কারকেই তাহা বলা উচিত।

জিজ্ঞাসু॥ ওরূপ স্থলে, হিন্দুমুসলমান নিজেরা যে, দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রবর্ত্তনকর্ত্তা নহে, তাহার প্রমাণ কি?

প্রবোধয়িতা॥ তাহার প্রমাণ হাতে হাতে! "মুসলমানেরা ম্লেচ্ছজাতি" এই ভগ্নাবশিষ্ট জীর্ণ-গৃহাশ্রিত বটতরুর ন্যায় বদ্ধমূল সংস্কারটি যদি হিন্দুদিগের মন হইতে উ হইয়া যায়, আর, সেইসঙ্গে "হিন্দুরা কাফের" এই ে বদ্ধমূল সংস্কারটি যদি মুসলমানদিগের মন হইতে উ হইয়া যায়, তবে বিজয়া-দশমীতে দুই পক্ষের পরস্পরে পরস্পরের সংগ্রামের পরিবর্ত্তে কোলাকুলির ধুম পড়ি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ফল-কথা এ তোমার আমার, তথৈব আতা-উল্লার, বুদ্ধি বহি ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি অন্তর্মুখী; আর, সে তোমার আমার এবং আতাউল্লার অহঙ্কার-বিমূঢ় ভ্রম-স্বপক্ষেরা পরম সাধু, এবং প্রতিপক্ষদিগের অপরাধের পরিসীমা নাই; পক্ষান্তরে, ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান-গর্ভ সমদৃষ্টিতে কেহই অপরাধী নহে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অন্তর্মুখী বুদ্ধিই—জ্ঞানই—অহংকার-রোগের মহৌষধি॥ ইতি প্র সমাপ্ত॥

সাংখ্যের তত্ত্ব-সোপানের প্রথম পৈঁঠা হইতে পৈঁঠাতে নাবিবার সবে কেবল উদ্‌যোগ আরম্ভ হইয় এইজন্য, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার কিরূপে প্রসূত হয়-তৃতীয় পৈঁটার কথাটার অবতারণা এখানে হইতে না—যথাস্থানে তাহা পরে হইবে। আপাতত শঙ্করাচ অভিপ্রায়-মতে অহংকারকে বুদ্ধির অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া আমরা পাইতেছি—

অহঙ্কার-গর্ভ বুদ্ধি—অহংবৃত্তি।
চিন্তাগর্ভ চিত্ত—মধ্যভূমি।
ইন্দ্রিয়গর্ভ মন—ইদংবৃত্তি।

শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় মতে চিত্তকে মনের অন্ত করিয়া ধরিয়া না-লওয়া হইল কেন—তাহার কৈফিয়ৎ আমি ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি—বাকি কৈফিয়ৎ অ বিলম্বে দিব। সে যাহা হোক্‌—একটি গুরুতর বি মীমাংসা এই স্থানটিতে নিতান্তই আবশ্যক; সে বি হ'চ্চে—কূটস্থ চৈতন্যের সহিত বুদ্ধির ভেদাভেদ সম্বন্ধ। সব নিগূঢ়-তত্ত্বের সন্ধান জ্ঞাপন তাড়াতাড়ি'র কাজ নহে তাহা ধীরে ধীরে ক্রমশ প্রকাশ্য।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুই তার

(২২)

গুণময় বৈঠকখানায় মাটিতে একখানা বিলাতী কম্বল পাতিয়া একখানা শাল গায়ে জড়াইয়া বসিয়া আছেন, পঞ্চানন নিকটে ফরাশের উপর বসিয়া গুণময়ের মাতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদির ও কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে তাহার ফর্দ্দ করিতেছে।

ডাকের চিঠি আসিল। গুণময় বুড়া বলিয়া সনাক্ত হইবার ভয়ে চশমা লইতেন না। চিঠিগুলিকে হাতে করিয়া খুব দূরে ধরিয়া চোখ বিবিধ প্রকারে সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত করিয়াও যখন পড়িতে পারিলেন না, তখন চিঠিগুলি পঞ্চাননের দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—আলোচালের হবিষ্যি কোরে আর রুক্ষ্ম নেয়ে চোখ একদম খোরে গেছে ঘোড়ার ডিম!

পঞ্চানন চিঠিগুলি তুলিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—হবে না? এই মানসিক ক্লেশের উপর দৈহিক কষ্ট! ......পিরোজপুরের তহশীলদার লিখছে—হুজুরের কাছে অধীনের নিবেদন এই—

গুণময় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—অত ধানাইপানাই শুনতে পারিনে, তা হলে ত আমিই পড়তাম, তোমাকে দিলাম কেন? তুমি পড়ে পড়ে মোদ্দা-কথাটা আমায় বলো।

পঞ্চানন চিঠি পড়িয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—পিরোজপুরে খুব দুর্ভিক্ষ হয়েছে, খাজনা আর মাথট আদায় হচ্ছে না।

গুণময় বলিলেন—তহশীলদারকে লিখে দাও আস্তে আস্তে আদায় করুক; কিন্তু ফাগুন নাগাদ সমস্ত আদায় হওয়া চাই।

পঞ্চানন আর-একখানি চিঠি তুলিয়া লইয়া বলিল—মীরে রাণীবৌকে চিঠি লিখেছে।

গুণময় বলিলেন—আসতে বারণ করা হয়েছে তাই নালিশ করেছে। খুলে দেখ।

পঞ্চানন বিনা দ্বিধা-সঙ্কোচে দয়াদেবীর নামের চিঠি খুলিয়া পড়িয়া বলিল—না, সেসব কিছু লেখেনি, পাশ হয়েছে তাই খবর দিয়েছে, এখানে আর কখনো আসবে না তাও লিখেছে।

গুণময় বলিয়া উঠিলেন—আঃ! আপদ বিদেয় হলো, বাঁচা গেল! চিঠিখানা চতুরকে দাও, গিন্নিকে দিয়ে আসুক।

চতুর খানসামা চিঠি লইয়া অন্দরে দিতে গেল।

পঞ্চানন আর-একখানা চিঠি খুলিয়া পড়িয়া বলিল—রসময়বাবু চিঠি লিখেছেন; আপনার মাতৃবিয়োগে দুঃখ করেছেন; বিয়ে স্থগিত হওয়ার জন্যে আরো দুঃখ করেছেন; আর আমাদের জমিদারীর পাঁচশো ঘর প্রজা তাঁর জমিদারীতে উঠে যাবে বোলে এক দরখাস্ত করেছিল, সেই দরখাস্তখানা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

গুণময় কাত হইয়া কম্বলে শুইয়া-পড়িয়াছিলেন, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিলেন—অ্যাঁঃ। দরখাস্তে কি লিখেছে?

পঞ্চানন বলিল—মস্ত বড় দরখাস্ত। একটু একটু পড়ে শোনাই—'আমাদের জমিদার অত্যাচারী জুলুমবাজ!...... একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর জুটিয়াছে পেঁচো—সে বেটা পাজির পা-ঝাড়া বেহদ্দ বদমায়েস!......আমরা রাতারাতি আপনার জমিদারীতে পলাইয়া যাইব ও জঙ্গল কাটিয়া গঞ্জ বসাইব, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা! ......জমিদার এই অজন্মার বৎসরে পুরা খাজনা ও মাথটের জন্য পীড়ন করিতেছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পৃষ্ঠবল হইলে আমরা জমিদারের অতিলোভের উত্তম শিক্ষা দিতে পারি!.........'

গুণময় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—পাজি বেটারা আমাকে শিক্ষা দেবে! এইবার কে কাকে শিক্ষা দ্যায় দেখিয়ে দেবো! কার কার নাম সই আছে দেখ ত।

পঞ্চানন দরখাস্তের পাতা উল্টাইয়া বলিল—প্রথমেই সই আছে পতে হাড়ির। দরখাস্তখানাও সেই বেটারই হাতে লেখা! ও! হয়েছে! তাই ও লোকের বাড়ী-বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! জিজ্ঞাসা করাতে বললে মাথট আদায়ের বন্দোবস্ত করছি! মাথটের বদলে এইবার ওর মাথাটা নেবো তবে আমার নাম পঞ্চানন ভটচায্!......এই চাপরাশী, কাছারীতে পতিত মণ্ডল এসেছিল, যদি থাকে, ডেকে নিয়ে এস।

চাপরাশী চলিয়া গেল। গুণময় ও পঞ্চানন রাগে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

পতিত চাপরাশীর সঙ্গে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই গুণময় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—চাপরাশী, শালাকে পাঁচশো জুতো গুনে লাগাও!

পতিত আশ্চর্য্য হইয়া একবার গুণময় ও একবার পঞ্চাননের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—হজুর, আমার কি অপরাধ?

গুণময় বলিয়া উঠিলেন—এখন নেকা সাজছিস পাজি! বিলাসপুরের এলাকায় উঠে গিয়ে যে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছিলি! কেমন শিক্ষা আমি তোকে দিয়ে দি দ্যাখ! মারো জুতো!

পতিত চকিতে একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিল দরজার পাশে পঞ্চাননের একগাছা বাঁশের লাঠি ঠেসানো রহিয়াছে। চট করিয়া সেই লাঠিগাছা ধরিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তারপর বলিল—খবরদার বাবু, আমরা মরীয়া হয়ে উঠেছি, মরীয়ার মাথায় খুন চাপাবেন না; আমার গায়ে কেউ হাত দিতে এলে আপনাদের দুজনকে আমি আস্ত রাখবো না। আমি হাড়ির ছেলে, হাতে লাঠি পেয়েছি, খবরদার!

মহরমের সময় পতিত হাড়ির লাঠি খেলা গুণময় বহুবার দেখিয়া তারিফ করিয়াছেন; পতিতের কথা শুনিয়া গুণময় বা পঞ্চানন কাহারো আর বাক্য সরিল না। পতিত সেই অবসরে বৈঠকখানা হইতে জমিদার-বাড়ীর হাতা ছাড়াইয়া নিজের গ্রামের পথ ধরিল; পথে যাহাকে যাহাকে দেখিতে পাইল খবর দিয়া গেল বাবু তাহাদের দরখাস্তের খবর পাইয়াছেন, এখন নিজেরা খবরদার!

পতিত চলিয়া গেলে গুণময় গর্জ্জিয়া বলিলেন—একশো লেঠেল লাগিয়ে সব কজনকে ধরিয়ে আনাও, ওদের জরুবেটিকে বে-ইজ্জত করো, ঘরে আগুন লাগাও! যে নাকে খৎ দিয়ে একশো টাকা জরিমানা দেবে সেই কেবল রেহাই পাবে!

পঞ্চানন মাথা নাড়িয়া "আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি!" বলিয়া উঠিয়া কাছারীতে গেল।

গুণময় নিষ্ফল ক্রোধে ও অপমানের ক্ষোভে মাথার তলে হাত রাখিয়া কম্বলের উপর শুইয়া পড়িলেন।

(২৩)

চতুর খানসামা বীরেনের চিঠিখানি লইয়া গিয় দেবীকে দিল। তিনি হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিে কার চিঠি রে চতুর?

—আজ্ঞে, বীরেন দাদাবাবুর।

দয়াদেবী চিঠিখানি হাতে করিয়া লইয়াই জি করিলেন—আমার নামের চিঠি খুললে কে রে?

—আজ্ঞে, নায়েব মশায় খুলেছেন।

দয়াদেবী চতুরের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি হানিয়া বলিবে কী! পেঁচোর এতবড় আস্পদ্ধা যে আমার চিঠি পড়ে সে!

চতুর ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে বাবু হুকুম দিয়েছিলেন তাই তানাকে পড়ে শুনিয়েছিল

দয়াদেবীর চিঠি-মুঠিকরা হাত বিছানায় পড়িয়া ে তিনি চোখ মুদিয়া জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

চতুর সেই অবকাশে সে ঘর হইতে পলায়ন করিল

দয়াদেবীর পায়ের কাছে রাজবালা বসিয়া ছিল; উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টিতে বীরেনের চিঠিখানির দিকে দেখি দেখিতে ভাবিতেছিল কখন্ তাহার দিদি তাহাকে চিঠিখানি পড়িতে বলিবেন? ঐ চিঠিতে বীরেন তা কথা কিছু লিখিয়াছে কি? নিশ্চয় লিখিয়াছে। ে জায়গাটা সে কেমন করিয়া পড়িবে? লজ্জায় সুখে দুঃখে সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারিবে কি?

দয়াদেবী চোখ মুদিয়া শুইয়াই আছেন। রাজবাল এক মুহূর্ত্ত এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে, ইচ্ছা হইতে দয়াদেবীর হাতের মুঠার মধ্য হইতে চিঠিখানা টানিয়া লই সে পড়িয়া লয়। তাই রাজবালা ধীরে ধীরে ডাকিল দিদি!

দয়াদেবী চমকিয়া চোখ চাহিয়া বলিলেন—অ্যাঁ?

দয়াদেবী অতীত স্মৃতির ধ্যানে ডুবিয়া গিয়াছিলেন-সেই তাঁহাদের ছেলেবেলাকার ভালোবাসার কথা, তাঁহাদে সুখের স্বপ্ন ভাঙিয়া দেওয়ার কথা, তাঁহাকে সতীনের হা হইতে বাঁচাইবার জন্য হরেন্দ্রের অবিবাহিত থাকিবা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিবাহ করার কথা, তারপর বীরেন্দ্রে বাদের মৃত্যু ও হরেন্দ্রের ছেলে বীরেন্দ্রকে নিজের পুত্ররূে

পাইয়াও তাহাকে হারাইবার ঘটনা তাঁহার মনের মধ্যে দিয়া বহিয়া চলিতেছিল। রাজবালার ডাকে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি চমকিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন—অ্যাঁ!

রাজবালা ডাকিয়া ফেলিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল; কেন ডাকিল তাহার কি জবাব দিবে? দয়াদেবীর চিঠি তিনি পড়ুন আর না পড়ুন তাহাতে তাহার কি, তাহার আগ্রহ ও কৌতূহল যে নিতান্ত অশোভন। সে লজ্জিত নত মুখে তাড়াতাড়ি বলিল—এখন ঘুমিও না, ওষুধ খেতে হবে।

দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চিঠিখানি তুলিয়া ধরিলেন। রাজবালার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। দয়াদেবী খাম হইতে চিঠি বাহির করিলেন, চিঠির এক-একটি ভাঁজ খোলার সঙ্গে-সঙ্গে রাজবালার বুক কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, এইবার ঐ চিঠিখানি তাহার হাতে আসিবে, সে এইবার উহা পড়িতে পাইবে! দয়াদেবীর সমস্ত চিঠি পড়া ও লেখার কাজ ত রাজবালাই করে। আগ্রহে রাজবালার সমস্ত দেহমন উৎসুক হইয়া উঠিল। কিন্তু দয়াদেবী এ চিঠিখানি নিজেই চোখ বুলাইয়া মনে মনে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তারপর একে একে ভাঁজে ভাঁজে পাট করিয়া খামে ভরিয়া চিঠিখানি মাথার বালিশের তলায় রাখিয়া দিলেন।

রাজবালা আর সেখানে থাকিতে পারিল না, উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল।

দয়াদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাচ্ছিস্?

রাজবালা মুখ না ফিরাইয়াই "আসছি" বলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মায়ার পড়িবার ও খেলিবার ঘরে গিয়া রাজবালা, কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; আর টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই ঘরে একটা বড় দেরাজের পিছনে বসিয়া মায়া আপনার পুতুলের সংসার গোছাইতেছিল। ঘরে কান্নার শব্দ শুনিয়া ঝুঁকিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল; তারপর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিয়া রাজবালার পিঠে হাত দিল। রাজবালা চমকিয়া মাথা তুলিয়া দেখিল মায়া! মায়া গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছে। রাজবালা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়া রাজবালার হাত ধরিয়া মুখ তুলিয়া করুণা-ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ ভাই মাসী, তুমি বীরেনদার জন্যে কাঁদছিলে?

রাজবালা আবার বসিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। মায়া আস্তে আস্তে গিয়া ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া বলিল—বাবার পায়ে আজকাল আবার জুতো নেই, কখন এসে পড়বে!—বীরেন-দাদাকে ও দুটি চক্ষে দেখতে পারে না। বীরেন-দাদার জন্যে আমারও ভাই বড্ড মন-কেমন করে। বীরেন-দাদা কবে আসবে ভাই মাসী?

আজ মায়াকে ব্যথার ব্যথী দেখিয়া রাজবালার কান্না যেন উথলিয়া পড়িতে লাগিল। সে অস্ফুট স্বরে বারবার বলিতে লাগিল—সে আর কখনো আসবে না রে, আর কখনো আসবে না।

মায়া মুখখানি ম্লান করিয়া তাহার কান্না দেখিতে-দেখিতে বলিয়া উঠিল—আমিই বীরেন-দাদাকে তাড়ালাম।

অতটুকু মেয়ে শোকের আওতায় প্রৌঢ়ার মতন ভারিক্কি হইয়া উঠিয়াছে; শিশুর মুখে দুঃখের কথা বড় বেশী-রকম করুণ সুরে বাজে। রাজবালা মায়ার কথায় ব্যথিত হইল; তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া মায়াকে কোলের কাছে টানিয়া তাহাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না, তুমি তাকে তাড়াবে কেন?—তুমি যে তাকে ভালোবাস। তোমার বিয়ের সময় সে নিশ্চয় আসবে, তখন দেখা হবে।...তুমি খেলা করো, আমি দিদির কাছে যাই, দিদি একলা আছেন।

মায়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—তাহার মাসী ত বেশ, তবে কেন সে মাসীর হিংসা করিয়া এমন অনর্থ ঘটাইল।

বীরেন্দ্রের ব্যবধান সরিয়া যাওয়াতে মায়া দেখিতে-ছিল যে তাহার মাসীর মনটি তাহার প্রতি মমতায় ভরা, দুজনেরই দুঃখ একজনের অভাবে, তাই তাহারও মন ক্রমশঃ মাসীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

রাজবালা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল দয়াদেবী চোখ মুদিয়া শুইয়া আছেন। রাজবালা থমকিয়া দাঁড়াইল; সে বুঝিতে চাহিল তিনি ঘুমাইয়াছেন কি না; রাজবালা

আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া গিয়া খাটের কাছে দাঁড়াইল, তবু দয়াদেবী চোখ মেলিলেন না; রাজবালা খাট প্রদক্ষিণ করিয়া দয়াদেবীর মাথার বালিশের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার বুকের ভিতরকার ধড়াস ধড়াস শব্দে দয়াদেবী এখনি চমকিত হইয়া চাহিবেন; কিন্তু দয়াদেবী তখনও চোখ মেলিলেন না; তাঁহার মুখের দিকে দেখিয়া-দেখিয়া রাজবালা একবার ঠোঁট চাটিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া ধীরে ডাকিল—দিদি! তবু দয়াদেবী চোখ মেলিলেন না; তখন আবার এদিক ওদিক চাহিয়া রাজবালা অতি সন্তর্পণে দয়াদেবীর মাথার বালিশের তলা হইতে বীরেন্দ্রের চিঠিখানি টানিয়া বাহির করিল, তারপর সেখানিকে মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া একবার দয়াদেবীর দিকে একবার ঘরের দরজার দিকে তাকাইয়া খাটের পাশে বসিয়া পড়িল। তখন তাহার বুকের মধ্যে এমনি ঢিপ ঢিপ শব্দ করিতেছিল আর তাহার চোখ মুখ দিয়া এমন আগুন ছুটিতেছিল যে সে খানিকক্ষণ চিঠিখানা কোলের উপর মুঠি করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। একটু দম লইয়া সে আস্তে-আস্তে খাম হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিল, বীরেন দয়া-দেবীকে লিখিয়াছে—

মা,

আপনার আশীর্ব্বাদে আমি পাশ হব, এগজামিন ভালোই দিয়েছি। আপনার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আপনার সেবা করবার সৌভাগ্য আমার আর হবে না। এই দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা পাচ্ছি এই ভেবে যে আমি না থাকলেও আপনার শুশ্রূষার ক্রটি ও অভাব হচ্ছে না। মায়াদের আমার কথা বলবেন; নাকে দের আমি কখনো ভুলতে পারব না। আমি জেলায় রেহাই পাবে খানে ওকালতী করবার জোগাড় এখন থেকেই পঞ্চানন মার সেখানে থাকলে আপনাদের খবর প্রায়ই বলিয়া উঠিয়া কাছ। মায়াদের বিয়ে হলে আমাকে খবর দেবেন, গুণময় নিষ্ফল দী গিয়ে মায়াকে দেখে আসব।

তলে হাত রাখিয়া কন্ধ আপনার স্নেহের ছেলে বীরেন।

ড়তে-পড়িতে রাজবালার ঠোঁট কাঁপিয়া- সে জোর করিয়া কান্না থামাইয়া বারবার সেই চিঠিখানি পড়িল। চিঠির মধ্যে কোথাও একটি বারও তাহার নাম নাই; এই অনুল্লেখই রাজ-বালাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিল সে বীরেন্দ্রের মনের কোন্ জায়গাটি অধিকার করিয়া আছে;—বীরেন যে লিখিয়াছে "এই দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা পাচ্ছি এই ভেবে যে আমি না থাকলেও আপনার শুশ্রূষার ক্রটি ও অভাব হচ্ছে না," সে কাহার কথা ভাবিয়া? "মায়াদের" "তাদের" প্রভৃতি বহুবচনে মায়ার সঙ্গে আর কাহার নাম বীরেন্দ্রের মনে জাগিয়াছিল? তাহা বুঝিতে রাজবালার বাকী থাকিল না। কিন্তু তবুও তাহার অভিমানে ঠোঁট ফুলিতেছিল এই ভাবিয়া যে সে একটিবারও তাহার নাম করিল না!

অনেক কষ্টে সে আপনাকে সামলাইয়া চিঠিখানি খামে ভরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; দেখিল দয়াদেবী তখনও চোখ মুদিয়া তেমনি শুইয়া আছেন। রাজবালা আস্তে-আস্তে চিঠিখানি বালিশের তলায় রাখিবে বলিয়া বাঁ হাতে বালিশের একটা কোণ যেই একটু উঁচু করিয়া ধরিয়াছে অমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দয়াদেবী বলিলেন—চিঠিখানা তোর কাছেই রেখে দে, তুইই একটা জবাব লিখে দিস, আমি মোহিনীকে দিয়ে চুপিচুপি ডাকে ফেলিয়ে দেওয়াব।

দয়াদেবী কথা বলিতেই রাজবালা ভয় পাইয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিল; তারপর যখন দেখিল যে তাহার চুরি ধরা পড়িয়া গেছে ও তাহার দিদি তাহার অন্তরের পরিচয় পাইয়া তাহার দুঃখে মমতা দেখাইতেছেন, তখন লজ্জায় দুঃখে ও সুখে অভিভূত হইয়া রাজবালা মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দয়াদেবীর মাথার বালিশের পাশে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়াদেবী তাহার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

এমন সময় মায়া ঘরে আসিয়া দেখিল তাহার মাসী তখনো কাঁদিতেছে। দয়াদেবী পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহার দিকে ফিরিতেই মায়া ছুটিয়া মায়ের কাছে আসিয়া বলিল—মা, বীরেনদাদাকে ফিরিয়ে আনো। বীরেনদাদার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে,—বলিতে-বলিতে সেও কাঁদিয়া ফেলিল। দয়াদেবীরও চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

(২৪)

আজ সাঁড়াশিয়া গ্রামের হাটবার। হাটে তেমন লোক জমে নাই। কাহার ঘরে কি আছে যে বিক্রয় করিতে আনিবে, কাহার ঘরে কি সঙ্গতি আছে যে তাহা দিয়া দিন গুজরানের জিনিসই কিনিতে আসিবে? দেশে যে ভয়ানক অজন্মা, অভাব যে ঘরে ঘরে, দুর্ভিক্ষ যে কঙ্কাল-মূর্ত্তিতে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতেছে। যে অল্প কয়েকজন লোক হাটে আসিয়াছে তাহাদের কেহ বা বলদ গরু হাল লাঙ্গল পর্য্যন্ত বেচিতে আসিয়াছে, কেহ বা পাট প্রভৃতি যাহা খাদ্য নয় তাহা বেচিয়া দুটি চাল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে, আর কেহ বা কাচ্চাবাচ্চার শুকনো মুখে চোখের জল দেখিতে না পারিয়া ধারে কিছু খাবার সংগ্রহ করিতে পারে কি না দেখিবার জন্য হাটময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিড় বাড়াইতেছে।

হাটখোলার ঠিক মাঝখানে রক্ষাকালীর ছোট্ট একটি মন্দির। সেই মন্দিরের দালানের নীচে রকে দাঁড়াইয়া পতিত হাড়ি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ভাইসব, তোমরা শোনো......

হাট হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল; পরক্ষণেই দ্বিগুণ কলরব উঠিল—চুপ্ চুপ্, পতিত মণ্ডল কি বলছে শোন্......আঃ গোলমাল করিস কেন ·······একটু থাম না......চ চ এগিয়ে চ, কি বলছে শুনি......

মিনিট পনর পরে কোলাহল একটু ক্ষান্ত হইলে পতিত আবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—ভাইসব, তোমরা শোনো। দেশে অজন্মা আকাল হয়েছে, আমরা মরতে বসেছি। এখন এর ওপর জমিদার বাজে-আদায় কোরে অত্যাচার করতে চাচ্ছে; প্রাণ যখন যেতেই বসেছে তখন এস আমরা মরদের মতন মরি, এই মা-কালীর থান ছুঁয়ে দিব্যি করি, আমরা কিছুতেই জমিদারের ন্যায্য পাওনা ছাড়া এক পয়সাও উপরি বেশী দেবো না, প্রাণ গেলেও না।......

জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠিয়া ক্রমে কলরব বাড়িতে লাগিল—পতে মোড়ল ক্ষেপেছে নাকি?···বলা সোজা, ন্যাওধরা কি অমনি কথার কথা!...,...বাবা! জমিদারের সঙ্গে কাজিয়ে! সর্ব্বরক্ষে! কি বুকের পাটা রে!.....

পতিত হাড়ি দুই হাত উঁচু করিয়া সকলকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া আবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—ভাইসব, আমার কথা কটা শেষ করতে দাও। জমিদার ত জমি সৃষ্টি করেনি, জমিদার ত জমির চাষ আবাদ করে না, তবে জমির মালিক সে কিসে? আমরা মাটি চষি, মাটি মাখি, মাটি-মায়ের বুকের দুধে আমাদেরই হকের দাবী! জমিদার আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি করে, আর আমরা হা অন্ন জো অন্ন কোরে মরি। কিন্তু রাজার আইন যখন জমিদারকেই জমির মালিক করেছে, নাচার আমরা জমিদারকে তার ন্যায্য পাওনাটুকুই দেবো, তার বেশী এক কড়া না। তোমরা দিব্যি করতে রাজি আছ?......

পতিত চুপ করিল। জনতার মধ্যে আবার গুঞ্জন কলরবে ও কলরব কোলাহলে পরিণত হইল।—মোড়লের পোঁ কথাগুলো বলছে ত ঠিক, কিন্তু··· আরে পেটে নেই ভাত, লড়ব কিসের জোরে?... হ্যাঃ অমন গোলাভরা ধান আর সিন্দুকভরা টাকা থাকলে আমরাই কি জমিদারকে ডরাতাম নাকি?......

পতিত আবার ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত লোকের মধ্যে কি একজনও নেই যে সাহস কোরে বলতে পারে 'না, অন্যায় জুলুম বরদাস্ত করব না!'...আমি তবে একলাই দাঁড়ালাম জমিদারের বিপক্ষে—না, আমি একলা নই, আমরা চারজন,—আমার বুড়ো মা, আমার বিধবা বোন, আর আমার স্ত্রী—তারাও এসেছে, মাকালীর মন্দির ছুঁয়ে দিব্যি করছে, প্রাণ দেবে তবু দেশের লোকের ওপর অত্যাচার হতে দেবে না, জমিদারের অন্যায় হুকুম শুনবে না, মানবে না।......

সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দালানের এক পাশে তিনজন স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জনতার মধ্যে মহা কোলাহল উঠিল—আমরাও ত দিব্যি করতে পারি, কিন্তু আমরা জেলে গেলে কাচ্চাবাচ্চা খাবে কি, দাঁড়াবে কোথায়? মেয়েলোকদের বে-ইজ্জত করতে এলে তাদের রক্ষে করবে কে?......

জনতা ভেদ করিয়া কালীর মন্দিরের রোয়াকের উপর হাত রাখিয়া কাৎলামারী গ্রামের শশী জেলে মোটা গলায়

চীৎকার করিয়া উঠিল—মা-কালীর দিব্যি মোড়লের পো, আমি তোমার দিকে, আমার সাত ছেলে, আট ভাইপো, সবাই তারা লাঠি ধরতে পারে।

শশী জেলে তাহার প্রকাণ্ড কালো দেহটা সোজা খাড়া করিয়া সিংহের কেশরের মতন ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল যখন মাথা ঝাড়া দিয়া ফুলাইয়া তুলিল, তখন সমস্ত জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় কালীমাঈকী জয়!

সেই কোলাহল থামিতে-না-থামিতে থাকো তাঁতিনী মুখের উপর একটু ঘোমটা টানিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া মন্দিরের রোয়াকে মাথা ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ মিহি স্বরে বলিল—আমার সোয়ামীকে পেঁচো বামনা বীরেন রায়ের নামে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলেছিল; তিনি রাজি না হওয়াতে তানার বুকে বাঁশ দিয়ে দলেছিল; সেই থেকে মুখে রক্ত উঠে তানার পেরাণডা গেল; সেইদিন সোয়ামীর চিতার কাছে দাঁড়িয়ে আমার ছেলে ক্যাবলার মাথায় হাত দিয়ে আমি দিব্যি করেছিলাম পেঁচো বামনার রক্তদর্শন করবই করব। মা-কালী আজ রক্ত চাইছেন, সে রক্ত আমি এনে দেবো।

জনতা আবার ক্ষিপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় কালীমাঈকী জয়!......মার মার পেঁচো পাজীকে মার! সেই শালাই ত যত নষ্টের গোড়া!......চল্ জমিদার-বাড়ী লুট করি, জমিদারের মায়ের ছেরাদ্দের সঙ্গে জমিদারেরও ছেরাদ্দের জোগাড় করে দিয়ে আসি, আমাদের খালি পেটে দুটো ভালো মন্দ জিনিসও পড়বে!......

দেখিতে দেখিতে কত মেয়ে পুরুষ যে কালী-মন্দিরের রোয়াক ছুঁইয়া শপথ করিয়া পতিতকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল তাহার আর ঠিকানা থাকিল না।

পতিত আবার দুই হাত তুলিয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—দেখ ভাই, আমরা অন্যায়ের প্রতিকার করতে চাই, অন্যায় আমরা করব না। আঘাত বাঁচাব, আঘাত করব না; রক্ত যদি পড়ে, আগে আমাদেরই পড়বে; আমরা শুধু অত্যাচারে বাধা দেবো, অত্যাচার প্রাণ গেলেও করব না। খালি পেট ভরাবেন মা অন্নপূর্ণার বেশে মা কালীই! অন্যায় করলে রক্ষাকালী কাউকে রক্ষা করেন না। যারা অন্যায় কাজে বাধা দেবে কিন্তু অন্যায় করবে না, তারা সব আমার ভাইবোন; আমার গোলায় যা মজুদ আছে তাতে তাদের সকলের সমান ভাগ, আমার যা পুঁজিপাটা আছে তাতেও তাদের সমান অধিকার—মা-কালী সাক্ষী, আমার যা কিছু মজুত আছে তা আমার একলার নয়, তা তোমাদের সকলকার!......

হাটখোলা ভরিয়া উচ্চরোল উঠিল—জয় কালীমাঈকী জয়! জয় পতিত মোড়লের জয়!

দেখিতে দেখিতে হাটের সকল লোকই পতিতের পক্ষ হইয়া গেল; যে শুষ্ক মুখে সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়াও নিজের কাচ্চাবাচ্চার মুখে দিবার মতন কিছুই জোগাড় করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারও মুখ আনন্দে আশায় উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাট ভাঙিয়া সকলে দল বাঁধিয়া পতিতের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গেল—পতিত আজ আর অস্পৃশ্য হাড়ি নয়, সে আজ অন্নদাতা পরিত্রাতা।

(২৫)

রাত পোহাইতে-না-পোহাইতে এই খবর দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—সমস্ত দেশে উৎসাহের বিদ্রোহের আগুন ধরিয়া উঠিল; একটা সামান্য লোক অন্যায় প্রতিকারের জন্য সমস্ত স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া প্রবল দুঃখ ও নির্য্যাতনের ক্লেশ সহ্য করিতে দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া দেশের সকল নরনারী ইতরভদ্র সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল; অন্যায়ে উৎপীড়িত হইয়া সকলকার অন্তরের সঞ্চিত অসন্তোষ জড়তাবশে সুপ্ত হইয়া ছিল, একজনের চেতনার সাড়া পাইয়া সর্ব্বত্র চেতনা সঞ্চারিত হইয়া পড়িল।

কথাটা শুনিয়া পঞ্চানন মুচকি হাসিল। গুণময় শঙ্কিত হইয়া পঞ্চাননকে ও হৃদয়েশ্বর দারোগাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পঞ্চানন আসিতেই গুণময় শুষ্ক মুখে ভীত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি হচ্ছে পাঁচুদা?

পঞ্চানন তাহার লম্বা নাক সিঁটকাইয়া তাচ্ছিল্য দেখাইয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে!' মরণ ঘনিয়ে এসেছে—ওদের যথাসর্ব্বস্ব আমাদের দিয়ে ওরা মরবে, তারই জোগাড় করছে।

পঞ্চাননের পরম নিশ্চিন্ত অবজ্ঞার ভাব দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া গুণময় বলিলেন—তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা দাদা, দেখো যেন কোনো ফ্যাসাদে না পড়তে হয়।

পঞ্চানন আশ্বাস দিয়া বলিল—সে তোমাকে ভাবতে হবে না ভায়া। পাঁচশো লোক আমাদের জমিদারী থেকে উঠে যাবে বোলে রসময় বাবুর কাছে দরখাস্ত করেছিল, তার মধ্যে তেইশ জনের কাছ থেকে একশো টাকা কোরে জরিমানা আদায় হয়ে গেছে; ছত্রিশ জন অর্দ্ধেক দিয়ে কিস্তিবন্দি করেছে; একুশো উনচল্লিশ জন একশো টাকার তমস্থক লিখে দিয়ে গেছে; বাকী কজন পতে হাড়ির পাল্লায় পোড়ে এখনো মাথা ঘোরাচ্ছে বটে, কিন্তু পালের গোদাটাকে ঘায়েল করতে পারলে সব বেটাই কাবু হয়ে পড়বে।

গুণময় পঞ্চাননের কর্ম্মকুশলতায় খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—পতেটাকে ঘায়েল করবার কি মতলব করেছ?

পঞ্চানন বলিল—মতলব ঠিক হয়ে আছে ভায়া, কেবল কর্ত্তামায়ের শ্রাদ্ধটা মিটে গেলেই হয়। পতের দলের সঙ্গে গোটা দুই দাঙ্গা বাধাতে হবে; তাইতে ওদের দলের দুএকটা জখম হবে, পাঁচসাতটাকে জেলে পাঠাবো, তখন বাকীগুলো ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে সুড়সুড় করে ছুটে এসে আপনা থেকেই পায়ে পড়বে। কিন্তু তার আগে হংসেশ্বর দারোগাকে হাত করতে হবে।

গুণময় বলিলেন—আমি ওকেও ডাকিয়ে পাঠিয়েছি; এলে তুমিই তার একটা ব্যবস্থা করে ফেলো......

হংসেশ্বর দারোগা ঘরে ঢুকিয়া খুব নত হইয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই পঞ্চানন কুকুরের মতন লম্বা লম্বা শাদা শাদা দাঁত বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে দারোগা-বাবু, নাম করতেই এসেছেন, আপনি অনেকদিন বাঁচবেন।

গুণময় তাঁহার বাঁধানো দাঁত দুপাটি বাহির করিয়া বলিলেন—আসতে আজ্ঞে হোক, আসতে আজ্ঞে হোক।... ওরে চতুর, দারোগা-বাবুকে তামাক দিয়ে যা।

হংসেশ্বরের চেহারাটি ঠিক্ উটের মতন—পা দুখানা ধড়ের তুলনায় অতিরিক্ত লম্বা, হাত দুখানি নলি-নলি, পেটটি ডাগর, মাথাটী ছোট, কান দুটো খুব লম্বা, গলাটা কাস্তের মত বাঁকা ও মস্ত একটা কণ্ঠা ওঠা; রংটি মেটে —না কালো, না ধলো; চোখ দুটো ড্যাবা-ড্যাবা গোল-গোল, গাঁজাখোরের মতন লাল; নাকটা খাঁদা; তার নীচে প্রকাণ্ড পুরু ঠোঁটের উপর একজোড়া বিপুল গোঁপ; সম্প্রতি তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে বলিয়া ক্ষৌরী করা হয় নাই, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজাইয়াছে, বয়স তাহার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর।

হংসেশ্বর ফরাসে বসিয়া গড়গড়ার শটকা নল হাতে লইয়া বলিল—আজকাল যত সব ছোটলোকের বড় বাড় বেড়েছে। পতিত হাড়ি বোলে আপনার একটা প্রজা কাল সাঁড়াশিয়ার হাটে নাকি সকলকে খুব ক্ষেপিয়েছে। আজ সকালেই এসেছিল থানায় এত্তেলা করতে যে জমিদারের তরফ থেকে আমাদের ওপর জুলুম হবার সম্ভাবনা আছে, পুলিশের আশ্রয় চাই। আমি বেটাকে খুব কোরে ধমকে কড়কে দিয়েছি যে সে বেশী ট্যাঁফোঁ করলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা বোলে তাদেরই ধোরে ধোরে চালান দেবো আর আদালতে মুচলেকা লিখে দিয়ে তবে ছাড়ান পাবে।

হংসেশ্বরের কথা শুনিয়া ও অযাচিত ভাবে তাহাকে নিজেদের পক্ষে পাইয়া গুণময় ও পঞ্চানন খুসী হইয়া গেল। গুণময় চোখ টিপিয়া পঞ্চাননকে ইসারা করিলেন—এই সুযোগে তুমি কথাটা পাড়িয়া ফ্যালো। পঞ্চানন ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল না, সে গম্ভীরভাবে বলিল—আপনি ভদ্র-লোক, ভদ্রলোকের মতন কাজই করেছেন। বেটা ছোটলোক হাড়ি, একটু লেখাপড়া শিখেছে, উড়তে পারে না ফুরফুর করছে। আপনারাই হচ্ছেন দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনকর্ত্তা, আপনারা শাসন কোরে দিলে ছোট-লোকে মাথা তুলতেই সাহস করবে না।......আপনি চিরকাল ন্যায়ের পক্ষে, আমরা জানি। তাই মালিক আপনার সঙ্গে ঐ বিষয়েই একটা পরামর্শ করবেন বোলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।...পতেটাকে শাসন করবার কি উপায় করা যায় বলুন দেখি?.....

হংসেশ্বর ঘাড়-নাড়া পুতুলের মতন লম্বা গলা উপরে নীচে ঠকঠক করিয়া নাড়িয়া বলিল—কোনো একটা অছিলায় ওকে ফৌজদারীতে ফেলে দিতে পারলেই ও কাবু হয়ে যাবে।

পঞ্চানন দিব্য সপ্রতিভ ভাবেই হংসেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমরা কোনো ছুতোয়-নাতায় ওদের সঙ্গে

একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দেবো ; সেই সময় আপনি পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করে চালান দেবেন। এই উপকারের জন্যে সরকার থেকে আপনাকে পান খেতে একশো টাকা দেওয়া যাবে।

হংসেশ্বর অপ্রসন্ন মুখে হাসিয়া বলিল—আমি ত রায় মশায়ের নিমক ঢের খেয়েছি আরো খেতে পাব, আশা রাখি। কিন্তু অত অল্পে আমাদের পেট ভরবে না ভট্‌চায্যি-মশায়।

পঞ্চানন সপ্রতিভভাবে বলিল—ওটা বায়না মাত্তর, পরে আপনাকে খুসী না কোরে কি আমরা ছাড়বো।

হংসেশ্বর পাকা কাজের-লোকের মতন বলিল—সেইটে এখনই ঠিক হয়ে যাওয়া ভালো—কি বলেন আপনি রায় মশায়।

গুণময় টাকা খরচের সম্ভাবনায় কাতর হইয়া কেবল মাথা নাড়িতে লাগিলেন। পঞ্চানন বলিল—তা আপনার স্ত্রীর শ্রাদ্ধ আর আপনার বিয়ের খরচের জন্যে বাবু আপনাকে পাঁচশো টাকা দেবেন।

হংসেশ্বর খুসী হইয়া বলিল—আর জমাদার, রাইটার, আর কনেষ্টবল চৌকীদারদের? তাদেরও ত কিছু দেওয়া উচিত।—সেও পাঁচশো ধোরে রাখুন।

গুণময় আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—পাঁচশো!

হংসেশ্বর বলিল—আজ্ঞে পাঁচশোর কমে হবে না, ভাগ হলে ফি-জনে কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশী পড়বে না।

গুণময় পঞ্চাননের মুখের দিকে চাহিলেন। পঞ্চানন হংসেশ্বরকে বলিল—আচ্ছা পাঁচশোই দেবো, কিন্তু আপনাদের খুব হুঁসিয়ার হয়ে গোড়া বেঁধে কাজ করতে হবে।

হংসেশ্বর খুসী হইয়া বলিল—সে আর বলতে হবে কেন?......তা দেখুন, জমাদারদের পাঁচশো টাকাটাও আমার হাতেই দেবেন।......পাঁচশো আগাম, চালান হয়ে গেলে বাকী পাঁচশো আমি হাতে চাই।

পঞ্চানন বলিল—যে আজ্ঞে, কর্ত্তামায়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে আপনি কোনো দিন কাছারীতে একবার যদি অনুগ্রহ করে আসেন প্রথম কিস্তির টাকাটা দিয়ে দেবো। বলেন ত আমিই দিয়ে আসবো।—

—আপনাকে আর কষ্ট কোরে যেতে হবে না, আমিই আসব—বলিয়া হংসেশ্বর প্রসন্ন হইয়া চলিয়া গেল।

গুণময় বলিলেন—এতটা টাকা খরচ!

পঞ্চানন বলিল—ভয় কি ভায়া, ঐ পতে মোড়লের বাড়ী লুটেই সব টাকাটা উসুল করে নেবো।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদর্শ গ্রাম

প্রজা-বৎসল রাজার উদ্যোগে প্রজার ও দেশের যে কতখানি উন্নতি হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বড়োদা-রাজ্যের যে-কোনো বিভাগে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে গ্রামে-গ্রামে যেমন ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত পাঠশালা লাইব্রেরী হইয়াছে তেমন ব্রিটিশ ভারতের কুত্রাপি হয় নাই। সেখানে বাল্যবিবাহ আইন করিয়া নিবারণ ও বিধবাবিবাহ আইনের দ্বারা সমর্থন করিয়া প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। সেখানে মূর্খ গুরুপুরোহিত যে 'দক্ষিণায়-পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্ব্বাদ' করিয়া ভুল মন্ত্র পড়িয়া চালকলানৈবেদ্য বাঁধিয়া চম্পট দিবেন তাহারও জো নাই, যাহারা গুরুপুরোহিতের ব্যবসায় করিবে তাহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহারা তাহার যোগ্য; তাহার জন্য পরীক্ষা পাশ করিয়া উপাধি ও সার্টিফিকেট পাইবার ব্যবস্থা আইন করিয়া স্থির হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে অমনি বিনা বেতনে সকল ছেলেমেয়েকে বাধ্য করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা দিবার আইন পাশ করাইবার চেষ্টা গোখলে করিয়াছিলেন, গভর্মেণ্টের প্রতিকূলতায় সফল হইল না; অথচ সম্প্রতি পার্লামেণ্টে ডাঃ ফিশার ফাঁকা ওজর করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে যুদ্ধের জন্য টাকার অভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইতেছে না; যুদ্ধ যেন আজ চার বৎসর চলিতেছে, কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের বয়স ত হইয়াছে ১৫০ বৎসর; এতকাল কি বাধা ছিল? কিন্তু বড়োদায় বর্ত্তমান রাজার রাজত্ব-কালেই ছেলেমেয়েদের বিনাবেতনে সকলকে বাধ্য করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। এইখানে

আমরা বিদেশী বিরুদ্ধস্বার্থের লোকের হাতে ক্ষমতা থাকা ও সমস্বার্থের স্বদেশীর হাতে ক্ষমতা থাকার পার্থক্য বুঝিতে পারি; এবং এই কারণেই আমরা এমন আগ্রহ ও জোর দেখাইয়া হোমরুল বা স্বয়ম্প্রভুতা দাবী করিতেছি। ব্রিটিশ ভারতে হিন্দুর অসবর্ণ বিবাহ এখন অসিদ্ধ; তাহা সিদ্ধ বলিয়া মান্য করাইবার জন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এক বিবাহ-আইন পাশ করাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু গভর্মেণ্টের উদাসীনতা বা প্রতিকূলতায় তাহা হইল না। বড়োদায় কিন্তু এরূপ আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বাংলাদেশের, পল্লীগ্রামগুলি নানা কারণে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে; তাহার প্রতিকারের জন্য বারবার আন্দোলন করাতে মাঝে মাঝে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের তরফ হইতে এক-একটা কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। লোকে আশ্বস্ত হইয়াছে এইবার কাজ হইবে। ফলে আন্দোলন থামিয়া গিয়াছে, কমিশনের রিপোর্ট সরকারী দপ্তরে বস্তাবন্দী পচিতে লাগিল, গ্রামগুলি যে তিমিরে সেই তিমিরেই এখন পর্য্যন্ত আছে। যে টাকাটা কমিশন নিয়োগে খরচ হয় তাহা খরচ করিলে অন্তত একটা গ্রামও ত ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইতে পারিত? ওদিকে বড়োদায় গ্রামগুলি দিনে-দিনে শহরের মতন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হইয়া বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে।

এইরূপ একটি গ্রামের পরিচয় ও বিবরণ দেওয়া যাইতেছে:—

বড়োদা-রাজ্যের বড়োদা জেলায় পেটা-মহলের অন্তর্গত ভদ্রন গ্রাম। ইহা অতি প্রাচীন জনপদ। কিম্বদন্তী এই যে ১২৩২ সম্বতের ১১ই সুদি বৈশাখ তারিখে ইহার পত্তন হয়। এখন ১৭৭৫ সংবৎ। সুতরাং ঐ গ্রামের বয়স ৫৪৩ বৎসর। গ্রামদেবতা ভদ্রকালীর নাম হইতে গ্রামের নাম ভদ্রন হইয়াছে। ভদ্রকালীর প্রাচীন দেউল এখনো গ্রামে বর্ত্তমান। ১৯১১ সালের লোকগণনায় স্থির হয় এই গ্রামে ১৪১৮ ঘর লোকের বাস, লোকের সংখ্যা ৪৮২৪, তার মধ্যে পুরুষ ২৭৪২, ও মেয়ে ২০৮১ জন। অধিবাসীদের ধর্ম্ম অনুসারে সংখ্যা ৪৪৩০ হিন্দু, ২৬৫ মুসলমান, ১২৮ জৈন। হিন্দু অধিবাসীরা প্রায় সকলেই পাটিদার বা কৃষক; তাহারা পুরুষানুক্রমে চাষবাস ক্ষেতখামারের কাজই করে। এই গ্রাম লোকসংখ্যায় হিসাবে বাংলাদেশের অনেক নামজাদা গ্রামের চেয়ে ছোট। রাণাঘাট, শান্তিপুর, তমলুক, ঘাটাল, সোণামুখী, বিষ্ণুপুর, কালনা, কাটোয়া, নাটোর, আরামবাগ প্রভৃতি গ্রামের লোকসংখ্যা ভদ্রনের দ্বিগুণ তিনগুণ। ভদ্রনের লোকসংখ্যার চেয়ে অল্প বেশী অথবা কাছাকাছি লোকসংখ্যার কতকগুলি গ্রামের নাম সেন্সস রিপোর্ট হইতে তুলিয়া দিতেছি। দাঁইহাট (বর্দ্ধমান), ক্ষীরপাই (মেদিনীপুর), বাঁশবেড়ে (হুগলি), বারুইপুর (২৪ পরগণা), গোবরডাঙ্গা (২৪ পরগণা), টাকী (২৪ পরগণা), কুষ্টিয়া (নদীয়া), বীরনগর (নদীয়া), চাকদহ (নদীয়া), মহেশপুর (যশোর), দেবহাটা (খুলনা), সৈদপুর (রঙ্গপুর), শেরপুর (বগুড়া), মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ), ঝালোকাঠি (বরিশাল), পটুয়াখালি (বরিশাল), সুধারাম (নোয়াখালি), ঝালদা (মানভূম), রঘুনাথপুর (মানভূম), ইত্যাদি। এই সমস্ত গ্রামের অবস্থার সহিত ভদ্রনের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে আমরা কিরূপ দুর্দ্দশায় কালযাপন করিতেছি এবং গ্রামবাসীরা চেষ্টা করিলে ও গভর্মেণ্টের সাহায্য ও সমর্থন পাইলে দেশটাকে কিরূপ উন্নত করা যায়। উপরে লিখিত অনেক গ্রামে ধনী জমিদারের বাস আছে,—যেমন, নাটোর, মুক্তাগাছা—অনেক গ্রাম ব্যবসার কেন্দ্র ও বন্দর—যেমন, ঝালোকাঠি কুষ্টিয়া; কিন্তু সে সব গ্রামেরই বা অবস্থা এমন শোচনীয় কেন? তাহার কারণ গ্রামবাসীদের উদাসীনতা নিশ্চেষ্টতা ও গভর্মেণ্টের দরদ ও দায়িত্বের অভাব। যে গ্রামের অধিকাংশ লোকই চাষা, সে গ্রামে বিনা বেতনে বাধ্য করিয়া সকল ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর ফলে ২০ বৎসরের মধ্যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে দেখা যাক।

লাইব্রেরী।

ভদ্রনের প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত দলের যুবকেরা ১৮৯৫ সালে গ্রামে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে; ইহাই গ্রামে লোকশিক্ষার প্রথম ও পুরাতনতম ফল। এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় ৬০০০ টাকা খরচ হয়; ৩০০০ টাকা গ্রাম হইতে চাঁদা উঠে, বাকী ৩০০০ টাকা ঋণ করা হয়। সেই ঋণ

শুভকর্ম্ম উপলক্ষে গ্রামবাসীর নিকট হইতে গ্রামভাটা আদায় করিয়া ও আজীবন-সদস্যদের চাঁদা ও দান হইতে ক্রমে ক্রমে শোধ করা হয়। এই লাইব্রেরী প্রথমতঃ মেয়ে-পুরুষ উভয়ের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের পাঠে স্পৃহা বাড়িয়া চলিল; সুতরাং ১৯১২ সালে তাহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইল—তাহার নাম 'মহিলা পুস্তকালয়'। এই পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠাতেও ৬০০০ টাকা খরচ পড়ে; তাহার মধ্যে ২০০০ টাকা গায়কবাড় মহারাজার গভর্মেণ্ট হইতে সাহায্য পাওয়া যায়, বাকী চার হাজার গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করে। এ বৎসর একটি 'বাল-পুস্তকালয়' প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, যেখানে গ্রামের শিশু ছেলেমেয়েরা গিয়া পড়াশুনা করিবে। ইহা বোম্বাইএর শ্রীযুক্ত মগনলাল দলপৎরাম খাখার মহাশয়ের অনুগ্রহে হইয়াছে; তিনি ভদ্রনের অধিবাসীদের শিক্ষালাভে আগ্রহ ও তাহাদের আত্মোন্নতির চেষ্টার সঙ্গে আত্মনির্ভরতা দেখিয়া তাঁহার পিতার সংগৃহীত বহুমূল্য শিশুপাঠ্য পুস্তকের ভাণ্ডার ঐ গ্রামকে দান করিয়াছেন।

স্কুল।

বড়োদা-গবর্মেণ্ট এই গ্রামে একটি ছেলে-স্কুল ও একটি মেয়ে-স্কুল করিয়াছেন। ছেলে-স্কুলের বাড়ীটিও গভর্মেণ্টের খরচে হইয়াছে; কিন্তু মেয়ে-স্কুলের জন্য গভর্মেণ্ট ১৪ হাজার টাকা মাত্র দিলে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রামের মাতব্বর অধিবাসীর মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত তুলসীভাই বাকরভাই ১০ হাজার টাকা দান করেন, এবং গ্রামবাসীরা চাঁদা করিয়া ৬ হাজার টাকা তুলে। এই ত্রিশ হাজার টাকায় মেয়ে-স্কুলের বাড়ী হইয়াছে। অবনত ও অনুন্নত জাতিদের ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক একটি স্কুল ও তাহার নিজের বাড়ী আছে। ১৯০৬ সালে কয়েকজন গ্রামমুখ্যের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষার প্রথম দুই শ্রেণী খোলা হয়; গভর্মেণ্ট ইহার জন্য মাসে ২৫ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। প্রত্যেক বৎসর গ্রামমুখ্যেরা একটি-একটি করিয়া শ্রেণী বাড়াইয়া বাড়াইয়া ১৯০৯ সালে ইহাকে একটি মাইনর স্কুলে পরিণত করিয়া তুলেন; তখন গভর্মেণ্ট উহা চালাইবার সম্পূর্ণ ভার লন। তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চেষ্টা স্থগিত না করিয়া গ্রাম-মুখ্যেরা একটি স্বতন্ত্র ৫ম মানের শ্রেণী খুলিলেন। তাহা দেখিয়া গভর্মেণ্ট গ্রামবাসীদের উচ্চশিক্ষা পাইবার আগ্রহে সন্তুষ্ট হইয়া মাইনর স্কুলেই ৫ম মানের একটি উচ্চ শ্রেণী যোগ করিলেন। লোকেরা তারপর একটি আলাদা ষষ্ঠ মানের উচ্চতর শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গভর্মেণ্টের কাছে প্রস্তাব করিলেন যে যদি গভর্মেণ্ট ঐ শ্রেণীটিরও খরচের ভার লন, তবে গ্রামিকেরা একটি ম্যাট্রিকুলেশন-ক্লাশ চালাইবার ব্যয়-ভার গ্রহণ করিবে। গভর্মেণ্টও এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মত হইলে গ্রামিকদের চেষ্টায় ১৯১১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন-ক্লাশ খোলা হইল এবং তাহাতেও বড়োদা-গভর্মেণ্ট মাসে ৬০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। এইরূপে ভদ্রনে একটি উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার স্কুল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু সেখানকার লোকেরা স্কুলটিকে পাকা ও স্থায়ী রকমে প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার পাত্র নয়। তাহারা গভর্মেণ্টের কাছে প্রস্তাব করিল যে গভর্মেণ্ট যদি মাইনর স্কুলটিকে গভর্মেণ্টের উচ্চ-ইংরেজী শিক্ষার স্কুলে পরিণত করিয়া চালান, তবে গ্রামবাসীরা ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিবে। বড়োদা-গভর্মেণ্ট গ্রামবাসীর উৎসাহ আগ্রহ ও আত্ম-নির্ভরতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া এই প্রস্তাবে অবিলম্বে সম্মত হইলেন, অধিকন্তু নিজের ব্যয়ে ৪৫ হাজার টাকা দিয়া স্কুলের বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দিলেন। একজন গ্রামিক শ্রীযুক্ত জেঠাভাই নারাণভাই তাঁহার মৃতপুত্রের নাম স্মরণীয় করিবার জন্য শম্ভুপ্রাসাদ নামে ১৫ হাজার টাকা দিয়া স্কুলের বোর্ডিং-বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ তালুকের লোক্যাল বোর্ডও ঐ পরিমাণ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

ঘড়ী-ঘর।

লালুভাই নামে একজন জৈন ব্যবসাদার একটি পর্‌বদী অর্থাৎ পাখীদের খাওয়াইবার ঘর প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০০০ টাকা খরচ করিতে সঙ্কল্প করেন। ভদ্রনের মুখ্য লোকেরা তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহারা আরো ২০০০ টাকা তুলিয়া দিবেন যদি তিনি ঐ ঘর এমন করিয়া তৈয়ার করান যাহাতে উহা ঘড়ী-ঘর ও পাখীর বাসা দুই কাজেই লাগে। লালুভাই সম্মত হইলেন। ফলে ভদ্রনের মাঝ-খানে একটি ঘড়ীঘর হইতে গ্রামবাসীরা ঘণ্টা, আধ-ঘণ্টা, পোয়া-ঘণ্টা সময়ের হিসাব-রাখা শোনে।
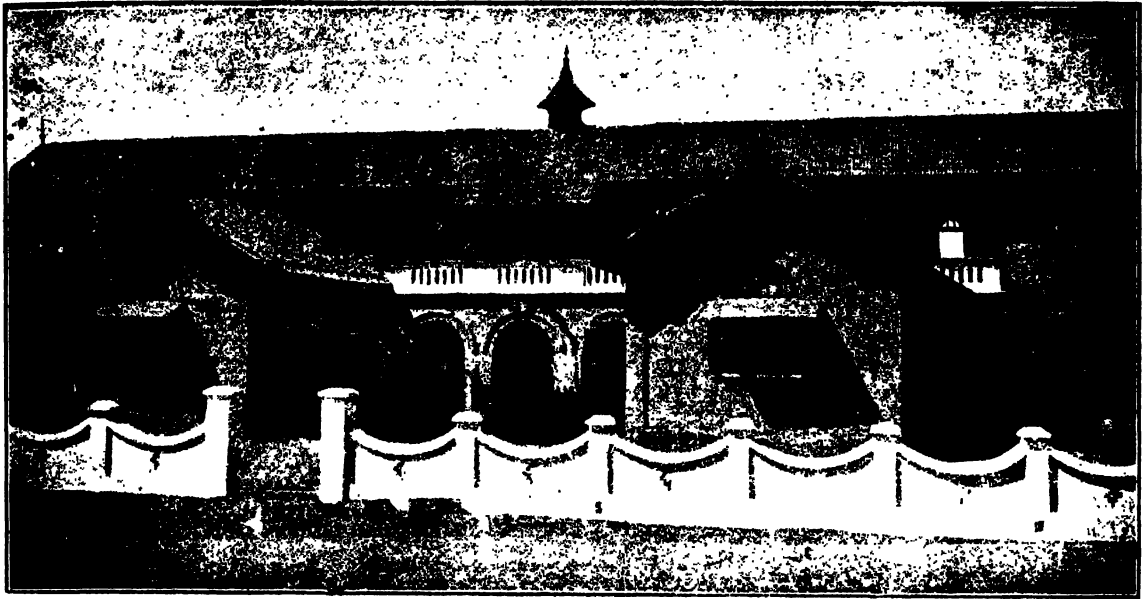
ভদ্রনের দেশীভাষা শিক্ষার ইস্কুল।

ভদ্রনের কলের জলের চৌবাচ্চা।

দেবীদর্শন।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে।

ডাক্তারখানা।

মহারাজা সয়াজীরাও গায়কবাড় তাঁহার ২০ বৎসর রাজত্ব করার উৎসব উপলক্ষ্যে, ভদ্রনের লোকদের আত্মোন্নতির চেষ্টার সঙ্গে আত্মনির্ভরতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ, তাহাদিগের জন্য একটি ডাক্তারখানা করিয়া দিতে স্বীকার করেন; তাহাও এই সর্ত্তে যে গ্রামবাসীরা ঐ অনুষ্ঠানের জন্য যত টাকা দিবে, তাঁহার গভর্মেণ্ট তত টাকা সাহায্য করিবেন। লোকেরা সাড়ে সাত হাজার টাকা সংগ্রহ করিলে সরকারী তহবিল হইতেও তত দিয়া ১৩ হাজার টাকায় ডাক্তারখানা তৈয়ার হইয়াছে।

জলের জোগান।

ভদ্রনের কূপ ইঁদারা খুব গভীর। সেই ইঁদারা হইতে জল তুলিতে স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত শ্রম ও কষ্ট করিতে হয়। তাহা দেখিয়া ভদ্রনের উন্নতিপ্রয়াসী সদা-সচেষ্ট লোকেরা স্থির করিল তাহাদের গ্রামে জলের কল করিতে হইবে। তাহারা বড়োদা-গবর্মেণ্টের নিকট এই কর্ম্মের জন্য ২৬ হাজার টাকা ঋণ পাইবার আবেদন করিল। যাহারা আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইতে চায় বড়োদার উদারহৃদয় মহারাজার দৃষ্টান্তে তাঁহার কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে ব্যগ্র। ভদ্রনের লোকেরা ২৬ হাজার টাকা ঋণ ত পাইলই, অধিকন্তু ১২ হাজার টাকা সাহায্য পাইল। এবং তাহাতে গ্রামে জল জোগাইবার জন্য কল প্রস্তুত হইয়া গেল। একটা বড় ইঁদারা খুঁড়িয়া তাহা হইতে জল পাম্প করিয়া উঁচুতে চৌবাচ্চায় ভরিয়া রাখা হয়, এবং সেখান হইতে জল নল বহিয়া লোকের ঘরে ঘরে গড়াইয়া যায়। যাহারা বাড়ীতে জলের কল লয় তাহাদিগকে বৎসরে ৯ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়; আর যাহারা সাধারণের জন্য নির্ম্মিত রাস্তার কল হইতে জল লয় তাহাদের দিতে হয় তিন টাকা। এই ট্যাক্স হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে জল জোগাইবার চলতি খরচ চলে এবং এমন পরিমাণে ঋণ শোধ হয় যে সমস্ত ঋণ ৩০ বৎসরে নিঃশেষে শোধ হইয়া যাইবে।

সাধারণের বাগান।

জলের কল হওয়াতে গ্রামের ঠিক মাঝখানে সাধারণের সঞ্চরণের জন্য একটি ছোট বাগান তৈয়ার করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই বাগানের মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারার উৎস ও কলের জলের উঁচু চৌবাচ্চা। সন্ধ্যায় সকালে গ্রামের মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সকলে এখানে বিশ্রাম ভ্রমণ পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া ফুলের গন্ধে খোলা হাওয়ায় মনটাকে প্রসন্ন প্রফুল্ল তাজা করিয়া লইবার সুবিধা পায়।

ভদ্রনের ঘড়ি-ঘর।

কৃষি-ব্যাঙ্ক।

ভদ্রনের লোকেরা 'চাষা', সুতরাং তাহাদের প্রধান আবশ্যক অনুভূত হইল একটি কৃষিব্যাঙ্কের। ১৯১১ সালে ইহার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়; দশ টাকা করিয়া ৫০০০ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৫০ হাজার টাকা তোলা হয়, তাহার অর্দ্ধেক গ্রামের লোকে কিনে ও অর্দ্ধেক কিনেন বড়োদা-গভর্মেণ্ট। ব্যাঙ্ক পরিচালনের ভার একটি পরিচালক-সমিতির হাতে আছে, তাহার নায়ক ও প্রধান হন জেলার সুবা বা কলেক্টার যখন যিনি থাকেন। এই ব্যাঙ্ক হইতে চাষীদের ও সমবায়-সমিতিদের আবশ্যক-মত টাকা ধার দেওয়া ও সাহায্য করা হয়।

কৃষি-সমিতি।

কৃষির উন্নতি করিবার জন্য সম্প্রতি একটি কৃষিসমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ সভ্যের মাত্র একটাকা দক্ষিণা দিতে হয়; ২৫ টাকা দিলেই সমিতির আজীবন সদস্য বলিয়া গণ্য হওয়া যায়। মাসে মাসে সমিতির অধিবেশন হয় ও কৃষিবিষয়ক আলোচনা হয়। ইহার আনুষঙ্গিক রূপে একটি কৃষি-মিউজিয়াম আর বীজ ও কৃষিযন্ত্রের আড়ত খুলিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। গ্রামিকদের অধ্যবসায় আগ্রহ তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তা শীঘ্রই ঐ সঙ্কল্পকে কর্ম্মে সম্পন্ন করিয়া তুলিবে।

পশুর ডাক্তারখানা।

বড়োদার গভর্মেণ্ট চাষীদের সুবিধা ও সাহায্যের জন্য একটি বদান্য নিয়ম প্রচার করেন এই যে কোনো গ্রাম যদি ব্যয়ের তৃতীয়াংশ বহন করিতে প্রস্তুত হয় তবে গভর্মেণ্ট নিজ তহবিল হইতে বাকী দুই অংশ পূরণ করিয়া দিয়া সেই গ্রামে একটি পশুচিকিৎসার ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। এই নিয়ম প্রচারের সঙ্গেসঙ্গেই সর্ব্বপ্রথম ভদ্রনের সদাউৎসাহী লোকেরা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের আবেদন মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে; শীঘ্রই ভদ্রনে চাষের বলদ গোরুর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার-খানা হইয়া যাইবে।

সাধারণ লেকচার-হল।

গ্রামে শিক্ষা ও কর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে একটি সাধারণের সম্মিলনের ও বক্তৃতা বা আলোচনার স্থানের আবশ্যকতা উপলব্ধি যেই হইল অমনি একটি সাধারণের বক্তৃতা-ঘর প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প কাজে পরিণত হইয়া উঠিল। মিউনিসিপালিটি ২৫০০৲, মহল পঞ্চায়ত ৮১০০৲, ও ডিষ্ট্রিক্ট লোক্যাল বোর্ড ৬০০০৲ টাকা চাঁদা দিয়া মোট ১৭ হাজার টাকায় লেকচার-হল নির্ম্মাণ করাইলেন; ইমারত স্থাপনের জমি গ্রামবাসীদের দান। এই হলের পাশ-কামরায় মিউনিসিপালিটি ও লোক্যাল বোর্ডের মিটিং হয়। মাঝের বড় ঘরে সাধারণের সভা হয়; বড় ঘরের একাংশে মেয়েদের সভায় যোগ দিবার সুবিধার জন্য একটি গ্যালারী আছে।

ক্লাব।

এত করিয়াও ভদ্রনের লোকেদের মন উঠে নাই। তাঁহারা দেখিলেন যে একত্র সম্মিলিত হইয়া খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব খেলা-ধূলা করিবার একটা আড্ডা না হইলে চলে না। একটা ক্লাব করা নিতান্ত দরকার, তাহা আধুনিক যুগের উন্নতির একটা অঙ্গ ও লক্ষণ। একজন গ্রামিক গ্রামহিতের জন্য ৫০০০ টাকা দিতে প্রস্তুত হইলে তাঁহার নিকট ক্লাব স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। তাঁহার সম্মতিতে তাঁহার প্রদত্ত অর্থে একটি ক্লাব-ঘর নির্ম্মিত হইতেছে।

মিউনিসিপালিটি।

এই গ্রামে মিউনিসিপালিটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার অর্দ্ধেক মেম্বর গ্রামিকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ও অর্দ্ধেক গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হয়। মিউনিসিপালিটি গ্রামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য ও নবনির্ম্মিত জলের কলের তত্ত্বাবধান করে।

লোক্যাল বোর্ড।

তালুকা লোক্যাল বোর্ডের সদর আফিসও ভদ্রনে; তাহা গ্রামের ও সমস্ত তালুকের পথ ঘাট সাঁকো পুল পুষ্করিণী কূপ ইঁদারা প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করে।

সরকারী আফিস।

ভদ্রন এইরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নত ও প্রধান স্থান হইয়া ওঠাতে সেই অঞ্চলের পেটা-মহলের সদর হইয়া পড়িয়াছে। ওখানে এখন মহলকারীর কাছারী, ফৌজদারের কাছারী, সাব-রেজিষ্ট্রারের কাছারী, পুলিসের থানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং ঐসব সরকারী কাছারী-বাড়ী নির্ম্মিত হওয়াতে গ্রামের শ্রী অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ধর্ম্মশালা।

গ্রামে বিদেশী লোক আসিলে আশ্রয় দিবার জন্য একটি ধর্ম্মশালাও নির্ম্মিত হইয়াছে।

রেল-ষ্টেসন।

এমন উন্নত গ্রাম ভদ্রন, এখানে কিন্তু রেল-ষ্টেসন নাই। এখানকার সবচেয়ে নিকট রেল-ষ্টেসন ১০ মাইল দূরে। গ্রামবাসীরা ইহার অসুবিধা বোধ করিতেছে। গ্রামমুখোরা সিমলা-পাহাড়ে রেলওয়ে বোর্ডের নিকট আবেদন করিয়াছেন

যেন প্রস্তাবিত বাসদ-কাঠানা রেল-লাইনটি ভদ্রনের গা ঘেঁষিয়া যায়। ইহাদের আগ্রহ ও ইচ্ছা যখন হইয়াছে তখন এ অভাবও অচিরেই মোচন হইয়া যাইবে।

কর্ম্মী।

এত-সব সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ২০ বৎসরের মধ্যে হইয়া ভদ্রনকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করিবার উদ্যোগের মূলে চারজন গ্রামমুখ্য প্রধান। প্রথম, শ্রীযুক্ত মোতিভাই পাটেল, তিনি বড়োদা-সরকারে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, তিনিই গ্রামের সমস্ত ইমারতের নক্সা তৈয়ার করিয়া দ্যান ও নিম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করেন। দ্বিতীয়, শ্রীযুক্ত বরজভাই বাঘজীভাই পাটেল; তিনি স্থানীয় তালুকা লোক্যাল বোর্ডের, ডিষ্ট্রিক্ট লোক্যাল বোর্ডের, মিউনিসিপালিটির মেম্বর, ও বড়োদা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রজা-নির্ব্বাচিত সদস্য। তৃতীয়, শ্রীযুক্ত তুলসীভাই বাকরভাই, জমিদার। চতুর্থ, শ্রীযুক্ত আমঠাভাই গোবিন্দভাই পাটেল, একজন স্কুলমাষ্টার। শেষোক্ত তিনজন গ্রামের মস্তিষ্ক; তাঁহারা গ্রামের অভাব ভাবিয়া নির্ণয় করেন, অভিযোগ শুনিয়া প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কার করেন, অর্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহাদের কাজে স্বেচ্ছায় ও আনন্দে সহযোগিতা করে গ্রামের প্রায় সকল লোকেই।

গ্রামিকদের কথা।

গ্রামে শিক্ষা ও বিবিধ বিষয়ের প্রচেষ্টায় লোকদের মন তাজা ও পটু হইয়া উঠিতেছে; তাহারা আপনারাই ভাবে চিন্তয় কাজ করে, জড়ের মতন নিশ্চেষ্ট হইয়া পরের মুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকে না। গ্রামের লোকেরা ক্রমে শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। একজন গ্রামিক লণ্ডনের এম-ডি পরীক্ষায় পাশ হইয়া ডাক্তার হইয়াছেন; তিনি মহারাজের প্রদত্ত বৃত্তি লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। অপর একজন ম্যাঞ্চেষ্টারের ইনষ্টিটিউট অফ মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার্স সমিতির এসোসিয়েট মেম্বর বা সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গ্রামের প্রায় ডজনখানেক ছেলে বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ ও এলএল-বি পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। গ্রামের শতাধিক আণ্ডার-গ্রাজুয়েট আফ্রিকা প্রভৃতি দূর দেশে ও স্বদেশের সরকারী কাজে নিযুক্ত হইয়া বিবিধ ক্ষেত্রে যশ ও জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। একজন ছাত্র সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে গোয়ালা-ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; ভদ্রনের ন্যায় কৃষি-প্রধান গ্রামে উঁহার খুব দরকার ও কদর আছে।

শেষ কথা।

ভদ্রনের ন্যায় বড়োদায় আরো অনেক উন্নত আদর্শ গ্রাম আছে, যেমন বাসো, ধর্ম্মজ ইত্যাদি। দেশের এক জায়গায় আত্মচৈতন্য জাগ্রত হইলে সর্ব্বত্র তাহার ধাক্কা লাগে, একের দেখাদেখি দশটা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় এবং পরস্পরের প্রতিযোগিতায় কর্ম্ম বহুতর, উদ্যম প্রবলতর ও ফল উৎকৃষ্টতর হইতে থাকে। ব্রিটিশ ভারতে আমাদেরও নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার বয়স ও ইচ্ছা হওয়া উচিত; আমরা কি চিরকাল বিদেশী রাজকর্ম্মচারীদের হাত-তোলা প্রসাদ মাত্র পাইয়া নাবালকই থাকিয়া যাইব! নিশ্চয়ই নয়। ব্রিটিশপ্রজা ভারতবাসীর আত্ম-চৈতন্য প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তাই আমরা স্বয়ম্প্রভুতা বা হোমরুল চাহিতে পারিতেছি। হোমরুল বা স্বগৃহে স্বয়ম্প্রভু হইতে পারিলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা, স্থানীয় ব্যবস্থা, সমস্তই আমরা নিজেরা করিতে পারিব; যার পায়ে জুতো থাকে সেই জানে কোথায় আঁট হইয়া লাগিতেছে, আমাদের নিজের হাতে ক্ষমতা থাকিলে আমরা যেখানে অভাব অসুবিধা বোধ করিব তাহার প্রতিকার আমরা নিজেরাই চটপট করিতে পারিব। বড়োদায় গ্রামগুলির ঐরূপ উন্নতি হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে চার কারণে—(১) বড়োদার মহারাজা ও প্রজারা একই দেশের লোক। (২) বড়োদার মহারাজা প্রজাবৎসল উন্নতহৃদয় উদার। (৩) রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রজাদের অধিকার আছে সুতরাং রাজকর্ম্মচারীরা প্রজাদের সমর্থন ও সন্তোষ চায়, তাহারাও দেশের লোক সুতরাং দেশের উন্নতি ও কল্যাণে তাহাদের নিজেদের সুযশ ও কল্যাণ জড়িত; প্রজা ও কর্ম্মকর্ত্তাদের স্বার্থ এক, বিরুদ্ধ নহে। (৪) প্রজারা শিক্ষালাভ করিয়া স্বাধিকার দাবী ও আদায় করিতে শিখিতেছে, পরাধীনতার গ্লানি মনের উপর চাপিয়া না থাকাতে তাহারা চিন্তাশীল উদ্যম-উদ্যোগ-পরায়ণ আত্মনির্ভর কর্ম্মপটু হইয়া উঠিতেছে। ব্রিটিশ-প্রজা

আমরাও যথাসম্ভব এইরূপ হইবার ও ব্যবস্থা করিবার জন্য হোমরুল বা স্বয়ম্প্রভুতা চাহিতেছি। বড় আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় যে কোনো কোনো দলের লোক প্রকাশ্য সভা করিয়া বলিতেছেন যে তাঁহারা স্বয়ম্প্রভুতা চাহেন না; সম্প্রতি নাকি একদল মুসলমান ও হিন্দু নমঃশূদ্রজাতি বাংলায় এই অদ্ভুত হাস্যকর কথা প্রকাশ করিয়াছেন, মান্দ্রাজে পঞ্চমা জাতি জমিদার-সম্প্রদায় ও খ্রীষ্টানেরাও এই ধুয়া ধরিয়াছেন, আগ্রা-অযোধ্যার জমিদার-তালুকদার ও একদল মুসলমানও তাহার পোঁ ধরিতেছেন। আমেরিকায় যখন ক্রীতদাসদের মুক্তি ও স্বাধীনতা দিবার কথা হয় তখন তাহারাও ভয়ানক আপত্তি ও কাঁদাকাটা করিয়াছিল; প্রভুর আস্তাবলে ঘোড়া গাধা ও খোঁয়াড়ে শূওর কুকুর যেমন কখনো চাবুকও খায় আবার সময়মত চারাটি দানাপানিও পায়, তাহাদের কোনো চেষ্টা বা কষ্ট করিতে হয় না, তেমনি নিশ্চিন্ত অন্নপান পাইয়া চাবুক লাথি খাওয়াও তাহাদের শ্লাঘ্য ও শ্রেয় মনে হইয়াছিল। আমাদেরও দশা হইয়াছে তাই; পরের হাততোলা প্রসাদ পাইয়া পরের তাবেদারী করিয়া নিজেদের উদ্যোগ আয়োজন চেষ্টা প্রয়োজন সব ভুলিয়া বসিয়াছি, তাই ভয় পাইতেছি—'বাপরে! আমরা নিজেরা কি কিছু করিতে পারি, যোগ্যতা কিছু আছে কি!' আরে মূঢ়, নাই থাকে যদি যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে না, নিজের ঘরে নিজে কর্ত্তা হইয়া বসিতে হইবে না? না, চিরকাল অপরের কানমলা খাইয়াই তবে চলিব? শূদ্ররা ভয় পাইতেছেন স্বয়ম্প্রভুতা পাইলে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য হইবে, মুসলমানেরা ভয় পাইতেছেন হিন্দুর প্রাধান্য হইবে, জমিদার ভয় পাইতেছেন প্রজার কাছে আর তাঁহাদের ট্যাঁফোঁ খাটিবে না। এ ভয় ভিত্তিহীন, স্বয়ম্প্রভুতার মূল সূত্রের বিরোধী বলিয়াই অযথা ও অসত্য। স্বয়ম্প্রভুতা মানে শ্রেণী বা জাতি বিশেষের প্রাধান্য নহে, সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থায় জাতিধর্ম্মবর্ণ-নির্ব্বিশেষে যে সকলকার সমান অধিকার; সেখানে জমিদারের প্রভুত্ব ও অত্যাচার খর্ব্ব ত করিতে হইবেই সকল প্রজাকে তাহার ন্যায়ের অধিকার পাইতে দিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড় করাইবার জন্য, শূদ্রকেও ত ব্রাহ্মণের সমান করিতে হইবেই শূদ্রকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমান অধিকার পাইতে দিবার জন্য; সেখানে ধনী দরিদ্র, অভিজাত বংশজ, উচ্চ অবনত, সকলের সমান অধিকার। সক ধর্ম্মের লোকের সমান অধিকার। তাহা যদি না হ তবে ত হোমরুলই হইবে না। অতএব এই পর সুযোগের সন্ধিক্ষণে ভুল করিয়া যাঁহারা দেশের লোকে স্বয়ম্প্রভুতা লাভের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন তাঁহারা দেশে পরম অনিষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা নিজেদেরই শত্রুতাচর করিতেছেন। আমাদের দেশের প্রত্যেক জমিদারের উচিৎ বরোদা মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের আদর্শ সম্মুখে রাখিয় নিজের নিজের জমিদারীর সমস্ত প্রজাকে শিক্ষায় দীক্ষায় চিন্তায় চরিত্রে উদ্যমে কর্ম্মপটুতায় উন্নত করিয়া তোলা তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে যে খাজনা আদায় করেন তাহা তাঁহাদের নিকট প্রজাদের গচ্ছিত ন্যাস, সে টাক বিলাসে ব্যসনে ব্যয় করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই, তাঁহারা প্রজার কর্ম্মচারী প্রতিনিধিরূপে ভদ্র স্বচ্ছলভাবে সংসারখরচের ব্যয় মাত্র সেই তহবিল হইতে পাইতে পারেন। বাকী টাকা প্রজাদের হিতের জন্য গ্রামের রাস্তা ঘাট জলাশয় বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় ও সংস্কারে ব্যয় করিলে অচিরে সমস্ত দেশের অস্বাস্থ্যপীড়িত ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত গ্রামগুলি আদর্শগ্রামে পরিণত হইবে, লোকেরা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পাইয়া অন্নসংস্থানের নব নব পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবে, সুস্থদেহে সবল মনে স্বচ্ছন্দে দুটি খাইয়া পরিয়া মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইতে পারিবে। জমিদারেরা এইরূপে সাহায্য করিলে দেশের লোকেরও আত্মনির্ভরতা ও স্বাধিকার দাবী ও আদায় করিবার ইচ্ছা হইবে; তখন ব্রিটিশ-গভর্মেণ্ট কতক লজ্জার খাতিরে, কতক দায়ে ঠেকিয়া, কতক চাপের চোটে ক্রমে ক্রমে আমাদের সমস্ত অভাব সম্পূরণ, অভিযোগ শ্রবণ ও অধিকার পুনঃপ্রদান করিতে বাধ্য হইবেন। সোনার ভারত আবার সোনার ভারত হইবে; দেশে জ্ঞান উদ্যম স্বাস্থ্য অন্ন সকলের লভ্য হইবে; ভারত আবার পৃথিবীর সকল সভ্য উন্নত স্বাধীন দেশের সমকক্ষ হইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সম্মানের অধিকারী হইবে। 'এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে!'

চ, ব।

পঞ্চশস্য

প্রকৃতির যাদুঘর—

বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পিয়াই নগর ধ্বংস হয়। বহু শতাব্দী পরে ছাই মাটি সরাইয়া নগরটিকে আবার বাহির করা হইয়াছে। এই নগরটি দেখিলে প্রাচীনকালে রোমীয় নগরগুলি কি-রকম ছিল বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেকটি জিনিস অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যেমনটি ছিল তেমনি আছে। এমন কি রাস্তায় গাড়ীর চাকার দাগ অবধি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি পম্পিয়াই নগর ছাই চাপা না পড়িত, তবে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আমরা তাহার প্রাচীন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম না। মানুষ যেমন যাদুঘরে পুরাতত্ত্বের নানা বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখে, প্রকৃতি দেবীও তেমনি নগরটিকে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

কিছুদিন হইল, প্রকৃতির এরূপ আর-একটি যাদুঘর পাওয়া গিয়াছে। এখানকার সংগ্রহ যেমন আশ্চর্য্যজনক, সংগ্রহের রীতি তদপেক্ষাও বিস্ময়সূচক। কালিফর্ণিয়া রাজ্যে সাণ্টামনিকা নামক স্থানে একদিন একটি বালক দেখিল যে মাটি হইতে পা তুলিতে পারিতেছে না। পৃথিবী যেন চুম্বকের মত তাহার পা টানিয়া ধরিতেছিল, চোরা বালিতে পড়িলে যেমন মানুষ ক্রমশঃ তাহার মধ্যে বসিয়া যায়, সে তেমনি মাটিতে বসিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে অন্য লোকজন আসিয়া পড়ায় সৌভাগ্যক্রমে বালক বাঁচিয়া গেল।

এই ঘটনায় সেদিকে লোকের দৃষ্টি পড়িল। দেখা গেল যে বালক মাটি ভাবিয়া একটা ধূলাঢাকা মেটে তৈলের ডোবায় যাইয়া পড়িয়াছিল। এই তৈল ও নানা-প্রকার গ্যাস চিমনীর মত ছিদ্র দিয়া মাটির নীচ হইতে ওঠে। নিকটে কোথাও খানাডোবা থাকিলে গড়াইয়া গিয়া তাহাতে জমা হয়। এই ডোবাগুলি মাত্র অল্প কয়েক ইঞ্চি হইতে অনেক ফুট পর্য্যন্ত চওড়া দেখা গিয়াছে। তৈল অত্যন্ত কালো ঘন ও আটালো, কিন্তু বাতাসে এবং ধূলায় উপরিভাগে একটা সর পড়িয়া যাওয়ায় তাহার স্বরূপ ঢাকিয়া গিয়াছে। এই মেটে তৈলের ডোবাগুলি বহু শতাব্দী হইতে ফাঁদের মত নানা পশু পক্ষী ধরিয়া তাহাদিগকে নিজের করাল-গহ্বরে ঠাঁই দিয়া আসিতেছে। বর্ষাকালে উহাদের উপর জল জমিয়া যায়; তখন যদি কোনো স্থলচর পশু জলপান করিতে উহার উপর যায় তবে ক্রমশঃ ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে সে অদৃশ্য হইয়া যায়। কোনো জলচর পক্ষী যদি সেখানে চরিবার দুরাশা করিয়া আসে, তবে তাহারও সেই দশা হয়। মাছরাঙ্গা প্রভৃতি পক্ষী উহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া আর উঠিতে পারে না। যেসব পক্ষী জলের খুব কাছ দিয়া ওড়ে, তাহার পা অথবা ডানা হয়ত তৈলে খুব আলগাভাবে লাগিয়া যায়, পরে ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া উহার মধ্যে আরো আঁটিয়া যায় ও সেখানেই তার শেষ হয়।

আগ্নেয়গিরির গলিত পদার্থ যেমন আস্তে আস্তে জমিয়া শক্ত হইয়া যায়, তেমনি এ তৈলও বাতাস ও বালি লাগিয়া আস্তে আস্তে শক্ত হইয়া শিলাজতুর আকার ধারণ করে। বিনষ্ট পশুপক্ষীর কঙ্কাল-গুলিও তাহার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া যায়। যে-সময় হইতে জানা গিয়াছে যে এই-সব ডোবা হাজার হাজার বৎসর কাজ করিয়া নানাজাতীয় অসংখ্য জীব নিজ কুক্ষিগত করিয়াছে, তখন হইতেই ইহারা বৈজ্ঞানিকগণের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে।

এখানে এমন অনেক জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে যাহা এখন আর পৃথিবীতে দেখা যায় না। বাঘ, সিংহ, হাতী, উট, ঘোড়া ও অন্যান্য অধুনালুপ্ত বৃহৎ জন্তুর কঙ্কাল যে পাওয়া যায় ইহা তত বিস্ময়ের কথা না হইতে পারে। কিন্তু খুব ছোট ছোট জন্তুর ভঙ্গুর কঙ্কালও যে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে ইহা একান্ত আশ্চর্য্যজনক। প্রায় ৫০ রকমের পাখী অর্থাৎ পাখীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতগুলি প্রকাণ্ড পক্ষী এখন আর পাওয়া যায় না, আবার কতগুলি এখনো পাওয়া যায়। পাখীগুলির মধ্যে শকুনি, বাজ, ঈগল প্রভৃতি অনেক মাংসাশী পাখী পাওয়া যায়, বেচারীরা বোধ হয় ফাঁদে-পড়া অন্য জন্তুর মাংস খাইতে আসিয়া নিজেরাই ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছিল।

এখানে যে-সব পাখীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহাদের অর্দ্ধেকের বংশধর পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। সেখানে পাঁচপ্রকার ঈগল পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র দুইপ্রকার এখনো দেখা যায়। ছয়-প্রকার কণ্ডরের মধ্যে মাত্র এক-প্রকার এখনো মিলে। চারি-প্রকার পেঁচার মধ্যে দুই-প্রকার এখনো দেখা যায়। ভরতপক্ষী, কাঠঠোকরা, তিতির ও কোকিলের অভাব নাই, কিন্তু একজাতীয় সারস ও ময়ূর পাওয়া গিয়াছে, যা' এখন পৃথিবীর কোনো দেশে দেখা যায় না। কানাডা দেশীয় রাজহাঁস, নীলবক, ভুঁই সারস ও দাঁড়কাক পাওয়া গিয়াছে।

হোমস্ মিলার নামক একজন বৈজ্ঞানিক এই-সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া, আগে চেনা যায় নাই এমন ১২টি পাখীর গোত্র স্থির করিয়াছেন। কালিফর্ণিয়া দেশে আজকাল প্রায় ৮০ প্রকারের পায়রা মিলে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাবহুল, তাহার একটিও কিন্তু এখানে পাওয়া যায় নাই। মিলার সাহেব ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, প্রকৃতি দেবী যখন যাদুঘরে প্রাণীসংগ্রহ করিতেছিলেন তখন ঐ-জাতীয় পারাবত ঐ দেশে ছিল না।

তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে ঐ স্থানে গৃধিনী ও হার্পি ঈগলের কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই, কিন্তু আজকাল মেক্সিকো সীমান্তে উহা প্রচুর মিলে। তোতাপাখীর কঙ্কাল সেখানে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আজকাল কালিফর্ণিয়ার কিছু দক্ষিণে উহাদিগকে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায়। ওড়ে না, এমন কোনো পাখীর কঙ্কাল সেখানে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং দক্ষিণ আমেরিকার 'রিয়া' পক্ষী দক্ষিণ আমেরিকায়ই জন্মিয়াছিল, না উত্তর এসিয়া হইতে বেরিং প্রণালী পার হইয়া আলাস্কা প্রদেশের মধ্য দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল, এ প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু বিড়াল, হরিণ, হাতী এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব প্রাচীন মহাদেশ হইতে আলাস্কা প্রদেশ দিয়া আমেরিকায় আসিয়াছিল, ইহা পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন। আমেরিকায় পূর্ব্বে শ্বাপদ জন্তু ছিল না, পরে ভূপৃষ্ঠ পরিবর্ত্তনের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক যুগে বিড়াল-জাতীয় জীবগণ সেখানে উপস্থিত হয়। মিলার সাহেব এখানে একটি সারস-জাতীয় পক্ষীর কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন, তত বড় পাখী এখন আর পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায় না।

* *
*

যুদ্ধে রসায়ন-বিজ্ঞান—

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে যে "অভাবই আবিষ্কারের জননী", মানুষের কোনো বিষয়ে অভাব হইলেই সেই অভাব পূরণের চেষ্টা আসে—তাহার ফলেই আবিষ্কার হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস অবরোধের সময় সোরার অভাবে ফরাসী কামান নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন ফরাসী রসায়নবিদ্‌গণ গোময় হইতে সোরা প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। ইতিহাসের পুনরভিনয়

হইয়াছে, এই যুদ্ধেও আবার তেমনি ব্যাপার ঘটিয়াছে। তবে সেবার আবিষ্কার করিয়াছিল ফরাসী, এবার করিয়াছে জর্ম্মনি।

জর্ম্মনি যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল, তাই সে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত রাখিয়াছিল। আজকালকার বিস্ফোরক পদার্থ আগের মত সোরা-গন্ধক-কয়লা দিয়া প্রস্তুত হয় না। নাইট্রিক এসিডের সঙ্গে গ্লিসারিন, তুলো বা টলিউয়েন মিশাইয়া তৈরি করা হয়। তবে সোরা দরকার হয় নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত করিতে। যদি দরকার হয় এইজন্য জর্ম্মনি ৬,০০,০০০ টন সোরা নিজের দেশে মজুদ করিয়া রাখিয়াছিল। ইংলণ্ড যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর জর্ম্মনি, সহজে সোরা পাওয়া সুবিধা হইবে না দেখিয়া, নিরপেক্ষ রাজ্যগুলির মারফতে আরো ২,০০,০০০ টন সোরা আমদানী করে। তা'ছাড়া এণ্টোয়ার্প অধিকারের সময় বেলজিয়ানগণের সঞ্চিত ২,০০,০০০ টন সোরাও জর্ম্মনির ভাগ্যক্রমে তাহার হস্তগত হয়।

যদিও জর্ম্মনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল, তবু তাহারা আন্দাজ করিতে পারে নাই যে এ যুদ্ধে সব হিসাবপত্র হার মানিবে এবং সোরা-জাতীয় জিনিস এত খরচ হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ফ্রান্সের এক ভার্ডুন যুদ্ধেই এত গোলাগুলি লাগিয়াছে, যাহা সমগ্র বুয়র যুদ্ধেও লাগে নাই। ফলে জর্ম্মনির সঞ্চিত সোরা যুদ্ধারম্ভের অনতিবিলম্বেই নিঃশেষ হইবে এরূপ আশঙ্কা সে করিতে লাগিল। জলে ইংলণ্ড শত্রু, সুতরাং বিদেশ হইতে আমদানী করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক নাইট্রিক এসিড চাইই চাই, নতুবা সব চেষ্টা বৃথা।

এই সময়ে একটি সাধারণ দ্রব্যের প্রতি জর্ম্মন বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়িল। জিনিসটির নাম ক্যালসিয়াম সায়েনামাইড (Calcium-cyanamide), জমীতে সারের জন্য ব্যবহৃত হইত, এমন কিছু জাঁকালো জিনিস নয়। তাঁহাদের মনে পড়িল যে খুব চাপে সায়েনামাইডের সঙ্গে বাষ্প মিলাইয়া উত্তাপ দিলে সায়েনামাইডের নাইট্রোজেন এমোনিয়ায় পরিণত হয়, এবং বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সঙ্গে এমোনিয়া মিশাইতে পারিলেই তাহা নাইট্রিক এসিড হইয়া দাঁড়ায়। সামাজিক জীবনে বিবাহে বর ও কনের মিলনের জন্য যেমন পুরোহিত লাগে, তেমনি এই রাসায়নিক মিলন ঘটাইতে অপর একটি তৃতীয় পদার্থের আবশ্যক হয়, তাহাকে বাহক (Catalyst) বলে। এমোনিয়া, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের এই মিলন প্লাটিনাম ধাতু দ্বারা সংঘটিত হয়। এই জন্য জর্ম্মনিতে এই আবিষ্কারের পরে প্লাটিনাম ধাতুকে ইংলণ্ড নিষিদ্ধ বস্তুর (Contraband) তালিকাভুক্ত করেন। পুরোহিত যেমন এক বিবাহ সম্পন্ন করাইয়া আবার অন্য বিবাহের কার্য্যে যাইতে পারেন, তেমনি একই প্লাটিনাম বারবার করিয়া এই মিলন সংঘটিত করিতে পারে।

জর্ম্মনি সংশ্লেষণ দ্বারা নাইট্রিক এসিড, তথা বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করিতে না পারিলে যুদ্ধ অনেকদিন পূর্ব্বেই থামিয়া যাইত। জর্ম্মনির সৈন্যদলের চমৎকার সুশৃঙ্খলা, তাহার সুবৃহৎ যুদ্ধজাহাজ, সবমেরিন ও সেণ্টিমিটার কামান একমাত্র বিস্ফোরক অভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইত।

* * *

জড়ের জীবনলাভ-সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ—

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে যে জীবের জন্ম কেমন করিয়া হইল। আরিষ্টটলের যুগে লোকের বিশ্বাস ছিল যে সূর্য্যালোকে পৃথিবী হইতে উত্থিত বাষ্পরাশি হইতেই জীবের জন্ম। ইহা হইতেই ষোড়শ শতাব্দীতে স্বতঃজনন মতবাদের উৎপত্তি হয়। স্বতঃজনন মতবাদ ছাড়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করার আর কোনো উপায় ছিল না। এই মতবাদ এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল যে হেলমণ্ট নামক এক পণ্ডিত কি উপায়ে দুখানা ইট ও একটি তুলসীগাছ হইতে বিছা জন্মানো যায়, সে উপায় পর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছিলেন! পরে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক রেডি একখণ্ড সূক্ষ্মবস্ত্র, এক টুকরা মাংস ও একটি পাত্রের সাহায্যে এই মত খণ্ডন করেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে স্বতঃজনন-মত আবার মাথা খাড়া করিয়া ওঠে। অবশেষে বিগত শতাব্দীতে ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তুর সাহেবের গবেষণার ফলে এই মত একেবারে পরিত্যক্ত হয়। এ-সমস্ত পাঠক অবগত আছেন।

স্বতঃজনন যদি অসম্ভব হয়, তবে পৃথিবীতে আদিজীবের জন্ম হইল কেমন করিয়া, ইহার উত্তরে অনেক দিন হইতে বলা হইতেছে যে পৃথিবীর প্রথম জীব মহাশূন্যের মধ্য দিয়া অন্য কোনও গ্রহ হইতে এই গ্রহে আসিয়া পৌছিয়াছিল। একটি কাচের পাত্রে ধাতুচূর্ণ ও অতিসূক্ষ্ম কীটাণু পূরিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া, তাহার উপর খুব তীব্র আলোক ফেলিয়া পাত্রটি উলটাইয়া ধরিলে দেখা যায় যে ধাতুচূর্ণগুলি খাড়াভাবে পড়িতেছে, কিন্তু কীটাণুগুলি আলোর বিপরীত দিকে বাঁকিয়া পড়িতেছে। ইহা হইতে আলোকচাপের আবিষ্কর্ত্তা আর্হেনাস পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বলিলেন যে বায়ুশূন্য অন্তরীক্ষের মধ্য দিয়াই প্রথম জীবাণু আলোকের চাপে অপর কোনও গ্রহ হইতে আসিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

এই মতের বিরুদ্ধ-যুক্তি অনেক আছে। কিন্তু সে সব কথা না তুলিয়া যদি স্বীকারই করিয়া লওয়া যায় যে এই মতবাদ সত্য, তথাপি জীবের জন্মরহস্য অমীমাংসিতই রহিয়া গেল। মূল প্রশ্ন থাকিয়াই গেল যে অন্য কোনো গ্রহেই বা জীবের প্রথম জন্ম হইল কেমন করিয়া?

পাস্তুর স্বতঃজনন মতবাদের খণ্ডন করিতে যাইয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে কতকগুলি অবস্থাবিশেষে জীবের জন্ম সম্ভবপর নয়। এস্থানে জীব অর্থে প্রাণী বুঝাইতেছে। কিন্তু "জীব" ইহা হইতেও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা যাউক জীব কি?

জড়ের সহিত শক্তির মিলনই জীবের প্রধান পরিচয়। কিন্তু তাই বলিয়া ষ্টীম-এঞ্জিন জীব নয়, কেন না তাহার শক্তি আইসে সোজাসুজি বাহির হইতে। আর জীব বাহিরের শক্তি গ্রহণ (assimilate) করিয়া নিজের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং অবস্থাবিশেষে তাহা দ্বারা কাজ করে। কারবাইডে জল দিলে গরম হইয়া উঠে এবং উৎপন্ন এসিটিলিন গ্যাস হইতে আলো জ্বলে। ইহা নিশ্চয়ই শক্তির বিকাশ। কিন্তু তাই বলিয়া কারবাইড জীব নহে। কারণ বাহির হইতে শক্তি সংগ্রহ ছাড়া বৃদ্ধি এবং মৃত্যুও জীবত্বের অন্যতম লক্ষণ। এই ধর্ম্মের জন্য জীবের জড়ভিত্তি অত্যন্ত জটিল-গঠন হওয়া আবশ্যক। এই লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে উদ্ভিদ সজীব পদার্থ। কিন্তু উদ্ভিদকে আমরা প্রাণী নামে অভিহিত করিব না। প্রাণী আরও উচ্চস্তরের জীব। সুতরাং বৃক্ষের সহিত প্রাণীর শরীরের সম্বন্ধ ও বৃক্ষদেহের উৎপত্তি স্থির করিতে পারিলেই জীবের জন্ম-রহস্যের কতকটা মীমাংসা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পাস্তুরের স্বতঃজননবাদের খণ্ডন সাধারণতঃ প্রাণীর বিষয়েই প্রযুজ্য। কিন্তু জড়ের সহিত শক্তি সংযোগে জীবনক্রিয়া-সাধনোপযোগী জটিল-গঠন যৌগিকবিশেষের সৃষ্টি যদি স্বতঃজনন মতবাদের মূল ভিত্তি বলিয়া ধরা যায়, তবে আধুনিক বিজ্ঞান, এমন কি পাস্তুরের গবেষণাও, স্বতঃজননবাদের মত খণ্ড করিতে পারে নাই।

প্রত্যক্ষভাবেই হোক, আর পরোক্ষভাবেই হোক, অভিব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র প্রাণী জগতই পুষ্টি ও শক্তির জন্য উদ্ভিদের জটিল গঠন রঞ্জনদ্রব্যের (Chlorophyl) নিকট ঋণী। আবার আমরা পৃথিবীতে যে-কোনো শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই তাহা সমস্তই সূ

হইতে আহৃত—ইহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র। আমরা যে কয়লা পোড়াই, কাঠ বা গ্যাস জ্বালাই, জলঘরট্ট (water mill) প্রভৃতি চালাই, এ সকলই শক্তির জন্য সূর্য্যালোকের নিকট ঋণী। বায়ুর অঙ্গারক গ্যাস, জলকণা ও সূর্য্যালোকের শক্তি, এই তিন উপাদান লইয়া বৃক্ষপত্রের সবুজবর্ণ নানাবিধ অঙ্গার-যৌগিক প্রস্তুত করে এবং বৃক্ষকাণ্ডে সঞ্চিত করিয়া রাখে, কিন্তু নিজে পরিবর্ত্তিত হয় না। বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ হইতে জীবগণ এই শক্তি নিজ নিজ পুষ্টির জন্য আহরণ করে। আমরা রৌদ্রে পড়িয়া থাকিয়া প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যালোকের শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি না। বৃক্ষপত্র এই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চয় করে। এবং আমরা, হয় বৃক্ষ হইতে নতুবা বৃক্ষপত্রাদিভোজী অন্য কোনও প্রাণী হইতে, এই শক্তি পরোক্ষভাবে আহরণ করি।

সূর্য্য হইতে আহৃত শক্তির বিকাশ জড়জগতে যেরূপ সুস্পষ্ট, জীবজগতে সেরূপ নহে। কাঠ, কয়লা বা গ্যাস জ্বালাইলে আমরা এই শক্তির কার্য্য প্রত্যক্ষ করি। জীবজগতেও প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এমনি একটা দহনক্রিয়া চলিতেছে, কিন্তু তাহা তত স্পষ্ট নহে, কারণ, তাহার উত্তাপ তত অধিক নহে। অনেকেই জানেন যে কতগুলি পদার্থের উপস্থিতিতে খুব কম উত্তাপেই এমন সব রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে যাহা সেই-সব পদার্থ ছাড়া ঘটাইতে খুব বেশী উত্তাপ আবশ্যক হয়। জীবশরীরেও এইরূপ কতগুলি পদার্থ আছে। ইহাদের উপস্থিতিতেই আমাদের শরীরের দহন খুব প্রবল না হইলেও আমাদের মধ্যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জিনিষ প্রোটোপ্লাজম বা জীবপঙ্ক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৃক্ষের সবুজবর্ণ রঞ্জনপদার্থের সঙ্গে সূর্য্যালোকের প্রভাবে অন্যান্য পদার্থ সংশ্লিষ্ট হইয়া, অনেক জটিল পরিবর্ত্তনের পর, অঙ্গারের প্রকৃতি-সুলভ অত্যন্ত জটিল-গঠন অণুসমূহের সৃষ্টি করে। সম্ভবতঃ এই পরিবর্ত্তনের প্রথমেই নাইট্রোজেন যুক্ত হয়। ইহাই প্রোটোপ্লাজম। এই অণুগুলি অত্যন্ত ভঙ্গুর অতি সহজেই ইহারা ভাঙ্গিয়াচুরিয়া অন্য পদার্থে পরিণত হয়। এই অতিভঙ্গুর অণুসমূহই যে প্রাণীশরীর গঠনের প্রধান উপাদান, একথা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এ ভঙ্গুরতা আছে বলিয়াই প্রোটোপ্লাজম পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজকে অতি শীঘ্র এবং সহজে মানাইয়া লইতে পারে, এবং এ গুণের জন্যই জলবায়ু ও তাপচাপের বিভিন্নতাসত্ত্বেও সকল দেশেই প্রোটোপ্লাজম হইতে জীবের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছে।

এইবারে ক্লোরোফিল, বা বৃক্ষের সবুজ রংএর কথা। এই জিনিসটির গঠন অবশ্য বর্ত্তমান রসায়ন একপ্রকার স্থির করিয়াছে। তথাপি ইহা প্রথমে অজৈব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে এই জিনিষটাও কিছু চিরকাল হইতেই ছিল না, সুতরাং সম্ভবতঃ এই শক্তিরূপান্তরিত-করার কাজটা প্রথমে কোনো অজৈব পদার্থ দ্বারা সাধিত হইত, এবং তাহা হইতেই ইহা সৃষ্ট হইয়াছিল, এরূপ মনে করার হেতু আছে। এই প্রকার একাধিক অজৈব পদার্থ পাওয়াও গিয়াছে, তন্মধ্যে অঙ্গারক গ্যাস অন্যতম। গাছের সবুজ রং যখন আলোক-সাহায্যে অন্যান্য অণুসমূহ সংশ্লেষণ করিতে থাকে, তখন প্রথমে প্রস্তুত হয় ফরম্যালডিহাইড (formaldehyde) নামক একটি পদার্থ। পরীক্ষার দেখা গিয়াছে যে ইউরেনাম-ঘটিত কোনও যৌগিক উপস্থিত থাকিলে জল ও অঙ্গারক বাষ্প হইতেও এই পদার্থটি উৎপন্ন হয়।

মোটামুটি বলিতে গেলে, জীবজগৎ অসংখ্য পরিবর্ত্তনের ফল মাত্র। এই পরিবর্ত্তন প্রথমে অজৈব শক্তি-শোষক ও বাহক পদার্থের প্রভাবে সংঘটিত হয়। পরে আরো জটিল পদার্থের সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে নানাবিধ পাচক পদার্থও এই কার্য্যে নিয়োজিত হয়। নানা সংযোগ ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অঙ্গার হইতে অঙ্গারক বাষ্প,—অঙ্গারক বাষ্প হইতে ক্লোরোফিল, ক্লোরোফিল হইতে প্রোটোপ্লাজম, এবং প্রোটোপ্লাজম হইতে জীবের জন্ম। সুতরাং জড় হইতেই জীবের উৎপত্তি এবং এই মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলিকেই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সেতু বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সবচেয়ে বাঁকা নদী—

সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে আমেরিকার হাম্বোল্ট নদীই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা। এক জায়গায় ডাঙা পথে যে দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান মাত্র আড়াই মাইল সেখানে নদীটি এমন আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে যে জলপথে সেই দুই স্থানের মধ্যে দূরত্ব হইয়াছে আট মাইল। নদীটি কতবার কোন্ মুখে ফিরিয়াছে জানিলেই তাহার বাঁকের ধারণা হইবে। নদীটি উত্তরবাহিনী হইয়াছে ২৫ বার, পূর্ব্বমুখী ১৮ বার, দক্ষিণগামিনী ৩০ বার ও পশ্চিমবাহিনী ৪১ বার। ৩৩ জায়গায় নদীর এক খাত হইতে তাহারই অপর খাতের ব্যবধান মাত্র ১৫০ ফুট বা তারও কম, এবং এত কাছাকাছি দুই খাতে নদীর স্রোত পরস্পরের বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইতেছে। একই রেলের লাইন এই ছটফটে পলাতক নদীটিকে ২৮ বার পার হইয়াছে বলিয়া একই নদীর উপর ২৮টি পুল বাঁধিতে ৬৫৪০০০ ডলার বা ২০ লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছে। এই নদীটি একটি মরুভূমিতে গিয়া পড়িয়া বালির গাদায় জলের ধারা হারাইয়া বসিয়াছে, এবং সেখানে কর্কস্ক্রুর আকারে পেঁচোয়া একটা গর্ত্ত হইয়া সেই জলধারা গ্রাস করিতেছে। এই 'বাঁকা-নদীর গতিক বোঝা ভার' বলিয়া, ইহাতে যেসব জলচর পাখী চরে বা ইহার তীরে যেসব পশু বিচরণ করে তাহারা শিকারীর তাড়া খাইয়া বাঁকে বাঁকে ঘুরপাক খাইয়া এমন থতমত খাইয়া যায় যে তাহাদের মাথা ঘুরিতে থাকে, মাতালের মতন টলিতে টলিতে যে জায়গা হইতে পলায়ন আরম্ভ করে বারবার সেইখানেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়া বেচারারা সহজেই শিকারীর হাতে প্রাণ হারায়।

* *
*

রাত্রিতে স্কুল—

আমেরিকা দেশটা পৃথিবীর মধ্যে ধনী, উন্নত, আর সকল বিষয়ে অগ্রসর। সেখানে প্রত্যেক জেলার গ্রামে যেমন ভালো ভালো স্কুল আছে, সেখানে সকল ছেলেমেয়েকে জ্ঞান ও শিক্ষা দিবার এত-রকম ভালো ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত আছে যে তেমন কোথাও নাই বোধ হয়। তবু সে দেশের লোকের মন উঠিতেছে না, সকল লোকই যদি সুপণ্ডিত ও সুশিক্ষিত না হইল ত হইল কি? কিন্তু সকল লোকই ত আর কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া বেশীদিন স্কুল কলেজে শিক্ষা করিবার অবসর পায় না, তাই রাত্রে স্কুল করার ব্যবস্থা করিতে হয়; দিনের কাজকর্ম্মের পর মেয়েপুরুষ বুড়ো বয়স পর্য্যন্তও জগতের অগ্রগমনের সমস্ত সংবাদ রাত্রির স্কুলে গিয়া সংগ্রহ ও আয়ত্ত করিতে পারে। ১৯১০ সালে আমেরিকায় ৫৫ লক্ষ লোক মাত্র নিরক্ষর ছিল। সেই কয়েকজন নিরক্ষর লোক দেখিয়াই সে দেশের গভর্মেণ্ট হইতে শিক্ষিত লোক পর্য্যন্ত সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল—যাহারা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া জ্ঞান না দিতে পারিলে তাঁহাদের যে প্রত্যবায় হইবে। অমনি সমস্ত স্কুলের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল,

দিবারাত্রি সেখানে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইল। ১৯১১ সালে কেণ্টকী ষ্টেটের রাওয়ান কাউণ্টিতে প্রথম কাজ সুরু হয়। ভলাণ্টিয়ার শিক্ষকেরা বিনা বেতনে নিরক্ষরদের শিক্ষা দিয়া দেশের নিরক্ষরতার কলঙ্ক অপনোদন করিতে লাগিয়া গেলেন। প্রথমেই বারো শত নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর ছাত্র জুটিল। তাহারা প্রথমে নিজের নাম দস্তখত করিতে শিখিতে লাগিল। তারপর নিজের চিঠি লিখিতে, বাইবেল ও খবরের কাগজ পড়িতে শেখানো হইতে লাগিল। তাহাদের এমন আশ্চর্য্য উৎসাহ লাগিয়া গেল যে দুসপ্তাহের শিক্ষাতেই তারা নিজে চিঠি লিখিতে পারিল। তারা বই ত পড়িত না, যেন গিলিয়া ফেলিত। এমনি করিয়া তিন সেসনে ১১০০ নিরক্ষর লিখিতে পড়িতে শিখিয়া গেল। তখন গণনা ও অনুসন্ধানে জানা গেল যে রুগ্ন ও অসমর্থ বাদে ৬ জন সক্ষম লোক লেখাপড়া শিখিতে আসে নাই, তার মধ্যে ৪ জনকে কিছুতেই লেখাপড়া শিখাইতে রাজি করা যায় নাই। এইরূপে অতি অল্পদিনেই একটা জেলার সমস্ত লোককে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া দেওয়া হয়।

তারপরে অপর জেলায় দুই সেসনে ১৪০০ লোককে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব হইয়াছে। এবং একজন মাত্র শিক্ষক নিজের একার চেষ্টায় অপরের কোনো সাহায্য না লইয়াও ৭৫ জনকে এক সেসনে লেখাপড়া শিখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

কেণ্টকী ষ্টেটের প্রতিজ্ঞা হইল ১৯২০ সালে সে ষ্টেটে একটি নিরক্ষরও রাখিবে না। তাহার দেখাদেখি বহু ষ্টেট নিরক্ষরতা দূর করিবার ব্রত লইয়া মূর্খতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে। হাজার হাজার ভলাণ্টিয়ার শিক্ষক সংগ্রহে লাগিয়া গিয়াছে, এবং প্রতি বৎসর হাজার-হাজার রাত্রির স্কুল খোলা হইতেছে। সকলে আশা করিতেছেন এক পুরুষ পরে আমেরিকার সমস্ত লোকই লেখাপড়া জানিয়া তালিম হইয়া উঠিবে।

আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে লজ্জায় ও ক্ষোভে মন উত্তেজিত হইয়া উঠে। দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যে দেশের লোকের উদ্যম ত নাই বলিলেই হয়; তাহারই মধ্যে যদি দু একজন উৎসাহী লোক নিরক্ষর দেশবাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য রাত্রিতে স্কুল খুলিয়াছেন তবে পুলিশ তাঁহাদের পিছনে লাগিয়া নির্য্যাতন উৎপাত করিয়াছে, পড়ুয়াদের ভয় পাওয়াইয়া ভাগাইয়াছে, স্কুলগুলিকে বন্ধ করিয়া ছাড়িয়াছে। গভর্মেণ্ট প্রজার খাজনা হইতে বিদেশী লোকদের মোটা বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া, পেন্সন ভাতা দিয়া দেশের অর্থ অপব্যয় করিতেছেন, আর প্রজারা অজ্ঞানে মজিতেছে, অস্বাস্থ্যে ভুগিতেছে, অনাহারে মরিতেছে। কলিকাতার কোনো কোনো কলেজে দুবার ক্লাশ করিয়া দুদল ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল, তাহাতেও বাধা দিবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। তবু আমাদের এই-সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা না মানিয়া, দুঃখ বিপদ নির্য্যাতন স্বীকার করিয়া, দলে দলে ভলাণ্টিয়ার হইয়া শিক্ষাবিস্তার ব্রত করিতে হইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে গভর্মেণ্টকেও অনুকূল করিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষা পাওয়া যদি কোনো দেশের দরকার থাকে ত ভারতবর্ষেরই সবচেয়ে বেশী, কারণ এখানে প্রায় সকলেই নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর।

চ, ব।

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রবাসীর বয়স।

বাংলায় যে কাগজগুলি রোজ একবার বা সপ্তাহে একবার বাহির হয়, তাহাদিগকে সংবাদপত্র বা খবরের কাগজ বলা হয়, মাসিক ও ত্রৈমাসিকগুলিকে সাময়িক পত্র বলা হয়। বিলাতী যে-সব সাময়িক পত্র এখনও চলিতেছে তাহার মধ্যে ওএস্‌লিয়ান ম্যাগাজিন ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং ব্লাক্‌উড্‌স্‌ ম্যাগাজিন ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটি একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কাগজ; দ্বিতীয়টি সর্ব্বসাধারণের জন্য এবং সমধিক প্রসিদ্ধ। গত জানুয়ারী মাসে প্রথমটির ১৩৯তম জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। ব্ল্যাকউড্‌সের শতবার্ষিক জন্মোৎসব গত এপ্রিল মাসে হইয়াছিল। যে-সব বিলাতী ত্রৈমাসিক এখনও চলিতেছে, তাহার মধ্যে এডিনবরা রিভিউ ১৮০২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং কোআটার্লী রিভিউ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। "দি য়্যানুয়্যাল রেজিষ্টার" নামক বার্ষিক পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও বাগ্মী এড্‌মণ্ড বার্ক ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাহির করেন। উহা এখনও চলিতেছে।

কোন সাময়িক পত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় নাই। সুতরাং কোন বাংলা সাময়িক পত্রের একশত বৎসর বয়স হইবার সময় এখনও হয় নাই। কোনটিরই হইবে কি না বলা যায় না। সকলের চেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষেরই জীবন সকলের চেয়ে সার্থক, ইহা যেমন বলা যায় না, তেমনি কোন সাময়িক পত্র বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেই তাহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু কোন দেশে অনেক লোক দীর্ঘজীবী হইলে, তাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে তথাকার জলবায়ু ভাল; এবং নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা ভাল। তদ্রূপ কোন দেশে অনেকগুলি সাময়িক পত্র অনেক বৎসর ধরিয়া সুপরিচালিত হইলে তথাকার লোকদের জ্ঞানানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ, সাহিত্যিক প্রতিভা, দল বাঁধিবার ও দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিবার শক্তি, অধ্যবসায়, প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালীদের মধ্যে এইসব গুণ ও শক্তি যথে

পরিমাণে আছে কি না সন্দেহের বিষয়; কেন না, তাহা হইলে বঙ্গদর্শন ও সাধনার মত কাগজ উঠিয়া যাইত না।

মনে হইতে পারে বটে যে সম্পাদকতা করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী লোক ত বরাবর পাওয়া যাইত না, সুতরাং, অন্য কোন ব্যাঘাত না ঘটিলেও, কেবল উপযুক্ত সম্পাদকের অভাবেই কালক্রমে বঙ্গদর্শন ও সাধনা উঠিয়া যাইত। কিন্তু তাহা ভুল। ইংরেজী যে-সব সাময়িক পত্র বিলাতে বহুবৎসর ধরিয়া, শতবর্ষেরও অধিককাল ধরিয়া, সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ লেখকেরাই ত তাহার সম্পাদকতা করিয়া আসিতেছেন না; যাঁহারা সম্পাদকতা করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ সাহিত্যজগতের সাধারণ লোক। বাস্তবিক সাহিত্যিক প্রতিভা না থাকিলেও সাময়িক পত্রিকা চালান যায়।

তাহার প্রমাণের জন্য বিলাত যাইবার দরকার নাই। আমাদের দেশের অন্য সম্পাদকের কথা বলিতে পারি না; নিজের কথা বলিতে পারি। বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ সংখ্যা সমেত দুইশত খানি প্রবাসী ১৩০৮ সালের বৈশাখ হইতে নিয়মিতরূপে বাহির হইল। বিলাতী বহু সাময়িক পত্রের সুদীর্ঘকালব্যাপী নিয়মিত প্রকাশের কথা ভাবিলে ইহা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক শক্তি ও প্রতিভা এবং রচনানৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রহস্ততা না থাকা সত্ত্বেও, আমরা যে নানাপ্রকার বিঘ্ন বাধার মধ্যে দুই শত মাস ধরিয়া কাগজ চালাইতে পারিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে, যে, সাহিত্যিক শক্তি ও প্রতিভা না থাকিলেও মাসিক পত্র চালান যায়; প্রবাসীর বয়সের উল্লেখের অন্ততঃ এইটুকু প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিক শক্তি ও প্রতিভায় বঞ্চিত বলিয়া যাঁহারা আমাদের সমাবস্থাপন্ন, তাঁহারা প্রবাসীর এই ষোল বৎসর সাত মাস ব্যাপী জীবন হইতে এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন যে তাঁহারাও চেষ্টা করিলে সাময়িক-সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু কাজ করিতে পারিবেন। সত্য, আমাদের কাজের মত তাঁহাদেরও কাজ দুদিনের হইবে, স্থায়ী হইবে না; আমাদের লেখার মত তাঁহাদেরও লেখা স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবে না। কিন্তু যাহা দুদিনমাত্র সংসারের কাজে লাগে, তাহারও প্রয়োজন আছে।

বাংলা মাসিক দীর্ঘজীবী হয় না কেন ?

যাঁহারা এপর্য্যন্ত বাংলা মাসিকপত্র চালাইয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোক। একশ্রেণীর লোক মাসিকপত্র হইতে কোন আয়ের আশা রাখেন না, অন্য প্রকারের আয়েই তাঁহাদের সংসার চলিয়া যায়; এমন কি কেহ কেহ লোকসান দিয়াও কাগজ চালাইতে সমর্থ। কিন্তু যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা এইরূপ, তাঁহারাও চান যে তাঁহাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হয়, তাঁহারা মাসে-মাসে যাহা বাহির করেন, তাহার আদর হয়, এবং যথেষ্টসংখ্যক লোকে তাহা পড়ে। লোকে যাহা পড়ে না, তাহার জন্য পরিশ্রম করিতে ও টাকা খরচ করিতে খুব ধনী লোকেরও উৎসাহ কতদিন থাকে? সুতরাং যথেষ্ট ক্রেতা না জুটিলে এরূপ পরিচালকদের কাগজও কিছুদিন পরে উঠিয়া যায়। অন্যদিকে কোন মাসিকের যথেষ্ট আদর হইলে ও যথেষ্ট ক্রেতা জুটিলে তাহা আর লোকসানের ব্যাপার থাকে না। যাঁহারা মাসিক কাগজ চালাইয়া কিছু আয়ের আশা রাখেন, তাঁহাদের কাগজেরও স্থায়িত্ব যথেষ্ট ক্রেতার উপর নির্ভর করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে পরিচালকেরা যে শ্রেণীরই লোক হউন, এবং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা যেরূপই হউক, কাগজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে যথেষ্টসংখ্যক ক্রেতা-পাঠকের উপর। ক্রেতা-পাঠকদের সংখ্যা যথেষ্ট হইতে পারে যদি দেশে শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজনানুরূপ হইয়া থাকে, এবং যদি দেশের লোকদের মধ্যে আবশ্যকমত জ্ঞানানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ থাকে। বাংলাদেশে যথেষ্ট শিক্ষার বিস্তার হয় নাই; যাঁহারা শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞানানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ নাই;—পাশ্চাত্য সভ্য দেশসকলের তুলনায় ত নাই-ই, ভারতবর্ষেরই কোন কোন প্রদেশের তুলনায় বাঙালীর জ্ঞানানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ কম। বাংলা মাসিক কাগজ অনেক স্থলে মহিলারাই পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে আরও শিক্ষার বিস্তার হইলে বাংলা মাসিকপত্রগুলির অবস্থা ভাল হইতে পারে।

দেশে খুব বেশী শিক্ষার বিস্তার হইলেও এবং শিক্ষিতদের জ্ঞানানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ থাকিলেও, তাঁহারা যে-সে কাগজ পড়িবেন না। সুতরাং কাগজে ভাল লেখা দিতে পারা চাই। সম্পাদক যদি নিজেই দশ-রকম ভাল লেখা

দিয়া কাগজ ভরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বেশী চিন্তার কারণ থাকে না। কিন্তু এরূপ সম্পাদক ক'জন পাওয়া যায়? এবং পাইলেও এক এক জন এরূপ সম্পাদকের পরে পরে তাঁহাদেরই মত শক্তিমান্ লোক বরাবর জুটিবার সম্ভাবনা কম। মোটের উপর সাধারণ-রকমের সম্পাদকের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। এরূপ সম্পাদককে ভাল লেখা জোগাড় করিতে হইবে। দেশে যথেষ্ট ভাল লেখক না থাকিলে সম্পাদক নিরুপায়। কিন্তু ভাল লেখকের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও লেখা জোগাড় করা সহজ না হইতে পারে। কোন সম্পাদকের পরিশ্রমে দেশের কল্যাণ হইতেছে, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে কেহ কেহ তাঁহার কাগজে লেখা দিয়া থাকেন,—বিশেষতঃ বন্ধুগণ। আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের খাতিরেও কখন কখন কোন কোন সম্পাদক লেখা পাইতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ সম্পাদকদের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে অনেক ভাল লেখক থাকিবেই, এমন আশা করা যায় না। লেখকগণকে দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অল্পসংখ্যক লেখকদের লেখা পাওয়া যায়। কিন্তু টাকা ফেলিলাম আর ভাল লেখা পাইলাম, বাংলা-দেশের অবস্থা এরূপ নহে; এবং নিজের প্রত্যেক ভাল লেখককে নিজের আয় হইতে যথেষ্ট দক্ষিণা দিতে পারে, বাংলা দেশে এরূপ মাসিক পত্র একখানিও নাই, বোধ হয় কখনও ছিল না। বাস্তবিক, কাগজের দাম, ব্লকের দাম, ছাপাইবার ও বাঁধাইবার খরচ, ডাকমাশুল এবং আফিসের কর্ম্মচারীদের বেতন ও আফিসভাড়া বাদে, যে মাসিকপত্র সম্পাদক, পরিচালক, এবং লেখক ও চিত্রকরদিগকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিতে না পারে, তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই। যিনি কাগজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার ঝোঁকে কাগজ-খানা কিছুদিন চলিতে পারে। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ জুড়াইয়া গেলে বা মৃত্যু হইলে কাগজ বন্ধ হইয়া যাইবেই।

কাগজ চালাইয়া যথেষ্ট আয় হইলে ক্রমশঃ শক্তিমান্ শিক্ষিত লোকেরা এই কাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। তখন যোগ্য সম্পাদকের অভাবে কাগজ উঠিয়া যাইবে না।

লেখা জোগাড় করিবার আর দুটি উপায় কখন কখন অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা সদুপায় নয়। প্রথম খোসামোদ অনুনয়বিনয়। দ্বিতীয়, সাহিত্যিক গুণ্ডামি; অর্থাৎ তুমি যদি আমার কাগজে না লেখ, তাহা হইলে তোমাকে গালি দিব এবং তোমার নিন্দা কুৎসা করিব।

বিলাতেও এমন অনেক কাগজ আছে বটে যাহা লেখকদিগকে টাকা দিতে পারে না, কিন্তু ভাল কাগজ মাত্রেই টাকা দেয়।

বিজ্ঞাপনের আয় হইতেও কাগজ চালাইবার পক্ষে সাহায্য হয়। পাশ্চাত্যদেশের অনেক কাগজের লাভ বিজ্ঞাপনের আয়ের উপরই নির্ভর করে; বিজ্ঞাপনের আয় না থাকিলে ঐ কাগজগুলি লোকসানের ব্যাপার হইত। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বঙ্গে, বড়-বড় কারবার ইংরেজের হাতে। তাহারা আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন সামান্য দেয়। আমাদের দেশের লোকে বড় বড় কারখানা ও দোকান চালাইয়া যদি লাভবান হয় ও দেশী কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, তাহা হইলে খবরের কাগজ ও মাসিক কাগজ উভয়েরই সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাহা দূরের কথা।

আপাততঃ কাগজ ভাল করিয়া চালাইবার একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা সম্পাদকের প্রকৃত লোকহিতৈষী হওয়া এবং তজ্জন্য খুব পরিশ্রম করা, এবং তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা পাইবার যোগ্য হওয়া। যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য এবং সমাজ ধর্ম্ম সাহিত্য আদি বিষয়ে মত অনেকটা এক, বাংলাদেশে এখনও এইরূপ এক এক দল লোকের পরস্পরের সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা প্রবল ও অভ্যাস বদ্ধমূল হয় নাই। ক্রমে তাহা হইবে।

মাসিকপত্র চালাইয়া বেশী টাকা রোজগার হইবে, এরূপ আশা লইয়া কাগজ প্রতিষ্ঠিত করা কাহারও পক্ষে ঠিক্ হইবে না। আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষাদান-কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদের পারিশ্রমিক, যোগ্যতার তুলনায়, শিক্ষিত কর্ম্মীদের মধ্যে সকলের চেয়ে কম। মাসিকপত্র পরিচালনের আয় তাহার চেয়েও কম। একজন মানুষ অধ্যাপকতা করিলে পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে যত বেতন পাইতে পারিত, একা দুখানা মাসিকপত্র চালাইয়াও তাহার তত আয় হয় নাই দেখা গিয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়।

কলিকাতায় ১৭ সংখ্যক বোসপাড়া গলির বাটীতে অনেক বৎসর হইতে হিন্দু বালিকা ও নারীদের শিক্ষার জন্য

একটি বিদ্যালয় চলিতেছে। ভগিনী নিবেদিতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনি নানাবিধ অভিনব প্রণালীতে শিক্ষা দিতেন। ভগিনী কৃষ্টীনও শিক্ষা দিতেন, ভগিনী নিবেদিতার দেহান্তের পর ভগিনী কৃষ্টীন এই কাজ করিতেন, এবং আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার করিবেন। অন্য শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা এখন কাজ চলিতেছে। এই বিদ্যালয়ে আধুনিক উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং প্রাচীন হিন্দুনারীদিগের আদর্শ-অনুযায়ী চরিত্রগঠনের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষা অবৈতনিক। গত ১৫ বৎসরে প্রায় ৭০০ কুমারী এবং তিন শত বিবাহিতা নারীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অনেকে এখানে শিক্ষা পাইয়া ও পরে অন্যত্র শিক্ষিত হইয়া এখন নিজের ভরণপোষণ করিতে পারিতেছেন। বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী করিবার জন্য ইহার কমিটি বাগবাজারের নিবেদিতা গলিতে ১৮ কাঠা জমী লইয়া একটি গৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছেন। জমীর মূল্য ২৯,০০০৲ টাকা পড়িবে। বাড়ীটিতেও তার চেয়ে কম খরচ হইবে না। কমিটি এই জন্য হিন্দুসমাজের সকলের নিকট চাঁদা চাহিতেছেন। তাঁহাদের যে এই কাজে মুক্ত-হস্তে সাহায্য করা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় কমিটির সম্পাদকের নামে টাকা পাঠাইতে হইবে।

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষীর আদর্শ যেভাবে বুঝিয়া-ছিলেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে গৌরব বোধ করিয়া সুখে নিদ্রা দিবার মত লোকের অভাব এদেশে নাই। কিন্তু উচ্চ আদর্শ অনুসারে কাজ করিতে পারিলেই তবে বাস্তবিক তাঁহার সম্মান করা হয়।

হিন্দু-মুসলমান।

রাষ্ট্রীয় অধিকার ও শক্তি পাইবার চেষ্টা করিতে হইলে ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও জাতির মধ্যে বিরোধ থাকা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। অনেকে প্রধানতঃ এইজন্যই নানা উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া মিটাইয়া দিতে বা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। কেন না, হিন্দু-মুসল-মানের ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও বিরোধ যে ব্রিটিশ প্রভুত্বের ভিত্তির একটা প্রধান উপাদান, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্যার জন ষ্ট্রেচী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত বহিতে লিখিয়াছেন—

'If Muhammadanism contains any elements of political danger, they are nullified by the fact that the feelings of true Muhammadans towards idolatrous Hindus are more hostile than towards Christians and that Hindus will never desire the restoration of Musalman supremacy. Nothing could be more opposed to the policy and universal practice of our Government in India than the old maxim of divide and rule; the maintenance of peace among all classes has always been recognized as one of the most essential duties of our "belligerent civilization"; *but this need not blind us to the fact that the existence side by side of these hostile creeds is one of the strong points in our political position in India.*'

মিঃ নীড্‌হাম কাষ্ট লিখিয়াছেন :—

One of the most time-honoured maxims in the science of government is that famous phrase, *Divide et impera* and *in caste we have ready-made fissures in the community*, which render the institution of secret societies, so common and so dangerous among the Chinese and Malays, almost impossible in India."—(Essay on Caste by Robert Needham Cust)

ভারতে ইংরেজ-রাজপুরুষেরা ভেদনীতি প্রয়োগ করেন কি না, তাহার বিচার এখানে করিব না; তবে আমাদের দেশে ধর্ম্মভেদ ও জাতিভেদ হইতে যে সব ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও বিরোধ উৎপন্ন হয়, তাহা যে ইংরেজ-প্রভুত্বের অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধরুন যদি আমাদের দেশটা স্বাধীন হইত, এবং সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে দেশের কাজ নির্ব্বাহিত হইত, তাহা হইলেও কি সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিরোধটা দুঃখের বিষয় হইত না? রাষ্ট্রীয় উন্নতিকামী বলিবেন "হইত বৈ কি? কারণ, এইরূপ বিরোধের ছিদ্র অবলম্বন করিয়া বহিঃশত্রু আমাদের দেশ পদানত করিতে পারিত।" কিন্তু ধরুন, সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও যদি দেশ বরাবর স্বাধীন থাকার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও কি এরূপ বিরোধ অকল্যাণকর নহে? নিশ্চয়ই অকল্যাণকর। সেইজন্য, এরূপ ঝগড়া বিরোধের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে।

পাঁঠা বলি দিয়াও ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করা যায় না, গোরু বলি দিয়াও সন্তুষ্ট করা যায় না। কোন একটা জন্তু বা জিনিষ ভগবানের নাম করিয়া বলি দিলে বা উৎসর্গ করিলে আত্মার উন্নতি হয় না, মানুষটা যেমন ছিল, তার চেয়ে ভাল ও মহৎ হয় না। হিংসার ভাব একটুও মনে থাকিলে মানুষের সাত্ত্বিকতা জন্মে না। আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়, মানুষের ভিতরে যে পশুত্ব আছে, তাহার অধীন হইয়া না পড়া, এবং প্রয়োজনমত তাহাকে বলি দেওয়া। মানুষের

মত এইরূপ হইলে ধর্ম্মোন্মত্ততা-জনিত দাঙ্গাহাঙ্গামার মূলোচ্ছেদ হয়। কিন্তু সব লোকে এই মতের অনুসরণ করে না। কেহ বা পাঁঠা বলি দিতে চায়, কেহ বা গোরু বলি দিতে চায়। এইজন্য বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণ করিতে হইলে, যাহার যাহা মত, তাহাকে তাহার অনুসরণ করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু অপরের প্রাণে ক্লেশ হয়, এরূপভাবে বলি দেওয়া অকর্ত্তব্য। এক্ষেত্রে "আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস এইরূপ," ইহা বলাই ভাল; কোন প্রকার "বৈজ্ঞানিক" যুক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা না টিকিতেও পারে। কোন হিন্দু যদি বলেন, যে, গোবধ এইজন্য অধর্ম্ম যে আমরা গাভীর দুধ খাই, এবং গোরু চাষবাস এবং ভারবহন ও যানবাহনে কাজে লাগে, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যায় যে মহিষের দুধও মানুষে খায় এবং মহিষও চাষে ও গাড়ী টানিতে নিযুক্ত হয়, অথচ মহিষবলি নিষিদ্ধ নয়; ছাগলের দুধ আমরা খাই, অথচ পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। অন্যান্য যুক্তিরও এইরূপ উত্তর আছে। অতএব তর্ক না করিয়া সোজাসুজি বলা ভাল যে "আমি আমার ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতে চাই।" প্রতিবেশীর সঙ্গে ও সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে মৈত্রী থাকা একান্ত আবশ্যক। মানুষকে প্রীতি না করিলে কখনও আত্মার উন্নতি হয় না। মৈত্রীরক্ষার জন্য সকলকেই নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে দেওয়া উচিত,—অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সেই ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী কাজ লোকস্থিতির অন্তরায় না হয়। ঠগদের বিশ্বাস ছিল যে মানুষের গলায় ফাঁসী দিয়া মারা পরম ধর্ম্ম; কিন্তু তাহা করিতে দিলে লোকস্থিতি অসম্ভব।

সম্প্রতি মহরম উপলক্ষে আরা জেলা, এলাহাবাদ শহর, প্রভৃতি অল্প কয়েকটি জায়গায় হিন্দুমুসলমানে বিরোধ, এবং খুনাখুনি লুটপাট হওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের বিস্তর লোকের মন উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে। লুণ্ঠন, রক্তপাত, বিদ্বেষ, অতিশয় শোচনীয়। কোন পক্ষেরই দোষক্ষালন করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। উভয় পক্ষেই পরমত-অসহিষ্ণু অনুদার লোক আছে। কেবল এইটুকু মনে রাখা উচিত যে ভারতসাম্রাজ্যে সাড়ে একত্রিশ কোটি লোক বাস করে, তাহার মধ্যে খুব বেশী হয় ত কয়েক হাজার লোকে অপকার্য্য করিয়াছে। তাহার জন্য মনে করা যাই[তে] পারে না যে সমুদয় হিন্দুর সহিত সমুদয় মুসলমানের বিরো[ধ] হইয়াছে; বরং, খবরের কাগজেই দেখা যাইতেছে যে [যত] জায়গায় মারামারি হইয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী জায়গা[য়] হিন্দুমুসলমানে পরস্পরের উৎসবে যোগ দিয়া পরস্পর[কে] সাহায্য করিয়া সদ্ভাব দেখাইয়াছে। অধিকাংশ জায়গা[য়] সদ্ভাব অসদ্ভাব কোনটিরই বিশেষ বাহ্য লক্ষণ দেখা [যায়] নাই। ভারতসাম্রাজ্যে নগর ও গ্রামের সংখ্যা সাত ল[ক্ষ] ত্রিশ হাজার সাত শতের উপর। আরা জেলার দা[ঙ্গা] হাঙ্গামার ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগুলিকেও আলাদা আলা[দা] জায়গা বলিয়া ধরিলেও, মহরমের সময় ১৫০ জায়গাতে বিরোধ হয় নাই। ধরুন যে ১৫০ বা ২০০ জায়গাতে হইয়াছে (ইহা খুব বেশী ধরা হইল); কিন্তু বিরোধ [হয়] নাই সাত লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচ শত জায়গায়। সুতর[াং] একটা হিন্দুমুসলমানের ভারতব্যাপী বিরোধ কল্পনা করিব[ার] প্রয়োজন নাই, ভিত্তিও নাই। অবশ্য যেখানে যেখা[নে] দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই, তাহার সব জায়গাতেই কো[ন] অসদ্ভাব নাই, মনে করা যায় না। অনেক জায়গায় অপ্রী[তি] আছে; কিন্তু তাহার মাত্রা দাঙ্গা হইবার মত নহে। এ[ক] বারুদ অনেক জায়গায় থাকিলেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সব জায়গা[য়] না থাকিতে পারে।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। আরা জেলা[র] যে-সব গ্রামে মুসলমানদের বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে, ও অন্যবি[ধ] অত্যাচার হইয়াছে, সেখানেও অনেক হিন্দু অনে[ক] মুসলমানকে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়াছে; আশ্রয়দাতাদে[র] অন্তরের মানুষটি ধর্ম্মোন্মাদ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ [ও] সংকীর্ণতার উপরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে দক্ষিণ-পশ্চিম পঞ্জাবে যখন রিস্তর গ্রামে হিন্দুদের বাড়ী লুণ্ঠি[ত] হয় এবং অন্যান্য অত্যাচার হয়, তখনও খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম, কোন কোন জায়গায় কোন কোন মুসলমা[ন] কতকগুলি হিন্দুকে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়াছিল। এখানে[ও] আশ্রয়দাতাদের অন্তরের মানুষটি নিকৃষ্ট ভাবকে পরাজি[ত] করিতে পারিয়াছিল। সমগ্র হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনা[য়] যাহারা সংখ্যায় অতি কম সেই গর্হিতাচারী মুসলমানদিগকে সমুদয় মুসলমানের প্রতিনিধি মনে করা উচিত নয়; অন্য

দিকে সমগ্র হিন্দুসমাজের তুলনায় যাহাদের সংখ্যা খুব কম সেই গর্হিতাচারী হিন্দুদিগকে সমুদয় হিন্দুর প্রতিনিধি মনে করা উচিত নয়। ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে উত্তেজনার সময়েও কোন কোন জায়গায় হিন্দুমুসলমান উভয়েই মানুষের মত কাজ করিয়াছে, ও করিতে পারে। আরা জেলায় হৃতসর্ব্বস্ব মুসলমানদের সাহায্যার্থ হিন্দুরাও চাঁদা দিতেছে।

এবার মহরমের সময়ে, কাগজে যেরূপ দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ স্থলে হিন্দুরা অপকার্য্য করিয়াছে। ঘটনাগুলা সম্প্রতি ঘটিয়াছে বলিয়া মুসলমানদের চিত্তবিক্ষেপ হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহাদের কেহ কেহ হিন্দুসমাজকে ও হিন্দুদের কোন কোন কাগজকে দোষ দিতেছেন। আমরা কোন পক্ষ অবলম্বন করিতেছি না, এবং কাহারও দোষ-ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিতেছি না। হিন্দুদের দোষও দোষ, মুসলমানদের দোষও দোষ। মুসলমান নেতা ও সাধারণ লোকদিগকে এবং মুসলমান সম্পাদকদিগকে আমরা কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে, উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে বহুবৎসর ধরিয়া মুসলমান দস্যুরা লুণ্ঠন ও মানুষ অপহরণ করিয়া আসিয়াছে, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে দক্ষিণ-পশ্চিম পঞ্জাবে বিস্তর গ্রামে মুসলমানেরা হিন্দুদের বাড়ী লুঠ ও অন্য অত্যাচার করিয়াছে; কিন্তু এইসব অপকার্য্যের জন্য আমরা সমগ্র মুসলমানসমাজকে দায়ী করি নাই।

দোষী হিন্দু বা মুসলমানদের অপকার্য্যের কথা খবরের কাগজে বা সরকারী রিপোর্টে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি; প্রকৃত বৃত্তান্ত যে কি, জানি না।

বর্ত্তমান বৎসরে যেমন ভারতসাম্রাজ্যের সাত লক্ষ ত্রিশ হাজারের উপর গ্রামনগরের মধ্যে অতি অল্প কয়েকটি জায়গায় হিন্দুমুসলমানের বিরোধ হইয়াছে, বরাবরই সেইরূপ। কখন কখন ইহা অপেক্ষাও খুব কম জায়গায় হয়, বেশী জায়গায় প্রায় হয় না।

হিন্দুমুসলমানের ঝগড়ার একটা বিশেষত্ব সকলে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, প্রতি বৎসর যেমন বৃটিশ ভারতের কোথাও-না-কোথাও এই বিরোধ হয়, দেশী রাজ্যগুলির কোনটিতে সেরূপ হয় না। ইহার কারণ যাহাই হউক, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে ভয় হয়, পাছে দুষ্ট লোকে দেশী রাজ্যগুলির এই বিশেষত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষে এখন যেমন মধ্যে-মধ্যে কোথাও-কোথাও হিন্দুমুসলমানের মারামারি হয়, পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশ-সকলেও পূর্ব্বে সেইরূপ খৃষ্টিয়ান ও ইহুদী এবং প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে হইত। এইরূপ সংঘর্ষ বরং ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী হইত, তবু কম নয়। এখনও পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশসকলে এইরূপ ধর্ম্মোন্মাদজনিত দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া থাকে, যদিও তাহা প্রতি বৎসর বা বেশী সংখ্যায় হয় না। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত টুআর্ডস্ হোম রুল (Towards Home Rule) নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ১০৩-৪ ও ১৩৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। ধর্ম্মের জন্য মারামারির সংখ্যা পাশ্চাত্য দেশ-সকলে কমিয়া থাকিলেও, রাজনৈতিক, আর্থিক, গায়ের রং বা জাতিগত দাঙ্গা (race strife) ঐ-সব দেশে অনেক বেশী হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষেরই উপর বিধাতার অভিশাপ বিশেষ করিয়া পড়িয়াছে, এরূপ ভাবিয়া আমরা যেন নিরাশ না হই। অন্য দেশে মারামারি খুনাখুনি হইত বা এখনও হয় বলিয়া আমাদের দেশের বিরোধ ও সংঘর্ষ উপেক্ষণীয় ও মার্জ্জনীয়, কিম্বা তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য নহে, আমাদের মনের ভাব এরূপ নহে। বরং আমরা এই বলি, যে, অন্যান্য দেশে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়া কুসংস্কার ও ধর্ম্মোন্মাদ দূর করায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মারামারির মূল উচ্ছেদ করিয়াছে; অন্যান্য দেশে প্রজাদের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাষ্ট্রীয় হিতসাধনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের লোকে একযোগে কাজ করিতে পাইয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে; অতএব, আমরাও জ্ঞানের আলোক দেশের সর্ব্বত্র গৃহে গৃহে, সুদূর পল্লীগ্রামের প্রান্ত পর্য্যন্ত, বিকীর্ণ করিতে চেষ্টা করি, এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকে দেশের হিতসাধনক্ষেত্রে মিলিত হই।

চোখের কাছে যাহা ঘটে, মানুষ তাহাতে অধিক বিচলিত হইয়া পড়ায় সত্যসম্বন্ধে প্রকৃত ধারণায় উপনীত হইতে পারে না। অতীত ২৫, ৫০, ৭৫, বা ১০০ বৎসরের খবর লইলে হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ও

ব্যবহার কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে ধারণা বেশী ভ্রমহীন হইবার সম্ভাবনা। এবিষয়ে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত ডাক্তার টেলারের ঢাকার স্থান-বিবৃতি (Topography of Dacca) হইতে জানা যায় যে তখন এই দুই সম্প্রদায়ে ঝগড়া প্রায় হইত না। তিনি বলেন, "These two classes live in perfect peace and concord, and a majority of the individuals belonging to them have even overcome their prejudices so far as to smoke from the same hookah" (page 257)। ডাক্তার টেলার এই পুস্তক কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের সরকারী মেডিক্যাল বোর্ডের অনুরোধে লিখিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ওআল্টার হামিল্টন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার নামক যে-বহি লিখিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের নামে উৎসর্গ করেন, তাহাতে হিন্দুস্থান, রংপুর, মালাবার, দক্ষিণাপথ, বালুচীস্তানের রাজধানী কেলাট, আফগানিস্তান, কাবুল ও কান্দাহারে হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতির পরিচয় আছে। টুআর্ড্‌স্ হোমরূল পুস্তকের ১ম খণ্ডের ১০০-১০২ পৃষ্ঠায় এই দুই পুস্তক হইতে লেখকদের নিজের কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষের সহিত সংস্পৃষ্ট তখনকার একজন প্রধান ইংরেজ মিঃ জন সালিভ্যান হাউস্ অব্ কমন্সের সিলেক্ট কমীটীর সম্মুখে সাক্ষ্য দেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "543. The Hindus and the Mussalmans sit together very friendly, without reference to each others' religion ?" উত্তরে তিনি বলেন, "Without any reference whatever to their religion, there is a feeling of perfect equality; they live in social habits |" অন্যতম ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মুসলমানরাজত্বকাল সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, "the interests and sympathies of the conquerors and the conquered became identified."

কখন কখন গোবধ ছাড়া আর-একটি কারণে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া হয়। মুসলমানেরা বলেন, মসজিদের নিকট গীতবাদ্য নিষিদ্ধ। মসজিদের সম্মুখ দিয়া বা নিকটে কেহ বাজনা বাজাইলে বিরোধের কারণ ঘটে। বস্তুতঃ যে কোন সম্প্রদায়ের লোকে কোন গৃহে ভগবানের আরাধনা ধ্যান ধারণায় ব্যাপৃত থাকে তাহার নিকট গোলমাল করিলে উপাসনায় ব্যাঘাত হয়। এরূপ ব্যাঘাত জন্মান কখন উচিত নহে। কিন্তু যখন কোন ভজনালয়ে কেহ আরাধনা আদি করিতেছেন না, তখন আপত্তির যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি যদি সকল সময়ে মসজিদের নিকট গীতবাদ্য নিষিদ্ধ হয়, সেই বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মুসলমানেরাও বিবেচনা করিবেন যে তাঁহারা যখন মহরমের সময় তাজিয়া লইয়া বাহির হন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জয়ঢাক বাজিতে থাকে, তখন তাঁহারা অন্ততঃ রাত্রিকালেও লোকের সুবিধা ও নিদ্রা সম্বন্ধে বিবেচনা করেন কি না, এবং অন্য সম্প্রদায়ের উপাসনামন্দির গির্জ্জা আদির নিকট দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইবার সময় যদি দেখেন যে তথায় উপাসনা হইতেছে, তখন আপনা হইতেই তাঁহারা বাদ্য বন্ধ করেন কি না। আমার প্রতি অন্যের যেরূপ ব্যবহার বাঞ্ছনীয় মনে করি, অন্যের প্রতি আমি সেইরূপ ব্যবহার করিলে প্রতিবেশীর মত কাজ করা হয়।

কলেজসমূহে স্থানাভাব।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরও আমরা শুনিতে পাইতাম যে অনেক ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে স্থানাভাব বশতঃ ভর্ত্তি হইতে পারিতেছে না। এবৎসর এই সমস্যা আরও গুরুতর হইয়াছে। এবারে এগার হাজারের উপর ছেলে প্রবেশিকায় পাস হইয়াছে; তাহার মধ্যে প্রায় ছয় হাজার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কলিকাতার প্রত্যেক কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে দুটি ভাগ করিয়া ৩০০ ছেলে ভর্ত্তি করিলে, এবং মফঃস্বলের প্রত্যেক কলেজের ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে ১৫০ করিয়া ছেলে লইলেও বোধ হয় কেবলমাত্র ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের স্থান হইতে পারে। কিন্তু সব কলেজে এই হিসাবে ছাত্র লইবে না, এবং সংখ্যা ২য় ও ৩য় বিভাগের ছাত্রদের কি গতি হইবে? ১ম বিভাগে পাস হইলেই ছাত্রকে খুব ভাল এবং ২য়, ৩য় বিভাগে পাস হইলেই ছাত্রকে মন্দ বলা যায় না। শিক্ষালাভ করিবার

ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকা সত্বেও শিক্ষা না পাওয়া বড়ই ক্লেশের কারণ। দেশের পক্ষেও ইহা অকল্যাণকর। হঠাৎ ত অনেকগুলা কলেজ স্থাপন করা যায় না, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকালকার কড়া নিয়ম অনুসারে। আমরা গত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের কাগজে লিখিয়াছিলাম যে দশটা হইতে তিনটার মধ্যে সাধারণতঃ যেমন কলেজগুলিতে পড়ান হয়, তাহা ছাড়া প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যারাত্রে অতিরিক্ত ছাত্রদের জন্য ক্লাস করিলে আরও অনেক ছাত্রের পড়িবার সুবিধা হইতে পারে। আমেরিকার কোথাও কোথাও এইরকমের স্কুল হইতেছে, এবং বিলাতেও সকাল, দুপর, বিকাল, ও সন্ধ্যারাত্রে ক্লাস করিবার রীতি সমর্থিত হইতেছে, একথাও আমরা লিখিয়াছিলাম। কলিকাতার দুটি কলেজে গত বৎসর এইরূপ অতিরিক্ত ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস খুলা হয়। তাহার ফলাফল বিবেচনা করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। আমরা অবগত হইলাম, কমিটি এইরূপ ক্লাস করিবার রীতির বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই, উহার সমর্থনও করেন নাই; কেবল ঐ কলেজ দুটির বন্দোবস্তে কি কি ত্রুটি হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি যাহাতে না হয়, তাহা দেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যই কর্ত্তব্য; কিন্তু এইরূপ ক্লাস করিতে দেওয়াও উচিত। গবর্ণমেণ্ট একটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে মফঃস্বলে কতকগুলি এণ্ট্রেন্স স্কুলে ইণ্টারমীডিয়েট পড়াইবার বন্দোবস্ত করা হউক, তাহা হইলে কলিকাতার বড় বড় কলেজে ছাত্রের ভীড় কিছু কমিবে। ইহা একটা উপায় বটে, কিন্তু একটা পূরা কলেজে যেমন ভাল অধ্যাপক থাকে, এক একটা আধা কলেজে তাহা থাকিতে পারে না। তা ছাড়া, উচ্চতর ও উচ্চতম কলেজ-ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গ, সংস্পর্শ ও দৃষ্টান্তে নীচের ক্লাসের ছেলেদের যে উপকার হয়, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা অন্যায় ও অনিষ্টকর। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্র হইতে অগ্রসর ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্র স্বতন্ত্র হওয়া উচিত নয়। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে আপাততঃ কিছু সুবিধা হইলেও আমরা ইহাকে একটা স্থায়ী প্রকৃষ্ট উপায় মনে করি না। গবর্ণমেণ্ট যে, কয়েক বৎসর হইতে ইস্কুল ও কলেজবিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিবার জন্য জেদ করিয়া আসিতেছেন, এখন তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন কেন?

কেহ কেহ বলেন, আমাদের দেশে কেবল কেতাবী শিক্ষা বড় বেশী হইতেছে; শিল্পবিদ্যালয় আদি খোলা উচিত। আমরাও বলি, শিল্পবিদ্যালয়, বাণিজ্য-বিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয়, শিল্প-কলেজ, বাণিজ্য-কলেজ, কৃষি-কলেজ, নিশ্চয়ই খোলা উচিত; আরো এঞ্জিনীয়ারিং স্কুল কলেজ, আরো মেডিকাল স্কুল কলেজ খোলা উচিত। তাহা হইলে নূতন নূতন পথে ছাত্রেরা ধাবিত হইবে। কিন্তু এ কথা সত্য নহে যে আমাদের দেশের সাধারণ কলেজী শিক্ষা খুব বেশী হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্য দেশসকলের লোকসংখ্যা ও তথাকার সাধারণ কলেজসকলে বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে কত ছাত্র পড়িত, তাহার সহিত আমাদের দেশের লোকসংখ্যার এবং আমাদের সাধারণ কলেজসকলের ছাত্রসংখ্যার তুলনা করিলে আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

কলিকাতার অধিকাংশ কলেজ এখনও খুলে নাই; কিন্তু ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে যে বড়-বড় কলেজগুলিতে আর স্থান নাই। মফঃস্বলেও ভাল ভাল কলেজ আছে। কোথাও কোথাও স্বাস্থ্যও বেশ ভাল। ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। ছাত্রেরা সেইসব কলেজে যান। তাহাতেও যাঁহাদের জায়গা হইবে না, তাঁহারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নামে চিঠি লিখিয়া তাঁহাকে জানান যে তাঁহারা পড়িতে পাইতেছেন না। উচ্চ শিক্ষা লাভে ইচ্ছুক ও সমর্থ সব ছাত্র যাহাতে শিক্ষা পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে তিনি ইচ্ছুক, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। তাঁহার সামর্থ্য অবশ্য ইচ্ছার সমান নয়, কিন্তু তিনি অন্ততঃ জানুন ও বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান যে ঠিক্ কত ছেলে পড়িতে পাইতেছে না। নীরবে সমুদয় ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করা আমাদের দেশের লোকদের একটা রোগ। সব অসুবিধার একটা প্রতীকার আছে। প্রতীকারের চেষ্টা করিবার আগেই অদৃষ্টকে দোষ দিয়া বসিয়া পড়া মানুষের উচিত নহে। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।

দৈব দিবে, ইহা কাপুরুষেরাই বলে; কিন্তু লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই আশ্রয় করেন,—উদ্যোগিনম্ পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ।

শাসনসংস্কার সম্বন্ধে কার্টিসের প্রস্তাব।

মিঃ লায়নেল কার্টিস্ একজন দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশিক ইংরেজ। ভারতবাসীদিগকে কি-প্রকারে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যাইতে পারে, তিনি তাহার চর্চ্চা করিতেছেন। সে সম্বন্ধে তিনি Four Studies of Indian Government নাম দিয়া একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। উহা একটাকা মূল্যে এলাহাবাদের ১৫ নং এলগিন রোড ঠিকানায় হুইলার এণ্ড কোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায়। মিঃ কার্টিসের একটু পূর্ব্বপরিচয় দিবার জন্য লিখিতেছি, যে, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত শাসন-কর্ত্তাদের আইনের গুণে হাজার হাজার ভারতবাসী নানা-প্রকারে কষ্ট পাইয়াছে, ও অনেকে জেলে গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধি তিনবার জেলে গিয়াছিলেন। মিঃ কার্টিসের সম্বন্ধে ভারত-বন্ধু মিঃ পোলাক ১৯১৬ ডিসেম্বরের মডার্ণ রিভিউএ লিখিয়াছেন:—

"*he*, more than any other, was responsible for and srtongly advocated the Transvaal Asiatic Ordinance, whose passage, in the nominated Legislative Council, in the teeth of the unanimous opposition of the Indian community, for eight years plunged South Africa into a vortex of racial passions, and shook the Empire to its depths" (p. 656).

ইহাও বলা দরকার যে তিনি বড় বড় ইংরেজ আমলাদের বন্ধু। এহেন কার্টিস যে ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা, মিষ্ট কথা ও উঁচু কথা ছাড়া তাহার অন্য প্রমাণ চাই।

শুনিলাম, কলিকাতার ভারতসভা মিষ্টার কার্টিসের শাসনব্যবস্থা অনুমোদন ও গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মানে যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। কলিকাতার আর-এক দলের নেতা বাবু মতিলাল ঘোষও নাকি এই ব্যবস্থায় রাজি হইয়াছেন। দুই দলেরই বড়-কর্ত্তা ছাড়া, মেজো, সেজো, ছোট, প্রভৃতি আরো অনেক কর্ত্তাও নাকি রাজী হইয়াছেন। ব্যবস্থাটি ভাল কি মন্দ, আলোচনা করিবার আগে আমরা অন্য দুএকটা কথা বলিয়া লইতে চাই।

আমরা যে এতদিন ধরিয়া স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন চাহিয়া আসিতেছি, তাহার মানে এই যে, দেশের লোকদের মত অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, ও মন্ত্রী এব কর্ম্মকর্ত্তারা দেশের লোকদের কাছে তাঁহাদের কাজে জন্য দায়ী হইবেন; অর্থাৎ দেশে গণতন্ত্র শাসনপ্রণা স্থাপিত হইবে। আর-এক দিক্ হইতে বলিতে গে বলিতে হয়, যে, দেশের লোকে চাহিয়াছে, যে, দেশে লোকের নিকট দায়িত্ববিহীন কতকগুলি (তাহারা ইংরেজ হউক বা ভারতীয়ই হউক) লোকের শাসনের পরিবর্ত্তে দেশের লোকের নিকট দায়ী লোকদের দ্বারা রাষ্ট্রীয়-কার্য নির্ব্বাহপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হউক। কিন্তু গোড়াতেই দেখিতেছি, যাঁহারা নেতৃত্বের দাবী করেন, তাঁহারা গণতন্ত্রে মূলনীতিই লঙ্ঘন করিতেছেন। ভারতসভার যদি বি গুরুত্ব থাকে, তাহা দেশের লোকের প্রতিনিধি বলিয়া। ছু সময় অন্য অনেক লোক ত কলিকাতায় ছিলেনই ভারতসভারই অনেক সভ্য কলিকাতায় ছিলেন না, যে কেহ এখনও ফিরেন নাই। এ সময়ে এরূপ গুরুতর বিষ মত দেওয়া ঠিক্ হয় নাই। ভারতসভা যে ব্যবস্থাটি গ্র করিয়াছেন বলিয়া শুনিলাম, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা ত দেশে লোককে মত প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ দেন না বেঙ্গলীতে, অমৃতবাজারে, কোন বাংলা কাগজে, কে প্রকাশ্য সভায় প্রদত্ত বক্তৃতায়, কোনভাবেই ত তাহা দেশে লোকের কাছে উপস্থিত করা হয় নাই। বাংলা খবরে কাগজগুলিও এতদিন ছুটি ভোগ করিতেছিল। ব্যবস্থা কার্টিসের বহিতে আছে বলিলে চলিবে না। তাহা ইংরেজ এবং অতি অল্প লোকেই উহার অস্তিত্ব অবগত আছে। ব দ্বিতীয় ও চতুর্থ চর্চ্চায় আবার দুটি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন-রকম ব্যবস্থা আছে। কোন্‌টি "নেতা"রা মঞ্জুর করিলেন, এ পর্য্যন্ত অমুদ্রিত কোন্ নূতনতর ব্যবস্থায় তাঁহারা দিলেন, তাহা লোকে কেমন করিয়া জানিবে? কার্টি কোন ব্যবস্থা যে অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়াছে, তাহা কোন খবরের কাগজেও ছাপা হয় নাই। যদি অনুমোদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গোপন করিবার কারণ কি? হইয়া না থাকে, তাহা হইলে শহরের শিক্ষিতসমাজে গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিথ্যা বলিয়া ভারতস সুরেন্দ্র বাবু, মতি বাবু, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রচার কর

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন এই-প্রকার "হাম্‌-বড়া" ভাবে কেহ করিতে চাহিলে সে চেষ্টার ব্যর্থতা ভাবিয়া হাসি পায়।

ব্যবস্থাটি ঠিক্ কি আকারে গৃহীত হইয়াছে, না জানায়, বহিখানাতে চতুর্থ চর্চ্চায় যেরূপ আছে এবং তাহার পর কাহারও কাহারও কাছে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহারই কিছু সমালোচনা করিতেছি।

ব্যবস্থাটার প্রথম প্রধান বিশেষত্ব এই যে উহাতে কেবল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিতে কিছু নূতনত্ব সঞ্চার করিবার এবং দেশের লোকদিগকে কিছু ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব আছে; ভারত-গবর্ণমেণ্টের পরিচালন-প্রণালী এখন যেমন আছে, তেমনি থাকিবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট বা বিভাগগুলিকে দুটি থাক্ বা শ্রেণীতে সাজান হইয়াছে। প্রথম থাকে আছে—

Vernacular Education. নিম্নশিক্ষা।
Medical Relief. চিকিৎসা ও ঔষধ দান।
Rural Sanitation. গ্রামসকলের স্বাস্থ্যোন্নতি।
The Veterinary Service. পশুচিকিৎসা বিভাগ।
Roads other than Provincial Trunk Roads. প্রাদেশিক বৃহৎ রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা।
A Public Works Department. একটা পূর্ত্তবিভাগ।
Control of all other functions already delegated to boards. বোর্ডগুলির অন্য কাজের উপর কর্তৃত্ব।
The general control of district and municipal bodies. বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির কর্তৃত্ব।

দ্বিতীয় থাকে আছে—

Agriculture. কৃষি।
Co-operative Credit. যৌথ ঋণদান।
Industries. অর্থকরশিল্প।
Museums. মিউজিয়াম।
Registration of Deeds. দলিল রেজিষ্ট্রী।
Provincial Trunk Roads and Bridges. প্রাদেশিক বড় রাস্তা ও সেতু।
Local Railways. স্থানিক রেলওয়ে।
Forest. অরণ্য।
Irrigation. জলসেচন।
Higher education. উচ্চশিক্ষা।
Famine Relief. দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান।

এই শ্রেণীবিভাগে পুলিস্, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার, জমীর খাজনা নির্দ্ধারণ ও আদায়, প্রভৃতি গুরুতর কাজের কোন উল্লেখই নাই। বহিখানার দ্বিতীয় চর্চ্চায় গবর্ণমেণ্টের ডিপার্টমেণ্টগুলিকে যে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, তাহার চতুর্থশ্রেণীতে এইসব কাজ আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও আইন করিবার ক্ষমতার উল্লেখ নাই। "নেতা"রা কোন্ শ্রেণীবিভাগটা গ্রহণ করিয়াছেন জানি না। যেটাই করুন, মূল কথাটা এই যে, প্রথমে দেশের লোকদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যিনি সকলের চেয়ে ক্ষমতাশালী তাঁহাকে গবর্ণর প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করিবেন, এবং তাঁহাকে অন্যান্য মন্ত্রী বাছিয়া লইয়া মন্ত্রীসভা (cabinet) গড়িতে বলিবেন। এই মন্ত্রীরা প্রথমে উপরে মুদ্রিত দুটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কাজগুলি পাঁচ বৎসর ধরিয়া নির্ব্বাহ করিবেন। অন্যান্য বিভাগের কাজ সম্বন্ধে আমাদের প্রতিনিধিরা এখনকার মত কেবল সমালোচনা করিতে, পরামর্শ দিতে, প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ও ভোট দিতে পারিবেন; এসব বিষয়ে তাঁহাদের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন প্রধান মন্ত্রী কখন কোন বিষয়ে অধিকাংশ প্রতিনিধির মত না পাইলে পদত্যাগ করিবেন, এবং তাঁহার স্থানে গবর্ণরের মনোনীত অন্য একজন প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন। পাঁচ বৎসর পরীক্ষার পর আমাদের প্রতিনিধিদের ও মন্ত্রীসভার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইলে প্রদেশটির স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইবে; যদি তাঁহারা মাঝারি-রকম সামর্থ্য দেখান, তাহা হইলে আরো পাঁচ বৎসর ঐরূপ কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদেশটিকে দেওয়া হইবে; খুব সামর্থ্য দেখাইলে দ্বিতীয় থাক্ হইতে আরও এক আধ রকমের কাজ এবং কিছু বেশী টাকা দেওয়া হইবে। কিন্তু কবে কোন্ কালে যে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা প্রদেশের পুলিস্, রাজস্ব, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার, সর্ব্ববিধ শিক্ষা, আইনপ্রণয়ন, প্রভৃতি সব-রকমের কাজের ভার পাইবেন, তাহার স্থিরতা বা উল্লেখ নাই; এবং সমগ্র ভারতের শাসন-কার্য্যে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ও মন্ত্রীসভায় দেশের লোকের প্রতিনিধিরা যে কখনও দেশমতকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রভু করিতে পারিবেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই। কার্টিসের ব্যবস্থায় দেশের লোকদিগকে সমগ্র ভারতের শাসনকার্য্যে যে কোন ক্ষমতাই দিবার প্রস্তাব নাই, এবং প্রাদেশিক কার্য্যেও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কাজ যে

আমাদিগকে বহুকাল বা হয়ত কখনও দেওয়া হইবে না, তাহার কারণ শুনিয়াছি দুটি। (১) এত বড় কাজ দেশের লোকে করিতে পারিবে না; (২) এত ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দিতে রাজী হইবেন না। আমরা যে কোন্ কাজটা পারিব, কোন্‌টা পারিব না, তাহা, করিবার সুযোগ না পাইলে, আমরাও বলিতে পারি না, অন্য লোকেও পারে না। আমরা দেখিতেছি, ভারতসচিবের মন্ত্রীসভা ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীসভা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় যে কাজের ভার ভারতবাসীরা পাইয়াছে, তাহাই তাহারা করিতে পারিয়াছে; আমরা দেখিতেছি, বড় বড় ও ভাল দেশী রাজ্যের সকল-রকম কাজ, দেশী লোকে উত্তমরূপে করিতেছে; আমরা জানি ইংরেজের শাসনের আগে বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ ভারতে ছিলেন। অতএব সমগ্র ভারত-বর্ষের ও একটি একটি প্রদেশের সব-রকমের কাজ কেন আমরা করিতে পারিব না? বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ও মস্‌লেম লীগ্ কেবল আভ্যন্তরীণ কাজের ভার চাহিয়াছেন, সৈনিক বিভাগের এবং বিদেশের সহিত সন্ধি যুদ্ধ আদির ভার চান নাই। সত্য বটে, আমরা প্রথম প্রথম অনেক ও বরাবরই কিছু কিছু ভুল করিব। কিন্তু কোন্ দেশের নেতারা প্রতিনিধিরা মন্ত্রীরা এখনও বড় বড় ভুল করিতেছেন না? ভুল করিবার সুযোগ পাওয়াই শিখিবার ও সিদ্ধিলাভ করিবার একমাত্র উপায়। অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা এরূপ অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তির কাজ যে আমরা তাহার ধারণাই করিতে পারি না। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেকী বলিয়াছেন:—

"Statesmanship is not like poetry, or some of the other forms of higher literature, which can only be brought to perfection by men endowed with extra-ordinary natural gifts. The art of management, whether applied to public business or to assemblies, lies strictly within the limits of education, and what is required is much less transcendental abilities than early practice, tact, courage, good temper, courtesy and industry.

"In the immense majority of cases the function of statesmen is not creative, and its excellence lies much more in execution than in conception. In politics combinations are usually few, and the course that should be pursued is sufficiently obvious. It is the management of details, the necessity of surmounting difficulties, that chiefly taxes the abilities of statesmen, and those things can to a very large degree be acquired pr actice."

এ-সব কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, যে-দেশে এখনও চিন্তার ও কার্য্যের নানা ক্ষেত্রে মহৎ লোক জন্মিতেছে, সে দেশে রাষ্ট্রীয় কাজ করিবার লোকের অভাব না হইবারই সম্ভাবনা।

আর একটা আপত্তি এই হইতে পারে যে দেশী রাজ্যগুলি ছোট; তাহাদের শাসনে সিদ্ধিলাভের দ্বারা প্রমাণ হয় না যে বৃহত্তর প্রদেশগুলির বা সমুদয় ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য দেশী লোকে করিতে পারিবে। ইহার সাধারণ উত্তর এই যে ছোট দেশের শাসনে ও বড় দেশের শাসনে একই রকমের শক্তির দরকার হয়। যাহারা ছোট দেশের কাজ চালাইতে পারে, তাহারা বড় দেশেরও পারে, সাধারণ ভাবে ইহা সত্য। এই বিষয়টির সম্যক্ আলোচনা "টুআর্ড হোমরূল" বহির ১ম খণ্ডের ১৬-১৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ফর্টনাইটলী রিভিউ নামক শ্রেষ্ঠ বিলাতী মাসিকে ভাবনগর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর উদয়শঙ্কর ওজা মহাশয়ের কার্য্যের আলোচনা করিতে গিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে ছোট রাজ্য শাসনে বড় সাম্রাজ্যের কাজ চালাইবার মতই শক্তি ও দক্ষতার দরকার হয়। যথা—

'These words contain a rapid survey of the work of a whole life, and if we were to enter here into the details of what was actually achieved by this native statesman, we shall find that few Prime Ministers even of the greatest states in Europe have so many tasks on their hands, and performed them so boldly and so well. The clock on the tower of the Houses of Parliament strikes louder than the repeater in our waistcoat pocket, but the machinery, the wheels within wheels, and particularly the spring, have all the same tasks to perform as in Big Ben himself. Even men like Disraeli or Gladstone, if placed in the position of these native statesmen, could hardly have been more successful in grappling with the difficulties of a new State, with rebellious subjects, envious neighbours, a weak sovereign, and an all-powerful suzerain, to say nothing of court intrigues, religious squabbles, and corrupt officials. We are too much given to measure the capacity of ministers and statesmen by the magnitude of the results which they achieve with the immense forces placed at their disposal. But most of them are very ordinary mortals, and it is not too much to say that for making a successful marriage-settlement an ordinary solicitor stands often in need of the same vigilance, the same knowledge of men and women, the same tact, and the same determination or bluff which Bismarck displayed in making the treaty of Prague or of Frankfurt. Nay, there are mistakes made by the greatest statesmen in history which, if made by our solicitor, would lead

to instant dismissal. If Bismarck made Germany, Gaurisankar made Bhavnagar. The two achievements are so different that even to compare them seems absurd, but the methods to be followed in either case are, after all, the same; nay, it is well known that the making or regulating of a small watch may require more nimble and careful fingers than the large clock of a Cathedral. We are so apt to imagine that the man who performs a great work is a great man, though from revelations lately made, we ought to have learnt how small—nay, how mean—some of these so-called great men have really been."

কয়েকটি দেশী রাজ্যের, ব্রিটিশ উপনিবেশের ও ইউরোপীয় দেশের মোটামুটি লোকসংখ্যা দিতেছি। গোআলিয়র ৩০ লক্ষ, ত্রিবাঙ্কুড় ৩৪ লক্ষ, বড়োদা ২০ লক্ষ, মহীশূর ৫৮ লক্ষ, হাইদরাবাদ ১ কোটি ৩৪ লক্ষ; নিউজীল্যাণ্ড ১১ লক্ষ, নিউসাউথওয়েলস ১৬॥০ লক্ষ, ভিক্টোরিয়া ১৩ লক্ষ, কুইন্সল্যাণ্ড ৬ লক্ষ; ডেন্মার্ক ২৭ লক্ষ, হল্যাণ্ড ৬২ লক্ষ, সুইজারল্যাণ্ড ৩৮ লক্ষ, সার্বিয়া ২৯ লক্ষ। ছোট ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির ও ছোট ইউরোপীয় দেশগুলির মন্ত্রী ও অন্য কার্য্যকর্ত্তাদের বড় বড় কাজ করিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে কেহ ত এই বলিয়া সন্দেহ করে না যে তাহারা ছোট ছোট দেশ শাসন করিয়াছে, অতএব তাহাদের বড় দেশের বড় কাজ করিবার যোগ্যতা নাই? আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড চেম্সফোর্ড বড়লাট হইবার আগে এত বড় কাজের যোগ্যতার কি পরিচয় দিয়াছিলেন? তিনি কুইন্সল্যাণ্ডের গবর্ণর ছিলেন, যাহার লোকসংখ্যা ছয় লক্ষ মাত্র, এবং নিউসাউথওয়েলসের গবর্ণর ছিলেন, যাহার লোকসংখ্যা সাড়ে ষোল লক্ষ। ছয় লক্ষ ও সাড়ে ষোল লক্ষ লোকের শাসনকর্ত্তার যদি সাড়ে একত্রিশ কোটি লোক শাসন করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে যে ভারতবাসীরা ৩০, ৩৪, ২০, ৫৮ লক্ষ বা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ লোকের কাজ চালায় সেই ভারতবাসীরাই না কেন সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের কাজ চালাইতে পারিবে না? ইংরেজের রক্তেই কোন বিশেষ গুণ নাই। তাহা হইলে সব ইংরেজই খুব যোগ্য লোক হইত। তাহারাও ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে, আমরাও ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিব।

একটা কথা উঠিয়াছে যে দেশী রাজ্যে দেশী লোকে কাজ করে বটে, কিন্তু কর্ম্মচারীরা দেশের লোকের কাছে দায়ী নয়, সুতরাং দেশী রাজ্যগুলিতে দায়ী গবর্ণমেণ্ট বা রেস্পন্সিবল্ গবর্ণমেণ্ট নাই। ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও বহু পরিমাণে সত্য। কিন্তু দেশী মন্ত্রীরা কতকটা দায়ী এবং তাঁহাদের দায়িত্ব ও প্রজাদের প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সে যাহা হউক, দেশী রাজ্যে সব-রকমের কাজ ত দেশী লোকে করে? আমরা যদি প্রধান প্রধান কাজেরই ভার না পাই, তাহা হইলে গ্রাম্য সারডোবা ও পাঠশালার দায়ী প্রধান মন্ত্রী হইয়া দায়ী কথাটি ধুইয়া খাইলে আমাদের পেটও ভরিবে না, জা'তও যাইবে।

কার্টিসের ব্যবস্থার দ্বিতীয় কারণ শুনিয়াছি এই, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নাকি এর চেয়ে বেশী ক্ষমতা আমাদিগকে দিবেন না। গবর্ণমেণ্ট এমন কথা বলেন নাই, সুতরাং আমরা তাহা মানিয়া লইব না। আর যদি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এইরূপই হয় যে তাঁহারা আমাদিগকে ভুও, অকেজো, বা সামান্য-রকম কিছু অধিকার দিবেন, তাহা হইলেই যে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে আমরা তাহাই চাই এবং তাহা পাইলেই আহ্লাদে আটখানা হইব, ইহা কোন্ আইনে, কোন্ শাস্ত্রে বলে? প্রথমেই কি কি ক্ষমতা কতটুকু করিয়া পাইলে আমরা দেশের মঙ্গল করিতে পারিব, এবং আরও বেশী পরিমাণে মঙ্গল করিবার ক্ষমতা আমাদের জন্মিবে, তাহা আমরাই স্থির করিব, এবং তাহাই আমরা চাহিব। গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতে চান, দিবেন; তাহা অগত্যা লইতে হইবে। তাহা আমাদের মনোমত না হইলে বলিব যে আমরা সন্তুষ্ট হই নাই; এবং পূরা স্বরাজ পাইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইব না। আমাদের ন্যায্য দাবী জানাইলে, গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাও দিবেন না, এরূপ মনে করার মত বোকামি আর নাই। ইংরেজ আমলাবর্গ ও তাঁহাদের বন্ধুরা যতটুকু দিতে চান তাহাই সেলাম ঠুকিয়া চাহিতে হইবে, ইহার মত ক্যাংলামিও আর নাই। যেন ভারতবর্ষকে কতকটা আত্মকর্ত্তৃত্ব দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ ও গরজ নাই! এ ইচ্ছাপ্রকাশ আমাদের প্রতি দয়াসম্ভূত নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য, সাম্রাজ্য অটুট রাখিবার জন্য, ইহা দরকার। যে-সব ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞের বুদ্ধি আছে তাঁহারা জানেন যে ভারতবর্ষকে আত্মকর্ত্তৃত্ব দিলে তাঁহাদেরও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল; না দিলে মঙ্গল নাই।

ভারত-গবর্ণমেণ্ট দেশের যত বড় কার্য্য ও ব্যবস্থা সবই করেন। দেশের দেওয়ানী ফৌজদারী ও অন্য সব-রকম সমগ্রদেশপ্রযুজ্য আইন করেন, সমস্ত দেশে ট্যাক্স স্থাপন বৃদ্ধি ও খুব একটা মোটা অংশ ব্যয় করেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও তদ্বিষয়ক আইন করেন, রেলওয়ে-নীতি স্থির করেন, বড় বড় রেল করেন, এবং আরও বড় বড় কাজ করেন। ভারতগবর্ণমেণ্টে আমাদের একটুও কর্তৃত্ব না থাকার মানে যে কি, তাহা ত এখন আমরা দেখিতেছি। কোন আইন যতই কড়া হউক, তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই; আমাদের সব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তাহার বিরোধী হইলেও তাহা পাস হইবে। রাজদ্রোহ-সম্বন্ধীয় আইনে ও প্রেস আইনে দেশের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হইলেও তাহাতে আমাদের হাত নাই। রেলওয়েগুলির মাল-ভাড়ায় দেশী শিল্পের সম্যক্ উন্নতি অসম্ভব হইলেও এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা পশুর অধম ব্যবহার পাইলেও আমরা কিছু করিতে পারি না। দেশের বাণিজ্যনীতি, কলকারখানা বিষয়ক নীতি, আমরা এখন নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারি না; স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রার সম্বন্ধ, পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক, বা অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যাপারে আমাদের হাত নাই। কার্টিসের প্রস্তাবে এ বিষয়ে আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না। দেশে কিরূপ শিক্ষা হওয়া চাই, কলেজ স্কুল আদি কি-প্রকারে আরও বাড়িতে পারে ও ভাল হইতে পারে, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে যেরূপ আইন করিয়া দিয়াছেন, সেই খোঁয়াড়ের ভিতরে যিনি যত ইচ্ছা লম্ফ ঝম্প করুন, শিং উঁচু করুন, কিন্তু খোঁয়াড়ের বাহিরে যাইবার জো নাই। লবণের কর বা অন্য কোন কর আমরা কমাইয়া বা উঠাইয়া দিতে পারি না। জমীর খাজনা সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বা বহুকালস্থায়ী বন্দোবস্ত আমরা করিতে পারি না। পুলিসের হাতে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে, যে, তাহারা বিনা বিচারে বিনা কারণে যে-কোন লোককে পিষিয়া ফেলিতে পারে, তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। আমরা তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারি না। ভারত-গবর্ণমেণ্টের বড় বড় মোটা মাহিনার কাজ এক আধটা ছাড়া ইংরেজের একচেটিয়া। আমাদের তাহাতে কোন হাত নাই। কার্টিসের প্রস্তাবে আমাদে অবস্থা সব বিষয়েই ঠিক্ এইরূপ থাকিবে। ইহাতে মা কেমন করিয়া সম্মতি দিতে পারে জানি না।

একটা পরিহাসের কথা আছে, "সর্ব্বস্ব তোমার, চাবি আমার।" কার্টিস রেস্পন্সিব্‌ল্ গবর্ণমেণ্ট দিবার প্রস্তাব করিতেছেন, কিন্তু রাজকোষের চাবীটি থাকিতেছে ইংরেজদের হাতে; আমাদিগকে তাঁহাদের অনুগ্রহজীবী হইয়া হইবে। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী লইয়া রাজায়-প্রজায় অতীতকালের দ্বন্দ্বের একটা অতিপ্রধান বিষয়ই ছিল, কে খাজনাখানার মালিক হইবে, কে সর্ব্ববিধ ব্যয় মঞ্জুর করিবে রাজা না প্রজা? প্রজারই জিত হইয়াছে। ইংলণ্ড শতাব্দীর চেষ্টায় যে রেস্পন্সিব্‌ল্ গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছে মহানুভব কার্টিস্ ও তাঁহার সরকারী বন্ধুগণ তাহা আমাদিগকে দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু চাবীটি ইংরেজ কর্ম্মচারীদের হাতেই থাকিবে। আমাদের মন্ত্রীদের বেশী টাকার দরকার হইলে তাঁহারা নূতন ট্যাক্স বসাইতে পারিবেন, এবং সেই-কারণে-অসন্তুষ্ট প্রজাগণ এংলো-ইণ্ডিয়ানদের চক্রে প্ররোচনায় "আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই না" বলিয়া সরকার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবে।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেরও সব ডিপার্টমেণ্ট বা বিভাগের উপর আমাদের হাত থাকিবে না। ইংরেজ কমিশনার ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্কুল-ইন্সপেক্টর অধ্যাপক প্রিন্সিপ্যাল প্রভৃতি এখনকার মত সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিবেন; তাহাদের উপর এখন যেমন আমাদের কোন কথা খাটে না পরেও খাটিবে না। প্রাদেশিক যে-যে বিভাগের কাজ আমাদের হাতে দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজ প্রায় নাই বা বেশী নাই। ইহার মানে নানারকম;- ইংরেজ দেশের লোকতন্ত্রের অধীন হইতে, তাহাদের নিকট দায়ী হইতে একেবারেই নারাজ, তাঁহাদের প্রভুত্বটা থাকা চাই-ই, তাঁহাদের মোটা মাহিনার চাকরী গুলাও প্রায় সবই থাকা চাই-ই। ইহা কি-রকমের স্বরাজ বা স্বরাজের সূত্রপাত?

পূর্ব্বমুদ্রিত প্রথম তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যে কাজের ভার আমরা পাইব, তাহা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যথেষ্ট টাকা চাই। সকলেই জানেন গবর্ণমেণ্টে এখন সক

রকম শিক্ষার জন্য, সুতরাং পাঠশালা ও ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষার জন্যও, পল্লীগ্রাম অঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, গ্রাম্য রাস্তাঘাট ও অন্য নানারকম কাজের জন্য, দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থার জন্য, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক কাজের জন্য সামান্য টাকাই ব্যয় করিয়া থাকেন। ইহাতে এইসব কাজ ভাল করিয়া চলে না। ভাল করিয়া চালাইতে হইলে আরও টাকা চাই? আরও টাকা কোথা হইতে আসিবে? গবর্ণমেণ্ট এখন এই-সব কাজে রাজস্বের যত অংশ দেন, তদপেক্ষা বেশী অংশ দিতে পারিবেন না। সুতরাং হয় অল্প টাকায় ভাল কাজ করিতে না পারিয়া আমাদিগকে পাঁচ বৎসর পরে এই অপূর্ব্ব "দায়ী গবর্ণমেণ্টের" অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, নতুবা আমাদের মন্ত্রীদিগকে দেশের লোকের উপর ট্যাক্স্ বসাইয়া আয় বাড়াইতে হইবে। সরকার নাকি সে অধিকার তাঁহাদিগকে দিবেন। তখন দেশের লোকে বলিবে, "তোমরা বেশ স্বরাজ পাইয়াছ দেখিতেছি! প্রথম নম্বরেই ট্যাক্স বৃদ্ধি! বাপু, আমাদের কি আরও ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা আছে? কোন্ হাড়খানা ঠেঙ্গাইয়া টাকা বাহির করিবে, এই কঙ্কালখানা হইতে বাছিয়া ঠিক কর। আগে যে-টাকা দিয়াছি তাহা হইতে অপব্যয় নিবারণ, অনাবশ্যক মোটা মাহিনার চাকরের জায়গায় সমান যোগ্য দেশী অল্প মাহিনায় চাকর নিয়োগ, প্রভৃতি উপায়ে, কতদূর ভাল কাজ হইতে পারে, দেখাও; তাহার পর না হয় আধপেটার জায়গায় সিকিপেটা খাইয়াও দেশের মঙ্গলের জন্য টাকা দিব।" তখন আমাদের সারডোবা ও পাঠশালার প্রধান মন্ত্রী বলিবেন, "দেখ বাপু, আমাদিগকে সরকার-বাহাদুর দায়ী গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন, কিন্তু যথেষ্ট টাকা দেন নাই; রাজস্বের উপর আমাদের কোন হাত নাই। দায়ী গবর্ণমেণ্ট পাওয়াটা বড়ই সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা; ইহা হারান কি উচিত? ট্যাক্স দিয়া আমাদের এই গৌরব ও ইজ্জৎ রাখ।" তখন পল্লীগ্রামের চতুর মোড়লেরা ভাবিবে, বর্ত্তমান ট্যাক্স ও অদায়ী গবর্ণমেণ্টই ভাল; বর্দ্ধিত-ট্যাক্সসাপেক্ষ দায়ী গবর্ণমেণ্টরূপ গৌরব ও সৌভাগ্য হইতে, হে দরিদ্রের ভগবান্, আমাদিগকে রক্ষা কর।" আমরা শুধু পরিহাস করিতেছি না, যে-ব্যবস্থা গোড়াতেই অবশ্য-ভাবী ট্যাক্সবৃদ্ধি দ্বারা স্বায়ত্তশাসনকে লোকের অপ্রিয় করিবে, তাহা কখনও সুফলপ্রদ হইবে না। রাজপুরুষেরাও নিশ্চয় নেতাদিগকে বলিবেন, "তোমরা বলিয়াছিলে তোমরা ক্ষমতা পাইলে দেশের লোকে সন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু দেখিতেছি দেশে অসন্তোষই বাড়িতেছে, কারণ লোকে ট্যাক্স দিতে চাহিতেছে না। অতএব, তোমরা কোন কাজের নও। সুতরাং তোমাদের স্বরাজের এইখানেই ইতি।" ইহার ভিতর কাহারও কোন গূঢ় অভিসন্ধি না থাকিলেও ফলটা এইরূপ দাঁড়াইবারই সম্ভাবনা।

আর-একটা চমৎকার ব্যাপার দেখুন। আমরা স্বীকার করি, দেশের হিতকর নানা কাজে বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও অনেক টাকা খরচ না করিলে দেশের উন্নতি হইবে না। কতক টাকা অপব্যয়নিবারণ আদির দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও কুলাইবে না। ট্যাক্স বসাইতে হইবে। বর্ত্তমান রাজস্বের ঠিক্ সদ্ব্যয় করিলে এবং তাহা করা হইতেছে বলিয়া দেশবাসীকে বুঝাইতে পারিলে, তাহাদের বর্দ্ধিত ট্যাক্স দিবার ক্ষমতাও বাড়িবে, সম্মতিও পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজস্ব হইতেই কৃষির উন্নতিতে এবং অর্থকর শিল্পের প্রবর্ত্তন ও উন্নতিতে যথাসম্ভব ব্যয় করিলে লোকের আয় বাড়িবে ও তাহারা আরও ট্যাক্স দিতে পারিবে; কারণ কৃষিই আমাদের বেশী লোকের উপজীবা; তাহার পর অনেক কম লোকের উপজীব্য শিল্প। কিন্তু কার্টিসের ব্যবস্থাটি এমন চমৎকার, যে, (Agriculture) এবং অর্থকর শিল্পের কারখানা (Industries), অরণ্য (Forests), যৌথ ঋণদান (Co-operative credit), জল-সেচন (Irrigation), ইত্যাদির নাম প্রথম তালিকায় নাই, দ্বিতীয়তে আছে। সুতরাং সেগুলির ভার আমরা প্রথমে পাইব না। অর্থাৎ প্রথমেই আমাদিগকে এমন কতকগুলি কাজের ভার দেওয়া হইবে, যাহা করিয়া আমরা সাক্ষাৎ-ভাবে দেশের লোকের আয় বাড়াইতে পারিব না কিন্তু ব্যয় বাড়াইতে পারিব (অর্থাৎ তাহাদের ট্যাঁক হইতে ট্যাক্স লইব)। এই কাজগুলি পাঁচ দশ পঞ্চাশ বৎসর (কত বৎসর নির্দ্দেশ করা নাই) করিতে পারিলে তবে আয় বাড়াইবার ডিপার্টমেণ্টগুলির দুএকটি করিয়া ভার আমরা পাইব! আগে একটা গাভীকে অন্ততঃ পাঁচ

বৎসর ধরিয়া দোহন করিয়া দেখাইতে হইবে যে আমরা যোগ্য, তাহার পর চাষবাস জলসেচন আদির দ্বারা শস্য ও ঘাস জন্মাইয়া গাভীটাকে খাওয়াইবার ও পুনর্ব্বার দোহন করিবার ভার আমরা পাইব! ইহাই ত স্বরাজ! এবং ইহাকেই ত বলে রাজনীতিজ্ঞতা!

মানুষের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মত দেশের শাসন-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক আছে। পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত সমুদয় যন্ত্রটি চলিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাবিয়া দেখুন পুলিসের সাহায্য প্রায় আর-সব বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকেই লইতে হয়। পুলিসের উপর আমাদের কোন হাত থাকিবে না; খাজনার উপরও না। কেহ যদি তাহার হাত পা'কে বলে, "হে হাত-পা, তুমি খুব কাজ কর, কিন্তু পেটের সাহায্যে পুষ্টি পাইবে না," তাহা হইলে কেমন ব্যবস্থা হয়? আমাদের উপর কেবল দেশভাষার সাহায্যে প্রদত্ত নিম্নশিক্ষার ভার থাকিবে, উচ্চতর শিক্ষার ভার থাকিবে না। অর্থাৎ দেশের মানুষ গড়া যায় প্রধানতঃ যে শিক্ষা দ্বারা, বলিতে গেলে যাহা দেশের মস্তিষ্ক-যন্ত্র প্রস্তুত করিবে, তাহাতে আমাদের কর্তৃত্ব থাকিবে না। মস্তিষ্কটা প্রকৃতিস্থ, সুস্থ, সবল, আত্মবশ না হইলে শরীরের কাজ ভাল করিয়া চলে কি? আমরা দেশের যে-সব ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদের দ্বারা স্বরাজ পূর্ণাঙ্গ করিব, দেশকে ধর্ম্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, দর্শনে উন্নত করিব, তাহাদিগকে ঠিক্ সেই কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া দিবে অন্য সেইসব লোকে যাহারা এপর্য্যন্ত আমাদের উন্নতির জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা কখনও দেখায় নাই, ইহা কি মানবচরিত্রজ্ঞ ব্যক্তি আশা করিতে পারেন?

কেবলমাত্র যদি শিক্ষার ভারই আমরা পাই, তাহাও সহ্য হয় এবং তাহা হইতেও আমরা দেশের কিছু পূর্ণাঙ্গ সেবা করিবার চেষ্টা করিতে পারি যদি পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উচ্চতম শিক্ষার ভার সবটা আমরা পাই। শিক্ষার নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তরে ধাপে ধাপে ছাত্রেরা উঠিতে পারে, এবং সকল স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রণালীতে একটা সামঞ্জস্য থাকে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। ইংলণ্ডের নূতন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার ফিশার ইংলণ্ডের সমগ্র শিক্ষা-প্রণালীকে পূর্ব্বাপেক্ষাও এক লক্ষ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অভিমুখীন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশে নি[ম্ন] ও উচ্চশিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের অধীন হইলে এরূপ ক[রা] যাইবে না। নিম্নশিক্ষাকে বাধ্য হইয়াই উচ্চশিক্ষার অনুবর্ত[ন] করিতে হইবে, এবং উচ্চশিক্ষায় আমাদের কর্তৃত্ব না থাকা ও বিদেশীর কর্তৃত্ব থাকায়, তাহা আমাদের জাতীয় পূর্ণা[ঙ্গ] সাধনায় সিদ্ধিলাভের অনুকূল হইবে না। নিম্নশিক্ষা [ও] কৃষির, নিম্নশিক্ষা ও অর্থকর শিল্পের পরস্পর সম্পর্ক আছে অথচ কৃষি ও অর্থকর শিল্পকে নিম্নশিক্ষার সঙ্গে এক শ্রেণীতে না রাখিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষ গড়া। আমরা শিক্ষার ভা[র] পাইলে লোকহিতৈষী, পরার্থপর, স্বার্থত্যাগী, সেবাপরায়[ণ] সাহসী মানুষ গড়িতে চাহিব। কিন্তু পুলিসের গোয়েন্দা[র] প্রাবল্যে স্বার্থপর, নীচাশয় কাপুরুষদের জীবনযাত্রা নির্ব্বা[হ] অধিকতর নিরাপদ হওয়ায়, আমাদের চেষ্টায় বাধা পড়িবে এই বাধা দূর করিবার ক্ষমতা আমাদের চাই। অর্থা[ৎ] শিক্ষা ও পুলিস উভয় বিভাগেই আমাদের কর্তৃত্ব চাই কিন্তু তাহা আমরা পাইব না।

আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা এখন যেরূপ তাহাতে শিক্ষার, বিশেষতঃ নিম্নশিক্ষার, বিস্তারের জন্য পল্লীগ্রাম-সকলের স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, এব[ং] দরিদ্র (দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র) লোকদের চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা করিবার জন্য, স্বেচ্ছাসেবকদের হিতৈষণা উদ্বুদ্ধ করিয়া বহুদিন বহু পরিমাণে তাহাদের সাহায্য লইতে হইবে; কেবলমাত্র বেতনভোগী লোকদের দ্বারা দেশের উন্নতি করিতে হইলে বহু বিলম্ব হইবে কার্টিসের ব্যবস্থা অনুসারে যে মন্ত্রী শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির ভার প্রাপ্ত হইবেন, তিনি যে-সব স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য লইবেন, বর্ত্তমান সময়ে লোকহিতসাধনে নিযুক্ত বহু স্বেচ্ছা-সেবকের মত, তাঁহারাও যে পুলিসের শান্তিরক্ষণ চেষ্টায় বিপন্ন হইবেন না, তাহার প্রমাণ কি? অথচ এখনকার মত, প্রস্তাবিত "দায়ী গবর্ণমেণ্টে"র আমলেও পুলিশের উপর আমাদের কোনই হাত থাকিবে না। এই-প্রকারে নানাদিক দিয়া পুলিশের গোয়েন্দাদির দ্বারা দেশী "দায়ী গবর্ণমেণ্টে"র চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারিবে। একদা কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স্ জেঙ্কিন্সের

উপরও পুলিসের নজর ছিল। আমাদের দেশী "দায়ী" মন্ত্রীদের উপর থাকা আরও সম্ভব।

মানুষকে বিপন্ন করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, আমাদের দেশে তাহার প্রভাব বেশী, প্রেষ্টীজ বেশী। ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা দূরে থাক, পুলিশ দারোগাকে বাস্তবিকই হাইকোর্টের জজের চেয়ে লোকে বেশী মানে। পুরস্কৃত করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, তাহারও মর্য্যাদা বেশী। এই-জন্য, জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় উল্টাইয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রভাব জজের চেয়ে ঢের বেশী। আমাদের "দায়ী গবর্ণমেন্ট" কাহাকেও দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করিতে পারিবেন না; যাহারা দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করিবে, তাহাদিগকেও তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য দায়ী করিতে পারিবেন না। সুতরাং যদি "দায়ী" প্রধান মন্ত্রীকেও কোন গ্রাম্য বৃদ্ধা, "বাবা, তুমি দারোগা হও," বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। আমরা ক্ষমতার জন্য ক্ষমতা, প্রভাবের জন্য প্রভাব, ভীতি উৎপাদনের জন্য প্রেষ্টীজ চাহিতেছি না। প্রভাব ও প্রেষ্টীজ না থাকিলে মানুষকে দিয়া ভাল কাজও করান যায় না; এইজন্য চাহিতেছি। কিন্তু যখন শাসন, বিচার, রাজস্ব, পুলিশ, উচ্চশিক্ষা, সমগ্রদেশ-প্রযুজ্য আইন প্রণয়ন, কোন বিষয়েই আমাদের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, তখন আমাদের প্রভাব ও প্রেষ্টীজ কি-প্রকারে জন্মিবে?

আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত অপ্রধান যে কয়েকটি বিভাগের ভার দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে আমরা যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে বহু বৎসর পরে আরো কোন কোন বিষয়ের ভার পাইব। এই-প্রকারে সব বিভাগের কর্ত্তৃত্ব আমাদের হাতে আসিতে পারে, এইরূপ বলা হইতেছে। যত বেশী বিভাগের ভার আমাদের হাতে আসিবে, মোটের উপর ইংরেজ আমলাদের প্রভুত্ব, চাকরী ও আয় তত কমিতে থাকিবে। অথচ প্রথম তালিকারই কাজ-গুলিতে সুফলতা দেখান ইংরেজ রাজপুরুষদের আন্তরিক সহযোগিতা সাপেক্ষ। বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করা, ঔদাসীন্য অবলম্বন করা, সহযোগিতা করা,—তিন-রকম ভাব দেখানই তাহাদের সাধ্যায়ত্ত থাকিবে। তাহারা বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না, উদাসীনও হইবে না, কিন্তু অন্তরের সহিত সহযোগিতা করিয়া আপনাদের ও আপনাদের জা'ত-ভাই ভবিষৎবংশের প্রভুত্বের ও উপার্জ্জনের শেষদিন নিকটতর করিয়া দিবে, মানবপ্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থা ও ইংরেজ আমলাবর্গের অতীত ও বর্ত্তমান আচরণের ইতিহাস হইতে ইহা আশা করা কি সঙ্গত? যাহারা এই সেদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের বিরোধী ছিল, যাহাদের মধ্যে উচ্চতম কর্ম্মচারীরাও এই সেদিন আমা-দিগকে অতিদূর ভবিষ্যতে ভিন্ন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের আশা হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিতে বলিতেছিল, তাহাদের উপর আমাদের কোন প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও তাহারা আমাদের কাজ আগাইয়া দিবে, ইহা কেমন করিয়া আশা করিব?

ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ, যে কারণে ও যে প্রকারেই হউক, ইংরেজদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে ভারতবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করা ও রাখা দরকার। এই যুদ্ধ চিরকাল চলিবে না। পাঁচ বৎসরও চলিবে না। এই পাঁচটা বা দশটা বৎসর ভারতবাসীদিগকে, ক্ষমতার-দিক্-দিয়া-অপ্রধান কতকগুলা কাজের ভার দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, পাঁচ বা দশ বৎসর অন্তে, যখন ব্রিটিশসাম্রাজ্য আর বিব্রত থাকিবে না, এবং যখন ভারত-বর্ষসম্বন্ধে নূতন নীতি স্থির হইয়া যাইবে, তখন তাহাদিগকে বলিলেই চলিবে, "তোমরা পারিলে না, তোমরা যোগ্য নও, এ ক্ষমতা তোমাদের গেল, অন্য ক্ষমতাও যোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পাইবে না;" এই রকম একটা অভিসন্ধি কখনও কার্টিসের মগ্নচৈতন্যের (subliminal consciousnessএর) চৌকাঠও মাড়ায় নাই, আমাদিগকে কেহ এই আশ্বাস দিতে পারিলে আমরা আনন্দিত হইব।

গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট একটি স্বতন্ত্র পুরুষ নহেন। যে মানুষগুলি লইয়া গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে গঠিত থাকে, তাহাদের উদ্দেশ্যই গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য ভাল হইলেও, ভারতের সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারী ও বেসরকারী বণিক্ প্রভৃতির চেষ্টায় সেই উদ্দেশ্য কখন কখন ব্যর্থ হয়। এইজন্য আমাদিগকে শেষোক্ত লোকদের মন্দ অভিসন্ধির অস্তিত্বের সম্ভাবনাও অনুমান করিয়া তাহার

আলোচনা করিতে হয়। নতুবা, কাহারও মন্দ অভিসন্ধি আছেই, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়। অভিসন্ধি মন্দ না হইলেও ফল মন্দ হইতে পারে।

মন্দ অভিসন্ধির কথা যখন তুলিয়াছি, তখন ভাল যাহা বলা যাইতে পারে, তাহাও বলি। মিঃ, কার্টিসের এইরূপ ভাল উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, যে, "গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীদের নিকট সব কাজের জন্য দায়ী, সব কাজ দেশবাসীদের মত অনুসারে হওয়া উচিত, গণতন্ত্রের এই মূলনীতি সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইতে বাধা ও বিলম্ব আছে বলিয়া, অন্ততঃ কয়েকটি অপ্রধান বিষয়ে, আংশিক ভাবে, নীতিটি স্বীকৃত হইয়া যাউক; একবার ইহা স্বীকৃত হইলে সরকার-বাহাদুর আর পিছাইতে পারিবেন না। অর্থাৎ গণতন্ত্র সূচীর মত সূক্ষ্ম আকারে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের (bureaucracy'র) দুর্গ-প্রাকার ভেদ করিয়া ঢুকিতে পারিলে পরে দুর্গ দখল হইতে পারিবে।" এরূপ উদ্দেশ্য থাকিলেও তাহা ব্যর্থ করিবার প্রভূত ক্ষমতা কার্টিসের ব্যবস্থায় ইংরেজ আমলাদের হাতে থাকিয়া যাইবে। তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন ত আমাদের মন্ত্রীদের কাজ ভাল হইবে না; এবং সেরূপ সহযোগিতা পাইবার আশা বড় কম।

আর এই যে এত ঘটা করিয়া আমাদিগকে রেস্পন্সিব্‌ল্ গবর্ণমেণ্ট (প্রজাদের কাছে দায়ী গবর্ণমেণ্ট) দেওয়া হইবে বলা হইতেছে, ইহার মধ্যে রেস্পন্সিব্‌ল্ কথাটা থাকিলেই ত আমাদের মোক্ষলাভ হইবে না, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় কাজের ভার, আমাদের হাতে কোন্ রকমের ও কি পরিমাণে পড়িবে তাহাই প্রধান বিবেচ্য। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কাজই আমরা পাইব না। একজন মানুষ তোমাকে বলিল, তোমাকে ঝকঝকে থালায় ভোজ দিব; বলিয়া একটা ঐরূপ থালায় আধ মুঠা খৈ দিল। আর একজন মানুষ তোমাকে কলার পাতায় লুচী সন্দেশ ক্ষীর দই দিল। আমরা ত বলি কলার পাতার ভোজটাই ভাল, যদিচ পাত্রটা জমকাল নয়। আধারটার চেয়ে আধেয় বা ধৃত বস্তুটাই বেশী দরকারী। কেতাবের মলাটের বাহারের চেয়ে কেতাবের ভিতরের লেখাটার উৎকর্ষ অধিক প্রার্থনীয়। সুন্দর বিলাতী কৌটায় কড়ি থাকিলে তার চেয়ে মোহরপূর্ণ মাটির ভাঁড় ভাল। জার্মেনীতে স্বায়ত্তশাসন আছে কি রেস্পন্সিব্‌ল্ গবর্ণমেণ্ট নাই; জাপানে স্বায়ত্তশাসন আছে কিন্তু রেস্পন্সিব্‌ল্ গবর্ণমেণ্ট নাই। ঐ দুটা দেশ কি উন্নতি করে নাই না শক্তিশালী নহে? নিশ্চয় করিয়াছেও বটে তাহার কারণ, তাহাদের গবর্ণমেণ্টটা রেস্পন্সিব্‌ল্ হউক বা না হউক, তাহা তথাকার জাতীয়-গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী-গবর্ণমেণ্ট মহা আড়ম্বর করিয়া রেস্পন্সিব্‌ল্ গবর্ণমেণ্ট দিব বলিয়া যদি আমাদিগকে ঘাস কাটিবার এবং গ্রাম্য সারডোবার তদারক করিবার মন্ত্রীত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি মনে করিতে হইবে যে আমরা জার্মেনী ও জাপানের লোকদের চেয়ে বেশী রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং দেশের কাজ করিবার অধিক সুযোগ পাইতেছি? কখনই না। আর, আজকালকার কালে এই বিংশ শতাব্দীতে সভ্য উন্নতিশীল স্বশাসক দেশের গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই অচিরে রেস্পন্সিব্‌ল্ হইতে বাধ্য। জার্মেনী ও জাপানের গবর্ণমেণ্টকে প্রজাদের কাছে ক্রমশঃ অধিকতর দায়ী করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং এ চেষ্টা সফল হইবেই বিলাতের লোক স্বশাসক হইয়াছে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, কিন্তু তাহাদের গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের কাছে দায়ী হইয়াছে, তাহার অনেক পরে। আমাদিগকে যে কার্টিস সাহেব "রেস্পন্সিব্‌ল্" শব্দরূপ মইয়ের সাহায্যে একেবারে স্বরাজবৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে আমাদের গাছ হইতে পড়িয়া মরিবার আশঙ্কা যে একেবারে নাই এমন ভরসা দিতে পারি না। আমরা চাই, দেশী লোকদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কাজ নির্ব্বাহ, এবং দেশী প্রতিনিধি সভার হাতে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার ভার অর্পণ; শাসনপ্রণালীর নাম লইয়া এখন বিতণ্ডার দরকার কম।

জার্মেনী ও জাপানে "অদায়ী" গবর্ণমেণ্টের অধীন লোকদের তাহাদের দেশের কাজ করিবার যত ক্ষমতা ও সুযোগ আছে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যতটা কর্তৃত্ব আছে, কার্টিসের প্রস্তাবিত "দায়ী গবর্ণমেণ্ট" পাইলেও, তাহার শতাংশের এক অংশও আমাদের হইবে না।

পূরা রেস্পন্সিব্‌ল্ গবর্ণমেণ্টটা খুবই ভাল জিনিষ; কিন্তু ঐ নামটাই প্রধানতঃ সেই জিনিষ নয়। কি বস্তুটা দেওয়া হইতেছে, তাহাই দেখিতে হইবে। যদি প্রথম ধাপ নিশ্চয়ই সুনির্দ্দিষ্ট অল্পকালের মধ্যে আমাদিগকে শেষ ধাপে লইয়া

যাইত, তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু সে আশা যে কত কম, তাহা পূর্ব্বে নানাভাবে দেখাইয়াছি। আমাদের মনে হইতেছে, কার্টিসের প্রস্তাবে আমাদের স্বরাজ পাইতে অনির্দ্দেশ্য বিলম্ব হইবে, স্বরাজলাভ খুব পিছাইয়া যাইবে। যাঁহারা এই প্রস্তাবে মত দিয়াছেন, তাঁহারা ব্যাপারটি তলাইয়া বুঝেন নাই, এবং ভিন্ন ভিন্ন সভ্যদেশের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর বৃত্তান্ত ও তাহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানেন না। নেতা নাম পাইলেই মানুষ রাজনীতিজ্ঞ হয় না; রাজনীতিও শিখিতে হয়। বহু অধ্যয়ন, চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় মানুষ রাজনীতিজ্ঞ হয়।

পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, দুর্ভিক্ষে অনশনক্লিষ্ট লোকদিগকে সাহায্য দেওয়াটাও দ্বিতীয় তালিকার শেষে ফেলা হইয়াছে। প্রথম প্রথম ইহারও যোগ্য বলিয়া আমরা বিবেচিত হইব না এবং ইহারও ভার পাইব না!

বাংলাকে এবং অন্যান্য প্রদেশকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করিলে "দায়ী গবর্ণমেণ্ট" ভাল করিয়া কাজ করিতে পারিবে, কার্টিসের বহিতে ইহাও লেখা আছে। (১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা।) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জনিত আন্দোলনের কথা শুনিয়া বোধ হয় তিনি এবিষয়ে তাঁহার প্রস্তাব বেশ পরিষ্কার ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন নাই। যাহা হউক, দেশটাকে টুকরা টুকরা করিলে যেমন কার্য্যসৌকর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, তেমনি অসুবিধাও আছে। বৃহৎ লোকসমষ্টির দ্বারা যত বড় বড় অনুষ্ঠান যত সহজে হয়, ক্ষুদ্রতর লোকসমষ্টির দ্বারা তদ্রূপ হয় না। বৃহৎ লোকসমষ্টির শক্তি ও প্রভাব যেমন, ক্ষুদ্রতর সমষ্টির তেমন নয়। তা ছাড়া, সমস্ত বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় কাজ গণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে একসঙ্গে করা যায় না, ইহা কখন্ পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইল? জাপানীদের সংখ্যা ৫ কোটির উপর, বাঙালীদের সংখ্যা ৫ কোটির কম। জাপানীদের রাষ্ট্রীয় কাজ যদি নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে হইতে পারে, তাহা হইলে বাঙালীদের কেন হইতে পারিবে না?

আমরা যত স্বশাসকদেশের শাসনপ্রণালীর কথা অবগত আছি, কোথাও এরূপ ভাগাভাগি করিয়া দেশের লোকদিগকে ক্ষমতা-হিসাবে-অপ্রধান কাজ দিয়া বিদেশী প্রভুদিগের হাতে আসল প্রভুত্ব রক্ষিত হয় নাই। এরকম শাসনপ্রণালী কোথাও নাই। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যে আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইয়াছে, তাহা তাহারা এই-রকম টুকরা টুকরা করিয়া পায় নাই; ফিলিপিনোরাও আমেরিকানদের নিকট হইতে এইরূপ টুকরা টুকরা করিয়া ক্ষমতা পায় নাই।

সব দেশেরই রাষ্ট্রীয় উন্নতির সমস্যাটি একটি সমগ্র অখণ্ড সমস্যা। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ, অঙ্গ, বা বিভাগ আছে বটে; কিন্তু সবগুলিরই পরস্পরের সঙ্গে যোগ আছে। একদিকে উন্নতি অন্যসব দিকে উন্নতির উপর নির্ভর করে। এইজন্য আমরা রাষ্ট্রীয়-উন্নতির সমস্যাটি সমগ্র ও অখণ্ডভাবে আয়ত্ত করিয়া, সমস্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, কাজে প্রবৃত্ত হইলে, তবে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। এইভাবে সমগ্র সমস্যাটি একই কর্ত্তৃপক্ষ আয়ত্ত করিয়া, কোন্ দিকে কত শক্তি প্রয়োগ ও কত অর্থব্যয় করিতে হইবে, স্থির করিলে সুশৃঙ্খলভাবে রাষ্ট্রীয় কাজ হয়। কিন্তু কয়েকটি অপ্রধান বিষয়ের ভার আমাদের উপর এবং বাকীগুলির ভার ইংরেজ আমলাসমষ্টির উপর থাকিলে, সমগ্র সমস্যাটি না আমরা ভাবিব, না তাঁহারা ভাবিবেন। কি নীতি অনুসারে কোন কোন্ বিভাগে রাজস্বের কত অংশ ব্যয় হইবে, তাহাও দেশবাসীর নির্ব্বাচিত একই কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা নির্দ্ধারিত না হওয়ায় সব বিভাগগুলির প্রতি অপক্ষপাত সমদৃষ্টি থাকিবে না; আমাদের হাতের বিভাগগুলি এখনকার মত কম টাকাই পাইতে থাকিবে। রাষ্ট্রীয় সমগ্রসমস্যাটি আমাদিগকে আয়ত্ত করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে না দেওয়া সুপরামর্শ নয়। একটা মানুষের দেহের উন্নতি করিতে হইলে এক বা একাধিক চিকিৎসক সমগ্র দেহের কথা ভাবিয়া ব্যবস্থা করেন। একজন পায়ের আঙুল, আর-একজন নাসিকাগ্র, তৃতীয় চিকিৎসক হাতের নখের চিকিৎসা করিবে, এবং তাহাদের নিকট দায়ী নহে এমন অন্য কয়েকজন চিকিৎসকের উপর চুল, দাড়ী, উদর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, বাহু, প্রভৃতির কল্যাণের ভার দিলে, ব্যবস্থাটা খুব সমীচীন হয় না।

কোন একটা উদ্যম সফল হইবে কি না, পরীক্ষা করিতে হইলে, অনেক স্থলে দেখা যায়, ছোট আয়তনে পরীক্ষা করিলে চেষ্টা বিফল হয়, কিন্তু বড় আয়তনে করিলে সফল হয়। ইণ্টারমীডিয়েট পর্য্যন্ত পড়াইবার আধা-কলেজ

অপেক্ষা বিএ, এম্‌এ পর্য্যন্ত পড়াইবার পূরা কলেজ ভাল চলিবার কথা। সাবানের সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট আর দু-একটা জিনিষের কারখানা চালাইতে পারিলে যেখানে চলে, শুধু সাবানের কারখানা হয়ত সেখানে চলে না। রাষ্ট্রীয় পরীক্ষাতেও ছোট আংশিক পরীক্ষা অপেক্ষা বড় পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা ফলবতী হইবার অধিক সম্ভাবনা।

ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের প্রতিনিধিরা কখন হইবেন সম্পূর্ণ কর্ত্তা, কখন হইবেন কেবলমাত্র পরামর্শদাতা, কখন হইবেন সমালোচক মাত্র। গবর্ণর সকালে হইবেন মন্ত্রী-সভার মুরুব্বি; আবার হয়ত সেই দিনই বিকালে ঐ মন্ত্রীরা ও তাহাদের অনুবর্ত্তী প্রতিনিধিরা হইবেন গবর্ণর ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধাচারী সমালোচক। এই-রকম গোল-মেলে বন্দোবস্তে বিনা সংঘর্ষে কাজ চলিবে কি? আমাদের মন্ত্রীরা প্রধান প্রধান বিভাগের ইংরেজ কর্ত্তা ও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের আন্তরিক সাগ্রহ সহযোগিতা ভিন্ন কাজ চালাইতে পারিবেন না, কেন না, সব বিভাগের কাজ পরস্পরসম্বদ্ধ; কিন্তু এই সহযোগিতা কি অনায়াসে পাওয়া যাইবে?

যে-সব অপ্রধান বিভাগ লইয়া আমাদের মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে, তাহা অপ্রধান হইলেও, নামের কুহকে ও সেই সেই ক্ষেত্রে চেষ্টার আপাত পূর্ণ সার্থকতা দেখিয়া আমাদের প্রতিনিধিদের শক্তি ঐসবদিকেই বেশী মাত্রায় নিয়োজিত হইবে; সুতরাং প্রধান প্রধান ডিপার্টমেণ্টগুলির দিকে তাঁহাদের যথেষ্ট দৃষ্টি পড়িবে না ও তাহাতে হয়ত ইংরেজ আমলাদের প্রভুত্ব ও খামখেয়ালি এখনকার চেয়ে বাড়িয়া যাইবে।

আমরা ৫ বা দশ বৎসরের পরীক্ষায় সফলতা দেখাইতে পারিলে এক ধাপ হইতে আর-এক ধাপে উঠিতে পারিব। কিন্তু সাফল্যের বিচারক কে হইবে? ভারতপ্রবাসী ইংরেজ-আমলারা সুবিচারক হইতে পারে না, কেন না পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইলে তাহাদের ক্ষমতার হ্রাস ও জীবিকার পথ সংকীর্ণ হইবে। বিলাত হইতে কমিটি আসিলে, তাহার সভ্যগণ এংলোইণ্ডিয়ান-প্রভাবে নির্ব্বাচিত হইবে, এবং আমাদের চেয়ে এংলোইণ্ডিয়ানদের মতই বেশী গ্রাহ্য করিবে। ঔপনিবেশিক লোকদিগকে বিচারক করিলে তাহারাও বেশী পরিমাণে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান প্রভাবের অধী[ন] হইবে।

আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব পাওয়া চাই-ই চাই। আশা ক[রি] ইংরেজও বুঝিয়াছেন যে আমাদিগকে আত্মকর্ত্তৃত্ব দেও[য়া] ভিন্ন সাম্রাজ্যের মঙ্গল নাই। সুতরাং যদি আমাদিগকে এ[ই] কর্ত্তৃত্ব ক্রমে-ক্রমেই দিতে হয়, তাহা হইলে এক এক ধা[প] কত বৎসর অন্তর অন্তর আমরা উঠিব, তাহা নিশ্চিত করি[য়া] বলা হউক; অনিশ্চয়ে অসন্তোষ জন্মিবে, কাজও ভা[ল] হইবে না। ইংরেজ বলিতে পারেন, "পরীক্ষায় ফেল হই[লে] অধিকার লুপ্ত হইবার ভয় থাকিলে তোমরা ভাল করি[য়া] কাজ করিবে।" ইহাতে সত্য আছে। কিন্তু অধিকারট[া] আমরা নিশ্চয়ই চিরকালের জন্য পাইলাম, ইহা জানিলে ত আবার আমাদের রাষ্ট্রীয় কার্য্যে খুব উৎসাহ হইত[ে] পারে? কেন না, আমাদের কাজের উপর যে বংশানুক্রমে আমাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, ইংরেজ পরীক্ষকের সন্তোষ-অসন্তোষের চিন্তা অপেক্ষা এই চিন্তার উদ্দীপনশক্তি অধিক। ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩২৪; ১৫ই নবেম্বর, ১৯১৭।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার।

মুসলমানেরা যখন হইতে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে, এমন কি ডিষ্ট্রিক্ট ও লোক্যাল বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটিগুলিতে নিজেদের পৃথক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছেন, আমরা তখন হইতেই উহার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। কারণ একটি সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দিলে ও অন্য সব সম্প্রদায়কে না দিলে অবিচার হয়, এবং এক বা একাধিক সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দিলে দেশে একজাতিত্ব জমাট-বাঁধে না (অর্থাৎ national solidarity জন্মে না)। কিন্তু মুসলমানেরা বরাবর জেদ করায় এবং সেই জেদ বজায় থাকায় আমরা আর কিছু বলি না। মুসলমানেরা কয়েক বৎসর হইতে নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেছেন। তা ছাড়া, কোন কোন প্রদেশে সব সম্প্রদায়ের লোকদের অধিকাংশের ভোটে কোন কোন মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হয়, অমুসলমানেরাও, যোগ্য মুসলমান পাইলে,

তাঁহাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। ইহা দেখিয়া যদি কালে মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে ভাল হয়। আপাততঃ তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কারণ, মুসলমানেরা সবপ্রদেশে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটিতেও স্বতন্ত্র প্রতিনিধি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

হোমরূল বা স্বরাজ পাইবার চেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে কোন কোন শ্রেণীর লোক ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। ইহা করা ঠিক্ নয়। সমস্ত দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি বাড়িলে সব শ্রেণীর লোকদেরই উন্নতি হইবে। এংলো-ইণ্ডিয়ানরা বলিতেছে বটে যে স্বরাজ মানে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব। ইহা মিথ্যা কথা। সমস্ত ভারতবর্ষ ধরিলে, ব্রাহ্মণরা ধনে বিদ্যায় বা পদমর্য্যাদায় কিম্বা লোকসংখ্যায় প্রধান নহে। মহারাষ্ট্রে ও মান্দ্রাজে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা তাঁহাদের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় বেশী বটে। কিন্তু এটা অস্থায়ী অবস্থা, শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে ইহা লোপ পাইবে।

শিক্ষার বিস্তার ভিন্ন কোন শ্রেণীর লোকের উন্নতি হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষা যাহাতে সব শ্রেণীর লোকদের সন্তানেরা বিনা বেতনে পায়, তাহার জন্য চেষ্টা প্রথমে শিক্ষিত ভারতবাসীরা করিয়াছেন, এবং বাধা দিয়াছেন এংলো-ইণ্ডিয়ানরা। এক্ষণে এই শেষোক্ত লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের বন্ধু সাজিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে! ইহা সবাই জানে, এবং পাব্লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্টে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত আবদুর রহিম ও বোম্বাই গবর্ণমেন্টের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মহাদেব চৌবল লিখিয়াছেন, দরিদ্র, অশিক্ষিত, "অস্পৃশ্য," বা "নিম্ন"শ্রেণীর লোকদের অবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষাদান, চিকিৎসা, দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান, বন্যায় সাহায্যদান, ঋণদান হইতে মুক্তির চেষ্টা, প্রভৃতি যত চেষ্টা বেসরকারী লোকে করিয়াছে, সমস্তই শিক্ষিত লোকেরা করিয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ও ইন্দোর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্যার নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর "হোয়াট ইণ্ডিয়া ওআণ্টস্" নামক পুস্তিকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের বার আনা লোক কৃষিজীবী; খাজনার হারের চিরস্থায়িত্ব বা দীর্ঘকালস্থায়িত্ব ও কৃষকদের পক্ষে সুবিধাজনক অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন বহুকাল হইতে শিক্ষিত লোকেরাই করিয়াছে; এবং প্রথম প্রথম যদিও গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কথা শুনেন নাই, কালে সেই আন্দোলনের পরোক্ষ ফলে কৃষকদের কিছু কিছু সুবিধা হইতেছে। আমরা অশিক্ষিত ও দরিদ্রদের প্রতি কর্ত্তব্য অল্পই করিয়াছি; কিন্তু তাহাদের উন্নতির জন্য বে-সরকারী চেষ্টা দেশী শিক্ষিতদের দ্বারাই হইয়াছে, ইংরেজ বণিকদের দ্বারা হয় নাই। খৃষ্টান মিশনরীরাও চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা খৃষ্টিয়ান করিবার জন্য। কোন কোন লোক নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে এই বলিয়া ভীত ও উত্তেজিত করিতেছে, যে, দেশী লোকদের কর্ত্তৃত্ব বাড়িলে দরিদ্র অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা হইবে না, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা সব সুবিধা একচেটিয়া করিবে। আমরা কিন্তু দেখিতে পাইতেছি, বড়োদা, ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূর এই তিনটি উন্নতিশীল দেশীয় রাজ্যে অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের উন্নতির জন্য তৎ-তৎ রাজ্যের পক্ষ হইতে যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, বৃটিশভারতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট-দ্বারা তাহা হইতেছে না। এইসব কথা "টুআর্ডস্ হোমরূল" পুস্তকের তৃতীয়ভাগে বিস্তৃতভাবে প্রমাণসহ লিখিত হইয়াছে।

আমরা যতটা জানি, এখন কেবলমাত্র অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের বস্নিয়া-হের্টসেগোভীনা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সেখানে, ভারতবর্ষের মত, কেবল একটি সম্প্রদায়কে তাহাদের লোকসংখ্যার হিসাবে অতিরিক্ত-সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় নাই; সব সম্প্রদায়কে তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে কম বা বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছে? এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা নামক শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষের ৪র্থ ভল্যুমের ২৮২ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই তথায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বড়ই বিদ্বেষ; "Considerable bitterness prevails between the rival confessions, each aiming at political ascendancy, but the government favours none."

আমরা খুবই চাই যে সব সম্প্রদায়ের সব শ্রেণীর লোকের রাষ্ট্রীয় হিতচিন্তার ফলে দেশ উন্নত হউক। কিন্তু যোগ্যতা দ্বারা সব শ্রেণীর লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেই ঠিক হয়। যে-কোন শ্রেণীর লোক, কঠিন পীড়া হইলে, সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলের চেয়ে ভাল চিকিৎসক ডাকে, গুরুতর মোকদ্দমায় সম্প্রদায়-নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠ উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করে। রাষ্ট্রীয় কার্য্য কি ছেলেখেলা যে ইহাতে একমাত্র যোগ্যতা না দেখিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়, জা'ত, প্রভৃতির উপর ঝোঁক দিতে হইবে? ধরুন, যদি কেবল মুসলমান ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যই ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি হয়। তাহারা কি আইন করিবে যে তাহাদের স্বজাতীয় লোকেরা খুন চুরি ডাকাতী করিলে বক্‌শিশ পাইবে এবং অন্য জাতির লোকেরা দণ্ডিত হইবে? তাহারা কি আইন করিবে যে তাহাদের স্বজাতীয় লোকদিগকে জমীর খাজনা দিতে হইবে না বা খুব কম দিতে হইবে, এবং অন্য লোকদিগকে খুব বেশী খাজনা দিতে হইবে? তাহারা কি আইন করিবে যে লেখাপড়া তাহাদের ছেলেরাই শিখিতে পারিবে, অন্যেরা পারিবে না? তাহাদের ছেলেরা বিনা বেতনে বা কম বেতনে ও অন্য ছেলেরা খুব উচ্চ বেতন দিয়া লেখাপড়া শিখিতে পাইবে? তাহারা কি নিয়ম করিবে, যে, তাহাদের জাতির জন্য, এখন যেমন ইংরেজ ফিরিঙ্গীর জন্য রেলে স্বতন্ত্র তৃতীয় শ্রেণীর ও মধ্যশ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ থাকে, সেইরূপ থাকিবে? তাহারা কি নিয়ম করিবে, যে, এখন যেমন ইংরেজ আসামী দাবী করিলে তাহার বিচার ইংরেজ জজ ভিন্ন অন্য করিতে পারে না, তেমনি তাহাদের জাতির লোকদের বিচার অন্য জাতির লোকেরা করিতে পারিবে না? তাহারা কি এই ব্যবস্থা করিবে যে, এখন যেমন পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবার পরীক্ষা ইংরেজ ছাড়া আর কেহ দিতে পারে না, তেমনি তাহাদের স্বজাতীয় ছাড়া আর কেহ ঐ পরীক্ষা দিতে পারিবে না? তাহারা কি এমন কোন ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে এখন যেমন কার্য্যতঃ সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য বিভাগের বড় চাকরীগুলি ইংরেজদের একচেটিয়া আছে, ভবিষ্যতে তেমনি তাহাদের স্বজাতীয় ছাড়া অন্যেরা প্রায়ই বড় চাকরী পাইবে না? অসম্ভব। এরূপ নিয়ম তাহারা করিতে চাহিবে না, চাহিলেও পারিবে না। কারণ ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দিবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লুপ্ত হইবে না, সর্ব্বোপরি কর্ত্তার মত থাকিবে।

ভারতবর্ষের আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভে বাধা দিতে নমঃশূদ্র কি অন্য জাতি পারিবেন না। তাঁহাদের প্রতি বহু শতাব্দী ধরিয়া অন্যায় আচরণ হইয়াছে বটে; কিন্তু ইংরেজ ত সেই সামাজিক লাঞ্ছনার প্রতিকার করিতে পারেন নাই, পারিবেন না। প্রতিকার তাঁহাদের নিজের হাতে,—যোগ্যতালাভ দ্বারা। এবং সেই যোগ্যতালাভের সুযোগ দেশীলোকের কর্তৃত্বে যতটা হইবে, এখন ইংরেজের কর্ত্তৃত্বে তাহা নাই। প্রমাণ, দেশীরাজ্যে "নিম্ন" শ্রেণীর লোকদের উন্নতির জন্য পূর্ব্ববর্ণিত চেষ্টা; প্রমাণ, ব্রিটিশভারতে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের চেষ্টা।

গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক কারণে মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় বা জাতের দাবী বিচার করিবার সময় সে কারণ বিদ্যমান থাকিবে না। তথাপি যদি গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত করিতে চান, তাহা হইলে ন্যায্য ব্যবস্থা দ্বারা সব সম্প্রদায়, শ্রেণী ও জা'তকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। ভারতবর্ষে ন্যূনকল্পে এক হাজার জাতি বা জা'ত (Caste, tribe, race, ইত্যাদি) আছে। ইহাদের প্রত্যেককে যদি গড়ে একজন করিয়াও প্রতিনিধি দিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় অন্ততঃ এক হাজার প্রতিনিধি সভ্যরূপে উপস্থিত হইবে! কিন্তু এপর্য্যন্ত যত অনুমান বা প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে সভ্যসংখ্যা ১০০র বেশী ধরা হয় নাই। বাস্তবিক ভারতে সকল সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দিবার কোন ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করা কার্য্যতঃ অসম্ভব।

এই বছরের ভাদ্রের প্রবাসী।

এই বৎসরের ভাদ্রের প্রবাসী ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা ভাদ্র বাদ চৈত্র পর্য্যন্ত ১১ খানি প্রবাসী পাইবেন এবং মূল্য দিবেন ডাকমাশুল সমেত ৩/১০। ইহাতে যাঁহাদের মত হইবে না, তাঁহারা আশ্বিন কার্ত্তিক বা অন্য কোন মাস হইতে গ্রাহক হইতে পারেন। ভাদ্র ছাড়া অন্যান্য সংখ্যাও কম আছে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৭শ ভাগ | ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩২৪ | ৩য় সংখ্যা

নিবেদন

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই-সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহা সত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই, যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাসরাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য-সম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব, তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধ-

বসু বিজ্ঞান-মন্দির
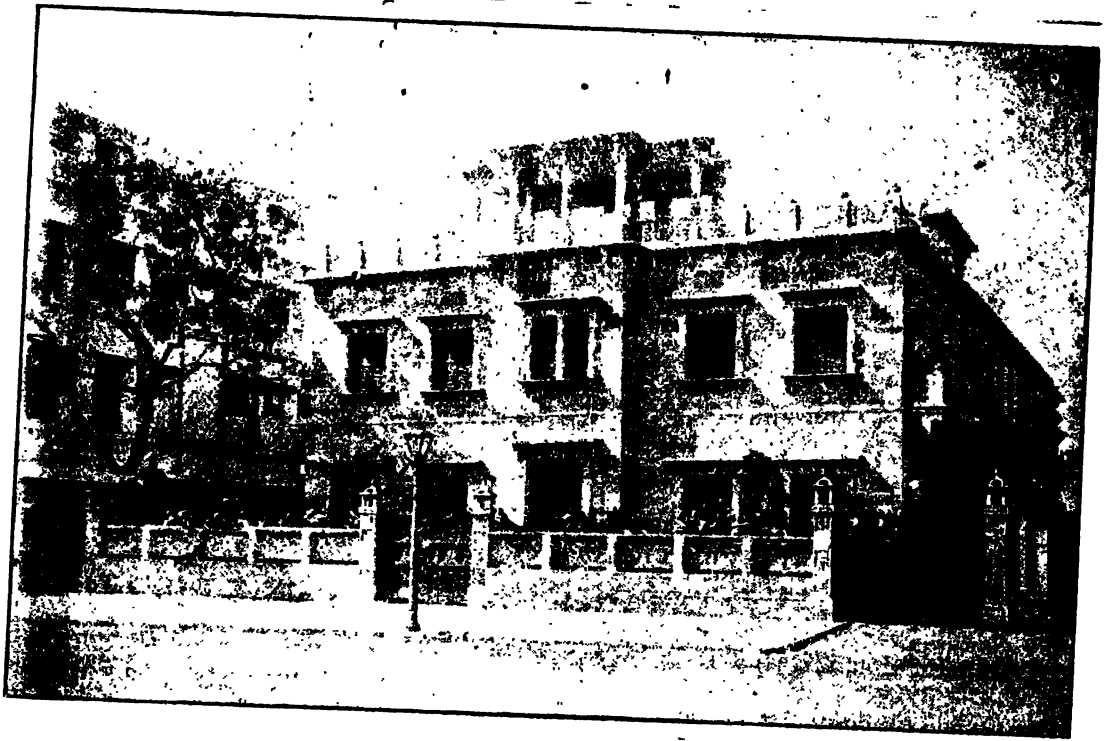
বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পশ্চাতের বাগানের মধ্যে বট ও অশথ গাছে অবলম্বিত মঞ্চ।

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পশ্চাতের বাগান।
বাগানের মধ্যে যে দুটি বড় গাছ একটি মঞ্চ অবলম্বন করিয়া আছে দেখা যাইতেছে তাহা অন্যত্র হইতে ঔষধ-প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া তুলিয়া আনিয়া ঐস্থানে লাগানো হয়।

শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনিই শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। তিনি জনহিতকর নানাকার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে-সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু-দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই-সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারত-বাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে এই-সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শক কেহ ছিল না। বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন

আচার্য্য বসুর দার্জ্জিলিঙের গবেষণা-মন্দিরের ধ্যান-বিতান।

মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জর্ম্মানীতে আচার্য্য হার্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোন প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমানকালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম, যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই-সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পালিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল! আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেদিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর ক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।
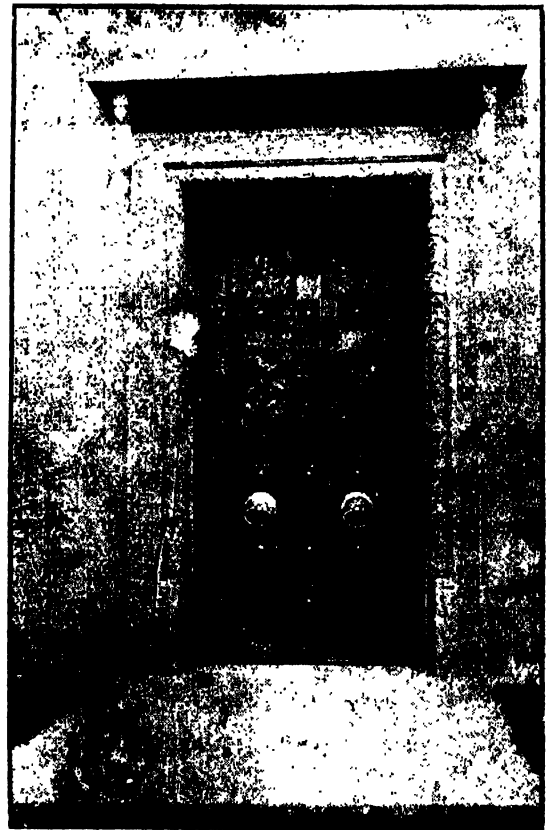
বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাতকারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা

আচার্য্য বসুর দার্জ্জিলিঙের গবেষণা-মন্দির।

আচার্য্য বসুর গঙ্গাতীরবর্ত্তী সিজবাড়িয়ার গবেষণা-মন্দির

আবাহন

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
বল "জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!"

এস বজ্রমহাসনে, মাতৃআশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে!
সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ-দুঃখভাগী,
এস দুর্জয়শক্তিসম্পদ
মুক্তবন্ধ সমাজ হে!
এস জ্ঞানী, এস কর্মী,
নাশ ভারতলাজ হে!
এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্যসৌরভ,
এস তেজঃসূর্য উজ্জ্বল
কীর্তি অম্বর মাঝ হে!
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে
বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ অগ্রহায়ণ
১৩২৪

বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত সঙ্গীত।
শ্রীযুক্ত কে ভি সেন মহাশয়ের নির্মিত ব্লক তাঁহারই সৌজন্যে মুদ্রিত।

ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেব চরণে নিবেদন করিলাম।
শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু
১৪ই অগ্রহায়ন, সংবৎ ১৯৭৩।

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার তাম্রলিপি।

যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া চিরদিনের জন্য অন্তহিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত-মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুইএকজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরো দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও, মেঘরাশি. ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই-সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী পর্য্যটন

ভাগ্য- ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম,-উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সেই দুর্য্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরেজ একদিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আইসেন; উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল পরীক্ষা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং যে-সকল কর্ম্মকার আমার শিক্ষা-অনুসারে এই-সকল কল নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশসেবক! জানিতে পারিলাম, সেইদিনের আগন্তুক আজ আমাদের ভারতসচিব মণ্টেগু। ইহার পর ভারত-গভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটী দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

মা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার।

চিত্রের অধিকারী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত।

বীরনীতি

বর্ত্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জর্ম্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমার নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল, যে, এ-সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের।

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি, যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যেস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোনদিন অবরুদ্ধ না হয়!

বিজ্ঞান প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী আর এই চিরমৌন নিস্তব্ধ অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, যে, তাহার দুইটি চক্ষু একসময়ে জাগরিত থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ-উর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, নির্ব্বাণ জীবনের বেদনাচাঞ্চল্য মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। স্থির বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধির মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে, সেই বৃদ্ধি মাত্রা পরিবর্ত্তন, মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগদ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া

দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে, যে, যে-সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই-সকল কথা কল্পনা-প্রসূত নহে। যে-সকল অনুসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে-সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কি মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোন বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই-সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে-সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্ম্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞান বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চির-জীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। হইতে পারে না বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর-একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে আমি যে-আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুইজন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্ব্বপ্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিলাম। গভর্ণমেণ্টও এবিষয়ে বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই-সকল দেখিয়া মনে হয় আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য. তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোন বহুচর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে-সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই-সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকার দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এইস্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার এইরূপে জগতের সম্পত্তি হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোন পেটেণ্ট লওয়া হইবে না; কারণ আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থলাভের উপায় নহে।

আমার আরো অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুই দিক আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন, আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি-মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি, বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে, তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে-মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্তনাদবিহীন উদ্ভিদ-জগতে, এই তুষ্ণীম্ভূত, অসীম জীবসঙ্ঘারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই-সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণ পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড়-সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশ-বিজয়ে কোন দিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা

ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয়মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে। *

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

স্বাধীনতা

(লাওয়েল্ হইতে)

স্বাধীন আর্য্যসন্তান বলে' গর্ব্ব যে কর' নর
কি সে স্বাধীনতা একটিও দাস থাকে যদি ধরা'পর?
ভাই তব হোথা শৃঙ্খল-ভারে ফেলিবে দীর্ঘশ্বাস—
উদাসীন তুমি?—কোন্ সুখে তব বদনে নিলাজ হাস?
অয়ি নারি, তুমি করিবে প্রসব সুত স্বাধীনতা-সেবী,

ভগিনী তোমার পরদাসী রবে—কেমনে দেখিবে, দেবি?
নিজজন-দুখে সমবেদনায় কাঁদিবে না তব হিয়া,
চিত্তের রস ঝরিবেনা চোখে, চুমিবেনা বুকে নিয়া?
ধিক্ তবে, নারি, তোমরা না হবে স্বাধীনপুত্র-মাতা?
মিথ্যা কথা এ- জননীর প্রাণ নহে গো পাথরে গাঁথা।

সত্য কি তবে স্বাধীনতা এই স্বার্থ মাঝারে লীন?
আর ভুলে-যাওয়া মানব-সমাজে মানবের যত ঋণ?
না, না, কভু নয়—স্বাধীনতা দেয় দয়াল উদার মন
পতিতে পীড়িতে কোলে তুলে নিতে, সহিতে নির্য্যাতন।

ঘৃণ্য পামর তারাই জগতে পতিতে ত্যজে যে জন,
ঘড় পরাধীন, ভীত যে করিতে পতিতে সমর্থন!
দুর্ব্বল আর লাঞ্ছিত কাছে স্বাধীনের যত কাজ
এটি যে জানে না—দাস হ'তে দীন তারাই দুনিয়া মাঝ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

* বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ডি-এস-সি, সি-আই-ই, সি-এস-আই মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দির দেশ-জননীকে নিবেদন উপলক্ষ্যে পঠিত।

আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়

চীনারা বলে, যে-লোক নিজেকে সম্মান করে না, তাকে সম্মান করে' কোনো ফল নেই। আমার ইচ্ছা অন্য লোকে আমাকে সম্মান করুক, অথচ আমি নিজে আপনাকে সম্মান করি না, এ বড় অদ্ভুত। এমন লোককে কেউ যদি জুয়া-চোর বলে' আমল না দ্যায় তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

পরকে সম্মান করতে না জানলে নিজেকেও সম্মান করা যায় না। কারণ আত্মসম্মান ও পরসম্মান উভয়েরই মূলতত্ত্ব এক। বিচারের তুলাদণ্ড আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মাঝে বর্ত্তমান—এমন কি খুনে আসামীও মনে মনে বিচারককে শ্রদ্ধা করে; তিনি যখন দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন তখন খুনের মনে হয়, "এই তো ঠিক।"

লিংকন বলেছিলেন—"সকল লোককে কিছুকাল ঠকাতে পার, কোনো-কোনো লোককে সকল সময় ঠকাতে পার, কিন্তু সকলকে বরাবর ঠকাতে পার না।" নিজেদের কিন্তু আমরা কোনো কালেই ঠকাতে পারি না, তাই নিজে-দের ওপর শ্রদ্ধা রাখতে হলে দৈনিক জীবনে ও ব্যবহারে শ্রদ্ধেয় হতে হবে। আমার যে-মূল্য আমি নির্দ্ধারিত করেছি সাধারণও যদি আমার সেই মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তবে রাগ করা চলে না। আমাদের মূল্য আমাদের ওপরে সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে, সমাজে যখন মিশি তখন লোকে আমাদের মুখের পানে চায়—দেখবার জন্যে আমরা নিজেদের কিরূপ মূল্য অবধারণ করেছি। যদি তারা খুব কম মূল্যের ছাপ দ্যাখে তবে তারা, তুমি নিজেকে খুব ছোট করে' দেখেছ কি না, সে-কথা ভাবতে মাথা ঘামায় না। কারণ তারা জানে তুমি নিজের সঙ্গে অনেকদিন ধরে' বাস করছ, কারবার করছ, তোমার মূল্য তুমি নিশ্চয়ই তাদের চেয়ে ভালো জান

কলোনার ষ্টীফেনকে বিদ্রোহীদল বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—"কি! এখন গেল কোথায় তোমার দুর্গ?" ষ্টীফেন হৃদয়ের ওপর হাত রেখে দৃপ্তভাবে উত্তর দিলেন—"এই খানে।"

বৃদ্ধ শরীর-ব্যবচ্ছেদকারীকে কাজে নিযুক্ত দেখে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হে জন, এখনো কাজ চলছে?" সে বল্লে—"হাঁ চলছে বইকি। আমি মরলে এমন একজন জন্ হাণ্টার মেলা ভার হবে।"

কাউনিটজ্, অর্দ্ধশতাব্দী ধরে' দেশের কাজ অসামান্ত দক্ষতার সহিত চালিয়ে বলেছিলেন—"বিধাতা একশো বছর ধরে' এমন একটি প্রতিভা সৃষ্টি করেন যা দেশকে উদ্বুদ্ধ করে, জাগ্রত করে; তারপর তিনি একশো বছর বিশ্রাম করেন। তাই আমার মৃত্যুর পর অষ্ট্রীয়ার কি হবে তা ভেবে শিউরে উঠি।"

১৭৫৭ সালে উইলিআম পিট ডিউক অফ ডিভনশয়ারকে বলেছিলেন—"আমি এ দেশকে রক্ষা করতে পারি নিশ্চয়; আর কেউ পারে না।" রক্ষাও তিনি করেছিলেন।

চতুর্দ্দশ লুই তাঁর পুরোহিতকে বলেছিলেন—"হ্যাঁ, এ সবই সত্য। আপনি যখন বলছেন তখন আমি যে পাপী তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মত শ্রেষ্ঠ একজন রাজাকে দূর করে' দেবার আগে স্বর্গের অধিপতি যে ভালো করে' ভেবে চিন্তে না দেখবেন তা তো মনে হয় না।"

ওয়াশিংটন আর্ভিং বলতেন—"পরিমিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত মেধার আদর হবেই। তবে কেউ ঘরের কোণে বসে' থেকে তা আশা করতে পারেন না। গায়ে-পড়া ফপরদালাল লোকের সফলতার মধ্যে অনেকটা মেকি থাকে সন্দেহ নেই। এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে যাঁরা থাকতে ভালবাসেন এমন অনেক গুণী লোকের কেউ বড় একটা খোঁজখবর রাখে না এমনও দ্যাখা যায়। কিন্তু সাধারণত আমরা দেখি এই ফপরদালাল লোকগুলোর প্রধান গুণ হচ্ছে কর্ম্মতৎপরতা—এই গুণটি না থাকলে কেবল বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ আদায় হয় না। যে-কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তার মূল্য অনেক সময় ঘুমন্ত পশুরাজের চেয়েও বেশী।"

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে জন ফ্রেগ্রেন্টের স্থান বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাম্‌বল্‌ড্‌-এর পরেই। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর স্থান খুব উচ্চে। কিন্তু তিনি একরকম অখ্যাতই রয়ে গিয়েছিলেন। তার কারণ, তাঁর এক বিরুদ্ধবাদী বলেন—"তাঁর আত্মপ্রত্যয় মোটেই ছিল না, তিনি আপনাকে লোকসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে জানতেন না। তিনি জানতেন নিজেকে একেবারে বেমালুম মুছে ফেলতে।"

কেউ যদি নিজের আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের কথা খুব জোর গলায় প্রচার করে আমরা বিরক্ত হই; ভাব লোকটার কী অহঙ্কার! কিন্তু অধিকাংশ মহাপুরুষেরই আত্মশক্তিতে অতুল্য বিশ্বাস ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইতিহাসে যে-স্থান অধিকার করবেন সে-সম্বন্ধে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না এবং সে-কথা তিনি বলতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। দান্তে নিজেই নিজের যশ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কেপলার বলতেন তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁর বই পড়লে বা না পড়লে তাতে কিছু আসে যায় না। "বিধাতা যদি আমার মত একজন পর্য্যবেক্ষকের জন্যে ৬০০০ বছর অপেক্ষা করে' থাকেন—তবে আমি আমার পাঠকের জন্যে একশো বছর খুব অপেক্ষা করতে পারি।"

ঝটিকাবিক্ষুব্ধ-সাগর-দর্শনে-ভীত কর্ণধারকে জুলিআস সীজার অভয় দিয়েছিলেন—"ভয় কি। তুমি যে সীজার এবং তার সৌভাগ্যকে বহন করে' নিয়ে যাচ্ছ!"

আপনার অজেয় আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান দেশভক্ত বাঙালী বলেছেন—

হে সমুদ্র, দুরন্ত কেশরী,
তোমারে আনিব নিজ বশে হেলায় কেশর-গুচ্ছ ধরি';
নহে ডুবে যাব একেবারে
লবণাদ্র গভীর গহ্বরে অন্ধকার অতল পাথারে।
সুবিপুল ও-বপুর ভার
ধরিব নিজের 'পরে, করিব নিরোধ ভাগ্যেরে আমার
হে স্বাধীন, হে মহাসাগর!
অমেয় আত্মার বল পরখিতে আজ আমি অগ্রসর।

আর আমাদের কবি একদা গেয়েছিলেন—

আমি—ঢালিব করুণা-ধারা!
আমি—ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা!
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি!

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নব দেশে বারতা লইয়া;
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেবো প্রাণ বহে' যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।

* * *

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই!

কবির বাণী যে অত্যুক্তিও নয়, বৃথা অহঙ্কারও নয়, তা তো আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে।

মহাপুরুষদের মধ্যে এই যে অহঙ্কার এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রকৃতি মানুষের মধ্যে সুবৃহৎ আশা নিহিত করেছে, পাছে সে নির্দ্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছুতে ইতস্তত করে। সেইজন্যে প্রকৃতি আমাদের অহংজ্ঞানকে এমন ভারী করে' তুলেছে যে তাতে অনেক সময়ে আশ-পাশের লোক বিরক্ত বই সন্তুষ্ট হয় না। আত্মপ্রত্যয় আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিরই পরিচয়দান করে। অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করতে যে আমরা সক্ষম এ তাই প্রমাণ করে।

নীতির দিক দিয়ে দেখলে যে-সব লোক নিজেদের বিশ্বাস করে তাদের বিশ্বাস করায় ভয় নেই; কিন্তু যারা নিজেদের বিশ্বাস করে না, তাদের যেন অন্যেও বিশ্বাস না করে। নৈতিক অধঃপতনের আরম্ভ হয় মানুষের মনের মাঝেই। নেপোলিয়ন যখন একজন দরিদ্র সাব-লেফটেন্যান্ট মাত্র, তখন তিনি কি বিশ্বাস করতেন না যে তাঁর মধ্যে পৃথিবী ওলটপালট করবার শক্তি ও সামর্থ্য বর্ত্তমান?

জগৎ বড়ই ব্যস্ত। কোথায় কোন্ এক অজ্ঞাত কোণে কোন্ শক্তিমান পুরুষ বিনয়বশত আত্মগোপন করে' রয়েছেন, তার সন্ধান করবার সময় মানুষের নেই। মানুষ নিজেকে যে-দরে চালায় সাধারণত সে সেই দরেই বিকোয় যতদিন না তার অন্য রূপ প্রকাশ পায়। জগৎ শ্রদ্ধা করে সাহস এবং পুরুষত্ব; যে যুবক সদাই সঙ্কোচে ও কুণ্ঠায় নিতান্ত কিন্তু-ভাবে জগতে বাস করে, সে লোকের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণাই আহরণ করে।

শেলিং বলতেন—"কেউ যদি নিজে কী সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তবে তার কিরূপ হওয়া উচিত তা-ও বুঝতে বিলম্ব হয় না। নিজের ওপর যদি মনে মনে শ্রদ্ধা থাকে তবে মানুষ কাজেও সেই শ্রদ্ধার উপযুক্ত হতে চেষ্টা করবে।" কান্মুটের মতে—"বিনয় জ্ঞানেরই অংশ। মানুষের তা ভূষণস্বরূপ। কিন্তু কেউ যেন আত্মপ্রত্যয়কে তুচ্ছ না করে; এটিই সত্যকার পুরুষত্বের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ।" ফ্রাউড লিখেছিলেন—"ফুল বা ফল ধরাতে হলে মাটির মধ্যে গাছের শিকড় গাড়া দরকার। মানুষ নিজের পায়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে' দাঁড়াতে শিখবে, কারও দয়া বা দৈবের ওপর সে নির্ভর করবে না। কেবল এই ভিত্তির ওপরই জ্ঞানচর্চ্চা বা আত্মোন্নতির চেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"

মানুষের সেই আত্মসম্মান জ্ঞান থাকা দরকার যা তাকে সকল নীচতার ওপরে তুলবে, যার বলে সে শুভচেষ্টায় শত অসম্মান এবং অপবাদেও বিচলিত হবে না।

অপবাদের অনুসরণ করবার দরকার নেই। ও বস্তুটিকে আমল না দিলেই উহা অচিরে পঞ্চত্ব পায়।

লা রশেফোকোল্ড্ বলতেন—"একপ্রকার উচ্চতা আছে যা ধনের ওপর নির্ভর করে না। তা হচ্ছে একটি বিশেষ ভঙ্গী যা আমাদের অন্য লোকের থেকে পৃথক করে, যা আমাদের বড় কাজের জন্যে নির্দ্দিষ্ট করে; এ সেই মূল্য যা আমরা নিজের অগোচরে নিজের ওপর ধার্য্য করি। এই গুণের দ্বারাই আমরা অন্যের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করি, এবং ইহাই তাদের ওপর আমাদের স্থাপন করে; সদ্বংশে জন্ম বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার দ্বারাও এতটা অসম্ভব।"

ওয়েবস্টার বলতেন—"অন্তঃসারশূন্য কপট লোকেই সদ্বংশে জন্মের গৌরব এবং সামান্য বংশে জন্মানোর নিন্দা করে' থাকে। যে-ব্যক্তি নিজেকে তুচ্ছ করে না, শৈশবের হীন অবস্থার জন্যে তার লজ্জিত হবার প্রয়োজন নেই। আমার জন্ম কাঠের কুঁড়ে ঘরে, নিউ-হ্যাম্পশায়ারের তুষারস্তূপের ওপর; সে এত দিন আগে যে আমাদের কদর্য্য চিমনি থেকে

যখন প্রথম ধোঁয়া বেরিয়ে বরফে-ঢাকা পাহাড়ের গা বেয়ে কুণ্ডলাকারে ওপরে উঠেছিল, তখন সে-স্থান ও ক্যানাডার নদীর ধারের উপনিবেশের মধ্যে আর কোথাও সাদা মানুষের অবস্থিতির নিদর্শনমাত্র ছিল না।

"সে বাসস্থানের চিহ্ন এখনো বর্ত্তমান। আমি প্রতিবৎসর সেখানে গিয়ে থাকি। আমার ছেলেমেয়েদের সেখানে নিয়ে যাই, দেখাবার জন্যে তাদের পূর্ব্বপুরুষ কী বিপুল অধ্যবসায়ে কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। সেই-সব পুরানো কথা ভাবতে আমি ভালোবাসি; শৈশবের সেই-সব স্নেহ আশা আকাঙ্ক্ষা; আমাদের পারিবারিক এই আদিম বাসস্থানের স্মৃতি-বিজড়িত আরো কত ঘটনা। তখন এ-কুঁড়েতে যাঁরা বাস করতেন তাঁরা কেউ জীবিত নেই এ-কথা ভেবে কাঁদি। আর যিনি এই কুঁড়ে নির্ম্মাণ করেছিলেন, অসভ্যদের হাত থেকে এটিকে রক্ষা করেছিলেন, এর মধ্যে পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সাতবর্ষব্যাপী বিপ্লবের যুদ্ধের মধ্যে দেশ-সেবার জন্যে এবং আপন পুত্রকন্যাদের নিজের অবস্থার চেয়ে ভালো অবস্থায় উন্নীত করবার জন্যে, কোনো কঠিন কাজ বা কোনো ত্যাগ করতে বিরত ছিলেন না, তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা যদি কখনো ম্লান হয়ে আসে, তাঁর নামে যদি কখনো গৌরব বোধ না করি, তবে যেন আমার নাম এবং আমার সন্তানসন্ততির নাম মানুষের মন থেকে মুছে যায়।"

মক্কেলের জন্যে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কুরান বল্লেন—"আমার সমস্ত আইনের বই পড়েও একটি মকদ্দমাও পাইনি যার দ্বারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী উকীলের মত সমর্থিত হতে পারে।"

জজ রবিন্সন, যিনি কয়েকখানা কুলিখিত খোসামুদে কদর্য্য পুস্তিকা রচনা করে' খ্যাতি লাভ করেছিলেন, বল্লেন—"আমার সন্দেহ হয় মশাই আপনার আইনের বইএর লাইব্রেরী বিশেষ প্রশস্ত নয়। কি বলেন?"

যুবক ব্যারিষ্টার জজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' স্থিরভাবে বল্লেন—"আমি গরীব; এ-কথা সত্য। এবং সেহেতু আমার লাইব্রেরী বিশেষ বড় হতে পারেনি। আমার বইয়ের সংখ্যা অল্প, কিন্তু সেগুলি বাছা বাছা; সেগুলি আমি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েছি। কয়েকখানা ভালো বই পড়েই আমি এই উচ্চ ব্যবসায়ের উপযুক্ত হয়েছি, কতকগুলো খেলো বই রচনা করে' নয়। আমি আমার দারিদ্র্যের জন্যে লজ্জিত নয়, কিন্তু আমার অর্থের জন্যে লজ্জিত হতুম যদি তা সঞ্চিত হত অসদুপায়ে হীন তোষামোদের দ্বারা। আমি পদমর্য্যাদা লাভ না করতে পারি; কিছু না হই আমি ন্যায়পথে থাকব এটা ঠিক। আর দুর্ভাগ্যবশত যদি কখনো তেমন না থাকি তো নানা দৃষ্টান্ত দেখে বুঝতে পারছি অন্যায়রূপে উচ্চ পদ পেয়ে আমার চরিত্র লোকের কাছে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং আমি চিরদিন কেবল সকলের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার পাত্র হয়েই থাকব।"

জজ রবিনসন আর কখনো ঐ যুবক ব্যারিষ্টারের দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষপাত করেননি।

আমাদের সকলের প্রার্থনা হওয়া উচিত—

"আমারে সৃজন করি' যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি!
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্ব্বরী
তার উর্দ্ধশিখা যেন সর্ব্ব উচ্চে রাখি,
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি!
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমারি মহিমা।"

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাঁঝে

সন্ধ্যা হ'ল! সন্ধ্যা হ'ল!
নিবল দিনের ক্ষীণ আলোটি!
ঘুমপাড়ানীর নিঝুম কোলে
ক্লান্ত রবি পড়ল লুটি'।

ঝাপ্‌সা হ'ল বনের রেখা,
ঝাপ্‌সা হ'ল গাছের পাতা;
সাঁঝের আলোয় আকাশ শুধু
মাটির পায়ে ঠেকায় মাথা।

মাঠের চাষা ফিরল ঘরে
ফিরল গরু মাঠের থেকে ;
কলসী কাঁখে ধায় মেয়েরা
পথ গিয়েছে এঁকে বেঁকে।

ক্যেচকেঁচিয়ে গরুর গাড়ী
চল্‌ছে চাকার দাগ্‌টি ফেলে !
শেষ কিরণে অঙ্গ ঢেলে
ফিরছে পাখী বাতাস ঠেলে !

পাগড়ী-পরা গাছের সারি
চৌদিকেতে দেয় পাহারা !
হুকুম তাদের শুন্‌বে না ক ?—
নাইক' কোথাও শব্দসাড়া।

বাদুড়গুলো একটি পায়ে
ঝুলছিল ওই ঝাউ-গাছেতে,
পাখ্‌না ঝেড়ে উড়ল তারা
ঢুঁড়তে হবে আজকে রেতে।

স্ফূর্ত্তিভরে চেঁচায় পেঁচা
অন্ধকারের খবর পেয়ে !
কোটর থেকে ঘুপ্‌টি মেরে
তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে চেয়ে !

ডিঙিয়ে এসে গাছের ডগা
পড়ল আঁধার দীঘির জলে।
দুলিয়ে দেহ হাঁসের সারি
পুকুর ছেড়ে ডাঙায় চলে।

মাছের আশে জলের ধারে
বকটি ছিল চুপ্‌টি করে'।
আঁধার দেখে মনের দুখে
ফিরছে ঘরে আলস ভরে।

গ্রামের বাটে শেয়াল হাঁটে
কুকুরগুলো কেউবা ডাকে।
কেউবা শুয়ে পরম সুখে
গুঁজছে মাথা হাঁটুর ফাঁকে।

গভীরকালো গাঙের জলে
নৌকা ভাসে দুএকখানা।
কোন্ ঘাটে যে ভিড়বে তারা
নাইক' তাহার ঠিক-ঠিকানা !

স্তব্ধ সবই ! স্তব্ধ সবই !
ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিল্লী বাদে,
মাঝে মাঝে শেয়াল যত
হল্লা ক'রে চেঁচিয়ে কাঁদে।

পথের পরে পথিক নাহি
চলা ফেরা কেউ করে না,
ভূত চলে কি মানুষ চলে
অন্ধকারে যায় না চেনা !

নিবিড় আঁধার চার দিকেতে
দৃষ্টি চাহে হার মানিতে।
ফুলঝুরিটি জ্বল্‌ছে যেন—
জোনাক ওড়ে ঘোর নিশীথে !

আচম্বিতে হাজার তারা
উঠ্‌ল জ্বলে আকাশ জুড়ে,
ফিন্‌কি দেওয়া আলোর ধারা
ছুট্‌ল রে ওই বাতাস ফুঁড়ে।

সন্ধ্যা এল ! রাত্রি এল !
ঘুমটি এল হাওয়ার দুলে !
নিথর রাতে নিদ্‌মহলে
নয়ন সবার পড়ছে ঢুলে !

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়

দুই তার

(২৬)

চিনিবাস তাঁতি ভোরে উঠিয়া পাড়ায় বাহির হইয়াছিল যদি কাহারো কাছে কিছু খাবার জিনিস বা টাকাটা সিকেটা ধার পায়; আজ একমাস হইল তাহাদের তাঁত বন্ধ আছে, ঘরে এক খেই সুতারও সঙ্গতি নাই। তাহার উপর তাহার ছেলে ছিদাম, পতিত হাড়ির পাল্লায় পড়িয়া, রসময়-বাবুর জমিদারীতে উঠিয়া যাইবার দরখাস্তে সই করিয়াছিল; জমিদারের কোপ হইতে ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য বৃদ্ধ চিনিবাস ঘটীবাটি বেচিয়া হালনাগাদ খাজনা ও মাথট শোধ করিয়াছে এবং বাপে বেটায় মিলিয়া জরিমানার একশো টাকার জন্য জমিদারকে তমসুক লিখিয়া দিয়া আসিয়াছে। বুড়ার ঘরে খাইবার লোক অনেকগুলি—নিজে, নিজের স্ত্রী, বেটা, বেটার বৌ, ছেলের ছেলে বেচারাম, দুই বিধবা মেয়ে দাখো ও থাকো, এবং থাকোর ছেলে কেবলরাম। আজ একমাস একটি পয়সা কামাই নাই। অজন্মার দিনে পেটচলা দায় হইয়াছিল, তাহার উপর কমবক্তা ছেলেটা জমিদারের সঙ্গে কাজিয়া করিতে গিয়া অবস্থা আরো সঙ্গিন করিয়া তুলিয়াছে।

বুড়া মানুষ শীতে হিহি করিতে-করিতে ছেঁড়া কাঁথাখানি দুই হাতে গায়ের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া পথে-পথে শুষ্ক কাতর মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। শেষা পৌষের শীতের ঠেলায় সবাই যে যার ঘরে জড়সড় হইয়া পড়িয়া আছে, এখনো অনেক ঘরের ঝাঁপই খোলা হয় নাই। এমন সময় জমিদার-কাছারীর সর্দ্দার-পাইক জিতু সর্দ্দার মাথায় লাল শালুর পাগড়ী বাঁধিয়া লম্বা লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া হনহন করিয়া সেইখানে আসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে চিনিবাস-খুড়ো! তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

জমিদারের পাইক সকালে উঠিয়া তাহার কাছেই আসিতেছিল শুনিয়া চিনিবাসের শুষ্ক মুখ অধিকতর শুষ্ক ও কাতর হইয়া উঠিল; সে ভয়ের ব্যাকুলতা মনে যথাসাধ্য দমন করিয়া বলিল—কেন বাবা, কোনো বরাত ছিল কি?

—হাঁ, বরাত নইলে এত ভোরে এই জাড়ে কে সাধে সুখে বেরোয় বলো? ভাগ্যিস পথে দেখা হয়ে গেল, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

জমিদারের বাঁধা-বেতনে নিশ্চিন্ত, গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া খোরাকী ও ঘুষ আদায় করিয়া পুষ্ট পাইককে চিনিবাস বলিতে পারিল না যে বাড়ীতে তাহার আহারের সংস্থান নাই তাই লোকের দ্বারে-দ্বারে দয়ার প্রত্যাশী হইয়া ঘুরিতেছিল; সে শুধু বলিল—কোথাও যাইনি বড়, গোরুটার জন্যে ৩ আঁটি বিচুলির তল্লাসে বেরিয়েছিলাম।

জিতু সর্দ্দার বলিল—নায়েব-মশায় তোমাদের বাপ-বেটাকে তলব করেছেন, জরুরী তলব, এখনি যেতে হবে।

চিনিবাসের বুক কাঁপিয়া উঠিল—আবার নায়েব-মশায়ের তলব? শুষ্ক মুখে কাতর দৃষ্টিতে জিতুর মুখের দিকে চাহিয়া আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কিসের জন্যে জানো কি বাবা?

জিতু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল—সে গেলেই টের পাবে। নাও, ছিদামকে ডেকে নেবে আর আমার খোরাকীটা দিয়ে দেবে চলো।

হায় রে দারুণ অদৃষ্ট! নিজের খোরাকীর জোগাড় করিবার জন্য যে পরের কাছে হাত পাতিতে বাহির হইয়াছিল সে জমিদারের সর্দ্দার-পাইককে খোরাকী জোগাইবে কোথা হইতে? চিনিবাসের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল, তাহার বুড়া শরীরের অল্প রক্তটুকুও হিম হইয়া দ্বিগুণ শীতে হাড়ের মধ্যে কম্প ধরাইয়া দিল। চিনিবাস জিতুর কাছে হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবা, কাল থেকে ঘরে হাঁড়ি চড়েনি, বেচা ক্যাবলা দুধের ছেলে দুটো পর্য্যন্ত উপোষ কোরে রয়েছে, তাই সকালে সাত-তাড়াতাড়ি কোথাও থেকে কিছু খাবার জোগাড়ে বেরিয়েছিলাম। তোমায় খোরাকী দিতে কোথায় পাবো বাবা?

জিতু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—এই বললে গোরুর খড় জোগাড় করতে যাচ্ছ, আবার বলছ খাবার জোগাড়ে বেরিয়েছ! বুড়ো হয়ে মরতে চললে খুড়ো, এখনো বিহান পহরে মিথ্যে কথাটা মুখে বাধছে না?

চিনিবাস দুই হাতে জিতুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তোমার দিব্যি বলছি,......

জিতু বাধা দিয়া বলিল—থাক আর দিব্যি গালতে হবে না। নগদ না দাও গোরুটা আমি নিয়ে যাবো। চলো, বেলা বেড়ে যাচ্ছে. ছিদামকে ডেকে নাও আর আমার গোরুটা .....

চিনিবাসের চোখ দিয়া জল পড়িল; সে থরথর-কম্পিত শীর্ণ শুষ্ক অস্থিচর্ম্মসার বড় বড় দুখানি হাত জোড় করিয়া বলিল—দোহাই তোমার সর্দ্দার, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরো না। মেয়ে-বৌএর গয়নাগাটি, ঘর-সংসারের ঘটীবাটি সব গেছে, আছে সম্বল ঐ গোরুটি; সেও খেতে না পেয়ে ধুঁকছে, তবু দুবেলায় দুপোয়া দুধ দ্যায়, তাই খাইয়ে বেচা আর ক্যাবলাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। ছিদামকে আজকের দিনটি ছেড়ে দাও, সে হাসিমপুরে সাধু মোড়লের বাড়ী ধান আছড়াতে যাচ্ছে, সেখানে যে ধানকটি পাবে তাই......

এমন সময় ছিদামও একখানা ছেঁড়া, ময়ূরকণ্ঠী রং হইতে ধূসর বর্ণে পরিণত রেপার গায়ে দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই জিতু বলিল—এই যে ছিদাম এসেছে। তা তোমরা এগিয়ে চলো, আমি গোরুটা নিয়ে আসি......

চিনিবাস আবার মিনতি করিয়া বলিল—গোরুটো তুমি নিয়ো না বাবা, তোমার খোরাকীর পয়সা ধার রইল, আমি দুদিন পরে শুধে দেবো। আর ছিদামকে ছেড়ে দাও বাবা, আমায় নিয়ে চলো .....

ছিদাম শুষ্ক মুখে জমিদারের যমদূতের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল।

জিতু বলিয়া উঠিল—বাপরে! তাও কি হয়! নায়েব-মশায় তোমাদের দু-জনকেই নিয়ে-যেতে বলেছেন।

চিনিবাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—মধুসূদন!

ছিদাম একটি কথাও বলিতে পারিল না, সে পাইক ও পিতার পিছনে-পিছনে কলের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল—সে ভাবিতেছিল, কি কুক্ষণেই আহাম্মকি করিয়া দরখাস্তে সই করিয়াছিল, যে, এখনো তাহার জের মিটিল না, অথচ তাহারা জেরবার হইয়া উঠিল।

চিনিবাস ও ছিদাম বলির পশুর মতন ভয়ে ভাবনায় অনিশ্চিত ও অজ্ঞাত বিপদের প্রতীক্ষায় কাঁপিতে-কাঁপিতে জমিদারের সদর কাছারীতে গিয়া নায়েব পঞ্চাননকে প্রণা[ম] করিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন বাঁ-হাতে হুঁকা ধরিয়া মু[খে] লাগাইয়া টানিতে-টানিতে কি লিখিতেছিল; একবার আ[ড়] চোখে আগন্তুকদের দেখিয়া লইয়া লিখিতেই লাগিল। চিনিবাস ও ছিদাম হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াই[য়া] ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তবু নায়েব-মশায়ের নেক-নজর গরিবদে[র] উপর পড়িল না। ঝাড়া আধ-ঘণ্টা পরে লেখা শেষ করি[য়া] পঞ্চানন হুঁকাতে খুব জোরে কষিয়া গোটা-দুই টান দি[য়া] ধোঁয়া ছাড়িয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া হুঁকাটা বৈঠ[কে] রাখিয়া দিল। চিনিবাস ও ছিদাম নায়েব-মশায়ের হুকু[ম] শুনিবার জন্য তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন তাহাদে[র] দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া বড় বড় খেরুয়া-বাঁধানে[া] খাতা লিখিতে ব্যাপৃত কর্ম্মচারীদের দিকে চাহিয়া বলিল—এবারে কি দারুণ শীতই পড়েছে! আবার মেঘলা-মেঘ[ও] করছে, এর ওপর বিষ্টি-বাদল হলেই চিত্তির!

জমানবিশ প্যারীবাবু বলিল—শীতকালে শীতটা এক[টু] চেপে পড়া ভালো, পিঠেপুলিগুলো অনেক দিন প্রাণ ভ[রে] খাওয়া যাবে।

পঞ্চানন ঢেকুর তুলিয়া বলিল—আরে রামো। খাবা[র] দাবার কি জো আছে ছাই! কাল রাতে একটা পাঁ[ঠা] কাটা হয়েছিল, জামাই এসেছেন কিনা, গিন্নি বললেন দুটে[া] পোলোআ করি; সেই পোলোআ পাঁঠা পিঠে আ[র] সরুচাকলি লকলকি পাটিসাপটা পায়েস সন্দেশ একটু একটু চাখতে-চাখতে দশের লাঠি একের বোঝা হ[য়ে] উঠল। এখনো পোলোআর আর মাংসের ঢেকুর উঠছে!

শুমার-নবিশ রমানাথ বাবুও বলিয়া উঠিল—উঃ! কা[ল] রাত্তিরে আমাদেরও খাওয়াটা খুব জবর হয়েছিল—কা[ল] আমাদের ফিষ্টি হয়েছিল, জমানবিশ বাবুর বাসাতে খাওয়া হলো, রাত প্রায় একটা বেজে গিছল।

পঞ্চানন হাসিয়া বলিল—এই ব্রাহ্মণকে ভোজনে বা[দ] দিলে হে? কি কি রান্না হয়েছিল?

জমানবিশ প্যারীবাবু বলিল—আজ্ঞে আমরা নিজে[রা] রান্না করেছিলাম, তাই ব্রাহ্মণকে বাদ দিতে হয়েছিল রান্না বেশী কিছু হয়নি,—কোপ্তার পোলাও, মাংস, ক[পি] দিয়ে মাছ দিয়ে, চাটনি, আর দই সন্দেশ।

পঞ্চানন হাসিয়া বলিল—ওহে দই সন্দেশটা ত ব্রাহ্মণের খেতে বাধা ছিল না··· ...

এমন সময় চতুর খানসামা আসিয়া খবর দিল নায়েব-মশায়কে বাবু ডাকিতেছেন। আর একজন লোক পাঠাইতে বলিয়াছেন দারোগা-বাবুকে ডাকিতে।

পঞ্চানন সেরেস্তার প্রধান মোহরেরকে বলিল -যদু, তুমি গিয়ে দারোগা-বাবুকে একবার খবর দাওগে, মালিক একবার ডেকেছেন—চাকর পেয়াদা দিয়ে ডেকে পাঠানোটা ভালো দেখাবে না।

পঞ্চানন উঠিয়া দালানে আসিল, উপবাসী চিনিবাস ও ছিদাম আহারতৃপ্ত নায়েব মশায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিবার আশায় একটু নড়িয়া-চড়িয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি তাহাদের দিকে পড়িয়াও পড়িল না; কাছারীর চাকর খেদাই নূতন তামাক সাজিয়া কল্কেতে ফুঁ দিতে-দিতে সেইখান দিয়া যাইতেছিল, তাহা দেখিয়া পঞ্চানন বলিল—তামাক সেজে আনলি? দে হুঁকোটা এনে, একটা টান দিয়ে যাই।

খেদাই হুঁকায় কল্কে চড়াইয়া নায়েব-মশায়ের সম্মুখে বাঁ হাত ডাহিন হাতের কনুইএর কাছে ঠেকাইয়া ডাহিন হাতে হুঁকা বাড়াইয়া ধরিল। পঞ্চানন হুঁকা লইয়া খুব ঘন-ঘন কয়েকটা টান দিয়া খুব জোরে-জোরে দুটা টান দিল এবং খেদাইএর হাতে হুঁকা ফিরাইয়া দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাবুর বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল। চিনিবাস ও ছিদাম হতাশ হইয়া দালানের একপাশে বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পিতা বা পুত্র কাহারো মুখ দিয়া একটা কথাও সরিল না। যত বেলা বাড়িতেছিল বেচারাদের ভাবনাও তত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে চিনিবাস চুপি-চুপি বলিল—ওরে ছিদাম, বেলা যে মবলগ হ'য়ে উঠল! বাড়ীতে কচি ছেলে দুটো যে খিদেয় ভুকচানি যাচ্ছেরে! কি হবে, আঁ্যা?

ছিদাম ছল-ছল চোখে মুখ উঁচু করিয়া শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বুড়াও স্তব্ধ হইয়া বসিল।

বসিয়া-বসিয়া তাহারা দেখিতে লাগিল, দারোগা-বাবু আসিল, বাবুর বৈঠকখানায় গেল; দারোগা বাবু ফিরিয়া থানায় গেল; কাছারীর ঘড়ীতে এগারটা বাজিল, সেরেস্তার বাবুরা দপ্তর গুটাইয়া স্নানাহার করিতে বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু তখনো নায়েব-মশায়ের দেখা নাই, কি যে তাহাদের অপরাধ তাহা তাহারা এখনো জানিতে পারিল না এবং জুতার ঘায়ে শোধ করিয়া ছুটিও পাইল না।

বারোটা বাজিয়া গেল; কাছারীর পাহারা বদল হইল, তবু নায়েব-মশায়ের দেখা নাই। চিনিবাস পাহারা-দারকে জিজ্ঞাসা করিল—নায়েব-মশায় কোথায় বলতে পারো?

উত্তর পাইল, নায়েব-মশায় বাড়ী গিয়াছেন, স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া তিনটার সময় কাছারীতে আসিবেন।

চিনিবাস ছিদামকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল—দুঃখু কি বাবা, বাড়ীতে থাকলেও উপোষ করতে হত এখানেও উপোষ করছি। এ বরং ভালো বলতে হবে যে কাচ্চা-বাচ্চাগুলো না খেতে পেয়ে ধড়ফড়িয়ে মরছে চোখের সামনে দেখতে হচ্ছে না।

ছিদাম কোনোই জবাব দিল না, ছাদের দিকে মুখ তুলিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে বৃদ্ধের ঢুলুনি আসিতেছিল; দালানের যে জায়গাটিতে রোদ আসিতেছিল সেইখানটিতে ক্ষুধায় কাতর বৃদ্ধ জড়সড় হইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ছিদামও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিল। এক-এক ঘণ্টা অন্তর ঘড়ীতে ঘা পড়ে আর তাহারা চমকিয়া জাগিয়া উঠে, নায়েব মশায় তখনো আসেন নাই দেখিয়া আবার ঝিমায়।

তিনটার পর পান চিবাইতে-চিবাইতে পঞ্চানন দশ-বারো জন কর্ম্মচারীতে পরিবৃত হইয়া কাছারীবাড়ীর সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে বলিতেছিল—জামাই বাড়ীতে এলে খাবার সুখটা খুব হয় হে! ওঃ, গণ্ডেপিণ্ডে গিলে এখন হাঁসফাঁস করছি—একটু ঘুমোনোও হ'লো না......

বারো জোড়া জুতোর ঠকঠক মশমশ শব্দেও ক্লান্ত চিনিবাস ও ছিদামের ঘুম ভাঙে নাই, গুরু আহারের গল্পের কলরবও ক্ষুধায় অবসন্ন নিদ্রিতদের কানে পৌঁছে নাই। পঞ্চানন দালানে উঠিয়াই দুই লাথিতে দুজনকে চেতন করিয়া বলিয়া উঠিল—এটা তোদের আরাম কোরে ঘুম দেবার জায়গা, না?

ছিদাম বসিয়া-বসিয়া ঘুমাইতেছিল, লাথির ধাক্কায় তাহার মাথা দেয়ালে ঠুকিয়া গেল, চিনিবাস উঃ করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; চোখ মেলিয়াই যমের চেয়েও নিষ্ঠুর নায়েব-মশায়কে সম্মুখে দেখিয়াই তাহারা থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চানন শ্লেষের স্বরে বলিল—কিরে, আমাকে মা-কালীর কাছে নাকি বলি দিবি? এখন কে কাকে বলি দ্যায় দ্যাখ্। এই দারোয়ান, বেটাদের পঞ্চাশ পঞ্চাশ জুতো লাগা—ডাক তোদের পতে বাবাকে, এসে রঙ্গে করুক।

চিনিবাস ও ছিদাম নিজেদের অপরাধ কি বুঝিতে না পারিয়া ভয়চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিয়া দুজনেই পঞ্চাননের পায়ের উপর গিয়া পড়িল--পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে অপমান ও বেদনা হইতে বাঁচাইবার জন্য, এ মনে করিতেছিল ও বোধ হয় অপরাধী, আর ও মনে করিতেছিল এ বোধ হয় কোনো অপরাধ করিয়াছে যাহা সে জানে না, নিজে যে কিছু অন্যায় করে নাই সে প্রত্যয় ত প্রত্যেকেরই আছে। চিনিবাস কাতর স্বরে বলিল—নায়েব-মশায় মিনি দোষে শাস্তি করবেন না; আপনার হুকুমে একশো টাকার খত লিখে দিয়ে গেছি; আর ত আমরা কোনো অপরাধ করিনি......

পঞ্চানন দুই লাথিতে দুজনকে ফেলিয়া দিয়া বানরের মতন মুখ খিঁচাইয়া বলিল—ন্যাকা চৈতন! কিছু জানো না? মেয়ে যে কাল সাঁড়াশিয়ার হাটে রক্ষাকালীর কাছে মানত কোরে এসেছে মা-কালীকে আমার রক্ত দেবে!...

চিনিবাস দুই হাতে কান চাপিয়া জিব কাটিয়া বলিল —রাম রাম! আপনি হলেন দেবতা বেরাম্ভন, আপনার রক্ত গোরক্ত তুল্য! এ কথা কি সে মুখে আনতে পারে?

পঞ্চানন বলিল—এক হাট লোক সাক্ষী আছে। তুই না বল্লেই হবে?

চিনিবাস ছিদামের দিকে ফিরিয়া বলিল—কাল কে হাটে গিছল রে?—দাখী, না থাকী?

পঞ্চানন বলিয়া উঠিল—তোমার থাকী গো থাকী, আমি ইচ্ছে করলে তোদের সব্বাইকে পুলিশে দিতে পারি, কিন্তু আমি মেয়েলোককে বে-ইজ্জত করতে চাইনে। তোরা এর একটা যদি বিলি বন্দেজ করিস্ ভালো, নয়ত শেষে আমাকে পুলিশে খবর দিতেই হবে।

পুলিশের নামে চিনিবাসের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে হাত জোড় করিয়া বলিল—আপনি গরিবের মা-বাপ, তাকে শাস্তি করতে হয় আপনি বলো, পুলিশে দিয়েন না......

পঞ্চানন বলিল—ও নিজের ছেলে ক্যাবলার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর্‌বে যে সে আমার রক্তদর্শন করবে না তবেই ছাড়বো; নইলে তোদের সব্বাইকে পুলিশে দেবো। একটা মেয়েমানুষের কথায় কিবে আসে যায়, আমি কিছু বলতাম না, কিন্তু তোদের বড্ড বাড় বেড়ে চলেছে দমন করা দরকার।

চিনিবাস বলিল—কাল সক্কালেই থাকী আর ক্যাবলাকে নিয়ে আমরা কাছারীতে আসবো, সে আপনার সামনে দিব্যি কোরে আপনার পায়ে ধোরে ঘাট মেনে যাবে।

—আচ্ছা তবে আজ যা; কাল আসিস কিন্তু—বলিয়া পঞ্চানন সেরেস্তায় ঢুকিল।

(২৭)

সকাল হইলে কেবলরাম ও বেচারাম নিজের নিজের মাকে বলিল—মা খিদে পেয়েছে, কি খাবো?

ছিদামের স্ত্রী চন্দনার মেজাজটা কিছু রুক্ষ, তাহাতে আবার মাসাবধি পেট ভরিয়া খাবার জুটিতেছে না, তাহার উপর দুই বিধবা ননদ ছেলে লইয়া আসিয়া জুটিয়া স্বল্প খাবারেও ভাগ বসাইয়াছে, বুড়া শ্বশুর ও বাতে-পঙ্গু শাশুড়ীকে পোড়া যমের এখনো মনে পড়িল না বলিয়া চন্দনা মনে মনে গুমরাইতেছিল; কাল রাত্রিটা নিছক উপবাসে গিয়াছে, পেটের জ্বালার অনুপাতে মেজাজও জ্বলিতেছিল। ছেলের প্রশ্নের উত্তরে চন্দনা কোনো সাড়াই দিল না। বেচারাম আবার মায়ের গা ঠেলিয়া বলিল—ওমা, মা, খিদে পিয়েছে, কি খাবো?

চন্দনা গায়ের ছেঁড়া কাঁথাখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ঝাঁজিয়া বলিয়া উঠিল—হতচ্ছাড়া ছেলে, খাবি কি? উনুনে ছাইও নেই যে খাবি, চিতেও যে কবে জ্বালবো তাও জানিনে। এই কিল খা, এই চড় খা, আর এই তোরা সব্বাই মিলে আমার মাথাটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খা.. ...

বেচারা বেচারামের চীৎকারে ঘর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

থাকো তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—ওকি বৌদি, বেহান পহরে ছেলেটাকে গাল পাড়তে নেগেছ, খামকা টিপুচ্ছ। ষাট ষাট। চ বেচা, গাই দুয়ে দি গিয়ে, তুই আর ক'বলা খাবি......

চন্দনা রুক্ষ স্বরে, বলিয়া উঠিল—নিজেদের ঘরসংসার উজাড় করে আমার কন্ধে এসে ভর করেছেন যবে থেকে তবে থেকে সংসারে শনির দিষ্টি লেগেছে। তোমরা গোরুর বাঁটে হাত দিয়ো না, যেটুকু দুধ দিচ্ছে তাও চম্‌কে যাবে।

থাকো আর কিছু না বলিয়া বেচাকে কোলে তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; দাখোও বেগতিক দেখিয়া কেবলরামকে কোলে তুলিয়া ঘর হইতে পলাইল; অথর্ব্ব বুড়ী তাঁতি-গিন্নি বৌমার চোপার ভয়ে আড়ষ্ট আকাট হইয়া পড়িয়া রহিল, বেচারীর পলাইবার শক্তি ছিল না।

বাহিরে গিয়া দাখো থাকোকে জিজ্ঞাসা করিল—ছেলেগুলো কি খাবে লো?

থাকো বলিল—ভগমান যা মাপাবেন। বাবা ত বেরিয়েছে, কিছু জোগাড় কোরে নিয়ে এল বলে। দাদাও কাজে গেছে। এবেলাটা যেমন-তেমন কোরে চালিয়ে সন্ধ্যে বেলা দুটো ভাত জুটবে এখন।

কেবলরাম মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিয়া কাঁদুনে সুরে বলিল - মা খিদে পেয়েছে যে, কি খাবো?

থাকো বলিল—যা বাবা, ততক্ষণ দুটো কুল পেড়ে খেগে যা, দুধ দোয়া হলে মামী খেতে দেবে।

দাখো বলিল—সকাল বেলা বাসি পেটে কোথো কুল খাবে কি লো? দাঁড়া, রোস্, গাছে একটা পেঁপে পাকটো হয়েছিল, পেকেছে কি না দেখি।

তাঁতঘরের পিছনেই একটা পেঁপে-গাছ ছিল; তাহাতে একটা পেঁপে পাকিয়া ছিল। দাখো একটা আঁকষি দিয়া সেই পেঁপেটা পাড়িল। ধপ করিয়া পেঁপে পড়ার শব্দে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দনা ঘর হইতে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে পেঁপে পাড়ছে রে?

দাখো বলিল—আমি বৌদি।

চন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—সকাল বেলাই পেটে আগুন জ্বললো, পেঁপেটি গিলতে হবে।

দাখো বলিল—আমরা গিলবো না বৌদি, ছেলেদের দেবো আর মাকে একটু দেবো।

থাকো বলিয়া উঠিল—আমরাই বা গিলবো না কেন? বাপ-ভাইএর জিনিস, বেশ করবো গিলবো। কাগে হনুমানে খেয়ে যেতে পারে, আর আমরা মনিষ্যি আমরা খেলেই বুক ফেটে যায়!

চন্দনার স্বর সপ্তমে চড়িল—যারা মিনি দোষে সকাল বেলায় আমায় গালাগাল-মন্দ করছে, হে হরি, তাদের যেন বুক ফাটে, বেটার মাথা যেন কড়মড়িয়ে খায়, আপনার ভালো খেয়ে যেন রাক্কুসে খিদে নিবিত্তি করে . ...

থাকো ব্যথিত হইয়া বলিল—আপনার ভালো ত খেয়ে বসে আছি বৌদি, এখন আমাদের ভালো তোমরাই, নিজেকে নিজে গালাগাল দিয়ে অকল্যেণ ডেকে এনো না।

চন্দনা পরাজিত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—ভালো রে ভালো! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদেরই গাল দেওয়া, যার খাবে তারি সব্বনাশের আহিঙ্গে—এযে বুকে বসে দাড়ি ওবড়ানো। আচ্ছা, আসুক আজ বাড়ী, বোনেদের নিয়ে থাকবে, না আমায় নিয়ে থাকবে, তার একটা বোঝাপড়া হবে।

দাখো বলিয়া ফেলিল—এখনো দাদা ত কত্তা হয়নি, মাথার ওপর বাপ-মা বসে রয়েছে......

—আচ্ছা গো আচ্ছা, তবে তোমরা আপদ বালাই আমাকেই দূর কোরে দিয়ে বাপভাই নিয়ে ঘর করো—বলিয়া চন্দনা রায়বাঘিনীর মতন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বেচারামকে থাকোর কোল হইতে ছিনাইয়া লইল এবং তাহার পিঠে দুই চড় কষাইয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে লইয়া চলিয়া গেল; বেচারা বেচারামের কান্নার রোল আকাশ চিরিয়া ফেলিতেছিল।

থাকো খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া দাখোকে বলিল—দিয়ে দিগে দিদি ওর পেঁপে ওকে, ঐ দিষ্টি-দেওয়া পেঁপে খেলে ক্যাবলার পেট ফুলবে।

পেঁপে খাইবার আশায় উৎফুল্ল কেবলরাম মামীর রণমূর্ত্তি ও বেচারামকে প্রহার দেখিয়া কাঁদো-কাঁদো হইয়া ছিল, এখন পেঁপেও খাইতে পাইবে না শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—আমি পেঁপে খাবো।

দাখো তাহাকে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—খাবে বৈকি বাবা, চল কেটে দিগে।

চন্দনা গোহাল-ঘরে দুধ দুইয়া সেই কাঁচা দুধের ঘটী বেচারামের মুখের সামনে ধরিয়া বলিল—খা।

বেচারাম এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া ঘটী মায়ের হাতে ফিরাইয়া দিল। ঘটীতে দুধ আছে দেখিয়া চন্দনা ছেলেকে বলিল—সবটা খেয়ে ফ্যাল।

বেচা বলিল—ক্যাবলা-দাদা খাবে যে।

চন্দনা বলিল—না, সে পেঁপে খেয়েছে, আর দুধ খাবে না।

বেচা বলিল—পিসিমা ত বলেছে পেঁপে আমাকেও দেবে......

চন্দনা আর কিছু না বলিয়া ঘটীর দুধটুকু নিজের গলায় ঢালিয়া দিল।

চন্দনা খালি ঘটী লইয়া গিয়া ধুইয়া দাওয়ার উপরে উপুড় করিয়া রাখিল। দাখো আধখানা পেঁপে আনিয়া চন্দনার সামনে রাখিয়া ও কয়েক টুকরা বেচারামের হাতে দিয়া বলিল—আধখানা পেঁপে কেটে ক্যাবলা ব্যাচা আর মাকে দিয়েছি; এ আধখানা রেখে দাও বাবা দাদা খাবে। দুধ কোথায় রাখলে, দুধ একটু দাও ক্যাবলাকে আর মাকে গরম কোরে দি।

চন্দনা পেঁপের আধখানা তুলিয়া লইয়া গম্ভীর মুখে বলিল—দুধ আজ আর বেশী হয়নি, যেটুকু হয়েছিল ব্যাচা খেয়েছে.....

বেচারামের নামে মিথ্যা দোষারোপ শুনিয়া সে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—হ্যাঁ, সবটা আমি খেয়েছি বুঝি? অর্দ্ধেকটা ত আমি ক্যাবলা-দাদার জন্যে রেখেছিলাম, তুমি খেয়ে নিলে .....

বেচারামের মুখের কথা শেষ হইবার আগেই চন্দনার প্রচণ্ড চড় বেচারামের পিঠে আসিয়া পড়িল। দাখো অমনি টুপ করিয়া বেচাকে কোলে তুলিয়া সেখান হইতে দৌড় দিল। চন্দনা রাগে ও লজ্জায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—বেশ করেছি খেয়েছি! আমার জিনিস আমি খেয়েছি, তাতে কার কি! শতেকখোয়ারি ভালো-খাকীরা আমার সংসারে থাকে কেন!......

থাকো দাখোকে চুপি-চুপি বলিল—আজ সকাল থেকে ও অমন কোরে মরছে কেন?

বেচারাম তখনো কাঁদিতেছিল। দাখো বেচারামে বুকে চাপিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যথিত হাসি হাসিয়া বলিল—একে চটামেজাজ, তায় কাল থেকে খাও হয়নি, পেট জ্বলছে; আমরা যদি না এসে জুটতাম ত হলে এখনকার একদিনের খরচে ওর দুদিন চলতো, ও রাগ ত হবারই কথা বোন।

—তা দিদি, আমরা ভেন্ন হই চল্।

—কি নিয়ে ভেন্ন হবি?

—এমনেও উপোষ অমনেও উপোষ। দুজনে গতর খাটালে ক্যাবলাটার পেট ভরাতে পারবো না?

—বাপভাই রাজি হবে কেন?

—রোজ রোজ এমন হেওড়াহেওড়ি-ক্যাওড়াকেওড়ি অশান্তির চেয়ে আমাদের ভেন্ন কোরে দেওয়াই ভালো, আজ একবার বোলে দেখবো। একখানা চালা......

দাখো বলিয়া উঠিল—মা ডাকছে।

দুই বোনে বেচারাম ও কেবলরামকে খেলা করিতে যাইতে বলিয়া মায়ের কাছে গেল।

তাঁতি-গিন্নি মেয়েদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কোথায়?

—বাবা সকাল বেলাই বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।

বুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পেটের ধান্দায় ঘুরছে। এই বাড়ীতে একদিন পাঁচখানা তাঁত খেটেছে, এখন তাঁতে মাকড়সায় জাল বুনছে!......আমায় একটু রোদে নিয়ে চ।

দুই বোনে ধরাধরি করিয়া মাকে দাওয়ায় আনিয়া রোদে বসাইয়া দিল। থাকো বলিল—একটু তেল মালিশ কোরে দিতে পারলে হতো পায়ে।

বুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—আর তেল! গায়ে সর্ষে ফুঁড়ে উঠছে, ভাতে পোড়া মাখতে একটু পাওয়া যায় না, তা পায়ে মালিশ! আমাদের এখন মরণ হলেই বাঁচি!

চন্দনা ঘরের মধ্যে বিড়বিড় করিয়া বলিল—আমরাও বাঁচি, হাড়ে বাতাস লাগে।..

থাকো বলিল—মা, তুমি বোসো, আমরা ডুব দিয়ে আসি।

থাকো ও দাপো স্নান করিয়া আসিল। চন্দনাও স্নান করিয়া ফিরিল। তখনো চিনিবাসের দেখা নাই।

থাকো বলিল—বেলা যে মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল, বাবার যে এখনো দেখা নেই, গেল কোথায়?

চন্দনা বলিয়া উঠিল—খেতে দেবার ভয়ে কোথায় লুকিয়ে বোসে তামাক ফুঁকছে। জানে বেটা রোজগার করতে গেছে, সন্ধ্যেবেলা বাড়ী এসে ভাতে ভাগ বসাবে।

থাকো বলিয়া উঠিল—দ্যাখো বৌদি···

বুড়ী বাধা দিয়া বলিল—থাকো তুই থাম, আমার মাথা খাস, এই দুঃখের ওপর আর কথা কাটাকাটি করিসনে। আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে—বুড়ো আত্মহত্যা করলে না ত?

দাপোর ও থাকোর বুকে কথাটা ঘাঁত করিয়া বাজিল; তাহাদের মুখ শুকাইয়া উঠিল। তাহারা বলিল—আমরা একবার পাড়ায় জিজ্ঞেস কোরে দেখে আসি।

তাহারা পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিল, কেহই চিনিবাসকে আজ সকাল থেকে দ্যাখে নাই। অবশেষে একজন বলিল চিনিবাস ও ছিদামকে জিতু সর্দ্দারের সঙ্গে হাতীকাঁদার দিকে যাইতে দেখিয়াছে। তখন আরেক-রকম ভয়ে তাহাদের মন দমিয়া গেল।

খবরটা পাইয়া বুড়ী একদিকে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল। আপন মনে বলিল—মধুসূদন, এখনো শাস্তির শেষ হয়নি?

চন্দনারও বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। কথা ফুটিল—থাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হলো তাঁতির এঁড়ে গোরু কিনে। জমিদারের সঙ্গে যেমন লড়াই করতে যাওয়া হয়েছিল, তার ফল ভোগ করতে হবে না? কুমীরের সঙ্গে বাদ কোরে জলে বাস করবার ইচ্ছে?

কেবলরাম ও বেচারাম ক্ষুধায় কাঁদিয়া-কাঁদিয়া নেতাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীলোক কজন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। পৌষ মাসের বেলা, সন্ধ্যা হয়-হয়।

এমন সময় শুষ্ক মুখে ধূলা-মাখা পায়ে আগে আগে চিনিবাস ও পিছনে পিছনে ছিদাম বাড়ী ঢুকিল। চিনিবাস পথে ক্ষেত হইতে একটা শাঁক-আলু ও একটা বেগুন ও চারটি মটরশুঁটী চাহিয়া আনিয়াছে—গামছা-সুদ্ধ সেগুলি ধপাস করিয়া দাওয়ায় ফেলিয়া নিজেও বসিয়া পড়িল; ছিদামও দাওয়ায় উঠিয়া বসিল। একদণ্ড কাহারো মুখে কোনো কথা নাই, কেহ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিতেছে না। চন্দনা ছটফট করিতেছিল, কিন্তু শ্বশুরের সাক্ষাতে তাহার খর রসনাও রুদ্ধ হইয়া ছিল। অনেকক্ষণ পরে থাকো জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, জমিদার আবার তলব করেছিল কেন?

চিনিবাস ক্রোধ দুঃখ-অভিমান-বেদনায় ভরা স্বরে বলিল—এই তোমার মতন গুণের মেয়ের জন্যে।

থাকো আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার জন্যে?

—কাল সাঁড়াশিয়ার হাটে গিয়ে কি কীর্ত্তি কোরে এসেছ?

থাকো বুঝিতে পারিল ব্যাপার কি। কাল রাগের মাথায় সে যাহা করিয়াছে তাহাতে যে তাহার বাপ ভাই জড়াইয়া বিপন্ন হইবে তাহা সে মোটেই ভাবে নাই। বাপের কথায় তাহার হুঁশ হইল। সে চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

চিনিবাস বলিল—তুই নাকি বামুনকে খুন করবি বলেছিস একহাট লোকের সামনে!

থাকো উষ্ণ হইয়া বলিল—পেঁচো আবার বামুন? ও চামারেরও অধম!

—এ সমস্তই ঐ পতে ছোঁড়ার সলা! মেয়েমানুষকে নাচিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখা! আমরা জমিদারের কাছে ঘাট মেনেছি, সেই রাগে আমাদের হাতে দড়ি দেবার চেষ্টা!

বিনা দোষে পতিতকে অপরাধী করা হইতেছে দেখিয়া থাকো ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, মোড়লের পোর এতে কোনো দোষ নেই। আমি আপনা হতেই বলেছিলাম; তখন জানতাম না তোমাদের এতে বিপদে পড়তে হবে। আমি তোমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তা হলেই আর তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না।

ছিদাম বলিয়া উঠিল—না না, তোকে সে-সব কিছু করতে হবে না। কাল সকালে নায়েব-মশায়ের কাছে গিয়ে ক্যাবলার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কোরে বলবি নায়েবমশায়ের তুই কিছু অনিষ্ট করবিনে, তা হলেই নায়েব-মশায় মাপ করবে বলেছে—নায়েব-মশায় কি মেয়েলোকের ওপর অত্যাচার করবে।

থাকো রুষ্ট স্বরে বলিল—না, নায়েব-মশায় তোমাদের ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! গয়লাদের সৈরবীকে জেলে দিয়েছিল কি কোরে? বীরেন রায়ের মাকে কে মেরেছিল? তোমরা পেঁচোকে ভয় করতে পারো, আমি ডরাইনে—মরার বাড়া গাল নেই, সেই মরণ হলেই ত আমি বাঁচি।

থাকো ঘুমন্ত পুত্রকে বুকে তুলিয়া দাওয়া হইতে নামিল। থাকোর মা বলিল—এমন ভর সন্ধ্যেবেলা ছেলে নিয়ে কোথায় চল্লি লো, ছেলেটাকে না হয় রেখে যা......

থাকো কোনো কথায় জবাব না দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল; দাখোও পিছনে পিছনে নীরবে বাহির হইল।

এমন অনায়াসে পাপ বিদায় হইল দেখিয়া চন্দনার মন খুসীতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া চৌকাঠে জল দিয়া দু ভাঁড় জল আনিয়া শ্বশুর ও স্বামীকে পা ধুইতে দিল; পেঁপে ও শাঁক-আলু ছাড়াইয়া দুই চিল্‌তে কলাপাতায় করিয়া আনিয়া রাখিল এবং ঘর খুঁজিয়া চারটি চালের খুদ ও বেগুন মটরশুটীগুলি একত্র করিয়া সিদ্ধ করিবার জোগাড় করিতে লাগিল। অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া বুড়া-বুড়ী চোখের জল ফেলিতেছিল। ছিদামের একবার করিয়া পতিতের উপর রাগ হইতেছিল, একবার করিয়া পতিতের দলে ভিড়িয়া পঞ্চাননের মুণ্ডপাত করিবার ইচ্ছা হইতেছিল, সে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

(২৮)

চিনিবাস-তাঁতির বাড়ীর নিকটেই পতিতের বেশ বড় একটা আম-বাগান। থাকো ও দাখো কেবলরামকে লইয়া সেই বাগানে গিয়া গাছতলায় আশ্রয় লইল।

খোলা জায়গায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া কেবলরামের ঘুম ভাঙিয়া গেল; সে বলিয়া উঠিল—মা, আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিস্‌ কেন?

থাকো বিষণ্ণস্বরে বলিল—এই গাছতলাতেই থাকতে হবে বাবা, তোর মামার বাড়ীতে ওরা আর থাকতে দেবে না।

অবুঝ দুঃখে ও ভয়ে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কেবলরাম বলিল—বড্ড জাড় লাগ্‌ছে যে মা।

দাখো বলিল—দাঁড়া, আমি আগুন করছি।

থাকো নিজের আঁচলে ছেলেকে জড়াইয়া কোলে মধ্যে চাপিয়া বসিল। দাখো ঝরিয়া-পড়া শুকনো পাতা জড়ো করিতে লাগিল।

পাতা জড়ো করিয়া রাখিয়া একটু আগুনের জন্য দাখো নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। গিয়া দেখিল চন্দনা রান্না চড়াইয়াছে। দাখো দুখানা ঘুঁটে পাতিয়া বলিল—বৌদিদি, একটু আগুন দাও ত।

চন্দনা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ভর-সন্ধ্যেবেলা আগুন দিলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে।

দাখো আর কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিকটেই পতিত হাড়ির বেগুন ও আখের ক্ষেত ক্ষেতের আগলদারেরা কুঁড়ে ও টং বাঁধিয়া সেই ক্ষেতে আছে। দাখো তাহাদের কাছে চাহিয়া একটু আগুন লইয়া আসিল।

আগুনের তাতে কাঁপুনি একটু থামিলে কেবলরা বলিল—মা বড় খিদে পেয়েছে যে।

ক্ষুধা যে কি পরিমাণ পাইয়াছে তাহা মা-মাসীরাও বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিল। দাখোর মনে হইল তাহার বৌদিদি রান্না চড়াইয়াছে—কিন্তু তখনি মনে পড়িল তাহার আর সে সংসারের কেউ নয়।

পতিত মণ্ডল সমস্ত দিন গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া কাহার আহার জুটে নাই জানিয়া তাহাদের অন্নবস্ত্র চালদার জোগাড় করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল; আমবাগানে আগুন দেখিয়া মনে করিল বেদেরা বোধ হয় টোল ফেলিয়াছে। পাছে তাহারা কোনো গাছ আগুন-আঁচে জখম করে এই ভয়ে সে দেখিতে চলিল কেমন জায়গায় তাহারা আগুন করিয়াছে। একটু গিয়াই সে শুনিতে পাইল শিশু-কণ্ঠের কাতরতা—মা বড় খিদে পেয়েছে যে।

তাহার মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উপায় আবিষ্কারের ক্ষীণ আনন্দ-মিশ্রিত কাতর সান্ত্বনার স্বরে বলিল—একটু মাই খাবি বাবা?

শিশু বলিল—সমস্ত দিন কিচ্ছু খাইনি, মাই খেয়ে পেট ভরবে কিনা! মাইএ ত তোর দুধ নেই।

নিঃসম্বল মাতার একমাত্র সম্বল আপনাকে দিয়াই সে পুত্রের ক্ষুধা মিটাইতে চাহিতেছিল। কিন্তু তাহা যে কতখানি দুরাশা ও কতবড় প্রবঞ্চনা তাহা পুত্রের কথায় বড় দারুণ রকমে মনে পড়িল। তবুও আপনাকে দমন করিয়া রাখিয়া মাতা ক্ষুধাতুর পুত্রকে ভুলাইবার জন্য আবার বলিল —খা না একটু, তবু গলাটা ত ভিজবে।

আগুনের আলোতে তাহাদের চিনিতে পারিয়া পতিত ডাকিল—থাকো দিদি।

অন্ধকারে হঠাৎ মানুষের ডাকে চমকিয়া উঠিয়া থাকো জিজ্ঞাসা করিল—কে?

—আমি পতিত। তোমরা এখানে?

—আমার জন্যে পেঁচো বামনা আমার বাপ-ভাইকে শাস্তি করছে; তাই আমি তাদের বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছি।

—তবে দিদি, তুমি আমার বাড়ী চল।

—না, আমার জন্যে কাউকে আমি বিব্রত করব না।

—ক্যাবলার সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি; এই শীতে আড়ষ্ট হয়ে ছেলেটা যে মারা যাবে। আর আমি ত বিব্রত হয়েই আছি; আমায় আর বেশী কি বিব্রত করবে তুমি?

ছেলের বিপদের আশঙ্কায় মাতার মন আর আপত্তি করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

দাখো বলিল—তাই যা থাকো, মোড়লের বাড়ীই আজ যা; বাপ ভাই মান ইজ্জতের চেয়ে নিজেদের আরামটাই যখন বড় কোরে দেখছে, তখন তাদের দিকে আর তাকাসনে।

থাকো জিজ্ঞাসা করিল—তুমি?

দাখো বলিল—তুই বলিস যদি ত আমিও তোর সঙ্গেই যাবো।

থাকো একটু ভাবিয়া বলিল—না দিদি, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। নিন্দে কলঙ্ক অখ্যাতি সে আমার একলারই থাক্।

ঐ কথা শুনিয়া দাখো দৃঢ়স্বরে বলিল—তোকে একলা ফেলে আমি ফিরব না থাকো—চ আমিও যাবো।

—তুমি যদি সঙ্গে থাকো, তবে আর কারো বাড়ী যাবার দরকার কি?....আমরা একখানা কুঁড়ে বেঁধে এইখানেই থাকবো মোড়লের পো।

পতিত আর অনুরোধ করিল না; সে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সে কিছু চিঁড়ে গুড়, দুগাছা আক, কতকগুলো বেগুন ও শাঁকআলু, কলাপাতা ও নূতন একটা ভাঁড় আনিয়া সেইখানে রাখিল। তারপর বলিল—ক্ষেতের আগলদারদের কাছ থেকে এই পেলাম। কাল সকালেই আমি চাল দাল নিয়ে আসবো।

পতিত চলিয়া গেলে থাকো বলিল—দিদি, বাড়ীতে সমস্ত দিন কারও আজ খাওয়া জোটেনি; ক্যাবলার মতন চারটি চারটি রেখে বাকী সব বাড়ীতে দিয়ে আয়।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্লেটো—সোক্রাটীসের কারাবাস

৯। সো—তাহা হইলে, আমরা যাহা মানিয়া লইলাম তাহা হইতে আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যে আমি যদি আথীনীয়দিগের অনুমতি বিনা এস্থান হইতে পলায়ন করিতে প্রয়াস পাই, তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে, কি ন্যায়সঙ্গত হইবে না; যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে আমরা ঐ বিষয়ে উদ্যম করিয়া দেখিব; যদি না হয়, আমরা উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই। কিন্তু তুমি যে-সকল বিষয় বিবেচনাযোগ্য বলিয়া বলিতেছ—অর্থব্যয়, খ্যাতি, সন্তানপালন—হে ক্রিটোন্, সেগুলি বস্তুতঃ সেই জনসাধারণের পক্ষেই বিবেচ্য, যাহারা বিনাবিচারে অনায়াসেই অপরকে বধ করিয়া থাকে, এবং যাহারা পারিলে অবলীলাক্রমে আবার তাহাদিগকে প্রাণদান করিত। কিন্তু, আমাদিগকে বিচার-বুদ্ধি এই সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে, যে, আমি এইমাত্র যাহা বলিয়াছি, তদ্ভিন্ন আর কিছুই বিবেচনা-যোগ্য নহে; তাহা এই—যাহারা আমাকে এস্থান হইতে পলায়ন করিতে সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে অর্থ ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়া, এবং নিজেরাও কারাগার হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে দিয়া, আমরা ন্যায়-সঙ্গত আচরণ করিব, না, এই-সকল করিয়া বস্তুতঃ অন্যায়ের ভাগী হইব। যদি দেখা যায়, যে, এই-সকল করিলে আমরা অন্যায়ই করিব, তাহা

হইলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া যদি মরিতেও হয়, তবে তাহাও গণনা করা উচিত নহে; অন্যায়াচরণের তুলনায় চরম দণ্ডভোগও তুচ্ছ।

ক্রি—সোক্রাটীস্, আমার বোধ হইতেছে তুমি উত্তম কথাই বলিয়াছ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আমরা কি করিব।

সো—হে ভদ্র, এস, আমরা একত্র ভাবিয়া দেখি; আমি যাহা বলিলাম, যদি তোমার তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে, বল, আমি তোমার কথা মানিয়া লইব। কিন্তু যদি না থাকে, তবে হে ভাগ্যধর, এখনই থাম; তবে পুনঃ পুনঃ সেই এক কথাই বলিও না, যে আথীনীয়গণের অনুমতি বিনা আমার এস্থান হইতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য। আমি তোমাকে কথাটা বুঝাইবার জন্য একান্ত ব্যাকুল; আমি তোমার অমতে এখানে থাকিতে চাহিতেছি না। এখন এই বিচারের প্রথমাবধি আলোচনা করিয়া দেখ, যে, যাহা তোমাকে বলিয়াছি, তাহা পর্য্যাপ্ত কি না; এবং তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব, যথাসাধ্য তাহার সদুত্তর দিতে চেষ্টা কর।

ক্রি—আচ্ছা, আমি চেষ্টা করিব।

১০। সো—আমরা কি বলিব, যে, কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায়াচরণ করা উচিত নহে; না কোনও স্থলে অন্যায়াচরণ করা উচিত, কোন কোনও স্থলে উচিত নহে, ইহাই বলিব? আমরা পূর্ব্বে বহুবার মানিয়া লইয়াছি, যে, অন্যায়াচরণ কস্মিন্‌কালেও শ্রেয়ঃ বা মহৎ হইতে পারে না; একথা কি ঠিক্? অথবা আমরা পূর্ব্বে যাহা কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াছি, সে সমস্তই এই অল্প কয়দিনেই বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে? হে ক্রিটোন্, আমরা যে এই পরিণত বয়সে বহুবৎসর ধরিয়া এমন ব্যগ্রভাবে পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া আসিতেছিলাম, আমাদিগের অজ্ঞাতসারে তাহাতে কি আমরা কেবল বালকোচিত ব্যবহারই করিয়াছি? অথবা আমরা তখন যাহা বলিয়াছি, তাহাই ধ্রুব সত্য, তা' জনসাধারণ তাহা স্বীকার করুক বা না করুক? আমরা কঠিনতর দণ্ডই ভোগ করি, বা লঘুতর দণ্ডই প্রাপ্ত হই, অন্যায়াচরণ অন্যায়াচারীর পক্ষে সর্ব্বস্থলেই অকল্যাণ ও লজ্জার কারণ; আমরা ইহাই বলিব, কি বলিব না?

ক্রি—হাঁ বলিব।

সো—তবে অন্যায়াচরণ কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ক্রি—নিশ্চয়ই নয়।

সো—যদি অন্যায়াচরণ কখনই কর্ত্তব্য না হয়, তবে ইতরজন যে মনে করে, অন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায় করা উচিত, তাহাও ঠিক্ নহে।

ক্রি—সুস্পষ্টই নয়।

সো—বেশ কথা। কাহারও অপকার করা উচিত, না অনুচিত, ক্রিটোন্?

ক্রি—কখনই উচিত নয়, সোক্রাটীস্।

সো—আচ্ছা, ইতরজন বলিয়া থাকে, অপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করা কর্ত্তব্য; ইহা ন্যায়সঙ্গত, না ন্যায়সঙ্গত নহে?

ক্রি—কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে।

সো—যেহেতু, কোনও লোকের অপকার করা ও তাহার প্রতি অন্যায়াচরণ করা, এই উভয়ে কোন পার্থক্য নাই।

ক্রি—তুমি যথার্থ বলিয়াছ।

সো—তাহা হইলে আমরা অপর হইতে যে দুঃখ ভোগ করি না কেন, কোনও লোকের প্রতিই অন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায়াচরণ বা তাহার অহিত-সাধন কর্ত্তব্য নহে। ক্রিটোন্, তুমি দেখিও যে একটি একটি করিয়া এই-সকল কথা মানিয়া লইয়া তোমাকে তোমার মতের বিপরীত কিছু মানিয়া লইতে না হয়। কেন না, আমি জানি, যে, অল্প লোকেই এই-প্রকার মত পোষণ করে ও করিবে। সুতরাং যাহারা এই-প্রকার মত পোষণ করে, ও যাহারা করে না, তাহাদিগের মধ্যে বিচারের কোনও সাধারণ ভূমি নাই; কাজেই তাহারা যে পরস্পরের মত দেখিয়া পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে, তাহা অপরিহার্য্য। অতএব তুমি খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, যে, আমাদিগের মধ্যে কোনও সাধারণ ভূমি আছে কি না, এবং তুমি আমার মতে মত দিতে পারিতেছ কি না। তুমি কি মনে কর, যে, আমরা এই বিষয় হইতে আলোচনা আরম্ভ করিব, যে, অন্যায়াচরণ করা, বা অন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায় করা, কিংবা অপকার সহ্য করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপকার করি-

প্রতিশোধ লওয়া কখনই ধর্ম্মসঙ্গত নহে? না তুমি এই মূল সূত্রেই আপত্তি করিতেছ ও ইহাতে সায় দিতে পারিতেছ না? আমি পূর্ব্বেও এই মূল সূত্র অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতাম এবং এখনও করি। তোমার যদি অন্যরূপ বোধ হয়, বল, ও তাহা বুঝাইয়া দাও। যদি তুমি পূর্ব্বের মতেই অটল থাক, তবে এই পরবর্ত্তী প্রশ্নটি শুন।

ক্রি—হাঁ, আমি সেই মতেই অটল আছি, এবং তোমার সহিত একমত হইতেছি। বল।

সো—ইহার পরে আমি বলিতে চাই—জিজ্ঞাসা করিতে চাই বলিলেই বরং ঠিক হয়—কোনও ব্যক্তি যে ন্যায়ানুগত কর্ম্ম করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা তাহাকে সম্পাদন করিতে হইবে, না সে বিষয়ে তাহার প্রবঞ্চনা করাই কর্ত্তব্য?

ক্রি—সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য।

১১। ইহা হইতেই ভাবিয়া দেখ। আমি যদি পুরীর অমতে এস্থান হইতে পলায়ন করি, তবে যাহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য, তাহাদিগের প্রতি আমি অন্যায়াচরণ করিব, কি করিব না? এবং আমি যে ন্যায়-সঙ্গত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা আমি রক্ষা করিব, না রক্ষা করিব না?

ক্রি - সোক্রাটীস, আমি তোমার প্রশ্নের কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইতেছি না; কারণ আমি উহা বুঝিতে পারিতেছি না।

সো – আচ্ছা, এইরূপে বিচার করিয়া দেখ। আমি যখনই এই স্থান হইতে অপসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি—যদি এই শব্দটি এস্থলে ব্যবহার করা সঙ্গত হয়—তখন যদি পুরী ও বিধিসমূহ আসিয়া ও আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলেন, "হে সোক্রাটীস, আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি করিতে সংকল্প করিয়াছ? তুমি যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা কি তুমি তোমার সাধ্যমত বিধিসমূহ আমাদিগকে ও সমগ্র পুরীকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছ না? তুমি কি বিবেচনা কর, যে, যে পুরীতে বিধিসঙ্গত মীমাংসার কোনও বল নাই, প্রত্যুত যে কোনও ব্যক্তি উহা অগ্রাহ্য ও পদদলিত করে, সেই পুরী কখনও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে? তাহা কি সমূলে উচ্ছিন্ন হইবে না?" ক্রিটোন্, আমরা এই প্রশ্ন এবং এই-প্রকার অন্যান্য প্রশ্নের কি উত্তর দিব? যে বিধি ঘোষণা করিয়াছে, যে ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসা সর্ব্বোপরি মান্য হইবে, সেই বিধি যাহাতে অব্যাহত থাকে, তৎপক্ষে যে কেহ, বিশেষতঃ একজন বক্তা অনেক কথাই বলিতে পারে। আমি কি এই উত্তর দিব, "পুরী আমার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছে; ইহা আমার পক্ষে ন্যায়বিচার করে নাই?" আমরা কি ইহাই বলিব, না আর কোনও উত্তর দিব?

ক্রি—হাঁ, সোক্রাটীস, আমরা নিশ্চয়ই এই উত্তর দিব।

১২। সো—তখন যদি বিধিসমূহ এইরূপ বলেন, তাহা হইলে কি হইবে,—"হে সোক্রাটীস্, আমাদিগের ও তোমার মধ্যে কি এই-প্রকার অঙ্গীকার ছিল? না তুমি এই অঙ্গীকার করিয়াছিলে, যে, পুরী বিচারের মীমাংসা যাহাই করুন না কেন, তুমি তাহাই শিরোধার্য্য করিবে?" যদি আমরা তাঁহাদিগের এই কথায় বিস্ময় প্রকাশ করি, তাহা হইলে তাঁহারা হয়তো বলিবেন, "সোক্রাটীস্, আমাদিগের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিও না, কিন্তু যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দাও; তুমি তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ও তাহার উত্তর দিতে অভ্যস্ত আছ। এস, আমাদিগের ও পুরীর বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ করিবার আছে, যাহাতে তুমি আমাদিগকে সংহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছ? প্রথমতঃ, আমরাই কি তোমাকে জন্মদান করি নাই? আমাদের সাহায্যেই কি তোমার পিতা তোমার মাতাকে গ্রহণ ও তোমাকে উৎপাদন করেন নাই? বল, আমাদিগের যেগুলি বিবাহসম্বন্ধীয় বিধি, তুমি কি সেইগুলিই অসঙ্গত বলিয়া দোষাবহ বিবেচনা করিতেছ?" আমি বলিব, "না, দোষাবহ বিবেচনা করি না।" "তবে তুমি কি সন্তানের পালন ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিধিগুলি দোষাবহ বোধ করিতেছ? তুমি নিজেও তো লালিতপালিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছ। অথবা আমাদিগের মধ্যে ইহার পরবর্ত্তী যেসকল বিহিত বিধি তোমার পিতাকে তোমাকে সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দিতে আদেশ করিয়াছিল, তাহারা শোভন কর্ম্ম করে নাই?" আমি বলিব, "হাঁ, শোভন কর্ম্মই করিয়াছে।" "বেশ কথা।

আমরাই যখন তোমাকে জন্ম দিয়াছি, লালনপালন করিয়াছি এবং শিক্ষা দিয়াছি, তখন প্রথমে বল দেখি, তুমি কেমন করিয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মত আমাদিগেরই সন্তান ও দাস নও? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কি তুমি বিবেচনা কর, যে, তোমার ও আমাদিগের স্বত্ব সমান? তুমি কি বিবেচনা কর, যে, আমরা তোমার প্রতি যাহা করিতে উদ্যত হইব, তৎপরিবর্ত্তে ঠিক্ তাহা করাই তোমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইবে? তোমার ও তোমার পিতার স্বত্ব তো সমান ছিল না; এবং যদি তুমি দাস হইতে, তোমার ও তোমার প্রভুর স্বত্বও সমান হইত না। সুতরাং তুমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে যে-প্রকার ব্যবহারই প্রাপ্ত হও না কেন, তৎপরিবর্ত্তে সেই-প্রকার ব্যবহার করিবার অধিকার তোমার নাই; তাঁহারা তিরস্কার করিলে প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করা, প্রহার করিলে পুনশ্চ প্রহার করা, কিংবা এইরূপ অপর বহুবিধ আচরণের বিনিময়ে সেইরূপ আচরণ করা তোমার পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত নহে। তবে কি তোমার জন্মভূমি ও বিধিসমূহ সম্পর্কেই তোমার স্বত্ব এমন সমতুল্য, যে, আমরা যদি তোমাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তুমিও প্রতিশোধ-স্বরূপ বিধিসমূহ আমাদিগকে ও তোমার জন্মভূমিকে বিনাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিতেছ? যে তুমি যথার্থই ধর্ম্মের জন্য এমত যত্নবান্, সেই তুমি কি বলিবে, যে, এই-প্রকার করিলে তোমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করা হইবে? অথবা তুমি কি এতই জ্ঞানী হইয়াছ, যে, এই কথাটাও বুঝিতে পারিতেছ না, যে, তোমার জন্মভূমি দেবকুল ও মনস্বী মানবকুল সমক্ষে তোমার পিতা, মাতা ও অন্য সমস্ত পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা পূজ্যতর, মহত্তর, পবিত্রতর ও অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র? তোমার কর্ত্তব্য এই, যে, জন্মভূমি ক্রুদ্ধ হইলে তুমি তোমার পিতা অপেক্ষাও তাঁহার অধিকতর অর্চ্চনা করিবে, নতি স্বীকার করিবে, স্তুতি করিবে, এবং তিনি যাহাই আদেশ করুন না কেন, হয় তাহা হইতে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে, নতুবা তাহা পালন করিবে। যদি তিনি তোমার প্রতি কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, যদি তিনি তোমাকে প্রহার করেন, বা কারাগারে নিক্ষেপ করেন, কিংবা আহত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্য যুদ্ধে নিয়োগ করেন—তুমি সে দ[illegible] নীরবে গ্রহণ করিবে। ইহাই তোমার কর্ত্তব্য এবং ইহা ন্যায়সঙ্গত; তুমি পরাজয় স্বীকার করিবে না, পলায় করিবে না, অথবা স্বীয় স্থান ত্যাগ করিবে না। যুদ্ধক্ষে ও বিচারালয়ে এবং সর্ব্বত্র পুরী ও জন্মভূমি যাহা আদেশ করুন না কেন, তাহাই তুমি পালন করি[illegible] কিংবা যাহা ন্যায়ানুগত, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে পিতা কিংবা মাতার প্রতি বলপ্রয়োগ করা পুণ্যক[illegible] নহে; জন্মভূমির প্রতি বলপ্রয়োগ তবে ইহা অপেক্ষা কত অল্প পুণ্য কার্য্য?" হে ক্রিটোন্, আমরা এই-সক কথার কি উত্তর দিব? আমরা কি বলিব, যে, বিধিসমূ সত্য কথাই বলিতেছেন, না তাহা বলিব না?

ক্রি—আমার তো বোধ হয়, তাঁহারা সত্য কথা বলিতেছেন।

১৪। সো—বিধিসমূহ হয় তো বলিবেন, "তাহা হইলে সোক্রাটীস্, তুমি ভাবিয়া দেখ, আমরা যে বলিতেছি তুমি এক্ষণে যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহাতে আম দিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করিতেছ না, এ কথা সত্য কি না। কেন না, আমরাই তোমাকে জন্ম দিয়াছি এবং তোমাকে ও অপর সমুদায় পুরবাসীদিগকে যাবতী সুখসম্পদ প্রদান করিয়াছি। আবার আমরা এই ঘোষণা করিয়াছি যে, যে কোনও আথীনীয় বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে-স[illegible] রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া এবং পুরীর কার্য্যাব[illegible] ও বিধিসমূহ আমাদিগকে দেখিয়া আমাদিগের প্রতি অসন্ত হইবে, সে যেন আপনার সমুদায় বিত্ত লইয়া যেখানে ইচ্ছ চলিয়া যায়; আমরা সকলকেই চলিয়া যাইবার এ[illegible] অধিকার প্রদান করিয়াছি। আমরা ও এই পুরী য[illegible] তোমাদিগের কাহারও অসন্তোষের কারণ হই, তবে [illegible] স্বচ্ছন্দে আপনার অর্থবিত্ত লইয়া যেখানে ইচ্ছা চলি[illegible] যাইতে পারে, তাহাতে আমরা কেহই তাহাকে বা[illegible] দিতেছি না; ইচ্ছা করিলে সে আথেন্সেরই কোনও উ[illegible] নিবেশে গমন করিতে পারে, কিংবা বিদেশে যাইয়া যথা অভিরুচি বাস করিতে পারে। কিন্তু আমরা বলিতেছি যে আমরা কিরূপে ন্যায় বিতরণ ও অন্যান্য বিষয়ে পুরী শাসন সংরক্ষণ করি, তাহা দেখিয়াও তোমাদিগের মধ্যে

যে এই পুরীতে বাস করিতেছে, সে এই কার্য্যদ্বারাই আমাদিগের সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছে, যে, আমরা যাহাই কেন আদেশ করি না, তাহাই সে সম্পাদন করিবে। আমরা বলি, যে আমাদিগকে অমান্য করে, সে ত্রিবিধ অন্যায় কার্য্য করে; আমরা তাহার জনক-জননী, সে জনকজননীর অবাধ্যতা করিতেছে; আমরা তাহার প্রতিপালক, সে প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিতছে; এবং সে আমাদিগের আদেশ মান্য করিবে, এই অঙ্গীকার করিয়াও আমাদিগকে অমান্য করিতেছে, অথচ আমরা যদি কিছু অন্যায় আদেশ করিয়া থাকি, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে না। তবু তো আমরা তাহাকে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছি, তাহা কঠোর-ভাবে আদেশ করি নাই; আমরা তাহাকে এই দুইয়ের একটি করিতে অনুরোধ করিয়াছি—হয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, যে, আমাদিগের আদেশ অন্যায়, না হয় উহা পালন কর; কিন্তু সে উভয়ের কোনটিই করিতেছে না।"

১৪। "হে সোক্রাটীস্, আমরা বলিতেছি, যে, তুমি যাহা করিবে বলিয়া ভাবিতেছ তাহা যদি কর, তবে তুমিও এই-সকল অপরাধে অপরাধী হইবে; অন্যান্য আথীনীয়-দিগের অপেক্ষা তোমার অপরাধ লঘু হইবে না, প্রত্যুত উহা অতি গুরুতর বলিয়াই গণ্য হইবে।" আমি যদি বলি, "কেন?" তাঁহারা হয়তো ন্যায্যরূপেই এই বলিয়া আমাকে আক্রমণ করিবেন, যে, আমি অপর সমুদায় আথীনীয় অপেক্ষা বিশিষ্টরূপে তাঁহাদিগের সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি। তাঁহারা বলিবেন, "সোক্রাটীস্, এ বিষয়ে মহা প্রমাণ রহিয়াছে, যে, তুমি আমাদিগের প্রতি ও এই পুরীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে। কেন না, তুমি যদি অপর সমুদায় আথীনীয় অপেক্ষা এই পুরীর প্রতি বিশেষ-ভাবে সন্তুষ্ট না থাকিতে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা বিশেষভাবেই এই পুরীতেই বাস করিতে না; তুমি জাতীয় মহোৎসবের দৃশ্য দেখিবার জন্যও কখনও পুরীর বাহিরে যাও নাই, এবং যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন কখনও অপর কোন স্থানেও গমন কর নাই, অন্যান্য লোকের মত তুমি কোন কালেই বিদেশ ভ্রমণে বাহির হও নাই; তোমার অন্তরে কদাপি অপর পুরী ও অপর বিধি অবগত হইবার আকাঙ্ক্ষা উদিত হয় নাই; কিন্তু আমরা ও আমাদিগের পুরীই তোমার পক্ষে পরিপূর্ণ সন্তোষের নিদান ছিলাম; আমাদিগের প্রতি তোমার প্রীতি এতই গভীর ছিল, এবং আমাদিগের শাসনাধীন হইয়া বাস করিতে তুমি এমনই অঙ্গীকার করিয়াছিলে; বিশেষতঃ, তুমি এই পুরীর প্রতি এমত সন্তুষ্ট ছিলে যে এখানে সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়াছ। তৎপরে, তোমার বিচারের সময়ে ইচ্ছা করিলেই তুমি তোমার পক্ষে নির্ব্বাসনদণ্ডের প্রস্তাব করিতে পারিতে; এবং এক্ষণে তুমি যাহা পুরীর অমতে করিতে উদ্যত হইয়াছ, তখন তাহা পুরীর সম্মতিক্রমেই করিতে পারিতে। কিন্তু তখন তুমি এই গর্ব্ব করিলে, যে, তুমি মরিতে একটুকুও অপ্রস্তুত নও; তুমি বলিলে, যে, নির্ব্বাসন অপেক্ষা বরং তুমি মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিবে। আর এক্ষণে তুমি এই কথাগুলি স্মরণ করিয়া লজ্জাবোধ করি-তেছ না; তুমি বিধিসমূহ আমাদিগকে মান্য করিতেছ না, বরং ধ্বংস করিতেই উদ্যত হইয়াছ; অতি হীনমতি দাস যাহা করিতে চাহে, তুমি তাহাই করিতে যাইতেছ—তুমি আমাদিগের শাসনাধীন থাকিয়া বাস করিতে সম্মত হইয়া যে সন্ধিবন্ধন ও অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছ। অতএব প্রথমতঃ আমাদিগের এই প্রশ্নটির উত্তর দাও—আমরা যে বলিতেছি, তুমি কথায় নয়, কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদিগের শাসনাধীন হইয়া বাস করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা সত্য, না মিথ্যা?" ক্রিটোন, আমরা ইহার কি উত্তর দিব? আমরা ইহা স্বীকার না করিয়া আর কি করিব?

ক্রি-হাঁ, সোক্রাটীস, আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

সো—তখন তাঁহারা বলিবেন, "তবে আমাদিগের মধ্যে যে সন্ধিবন্ধন ও অঙ্গীকার ছিল, তুমি কি তাহা অতিক্রম করিতেছ না? তুমি যে বাধ্য হইয়া বা প্রবঞ্চিত হইয়াছ বলিয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে যাইতেছ, তাহা নহে; অথবা তুমি যে অল্প সময়ের মধ্যে এই সঙ্কল্প করিতে বাধ্য হইয়াছ, তাহাও নহে; কিন্তু তুমি সত্তর বৎসরে এই সঙ্কল্পে উপনীত হইয়াছ; তুমি যদি আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে অথবা আমাদিগের মধ্যে যে অঙ্গীকার ছিল, তাহা যদি

তোমার নিকটে অন্যায় বলিয়া বোধ হইত, তবে এই কালের মধ্যে তুমি অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিতে। কিন্তু তুমি লাকেডাইমোন বা ক্রীট, কোনটিই ইষ্টতর বলিয়া গ্রহণ কর নাই, অথচ তুমি সদাসর্ব্বদাই বলিয়া থাক, যে, এই দুইটির শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট; তুমি গ্রীকজাতির অন্য কোনও নগর কিংবা বর্ব্বরজাতিসমূহের কোনও নগরও প্রশস্যতর বিবেচনা কর নাই; অন্ধ ও খঞ্জ এবং অন্যান্য আতুর লোক অপেক্ষাও তুমি এই পুরীর বাহিরে অল্পই গমন করিয়াছ। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, তুমি অন্যান্য আথীনীয় অপেক্ষা এই পুরীর প্রতি ও বিধিসমূহ আমাদিগের প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ছিলে। কেননা কে বিধি-বর্জ্জিত পুরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? এখন কি তুমি তোমার অঙ্গীকারে অটল থাকিবে না? হে সোক্রাটীস্, আমাদিগের কথা যদি শুন, তবে অবশ্যই থাকিবে। তাহা হইলে, এই পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া তুমি আপনাকে হাস্যাস্পদ করিবে না।"

১৫। "কেন না, এইটুকু ভাবিয়া দেখ—তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধ করিয়া তোমার বা তোমার বন্ধুজনের কি উপকার করিবে? যেহেতু, ইহা একরূপ নিশ্চিত, যে, তোমার বন্ধুজনেরাও বিপদে পতিত হইবে; তাহারা নির্ব্বাসিত ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বে বঞ্চিত হইবে, কিংবা আপনাদিগের সম্পত্তি হারাইবে। প্রথমতঃ, তুমি নিজে যদি নিকটবর্ত্তী কোনও নগরে গমন কর, তুমি যদি থীবস বা মেগারায় যাও, কেন না, এই উভয়েরই শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট—হে সোক্রাটীস, তুমি সেই রাজ্যে শত্রুরূপেই উপস্থিত হইবে; যে-কেহ স্বীয় পুরীর হিতকল্পে যত্নবান্, সেই তোমার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিবে, এবং ভাবিবে, যে, তুমি বিধিসমূহ বিনাশ করিয়াছ; তোমার ব্যবহারে লোকের মনে এই প্রত্যয়ই দৃঢ়মূল হইবে, যে, বিচারকগণ তোমার প্রতি ন্যায় বিচারই করিয়াছেন; কেন না, যে বিধিসমূহকে বিনাশ করে, তাহার সম্বন্ধে একথাও অক্লেশেই বলা যাইতে পারে, যে, সে নব্যযুবক ও নির্ব্বোধ লোকদিগকেও বিনাশ করিবে। তবে কি তুমি সুশাসিত পুরী ও সুসভ্য জনসমাজ পরিহার করিতে চাও? এরূপ করিলে কি তোমার পক্ষে জীবন ধারণের যোগ্য থাকিবে? অথচ তুমি সুসভ্য মানবের সহবাসে জীবনযাপন করিবে, এবং তাহাদিগের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইতে লজ্জা বোধ করিবে না—কোন কথায় আলাপ করিবে, সোক্রাটীস? এখানে যে-সকল কথায় আলাপ করিয়া থাক, সেই-সকল কথায়? তুমি এই আলাপ করিবে, যে, ধর্ম্ম ও ন্যায়, ব্যবস্থা ও বিধিসমূহ মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্? তুমি কি বিবেচনা কর না, যে, সোক্রাটীসের এই কার্য্যটি লজ্জাজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে? বিবেচনা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি এই-সকল স্থান ত্যাগ করিয়া থেসালীতে ক্রিটোনের বন্ধুদিগের নিকটে গমন করিবে, কেন না, সেখানে পরিপূর্ণ অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজমান। তুমি কিরূপ হাস্যজনক উপায়ে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছ,—যে কোন প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, যথা চর্ম্মের দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিয়া, কিংবা পলাতক দাসেরা যেরূপ বস্ত্র পরিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বস্ত্র লইয়া, এবং আপনার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া তুমি যে অপসৃত হইয়াছ—তাহা শুনিয়া লোকে হয় তো আমোদ বোধ করিবে। কিন্তু তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, সম্ভবতঃ তোমার জীবনের অল্প কালই অবশিষ্ট আছে; তথাপি তোমার ঘৃণিত জীবনের মায়া এতই অধিক, যে, তুমি ইহারই জন্য মহোচ্চ বিধিসমূহ উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছ—একথা কি সেখানে কেহই বলিবেনা? তুমি যদি কাহাকেও বিরক্ত না কর, তবে হয়তো কেহই বলিবে না, কিন্তু যদি তুমি বিরক্ত কর, তবে সোক্রাটীস্, তোমার পক্ষে অযোগ্য বহু কথাই শুনিতে পাইবে। তুমি সমুদায় লোকের তোষামোদকারী ও দাস হইয়া জীবন যাপন করিবে। তুমি থেসালীতে অতি মাত্রায় ভোজন করা ভিন্ন আর কি করিবে? লোকে মনে করিবে যে, তুমি ভোজনের উদ্দেশ্যেই থেসালীতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছ। কিন্তু আমরা যে ন্যায় ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছি, সেগুলি সেখানে কোথায় থাকিবে? তুমি বলিবে, যে, তুমি সন্তানদিগের জন্য, তাহাদিগকে লালন পালন করিবার ও শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে, বাঁচিয়া থাকিতে চাও। সে কি কথা? তুমি তাহাদিগকে থেসালীতে লইয়া যাইয়া লালনপালন করিবে ও শিক্ষা দিবে? তাহারা যাহাতে এই সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে পারে, এইজন্য তুমি

তাহাদিগকে স্বদেশের পক্ষে বিদেশী করিয়া তুলিবে? অথবা তাহারা বিদেশী হইবে না, কিন্তু তুমি তাহাদিগের সঙ্গে না থাকিয়াও বাঁচিয়া থাকিলে এখানেই তাহারা উৎকৃষ্টতররূপে পালিত ও শিক্ষিত হইবে? কেন না, তোমার বন্ধুবান্ধবেরা তাহাদিগকে যত্ন করিবে। তুমি যদি থেসালীতে যাত্রা কর, তাহা হইলে তাহারা যত্ন করিবে, আর তুমি যদি যমালয়ে যাত্রা কর, তাহা হইলে যত্ন করিবে না? যাহারা আপনাদিগকে তোমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগের যদি কোনও পদার্থ থাকে, তবে তোমার এ-প্রকার মনে করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

১৬। "না, সোক্রাটীস্, আমরাই তোমাকে লালনপালন করিয়াছি, তুমি আমাদিগের কথা শুন, ন্যায়ধর্ম্ম অপেক্ষা সন্তান বা জীবন কিংবা অপর কিছুই মূল্যবান্ জ্ঞান করিও না; তাহা হইলে তুমি যমালয়ে উপনীত হইয়া তথায় বিচারকদিগের সমক্ষে আত্মসমর্পণ-কালে এই সকল বলিতে পারিবে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, ক্রিটোন্ যাহা বলিতেছে তাহা করিলে, তুমি কিংবা তোমার বন্ধুজনের মধ্যে কেহই ইহজীবনে অধিকতর সুখী বা ন্যায়বান্ বা পবিত্র হইবে না; এবং পরলোকে উপনীত হইয়াও তুমি অধিকতর সুখলাভ করিবে না। কিন্তু এক্ষণে যদি তুমি ইহলোক হইতে প্রস্থান কর, অন্যায় ব্যবহার পাইয়া—বিধিসমূহ আমাদিগের নিকটে নয়, কিন্তু মানুষের নিকটে অন্যায় ব্যবহার পাইয়া—প্রস্থান করিবে। কিন্তু যদি তুমি এইরূপ নির্লজ্জভাবে অন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায় ও অপকারের পরিবর্ত্তে অপকার কর, যদি তুমি আমাদিগের প্রতি তোমার অঙ্গীকার ও সন্ধিবন্ধন লঙ্ঘন কর, যাহাদিগের প্রতি অপব্যবহার তোমার একান্ত অকর্ত্তব্য—তুমি স্বয়ং, বন্ধুজন, জন্মভূমি ও আমরা—যদি তুমি তাহাদিগের প্রতি অপব্যবহার কর, যদি তুমি এই সমুদায় কুকর্ম্ম করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান কর, তাহা হইলে তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিব, এবং তুমি যখন যমালয়ে উপস্থিত হইবে, তখন আমাদিগের ভ্রাতা পরলোকের বিধিবৃন্দ তোমাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিবে না; যেহেতু তাহারা জানিতে পারিবে, যে তুমি ইহলোকে তোমার সাধ্যমত আমাদিগকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইয়াছ। অতএব ক্রিটোন্ যাহা করিতে বলিতেছে, তাহাতে সে যেন তোমাকে সম্মত করিতে না পারে; তুমি বরঞ্চ আমাদিগের কথা শুন।"

১৭। হে প্রিয় বয়স্য ক্রিটোন্, তুমি বেশ জানিও, যে, আমার মনে হইতেছে, আমি এই-সকল কথা শুনিতে পাইতেছি—কুবেলীদেবীর উপাসকেরা প্রমত্তাবস্থায় যেমন বংশীধ্বনি শুনিতে পায় বলিয়া ভাবে, ইহাও সেইরূপ। এই বাক্যগুলির ধ্বনি আমার কর্ণে নিনাদিত হইতেছে ও আমাকে অপর কথা শুনিতে অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে। তুমি জানিও, যে, আমার নিকটে এক্ষণে যাহা সঙ্গত বোধ হইতেছে, তুমি যদি তাহার বিপরীত কিছু বলিতে চাও, তবে তোমার বাক্যব্যয় বৃথা হইবে। তাহা হইলেও, যদি তুমি বিবেচনা কর, যে, তোমার আরও কিছু বলিবার আছে, বল।

ক্রি—না, সোক্রোটীস, আমার আর কিছুই বলিবার নাই।

সো—তবে যাও, ক্রিটোন্; আমি যেরূপ করিতে চাহিতেছি, তাহাই করি, যেহেতু ঈশ্বরই এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

মহরম

মহরমের গোঁয়ারা ও "হুসেন হুসেন" বলিয়া শোক প্রকাশ সকলেই দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু মহরমের কাহিনী যে কত করুণ, বোধ হয় সকলে জানেন না। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিখিলাম।

ইসলামধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মহম্মদের বংশের পূর্ব্ব ইতিহাসের সহিত মহরমের কাহিনী জড়িত।

আরববাসীরা বলেন মক্কার কাবা পৃথিবীর প্রাচীনতম মন্দির। এই মন্দির আদিপিতা হজরৎ আদম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে ঈশ্বরদূত জিব্রঈল হজরৎ আদমকে ঈশ্বরোপাসনার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই মন্দিরের সেবাইত-বংশে অব্দ-মেনাফ একজন প্রসিদ্ধ সেবাইত ছিলেন। এই সেবাইতরা মক্কানগর ও হেজাজ (মক্কার

চতুর্দ্দিকের দেশ) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বা রাজা ছিলেন। দেশে কোনও একছত্র রাজা ছিল না। প্রত্যেক জনপদবাসী আপন আপন প্রধান বা রাজা স্থির করিয়া লইত। এই প্রধানই জনপদের সর্ব্বেসর্ব্বা। মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসীরা কোন সাধারণ মেলা অথবা মন্দিরে একত্রিত হইয়া রাষ্ট্রীয় বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইত। মক্কার মন্দিরে এরূপ সম্মিলন প্রায় হইত বলিয়া সেবাইত-রাজার সম্মান অন্যান্য রাজা অপেক্ষা বেশী ছিল।

একবার অব্দমেনাকের দুইটি জোড়া পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের পিঠ জোড়া ছিল। চিকিৎসকেরা একখানি তরবারি দিয়া তাহাদের কাটিয়া দিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দুই বালকের স্বভাব ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। হাশিম ধর্ম্মভীরু, তপস্বী, নম্র ও জ্ঞানপিপাসু; কিন্তু ওমাইয়া—সাহসী, যুদ্ধপ্রিয়, কূটবুদ্ধি ও উদ্ধত হইল। কালে বৃদ্ধ পিতার জীবিতাবস্থাতেই দুই সহোদরে ঘোর শত্রুতা জন্মিল ও এই শত্রুতা বংশানুক্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত বহু অনর্থ ঘটাইয়াছে।

৫৭০ খৃষ্টাব্দে হাশিমের প্রপৌত্র হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়। তিনিই ইসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে মুসলমানেরা তাঁহার বাল্যকালের সমবয়স্ক বন্ধু, চিরজীবনের সহচর, ও প্রেয়সী স্ত্রী আয়েশার পিতা অবুবকর সিদ্দীকীকে প্রথম খলীফ নির্ব্বাচিত করিল। দুই বৎসর পরে বৃদ্ধ অবুবকর দেহত্যাগ করিলে হজরৎ মহম্মদের দ্বিতীয় পার্ষদ ও অন্য স্ত্রী হাফেজার পিতা ওমর ফারুক দ্বিতীয় খলীফ নির্ব্বাচিত হন। দশ বৎসরে ওমর রাজ্যের সীমা এত বিস্তৃত করিলেন যে মুসলমান ধর্ম্মরাজ্য এখন বাস্তবিক বিস্তৃত সাম্রাজ্য হইয়া পড়িল। তিনি যখন গুপ্ত ঘাতকের ছোরার আঘাতে প্রাণ বিসর্জন করিলেন, তখন ওমাইয়ার প্রপৌত্র ওসমানকে তৃতীয় খলীফ নির্ব্বাচিত করা হইল। আরও ১৩ বৎসর পরে যখন রাজপ্রাসাদের এক কক্ষে ওসমান গুপ্ত ঘাতকের ছোরার আঘাতে মৃত্যুশয্যায় ছটফট করিতেছিলেন তখন অন্য কক্ষে তাঁহার নিয়োজিত ছয়জন প্রধান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনে তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন। দুইজন খলীফের শেষদশা দেখিয়া এখন আর কেহ খলীফ হইতে চাহে না। পরে, বহু অনুনয়ে হজরৎ অলী স্বীকৃত হইলেন।

হজরৎ মহম্মদের বয়স যখন ২৫ বৎসর, তখন তিনি ৪০ বৎসর বয়স্কা বিধবা জ্ঞাতি-কন্যা খদীজাকে বিবাহ করেন। ইতিপূর্ব্বে খদীজার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, উভয় স্বামীই প্রচুর ধনরত্নের সহিত পুত্রকন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। মহম্মদের সহিত বিবাহের পর খদীজার এক পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শিয়াদের মতে সর্ব্বকনিষ্ঠা বিবি ফাতেমাই হজরৎ মহম্মদের একমাত্র কন্যা; অপর তিনটি খদীজার প্রথম বা দ্বিতীয় স্বামীর পুত্র কন্যা। যাহা হউক পুত্রটি শৈশবেই মরিয়া যায় ও চারি কন্যার মধ্যে কেবল বিবি ফাতেমাই পুত্রবতী ছিলেন। তাঁহার বিবাহ মহম্মদের খুল্লতাত অবু তালিবের কনিষ্ঠপুত্র ও হজরতের প্রিয় শিষ্য হজরৎ অলীর সহিত হইয়াছিল। বিবি ফাতেমা অল্পবয়সেই (১৮ বৎসর ৭৫ দিবস) দুই পুত্র হসন ও হুসেনকে রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। অতএব মুসলমানদিগের পয়গম্বর-বংশে দুইটি দৌহিত্র ছাড়া আর কেহ ছিল না।

৬৬১ খৃষ্টাব্দে হজরৎ অলীকেও গুপ্ত ঘাতকের ছোরার আঘাতে দেহত্যাগ করিতে হয়। তখন মুসলমানেরা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরৎ ইমাম হসনকে খলীফ নির্ব্বাচিত করিল। এই সময়ে মুসলমানদের দুইটি দল হইয়া গিয়াছিল। এক দলের মতে হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর পর অলীই প্রথম ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী খলীফ ছিলেন। মধ্যের তিন জন প্রতারক ও অনধিকারী। এই দল শিয়া নামে প্রসিদ্ধ। অন্য দলের মতে মধ্যের তিনজনের নির্ব্বাচন ন্যায়-আইনসঙ্গত হইয়াছিল। এই দল সুন্নী নামে খ্যাত। অদ্যাবধি মহরমের সময়ে গোঁড়া শিয়ারা এই তিনজন খলীফকে প্রবঞ্চক, প্রতারক, ইত্যাদি নানা প্রকার অতি সম্বোধন করিয়া থাকেন; এমন কি এই সূত্রে শিয়া সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামাও হইয়া থাকে।

যখন হসন নির্ব্বাচিত হন সেই সময়ে শাম (Syria দেশে ওসমানের নিয়োজিত তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা ওমাইয়া বংশীয় মোয়াবিয়া শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনিও সিংহাসনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ছয়মাসে

মধ্যে অসি ও কূট রাজনীতির বলে হসন সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ও মোয়াবিয়া রাজসিংহাসন পাইলেন; কিন্তু তাঁহাকে অঙ্গীকার করিতে হইল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর হসন আবার রাজ্য পাইবেন। তিনি ৬৬৯ খৃষ্টাব্দে গোপনে বিষপ্রয়োগে হসনকে হত্যা করিয়া এই অঙ্গীকার হইতে কতক পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

রাজ্য বিস্তৃত হইলে মরুভূমিবেষ্টিত মদিনায় রাজধানী রাখা আর উচিত বিবেচিত হয় নাই। কেন না, মদিনার স্বাস্থ্য ভাল নহে। বারমাস ম্যালেরিয়ার প্রকোপ; সেই-জন্য পূর্ব্ব খলীফেরা রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অলী যখন সিংহাসন লাভ করেন, তখন তিনি উত্তরে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কূফা নামক নগরে নিজ রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। মোয়াবিয়া শামের শাসনকর্ত্তা-রূপে দামস্কে (Damascus) থাকিতেন, খলীফ হইয়াও দমিস্কে থাকিতে লাগিলেন। অতএব এখন রাজধানী দমিস্ক হইল।

হুসেনের মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া মুসলমানদের রাজা নির্ব্বাচন করিবার অধিকার ঘুচাইয়া নিজের বংশে উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সে-সময়ের প্রধানদের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে তাঁহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র য়াজীদকে তাঁহারা উত্তরাধিকার-সূত্রে খলীফ স্বীকার করিবেন। এই প্রধানেরা প্রকাশ্য রাজসভায় য়াজীদকে যুবরাজ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কেবল মাত্র পাঁচজন এ-বিষয়ে মত দেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে হজরৎ মহম্মদের কনিষ্ঠ দৌহিত্র ও হজরৎ অলীর দ্বিতীয় পুত্র হুসেন একজন।

৬৮০ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ মোয়াবিয়ার মৃত্যু হইলে দুশ্চরিত্র নিষ্ঠুর য়াজীদ সিংহাসন লাভ করিলেন।

কূফার অধিবাসীরা যেমন তরল ও চঞ্চলমতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সেইরূপ হজরৎ অলীকে ভালবাসিত ও সম্মান করিত। তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল খলীফ-সিংহাসন পয়গম্বর-বংশেই থাকে, অর্থাৎ হজরৎ ইমাম হুসেন খলীফ হন, ও হুসেনের পরে হুসেনের পুত্রেরাই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী হন। তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া গোপনে মদিনাবাসী হুসেনকে আমন্ত্রণ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ১০,০০০ যোদ্ধা হুসেনের পক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইল। প্রথমে হুসেন এ আমন্ত্রণ-পত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। ক্রমে বহু (ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে সংখ্যা ৫২ হইতে ১৫০ পর্য্যন্ত) আমন্ত্রণপত্র ও একখানি বহু (১,৪০,০০০ ?) অধিবাসী দ্বারা স্বাক্ষরিত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। হুসেন তখন আপন খুল্লতাত-পুত্র মুসলিমকে গোপনে কূফাবাসীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া সংবাদ দিতে পাঠাইয়া দিলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই মুসলিম সংবাদ দিলেন যে ৮০০০ যোদ্ধা তাঁহার কাছে হুসেনকে খলীফ স্বীকার করিয়া শপথ করিয়া গিয়াছে ও প্রত্যহ আরও লোক আসিতেছে।

কূফাতে মোয়াবিয়া ও তাঁহার পুত্র য়াজীদের নিয়োজিত নমান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি গুপ্তচরের মুখে কূফা-বাসীদের মনের ভাব অবগত হইয়া এক দিবস প্রকাশ্য মসজিদে সাধারণ কূফাবাসীদের শাসাইয়া দিলেন যে, যে কেহ হুসেনের পক্ষে যোগ দিবে তাহাকে সবংশে জল্লাদ-হস্তে সমর্পণ করা হইবে। তৎপরে সবিস্তার সংবাদ দিয়া য়াজীদের কাছে আরও কিছু সেনা চাহিলেন। নমান প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, তাহার নিষ্ঠুরতা সে-কালের আরবদেশেও প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার দৃঢ়তা দেখিয়া চঞ্চলমতি কূফাবাসীরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হুসেনের সকল আশা-ভরসা একেবারে উড়িয়া গেল। কিন্তু য়াজীদ বেশ জানিতেন যে নমান মুখে কর্ত্তব্যপালনের জন্য যাহাই বলুক, মনে মনে রসুলঅল্লা- (হজরৎ মহম্মাদ) বংশের পক্ষপাতী। খলীফ-সিংহাসন হুসেনেরই প্রাপ্য বলিয়া নমানের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব য়াজীদ আপনার খুল্লতাত-পুত্র অব্যাদঅল্লা বিন জিয়াদকে কূফার নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ৪০০০ সৈন্যের সহিত কূফায় পাঠাইলেন ও একজন দ্রুতগামী দূত মরুপথে পাঠাইলেন; পথে হুসেনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বুঝাইয়া মদিনা ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। অব্যাদঅল্লাকে বুঝাইয়া দিলেন, যদি হুসেন আমাকে খলীফ বলিয়া স্বীকার করে ও রাজনিয়ম-মত শপথ গ্রহণ করে, তবে আমার মাননীয় অতিথিরূপে দমিস্কে আনিবে। কিন্তু যদি আমার খলীফপদ অস্বীকার করে তবে তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিবে। তোমার অশ্ব-পদতলে তাহার অস্তিত্ব লোপ করিবে।

হুসেন, মদিনায় মুসলিমের আশাপ্রদ পত্র পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, কুটুম্ব, সকলের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্ত্রীপুত্র, কয়েকজন জ্ঞাতি ও অল্প অনুচর সহিত বিস্তৃত মরু-প্রান্তরের অপর পারে সিংহাসনারোহণ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে মক্কায় গেলেন। সেখানকার আত্মীয়েরাও চঞ্চলমতি কুফাবাসীদের ভরসায় সেখানে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তিনি আসন্নকালে বিপরীত-বুদ্ধিবশতঃ সকলের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহার সহিত স্ত্রী, শিশু ও অনুচর, সর্ব্বশুদ্ধ ৭২টি প্রাণী ছিল; তন্মধ্যে তাঁহার তিন ভগ্নী, জ্যেষ্ঠ সহোদরের চারটি পুত্র ও নিজের তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৫৫ (চান্দ্র ৫৭), তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স ২৯ (তিনি বিবাহিত ও পুত্রের পিতা), দ্বিতীয় পুত্র অলী অকবর অষ্টাদশ বর্ষীয় অবিবাহিত যুবক ও কনিষ্ঠ অলী অসগর ছয়মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশু। জ্যেষ্ঠ জ্যানউল আবদীন এত পীড়িত ছিলেন যে তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার জন্য পাল্কীর মত কোন যান ছিল। মুসলিমের পত্রে উৎসাহিত হইয়া হুসেন, মক্কায় কাবা প্রদক্ষিণ করিয়া ১১ সেপ্টেম্বর ৬৮০ খৃঃ উত্তরাপথে যাত্রা করিলেন।

মরুভূমি অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই য়াজীদের প্রেরিত দূতের সহিত এক আড্ডাতে দেখা হইল। দূত তাঁহাকে পয়গম্বরের দৌহিত্রের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া অনেক বুঝাইল, মদিনায় ফিরিয়া যাইতে অনুনয়বিনয় করিল, কিন্তু তিনি তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। য়াজীদকে খলীফ বলিয়া স্বীকারও করিলেন না, মদিনায় ফিরিয়াও গেলেন না। এই আড্ডাতেই মুসলিম-প্রেরিত অন্য এক দূত আর-এক পত্র আনিল। মুসলিম লিখিয়াছেন, "আমি বড় প্রতারিত হইয়াছি। কুফাবাসীরা ভীরু কাপুরুষ, আমার প্রাণ নিরাপদ নহে। আপনি মদিনা ফিরিয়া যান। আপনি কুফাবাসীদের কাছে কোন-প্রকার সাহায্য আশা করিবেন না। এখানে আসিলে আপনি বিপদে পড়িবেন।" হুসেন আড্ডায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি করা উচিত। এই সময়ে একজন কুফাবাসী কবি ও বিদ্বান সেই পথে যাইতেছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কুফা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কবিও তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি কবিতায় বলিলেন, "যদিও কুফাবাসীদের মন আপনার অধীন, কিন্তু তাহাদের অসিযুক্ত দক্ষিণহস্ত য়াজীদের অধীন।" এই-সকল দেখিয়া শুনিয়াও না জানি কি ভাবিয়া হুসেন কুফার দিকে অগ্রসর হইতেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি য়াজীদকে খলীফ বলিয়া স্বীকারও করিলেন না, অথচ ঐ ঘোর শত্রুর কবলে পুত্রকলত্র লইয়া সেনাহীন অবস্থায় অগ্রসর হইলেন।

পথে কুফার নূতন শাসনকর্ত্তা অব্যাদঅল্লা বিন জিয়াদ কর্ত্তৃক প্রেরিত হুর নামক সেনাপতির অধীনে এক সহস্র সৈনিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হুর সবিনয়ে জানাইল যে বিন জিয়াদ হুসেনকে বন্দীরূপে কুফায় লইয়া যাইতে তাহাকে আদেশ করিয়াছে; সে আজ্ঞাবাহী সেবক মাত্র, তাহার কোন অপরাধ নাই। বন্দী হইয়া হুসেন আপন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন ও মদিনায় ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হুর দৃঢ়রূপে বুঝাইয়া দিল এখন তাঁহাকে বন্দীরূপে কুফা যাইতেই হইবে। হুর, পয়গম্বরের দৌহিত্রের অপমান করিতে চাহে না, কিন্তু প্রাণ থাকিতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে না। অগত্যা হুরের সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হুসেন সপরিবারে ২রা মহরম ৬১ হিজরা (২রা অক্টোবর ৬৮০ খ্রীঃ) কুফা হইতে ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কর্ব্বলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। নদীতীরে শত্রুর সেনানিবাস, তাঁহাকে কিছুদূরে বালুকাময় মাঠে বস্ত্রাবাস খাটাইতে হইল।

এই সময়ে উমরু-বিন-সাদ ৪০০০ সেনার সহিত শত্রু সেনায় যোগ দিল। হুর আর-একখানি আজ্ঞাপত্র পাইল, তাহাতে লেখা ছিল—"হুসেনকে এমন স্থানে রাখিবে যে কোনরূপ আশ্রয়, পাহাড় বা গাছের ছায়া, অথবা এক বিন্দু জল না পায়। তাহাকে জলাভাবে মারিতে হইবে।" হুর এই পত্রখানি হুসেনকে দেখাইয়া বলিল, "আমি আজ্ঞা পালনকারী সেবক মাত্র।" ঘোর অদৃষ্টবাদী হুসেনও আপনার অবস্থা দেখিয়া বড় চিন্তিত হইলেন। সঙ্গে অনেকগুলি স্ত্রী, শিশু, পীড়িত, মৃতকল্প পুত্র; সঙ্গে জল যাহা ছিল ফুরাইয়াছে। সম্মুখে নদী, কিন্তু জল পাইবার আশা

নাই।* তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন। বহু-প্রকারে আপন পিতা ও মাতামহের দোহাই দিয়া বক্তৃতা করিলেন, কত নরকের ভয় দেখাইলেন, কিন্তু হুরের হৃদয়ে দয়া বা ভয়ের সঞ্চার করিবার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। হুসেন আপন অনুচরদের বস্ত্রাবাসগুলি সাজাইয়া লইলেন অর্থাৎ মধ্যস্থলে স্ত্রীলোক ও পীড়িত পুত্রের বস্ত্রাবাস রাখিয়া চতুর্দ্দিকে পুরুষদের বস্ত্রাবাস খাটাইলেন ও চারিদিকে একটি বালুকাময় গড় প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। কয়েক দিবস ধরিয়া শত্রুপক্ষের সহিত কথা কাটাকাটি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রাম চলিতে লাগিল। হুসেন অধিকাংশ অনুচরদের বুঝাইলেন, "য়াজীদ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য আমার মৃত্যুকামনা করিতেছে। আমার প্রাণ রক্ষা করিবার আর কোন উপায় দেখিতেছি না। তোমরা তাহার শত্রু নও, তবে কেন আমার কাছে থাকিয়া নিশ্চয়-মৃত্যু আলিঙ্গন করিতেছ? আমাকে তোমরা কোন-রূপ সাহায্য করিতে পারিবে না। বড়জোর কতকগুলি শত্রুসৈনিক মারিবে, তাহাতে আমার জীবন রক্ষা হইবে না। অতএব তোমরা কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাও। তোমাদের পথ ছাড়িয়া দিতে বোধ হয় হুর আপত্তি করিবে না। কেননা সে যে আজ্ঞাপত্র পাইয়াছে তাহাতে কেবল আমাকে জলাভাবে মারিবার আজ্ঞা আছে, তোমা-দের সম্বন্ধে কিছুই নাই।" হুসেনের জ্ঞাতি ও অনুচরেরা কিন্তু এ-সকল যুক্তি বুঝিল না। সকলেই বলিল, "মরিতে ত একদিন হইবেই, তবে আর আপনাকে ছাড়িয়া কাপুরুষের মত পালাই কেন? আমরা স্বইচ্ছায় আপনার সহিত রহিলাম, আমাদের বিদায় করিবার জন্য আর বাক্যব্যয় করিবেন না।" অতএব কেহই পলাইল না। একে-একে ক্ষুধাপিপাসায় কাতর হইয়াও সম্মুখ-সমরে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইতে লাগিল।† এই সময়ের এক-এক অনুচরের বীরত্বকাহিনী অতি বিস্ময়কর। ৫০০০ শত্রু ভেদ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে অব্বাস নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে ও এক চামড়ার ব্যাগ ভরিয়া জল লইয়া অসি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে ফিরিয়া আসিতেছিল; প্রথমে ঘোড়া মরিল; পরে দক্ষিণ হস্ত, তার পরে বাম হস্ত কাটা গেল; তখন ব্যাগটি দাঁতে ধরিয়া ছুটিয়া হুসেনের দিকে আসিতেছিল, একজন সৈনিক ব্যাগ ফুটা করিয়া দিল। আব্বাস শূন্য ব্যাগ মুখে করিয়া হুসেনের সম্মুখে পড়িয়া মরিয়া গেল; জীবনের বিনিময়েও প্রভুকে একবিন্দু জল দিতে পারিল না। এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। জ্যেষ্ঠ সহোদর হসনের চারি পুত্রই শহীদ হইলেন। তাঁহার বংশে আর কেহ রহিল না। ৯ই মহরম প্রাতে অলী অকবর পিতার অনুমতি লইয়া যুদ্ধে শহীদ হইলেন। জনশ্রুতি বলে, তিনি ১২০টি শত্রু মারিয়া তবে নিহত হন। তবে ১২০ অঙ্কটি শুদ্ধ কি না সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ করেন। এমন দুর্দ্দিনেও হুসেন নমাজ ত্যাগ করেন নাই। তিনি দুই প্রহরের নমাজ শেষ করিয়া সম্মুখ-সমরে শহীদ হইবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি একবার পীড়িত শয্যাশায়ী জ্যেষ্ঠপুত্রকে শেষ দেখা দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, নিকটেই ছোটছেলেটি পড়িয়া কাঁদিতেছে, কিন্তু শব্দ শুনিতে পাইতেছেন না। পিপাসায় শিশুর গলা এমন শুকাইয়াছে যে শব্দ হইতেছে না; তাহার মাতৃস্তন্য আহার ও পানীয় অভাবে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি সেই অর্দ্ধমৃত শিশুকে কোলে করিয়া বাহিরে আসিলেন ও শত্রুসৈনিকদের দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাদের শত্রু, অতএব আমার সহিত যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু এই দুগ্ধপোষ্য শিশু তোমাদের শত্রু নহে; ইহার প্রতি নিষ্ঠুরতা, করুণাময় আল্লাতালা কখনই ক্ষমা করিবেন না। আমি তোমাদের অনুনয় করিতেছি, তোমরা আপন আপন শিশুপুত্র বা ভ্রাতাকে স্মরণ করিয়া করুণাময় আল্লাতালার নামে এই শিশুকে এক অঞ্জলি জল ভিক্ষা দাও।" এই সকরুণ আবেদন উপেক্ষা করিয়া শত্রুসেনা আপন আপন স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও দয়া হইল না, অথবা কেহ দয়া করিতে সাহস করিল না। কেবল একজন দয়া করিল। দয়া করিয়া এমন এক তীর ত্যাগ করিল

* যে কয়খানি পুস্তক দেখিয়াছি সকলগুলিতে পানীয়ের অভাবের কথা আছে, কিন্তু খাদ্যাভাবের কথা নাই। সম্ভবত সঙ্গে খাদ্য ছিল, জল ফুরাইয়াছিল; পিপাসা বৃদ্ধির ভয়ে কেহ খাদ্য খায় নাই বা খাইতে সাহস করে নাই।

† বিধর্ম্মীর সহিত ধর্ম্মযুদ্ধকে "জিহাদ" বলে। এইরূপ যুদ্ধে মৃত্যু হইলে শহিদ হয় ও স্বর্গে অতি উচ্চস্থান পায়। "শহীদ"দের গোর পূজিত হয়।

যে শিশুকে তাহার পিতৃক্রোড়েই বিঁধিয়া ফেলিল। শিশু একমুহূর্ত্তে সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। হুসেন সেইরূপ তীরবিদ্ধ অবস্থায় শিশু অলী অসগরকে আবেগভরে চুম্বন করিয়া তাহার মাতৃক্রোড়ে দিয়া বলিলেন, "এই লও তোমার পুত্রের দেহাবশিষ্ট। সে তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তার কাছে গিয়াছে; তাহার সকল যন্ত্রণা শেষ হইয়াছে।"

হুসেন এইবার বস্ত্রাবাস ত্যাগ করিয়া শহীদ হইতে চলিলেন।

এই বর্ণনায় অনেক অত্যুক্তি আছে। সম্প্রদায়-ভেদে জনশ্রুতি বিভিন্ন অত্যুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। তথাপি হুসেনের শৌর্য্যের ও বীর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সকল প্রামাণিক পুস্তকে দেখা যায় তাঁহার বিপক্ষে অন্ততঃ ৫০০০ সৈনিক ও চতুর সেনাপতিরা ছিল। যুদ্ধ দুইপ্রহরের নমাজের পর আরম্ভ হয় ও সূর্য্যাস্তের নমাজের কিছু পূর্ব্বে শেষ হয়। যে প্রৌঢ়বয়স্ক বা প্রায় বৃদ্ধ যোদ্ধা ৩।৪ বা ততোধিক দিবসের ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর অবস্থায় জ্ঞাতিপুত্রাদি বিসর্জ্জন দিয়া ৫০০০ শত্রুর সহিত অন্তত ৩।৪ ঘণ্টা যুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিতে সকলে বাধ্য। জনশ্রুতি আছে, তিনি ১৯৫০ জন শত্রু বধ করিয়াছিলেন ও তাঁহার শরীরে ৭০টি তীর ও ৭০টি অসির আঘাতচিহ্ন ছিল। অবশ্য অঙ্কগুলিতে অত্যুক্তি আছে।

হুসেনের মাথা কাটিয়া দমিস্কে য়াজীদের কাছে পাঠান হয়। হুসেনের স্ত্রী ভগ্নী ও একমাত্র পুত্র (অলীজ্যান উল আবদীন) বন্দীভাবে দমিস্কে চলিলেন। হুসেনের দেহ করবলা ক্ষেত্রেই সমাহিত করা হয়। সেইজন্য করবলা অদ্যাবধি পবিত্র তীর্থস্থান। ভারতের অনেক শিয়া বড়-লোকেরা তাঁহাদের আত্মীয়দের দেহ করবলা-ক্ষেত্রে সমাধির জন্য পাঠাইয়া থাকেন।

ভারতের মুসলমানেরা—প্রধানতঃ শিয়ারা—এই করবলা যুদ্ধের তিথিতে প্রতি বৎসর ঐ যুদ্ধের অভিনয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে তাবুত বা তাজিয়া বা গোঁয়ারা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সেটা হুসেনের মৃতদেহ গোরস্থানে লইয়া যাইবার অভিনয়; নগরের স্থানে স্থানে জলসত্র খুলিয়া ইমাম হুসেনের ও তাঁহার পরিবারবর্গের জলকষ্ট স্মরণ করিয়া জল ও সরবৎ বিতরণ করিয়া থাকেন; হুসেনের না[ম] করিয়া শোক প্রকাশ করেন ও উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেন ও বুক চাপড়াইয়া থাকেন। ভারতে এমন নগর নাই যেখানে শিয়া মুসলমানের বাস আছে অথচ নগর-প্রান্তে করবলা বলিয়া কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। ১০ মহরমে গোঁয়ারাগুলি লইয়া করবলায় সমাধি দিয়া আসেন। ১২ মহরম অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে গোরস্থানে গিয়া "জিয়ারৎ" করিলেই অভিনয় শেষ হইল।

ভারতের মুসলমানদের মধ্যে কেবল শিয়ারা এইরূপ গোঁয়ারা প্রস্তুত করেন ও ঐ কয় দিবস মজলিস (সভা) করিয়া পবিত্র মরসিয়া (শোকগাথা) পাঠ করিয়া থাকেন। এই মরসিয়া শুনিয়া অশ্রুত্যাগ করেন না এরূপ শ্রোতা বিরল।

বঙ্গদেশ, লখনউ, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহমদনগ[র] ভারতে শিয়া-রাজ্য ছিল। অন্য নবাবেরা ও দিল্লী[র] সম্রাটেরা সুন্নী ছিলেন। অওরঙ্গজেব যেমন হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, সেইরূপ শিয়াবিদ্বেষী ছিলেন। শিয়ারা ভারতে অনেক অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে।

করবলা-ক্ষেত্রে হজরৎ মহম্মদের সন্ততির মধ্যে একমা[ত্র] পীড়িত অলীজ্যান উল আবদীন বিন হুসেন (বাঙ্গালা দেশের জয়নাল) জীবিত ছিলেন। আর সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। এই জ্যান উল আবদীনের বংশধ[র] অদ্যাবধি "সৈয়দ" বলিয়া জগতে পরিচিত ও সম্মানিত।

উপরি-উক্ত শোক-উৎসব ছাড়া ১০ই মহরমে কো[ন] কোন মুসলমান রোজা রাখিয়া থাকেন।

৬২২ খৃষ্টাব্দে যখন হজরৎ মহম্মদ মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় আশ্রয় লইলেন তখন মদিনার ইহুদীরা ১০ মহর[মে] রোজা রাখিত। হজরৎ মহম্মদ কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন ঐ দিবসে নিষ্ঠুর মিশরাধিপতির (ফরউ[ন] বা ফেরো) কবল হইতে বন্দী ইসরাইলদিগকে নবী হজর[ৎ] মুসা (Moses) ছড়াইয়া আনেন, সেই আনন্দের উৎসব। হজরৎ মহম্মদ পূর্ব্ব নবীদের সম্মান করিতেন, অতএব তি[নি] মুসলমানদের রোজা রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তবে এ রোজা মুসলমানদের "ফর্জ" (duty) নহে, অর্থাৎ রোজা রাখিতে বাধ্য নহে, রাখিলে ভাল, না রাখিলে দোষ নাই। সেইজন্য অতি অল্প লোকেই এ রোজা রাখে।

হায়দরাবাদ। শ্রীঅমৃতলাল শীল

প্রণাম

(গল্প)

তেতলার ছাদের উপর একখানিমাত্র পূর্ব্বদুয়ারী ঘর; এই ঘরখানি আমার। প্রত্যূষের অরুণরাগ আমার এই ঘরখানিতে সর্ব্বাগ্রে এসে পড়তো। আমি প্রত্যহ ভোরবেলা উঠে দিবসের এই প্রথম অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকতুম। সামনের খোলা ছাদের উপর মৃগচর্ম্মের আসনখানি বিছিয়ে, গরদের পট্টবস্ত্র পরিধান করে' কৃতাঞ্জলিপুটে সেই আরক্ত-সৌন্দর্য্যের প্রতীক্ষায় অনিমেষ চেয়ে থাকতুম। অল্পে-অল্পে পূর্ব্বদিক ফরসা হয়ে আসতো, অল্পে-অল্পে স্বর্ণছটা ফুটে উঠতো, দেখতে-দেখতে মেঘে-মেঘে সিন্দুর সমুদ্র টলমল করে উঠতো; আমার কম্পমান বুকখানা দুইহাতে চেপে ধরে' একাগ্রচক্ষে চেয়ে থাকতুম,—কখন আসে, কখন আসে। মনে হ'ত এখনি আমার সমস্ত হৃদয়-মনে স্তবগান ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে, কিন্তু একটি মন্ত্রও উচ্চারিত হ'ত না। তারপরে ধীরে-ধীরে সেই অভ্রসমুজ্জ্বল কুসুমরাশি ভিন্ন করে' ঢলঢল্ স্বর্ণকমল ফুটে উঠতো। আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে বারম্বার প্রণাম করতুম।

এই সূর্য্য, এই জগতের আলো, এই মহিমাময় মহাদ্যুতির সম্মুখে আমার শির স্বতঃই নত হয়ে পড়তো। প্রত্যহ তাঁরি আলোকে স্নান করতুম, তাঁরি কনককিরণে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করতুম, তাঁকে প্রণাম করতুম, তাঁকে প্রদক্ষিণ করতুম, তাঁরি উদ্দেশে কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করে' মহানন্দে নিমগ্ন হতুম। এমনি করে' আমার দিন কাটতো। আর কারো প্রতি আমার ভক্তি ছিল না। মনে হতো, এই আমার সত্য, এই আমার ধ্রুব, এই আমার চিরজীবনের একমাত্র অনির্ব্বাণ আলোকশিখা। এই অসীমসুন্দর মহাবিকাশকে ত্যাগ করে' কোন্ অজ্ঞাত অজানার উদ্দেশে অর্ঘ্য বহন করে' বেড়াবো! যাঁর জ্যোতির্ম্ময় কনকসূত্রে আমার হৃদয়খানি বাঁধা পড়েছে, সারাদিন তাঁরি স্তবগান করে' কাটিয়ে দিতুম। তারপর সন্ধ্যা-বিদায়ের প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে আসতুম। আমার নিদ্রা সোনার স্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকতো; আমার জাগরণ কুসুমস্রোতে সাঁতার কেটে বেড়াতো;—এমনি করে' আমি অরুণলোকের অধিবাসী হয়ে' গিয়েছিলুম।

হঠাৎ একদিন আমার আকাশে দ্বিতীয় সূর্য্যের উদয় হ'ল। কিন্তু তার আগে আর গোটাকতক কথা বলে নেওয়া দরকার।

একবছর হ'ল লেখাপড়া আমার শেষ হয়ে গেছে। আমার বাবা জজ, মা বর্ত্তমান,—কাজেই নানাদিক থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসছিল। কিন্তু আমার হৃদয়ে তখন কোনো মানবকন্যার জন্য এতটুকুও স্থান ছিল না। মা জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলিস্ রে! তা হ'লে সব ব্যবস্থা করি?

আমি বল্লুম—এখনি কেন মা, যাক্ না আর কিছু দিন।

মা বোধ হয় মনে করলেন এটা আমার লজ্জা, কেননা তিনি যেন একটু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

কারো সঙ্গেই বেশী কথা কওয়া আমার স্বভাব নয়, এমন কি মায়ের সঙ্গেও।

সেদিন সূর্য্যোদয়ের তখনো বিলম্ব আছে, আমি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে' স্বপ্ন-সমাহিত অবস্থায় ছাদের উপর বসে আছি। আজ পূর্ব্বাকাশে আলো-আঁধারের সংমিশ্রণে স্বর্গোদ্যানের সৃষ্টি হয়েছে। অশোক, কিংশুক, আর রক্তজবায় সে বাগান ছেয়ে গেছে। হায়! এ সৌন্দর্য্য ক্ষণকালেই মিলিয়ে যাবে। অনেকক্ষণ চেয়ে-চেয়ে দেখে-দেখে সেই অপরূপ শোভা হৃদয়ে এঁকে নিলুম। তারপর চক্ষু নিমীলিত করে' অন্তরের মধ্যে পূর্ব্বগগনের প্রতিকৃতি দেখ্‌তে লাগলুম। ভাবলুম—এবার চোখ খুলেই একেবারে আমার দেবতাকে দর্শন করবো।

ক্ষণকাল চোখ বুজে থাকবার পর মনে হ'ল সূর্য্যোদয় হয়েছে। নিমীলিত চক্ষেই করজোড়ে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর ধীরে-ধীরে চোখ চেয়ে,—একি. দেখলুম! তুমি কেগো! আমার গগনে এ আজ কোন্ সূর্য্যের উদয় হ'ল! তেমনি দীপ্ত তোমার মুখখানি, তেমনি রক্তরাগ তোমার কপোলে, তেমনি উজ্জ্বল তোমার মধুবর্ষী দৃষ্টি দূরদিগন্তের দিকে প্রসারিত। ঐযে তোমার দুখানি ললিত করতল যুক্ত হ'ল; ঐযে তোমার দৃষ্টি পূর্ব্বাকাশের দিকে ফিরলো; ঐযে সূর্য্যোদয় হয়েছে। তুমি সূর্য্যদেবকে প্রণাম করতে চাও, কিন্তু তোমার করপুট ললাট পর্য্যন্ত ওঠবার আগেই তোমার প্রণাম শেষ হয়ে'গেল। তুমি চলে যাচ্ছ? ওগো

আমার অরুণলোকের সহযাত্রিণী!—কিন্তু ছিঃ, আজ আমার একি হ'ল! হে সূর্য্যদেব, ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। প্রণাম, তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম!

কিন্তু তবুও ক্ষণেক্ষণে মনে হতে লাগলো সেই মুখখানি, সেই চোখছুটি, সেই দুটি কোমল করপল্লব। দেবলোকের জ্যোতিরুৎসবের মাঝখান থেকে আজ এই প্রথম আমি পৃথিবীর পানে তাকিয়ে দেখলুম,—শ্যামা, সুন্দরী, প্রাণময়ী এই পৃথিবী। কোথাকার অজ্ঞাত নির্ঝরিণী টুটে অকস্মাৎ প্রাণের প্রবাহ ছুটে এল, প্রবল তরঙ্গবেগে একনিঃমেষে আমায় নবজীবনের বেলাভূমে উত্তীর্ণ করে' দিয়ে গেল। অজানা দেশের নূতন পথিকের মত উৎসুক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলুম—দূরে ঐ গাছগুলি; কে জানতো তাদের পাতার কাঁপুনিতে এমন সজীব আদর, এমন স্নেহের আহ্বান লুকানো ছিল। প্রথম প্রভাতের এই কলকণ্ঠ পাখীগুলি—এরা যেন স্নেহময়ী প্রকৃতির মায়ামন্ত্র ঘোষণা করবার ভার নিয়েছে। এই বাতাসের স্পর্শ, এই কুসুমরাশির গন্ধ, আমার মুগ্ধ হৃদয়কে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করে' ধরেছে। এ যেন একটা নূতন আশার আনন্দ, তার সঙ্গে কিসের একটু অস্ফুট বেদনা; কিসের যেন আশ্বাস, তারি মধ্যে লুকানো একটু দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু এই আশানিরাশার আনন্দবেদনার মধ্যে ডুবে থাকতে ইচ্ছা করে কেন? আমার একনিষ্ঠ চিত্তের মধ্যে একি বিরোধ ঘনিয়ে উঠলো। মনে হ'ল আমার দেবতা যেন আমার পক্ষে একটু অতিরিক্ত উজ্জল, অতিরিক্ত ভাস্বর। এতটা দীপ্তি আমার মানবচক্ষে একটু যেন দুঃসহ! কিন্তু সেই মানবনন্দিনীর কান্তিচ্ছটা,—হায়! তবে কি আমি আমার দেবতার কাছে অপরাধী হলুম! কেন? এমন কি অপরাধ! সে কন্যা কুমারী, এবং আমি কুমার। নবজীবনের এই প্রথমপ্রভাতে নীলাকাশের আশীর্ব্বাদের নীচে দুইখানি তরুণ হৃদয় একই কালে একই দেবতার চরণতলে উৎসর্গীকৃত হয়েছে—এতে অপরাধ কোথায়। আমার পূজামন্দিরে দেবতার আরতি করছিলুম আমি একা—আজ থেকে না হয় আমরা দুজনে,—আমরা!—কে তিনি, কি তাঁর নাম,—কিছুই ত জানি না! নাই বা জানলুম। সূর্য্যকিরণে-গড়া সেতুর উপর বাসরঘরের পুষ্পচন্দন যদি না পড়ে, তাতে আক্ষেপ কি?

তিনি কে?—এটা তো এখনি জানা যেতে পারে। ও তো তাঁদের বাড়ী। কিন্তু কি হবে জেনে? শেষে কি দুঃখকে নিমন্ত্রণ করে আন্‌বো। কি তাঁর নাম? লীলা কি শোভা, কি হেম, কি এমনি একটা কিছু হবে। কিন্তু কোনটাই তাঁর উপযুক্ত হ'ল না তো। আচ্ছা! তাঁর যোগ্য একটা চমৎকার নাম খুঁজে বার করা যাক। প্রভা,—মন্দা সরযূ,—কমল—না, তাঁর নাম পৃথিবীর ভাষায় আজিও সৃষ্টি হয়নি। তবু একটা নাম চাই—আচ্ছা! সূর্য্যমুখী,—না আরো একটু কোমল, আরো একটু মিষ্টি কিছু দরকার তবে উষা! এটা বরং মন্দ নয়। নয়নের আনন্দ, পূর্ব্ব গগনের প্রথম আলো, ধ্যানমৌন পূজারীর জাগ্রত স্বপ্ন।

এমনি করে' কিছুকাল কেটে গেল। প্রতি প্রভাতে আমার সূর্য্যবন্দনার মাঝখানে ক্ষণকালের জন্য একখানি কিশোরী প্রতিমা ফুটে উঠতো এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই উষারাণীর মত সে ছবি মিলিয়ে যেত। এই অল্প একটু সময়ের মধ্যে তাঁর উৎসুক দৃষ্টি আকাশের নানাস্থানে বিচরণ করতো, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের এই পশ্চিমদিকের ছাদের পানে একটিবারও তাঁর নয়ন পড়তো না। এটা যেন নিষিদ্ধ দিক, এদিকে যেন এমন কিছু আছে যা দেখবার জন্যে কোন কিশোর হৃদয়ে কোন কৌতূহলই জাগে না।

আহারে বসেছি। মা আমার কাছে বসেছেন। হঠাৎ মা বল্লেন—"হাঁরে বসন্! ভুনি বল্‌ছিলো ওদের ননীবালাকে নাকি তোর পছন্দ হয়েছে! দ্যাখ্, বলিস্ তো ওদের বাড়ী ঘটক পাঠাই।"

"সর্ব্বনাশ! ননীবালা! মা, আমি শপথ করে' বলতে পারি তোমার ননীবালা কিংবা শশীমুখীকে কোনকালে আমি পছন্দ করতে যাইনি।"

আহার-শেষে আমার তেতলার ঘরে গিয়ে ভাবলুম—হঠাৎ কথাটা বলে হয়ত ভাল করলুম না। এই ননীবালাই যদি উষা হয়।

হঠাৎ একদিন তাঁদের বাড়ী বিবাহের বাজনা বেজে উঠলো। চতুর্দ্দোলে চড়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বর এল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুক থরথর করে' কেঁপে উঠলো। আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে এমন কত বর যায়, কত বর আসে, কখনো তাদের শোভাযাত্রা দেখবার জন্যে উদ্বিগ্ন হই-

নি। কিন্তু এই বরটিকে দেখবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলুম না। দেখলুম রাজার মত পোষাকপরিচ্ছদ পরিয়ে খাড়া করেছে এক-রকম মন্দ নয়। ননীবালা-নামধারিণী কোন কিশোরীর উপযুক্ত বর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ননীবালাই যদি উষা হয়!

পরদিন বরকন্যা বিদায়ের সময় ভিড়ের মধ্যে আমাকে উপস্থিত দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল। আমার কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। খানিক পরেই বরকন্যাকে বাইরে এনে পত্রপুষ্পে সাজানো মোটরের উপর চড়ানো হল। আমি ভিড় ঠেলে কোনগতিকে একবার কন্যাটিকে দেখে নিলুম। আঃ বাঁচা গেল! এ তো উষা নয়। যাক্, এখন আমি নিরাপদে তেতলায় উঠে দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হতে পারি।

বাড়ী গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"হ্যাঁ মা, ওদের বাড়ী কার বিয়ে হ'ল?" মা বল্লেন—"ও সেই ননীবালার জেঠতুতো বোনের। তুই তো আর বিয়ে-টিয়ে করবি-নে। ননীবালা মেয়েটি দেখতে-শুনতে বেশ। দিব্যি চালাক চতুর, আর এদিকে—" আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। বুঝতে পারলুম, এই ননীবালাই উষা। তারপর দিনের পর দিন আমার সূর্য্য-আরাধনা চলতে লাগলো। ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ে উষারাণীর স্বর্ণসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু সিংহাসনের অধিকারিণী কোনদিন পলকের জন্যও সেদিকে চেয়ে দেখলেন না। হায়! দীর্ঘ দিবা, দীর্ঘ রজনীব্যাপী ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর একটিমাত্র শুভক্ষণ ভেসে আসে; তাও অনাদরে, অবহেলায় ব্যর্থ হয়ে যায়; অথচ এমনতর মুহূর্ত্ত আর কতগুলিই বা জীবনে বাকী আছে।

আবার একদিন ভোরবেলা থেকে তাঁদের বাড়ীতে সানাই বাজা আরম্ভ হ'ল। বুঝতে পারলুম, প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হবার আগেই বিসর্জ্জনের পালা সুরু হয়েছে। আজ সূর্য্য মেঘে ঢাকা, সমগ্র পূর্ব্বগগনে অশ্রুবাষ্প ঘনিয়ে উঠেছে। মৃগচর্ম্মের আসনে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। আমি ছাদের উপর পায়চারি করে বেড়াতে লাগলুম।

চকিতে সেই পরিচিত প্রতিমাখানির উদয় হ'ল। ক্ষণকালের মধ্যে পূর্ব্বাকাশে তাঁর দৃষ্টি পড়লো,—সূর্য্য নেই। তারপরেই একেবারে আমার দিকে, চেয়ে, আমাকে!—একি গো! কাকে তুমি প্রণাম করলে! আজ কি পশ্চিমে সূর্য্যোদয় হয়েছে! আজ কাকে তুমি ধন্য করলে—তোমার স্নিগ্ধ দুটি নয়নপাতে! কার চক্ষে এঁকে দিয়ে গেলে তোমার ঐ লজ্জারুণ প্রণত মিনতিখানি! বিসর্জ্জনের বিদায়-রাগিণীর মাঝখানে ক্ষণিকের লীলায় এ আগমনীর সুরটুকু কেন গেঁথে দিয়ে গেলে। হায় গো! তোমার ঐ ভাষাহীন বিদায়বাণী দুটি দিন আগে যদি শুনতে পেতুম; যদি আভাসেই বুঝতুম—এই তৃষাতুর পশ্চিমের পানে কারো একখানি শিশিরসিক্ত কমলদৃষ্টি গোপনে ফেরানো আছে—

রাত্রে বাইশ ঘোড়ার গাড়ী চেপে রণবাদ্য বাজিয়ে বর এল। এবার আমার বর দেখবার ইচ্ছা হল না। বাদ্যের ঘটা শুনেই বুঝতে পারলুম এই দিগ্বিজয়ী বীর কন্যাপক্ষের কেল্লাটা ফতে করে' যাবে। হঠাৎ একবার মনে হ'ল বীরবরের সঙ্গে একবার লড়াই দিয়ে দেখি। কিন্তু আভাসে আন্দাজে বুঝতে পারলুম তাঁর সেনাসংখ্যা অগণ্য। পরাজয় নিশ্চয় জেনে ক্ষান্ত হ'য়ে বসে রইলুম।

যা ভেবেছিলুম তাই। পরদিন বিনাযুদ্ধে বিনাবাধায় দুর্গ দখল করে' বিজয়ী বীর জয়োল্লাসে আকাশ-বাতাস্ বিকম্পিত করে চলে গেলেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। এখন শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। সেই প্রলয়ান্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা পাগলহৃদয় কৃতাঞ্জলি হয়ে অপেক্ষা করছে;—কবে আবার প্রভাত হবে, কবে তার সূর্য্য উঠবে, কবে সে তার কুড়িয়েপাওয়া প্রণামখানি ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন।

পথের দেখা

(গল্প)

"রাঙাদিদি!"

"কি গো রাণু!"

"আজ সুনীর জন্মদিন কিনা, তাই তাঁদের বাড়ী বিকেলে নেমন্তন্ন, আমরা সবাই একটা-কিছু সেজে যাব। আমি লক্ষ্মী সাজব। কিন্তু আমার ত লাল কাপড় নেই, তাই মা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তোমার নাকি খুব চমৎকার লাল বেনারসী কাপড় আছে?"

"না'তিন, আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের-কালের কাপড় কি আর তোদের পছন্দ হবে, তোরা-সব মেয়ের ইস্কুলে পড়িস্।"

"বাপ্‌রে বাপ্‌, রাঙাদি, তুমি এতও কথা বলতে পার। সেকেলে ত কি হবে? লক্ষ্মী ত তোমার চেয়েও সেকেলে। এখন কাপড়খানা বের করে দ্যাখাও না।"

নাতনীর তাড়ায় উঠে বস্‌তে হল। কাপড়ের বাক্স খুলে একে একে প্রায় বিশ-পঁচিশখানা শাড়ী বের করলাম। লাল, নীল, সবুজ, গোলাপী, জরদা, রংএ মেঝেতে ঢেউ-খেলে গেল, তাতে কত বিচিত্র সোনার রূপোর ফুল ঝলমলিয়ে উঠল, কিন্তু আমার ক্ষুদে নাতনীটির কাছে কেউ আদর পেলে না। এক-একখানা করে বের করি আর সে নাকসিঁটকে বলে ওঠে, "এটা হবে না, রাঙাদি, লক্ষ্মীকে এমন কাপড়ে মানায় না।"

আমি শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বল্লুম, "তবে দিদি, আমার কাছে আর হল না, অন্য কোথাও চেষ্টা দেখ।"

নাত্‌নী তার ছোট্ট সুন্দর মুখখানি ভার করে সেই কাপড়ের স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল, নড়বার নামও নেই। হটাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা রাঙাদি, ঐ যে তোমার লোহার সিন্দুকের পাশে শাদা পাথরের বাক্সটা, ওতে কি আছে? পাথরের জালিকাটার ফাঁকে-ফাঁকে ভিতরে সোনার মত কি চক্‌চক করছে?"

শাদা পাথরের বাক্স! তাইত, ওর কথা যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। চন্দন-চেলী-নূপুর-পরা বৌ প্রায় চল্লিশ বছর আগে যেদিন এই ঘরের দরজায় প্রথম এসে দাঁড়াই, তখনও যে ও ঐখানটিতেই ছিল। তখন ওর রং ছিল যেন সাগরের নীলজলের সদ্য-ওঠা ফেনার মত, এখন কালের গুণে একটু হল্‌দে ছোপ ধরে গিয়েছে। তার পর থেকে ওকে রোজ চোখে দেখে আস্‌ছি, কিন্তু মন থেকে ও-যে কবে সরে পড়েছে তার ঠিক নেই।

আমি বল্লুম, "তা রাণু, ওর ভেতর তোমার মনের মত জিনিষ মিল্‌তে পারে, যদি তোমার কপাল-জোর থাকে। ওতে আমার বিয়ের শাড়ী তোলা আছে, তোদের বাড়ী যেদিন প্রথম পা দিলুম সেইদিন ঐ বাক্সে কাপড় তুলে রেখেছিলুম, তার পর আর কোনো দিন হাতও দিইনি। তোর ছোট পিসী যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন মাঝে-মাঝে খুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখত, সে যাবার পর আর কেউ ওর কোনো খোঁজও করেনি। যদি পোকায় কিছু বাকী রেখে থাকে তা হলে তোমায় বের করে দিচ্ছি।"

সেকেলে ধরণের একটি ছোট্ট পিতলের তালা দিয়ে বাক্সটি বন্ধ। প্রকাণ্ড চাবির তাড়া থেকে বেছে-বেছে তার চাবী বের করলুম। মর্চে ধরে গিয়েছে, খুলবে কি না কে জানে! যাক্, একটু জোর দিতেই খুলে গেল, আমি বাক্সের ডালা তুলে ধরলুম।

রাণু আনন্দে চীৎকার করে উঠল, "ওমা, কি চমৎকার! রাঙাদি, তোমার মত মানুষ যদি কোথাও দেখেছি! কি বলে' এমন কাপড়খানাকে এত বচ্ছর ধরে বাক্সে ফেলে রেখেছ বল ত? যাক্ বাঁচলুম, দুজায়গার বেশী পোকায় কাটেনি, বেশ পরা চল্‌বে। আঃ বাক্সটায় কি সুন্দর কর্পূরের গন্ধ!"

"ওতে তোর ছোট পিসী মাঝে মাঝে কর্পূরের মালা রাখত, তারি গন্ধ আর কি।"

"ওমা, এ কিরকম গয়না রাঙাদি, সোনার বেলফুলের মালা! এটাকেও এই বাক্সে ফেলে রেখেছ, তোমার যা জিনিষ-পত্রের যত্ন! ইচ্ছে করছে নিয়ে পালাই, কিন্তু গয়না নিয়ে গেলে মা এক চড় লাগিয়ে দেবেন, সেই যে ব্রোচ্ হারিয়েছিলুম, তখন থেকে আমার আর কিছু ছোঁবার জোটি নেই। লক্ষ্মীকে আজ ঝুঁটো গিল্টি পরেই তুষ্ট থাকতে হবে।"

নাত্‌নী শাড়ী হাতে করে নাচ্‌তে-নাচ্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি সেই খোলা বাক্সের সামনে মেজের উপরেই বসে রইলুম, কি জানি কেন তখন আর উঠ্‌তে ইচ্ছে করছিল না।

তোমরা বুঝি মনে মনে হাস্‌ছ যে নাতনীর ঠাকুরমা বুড়ীর আবার গল্প! কিন্তু ওগো রূপসী পাঠিকা ঠাকরুণ, আমারও এমন একদিন ছিল যখন হাজার মেয়ের মাঝে দাঁড়ালে আমার দিকে ছাড়া মানুষের চোখ আর কোনো দিকে ফিরতে চাইত না।

(২)

বড়মানুষের বাড়ীতে জন্মেছিলুম। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে অভাব ত কিছুরই ছিল না। বাপের অগাধ

টাকা, মস্ত পাঁচ-মহলা বাড়ী, দাসদাসী লোকজনে গম্‌গম্ করছে। চার ছেলে হবার অনেকদিন পরে আমি মায়ের এক মেয়ে, কাজেই মেয়ে বলে অনাদর কখনও পাইনি। বাড়ীতে একমাত্র কচি ছেলের যে আদর তা অনেক দিন ধরেই ভোগ করেছিলুম। তারপর যখন বৌদিদিদের খোকা-খুকীদের আগমন হল, তখন আমি পিসী সেজে গিন্নিগিরি সুরু করে দিলুম।

ঠাকুরমা আমার নাম রেখেছিলেন বিদ্যুৎবরণী। অনেক কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন থাকে বটে, কিন্তু আমার নাম যে আমি সম্পূর্ণ সার্থক করেছিলুম সে বিষয়ে কারু সন্দেহ ছিল না, আমার নিজের ত নয়ই। নিজের রূপের গর্ব্বে আমার মাটিতে পা পড়ত না। কতদিন, যখন মা ঘরে থাকতেন না, তখন তাঁর প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে নিজের দিকেই তাকিয়ে থাকতুম। নিজের কোঁকড়া কালো চুলের রাশ মাথা হেলিয়ে কত ভঙ্গীতেই মাটীতে ছোঁয়াতুম, কতবার কত ছাঁদেই চুল বাঁধতুম, আবার কখনও বা নিজের শাঁখের মত শাদা মৃণালের মত সুগোল হাত তুলে ধরে তার উপর গোলাপী আলোর খেলা দেখতুম। ছোট্টবেলা থেকেই লাল শাড়ী কি নীলাম্বরী ছাড়া আর কিছু পরতে দিলে কেঁদেকেটে হাট বসিয়ে দিতুম;—এটা আমার খুবই জানা ছিল যে ঐ দুটো রংএ আমার আগুনের মত গায়ের রং আরও ঝল্‌কে ওঠে। আমার ঠাকুরদাদা তখনও বেঁচে ছিলেন, তিনি আমাকে দেখলেই হেসে বলতেন, "দিদি, তুই যে রূপসী হয়েছিস্ তোর যুগ্যি বর কোথাও মিল্‌বে না, এক আমি আছি, আর ত কাউকে দেখি না।"

আমার বাবা অমন বনিয়াদী বাড়ীর ছেলে হয়েও একটু একেলে ছিলেন। তবে ঠাকুরদাদা থাকাতে বেশী কিছু করে উঠতে পারেননি। তখন বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা সবে আরম্ভ হয়েছে, তাই নিয়ে সারা দেশময় সাড়া পড়ে গিয়েছে। বেথুন ইস্কুলে পাঠাবার সাহস বাবার হল না, তবে তিনি নিজে আমাকে আর আমার দুই বৌদিদিকে পড়াতে আরম্ভ করলেন। বৌদিদিদের পড়ার চেয়ে তাস-খেলা আর খোসগল্পের দিকে ঝোঁক ঢের বেশী ছিল, শ্বশুরের মান রাখবার জন্যে কোনোগতিকে একটু এসে বসতেন, আর আধঘণ্টা কাটতে-না-কাটতেই ছেলে-কাঁদা কি এম্‌নি কিছুর ছুতো করে উঠে পালাতেন। আমার কিন্তু পড়াটা বেশ পছন্দ হয়ে গেল। বাবা যত বই আনতেন সব ত শেষ করতুমই, তার উপর রাত্রে বাবার বৈঠকখানার আলমারী খুলে যা কিছু হাতে ঠেক্‌ত সব কুড়িয়ে এনে রাত জেগে পড়তুম।

আমাদের ঘরে সব মেয়েরই খুব অল্প বয়েসেই বিয়ে হয়েছে; আমার দাদাদের বৌরাও যখন এসেছে, তখন কারু বয়স ছয়, কারু বা আট। আমার বেলা নিয়ম বদ্‌লে গেল। এক মেয়ে বলে মা ঠাকুরমা কেউ আমাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারতেন না। আমার বয়স তাঁরা দুচার বছর হাতে রেখেই বলতেন, আর তার পরেই মন্তব্য করতেন, "আমরা ইচ্ছে করে ছোট বয়সে বিয়ে দিই তাই, তা না হলে কে আমাদের কি বলতে পারে? আমাদের বংশে কত মেয়ে চিরকাল আইবড় থেকেছে, কেউ কথাটি কইতে সাহস করেনি।"

আমাদের বংশের কৌলীন্য খুবই বেশী ছিল, তবে সেটা অনেক কাল কারু কাজে লাগেনি। আমি যেন সুদে-আসলে সব পুষিয়ে দিতে বসলুম। ঠাকুরমা মাঝে মাঝে আমার বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রাখবার প্রস্তাব করতেন, কিন্তু সে বিষয়ে ঠাকুরদাদা কয়েকবার ঠকেছিলেন বলে ঠাকুরমার কথায় কান দিতেন না। আমার বর খোঁজা হচ্ছে এই-রকম একটা কথা শুনতুম, কিন্তু ওকাজটায় খুব বেশী উৎসাহ কারু দেখা যেত না। আমি আদরের মেয়ে বলেই যে শুধু এতটা ঢিলে দিয়েছিলেন তা নয়, সমাজের চাপও তাঁদের উপর খুব কম ছিল। আমরাই জমিদার, কাছাকাছির মধ্যে আমাদের সমান দরের লোক কেউ ছিল না। প্রজারা কিছু বলতে সাহস করত না, আড়ালে যদি বা বলত তা সে কথা আমাদের কানে পৌঁছত না।

আমার বড়দাদার বিয়ে আমি জন্মাবার আগেই হয়েছিল, মেজদাদার বিয়ের সময়ও আমি খুব ছোট ছিলাম। এইবার সেজদাদার বিয়ে। ঠাকুরদাদা বল্লেন, "আর কদিন বাঁচি তার ঠিক কি? হয়ত নাতনীর বিয়েও চোখে দেখব না। এই বিয়েতে মনের সাধ মিটিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে নিতে হবে।"

দাদার বিয়ের ঠিক হয়েছিল খুব গরীবের ঘরে, মেয়ে পরমাসুন্দরী তাই ঠাকুরদাদা রাজী হয়েছেন। মেয়ে দেখা হয়ে গেলে তিনি আমার কাছে এসে হেসে বললেন, "নাতনি, তুই ত ভাবিস্ তোর মত রূপ জগতে আর কারু নেই, দেমাকে বুড়োর দিকে ফিরেও তাকাস না, তাই এবার যে কনে আনছি সে তোর চেয়েও সুন্দর, তোর গরব আর সয় না।"

তাঁর কথা শুনে তখন হাসলুম বটে, কিন্তু মন যেন একটু খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। সত্যিই কি আমার চেয়েও সুন্দর? আচ্ছা, বউ আসুক, দেখা যাবে।

গরীবের বাড়ী বিয়ে, তারা ত কিছুই ঘটা করতে পারবে না, তাই আমাদের বাড়ীতে যা ঘটার আয়োজন হচ্ছে তা কনের বাড়ীর উৎসবের অভাবের ক্ষতিপূরণ করে নিয়ে। বৌ-ভাত এই বাড়ীতেই হবে, তারপর বাড়ীর সকলে আর নিমন্ত্রিতের দল মিলে গঙ্গার ধারে আমাদের যে এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী আছে সেখানে যাওয়া হবে। নাচ, গান, যাত্রা, সব সেইখানেই হবে। দুখানা প্রকাণ্ড বজরা আছে, নদীতে বেড়াবারও খুব সুবিধে।

আজ দাদা বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরবেন। সকাল থেকে লোকজনের গোলমালে কান পাতবার জো নেই। বাইরে গেটের কাছে নহবৎ বসেছে, রাজ্যের ছোট ছেলে গিয়ে জুটেছে সেইখানে। অন্দরে ঢুকবার দরজা থেকে ঠাকুর-দালান অবধি আলপনার ফুলে ঢেকে গিয়েছে। বরণডালা সাজানো নিয়ে মা আর বড় বৌদি ক্রমাগত পরামর্শই করে চলেছেন। বাড়ীর কারু যেন নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই, যারা কোন কাজ করছে না, তারাই সবচেয়ে মুখ চিন্তাকুল করে চরকীবাজির মত ক্রমাগতই ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি এতক্ষণ কি করছিলুম? শুনলে তোমরা হয়ত হাসবে। নিজের ঘরে এসে আলমারী থেকে শাড়ীর পর শাড়ী বের করে করে নিজের গায়ে ফেলে ফেলে দেখছিলুম কোন্‌টিতে আমায় সবচেয়ে ভালো মানায়। পরের বাড়ীর মেয়ের কাছে আজ কিছুতেই হার মানতে পারব না। শেষে একখানি কাপড় আমার পছন্দ হল, শরৎকালের আকাশের মত তার স্নিগ্ধ নীল রং, তাতে তারার মালার মত সোনালী জরীর বুটি ঝিক্‌মিক্ করছে। আমার গোড়ালি অবধি চুল, না বেঁধে খুলে দিলুম, একটি নীলার চিরু দিয়ে তা আটকে রাখলুম যাতে চোখে-মুখে এসে না পড়ে। বেশী গয়না পরলুম না, আমার দরকার কি? আমার রূপ বাইরের সজ্জার কিই বা ধার ধারে? ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্দরের দরজার কাছে যেখানে সব বৌ-ঝিরা জটলা করছিল, সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ঐ যে বাজনার শব্দ কানে আসছে, সঙ্গে-সঙ্গে কত পটকা বোমই যে ফুটছে! আঃ, কি প্রকাণ্ড কলরব! প্রকাণ্ড মিছিল এসে আমাদের সদর দরজার কাছে দাঁড়াল। বর-বৌএর সোনার-বিট-দেওয়া রূপোর পাল্কি অন্দরে এগিয়ে এল। আমি সবাইকে ঠেলেঠুলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। মা বৌকে কোলে করে নামালেন। তার তখনকার মূর্ত্তি যেন আজও চোখের সামনে ভাসছে। তিনি যখন বৌকে কোলে নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন তখন মনে হল যেন কৈলাশেশ্বরী পার্ব্বতীর কোলে বালিকা লক্ষ্মী! বৌয়ের মুখখানি যেন ননী দিয়ে গড়া, চোখ অসহায় হরিণশিশুর মত। সে যখন আলপনার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল, তখন আলপনার লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ যেন আমাদের ঘরের এই নতুন লক্ষ্মীর পায়ের তলায় মিশে গেল।

আমি হাঁ করে বৌ দেখছিলুম, এমন কি হিংসে করতেও ভুলে গিয়েছিলুম। আমার পাশে আমার এক মাসতুতো বোন দাঁড়িয়ে ছিল, সে হটাৎ বলে উঠল, "হ্যাঁ সুন্দর বটে, তবে গায়ের রংএ বিদ্যুতের কাছে দাঁড়াতেও পারে না, ঠাকুরদাদার যেমন কথা!"

তাইত বটে! মন আবার সজাগ হয়ে উঠল; বৌয়ের মুখ যতই চমৎকার হোক, রংএ আর চুলের বাহারে তাকে হার মানতেই হবে। আমি এবার প্রসন্ন মনে উৎসবের কোলাহলে যোগ দিলুম। বৌকে প্রণাম করতে সে তার ডাগর চোখে বিস্ময় ভরে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

সেজদার বৌভাতে যা ঘটা হল, তেমন বোধ হয় এ অঞ্চলে আর কখনও হয়নি। এখনও আমার বাপের বাড়ীর দেশে বুড়োবুড়ীতে "সেজবাবুর" বিয়ের গল্প করে। তারপর বাগানবাড়ীতে যাবার ধুম পড়ে গেল। হাতীতে আর গোরুর গাড়ীতে জিনিষ বোঝাই হয়ে রওনা হয়ে

গেল, বাড়ীর ছেলেরা দাদাকে আর তাঁর বন্ধুর দলকে নিয়ে হৈ হৈ করে পাড়া কাঁপিয়ে চলে গেল। সবার শেষে পাঁচ-ছ-খানা পাল্কি-গাড়ী বোঝাই করে আমরা চল্লুম, সঙ্গে রাজ্যের দাসী আর দরোয়ান।

বাগানবাড়ীতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সেদিন আর বেড়ানোর কোন সুবিধাই হল না। মা, ঠাকুরমা তাড়া দিয়ে আমাদের সকাল-সকাল খাইয়ে শুতে পাঠিয়ে দিলেন। আমার ঘরে আমার সেই মাসতুতো বোন শুলো, আশে-পাশে সব বৌদিদিদের ঘর।

ভোর রাত্রে কার ঠেলাতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, মেজ বৌদি আমাকে আর কমলিনীকে ঠেলে তোলবার চেষ্টা করছে। আমি তার দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল, "ওঠনা ভাই, বাগানবাড়ীতে এসেছিস কি শুধু ঘুমতে? বাগানের নাকি এবার ঢের বাহার বেড়েছে, অনেক নতুন গাছ লাগানো হয়েছে; কত চৌবাচ্ছা ফোয়ারা, পাথরের বেদী সব হয়েছে, চলনা একটু দেখে আসি।"

কমলিনী চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, "তা ভাই রাত দুপুরে যাবে নাকি? দিনের বেলায় গেলেই হবে।"

বৌদি আমার হাত ধরে জোরে এক টান দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, তখন তোদের জন্যে বাবুরা বাগান ছেড়ে দিয়ে মাঠে গিয়ে বসে থাকবে। এই বেলা চল, এখন সব ঘুমচ্ছে।"

বৌদির তাড়ার চোটে উঠে বসলুম। একটু শীত-শীত করছিল, একখানি সবুজরংএর শালে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বাগানে ঢুকে প্রথমে ভয় করছিল, এ ত কলকাতার বাড়ীর সখের টব-বসানো বাগান নয়, চোখ চেয়ে এর শেষ পাওয়া যায় না। যেদিকে চাই রঙীন ফুলের হাট বসে গিয়েছে, ভোরের শিশির তাদের তখনও মুক্তার মালায় সাজিয়ে রেখেছে। গাছের সারির তলা দিয়ে যেতে যেতে আমাদের চুলে গায়ে কাপড়ে বনদেবীদের সদ্যসিক্ত সবুজ আঁচল থেকে কত জলকণা ঝরে পড়ল তার ঠিক নেই।

খানিকদুর গিয়েই কমলিনী একটা রঙীন জলের ফোয়ারার ধারে ঘাসের উপর বসে পড়ল, বললে, "আমি আর হাঁটতে পারছি না, তোমরা 'যত' পার ঘোরো; আমি একটু জিরিয়ে এখান থেকেই বাড়ী ফিরব।" আমরা অনেক সাধাসাধির পরেও তাকে নড়াতে না পেরে এগিয়ে চললুম।

একটু দূরেই একটি ছোট্ট কালো পাথরের তৈরী পাহাড়। তার অঙ্গে কত রংবেরঙের গাছপালা গজিয়ে উঠেছে, আর তার কালো বুক ভেদ করে গলানো হীরের স্রোতের মত একটি ঝরণা নেমে আসছে। পাহাড়ের তলায় একটি ছোট নদীর সৃষ্টি করে ঝরণাটি শেষে গিয়ে সামনের লালপদ্মে-আলো-করা দীঘির জলে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়ালুম, বৌদি ঝরণার ধারে একখানা আছাঁটা গাছের ডালের বেঞ্চিতে বসে পড়ে বললে, "কম্‌লি নেহাৎ মিথ্যে বলেনি, আমারও পা ব্যথা করছে। দেখ ঠাকুরঝি, কি চমৎকার পদ্মফুল! হ্যাঁ, ফুল বলতে হয় ত ওকেই বলি।"

সব জিনিষেই নিজের একটা মত প্রকাশ করা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, আমি বললুম, "যাই বল' বাপু, আমার সবচেয়ে বেলফুলই ভাল লাগে। রূপ না হয় অত নাই হল, কিন্তু গন্ধ কেমন চমৎকার!"

"বটে! রূপের চেয়ে গুণের ওপর তোমার টান বেশি? কালে কালে কতই দেখব! রূপের মহিমা তোমার 'মত' ত আর কোনো মানুষকেই......" বৌদিদি হটাৎ থেমে গেল, আমি তার দিকে চেয়ে দেখলুম সে ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। আমি তার রকম দেখে অবাক হয়ে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম। ওমা, পাহাড়ের ওধারে কে একজন এতক্ষণ বসে ছিল, আমাদের গলা শুনে তাড়া-তাড়ি উঠে পড়েছে।

বৌদি বাড়ীর বৌ, ঘোমটা দিয়ে নিস্তার পেল; আমার ত কোনো দিনও অভ্যাস ছিল না, আর সত্যি কথা বলতে কি তখন আমার অভ্যাস থাকলেও সে কথা মনে আসত না। যে মুহূর্ত্তটা আমার জীবনে এতখানি জায়গা জুড়ে আছে সেটা কি আর ঘোমটা দিয়ে নষ্ট করবার জিনিষ?

এতকাল নিজের রূপ ছাড়া আর কিছু চোখে দেখতে পেতুম না, এইবার অন্যের রূপ দেখলুম। সে কি আশ্চর্য্য

চেহারা! বাগানের মাঝে মাঝে যে গ্রীক মূর্ত্তির অনুকরণে তৈরী মূর্ত্তি দাঁড় করানো থাকত, এ যেন তার চেয়েও সুন্দর। তোমরা হয়ত মনে করে হাসবে যে সামান্য বাঙালী গৃহস্থের ছেলের এমনই বা কি রূপ? কিন্তু মনে রেখো সেই আমি প্রথম নারীর চোখে পুরুষকে দেখলুম, তখন যে আশ্চর্য্য রূপ দেখা যায় সে কি সবটা বাইরের? মনের রংএ যে তার রূপ শতগুণ বেড়ে ওঠে। এতকাল আমি ছিলুম বড়ঘরের আদরিণী মেয়ে আর যাদের দেখতুম তারা ছিল আমারই দাদা, কাকা, মামা, কি অন্য কোন সম্পর্কীয় লোক। কিন্তু সেদিন সে ছিল শুধু একটি তরুণ পুরুষ আর আমি একটি মেয়ে যার বাল্য সেই এক নিমিষের দৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই চিরকালের মত অতীতের অতলে তলিয়ে গেল।

আমি তাঁর দিকে যতখানি বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে ছিলুম, তাঁর দৃষ্টিতেও তার চেয়ে কম কিছু ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা আমি তখন লক্ষ্য করিনি, পরে মনে পড়েছিল। সে দৃষ্টি কতক্ষণেরই বা, এক নিমিষ বৈ ত নয়? বৌদিদির হাতের মৃদুপীড়নে আমিও যেই সচকিত হয়ে ফিরে দাঁড়ালুম, তখনই তিনিও সেই বাগানের ঘন দেবদারু-গাছের বীথিকার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেলেন। পুবদিক রাঙিয়ে সূর্য্যদেব নিজের ওঠবার আভাস দিলেন, আমিও নিজের জীবনাকাশের প্রথম তপনোদয়ের রক্তিমায় রাঙা হয়ে বাড়ী ফিরে এলুম।

নিজের ঘরে ঢুকে অন্যমনস্কভাবে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। মনের ভিতর কতকিছু যে খেলে যাচ্ছিল তার ঠিকঠিকানা নেই, কিন্তু সব এমন এলোমেলো যে তাকে একটা সুস্পষ্ট আকার দেওয়া শক্ত। হটাৎ পিছন থেকে মেজবৌদি বলে উঠল, "ওগো আর অত করে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে হবে না, বিনা সাজের রূপেই যা দেখাচ্ছে, 'তাতেই সে বেচারা বাড়ী গিয়ে মরে থাকবে।'"

আমি চমকে আয়নার সামনে থেকে সরে গেলুম। মেজবৌদি যেটা পরিষ্কার করে বলে দিলে, বাস্তবিক সেই ইচ্ছা নিয়েই কি আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম? একেবারে অস্বীকার করতে ত পারি না!

উৎসব-বাড়ীর হাজার কোলাহলের মধ্যে মনকে আমি কিছুতেই বসাতে পারছিলুম না। মেজবৌদি আর কমলিনী যে সেটা লক্ষ্য করে গা-টেপাটিপি করছে তাও আমার চোখ এড়ায়নি, কিন্তু চেষ্টা করেও আমি অন্য কিছুতে উৎসাহ দেখাতে পারছিলুম না। বাড়ীর ঐ দুটি মেয়ে ছাড়া নিশ্চয়ই আর কেউ আমার কোনো বিশেষত্ব সেদিন লক্ষ্য করেনি, কিন্তু আমার মনে কেবলি একটা আশঙ্কা জেগে উঠছিল যে নিশ্চয়ই সবাই সব বুঝতে পেরেছে। অথচ কি যে তারা বুঝবে তার ঠিক নেই, আমি নিজেই কি ভাল করে কিছু বুঝেছিলুম?

বিকেলে আমাদের বাড়ীতে মস্ত ভোজ। সেজদার সব বন্ধুরা তাকে নিয়ে রান্নাবাড়ীর সামনের বড় দালানটাতে খেতে বসল। সবাইকার সঙ্গে বসলে তাদের ফূর্ত্তি জমে না। তারা বসেই আব্দার ধরলে যে নূতন বৌকে পরিবেষণ করতে হবে, তা না হলে তারা খাবে না। গুরু-পুরোহিতরাই শুধু বৌয়ের পরিবেষণ লাভ করবে, তারা বুঝি কেউ নয়? মা আর ঠাকুরমা তাদের রকমসকম দেখে হাসতে-হাসতে বললেন, "তা যাক্, বৌই না হয় দুএক-হাতা দিক। ওদের বন্ধুর বৌ, ওরা ত গোলমাল করবেই। নূতন বৌয়ের লোকের সামনে বেরুতে দোষ নেই।"

আগাগোড়া হীরেজহরতে-মোড়া বৌ এসে দাঁড়াল। তার হাতে একখানা রূপোর হাতা তুলে দিতেই সেটা সে তখুনি ফেলে দিলে। তার হাত তখন থরথর করে কাঁপছে। মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ওকে একলা পাঠালে ও সেইখানেই গড়িয়ে পড়বে, সঙ্গে একজন কেউ যাও।" কে যাবে? বাড়ীর বৌরা সবাই একএকহাত ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়াল, কমলিনী চোখ কপালে তুলে বললে, "ওরে বাবারে, আমি পারব না, আমি বৌকে ধরব কি বৌকেই আমায় ধরতে হবে।" কেউ নড়ে না, এদিকে বাইরে ছেলের দল মহা হাঙ্গাম লাগিয়ে দিয়েছে। ঠাকুরমা ঠাট্টা করে বললেন, "তা না হয় বৌমা আমিই নাতবৌর সঙ্গে যাই। বিমলের দুই কনে একসঙ্গে পরিবেশণ করুক।"

মা একটু হেসে বললেন, "তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? এদিকে যে দেরী হয়ে যাচ্ছে।" হটাৎ তাঁর চোখ

আমার উপর পড়ল, আমার দিকে ফিরে বললেন, "খুকী, এদিকে আয় ত। তুই যা বৌয়ের সঙ্গে, দেখিস শক্ত করে ধরিস্, পড়েটড়ে না যায়।" কমলিনী পিছন থেকে আমাকে এক ঠেলা দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "আর দেখিস্ তুই নিজে যেন পড়িস্‌নে।"

আমার বেশ ভয় করছিল, কিন্তু কমলিনীর ঠাট্টায় রাগ হল, জোর করে মনকে শক্ত করে নূতন বৌকে নিয়ে এগলুম। প্রকাণ্ড দালান জুড়ে ছেলের দল বসে গিয়েছে, তাদের গল্পের শব্দে কান পাতা যায় না। আমাদের আবির্ভাবে হটাৎ সব চুপ হয়ে গেল। বৌ রূপোর হাতায় সবাইকে পরিবেষণ করতে লাগল, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে চললুম। অত লোকের সামনে বেরিয়ে আমার পা কাঁপছিল, নাক মুখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরুচ্ছিল। তবু অত লজ্জার মধ্যেও একবার মাথা তুলে চেয়ে দেখলুম, সেও কি ঠিক সেই সময়েই মাথা তুলে চাইলে!

সমস্ত লাইন একবার পার হতেই মা দরজার আড়াল থেকে ইসারা করে আমাদের ডেকে নিলেন। ঘরে ঢুকে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

একসপ্তাহ ধরে বাগানবাড়ীতে উৎসব চলতে লাগল। আমি কিন্তু দিনের পর দিন নিজের মনের গোপন উৎসবেই মজে রইলুম, বাইরের উৎসব আমাকে টেনে নিতে পারলে না। কমলিনী আর মেজবৌদি দিন-দুই আমার পিছনে লেগে তারপরই হাজার আমোদের হিড়িকে সে কথা ভুলেই গেল।

উৎসব শেষ হল যাত্রাগান হয়ে। ঠাকুরদাদা অনেক খরচ করে অন্য দেশ থেকে এই যাত্রার দল আনিয়েছিলেন, কাজেই যাত্রা শুনবার আয়োজনও খুব ঘটা করে হল। মেয়েদের বসবার জন্যে জায়গা ঠিক করা হল, তার সামনে লেসের-ঝালর-দেওয়া রেশমী পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। দাদাদের বন্ধুবান্ধবরা দলবল নিয়ে বুড়োদের কাছ থেকে একটু তফাৎ হয়ে বসল।

গান আরম্ভ হল। মেয়েরা গান শুনতে-শুনতে সমানে পানখাওয়া, ছেলেকে দুধখাওয়ানো এবং পরস্পরের নূতন গয়নার খোঁজখবর নিতে লাগল। তবু যারা খুব অল্পবয়সী তারা মন দিয়ে গান শুনছিল। আমি গল্পে যোগ দিইনি, তবে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে যে শুধু গানই শুনছিলাম, তা নয়।

একটা গান শেষ হতেই ভারী বাহবা পড়ে গেল। কত সুরেই যে সাধুবাদ উঠল তার ঠিক নেই। ঠাকুরদাদা নিজের গায়ের শাল খুলে অধিকারীর গায়ে ফেলে দিলেন, আরও কত লোকে কত কি দিলে।

এত পেয়ে অধিকারীর লোভ আরও বেড়ে গেল, সে মেয়েদের পরদার দিকে মুখ করে করজোড়ে ফিরে দাঁড়াল। মা আর ঠাকুরমা দুজনে দুটি মোহর আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "তুই হাত বাড়িয়ে বাইরে দিয়ে দে।"

এমনি ছুড়ে দিলে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে বলে, আমি আমার হাতের রেশমী রুমালে মোহর দুটি বেঁধে বাইরে ফেলে দিলুম। বোধ হয় আমিই আস্তে ছুড়েছিলুম, রুমালখানা অধিকারীর সামনে না পড়ে, পড়ল গিয়ে সেই ছেলের দলের মধ্যে। একজন সেটা টপ্ করে তুলে মোহর দুটি খুলে অধিকারীর হাতে দিয়ে দিলে। কিন্তু রুমালখানা তার হাতেই থেকে গেল। সে কে, তা কি আর বলে দিতে হবে? তোমাদের জিনিষ খোওয়া গেলে তোমরা দুঃখ কর, কিন্তু ঐ রুমালখানা হারিয়ে আমি যে সুখ পেয়েছিলুম, সে-রকমটি আর এ জীবনে জুটল না। পর্দার লেসের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে নিজের হারাধনের দিকে কতক্ষণ চেয়ে ছিলুম, শেষে আবার গান আরম্ভ হওয়াতে চমক ভেঙে গেল।

পরদিন আমাদের আনন্দের হাট ভেঙে গেল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন যে-যার বাড়ী ফিরে গেল। আমরাও বাড়ী ফিরলুম।

একটা বিয়ের কোলাহল বাড়ীর লোককে যেন ভাল করে মনে করিয়ে দিলে যে আরও একটা বিয়ে বাকী আছে। সেজদার বিয়ের পর থেকেই সবাই আমার বিয়ের সম্বন্ধে বড় বেশী সজাগ হয়ে উঠল। ঘটকঘটকীর আগমনে আমি প্রায় অস্থির হয়ে গেলুম। নিজের ঘটকালি যে নিজেই করে বসেছিলুম, তাই অন্য কারুর ওকাজে হাত দেওয়া সইতে পারতুম না। নিজের গোপন-স্বয়ম্বরের বরটি যে কে, কোথায় থাকে, কি করে, কিছুই জানতুম না; তবু আমার, মনে কে এ আশা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে তার

সঙ্গে ছাড়া আর কারু সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। কেবল অনেক চেষ্টা করে বৌদিদের হাজার ঠাট্টা সহ্য করে এইটুকু জানতে পেরেছিলুম যে তার নাম মণীন্দ্র।

সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরের জানলার কাছে বসে আছি, বাইরের বাগানের একটা বিলিতী নিমের গাছের মাথার উপর সন্ধ্যাতারা ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে, আর একটি তারাও তখন নিজের মুখ দেখায়নি। হটাৎ বৌদিদি ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "সুখবর এনেছি, কি বখশিশ্ দিবি দে, হাঁ করে আকাশের দিকে আর তোমাকে বেশীদিন তাকিয়ে থাক্‌তে হবে না, এর পর ঘর ছেড়ে বেরতে চাইবে না।"

আমি বুঝলুম ব্যাপারখানা কি। বড়বৌদিদি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, তাঁর কথার আর কোনো উত্তর দিলুম না, তিনি হাসতে-হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি সেইখানেই বসে রইলুম, ভয় আর আনন্দে মেশানো কি একটা ভাব আমার বুকের মধ্যে কেবলি একটা কম্পন জাগিয়ে ফিরতে লাগল।

বাড়ীতে আবার ধুমধাম লেগে গেল। স্যাকরা, ময়রা, ছুতোরমিস্ত্রী সদলবলে আমাদের বাড়ীতে ভেঙে পড়ল। মা একদিন কথায়-কথায় বললেন, "আমার এক মেয়ে, তাকে এমন সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাব যে যতবড় দজ্জাল শাশুড়ীই হোক না কেন, কোনো খুঁৎ বের করতে পারবে না।"

দিনের পর দিন যেতে লাগল, সেই পরম শুভদিনটিও এগিয়ে আসতে লাগল। আমার কোনো ভয় কোনো চিন্তাই কি হয়নি? কোন্ অচেনা অজানার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হবে তা কি একবারও ভাবিনি? কিন্তু নিস্তব্ধ দুপুরের সময় পাশের ঘর থেকে গোপনে-শোনা একটি কথা ভোরের প্রথম জ্যোতিচ্ছটার মত আমার মন থেকে সব আঁধার দূর করে দিয়েছিল। আমি নিজের ঘরে শুয়ে ছিলুম, হটাৎ কানে এল যে পাশের ঘরে আমার এক দূরসম্পর্কের খুড়ীমা মাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "হ্যাঁ দিদি, মেয়ে দেখানো হয়ে গেছে?" মা হেসে বললেন, "না বোন, মেয়ে দেখাতে হবে না, বিমলের বিয়ের সময় বর নিজে কনেকে দেখে পছন্দ করে গিয়েছে।" এর পরও কি আর তোমাদের বলতে হবে যে আমার মনে ভয়ভাবনা কেন কছুতেই আমল পায়নি?

বিয়ের কাপড়ের ফরমাস নিতে বেনারসীওয়ালা আ দের বাড়ীতে এল। মা বললেন, "আমাদের সব সেবে পছন্দ, বৌমাদের ডাকি না হয়।" বৌরা পরম উৎসাহেই এল, আসবার সময় মেজবৌদি আমাকে সুদ্ধ জোর ক গ্রেপ্তার করে আনলে। বড়বৌদি অনেক পরামর্শ ক ফরমাস দিলেন যে গাঢ়লাল-চেলীর উপর আগাগে সোনালী জরীর বিদ্যুৎ খেলে যাবে, মেয়ের নামে ত কাপড়ের চেহারায় মিল থাকা ত চাই? আমি মেজবৌ হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেলুম; ঘরে ঢুকে নিজের অজ্ঞা কখন এই কথাটাই মনে জেগে উঠল যে একদিনের সজ্জ অভাব এইবার মিটিয়ে নিতে পারব।

গায়েহলুদের দিন বরের বাড়ীর তত্ত্ব দেখে বৌদি বল্লে "ঠাকুরঝির কপাল ভাল, বাপের বাড়ী এতদিন পা উপর পা দিয়ে কাটিয়েছে, শ্বশুরবাড়ীতেও তাই থাক দেখছি।"

বাড়ীর গোলমালে আর একমুহূর্ত্তও আমি এক বসতে পারতুম না, সমবয়সীরা ত একমিনিট ছাড়ত ন তার উপর বাড়ী বাড়ী আইবড় ভাত খেয়ে বেড়ানো।

বিয়ের দিন এসে পড়ল। যত দিনই যাক, মেয়েমানুষে মন থেকে এই দিনের স্মৃতি কখনও যায় না, আমার যায়নি।

সকাল থেকে চণ্ডীর পুঁথি কোলে করে আলপনা-দেও চন্দন-কাঠের পিঁড়িতে বসে ছিলুম, সেই মহা গোলমালে মধ্যে আমিই শুধু সেদিন চুপ। সব কাজের মধ্যে কিন্তু ম ঠাকুরমা, বৌদিদিরা এক-একবার এসে উঁকি মেরে আমা দেখে যাচ্ছিলেন। দেশবিদেশে যত আত্মীয় ছিলেন সবা এসে জুটেছেন, এমন কি সেদিন পর্য্যন্ত তখনও নূতন লো আসছে। মানুষের পায়ের শব্দে হটাৎ মুখ তুলে চে দেখলুম একজন বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে বললেন, "বিদ্যুৎ, ইনি আমার মাসী, এঁ প্রণাম কর।" আমি উঠে তাঁকে প্রণাম করলুম। তি আমাকে "রাজরাণী হও" বলে আশীর্ব্বাদ করে মায়ের দি ফিরে বললেন, "মেয়ে ত ঠিক বিদ্যুতেরই মত দেখতে জামাই হল কেমন? মানাবে ত?" আমি মনে-ম হাসলুম। মা বললেন, "বাইরের রূপে কি এসে যায় মা

মা? আমার জামাই প্রসন্নর রং কালো, কিন্তু আমি তোমায় বলছি, বিদ্যুৎ অনেক জন্মের তপস্তার ফলে এমন স্বামী পাচ্ছে।"

প্রসন্ন! কালো রং! একি হল? আমার সামনে দিনের আলো যেন গভীর কালো হয়ে উঠল, ঘরের জিনিষপত্র যেন চোখের উপর নাচতে লাগল। মায়ের মাসী চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওমা, কি হল! শিগগির মেয়েকে ধর!" মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সারাদিন উপোষ করে আছে, তাই বোধ হয় মাথা ঘুরছে, আর তোকে পিঁড়িতে বসতে হবে না, শুবি চল।" আমাকে টেনে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। চারিদিকের আনন্দের কোলাহল আমার কানে ঠিক প্রেতলোকের আর্ত্তনাদের মত বাজতে লাগল। কাঁদতে পারলে আমার জ্বালা হয়ত একটু কমত, কিন্তু চোখ দিয়ে জল কিছুতেই বেরল না, মনের ব্যথা পাথরের মত ভারি হয়ে বুকের উপর চেপে রইল। ঠিক বলি-দানের আগে, বলির পশুকে দেখে চারিদিকের লোকের মনে যে উন্মত্ততা আসে, মনে হল আমার বাড়ীর লোকেরও তাই এসেছে, তা না হলে কি আর তাদের গলা থেকে এমন সময় আনন্দের সুর বেরত? কোনো অদৃশ্য দর্শক আমাদের বাড়ীর এই নাট্যটা সেদিন দেখলে বেশ হত। বিদ্যুতের আলোর হাসি সবাই উপভোগ করলে, কিন্তু গোপন বজ্রটা কার বুকে পড়ল তার খোঁজ কে নিলে? মেয়েমানুষের প্রাণ, তাই সেদিন সয়ে গিয়েছিল; লোহারও যা সয় না, হিন্দুর মেয়েকে যে অহরহই তা হাসিমুখে সইতে হচ্ছে।

বিকেল হতে-না-হতেই সঙ্গিনীরা এসে আমাকে খাট থেকে টেনে তুললে। এইবার কনে সাজানোর পালা। আমি পাথরের মূর্ত্তির মত বসে রইলুম, তারা সবাই মনের সাধে আমাকে সাজিয়ে চলল। ঘণ্টা-দুই ধরে অবিশ্রান্ত মুখ এবং হাত চালিয়ে তারা কাজ শেষ করলে পর বড়বৌদি টেনে নিয়ে গিয়ে আমাকে একটা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু চেয়ে দ্যাখ, পরের পছন্দ পরের কথা, এখন তোর নিজের পছন্দ হয় কি না।" এতক্ষণে হটাৎ যেন আমার জ্ঞান ফিরে এল। চেয়ে দেখলুম, আয়নার ভিতর আমার সমস্ত শরীরের ছায়া। হাঁ এই ত ঠিক সাজ হয়েছে! যার ভিতরে আগুন জ্বলছে, তার এমনি আগুনের সাজই ত দরকার। কাপড়ের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে হাতের হীরার কাঁকণ, গলার হীরের কণ্ঠী থেকে ফিনকি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। বাইরে চারদিকে লালের আর আগুনের খেলা, ভিতরেও যে তাই। মনে হল শাড়ীর জরির আগুন সত্যি হয়ে আমাকে যদি এখুনি জড়িয়ে ধরে, তা হলে সব জ্বালা চুকে যায়। সেইখানেই বসে পড়লুম। কমলিনী হেসে বললে, "দেখিস, নিজের রূপ দেখে নিজেই মূর্চ্ছা যাসনে।" একটা তীব্র বেদনা ছুরির মত আমার বুকে এসে বিঁধল। এই শাড়ী এই গয়না হবার সময় কি আনন্দে কি আশায় মন ভরে উঠেছিল!

বর এসে পড়ল। স্ত্রী-আচার বরণ সব যেন আমার চোখে ছায়াবাজির মত খেলে যেতে লাগল। শুভদৃষ্টির সময় মাথায় চেলীর চাদরের আবরণ দিয়ে চারদিক থেকে যখন চোখ চাইবার অনুরোধ আসতে লাগল, তখন কিসের একটা কৌতুহলে একবার সামনে তাকালুম। শ্যামবর্ণ কোমল মুখ থেকে একজোড়া মিনতি-ভরা চোখ আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি তখুনি চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

বিয়ে ত হয়ে গেল। তারপর বাসরের পালা। প্রকাণ্ড ঘর, বড় বড় ঝাড়ের আলোয় আর রাজ্যের বালিকা কিশোরী আর তরুণীর হাসিতে আলো হয়ে উঠেছে। বর-কনের খাটের চারিদিকে যেন হাসি-তামাসার বান ডেকে যাচ্ছে। বরযাত্রীর দল অনেকবার করে বাইরে থেকে খবর পাঠাচ্ছে যে তারা একবার বৌ দেখতে আসতে চায়। শেষে ঠাকুরমা আর না পেরে অনুমতি দিলেন। মেয়ের দলের অর্দ্ধেক ঘোমটা দিয়ে খাটের আড়ালে সরে গেল আর বাকী অর্দ্ধেক ঘর থেকে বেরিয়ে কপাটের আড়াল থেকে উঁকি মারতে লাগল। হুড়মুড় করে একপাল ছেলে ঘরে ঢুকে পড়ল, খানিকক্ষণ তাদের হাসিতামাসার চোটে ঘর একে-বারে গমগম করতে লাগল। অল্পক্ষণ থেকেই তারা আস্তে আস্তে এক-এক করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল, বাইরের ভোজের কোলাহলে আর বেশীক্ষণ বাসর-ঘরে টিকতে পারলে না। ভিড় যখন খুব কমে এসেছে তখন হটাৎ আমাদের একেবারে সামনে একজন এগিয়ে

এসে দাঁড়াল। আমি তাকিয়ে দেখলুম। তাকে দেখেই মনে হল এখুনি খাট থেকে নীচে পড়ে যাব, হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে এল। কিন্তু তখুনি আবার শক্ত হয়ে চেপে বসলুম। সেজদা বললেন, "প্রসন্ন, মণি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।" আমার স্বামী হাসিমুখে ফিরে চাইলেন। মণীন্দ্র আরও কাছে এসে পকেট থেকে নীলকাগজে-মোড়া একটা কি বার করে বললেন, "ভাই, তোমার বিয়েতে সামান্য একটু উপহার এনেছি, সকলের সঙ্গে দিইনি, তা হলে ভিড়ের মধ্যে গরীবের জিনিষ চোখে পড়ত না।" নীল কাগজের মোড়ক খুলে তিনি সোনায়-গড়া আধফোটা বেলকুঁড়ির একটি মালা আমার অবশ হাতে তুলে দিলেন। স্বামী যেন তাঁকে কি-একটা বললেন, আমার সেটা ঠিক কানে গেল না। আমি আর-একবার চোখ তুলে চাইলুন, চোখেরই নীরব ভাষায় আর-একজনও বিদায় নিয়ে লোকের ভিড়ে মিশে গেল। ভোরের আলোয় আমার জীবনের পথে যে প্রথম পা দিয়েছিল, রাত্রির ঘোরালো আলোতে উৎসব-কোলাহলের মধ্যে সে চিরদিনের মত সেপথ থেকে সরে গেল।

বরযাত্রীরা সব বেরিয়ে যেতেই মেয়ের দল এসে আবার আমাদের ঘিরে ধরলো। কমলিনী আমার হাত থেকে মালাটা টেনে নিয়ে গলায় পরিয়ে দিতে দিতে বললে, "নিশ্চয়ই কটকের তৈরি, এখানে আর এত চমৎকার গড়তে হয় না।"

মাঝরাত্রে বাসরের কোলাহল কমে এল, কেউ বা ঘুমিয়ে পড়ল, কেউ বা বাড়ী চলে গেল। স্বামী আমার সঙ্গে দুচারটা কথা বলে তার কোনো উত্তর না পেয়ে চুপ করে শুয়ে পড়লেন। ঘরের ঝাড়লণ্ঠনগুলো ক্রমে-ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিভে আসতে লাগল। আমি খাটের উপর বসে-বসেই সেই দীর্ঘ রাত কাটিয়ে দিলুম। তার পর-দিন আজন্মপরিচিত আদরের নীড় ছেড়ে কোন্ অচেনার সঙ্গে অজানা পথে পা বাড়ালুম। আমার জীবনের প্রধান উৎসব চোখের জলে শেষ হয়ে গেল।

শ্বশুরবাড়ী এসে আবার সেই আনন্দের মেলার মাঝে পড়লুম। কাঠের পুতুলের মত যে যা করালে তাই করলুম, যে যা বললে নীরবে শুনে গেলুম। বাইরে আনন্দ উৎসব যত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল, আমার বুকে ভিতরটা ততই যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠ লাগল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ীর গোলমাল একটু কমল। আমা একজন ঝি আর বাড়ীর দুতিনটি মেয়ে মিলে আম শোবার ঘরে একটু বিশ্রাম করবার জন্যে রেখে গে তারা যেতেই আমি বিয়ের সজ্জা খুলে ফেলে দিয়ে পাথ মেঝের উপর শুয়ে পড়লুম, ঘরে একটা আলো জ্বলি সেটাকে দিলুম নিভিয়ে। কতক্ষণ যে পড়ে ছিলুম তা জা না, হঠাৎ আমার অন্ধকার-ঘরের দরজার সামনে কে এ জন এসে দাঁড়াল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই ঘরে ঢুকে কাছে এল। দেখলুম একটি সতেরো আঠা বছরের মেয়ে, বিধবার বেশ, মুখখানি ভারি সুন্দর, রং য শ্যামবর্ণ। গোছা গোছা কোঁকড়া চুল তার মুখের উ এসে পড়েছে, চোখ দুটি যেন বিষাদের উৎস। মনে মেয়েটি যেন এখুনি সন্ধ্যাদেবীর কোল থেকে উঠে এ তেমনি ম্লান, তেমনই শান্তসৌন্দর্য্যে-ভরা।

সে আস্তে আস্তে এসে, আমাকে প্রণাম করে আম পাশে বসে পড়ল। আমার হাত ধরে বল্লে, "রাঙামা আমি তোমার ভাগ্নী কল্যাণী, এতক্ষণ আমাকে দেখা আনন্দের উৎসবে মুখ দেখাবার অধিকার অনেক দি হল খুইয়েছি। তুমি একলা আছ ভেবে মামা আমা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মাটিতে বসে রয়েছ কে খাটে উঠে বসবে চল।"

চারিদিকে লোকের মুখের হাসি দেখে আমার বুকে ভিতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল, এই মেয়েটির বেদনাকাতর ম্লা মুখ দেখে প্রাণটা একটু জুড়ল। হঠাৎ আমার চোখ দি ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল, কিছুতেই থামা পারলুম না।

কল্যাণী আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "ছি! কেঁদ ন মা বাপ ছেড়ে এসেছ, তা দুদিনেই সয়ে যাবে। এর চে ঢের বড় দুঃখও মানুষের সয়ে যায়। এমন দিন গিয়ে যখন ভেবেছিলাম জন্মে আর মাথা তুলতে পারব না, আ ত বেশ হেসে খেলে বেড়াতে পারছি।" তারপর হঠা দাঁড়িয়ে বললে, "যাক ওসব কথা, শুভদিনে কি যা-

যে বক্‌ছি। তার চেয়ে তোমার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিই। আলোটা নিবিয়ে দিয়েছ কেন?"

আলো তখুনি আবার জ্বলে উঠল। কল্যাণী ঘরের এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে রাখতে রাখতে বললে, "রাঙামামী, বিয়ের শাড়ী অমন করে ফেলে রেখেছ কেন? আচ্ছা, আমি তুলে রাখছি। আমাদের দেশে বলে বিয়ের শাড়ী আর নিজেকে পরতে নেই, ছিঁড়ে গেলে জলে ফেলে দিতে হয়।" কাপড় পাট করে হাতে নিয়ে সে আমার কাছে এসে বললে, "ভাই, ঐ যে তোমার সিন্ধুকের পাশে পাথরের বাক্সটা দেখছ, ওটা আমিই সকালবেলা রেখে গিয়েছি। তোমাকে ওটা দিলুম, আর ত আমার কিছু নেই, ওটা একবার একজন পশ্চিম থেকে আমাকে এনে দিয়েছিল। ওতে তোমার বিয়ের শাড়ী রাখবে? বেশ আলাদা থাকবে।"

আমি বললুম, "রাখ।"

কল্যাণী বাক্সের মধ্যে শাড়ী রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিন চার ছড়া কর্পূরের মালা এনে শাড়ীর চারধারে সাজিয়ে রাখতে লাগল। আমি হটাৎ উঠে নিজের গলা থেকে সেই সোনার মালাটা খুলে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিলুম। কল্যাণী বলে উঠল, "এটা ওতে রাখছ কেন? গয়নার বাক্সে রাখলেই ভাল হয়, যখন-তখন বের করতে হবে।"

আমি বললুম, "না, ও ছড়া ওখানেই থাক; শাড়ী যেদিন জলে ফেলব, ওটাকেও তার সঙ্গে ফেললেই হবে।"

কল্যাণী খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর বললে, "আচ্ছা, তবে তাই থাক।"

(৩)

"রাঙা দিদি।"

হীরের কাঁকণ হীরের কণ্ঠী লাল চেলী পরা তরুণী বিদ্যুৎবরণী কোন্ শূন্যে মিলিয়ে গেল। ওমা, আঁধার হয়ে গিয়েছে, এখনও ঘরে প্রদীপ জ্বলেনি। বসে বসে খোলা চোখে স্বপ্ন দেখছি, ছেলেপিলেগুলোর খাওয়া হল কি না তাও দেখলুম না। রাণুও ফিরেছে যে। উঠে পড়ে দরজার কাছে এসে বল্লুম, "কি নাতনি, খবর কি? লক্ষ্মীর রূপ দেখে কজন মূর্চ্ছা গেল?"

"আঃ, তুমি যে কি বল রাঙাদি! আমাকে দেখে আবার কে মূর্চ্ছা যাবে? যে গরম, আমারই প্রাণ বেরবার জোগাড়। এই নাও তোমার শাড়ী; দেখ, এমন পাট করে এনেছি যে মনেও হচ্ছে না কেউ পরেছিল। চল সেই পাথরের বাক্সে তুলে রাখি।"

দুজনে গিয়ে বাক্সের সামনে দাঁড়ালুম। রাণু শাড়ী রাখতে রাখতে বললে, "দেখ রাঙাদি, কতক্ষণই বা শাড়ী নিয়ে গিয়েছি, তখন কেমন চমৎকার কর্পূরের সুগন্ধ ছিল, এখন প্রায় আর পাওয়াই যাচ্ছে না। এত শিগগির উবে গেল! মালা ত কোন্ কালে গিয়েছে গন্ধও রইল না, অথচ দেখ পাথরের বাক্স যেমন ছিল, তেমনটিই আছে।"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ম্লান হাসি হেসে বললুম, "সুগন্ধ কি আর চিরকাল থাকে রাণু? দুদিনেই বাতাসে মিশে যায়। পাথরের ত ক্ষয় নেই, সেই চিরকাল টিকে থাকে।"

শ্রীসীতা দেবী।

কে?

ঐ আকাশের আড়াল হতে ডাকছে মোরে কে?
শিশির-ভেজা পদ্মপাতায় দাঁড়িয়ে আছে সে।
অলস বাতাস অঙ্গ তাহার স্পর্শ করে যায়,
ফুলগুলি তার পাপড়ি খুলে মুখের পানে চায়,
চোখেতে তার প্রাণের আলো কেঁপে কেঁপে দোলে,
বুকেতে তার শতেক রেখা মেঘের বসন কোলে,
দাঁড়িয়ে আছে একা সে যে কিরণ মাখা গায়,
শুকিয়ে-কখন-পড়া-পাতায় কুসুম-ঝরা-পায়;
কে হোথা গো দাঁড়িয়ে আছ শিশির-ভেজা প্রায়ে?
বনফুলের মালা গলে আকাশ-বহা বায়ে?
ডাকছ কে গো সামনে এস মুখের পানে চাও,
এক নিমেষে ঐ বাতাসে দুয়ার খুলে দাও।

শ্রীবরেন্দ্রমোহন সোম।

"একতারা"*

(আলোচনা)

"একতারা" একখানি কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থখানি খাঁটি কবিত্বে ভরা, সুতরাং উপাদেয়। কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণকে আমরা সাহিত্যের বাজারে এ-দোকানে সে-দোকানে বড় বেশী দেখিতে পাই নাই। আজ তিনি পূর্ণ কবিমূর্ত্তিতে সাহিত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একেবারে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর সে সুধাভাণ্ড হইতে অজস্র স্রোতে ক্ষরিত হইতেছে পরিপূর্ণ পবিত্র প্রেমের অফুরন্ত রস-মধুর-ধারা। সে অমৃত-ধারায় হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়া আমরা পূত, ধন্য হইয়াছি। কবির দাম্পত্য-প্রেমের মহীয়ান আদর্শ দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ। আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনা বিমুগ্ধ হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন মাত্র।

ভালো-লাগার দিক হইতে উচ্ছ্বাসের একটা দাবী আছে। সেইজন্যই এই প্রয়াস।

কাব্যগ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে এক হিসাবে অভিনব। ইহার আগাগোড়াই একরকম যুগল-প্রেম বা দাম্পত্য-প্রেমের কথা। স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রেমের এমন একটি সুন্দর, সম্পূর্ণ, পবিত্র ছবি আমরা বাংলাকাব্যসাহিত্যে পূর্ব্বে পাইয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না।

কবি তাঁহার "একতারা"র আগাগোড়া যুগল প্রেমের যে সম্পূর্ণ ছবিটি আঁকিয়াছেন তাহাই আমরা ক্রমে ক্রমে স্তরহিসাবে পাঠকের নিকট ফুটাইতে চেষ্টা করিব। কবির প্রিয়া যে তাঁহার কাব্যের কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহার "গান-গাওয়ার" সঙ্গে তাঁর প্রিয়ার কি বন্ধন, তাহা "আমার গান" নামক কবিতাটিতে কবি সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"কাব্য লেখা সে যে আমার প্রিয়ার অভিসার।"

* * *

প্রিয়ার পরম পরশখানি
ছাওয়া যেন সকল বাণী।"

* * *

"নয়কো গান এ নয় গো;
ভাবগুলি ছোঁয় প্রিয়া'র চুমায়
নেশায় বিকল করে আমায়,
সুরের বাঁধন বাহুর ডোরে
বুকে তুলেই লয়গো।"

এইরূপে কবি দেখাইলেন তাঁর প্রিয়ার সহিত তাঁর কাব্য লেখার কি অচ্ছেদ্য বন্ধন। তাঁর গান গাওয়া ও প্রিয়ার কথা বলায় কোনও প্রভেদ নাই। আমরাও দেখিব বাস্তবিকই তাঁর কাব্যখানি তাঁর প্রিয়ার পরম অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কবি প্রিয়াকে পাইয়াছেন। কিন্তু প্রিয়ার একটু আধটু পাইয়া কবির প্রেমের আশা মিটিতেছে না। তিনি তাঁর সমগ্র প্রিয়াকে আপনার মধ্যে সমগ্রভাবে পাইতে চান। তাঁর প্রেমের ক্ষুধা রাক্ষসীর ক্ষুধারই মত। সে ক্ষুধার জঠরে সমগ্র প্রিয়াকে পাইলে তবে তাঁর পরিতৃপ্তি। তাই "ছদ্মপ্রেম" কবিতায় কবি লিখিলেন,—

"শূন্য মোর এ দেহ প্রাণ
শূন্য সব ঠাঁই;
তোমায় দিয়ে জঠর তার
ভরিয়ে নিতে চাই।
তোমায় আমি করিব গ্রাস
করিয়ে দিব লয়,
তোমার কিছু রবে না হেন
আমার যাহা নয়।"

প্রেম-ক্ষুধিত হৃদয়ে এইরূপে প্রিয়াকে গ্রাস করিলে তবে তাঁর আশ তৃপ্তি। যৌবনে প্রেম যখন উন্মত্ত আগ্রহে তাহার প্রবল আবে অন্ধ হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে ছুটিয়া যায়, তখন প্রিয়ার মত প্রিয়া পাই সে প্রেম এমনি ব্যাকুল প্রচণ্ড ক্ষুধায় প্রিয়াকে আত্মসাৎ করিতে চায়।

প্রিয়াকে ত পাওয়া হইল। কিন্তু কবির ভয় হইতেছে পাছে তি প্রিয়াকে হারাইয়া ফেলেন।

"একান্ত পেয়েছি তোমার কাছে;
ভয় হয় এ মিলন টুটে যায় পাছে।"

যেখানে গভীর প্রেম সেখানেই এই হারাই হারাই ভাব, সেখানেই এ ব্যাকুল অজানা আশঙ্কা।

প্রেমের উন্মত্ত আবেগে যে প্রিয়াকে কবি আপনার বলিয়া সম ভাবে ধরিয়াছেন, সে প্রিয়াকে তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে চান "আলগা জানায়" তাঁহাকে জানিয়া কবির তৃপ্তি নাই। সমস্ত অন্ত চেতনার সহিত তিনি জানিতে চান যে তাঁর প্রিয়াকে তিনি যথার্থ পাইয়াছেন। তাই কবি লিখিলেন,—

"তোমার জানা সে ত অমন চোরের মত আস্‌বে না।
সকল জানা অজানা মোর তার আলোতে হাস্‌বে না?
জান্‌বে না মোর সকল স্নায়ু
পরাণব্যাপী পরাণবায়ু?
জানার সুখ কি বুকের রক্তে তালে তালে নাচ্‌বে না?

* * *

বিপুল মরণপুঞ্জ কি সেই ওই জানাতে বাঁচবে না?"

প্রিয়া-প্রাপ্তির এমনি প্রচণ্ড অনুভূতি কবি চান। ইহাই কবির কা প্রকৃত পাওয়া।

প্রিয়াকে ত কবি পাইলেন। কিন্তু তাঁহার ভয় হইতেছে তি যদি অন্ধ প্রেমিক হইয়া থাকেন; যদি তাঁহার প্রিয়ার ত্রুটিও তাঁ চোখে ঢাকা পড়িয়া থাকে? তাই তিনি প্রিয়াকে জগতের নারী সমাজের পাশে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। সেখানে তুলনা করি দেখিয়া কবি প্রিয়ার কাছে কবুল-জবাব করিলেন—

"তোমার সকল মন্দ ভালো যতেক তব ত্রুটি
উঠে সেথায় উজল হয়ে ফুটি।"

কত নারী তাঁর প্রিয়াকে রূপে ও গুণে ছাড়াইয়া গেল। প্রিয়ার অনে দোষ তাঁহার চোখে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু প্রেমের নির্ম্মল আলোকে দোষ-গুণ-সমন্বিতা প্রিয়া মহীয়সী মূর্ত্তিতে সকল তুলনা নিরস্ত করি কবির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। প্রেমের মিলনে তুচ্ছ তুলনার কথ মনে আসিতেই পারে না। তাই মন-গড়া তুলনায় পর কবি প্রিয়াকে বলিতেছেন,—

"প্রেমের মণিদীপের যেথা অলোক আলো লেখা,
সেথায় যবে পাইগো তব দেখা;
তোমার সেথা যেই মহিমা
কোথাও যে তার নাইক সীমা,
মরম-মাঝে অতুল তুমি তুমি যে মোর একা।"

যথার্থ প্রেম নিজগুণে প্রিয়াকে গৌরবান্বিতা করিয়া লইল। আর যে গৌরবান্বিতা প্রিয়ার [illegible]

* একতারা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী রচয়িতা; প্রকাশক শ্রীমৃণালকান্তি বাগচী, ৫ মুক্তারাম রো, কলিকাতা।

"তোমার বাসরশয়নখানি এ মোর দেহ।" এই প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে এই মিলন-পরিচয়ের সূত্রপাতেই কবির ও তাঁর প্রিয়ার প্রেম-জগতে নবজীবন লাভ হইল। প্রেমের "অলোক লোকের" উন্মুক্ত আলোকে দুইজনে পুনরায় জন্ম লইলেন; জীবনের এক নব-পথের তাঁহারা দুইটি শিশু-যাত্রী:—

"তোমার আমার জনম হল এক নিমেষে একই ক্ষণে,
যেমনি দেখা হল আমার তোমার সনে,
ধরণীর এই গর্ভ আঁধার
ছেড়ে নব জনম দোঁহার
অলোক লোকের মুক্ত আলোক সমীরণে।"

প্রেমের নব-পথে দুইটি যাত্রী চলিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বন্ধনটা কি-রকম কবি এইবার তাই বলিতেছেন। যৌবনের "গহন দেহ-বনের ছায়ে" ত তাঁহাদের দেখা। যৌবনের সেই বনে কবির প্রিয়াই তাঁহার কাছে "বনদেবী"। প্রিয়াকে তিনি বলিলেন,—

"নবীন মম জীবনখানি
দিলাম পায়ে ভাগ্য মানি,
তুমি যে মোর বনদেবী যৌবনের ওই ঘন বনে।"

যে প্রিয়া কবির কাছে দেবীমূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইলেন তাহার সঙ্গে কি কেবল দৈহিক ও ইন্দ্রিয়াদির বন্ধন? তাহা নয়। তাই কবি প্রিয়াকে বলিলেন,—

"আমি রবো ফুটে অমলিন ফুলে
তুমি তার সুধা সৌরভ।"

এই নির্ম্মল আদর্শকে লইয়া কবি ও কবিপ্রিয়ার প্রেম। এই পবিত্র প্রেমের সৌরভ লইয়া কবি ও কবিপ্রিয়া জীবনের পথে চলিয়াছেন। কিন্তু এই চলা কি সাধারণ লোকের মত চলা? কেবল কি কবি প্রিয়ার হাতটি ধরিয়া চলিয়াছেন? তাহা নহে। কবির জীবনযাত্রা প্রিয়ার অন্তরের পথে। তিনি জীবন-পথে যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই প্রিয়ার অন্তর-লোকে পৌছিতেছেন। তিনি প্রিয়ার মধ্যে অগ্রসর হইয়া তাহাকে বড় করিয়া পাইতেছেন। তিনি অগ্রসর হইতেছেন সেইখানে যেখানে প্রিয়ার পরিপূর্ণা অমৃতময়ী মানসী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। কবি কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই যৌবনের "কানন" ছাড়াইয়া তাঁহার প্রিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? এই যৌবনের চপলতার পরপারে কি প্রিয়ার কোন প্রশান্ত আবাস আছে? তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এই কাননের ওপারে কি
তোমার চির গেহ আছে?

কবি সব বুঝিতে না পারিলেও কিন্তু বেশ বিমুগ্ধভাবে চলিয়াছেন। এ পথে তিনি যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই তাঁহার সব অপূর্ণতা সব শূন্য কি এক সৌরভে অমৃতে ভরিয়া উঠিতেছে। প্রিয়া তাঁহাকে কি এক স্বর্গলোকেই লইয়া যাইতেছেন। এ প্রিয়া মানবী না দেবী? কবি ভাব-বিহ্বল-চিত্তে বলিলেন,

"যে পথ দিয়ে যাচ্ছ নিয়ে
চলছি সাথে পথ তো এ নয়,
বিপুল দেউল মাঝে যেন
যাচ্ছি চলে শেষ নাহি হয়।
পূজার গন্ধে ধূপের বাসে প্রাণের ঝাঁক যে ভরে' আসে,
নিবিড় গভীর নয়নজলে
[illegible]।"

দাম্পত্য-প্রেম যখন গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে তখন তাহার মধ্যে এ পবিত্রতা এ সৌরভ খুঁজিয়া পায় এমন ভাগ্যবান কয় জন? এখনও কিন্তু কবি জীবন-যাত্রার কথা শেষ করেন নাই। তাঁর জীবনের স্রোত অজস্র তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। সে স্রোতের উপর, তাঁর সে জীবন-সমুদ্রের বুকের উপর তাঁর প্রিয়ার উদার নির্ম্মল হাসিটি ভাসিয়া বেড়াইতেছে,—

"চপল জীবন-ধারা যে মোর
ঐ হাসিতে উজল হাসে।"

আবার সে স্রোতের একটির পর আর-একটি তরঙ্গ কেমন ভাবে যাইতেছে?—

"তোমার মুখের মোহন মালা
গেঁথে গেঁথে চল্‌ছে তারা।"

এই রকমে কবির জীবন চলিয়াছে। প্রিয়ার সৌরভে তাঁর শূন্য ভরিয়া উঠিতেছে, প্রিয়ার হাসিতে তাঁর আঁধার হাসিয়া উঠিতেছে। দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ ইহা অপেক্ষা আর কি মহীয়ান হইতে পারে?

কবির প্রেম কত উদার এইবার আমরা তাহাই দেখিব। তিনি নিজেও উদার, সুতরাং প্রিয়ার প্রেমকেও উদার দেখিতে চান। প্রিয়াকে তিনি প্রেমের দাসী করিতে চান না। তাঁর প্রেমও উদার থাকিবে, আর তাঁর প্রিয়ার প্রেমও উদার, সহজ, স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আপনাকে পুষ্ট করিতে থাকিবে। কবির আকাঙ্ক্ষার পীড়নে যেন প্রিয়ার প্রেম খর্ব্ব না হয়। প্রিয়া আপনা হইতে সহজভাবে যাহা দিবেন তাহাই কবি চান। তাই প্রিয়াকে বলিতেছেন,—

"নাইকো কোনই জোর,
ভালবাসিস্ মোরে সে তো
আপন খুসী তোর।"

সেই সহজ প্রেমের কথাই আবার বলিলেন,—

"আমার মাঝে না রয় তোমার
কোথাও বাধা কোনও বন্ধ;
ক্ষুণ্ণ না হয় তিলেক তরে
তোমার প্রাণের আপন ছন্দ।"
* * *
"পাখী যেমন ভালবাসে
অসীম আকাশ উদার আলো
তেমনি সহজ তেমনি মুক্ত
আমায় তুমি বাস্‌বে ভালো।"

উদার-মনা কবি না হইলে এমন 'মুক্ত' 'সহজ' প্রেম কে চাহিবে? বাধা-প্রাপ্ত প্রেম যে কবির প্রাণে বিষম পীড়া দেয়। তাই এই উদার-প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। জীবন-পথে কবি ত চলিয়াছেন; উদার সহজভাবে তিনি প্রিয়াকে পাইয়াছেন। এইবার কবি একবার দেখিতেছেন তাঁহাদের বন্ধন কিরূপ, কতদিনের। এ বন্ধন কি বর্ত্তমানেই কেবল আবদ্ধ? ইহা কি আগেও ছিল না, পরেও থাকিবে না? কবি বুকে হাত দিয়া দেখিলেন তাঁহাদের গত মিলনের স্পন্দন এখনও যেন সেখানে বাজিতেছে, এখনও তার স্মৃতির ক্ষীণ আলোটা মনের কোণে মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে,—

"আমাদের সেই গত জনম মোদের মাঝে নাই,
ছায়ার মত জাগছে মধুর অতীত স্মৃতিটাই।"

এই ত গেল অতীতের কথা। বর্ত্তমানের কথা ত কবি বলিতেছেনই। এবার ভবিষ্যতের কথা; অনন্ত প্রেমের কথা। তাঁর প্রিয়া ছোট নয়। সে প্রিয়া দেশকালের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া অসীম হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বিশ্বময় বিপুল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অসীমতার মাঝে কবি নিজেকে ছড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে কুড়াইয়া পাইতেছেন ও পাইবেন। এ-জগতে ও পর জগতে তাঁর প্রিয়া সমানভাবেই তাঁর অধিকারে। সর্ব্বব্যাপিনী, বিশ্বময়ী প্রিয়াকে কবি বিপুলভাবে উপলব্ধি করিতেছেন,—

"অকূল মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে যে পাওয়া আমি পেয়েছি তাই,
একূল আর ওকূল গেছে মিলিয়ে,
যে কূলে তুমি যাও না কেন সমান পাই সমান পাই
তোমারি প্রেম-অতলে যাই তলিয়ে।
* * *
যেথায় আমি রইনা কেন তুমিও রবে সেই দেশে,
ভরিয়ে মোরে আছ যে সবি জুড়িয়ে।"

প্রিয়া ত এমনি অসীম হইলেন। কবিও অসীম হইয়া প্রিয়াকে ধরিতে চাহিতেছেন। দুজনে যখন এইরূপ অসীম তখন পতি পত্নী-ভাবের কথা আর দাঁড়াইতে পারিল না। কবি তখন প্রিয়াকে একটি প্রাণরূপে দেখিলেন, আপনাকেও একটি প্রাণরূপে দেখিলেন। এখন আর পতি-পত্নী নাই। এখন 'তুমি' ও 'আমি'। কবি 'অসীম' 'তুমি'-প্রিয়াকে বলিলেন,—

'আমি' সে যে শূন্য আঁধার চেতন-বিহীন, 'তুমি' বিনে।
'তুমি'র মাঝে আপনারে সে লই যে চিনে।
এই চেনা কি যাবে থামি?—
অসীম 'তুমি' অসীম 'আমি,'
দোঁহার মাঝে দোঁহার বিকাশ রাত্রি দিনে।
* * *
'আমি' 'তুমি' যদি মিলায়
লুপ্ত হবে সকল লীলাই,
কোথাও কিছু রবে না শেষ এই ভুবনে।"

অসীম 'তুমি' অসীম 'আমি'। এই হইল দু'জনের কথা। দুইজনেই অসীম, দুইজনেই বিশ্বব্যাপিয়া। দুজনের মৃত্যু হইলে এই বিপুল বিশ্বেরও হয়ত মৃত্যু হইবে। অতএব এই 'তুমি—আমি'র মৃত্যু কোথায়? কবি ও কবিপ্রিয়া অমর।

এই ত গেল ভাব-জগতে প্রেমের আদর্শের চরম কথা। কিন্তু এ প্রেম কি সম্ভব-জগতে নিরর্থক নিস্ফল হইয়া থাকিবে? বাস্তব জগতে কি এ প্রেমের চরম সার্থকতা নাই, অমরত্ব নাই। আছে। বাস্তব জগতেও ইহার মহৎ সার্থকতা আছে। সে সার্থকতা এই গভীর দাম্পত্য-প্রেম লাভ করিবে তখনই যখন ইহা নিজের মধ্যে সমস্ত জগতের, সমস্ত বিশ্বমানবের দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করিবে, যখন এ প্রেম কেবল আপনার তৃপ্তির দিকে তাকাইবে না, যখন সে মানব-সমাজের কল্যাণের উদ্যোগে মাতিয়া উঠিবে। এই প্রেমের সেই পরম আদর্শের কথাও কবি কম বলেন নাই। এবং তাহা বলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শটি মহিমান্বিত ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—

"এ মিলন কি গৃহাঙ্গনের যত্নে-ঘেরা কূপ?
লাগবে তোমার প্রয়োজনে;
পিপাসিত বিশ্বজনে
ফিরবে হেরি কঠিন কঠোর জড় নিষেধস্তূপ?

তাহা নহে। তবে কি?—

"এ মিলন যে তীর্থ পরম নিখিল ভুবনের,
কারো হেথা নাইকো মানা,
জানা কিম্বা হোক অজানা
বহে আনে পূজার অর্ঘ্য আপন জীবনের।"

এইখানেই ত প্রেমের পরম সার্থকতা। কবি ও কবিপত্নী যখ আপনাদের প্রেমের মধ্যে বিশ্বকে বাঁধিলেন তখনই তাঁহাদের প্রেম ধ কৃতার্থ হইল। দাম্পত্য প্রেমের এত বড় আদর্শ বাংলা কাব্য-সাহিত আছে কি না জানি না। আমাদের ভারতবর্ষে যেখানে গার্হস্থ্যজী ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত, সেখানে কবির পবিত্র দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ য বিশ্ব-ধর্ম্মকেও না আলিঙ্গন করে ত কোথায় করিবে? আমাদের হি আদর্শকেই কবি এখানে গৌরবান্বিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ধন্য

কিন্তু আমরা এখনও তাঁর প্রেমের বাস্তব সার্থকতার কথা সব ব নাই। ভাব-জগতে কবি ও কবিপ্রিয়া অমর হইতে পারেন, কিন্তু বাস্ত জগতের পক্ষে কি তাঁহারা মরিয়া যাইবেন? কবি বলিতেছেন- তাঁহারা মরিবেন না। তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তাঁরা অমর হই থাকিবেন। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নাচিয়া-নাচিয়া তাঁরা ধরার আনন্দ আলোক উপভোগ করিতে থাকিবেন;—

"এ জীবলোকে মোদের এ প্রেম ব্যর্থ নহে বন্ধ্যা নহে,
মোদের ছেলে-মেয়ের মাঝে মোদের জীবন ধারা বহে।
* * *
তাদের প্রতি রক্ত-কণে
জাগবো মোরা সকল ক্ষণে।"

এইরূপে এ প্রেম বাস্তব জগতে সার্থক হইবে, অমর হইবে; ব্যথ হইবে না।

এইরূপে এই দাম্পত্য-প্রেমের পবিত্র আদর্শটিকে সকল দিক হইতে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য কবি আরও অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। তাহাতে ছবিটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমরা কিন্তু এস্থলে সমস্তগুলির উল্লেখ করিতে অক্ষম। আমরা সেই ছবিটিকে স্তর হিসাবে মোটামুটি-রকমে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কাব্যখানি খণ্ড কবিতার সমষ্টি হইলেও ইহাতে প্রেমের আদর্শটি একটি সম্পূর্ণ অখণ্ড মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে অখণ্ড ভাবে দেখিতেই ইচ্ছা করে। আমরা পাঠককে কাব্যগ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

আমরা উপসংহারে কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি নির্ম্মল-দাম্পত্য-প্রেমের যে অমৃতধারায় আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহার কাছে চিরঋণী। আধুনিক কাব্যসাহিত্যে তিনি এক অভিনব জিনিষ প্রদান করিয়াছেন; সেজন্য সাহিত্য-মাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। দাম্পত্য-প্রেম কত পুরাতন জিনিষ। কিন্তু তাহাকে নূতনভাবে অনুভব করিয়া নূতন মহিমায় তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া দেখানো, আর তাহার পবিত্র আদর্শটিকে উজ্জ্বল করিয়া আঁকা সকলের শক্তিতে নাই। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ন্যূনশক্তির কবির হাতে এই সাধারণ ও পুরাতন জিনিষটি নিতান্তই তুচ্ছ-রকমে প্রকাশ পাইত। এ বিষয়ে কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণকে আমরা অতুল শক্তিশালীরূপে দেখিলাম।

আমাদের এ আলোচনা এক হিসাবে প্রশংসাবাদ। কবির দাম্পত্য-প্রেমের বৃহৎ, মহৎ আদর্শ আমাদিগকে এত বিমুগ্ধ করিয়াছে যে তাহার বৃহত্বের মধ্য হইতে কবির দুই একটি সামান্য ত্রুটির ক্ষুদ্রতাকে আমরা টানিয়া বাহির করিতে ইচ্ছা করি নাই।

স্মৃতির সৌরভ

(১৭)

পরদিন ভোর না হইতেই শার্পগিন্নির সবার আগে টিনার কথা মনে পড়িল। কাল সন্ধ্যায় তাহাকে দেখিয়া আসা হয় নাই। শার্পগিন্নির টিনার উপর খুব টানও ছিল, তা'ছাড়া তাহার আর-একটা ধারণা ছিল যে টিনা তাহারই। এই অধিকারের গর্ব্বে বেনামী বুড়ীর হাতে টিনাকে সঁপিয়া দিতে সে একেবারেই নারাজ। সাড়ে আটটার সময় সে টিনার ঘরে গিয়া হাজির হইল; ঔষধ পথ্য, বিছানায় শুইয়া থাকা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে ত। কিন্তু ঘরের দরজা খুলিয়াই দেখে যে পরিষ্কার ধপ্‌ধপে বিছানাটি শূন্য পড়িয়া আছে।

রাত্রে যে কেউ এ বিছানায় শোয় নাই তা' ত পরিষ্কার বোঝাই যাইতেছে। তবে কি টিনা সারারাত্রি বসিয়া কাটাইয়া সকালে বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছে? কালকার ব্যাপারে বোধ হয় বেচারীর মাথা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কাপ্তেন উইব্রোকে অমনভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখা যে বড় বিষম ধাক্কা!—সে সামলান ত সহজ নয়। হয়ত মেয়েটা পাগলই হইয়া গেল। শার্পগিন্নির ত চক্ষুস্থির। মহা উদ্বিগ্ন হইয়া সে টিনার জামা টুপির খোঁজ করিতে গেল; সে-সব কিছুই নাই; তবু যা'হোক সে-গুলো পরিবার মত হুঁশ এখনো আছে। বেচারী ভালমানুষ বড়ই ভয় পাইয়া গেল; মিঃ গিলফিল্ পড়িবার ঘরে আছেন জানিয়া সে তাঁহাকেই খবর দিতে ছুটিল।

ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা ভেজাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "মিঃ গিলফিল্, আমার বড় ভয় করছে, মিস্ সার্টির বোধ হয় একটা ভয়ানক-রকম কিছু হয়েছে।"

মেনার্ড তখন ভয়ে অজ্ঞান; তবে বুঝি টিনা ছোরাটার বিষয় কিছু একটা বলে বসেছে; তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

"তিনি ঘরে নেই, রাত্রে বিছানায় একবারও শোননি, এদিকে টুপি আর আঙরাখাটাও দেখছি না।"

মিনিট দুই মিঃ গিল্‌ফিলের মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না। তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয় সব শেষ হইয়া গিয়াছে টিনা আত্মহত্যাই করিয়াছে। অমন সবল সুস্থ মানুষটি মুহূর্ত্তের মধ্যে এমন দুর্ব্বল অসহায়ের মত হইয়া পড়িলেন যে বেচারী শার্পগিন্নি নিজের অতিব্যস্ততার ফল দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল।

"ওমা, গো ঠাকুর মশায়, আপনাকে হঠাৎ এমন করে ভয় পাইয়ে দিয়ে আমি ত বড় অন্যায় করেছি! সত্যি আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু আমি কি করব, আর কার কাছে যে যাব ভেবেই পেলাম না।"

"না, না, তুমি ঠিকই করেছ।"

নিরাশার শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াই তিনি খানিকটা বল সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সব ত শেষ হইয়াই গিয়াছে, এখন আর ভাবিয়া কি লাভ? এখন এক দুঃখভোগ করা আর দুঃখীর দুঃখ মোচনে সাহায্য করা ছাড়া ত আর তাঁহার কোনো কাজ নাই। আর-একটু দৃঢ় সংযত স্বরে তিনি বলিলেন,

"দেখ, এ বিষয়ে একটি কথা আর কারুর কাছে বলো না। স্যর ক্রিষ্টফার আর লেডি শেভারেল যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু জান্‌তে না পারেন, তাঁদের ভয় পাওয়ালে চলবে না। মিস্ সার্টি হয়ত বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন। কাল তিনি যা দেখেছিলেন, তাতে তাঁর মনে বড় বেশী রকম ঘা লেগেছিল, হয়ত শুধু মনের ওই উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের জন্যেই রাত্রে শুতে পারেননি। যে ঘরে লোক-জন নেই, সেইসব ঘর দিয়ে আস্তে-আস্তে গিয়ে একবার দেখে এস, বাড়ীতে আছেন কি না। আমি ততক্ষণ বাগানে আর ময়দানে দেখি গিয়ে।"

তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন; বাড়ীর লোকে পাছে ভয় পায় এই ভয়ে তিনি একেবারে সোজা 'মশল্যাণ্ডে' মিঃ বেট্‌সের সন্ধানে চলিলেন। পথে দেখিলেন সে সবে খাইয়া উঠিয়া আসিতেছে। টিনার সম্বন্ধে যে ভয় করিতেছিলেন, তাহাকে তাহা খুলিয়া বলিলেন, শুধু বলিলেন, কালকার অমন ভীষণ ব্যাপারে বোধ হয় তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, এখন একবার বাগানে মাঠে আর কর্ম্মচারীদের বাড়ীগুলোতে তাহার খোঁজ করা হউক। যদি সেসব জায়গায় না দেখা যায় কি কোনো সন্ধানও না পাওয়া যায় তবে একবার বাড়ীর চারিধারের খানাডোবা পুকুরে জাল ফেলা দরকার।

"বেট্‌স্‌, ভগবান করুন এমন দুর্ঘটনা না ঘটে, কিন্তু যথাসাধ্য সব জায়গায় খোঁজ করলে আমাদের মন তবু একটু শান্তি পাবে।"

"মিঃ গিলফিল্, আমায় বিশ্বেস করুন, আমার হাতে সব ছেড়ে দিন। আহা গো, আমি বরং বুড়ো বয়সে মরণ-কাল পর্য্যন্ত দিনমজুরী করে খেটে মরব, তবু যেন আমার টিনিমণির কোনো অমঙ্গল দেখতে না হয়।"

মালী বেচারা সাধাসিধে মানুষ। দুঃখে নুইয়া পড়িয়া সে আস্তাবলের দিকে কষ্টে পা ফেলিয়া চলিল; সহিস-গুলোকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া চারদিকে দৌড় করাইতে হইবে।

মিঃ গিলফিলের দ্বিতীয় চিন্তা হইল একবার বাগানের সেই কোণের ঝোপটা খোঁজ করার—হয়ত সে কাপ্তেন উইব্রোর মৃত্যুস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি ব্যস্ত-ভাবে সবক'টা ঢিপির উপর উঠিয়া, সব বড় গাছগুলির আড়ালে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া পথগুলির প্রতি বাঁকে-বাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাস্তবিক, সেসব জায়গায় তাহাকে পাইবার আশা তাঁহার একবিন্দুও ছিল না; কিন্তু এখানে পাইবার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুই জলে টিনার দেহ পাওয়ার বিভীষিকাময় দৃঢ় ধারণাটা একটু ঠেকাইয়া রাখিতেছিল। বাগানের কোণের বৃথা সন্ধান শেষ হইয়া গেল। তিনি দ্রুতবেগে মাঠের ধারের ছোট জলাটির দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সেটা প্রায় সব জায়গাতেই ঘন গাছের আড়ালে ঢাকা, এক জায়গায় একটু ফাঁক, সেখানে জলটা অন্য জায়গার তুলনায় গভীরও বেশী, চওড়াও বেশী—ডোবা কি পুকুরের চেয়ে টিনার এখানে আসার সম্ভাবনাই বেশী। তিনি চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া পাগলের মত সেইদিকে ছুটিলেন। যে ভীষণ দৃশ্য দেখিবার ভয়ে তাঁহার বুক কাঁপিতেছিল, কল্পনা তাঁহার মনের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে ক্রমাগত সেই-রকম দৃশ্যই গড়িয়া তুলিতেছিল।

ওই যে, ওই ঝুঁকিয়া-পড়া ডালটার পিছনে কি যেন একটা শাদা-মত দেখা যাইতেছে। তাঁহার পা-দুখানা ঠক্ ঠক্ করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, যেন টিনার পোষাকের একটা কোণ ছোট একটা ডালে বাধিয়া গিয়াছে, সেই প্রিয় মুখখানি যেন মরণের কোলে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। মেনার্ড মনে মনে ভগবানকে ডাকিলেন, "হে দয়াময়! যে দুর্ব্বল সন্তানের উপর এ গভীর বেদনার বোঝা চাপাইয়াছ, তাহাকে বহিবার শক্তি দাও।" গাছের ডালটার কাছে গিয়া প্রায় যখন পৌঁছিয়াছেন, তখন সে শাদা জিনিষটা নড়িয়া উঠিল। সেটা একটা বক, তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া শাদা ডানা দুখানি মেলিয়া উড়িয়া গেল। এখানে টিনাকে না দেখিয়া তিনি মুক্তির আনন্দ পাইলেন কি নিরাশার ব্যথা পাইলেন তাহা নিজেই বুঝিলেন না। টিনা যে নাই, এ দৃঢ় বিশ্বাস কিন্তু তেমনি ভাবেই পাথরের বোঝার মত তাঁহার বুকে চাপিয়া রহিল।

প্রাসাদের সাম্‌নে বড় পুকুরটার ধারে আসিয়া দেখিলেন মিঃ বেট্‌স্‌ লোকজন লইয়া হাজির। এখনি মৃত্যুর দ্বারে সন্ধান চলিবে, তাঁহার অস্পষ্ট ভয় কঠিন সত্যের ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিবে। মালী এতই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে যে সে আর-সব খোঁজ শেষ করার অপেক্ষায় আর থাকিতে পারিতেছে না। পদ্মবনের আলোছায়ার খেলায় পুকুরটি আজ আর হাসিতেছে না, বিষণ্ণ আকাশের তলে সে আজ মুখ আঁধার করিয়া নিষ্ঠুরের মত পড়িয়া আছে, যেন তাহার শীতল জলের তলে গোপন কক্ষে মেনার্ডের জীবনের সব ছিন্ন আশা আর বিগত আনন্দের রাশি সে আজ নির্ম্মম নিয়তির মত লুকাইয়া রাখিয়াছে।

ইহার ফল তাঁহার নিজের ও অন্যের পক্ষে কি-রকম দুঃখময় হইবে সেই চিন্তাতেই তিনি তখন আকুল। প্রাসাদের সাম্‌নের সব জানালা বন্ধ, সব পরদা ফেলা, বাহিরের খবর স্যর ক্রিষ্টফারের পাইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই; তবু মিঃ গিল্‌ফিলের মনে হইতেছিল টিনার কথা তাঁহার কাছে বেশীক্ষণ গোপন থাকিবে না। এখনি অ্যান্টনির মৃত্যুর কারণের সন্ধান আরম্ভ হইবে; টিনারও ডাক পড়িবে; তাহা হইলেই বৃদ্ধ জমিদারকে সব কথা না জানাইয়া পার পাওয়া যাইবে না।

(১৮)

রাতটার সময় সব রকম খোঁজ করাই শেষ হইয়া গেল; সবই বৃথা। এদিকে "করোনার"ও প্রায় আসিয়া পড়িল

মিঃ গিল্‌ফিল্ ভাবিলেন, আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না; স্তর ক্রিষ্টফারকে এই নূতন অমঙ্গলের কথা শুনাইবার কঠিন কর্ত্তব্য তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে; না হইলে তিনি হঠাৎ কথাটা শুনিয়া ফেলিয়া আরো বেশী বেদনা পাইবেন।

জমিদার মহাশয় তাঁহার পোষাক পরিবার ঘরে বসিয়া ছিলেন; জানলার পরদাগুলো টানা, ঘরে একটু ম্লান আলো আসিতেছে। আজ ভোর হওয়ার পর তাঁহার সঙ্গে মিঃ গিল্‌ফিলের এই প্রথম দেখা; দেখিলেন একরাত্রির শোকে সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ যেন জরার কবলে পড়িয়া গিয়াছেন। কপালের ও মুখের রেখাগুলি গভীর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; মুখের রং কেমন যেন ঘোলা ঘোলা; চোখের তলা ফুলিয়া উঠিয়াছে, চোখের সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কোথায়! সবি শূন্য। দৃষ্টি যেন বর্ত্তমানকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপলব্ধি করিবার শক্তি আর নাই, কেবল অতীতের স্মৃতিটুকু জাগিয়া আছে। মেনার্ডকে দেখিয়া তিনি হাতখানা বাড়াইয়া দিলেন, মেনার্ড তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া পাশে বসিয়া পড়িলেন। এই নীরব সহানুভূতিতে স্তর ক্রিষ্টফারের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। চোখের জল আর বাধা মানে না, বড় বড় ফোঁটায় গড়াইয়া তাঁহার গালের উপর পড়িল, তিনি থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। সেই কোন্ কালে শিশুবয়সে কাঁদিয়াছিলেন, তাহার পর কতযুগ পরে আজ তাঁহার চোখের জল পড়িল, অ্যান্টনির জন্য।

মেনার্ডের মনে হইতেছিল, তাঁহার জিভটা যেন কে আঠা দিয়া মুখের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে। তিনি প্রথমে কথা বলিতে পারিলেন না; স্তর ক্রিষ্টফার আগে কিছু একটা কথা তুলিলে তবে তিনি সেই নিষ্ঠুর কথা শুনাইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

অবশেষে কোনো-রকমে নিজেকে একটু সামলাইয়া স্তর ক্রিষ্টফার অতি কষ্টে বলিলেন, "মেনার্ড, আমি বড় দুর্ব্বল—প্রার্থনা কর, ভগবান্ আমার সহায় হোন! আমাকে যে আবার কিছুতে এমন করে ভেঙে দিতে পারবে তা আমি ভাবিনি; আমি ওই ছেলেটার আশাতেই সব গড়ে তুলছিলাম। বোনকে ক্ষমা না করা বোধহয় আমার অন্যায় হয়েছিল। এই কদিন আগে তাঁরও একটি ছেলে ভগবান তুলে নিয়েছেন। আমি যে বড় জেদী, বড় অহঙ্কারী হয়ে উঠেছিলাম! অত সইবে কেন?"

মেনার্ড বলিলেন, "দুঃখ বেদনা না হলে যে আমাদের বিনয় ও প্রেমের শিক্ষা হয় না। ভগবান দেখ্‌ছেন যে আমাদের ব্যথা দেওয়াই এখন দরকার, তাই বেদনার ভার ক্রমেই ভারী করে তুলছেন। আজ সকালে আবার আমাদের এক নূতন বিপদ ঘটেছে।"

স্তর ক্রিষ্টফার চম্‌কাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "টিনা? টিনার অসুখ করেছে বুঝি?"

"তার সম্বন্ধে বড় ভীষণ সন্দেহে পড়েছি। কাল সে বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল—তার দুর্ব্বল শরীর—আমার ভয় হচ্ছে, অত বড় ঘায়ের ফলে না জানি কি ঘটেছে।"

"তার কি বিকার হয়েছে? আহা আমার বাছারে!"

"ভগবানই জানেন সে কেমন আছে। আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আজ সকালে তার ঘরে গিয়ে শার্প-গিন্নি ঘরে কাউকে পায়নি। রাত্রে সে শোয়নি পর্য্যন্ত। জামাটুপিও ঘরে নেই। আমি সব জায়গায় খোঁজ করেছি—বাড়ীতে, বাগানে, মাঠে, আর—আর—জলেও—। কাল সন্ধ্যা সাতটায় আগুন দিতে গিয়ে মার্থা তাকে ঘরে দেখেছিল, তারপর আর তাকে কেউ দেখেনি।"

মেনার্ড যখন কথা বলিতেছিলেন স্তর ক্রিষ্টফারের ব্যগ্র চোখ দুটি তখন আবার যেন আগেকার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছিল; কি একটা বেদনাময় ভাবের আবেশ যেন তাহাতে ফুটিয়া উঠিতেছিল; জলের ঢেউএর উপর যেমন কালো মেঘের ছায়া পড়ে তেমনি তাঁহার উত্তেজিত মুখের উপর দিয়া আর-একটা কি নূতন চিন্তার ছায়া দ্রুত চলিয়া গেল। মিঃ গিলফিল থামিলে তিনি তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া আরো মৃদু স্বরে বলিলেন,

"মেনার্ড, আমার সে দুঃখিনী মেয়ে কি অ্যান্টনিকে ভালবাসত?"

"হ্যাঁ, বাসত।"

এই কথা বলিয়া মেনার্ড যেন কেমন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, স্তর ক্রিষ্টফারকে আর বেশী গভীর ঘা দিতে তাঁহার নিতান্তই অনিচ্ছা, এদিকে টিনার প্রতি যাহাতে

কোনো অবিচার না হয় সেদিকেও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এই দুই চিন্তার মাঝখানে পড়িয়া তাঁহার মনে বিষম সংগ্রাম বাধিয়া উঠিতে লাগিল। স্তর ক্রিষ্টফারের দৃষ্টি তখন তাঁহার মুখের উপর জিজ্ঞাসুভাবে স্থাপিত, মেনার্ডের দৃষ্টি নামিয়া মাটিতে পড়িয়াছে; তিনি তখন কেমন করিয়া কি-রকম ভাষায় নিষ্ঠুর সত্যটাকে একটু মোলায়েম করিয়া বলিবেন সেই চিন্তায় মগ্ন।

শেষকালে অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "আপনি টিনার সম্বন্ধে কোনো অন্যায় ধারণা করবেন না। আজ আমি শুধু তারি জন্য আপনাকে যেসব কথা বলব, আর কোনো কারণে এজগতে সেকথা আমার মুখ থেকে বার হ'ত না। কাপ্তেন উইব্রোর তখন যে অবস্থা তাতে তিনি অনুচিতভাবে টিনাকে ভালবাসা দেখিয়ে তার হৃদয় অধিকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর বিবাহের কথাবার্ত্তা হবার আগে তিনি তার সঙ্গে প্রণয়ীর মত ব্যবহার করতেন।"

স্তর ক্রিষ্টফার মেনার্ডের হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি একেবারে নীরব রহিলেন; নিশ্চয়ই শান্তভাবে কথা বলিবার জন্য নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

আগে যেমন তিনি চট্ করিয়া সব কথার মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন, খানিকটা সেইরকম সুরেই শেষে বলিলেন, "আমার এখনি হেনরিয়াটার সঙ্গে দেখা করা দরকার; তাঁকে সব কথা বলতেই হবে; তবে আর-সকলের কাছ থেকে কথাটা যথাসম্ভব গোপন রাখতে হবে।"

তাহার পর একটু স্নেহকোমল সুরে বলিলেন, "বাবা, তোমারি উপর সকলের চেয়ে ভারী বোঝাটা পড়ল। থাক্, হয়ত এখনো তাকে পেতে পারি; একেবারে নিরাশ হওয়া উচিত নয়; নিশ্চয় করে কিছু বল্‌বার মতন সময় এখনো হয়নি। আহা অভাগিনী মেয়েটা! ভগবান আমার সহায় হোন। আমি মনে করতাম সবই দেখ্‌ছি, এদিকে অন্ধের মত ঘোর অন্ধকারেই দিন কাটিয়েছি।"

(১৯)

বিষণ্ণ নিরানন্দ একটি সপ্তাহ অতিধীরে কোনোপ্রকারে শেষ হইয়া গেল। অনুসন্ধানের ফলে "করোনার" বলিলেন, অ্যান্টনির মৃত্যু আকস্মিক। ডাক্তার হার্ট তাহার স্বাস্থ্যে সব খবরই রাখিতেন, তাঁহার মতে অনেক দিনের হৃদ্‌রোগের ফলে মৃত্যু উন্মুখ হইয়াই ছিল, তবে কোনো আকস্মিক উত্তেজনায় একটু আগেই ঘটিয়া গেল। একমাত্র মিস্ আশার ছাড়া আর কেহই অ্যান্টনির সেদিন সে সময়ে বাগানের ওই কোণের ঝোপে যাইবার ঠিক কারণটা জানিতেন না; কিন্তু তিনি টিনার নাম করেন নাই, অন্য সকলেও সব-রকম কষ্টকর প্রশ্ন প্রভৃতির হাত হইতে তাঁহাকে সযত্নে বাঁচাইয়াই চলিয়াছিল। মিঃ গিলফিল ও স্তর ক্রিষ্টফার যাহা জানিতেন, তাহাতে তাঁহারা বুঝিয়াইছিলেন যে টিনার সঙ্গে কোনো নির্দ্দিষ্ট সাক্ষাৎকারের অতিরিক্ত ভাবনাতেই এই উত্তেজনা ঘটিয়াছিল।

টিনাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল, আর টিনা আত্মহত্যা করিয়াছে এ কথাটা একরকম ধরিয়া লওয়াতে সব সন্ধান নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনাটা আরোই বাড়িয়া চলিল। সে যে দেরাজ হইতে ছোটখাটো জিনিষগুলি লইয়া গিয়াছিল, সেটা কেহই লক্ষ্য করিল না; ছবির কথা কেহ জানিতই না, মোহরগুলি যে সে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিত তাহাও সকলেরি অজ্ঞাতে, আর মুক্তার দুলজোড়া পরিয়া থাকা একটা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। লোকে ভাবিল, সে কিছু না লইয়াই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; সে যে বেশীদূরে যাইতে পারে একথা কেহ ভাবিতেই পারিল না; আর তাহার মনটা যে খুব উত্তেজিত আর বিচলিত ছিল সে বিষয়ে ত কোনো সন্দেহই নাই, কাজেই এক মরণের সাহায্যে মুক্তিলাভ ছাড়া আর সে কিসের সন্ধানে যাইতে পারে? প্রাসাদের চারিধারের মাইল চারেক জায়গাই বার বার করিয়া খোঁজ করা হইল—আশেপাশের কোনো পুকুর কোনো খানা কোনো ডোবাই বাদ পড়িল না।

মেনার্ড এক এক সময় ভাবিতেন শীতের প্রকোপ ও অবসাদের ফলে মৃত্যু বোধ হয় আপনি আসিয়া পড়িয়াছিল; তাই এমন একটা দিন যাইত না যেদিন তিনি গাঁয়ের যত ঝোপঝাড় বনবাদাড়ের শুক্‌নো পাতার গাদা উলোটপালট করিয়া পাগলের মত ঘুরিয়া না বেড়াইতেন, যেন টিনার মৃতদেহ ওই পাতার আড়ালেই ঢাকা

পড়িতে পারে! আর একটা ভীষণ সম্ভাবনাও তাঁহার মনে জাগিত—তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি বাড়ীর যত পোড়ো আর শূন্য ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—আর একবার দেখিয়া লইবার ইচ্ছা, যদিই কোনো আলমারী কি দরজা কি পর্দার আড়ালে তাহাকে পাওয়া যায়—হয় ত দেখিবেন তাহার চোখদুটি পাগলের মত, সে উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, চোখে পলক পড়ে না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতেও পাইতেছে না।

ক্রমে পাঁচটি দীর্ঘ দিন ও পাঁচটি দীর্ঘ রজনী কাটিয়া গেল, অ্যান্টনির কবর হইয়া গেল, গাড়ীগুলি গোরস্থান হইতে বাগানের পথে ফিরিতে লাগিল। যাত্রার সময় মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, এখন আস্তে-আস্তে মেঘ কাটিয়া ভিজে ডালের পাতায়-পাতায় সূর্য্যের আলো চক্‌চক্‌ করিয়া রাস্তার গাড়ীগুলির উপর প্রতিফলিত হইতেছিল। এই সময় দূরে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া একটি মানুষ কোনো-রকমে ধুঁকিতে ধুঁকিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার মুখের উপর এই আলোর রেখা পড়িতেছিল; লোকটি রোগা হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মিঃ গিলফিল চিনিলেন, এ সেই ড্যানিয়েল নট, দশ বৎসর আগে যে ডরকাসের গোলাপী গাল দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্রতি নূতন ঘটনাতেই মিঃ গিলফিলের মনে সেই একই কথা জাগিয়া উঠে; নটের উপর চোখ পড়িতে তিনি ভাবিলেন, "একি টিনার বিষয়ে কোনো খবর দিতে এসেছে?" মনে পড়িল, টিনা ডরকাসকে বড় ভালবাসিত, নট কোনো কারণে কখনো এখানে আসিলেই টিনা তাহার হাতে বন্ধুকে কিছু উপহার পাঠাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তবে কি টিনা ডরকাসের কাছে গিয়াছে? কিন্তু যেই মনে পড়িল নট হয়ত কাপ্তেন উইব্রোর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পুরাতন প্রভুকে দুঃখের দিনে একবার দেখিয়া যাইতে আসিয়াছে, অমনি তাঁহার হৃদয় নিরাশায় ম্লান হইয়া উঠিল।

গাড়ীটা আসিয়া বাড়ীর কাছে থামিতেই তিনি নামিয়া নিজের পড়িবার ঘরে গিয়া পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; তাঁহার শরীরটা কেমন দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল; নটের কাছে যাইতে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু পাছে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া আশার ক্ষীণ রেখাটুকুও লোপ পাইয়া যায় সেই ভয়ে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অমন শান্ত সৌম্য মূর্ত্তির দিকে এখন একবার তাকাইলেই বোঝা যায় যে গত একসপ্তাহের এই অসহ্য বেদনা মুখে গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। দিনের বেলা তিনি সারাদিনই ঘোড়ায় চড়িয়া কিম্বা পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়ান—কখন বা নিজে টিনার খোঁজ করেন, কখন বা অন্যকে খোঁজে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। রাত্রে চোখে ঘুম নাই—মাঝে মাঝে যা একটু তন্দ্রা আসে তাহাতে টিনার মৃত মুখখানিই কেবল দেখা দিয়া যায়; চম্‌কাইয়া জাগিয়া উঠিয়া মিথ্যা যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পান বটে, কিন্তু টিনাকে আর দেখিতে পাইবেন না এই বিশ্বাসের সত্য বেদনায় মন কাঁদিয়া উঠে। সেই উজ্জ্বল ধূসর চোখদুটি আজ বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টি কেমন যেন অস্থির। পূর্ণ ঠোঁটদুখানি যন্ত্রণায় শুকাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে; রেখাহীন পরিষ্কার কপাল বেদনায় শত রেখাময়। দুদিনের ভালবাসার পাত্রীকে ত তিনি হারান নাই। তিনি যাহাকে হারাইয়াছেন সে যে তাঁহার ভালবাসিবার শক্তির সঙ্গে বাঁধা; তাহাকে ভালবাসিয়াই তিনি ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। অতি শিশুকালে আমরা যে ছোট নদীটির ধারে যে ফুলগুলি লইয়া খেলা করিয়াছি, তাহারা যেমন করিয়া আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে জড়িত, তাঁহার প্রিয়া তাঁহার প্রণয়ের সঙ্গে তেমনি করিয়া জড়িত। টিনাকে ভালবাসা ছাড়া ভালবাসার আর কোন অর্থই তিনি জানেন না। আলো বাতাস যেমন করিয়া জগতের সর্ব্বঘটে থাকে, এই এত বৎসর ধরিয়া টিনার চিন্তা তাঁহার সকল চিন্তা সকল ভাবনার মধ্যে তেমনি করিয়া অণুতে-অণুতে জড়াইয়া গিয়াছে; আজ সে নাই, তাই মনে হইতেছে তাঁহার সকল আনন্দের আধারই আজ হারাইয়া গিয়াছে। আকাশ, বাতাস, ধরণী তেমনি আছে; রোজকার ভ্রমণ, হাসি গল্প, সবই থাকিতে পারে, কিন্তু এই-সকলের মূলে মাধুরীরূপে, আনন্দরূপে যে ছিল সে আর এজন্মে দেখা দিবে না।

ঘরের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে শুনিলেন বারান্দায় কাহার যেন পায়ের শব্দ; একটু পরেই কে আসিয়া দরজায় ঘা দিল। "ভিতরে এস" বলিতে তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল।

দরজা খুলিয়া ওয়ারেন ও ড্যানিয়েল নট ঘরে ঢুকিতেই নূতন আশার আনন্দ বেদনার মতই মনের মধ্যে ঘা দিয়া উঠিল।

"হুজুর, নট মিস্ সার্টির খবর নিয়ে এসেছে। আপনার কাছে আগে আনাই ঠিক মনে হ'ল, তাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম।"

মিঃ গিল্‌ফিল্ ছুটিয়া গিয়া পুরানো গাড়োয়ানের হাতখানা চাপিয়া না ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না; মুখ দিয়া কিন্তু কথা বাহির হইল না, ইসারায় তিনি তাহাকে একটা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিলেন। ওয়ারেন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যমরাজ্যের অতি ভীষণ-মূর্ত্তি দূতের কথা শুনিতে হইলে যেমন গম্ভীর যেমন উৎসুক হইয়া শোনা সম্ভব তেমনি আগ্রহের সহিত তিনি ড্যানিয়েলের গোল মুখখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার বাঁশীর মত সরু গলার কথাগুলি শুনিতেছিলেন।

"ঠাকুর, ডরকাসই ত' আমায় পাঠিয়ে দিলে; জমিদার-বাড়ীতে যে এত-সব কাণ্ড ঘটেছে, তার আমরা বিন্দু-বিসর্গও জানি না; মিস্ সার্টির অবস্থা দেখে ডরকাসের ত চোখ কপালে উঠে গেল; সে আজ সকালেই আমার কালা ঘোড়াটা জুতে চাষবাস ফেলে কর্ত্তা-গিন্নীকে খবর দিতে আসতে বল্লে। আপনি জানেন বোধ হয় এখন আমরা শ্লপেটারের সরাইখানা উঠিয়ে দিয়েছি;. বছর তিন আগে আমার এক মামা মারা যায়, সে আমায় কিছু জমি-জমা দিয়ে গেছে। ও-পাড়ার জমিদারদের নায়েব ছিলেন তিনি; তাঁর হাতে অনেক ক্ষেতখামার ছিল। বিঘে কয়েক জমি আর একটা ছোট খামারবাড়ী নিয়ে আমরা এখন চাষবাস করছি। ছেলেপিলের ঝঞ্চাটে পড়ে ডরকাস আর সরাইখানা রাখতে চাইলে না। কি চমৎকার জায়গা; দেখ্‌লে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে; বাড়ীর পেছনেই জল আছে, গরুবাছুরের খুব সুবিধে......"

মেনার্ড বলিলেন, "দোহাই ধর্ম্মের! মিস্ সার্টির কি হয়েছে, তাই বল। অন্য বাজে কথা আমায় এখন বল্‌তে হবে না।"

পুরোহিত মহাশয়ের অমন প্রচণ্ড আবেগে একটু ভড়্‌কাইয়া নট বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, বল্‌ছি, বল্‌ছি। বুধবার দিন রাত ন'টার সময় মাল-বোঝাই গা[ড়ী] গাড়ীতে চড়ে তিনি আমাদের বাড়ী আসেন; গাড়ী থাম[ার] শব্দ শুনেই ডরকাস ছুটে বেরিয়ে পড়ল; মিস্ সা[র্টি] এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে 'আমায় ঘরে নিয়ে চ[ল] ডরকাস, ঘরে নিয়ে চল,' বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন[।] ডরকাস 'ড্যানিয়েল' বলে ডাক দিতেই আমি ছুটে গি[য়ে] দিদিমণিকে ঘরে এনে শোয়ালাম। একটু পরে জ্ঞা[ন] হয়ে চোখ মেল্‌তেই ডরকাস দুধের সঙ্গে মদ মিশিয়ে খে[তে] দিলে। সরাই ছেড়ে আসবার সময় আমরা খুব ভা[ল] খানিকটা মদ এনেছিলাম, ডরকাস তা কাউকে এক[টু] ছুঁতেও দেয় না। সে বলে অসুখবিসুখের জন্যে তোল[া] থাক্। আমি ত বলি বাপু, অসুখের সময় মুখের স্বাদই ন[ষ্ট] হয়ে যায় তখন খেয়ে কি লাভ। ডাক্তারের ওষুধ খানিক[টা] খেলেই ত চলে। হাঁ, তারপর ডরকাস তাঁকে বিছানা[য়] এনে শোয়ালে, তখন থেকে সেই শুয়েই আছেন; কেম[ন] যেন বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই মনে হয়, কথাও ক'ন না; কেব[ল] ডরকাস নেহাৎ পীড়াপীড়ি করলে একটু কিছু খান[।] আমাদের ভারী ভয় হ'ল, কেন যে এবাড়ী ছেড়ে গেলে[ন] কিছুই বুঝলাম না; ডরকাস বল্‌ছিল, নিশ্চয় একটা কি[ছু] কাণ্ড ঘটেছে। আজ সকালে সে আর কোনো কথ[া] শুন্‌লে না, আমাকে না পাঠিয়ে ছাড়লেই না, কি হয়েছে দেখে যেতেই হবে; তাই কুড়ি মাইল ধরে কালার পিঠে চড়ে আস্‌ছি। লক্ষীছাড়াটা আবার এমন,—ভাবছে বুঝি ক্ষেত চষছে, তাই গজ ত্রিশেক যায় আর ঘুরে দাঁড়ায়, যেন আলের ধারে এসে পড়েছে। সত্যি, ঠাকুর, ওকে নিয়ে মহা বিপদেই পড়েছিলাম আর কি।"

নটের হাতখানা ধরিয়া জোরে নাড়া দিয়া মিঃ গিল্‌ফিল্ বলিলেন, "নট, তুমি এসেছ তাই রক্ষে; ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। এখন নীচে গিয়ে কিছু একটু মুখে দিয়ে বিশ্রাম করগে। আজ রাত্রে তুমি এখানেই থাকবে, তারপর একটু পরে আমায় তোমার বাড়ী যাবার সবচেয়ে সোজা রাস্তাটা বলে দিয়ো এখন। স্যর ক্রিষ্টফারকে খবরটা দিয়েই আমি সেখানে যাবার উদ্যোগ করছি।"

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মিঃ গিল্‌ফিল্ একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া শ্লপেটারের মাইল পাঁচেক দূরের

ক্যালাম গ্রামের পথে ছুটিলেন। পড়ন্ত সূর্য্যের আলো আবার তাঁহার চোখে আনন্দময় হইয়া দেখা দিল; গাছের ঝোপের পাশ দিয়া বাতাস কাটাইয়া সাঁ সাঁ করিয়া 'কিটি" ঘোড়াটাকে ছুটাইয়া চলিতে আজ আবার তাঁহার মনটা খুসী হইয়া উঠিল। টিনা মরে নাই; তাহার সন্ধান মিলিয়াছে; তাঁহার মনে হইল, তাঁহার ভালবাসার, তাঁহার স্নেহের, তাঁহার এ দীর্ঘকালের দুঃখবেদনার এত শক্তি; যে, তাহারা টিনাকে নূতন জীবন নূতন সুখ না দিয়া ছাড়িবে না। এক সপ্তাহের গভীর নিরাশার পরে একেবারে আজ আশার স্বর্গ বহিয়াছে; আর কি তাঁহার সীমাজ্ঞান থাকে, চূড়ান্ত সুখের স্বপ্নও তিনি আজ দেখিয়া লইলেন। ক্রমে টিনা তাঁহাকে ভালবাসিবে, সে একদিন একান্ত তাঁহারি হইবে। টিনাকে তাঁহার প্রেমের মূল্য দেখাইবার জন্যই তাঁহাদের এত কঠিন সংগ্রাম, এত দুঃখ শোক। এ বেদনা তাঁহার পরশমণি। টিনাকে— আদরের টিনাকে তিনি কত আদরে কত সোহাগে রাখিবেন। ঐ কালো চোখ দুটি, ঐ প্রেমে সঙ্গীতে মুখরিত মধুর সুধাকণ্ঠ যে তাঁহার টিনার; তাঁহারই ঘরে-ঘরে সে সুধা ঝরিতে থাকিবে। তাঁহার সবল বক্ষের আড়ালে পাপিয়া পাখীটি নিশ্চিন্তে থাকিবে; আহা, ছোট হৃদয়খানি এতদিন কত দুঃখ কত বেদনার ঘায়ে জর্জ্জরিত হইয়াছে, আর সে বেদনা বহিতে হইবে না।

সাহসী ও একনিষ্ঠ পুরুষের প্রেমে মাতৃস্নেহের মাধুরী মিশানো থাকে; শিশুরূপে মায়ের কোলে শুইয়া সে যে স্নেহদৃষ্টির আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠে, সেই স্নেহে সেই আশ্রয়ে সে তাহার প্রিয়াকে ঘিরিয়া রাখে।

ক্যালাম গ্রামে যখন তিনি পৌঁছিলেন, তখন গোধূলি হয়-হয়। পথে এক বাড়ী-মুখো শ্রান্ত মজুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, গির্জ্জার পাশেই ড্যানিয়েল নটের বাড়ী। একটা ঢালু জায়গার উপর আইভিলতায়-ঘেরা গির্জ্জার চূড়া দেখা যাইতেছিল; ড্যানিয়েলের বর্ণিত 'চোখ জুড়োনো' জায়গাটি চিনিবার পক্ষে এ চিহ্নটির খুবই দরকার, যদিও ছোট একটি ঘেসো জমির পরেই সোজা বাড়ীর দরজা দেখিলেই বাড়ীর বর্ণনাটা অনেকটা মিলিয়া যাইত।

গেটের ভিতর ঢুকিতেই একমাথা কোঁকড়া-চুলওয়ালা একটি বছর নয়ের ছেলে দৌড়িয়া আসিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ডরকাস আসিয়া দরজায় হাজির; তাহার কোলে একটি মোটাসোটা ছেলে একটা রুটির টুকরা হাতে করিয়া চুষিতে চুষিতে চারিদিকে তাকাইতেছে; আশে-পাশে আরো তিনটি শিশু দাঁড়াইয়া; তাহাদের টুকটুকে গালের আভায় ডরকাসের গোলাপী গাল দুটি আরো রাঙা দেখাইতেছে।

মিঃ গিলফিল ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া রাখিয়া ভিজে খড়ের গাদার উপর দিয়া আসিতেছিলেন; ডরকাস খুব নীচু হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনিই কি মিঃ গিলফিল?"

"হ্যাঁ, ডরকাস; তুমি আর এখন আমায় চিনবে না। মিস্ সার্টি কেমন আছেন?"

"ড্যানিয়েল আপনাকে যেমন বলেছে ঠিক্ তেমনিই; এক বিন্দুও কমেনি। আপনি নিশ্চয় সে বাড়ী থেকে আসছেন। আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি এসেছেন যা হোক।"

"হ্যাঁ, নট ওখানে একটায় পৌঁছেছে, তার পরেই আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়েছি। তাঁর অবস্থা আর খারাপ হয় নি ত?"

"কিছুই বদলায়নি, না ভাল, না মন্দ। একবার ভেতরে আসবেন না কি? সাতদিনের ছেলে যেমন কোনো দিকে না তাকিয়ে পড়ে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে পড়ে আছেন, আমাদের দিকে এমন করে তাকান যে কোনো দিন যে আমায় চিনতেন তা মনেই হয় না। মিঃ গিলফিল, কি হয়েছে বলুন না? বাড়ী ছেড়ে এমন করে চলে আসবার মানে কি? কর্ত্তা গিন্নি ভাল আছেন ত?"

"বড় বিপদ তাঁদের, ডরকাস। স্যর ক্রিষ্টফারের ভাগ্নে কাপ্তেন উইব্রোকে চেন ত? তিনি হঠাৎ মারা গেছেন। মিস সার্টি তাঁকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছেন। বোধ হয় তারি ধাক্কায় তাঁর মনে খুব চোট লেগেছে।"

"ওমা গো! সেই সুন্দর ছেলেটি! ড্যানিয়েল বলছিল বটে তিনি জমিদারীর মালিক হবেন। ছোট্ট বেলায় মামা-বাড়ীতে বেড়াতে আসতেন, দেখেছি মনে হচ্ছে। আহা গো! কর্ত্তা মশায় আর গিন্নিমার কি দুঃখ! কিন্তু বেচারী টিনাদিদির কি গেরো গো! মানুষটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখলে? মাগো, মা!"

যেসব খামারবাড়ীতে বসিবার ঘর থাকে না, সে-সব বাড়ীতে প্রায়ই দুটো রান্নাঘর থাকে, সাজানো গোছানো ভালটাতেই লোকজন বসে। ডরকাস সেই-রকম একখানা সুন্দর ঘরে মিঃ গিলফিলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। এক সারি ঝকঝকে দস্তার বাসনের উপর উনুনের আগুনের আলো পড়িয়া চকমক্ করিতেছিল। কাঠের টেবিলগুলি এমন মাজাঘসা যে দেখিলেই হাত বুলাইতে ইচ্ছা হয়; চিমনির এক কোণে একটা সিন্দুক, আর এক কোণে একটা তিনকোণা চেয়ার। তাহার পিছনে দেয়ালগুলিতে পর্দার মত করিয়া ঝুলানো টুক্‌রা টুক্‌রা মাংস। কড়ি হইতেও মাংস ঝুলিতেছে।

তিনকোণা চেয়ারটা ঠেলিয়া দিয়া ডরকাস বলিল, "বসুন। অনেকখানি পথ এসেছেন, আমি আপনার জন্যে একটু খাবার যোগাড় দেখি গিয়ে। বেকি, খোকাকে একটু ধরবি আয় ত।"

পাশের রান্নাঘর হইতে লাল-লাল হাত দুখানি বাড়াইয়া বেকি আসিয়া দাঁড়াইল। কোল বদল হওয়াতে খোকার কোনো হর্ষ কি বিষাদের ভাবই দেখা গেল না। সে বেশ নিশ্চিন্ত উদাসীন।

ডরকাস বলিল, "ঠাকুর, আপনি কি খাবেন বলুন; দেবার মত আমাদের ত কিছু নেই। এক চা আছে, দিতে পারি; আর একটু পরে মাংস রেঁধে আনছি। আপনি যা খান, তেমন জিনিস আমরা কিইবা দিতে পারি; তবে যা আছে তাই আপনাকে দিতে পারলে ধন্য হয়ে যাব।"

"ধন্যবাদ ডরকাস; আমি খেতে দেতে পারব না। আমার ক্ষিধেও পায়নি, ক্লান্তিও বোধ হচ্ছে না। টিনার কথা বল্‌বে এস। সে কি কথাবার্ত্তা কিছু বলেছিল?"

"সেই প্রথম কথাটির পরে আর একটিও বলেননি। 'ডরকাস, দিদি আমায় ঘরে নিয়ে চল' বলেই ত অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তারপর থেকে আর একটি কথা বলেননি। টুক্‌টাক্ একটু-একটু খাবার মাঝে-মাঝে নিয়ে দিতে যাই, তা একবার ফিরেও তাকান না।"

মায়ের আঁচল ধরিয়া ছোট একটি তিন বছরের মেয়ে সবিস্ময়ে নবাগত অতিথির দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ডরকাস আবার বলিতে লাগিল, "এই বেশিটাকেও মাঝেমাঝে একবার করে সঙ্গে নিয়ে যাই যদি ওকে দেখেও একটু ফিরে তাকায়। মানুষ যখন বেহুঁস হয়েও পড়ে থাকে তখনও দেখেছি আর কোনো জিনিষের দিকে না তাকাক ছোট ছেলেপিলের দিকে একবার তাকায়! বাগান থেকে জাফরান-ফুল তুলে ছিলাম, বেশি হাতে করে নিয়ে গিয়ে টিনা দিদির বিছানায় রাখলে। ছেলেবেলায় ও মেয়ে যে কি-রকম ফুল ভালবাসত তা ত আমি জানি! কিন্তু এখন এমনি ভাবেই তাকালেন যে মনে হ'ল বেশিকেও দেখতে পেলেন না ফুলগুলোকেও না। আহা ওঁর অমন চোখ দুটির দিকে তাকালে আমার বুক ফেটে আসে; অসুখে পড়ে যেন আরো বড় হয়ে গেছে। আমার যে খোকা সেবার মারা গেল, সে যখন অসুখে পড়ে তখন ঠিক অমনি করে তাকাত। একে দেখ্‌লেই আমার বাছার কথা মনে পড়ে। উঃ, তার হাত দুখানা যা হয়েছিল, অমন রোগা আমি দেখিনি! হাঁ, তা যাক্! আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনি সে-বাড়ী থেকে এসেছেন, আপনাকে দেখ্‌লে হয়ত একটু কিছু উপকার হতে পারে।"

মেনার্ডেরও সে আশা ছিল; কিন্তু এখন যেন তাঁহার একটু ভয়-ভয় করিতে লাগিল। টিনা বাঁচিয়া আছে শুনিয়া প্রথম কয়েক ঘণ্টা আনন্দে তিনি জগৎ জুড়িয়া কেবল আশার বাণীই শুনিতেছিলেন। সুখের সে নেশা কাটিয়া যাইতেই মনে হইল, এ কঠিন ঘা খাইয়া টিনার দুর্ব্বল দেহ মন আর কি সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিবে? ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি মনে হইতে লাগিল, টিনার ক্ষীণ প্রাণের শেষ রশ্মি এইবার নিভিয়া যাইবে।

কিছুক্ষণ পরে মেনার্ড বলিলেন, "ডরকাস, একবার গিয়ে দেখে এস ত এখন কেমন আছে। কিন্তু আমি যে এ বাড়ীতে এসেছি সে কথা যেন বলে ফেলো না। ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর দেখ্‌তে যাওয়াই বোধ হয় আমার পক্ষে ঠিক হবে; কিন্তু এমনভাবে অতক্ষণ কাটানোও যে শক্ত।"

বেশিকে কোল হইতে নামাইয়া ডরকাস চলিয়া গেল। আর তিনটি খোকাখুকী মেনার্ডের সামনে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত লাজুকের মত তাঁহাকে দেখিতেছিল। মা চলিয়া যাওয়াতে

তাহাদের লজ্জাটা আরো বাড়িয়া উঠিল। মিঃ গিলফিল বেশিকে টানিয়া হাঁটুর উপর বসাইলেন। মাথা নাড়িয়া চোখের উপর হইতে ঝাঁকড়া সোনালী চুলগুলা সরাইয়া দিয়া সে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,

"টুমি টিনা মাসীকে ডেখটে এসেছ? টুমি ওকে কঠা বলিয়ে ডেবে? টি টরবে টুমি? চুমু দেবে?"

"বেশি, তোমায় চুমু দিলে কেমন লাগে? বেশ, না?"

বেশি অত্যন্ত আপত্তি করিয়া মাথাটা খুব নীচু করিয়া বলিল, "ধাঃ।"

অতিথিকে বেশির সঙ্গে অমন মিষ্টি ব্যবহার করিতে দেখিয়া খোকাবাবুও সাহস পাইয়া বলিল, "আমাদের দুটো-কুকুরছানা আছে। তুমি দেখবে? একটার গায়ে কেমন শাদা-শাদা দাগ!"

"হ্যাঁ, আমি দেখব, আনো।"

খোকা ছুটিয়া গিয়া দুটি সদ্যোজাত কুকুরছানা লইয়া আসিল, সন্তানের মায়ায় কুকুরটাও পিছন-পিছন ছুটিয়া আসিল। রান্নাঘরে বেশ একটা বড়-রকম ব্যাপারের সূচনা হইয়া আসিতেছিল, ইতিমধ্যে ডরকাস ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

"কৈ? কিছু ত অন্যরকম দেখলাম না। আমি ত বলি, আপনার আর অপেক্ষা না করাই ভাল। সে চুপটি করে পড়ে আছে; সব সময়ই অমনি থাকে। আমি ঘরে দুটো বাতি দিয়ে এসেছি তাতে আপনাকে বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবে। আমার একটা টুপি তাঁকে পরিয়ে দিয়েছি, ঘরখানাও তেমন কিছু ভাল নয়; দয়া করে কিছু মনে করবেন না।"

মিঃ গিলফিল নীরবে মাথা নাড়িয়া তাহার সঙ্গে উপরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম দরজাটা সামনে পড়িতেই দুজনে ঢুকিয়া পড়িলেন, সান বাঁধানো মেজেয় তাহাদের পায়ের কোনো শব্দ হইল না। বিছানার মাথার দিকে লাল ছিটের মশারিটা ফেলা; বাতি দুটা ঘরের উল্টা দিকে এমন জায়গায় রাখা যাহাতে টিনার চোখের উপরে আলোটা না আসিয়া পড়ে। দরজাটা খুলিয়া ধরিয়াই ডরকাস খুব নীচু গলায় বলিল, "আমার না থাকাই ভাল, কি বলেন?"

মিঃ গিলফিল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া মশারির ওদিকে গিয়া দাঁড়াইলেন। টিনা অন্য দিকে চাহিয়া শুইয়া ছিল, ঘরে যে লোক ঢুকিয়াছে সে বোধ হয় তাহার কিছুই জানে না। তাহার চোখ দুটি সত্য-সত্যই আরো বড় হইয়া উঠিয়াছে; মুখখানা আরো ছোট ও রক্তহীন হইয়া উঠাতেই বোধ হয় চোখ বড় দেখাইতেছে। তাহার চুলগুলি সব জড়ো করিয়া ডরকাসের একটা পুরু টুপির তলায় ঢাকা। গায়ের কাপড়ের উপরে ছোট হাত দুখানি অলসভাবে পড়িয়া আছে; অমন যে রোগা হাত তাহাও আরো শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার বয়সের চেয়ে তাহাকে অনেক ছোট দেখাইতেছিল; অচেনা কোনো লোক তাহার ছোট মুখখানি ও হাত দুখানি দেখিলে মনে করিত দশ বারো বছরের ছোট একটি মেয়ে বুঝি সংসারের দুঃখশোকের হাতে পড়িবার আগেই বিদায় লইতেছে; দুঃখের দিনকে যে সে পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে একথা কাহারও মনে আসিত না।

মিঃ গিলফিল সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের কাছে দাড়াইতেই আলোটা আসিয়া ঠিক তাঁহার মুখের উপর পড়িল। টিনার চোখে কেমন একটু চকিত দৃষ্টি দেখা দিল; কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে হাতখানা তুলিল; বোধ হয় তাঁহাকে ইসারা করিয়া তাহার পর অতি ক্ষীণ কণ্ঠে "মেনার্ড!" বলিয়া একবার ডাকিল।

তিনি বিছানার উপর বসিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া রহিলেন। টিনা আবার বলিল,

"মেনার্ড, তুমি কি ছোরাটা দেখেছিলে?"

মুখে যে কথাটা প্রথম আসিল, তিনি তাহাই বলিলেন; তাহার ফলও ভাল হইয়াছিল। তিনি প্রায় টিনার কানে কানে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সেটা তোমার পকেটে পেয়েছিলাম, তারপর আলমারীতে যথাস্থানে ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছি।"

মেনার্ড টিনার হাত দুখানা সাদরে নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া তাহার দ্বিতীয় কথার আশায় বসিয়া রহিলেন। টিনা যে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে তাহাতেই তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। আনন্দে তাঁহার চোখ ঠেলিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল। টিনার চোখের দৃষ্টি ক্রমে

কোমল হইয়া আসিতে লাগিল। চোখদুটি ধীরে ধীরে জলে ভরিয়া উঠিল; তারপর বড়-বড় কয়েকফোঁটা অশ্রুজল তাহার গালের উপর ঝরিয়া পড়িল। এইবার বাঁধ টুটিয়া গেল; টিনার কান্না আর থামে না; অশ্রুর বন্যা বহাইয়া আজ সে তাহার ব্যথিত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে। এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবু টিনা কথা বলে না; যে গভীর দুঃখের বোঝা তাহার বুকে পাথরের মত চাপিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল, আজ কাঁদিয়া সে সেই পাষাণ গলাইবে। টিনার চক্ষের জল আজ মেনার্ডের চোখে অমূল্যনিধি! টিনার অশ্রুহীন শুষ্ক চোখের পাগলের মত জ্বালাময়ী দৃষ্টি কল্পনা করিয়া, মনে মনে তাহার সে পাগলিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি যে এতদিন ধরিয়া দিনের পর দিন কেবলি কাঁপিয়া উঠিয়াছেন।

ক্রমে টিনার কান্নার বেগ কমিয়া আসিল, নিশ্বাসের দ্রুত তাল ঢিমা হইয়া আসিল; সে তখন চোখদুটি বুজিয়া চুপচাপ করিয়া পড়িয়া রহিল। মেনার্ড তখনও ধীরভাবে সেইখানেই বসিয়া,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে পাখা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে সেদিকে দৃষ্টি নাই; সিঁড়ির উপরের পুরানো ঘড়িটা এই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একটানা স্রোতের মত ক্রমাগত টকটক করিয়া চলিয়াছে, সেদিকেও তাঁহার লক্ষ্য নাই। যখন দশটা বাজে, ডরকাস তখন আর বাহিরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। মিঃ গিলফিলের আগমনের ফল জানিবার জন্য তাহার মন ছটফট করিতেছিল; তাই আস্তে আস্তে পা টিপিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মিঃ গিলফিল বিছানা ছাড়িয়া না উঠিয়াই তাহার কানে কানে বলিলেন, "আমায় আর কয়েকটা বাতি দিয়ে আর রাখালটাকে ঘোড়াটার তদারক করতে বলে, তুমি শোও গিয়ে—আমিই রাতে টিনাকে দেখা শোনা করব—ভাল লক্ষণই দেখা দিয়েছে।"

অল্পক্ষণ পরেই টিনার ঠোঁটদুটি নড়িয়া উঠিল; অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে সে ডাকিল, "মেনার্ড"। তিনি মুখটা খুব নীচু করিয়া তাহার মুখের কাছে আনিয়া শুনিতে লাগিলেন। টিনা বলিল, "মেনার্ড, আমি যে কি ভীষণ পাপী তা তুমি জানো তাহ'লে, না? ছোরাটা দিয়ে আমি করতে গিয়েছিলাম কি জানো?"

"টিনা, তুমি কি আত্মহত্যা করবে ভেবেছিলে?"

টিনা আস্তে আস্তে ঘাড়টি নাড়িয়া আবার অনেকক্ষ নীরবে পড়িয়া রহিল। তারপর মেনার্ডের দিকে গভী অর্থপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া অতি মৃদুগলায় বলিল, "তাকে মা ভেবেছিলাম।"

"টিনা, তুমি একাজ কখনো করতে না। ভগবান তোম অন্তর মন দেখেছিলেন; তুমি যে কোনোদিন কো প্রাণীর এতটুকু অনিষ্ট করবে না, তা তিনি জানেন পরমেশ্বর তাঁর সন্তানদের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখেছে সমস্ত অন্তরের সঙ্গে যে কাজ না করবার জন্যে তা প্রার্থনা করছে, সে কাজ তাদের তিনি কখনই করে দেবেন না। মুহূর্ত্তের উন্মত্ত ক্রোধে তোমার মনে ও-চি এসেছিল, সেজন্য ভগবান তোমায় ক্ষমা করেছেন।"

"কিন্তু এইরকম পাপ-চিন্তা যে আমার মনে অনে কাল ছিল। নিজের দুঃখে আমি এমন অভিভূত হ গিয়েছিলাম বলেই ত আমি অত চটেছিলাম, তাই আমি মিস আশারকে অমন ঘৃণা করতাম, তাই আ অন্যের ভালমন্দের কথা একবার ভেবেও দেখিনি আমার মন পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার মত পাপী বোধ হয় আর কেউ কোনো কালে ছিল না।"

"না, না, টিনা, ঠিক অমনি পাপী আরো অনেক আছে আমার মনে কত সময় কত অন্যায় চিন্তা আসে, কত অন্যায় কাজ করবার জন্যে আমারও মনটা লুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার শরীরে যে তোমার চেয়ে শক্তি বেশী, তাই আমি মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে পারি, প্রলোভনকেও একটু ঠেকিয়ে রাখতে পারি। তারা আমায় ভাল করে অভিভূত করে ফেলতে পারে না। ছোট ছোট পাখীর ছানাগুলো যখন ভয় পায় কি রেগে ওঠে তখন তাদের সমস্ত পালকগুলো কেমন ফুলে ছড়িয়ে যায়, দেখেছ বোধ হয়; নিজেদের ওপর তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকে না; তখন খানা খন্দ যেখানে হোক সেখানেই তারা পড়ে মরে। তুমিও সেই অসহায় দুর্ব্বল ছোট পাখীগুলির মত। দুঃখকষ্ট তোমাকে এমনি পেয়ে বসেছিল যে তাদের হাতে পড়ে তুমি কি করেছ না-করেছ তা নিজেই ঠিক করতে পারনি।"

বেশী কথা বলিলে পাছে টিনা ক্লান্ত হইয়া পড়ে কি অনেক-রকম চিন্তার হাতে গিয়া পড়ে এই ভয়ে মেনার্ড আর কথা বলিলেন না। এক-একটি মনের ভাব সামান্য দুইচার কথায় ব্যক্ত করিবার জন্যই টিনাকে বেশ খানিকটা করিয়া বিশ্রাম দেওয়া দরকার হইতেছিল।

আবার কিছুক্ষণ পরে টিনা বলিল, "কাজটা যখন আমি করতেই গিয়েছিলাম, তখন আমার অপরাধটাত' করার সমানই হ'ল।"

মেনার্ড অতি শান্ত ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "না, না, টিনা তা হয়নি। আমরা এমন কত মন্দ কাজই করতে যাই যা আমাদের দ্বারা হওয়া কখনই সম্ভব নয়; আবার কত ভাল কাজও ত আছে যা আমাদের করবার ইচ্ছা হয় কিন্তু ক্ষমতায় কি বুদ্ধিতে কিছুতেই কুলিয়ে ওঠে না। মানুষ বাস্তবিক যা, তার চিন্তা অনেকসময়ই তার চেয়ে ঢের মহৎ কি ঢের নীচ হয়। সংসারের অন্য মানুষের মত ভগবান কিন্তু মানুষের বিচার তার সেই সাময়িক চিন্তা কি ভিন্ন ভিন্ন কাজ দিয়ে করেন না; তিনি আমাদের সমগ্র রূপটিকেই দেখেন। আমরা ত প্রতি মুহূর্ত্তেই পরস্পরের প্রতি অবিচার করছি, আমরা মানুষের খণ্ডরূপ দেখি বলে, তার চিন্তার কি কাজের এক-একটা মাত্র দিক দেখতে পাই বলে, তার যা ন্যায্য পাওনা সেটা ঠিক দিয়ে উঠতে পারি না, হয় তার চেয়ে অনেক বেশীই দিয়ে ফেলি, নয় অত্যন্ত অল্পই দি। আমরা আমাদের পরস্পরের পূর্ণ পরিচয় পাই না। কিন্তু ভগবান জানেন, তিনি তোমার অন্তরতম প্রদেশে ঢুকে দেখেছেন যে এত বড় অপরাধ তুমি কখনই করতে পারতে না।"

টিনা আস্তে আস্তে মাথাটি নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "পারতাম কি না জানি না; কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল সে যেন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে; সেই তার চিরপরিচিত মুখখানা আমার চোখের উপর ভেসে উঠছিল, আর আমি......আমি সে কাজটা করবই ত মনে করেছিলাম।"

"কিন্তু টিনা, তুমি যখন তাকে সত্যি-সত্যিই দেখ্‌লে —তখন কি হ'ল বল ত।"

"দেখলাম সে মাটির উপর শুয়ে পড়ে আছে, মনে হ'ল বোধ হয় অসুখ করেছে। ঠিক সেই সময়টা কি হ'ল জানি না; আমি সব ভুলে গেলাম। নীচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার সঙ্গে কথা কইলাম, আর সে—সে কিন্তু আমার দিকে একবারটি ফিরেও তাকাল না; তার চোখ দুটো তখন একেবারে স্থির। তাই মনে হ'ল, তবে বুঝি সে আর নেই।"

"আর তারপরে তোমার একবারও রাগ হয়নি।"

"না, না, একবারও না; আমারই ত অপরাধ সকলের চেয়ে বেশী; আগাগোড়া আমিই ত অন্যায় করে এসেছি।"

"না টিনা; সমস্ত অপরাধ তোমার নয়; সেও অন্যায় করেছিল। সেই ত তোমার রাগের ইন্ধন জুগিয়েছিল; অন্যায়ই ত অন্যায়কে জাগিয়ে তোলে। লোকে যখন আমাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে, তখন তাদের সম্বন্ধে আমাদের মনের মন্দ চিন্তাটাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু এই দ্বিতীয় অপরাধের তবু মার্জ্জনা আছে। টিনা, আমি তোমার চেয়ে পাপী; আমার মনে কাপ্তেন উইরোর সম্বন্ধে কতবার যে কত মন্দ চিন্তা জেগেছে তার ঠিক নেই; তোমাকে সে যেমন করে যন্ত্রণা দিয়েছে, আমাকে যদি তা দিত, তাহ'লে বোধ হয় আমি আরো বড়-রকম কিছু একটা করে বস্‌তাম।"

"না, না, সে এমন কিছু অন্যায় করেনি। তার ব্যবহারে আমি যে কতখানি ব্যথা পেতাম তা সে মোটে জানতই না। আমি তাকে যেমন করে ভালবাসতাম, সেও আমাকে তেমনি করে ভালবাসবে এও কি কখন সম্ভব? আর আমার মত একটা নগণ্য কুড়োনো মেয়েকেই বা সে কি করে বিয়ে করতে পারে?"

মেনার্ড এ কথার আর কোনো উত্তর দিলেন না, নীরবে বসিয়া রহিলেন; নীরবতা ভঙ্গ করিয়া টিনা আবার বলিল, "আর আমি কি-রকম প্রতারণাটাই না করেছি। আমি যে কতখানি মন্দ তা কেউ জানত না। ডাক্তারমশায় জানতেন না; তিনি আমায় আদর করে কত লক্ষ্মী সোনা বলে ডাকতেন; উঃ, তিনি যদি জানতেন, তবে না জানি আমায় কি মনে করতেন!"

"টিনা, আমাদের সকলেরই গোপন পাপ আছে; নিজেদের যদি ভাল করে চিনতাম তবে পরস্পরকে আর

আমরা এমন নিষ্ঠুরের মত বিচার করতাম না। এই দুঃখ পাওয়ার পর স্যর ক্রিষ্টফারও বুঝেছেন যে তিনি এতদিন বড় কঠিন ও বড় বিষম একগুঁয়ে ছিলেন।"

এই-রকম করিয়া—পাপ স্বীকার ও সান্ত্বনা-বাক্যের উত্তর প্রত্যুত্তরে—ঘণ্টাগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল, গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকার কাটিয়া ক্রমে শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপন দিয়া গেল, তারপর উষার প্রথম সোনালী কিরণ-রেখা মেঘের ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া গেল। মিঃ গিলফিলের মনে হইতেছিল, আজিকার এই রাত্রির দীর্ঘ জাগরণের মধ্য দিয়া যেন তাঁহার প্রেমের বাঁধন আরও দৃঢ় আরও পবিত্র হইয়া উঠিল; এ বন্ধন চিরদিনের মত একমাত্র টিনার দুয়ারেই তাঁহার হৃদয় বাঁধিয়া দিয়াছে, মানুষের যে সম্বন্ধ হৃদয়ের প্রীতি ও মমতার উপরই স্থাপিত তাহা এমনি করিয়াই দৃঢ় হইয়া উঠে। যে প্রেম স্মৃতি ও আশাকে আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া থাকে, প্রতি নূতন দিনের সুখ প্রতি নূতন রাত্রির দুঃখই তাহাকে নূতন খোরাক জোগাইয়া দেয়—চিরপুরাতন কথাই চিরদিন ধরিয়া শুনাইলেও এ প্রেমে শ্রান্তি আসে না, অভাবেই বাড়িতে থাকে; এ প্রেমে বিচ্ছিন্ন আনন্দ ব্যথারই সৃষ্টি করে।

উষার আগমন জানাইয়া মোরগ ডাকিতে আরম্ভ করিল; বাহিরের দরজা শব্দ করিয়া খুলিয়া গেল। উঠানে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। মিঃ গিলফিল বুঝিলেন ডরকাস উঠিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। শব্দগুলি বোধ হয় টিনাকেও একটু নাড়া দিয়াছিল, সে উদ্বিগ্নভাবে মেনার্ডের দিকে চাহিয়া বলিল, "মেনার্ড, তুমি কি চলে যাচ্ছ?"

"না, তুমি সেরে ওঠা পর্য্যন্ত আমি ক্যালামেই থাকব, তারপর তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।"

"না, না, সে বাড়ীতে আর না! আমি দীনহীন হয়ে থাকব, খেটে খাব, তবু আর সেখানে যাব না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, টিনামণির যা ইচ্ছা তাই হবে। কিন্তু লক্ষীটি এখন একটু ঘুমোও। চুপটি করে একটু বিশ্রাম করতে চেষ্টা কর, তারপর অল্পে অল্পে বসতে পারবে। এত দুঃখেও ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন; তাঁর এ দানের অপব্যবহার করলে পাপ হবে। টিনা আমার লক্ষী, তোমায় এ দানের মর্য্যাদা রাখতেই হবে;—একদিন ওদের খুকী বেসি তোমায় ফুল এনে দিয়েছিল, তুমি বেচারার দিকে ফিরেও তাকাওনি; এর পর যখন সে আসবে তখন নিশ্চয় তাকাবে, না টিনা?"

টিনা অতি ধীরভাবে ক্ষীণস্বরে বলিল, "চেষ্টা করব।" তারপর চোখ দুটি বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

এদিকে সূর্য্য দিকচক্রবালের সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়া তাহার হাসিমাখা উজ্জ্বল আলোয় মেঘ দূর করিয়া দিল। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো যখন জানালার ভিতর দিয়া ঘরে ছড়াইয়া পড়িল, তখন টিনা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মেনার্ড অতি যত্নে ছোট হাতখানি নিজের মুঠার ভিতর হইতে সরাইয়া বিছানায় রাখিয়া ডরকাসকে সুখবর দিলেন তাঁহার টিনা আবার সেই আগের টিনা হইয়া আসিতেছে। এই আনন্দে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া গ্রামের সরাইখানার দিকে চলিলেন।

যে-সকল স্মৃতির মধ্যে টিনা একেবারে ডুবিয়া ছিল মেনার্ড আসিয়া স্বভাবতই সেই-সব স্মৃতির মধ্যে একটা নাড়া দিয়া গেল; তাহাকে দেখিয়াই টিনার মনে নিজের বেদনার কথা বলিবার একটা ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। হৃদয়ের ব্যথার ভাগ লইবার মত ব্যথার-ব্যথী জুটিলে এ রোগের নিবৃত্তি হইতে দেরি হয় না। কিন্তু টিনার শরীর এতই দুর্ব্বল, মন এতই আহত, যে, অত্যন্ত সস্নেহ হৃদয়ঢালা যত্ন না হইলে তাহার সারিয়া উঠা শক্ত।

মেনার্ড মনে করিলেন, এইবার স্যর ক্রিষ্টফার ও লেডি শেভারেলকে খবর দেওয়া দরকার; তারপর চিঠি লিখিয়া বোনকে এইখানে আনাইতে হইবে, তাঁহার হাতে টিনার যত্নের ভার দেওয়াই ঠিক। টিনা যদি শেভারেল-প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেও চাহিত, তাহা হইলেও এ সময়ে সে-বাড়ীতে বাস তাহার হৃদয়-মনের অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেখানকার প্রত্যেক দৃশ্য প্রত্যেক জিনিষই তাহার হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে জড়িত; সে বেদনার এখনও কিছুমাত্র উপশম হয় নাই; দুঃখস্মৃতির অত আঘাত তাহাতে সহিবে না। মেনার্ডের স্নিগ্ধহৃদয়া শান্ত বোনটির সঙ্গে কিছুদিন বাস করিলে, তাহার শান্তিময় গৃহে তাহার আনন্দমূর্ত্তি শিশুটিকে লইয়া কিছু দিন কাটাইলে টিনা হয়ত আবার

নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে পারে; হয়ত ইহাতে তাহার দুর্ব্বল দেহ এ বিষম আঘাতের ফল হইতে খানিক-টাও সারিয়া যাইতে পারে। চিঠিপত্র লিখিয়া, তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া মেনার্ড আবার ঘোড়ায় চড়িয়া প্লপেটারের পথে চলিলেন;—সেখানে চিঠি ডাকে দিয়া, এমন একটি চিকিৎসকের সন্ধানে যাইতে হইবে যাহাকে টিনার অবস্থার মানসিক কারণগুলিও খুলিয়া বলা চলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

মুক্তিপথে

ওরে পাখী,—ওরে খাঁচার পাখী!
চাস্‌রে দিতে এমন কেন আপ্‌নারে তুই ফাঁকি?
কারায় চির বন্দী হ'তে,
না জানি তুই চাস কি মতে,
নীল আকাশের মুক্ত পথে ধায় না কেন আঁখি?
চাস্‌রে দিতে মিথ্যা কেন আপ্‌নারে তুই ফাঁকি?

গগন-ঘেরা গহন-মাঝে দেখরে ফিরে চেয়ে;
দিন-রজনীর আলো-আঁধার উঠ্‌ছে কি গান গেয়ে!
স্বাধীনতার সুরটি সেথায়,
গ্রহ তারা সব্‌কে মাতায়;
পত্রপুটের মর্ম্ম-কথায় যায় সে তোরে ডাকি'!
চাস্‌রে দিতে আজ্‌কে কেন আপ্‌নারে তুই ফাঁকি?

লোহার খাঁচায় রইলি বাঁধা, হায়রে হীনমতি!
কল্প-লোকের জল্পনারে সত্য ভেবে অতি।
প্রভাত-পবন হাতটি মেলে
বদ্ধ দুয়ার দিল ঠেলে;
তাও কিরে তুই বাঁধন ফেলে বাহির হবি না কি?
চাসরে দিতে হেলায় কেন আপ্‌নারে তুই ফাঁকি?

সোনার পাখা রইবে ঢাকা আজো কি তোর ওরে!
গান কি রে তোর নীরব রবে এই সিঁদুরে ভোরে?
অরুণ দেবের কিরীট-কিরণ,
আজ তোরে চায় কর্‌তে বরণ;
ওরে অলস-নিদ্র-নয়ন, আয় বাহিরে জাগি'!
চাসরে দিতে বৃথায় কেন আপনারে তুই ফাঁকি?

শ্রীমণিকান্ত হালদার।

স্ত্রীলোকের অধিকার

মানুষ যে-সকল রীতি, প্রথা ও আদর্শের সৃষ্টি করে, তাহারাই আবার মানুষকে পাইয়া বসে। যুগযুগান্তরের মধ্যেই বোধ হয় ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আজকালকার দিনেও ত আমরা মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের সমাজ, মানুষের ভাষা ও সাহিত্য, সকলের মধ্যে মানুষের অবস্থা দেখিতেছি। চীনা বালিকার জুতার মত তাহারা মানুষের পা দু'খানি বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মানুষ যে মানুষ, তাহার যে বাড়িবার কথা, একথা এই-সকল প্রথা ভুলাইয়া দেয়। তাহারা বলে একদিন যে কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা বদলাইব কি বলিয়া? তাহা হইলে যে অসঙ্গতি দোষ হইবে, মিথ্যাচরণ হইবে।

মানুষের উপর মানুষের সৃষ্টির এই যে অত্যাচার, তাহা আমাদের এই দুইদিনের সংস্কারকেও ছাড়িয়া দেয় নাই। কারণ কাল যে-শিশুর বয়স একদিন মাত্র ছিল, আজ সে শিশু থাকিলেও দুই দিনের হইয়াছে। একদিন আর তাহার সত্য বয়স বলে না, দুই দিনই বলে। কাজেই কালকার সংস্কার আজ আর খাটে না।

একদিন ছিল যে-দিন আমাদের সামান্য কাজগুলিকেও বাহবা দেওয়া চলিত। কিন্তু সে-দিন অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া না গেলেও গোধূলির ম্লান আলোয় ঢাকিয়া আসিতেছে।

আমাদের মেয়েদের কাল্পনিক ও কথার আদর্শ সংস্কারের প্রথম দিন হইতেই খুব উঁচু ছিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র তখন এত নীচে যে সে আদর্শ খাটাইতে গেলে তাহা কতকটা দুর্ভিক্ষপীড়িতকে পঞ্চাশ্ ব্যঞ্জন সাজাইয়া দেওয়ার মতন হইত। এই ভয়ে আমরা দুই মুঠার বেশী দিতে পারিলাম না। তখনকার মত আদর্শটাকে খাটো করিয়া লইলাম, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কল্পনার উঁচু আদর্শটি অস্ত যাইবার যোগাড় করিল।

এই সামান্য সংস্কারকে আমরা উচ্চশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার, প্রভৃতি কত নাম দিলাম। এবং তাহার ফল যাহা পাইলাম তাহাকেই পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম ফল মনে করিয়া কেহ বা খুব বাহবা দিতে

লাগিলাম, আর কেহ বা ইহাদের কাছে আর বেশী কিছু আশা করা যায় না বলিয়া অবহেলা করিয়া চলিয়া গেলাম। যেন সকলের এবং সকল বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। আর যে দুর্ভিক্ষপীড়িত দুই মুষ্টি অন্ন পাইয়া ধন্য হইয়াছিল সেও সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। যে অজস্র প্রশংসা পাইল, সে মনে করিল, আমার কান্তি, শক্তি, সৌন্দর্য্য সকলেরই বুঝি চরম হইয়াছে; সে যে কঙ্কাল মাত্র, সেকথা একবার ভাবিল না, তাহার ক্ষুধা মরিয়া গেল, সে অন্যান্য কঙ্কালের সঙ্গে মিশিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া রহিল; তাহারই মধ্যে দুই-একজন হয়ত স্বপ্নে অমৃতের আস্বাদ পাইয়া তাহা খুঁজিতে উঠিল। আবার যে অবহেলা ও তাচ্ছিল্য পাইল, সে মনে করিল আমাকে দিয়া বুঝি তবে কিছুই হইবে না; কেন মিথ্যা ভাবিয়া মরি, তাহার চেয়ে ঘুমাইয়া দিনগুলা কাটাই না কেন।

এই অবহেলা ও প্রশংসার সম্পর্ক অতি নিকট। এই প্রশংসার মধ্যে বাস্তবিক সম্মান কিছুই নাই। যাহার কাছে মানুষ কিছুই আশা করে না, দেখা যায় যে তাহার কাছে সামান্য কিছু পাইলেই সে ধন্য ধন্য করে। ভিখারীর দানের এত সম্মান কেবল সে ভিখারী বলিয়াই, স্বর্ণভাণ্ডার বিলাইয়াছে বলিয়া নয়।

হইতে পারে আমাদের দিবার তেমন কিছু নাই; ভাবিবার তেমন শক্তিই নাই। একথা না হয় মানিয়াই লইলাম; কিন্তু উপার্জ্জন করিতে পারিলে যে আমাদের সম্পদ্ আরো অনেক বাড়িবে একথা নিশ্চয়। সেই উপার্জ্জনের অন্তরায় এই অযথা প্রশংসা বা তাচ্ছিল্যের সম্মান।

আমরা যদি সামান্য একটা পরীক্ষা পাশ করি, তাহা হইলে এক-একখানা খবরের কাগজে দশবার দশ-রকম করিয়া তাহার জয়গান বাহির হইবে। যদি একসঙ্গে ঘরের কাজ ও ইস্কুলের দশখানা বই মুখস্থ করিতে পারি, তাহা হইলে ত আদর্শ রমণীই হইয়া গেলাম। আর আমাদের জোড়াই বোধ হয় জগতে মিলিবে না। যদি একটি মেয়ে কোন একটি ভাল কাজ করেন, তবে আমাদের সকলের স্ত্রীজন্মই সার্থক হইল বলিয়া মনে করি। শিক্ষা সাঙ্গ হইলে যদি সুগৃহিণী সাজিয়া বাড়ীঘর গুছাইয়া রাখিতে পারি, তবে আর আমাদের কাছে অন্যেরও কিছু চাহিবার নাই। আমাদের নিজেদেরও ভাবিবার কিছু নাই, উপরি যদি কিছু পারি তবে সে দেবতার বিশেষ দান। যে গৃহিণী না হইবে তাহার আর কিছু হইবার করিবার কি ভাবিবার দরকার নাই; বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইলেই হইল। শিক্ষয়িত্রীর মত শিক্ষয়িত্রী হওয়াটা অবশ্য সৌভাগ্যের কথা; কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহার নাকে কানে চোখে ঠুলি দিয়া ও হাতপাগুলা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। অথবা শিক্ষয়িত্রী না হইলেই মোক্ষলাভের কিছু অসুবিধা হইবে?

কেহ বলিতে পারেন, বেশ ত, ইহাতে যদি তোমরা সন্তুষ্ট না হও, আরো জ্ঞানলাভ করিতে পার, গভীর বিষয়ে চিন্তা করিতে পার, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নানা সমস্যার পূরণের সহায়তা করিতে পার। পথ ত পড়িয়াই আছে। আমার বিশ্বাস, পথ যতটা পড়িয়া থাকা উচিত, ততটা মোটেই নাই। পথের সীমা যত দূরেই দাও না কেন, তাহাও ত কেহ অতিক্রম করিতে পারে। সেই একজনই বা বাধা পাইবে কেন? একথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু ওই যে পথের আরম্ভেই দরজার কাছে মিথ্যা প্রশংসা সিদ্ধির রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে যে সকলের বড় বাধা। তাহার হাতের দান তৃপ্তি, অতৃপ্তি নয়। এই তৃপ্তিই আমাদের গতি বন্ধ করিয়াছে, চিন্তার প্রবাহ নষ্ট করিয়া এক জায়গায় খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের আদর্শ, আমাদের সম্বন্ধে অপরের আদর্শ বাস্তবিক উঁচু হইলে এই প্রশংসার গান যখন-তখন এমন তুচ্ছ কারণে শুনিতে হইত না।

বৈচিত্র্যেই জগতের সৌন্দর্য্য। জগতে প্রত্যেক মানুষের মুখশ্রীর মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বিভিন্নরূপের খেলা চলিয়াছে; তাহাদের অন্তরের মধ্যেও নানা চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। তাহাদের অসংখ্য রূপই তাহাদের সৌন্দর্য্য।

এই বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্যও আছে। বৈচিত্র্যের মিলনেই সেই সামঞ্জস্যের পথ গড়িয়া উঠে। অসংখ্য মানুষের চিন্তার আদানপ্রদান তাহার উপায়। আধুনিক যুগে তাহার চেষ্টা খুব চলিয়াছে। International Races Congress প্রভৃতি এই চেষ্টারই ফল। কিন্তু সেই-সকলে

জগতের সমস্ত মানুষের মিলনের সুযোগ হয় না এবং সকলের মিলন আজ পর্য্যন্ত সম্ভবও হয় নাই। অথচ কোন-না-কোন-প্রকারে সেটা যতদূর সাধ্য সম্ভবপর করিতে পারিলেই লাভ। কারণ পূর্ণ ও অপূর্ণ, অস্ফুট ও পরিস্ফুট, উন্নত ও হীন, সকল-রকম চিন্তার মিলনই এই সামঞ্জস্যের উপাদান। এই আদানপ্রদানেই অপূর্ণ চিন্তা পূর্ণ হইয়া উঠে, বিশৃঙ্খল চিন্তায় শৃঙ্খলা আসে, অনুন্নত উন্নতের সাহায্য পায়, উন্নত অনুন্নতের অভাব বোঝে। যাহার দিবার সে দিয়া যায়, যাহার লইবার সে লইয়া যায়। যে কিছুই চায় না সেও চিন্তার আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে শেখে। তাহার কিছু ভাবিবার আছে কি না অন্তত তাহার খোঁজ করে। ইহাতেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে। তাহার আদর্শও উঁচু হইয়া উঠে।

স্ত্রীপুরুষ সকলেই যখন মানুষ, তখন পুরুষের চিন্তার সহিত পুরুষের চিন্তার সংস্পর্শে যেমন পুরুষ গড়িয়া উঠে, স্ত্রীজাতির চিন্তার সঙ্গে স্ত্রীজাতির চিন্তার মিলনে যেমন স্ত্রীজাতি গড়িয়া উঠে, স্ত্রীপুরুষের চিন্তার আদানপ্রদানে তেমনিই পূর্ণ মানুষ গড়িয়া উঠে। মেয়েদের এবং পুরুষদের কার্য্যক্ষেত্র ও চিন্তার ক্ষেত্রের মধ্যে সকল বিষয়ে যখন খুব পরিষ্কার কোন গণ্ডী টানা নাই, তখন তাহাদের পরস্পরের চিন্তার মিলনেই তাহারা নিজেদের খাঁটি রূপ পায় এবং নিজেদের ক্ষেত্র বুঝিয়া লয়, এবং আদর্শকে চিনিতে শিখে।

শ্রীশান্তা দেবী।

আমার ধর্ম্ম

সকল মানুষেরই "আমার ধর্ম্ম" বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃষ্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে-ধর্ম্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে, সে হয় ত সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্ম্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।

কোন্ ধর্ম্মটি তার? যে-ধর্ম্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলচে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণ-ধর্ম্ম। সেই প্রাণধর্ম্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর-একটি প্রাণ আছে সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে বড়—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনী-শক্তিই হচ্চে তার ধর্ম্ম। এই জন্যে আমাদের ভাষায় ধর্ম্ম শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্চে জলের ধর্ম্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্চে আগুনের ধর্ম্ম। তেমনি মানুষের ধর্ম্মটিই হচ্চে তার অন্তরতম সত্য।

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে, আবার সেইসঙ্গে তার একটি বিশেষরূপ আছে। সেইটেই হচ্চে তার বিশেষ ধর্ম্ম। সেইখানেই সে-ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করচে। সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী। এইজন্যে এ'কে সম্পূর্ণ নষ্ট করবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমি সাম্যনীতিকে যতই মানিনে কেন, তবু অন্য সকলের সঙ্গে আমার চেহারার বৈষম্যকে আমি কোনোমতেই লুপ্ত করতে পারিনে। তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে' আমি যতই মনে করি না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্ম্মের, তবু আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্ম্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করচে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্য্যামীর বিশেষ আনন্দ।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেচি যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম—সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাজে আমার ধর্ম্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাগড়ি। কিন্তু যেটা আমার মাথার ভিতরকার মগজ, যেটা অদৃশ্য, সে-পরিচয়টি আমার অন্তর্য্যামীর কাছে ব্যক্ত, হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যদি বলে তার উপরকার প্রাণময় রহস্যের আবরণ ফুটো হয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে, এমন কি তার উপাদান বিশ্লেষণ করে তাকে যদি বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ করে দেয়, তাহলে চমকে উঠতে হয়।

আমার সেই অবস্থা হয়েচে। সম্প্রতি কোনো কাগজে একটি সমালোচনা বেরিয়েচে। তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, এবং সেই তত্ত্বটি একটি বিশেষ শ্রেণীর।

হঠাৎ কেউ যদি আমাকে বলত আমার প্রেতমূর্ত্তিটা দেখা যাচ্চে তাহলে সেটা যেমন একটা ভাবনার কথা হত এও তার চেয়ে কম নয়। কেননা মানুষের মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ না হলে প্রেতলীলা সুরু হয় না। আমার প্রেতটি দেখা দিয়েছে এ কথা বল্লে এই বোঝায় যে, আমার বর্ত্তমান আমার পক্ষে আর সত্য নয়, আমার অতীতটাই আমার পক্ষে একমাত্র সত্য। আমার ধর্ম্ম আমার জীবনের মূলে। সেই জীবন এখনো চলচে—কিন্তু মাঝে থেকে কোনো এক সময়ে তার ধর্ম্মটা এমনি থেমে গিয়েচে যে, তার উপরে টিকিট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যায়, এই সংবাদটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অন্য-একটি কাগজে অন্য একজন লেখক আমার রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচা বয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টান্তস্বরূপ চেপে ধরে তিনি তাঁর ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে আমি থামিনি, সেখানে আমি থেমেচি, এমন ভাবের একটা ফটোগ্রাফ তুললে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চলতি ঘোড়ার আকাশে-পা-তোলা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে। এই জন্যে চলার ছবি ফোটোগ্রাফে হাস্যকর হয়, কেবলমাত্র আর্টিষ্টের তুলিতেই তার রূপ ধরা পড়ে।

কিন্তু কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। হয়ত যার মূলটা চেতনার অগোচরে, তার ডগার দিকের কোনো-একটা প্রকাশ বাইরে দৃশ্যমান হয়েচে। সেই-রকম দৃশ্যমান হবামাত্র বাইরের জগতের সঙ্গে তার একটা ব্যবহার আরম্ভ হয়েচে। যখনি সেই ব্যবহার আরম্ভ হয়, তখনি জগৎ আপনার কাজের সুবিধার জন্যে তাকে কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্নে চিহ্নিত করে তবে নিশ্চিন্ত হয়। নইলে তার দাম ঠিক করা, বা প্রয়োজন ঠিক করা চলে না।

বাইরের জগতে মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা।

বাইরের এই পরিচয়টি যদি তার ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোনো অংশে না মেলে তাহলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। কেননা মানুষ যে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে যা জানে সেই জানার মধ্যেও সে অনেকখানি আছে। আপনাকে জানো এই কথাটাই শেষ কথা নয়, আপনাকে জানাও এটাও খুব বড় কথা। সেই আপনাকে জানাবার চেষ্টা জগৎজুড়ে রয়েছে। আমার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মতত্ত্বও নিজের মধ্যে নিজেকে ধারণ করে রাখতে পারে না—নিশ্চয়ই আমার গোচরে ও অগোচরে নানা-রকম করে বাইরে নিজেকে জানিয়ে চলেছে।

এই জানিয়ে চলার কোনোদিন শেষ নেই। এর মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তাহলে মৃত্যুর পরেও শেষ হবে না। অতএব চুপ করে গেলে ক্ষতি কি, এমন কথা উঠতে পারে। নিজের কাব্যপরিচয় সম্বন্ধে ত চুপ করেই সকল কথা সহ্য করতে হয়। তার কারণ, সেটা রুচির কথা। রুচির প্রমাণ তর্কে হতে পারে না। রুচির প্রমাণ কালে। কালের ধৈর্য্য অসীম, রুচিকেও তার অনুসরণ করতে হয়। নিজের সমস্ত পাওনা সে নগদ আদায় করবার আশা করতে পারে না। কিন্তু যদি আমার কোনো একটা ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে তবে তার পরিচয় সম্বন্ধে কোনো ভুল রেখে দেওয়া নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা। কারণ যেটা নিয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার চল্‌চে, যার প্রয়োজন এবং মূল্য সত্যভাবে স্থির হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে কোনো যাচনদার যদি এমন কিছু বলেন, যা আমার মতে সঙ্গত নয়, তবে চুপ করে গেলে নিতান্ত অবিনয় হবে।

অবশ্য একথা মানতে হবে যে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা-কিছু প্রকাশ সে হচ্চে পথ-চল্‌তি পথিকের নোট-বইয়ের টোকা কথার মত। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোনো কথা বলেচেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিনি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে-উঠতে বেড়ে চল্‌তে-চল্‌তে নানা রচনায় নিজের যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেচে সেইগুলিই হচ্চে তার পরিচয়ের উপকরণ। এমন অবস্থায় মুস্কিল এই যে, এই উপকরণগুলিকে সমগ্র করে তোলবার সময় কে কোন্‌গুলিকে মুড়োর দিকে বা ল্যাজার দিকে কেমন করে সাজাবেন সে তাঁর নিজের সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

অন্যে যেমন হয় তা করুন, কিন্তু আমিও এই উপকরণগুলিকে নিজের হাতে জোড়া দিয়ে দেখতে চাই এর থেকে কোন্ ছবিটি ফুটে বেরয়।

কথা উঠেছে আমার ধর্ম্ম বাঁশির তানেই মোহিত; তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের জন্যেও দরকার।

কারো কারো পক্ষে ধর্ম্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্র পথ। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এমন একটা ছুটি নেওয়া যে ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন কি, গৌরব আছে। অর্থাৎ সংসার থেকে জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্ম্মের দায় চোকে, ধর্ম্মের নামে সেই-সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও আছেন। তাঁরা সংসারের কতকগুলি বিশেষ রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে নিয়ে তাই পান করে জগতের আর-সমস্ত ভুলে থাকতে চান। অর্থাৎ এক দল এমন একটি শান্তি চান, যে-শান্তি সংসারকে বাদ দিয়ে; আর অন্য দল এমন একটি স্বর্গ চান যে স্বর্গ সংসারকে ভুলে গিয়ে। এই দুই দলই পালাবার পথকেই ধর্ম্মের পথ বলে মনে করেন।

আবার এমন দলও আছেন যাঁরা সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকে ধর্ম্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সে পরম অর্থটি পাওয়া যায় না, যে-অর্থ তাকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত করে এবং সকলদিকে অতিক্রম করে বিরাজ করচে। অতএব কোনো অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু সর্ব্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থটিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম্ম বলে জানেন।

ইস্কুল পালানোর দুটো লক্ষ্য থাকতে পারে। এক, কিছু না করা আর এক, মনের মত খেলা করা। ইস্কুলের মধ্যে যে-একটা সাধনা দুঃখ আছে সেইটে থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই এমন করে প্রাচীর লঙ্ঘন, এমন করে দরোয়ানকে ঘুষ দেওয়া। কিন্তু আবার ঐ সাধনা দুঃখকে স্বীকার করবারও দু'রকম দিক আছে। একদল ছেলে আছে তারা নিয়মকে শাসনের ভয়ে মানে, আরেক দল ছেলে অভ্যস্ত নিয়ম পালনটাতেই আশ্রয় পায়। তারা প্রতিদিন ঠিক দস্তুরমত ঠিক সময়মত উপরওয়ালার আদেশমত যন্ত্রবৎ কাজ করে' যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় এবং তাতে যেন একটা-কিছু লাভ হল বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কিন্তু এই দুই দলেরই ছেলে নিয়মকেই চরম বলে দেখে—তার বাইরে কিছুকে দেখে না।

কিন্তু এমন ছেলেও আছে ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন কি, আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেচে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানচে বলেই সে যে মুহূর্ত্তে দুঃখকে পাচ্চে সেই মুহূর্ত্তে দুঃখকে অতিক্রম করচে, যে-মুহূর্ত্তে নিয়মকে মানচে সেই মুহূর্ত্তে তার মন তার থেকে মুক্তিলাভ করচে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি, সাধনা থেকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি হচ্চে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার একটি আনন্দচ্ছবি এই ছেলেটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্চে বলেই উপস্থিত সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে সমস্ত দুঃখকে সমস্ত বন্ধনকে সে সেই আনন্দেরই অন্তর্গত করে জানচে। এ ছেলের পক্ষে পালানো একেবারে অসম্ভব। তার যে-আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে সে আনন্দ কিছু না করার চেয়ে বড়, সে-আনন্দ খেলা করার চেয়ে বড়। সে আনন্দ শান্তির চেয়ে বড়, সে-আনন্দ বাঁশির তানের চেয়ে বড়।

এখন কথা হচ্চে এই যে, আমি কোন্ ধর্ম্মকে স্বীকার করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি যখন "আমার ধর্ম্ম" কথাটা ব্যবহার করি তখন তার মানে এ নয় যে আমি কোনো একটা বিশেষ ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করেছি। যে বলে আমি খৃষ্টান সে যে খৃষ্টের অনুরূপ হতে পেরেচে তা নয়—তার ব্যবহারে প্রত্যহ খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা বিস্তর দেখা যায়। আমার কর্ম্ম, আমার বাক্য কখনো আমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে চলে না এত বড় মিথ্যা কথা বল্‌তে আমি চাইনে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমার ধর্ম্মের আদর্শটি কি?

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা জায়গাতেই আছে। অন্তরেও যখন নিজেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অন্তরাত্মা বলে—আমি ত কিছুকেই ছাড়বার পক্ষপাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ।

"আমি যে সব নিতে চাইরে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।"

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক, তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে

আপনি হনন করত। অতএব সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিল দিয়ে একটা ঘরগড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুল্‌লে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এক সময়ে মানুষ ঘরে বসে ঠিক করেছিল যে পৃথিবী একটা পদ্মফুলের মত তার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্ব্বতটি যেন বীজকোষ—চারিদিকে এক একটি পাপড়ির মত এক-একটি মহাদেশ প্রসারিত। এ-রকম কল্পনা করবার মূল কথাটা হচ্চে এই যে, সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখ্‌তে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে' এবং অতিক্রম করে'—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান করে' তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে' পৃথিবীটি বস্তুতঃ যেমন,—অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জান্‌বার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘরগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশী, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করিনে।

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্য্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দ্দার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র ছায়ার ঘাত-প্রতিঘাত তখন তার জন্যে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্ম্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্চে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তং, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যং।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সেদিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনই ঘট্‌তে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড় মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়-আমির সঙ্গে আমরা মিল্‌তে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড় পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্ম্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোট-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখ শোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে, তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাইনে, তখন প্রাণপণে কেবলি সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখিনে, ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে—তখন

> শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
> সরমের ডালি,
> নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
> ধূমাঙ্কিত কালী।

এই বড়-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগ্‌ল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, "সোনার তরীর" "বিশ্বনৃত্যে"।

> বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
> কে বাজাবে সেই বাজনা,
> উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
> বিস্মৃত হবে আপনা।
> টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
> নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
> হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
> জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ সুর মন্দ্র বটে কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক্, কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠ্‌চে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করচে। তাই ঐ কবিতাতেই আছে:—

> ঐ কে বাজায় দিবস নিশায়
> বসি অন্তর-আসনে
> কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
> কেহ শোনে কেহ না শোনে।
> অর্থ কি তার ভাবিয়া না পাই,
> কত জ্ঞানী গুণী চিন্তিছে তাই,
> মহান্ মানব-মানস সদাই
> উঠে পড়ে তারি শাসনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করে দুর্গমবন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করচেন এখানে তাঁরি কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

কিন্তু বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে-ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্চে সেই ঐক্যটি কি? সেটি হচ্চে শিবং। এই যে মঙ্গল, এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুইভাগ হয়ে বাড়্‌তে চলেচে, সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল, সেটি এক, সেটি শান্তং, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধ্‌ল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।". কিন্তু এই বড় বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্ম্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্ব-প্রকৃতির বৃহৎ শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে নৈবেদ্যের দুটি কবিতায় এ কথা বলা আছে।

১।

> মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্যক্ষীররস
> পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,
> তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাব-রসরাশি
> কৈশোরে করেছি পান; বাজায়েছি বাঁশি
> প্রমত্ত পঞ্চম সুরে, প্রকৃতির বুকে
> লালন-ললিত চিত্তে শিশুসম সুখে
> ছিনু শুয়ে; প্রভাত শর্ব্বরী সন্ধ্যাবধূ
> নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
> পুষ্পগন্ধে মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ,
> সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
> প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়া থাকে দূরে
> কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
> এবার এনেছ মোরে,—দাও চিত্তে বল,
> দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল।

২।

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলঙ্কাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি'
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
কর মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি "চিত্রায়" "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েচে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ।

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি?
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার-সীমা!

মাধুর্য্যের যে শান্তি, এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়। এ কবিতায় যার অভিসার সে কে?

কে সে? জানিনা কে! চিনি নাই তারে,—
শুধু এইটুকু জানি,—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে;
সর্ব্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন,
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

এর পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্য্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে-আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে ত বাঁশির ললিত সুরে নয়। তাই সেই সুরের জবাবেই আছে,—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্ত-লোভাতুরা,
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসার-সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্ম্ম ছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি'
তোমার আদেশ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান!

এ আহ্বান এ ত শক্তিকেই আহ্বান; কর্ম্মক্ষেত্রেই এর ও রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সেইজন্যই এর শেষ উত্তর এই:—

হবে হবে হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব, রাণী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিবিবে না।
কর্ম্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

আমার ধর্ম্ম আমার উপচেতন লোকের অন্ধকারের ভিতর থে ক্রমে ক্রমে চেতন লোকের আলোতে যে উঠে আসচে এই লেখা তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলেই বোঝা যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যা পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝেনি। যাকে দে পাচ্চে তাকে নাম দিতে পারচে না, তাকে নানা নামে ডাকচে। লক্ষ্য মনে রেখে সে পা ফেলছিল, বারবার হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে দে আর-একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চলচে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে,
চিনিনা যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই আবছায়া রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে যে-একটি বোধ কবির সাম ক্ষণে ক্ষণে চমক দিচ্ছিল, তার কথা তখনকার একটা চিঠিতে আ সেই চিঠির দুই এক অংশ তুলে দিই।

"কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখ্‌তে বলচে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুন প্রবৃত্ত করচে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলি প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলচে?

* * * *

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনই আমার হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে

ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।"

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্ম্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চল্‌ল ততই পূর্ব্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগ্‌ল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি-রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার বর্ষশেষ কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে:—

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল,—
পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।
তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান,
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চ্চি রেখা।
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানিনা
কি তাহাতে লেখা।
হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন-রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান,
আমরা দাঁড়াব উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ।
চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্‌।
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

রাত্রির প্রান্তে প্রভাতের, যখন প্রথম সঞ্চার হয় তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলঙ্কার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানা-রকম রং ফুটতে থাকে, গাছের মাথার উপরটা ঝিকমিক্ করে, ঘাসে শিশিরগুলো ঝিল্‌মিল্ করতে সুরু করে,—সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলঙ্কারিক। কিন্তু তা'তে করে এটুকু বোঝা যায় যে রাত্রের পালা শেষ হয়ে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্য্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সুপ্তরাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেষ হল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তমে সপ্তমে মীড় টেনে এখনি অশান্ত সুরের ঝঙ্কারে বেজে উঠবে। এমনি করে ধর্ম্মবোধের প্রথম উন্মেষটা সাহিত্যের অলঙ্কারেই প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মানস-প্রকৃতির শিখরে শিখরে কল্পনার মেঘে মেঘে নানা-প্রকার রং ফলাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্য থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যে, বিশ্ব-প্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল; নির্জ্জনে অরণ্যে পর্ব্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোল, এবারে বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব্ব। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে "পাগল" বলে যে গদ্য প্রবন্ধ বের হয়েছিল সেইটে পড়লে বোঝা যাবে, কি কথাটা কল্পনার অলঙ্কারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে।

"আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ, শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়, এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ: সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া, ভীত; আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্য দিয়া আপন সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুধাটুকুর জন্য সুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকে, দুঃখের বিষকে আনন্দ অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান।

"এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। * * নিয়মময় দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপন খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভূত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য ইঁহার সুর নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।"

"* * * * * * আমাদের প্রতিদিনের একরত্তা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখ-মিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহা-ধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহা পুণ্য ও মহা পাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে-একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ দুইয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্তআকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।

নৃত্য কর, হে উন্মাদ, নৃত্য কর! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজনব্যাপী নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়! হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক!

আমাদের এই ক্ষ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগ্‌লামি অহরহ জাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অনির্ব্বচনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি, রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।"

তার পরে আমার রচনায় বারবার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েচে—জীবনে এই দুঃখ-বিপদ-বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।

কহ, মিলনের এ কি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তার সমারোহভার কিছু নেই,
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না!
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে পিছে কেহ ব'বে না?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙা বরণ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?
যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন
ছিল কতমত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্‌বম্‌ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

* * * *

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখ-শয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধ-জাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব, ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

"খেয়া'তে "আগমন" বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে-মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করেনি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জ্জনের মত ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল, তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেচে আজ
আঁধার ঘরের রাজা!
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা!
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা!

ঐ "খেয়া"তে "দান" বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই, যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কি পেলুম?

এ ত মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি!
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি,
এ যে তোমার তরবারি!

এমন যে দান, এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।

আজ্‌কে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়।
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে'
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে'
রাখব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

এমন আরো অনেক গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে—যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেচে। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথা মানতেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্চে শান্তং শিবমদ্বৈতং। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাই ত মানুষ তাঁকে ডাকচে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ—তার দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্চে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্চে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু সেই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে! রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে ত স্বপ্ন, সে সত্য নয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি,
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার সুরটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজচেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ,—সমস্ত খেলাধূলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বল্লেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেচে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করচে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত;—অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েচে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করচে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করচে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করচে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জ্জন, এই দুঃখই ত তার শ্রী, এই ত তার উৎসব, এতেই ত সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেচে, আনন্দময় করেচে। বাইরে থেকে দেখলে এ'কে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ ত খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্য্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে, জগতে সেই-ই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ও ত গাছতলায় বসে-বসে বাঁশির সুর শোনাবার কথা নয়।

"রাজা" নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে-অগ্নিদাহ ঘটালে, যে-বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই ত তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করচে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য্য, তাতেই আনন্দ।

যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

"মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই ত আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না, আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।"

আমি ত মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেচে সে ঐ গুরু এসেচেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্চে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন, তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চলছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল—তাই ত হঠাৎ আগুন জ্বলল, তাই ত সাত রাজার লড়াই বেধে গেল—তাই ত যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে আপন সম্পদ ছেড়ে, পথের ধুলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্চে।

এই কথাটাই গীতালির একটি গানে আছে:—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে,
আরেক হাতে হার,
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আসচে জীবন মাঝে,
ও যে আসচে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে,
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার॥

এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্ম্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়,—যে সমাধানে পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম

এক, এর সম্বন্ধে বারবার আমি বলেচি। শান্তিনিকেতন গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারত। কিন্তু যেখানে আমি স্পষ্ট ধর্ম্মব্যাখ্যা করেচি, সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি—সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচি।

জীবনকে সত্য বলে জান্‌তে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেচে, সে দেখ্‌তে পায়, যাকে সে ধরেচে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দ্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দ্দার মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্চে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্চে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েচে। কিন্তু এই উৎসব ত শুধু আমোদ করা নয়, এ ত অনায়াসে হবার যো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে' তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছান যায়। তাই যুবকেরা বল্লে,—আন্‌ব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে'। মানুষের ইতিহাসে ত এই লীলা, এই বসন্ত উৎসব বারে বারে দেখ্‌তে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে' নিৰ্জ্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই ত য়ুরোপে চলচে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েচে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্ত্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেচে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েচে। তাই ফাল্গুনীতে বাউল বল্‌চে :—
"যুগে যুগে মানুষ লড়াই করচে, আজ বসন্তের হাওয়া তারি ঢেউ। যারা মরে' অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েচে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্চে,—আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তাহলে বসন্তের দশা কি হত?"—বসন্তের কচি পাতার এই যে পত্র, এ কাদের পত্র? যেসব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েচে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তাহলে জরাই অমর হত—তাহলে পুরাতন পুঁথির কাগজে সমস্ত অরণ্য হল্‌দে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর্ সর্ শব্দে আকাশ শিউরে উঠ্‌ত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে—এই ত বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে, যাঁরা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে' জীবন্মৃত হয়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

"চন্দ্রহাস। এ কি! এ যে তুমি! সেই আমাদের সর্দ্দার! বুড়ো কোথায়?

সর্দ্দার। কোথাও ত নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না? তবে সে কি?

সর্দ্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখ্‌লে, তারা যে তোমাকে কতরকম মনে করলে তার ঠিক নেই, তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে—এখন মনে হচ্চে তুমি বালক,—যেন তোমাকে এই প্রথম দেখ্‌লুম! এ ত বড় আশ্চর্য্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!"

মানুষ তার জীবনকে সত্য করে' বড় করে' নূতন করে' পেতে চাচ্চে। তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে-যৌবনটা বিকশিত হয়ে উঠচে, সে ত কোনদিন মৃত্যুকে ভয় করেনি। মানুষ বলেচে—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে বারে বারে,
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেচে—

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারা জীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিব্‌ল বাতি,
গর্জ্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেচে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেচে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে,
নাইক অবহেলা॥

আমার ধর্ম্ম কি, তা যে আজো আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বল্‌তে পারিনে—অনুশাসন আকারে, তত্ত্ব আকারে কোনো পুঁথিতে-লেখা ধর্ম্ম সে ত নয়। সেই ধর্ম্মকে জীবনের মর্ম্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, উদ্ঘাটিত করে, স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্য্য রসম্ভোগ যে সেই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি,—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জ্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ, তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই,—তাকে ত্যাগ করে নয়; তার যে অখণ্ড অদ্বৈতরূপ, তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে,—তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেই ত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই ত তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েচে যেই গেহ
সেই ত তোমার গেহ।

সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই ত তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই ত তোমার দান,
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই ত তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই ত তোমার ভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি।

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শান্তং শিবং অদ্বৈতং। য়িহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, দ্বন্দ্বের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে স্বর্গ ত জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ বলে জানিইনে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয় তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

"গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মা'কে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি,
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।"

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘট্‌ল। সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিট্‌তে পারে কোথায়? অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্ম্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং—মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মত কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে, তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না,—সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্চে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা সঙ্গম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়—সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ, সে ত দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্ম্মবোধের এই যে যাত্রা,—এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মত যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্তলোকে লুণ্ঠিত হয়েছে, তবেই অমৃত-লোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্ম্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে, এই অদ্বৈতে, অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি—তারা পারে যাবে কি করে? সেই জন্যেই ত মানুষ প্রার্থনা করে,—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। "গময়" এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্চে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্ম্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আরেক দিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আরেক দিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম্ম যে-আগমনীর গান গায়, সে এই :—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়!
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়!
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক্ ক্ষয়!
তোমারি হউক জয়!
এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়
তোমারি হউক জয়!
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়!
প্রভাত-সূর্য্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক্ লয়!
তোমারি হউক জয়!

(সবুজপত্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক।)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সজল নয়ন

(জাপানী কবিতার ইংরেজি হইতে)

'শিশির নাশিল তোর সকল গৌরব,
ওরে ফুল, কই তোর শোভা ও সৌরভ?'
কবি কয়,—'শিশিরেই বাড়িয়াছে শোভা,
নহিলে হয় কি ফুল এত মনোলোভা?'

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

৩৬ অধ্যায়

১৯০০ সালের ২রা নবেম্বর সেই মন্দিরের সকল মূর্ত্তি ও ধনরত্ন দেখিতে দেখিতেই কাটিয়া গেল। এই স্থানটি সারেংএর ঠিক ৬০ মাইল উত্তরে হইবে, সেখানকার ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই এখানে যাতায়াত করে। মন্দির দেখিয়া যেই আমি ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় সারেংএর একজন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এ ব্যক্তি এক নামজাদা বদমায়েস। যেমন মাতাল তেমনি জুয়াড়ি। এদেশের লোকেরাও তাহাকে ভয় করে। আমি যখন সারেংএ ছিলাম এ ব্যক্তি আমায় ইংরাজের চর বলিয়া সর্ব্বদাই অনুযোগ করিত। ইহার পরিবারের একজন পীড়িত হইলে, আমি একবার ঔষধ দিয়া তাহাকে আরোগ্য করি, তখন হইতে লোকটা একটু নরম হয়। কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি, সুযোগ পাইলেই নিজমূর্ত্তি ধরিতে তাহার আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব হবে না। আমি মনে মনে ঠিক করিলাম যে লোকটা যাহাতে আমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে তাহাই করিতে হইবে। আমি তাহার কাছে হাসিমুখে গিয়া বলিলাম, "যাহোক পুরানো বন্ধুকে দেখে ভারি খুসী হলাম, শুনেছি এদেশে চমৎকার মদ পাওয়া যায়, তুমি যদি আমার ঘরে এসো তোমাকে যত খুসী মদ খেতে দেবো।" লোকটা মদের নাম শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আমার ঘরে আসিতে রাজি হইল। আমি সেখানকার উৎকৃষ্ট মদ্য আনাইলাম। ভোর ৪টা পর্য্যন্ত লোকটাকে অনবরত মদ দিতে লাগিলাম। আমি নিজে যদিও এক বিন্দু মদ্য পান করি নাই, কিন্তু মাতালের কাছে মাতলামির ভান করিতে ছাড়িলাম না। অবশেষে লোকটা মদের নেশায় ঘুমাইয়া পড়িল. আমিও ঘুমাইবার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। ভোর ৫টার সময় উঠিয়া সরাইএর কর্ত্তাকে বলিলাম, "আমার এই বন্ধুটি জাগিলেই তাহাকে মদ খাইতে দিবে, আর ইহাকে কোনমতেই ঘর হইতে বাহির হইতে দিও না।" আমি মদের টাকা শোধ করিয়া, আরও মদ্য পানের জন্য অগ্রিম টাকা দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। সরাই-ওয়ালাকে যথেষ্ট দক্ষিণা দিয়া দিলাম, সুতরাং সে আমার উপর বড় প্রসন্ন হইল।

লোকটাকে ফাঁকি দিয়া বাহির হইলাম বটে, কিন্তু ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। লোকটা বড় চতুর। জাগিয়া উঠিলেই আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিবে, তখন রাজ-সরকারে গিয়া আমার নামে নালিশ করিতে আর বিলম্ব করিবে না। তখন যদি আমার পিছনে ঘোড়সোয়ার ছুটে তাহা হইলে চলিয়া আমি কত দূরে যাইতে পারি? অতএব যে-কোন-প্রকারে হোক একটা ঘোড়া জোগাড় করিতে হইবে। সে অঞ্চলে মানুষের দেখা সাক্ষাৎ নাই ত আবার ঘোড়া! দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তাড়াতাড়ি যাইতেছি, এমন সময় পিছন হইতে একজন ঘোড়সোয়ার আসিয়া পড়িল। দেখি একদল যাত্রী, ইহাদের দলে ৮০।৯০টা ঘোড়া, মানুষ জন ষোল হইবে। আমি দলের একজনকে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আমার জিনিষপত্র বহিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে ব্যক্তি বলিল সে নিকটের উপত্যকায় থাকে, যদি আমি সেখানে যাইতে ইচ্ছা করি তবে আমার জিনিষপত্র লইয়া যাইতে পারে। আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। তাহার তাঁবুতে পৌছিতে রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল। তাহারা আমাকে চা এবং মাংস দিয়া অতিথিসৎকার করিল। আমি বলিলাম, "আমি বৌদ্ধ পুরোহিত জীবহিংসা করি না।" একথা শুনিয়া তাহারা একেবারে গলিয়া গেল। কর্ত্তা বলিল, "তুমি কোন্ দেশের লোক", আমি বলিলাম "আমি চীনে।" তখন লোকটি আমার সঙ্গে চীনে ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কি বিপদ! আমি সহজভাবে বলিলাম, "মশাই, আমি পাড়াগেঁয়ে লোক, পিকিনের ভাষা ভাল বুঝি না।" তারপর আমায় চীনেভাষা পড়িতে দিল—সে পরীক্ষার ফলে পাস হইয়া "চীনে" বলিয়া পরিগণিত হইলাম। এই দলের সহিত জুটিয়া আমার ভালই হইল। ইহারা আমার জিনিষপত্র লইয়া চলিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে লাসা পর্য্যন্ত ইহাদের সঙ্গে যাই। সঙ্গে একজন লামা ছিলেন, তিনি আমায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন, ভাগ্যে আমি সারেংএ গয়ালসানের নিকট তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তিব্বতীভাষা ও ব্যাকরণ উত্তম-রূপে শিখিয়াছিলাম, তাই এই লামা আমার তিব্বতীভাষার

বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় দেখিয়া অবাক্। তিনিও তিব্বতী ব্যাকরণ পড়িয়াছেন, তবে আমার মত পণ্ডিত হইয়া উঠেন নাই। লোকটি আমায় বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে চল। আমরা প্রতিদিন ২টার পর আর চলি না, অনেক সময় পাওয়া যাবে, তোমার কাছে ব্যাকরণ পড়ব, তোমায় আমি যথেষ্ট পুরস্কার দিব।" আমি তখনই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম—আমিও তাহাই চাহিতেছিলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি যাত্রীরা চা করিতে ব্যস্ত। ঘোড়া চমরী সব চারিদিকে চারতে গিয়াছে—সেগুলিকে ধরিয়া আনিতে অনেক সময় গেল। আমাদের দলে ১৭ জন লোক। ১১ জন ঘোড়সোয়ার, একব্যক্তি কেবল পদব্রজে চলিয়াছেন—আমারও ঘোড়া নাই কাজেই আমি ইঁহার সঙ্গ লইলাম। লোকটি বিদ্যাশিক্ষার জন্য লাসায় যাইতেছে। সর্ব্বাগ্রে চা পান করিয়া আমরা দুজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম লোকটি আমার উপর প্রসন্ন নয়। লোকটির পাণ্ডিত্য কতদূর জানি না, কিন্তু জ্ঞানাভিমান সামান্য নয়। আমি ত ভাবিয়াই পাই না—এ ব্যক্তির অসন্তোষের কি কাজ করিয়াছি। ক্রমে কথার ভাবে বুঝিলাম, আমার ব্যাকরণের বিদ্যা দেখিয়া আমার প্রতি লামার অগাধ ভক্তি হওয়াতে এ ব্যক্তির মনে ঈর্ষা হইয়াছে। লোকটি কথায় কথায় বলিল, "যত সব মূর্খ ব্যাকরণ পড়িয়া মাথা ঘামায়, আমি এমন বোকা নই, যে, অনর্থক ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে যাইব।" লোকটা বুদ্ধিমান বটে। লোকটার আমার প্রতি কেবল ঈর্ষা নয় ষোলআনা সন্দেহ। তার বিশ্বাস, হয় আমি ইংরেজ নয় ইউরোপেরই কোনো দেশের লোক। নানা কথায় নানা ছলে তার চেষ্টা আমার পেটের কথা টানিয়া বাহির করে। আমি এবিষয়ে তার চেয়ে চতুর বেশী, আমায় কোনমতেই ঠকাইতে পারিল না।

এই দলের সঙ্গে আমি অনেক পথ অতিক্রম করিলাম। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে নিউকতাডাঙ্গা নামক স্থানে পৌছিলাম। এতদিনে আমি নির্ভয় হইলাম। ৬৫ মাইল আসিয়া পড়িয়াছি সারেংএর লোকটা আর আমার কিছু করিতে পারিবে না। একদিন হঠাৎ আমার সঙ্গী পণ্ডিতটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ভারতবর্ষে ছিলে, তা হলে শরৎচন্দ্র দাসকে নিশ্চয় চেনো।" আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষ কি তিব্বতের মত? সেখানে ৩০ কোটী লোকের বাস, বড় লোকদের নামই দেশস্থ লোক জানে না, আমি ত শরৎ বাবুর নামও কখন শুনিনি।" তখন সে ব্যক্তি বলিতে আরম্ভ করিল, "শরৎবাবু ফাঁকি দিয়ে তিব্বতে ঢুকে আমাদের বৌদ্ধধর্ম্ম চুরি করে নিয়ে গেছেন, তাঁর জন্য তিব্বতের অতিবড় সাধু সাংচিন দোরজিচানকে প্রাণ দিতে হয়েছে, তা ছাড়া কত লোকের যে ধনপ্রাণ গেছে তা আর কত বলব? সেই শরৎদাসকে তুমি যে জান না, এ অসম্ভব কথা নয়ত কি?" কি আশ্চর্য্য, শরৎবাবুর কথা তিব্বতের আবালবৃদ্ধবনিতা জানে। শরৎবাবুর ঘটনার পর তিব্বতীরা এমন চতুর হইয়াছে যে দেশশুদ্ধ লোক ডিটেকটিভ। আমাকে ধরিবার জন্য সঙ্গী পণ্ডিতটি যে কত ফাঁদ পাতিত! কি আশ্চর্য্য তার সঙ্গে তার স্বদেশীরা সকলেই যোগ দিত। তখন আমার নিজেকে কি বিপন্নই মনে হইত? শত্রুপুরীতে আমি একা! তিব্বতীরা বড় ক্রূর, তাদের মনের অভিসন্ধি বোঝা ভার। হাসিয়া হাসিয়া লোকের সর্ব্বনাশের ফাঁদ পাতে। তিব্বতীরা তাদের দেশের নাম "পো" এবং নিজেদের "পোপা" বলিয়া জানে। হিন্দুরা বলে "বোধ"। তিব্বত কেবল ভৌগোলিক নাম।

৩৭ অধ্যায়।

১৯০০সালের ৩ই নবেম্বরে আমরা আবার দক্ষিণপূর্ব্বে যাত্রা করিলাম। ২০ মাইল উঁচু নীচু পাহাড় অতিক্রম করিয়া এক তুষারাবৃত শিখরের পাদদেশে রাত্রিবাস করিলাম ৭ই ৫ মাইল পাহাড় ভাঙ্গিয়া চাকসাম সাংবো নামক স্থানে পৌছিলাম। সেখানে লোহার পুল ছিল। লোহার পুল বলি কেন? এক পাহাড় হইতে আর-এক পাহাড় পর্য্যন্ত লোহার কাছি বাঁধা। তাহার নাম পুল! লোকে লোকে হাত ধরাধরি করিয়া পার হয়। এখানে নদী অত্যন্ত খরস্রোতা—আর বিস্তর বরফের চাঁই ভাসিয়া চলিয়াছে। যা হোক আমি ঘোড়ার উপর চড়িয়া অবলীলাক্রমে পার হইলাম। এদেশে তৃণগুল্মের নাম নাই কেবল জলাভূমিতে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায়। প্রায় ৮ মাইল গিয়া "সাক্কাজং" নামে এক দুর্গে পৌছিলাম, এবং সেখানে রাত্রিবাস করা গেল। দুর্গ বটে, কিন্তু সৈন্য সামন্ত নাই।

যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে আশে পাশের লোকেরা এখানে আসিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এক উপত্যকায় আসিয়া পড়িলাম। সেখানে চমরীর মত ভীষণ আকৃতি এক জীব দেখিলাম। শুনিলাম ইহারা বন্য চমরী। চমরীর চেয়ে তিন গুণ বড়, উচ্চে ৭ ফুট হইবে, শিংগুলা ৫ ফুট লম্বা। ইহারা বড় ভীষণ জন্তু—দেখিতে ছোটখাটো হাতী-বিশেষ! কিন্তু প্রকৃতি বড় উগ্র, যাহাকে আক্রমণ করে, তার আর রক্ষা নাই। জিহ্বা এমন খসখসে, এ দেশের লোকেরা তাহা ঘোড়ার বুরুসের মত ব্যবহার করে। আমাদের দলের একজন লোক আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি গুণে বল দেখি আজ রাত্রে আমাদের কোন বিপদ হবে কি না?" আমি ভাবিলাম লোকটা বন্য চমরী দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছে। কিন্তু তারপর শুনিলাম ঠিক এই স্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে ডাকাতেরা ছয়জন পথিককে হত্যা করিয়াছে। আমি লোকটাকে নির্ভয় করিবার জন্য বলিলাম, "আজ রাত্রে কিছু হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" যাহোক সে রাত্রে দুর্ঘটনা কিছু ঘটে নাই।

আমরা ১১ই, ১২ই তারিখ ক্রমাগত পর্ব্বত প্রান্তর পার হইয়া চলিলাম। ১৩ই তারিখে "গাইটো তাজ্জান" নামক ক্ষুদ্র সহরে পৌঁছিলাম। এখানে প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ দেখিলাম। সহরে ৬০টি পরিবার বাস করে, লোকসংখ্যা মোটে ৪০০। এখানকার লোকেরা একটু ভদ্রগোছের—যাযাবর তিব্বতীদের মত গোঁয়ার নয়, তারা না জানে ভদ্রভাবে কথা কহিতে, না জানে কোন আদবকায়দা। নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি এদেশে কি প্রচণ্ড শীত! যাহোক আমার সঙ্গীদের অনুগ্রহে আমার একপ্রকার সুখেই কাটিত, তাহারা চমরীর করীষ সংগ্রহ করিয়া আমার জন্য অগ্নি জ্বালিত। আমরা পথে সিসান গোম্পা নামক মন্দির পার হইয়া সাং সাং তাজ্জমি নামক সহরে পৌঁছিলাম।

৩৮ অধ্যায়।

কসাইখানায় শাস্ত্রপাঠ।

আবার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিয়া পার্ব্বত্য দেশে মাইল অতিক্রম করিয়া একটা পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া তিনটা ঘর দেখিতে পাইলাম। যখন দেখিলাম সেই ঘরের কার্ণিসে ভেড়ার চামড়া সার সার ঝুলিতেছে, তখন আমার মনটা কি-রকম হইয়া গেল। শুধু কি তাই, শুনিলাম এটা জীব বলি দিবার স্থান। তিব্বতীদের ব্যবস্থা এই যে শীতের প্রারম্ভে ছাগ মেষ চমরী প্রভৃতি বলি দিয়া সেই মাংস শুখাইয়া রাখে। তিব্বতে যে শীত, সেখানে কোন জিনিষই পচে না। তিব্বতীরা এই শুষ্ক মাংস অতি উপাদেয় বলিয়া মনে করে। তাদের মতে এমন সুখাদ্য জগতে আর কিছুই নাই। শরৎ কালের শেষেই পশু বলি দিবার উৎকৃষ্ট সময়, গ্রীষ্মকালে তৃণ গুল্ম আহার করিয়া পশুগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে, সুতরাং এই সময়কার মাংস অতিশয় সুখাদ্য। তিব্বতীরা গ্রামের মধ্যে জীব হত্যা করে না। এই স্থানই আশেপাশের গ্রামের লোকদের সাধারণ হত্যার স্থান। আমরা যেদিন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম শুনিলাম সেইদিন ২১০ মেষ এবং ৩১ চমরী বলি দেওয়া হইয়াছে। আমরা উপস্থিত হইবার পরও ১২টি চমরী হত্যা করা হইল। শুনিলাম চমরীরা বলির পূর্ব্বে কেমন অদ্ভুত স্বরে ডাকিতে থাকে। আমাকে সকলে বলি দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল। আমি কি করিয়া এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখি? কিন্তু কি-প্রকারে বলি দেওয়া হয় দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া একবার গিয়া দাঁড়াইলাম। ধীরে ধীরে একটা চমরীকে হত্যার স্থানে লইয়া যাইতেছে, দুইজন পিছন হইতে ঠেলা দিতেছে, অবোধ পশু কিছুতেই সম্মুখে অগ্রসর হইতে চাহে না। যথাস্থানে উপস্থিত হইলে অভাগা পশুর চারিটি পা বাঁধিয়া ফেলা হইল। রক্তনদীতে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র কি এক অব্যক্ত ভয়ে হতভাগ্য প্রাণীর চক্ষু অশ্রুতে যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল—মুখে কি করুণ দৃষ্টি! আমি এ দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না—আমার যদি অর্থ থাকিত ইহাদের জীবন ক্রয় করিয়া লইতাম। দেখি ধর্ম্মপুস্তক হস্তে লইয়া এক লামা হত্যাস্থানে দর্শন দিলেন। বলির পশুর মস্তকে ধর্ম্মগ্রন্থ এবং জপের মালা ছোঁয়াইয়া মন্ত্র পড়িয়া দিলেন। ইহাতে ঘাতক এবং হত জীব উভয়ের মুক্তির পথ পরিষ্কার হইল। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে

ঘরের ভিতর চলিয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ ঝপ করিয়া এক শব্দ হইল, বুঝিলাম সব শেষ। বলির পরই এক পাত্রে রক্ত ধরা হয়, এই রক্ত দিয়া তিব্বতীদের এক সুখাদ্য প্রস্তুত হয়। বাস্তবিক চমরীর রক্ত তিব্বতীদের এত প্রিয় যে সময়ে সময়ে রক্ত খাইতে ইচ্ছা হইলে গৃহপালিত চমরীর গলায় ছোরা বিদ্ধ করিয়া একটা শির কাটিয়া পাত্রে সেই রক্ত লয় এবং তদ্দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই-প্রকারে শিরা কাটিলেও চমরীর মৃত্যু হয় না। কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা! মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়। আমি যখন লাসায় ছিলাম তখন দেখিয়াছি, বৎসরের শেষ তিন মাসে, সেখানে ৫০ হাজার মেষ ও চমরী হত্যা করা হয়। এই কসাইখানা হইতে যাত্রা করিয়া আমরা ১৯এ নবেম্বর তাসাংগুম্ফা নামে এক মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথে মানুস্রি সো নামে ১২ মাইল পরিধিবিশিষ্ট এক হ্রদের ধারে লারুং নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছিলাম। এস্থানে প্রথম গমের ক্ষেত দেখিলাম, তিব্বতে চাষবাসের কোন আয়োজন পূর্ব্বে দেখি নাই।

৩৯ অধ্যায়।

তিব্বতের তৃতীয় সহর।

তখন শীতকাল, সুতরাং গম-ক্ষেতে গম দেখিতে পাইলাম না, শুনিলাম সে অঞ্চলে দুই পেক বীজে দুই বুসেল গম হয়। লাসার কাছে ৪।৫ বুসেল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে—সচরাচর তিন বুসেল হইলেই যথেষ্ট ফসল হইয়াছে বলিয়া সে দেশের লোক মনে করে। তিব্বতে কৃষিকার্য্যের অবস্থা বড় মন্দ, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য কোন চেষ্টাই নাই, কৃষকেরা জমি পরিষ্কার পর্য্যন্ত করে না। জমি পরিষ্কার করিবার কথা একজনকে বলিয়াছিলাম, সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "আমাদের দেশে ওরকম করে চাস করে না।" এদেশের লোক নূতন কিছু শিখিতে রাজি নয়, যা বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাই যেন চিরদিনই চলিবে। অন্যান্য দেশের মত তিব্বতেও জমির উর্ব্বরতা অনুসারে খাজনা নির্দ্ধারিত হয়। এদেশের জমির উর্ব্বরতা পরীক্ষার বড় অদ্ভুত নিয়ম। এরূপ সনাতন নিয়ম আর কুত্রাপি দেখি নাই। দুইটা চমরী জুড়িয়া জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়, শীঘ্র এবং দেরীতে হইলেই সেই অনুসারে জমির দোষ গুণ বিচার হয়।

আবার আমরা দক্ষিণপূর্ব্ব মুখে যাত্রা করিয়া ২১ নবেম্বর "নাম সো গোগা" নামক আর-এক হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহারও পরিধি ১২ মাইল হইবে, জল অতি নির্ম্মল। এই হ্রদের উত্তরপূর্ব্ব দিয়া যাত্রা করিলাম। এবার আমরা যে রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম সে দেশে মানুষের বসতিও বেশী, কিছু কিছু চাষবাসও হয়। ২২এ নবেম্বর আমরা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে ব্রহ্মপুত্রের জল গভীর এবং নীল। এ নদী আর ঘোড়ায় চড়িয়া পার হওয়া যায় না। এখানে ভারতবর্ষের মত নৌকা আছে। বড় নৌকাগুলিতে ৪০ জন পার হইতে পারে। নৌকায় করিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলাম। পরপারে "লারসি" নামে এক সহরে উপস্থিত হইলাম। তিব্বতের মধ্যে ইহা তৃতীয় সহর। এস্থান হইতে "সিগাটসি" পাঁচ দিনের পথ। সিগাটসি তিব্বতের দ্বিতীয় বড় সহর। দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখি চীনেদের নির্ম্মিত এক প্রশস্ত পান্থশালা। এখানে চীন পরিব্রাজক এবং সৈনিক পুরুষেরা পথে বিশ্রাম করে। আমরাও এখানে আশ্রয় লইলাম। পথে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই, ডাকাতের হাতে পড়ি নাই, এই আনন্দে আমাদের দলের লোকেরা বড় উৎফুল্ল। ২৩এ নবেম্বর এই পান্থশালায় কাটিয়া গেল। তার পরদিন আমার এই পথিক দলের সহিত ছাড়াছাড়ি হইবে। যে লামাকে আমি ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়াছি তিনি আমায় ১০টি টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ দিলেন—দলের আর সকলেও আমায় কিছু কিছু টাকা দিল। আমরা সিটারসিং অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে দেখি সকলে ঘোড়া চমরী লইয়া সব ক্ষেতের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। শুনিলাম তিব্বতে প্রতি বৎসর চাষ হয় না, এক বৎসর বাদ ফসল তোলা হয়। তিব্বতের মধ্যে এ অঞ্চল বেশ উর্ব্বরা; এদেশে গম, যব, সীম অত্যন্ত সস্তা। এদেশ অতিক্রম করিয়া "রেনদা" নামক ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছিলাম। এখান হইতে যাত্রা করিয়া ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শাক্য-বিহার দৃষ্টিগোচর হইল। কি অপূর্ব্ব মহান্ দৃশ্য! বিহারের চারিদিকে ২২০ গজ ব্যাপিয়া উন্নত প্রাচীর পূর্ব্ব-পশ্চিমে

২০০ ফুট উত্তর-দক্ষিণে ২৪০ ফুট সৌধের উপর স্বর্ণ-নির্ম্মিত চূড়া ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে!

৪০ অধ্যায়।

শাক্যবিহার।

আমরা যে পান্থশালায় আশ্রয় লইয়াছিলাম সেখানে একজন পাণ্ডা জুটিল। তাহার সঙ্গে বিহার দেখিতে চলিলাম। প্রধান ফটক পার হইয়া, কয়েকটা ছোট ছোট গৃহ পার হইয়া, প্রধান বিহারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ভিতরের কিছুই বাহির হইতে দেখা যায় না, ক্রমে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গৃহটীতে প্রবেশ করিলাম। গৃহটি প্রশস্ত বটে—৭২ ফুট লম্বা এবং ৪২ ফুট চওড়া হইবে। দ্বারের উভয় পার্শ্বে বজ্রপাণির দুই মূর্ত্তি—প্রত্যেকটি ২০ ফুট উচ্চ। একটা রক্তবর্ণ, অপরটার বর্ণ নীল। জাপানেও ঠিক এইমত প্রত্যেক মন্দিরের দ্বারদেশে বজ্রপাণির নীল মূর্ত্তি দেখা যায়। প্রত্যেক মূর্ত্তির দক্ষিণ পা ঈষৎ বক্র, এবং বাম পা সম্মুখে বাড়ান, দক্ষিণ হস্ত আকাশের দিকে উত্থিত, বামহস্ত ভূমির দিকে দৃঢ় লক্ষ্যবদ্ধ। মূর্ত্তিগুলি দেখিয়াই মনে হইল তিব্বতীয় শিল্পের নিদর্শন, মাংসপেশীগুলি বড় স্বাভাবিক। ডানদিকে আরও ৪টি দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলাম। প্রত্যেকটি ৩০ ফুট উচ্চ। বামদিকের সমুদয় দেয়ালটি দেবদেবীর চিত্রে পূর্ণ। এত চিত্রের সমাবেশ সেখানে, যে, তিলমাত্র স্থান নাই। সমুদায় বিহারটি অতি যত্নে রক্ষিত, এবং বেশ সুন্দর অবস্থায় আছে। গৃহটি পার হইয়া এক প্রাঙ্গণে গিয়া পড়িলাম। প্রাঙ্গনটি ৩৬ ফুট লম্বা এবং ৩০ ফুট চওড়া। সাধারণ লামা ও ধর্ম্মশিক্ষার্থীগণ সেখানে শাস্ত্রপাঠ ও আহারাদি করে। প্রধান লামা বিহারের মধ্যে বাস করেন। এই প্রাঙ্গণ পার হইয়া গৃহ দেখিলাম—বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পূর্ণ। এই গৃহে প্রবেশের দুইটি দ্বার আছে; দক্ষিণের দ্বার দিয়া পুরোহিতগণ প্রবেশ করেন, এবং উত্তরের দ্বার দিয়া দর্শকগণ আসিয়া থাকেন। এ গৃহে সোনার কি ছড়াছড়ি দেখিলাম, ভিতরে প্রবেশ করিয়া মনে হইল যেন সোনার সাগরে আসিয়াছি, যে দিকে চাহিয়া দেখি স্বর্ণের উজ্জ্বল কান্তিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। আমি এখানকার স্বর্ণের প্রাচুর্য্য বর্ণন করিতে অক্ষম। সেই গৃহের ছাদ থাম সকলই স্বর্ণমণ্ডিত। গৃহে তিন শতের অধিক মূর্ত্তি আছে, সকলগুলিই সোনার পাতে মোড়া। গৃহের ঠিক মাঝখানে শাক্যমুনির ৩০ ফুট উচ্চ এক মূর্ত্তি আছে। শুনিলাম মূর্ত্তিটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, কিন্তু সোনার পাতে মোড়া বলিয়া সোনার বোধ হইতেছে। এই মূর্ত্তির সম্মুখে ৭টি জলাধার, কতকগুলি বাতিদান, একটি টেবিল (অর্ঘ্যগ্রহণের জন্য)। সকল দ্রব্যই পাকা সোনার নির্ম্মিত, রূপার দ্রব্য অতি অল্পই দেখিলাম। এখানে ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিলাম; কিন্তু যেরূপভাবে মূর্ত্তিগুলির আসবাবপত্র সজ্জিত আছে, তাহাতে বাস্তবিক বড়ই সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। তিব্বতীশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানে, কিন্তু সুরুচির অভাবে এমন সুন্দর ও বহুমূল্য দ্রব্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে না। এই ঘরের পশ্চাতে আর, একটি প্রকাণ্ড গৃহ ৬০ ফুট উচ্চ, ২০০ ফুট লম্বা এবং ৪০ ফুট চওড়া—এ গৃহটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে একেবারে পূর্ণ! এই গৃহটি বিহারের পুস্তকাগার—দেখিলাম কতকগুলি গ্রন্থ নীল কাগজে সোনার অক্ষরে লেখা, এবং কতকগুলি সংস্কৃত ভাষায় তালপত্রে লেখা। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা শাক্যপণ্ডিত ভারতবর্ষ হইতে আনাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ শাস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতেন। তিব্বতী ভাষার ধর্ম্মগ্রন্থসকল হস্তলিখিত। এই গৃহের সমুদায় বস্তু দেখিয়া আমরা প্রধান গৃহটিতে উপস্থিত হইলাম। তখন এক দুর্গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিল, ইতস্ততঃ চলিয়া এই দুর্গন্ধের প্রকৃত কারণ বুঝিলাম। তিব্বতে সমুদয় মন্দিরে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে, সেই ঘৃত মেজেতে সর্ব্বদাই পড়ে, তার উপর লামারা যতকিছু ভুক্তাবশিষ্ট মাটিতেই ফেলে, কখন কেহ তাহা পরিষ্কার করে না। নানাবিধ দ্রব্য পচিয়া মিশিয়া বিকট গন্ধ বাহির হয়। তিব্বতীয় নাসিকায় তাহা অতি সুগন্ধ, আমার নিকট তাহা অতি জঘন্য। এই গৃহের উভয় পার্শ্বে আরও দুইটি গৃহ আছে, তাহাতেও আরও অনেক মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে—পদ্মমুনির মূর্ত্তি দেখিলাম, মূর্ত্তিটা আগাগোড়া বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত। এমন কি সেই গৃহের মেঝে এবং আশেপাশের দেওয়ালে পর্য্যন্ত মূর্ত্তি উৎকৃষ্ট, অতি মূল্যবান প্রস্তরে খচিত। বিহারের

বহির্ভাগে কতকগুলি শয়নগৃহ আছে, সেখানে প্রায় পাঁচ শত লামা বাস করে। দক্ষিণ দিকে প্রধান আচার্য্য চাম্বা পাষাং টিনলির সুরম্য ভবন—তিনি এই ৫ ধর্ম্মশিক্ষার্থীর অধ্যাত্মগুরু। আমি ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যথার্থই মূর্ত্তি অতি সৌম্য আমি তাঁহাকে কয়েকটি ধর্ম্ম-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, পরদিন আমায় আসিতে বলিলেন। বাহিরে আসিয়া দূরে উইলো গাছের মধ্যে কতকগুলি প্রাসাদসদৃশ অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম তাহা এই বিহারের অধ্যক্ষের আবাসগৃহ। তাঁর নাম শাক্য কোমা রিনপোচি। "রিনপোচি" কথাটির অর্থ "রত্নশ্রেষ্ঠ"। চীনের সম্রাট আর এই বিহারের অধিকারী ভিন্ন আর কেহ এ নামে আখ্যাত হয় না। তিব্বতীদের মতে জগতে দুইজন পূজার্হ! তন্মধ্যে ইনি দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমরা এই মহাপুরুষের দর্শনের জন্য চলিলাম। ইনি কৃপা করিয়া যাহার সহিত বাক্যালাপ করেন, তিব্বতীদের চক্ষে সে ব্যক্তিও এক মহাপুরুষ! ইনি যে আশীর্ব্বাদ করেন সে আশীর্ব্বাদ ফাঁকা নয়, তাহার সহিত পার্থিব বস্তুও উপহারস্বরূপ মিলে। বাস্তবিক এ ব্যক্তি ধর্ম্মাচার্য্য কিম্বা গুরু নন, ইনি বিহারের প্রতিষ্ঠাতা শাক্যপণ্ডিতের বংশধর, তাই এত সম্মান। এ ব্যক্তি বিবাহিত, ভোগসুখরত, এমন কি মদ্যপান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। তথাপি প্রধান প্রধান লামা ধর্ম্মাচার্য্যগণেরও ইনি নমস্য। ইঁহাকে তিনবার কুর্নিশ করিতে হয়, লামাশ্রেষ্ঠ না হইলে এ সম্মান কেহ পায় না। বাস্তবিক এ ব্যক্তির আকৃতির ভিতর এমন কিছু আছে, যে, দেখিলেই মহৎবংশজাত বলিয়া মনে হয়। আমি কিন্তু ইঁহাকে তিনবার কুর্নিশ করি নাই, সেইজন্য গৃহে আসিয়া আমার সঙ্গীরা আমায় তিরস্কার করিল। আমি বলিলাম, "ভগবান বুদ্ধের আদেশ, ধর্ম্মাচার্য্য ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনবার কুর্নিশ করিবে না—এ ব্যক্তি ত ধর্ম্মাচার্য্য নয়।" পরদিন বিহারের প্রধান আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখি তিনি একটি ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে খেলা করিতেছেন—মনে হইল ছেলেটি তাঁহার পুত্র হইবে। অনুমান ঠিক বটে! বিহারের প্রধান গুরু বিবাহিত! এ দেশের কি জঘন্য নিয়ম! আমার সেই দণ্ডেই এ ব্যক্তির উপর অশ্রদ্ধা হইল। আমি মনে করিয়াছিলাম কিছুদিন এই বিহারে বাস করিব। কিন্তু এমন ভোগসুখরত লামার সঙ্গ আমার নিকট ঘৃণিত বোধ হইল, আমি পর দিনই সে সহর ত্যাগ করিলাম।

আবার আমি একাকী সঙ্গীবিহীন হইলাম। দুইদিন যাত্রার পর আবার তুষারপাত আরম্ভ হইল—আমার জিনিষপত্র সব ভিজিয়া যাওয়াতে আমি এক গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লইলাম। ৩০এ নবেম্বর একদল পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহাদের ৪০।৫০টি গর্দ্দভ ছিল, তাহাদের একটার পৃষ্ঠে আমার জিনিষপত্র চাপাইয়া এইদলের সঙ্গে চলিলাম। ১লা ডিসেম্বর রাংলা নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম। এ পর্ব্বতের চূড়া লাল পাথরের। সেখান হইতে কাংচেন নামক বিহারে পৌঁছিলাম। সে রাত্রি বিহারের পার্শ্বে মাঠে কাটাইলাম। পথে আসিবার সময় দেখি চাষকরা ক্ষেত। এদেশে প্রতিবৎসর চাষ হয় না, একবৎসর বাদ ফসল তুলিবার নিয়ম। পথে দেখি এক মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে। কিসের মন্দির জিজ্ঞাসা করিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম তাহা বড় অদ্ভুত। ব্যাপারখানা এই :—

কোন গণৎকার নাকি গণিয়া বলিয়াছে, এই স্থানে একটা উৎস আছে, সেটা আর কিছু নয়—দৈত্যের মুখ। যদি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই দৈত্যের মুখ বন্ধ করা না হয়, তাহা হইলে পৃথিবী জলপ্লাবনে ধ্বংস হইবে। তিব্বতরাজ সেই ভয়ে এতবড় ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হাত দিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎবাণীতে সংশয় করিবার কাহারও সাধ্য নাই—করিলে তাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে হইবে। চীন দেশের লামারাও নাকি এই ভবিষ্যৎবাণীর সমর্থন করিয়াছে। আমি কিন্তু ইহার একবর্ণও বিশ্বাস করি না। তিব্বতরাজ্যে একজন গণৎকারের কথায় এত টাকা ব্যর্থ হইতেছে। পৃথিবীতে দেখি রাজাপ্রজা সকলেই গণৎকারের শরণাপন্ন হয়। এ মন্দিরের কাছে দেখি একদল শকুনি। শুনিলাম এদেশে মৃতদেহ শকুনিকে খাইতে দেওয়া হয়, কিন্তু এ অঞ্চলে এতগুলি শকুনির পেট ভরিতে পারে এত লোক মারা পড়ে না, তাই মন্দির হইতে ইহাদের জন্য মাংসের বরাদ্দ আছে, তাই এখানে শকুনির

আবির্ভাব! সেস্থান হইতে কিছু দূরে এক গৃহ দেখিলাম, তার নাম কৃচ্ছ্র-সাধনের মন্দির; যখন কেহ কোন কৃচ্ছ্র-সাধনের ব্রত গ্রহণ করে তখন এখানে বাস করে। সে কি-প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন?—যথা মৌনী থাকা, নিরামিষ ভোজন করা। তিব্বতীরা এত মাংসপ্রিয় যে মাংস ভক্ষণ না করার মত তাহাদের আর কৃচ্ছ্রসাধন নাই।

পরদিন নারটাং মন্দির দর্শন করিতে গেলাম, মন্দির বলি কেন, ইহা তিব্বত রাজ্যের প্রধান ছাপাখানা, এখানে কাঠের হরপে ধর্ম্মপুস্তক ছাপা হয়। বুদ্ধের এবং অন্যান্য বৌদ্ধ সাধুর উপদেশ এখানে সংগৃহীত এবং মুদ্রিত হয়। ৩০০ লামা এই মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত আছেন। এখানকার অধ্যক্ষের সহিত আমার আলাপ হইল, লোকটি অতি সদালাপী, আমি ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত ও উপকৃত হইলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা সরকার।

পুস্তক-পরিচয়

রাঙ্গা-শাঁখা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত গল্পগ্রন্থ। প্রকাশক রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৭৫।১।১ হারিসন রোড, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত ১৫৫ পৃষ্ঠা। ছাপায় ভুল অনেক, কাগজ চলনসই, বাঁধাই সুন্দর। 'মূল্য নয় আনা মাত্র'।

পুস্তকখানিতে 'রাঙ্গাশাঁখা,' 'মুক্তি,' 'হার' প্রভৃতি আটটি গল্প আছে। কোন কোন গল্প আমাদের মন্দ লাগে নাই। বেশ একটা করুণরসের ধারায় দু'একটি গল্প অভিষিক্ত। কিন্তু অধিকাংশ গল্প অতিরিক্ত ফেনানো এবং এত অনাবশ্যক দীর্ঘ যে পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। রচনা-সংযম জিনিসটি না থাকিলে ছোটগল্প লেখা নিতান্তই ব্যর্থশ্রম এবং পড়া আরও বেশী বিড়ম্বনা। এই ফেনানো দোষটি লেখিকার প্রায় সমস্ত গল্প ও উপন্যাসে লক্ষ্য করিয়াছি। ঘটনার আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য লেখিকা এই উপায় অবলম্বন করেন কি না জানি না। বোধ হয় লেখিকার এটাও একটা দুর্ব্বলতা।

পুস্তকখানিতে বানানভুল এত বেশী যে তাহা লজ্জাকর। ভূমিকায় লেখা আছে 'অযাচিত' প্রভৃতি দু'একটি গল্প ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। আমরা কিন্তু সারা পুস্তকখানার সকল পৃষ্ঠা এমন কি মলাট পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন খুঁজিয়া 'অযাচিত' শীর্ষক কোন গল্প পাইলাম না। অযাচিতকে চাহিতে হয় না, কিন্তু আমরা যাচ্ঞা করিয়াও পাইলাম না; দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় ২১ লাইনে আছে—"স্বপত্নীর স্বামী গ্রহণে সম্মত হয়!" ১৩০ পৃষ্ঠায় ২৯ লাইনে এবং অন্যান্য তিন জায়গায় গ্রন্থকর্ত্রী 'আপত্য' লিখিয়াছেন। বেচারা কম্পোজিটরের ঘাড়ে এ ভুল চাপাইয়া যদি লেখিকা রেহাই চান, তবে তাহাতে আমাদের 'আপত্তি' আছে। 'বাগ্‌দত্তা'-লেখিকার এরকম ভুল উপেক্ষা করা যায় না। অহম্।

মহাপ্রসাদ

কবির মত হৃদয় আমার
নয়কো সদাই তরঙ্গিত
কথায় কথায় হয় নাকো তাই
মরমখানি উচ্ছ্বসিত।
তাইতে আমার সকল কাজে
নাইক লীলার মন্দ গতি,
দু এক আখর টানতে গেলেই
অমনি পতন ছন্দ যতি।
কাব্যে আমার নাই অধিকার
কবি সাজাই বিড়ম্বনা
সভ্য হলে কবির দলে
সাজা পাবার সম্ভাবনা।
ভয়ে ভয়ে তাইতে আমি
সরিয়ে নিলেম আসনখানি
বিনয়ভরে ভাবের ঘরে
দিলেম সুখে আগল টানি।
সেদিন হ'তে কাজের স্রোতে
যাচ্ছিল মোর মনটি ভেসে
কেমন করে লাগল আজ
ভাবের তুফান তাইতে এসে,
কেমন করে কাজের ঘরে
জমল এসে ভাবের পাড়ি
হাল ধরেছে কাজের নেয়ে
যাচ্ছে বেয়ে ভাবের দাঁড়ি।
স্থান ছিল না কবির সভায়
ছিলেম সেথায় ভাগ্যহত
তাই বলে কি আনন্দ মোর
বিদায় হবেন জনমমত?
গুপ্ত আমার আনন্দটি
লুপ্ত হবার নাই ভাবনা
অহর্নিশি হিয়ায় বসি
করছিল সে কাজ সাধনা।
সকল কাজে হিয়ার মাঝে
নিত্য তাঁরে স্মরণ করি;
চিত্ত, ভাবের মহাপ্রসাদ
পান করেছে কণ্ঠ ভরি।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ-বিধি।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ-বিধি ভবিষ্যতে কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা অনেক দিন হইতে হইতেছে। গত ২০শে আগষ্ট ভারতসচিব মণ্টেগু ঘোষণা করিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষে জনসাধারণের নিকট সকল কাজের জন্য দায়ী গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য এইরূপ হইলেও সব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে ও ভারত-গবর্ণমেণ্টকে অচিরে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের নিকট দায়ী করা হইবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবেন। প্রথম কিস্তিতেই ভারতবাসীদিগকে কি কি অধিকার দেওয়া হইবে, এবং তাহার পরের কিস্তিগুলি কি হইবে, এবং কত বৎসর অন্তর অন্তর কি প্রণালীতে আমাদিগকে এই কিস্তিগুলি দেওয়া হইবে, এই-সকল বিষয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্টের, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সকলের ও সর্ব্বসাধারণের মত জানিবার জন্য ভারতসচিব কয়েকজন পারিষদ সহ এদেশে আসিয়াছেন। প্রথম কিস্তিতেই ভারতবাসীরা যে-সব অধিকার চান, কংগ্রেস ও মস্‌লেম লীগ তাহা পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাহা খুব বেশী নয়। বাংলাদেশ হইতে ইহা অপেক্ষাও কম চাওয়া হইবে, এরূপ সম্ভাবনা একসময়ে হইয়াছিল। সে ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। আমরা মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে বলিয়া আসিতেছিলাম যে কংগ্রেস ও মস্‌লেম লীগের দাবীর চেয়ে কম কিছু চাওয়া উচিত নয়। ন্যায্য ও সঙ্গত দাবী ইহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে, এরূপ মতও আমরা প্রকাশ করিয়াছি। বাংলাদেশের জেলা-সকলের প্রতিনিধিরা, বঙ্গের ভূস্বামীদের সভা (Bengal Landholders' Association) এবং অন্য কোন কোন সমিতি ও ব্যক্তি কংগ্রেস ও মস্‌লেম লীগ অপেক্ষা অধিক অধিকার চাহিয়াছেন। তাঁহারা যে-ভাবে ভারতগবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সকলকে গঠিত করিতে চান, তাহা কংগ্রেস ও মস্‌লেম লীগের ব্যবস্থা হইতে কতকটা পৃথক্।

আমাদেরও মনে হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন স্বয় বলিতেছেন, ভারতবর্ষে জনসাধারণের নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য, তখন কংগ্রেসের ও মস্‌লেম লীগের আগামী অধিবেশনে এই রেস্পন্সিব্‌ল্ বা দায়ী গবর্ণমেণ্টের প্রথম কিস্তিরূপ ন্যায্য ও সঙ্গত দাবী আমাদের করা উচিত। ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কংগ্রেস মস্‌লেম-লীগের দাবী যাহা, মোটামুটি তাহাই থাকিতে পারে। কিন্তু বাংলা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা, প্রভৃতি প্রদেশগুলির ব্যবস্থাপক সভার সমুদয় সভ্যই নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত, এবং মোটের উপর প্রতি লক্ষ অধিবাসীর একজন করিয়া প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় থাকা উচিত। তাহা হইলে বঙ্গের প্রতিনিধি ৪৫০র কিছু বেশী হইবে। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতাও খুব বেশী লোকের পাওয়া ভাল। ২০ বা তদূর্দ্ধবয়স্ক লেখাপড়া-জানা প্রত্যেক ব্যক্তির, এবং যে-কেহ কোনপ্রকার ট্যাক্স, খাজনা বা সেস্ দেয়, তাহার এই অধিকার থাকা উচিত। এইরূপে বহুলক্ষ লোক নির্ব্বাচনের অধিকার পাইলে এবং প্রত্যেক জেলা হইতে কয়েকজন লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলে, সমস্ত দেশের রাজনৈতিক অসাড়তা দূর হইবে, এবং সকলে বুঝিতে পারিবে যে একটা রাজনৈতিক নবযুগ আরম্ভ হইল। নির্ব্বাচকদের সংখ্যা খুব বেশী হইলে ঘুষ বা অন্যবিধ অসৎ উপায়ে ভোট সংগ্রহ করাও কঠিন হইবে। ইহাতে আরও এই সুবিধা হইবে, যে, নানাজা'তের ও নানাশ্রেণীর লোকের ব্যবস্থাপক হইবার সুবিধা হওয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব কোন কোন জা'ত বা শ্রেণীর একচেটিয়া হইবার সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে।

মন্ত্রীসভা প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ও শক্তিমান্ লোকদিগকে লইয়া গঠিত হইবে। একদল মন্ত্রীর কোন কাজ বা ব্যবস্থা অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদন না পাইলে আর একদল লোক মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন; যেমন বিলাতে পার্লেমেণ্টে হইয়া থাকে।

প্রস্তুত হইতে হইবে।

আমরা কি-রকমের কি অধিকার পাইব, এখন তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের সংখ্যা যে এখনকার চেয়ে বেশী হইবে, এবং তাহাদের ক্ষমতা ও অধিকারও যে এখনকার চেয়ে বেশী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যতটুকু অধিকারই আমরা পাই না

কেন, তাহার ফল নির্ব্বাচিত লোকদের চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতার উপর এবং তাঁহাদের আলস্য কাজ ও অকাজের দিকে জনসাধারণের জাগ্রত দৃষ্টির উপর নির্ভর করিবে। এখন দেখা যায় যে অনেকে নিন্দনীয় উপায়ে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়। এরূপ গর্হিত উপায় অন্য দেশেও অবলম্বিত হয়। কিন্তু তা বলিয়া সেগুলা নির্দ্দোষ নয়। স্বাধীন দেশে লোকমত প্রবল বলিয়া অপেক্ষাকৃত অযোগ্য লোককেও কতকটা সিধা থাকিতে হয়। এবং যোগ্য লোকও বহুপরিমাণে নির্ব্বাচিত হন। আমাদের দেশে লোকমত এখনও প্রবল নয় বলিয়া এবং অনেক যোগ্যতম লোক নির্ব্বাচিত হইতে চেষ্টা করেন না বলিয়া অযোগ্য লোক নির্ব্বাচনের কুফল খুব বেশী। তা ছাড়া, স্বাধীন দেশের খুঁত ধরিবার লোক কম, ধরিলেও কেহ এমন বলিতে পারে না, "তোমরা অযোগ্য, অতএব তোমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লুপ্ত হইল।" আমাদের বিচারক অনেক, এবং তাহারা আমাদিগকে দোষী ও অযোগ্য বলিবার জন্য উন্মুখ। এইজন্য আমারা যেমন একদিকে রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার চেষ্টা করিতেছি, অন্য দিকে সেই অধিকারের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, প্রত্যেক মিউনিসিপালিটিতে একটি করিয়া করদাতাদের সমিতি থাকা উচিত। এই সভা বক্তৃতা, পুস্তিকাবিতরণ, প্রভৃতি উপায়ে শহরবাসীদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য ও অধিকার বুঝাইয়া দিবেন, যোগ্যলোকদিগকে কমিশনার নির্ব্বাচন করিতে শিখাইবেন, নির্ব্বাচিত কমিশনারদিগের কাজের অকাজের ও আলস্যের সমালোচনা করিবেন, এবং শহরের অভাব দূর করিবার ও দুরবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক জেলা ও প্রদেশের কাজ সম্বন্ধেও এইরূপ সমিতি এবং তাহাদের এইরূপ চেষ্টা আবশ্যক। অধিকার লাভের ভাবনা অপেক্ষা প্রাপ্ত অধিকারের যথাযোগ্য ব্যবহারের চিন্তা কম গুরুতর নহে।

বিপ্লবচেষ্টা সম্বন্ধে বঙ্গের লাটের বক্তৃতা।

বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে সম্প্রতি লাটসাহেব বক্তৃতা করিয়া সর্ব্বসাধারণের মনে এই বিশ্বাস উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে, বাংলা দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইবার জন্য একটা বিস্তৃত চক্রান্ত অনেক দিন হইতে চলিতেছে, এবং যে-সব লোককে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে নজরবন্দী বা অন্তরায়িত করা হইয়াছে, ও ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশ্যন অনুসারে যাহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছে, তাহারা কোন না কোন প্রকারে এই বিপ্লবচেষ্টার সহিত জড়িত ছিল; অতএব তাহারা সকলেই অপরাধী।

আমরা এই বিষয়ে আমাদের মত অনেক বার লিখিয়াছি। লাটসাহেবের বক্তৃতা পড়িয়া সে-মত পরিবর্ত্তিত হইল না। পুলিশ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত চক্রান্তকারীদের স্বলিখিত কার্য্যপদ্ধতি ও অন্যান্য কাগজপত্র, এবং অন্তরায়িত (interned) ও রাজনৈতিক বন্দীদের পুলিশের কাছে স্বীকৃত নিজ নিজ অপরাধের বৃত্তান্ত, প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া লাটসাহেব বক্তৃতা করেন। কিন্তু এই-সব কাগজ যে সত্য-সত্যই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কি? পুলিশের কোন-কোন কর্ম্মচারী যে কাগজপত্র জাল করিয়া প্রমাণ সৃষ্টি করে, তাহা অনেকবার প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে। যদি বলেন, যে, এই-সব কাগজপত্রে লিখিত বিপ্লবপ্রয়াসীদের কার্য্যপদ্ধতি বা বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী কোন-কোন ঘটনা ও মোকদ্দমা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ এই, যে, ঐ-সব কাগজপত্র যে ঐ-সব ঘটনা ও মোকদ্দমার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? এমনও ত হইতে পারে যে কাগজপত্রগুলি পরে রচিত হইয়াছে? প্রকাশ্য আদালতে উকীল-ব্যারিষ্টারের তর্কবিতর্কের সাহায্যে জজের দ্বারা যে-সব কাগজপত্র খাঁটি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই, তাহা প্রমাণ বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে পারি না। আর পুলিশের কাছে অপরাধ-স্বীকারোক্তি ত প্রমাণই নয়। সাক্ষ্যবিষয়ক আইনে পরিষ্কার করিয়া লেখা আছে যে, অন্য প্রমাণ না থাকিলে পুলিশকর্ম্মচারীর নিকট অপরাধীর স্বীকারোক্তি প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। এই আইন ভারতবাসী জনসাধারণ, বা জজেরা, বা উকীল-ব্যারিষ্টারেরা, প্রণয়ন করেন নাই, শাসনকর্ত্তা রাজকর্ম্মচারীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন একজন শাসনকর্ত্তা পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তিকে সত্য

প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া বিনা বিচারে দণ্ডিত শত-শত ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলিলে, কেমন করিয়া আমরা তাহা বিশ্বাস করিব? সাক্ষ্য-বিষয়ক আইনে উক্তরূপ স্বীকারোক্তিকে অকারণে অগ্রাহ্য করিতে বলা হয় নাই। ঐ আইনের ভাল-ভাল সংস্করণে এইরূপ বিধির মূলনীতিও বিবৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যে, পুলিশের লোকে লোভ বা ভয় দেখাইয়া, উৎপীড়ন করিয়া আসামীদিগকে অপরাধ স্বীকার করাইতে পারে; এইজন্য অন্য স্বতন্ত্র প্রমাণ না থাকিলে এরকম স্বীকারোক্তি অগ্রাহ্য হইবে। আইনের নজীরের বহিতে ভারতবর্ষের ও বিলাতের হাইকোর্ট-জজদের রায় হইতে এরূপ উক্তি উদ্ধৃত দেখা যায়, যে, যে-সব স্থলে অন্য কোন প্রমাণ থাকে না, প্রধানতঃ সেখানেই স্বীকারোক্তি উপস্থিত করা হয়। এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, যে, কেবল যে সব মোকদ্দমায় অন্য কোন প্রমাণ থাকে না সেই-সব স্থলেই আসামীরা অনুতপ্ত হইয়া স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে অপরাধ স্বীকার করে। জজেরা ইহাও দেখাইয়াছেন যে যে-সব আসামী পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করে, তাহারা প্রায়ই প্রকাশ্য আদালতে বিচারকের নিকটে আসিয়া তাহা প্রত্যাহার করে।

বিনা বিচারে যে-সব লোক স্বাধীনতা হারাইয়াছে, তাহাদের একজনকেও আমরা দোষীও বলিতেছি না, নিরপরাধও বলিতেছি না। কিন্তু যাহাদের দোষ প্রকাশ্য আদালতের বিচারে প্রমাণিত হয় নাই, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিরপরাধ মনে করিতে আমরা বাধ্য।

বাঙালীরা বার-বার বলিয়াছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগের বিচার হউক, বা তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। লাটসাহেব বলিতেছেন, আবদ্ধ ব্যক্তিরা পুলিশের কাছে দোষস্বীকার করায় সাক্ষ্য-আইন অনুসারে তাহাদের স্বীকার-উক্তি প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না বলিয়া আমরা তাহাদিগকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দোষ স্বীকার করিলে, স্বীকারোক্তি ত প্রমাণ বলিয়া সাক্ষ্য-আইন অনুসারে গৃহীত হইতে পারিত। তাহারা যদি অনুতাপের প্রেরণায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপরাধ মানিতে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেই একাইক আনা হয় নাই কেন? এরূপ যে করা হয় নাই, ইহাতেই মনে হয়, যে, আসামীরা হয় দোষ স্বীকার করে নাই, উহা পুলিশের বানান কথা, কিম্বা তাহারা পুলিশ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ বা উৎপীড়িত হইয়া মিথ্যা দোষ স্বীকার করিয়াছে। লাটসাহেব আরও বলিয়াছেন, আমরা অনেক-স্থলে এইরূপ লোকদের বিচার করাইয়াছি। বেশ কথা;—আমরাও ত প্রকাশ্য আদালতের বিচারে দোষী বলিয়া বিবেচিত লোকদিগকে নির্দোষ বলিতেছি না। কিন্তু কতকগুলি লোক বিচারে দণ্ড পাইয়াছে বলিয়া অন্য কতকগুলি লোককে বিচার না হওয়া সত্ত্বেও আমরা দুষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। এক বস্তা চাউল হইতে এক মুঠা চাউল নমুনা লইয়া তাহার ভাল মন্দের একটা অনুমান লোকে করে বটে; কিন্তু পুলিশের ধৃত শত-শত লোকের মধ্যে ৫০।৬০ জন অপরাধী বলিয়া সেই নমুনা অনুসারে অন্যদের অপরাধ অনুমিত হইতে পারে না।

লাটসাহেব বলিয়াছেন, অতঃপর কাহাকেও ভারতরক্ষা আইন, ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশ্যন, বা ভারতপ্রবেশ অনুজ্ঞা (Ingress Ordinance) অনুসারে আবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে কাগজপত্র দুজন জজের নিকট উপস্থিত করা হইবে। ইঁহারা সিবিলিয়ান-জজ, কি উকীল-জজ, কি ব্যারিষ্টার-জজ হইবেন, তাহা জানি না; ইঁহারা স্বাধীনচেতা ও সুবিচারক কিনা, তাহাও জানি না; ইঁহারা বাঙালীর প্রকৃতি ও রীতিনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ দেশী বা বিদেশী লোক তাহাও জানি না। ইঁহাদের সমক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং বা উকীল ব্যারিষ্টার দ্বারা দোষ খণ্ডন ও উল্টা প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পাইবে কি না, জানি না। সুতরাং লাট সাহেবের এই ব্যবস্থার ফল সন্তোষজনক হইবে কি না বলিতে পারি না। তাছাড়া, এই ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য। কিন্তু এখন যাহারা আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের প্রতি যে অবিচার হয় নাই, তাহা কেন ধরিয়া লওয়া হইবে? তাহাদিগকেও প্রস্তাবিত সুবিধা, যত সামান্যই হউক, দেওয়া হউক। তিনি আরও বলিয়াছেন, একটি কমিটির নিকট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের

হাতের সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে রায় দিতে বলিবেন, যে, বাংলাদেশে বিপ্লবপ্রয়াস ও তদর্থে ষড়যন্ত্র হইয়াছে কি না। তিনি বলিয়াছেন, এই কমিটি নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ হইবেন, বিলাতের হাইকোর্টের একজন জজ ইহার সভাপতি হইবেন, এবং ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়বিধ লোক সভ্য হইবেন। সভাপতি ও সভ্যগণের নাম ও সম্যক্ পরিচয় জানিতে পারিলে কমিটির কাজ সন্তোষজনক হইবে কি না কতকটা অনুমান করিতে পারা যাইবে; তবে ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে, যে, কমিটির সম্মুখে যদি কেবল পুলিশের সংগৃহীত উপকরণ উপস্থিত করা হয়, যদি আবদ্ধ লোকদিগকে স্বয়ং বা উকীল-ব্যারিষ্টারের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া না হয়, এবং যদি বঙ্গের জনসাধারণের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিবার জন্য বা তাহাদের বক্তব্য বলিবার জন্য কাহাকেও ডাকা না হয়, তাহা হইলে এই কমিটির রায়ে বাঙালী আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না।

এই কমিটি নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্য আমরা ঠিক্ অনুমান করিতে পারিতেছি না। যদি কমিটি বলেন বিপ্লবসংঘটনার্থ কোন দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র নাই, তাহা হইলে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে কি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? যদি বলেন, ষড়যন্ত্র ছিল ও আছে, তাহা হইলে কি বলা হইবে যে আবদ্ধ ব্যক্তিরা সবাই দোষী, এবং তাহাদিগকে যুদ্ধের অবসানের পরেও বরাবর স্বাধীনতায় বঞ্চিত রাখা হইবে? কোন গ্রামে একটা খুন বা ডাকাতি হইয়াছে, ইহা প্রমাণ হইলেই কি পুলিশ কর্তৃক ধৃত সমুদয় লোক দোষী সাব্যস্ত হয়? একটা আশঙ্কার কথাও বলি। কমিটি যদি বলেন, বাংলা দেশে ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তাহা হইলে কি এই রায় আমাদের স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব লাভের বিরুদ্ধে একটি প্রবল যুক্তি বলিয়া ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ও বণিকেরা ব্যবহার করিবে? আমরা কিন্তু এই মনে করি, যে, কোন দেশে বিপ্লবচেষ্টা হইলে তাহার সুস্পষ্ট মানে এই যে, তাহার শাসনকর্ত্তারা অযোগ্য ব্যক্তি, বা শাসনপ্রণালীর খুব দোষ আছে; কিম্বা শাসনপ্রণালীও ভাল নয়, শাসনকর্ত্তারাও অযোগ্য; সুতরাং তথায় রাষ্ট্রীয়কার্য্য নির্ব্বাহের নূতন ও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। দেশের লোককে দেশের কাজ করিতে দেওয়া অপেক্ষা সুবন্দোবস্ত হইতে পারে না।

নজরবন্দীদের গ্রাসাচ্ছাদন।

ব্যবস্থাপক সভায় নজরবন্দীদের সম্বন্ধে নানাপ্রশ্নের সরকারী উত্তর হইতে জানা যায় যে গবর্ণমেণ্ট কাহাকেও নজরবন্দী (intern) করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্নবস্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করেন না। তাহাকে নিজে বা তাহার পরিবারের লোকদিগকে তাহার খরচ চালাইতে হয়। সে কিম্বা তাহার পরিবারের লোকেরা ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট অন্নভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যতদিন দরখাস্ত মঞ্জুর না করেন, ততদিন তাহাদিগকে পুলিশের অনুগ্রহপ্রদত্ত ঋণের উপর নির্ভর করিতে হয়। আদালতের বিচারের পর যাহাদের কারাদণ্ড হয়, তাহাদের অবস্থা বিনা বিচারে দণ্ডিত এই লোকগুলির অবস্থা হইতে দুই বিষয়ে ভাল। (১) কয়েদীদিগের ভাতকাপড়ের খরচ তাহাদিগকে বা তাহাদের পরিবারস্থ লোকদিগকে চালাইতে হয় না; (২) তাহারা যতই গরীব হউক, সরকারের কাছে তাহাদিগকে ভিখারীর মত অন্নভিক্ষা করিতে হয় না,—এই হীনতা স্বীকার তাহাদিগকে করিতে হয় না।

নজরবন্দীদের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে তাহাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে বাধ্য করা কোন্ নীতি, কোন্ শাস্ত্র, বা কোন্ আইন সম্মত, আমরা স্থির করিতে পারি নাই। কোন পরিবারের একজন লোক যদি চুরি করে, জাল করে, নরহত্যা করে, তাহা হইলে শাস্তি তাহারই হয়, তাহার পরিবারের লোকদের হয় না। কোন ব্যক্তি যদি রাজদ্রোহ করে, এবং আদালতের বিচারে তাহার দোষ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে শাস্তি তাহারই হয়, তাহার পরিবারস্থ লোকদের হয় না। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে এই সন্দেহে ধৃত ও নজরবন্দী হয়, অথচ তাহাকে আদালতে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার মত যথেষ্ট প্রমাণ তাহার বিরুদ্ধে না থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বাধীনতালোপরূপ শাস্তি তাহার হয়, এবং তাহার রোজগার হইতে বঞ্চিত হইয়াও তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়া তাহার পরিবারস্থ লোকেরা দণ্ডিত হইতে পারে,—অবশ্য যদি তাহাদের তেমন আয় থাকে। অর্থাৎ কাহারও বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের যথেষ্ট প্রমাণ

থাকিলে কেবল তাহারই দণ্ড হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহার বিরুদ্ধে আদালতে বিচারের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে তাহার অন্তরায়ন (Internment) দণ্ড এবং তাহার পরিবারস্থ লোকদের তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ-রূপ জরিমানা বা অর্থদণ্ড হইতে পারে। যথেষ্ট বা বেশী প্রমাণে কেবল অপরাধী একজনের দণ্ড, কিন্তু অযথেষ্ট বা অল্প প্রমাণে তদতিরিক্ত নিরপরাধ একাধিক লোকেরও দণ্ডের ইহা চমৎকার দৃষ্টান্ত।

রাজনৈতিক সন্দেহভাজন কয়েদীদের প্রায়োপবেশন।

কিছুদিন হইল আমরা একখানা চিঠি পাই যে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশুন অনুসারে আবদ্ধ ১৮জন ব্যক্তি এবং ভারতরক্ষা আইন অনুসারে আবদ্ধ ২জন লোক ১লা ডিসেম্বর হইতে প্রায়োপবেশন করিয়াছে; উদ্দেশ্য এই যে হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মুক্তি দিবেন, নতুবা তাহারা উপবাস করিয়া মরিবে। চিঠিতে এই কুড়িজন লোকের নামধাম লেখা ছিল, এবং কাহাকে কাহাকে এইরূপ চিঠি পাঠান হইয়াছে, তাহাও লেখা ছিল; তাহারা কি কি রকমে কষ্ট পাইয়াছে, তাহা লেখা ছিল, এবং তাহাদের উপর নানাবিধ কথ্য ও ভীষণ অকথ্য অত্যাচারের উল্লেখ ছিল; প্রায়োপবেশকেরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে বড়লাট পর্য্যন্ত সকল রাজপুরুষের নিকট দরখাস্ত করিয়া কোন ফল পায় নাই, চিঠিতে ইহাও লেখা ছিল। চিঠিতে এই-সব কথা যাহা লেখা ছিল, তাহার সমস্তই সত্য কি না কিম্বা কোন কোন অংশও সত্য কি না, আমাদের তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই। গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে পারেন। এইরূপ চিঠি যে-সব লোকদের কাছে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া চিঠিতে লেখা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে ১১জনের নামও চিঠিতে ছিল। তন্মধ্যে তিনজন লোক সম্পাদক ও পাঁচজন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। চিঠির অনেক কথা অবিলম্বে অমৃতবাজার-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহার পর বেঙ্গলীতেও কিছু প্রকাশিত হয়। তাহার পর "এসোসিয়েটেড্ প্রেস্" নামক সংবাদ-সংগ্রাহক কোম্পানী সরকারী-সূত্রে সংবাদ পাইয়া দৈনিক কাগজে খবর দিয়াছেন যে এই প্রায়োপবেশনের খবর সত্য, কিন্তু আবদ্ধ ব্যক্তিরা জেলের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন উৎপীড়নের অভিযোগ করে না, কেবল মুক্তি পাইবার জন্য উপবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। আমরা কিন্তু ইহাই বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। এই বিষয়টির প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অমৃতবাজার ও বেঙ্গলীতে খবর বাহির হইয়াছে যে আবদ্ধ ব্যক্তিদের অনেককে এলাহাবাদ, নৈনী, জলপাই-গুড়ি, প্রভৃতি নানাস্থানের জেলে পাঠান হইয়াছে। ৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহারা উপবাসের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই। তাহাদের সঙ্গে যোগ্য ডাক্তার দিয়া তাহাদিগকে রেলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠান হইয়াছে। ৬ই ডিসেম্বরের কাগজে এইসব খবর বাহির হইয়াছে। প্রায়োপবেশন আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথা। এখনও লোকে ধরনা দেয়, হত্যা দেয়। এই সেদিনও, ঘৃতে চর্ব্বির ভেজাল দূর না হইলে, তাহারা আর আহার করিবে না, বলিয়া অনেক মাড়োয়ারি ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে উপবাসী হইয়া ছিলেন। আলি-পুরের বন্দীরা পুরাতন প্রথার নূতন-রকম প্রয়োগ করিয়াছে মাত্র। বিলাতে রাজনৈতিক অধিকারপ্রার্থিণী নারীরা তাহাদের এই অধিকার লাভের চেষ্টা উপলক্ষে কোন আইন ভঙ্গ করিয়া জেলে গেলে অনেকে প্রায়োপবেশন করিত। তখন তাহাদিগকে জোর করিয়া, নাকের ভিতর দিয়া নল চালাইয়া, খাওয়াইতে চেষ্টা করা হইত। ২।৪ দিন এইরূপ চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইত। আয়ারলণ্ডের শিন-ফেন দলের কয়েদীরাও এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। আমাদের দেশের এই প্রায়োপবেশক-দিগকে জোর করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে কি না আমরা এপর্য্যন্ত (২১শে অগ্রহায়ণ) তাহা শুনি নাই। কাগজে কেবল দেখিলাম যে অন্তরায়নের কর্ত্তা ষ্টীফেন্-সন্ সাহেব তাহাদিগকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। কাগজে ইহাও বাহির হইয়াছে যে কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফল জানা যায় নাই। ব্যবস্থা-পক সভার কোন সভ্য এবিষয়ে প্রশ্ন করিয়া অন্ততঃ যদি জানিতে পারেন যে প্রায়োপবেশকেরা সকলে বাঁচিয়া আছে

কি না, এবং তাহারা স্বয়ং খাইতেছে বা তাহাদিগকে জোর করিয়া খাওয়ান হইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব। রাজনৈতিক বন্দীরা দেশের লোকদের কোন চেষ্টা দ্বারা উপকৃত হইবে, এরূপ সম্ভাবনা কম। তাহারা আপনাদের মনের জোর ও বিধাতার কৃপাকে চরম অবলম্বন স্থির করিয়াছে।

প্রায়োপবেশক রাজনৈতিক বন্দীদের খবর প্রত্যহ গবর্ণমেণ্টের বাহির করা দরকার। দেশের লোকের না হউক তাহাদের আত্মীয়দের খবর পাইবার অধিকার আছে। তাহাদিগকে আলিপুর জেল হইতে না সরাইয়া, তাহাদের আত্মীয়দিগকে তাহাদিগকে বুঝাইয়া উপবাসভঙ্গ করাইবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। গুজব রটিয়াছে, যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মুক্তি ত দিবেনই না, অধিকন্তু তাহাদের আরও শাস্তি হইবে। এই গুজব মিথ্যা হইলে সুখী হইব, কারণ ক্রোধ ও প্রতিহিংসা আদর্শ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসঙ্গত ও অশোভন।

নজরবন্দীদের অবস্থা-পরিদর্শক কমিটি।

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে অন্তরায়িত লোকদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য ও তাহাদের কোন অভাব অভিযোগ থাকিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া বেসরকারী লোকদের কমিটি নিযুক্ত হউক। এই প্রস্তাব মঞ্জুর হয় নাই। সরকারী কর্ম্মচারীরা বলিয়াছেন, আবদ্ধ ব্যক্তিরা বেশ আরামে আছে, তাহাদের খুব যত্ন করা হয়। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সেই আরামের অবস্থাটা আমাদিগকে দেখিতে দিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে দিলে ত কোন ক্ষতি হয় না। রাজকর্ম্মচারীরা বলিতেছেন, "আমাদিগকে বিশ্বাস কর," কিন্তু তাঁহারা বেসরকারী লোকদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কি মনে করেন, প্রস্তাবিত বেসরকারী পরিদর্শক-কমিটিগুলি মিথ্যা রিপোর্ট দিত?

বিপ্লবচক্রান্তের অনুসন্ধান-কমিটি।

ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে বিপ্লবপ্রয়াসীদের চক্রান্তের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য প্রস্তাবিত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত অনুসন্ধান ছাড়া কমিটি আরও দুটি কাজ করিবেন। (১) এইসব চক্রান্ত দমন করিবার জন্য যথাযোগ্য কাজ করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্টকে কিরূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে, তাহা পরীক্ষা ও বিবেচনা করা, (২) চক্রান্ত দমন করিবার জন্য যদি নূতন আইন করিতে হয়, তাহা হইলে সে আইন কিরূপ হওয়া চাই, তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া। লর্ড রোনাল্ডশে যখন ব্যবস্থাপক সভায় এই কমিটির কথা বলেন, তখন ইহার নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা অনুমান হইয়াছিল। এখন বুঝা যাইতেছে, শাসন ও পুলিস বিভাগের কর্ত্তারা শীঘ্র দণ্ড-বিধানের আরও সহজ অথচ আইনসঙ্গত ক্ষমতা পাইবার জন্য উৎসুক হওয়ায়, প্রধানতঃ নূতনতর দমনবিধি প্রণয়নের মন্ত্রণার জন্য এই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে দমন-নীতি কি এখনও শেষ সীমায় পৌঁছে নাই? "মর্লী-মিণ্টো সংস্কার"গুলির সময়ে নূতন দমনবিধির ব্যবস্থা হইয়াছিল। "হোমরুল" স্থাপিত হউক বা না হউক, অতিব্যগ্র নবযুগ-অভিলাষীরা জড়দেহধারী রুল-নামক অন্য একটি জিনিষ হয়ত প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। শাপ ও বর কি দুই সতীন, না পেট ও পিঠ?

আমাদের বক্তব্য এই, যে, যদি নূতন আইন একান্তই আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ইহা যেন যথার্থ আইন নামের যোগ্য হয়, ইহাতে যেন অভিযুক্তের বিচার থাকে, শাসক-কর্ম্মচারী বা পুলিস-কর্ম্মচারীর সন্দেহ ও স্বেচ্ছাকেই যেন আইন নাম দেওয়া না হয়। আমরা ইহাও আশা করি যে নূতন আইন করিয়া পুলিসের নিকট আসামীর অপরাধস্বীকার তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ও বৈধপ্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবে না; সেরূপ আইন বর্ত্তমান সাক্ষ্য-বিষয়ক আইনের মূলনীতির বিরোধী হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যেরা এখন কলেজ পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা তেইশটি প্রশ্ন ছাপাইয়া অনেক লোককে পাঠাইয়াছেন; শুনিলাম ৫০০ লোককে পাঠাইয়াছেন। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকদিগকে, অন্ততঃ ইংরেজী দৈনিক-সকলের সম্পাদকদিগকে, প্রশ্নগুলি পাঠান হইয়াছে কি না,

জানি না। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে প্রশ্নগুলির উত্তর পাঠাইতে হইবে; কেহ যদি একান্ত তাহা না পারেন, তাহা হইলে ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে পাঠাইলে ভাল হয়। তাহার পর উত্তর পাইলে কমিশন তাহা বিবেচনা করিতে নাও পারেন। যাঁহারা উত্তর পাঠাইবেন, তাঁহাদের সকলকেই মৌখিক সাক্ষ্য দিতে ডাকা হইবে না, কাহাকেও কাহাকেও ডাকা হইবে। কমিশনের বিবেচ্য বিষয়গুলি খুব গুরুতর। এইজন্য সমস্ত প্রশ্ন ইংরেজী দৈনিকগুলিতে মুদ্রিত এবং প্রশ্নের বিষয়গুলি সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইলে ভাল হইত। এইজন্যই আমাদের কৌতূহল হইতেছে যে প্রশ্নগুলি ইংরেজী দৈনিক-সমূহের সম্পাদকদিগকে পাঠান হইয়াছে কি না। দেশী কোন দৈনিকে ত এখনও (২২ অগ্রহায়ণ) মুদ্রিত দেখি নাই। আমাদের কাছে প্রশ্নগুলি সবে ১২ই ডিসেম্বর আসিয়াছে; কিন্তু ব্যাপারটির গুরুত্ব বেশী বলিয়া আমরা চেষ্টা করিয়া প্রশ্নগুলি, কিছু বিলম্বে, অন্য জায়গা হইতে জোগাড় করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমরা মডার্ণরিভিউ ও প্রবাসীতে শিক্ষা সম্বন্ধে ছোট বড় অনেক আলোচনা করিয়া থাকি। তজ্জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের পর্য্যন্ত সমুদয় শিক্ষাসম্বন্ধীয় রিপোর্ট ও পুস্তক আমরা উভয় কাগজের জন্যই পাইয়া থাকি। কিন্তু আমাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের প্রশ্নগুলি যথাসময়ে পাঠান হয় নাই। হইতে পারে, কোন সম্পাদককেই ইহার পূর্ব্বে পাঠান হয় নাই।

দেখিলাম কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌স্টিটিউশন বা গঠনবিধি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই। ইহার সেনেট, সীণ্ডিকেট, প্রভৃতি, এখন যে-ভাবে গঠিত হয়, তাহার কোন পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় কি না, তৎসম্বন্ধে কমিশনকে কোন অনুসন্ধান করিতে বলা হয় নাই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসাধারণের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়া খুব আবশ্যক। রাষ্ট্রীয় সমুদয় কাজে গণমতের কর্তৃত্ব সদ্যসদ্য কতদূর প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য বিলাত হইতে ভারতসচিব পারিষদ সহ আসিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে গণমতের প্রাধান্য স্থাপন গবর্ণমেণ্ট বিবেচনারও বিষয় মনে করিতেছেন না। গণমতের প্রাধান্য না থাকার কুফল ত আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছেই; অধিকন্তু যাহার জন্য দেশের লোক দায়ী নয়, তাহার জন্য তাহাদিগকে দোষী এবং দায়ীও করা হইতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দি। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন দুই দুই বার বাহির হইয়া যাওয়ায় এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা অমনি সুর ধরিল, "তোমাদের ত এই কার্য্য-দক্ষতা; তোমরা প্রশ্ন গোপনে রাখিতে পার না, অথচ হোমরূল চাও?" অথচ ভাবিয়া দেখা হইল না যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজে দেশের লোকের কর্তৃত্ব কতটুকু। এক-শত ফেলো বা সদস্য লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট বা অধ্যক্ষ-সভা গঠিত। মোটামুটি ইহার অর্দ্ধেক ইংরেজ, অর্দ্ধেক দেশী লোক। একশত জনের মধ্যে কেবল দশ-জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টরীভুক্ত উপাধিধারীরা নির্ব্বাচন করেন, সরকারী বেসরকারী ইংরেজ ও দেশী ফেলোরা ১০জনকে নির্ব্বাচন করেন, ১০জন সরকারী কর্ম্মচারী—তাঁহাদের চাকরীর বলেই আইন অনুসারে ফেলো বলিয়া গণ্য, বাকী ৭০জনকে গবর্ণমেণ্ট মনোনয়ন করিয়া নিযুক্ত করেন। ভাইস্‌-চ্যান্সেলারকে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন; এইজন্য ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌-চ্যান্সেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের দলপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এবং বর্ত্তমান ভাইস্‌-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী উভয়েই গবর্ণ-মেণ্টের নিযুক্ত লোক। তাঁহাদের দক্ষতার যশোভাগী দেশের লোক নহে, তাঁহাদের অকাজ বা অযোগ্যতার জন্যও আমরা দায়ী নহি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন চুরির জন্য প্রধানতঃ দায়ী রেজিষ্ট্রার ক্রল সাহেব। তাঁহাকে দেশের লোক বা তাঁহাদের প্রতিনিধিরা নিযুক্ত করেন নাই। যদি, সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ, দেশের লোকদের প্রতিনিধিরাই ফেলো হইতেন, এবং তাঁহাদের কর্তৃত্বে কোন নিন্দনীয় কাজ হইত বা ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার জন্য আমরা দায়ী ও নিন্দাভাজন হইতাম। কিন্তু সেই অপকর্ম্ম বা লজ্জাকর ঘটনার প্রতিকার করিবার চেষ্টাও আমরা করিতে পারিতাম; আমরা যোগ্যতর ফেলো, রেজিষ্ট্রার, ভাইস্‌-চ্যান্সেলার, ইত্যাদি নিয়োগের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অকারণ গালি খাই, অথচ প্রতিকার করিবার কোন ক্ষমতাই আমাদের নাই। বর্ত্তমান ইংরেজী বৎসরের গোড়ার দিকে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন দু'বার বাহির হওয়ায় তাহার কারণ অনুসন্ধান

করিবার জন্য কমিটি বসে। তখন আমরা উহার কাজের গতিক দেখিয়া বলিয়াছিলাম যে সম্ভবতঃ গড়িমসি করিতে করিতে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসিবার সময় পর্য্যন্ত কমিটির রিপোর্ট লেখা বন্ধ বা প্রকাশ চাপা থাকিবে। কাজেও তাহাই ঘটিয়াছে। কমিটির সভাপতি আশুবাবু এখন কমিশনের কাজে ব্যস্ত। সম্ভবতঃ এই ওজুহাতে প্রশ্নচুরি-কমিটির রিপোর্ট আর লোকালয়ে প্রকাশিত হইবে না। দোষী লোকদিগকে এই-প্রকারে বাঁচাইয়া দেওয়া হইল। ক্রল সাহেব ৫ বৎসর রেজিষ্ট্রার আছেন। তাঁহার আমলে প্রায় প্রতিবৎসর একটা-না একটা গুরুতর ভুল-চুক ত্রুটি হইয়াছে। ১৯১৪ সালে শেষ এম্-বি পরীক্ষার রোলে নম্বর তুলিতে ভুল হয়; ঐ বৎসরই কোন কোন এম্-এ পরীক্ষার্থী প্রশ্ন জানিয়া ও উত্তরের শাদা খাতা চুরি করিয়া বাড়ী হইতে উত্তর লিখিয়া আনিয়া পাস্ করিবার চেষ্টা করে। ১৯১৫ সালে মফঃস্বলে প্রবেশিকার বাংলা প্রশ্নপত্র ও আই-এ পরীক্ষার উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র প্রেরণে উল্টাপাল্টা ও ভুল হয়। ১৯১৬ সালে মেডিক্যাল কলেজের কোন কোন ছাত্র উত্তরের শাদা খাতা চুরি করে। ১৯১৭ সালে প্রবেশিকার প্রশ্ন দুবার বাহির হইয়া যায়, এবং অন্য পরীক্ষারও কোন কোন প্রশ্ন জানা পড়ে। এই বৎসরই অর্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হামিল্টন সাহেবের চাকরীসম্বন্ধীয় কাগজপত্র লইয়া ক্রল সাহেবের দোষে একটা বিভ্রাট ঘটে। এহেন যোগ্য ক্রল সাহেবকে মাসিক একহাজার টাকা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইনি ইউরোপের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই বা উপাধি পান নাই; জার্ম্মেনীর কোন হাইস্কুলের ইনি ছাত্র; ভারতবর্ষে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকতা করিয়া ও শেষ পাঁচবৎসর রেজিষ্ট্রারের কাজ করিয়া এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি এখন আমাদের এম্এ, এম্-এস্সী পরীক্ষার্থীদিগকে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে গবেষণা করিতে শিখাইবেন। অথচ উদ্ভিদ-বিজ্ঞান তিনি কখন পড়াইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। শুনিয়াছি নাকি তাঁহার এবিষয়ে বিদ্যা এই পর্য্যন্ত যে, তিনি পুরাকালে যৌবনে পর্য্যটক-বৃত্তি (travelling scholarship) পাইয়া উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহাদি কি একটা কাজ করিয়াছিলেন! ইহা সত্য কি না, জানি না। কিন্তু এরূপ প্রাক্তনের জোরে বৃদ্ধ বয়সে হাজার টাকার চাকরী পাওয়া খুব কপাল-জোর বলিতে হইবে। এই চাকরীর জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া পদ-প্রার্থীদিগকে দরখাস্ত করিতে বলা হয় নাই। বিজ্ঞাপন দিলে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গ্রাজুয়েট শ্রীযুক্ত বীরবল সহ্‌নী মহাশয়ের মত লোককেও পাওয়া যাইতে পারিত। ইনি কেম্‌ব্রিজের ইমানুয়েল কলেজ হইতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য দেড় হাজার টাকার বৃত্তি পাইয়াছেন। তা ছাড়া তিনি ঐ বিজ্ঞানে গবেষণা করিবার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্সন ফণ্ড হইতেও দেড় হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। অকেজো জার্ম্মেন বুড়োমানুষকে নিযুক্ত না করিয়া এইরূপ সুযোগ্য প্রতিভাশালী ভারতবর্ষীয় যুবককে নিযুক্ত করিলেই ঠিক কাজ হইত। কাগজে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন না দিয়াই শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয় এক যুবককে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের কোন ল্যাবরেটরী বা এম্-এ এম্-এস্সীর ছাত্র আছে বলিয়া শুনি নাই। এই যুবক এখনও বিলাতে আছেন। হয়ত তিনি ফিরিয়া আসিবার পর যদি ছাত্র জুটে, এই ভরসায় অধ্যাপক নিয়োগ করা হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান বৎসরে প্রাণিবিজ্ঞানে কেম্‌ব্রিজে কৃতিত্বের জন্য আমরা মান্দ্রাজপ্রদেশের শ্রীযুক্ত জী ম্যাথেই মহাশয়ের নাম শুনিয়াছি। বিলাতী কাগজে দেখিয়াছি তাঁহাকে প্রাণিবিজ্ঞানে গবেষণা করিবার জন্য বিলাতেই দেড় হাজার টাকার বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। প্রাণি-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা ও গবেষণার জন্য আর-কোন যুবা ভারতবাসীর নাম আমরা বিলাতী কাগজে দেখি নাই। কাগজে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দিয়া বা অন্য উপায়ে এইরূপ প্রতিভাশালী যুবকদিগকে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। তাঁহাদের উৎসাহ ও প্রতিভার প্রভাবে আমাদের ছাত্রদেরও উৎসাহ বাড়ে এবং প্রতিভার বিকাশ হয়। কলিকাতার শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বি-এস্সী উপাধি পান। তাহার পর প্রাণিবিজ্ঞানে অনেক গবেষণা করিয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের

ডি-এস্‌সী উপাধি পাইয়াছেন। তিনি প্রৌঢ়, ও এ বিষয়ে বিচক্ষণ লোক। তাঁহার দ্বারাও কি প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপনা হইতে পারিত না? এই বৎসর পরীক্ষার প্রশ্নচুরি বিভ্রাট হওয়ায় একজন পরীক্ষা-তত্ত্বাবধায়ক (controller of examinations) নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কাজের জন্য যোগ্যতম লোক ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি দরখাস্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে জোর করিয়া দরখাস্ত প্রত্যাহার করান হইয়াছে; সম্ভবতঃ এইজন্য, যে, তাঁহার দরখাস্ত থাকিতে আর-কাহাকেও নিযুক্ত করা বর্ত্তমান "জো-হুকুম"-বহুল সেনেটের পক্ষেও অতিবড় কলঙ্কের কথা হইত। অর্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হামিল্টন সাহেব তাঁহার চাকরীর সর্ত্ত পালন করেন নাই, ইহা তাঁহার কাজের অনুসন্ধাতা কমিটির রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে; অথচ তাঁহার চাকরীটি ঠিক্ বজায় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ বেঠিক্ কাজ আরও আছে। তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে তাহা আমাদেরই, অপযশও হইতেছে আমাদেরই; কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় আমাদের হাতে নাই। তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌সটিটিউশন বা গঠনবিধির সংস্কার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের ইহা অন্যতম বিবেচ্য বিষয় নহে। কমিশনের প্রশ্নগুলির উত্তর আমরা দিব না, সমুদয় প্রশ্নের বিষয়ের আলোচনা করিবারও স্থান ও সময় নাই। কেবল সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র কলিকাতার বাহিরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব।

কমিশনের একবিংশ প্রশ্ন এই :—

21. Have you any suggestions or criticisms to offer with regard to the proposal that the University (and such of its constituent colleges as may desire) should be removed to an easily accessible site in the suburbs, with a view to facilitating—

(*a*) an expansion of the activities of the University;

(*b*) the erection of suitable buildings for colleges and residences for teachers and students; and, generally,

(*c*) the growth of corporate university life.

এরূপ একটি প্রস্তাবের সমালোচনা করা সোজা নয়; কারণ প্রস্তাবটি কোন একটি মূল নীতির সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতেছে না। অর্থাৎ প্রস্তাবটিতে ইহা বলা হইতেছে না যে কলিকাতার সব কলেজকেই বাহিরে যাইতে হইবে, বা কোনটিকেই যাইতে হইবে না; প্রত্যেককে যাওয়া বা না যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। ইহা অক্সফর্ড, কেম্ব্রিজ বা অন্য কোন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার অনুরূপ নহে। প্রস্তাবটির শেষ উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্মিলিত সমষ্টিগত জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ। তাহারই প্রথমে আলোচনা করা যাক্। প্রস্তাবটি এই যে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ সেনেট হাউস্, আইন কলেজ, বিজ্ঞান কলেজ ও এম্-এ এম্-এস্‌সী ছাত্রদের সমুদয় ক্লাস, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সহরতলীতে লইয়া যাইতে হইবে। যদি কোন কোন কলেজ তথায় যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাদেরও জায়গা সেখানে করা হইবে। মনে করুন কমিশন প্রস্তাবের পক্ষে মত দিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টও তাহা মঞ্জুর করিলেন। তাহা হইলে, সেনেটহাউস্, আইন কলেজ, বিজ্ঞান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের অন্যান্য ক্লাস সহরতলীতে উঠিয়া গেল। এই প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের মত হইলে, সম্ভবতঃ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সংস্কৃত কলেজও সেখানে যাইবে। মিশনরী ও বেসরকারী অন্য কলেজগুলি উঠিয়া যাইতে চাহিবে না, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বহু হাঁসপাতাল সহ মেডিক্যাল কলেজ, এবং বেলগাছিয়ার বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ তথায় যাইবে না, ইহাও একরূপ নিশ্চিত। তাহা হইলে অধিকাংশ কলেজই যদি সেখানে না গেল, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্মিলিত সমষ্টিগত জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ কেমন করিয়া হইবে?

কলিকাতার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট অর্থাৎ এম-এ এম-এস্‌সী অধ্যাপনার নূতন নিয়ম অনুসারে যে-যে কলেজের এইরূপ অধ্যাপনার ক্লাস ছিল, এবং অধ্যাপক ছিলেন, সবই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের। সহরতলীতে গেল না, এরূপ কোন কলেজের পোষ্টগ্রাজুয়েট শ্রেণীর অধ্যাপককে কখনও সহরে কখনও সহরতলীতে পড়াইতে হইলে তাঁহার পক্ষে "সমষ্টিগত" জীবনটা সম্ভব বা সুমিষ্ট হইবে কি না বিবেচ্য।

সব কলেজকে সহরতলীতে যাইতে বাধ্য না করিয়া কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ও শ্রেণীগুলিকে এবং দুটি

সরকারী কলেজকে সেখানে লইয়া গেলে উচ্চশিক্ষার আদর্শের দিক দিয়া একটি গুরুতর ত্রুটি হইবে। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য রাজকীয় কমিশনের রিপোর্ট (১৯১৩ সাল) হইতে আমরা কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। উহার ৬৮ প্যারাগ্রাফে আছে :—

"We agree with the view expressed in the Report of the Professorial Board of University College that 'any hard and fast line between undergraduate and post-graduate work must be artificial, must be to the disadvantage of the undergraduate, and must tend to diminish the supply of students who undertake post-graduate and research work.' "

৬৯ প্যারাগ্রাফে আছে :—

......"it is in the best interests of the University that the most distinguished of its professors should take part in the teaching of the undergraduates from the beginning of their university career."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণীগুলির অধিকাংশ অধ্যাপক ইহা করেন না, তাঁহারা আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদিগকে পড়ান না। সহরতলীতে বিশ্ববিদ্যালয় ও ২।১টি কলেজ উঠিয়া গেলে এই দোষ আরও বাড়িবে।

৭০ প্যারাগ্রাফে আছে—

"If it is thus to be desired that the highest University teachers should take their part in undergraduate work, and that their spirit should dominate it all, it follows for the same reasons that they should not be deprived of the best of their students when they reach the stage of post-graduate work. This work should not be separated from the rest of the work of the University and conducted by different teachers in separate institutions."

কিন্তু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কর্ত্তৃক অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত এইরূপ ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখনই অনেকটা করিয়াছেন। উহা সহরতলীতে উঠিয়া গেলে দোষটা আরও পরিস্ফুট-আকার ধারণ করিবে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নূতন ছাত্রদিগকে অগ্রসর ছাত্রদের সঙ্গে রাখার সুবিধা ("Advantage of associating junior with advanced students") সম্বন্ধে তাঁহাদের রিপোর্টের ৭১ প্যারাগ্রাফে বলিতেছেন :—

"It is also a great disadvantage to the undergraduate students of the university that post-graduate students should be removed to separate institutions. They ought to be in constant contact with those who are doing more advanced work than themselves, and who are not too far beyond them, but stimulate and encourage them by the familiar presence of an attainable ideal."

কলিকাতার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট অধ্যাপনার নূতন ব্যবস্থায় এই আদর্শ-অনুযায়ী কাজ হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়কে সহরতলীতে লইয়া গেলে আরও বেশী পরিমাণে এই আদর্শের বিরুদ্ধে যাওয়া হইবে।

অবশ্য যদি কলিকাতার সমুদয় কলেজকে সহরতলীতে একটি বিস্তীর্ণ ময়দানে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে উল্লিখিত দোষত্রুটিগুলি প্রায় থাকিবে না বলা যাইতে পারে। কিন্তু সব কলেজের সেখানে যাইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। মেডিক্যাল কলেজ ত কোন-মতেই যাইবে না। অধিকাংশ অন্য কলেজ তথায় লইয়া যাইতে হইলে মিশনরী ও বেসরকারী কলেজগুলিকে তথায় যাইতে বাধ্য করিতে হইবে, এবং সেখানে নূতন করিয়া কলেজগৃহ, ছাত্রাবাস, অধ্যাপক-নিকেতন, প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে (অর্থাৎ কার্য্যতঃ গবর্ণমেণ্টকে) রাশি রাশি টাকা দিতে হইবে। সহরের বর্ত্তমান কলেজবাড়ীগুলি বিক্রী হইলেও বিস্তর টাকা দিতে হইবে। শুধু যদি সেনেট হাউস, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলি এবং গবর্ণমেণ্ট-কলেজ দুটি সরাইয়া লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইবে। দেশের পক্ষ হইতে এই ব্যয়ে আমরা আপত্তি করিতে পারি। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, এইরূপ ব্যয় করিলে উচ্চশিক্ষার খুব একটা উন্নতি হইবে, তাহা হইলেও দেখিতে হইবে যে সব শ্রেণীর লোকের শিক্ষার জন্য যেরূপ খরচ করা উচিত, সেই অনুসারে এই খরচ করা সঙ্গত কি না। এপর্য্যন্ত শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যত ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে বাংলাদেশের শতকরা ৭·৭ অর্থাৎ হাজারে ৭৭ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। হাজারের মধ্যে বাকী ৯২৩ জনের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা আগে দরকার, না কলিকাতা হইতে কলেজগুলি সরাইয়া লইয়া যাওয়া আগে দরকার? আমরা উচ্চশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির চেষ্টা বন্ধ রাখিতে বলিতেছি না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ কলিকাতা হইতে উঠাইয়া লইয়া না গেলে উচ্চশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি হইবে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। সহরের বাহিরে গিয়া অধ্যাপকেরা ও ছাত্রেরা একটা প্রকাণ্ড মাঠে থাকিলেই জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তৃতি এবং চরিত্রে

সহৃদয়তা, দৃঢ়তা ও মহত্ত্ব বাড়িয়া যাইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। যাহা হউক, সে কথা পরে বলিতেছি। ব্যয় সম্বন্ধে আমাদের মোট বক্তব্য এই যে, দরিদ্রশ্রেণীর লোকদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত, উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তাবিত অসাধারণ-রকমের ব্যয়ের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

ব্যয়ের আর-একটা দিক্ দেখিবার আছে। মিশনরী ও অন্য বেসরকারী কলেজগুলির এখনও কিছু স্বাধীনতা আছে। সহরতলীতে সরকারী ব্যয়ে যদি তাহাদের সমস্ত ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট টাকার বিনিময়ে তাহাদের সামান্য এই স্বাধীনতাটুকুও লইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলেজগুলির কমিটি ও অধ্যাপকবর্গ ইহাতে রাজী আছেন কি? সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সব বিষয়ে সরকারী বেসরকারী সব কলেজের অধ্যাপকদের হাতপা সমান শৃঙ্খলিত দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না।

প্রস্তাবটির আর দুটি উদ্দেশ্য,—বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের বিস্তৃতিসাধন, এবং কলেজ, ছাত্রাবাস ও অধ্যাপক-নিকেতনের জন্য গৃহনির্ম্মাণ। সহরতলীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একটি ছোটখাট সহর বসাইতে যে খরচ হইবে, তাহা অপেক্ষা কিছু কম ব্যয়ে কি সহরের মধ্যেই এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী অনেকটা আয়োজন করা একান্ত অসম্ভব?

যদি ২।৪ কোটি বা ততোধিক টাকা ব্যয় করা আবশ্যক ও সঙ্গত হয়, তাহা হইলেও যুদ্ধের অবসানের পর ২০।২৫ বৎসর রাজকোষে অসচ্ছলতাবশতঃ টাকা পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এখন এ প্রস্তাব তোলা ঠিক্ হয় নাই।

ছাত্রেরা যখন নিজে বাড়ীভাড়া লইয়া মেস করিয়া থাকিত, তখনকার চেয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে থাকিতে তাহাদের খরচ বেশী পড়ে। আগেকার চেয়ে সব শ্রেণীর লোকদেরই যেরূপ ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে, আমরা সে-রকম বৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। ছাত্রদের ব্যয় তার চেয়েও বেশী বাড়িয়াছে। সহরের বাহিরে ছাত্রাবাসে সব ছেলেকে বাস করিতে হইলে খরচ আরও বাড়িবে। প্রায় সমস্ত সভ্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষা এখন অবৈতনিক; কোথাও কোথাও মধ্যশিক্ষাও অবৈতনিক; আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অবৈতনিক। সেখানে অনেক অবৈতনিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও, যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ীতে থাকিয়াই অল্প ব্যয়ে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সহরে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, এবং ইতিমধ্যেই কয়েকটি ছোট সহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিতও হইয়াছে। ইংলণ্ডে মধ্যশিক্ষা এবং ওয়েল্‌সে কলেজের শিক্ষা অবৈতনিক করিবার চেষ্টা হইতেছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন উহার অঙ্গীভূত কলেজসকলের বেতন কমাইবার প্রস্তাব তাঁহাদের রিপোর্টে করিয়াছেন। একান্ত আবশ্যক না হইলে আমাদের গরীব দেশে এমন কিছু করা উচিত নয়, যাহাতে শিক্ষার ব্যয় আরও বেশী মাত্রায় ছাত্রদের ঘাড়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমষ্টিগত জীবন।

এখন অধ্যাপক ও ছাত্রদের সমষ্টিগত জীবনের কথাটা একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিব।

সহরতলীতে একটি শিক্ষাপুরী বসিলে তাহার প্রকৃতি ভারতবর্ষের অন্যসব লোকালয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইবে না। ভারতবর্ষ যতদিন পর্য্যন্ত না ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সহিত সমান রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভ করিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত দেশী অধ্যাপক ও বিলাতী অধ্যাপক এবং দেশী ছাত্র ও বিলাতী অধ্যাপকদিগের এক জায়গায় বাস কখনও কোন পক্ষের সুখশান্তির, আরামের ও মঙ্গলের কারণ হইতে পারিবে না। প্রস্তাবিত শিক্ষা-পুরীতে ইংরেজ অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীদের স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ স্থান হইবেই হইবে; এবং এই স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত সমষ্টিগত জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের একটি প্রধান অন্তরায় হইবে। ইহাতে দেশী অধ্যাপক ও ছাত্রদের বেশ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা থাকা আমোদপ্রমোদ করা নিশ্বাস ফেলার ব্যাঘাত ঘটিবে। তাহাদিগকে আড়ষ্ট থাকিতে হইবে। সহরেও ইংরেজ আমাদের মনিব বটে; কিন্তু আমরা এখানে আলাদা পাড়ায় নিজেদের লোকের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদা আপনাদের অধীনতা দিনরাত উপলব্ধি

করি না। শিক্ষাপুরীতে দিনরাত ইংরেজ প্রভুর চোখের উপর বাস করিলে আমাদের অবস্থাটা ভুলিয়া থাকা কিছু কঠিন হইবে; বিশেষতঃ যখন দেখিব যে বিদ্যার ও যোগ্যতার আধিক্য না থাকিলেও ইংরেজের জন্য বেশী বেতন, আমাদের জন্য কম বেতন, ইংরেজের জন্য ভাল বড় বাড়ী, আমাদের জন্য তদপেক্ষা ছোট ও নিকৃষ্ট বাড়ী, ইংরেজের জন্য বড় হাতা, আমাদের জন্য ছোট হাতা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অতএব আমরা বলি, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ না করা পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র শিক্ষাপুরীর প্রস্তাবটা মুলতুবি থাক্। আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইহার ফল শুভ হইবে না।

এরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষাপুরী স্থাপনের উদ্দেশ্যের মূলে ছাত্রদিগকে পাহারার মধ্যে রাখার অভিসন্ধি না থাকিতে পারে, কিন্তু ফলটা তাহাই হইবে। পাহারার মধ্যে থাকিলে একরকমের নিরীহ ভালমানুষ প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু মানুষের মত মানুষ তেমনি করিয়া গড়িয়া উঠে না। সত্য বটে, কেম্ব্রিজ অক্সফর্ডেও ছেলেরা একরকম পাহারার মধ্যে থাকে। কিন্তু সেটা হচ্ছে স্বাধীনদেশের স্বাধীন যুবকদের উপর নৈতিক পাহারা। আমাদের শিক্ষাপুরীর পাহারা হইবে পরাধীনদেশের পরাধীন যুবকদের উপর রাজনৈতিক পাহারা। এ দু-রকম পাহারায় প্রভেদ আছে।

বিলাতে অক্সফর্ড-কেম্ব্রিজের পর যত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কোনটিই অক্সফর্ড কেম্ব্রিজের আদর্শ অনুযায়ী নহে। ফ্রান্সের পারিস বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মেনীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফর্ড-কেম্ব্রিজের মত নয়।

সংসার হইতে পলায়ন করা এখনও অনেকে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপায় মনে করেন। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, সন্ন্যাসপ্রধান প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দ্বারা যেমন হিত হইয়াছে, অহিত তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। সমাজকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম করিতে হইবে না, সমাজকেই ধর্ম্মানুগত করিতে হইবে। শিক্ষাসম্বন্ধেও সংসার হইতে পলায়নের এই আদর্শ হয় ত অনেকে এখনও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কিন্তু অক্সফর্ড-কেম্ব্রিজের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের কাজে লাগিবে না। কারণ, সেগুলিও ক্ষুদ্র হইলেও সহর, এবং সেখানেও মানুষ সপরিবারে বাস করে। নারী সেখানেও মাতা পত্নী ভগিনী কন্যা রূপে বিরাজ করেন। কোন কোন অজ্ঞ লোকের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, পুরাকালে আশ্রমে যে ঋষিরা শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা এখনকার ভস্মমাখা সন্ন্যাসীদের মত ছিলেন। বাস্তবিক কিন্তু তাঁহারা সপরিবারে এই-সকল আশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের শিষ্যছাত্রেরা ঋষিপুত্র ঋষিকন্যাদের সহিত শিক্ষা পাইতেন। ঋষিপত্নীদের মাতৃস্নেহ তাঁহারা পাইতেন। অর্থাৎ তাঁহারা সহর হইতে দূরে আশ্রমনামক স্বতন্ত্র ভূখণ্ডে থাকিলেও, সংসারের, মানবসমাজের, একটি অংশের মধ্যেই বাস করিতেন। তাঁহাদের জীবনে কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। এইসব আশ্রমে রিজ্‌লী সার্কুলার, কার্লাইল সার্কুলার, বা তদ্রূপ অন্য কোন অনুজ্ঞা অনুশাসন প্রচলিত ছিল না, যাহা দ্বারা বৈধ জীবনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়, চিন্তা ও শিক্ষা শৃঙ্খলিত হয়। আশ্রমে ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, সাহিত্য, প্রভৃতি, সব বিষয়ে চিন্তা করিবার ও শিক্ষা দিবার স্বাধীনতা ছিল। ক্রমে এই স্বাধীনতা হ্রাস পাইয়া লুপ্ত হইয়াছিল। সেটা ভারতবর্ষের অধঃপতনের যুগ।

বলা বাহুল্য প্রস্তাবিত শিক্ষাপুরী প্রাচীন আশ্রমগুলির মত হইবে না। সেখানে ঋষিপত্নীদের মাতৃস্নেহ, ঋষিপুত্রকন্যাদের সাহচর্য্য ও প্রীতি, ছাত্রেরা পাইবে না। শ্বেতঋষি ও শ্বেতঋষিপত্নীকন্যারা থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দুরধিগম্য বা ভীতির কারণ হইবেন। দেশী অধ্যাপকদের বাড়ীর মহিলারা পর্দ্দার আড়ালে থাকিবেন। চিন্তা ও শিক্ষার স্বাধীনতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনও নাই, সম্পূর্ণ স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতেও থাকিবে না।

প্রস্তাবিত শিক্ষাপুরী কেম্ব্রিজ অক্সফর্ডের মতও হইবে না। কেননা, কেম্ব্রিজ অক্সফর্ড ইংরেজ-সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ টুকরা। সেখানকার ছাত্রেরা অন্যজায়গার জীবন্ত স্বাধীন শিক্ষিত ইংরেজেরই মত স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, স্বাধীনভাবে বহি লেখে, স্বাধীনভাবে [illegible] করে, স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করে, স্বাধীনভাবে খবরের কাগজ লেখে, স্বাধীনভাবে পার্লেমেন্টের সভ্য নির্ব্বাচনাদি উপলক্ষে রাজনীতির চর্চ্চা করে, স্বাধীনভাবে সত্যের অনুসন্ধান করে

এবং সত্যের সন্ধান পাইলে অবাধে তাহা প্রচার করে। আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাপুরীতে এই যে মানবমনের মানব-আত্মার মুক্তভাব ও কার্য্য, তাহা থাকিবে না। সহর হইতে অল্পাধিক দূরে আলাদা জায়গায় কতকগুলা ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া তাহাতে অধ্যাপক ও ছাত্র বসাইয়া দিলেই একটা উচ্চ উদার সম্মিলিত ও সমষ্টিগত জীবন উৎপন্ন হইবে, ইহা মনে করা মহা ভ্রম। সহর হইতে দূরে নির্ম্মিত কতকগুলা ঘরবাড়ী কঙ্কাল মাত্র। তাহার প্রাণ, নারী ও পুরুষের বাহিরের ও অন্তরের স্বাধীন জীবন। ইহা না থাকিলে সব বৃথা।

কল্পিত শিক্ষাপুরী কেম্ব্রিজ না হইবার আরও কারণ আছে। কেম্ব্রিজে সমুদায় অধ্যাপক ও ছাত্রের সামাজিক জীবন এক। এখানে শাসকজাতির শ্বেত অধ্যাপক এবং শাসিতজাতির অধ্যাপক ও ছাত্রদের সামাজিক জীবন পৃথক্ হইবে। হিন্দুর নানা জাত আলাদা থাইবে। হিন্দুছাত্রদের গোপূজা করা উচিত এবং মুসলমান ছাত্রদের গোবলি দেওয়া উচিত, এইরূপ শিক্ষা তাহারা স্ব স্ব সমাজ হইতে পাইবে। শ্বেত অধ্যাপকদের মধ্যে উদারচরিত ভাল লোক নাই বা থাকিতে পারে না, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ইহা সত্য যে তাঁহারা দেশী ছাত্রদিগকে আপনাদের সমকক্ষ হইতে দেখিতে ব্যগ্র নহেন। দেশী লোক বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁহাদের সমকক্ষ বা তাঁহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহারা ইংরেজের সমান পদ পায় না। বড় কাজ যাঁহাদের একচেটিয়া, আমাদের যুবকেরা তাঁহাদের সমকক্ষ হইবে, ইহা কি তাঁহারা চান? ইংরেজ অধ্যাপক ও ইংরেজ ছাত্রদের সমষ্টিগত জীবন সম্ভব ও শুভফলদায়ক, কারণ তাঁহাদের মধ্যে একপ্রাণতা ও সহানুভূতি আছে। ইংরেজ অধ্যাপক ও দেশী ছাত্রদের মধ্যে তাহা আছে কি?

সহরের মধ্যে পাপ আছে, প্রলোভন আছে বটে। শিক্ষাপুরীতে কি কোথাও নাই বা থাকিতে পারে না? সে কথা যাক্। সহরে যেমন মন্দ আছে, তেমনি ভালও আছে। কলিকাতার অধ্যাপকেরা অধীন ভারতবর্ষেরও সর্ব্বোচ্চ স্বাধীনচিন্তা এবং সর্ব্বোচ্চ জীবনের নমুনা নহেন। আমরা প্রত্যেক অধ্যাপকের বা সমুদয় অধ্যাপকের ব্যক্তিগত নিন্দাচ্ছলে একথা বলিতেছি না; কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেক শ্রদ্ধেয় লোক আছেন। আমরা ইহাই বলিতেছি, যে, সব বিষয়ে স্বাধীনভাবে সত্যের অনুসন্ধান ও প্রচারে তাঁহাদের বাধা আছে, স্বাধীনচিন্তা-লব্ধ সত্য ও তত্ত্ব শিক্ষা দিবার পথ তাঁহাদের কাছে খোলা নাই। তাঁহারা দেশের লোকদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্য্যে ও জীবনে অবাধে পূর্ণমাত্রায় যোগ দিতে পারেন না। এইজন্য বলিতেছি, পরাধীন ভারতেও মানুষ যত দিকে যত বড়, যত উদার, যত স্বাধীন, যত সত্যদ্রষ্টা, যত মানবপ্রেমিক মানবহিতৈষী, যত পৌরুষসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা দেখিবার জন্য এবং সেরূপ মানুষের সাহায্যলাভ ও প্রভাব অনুভব করিবার জন্য কেবলমাত্র অধ্যাপকসমষ্টির সঙ্গ, উপদেশ ও প্রভাব যথেষ্ট নয়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে সহরের ও দেশের সাধারণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা চাই।

সহরের বাহিরে শিক্ষাপুরীতে কোন এক প্রকারের একটা সম্মিলিত সমষ্টিগত জীবন হইলেই হইবে না। জীবনটা কি-রকমের তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। জেলে কয়েদীদের এবং ব্যারিকে সৈন্যদেরও একটা সম্মিলিত সমষ্টিগত জীবন আছে। কিন্তু উভয়ের কোনটাই বাঞ্ছনীয় নহে। অবশ্য পৃথিবীতে কাহারও জীবন পূর্ণ নহে। পূর্ণতালাভের প্রয়াস, পূর্ণতার দিকে গতিই জীবনের একটা লক্ষণ। প্রস্তাবিত শিক্ষাপুরীতে অধ্যাপক ও ছাত্রদের জীবন যে কেবল আংশিক হইবে তাহা নয়, তাহা কৃত্রিম কারণে আংশিক থাকিবে; পরাধীন ভারতে তাঁহারা এই বাধা অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সহরও পরাধীন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কম পরাধীন। ইহার বৈধ জীবনের সহিত যে-পরিমাণে ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের মধ্যে পূর্ণতালাভের চেষ্টা, পূর্ণতার দিকে গতি লক্ষিত হইবে। এইজন্য আমরা মনে করি, সহরের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও জীবনের সহিত ছাত্রদের যোগ যাহাতে অবাধ হয়, এবং আরও ঘনিষ্ঠ হয়, তাহাই করা আবশ্যক; সহরের বাহিরে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখা তত প্রয়োজনীয় নয়।

কমিশনের শেষ প্রশ্নটি নারীদের শিক্ষাবিষয়ক।

নারীদের জন্যও যখন কমিশন চিন্তা করিয়াছেন, তখন জিজ্ঞাসা করি, প্রস্তাবিত শিক্ষাপুরীর সম্মিলিত ও সমষ্টিগত জীবনে নারীদের স্থান কিরূপ হইবে? কমিশনের বিলাতী সভ্যেরা বলিবেন, তাহারাও শিক্ষাপুরীর সকল শিক্ষাগৃহে, সমুদয় সভাসমিতিতে অবাধে উপস্থিত হইবে ও যোগ দিবে। ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহ্‌মেদ কি বলিবেন, তাহাদিগকে বোর্‌কা পরিতে হইবে! শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কি বলিবেন, তাহারা সর্ব্বত্র পর্দ্দার আড়ালে বসিবে, এবং পথে হাঁটিবার সময় সম্মুখে একটা চৌকা ফ্রেমে আঁটা পর্দ্দা উঁচু করিয়া ধরিয়া চলিবে! আমরা কমিশনের সভ্য নই, সুতরাং আমরা কিছুই বলিব না।

চাকরী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা।

কমিশনের পঞ্চদশ প্রশ্ন এই :—

Do you hold it to be advantageous or the reverse, (a) to the public services, (b) to the students, (c) to the progress and advancement of learning, that university examinations should be regarded as the qualification for posts under Government? Would you advocate the practice, adopted in many other countries, of instituting special tests for different kinds of administrative posts under government?

যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সরকারী সব-রকমের চাকরী দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি চাকরীর যোগ্যতার নিদর্শন বলিয়া গৃহীত না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। যদিও প্রবেশিকা আদি এই-সব পরীক্ষাকেই যোগ্যতার নিদর্শন মনে করিলে অনর্থক পরীক্ষা-বাহুল্য নিবারিত হয়, জীবনটা পরীক্ষা-কণ্টকিত হয় না। কিন্তু যদি এখনকার মত, মুন্সেফী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী প্রভৃতি ছাড়া, আর প্রায় সমস্ত চাকরীই শিক্ষার বিচার না করিয়াও দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা তাহা অত্যন্ত দূষণীয় মনে করিব। প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গ্রহণ না করিলে, চাকরীর বেতন ও উহার কাজের কঠিনতা বিবেচনা করিয়া প্রবেশিকা, আই-এ আই-এস্‌সী, বি-এ বি-এস্‌সী, বা এম্‌-এ এম্‌-এস্‌সী, যোগ্যতার নিম্নতম নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহা চাকরীর কাজের কঠিনতা ও বেতন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ঐ পরীক্ষার সমতুল্য করা উচিত। যেমন যুদ্ধের আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যে সিবিলসার্বিস পরীক্ষায় অক্সফর্ড-কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরাই বেশী চাকরী পাইয়াছে; কারণ ঐ পরীক্ষার মান (standard) অক্সফর্ড-কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েটদের জ্ঞানের অনুরূপ। আমাদের এখানে, মনে করুন, যদি ডেপুটী-গিরি চাকরীর জন্য আবার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে উহার মান এম্‌-এ বা এম্‌-এস্‌সীর সমান করা উচিত হইবে।

ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে প্রবেশিকা পাস করিলে তাহা সরকারী চাকরীর যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হয় না; কিন্তু স্কুল ফাইন্যাল অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগের গৃহীত স্কুলের শেষ পরীক্ষা ঐরূপ যোগ্যতা বলিয়া গণিত হয়, অথচ এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলেজে ভর্ত্তি হইবার অধিকার জন্মে না। এই-প্রকার নিয়ম করার মানে প্রকারান্তরে ছেলেদিগকে উচ্চশিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করা। কারণ, অনেক ছেলে মনে করিতে পারে হাতের-পাঁচটা ছাড়া ভাল নয়, স্কুল ফাইন্যালটা দিয়া রাখি। প্রবেশিকা পরীক্ষা উঠাইয়া দিবার অভিসন্ধি কমিশনের না থাকিলেই মঙ্গল। ইহার পরিবর্ত্তে বা বিকল্পে স্কুল ফাইন্যাল প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাও যেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই হাতে থাকে।

সত্য জিনিষটি খুব ভাল, কিন্তু সত্যের মুখোস-পরা কু-অভিসন্ধি ভাল নয়। "জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভে চেষ্টা কর," এই উপদেশ ভাল; কিন্তু এই সত্যের ব্যপদেশে শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিবার চেষ্টা ভাল নয়। সব দেশেই ছাত্রেরা ভবিষ্যতে উপার্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া বিদ্যাশিক্ষা করে। তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ছাত্র জ্ঞান দ্বারাই এমন আকৃষ্ট হয় যে তাহারা উপার্জ্জনটাকে লক্ষ্য না করিয়া জ্ঞানী হওয়াকেই লক্ষ্য করে। কিন্তু যদি সব ছাত্রকেই জোর করিয়া জ্ঞানকেই একমাত্র লক্ষ্য করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে ফল এই হয়, যে, অনেক লোক জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারদেশেও আসে না, এবং বাকী অনেকে ভণ্ড জ্ঞানতপস্বী হয়। বাঁচিয়া থাকা এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া, উচ্চপদ লাভ করিয়া দেশের কাজ করিতে পারা, এগুলা নিন্দনীয় জিনিষ নয়। এইজন্য সব সভ্যদেশে ভোকেশান্তাল এডুকেশন অর্থাৎ জীবিকা অর্জ্জন

করিতে শিক্ষা দেওয়ার খুব চেষ্টা হইতেছে। ইহারও বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আবার ছাত্রেরা বড় হইয়া কি খাইবে, শিক্ষাবিধান প্রণয়নে সে বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়া কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা ভাবাও ঠিক নয়। আমরা সুবিস্তৃত জ্ঞান চাই, মার্জ্জিত বুদ্ধি চাই, উদার ও প্রেমিক হৃদয় চাই, দৃঢ় চরিত্র চাই, কিন্তু ছেলেরা যে পরে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাও ভাবিতে চাই। এক সময়ে লর্ড কার্জন যখন আমাদের চ্যান্সেলার ছিলেন তখন একটা বক্তৃতায় এই বলিয়া আমাদের ছাত্রদের নিন্দা করিয়াছিলেন যে তাহারা কলেজে আসে "শিখিতে নয় কিন্তু রোজগার করিতে (they come to the university "to earn and not to learn")। আমরা সেই উপলক্ষে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

Lord Curzon in one of his addresses as Chancellor of the Calcutta University, held up our college students in an unholy light by saying that they came to the university "to earn and not to learn." The following extract from an English paper will show that the same 'poison' has entered English academic life, but is welcomed by the highest authorities of that country! Lord Curzon's ideal, therefore, must be sought outside England,—in Timbuctoo or Lhasa.

"Lord Haldane in his address on the "Conduct of Life" at Edinburgh University (November, 1913) spoke in particular of the mental and moral sorrows of an *undergraduate* who has to make his *choice of an occupation* in life and rule himself in *peparation for it.* His university career is the training for a wider permanent career, and the *moment a boy* fresh from school *enters a university* he becomes conscious of this fact in a sense never before experienced......The very *degree* that he has now begun to work for will be one of the *coins with which he will purchase a position in life.* His degree—so he thinks, and *it is well that he should think so*—will be a certificate of accomplishment which he will be able to wave like a banner in the struggle for life."—M. R, Feb., 1914, pp. 241-242.

অধ্যয়ন অধ্যাপনায় স্বাধীনতা।

কমিশন দ্বিতীয় প্রশ্নের একটি অংশে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে শিক্ষাদানে ও অধ্যয়নে অধ্যাপক ও ছাত্রদের বেশী-পরিমাণ স্বাধীনতা থাকা উচিত কি না। আমরা বলি, হাঁ, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি।

কমিশন জানিতে চান বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বাঞ্ছনীয় কি না। আমরা আরও বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কিন্তু ঢাকার মত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক ডিবিজনে একটি করিয়া হউক, কিন্তু তাহার অঙ্গীভূত করিবার জন্য যতবড় যতগুলি কলেজ দেশের লোক চালাইতে পারে, তাহাদিগকে তাহার অধিকার দেওয়া চাই। বর্দ্ধমান ডিবিজনের জন্য বাঁকুড়ায়, প্রেসিডেন্সী ডিবিজনের জন্য কলিকাতায়, রাজসাহী ডিবিজনের জন্য রাজসাহী ও দার্জিলিং বা অন্য কোন পার্ব্বত্য স্থানে, ঢাকা ডিবিজনের জন্য ঢাকায়, এবং চট্টগ্রাম ডিবিজনের জন্য চট্টগ্রামে, একএকটি বিশ্ববিদ্যালয় হইলে ভাল হয়।

কি কি বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া চাই?

কমিশন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সেবা করিবার জন্য ও উহার উন্নতির জন্য কি কি বৃত্তি ও পেশার প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে-সব বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ব্যতীত কৃষিবিদ্যা সর্ব্বত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত। অরণ্যসংরক্ষণ ও অরণ্যের সদ্ব্যবহার (forestry) শিক্ষণীয়। তাহার পর ভূতত্ত্ব ও খনিবিজ্ঞান (geology and mineralogy) এবং ধাতুবিজ্ঞান (metallurgy)। জাহাজ-নির্ম্মাণ ও জাহাজচালান বিদ্যা শিখাইতে হইবে। ফলিত রসায়ন (applied chemistry) শিখাইতে হইবে। সকল রকমের স্থাপত্য, পূর্ত্তকার্য্য ও যন্ত্রনির্ম্মাণ বিদ্যা (architecture and all kinds of civil and mechanical engineering) শিখাইতে হইবে।

শিক্ষার বাহন ও ইংরেজী শিক্ষা।

কলেজের সমুদয় শ্রেণীতেই বাংলাভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরও ইংরেজী বা দেশভাষায় দিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। আপাততঃ প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা পর্য্যন্ত কেহ যদি বাংলাতেই অধ্যাপনা করিতে ও নিজের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দেওয়াইতে চান, তাঁহাকে সে বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট বড়জোর এই বলিতে পারেন যে এইসব ছাত্রদিগকে চাকরী দিবেন না। কিন্তু কেহ নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা ভাল আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়া সে উচ্চজ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকিবে, এই অস্বাভাবিক বাধা দূরীভূত

হওয়া চাই। বিদ্যার উচ্চ অঙ্গের পাঠ্যপুস্তক কোন ভাষাতেই আদিকাল হইতে ছিল না। প্রয়োজন অনুসারে চেষ্টার দ্বারা এইসব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও তাহাই হইবে।

স্কুলে ও কলেজে ইংরেজী শিখান নিশ্চয়ই আবশ্যক। স্কুলের নীচের যে-সব শ্রেণীতে ইংরেজী প্রথম শিখান হয়, স্কুলের মধ্যে ইংরেজীতে সকলের চেয়ে পারদর্শী শিক্ষকদিগকে তাহাতে ইংরেজী শিখাইতে নিযুক্ত করা উচিত।

দেশভাষার বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা।

দেশভাষার বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা আরও অধিক পরিমাণে যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা ও আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের করা কর্ত্তব্য কি না, কমিশন জানিতে চান। বাংলার ভাষাতত্ত্ব, বাংলা ব্যাকরণের ক্রমপরিবর্ত্তন, বাংলার সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধ, ইত্যাদি নানা দিক দিয়া বাংলার বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা হইতে পারে এবং হওয়াও কর্ত্তব্য। কিন্তু সেনেট হাউসের বর্ত্তমান অবস্থায়, নিয়ম ও আয়োজন যাহাই হউক, কেবল প্রকৃত ভাষাতত্ত্বজ্ঞ লোক নিযুক্ত না হইয়া অনেক স্থলে খোসামোদপটু লোকই নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য সেনেটের গঠনবিধির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

সাহিত্যের দিক্ দিয়া বাংলার চর্চ্চা বিশ্ববিদ্যালয় করাইতেছেন না। পয়সা-ধরা ফাঁদ পাতিতে যাঁহারা জানে, এরূপ কতকগুলি তথাকথিত সাহিত্যিকই অনেক স্থলে টাকা পাইতেছে মাত্র। ছাত্রেরা সাহিত্যরসগ্রাহী হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার কি ব্যবস্থা আছে?

বর্ত্তমানে অনধীত বিদ্যা ও বিজ্ঞান।

কমিশন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যা বা বিজ্ঞানের এমন কোন্ কোন্ শাখা আমাদের স্কুল কলেজগুলিতে শিখান হয় না, যাহার চর্চ্চা হওয়া উচিত। স্কুলগুলিতে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত ও প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভূগোল শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। এখনকার মত ভূগোলের জ্ঞানলাভ করা বা না করা ছাত্রদের স্বেচ্ছাধীন হওয়া উচিত নহে। ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের ইতিহাসও প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অবশ্যপঠনীয় বিষয় হওয়া চাই। নীচের ক্লাসে গ্রীস রোম ও জাপানের ইতিহাস শিখান উচিত। ইতিহাস ও ভূগোল না শিখিলে আমাদের মন দেশ ও কাল উভয়দিকেই সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে, এবং হৃদয় মন ও আত্মার কূপমণ্ডূকতা জন্মে। যে লোক ইতিহাস জানে না তাহার পক্ষে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আশাশীল উৎসাহান্বিত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া খুব সম্ভব নহে। স্কুলে মানবশরীরতত্ত্ব (human physiology) এবং দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা (hygiene) ও লোকালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষা (sanitation) সম্বন্ধে স্থূল জ্ঞান ছাত্রদিগকে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (scientific method) সম্বন্ধে যাহাতে পরোক্ষভাবে একটা ধারণা জন্মে এইজন্য পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে স্থূল জ্ঞান বালকবালিকাদের থাকা দরকার।

সংগীতের চর্চ্চা স্কুল ও কলেজে নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির জড়তাসম্পাদন যেমন হয়, আর কোন সভ্যদেশে সেরূপ হয় না। চিত্রবিদ্যারও চর্চ্চা হওয়া দরকার।

কলেজে নূতন কি কি বিদ্যার চর্চ্চা হওয়া দরকার, আগে একটি প্রশ্নের আলোচনায় তাহা বলা হইয়াছে।

কৃষিবিদ্যালয়ের দ্বারা দেশ ছাইয়া ফেলা উচিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

পরম্পরাগত নীতি ও পারিবারিক বন্ধন।

কমিশনের একটি প্রশ্নে মনে হয়, তাঁহারা পরম্পরাগত নীতি (traditional morality) ও পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখিতে উৎসুক। পরম্পরাগত নীতি বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন, ঠিক্ ধরিতে পারিয়াছি কি না জানি না। যাহা হউক, এইরূপ নীতি যদি কোন অংশে মানুষের উন্নতির অন্তরায় না হয়, যদি ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও চিরন্তন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মনীতির বিরোধী না হয়, যদি ইহা হৃদয়কে সংকীর্ণ অনুদার করিয়া না রাখে, তাহা হইলে ইহা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি ইহার কোন অংশ মানুষকে ছোট, অনুদার, কূপমণ্ডূক ও ভীরু করিয়া রাখে, তাহা নষ্ট হওয়াই চাই। পারিবারিক বন্ধনও সর্ব্বপ্রযত্নে সংরক্ষণীয়; কিন্তু এই বন্ধনকে একান্ত করিয়া, ইহার জন্য আর-সব বলি দিয়া, যদি ব্যক্তির সহিত জাতির বন্ধন, এক-একজন মানুষের সহিত সমগ্র মানবজাতির বন্ধন

উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইহা সুস্থপ্রকৃতির মানুষের কাছে পায়ের নিগড় বলিয়াই মনে হইবে।

ছাত্রাবাস।

ছাত্রাবাস সম্বন্ধে কমিশন অনেক কথা জানিতে চাহিয়াছেন। ছাত্রাবাস কত বড় হওয়া উচিত, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের মত জানাইবার সময় নাই, স্থানও নাই। একটি মূল কথা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহাই লিখিতেছি। লোকসমষ্টি বা জনতার প্রকৃতিই এই, যে, যখন মানুষ ঐ সমষ্টির অন্তর্গত থাকে, তখন ভালই হউক বা মন্দই হউক, অবিচারিতভাবে অন্য দশজনের দেখাদেখি গ্রহণ করে। জনসমষ্টির উত্তেজনা ও জনসমষ্টির পাগলামি দ্বারা কখন কখন কার্য্য উদ্ধার হয় বটে, কিন্তু তাহা ভয় করিবার জিনিষ। সমষ্টির নীতির নিম্নগামী হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে, যদি খুব মহৎচরিত্রের প্রভাব ঘনিষ্ঠভাবে তাহার উপর না পড়ে। এইজন্যই বড় বড় বোর্ডিংস্কুলের আদর্শ উচ্চ রাখা এত কঠিন। ছাত্রেরা যখন নিজের নিজের বাড়ীতে থাকে, তখন মা-ভগিনীদের মধ্যে থাকে বলিয়া সেই প্রভাবেই অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ছাত্রাবাসগুলিতে যথেষ্টসংখ্যক তত্ত্বাবধায়ক রাখিয়া পাহারার বন্দোবস্ত খুব ভাল করা যাইতে পারে। কিন্তু ছাত্রসমষ্টি মহৎচরিত্রের প্রভাবে যাহাতে প্রকৃতিস্থ থাকে ও উন্নত হয়, তাহার কি উপায় হইতে পারে, পিতামাতাভাই-ভগিনীদের প্রভাবের স্থানে কি দেওয়া যাইতে পারে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে মানব প্রকৃতির প্রধানতঃ যে-যে বৃত্তির চালনায় কার্য্য উদ্ধার হইতেছে, তাহাতে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা খুব ভাল হইতেছে কি? তদ্দ্বারা মানবের অন্তরাত্মায় অনুভূত মহৎ প্রেরণাগুলি বলবতী হইতেছে কি?

নারীর শিক্ষা।

কমিশনের শেষ প্রশ্নটি বালিকা ও নারীদের সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিষয়ক। সকল সভ্যদেশেই এখন অনুভূত হইতেছে যে নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তাহার সমুচিত ব্যবস্থা নারীরা করিতে পারিলেই ঠিক হয়। কমিশনের মধ্যে নারী কেহ নাই। ইহাতে অন্ততঃ যদি ইংলণ্ডের 'মিসেস ফসেটের' মত একজনমাত্রও মনস্বিনী নারী থাকিতেন ত ভাল হইত। কমিশনের সভাপতি এবং হয় ত আর কোন কোন ইংরেজ সভ্যের কাছে আমরা এ বিষয়ে ততটা জ্ঞান ও বিবেচনার আশা করিতে পারি যতটা পুরুষদের নিকট হইতে আশা করা যায়; কারণ তাঁহাদের দেশে বালিকাদের শিক্ষা সুবিস্তৃত, এবং নারীদের উচ্চশিক্ষাও বহু পরিমাণে হইতেছে, যদিও তাঁহাদের বাংলাদেশের সামাজিক রীতি ও নীতি এবং অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় তাঁহারা জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিবেন না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভ্য দুইজনের সমাজের ও পরিবারের সহিত নারীর উচ্চশিক্ষার সংস্রব না থাকায়, তাঁহারা স্বয়ং শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ লোক হইলেও, এই বিষয়ে তাঁহাদের আন্তরিক উৎসাহ থাকিবার কথা নয়। যেটা আমরা নিজের জন্য চাই না, তাহার ব্যবস্থা খুব ভাল করিবার চেষ্টা কি আমরা করিতে পারি?

ছাত্রসাহায্যসমিতি।

কলিকাতায় ৬২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একটি ছাত্রসাহায্যসমিতি আছে। ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস ইহার সম্পাদক। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ এম্ টি কেনেডী, রেভারেণ্ড মিঃ হল্যাণ্ড, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রভৃতি ইহার সভ্য। সর্ব্বসাধারণে এই সমিতিকে সাহায্য করিলে আমরা খুব সুখী হইব। দরিদ্র ছাত্র বিস্তর কিন্তু সমিতির আয় নিতান্ত কম।

হাট লুট।

বঙ্গের নানা স্থানে হাট লুট হইতেছে। কাপড়ের ও নুনের দুর্ম্মূল্যতা ইহার উপলক্ষ্য। যুদ্ধের জন্য দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি ও অশান্তভাব বৃদ্ধি ইহার কারণ। কাপড় যে এত বেশী মূল্যে না বেচিলেও ব্যবসাদারদের যথেষ্ট লাভ থাকে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শুনা যায় বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা এই সুযোগেই ৪।৫ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে। নুনের দামও অসম্ভব বাড়িয়াছে। ইংরেজরা নিজের দেশে সব জিনিষের দাম আঁটিয়া দিয়াছেন, লোকের কষ্ট নিবারণের জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন; এখানে কিন্তু গবর্ণমেণ্টরূপী সেই ইংরেজই, আমরা জাতভাই নই বলিয়া, সেরূপ কিছু করার

প্রয়োজনটাও এপর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। দেখা যাক এখন কিছু হয় কি না।

আমরা লবণসমুদ্রে পরিবেষ্টিত; অথচ অবাধে নুন তৈয়ার করিয়া খাইতে পাই না। যুদ্ধের জন্য আগেকার মত বেশী পরিমাণে বিদেশী নুনও আসে না। এখন সমুদ্রতটবর্ত্তী সব প্রদেশে নুন প্রস্তুত করিতে লোককে অনুমতি ও উৎসাহ দেওয়া উচিত, এবং লবণের শুল্ক উঠাইয়া বা খুব কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সময় অল্পমাত্র বেশী দামে দেশী কাপড় কিনিতে অসামর্থ্য জানাইতেন, তাঁহারা এখন ভাবিয়া দেখুন, বাধ্য হইলে খুব বেশী দাম দিতে পারা যায় কি না। সময়ে স্বেচ্ছায় অল্প কষ্ট স্বীকার করিলে অসময়ে অধিক কষ্ট হইতে হয়ত কতকটা রক্ষা পাওয়া যাইতে পারিত।

পাশ্চাত্য নানাদেশে গরীব লোকেরা রোজগার করিবার কাজ না পাইলে, কিম্বা অন্নবস্ত্রাদি দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য হইলে লুটপাট করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময়ে কখন কখন এরূপ লুণ্ঠন হইতে শুনা যায়, এবং চুরির সংখ্যাও কিছু বাড়ে; কিন্তু তখনও সাধারণতঃ লোকে বরং না খাইয়া মরে, তবু লুটপাট করে না, কারণ, হিন্দুমুসলমান উভয়েই অদৃষ্টবাদী। কিন্তু এখন যে বঙ্গের নানাস্থানে নুন ও কাপড়ের মহার্ঘতা উপলক্ষ্য করিয়া লুট হইতেছে, ইহার কারণ কি? জগতের অন্য অনেক দেশের বিপ্লব ও অশান্তির ঢেউ বাংলায় পৌঁছিয়া কি সাধারণ লোকদের প্রকৃতি বদলাইয়া দিতেছে? না, সাধারণ লোকদের অদৃষ্টবাদিতা অন্য কারণে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, তাহারা অবৈধ ভাবে আপনাদের দারিদ্র্যের প্রতিবিধান নিজেই করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে? হয়ত পুলিস রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রাদি খুঁজিয়া বাহির করিতে ও বিপ্লবপ্রয়াসীদিগকে ধরিতে ব্যস্ত থাকায়, "অ-রাজনৈতিক" সাধারণ দুর্বৃত্তেরা সুযোগ বুঝিয়া লুট আরম্ভ করিয়াছে। ইহাও হইতে পারে, যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় দুষ্ট লোকেরা কলিকাতার বড়বাজার ও মৈমনসিং ত্রিপুরা আদি জেলায় যাহাদিগকে লুট ও অত্যাচার করিতে উৎসাহ দিয়াছিল, তাহারাই এখন কোন কারণে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অবিলম্বে অনুসন্ধান ও প্রতিকার হওয়া দরকার।

একজন প্রবাসী-বাঙ্গালী

দিল্লী-প্রবাসী নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক মহাশয় গত ২৩ কার্ত্তিক শুক্রবার দেহত্যাগ করিয়াছেন। ধন মান বা পাণ্ডিত্যের গৌরব তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বে এমন এক গুণ ছিল, যাহা দ্বারা তিনি ধনী, মানী এবং পণ্ডিতগণকে সম্মিলিত করিয়া সভা সমিতির অনুষ্ঠানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন এখানে আসেন, তখন দিল্লীতে এখনকার মত এত অধিক বাঙ্গালী ছিলেন না; সুতরাং তৎকালে বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠানও এখনকার মত কিছুই ছিল না। তৎপরে, ক্রমশঃ বাঙ্গালীগণের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দিল্লীতে বাঙ্গালীর যে-সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইয়াছে, তাহাদের সংগঠনে যে-সকল ব্যক্তির উদ্যম ও চেষ্টা উল্লেখযোগ্য, নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহাদেরই একজন। প্রবাসে বাঙ্গালীর স্বতন্ত্রতা রক্ষণ বিষয়ে গৌরবের যদি কিছু থাকে, তবে তাহার মাতৃভাষা অন্যতম। এই কথা তিনি বেশ ভালরূপেই উপলব্ধি করিতেন। এই দূর প্রবাসে মাতৃভাষার অনুশীলন যাহাতে অটুট থাকে, সে উদ্দেশ্যে শত বাধা-বিপত্তি, শত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি স্থানীয় "বঙ্গ-সাহিত্য-সভা"কে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। এই "বঙ্গ-সাহিত্য-সভা" তিনি ১৯০৩ সালে অর্থাৎ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় বন্ধুর সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করেন। "সভা" এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, নির্ম্মলচন্দ্র নিজের দেহপাত করিয়া ইহার প্রাণরক্ষা না করিলে, ইহা সে অবস্থায় উপনীত হইত কি না সন্দেহ। এইরূপ, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন দেখা যাইত। তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় বাঙ্গালীগণ একজন অকপট কর্ম্মী ও বন্ধু হারাইলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল অম্লরোগে ভুগিতেছিলেন।

দিল্লী। শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

... শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২৪

৪র্থ সংখ্যা

স্বাধিকার-প্রমত্তঃ

দেড় শো বৎসর পার হইয়া গেল, ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষকে আগাগোড়া দখল করিয়া বসিয়াছে। এ শাসনে ভারতের কল্যাণ হইয়াছে কি না, তার ধন সম্পদ শিল্প বাণিজ্য পূর্ব্বের চেয়ে বাড়িয়াছে কিম্বা তার আত্মশক্তির ও আত্মশাসনের সুযোগ বিস্তৃত হইয়াছে কি না, সে তর্কে আমাদের কোনো লাভ নাই, কারণ এ তর্কে অতীত মুছিবে না এবং বর্ত্তমানের দুঃখ ঘুচিবে না। ঐতিহাসিক কৌতূহলের তরফ হইতেও ইহার মূল্য খুব বেশী নয়। কারণ অনেক তথ্য আছে যাহা গোপনে এবং নীরবে ছাড়া স্মরণ করিয়া রাখিবার হুকুম আমাদের নাই। অতএব এমন আলোচনায় আমার দরকার কি যার পরিণাম শুভ বা সন্তোষজনক না হইতে পারে।

কিন্তু একটা কথা আছে যার সম্বন্ধে কোনো ঢাকাঢাকি নাই। একথা সকল পক্ষেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এত কালের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্ব ও পশ্চিম মেলে নাই, বরং তাদের মাঝখানের ফাঁক বাড়িয়াই চলিল। যখন দুই জাতি পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করিতে বাধ্য অথচ উভয়ের মধ্যে সত্যকার মিলন অসম্ভব তখন এ সংস্রব হইতে যত উপকারই পাই ইহার বোঝা বড় ভারী। অতএব যখন আমরা বলি যে এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদের জড়ভারে চাপা পড়িয়া আমাদের হাড়ে-মাসে এক হইল তখন সে কথা আমাদের শাসনতন্ত্রের অভিপ্রায় বা প্রণালীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভাবে বলি না। আজকের দিনে সে কথাটা আমাদের ভারতবর্ষের ভালোমন্দকে ছাড়াইয়াও অনেক দূর প্রসারিত। আমাদের নিজের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে যা শোষণ করিতে পারে শাসন করিতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই যে-শক্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়, যে-সভ্যতা অবজ্ঞার সহিত বাহির হইতে আমাদের মাথার উপর উপকার বর্ষণ করে অথচ আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা উদ্ধতভাবে দাবী করিতে থাকে; অর্থাৎ যাহা দানের সঙ্গে হৃদয় দেয় না অথচ প্রতিদানের সঙ্গে হৃদয়ের মূল্য চাহিয়া বসে।

অতএব একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সভ্যতার মধ্যে বুদ্ধিসম্পদ যথেষ্ট থাকিতে পারে কিন্তু ইহাতে এমন একটি সত্যের কম্‌তি আছে যে-সত্য মানুষের সকলের চেয়ে বড় জিনিস। এইজন্যই যে-সব জাত এই আধুনিক সভ্যতার হাতে গড়িয়া উঠিল তারা কোনো মুস্কিলে ঠেকিলেই প্রথমেই বাহিরের দিকে হাৎড়ায়, মনে করে তাদের আপিসে, তাদের কার্য্যপ্রণালীতে একটা কিছু লোকসান ঘটিয়াছে, মনে করে সেই প্রণালীটাকেই সারিয়া লইলে

তারা উদ্ধার পাইবে। তাদের বিশ্বাস মানুষের সংসারটা একটা সতরঞ্চ খেলা, বড়েগুলোকে বুদ্ধিপূর্ব্বক চালাইলেই বাজি মাৎ করা যায়। তারা এটা বুঝিতে পারে না যে, এই বুদ্ধির খেলায় যাকে জিৎ বলে মানুষের পক্ষে সেইটেই সব চেয়ে বড় হার হইতে পারে।

মানুষ একদিন স্পষ্ট হউক অস্পষ্ট হউক এই একটি বিশ্বাসে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, কোনো একটি সত্তা আছেন যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতেই আমাদের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ সত্য হইয়াছে। সেইদিন হইতেই তার ইতিহাস সুরু হইয়াছে। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি বলে এই বিশ্বাসের গোড়া ভূতের বিশ্বাসে। কিন্তু আমরা জানি ওটা একেবারেই বাজে কথা। মানুষের পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য আছে, সেই ঐক্যবোধের ভিতরেই ঐ বিশ্বাসের মূল, এবং এই ঐক্যবোধই মানুষের কর্ত্তব্যনীতির ভিত্তি। এই একটি সত্যের উপলব্ধিই মানুষের সমস্ত সৃজনীশক্তির মধ্যে প্রাণ ও জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছে, ইহাতেই সে আপন আত্মানুভূতির মধ্যে অসীমের স্পর্শ লাভ করিল।

স্বভাবতই ইতিহাসের আরম্ভে মানুষের ঐক্যবোধ এক-একটি জাতির পরিধির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। যেমন বড় ক্ষেতের মধ্যে চারা রোপণ করিবার আগে ছোট ক্ষেতের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয় এও ঠিক তেমনি। এইজন্য গোড়ায় মানুষ আপন দেবতাকে স্বজাতির বিশেষ দেবতা বলিয়াই গণ্য করিত এবং তার কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বিশেষ ভাবে তার স্বজাতির সীমার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ ছিল।

আর্য্যরা যখন ভারতে আসিলেন তখন তাঁরা যে দেবতা ও যে পূজাবিধি সঙ্গে আনিলেন সে যেন তাঁদের নিজের বিশেষ সম্পত্তির মতই ছিল। অনার্য্যদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই বাধিল—সে লড়াই কিছুতেই মিটিতে চায় না। অবশেষে যখন আর্য্য সাধক সর্ব্বভূতের মধ্যে সর্ব্বভূতাত্মাকে উপলব্ধি ও প্রচার করিলেন তখনি ভিতরের দিক হইতে বিরোধের গোড়া কাটা পড়িল। হৃদয়ের মধ্যে মনীষা না জাগিলে বিভেদের মধ্যে মিলন আসে কি করিয়া?

মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মত মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয় একটি ধর্ম্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এই-জন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফীর অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।

ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাই একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড় ঘটনা; কারণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্ব্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্ব্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আরো অনেক বড় লোক এবং বুদ্ধিমান লোক আমাদের কালে দেখিয়াছি। তাঁরা পশ্চিমের গুরুর কাছে শিক্ষা পাইয়াছেন। এই পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতির সত্তাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়—এই শিক্ষায় যে-স্বাদেশিকতা জন্মে তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য এই শিক্ষা জগতের যেখানেই পৌঁছিয়াছে সেইখানেই পরজাতির প্রতি সন্দেহসঙ্কুল বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে, সেইখানেই মানুষ অন্য দেশের মানুষকে ছলে বলে ঠেলিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ নিজে পুরা দখল করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তুলিতেছে। এই যে একটা প্রকাণ্ড বৃহৎব্যাপী অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার চর্চ্চা, এই যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করিয়া করিবার চেষ্টা, ইহা আজ

বিলিতি মদ এবং আর আর পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শিক্ষায়, বিপুল ও প্রবল মিথ্যার মধ্যে, যেটুকু সত্য আছে, সেটুকু আমাদিগকে লইতে হইবে, নহিলে আমাদের প্রকৃতি এক-ঝোঁকা হইয়া পড়িবে। কিন্তু সেইসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা চাই যে, ভারত যদি এমন কোনো সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে যাহার অভাবে অন্য দেশের সভ্যতা আপন সামঞ্জস্য হারাইয়া টলিয়া পড়িতেছে তবে আজ সেই সত্যকে বলের সঙ্গে প্রকাশ করাই তার সকলের চেয়ে বড় কাজ।

আজ পশ্চিম মহাদেশের লোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল জাতির সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মহৎ ঘটনার জন্য তার ধর্ম্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিষে জীর্ণ, পারস্য পদদলিত; তাই কঙ্গোয় য়ুরোপীয় বণিকের দানব-লীলা এবং পিকিনে বক্সার যুদ্ধে য়ুরোপীয়দের বীভৎস নিদারুণতা দেখিয়াছি। ইহার কারণ, য়ুরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সবচেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে। ইহাতে কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পার করিবে না। বালক-বয়সে এক-প্রকার দুর্দান্ত আত্মম্ভরিতা তেমন অসঙ্গত হয় না, কিন্তু বয়স হইলে সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করিবার সময় আসে; তখনও যদি মানুষ পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে না শেখে তবে তাহাতে অন্যেরও অসুবিধা ঘটে এবং তাহারও চিরদিন সুবিধা ঘটে না।

আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেশ করিয়া বুঝিতেছে স্বাজাতিকতা বলিতে কি বুঝায়। এতদিন যে-স্বাজাতিকতার সমস্ত সুবিধাটুকু ইহারা নিজে ভোগ করিয়াছে এবং সমস্ত অসুবিধার বোঝা অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে আজ তাহার ধাক্কা ইহাদের নিজের গৃহপ্রাচীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

এতদিন মানুষ বলিতে ইহারা মুখ্যত আপনাদিগকেই বুঝিয়াছে। তাহাতে ইহাদের আত্মোপলব্ধি এই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে প্রচণ্ডরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই সীমার বাহিরে নিজের সুবিধা এবং অসুবিধা অনুসারে নিজের লাভ ক্ষতির পরিমাণ বুঝিয়া ইহারা ধর্ম্মবুদ্ধিকে কমাইয়া বাড়াইয়া বেশ সহজ করিয়া আনিতে পারিয়াছে।

কিন্তু সুবিধার মাপে সত্যকে ছাঁটিতে গেলে সত্যও আমাদিগকে ছাঁটিতে আসে। কিছুদিন ও কিছুদূর পর্য্যন্ত সে অবজ্ঞা সহ্য করিয়া যায়। তার পরে একদিন হঠাৎ সে সুদে আসলে আপনার পাওনা আদায় করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন সময়ে আসে যেটা অত্যন্ত অসুবিধার সময়, এমন উপলক্ষ্যে আসে যেটা হয়ত অত্যন্ত তুচ্ছ। তখন সেটাকে আমরা বিধাতার অবিচার মনে করি। অধর্ম্মের টাকায় ভদ্রসমাজে যে-মানুষ গৌরবে বয়স কাটাইল হঠাৎ একদিন যদি তার খাতা ধরা পড়ে তবে সেটাকে সে অন্যায় অত্যাচার বলিয়াই মনে করে। বড় বড় সভ্য জাতি তেমনি আপন সমৃদ্ধিকে এমনি স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত বলিয়া মনে করে যে দুর্দ্দিন যখন তার সেই সমৃদ্ধির ইতিহাস লইয়া কৈফিয়ৎ তলব করে তখন সেটাকে সে সুবিচার বলিয়া মনেই করিতে পারে না।

এইজন্য দেখিতে পাই য়ুরোপ যখন কঠিন সঙ্কটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কূল পায় না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অপমান ভোগ করে সে কথা লইয়া বিধাতাকে কিম্বা নিজেকে তেমন জোরের সঙ্গে এরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভাল করিয়াই জানা দরকার ছিল যে মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক্ বিলম্বেই হোক্ তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। ঐ মনুষ্যত্বের উপলব্ধি কি পরিমাণে সত্য হইয়াছে ইহা লইয়াই সভ্যতার বিচার হইবে—নহিলে, তার আমদানি-রফ্‌তানির প্রাচুর্য্য, তার রণতরীর দৈর্ঘ্য, তার অধীন দেশের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতিহাসের এই বিচারে আমরা পূর্ব্ব দেশের লোকেরা প্রধান সাক্ষী। আমাদিগকে অসঙ্কোচে সত্য বলিতে হইবে, তার ফল আমাদের পক্ষে যত কঠিন এবং অন্যদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের বাণী

প্রভুত্বের বাণী নয়, তার পশ্চাতে শস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতক্তে দাঁড়াই নাই যেখান হইতে দেশ বিদেশ নতশিরে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজসভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধূলার উপরে দাঁড়াইয়া আছি যে-পথে যুগযুগান্তের যাত্রা চলিতেছে, যে-পথে অনেক জাতি প্রভাতে জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিগদিগন্তে ধূলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যা বেলায় তারা ভগ্ন দণ্ড এবং জীর্ণ কন্থায় যাত্রা শেষ করিল, কত সাম্রাজ্যের অহঙ্কার ঐ পথের ধূলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সব তারিখের ভাঙা টুক্‌রাগুলা কুড়াইয়া ঐতিহাসিক উল্টাপাল্টা করিয়া জোড়া দিয়া মরিতেছে। আমাদের বাণী বেদনার বাণী, সত্যের বলে যার বল, একদিন যাহা অন্য সকল কলগর্জ্জনের ঊর্দ্ধে ইতিহাসবিধাতার সিংহাসনতলে আসিয়া পৌঁছিবে।

একদিন ছিল যখন য়ুরোপ আপন আত্মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। তখন নানা চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও সে একথা বুঝিয়াছিল, যে, বাহিরের লাভের দ্বারা নয়, কিন্তু অন্তরে সত্য হইয়া মানুষ আপন চরম সম্পদ পায়। সে জানিত এ লাভের মূল্য কেবল আমাদের মনগড়া নয়, কিন্তু ইহার মূল্য সেই পরম প্রেমের মধ্যে যাহা চিরদিন মানুষের সংসারের মধ্যে সচেষ্ট হইয়া আছে। তার পরে এমন দিন আসিল যখন বিজ্ঞান বহির্জ্জগতের মহিমা প্রকাশ করিয়া দিল এবং য়ুরোপের নিষ্ঠাকে আত্মার দিক হইতে বস্তুর দিকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল।

মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের খুব একটা বড় তাৎপর্য্য আছে। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সহযোগিতা আছে বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করে। প্রকৃতির নিয়মের সাহায্যেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অধীনতা কাটাইয়া মানুষ আপন ধর্ম্মবিবেকের স্বাধীন নির্ব্বাচনের গৌরব লাভ করিতে পারে ইহাই বিজ্ঞানের শিক্ষা। প্রকৃতি যে মানুষের পরিপূর্ণতা লাভের পথে অন্তরায় নহে, প্রকৃতির সহিত সত্য ব্যবহার করিয়া তবেই আমাদের চিন্ময়কে রূপ দান করিয়া তাহার বাস্তপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, য়ুরোপের প্রতি এই সত্য প্রচারের ভার আছে।

বিজ্ঞান যেখানে সর্ব্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয় সেখানেই তার ভয়ঙ্কর পতন। কারণ ইহার প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ডরূপে প্রবল যে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়-বড় নামের বর্ম্ম পরিয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ জগতের সর্ব্বত্র এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্ব্বলের দিকে দলন-বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে; সকল দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধের উদ্যোগ নিত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পোলিটিকাল মহামারীর বাহন যে রাষ্ট্রনীতি তাহা নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনায় অন্তরে-অন্তরে কলুষিত হইতে থাকিল।

তথাপি এই আশা করি য়ুরোপের এতদিনের তপস্যার ফল আজ বস্তুলোভের ভীষণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া পায়ের তলায় ধূলা হইয়া যাইবে না। আজিকার দিনের প্রচণ্ড সঙ্কটের বিপাকে য়ুরোপ আর কোনো একটা নূতন প্রণালী আর একটা নূতন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বারম্বার মৃত্যুর পাঠশালায় শিক্ষা লাভের পরে য়ুরোপকে আজ না হয় ত আর-একদিন একথা মানিতেই হইবে যে কেবল কার্য্যপ্রণালীর পিরামিড নির্ম্মাণের প্রতি আস্থা রাখা অন্ধ পৌত্তলিকতা; তাহাকে একথা বুঝিতে হইবে, বাহিরের প্রণালীকে নয়, অন্তরের সত্যকে পাওয়া চাই, একথা বুঝিতে হইবে যে, ক্রমাগতই বাসনা-হুতাগ্নির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে একদিন জগদ্ব্যাপী অগ্নিকাণ্ড না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। একদিন জাগিয়া উঠিয়া য়ুরোপকে তার লুব্ধতা এবং উন্মত্ত অহঙ্কারের সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে, তারপরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে উপকরণই যে সত্য তাহা নয়, অমৃতই সত্য।

ঈর্ষ্যার অন্ধতায় য়ুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। তার স্থানসন্নিবেশ, তার জলবায়ু, তার জাতিসমবায় এমনভাবে ঘটিয়াছে যে, সহজেই তার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্য্য এবং স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া

উঠিয়াছে। সেখানকার প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, তাহা এক দিকে মানবের সমগ্র শক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া আনে, আরেক দিকে তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে দীক্ষিত করে না। একদিকে তাহা য়ুরোপের সন্তানদের চিত্তে এমন তেজের উদ্রেক করিয়াছে যে তাহাদের উদ্যম ও সাহস কোথাও আপন দাবীর কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না, অপর দিকে তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনাবৃত্তিতে সুসংযম, তাহাদের সকল রচনায় পরিমিতি এবং তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতা-বোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা একে-একে বিশ্বের গূঢ়রহস্য-সকল বাহির করিতেছে, তাহাকে মাপিয়া ওজন করিয়া আয়ত্ত করিতেছে; তাহারা প্রকৃতির মধ্যে অন্তরতর যে-একটি ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধ্যানযোগে বা তর্কের বলে নয়, তাহা বাহিরের পর্দা ছিন্ন করিয়া, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তিভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।

নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে য়ুরোপের দম্ভ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই কোথায় যে তার ন্যূনতা তাহা সে বিচার করে না। বাহ্যপ্রকৃতির রূপ যে দেশে অতিমাত্র বৃহৎ বা প্রচণ্ড সে-দেশে যেমন মানুষের চিত্ত তাহার কাছে অভিভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় তেমনি মানুষ নিজকৃত বস্তুসঞ্চয় এবং বাহ্যরচনার অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে। বাহিরের বিশালতার ভারে অন্তরের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতে হইতে একদিন মানুষের সমৃদ্ধি ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মধ্যে ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। রোম একদিন আপন সাম্রাজ্যের বিপুলতার দ্বারাই আপনি বিহ্বল হইয়াছিল। বস্তুর অপরিমিত বৃহত্ত্বের কাছে তার সত্য যে প্রতিদিন পরাভূত হইতেছিল তাহা সে নিজে জানিতেই পারে নাই। অথচ সেদিন য়িহুদী ছিল রাষ্ট্রব্যাপারে পরতন্ত্র, অপমানিত। কিন্তু সেই পরাধীন জাতির একজন অখ্যাতনামা অকিঞ্চন যে সত্যের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল তাহাই ত স্তূপাকার বস্তুসঞ্চয়ের উপরে জয়লাভ করিল। য়িহুদী উদ্ধত রোমকে এই কথাটুকুমাত্র স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল যে, আপন আত্মাকে তুমি আপন ধনের চেয়ে বড় করিয়া জান। এই কথাটুকুতেই পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন যুগ আসিল।

দরিদ্রের কথায় আপনার উপর মানুষের শ্রদ্ধা জন্মিল, আত্মাকে লাভ করিবার জন্য সে বাহির হইল। বাহিরে তাহার বাধা বিস্তর, তবু নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে অমৃতলোকের দিব্যসম্পদ অর্জ্জন করিবার জন্য সে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য বাহিরের দিক হইতে আবার আসিল প্রলোভন। বাহিরের জগৎকে তার হাতে তুলিয়া দিবার জন্য বিজ্ঞান তার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। য়ুরোপ আবার আত্মার চেয়ে আপন বস্তুসংগ্রহকে বড় করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বস্তু চারিদিকে বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু ইহাই অসত্য। যেমন করিয়া যে-নাম দিয়াই এই বাহিরকে মহীয়ান করিয়া তুলি না কেন ইহা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা ক্রমাগতই সন্দেহ, ঈর্ষ্যা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতারণা, অন্ধ অহঙ্কার এবং অবশেষে অপঘাতমৃত্যুর মধ্যে মানুষকে লইয়া যাইবেই; কেননা মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় সত্য এই যে, "তদেতৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।" অন্তরতর এই যে আত্মা, বাহিরের সকল বিত্তের চেয়ে ইহা প্রিয়।

য়ুরোপে ইতিহাস একদিন নূতন করিয়া আপনাকে যে সৃষ্টি করিয়াছিল, কোনো নূতন কার্য্যপ্রণালী, কোনো নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে তাহার মূলভিত্তি ছিল না। মানুষের আত্মা অন্য সব-কিছুর চেয়ে সত্য, এই তত্ত্বটি তাহার মনকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সৃজনীশক্তি সকল দিকে জাগিয়া উঠিল। অদ্যকার ভীষণ দুর্দ্দিনে য়ুরোপকে এই কথাই আর-একবার স্মরণ করিতে হইবে। নহিলে একটার পর আর-একটা মৃত্যুবাণ তাহাকে বাজিতে থাকিবে।

আর আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবিদ্ধ পশ্চিমের কাছ হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু আমাদিগকে কি দিতে পারে? পূর্ব্বে একরকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল তাহার বদলে আর-একরকমের রাষ্ট্রতন্ত্র? কিন্তু মানুষ কি কোনো

সত্যকার বড় জিনিস একের হাত হইতে অন্যের হাতে তুলিয়া লইতে পারে? মানুষ যে-কোনো সত্যসম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে না। ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না—কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী।

য়ুরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না? যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার লোভের অন্ত কোথায়? যে-হাত দিয়া সে কোন সত্যবস্তু দিতে পারে লোভে তার সে-হাতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—সত্য করিয়া তার দিবার সাধ্যই নাই—সে যে রিপুর দাস। যে মুক্ত, সেই মুক্তি দান করে।

যদি সে বিষয়বুদ্ধির পরামর্শ পাইয়া আমাদিগকে কিছু দিতে আসে তবে সে নিজের দানকে নিজে কেবলি খণ্ডিত করিবে। একহাত দিয়া যত দিবে আর-একহাত দিয়া তার চেয়ে বেশি হরণ করিবে। স্বার্থের দানকে পরীক্ষা করিয়া লইবার বেলা দেখিব তাহাতে এত ছিদ্র যে সে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখিবে কি, তাহাকে ভাসাইয়া রাখাই শক্ত।

তাই এই কথা বলি, বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড় দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে।" আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেইজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব একথা যে বলে সে-লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে দুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না, সেইজন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের কোনো আকস্মিক কারণ হইতে নয়।

য়িহুদী যখন পরাধীন ছিল তখন রোমের হাত হইতে দাক্ষিণাস্বরূপ তাহারা স্বাধীনতা পায় নাই। পরে এমন ঘটিয়াছে যে, য়িহুদী দেশছাড়া হইয়া বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার রাষ্ট্রও নাই, রাষ্ট্রতন্ত্রও নাই। কিন্তু তাহার ইতিহাসে এইটেই সকলের চেয়ে গুরুতর কথা নয়। ইহার চেয়ে অনেক বড় কথা এই যে, তাহার কাছ হইতে প্রাণের বীজ উড়িয়া আসিয়া য়ুরোপকে নূতন মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে। সে যাহা দিয়াছে তাহাতেই তাহার সার্থকতা। যাহা হারাইয়াছে, যাহা পায় নাই, সেটা সত্ত্বেও সে বড়, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

বাহিরের পরিমাণে মানুষের পরিমাণ নহে একথা আমরা বারবার ভুলি, কিন্তু তবু ইহা বারবার মনে করিতে হইবে। চীনদেশকে য়ুরোপ অস্ত্রবলে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু বড় কথা এই যে, ভারত একদিন বিনা অস্ত্রবলে চীনকে অমৃত পান করাইয়াছিল। ভারত আজ যদি সমুদ্রের তলায় ডুবিয়া যায় তবু যাহা সে দান করিয়াছে তাহার জোরেই সে মানুষের চিত্তলোকে রহিল; যাহা সে ভিক্ষা করিয়াছিল, চুরি করিয়াছিল, স্তূপাকার করিয়াছিল, তাহার জোরে নয়।

তপস্যার বলে আমরা সেই দানের অধিকার পাইব, ভিক্ষার অধিকার নয়, একথা যেন কোনো প্রলোভনে না ভুলি। মানুষ যেহেতু মানুষ এইহেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না, সত্যের দ্বারাই সে বাঁচে। এই সত্যই তাহার যে, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নাই। এই সত্যকে দান করিবার জন্য আমাদের উপর আহ্বান আছে। মণ্টেগুর ডাক খুব বড় ডাক, আজ এই কথা বলিয়া ভারতে সভা হইতে সভায়, সংবাদপত্র হইতে সংবাদপত্রে ঘোষণা চলিতেছে। কিন্তু এই ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না। আমাদের পিতামহেরা অমরলোক হইতে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন, তোমরা যে অমৃতের পুত্র এই কথা জান, এবং এই কথা জানাও; মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য দান কর যে, কোনো কর্ম্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্যব্যবস্থায় নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণ-তায় নয়, তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাণী

(বাউলের সুর)

বল, বল, বন্ধু, বল, তিনি তোমার কানে কানে
নাম ধরে' ডাক দিয়ে গেছেন ঝড়বাদলের মধ্যখানে।
স্তব্ধ দিনের শান্তিমাঝে
জীবন যেথায় বর্ম্মে সাজে
বল, সেথায় পরান তিনি বিজয়মাল্য তোমার প্রাণে।
বল, তিনি সাথে সাথে ফেরেন তোমার দুখের টানে।

বল, বল, বন্ধু, বল, নাম বল তাঁর যাকে তাকে।
শুনুক তারা ক্ষণেক থেমে ফেরে যারা পথের পাকে।
বল, বল, "তাঁরে চিনি
ভাঙন দিয়ে গড়েন যিনি,"
বেদন দিয়ে বাঁধ বীণা আপন মনে সহজ গানে।
দুখীর আঁখি দেখুক চেয়ে সহজ সুখে তাঁহার পানে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৌষপার্ব্বণ

(১)

সন্ধ্যা তখন হয়ে এসেছে। রাঙা সূর্য্যের উগ্র মূর্ত্তি আর নেই। তিনি তখন পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে সিঁদুরের কৌটার মত স্নিগ্ধ শোভা ছড়াচ্ছেন। ঢেঁক্‌শালে বসে বসে দত্তদের বিধবা বৌ সুরমা চাল ঝাড়তে ব্যস্ত। পাড়ার দুটি চাষীদের মেয়ে ঢেঁকিতে পাহার দিচ্ছে। তাদের চরণস্পর্শে উৎফুল্ল হয়ে ঢেঁকি ঢকর-ঢক্ করে নেচেই চলেছে। সুরমা কুলোখানা নামিয়ে মাঝে-মাঝে এক-একবার পশ্চিমের মাঠের পারের ধূলায় ধূসর রাস্তাটার দিকে যখন চেয়ে দেখ্‌ছিল, তখন চাষীদের মেয়ে ফেনী প্রায়ই একটু নরম সুরে বলে উঠ্‌ছিল, "আহা বৌঠান্, অত উতলা হও কেন? গোপাল দাদা এই এল বলে।"

বই বগলে একটি শ্যামবর্ণ রোগা পাতলা ছেলে এসে দাঁড়াল। মাথায় তার একরাশ চুল, চোখ দুটি বড় বড়, হরিণ-শিশুর মত কেমন যেন অসহায় দৃষ্টি। ছেলেটি লম্বায় নেহাৎ কমসম নয়, কিন্তু মুখখানি তার মায়ের কোলের কচি ছেলের মতই ঢল্‌ঢলে। এই কিশোর বালকটিকে দেখ্‌লে তার অতখানি দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও বোধ হয় মেয়েরা একটু আদর করে গাল না টিপে থাক্‌তে পারে না।

সুরমা চোখ তুলবার আগেই গোপাল বইগুলো ঝুপ করে একটা চালের ধামার মধ্যে ফেলে দিয়ে তার আঁচল ধরে টানাটানি বাধিয়ে দিলে। চাবির গোছা এক নিমিষে আঁচল ছেড়ে গোপালের হাতে এসে হাজির। তার পর গোপালের সে কি নাচ! সুরমা হাত বাড়িয়ে যত বলে, "আরে, চাবি নিয়ে কোথা যাস্? শীগ্‌গির দে, কোথায় হারিয়ে ফেলবি, তার পর আমি রাজ্যি শুদ্ধ খুঁজে বেড়াব।" গোপাল, তত লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে যায় আর বলে, "দেব না, কি মজা; হাতে পেয়েছি আর ছাড়ছি না; বল আগে চার আনা পয়সা দেবে, নয়ত এই দৌড় দিচ্ছি একেবারে তালপুকুরের পাড়ে।" বল্‌তে না বল্‌তে, গোপাল, দৌড়তে সুরু করল। বৌ অগত্যা হাতের কাজ ফেলে, "এই বাঁদর ছেলে থাম বলছি; লক্ষীটি ভাই গোপাল অমন করে না" ইত্যাদি নানা কথা বলে বালকের পিছনে ছুট্‌ল। ঢেঁক্‌শালের সামনের নিকোনো তক্‌তকে মস্ত উঠোনটা পার হতেই বাইরে দরজার পাশ থেকে গ্রামের ডাক-হরকরা ডেকে বল্লে, "বৌমার চিঠি আছে একখান।" বৌমা এলো চুলের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে কপাটের আড়াল থেকে হাতখানা বের করে দিলেন, কোথা থেকে গোপাল এসে ফস্ করে চিঠি-খানা নিয়ে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। "ও ভাই বৌঠান, তোমার নামে চিঠি! কে লিখেছে, বল না ভাই। খুলে দেখি না আমি।" গোপালের আর তর সয় না। না জানি কি একটা নূতন খবর আছে! সেটা না জেনে চিঠিখানা হাতে করে অপেক্ষা করা কি কম কথা! গোপাল সে পারবে না, এখুনি তার সব জানা চাই। বৌঠান ঘরে গিয়ে তবে চিঠি খুলবে, তার পর পড়বে; তার পর গোপালের হাতে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

বৌঠানের কিন্তু অত তাড়া দেখা গেল না। তার মুখ-খানা চিঠির নামেই কেমন যেন শুকিয়ে এল। কথার কোনো

জবাব না দিয়ে কেবল হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা সে চেয়ে নিলে। গোপাল বৌঠানের নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে তার অমন মুখ দেখে মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্ত হয়ে গেল। বৌঠানের মুখের সব ভাবই তার চেনা। সে মুখে কি একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখে দুরন্ত ছেলেটির ঢলঢলে স্নিগ্ধ চোখদুটিও ব্যাকুল হয়ে উঠল। সুরমার সকল ব্যথাই যে তার মনে ব্যথার সঞ্চার করে, একথা সে নিজে হয়ত কোনো দিনই স্পষ্ট করে অনুভব করে-নি; কিন্তু সেই ব্যথার গোপনস্পর্শে তার আনন্দ-উচ্ছ্বাস আপনি থেমে যেত, তার কচি মুখখানির উপরও বিষাদের ছায়া এসে পড়ত।

ঘরে গিয়ে গোপাল বল্লে, "কি ভাই বৌঠান, চিঠিতে বুঝি কিছু মজার কথা নেই?" বৌঠান বল্লে "না।" তখনি একবার "ওঃ" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কখন্ যে আবার সে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে নিজেও টের পায়নি সুরমাও পায়নি।

"বৌঠান চিঠি কে লিখেছে?" শুনেই সুরমা এক টানে বলে গেল, "আমার বাপের বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, আমায় একবার সেখানে যেতে হবে।"

গোপাল কেমন একটু চম্‌কে উঠে আগ্রহ-ভরে বল্লে, "আর আমাকে?"

"তোমাকে না ভাই, তুমি এইখানেই থাকবে।"

কচি মুখখানি আঁধার করে গাল ফুলিয়ে সে বললে, "একলাটি? তুমি আর আসবে না বুঝি?"

কথা বলতে গোপালের গলার স্বর ভারী হয়েছিল কি না কে জানে; সুরমার কানে কিন্তু গলাটা কেমন ভার-ভার ঠেক্‌ল। মনে হ'ল চোখের জলে তার কচি গলা একটু যেন মোটা হয়ে আস্‌ছে। তাই গোপালের আগেই তার বৌঠানের চোখ জলে ছলছল করে উঠ্‌ল। কিন্তু গোপাল দেখলে ভারবে কি? হেসে কথা কইতেই হবে। সুরমা বল্লে, "ওমা আসব না কেন ভাই? চট্ করে ফিরে আসব। তোমার কিনা ভাই পড়াশুনো, তাই তোমায় রেখে যেতে হ'ল। নইলে ভাইটিকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি!"

গোপাল অত আদর-সোহাগের কথা পছন্দ করে না। সে এখন বড় হয়েছে, বৌঠানের ও সব ছেলে-ভুলোনো কথা শুনলেই তার লজ্জা করে। ম্লান মুখে একরাশ হাসি ফুটিয়ে সহজে তার নরম মুখখানি বৌঠানের মুখের দিকে তুলে গোপাল খুব একটা লম্বা টান দিয়ে বললে, "আরে ভারি ত! আচ্ছা যাও না, কি আর হয়েছে? আমি বুঝি একলা থাকতে পারি না ভেবেছ? চাল ডাল সব রেখে যেও, ফেলীকে বোলো বাসন মেজে রোজ একবারটি উনুনটা ধরিয়ে দিতে, ব্যস্! দিব্যি থাকব। হাঁ, আর একটা টাকা দিয়ে যেও; আমি শশীপুরের মেলায় যাব। বুঝলে? উনুনটা কিন্তু ভাই আমি ধরাতে পারি না, সেটা বলে যেও।"

গোপাল আপন মনে নিজের ভবিষ্যৎ ঘরকন্নার আনন্দের ব্যাখ্যা করতে করতে বেরিয়ে চলে গেল। সুরমার কিন্তু কথাগুলো মনের মত হ'ল না। গোপাল কান্নাকাটি গোলমাল কিছু না করলেই ভাল, নইলে রেখে যাওয়া শক্ত হবে। কিন্তু তবু কেন জানি না, তার হৃদয়ের ভাল-বাসা একটু কান্নাকাটির পথ চেয়েই বসে ছিল। বৌঠান গোপালকে ছেড়ে চলে যাবে, আর গোপাল কিনা ওই দুটো কথা কয়েই অভিমানের পালা শেষ করে আনন্দের গান সুরু করে দিলে। সুরমার মন চাইছিল গোপাল চুপচাপ থাকে, কিন্তু তার মনের মন আড়াল থেকে চাই-ছিল গোপালের কান্না। কেন সে এমন করে নিরাশ করে দিয়ে গেল? ভাল থাক ভালই, চলে যাবার পর আনন্দ করুক, কিন্তু যাবার কথা শুনে যদি দু ফোঁটা চোখের জল পড়ত! সুরমার মন আপনা থেকেই সিদ্ধান্ত করে বসল,—আমার মন খারাপ হবে বলে ও অমন ছল করে চলে গেল। মনে ওর খুবই লেগেছে; নইলে কথাটা শুনেই চম্‌কে উঠবে কেন? বেরিয়ে যাবার সময় কেমন যেন চট্‌করে ছুটে চলে গেল; চোখে বোধ হয় জল আসছিল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার সময় গোপাল কোনো কথাই কইলে না। সুরমা আঁচল আড়াল দিয়ে প্রদীপটা নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে শোবার ঘরে গিয়ে উঠ্‌ল। পিতলের মাজা পিলশুজের উপর প্রদীপটা রেখে সুরমা যখন বিছানা ঝাড়তে ব্যস্ত ততক্ষণে গোপাল এসে হাজির।

ম্লান আলোর রেখা জলচৌকির উপর সাজানো ঘরের বাসনগুলির গায়ে পড়ে চিক্‌চিক্ করছিল, গোপাল তারি আশেপাশে খানিক ঘুরে হঠাৎ আঙুল দিয়ে সুরমার লম্বা চুলের একটা গোছা জড়াতে সুরু করে দিলে।

সুরমা বল্লে, "আঃ করিস কি, লাগে না?"

গোপাল তার উত্তরে একেবারে বলে বস্‌ল, "বৌঠান ভাই, পিঠে পার্ব্বণ কবে? তখন তুমি আসবে ত? নইলে আমায় পিঠে করে দেবে কে?"

ছোট দেওরটির ওইটুকু টানের কথাতেই সুরমার স্নেহভিক্ষু মন নরম হয়ে এল। এ ত পিঠে খাবার ভিক্ষা নয়, এ বৌঠানকে পাবার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন। সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "হ্যাঁ ভাই, নিশ্চয় আসব। কত কত পিঠে করে তোমায় খাওয়াব। সেখানে বসে থাক্‌লে আমার অত পিঠে খাবে কে? বাবা মা বুড়ো মানুষ, তোমার সিকির সিকিও খেতে পারবেন না।" দেওর বৌঠানের কথায় বেজায় খুসী; হ্যাঁ, বৌঠান আমায় চিনেছে বটে!

পাশাপাশি দুখানা তক্তাপোষে শুয়ে সে রাত্রে দুজনের কত না গল্প! সুরমা একরকম শ্রোতাই ছিল, বক্তা গোপাল। সুরমার মনটা বাপের বাড়ীর দুঃসংবাদ পেয়ে কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল; মনের ব্যথা মনে চেপে বেশী কথা কইতে সে পারে না। কিন্তু আদরের দেওরটির আনন্দকল্লোল পাছে তার মৌনতার কঠিনস্পর্শে থেমে যায় তাই প্রদীপের আলোর দিকে পিছন ফিরে সে দু-চারটে কথা বলে কথার ধারাটা বজায় রাখছিল। সে কত সাত রাজ্যের সাত শ' রকম কথা! কবে কোথায় মেলায় অন্ধ ভিখারী একটা মেলার দরজার বাইরে বসে আপন মনে গান গাইত, তার করুণ মুখের সেই বিষাদমাখা দুঃখ-গাথার কথা; আবার কোথায় বিজয়ার দিনের ঘটার বাইচ লড়ার কথা; কখনও বা শীতের সন্ধ্যায় দোলাই গায়ে আগুনের পাশে বসে গরম গরম মুড়িফুলুরি খাওয়ার সখের কথা ওঠে, কখনও বা গুরুমশায়ের হাতে পাঠশালার ছেলেদের দুরন্ত দুর্দ্দশার কথা ওঠে। কত সুখদুঃখ হাসিকান্নার স্মৃতিজড়িত সে-সব গল্প! কোন্ কথার মধ্যে গোপাল হঠাৎ বল্লে বস্‌ল, "জানো বৌঠান, আজ সন্ধ্যায় কেন এত দেরী করে বাড়ী এলাম? যদু-ময়রা গুরুমশায়কে খবর দিলে পাড়ায় নাকি একটা আড়কাঠি এসেছে। সে কি-রকম কাঠি ভাই, আমি ত কখনও দেখিনি! বল্লে, গোয়ালাপাড়ার পাশের সেই নীলকুঠির লাল ইটের ঘর-খানার কাছেই নাকি দেখা যাবে। আমরা সবাই ত দে দৌড়। ছুটে আমার সঙ্গে কে পারে বল? কিন্তু গিয়ে দেখি রাজ্যের খড়কুটো পাতাকাঠি জড়ো করে দিব্যি আগুন জ্বেলে একটা মস্তমোটা লোক জোড়া চাদর গায়ে দিয়ে হাতদুখানা বাড়িয়ে পা মেলে খুব আরামে বসে আছে। সবাই বল্লে কি না, ওই লোকটাই আড়কাঠি। আমাকে বোকা পেয়েছে কিনা, কিছু না পেয়ে যা তা বুঝিয়ে দিলে। আমি বাবা, তেমন ছেলেই নয়; সোজা গিয়ে বলে এলুম, 'মশায়, আপনাকে এরা কাঠি না কুটো কি বল্‌ছে শুনেছেন?' সে শুনে হেসেই অস্থির। হাসির চোটে তার প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা দুলে দুলে উঠছিল। ওরে বাস্‌রে, তার সে চেহারা নয় ত, যেন ঢাকাই জালা।"

বৌঠান মৃদু গলায় সংক্ষেপে উত্তর দিলে, "তাই নাকি?"

ভোরে কাক কোকিলও ডাকেনি, এমন সময় সুরমা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। গোপাল তখন দুই হাতে বালিশটা আঁকড়ে হাঁটু দুটো বুকের কাছে এনে লেপের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে অগাধ নিদ্রায় মগ্ন। শীতে জড়সড় ঘুমন্ত ছেলেটির মুখে ঘুমের মধ্যেই হাসি ফুটে উঠেছে। বোধ হয় ঢাকাই জালার দোলায়মান দেহের তরঙ্গ স্বপ্নে তাকে তখনও হাসি জোগাচ্ছিল। ডালিমফুলের নক্‌সা-করা একখানা পোষাকী বালাপোষ আলনায় ঝুলছিল; সুরমা গোপালের গায়ে সেইখানা চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। খিড়কির পুকুর-পাড়ে অত ভোরেই পল্লীবধূদের দুচারজনের দেখা মেলে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে দত্তদের ওবাড়ীর বড় মেয়ে এসে উপস্থিত। বৌকে দেখে একটু হেসে বল্লেন, "কি বৌ, বড় ভোর-ভোর যে! গোপাল ভাল ত?"

সে বল্লে, "হ্যাঁ দিদি, গোপাল ভালই। আমার বাপের বড় অসুখ, যেমন-তেমন নয়, বসন্ত। মন বড় খারাপ, আজ দুপুরে বেরিয়ে রাতের গাড়ী ধরতে হবে।"

ঠাকুরঝি বল্লেন, "আহা বড় ভাল লোক বোস মশাই। মা শেতলা ভালয় ভালয় রেখে গেলেই ভাল।"

বৌ একটু আমতা-আমতা করে হঠাৎ বল্লে, "ঠাকুর-ঝি, তোমার বাড়ীই যাব ভেবেছিলাম। গোপালকে ত সেখানে নিয়ে যাবার নয়। তুমি যদি তাকে এ কদিন রাখ তবেই…।"

দিদির মন ছিল ভাল; বল্লেন "ওমা, তা রাখব বৈ কি। ভাইটিকে দু-দিন কাছে ত বড়বোনে রেখেই থাকে।"

সুরমা চুপিচুপি এইবার আসল কথাটি পাড়লে, "জানই ত ঠাকুর-ঝি, ভাইটি তোমার আমায় দুদণ্ড চোখের আড়াল করে না। ভুলিয়ে রাখবার জন্যে বলেছি পিঠে-পার্ব্বণের আগেই আসব। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, সে হবার নয়। তাই বল্‌ছিলুম কি, তোমার ভাই, পর নয়—তুমি ত দেখবেই, তবে কিনা একটু চোখে চোখে রেখ; বড় অভিমানী, পার্ব্বণের দিন হয়ত কান্নাকাটি করবে। তা' তোমায় অবিশ্যি বলতে হবে না, আমার চেয়ে তোমার টান কম ত আর না—রক্তের টান। তবে একবার বল্লাম।"

ঠাকুর-ঝি বল্লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখব শুনব, পিঠে করে দেবো। তোমার কোনো চিন্তা নেই বৌ।"

বেলা বারটায় একখানা গরুরগাড়ী দরজায় এসে দাঁড়াল। গোপাল তখন বাক্স খুলে শশীপুরের মেলার জন্যে পোষাক গোছাতে ব্যস্ত। ভাইফোঁটার পাওনা জরিপেড়ে কাপড়খানা দুহাতে ঘসে ইস্ত্রি করা চলছে। একটা সবুজ ডোরাকাটা টিনের ছোট বাক্স, একটা বড় ধামা, তার উপর লাল গামছার চার কোণে বাঁধা চারটে ছোট পুঁটলি গাড়ীর মধ্যে তোলা হ'ল। তারপর নীল একখানা পুরানো শাল গায়ে দিয়ে ভিতরের ঘরের গায়ে চাবি দিয়ে সুরমা গাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে গোপালকে দেখে বল্লে, "গোপাল, আমার যে সময় হয়েছে।" গোপাল ঠোঁটটা একটু ফুলিয়ে বড় বড় চোখদুটি তুলে একবার বৌঠানের মুখের দিকে তাকালে, হাত দুখানা তখনও তার বাক্সের মধ্যে। বৌঠান তার নরম গালদুটি টিপে কপালের উপর একবার নিজের মুখটা ঠেকালে। প্রণাম করতেও গোপালের তখন সময় নেই। সে আবার বাক্সের মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে দিলে। গাড়ীর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে গোপাল আবার এক-বার মুখ তুলে চেয়ে দেখলে বৌঠান গাড়ীর ছইএর পিছনের চটের পর্দাটা তুলে গোপালের দিকেই চেয়ে আছে।

সারা পথ সুরমার মন কেবল গোপালের জন্যেই আকুলিবিকুলি করছিল। বাবার কথা যে তার মনে পড়েনি, তা নয়; তবে যে-বন্ধন শৈশবে সমাজ নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে কচি মেয়েটির মন রক্তে রাঙা করে দিয়ে-ছিল, আজ সেই ক্ষত পূর্ণ করে সেখানে নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে। যতবার সে আজ বৃদ্ধ পিতার মুখ মনে করতে চাইছিল, ততবারই সেখানে জেগে উঠ্‌ছিল কোঁকড়া কালো চুলে ঘেরা একটি কিশোর মুখের শ্যাম শোভা। বাড়ীর পেছনে বাঁকা বাঁশের মাচার উপর যেখানে লাউগাছ সহস্র ফণা তুলে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে পড়ে আছে, পথের মোড় ফেরবার সময় পর্য্যন্ত সেইখানটি দেখা যায়। সুরমা যতক্ষণ দৃষ্টি চলে সেই দিকে চোখ মেলে বসে ছিল। কেবলি মনে হচ্ছিল, এইবার গোপাল একবার বেরিয়ে আসবে, মাচার পাশ থেকে হয়ত দুষ্টুমি করে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে তাকে ডাক্‌বে। কিন্তু সে ত এল না। তবে বুঝি ঘরে মেজেয় পড়ে কাঁদছে। সুরমার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে একবার সহস্র চুম্বনে গোপালের চোখের জল মুছে দিয়ে আসে। কিন্তু গোপাল তখন শশীপুরের মেলার চিন্তায় বিভোর। আর বৌঠান ভাবছে, আসবার সময় গোপাল কথা কইলে না, প্রণাম করলে না, বুঝি কথা কইতে গেলে চোখের জল ঝরে পড়ত। সুরমার মনে সেই বড় বড় চোখের অসহায় দৃষ্টি ঘুরে ফিরে কত কান্নার নালিশ জানিয়ে যাচ্ছিল। সেই যে বাক্সর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঠোঁট ফুলিয়ে মুখখানা উঁচু করে গোপাল শুধু একবার চেয়েছিল, তারি নীরব অভিযোগ মনে করে সুরমারই চোখ ছলছল করে উঠছিল।

সোনার অঙ্গ ধুলায় পেতে সরগুঁজার ক্ষেত হাসিমুখে মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে। সুরমার গাড়ী তারি পাশ দিয়ে ঝড়াং ঝড়াং করে হেল্‌তে দুলতে চলেছে। আজ তার মনে পড়ছে, অনেক দিন আগেকার আর-এক পৌষের কথা। বিয়েরও আগে এমনি সোনার ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দশবছর বয়সের সময় মাসতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ী

দেখতে দিদির সঙ্গে সে এই গাঁয়েই এসেছিল। দিদি একদিন দত্তদের বাড়ী নূতন খোকা দেখবার জন্যে তাকে নিয়ে যায়। সেই দিনই মায়ের কোলে প্রথম সে গোপালকে দেখে। আজ মনে পড়ছিল, মুখ নীচু করে ঝুঁকে পড়ে সে যখন খোকার মুখ দেখতে যায়, তখন তার কাঁধ পর্য্যন্ত কোঁকড়া চুলের গোছা এলিয়ে পড়ে খোকার নরম নরম হাতের কাছে ঝুলে পড়েছিল। সেই চার মাসের কচি খোকা সেই দিনই তার মধ্যে কি দেখ্‌লে জানি না, খিল্ খিল্ করে হেসে তখনি কিন্তু সে ছোট ছোট গোলাপী হাতের মুঠোয় তার চুলের গোছা চেপে ধরলে। সত্যি, খোকা সেইদিনই কি করে তাকে চিনে ফেললে, আজও সে কথার অর্থ সুরমা ভেবে পায় না। তখন কে জান্‌ত ঐ সুরমাই দত্তবাড়ীর বড় বৌ হবে, আর কেই বা জান্‌ত যে ঐ অতটুকু খোকা আজ সুরমার সর্ব্বস্ব হয়ে বসবে?

তের বছর বয়সে দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ী এসেই সুরমা বিধবা হয়। সেই বছরই বড় ননদ বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। অতবড় ছেলের শোকে শাশুড়ী সেই যে শয্যা নিলেন, এজন্মে আর সে শয্যা তাঁকে ছুটি দিলে না। তিন বছরের খোকা সব হারিয়ে বৌঠানকেই সম্বল করলে। বাপ মায়ের বড় আদরের মেয়ে হয়েও তাই সে স্বামীর শূন্য সংসার ফেলে মায়ের কোলে দুদিন পড়ে জুড়তে পায়নি। চির দুর্ভাগিনী বাঙালীর বিধবা সুরমা আপন বলে গোপালকেই বরণ করে নিলে। মনের মধ্যে চেয়ে আজ যদি সে খোঁজ করে গোপাল তার কে, কিছুই ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। গোপাল তার ছেলে নয়, কিন্তু গোপালই তার সব, সেই তার বুকজোড়া সুখ, হৃদয়ভরা আনন্দ। স্বামীর মুখ তার মনে পড়ে বটে। চতুর্দ্দোলায় চড়ে চেলীর জোড় পরে বরবেশে শাঁখের মঙ্গল-ধ্বনি আর সানাইয়ের সুরের মাঝখানে তরুণমূর্ত্তি লজ্জানম্র মুখে একদিন তারি সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখখানি এখনও তেমনি মধুররূপে সুরমার হৃদয়ের ছোট্ট একটি কোণে আলো করে জেগে আছে। কিন্তু শুধু উৎসবের দিনের সুখস্মৃতি দিয়ে শুধু একদিনের হাসি-গানের স্মৃতি দিয়ে মেয়েমানুষের মনপ্রাণ যে পূর্ণ হয়ে থাকে না। সে চায় একটা জীবন্ত মানুষের প্রাণের স্পর্শ। স্মৃতিকে যদি নিতান্তই সম্বল করতে হয়, তবে সে স্মৃতি সুখে দুঃখে জড়িত, হাসিকান্না-মাখা, মান অভিমানে ঘেরা পরিপূর্ণ মানুষের স্মৃতি হওয়া চাই। সংসারের সকল আনন্দ-বিষাদের মাঝখানে, ছোটবড়র মধ্যে সেই দুদিনের উৎসবের সাথীটিকে ত সে একেবারেই পায়নি। তাই ওই বাল্য-মূর্ত্তিটিকে ঘিরেই তার যত মিলনের গান, বিরহের ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে ওঠে। স্বামী তার কল্পনার আলোয় দেবতা হয়ে দূর থেকে এখনো হাসেন, কিন্তু এই চিরদিনের সাথী কিশোর কুমারটিই তার বুকের কাছে মানুষের স্পর্শ নিয়ে তার সকল দৈন্য ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

(২)

পৌষ সংক্রান্তির দিনে পীড়িত পিতার সেবায় ব্যস্ত সুরমার মন যতবার সুযোগ পেয়েছে কেবলি দত্তবাড়ীর শূন্য ঘরখানির দিকে উধাও হয়ে ছুটেছে। আজ তার গোপালের কাছে ফিরে যাবার কথা; কিন্তু সে যে হবার নয়। গোপালের শশীপুরের মেলা ফুরিয়ে গেছে। বাঁশীর সুরের মোহন মোহ, হাজার আলোর মধুর স্বপ্ন, সব টুটে গেছে। বেঁধে রাখবার সকল স্বর্ণশৃঙ্খল আজ ছিন্ন! এখন শূন্য মনটি বৌঠানের কাছেই ছুটে যেতে চায়, খুঁটি-নাটির মধ্যে তার আদর-তিরস্কারগুলো স্পষ্ট করে অনুভব করতে চায়। কিন্তু ছেলেমানুষের মন নিজের অভাবটা নিজেই ভালো করে বুঝতে পারছে না। থেকে থেকে কেবল বৌঠানের উপর রাগ হচ্ছে, অভিমানে ঠোঁট ফুলে উঠছে, দিদির বাড়ীর পায়েস পিঠে তার মনে ধরছে না। কি অন্যায় বৌঠানের, কথা দিয়ে কথা ভাঙে! আজও এল না কেন? সত্যি, এমন করলে কিন্তু চলবে না। এত অত্যাচার গোপাল সইবে না; যেমন করে হোক বেঁধে আনবে। গোপাল রাগের চোটে একখানা চিঠিই ফেঁদে বসল।

(৩)

মাঘ মাসের ১লা কি ২রা। সকালে উঠোনজুড়ে রোদ পড়েছে। সুরমার বাপের বাড়ীর সবকটি কচি ছেলে রান্না-ঘরের দাওয়ার উপর রোদে পিঠ দিয়ে মহাকলরবে বাসি-পিঠে পেতে বসেছে। কারুর ঘাড়ে গিরোবাঁধা চেক

কাটা শালের গা বেয়ে রসের ধারা নাম্‌ছে, কারুর বালা-পোষের উপর দিয়ে পিঁপড়ের দলও ভোজের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে চলেছে। অতি-সাবধানী কেউ পরে খাবার জন্যে ভাল পিঠেগুলি জমিয়ে রাখছে, কেউ বা লোভে পড়ে তাড়াতাড়ি সব শেষ করে শূন্যথালা সামনে করে খাবার মত করে মেজেয় হাত দুখানা চেপে ধ'রে ঝুঁকে পড়ে লুব্ধদৃষ্টিতে অন্যের পূর্ণপাত্রের রূপ দেখ্‌ছে। সুরমা কদিন ধরে এক-রকম যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাপকে ছিনিয়ে এনেছে। আজ পিতার আরোগ্যলাভের আশা দেখে এতদিন পরে তার ক্লান্ত নয়ন ঢুলে আসছে। ছেলেদের সামনে চৌকাঠের উপর জড়সড় হয়ে বসে সে ঝিমচ্ছিল। সামান্য একটু তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখলে, গোপাল বলছে, "এবার আমি পিঠে খেতে পেলাম না। বৌঠান, তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। দেখ, আর কখ্‌খনো কথা কইব না।" ডাকহরকরার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। খামের উপর রস মাখিয়ে একটি ছেলে চিঠি দুখানা হাতে করে এনে বল্‌লে, "পিসিমা, তোমার দু'খানা চিঠি; বাবারে!" গোপালের হাতের লেখা দেখে আনন্দে সজাগ হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি খাম খুলে সুরমা পড়লে :—

"বৌঠান, তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ। দাঁড়াওনা মজা দেখাচ্ছি! এমন জব্দ করব যে টের পাবে। ভারি না বলেছিলে পিঠেপার্ব্বণের দিনে নিশ্চয় আসবে! আমি কাল ভোরেই তোমার বাপের বাড়ী রওনা হচ্ছি, তোমায় জোর করে টেনে নিয়ে আসব। কেমন জব্দ।"

কার সঙ্গে অতটুকু ছেলে অজানা দেশে আসছে মনে করে চিন্তিত মুখে অন্যমনস্ক ভাবে দ্বিতীয় চিঠিখানা খুলতেই চোখে পড়ল :—

"পরম কল্যাণীয়াসু,

বৌ, অনেক দিন তোমাদের কুশল-সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ কুশল দিয়া চিন্তা দূর করিবে। পিঠে-পার্ব্বণের দিন তুমি নেই মনে করে কাল সারাদিন পিঠে করে গোপালকে খাওয়ালাম। কেমন যেন মুখ ভার করে খেলে। কিন্তু রাত্রে শুতে যাবার সময় দেখলাম বেশ হাসিখুসি চেহারা। তারপর বলতে সাহস হচ্ছে না, আজ ভোর বেলা বিছানায় গিয়ে গোপালকে না দেখে যেন মনটা কেমন করে উঠল। চারধারে খোঁজ করে কোথায়ও পেলাম না। একটা জেলে রাত থাকতে মাছ ধরতে যায়। সে বল্‌লে, নীলকুঠির সেই আড়কাঠিটার সঙ্গে ভোর রাত্রে গোপালের মত অতবড় একটি ছেলেকে ইষ্টিশানের পথে যেতে দেখেছে। খোঁজ নিয়ে শুনলাম সে লোকটাও গাঁয়ে নেই। যা হয় শীগগির একটা উপায় কর।"

সুরমা কাঠের পুতুলের মত চিঠি হাতে করে বসে রইল। তার চোখের সামনে একটি কচিমুখের দুষ্টু হাসি ফুটে উঠছিল। সে হাসি যেন আঙুল তুলে বলছে—কেমন জব্দ!

শ্রীশান্তা দেবী।

পৌর আদর্শ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের সম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্যসন্নিবেশের জন্য স্থাননির্ব্বাচনে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। অধ্যাপক গেডেস্ বলেন যে পুররাজ্যই পুরাকালের রাজ্যের আদর্শ ছিল। তাহাতে কৃষি, বাণিজ্য এবং স্থল ও জলের সুবিধা থাকিত। প্রাচীন দার্শনিকেরা বলেন যে জনপদ (region) কতকগুলি অংশে বিভক্ত ছিল; প্রত্যেক অংশকে "গ্রাম" বলিত। এইরূপ কয়েকখানি গ্রাম লইয়া এক-একটি রাজ্য গঠিত হইত। আমরা অ্যারিষ্টটল ও প্লেটোর ঐ একই মত দেখিতে পাই। তাঁহাদের প্রাচ্য সহকর্ম্মিগণও রাজনীতিবিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে একই-প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও ঐ-প্রকারের মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের মত শুক্র (উপনষ্), চাণক্য (কৌটিল্য), কামন্দক (চাণক্যের শিষ্য) ও যুক্তিকল্পতরু-প্রণেতা ভোজ এই-প্রকারেই ঐ সমস্যা সমাধান করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে মতের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ ঐক্যের কোন সুসঙ্গত কারণ দেখা যায় না; হয়ত এরূপ মতের মিল মানুষের প্রকৃতিগত, অথবা ইহাও হইতে পারে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাদৃশ্যে কিম্বা মতের যোগাযোগ ও ভাবের আদানপ্রদান হেতু বিভিন্নদেশীয় রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে এইরূপ মতের ঐক্য ঘটিয়াছিল। ইহা অত্যন্ত স্বাভা-

বিক যে আদর্শ পুররাজ্যের কল্পনাতে প্রত্যেক দার্শনিকেরই মনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় ও কলাবিষয়ক যুক্তি প্রথমে স্থান পাইয়াছিল। ভারতীয় ও গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণের মত যে পুররাজ্য গঠনের সময়ে সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। পীতাভ বারিধি-মেখল, প্রান্তশায়ী সুনীল গিরিসানুদেশে বনভূমিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধ সমভূমিভাগে সুচারুরূপে নগর সন্নিবেশ করাই বাঞ্ছনীয়। নগরের স্থানটি এরূপভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে যে নগরে যেন শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে, ইহাকে সুরক্ষিত করিতে হইবে এবং ইহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল যথেষ্ট পরিমাণে থাকিবে। অবিরত জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও সামরিক বলের মূল। ইহাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের এবং গ্রীসের পুররাজ্যের আদর্শে নিতান্ত আবশ্যক বিবেচিত হইত।

যাঁহাদের আদর্শনগরের বর্ণনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত তাঁহাদের, বিশেষতঃ ভারতীয় পণ্ডিতগণের, জীবিতকালের বিষয়, সকলের অবগতির জন্য এখানে আলোচিত হইবে। বোধ হয় সকলেই জানেন যে অ্যারিষ্টটল খৃঃ-পূঃ চতুর্থ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডি-এস্‌সি বলেন যে প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্রজ্ঞ চাণক্য প্রাচীন গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্রবিদ্ অ্যারিষ্টটলের সমসাময়িক ছিলেন। ডাক্তার ফ্রেডারিক দেখাইয়াছেন যে কামন্দকনীতি চতুর্থ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। যে-সকল পুস্তক হইতে হিতোপদেশ-প্রণেতা নীতিবিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে উহা অন্যতম।

এখন দেখা যাউক প্রাচীন গ্রন্থে আদর্শ নগরের কিরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

অ্যারিষ্টটল্ বলিয়াছেন—নগররাজ্য সমুদ্র হইতে বেশী দূরে হইবে না এবং একটি পর্ব্বতের সন্নিকটে থাকিবে। উহার উৎপাদিকাশক্তি যথেষ্ট বাঞ্ছনীয়। নগরের উত্তর দিকে পর্ব্বত থাকাতে শীতলবায়ু নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এবং শত্রুও সহজে নগর আক্রমণ করিতে পারিবে না, আর পর্ব্বত হইতে যাবতীয় ধাতব পদার্থ ও বনজাত দ্রব্য নগরে সরবরাহ করার সুবিধা হইবে। পর্ব্বতসানু বনরাজিমণ্ডিত থাকিবে ও শৈলগাত্রে দ্রাক্ষা উৎপন্ন হইবে। কিন্তু নগর সমভূমি দেশে অবস্থিত থাকিবে। নগরের অবস্থান এরূপ হইবে যে শীতকালে বায়ু মৃদু বহিবে, উহা স্পার্টা ও রোম নগরীর মত যেন নদীতীরে অবস্থিত হয়। * * * * এতদ্ভিন্ন সাধারণের ভোজের জন্য কক্ষ থাকিবে।

প্লেটোর মত।—রাজ্যসংস্থাপনের জন্য সমুদ্রতীর সম্বন্ধে প্লেটো বেশী জোর দিয়া কথা বলেন নাই। তিনি বলেন, সমুদ্রসংস্পর্শহীন হইয়া যদি কোন রাজ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহাই হউক; সামুদ্রিক জীবনের সঙ্গেসঙ্গে যে অবনতি ও কুফল ঘটে, তাহা হইতে রাজ্যকে বাঁচান চাই। তাঁহার রাজ্য পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত, সমতলভূমিতে নহে।

রোমানগণ সাগরের উপকারিতা মানিতেন; সপ্তগিরির মাঝে স্থাপিত নগর (City of Seven Hills) সাগরতীরবর্ত্তী হওয়া চাই। সাগরের কাছে অথচ দূরে এমন স্থান তাঁহারা পছন্দ করেন। রোমনগরী এই কারণেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল।

চাণক্যের মত।—বহুজনাকীর্ণ স্থান হইতে জনসমূহকে সরাইয়া ও বিদেশীদিগকে বাসের সুবিধায় প্রলুব্ধ করিয়া নৃপতি নব জনপদ সৃজন করিতেন। জনপদ কতকগুলি পল্লীর সমষ্টি লইয়া গঠিত হইবে এবং শত্রুর বহিরাক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার উপযুক্ত গড় ও খাদের বন্দোবস্ত থাকিবে। দৈর্ঘ্য দুই হইতে চারি মাইলের ভিতর হইবে, জনসংখ্যা একশত পরিবারের অধিক হইবে না, কৃষকজনসংখ্যা পাঁচশত পরিবারের বেশী হওয়া উচিত নয়। গ্রামে বিদেশী ব্যক্তিদিগকে আসিতে দেওয়া হইবে না। গোচারণের জন্য, কৃষির জন্য, সন্ন্যাসীর মন্দিরমঠের জন্য পৃথক পৃথক ভূমি থাকিবে। শিল্পদ্রব্যপ্রস্তুতের জন্য, বাণিজ্যের জন্য বনগুলি রক্ষিত হইবে।

কামন্দকের মত।—যে দেশ শস্যপূর্ণ, খনিজদ্রব্যময়, বাণিজ্যসমৃদ্ধ হইবে, কাছাকাছি পশুপালনোপযোগী ভূমি থাকিবে, নদনদীবহুল, প্রাকৃতিকশোভামণ্ডিত, বনময়, গজপূর্ণ, জল ও স্থল বাণিজ্যচালনের পথময়, গুণী ও সাধু

ব্যক্তিদের নিবাসভূমি হইবে, কৃষিকার্য্য আকাশের জলধারার উপর নির্ভর করিবে না; সে দেশের জনগণ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হইবে, নৃপতি শক্তিমান্ হইবেন। যে দেশে জীবনধারণ অল্পব্যয়সাধ্য, জমি উর্ব্বরা ও নদীসলিলসিক্ত; যে দেশ পর্ব্বততলে প্রতিষ্ঠিত; শূদ্র বণিক ও শিল্পিজনে পূর্ণ, যে দেশে কর্ম্মঠ শক্তিশালী নব নব-সঙ্কল্প-সাধনে-তৎপর কৃষকগণের বাস, প্রজাগণ রাজভক্ত, অকাতরে উচ্চহারে রাজাকে কর দান করে, বিভিন্ন দেশবাসীগণ বাস করে, গোছাগাদি জন্তু প্রচুর পরিমাণে আছে, যে দেশের জননায়কগণ দাম্ভিক উচ্ছৃঙ্খল নন, সেই দেশই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জলপথে স্থলপথে যাতায়াতের সুবিধা থাকা চাই।

শুক্রাচার্য্যের মনের মতন নগর।—যে স্থান বৃক্ষলতা-পাতাকুঞ্জে পরিপূর্ণ, পালিত পশু পক্ষী ও নানাবিধ জন্তুর বাস, যে স্থানে নির্ম্মলসলিলময়ী নদী আছে, শস্যফলাদির অভাব নাই, বৃহৎ বন ও তৃণক্ষেত্র হইতে আবশ্যক দ্রব্যের যোগান পাওয়া যায়, যে স্থান পর্ব্বত হইতে অনতি-দূরে, রমণীয় সমতলভূমিতে, জলপথ দিয়া সাগরে যাওয়া যায়, বুদ্ধিমান্ নৃপতি সেই স্থানে তাঁহার নগর গড়িবেন। তাঁহার রাজধানী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, অথবা বৃত্তাকার, অথবা চতুষ্কোণ হইবে, প্রাচীর ও পরিখা দিয়া সংরক্ষিত থাকিবে, নবপল্লী স্থাপনের স্থান থাকিবে। রাজধানীর মধ্যস্থলে সভা অথবা মন্ত্রণাগার হইবে, নগরে দরকার-মত পুষ্করিণী জলাশয় থাকিবে, প্রাচীরবেষ্টিত নগরের চারিদিকে চার দ্বার হইবে, সারি সারি উত্তম পথ ও বৃক্ষকুঞ্জময় বিশ্রামস্থান রাখিতে হইবে, সুগঠিত আহারগৃহ ও বিশ্রামগৃহ, পথিক-দিগের জন্য পান্থনিবাস ও দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেবতার নামে, জনসাধারণের জন্য ও কৃষকদের বাসস্থানের জন্য ভূমি নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

ভোজের মত।—ভোজ "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থের লেখক। রাজধানী 'ক্রমবহুল ক্বচিৎ বাপীসমন্বিত' হইবে। নগর ধনীদিগের প্রাসাদ ও রাজার মন্ত্রণাগারসমূহে মণ্ডিত হইবে; জলাশয়-কানন-তরুসুশোভিত, "সমভূমদেশে" স্থাপিত হইবে। পুর গোলাকার, ত্রিভুজ অথবা চতুষ্কোণ হইতে পারে; গোলাকার বা ত্রিভুজাকার পুর কিন্তু তত ভাল নহে।

শুক্র, প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, কামন্দক ও ভোজ ইঁহারা সকলে যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সবাই একমত তাহা দেখা যাক্। আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারা বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের লোক হইলেও কতকগুলি বিষয়ে ইঁহাদের মতদ্বৈধ নাই।

নগররচনা সম্বন্ধে সকলেই ভাবিয়াছেন, যে, নগর কিরূপে সুরক্ষিত হয় ও আপন আবশ্যক ভোগের দ্রব্যসমূহ আপন সাধনায় আপন ভাণ্ডার হইতে কেমন করিয়া লাভ করিতে পারে।

প্লেটো ভিন্ন সকলেই বুঝিয়াছেন যে সমুদ্র ও গিরির সন্নিকটতা নগররাজ্যের জীবনের পক্ষে মঙ্গলকারক ও সমৃদ্ধিদায়ক। সামুদ্রিক জীবনকে প্লেটো ভয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন, বহিঃশত্রু আক্রমণের আশঙ্কা তাঁহার মনে বিভীষিকার সৃজন করিয়াছে। সেইজন্য তিনি নগরকে সমুদ্র হইতে দূরে সংস্থাপন করিয়াছেন। নগররক্ষার জন্য এক প্রবল রণতরী ও সমুদ্রবাহিনী রাখার গুরুত্ব সকলেই অনুভব করিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন ও রাজ্যতত্ত্বশীল দার্শনিকগণ বর্ত্তমান রাজ্যরক্ষাসমস্যার মীমাংসা করিয়া বহু উত্তর দিয়া দিয়াছেন।

নগরসমূহ সৈন্যদ্বারা রক্ষিত, স্বাস্থ্যকর ও কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের উপযোগী হওয়া উচিত। অ্যারিষ্টটলের নগরের ন্যায়, শুক্র ও কামন্দকের নগরও গিরিপর্ব্বত ও বন হইতে দূরে প্রাকৃতিক শোভার মাঝে মনোরম স্থানে, শস্যফলাদিপূর্ণ খনিজদ্রব্য ও জীবজন্তুবহুল স্থানে স্থাপিত। ভোজও তাঁহার নগরকে বৃক্ষপুষ্করিণীময় রমণীয়দেশে স্থান দিয়াছেন। কেবল প্লেটোই তাঁহার নগরকে পর্ব্বতের মাঝে বন্য উপত্যকায় স্থাপিত করিয়াছেন।

অ্যারিষ্টটল, শুক্র, কামন্দক, ও চাণক্য, সকলেই কিছু ভূমি দেবতার পূজার জন্য ও জনসাধারণের হিতকরকার্য্যের জন্য দান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; অ্যারিষ্টটল্ জন-সাধারণের আহারের স্থানের জন্য, ক্রীড়াভূমির জন্য, মিলনভূমি সভার জন্য ভূমিদানের কথা বলিয়াছেন; শুক্রও দেবতার পূজার জন্য, প্রজাদের বিহারভূমির জন্য ও অন্য জনহিতকর কার্য্যোদ্দেশে ভূমিদানের কথা কহিয়া-ছেন; চাণক্য কি করিয়া গোচারণমাঠ হয়, মঠমন্দির

সংস্থাপিত হয়, ভ্রমণের জন্য কুঞ্জবিতান, রাজার বাগান, জনসাধারণের বাগান হয় তাহার উপায় বলিয়াছেন। নগরে মন্ত্রণাগার ও উদ্যানের জন্য যে যথেষ্ট স্থান থাকা উচিত, যুক্তিকল্পতরুতে তাহার উল্লেখ আছে।

নগররক্ষার জন্য ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে অবিরল ধারায় নির্ম্মল সলিলের সরবরাহ প্রয়োজন। অ্যারিষ্টটলের নগর যদিও নদীতীরে স্থিত নহে, কিন্তু তাহাতে জলপ্রাপ্তির উপায় আছে; চাণক্য ও শুক্রের নগর সমুদ্রযাত্রী দেশবাসীদের নগরের ন্যায় নদীতীরে অবস্থিত। চাণক্য, শুক্র, কামন্দক, ভোজ ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় দার্শনিকগণের মতে, পুরে ও জনপদে বহুল পরিমাণে জলাশয় পুষ্করিণী ও হ্রদ থাকা উচিত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগরগুলি প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত; নগররক্ষার কৌশল প্রায় একই; পর্ব্বত যে নগর রক্ষা করিবার পক্ষে খুব সাহায্যকর তাহা সকল দার্শনিকই বুঝিয়াছিলেন। অ্যারিষ্টটল ও চাণক্য প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য প্রযত্নপর ছিলেন; সৈনিকোপযোগী যুবকগণ অ্যারিষ্টটলের রাজ্যের প্রান্তদেশ পাহারা দিত; চাণক্যের রাজ্যে শূদ্রের এই কাজ ছিল। নগররক্ষার উপায় ভাবিয়া তাঁহারা নগরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, তাঁহারা প্রায় সকলেই রাজধানীর জন্য এক রমণীয় স্থান রাখিতে বলিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক জীবন বলিয়া একটা জিনিষও ছিল; গ্রীসদেশের মত শুক্রের মন্ত্রণাগারগুলি নগরের মধ্যে, সেখানে সকলেই আসিতে পারে।

ভোজ মণ্ডপ গড়িতে, চাণক্য ভ্রমণের উদ্যান করিতে, অ্যারিষ্টটল মল্লভূমি মন্ত্রণাগার ও আহারস্থান করিতে বলিয়াছেন।

গ্রীসদেশের মত প্রাচীন ভারতেও রাজ্যের একটি কেন্দ্রশক্তি ছিল। ভারতীয় দার্শনিকগণের রাজশক্তি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা কি তাহা আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি রাজা কি। রাজা প্রজার ধর্ম্মরক্ষক, নীতির পথপ্রদর্শক, তাহাদের মিলনের সাহায্যকারী, তাহাদের শক্তি ও সমৃদ্ধির পথকারী।

'যস্য প্রভাবাৎ ভুবনং শাশ্বতে পথি তিষ্ঠতি
দেবঃ স জয়তি শ্রীমান্ দণ্ডধরো মহীপতিঃ।'

বনের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ চিন্তা করিয়াছেন। বন না থাকিলে রাজ্যের যে সমূহ ক্ষতি ঘটে তাহা বার বার বলিয়াছেন; প্রজাদিগের আর্থিক উন্নতি, বাণিজ্যের সুবিধা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে বৃহৎ বনের প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন।

লোকজনের বসবাস বিষয়েও তাঁহাদের বিশেষ মত ছিল। অ্যারিষ্টটল বলেন, রাজ্যের সংজীবন ও শক্তিবর্দ্ধনের জন্য এক দাস-সমাজ থাকা চাই। ভারতীয় চিন্তাশীলগণের মতে শূদ্রসমাজ রাজ্যরক্ষণ ও গঠনের সাহায্যে বিশেষ প্রয়োজন।

নগরের আকৃতি লইয়াও বহু আলোচনা হইয়াছে। নগর চতুষ্কোণ, অথবা গোলাকার, অথবা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অথবা ত্রিভুজাকৃতি হইতে পারে। মেগাস্থিনিস্ পাটলীপুত্র নগরের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বেশ স্পষ্ট ধারণা হয়—"গঙ্গা ও শোণনদীর সঙ্গমস্থলে পাটলীপুত্র নগরী স্থাপিত; দৈর্ঘ্যে ৮০ ও প্রস্থে ১৫; ইহা বর্গক্ষেত্রাকৃতি (Rectangular) কাঠের দেওয়ালে ঘেরা; দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট গর্ত্ত আছে, তাহার ভিতর দিয়া তীর ছোড়া যায়; নগরের চারিধারে খাদ আছে; সেই খাদ নগররক্ষার এক উপায়-স্বরূপ, আর নগরের আবর্জ্জনা তাহা দিয়া বহিয়া যায়।"

প্রাচীন যুগের নগরের সহিত বর্ত্তমান যুগের নগরের তুলনা করিলে যে জিনিষটি খুব বড় প্রভেদের চিহ্নরূপে চোখে পড়ে তাহা বর্ত্তমান নগরের লোভমত্ত ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষুব্ধজীবন; পল্লীজীবনের শান্তি ও স্নিগ্ধতা প্রাচীন দার্শনিকগণ নগরজীবনের সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য নগরই ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল, কিন্তু প্রাচীন নগরগঠনকারী চিন্তাশীলগণের মনে যে উজ্জ্বল আদর্শের স্নিগ্ধ চিত্রটি ছিল তাহা বর্ত্তমান নগর হইতে বহুপ্রকারে বিভিন্ন। প্রাচীন নগর ইটপাথরে-গড়া প্রচণ্ড কারাগারপুরী ছিল না। অসীম সমুদ্রের তীরে রুদ্র পর্ব্বতের ধারে শ্যামল ধরণীবক্ষে স্থাপিত নগর প্রকৃতির স্তন্যসুধাপালিত আদরের পুত্র ছিল, প্রকৃতিলক্ষ্মী তাহাকে শুধু শিল্পের দ্রব্য বাণিজ্যের জিনিষ দান করিত তাহা নহে; তাহাকে শান্তি দিত, আনন্দ দিত, স্নিগ্ধ স্নেহাঞ্চলে রক্ষা

করিত; সমুদ্র তাহার বাণিজ্যতরী দেশদেশান্তরে লইয়া যাইত, শুধু তাহা নহে, তাহাকে অসীমবিপুল আনন্দরসে ডুবাইত, অসীমের গান ও আহ্বান সমুদ্রতরঙ্গকল্লোলে কত সুরে তাহার কানে বাজিত। পল্লীর সহিত নগরের, পুরীর সহিত জনপদের, প্রাকৃতিক জীবনের সহিত মানব-জীবনের নিবিড় আনন্দকর সংযোগ প্রাচীন দার্শনিকগণের স্বপ্নে ও চিন্তায় জাগরূক ছিল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

অভিযানের গান

আজ, মরা গাঙে বান এসেছে,
খোল্‌রে তরী খোল্‌!
নূতন জলে কূল ভেসেছে,
কর্‌ আনন্দ-রোল।

ভাই, খুলে দে আজ তীরের বাঁধন,
মেলে দে পাল অমল বরণ;
নীল আকাশের সুখ-অনিলে
জয়ধ্বনি তোল!
নূতন জলে কূল ভেসেছে,
কর্‌ আনন্দ-রোল!

আজ, মরণ-স্রোতে ভাসা তরী,
জীবন যদি চাস্‌;
চল্‌রে হেলায় মথন করি'
কল-জলোচ্ছ্বাস!

হায়, ভয় কিরে তোর ভাব্‌না কিবা,
প্রভাত-আলোয় এলো দিবা,
মাথার 'পরে দিব্য বিভা
সাম্‌নে অভয় কোল!
নূতন জলে কূল ভেসেছে
কর্‌ আনন্দ-রোল।

শ্রীমণিকান্ত হালদার।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণবৃত্তান্ত)

৪১ অধ্যায়।

সিগাট্‌সি।

পরদিন, ৫ই ডিসেম্বরে, দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে ৮ মাইল গিয়া এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার স্বর্ণময় ছাদ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার নিকট পুরোহিতদিগের বাসের জন্য শুভ্রবর্ণ অনেক গৃহ। এই-সকল বাড়ীর ভিতর লাল রংএর অনেক মন্দির। দূর হইতে এই দৃশ্য যে কি সুন্দর দেখাইতেছিল! সিগাট্‌সি সহর—লাসার পরেই ইহাই তিব্বতের দ্বিতীয় সহর। এখানকার মন্দিরের নাম তাসিলুনপো। অর্থাৎ "সুমেরুগিরি"। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম "গেনডুন-ডাব"। এই মন্দিরে ৩৩০০ পুরোহিতের বাস; সময়ে সময়ে ৫০০০ জন পর্য্যন্ত এখানে বাস করেন। লাসার মন্দিরের পরই এই মন্দিরের স্থান, কিন্তু সম্মানে দলাই লামার মন্দিরের সমান। এই মন্দিরের আশেপাশে সিগাট্‌সি সহর। সহরে ৩৫০০ বাড়ী। এখানকার লোকেরা বলে সহরে ৩০০০০ লোকের বাস। একথা কতদূর সত্য বলিতে পারি না—কারণ অঙ্কশাস্ত্রে এবং জনসংখ্যা গণনায় ইহাদের যে পাণ্ডিত্য তাহাতে এ কথার কোন মূল্য দিতে পারি না। আমি মন্দির দর্শন করিয়া উত্তরপূর্ব্ব দেশের লামারা যে বিভাগে থাকে তাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া সেই-খানেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি চীনদেশের লোক, সুতরাং আমার আড্ডা সেখানেই হইবার কথা। এই মন্দিরের প্রধান লামা দলাই লামার পরেই তিব্বতীদের সম্মানার্হ, এমন কি বলিতে গেলে চীনসম্রাটের প্রসাদে ইঁহার দলাই লামার চেয়ে সম্মান একদিকে অধিক, যদিও রাষ্ট্রীয় শক্তি ইঁহার নাই। দলাই লামার মৃত্যু হইলে যতদিন না নূতন দলাই লামার প্রতিষ্ঠা হয় ততদিন এখানকার প্রধান লামাই দলাই লামার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হন। ইঁহার নাম পানচেন রিনপোচি। আমি যখন সিগাট্‌সিতে উপস্থিত হই, তখন এই লামাশ্রেষ্ঠ সহরে ছিলেন না। শুনিলাম ইঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। আমি সিগাট্‌সিতে ধার্ম্মিক পণ্ডিত লামাদিগের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বেড়াইতাম। একদিন শ্রেষ্ঠ

সিগাট্‌সি সহরের তাশিলানপো বিহারের দৃশ্য।

লামার শিক্ষকের সহিত আলাপ করিলাম। লোকটি অত্যন্ত বৃদ্ধ, বয়স চুয়াত্তর বৎসর হইবে। আমার সহিত ইঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল—লোকটি যথার্থই সজ্জন। শুনিলাম ইনি ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পণ্ডিত, সেখানকার সহস্র সহস্র লামা তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া মান্য করে। আমি তাঁহাকে ব্যাকরণের কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। বৃদ্ধ লজ্জিত হইয়া বলিলেন তিনি উত্তর দিতে অপারক। লাসার পথে এপোন সহরে এক চিকিৎসক আছেন। তিনিই তিব্বত রাজ্যে ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন। তিব্বতে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে দর্শন বিজ্ঞান ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের জ্ঞান আহৃত হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। সিগাট্‌সিতে কিছুদিন বাস করিয়া, আবার পথিকের পেশা গ্রহণ করিব ভাবিতেছি, এমন সময় শুনিলাম সিগাট্‌সি বিহারের লামাশ্রেষ্ঠ তৎপরদিন সেখানে আসিবেন। পরদিন দেখি শহরে রাস্তার উভয় পার্শ্বে (রাস্তা সে দেশে নাই, যেখান দিয়া আসিবার পথ) লম্বা লম্বা দণ্ডে ধূপধূনা জ্বলিতেছে—উভয় পার্শ্বে শত শত লোক দর্শনার্থী হইয়া উপস্থিত। ক্রমে দেখিলাম স্বর্ণখচিত পাল্কীতে চড়িয়া, মূল্যবান রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া লামাশ্রেষ্ঠ আসিতেছেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র লোকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছে। তাঁহার সঙ্গে প্রায় ৩০০ ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছে; ইহারা সশস্ত্র প্রহরী নয়, নানাবিধ পূজার উপকরণ বহন করিয়া চলিয়াছে। বাদ্যকরেরা অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। এই সমারোহ-ব্যাপার দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, ভাগ্যে আমি সিগাট্‌সি ত্যাগ করি নাই। সেই রাত্রে স্থানীয় লামাদিগের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলাম। তাঁহারা আমার উপদেশ শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এখানকার বিহারের লামাদিগের চরিত্র সংযত, কিন্তু তথাপি ইহাদের ভিতর পানদোষ বিলক্ষণ প্রবল। দলাই লামা প্রভৃতি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পুরোহিতদিগের পানদোষ নিবারণ করিতে পারেন নাই। এখানকার বিহারের দ্বারদেশে একজন পুরোহিত দ্বারী আছেন। বাহির হইতে যিনি আগমন করেন তাঁহার মুখে মদের গন্ধ আছে কি না তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া আসিতে হয়। শুনিলাম মুখে মদের গন্ধ ঢাকিবার জন্য লামাগণ প্রচুর পরিমাণে রসুন খাইয়া আসে। এমনি ব্যাপার!

১৫ই ডিসেম্বর মন্দির ত্যাগ করিয়া দুই মাইল গিয়াই সানচু নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে এক পুল পার হইয়া উত্তর দিকে ৪ মাইল গিয়া ব্রহ্মপুত্রের দর্শন পাইলাম। এইবার নদীর ধারে ধারে পূর্ব্ব দিকে ১২ মাইল গিয়া পী নামক এক গ্রামে পৌঁছিয়া এক দরিদ্র কৃষকের গৃহে আশ্রয় লইলাম। এখানে এক ব্যাপার দেখিলাম। করীষের বদলে ঘাসের চাপড়া দিয়া ইন্ধনের কাজ চলে। আরও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এখানে দেখিলাম—কৃষকের ১২ বৎসরের একটি ছেলে আগুনের ধারে বসিয়া লিখিতে শিখিতেছে। কাঠের উপর সাদা গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া বাঁশের কলমে তাহার উপর লিখিতেছে। বালকটি একবার করিয়া লিখিতেছে, আর পিতাকে আনিয়া দেখাইতেছে, পিতা সংশোধন করিয়া দিতেছে। বালকটি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত লিখিয়া যাইতেছে। যে দেশে সাধারণ লোক বিদ্যাভ্যাস করে না, সেখানে দরিদ্র কৃষকের পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় এই অভিনিবেশ! কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম এদেশের কৃষকেরা লিখিতে না জানিলে রাজকর লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। লেখাপড়া জানিলে কেহ ঠকাইতে পারিবে না, সেইজন্য কৃষকের পুত্রের লিখন-বিদ্যার উপর এতদূর নিষ্ঠা।

পরদিন আবার যাত্রা। ব্রহ্মপুত্রের তীর দিয়া ৫ মাইল চলিলাম; বাঁদিকে নদী, দক্ষিণে খাড়া পাহাড়। সেখান

হইতে আরও ৪মাইল গিয়া পাহাড়ের উপর দক্ষিণদিকে দুইটি বাড়ী দেখিলাম। শুনিলাম ইহাই এনপোর মন্দির—এখানেই সেই তিব্বতী বৈয়াকরণ মহাপণ্ডিত বাস করেন। আমার ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করার বিশেষ প্রয়োজন। পরদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। কি আশ্চর্য্য! ইনি ধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, দেখিলাম ব্যাকরণের কোন বিশেষ জ্ঞান ইহাঁর নাই।

১৮ই ডিসেম্বরে আবার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলাম। ৫মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর হঠাৎ কে আমার গতিরোধ করিল।

৪২ অধ্যায়।

অদ্ভুত ব্যাপার।

কোন্ ব্যক্তি আমার গতিরোধ করিল? ফিরিয়া দেখিলাম দুইজন অস্ত্রধারী দস্যু। আমার দিকে তাহারা অগ্রসর হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি চাও?" এই কথা বলিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন পাথর তুলিয়া আমাকে মারিতে আসিল, বলিল, "এখনই পালাও নয়ত মারিয়া ফেলিব।" আমি প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া পথের ধারে এক পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম। তাহারা এক টান দিয়া আমার লাঠি কাড়িয়া লইল। তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোমার কাছে কি আছে বল। তুমি কোন্ দেশ থেকে আসছ?"

"আমি যাত্রী, তিব্বত হতে আসছি।"

"তোমার নিকট টাকা-কড়ি আছে?"

"বেশী কিছু নাই, পথে ডাকাতে যথাসর্ব্বস্ব আমার কেড়ে নিয়েছে।"

"তোমার পিঠে কি?"

"ধর্ম্মপুস্তক আর কিঞ্চিৎ আহারসামগ্রী।"

"সব দেখাও।"

"টাকা-কড়ি আমার পকেটে। আমি লামা, মিছা কথা বলি না, যা আছে দেখাচ্ছি।"

আমি টাকা-কড়ি বাহির করিতে যাইতেছি এমন সময় তিনজন ঘোড়সোয়ার উপস্থিত হইতেই ডাকাতেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। তাহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "লোক দুটো এখানে কি করছিল?"

"আমার টাকা-কড়ি চাচ্ছিল।"

"চল ঐ মন্দিরে আমরা তোমায় নিরাপদে রেখে আসছি।"

আমি সম্মুখে গ্রামের দিকে চলিলাম। ২০এ ডিসেম্বরে অত্যন্ত তুষারপাত হইল। আমি বরফের ভিতর দিয়াই যাত্রা করিলাম। পথে চাম চেন গোম্পা নামক স্থানে পৌঁছিলাম, ইহা বুদ্ধ মৈত্রেয়ের মন্দির। মন্দিরটি প্রশস্ত, এখানে ৩০০ পুরোহিত বাস করে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে বাস করিতেছিলেন। আমাকে কয়েক দিন তাঁহার নিকট থাকিয়া আপদ শান্তির জন্য শাস্ত্র পাঠ করিতে হইল।

আবার সুদূর প্রবাসে নববর্ষের প্রথম দিন যাপন করিতে হইল। যথারীতি শাস্ত্রপাঠ ধ্যানধারণায় এবং জাপানের মহিমান্বিত সম্রাটের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনায় কাটাইলাম। ১২ই জানুয়ারি চোটেন নামক স্থানে পৌঁছিলাম, এখানে বিস্তর উষ্ণ প্রস্রবণ। প্রস্রবণের জলে স্নান করা চলে। পথে মনলাথাং নামক মন্দিরে পৌঁছিলাম। ইহা এক প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রতিষ্ঠাতার নাম জিসংথাপা। এই ব্যক্তি জপের চক্রের অবিষ্কর্ত্তা। জপের যন্ত্র একবার ঘুরাইলেই শত সহস্রবার নামজপের ফল লাভ হয়। এই মন্দিরের পুরোহিতটি অতিশয় রুক্ষ প্রকৃতির লোক। তিনি হঠাৎ আমায় বলিয়া বসিলেন, "তুমি আমার আকৃতি পরীক্ষা করে আমার ভবিষ্যৎ বল ত।" আমি বিষম বিভ্রাটে পড়িলাম, এ বিদ্যা ত আমার কোন কালে নাই। যাহোক এ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার জন্য বলিলাম, "আপনি পরের জন্য বিস্তর ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই—ভবিষ্যতে দেখিতেছি আপনার ঋণজালে আবদ্ধ হওয়া ভিন্ন কোন সম্বল থাকিবে না।" লোকটি আমার কথা শুনিয়া ভারি সন্তুষ্ট হইল, বাস্তবিক সে বিস্তর ব্যয় করিয়াছে, কিছু ফল লাভ করে নাই। লোকটি বড়মানুষের বাড়ী গিয়া আমার যশ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ভালই হইল। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় দরজি গয়ালপো নামক স্থানীয় এক ধনীর পত্নী, এক রুগ্ন শিশু লইয়া আমার নিকট

তিব্বতীর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ।

উপস্থিত হইলেন। ছেলেটির অদৃষ্টে কি আছে আমায় গণিয়া বলিতে হইবে। ছেলেটির চেহারা দেখিয়াই বুঝিলাম, অধিক দিন বাঁচিবে না। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলাম, "এ ছেলে যতদূর দেখিতেছি বেশী দিন বাঁচিবে না।" জননী ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে বাঁচাইবার কোন উপায় নাই।" আমি বলিলাম, "ইহার কল্যাণার্থে সমুদায় বৌদ্ধশাস্ত্রখানি একবার পাঠ করিতে হইবে।"

কি আশ্চর্য্য! সেই রাত্রেই ছেলেটির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা আমায় আসিয়া বলিল যে ছেলেটির কল্যাণের জন্য শাস্ত্রপাঠ করিতে হইবে। আমি তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলাম। শাস্ত্র পাঠের আয়োজন হইতে লাগিল। আমি ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছি এমন সময় হঠাৎ অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম—মনে ভাবিলাম ছেলেটির বোধ হয় শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি অবিচলিতভাবে বসিয়া রহিলাম। এমন সময় শিশুর জননী কাঁদিতে কাঁদিতে আমায় আসিয়া বলিলেন যে ছেলেটি মারা পড়িয়াছে। আমি গৃহের মধ্যে গিয়া দেখিলাম ছেলেটির দেহ শীতল ও স্পন্দহীন। নাড়ী দেখিলাম, তখনও অতি ক্ষীণভাবে চলিতেছে, বুঝিলাম ছেলেটির মৃত্যু হয় নাই। কিন্তু দেহ একেবারে শীতল ও শক্ত। আমি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা জলে কাপড় ভিজাইয়া মাথায় দিলাম, এবং সমুদায় দেহ ঘসিতে আরম্ভ করিলাম। এই-প্রকারে প্রায় ২০ মিনিট ঘসিতে লাগিলাম; দেখিলাম ছেলেটির দেহ ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছে, এমন কি ক্রমে ছেলেটি চৈতন্য লাভ করিল। মরা ছেলেকে বাঁচিয়া উঠিতে দেখিয়া মায়ের আনন্দ আর ধরে না। আমার প্রতি তাহাদের যে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উদয় হইল তাহা আর বলিবার নয়। আমি সেখানে কিছুদিন বাস করিয়া ছেলেটির কল্যাণার্থ শাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। সেখানকার শিশুগুলি আমার একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল, যখন বেড়াইতে বাহির হইতাম আমার পিছন পিছন এক পাল ছেলে যাইত। আমিও তাহাদের অত্যন্ত ভালবাসিতাম। ছেলেদের সঙ্গে বেড়ান আমার কাজ হইল।

৪৩ অধ্যায়।

তিব্বতের রীতিনীতি।

তিব্বতের লোকেরা পরিচ্ছন্নতা কাহাকে বলে জানে না। আমি এমন নোংরা জাতি কোথায়ও দেখি নাই। আমি যে বাড়ীতে ছিলাম সেখানে ২ জন ভৃত্য। তাহারা আমায় প্রতিদিন চা আনিয়া দিত—কিন্তু চাএর পেয়ালা কোন দিন ধুইত না। নিজে কিম্বা নিজের সমকক্ষ কোন ব্যক্তি যে পাত্রে খাইবে তাহা প্রতিদিন ধুইতে হয় না, পদমর্য্যাদায় হীন কেহ সে পাত্রে যদি আহার করে তবেই ধুইতে হয়। সুতরাং আমি যে পেয়ালায় প্রত্যহ চা খাই, তা যে কেন ধুইতে হইবে তা সে-দেশের লোক বোঝে না, সুতরাং কখনই ধুইত না; যদি পরিষ্কার করিতে বলিতাম, নিজের জামার হাতা দিয়া একবার মুছিয়া দিত। চাএর পেয়ালা কি কদর্য্য বলিতে পারি না। সেই পেয়ালায় চা খাইতে আমার বমি আসিত। কিন্তু বেশী করিয়া কিছু বলিতে পারি না, পাছে বেটা বিদেশী বলিয়া ধরা পড়ি। জলস্পর্শ করা এ দেশের নিয়ম নয়, স্নান নাই, কাপড় কাচা—

নাই, বাসন মাজা নাই, এমন কি বৃদ্ধ হইতে শিশু পর্য্যন্ত কাহারও জলশৌচের ব্যবস্থা একেবারে নাই—মানুষে আর পশুতে এ সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। মানুষ যে কতদূর নোংরা হইতে পারে তা এদেশে না আসিলে কেহ ধারণা করিতে পারিবে না। জন্মাবধি একদিনও স্নান করি নাই—একথা বলিয়া এ দেশের কত লোককে জাঁক করিতে শুনিয়াছি। কেহ মুখ হাত ধুইলে লোকে হাসে। হাতের চেটো আর চক্ষুদুটি ছাড়া সমুদায় দেহটির উপর শতপুরু ক্লেদ। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ না হইলেও কাফ্রির মত কুচকুচে কালো দেখায়। ধনীরা আর লামারা সাধারণ লোকের চেয়ে একটু পরিষ্কার, তাঁরা হাত মুখ ধোন। তিব্বতীরা বলে হাতমুখ ধুইলে সেই-সঙ্গে সুখশান্তি সব যায়। বিবাহের সময় কন্যা দেখিতে আসিলে কন্যার মুখে কত ক্লেদ আছে তাহাই দেখান হয়। কি বসন, কি ভূষণ, কি দেহ, যার যত কদর্য্য এবং ক্লেদপূর্ণ সেই তত সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া লোকে মনে করে। কনের হাত যদি পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে অলক্ষণের একশেষ। এ দেশে বস্ত্র পরিবর্ত্তনের নিয়ম নাই—পরিধেয় বস্ত্র তেল ময়লা লাগিয়া চামড়ার মত শক্ত হইয়া উঠে। দুনিয়ার আবর্জ্জনা বস্ত্রে। এদেশে কোথায়ও নিমন্ত্রিত হইলে আমার বড় কষ্ট হইত। অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘৃণার ভাব দূর করিতে পারিতাম না।

যাহোক এদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি,—অন্তরের সকল কষ্ট দূর হইয়াছে। আমি তিব্বতে নববৎসরের উৎসব দেখিলাম। ইহাদের বৎসর গণনার অদ্ভুত নিয়ম—কোন দেশের সহিত মিল নাই। নব বৎসরের সুপ্রভাতে দেখিলাম রাশি পরিমাণ গমের রুটীর উপর রক্তবর্ণ নিশান উড়িতেছে—দেখি অনেক শুষ্ক আঙুর পীচ প্রভৃতি গমের রুটীর উপর ছড়ান। বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া কয়েকটি শুষ্ক ফল হাতে লইয়া তিনবার লুফিয়া ভক্ষণ করিল, তার পর পদমর্য্যাদা অনুসারে প্রত্যেকে তাহাই করিল। তার পর চা এবং গমের পিঠা একপাত্র হইতে সকলে আহার করিল। এদেশের লোক কাঁচা মাংস, শুষ্ক মাংস, সিদ্ধ মাংস খায়, কিন্তু ভাজা মাংস কখন খায় না। এ দেশে যথেষ্ট মৎস্য পাওয়া যায়, কিন্তু কেহ মাছ খায় না। ইহাদের ধারণা মৎস্য মারিয়া খাইলে পাপ হয়। কিন্তু ছাগ, মেষ, মহিষ, চমরী হত্যা করিতে কোন দোষ নাই। নববর্ষের দিন কেবল আহারের ঘটা। ভোরের আহারের পর আবার বেলা ১০ টার সময় ফল রুটী খাওয়া ও মদ্য বা চা পান করিতে হয়। ২টার সময় মাংস ইত্যাদির ভোজ। রাত ৯টার সময় মাংস মূলা ইত্যাদি দিয়া আবার এক ঝোল প্রস্তুত হইল। এইরূপে ৪বার নানাবিধ আহার করিয়া নববৎসরের উৎসব সমাধা হইল। তিব্বতীদের গমই প্রধান খাদ্য। দারজিলিংএ দেখিয়াছি, তিব্বতীরা তিব্বত হইতে গম আনাইয়া আহার করে,—তাঁহাদের বিশ্বাস ভাত খাইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

আমি ১৮ই মার্চ্চ আবার যাত্রা করিলাম। তখন শীতের প্রকোপ কমিয়াছে—১০মাইল পথ গিয়া য়াকচু নদীর তীরে চীসাম গ্রামে পৌছিলাম। পথে পাহাড়ের উপর এক মন্দির দেখিলাম। দেখিতে বিহারও নয়, মন্দিরও নয়। সঙ্গীদিগের মুখে শুনিলাম ইহা "শিলা-প্রতিরোধক মন্দির"। সে কি ব্যাপার—এমন মন্দির ত কোথায় কখন দেখি নাই—শুনিও নাই। অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিলাম তাহা বড় চমৎকার। এদেশে গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি হয়—এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে গম পাকিবার সময়ই সচরাচর শিলাপাত হইয়া থাকে। এদেশে প্রতিবৎসর ফসল হয় না—তাহার উপর এই ভীষণ শিলাপাত হইলে সমুদায় শস্য নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং লোকে অনাহারে কষ্ট পায়। এই শিলাবৃষ্টির নামে এদেশের লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক সম্প্রদায় লামা আছে—যাহারা এই মন্দিরে বাস করিয়া, মন্ত্র পড়িয়া মাটি দিয়া পাঁচটি ডিমের মত গোলা তৈয়ার করিয়া রাশি রাশি স্তূপাকার করিয়া রাখে। আকাশে ঘন মেঘের আবির্ভাব দেখিয়াই পুরোহিত মহাশয় গম্ভীর ভাবে পর্ব্বতের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। হাতে জপের মালা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করে—যদি ঘন ঘন বজ্রধ্বনি হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, শিলাবৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলে পুরোহিত মহাশয় ক্ষিপ্তের মত পঞ্চভূতের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকে, লম্ফ ঝম্প তর্জ্জন গর্জ্জনের শেষ নাই। যেন পুরোহিত মহা-

তিব্বতী লামার শিলাবৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ।

শস্যের ভৈরবমূর্ত্তি তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া প্রকৃতি ভীত স্তব্ধ হইয়া শান্ত মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে। পুরোহিতের সমুদায় আস্ফালন মন্ত্রপাঠ উপেক্ষা করিয়া যখন বাস্তবিকই প্রচণ্ডবেগে শিল পড়িতে থাকে—তখন সেই শিলাবৃষ্টির মধ্যে পুরোহিতের মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্কর দেখায়। সমুদায় উপেক্ষা করিয়া সে বেচারা ক্রমাগত চীৎকার আর লম্ফঝম্প করিতে থাকে। যদি দৈবক্রমে মেঘ সরিয়া যায়, শিলাপাত না হয়, তাহা হইলে লোকের আনন্দের আর সীমা থাকে না, দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। সে দেশের লোক ইহাদিগকে "নাগ-পা" বলে। যদি শিলাবৃষ্টি না হয় এবং প্রচুর শস্য হয়, তাহা হইলে সকলেই ইহাকে পুরস্কার দেয়। যদি শিলাবৃষ্টি হইয়া শস্যের ক্ষতি হয়, তবে ইহার আর রক্ষা নাই—পুরোহিত মহাশয়কে গুরুতর শাস্তিভোগ করিতে হয়, অর্থদণ্ড বেত্রাঘাত প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। ইহা রাজ-বিধি-সম্মত। সাধারণ লোক "নাগপা"দিগকে অত্যন্ত সম্মান করে, পথে ঘাটে সাক্ষাৎ হইলে. মাথা নীচু করিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া শ্রদ্ধা জানায়। তিব্বত রাজ্য ভিন্ন শিলাবৃষ্টি নিবারণের অদ্ভুত ব্যবস্থা আর কোথায়ও দেখি নাই। এই মন্দির অতিক্রম করিয়া ৭ মাইল গিয়া "স্নাকচু" নদী দেখিলাম। এই নদী ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িয়াছে। এখান হইতে দুই মাইল গিয়া "পলটি" হ্রদ দেখিলাম। পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত হ্রদ আর নাই। হ্রদটির পরিধি ১৮০ মাইল হইবে। হ্রদের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে। যথার্থই এখানকার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। হ্রদের দক্ষিণে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শিখরমালা। হ্রদের ধারে পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া ভীষণ তুফান দেখিলাম, জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া তীরে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে। হ্রদের তীরে এক দুর্গ আছে—সেই দুর্গের নিকট এক বাড়ীতে আমি রাত্রিবাস করিলাম। এই হ্রদের তীর ধরিয়া ১৬ই মার্চ্চ আবার আমার গন্তব্যপথে চলিলাম। পথে দেখিলাম হ্রদের জলে কত জলচর পক্ষী সুখে বিহার করিতেছে। আমি সেই দিন ১২ মাইল গিয়া বেলা ৯টার সময় একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দেখিলাম। এখানে যাত্রীরা প্রাতরাশ করিতেছে। হ্রদের জল এমন বিষাক্ত যে কেহ সে জল স্পর্শ করে না। সেখান-কার লোকেরা বলে ২০ বৎসর পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে আসাতে জল বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে—তিনি কি মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছিলেন, তাই জল রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আসল কথা, এই হ্রদের জল নির্গমের পথ নাই; কোন অজ্ঞাত কারণে ইহার জল বিষাক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র স্রোত-স্বিনীর ধারে অনেক যাত্রী দেখিলাম। সিগাট্সি হইতে লাসা যাইবার এই পথ। যাত্রীদিগের মধ্যে একজন নেপালী সিপাই দেখিলাম, লোকটা ভারি রসিক। আমি তাহার স লইলাম।

৪৪ অধ্যায়।

লাসার পথে।

সিপাহীর সঙ্গ লইয়া আমার বেশ সুবিধাই হইল। নেপাল সরকারের তরফ হইতে এ ব্যক্তি লাসায় বাস করে। সম্প্রতি মাতৃচরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দেশে যাইতেছিল, কিন্তু সিগাট্সি সহর পর্য্যন্ত গিয়া লাসায় প্রণয়িনীর কথা স্মরণ হওয়াতে, আর দেশে যাইতে পারিল না। তাই আবার

লাসায় ফিরিয়া চলিয়াছে। প্রণয়িনীর প্রতি টানের নিকট তার মাতৃভক্তি হার মানিয়াছে। অন্যান্য কথার মধ্যে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নেপালী কতজন সিপাহী লাসায় বাস করে। এই প্রশ্নের উত্তরে সে ব্যক্তি বলিল যে পূর্ব্বে লাসায় নেপালী সিপাহী থাকিত না, ১৩ বৎসর পূর্ব্বের এক দুর্ঘটনার জন্য লাসায় ২৫ জন নেপালী সিপাহী রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লাসায় প্রায় ৩০০ নেপালী ব্যবসাদার বাস করে। একবার তাহাদের কাহার দোকান হইতে প্রবাল চুরি যায়, তারা এক স্ত্রীলোককে সন্দেহ করিয়া তাহাকে অশেষ-প্রকারে নিগ্রহ করে। তখন "সেরা" বিহারের লোকেরা বৈরনির্য্যাতনের জন্য বিস্তর সৈন্যসামন্ত জড় করে। এই সংবাদ শুনিয়া নেপালী ব্যবসায়ীরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে, কিন্তু তাহাদের জিনিষ-পত্র সব ফেলিয়া যায়। তাহা শত্রুরা নষ্ট করে। তখন এক কঠিন মামলা উপস্থিত হয়। পাঁচ বৎসর তাহার মীমাংসায় যায়। তাহার পর এই নির্দ্ধারিত হয়, যে, একজন রাজপুরুষ নেপাল সরকার হইতে নেপালী ব্যবসায়ীর স্বত্ব রক্ষার জন্য লাসায় বাস করিবে, এবং ২৫ জন প্রহরী সৈন্য সেইসঙ্গে থাকিবে। এ ব্যক্তি তাহাদেরই অন্যতম।

আমরা ত লাসার পথে চলিলাম। গেনপাল নামক খাড়া পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছিলাম। তাহার উপর উঠিয়া দূর হইতে লাসার দৃশ্য ছবির মত দেখিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখিলাম উত্তরপূর্ব্ব দিক হইতে ব্রহ্মপুত্র আসিয়া দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইতেছে। কিচু নামে ব্রহ্মপুত্রের এক উপনদী এখানে আসিয়া মিলিয়াছে। এই নদীর সন্নিহিত এক পাহাড়ের উপর দেখিলাম, এক বিশাল প্রাসাদের স্বর্ণচূড়া রৌদ্রে ঝক্‌মক্ করিতেছে। এই দলাই লামার প্রাসাদ "পোটালা"। এই প্রাসাদের ওদিকে লাসার রাজপথ, গৃহগুলি ছবির মত দেখিতে পাইলাম। এই পর্ব্বতের শিখর হইতে ৭ মাইল নামিয়া "পাচি" নামক স্থানে পৌঁছিলাম। সেস্থানেই রাত্রিবাস করা গেল। সারাদিন বরফের মধ্যে চলিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তার পরদিন ১৭ই মার্চ্চ আরও আড়াই মাইল চলিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর ধরিয়া ৬ মাইল যাইবার পর "চাক্‌সাম" নামক

লাসা সহরে দলাই লামার প্রাসাদের দৃশ্য।

খেয়া ঘাটে পৌঁছিলাম। এখানে নৌকাযোগে ব্রহ্মপুত্র পার হইলাম। এখানে চমরীর চামড়ায় নির্ম্মিত একপ্রকার ছোট নৌকা দেখিলাম। তাহা এত হালকা যে লোকে কাঁধে করিয়া লইয়া যায়। দুই চার ঘণ্টা জলের মধ্যে ব্যবহার করিয়া আবার তীরে তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। নদী পার হইয়া তীরের বালুকার ভিতর দিয়া ৩ মাইল গিয়া "যামড়ো" নামক এক দ্বীপ দেখিলাম, এই দ্বীপ ১১৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এতদিন কোথায় সবুজ বর্ণ দেখিতে পাই নাই, এই দ্বীপে কচি কচি বৃক্ষের পাতা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। এই স্থান হইতে আরও দুই মাইল গিয়া "চাসুর" নামক স্থানে পৌঁছিলাম—কিচু ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থানে ইহা অবস্থিত। লাসার পথে এস্থানের ন্যায় ঘোর ডাকাতের আড্ডা আর কোথায় নাই। এখানকার লোকেরা চুরিবিদ্যায় যেরূপ পটু তাহাতে মনে হয় এদের অবস্থা ভালই হইবে—কিন্তু এমন দরিদ্র আর কোথাও দেখি নাই। সকলেই আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিল। আমিও এখানে চুরির ভয়ে খুব সতর্ক হইয়াছিলাম। এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া কিচুর তীর ধরিয়া চলিলাম। কিছু দূর যাইবার পর পায়ের ব্যথায় বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেইখানে একটা গাধা পাইলাম। গাধাতে আরোহণ করিয়া ১০ মাইল গিয়া জং নামক স্থানে পৌঁছিলাম। জং-এ পৌঁছিয়া আমার বাহন বিদায় করিলাম। তখন হাঁটিয়া কি করিয়া লাসায় উপস্থিত হই তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে লাসায় রাজকর বহন

করিয়া একদল লোক যাইতেছিল, তাহাদের সঙ্গ লইলাম। আমি একটা ঘোড়া ভাড়া করিলাম। ৮।০ মাইল পথ গিয়া আমরা "নাম" নামক এক গ্রামে রাত্রিবাস করিলাম। পরদিন পার্ব্বত্য পথে ৬ মাইল গিয়া কিচু নদীর তীরে "নিথাং" নামক স্থানে পৌছিলাম।

৪৫ অধ্যায়।

অবশেষে লাসায়।

নিথাংএ মুক্তিজননীদিগের মন্দির দেখিলাম। এই মন্দিরে ২১ জন মুক্তিদায়িনী দেবী আছেন। তিব্বতীগণ এই দেবীদিগকে একান্ত ভক্তিতে পূজা করে। কথিত আছে ভারতবর্ষ হইতে শ্রীঅতীস আসিয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক মূর্ত্তিগুলি সুন্দর বটে। পরদিন ২০এ তারিখে নদীর তীর বাহিয়া উত্তরপূর্ব্বে যাত্রা করিলাম। ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এক পুলের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পুল পার হইয়া ৪ মাইল গিয়া "সিং জোনকা" নামক স্থানে পৌছিয়া রাত্রিবাস করিলাম। পরদিন ২১এ মার্চ্চ আমি অবশেষে লাসায় উত্তীর্ণ হইব! সেই গ্রামে জিনিষপত্র সঙ্গীদিগের নিকট রাখিয়া এক ঘোড়া ভাড়া করিয়া আমি স্থানীয় দ্রষ্টব্য যাহা কিছু দেখিতে চলিলাম।

দুই মাইল যাত্রা করিয়া বামদিকে এক বিশাল বিহার দৃষ্টিগোচর হইল। ইহাই "রিবাং বিহার"। লাসার নিকট এতবড় বিহার আর নাই। ইহাকে বিহার বলিব না প্রকাণ্ড এক গ্রাম বলিব। বাস্তবিক দলাই লামার কর্ত্তৃত্বাধীনে এতবড় বিহার আর নাই। ৭৭০০ লামা এখানে বাস করে, সময়ে সময়ে ৯০০০ পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। লামারা সময়ে সময়ে তীর্থযাত্রা করে। তখন ৬০০০ নূন পক্ষে বাস করে। এই বিহার তিব্বতরাজ্যে এক প্রধান শিক্ষার কেন্দ্র, এখানে বিদ্যামন্দির আছে। আমি তিব্বতে তিনটি শিক্ষার কেন্দ্র দেখিয়াছি—(১) এইস্থান (রিবাং), (২) লাসার "সেরা" বিহার এবং (৩) "গানডেন"। সেরাতে ৫৫০০ এবং গানডেন-এ ৩৩০০ শিক্ষার্থী বাস করে। ইহাই নির্দ্ধারিত সংখ্যা, বাস্তবিক কার্য্যকালে ইহার অন্যথা হইয়া থাকে।

এখানে পথের ধারে কিঞ্চিৎ নিম্নে একটি স্থান দেখিলাম যেখানে প্রত্যহ দলাই লামার ভোজনের জন্য চমরী, মেষ, ছাগ প্রভৃতি হত্যা করা হয়। এখানে হত্যা করিবার কারণ এই যে সহরের উপর হত্যা করিলে পাছে দলাই লামা জানিতে পারেন, তাঁহার জন্য কত জীব হত্যা হয়। যেন হত্যা হয় হোক, চক্ষের উপর না হইলেই ধর্ম্ম অক্ষুন্ন থাকিবে।

এই স্থান হইতে ৫ মাইল গিয়া এক পাহাড়ের তলদেশে পৌছিলাম। সেই পাহাড়ের উপর দলাই লামার প্রাসাদ। পথে "গেনপাল" হইতে এই প্রাসাদ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এই প্রাসাদের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব, এমন কি চিত্রেও সুন্দর দেখায়। এ দৃশ্য দেখিলে মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। আমি এই প্রাসাদশৈলের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে আধ মাইল গিয়া এক পুল পার হইলাম। পুলটি ১২০ ফুট লম্বা ১৫ ফুট চওড়া, পুলের উপর চীনদেশের ছাদের মত ছাদ আছে।

পুল পার হইয়া ১২০ গজ গিয়া লাসার পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এখানে চীনে স্থাপত্যের নমুনা দেখিলাম। পশ্চিমের দ্বার পার হইয়া কিছুদূর গিয়া বুদ্ধের মন্দির দেখিলাম। মন্দিরের ইতিহাস এই—তিব্বতের রাজা "স্রংসান গেমবো" থং-বংশীয় রাজা তাসাংএর কন্যা রাজ-কুমারী উনচিংকে বিবাহ করেন। বিবাহের সময় রাজ-কুমারী পিতার নিকট হইতে এই বুদ্ধমূর্ত্তিটি চাহিয়া আনেন। এই মূর্ত্তিটি নাকি ভারতবর্ষ হইতে চীন দেশে নীত হইয়াছিল। রাজকুমারী পিতাকে অনু-রোধ করেন, যে, যাহাতে তিব্বত-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহার উপায় করিয়া দিতে। তখন হইতে তিব্বত-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। সেই সময় তিব্বতীয় অক্ষর-লিখনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ১৬ জন পণ্ডিত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। তখন হইতে ১৩ শতাব্দী ধরিয়া তিব্বতরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। এই মন্দিরে বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইল, বুদ্ধের কৃপায় আমি এত বাধা বিঘ্ন পার হইয়া লাসায় উপস্থিত হইয়াছি। আমি বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে চক্ষের জলে ভাসিয়া আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন

করিলাম। ভগবান বুদ্ধ আমার ইষ্টদেবতা, আমি যে বুদ্ধের চরণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।

লাসায় অনেক পান্থশালা আছে। তিব্বতের প্রধান মন্ত্রীর পুত্রের সহিত দারজিলিংএ পরিচয় হইয়াছিল, আমি তাঁর আশ্রয়ে লাসায় বাস করিব স্থির করিলাম। জানিলাম বেচারা পাগল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি স্থির করিলাম সেরা বিহারে বাস করিব। জিনিষপত্র লইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রিবাং বিহারের ন্যায় ইহাও পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত, দূর হইতে একখানি গ্রামের ন্যায় দেখায়। আমি "সেরা" বিহারে উপস্থিত হইয়া আপনাকে তিব্বতী বলিয়া পরিচয় দিলাম। এতদিন কিন্তু "চীনে" বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছিলাম। আমার আকৃতি পথের কষ্টে ঠিক তিব্বতীর মত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিব্বতী বলিয়া পরিচয় দিয়া যে আমায় কঠিন পরীক্ষায় পার হইতে হইবে তাহা বুঝিলাম। কিন্তু তিব্বতী ভাষায় আমার দখল কোন তিব্বতীর চেয়ে কম নয়। "সেরা" বিহারে অনেক লামার বাস, তাঁদের মধ্যে এক-একজন পর্য্যায়ক্রমে এই বিহারের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সেই সময় "লা টোপা" নামে এক বৃদ্ধ লামা এই বিহারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আমি ইঁহার সহায়তায় "সেরা" বিহারে প্রবেশ করিলাম। "সেরা" বিহারটি তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথমাংশে ৩৮০০ পুরোহিত, ২য় বিভাগে ২৫০০, তৃতীয়তে ৫০০ জন মাত্র। প্রথম দুই অংশে "থামসান" নামে ১৮টি শয়নগৃহ আছে। এক এক ঘরে ৫০০ হইতে হাজার পুরোহিত পর্য্যন্ত বাস করে। আমি যে গৃহে আশ্রয় লইলাম সেখানে ২০০ পুরোহিত ছিলেন। প্রত্যেক থামসান আপন ব্যবস্থা আপনি করিয়া থাকে। "সেরা" বিহার বলিলে সমুদায় থামসান বোঝায়। এ স্থলে সেরা বিহারের আর অধিক পরিচয় দিতে পারিলাম না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা দেবী।

জহ্নুকন্যা

সুখের আশা ভোগের নেশা
আজ হ'তে হোক শেষ,
উঠুক জীবন জাগি'—
জহ্নুকন্যা ছুটাও বন্যা
দলি পাহাড় দেশ
দগ্ধ দীনের লাগি।

লক্ষ যুগের পাষাণ কারায়
জীবন্মৃতের মত
আঁধার ঘরের মাঝে
অন্ধ হয়ে বন্দী হয়ে'
কার সাধনায় রত
কোন্ দেবতার কাজে?

ভাবের সাড়া পড়েছে আজ
অনেক দিনের পরে
দেও না দুয়ার খুলে,
দীনের বেশে এসেছে এই
বিশ্ব তোমার তরে,
যাওনা আপন ভুলে।

সবার সাথেই মিলন যেথায়
সবার সাথেই ভোগ
সেথায় ত্যাগের সুখ,
রিক্ততাতে লঙ্ঘনাতে
শান্তিসুধার যোগ—
জুড়ায়ে যায় বুক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

রাজা রামমোহন রায় *

সমস্ত মানুষের ইতিহাসের উপরে এক সময়ে যুগান্তের প্রলয়-ঝড় উঠিয়াছিল, তখন হঠাৎ "শতাব্দীর সূর্য্য রক্তমেঘমাঝে অস্ত গেল।" ইতিহাস-স্রোতের ঘাটে-ঘাটে যে-সকল কীর্ত্তিকে মানুষ অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ঝড়ের বজ্রাঘাতে সে-সব কীর্ত্তি চিহ্নমাত্র না রাখিয়া কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। বর্ত্তমান যুগের সেই আরম্ভ; প্রলয়ের মধ্য দিয়া তার আবির্ভাব।

যে ঝড়ের কথা বলিতেছি সেটা কোন রূপক নয়, বাস্তবিকই সে ঝড় উঠিয়াছিল। মনে রাখা দরকার যে ফরাসীবিপ্লবের ঝড়ের মুখেই রামমোহন রায়ের জন্ম এবং ফরাসীবিপ্লবের পর হইতে সর্ব্বত্র মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আর-এক নূতন পালা সুরু হইয়াছে। বহুযুগের আচার ও কুসংস্কারের জীর্ণ বন্ধন হইতে এবং সকল রকম কৃত্রিম শাসন-অনুশাসনের বন্ধন হইতে মানুষকে স্বাধীন করিবার জন্য সে-যুগে ফ্রান্সে ভলটেয়ার, ভল্‌নি, রুশো প্রভৃতি যে রণভেরী বাজাইয়াছিলেন, এদেশে রাজা রামমোহন রায়কেও সেই রণভেরীই বাজাইতে হইয়াছে। তার সাক্ষী তাঁর প্রথম রচনা—"তুহ্‌ফাতুল মোহায়েদীন্" (A gift to monotheists)। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে সেখানে রাজা একেবারে সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত সার্ব্বজাতিক মানুষ—"a hierophant moralising from the commanding height of some Eiffel Tower on the far-seen vistas and outstretched prospects of the world's civilisation"—সেখানে তিনি যেন এক সমুচ্চ ঈফেলস্তম্ভের চূড়ায় উঠিয়া তাঁর দৃষ্টির সামনে দিকে-দিকে প্রসারিত নিখিল বিশ্বমানবসভ্যতার সুদূরব্যাপী দৃশ্য ও সম্ভাবনার সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য রহস্তবিৎ পুরোহিতের মত বলিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রামমোহন রায়, ফরাসীবিপ্লবের শুষ্ক যুক্তিমন্ত্র এবং সব সংস্কারের বাঁধন-ছাড়া অভিনব মুক্তি-তন্ত্রকেই চরম সত্য ও চরম আশ্রয় বলিয়া মনে করিলেন না। ওয়ার্ডস্বার্থ, কোলেরিজ, শাতোব্রিয়াঁ (Chateaubriand) প্রভৃতি একসময়ে ফরাসীবিপ্লবের পাণ্ডাগিরি ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে যেমন সংহারের চেয়ে সংরক্ষণ-নীতিরই পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইলেন, রাজা রামমোহন রায়ও তেমি একসময়ে যুক্তির সঙ্গে শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া শাস্ত্রের ভিতর হইতেই মানুষের মুক্তির রাস্তা খুলিয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। পৃথিবীতে অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনেই আমরা গোড়ায় একটা প্রবল অস্বীকার, একটা ভয়ঙ্কর নেতিত্বের দিক্ দেখিতে পাই। এম্নি করিয়া সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবেই তো তাঁরা সমাজকে, ধর্ম্মকে, নীতিকে, সমস্তকেই আবার বড়দিক্ হইতে স্বীকার করিয়া লন, তাঁদের ইতিত্বের দিক্‌টা ক্রমে ফুটিয়া উঠে। অর্থাৎ তাঁরা একবার ভাঙিয়া তারপর বড় করিয়া গড়েন। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনেও ইহার পরিচয় আছে। এক সময়ে যে সার্ব্বজাতিকতার দিক্ হইতে তিনি শাস্ত্রের শাসন মানেন নাই, পরে সেই সার্ব্বজাতিকতার দিক্ হইতে আবার তিনি শাস্ত্রের শাসনকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। তখন সেই সার্ব্বজাতিক রামমোহন রায় কেবল যে হিন্দুশাস্ত্র ও সভ্যতাকেই ধর্ম্মে, সমাজে, বিধিবিধানে, রাষ্ট্রে ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত স্বাধীন ও বিশ্বমুখীন করিবার জন্য চিরজীবন চেষ্টা করিলেন তা নয়। মুসলমান-শাস্ত্র ও সভ্যতাকেও ঐ ভাবে মুক্ত করিয়া বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্য তাঁর যত্ন হইল এবং খৃষ্টান-শাস্ত্র ও সভ্যতাকেও সকল দিক্ হইতে সার্ব্বজনীন বিকাশের পথে বাধামুক্ত করিবার জন্য তাঁর যুগের ইউরোপীয় কোন যুক্তিবাদী বা ক্রিথিঙ্কারের চেয়ে তিনি কিছুমাত্র কম চেষ্টা করিলেন না। সুতরাং ইহাই আশ্চর্য্য, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য যে, যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিরাট রঙ্গভূমিতে বিধাতা নানাজাতির সম্মিলন ঘটাইয়া এদেশের ধর্ম্মের মধ্যে ও দর্শনের মধ্যে এক উদার সমন্বয়-চেষ্টাকে যুগে যুগে নব-নব ধর্ম্মবিপ্লবের ভিতর দিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছেন, সেই দেশেই বিশ্বমানবের প্রতিভূ হইয়া রাজা রামমোহন রায় এযুগেও আবির্ভূত হইলেন। নানাজাতীয় সভ্যতার খণ্ড খণ্ড পরস্পর-বিচ্ছিন্ন রূপ যে এক অখণ্ড বিশ্বমানবেরই ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ মাত্র—সেই এক অখণ্ড বিশ্ব-

* রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে পঠিত।

মানবের দিকেই যে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া জাতীয় সভ্যতাগুলি মহা-যাত্রায় যাত্রা করিয়াছে—এই খবরটা আবার ভারতবর্ষ জগতে প্রচার করিবে বলিয়াই কি যেদিন জগতে মহা-প্রলয়ের মধ্য দিয়া এক নব সভ্যতার ভূমিকা তৈরি হইতেছিল, সেই দিনে, এই অখ্যাত অজ্ঞাত বাংলাদেশের এক গণ্ডগ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটিল?

কিন্তু আমি রামমোহন রায়ের এই বড় পরিচয়টি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না, কারণ প্রথমতঃ অত বড় আলোচনার শক্তি বা যোগ্যতা আমার নাই, দ্বিতীয়তঃ অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় আলোচনা সম্ভাবনীয়ও নয়। আমি বিশেষভাবে একটি মাত্র বিষয়ে আমার দৃষ্টিকে বদ্ধ করিতে চাই। আজ সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীকে ভারতের জাতীয়তা গঠনের যে সমস্যাটা ভাবাইয়া তুলিয়াছে,—অর্থাৎ কেমন করিয়া এত বিচিত্র জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক মহাজাতি গড়িয়া উঠিবে—সেই সমস্যা সম্বন্ধেই রাজা রামমোহন রায়ের কি বক্তব্য, তাহাই আমি আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

গোড়ায় বলিয়া রাখি যে, জাতীয়তা গঠনের প্রশ্নটা আমাদের কাছে আজ যেমন একটা ভয়ানক সমস্যার আকারে দাঁড়াইয়া গেছে, রামমোহন রায়ের কাছে ইহা সে আকারে মোটেই দেখা দেয় নাই। তিনি বিশ্বমানবের প্রতিনিধি হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাঁর ভিতরে বিশ্বমানবের অখণ্ড স্বরূপ সহজেই জাগ্রত ছিল। অতএব ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম্ম-প্রথা-বিধি বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সাম্য গড়িবার কল্পনা তাঁর মনের মধ্যে কি আকার লইয়াছিল তাহা আলোচনা করিতে গেলে সাধারণভাবে তাঁর জীবনের মধ্যে ঐ সাম্যের বিশ্ব-আদর্শটা কি ছিল তাহা জানা দরকার নয় কি? কারণ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দুই ভাগ আছে; একটা সাধারণ ভাবে সমস্ত মানবের জন্য তাঁর সৃষ্টি; আর একটা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের জন্যই তাঁর সৃষ্টি। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেও এই দুইটা দিক দেখিতে পাই—এক তাঁর সার্ব্বভৌমিক দিক্, আর এক তাঁর স্বাজাতিক দিক্।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে আমাদের এই ভারতবর্ষে যে-সকল সাম্য গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সকল সমন্বয় বা সমুচ্চয়বাদ দেখা দিয়াছে (যেমন ধরুন ভগবদ্গীতার সমন্বয়ই একটা মস্ত উদাহরণ)—সে-সকল সাম্য বা সমন্বয়, ধর্ম্মের ভিত্তিতেই গড়িবার চেষ্টা হইয়াছিল। এইজন্যই আমাদের দেশে 'ধর্ম্ম' কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়—সমাজধর্ম্মও ধর্ম্ম, রাজধর্ম্মও ধর্ম্ম, সবই ধর্ম্ম। কিন্তু এই গণতন্ত্রযুগে ধর্ম্মের সেই সম্রাট-পদটা ক্রমশঃ ঘুচিয়া যাইতেছে, কেননা রাজশক্তি যে এখন গণশক্তিতে বিভক্ত। এখন "সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।" অর্থাৎ এখন জীবনের বিচিত্র interest-গুলি, বিচিত্র দিক্‌গুলি, প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বারাজ্যে স্বরাষ্ট্রপতি (autonomous)। এক অদ্বৈতের খলে সব বিচিত্রতাগুলিকে মাড়িয়া পিষিয়া দিলে আর চলিবে না, বিচিত্রকে বিচিত্রভাবেই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, political, social, economic, ethical, spiritual, অর্থাৎ রাষ্ট্রীক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি কোন দিক্‌ই কারো অপেক্ষী নয়, কারো অধীন নয়—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং স্বরাট্—এই আইডিয়াই এযুগের বিশেষ আইডিয়া এবং রাজা রামমোহন রায়েরও বিশেষ আইডিয়া। বর্ত্তমান ভারতের জন্য এই এক তাঁর বিশেষ দান।

ব্যবহার-শাস্ত্র (Law) সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহাতে তিনি ব্যবহার বা lawকে ধর্ম্মবিধি ও নীতি হইতে একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন দেখিতে পাই। তেমনি আবার নীতিশাস্ত্রকে (Ethics) তিনি জ্ঞানের অনুশীলন, সভ্যতা কিংবা পরমার্থ সাধনা হইতেও স্বতন্ত্র করিয়াছেন। সামাজিক আচার-ব্যবহার, যথা খাদ্যাখাদ্য শুদ্ধাশুদ্ধ গম্যাগম্য বিচার—এ সমস্তকেই ধর্ম্ম হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন। ইহার ফলে হইয়াছে এই যে, রাজা ব্যবহার বা Law সম্বন্ধে আলোচনায় নীতি মানেন না, নীতির বেলায় পরমার্থকে আমল দেন না, এবং পরমার্থ সাধনায় সদাচারকে অগ্রাহ্য করেন—এই-রকমের একটা গোলমেলে ধারণা তাঁর সম্বন্ধে দাঁড়াইয়া যায়। জীবনের প্রত্যেক বিভাগের স্বারাজ্য বা অটনমি যে তাঁর আইডিয়া, সেটা ধরিতে না পারিলেই এই-সমস্ত গোলমেলে ধারণা অবশ্যম্ভাবী।

যখন এদেশে টোলচতুষ্পাঠীর শিক্ষাই চলিবে, না ইংরেজী শিক্ষা চলিবে, ইহা লইয়া তুমুল বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, যখন ইংরেজী শিক্ষার দিকে প্রায় কেউই নাই, তখন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্টকে লিখিত 'A letter on English Education'এ রাজা ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে কথা বলিতে গিয়া সংস্কৃত দর্শন ব্যাকরণাদি শিক্ষার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। নিজে বৈদান্তিক হইয়া এবং সর্ব্বপ্রথমে এদেশে বেদান্তভাষ্য বাংলায় প্রকাশ করিয়াও বেদান্ত সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন—

(অনুবাদ)—নীচে বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে দুটি-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, এই ধরণের তত্ত্বালোচনায় কোনই উন্নতি আশা করা যায় না, যথা—আত্মা কিভাবে পরব্রহ্মে লীন হয়? ব্রহ্মসত্তার সহিত তার সম্বন্ধ কি? কিম্বা যাহা-কিছু দৃশ্যমান বস্তু তাহাদের বাস্তবিক সত্তা নাই; অতএব বাপ ভাই প্রভৃতির যখন বাস্তবিক সত্তা নাই তখন তাঁদের প্রতি স্নেহভক্তিরও দরকার নাই এবং যত শীঘ তাঁদের বন্ধন কাটানো যায় ও জগৎ হইতে বিদায় লওয়া যায় ততই মঙ্গল—এই-রকমের বৈদান্তিক মতের শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা আমাদের যুবকেরা সমাজের উপযুক্ত সভ্য হইতে পারিবেন না।

এই উক্তি কি আমাদের আধুনিক মন্ত্র—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়!"—মনে পড়াইয়া দেয় না? তার-পর সেই চিঠিতে রাজা লিখিতেছেন যে, ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন না হইলে, ভারতবর্ষের লোকদের কোনদিন কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

রামমোহন রায় নিজে বৈদান্তিক হইয়া বেদান্তের শিক্ষাকে কেন ভূয়ো বলিলেন অনেকের মনেই এই ধাঁধা লাগিয়া যায়। কিন্তু তার একমাত্র কারণ ঐ যে, সামাজিক, রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলির উপর বেদান্ত আধিপত্য করিলে, অর্থাৎ তারা স্বাধীন স্বরাট্‌ভাবে বিকশিত না হইলে, বেদান্তের শিক্ষার দ্বারা সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। জীবনের এই বিচিত্র দিক্‌গুলির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিকাশ ঘটিলে তবেই ধর্ম্ম সুস্থ ও স্বাভাবিক হইতে পারিবে।

কিন্তু এই-সমস্ত বৈচিত্র্যের মূলে কি কোন ঐক্য নাই? তবে কি জীবনের প্রত্যেক বিভাগকে স্বরাট্‌ করিবার জন্য জীবনের এক পাশে ধর্ম্মকে রাজা ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে? না, একেবারেই না। রাজা রামমোহনের 'ব্রহ্ম' ছিলেন সকল বৈচিত্র্যের ঐক্য; তিনি সকল স্বারাজ্যের federation, মহাসঙ্গীতি। রামমোহনের কাছে সমস্ত জীবন ও তার সকল বৈচিত্র্য সেই ব্রহ্ম বা বিরাট বা ভূমার দ্বারা বিধৃত ও একীভূত ছিল। সেই ব্রহ্মকে তিনি স্বরূপে নির্গুণ ও অজ্ঞেয় বলিলেও একথা বলিয়াছেন, "মিথ্যা নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়।" সুতরাং তাঁর সেই ব্রহ্মের প্রকাশ যেমন ওষধি-বনস্পতিতে, যেমন শ্রদ্ধা-তপজপাদিতে, তেম্‌নি মানবের ইতিহাসে, সমাজে, রাষ্ট্রে, এমন কি ব্যবসাবাণিজ্য-লোকবিধিতেও—সর্ব্বত্র। তাঁর ব্রহ্ম এই-সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াও সকল বৈচিত্র্যকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। অতএব তাঁর এই ব্রহ্মের সাধন মানে তাঁরি ভাষায় বলিতে গেলে সকলকার সঙ্গে "ঐক্যচিন্তন"। অর্থাৎ বিশ্ব হইয়া উঠা। ওঁভূর্ভুবস্বঃ—এই ত্রিপাদ গায়ত্রী মন্ত্র ভিন্ন এই ভূমার সাধনের জন্য অন্য কোন মন্ত্র আর আছে কি? তাইতো দেখি যে, এই গায়ত্রীই তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর অবলম্বন ছিল। "গায়ত্রীর অর্থ" নামক চটী বহিটিতে এই বিশ্ব-হইয়া-উঠার সাধনার ইঙ্গিত যে গায়ত্রী-মন্ত্রের মধ্যেই পাওয়া যায় তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের মূল আদর্শ ও সাধনা কি ছিল তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা না হইলে সাধারণভাবে সমস্ত মানবের জন্য তিনি কি গড়িয়াছেন এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষের জন্যই বা তিনি কি গড়িয়াছেন, তার আলোচনা করা শক্ত হয়।

তাঁর গড়ার কাজটাকে মোটামুটি দুই ভাগে ফেলা যাইতে পারে—(১) ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি কি করিলেন, (২) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি কি করিলেন। এই দুই ভাগকেই আবার দুই দিক্‌ হইতে দেখিতে হইবে—(১) সাধারণভাবে সমস্ত মানবের দিক্‌ হইতে দেখিতে হইবে, (২) বিশেষভাবে ভারতবর্ষের দিক্‌ হইতে দেখিতে হইবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজা রামমোহন এইটেই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে একটা মূল জায়গায় ঐক্য থাকিলেও, আচার জিনিসটা ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত হওয়ার দরুণ পৃথিবীতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে

গুরুতর ভেদ দাঁড়াইয়া গেছে। বস্তুত ধর্ম্মের দ্বারা মানুষে মানুষে যত ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, এমন আর কিছুর দ্বারাই হয় নাই। সেইজন্য ধর্ম্মের এই বড় ক্ষেত্রটাতেই তাঁর জীবনের প্রধান কাজ হইল। এইখানে সাধারণভাবে সকল দেশের শাস্ত্রের মূল ঐক্যকে পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দিয়া আচারব্যবহারকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রতি ধর্ম্মের মধ্যে একটা সার্ব্বভৌমিক দিক্ আছে বলিয়া তার আবার যে কতগুলি জাতীয় বিশিষ্টতার দিক্ নাই কিম্বা তার সেই জাতীয় বিশেষত্বগুলি বর্জ্জন করা দরকার, এমন অদ্ভুত কথা রাজা রামমোহন রায় তাঁর প্রথম অবস্থার রচনা "তুহফাতুলে" ছাড়া আর কোথাও বলেন নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মের বিশিষ্ট সাধন, বিশিষ্ট মার্গ, আদর্শ, (cults, rites and ceremonials) এ-সব ত থাকিবেই; কিন্তু এ-সকল জাতীয় বিশেষত্বগুলিকেও তিনি মুক্তির অভিমুখী করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য হিন্দুর দিক্ হইতে হিন্দুধর্ম্মকে যেমন তিনি কাম্যকর্ম্ম, তামসকর্ম্ম, পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি অজ্ঞানতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; মুসলমানের দিক্ হইতে মুসলমানধর্ম্মকেও তেম্নি, সরিয়ৎ, হারাম হালাল অর্থাৎ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং খৃষ্টানের দিক হইতে খৃষ্টান-ধর্ম্মকে অলৌকিক কাহিনী (miracles), মানুষের পাপের জন্য ঈশ্বরের মানবরূপ ধারণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত (vicarious atonement), ত্রিত্ববাদ (trinity), প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

'আচার' জিনিষটাকে রাজা মোটের উপরে লোকরক্ষা ও লোকস্থিতির জন্য একটা আবশ্যকীয় বন্ধনের মত মনে করিতেন। আচার জিনিষটা সমাজের মধ্যে পরস্পরকে বাঁধিয়া রাখিবার একটা উপায়। ইহার সঙ্গে পরমার্থ ধর্ম্মের কোন যোগ নাই; ইহা সম্পূর্ণ বাহ্যিক জিনিষ। রামমোহন রায় পরিষ্কার দেখাইয়াছেন যে, এই খাদ্যাখাদ্য শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার—ইহার সহিত পরমার্থ সাধনের সম্পর্ক নাই। "আহারশুদ্ধি অপেক্ষা মনঃশুদ্ধি দেখা আবশুক।" অবশ্য তাই বলিয়া সদাচার বা সদ্ব্যবহারকে যে মানার প্রয়োজন্ নাই এমন কথা তিনি কখনই বলিবেন না। তাঁর "পথ্যপ্রদান" প্রভৃতি রচনায় তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের ভিন্ন ভিন্ন সদাচার ও সদ্ব্যবহার থাকিবেই। তান্ত্রিকের পক্ষে যাহা সদাচার, বৈষ্ণবের পক্ষে তাহা অনাচার। তারপর ভারতবর্ষে এমন নিয়ম নাই যে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ে কখনই যাইতে পারিবে না—সম্প্রদায়ের বদল হওয়া মাত্রই আচারব্যবহারেরও বদল হইয়া যাইতে পারে।

রামমোহন রায় লিখিয়াছেন যে এরূপ স্থলে "একের আচারকে সদাচার ও অন্যের আচারকে অসদাচার কহিতে পারিবেন না। বিহিতমদ্যপান ও বৈধহিংসা সল্লোকদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য্য, অতএব তত্তৎপক্ষে সে সর্ব্বদা সদাচার ও সদ্ব্যবহারের গণিত হইয়াছে।"

অতএব, সকল জাতির আচারকেই সদাচার বলিলে এবং সদাচারের সঙ্গে পরমার্থ-ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই বলিলে আচার জিনিষটার বিষদাঁত উপড়াইয়া ফেলা হয়। এম্নি করিয়া শাস্ত্রের ভিতর হইতেই শাস্ত্রের মুক্তির উপায় বাহির করিবার প্রণালী রাজা রামমোহন রায়ের প্রণালী ছিল।

কিন্তু আচারকে তিনি কেবলমাত্র লোকস্থিতির একটা উপায় বলিয়াই মনে করিতেন বলিলে ভুল হইবে। আচার-ব্যবহারের আর-একটা বড় দিক্‌ও তিনি স্বীকার করিতেন। লোকঃশ্রেয়ের দ্বারা আচারকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই, তবেই তাহা কল্যাণের আকর হইয়া উঠে। তিনি লিখিয়াছেন, "যে যে উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয় তাহাই কেবল ব্রহ্ম-নিষ্ঠের কর্ত্তব্য, এই ধর্ম্ম সনাতন হয়।"

এমনি করিয়া সাধারণভাবে ধর্ম্ম ও আচারের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তিনি হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন ধর্ম্মকেই বিশ্বের দিকে মুক্তি দিয়াছেন এবং এই তিন সমাজের উন্নতির পথকে অবারিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যেমন সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্য তিনি কি করিয়াছেন দেখা গেল, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তেম্নি তিনি কি আদর্শকে ধরিয়াছিলেন তাহাও দেখা চাই। রাষ্ট্রসম্বন্ধে সকল দেশের লোকই স্বাধীন হয়, ইহাই তাঁর আদর্শ ছিল। তিনি চাহিতেন যে প্রজাশাসন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বাধীন জাতিগুলি পরস্পর এক federation অথবা এক মহা-সম্মীতির বন্ধনে মিলিত হয়। ধর্ম্মের মত প্রতি রাষ্ট্রের মধ্যেও

একটা বিশ্বমুখীনতা তিনি আনিতে চাহিয়াছিলেন। এবং ধর্ম্মের সঙ্গীতির মত রাষ্ট্রেরও এক federation এক বিশ্ব-সৌরাষ্ট্রের কল্পনা তাঁর মনের মধ্যে ছিল। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সেই বিশ্বসঙ্গীতিই তাঁর ব্রহ্ম, তাঁর বিরাট। এই ত তাঁর গায়ত্রী। এই ত তাঁর ধ্যান।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে এই খবরটি পাওয়ামাত্র রাজা রামমোহন রায় টাউনহলে নিজের খরচে একটি প্রকাণ্ড ভোজ দিয়া বসিলেন। আবার যে-দিন খবর আসিল যে, নেপল্‌সের লোকেরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া হারিয়াছে, সেদিন রামমোহন রায় এমনি বিষণ্ণ হইলেন যে, মিঃ বকল্যাণ্ড নামক একজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সেদিন দেখা করিবার কথা ছিল কিন্তু তিনি দেখা করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁকে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁর মন এত মুহ্যমান যে বন্ধুকে সম্প্রদান করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর সেই আশ্চর্য্য চিঠিখানির উপসংহারের একটুখানি অংশ শোনাই :—

"From the late unhappy news I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe and Asiatic nations. ...... Under these circumstances I consider the cause of the Neapolitans as my own and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends to despotism have never been and will never be ultimately successful."

অর্থাৎ—সম্প্রতি যে নিরানন্দজনক খবর পাওয়া গেছে তার থেকে আমি এটা বুঝতে পাচ্চি যে ইউরোপ এবং এসিয়ার সমস্ত জাতিরা স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে এটা আমি আমার জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারব না। ......এই অবস্থায় নেপল্‌সের লোকদের আমি আমার স্বপক্ষ ও তাদের শত্রুদের আমার বিপক্ষ ব'লেই মনে করব। যারা স্বাধীনতার শত্রু, যারা স্বেচ্ছাতন্ত্রের বন্ধু, তারা কখনো পরিণামে কৃতকার্য্য হয়নি এবং হবেও না।

ইংলণ্ড যাত্রার পথে নেটাল বন্দরে একটা ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া সেই নিশানকে অভিবাদন করিতে গিয়া পড়িয়া তাঁর পা ভাঙিয়া যায়। তাঁর তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—ফরাসী জাহাজ ছাড়িয়া আসিবার সময় তিনি বারবার আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "Glory, glory, glory to France"। ইংলণ্ডে যখন তিনি পৌঁছেন তখন Reform Bill of 1832 লইয়া সেখানে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। রিফরম বিল পাশ হইলে রামমোহন রায় ইংলণ্ডে বলিয়াছিলেন যে, "আমি প্রকাশ্যরূপে জানাইয়াছিলাম যে, রিফরম্ বিল পাশ না হইলে আমি এ দেশ ছাড়িয়া যাইব।"

এইরূপে সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্য ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের যে উদার মুক্তির ভিত্তি তিনি তৈরি করিলেন, সেই মুক্তির ভিত্তি ভিন্ন আর কোন্ ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষের জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা তিনি করিবেন?

ভারতবর্ষের বন্ধন ও দুর্ব্বলতার তিনটি কারণ তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন :—(১) রাষ্ট্র-ব্যাপারে পরজাতির শাসনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়াছে। তাঁর ভাষায় বলি—"The country was at different periods invaded and brought under temporary subjection to foreign princes"। সুতরাং ইহা এমনই দেশ "a country in which the notion of patriotism had never made its way"—যে দেশে স্বাদেশিকতা জাগিতে পারে নাই। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইংরেজও এদেশ এ দেশীয় সৈনিকের সাহায্যেই জয় করিয়াছে। (২) দুর্ব্বলতার দ্বিতীয় কারণ তাঁরি ভাষায় বলি "আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।" (৩) তৃতীয় কারণ, তাঁরি ভাষায় বলি "আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসাত্যাগকে ধর্ম্মজানা" (mildness of the Hindu—নিট্‌শে যাহাকে slave morality বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন)। লেখাটির সমস্ত অংশটাই এখানে উদ্ধার করি। বাংলাদেশের লোক দুর্ব্বল কেন তার উত্তরে তিনি লিখিতেছেন "এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি" (অর্থাৎ যখন হইতে ভারত পরাধীন) "ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসাত্যাগকে ধর্ম্মজানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।"

ভারতের দুর্ব্বলতার এই কারণগুলি নির্দ্ধারণ করা মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু এগুলি দূর করিবার কি কি উপায় তিনি স্থির করিয়াছিলেন সেইটেই জানা আসল দরকার। ধর্ম্মের দিক্ হইতেই প্রথমে দেখা যাক্, তিনি মুক্তির উপায় কি স্থির করিলেন।

আমি জানি যে, এখানে আমার শ্রোতাদের

অনেকেরই মনে হইবে যে, ধর্ম্মের দিক হইতে ত তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সূচনা করিয়া গেছেন। কিন্তু তাঁর 'Trust Deed of the Brahmo Samaj"এ তিনি যে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আভাস দিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁর ধর্ম্মের পূরো চেহারাটি পাওয়া যায়, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিংবা ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি যে একটা স্বতন্ত্র 'সমাজ' তৈরি করিলেন—এমন কথা তিনি ত কোনদিন মনে করেনই নাই; আমরাও মনে করিলে তাঁর প্রতি অবিচার করিব। তাঁর Trust Deedএ স্পষ্ট লেখা আছে যে এ মন্দির "a place of public meeting for all sorts and descriptions of people without distinction"—সুতরাং তাহা স্পষ্টই সকল ধর্ম্মপন্থীদের একটা সাধারণ সম্মিলনের স্থান। তিনি বেশ জানিতেন যে, হিন্দু হিন্দুর অধ্যাত্ম তত্ত্বসাধন, মুসলমান মুসলমানের তত্ত্বসাধন এবং খৃষ্টান খৃষ্টানের তত্ত্বসাধন অবলম্বন করিয়াই ক্রমশঃ বিশ্বজনীনতার দিকে অগ্রসর হইবে; কিন্তু সেইসঙ্গে সেই বিশ্বজনীনতার আদর্শের একটি সুর ত কোথাও ধরাইয়া দেওয়া চাই। যতদিন নানা কারণে একের ধর্ম্মমন্দিরে অন্যের প্রবেশ নাই, একের ধর্ম্ম অন্যের অগ্রাহ্য, ততদিন এমন একটা মন্দির চাই যেখানে সব ভেদ মুছিয়া ফেলিয়া সবাই মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে। সেই বিশ্বধর্ম্মের মিলনমন্দির, সেই বিশ্বধর্ম্মপন্থীদের মিলনমন্দির—তাঁর ব্রহ্মমন্দির। অতএব, সেই মন্দিরে আসিলেই যে, সব ধর্ম্মগুলির বিশিষ্ট cults সাধন ও আদর্শ প্রভৃতি সমস্তই লুপ্ত হইয়া যাইবে, একথা রামমোহন রায়ের কথা একেবারেই হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মের মুক্তির জন্য যেমন তিনি একদিকে একটা বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সুর ধরাইয়া দিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত "ব্রহ্মসভায়" অন্যদিকে বেদ হইতে পুরাণতন্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রের ভিতর হইতে ঐ বিশ্বজনীন ধর্ম্মের দিকে প্রতি ধর্ম্মের ও ধর্ম্মসাধনার বিকাশের রাস্তাটাকে তিনি খোলসা করিয়া দিলেন।

তারপর সমাজের মুক্তি। আমাদের সমাজে জাতিভেদপ্রথা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন বটে যে তাহা "সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়" কিন্তু তার বেশি আর কিছুই বলেন নাই। তবে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য-রচিত "বজ্রসূচি" নামে একটি গ্রন্থ আছে এবং তাহাতে জাতিভেদ যে অযুক্ত তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রাজা সেই গ্রন্থ বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। ইহাতেই সে গ্রন্থের মতের সহিত তাঁর মতের ঐক্য ছিল বোঝা যায়। সে গ্রন্থ হইতে একটি জায়গা কেবল আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। আশা করি সে গ্রন্থখানি আপনারা নিজেরা পড়িয়া লইবেন। "বজ্রসূচি"কার লিখিতেছেন,

> "যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ, অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞবিহিত বিবাহদ্বারা, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয় সেই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতিস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব ব্যাঘাত হইল, যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কোপিলমুনি, উইচিবি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি ....শূদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্ত্ত-কন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন। ইঁহাদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক প্রকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি; অতএব জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপিও সম্ভব নহে।"

তারপর বর্ণ, ধর্ম্ম, পাণ্ডিত্য, কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব নিষ্পন্ন হয় না প্রমাণ করিয়া শেষে বজ্রসূচিকার লিখিতেছেন:

> "শাস্ত্রে কহে "জন্মপ্রাপ্ত হইলে সর্ব্ব সাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র, আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন * ... অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল।"

যাই হোক্, জাতিভেদ সম্বন্ধে রাজার মত কি ছিল, তাহা এই 'বজ্রসূচি' হইতেই বেশ বোঝা যায়। তারপর তিনি আচারকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। খাদ্যাখাদ্য শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার কেবল লোকস্থিতির জন্য, ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই বলিয়াছেন। তারপর লোকঃশ্রেয়ের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে ইহা বলার দ্বারা আচারের মধ্যে যাহা অশ্রেয়স্কর তাহাকে দূর করিবার পথ করিয়া দিয়াছেন। তারপর আবার প্রত্যেকের আচারই সদাচার ইহা প্রমাণ করার দ্বারা আচারের অনিষ্টকারিতার একেবারে মূলশুদ্ধ উপড়াইয়া দিয়াছেন।

---

* জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।

এইরূপে আচারকে তিনি বন্ধনমুক্ত করার দ্বারা জাতিভেদের একটা মস্ত অনিষ্টকে ঠেকাইবার উপায় করিলেন। তারপর বিবাহ-ব্যাপারে শৈববিবাহ সমর্থন করার দ্বারা তিনি জাতিভেদের বন্ধন কাটাইবার আর-এক প্রশস্ত রাস্তা খুলিয়া দিলেন। "চারি প্রশ্নের উত্তরে" তিনি লিখিয়াছেন :—

"তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্যগম্যা হয়।.........মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন করিতে তাঁহারা পারগ হয়েন।......শৈববিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই, কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্তৃকা না হয়।"

ভারতবর্ষের ধর্ম্মের মুক্তি, সমাজের মুক্তির পথ তিনি দেখাইলেন, এইবার রাষ্ট্রের মুক্তির কথা। ভারতে রাষ্ট্রশাসন কি ভাবে ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিবে, আজ হোমরুলের আন্দোলনের দিনে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে রাজা কি ভাবিয়াছিলেন তাহা জানিতে আমাদের ঔৎসুক্য হয়।

ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের সৌভাগ্যসূত্র যখন জড়িত হইয়া গেছে, তখন সেখানকার রাষ্ট্রনীতি যাতে ক্রমশঃ আমাদেরও নির্ভর হয়, এবং সেই রাষ্ট্রনীতিকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরাও আত্মকর্তৃত্বলাভ করি, ইহাই রামমোহন রায় কামনা করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র শাসক ও শাসিত সম্বন্ধ হইলে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধ কোনদিনই আত্মীয়সম্বন্ধ হইতে পারিবে না এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানও বাড়িয়াই যাইবে, ইহা রামমোহন রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলে, ইংরেজের সুখদুঃখের সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখের যোগ ঘটা চাই। সেইজন্য খুব ভদ্র ও উচ্চশিক্ষিত ইংরেজেরা এদেশে আসিয়া বাস করে এবং তাদের সঙ্গে এদেশের লোকদের সকল বিষয়ে আদানপ্রদান হয়, ইহা তিনি চাহিয়াছিলেন। কেননা, তাঁর ভাষায়, তারা "less disposed to annoy and insult the natives than persons of a lower class" এখনকার নিম্নশ্রেণীর ইংরেজের মত এ দেশের লোকদের উপর অমন উৎপাত ও অপমান করিবে না। তারা ঠিক বনিয়া যাইবে, ঠিক মিশ খাইবে।

তিনি বলিয়াছেন—ক্যানাডার সঙ্গে ইংলণ্ডের যেমন সম্বন্ধ, তখন ভারতবর্ষের সঙ্গেও ইংলণ্ডের তেমনই সম্বন্ধ হইতে পারিবে।

রাজার এ প্রস্তাব সম্বন্ধে ইংরেজ শাসনকর্তাদের এখনো ভাবিতে হইবে। কেননা উপর হইতে কেবলমাত্র শাসন ছুড়িয়া মারিলে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্বন্ধ কোনদিনই পাকা সম্বন্ধ হইতে পারিবে না। ইতর ইংরেজ নয়, উচ্চশিক্ষিত ভদ্রবংশীয় ইংরেজের এদেশে আসা দরকার, থাকা দরকার, মেশা দরকার। নহিলে "একদিকে শুধু অসি, অবজ্ঞা অটল, অন্যদিকে শুধু মসী আর অশ্রুজল" —চিরদিনই ভারতের ভাগ্যে ইহাই লেখা থাকিবে।

রাজা রামমোহন রায়ের সমস্ত জীবনের সাধনা কি ছিল তাহা যদি এককথায় আমার বলিতে হয়, তবে বলিব তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা ছিল মুক্তির সাধনা। তিনি সমস্ত মানুষের মুক্তির জন্য চিরজীবন তপস্যা করিয়াছেন। তাঁর মুক্তি কৈবল্য মুক্তি নয়, তাঁর মুক্তি নির্ব্বাণ মুক্তি নয়। তাঁর মুক্তি সর্ব্বমুক্তি, বিশ্বমুক্তি, বিশ্বমানবমুক্তি। জ্ঞানে মুক্তি, ধর্ম্মে মুক্তি, আচারে মুক্তি, সমাজে মুক্তি, রাষ্ট্রে মুক্তি, বিধিবিধানে মুক্তি, ভারতের মুক্তি, সমস্ত জগতের মুক্তি। সমস্ত বিশ্ব যে আজ সেই বৃহৎ মুক্তিসাধনায় রত, আজ রণপোতের গোলাগুলির ভীষণ গর্জ্জনের মধ্যেও সেই মুক্তির সঙ্গীতই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, দেশে-দেশে আজ ধর্ম্মে রাষ্ট্রে সমাজে সেই মুক্তির জন্যই যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বসংগ্রামের আয়োজন হইতেছে—তাহা কি আমরা জগতের দিকে চোখ মেলিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি না? সেইজন্যই ত আজ বিশেষভাবে ঐ সৌম্য প্রসন্ন, ঐ বলিষ্ঠ উদার, ঐ তপস্বী রাজর্ষি রামমোহন রায়কে স্মরণ করি, যিনি এ যুগের প্রবর্ত্তক। তিনি এই নবযুগের উদ্বোধনের কালে, সেই প্রলয়-রাত্রে, দূরে বহুদূরে—সুদূরতম ভবিষ্যতের দিকে তাঁর দৃষ্টির আলোককে প্রেরণ করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে বিশ্বমানবলোকে সেই

"One far off divine event
To which the whole creation moves—"

সেই সুদূর স্বর্গীয় মহৎ ঘটনা, মহৎ পরীক্ষার সূত্রপাত হইতেছে, সমস্ত জগৎ চরাচর যাহার দিকে ধাবমান।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

স্মৃতির সৌরভ

(২০)

এক সপ্তাহের মধ্যেই বেশ একখানা ভাল গাড়ী করিয়া টিনাকে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে যত্ন করিবার জন্য রহিলেন মিঃ গিলফিল ও তাঁহার ভগিনী মিসেস হেরন। মিঃ গিলফিলের বোনটির স্নিগ্ধ নীল চোখছুটির দৃষ্টিতে ও কোমল ব্যবহারে টিনার আহত হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। নিজের বোনের মত তাঁহার সহজ ব্যবহারটি টিনার চোখে আরও মধুর আরও নূতন ঠেকিত। সে ব্যবহারে ছোটবড়র কোনো ভেদ নাই। লেডি শেভারেলের প্রভুত্বব্যঞ্জক সদয় ব্যবহারের কাছে টিনা কেমন যেন আড়ষ্ট ও ভীত হইয়া থাকিত। তাঁহার ব্যবহারে আদর-সোহাগের চিহ্নও ছিল না। বড় বোনের মত এই যে একটি স্নিগ্ধহৃদয়া তরুণী তাহারি চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আদরে যত্নে তাহাকে ঘিরিয়া রাখিতেন, স্নেহমাখা স্বরে মৃদু গলায় কথা বলিতেন, ইহার মাধুর্য্য টিনার কাছে যেমন নূতন তেমনি লোভনীয়।

টিনার শরীর ও মনের অবস্থা তখনও অত্যন্ত সন্দেহজনক; পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মতই অস্থির; তখনই কেমন একটা আনন্দে মেনার্ডের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত; টিনার এ অবস্থাতেও সুখী হওয়াতে মেনার্ড নিজেই নিজের উপর চটিয়া উঠিতেন। কিন্তু টিনাকে সকল বিপদের হাত হইতে সরাইয়া ঘিরিয়া রাখার এই যে নূতন আনন্দ, প্রতিদিনের প্রতি ঘণ্টা তাহারই সঙ্গে কাটানর যে সুখ, তাহার আরামের জন্য সকল খুঁটিনাটি কাজ করায় যে তৃপ্তি, তাহার চোখের দৃষ্টিতে এ জীবনের প্রতি এতটুকু আগ্রহের সন্ধান পাইলে যে উল্লাস, তাহাতে কি আর দুঃখ-ভয়ের জন্য এতটুকু স্থান ছিল!

তৃতীয় দিনে গাড়ী গিয়া ফক্সহল্মের পুরোহিতের বাড়ীর দরজায় থামিল। পাদ্রী আর্থার হেরন তাঁহার নূদীকে সম্ভাষণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া একটি বছরপাঁচের বলিষ্ঠ ছেলে। ছেলেটির একমাথা সোনালী চুল, হাতে ছোট একটা শিকারের ছড়ি।

ঐ বাড়ীর সামনের মাঠটির মত সমান করিয়া ছাঁটা পরিষ্কার মাঠ প্রায় দেখা যায় না, পথগুলিও ঝাঁটপাট দিয়া ঝক্‌ঝকে করা, গেটের খিলানের উপর দোলানো লতার মালাটিও দেখিবার মত। ছোট একটি সবুজ পাহাড়ের চূড়ার উপর গ্রামের গির্জ্জা; দূরে গ্রামখানি দেখা যায়, অর্দ্ধপথে পুরোহিতের বাড়ী, অসংখ্য গাছের আড়ালে পাখীর বাসার মত লুকাইয়া আছে; গ্রামের মাঝে মাঝে গোচারণের বড় বড় মাঠ; আশেপাশে ঝোপ আর বড় বড় গাছ ছায়া করিয়া আছে। আজিও কৃষির উন্নতির কোপে পড়িয়া নির্ম্মূল হয় নাই।

প্রশস্ত বৈঠকখানা-ঘরখানার চিমনীতে ও টিনার গোলাপী-রং-করা শুইবার-ঘরের চিম্‌নীতে আগুন জ্বলিতেছিল। ছোট ঘরখানির মুখ সমাধিক্ষেত্রের দিকে নয়, এক কৃষকের গোলাবাড়ীর দিকে; টিনার জন্য বাছিয়া সেইজন্য এই ঘরখানাই ঠিক করা হইয়াছে। ঘরের জানালা দিয়া চাষাবাড়ীর সারি সারি মৌচাক, গোয়ালভরা সুপুষ্ট গরুবাছুর, ও কার্য্যতৎপর বলিষ্ঠ কৃষকদের কাজকর্ম্ম দেখা যায়। মিসেস হেরন নিজের বুদ্ধিতেই বিচার করিয়া স্বামীকে টিনার জন্য এই ঘরখানা ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। কুসুমকুঞ্জে পাপিয়ার গানের চেয়ে কৃষকের প্রাঙ্গণে পালিত পশুপক্ষীর স্বচ্ছন্দ বিচরণই অনেক সময় ব্যথিত হৃদয়ে বেশী শান্তি দেয়। চাষার বাড়ীর অনাদৃত কুকুর-বিড়ালের উচ্ছ্বাসহীন সহজ আনন্দের মধ্যে, সেখানকার শান্ত ঘোড়াগরুর কদর্য্য কাদাজল পানের তৃপ্তির মধ্যেই কেমন যেন একটা স্নিগ্ধতার আবেশ মাখানো।

এই নিভৃত নির্জ্জন বাড়ীখানিতে আরামের অভাব নাই, কিন্তু শেভারেল-প্রাসাদের আড়ম্বরের যথেষ্টই অভাব আছে। এই শান্তিময় গৃহে কিছুদিন থাকিলে যে টিনা অতীতের সে সব বেদনাময় স্মৃতির কবল হইতে ধীরে ধীরে উদ্ধার পাইতেও পারে, মিঃ গিলফিলের এ আশা কিছু অমূলক নয়। তাহার মনশ্চক্ষের সামনে যদি সে-সব অতীত দৃশ্যের ছায়া আর হানা-বাড়ীর ভূতের মত অমন করিয়া ঘুরিয়া না বেড়ায় তবে হয়ত তাহার দৈহিক দুর্ব্বলতা ও অবসাদও আস্তে আস্তে কাটিয়া যাইবে। মেনার্ডের ইচ্ছা টিনার সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্তক্ষণ থাকেন, কাজেই মিঃ হেরনের সহকারীর সঙ্গে কাজটা বদল করিয়া লইয়া সে

সুবিধাটাও করিয়া ফেলা দরকার। আজকাল টিনা যেন তাঁহার সঙ্গটাই পছন্দ করে, তাঁহার ফিরিবার সময় হইলে উদ্বিগ্নভাবে চাহিয়া থাকে; কথা অবশ্য সে তাঁহার সঙ্গে খুব কমই বলে, কিন্তু তিনি যখন তাঁহার বড় হাতদুখানির আশ্রয়ের মধ্যে সযত্নে তাহার ছোট হাতখানি ঘিরিয়া তাহার পাশে বসিয়া থাকেন তখনই টিনার মুখে গভীর তৃপ্তির ভাব ফুটিয়া উঠে। কিন্তু পাঁচ বছরের ক্ষুদে ছেলে অজিই ছিল তাহার সকলের চেয়ে উপকারী সঙ্গী। মামার চেহারার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার বাল্য-স্বভাবও সে উত্তরাধিকার-সূত্রে খানিকটা পাইয়াছিল। বাড়ীতে একটা চিড়িয়াখানা খুলিয়া বসিবার তাহার খুবই সখ; আর তাহার শূয়র-ছানা, কাঠবিড়ালী, পায়রা প্রভৃতির সুখ-দুঃখের খবরে টিনার সহানুভূতি আদায় না করিয়া সে ছাড়িত না। এই শিশুর সঙ্গে খেলায় মাতিয়া টিনা মাঝে মাঝে তাহার এ দুঃখ-শোকের আঁধার দেশ ছাড়াইয়া নিজের শৈশবের সেই সুখের রাজ্যে গিয়া পৌঁছিত। অজির খেলার ঘরে বসিয়া এই শীতের দিনের কত নিরানন্দ ঘণ্টাই সে স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিত।

মিসেস হেরন গায়িকা ছিলেন না, তাই তাঁহার বাদ্য-যন্ত্রও ছিল না; কিন্তু টিনার মনে যদি আবার কোনো দিন সঙ্গীতের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে, তবে হয়ত সে বাজনার দিকে নজর দিতে পারে, এই ক্ষীণ আশাতেই মিঃ গিলফিল কোথা হইতে একটি ছোট বাজনা আনিয়া বসিবার ঘরে খুলিয়া ঠিকঠাক করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। শীত-কাল প্রায় অবসান হইয়া আসিল, কিন্তু মিঃ গিলফিলের আশা পূর্ণ হইবার কোনো সম্ভাবনা দেখা দিল না। এত-দিনে টিনার মধ্যে যেটুকু সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যে কোনো কাজে উৎসাহ কি তৎপরতার কিছু চিহ্ন দেখা যায় নাই; নীরবে সব কাজে সায় দিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে সকলের বেশী কাজ। মাঝে মাঝে অজির নানা খেয়ালে সায় দেওয়া, একটু কৃতজ্ঞ হাসি হাসা, আর তাহার প্রতি সকলের এত যত্নের দিকে একটু নজর দেওয়া, ইহার উপরে সে এখনও উঠিতে পারে নাই। কখনো কখনো সেলাই ধরণের কিছু একটা হাতে করিয়া বসিত, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া তাহার উপর দৃষ্টি দিয়া পড়িয়া থাকিবার ক্ষমতাও তাহার বেশীক্ষণ থাকিত না, আঙুলগুলি কখন আপনা হইতেই খসিয়া আসিত আর টিনা যেন কিসের স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িত।

সেদিন সূর্য্যের আলোয় যেন বসন্তের রঙীন নিশান দেখা দিয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ কটা দিন সেবার শীতের হাত ছাড়া। মেনার্ড ও অজির সঙ্গে বাগানে তুষার-শুভ্র ফুলের বাহার দেখিয়া দেখিয়া টিনা তখন শ্রান্ত হইয়া একটা সোফায় বিশ্রাম করিতেছিল। অজি ঘরের চারিধারে কিছু একটা নিষিদ্ধ আনন্দের সন্ধানে ঘুরিতে ব্যস্ত। হঠাৎ ঘরের কোণে বাজনাটার উপর চোখ পড়াতে সে হাতের ছড়িটা দিয়া তাহার একটা খাদের চাবির উপর এক ঘা দিয়া দিল।

টিনার শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটা সুরের প্রবাহ বিদ্যুৎ বেগে খেলিয়া গেল; আজ এই মুহূর্ত্তে যেন তাহার মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইতেছিল; আজ এত দিনে যেন সে তাহার শূন্য জীবন পূর্ণ করিতে একটা গভীর কিছুর সন্ধান পাইল। টিনা ফিরিয়া বাজনাটার দিকে চাহিয়া উঠিয়া সেই দিকে চলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার হাত আবার সেই পুরানো ভঙ্গীতে সুরের ধ্বনি জাগাইয়া তুলিল; আজ তাহার প্রাণ আবার তাহার নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইল। মরুভূমিতে পড়িয়া যে পদ্ম শুষ্ক ম্লান হইয়া ছিল, আজ সে জলধারায় স্নান করিয়া জলের বুকে রূপের হাট খুলিয়াছে।

মেনার্ড মনে মনে বলিলেন, ধন্য ভগবান! আজ এতদিনে টিনার মনে একটা কাজে আগ্রহ আসিয়াছে, তবে আজ আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে।

ক্রমে বাজনার সঙ্গে-সঙ্গে টিনার সুকণ্ঠ অতি ধীরে জলধারার স্বরের মত আসিয়া মিশিল। তারপর বাজনার স্বর কোথায় মিলাইয়া গেল, টিনার হৃদয়ঢালা গানে আর-সব স্বর ডুবিয়া গেল। খোকা অজি তাহার "টিন-টিনে"র এই নূতন শক্তির বিকাশ দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে নিস্তব্ধ। সে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এতদিন তাহার ধারণা ছিল, তাহার এ খেলার সাথীটি নিতান্তই বোকা, তাহাকে অনেক বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া দরকার। আজ যে হঠাৎ

সব উল্টাইয়া গেল। তাহার দুধ খাইবার বাটির ভিতর হইতে হঠাৎ পাখা মেলিয়া একটা জুজুবুড়ী উড়িয়া আসিলেও সে এত আশ্চর্য্য হইত না।

টিনার দুঃখের দিনের প্রথম দর্শনের সময় সেই যে গানটি সে গাহিত, আজও সে সেইটিই গাহিতেছিল। স্যর ক্রিষ্টফারের সেই অতিপ্রিয় গানটি! গানের প্রতি সুর যেন টিনার জীবনের সব মধুমাখা স্মৃতি বহিয়া আনিতেছিল। যে সুখের দিনে শেভারেল-প্রাসাদ তাহার কাছে আনন্দ-নিকেতন ছিল, তাহারই স্মৃতিতে এগান পরিপূর্ণ। তাহার কৈশোর আজ তাহাদের দীর্ঘদিনের সুখসম্ভার লইয়া তাহার দুদিনের দুঃখ শোক আড়াল করিয়া ন্যায্য অধিকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

টিনা গান শেষ করিতে তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু-ধারা ঝরিয়া পড়িল। এবাড়ীতে আসার পর তাহার চোখে আজ প্রথম জল দেখা দিল। মেনার্ড আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া গিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার কালো চুলের উপর একটি চুম্বন আঁকিয়া দিলেন। টিনা তাহার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া নিজের ছোট্ট মুখখানি মেনার্ডের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

কোমল বেষ্টনে কাহাকেও না বাঁধিয়া আশ্রয়হীনা লতা বাঁচে কি করিয়া? তাই এ তরুণ প্রাণটি সঙ্গীতে নূতন জন্ম লাভ করিয়া প্রেমেও নূতন জীবন পাইল।

(২১)

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে ফক্সহলম্ গ্রামের গির্জ্জার দরজায় সারাগ্রামের লোক যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সেদিন গ্রামের লোকে একটা দেখিবার মত কিছু দেখিয়া-ছিল বটে। গির্জ্জার খিলান-দেওয়া দরজার ভিতর দিয়া সেদিন সকালে যখন মেনার্ড গিলকিল হাসিমুখে টিনার হাতখানি ধরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার আনন্দে যেন আকাশে বাতাসেও আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কচি-ঘাসের পাতায় পাতায় সূর্য্যের উজ্জল আলো শিশিরকণাগুলিকে হীরার মত ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিয়াছিল। বাতাস সেদিন মৌমাছির গুঞ্জন আর পাখীর কাকলিতে যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। গির্জ্জার ঘণ্টা যে সেদিন কেন ভোর না হইতেই আনন্দে অবিশ্রাম বাজিয়া চলিয়াছে তাহাই জানিবার জন্ম আশেপাশের যত গাছপালা ফুলের হাট খুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। টিনার ছোট মুখখানি সেদিনও কেমন বিবর্ণ; কি একটা গোপন বেদনার ছায়া মুখখানা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বিদায়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে প্রিয়জনদের সঙ্গে যে শেষ উৎসবে বসিয়াছে, যাত্রার আহ্বানধ্বনির জন্ম যে কান পাতিয়া আছে, তাহারই মত বিষাদে মলিন টিনার মুখখানি। কিন্তু তাহার হাতখানা মেনার্ডের হাতের উপর অনুরাগভরে লতাইয়া আছে, তাহার কালো চোখদুটির কোমলদৃষ্টিও মেনার্ডের নত চোখের দৃষ্টিকে প্রেমভরে বরণ করিয়া লইতেছে।

বরকনের সঙ্গে মিতকনের দল ছিল না। কেবল সুন্দরী মিসেস হেরন ফক্সহলমে নবাগত এক তরুণ যুবার হাতের উপর ভর দিয়া পিছন পিছন আসিতেছিলেন। মায়ের হাত ধরিয়া ক্জিও মহা আনন্দে নৃত্য করিতে-করিতে চলিয়াছিল; কিন্তু নূতন পোষাক ও টুপির আনন্দ তাহার যত না হউক, সে যে টিন-টিনের বিয়েতে মিতবর হইয়াছে, কল্পনার এই আনন্দেই সে ভরপুর।

সকলের শেষে যে দুইজন আসিতেছিলেন, বরকনের চেয়ে তাঁহাদের উপরেই গ্রামের লোকের নজর পড়িয়াছিল বেশী। সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধটির তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে সকল পাপীর দৃষ্টিই নত হইয়া আসে, আর তাঁহার সঙ্গিনীর নীল-পোষাক-পরা মোহিনীমূর্ত্তি দেখিলে রাজরাজেশ্বরী বলিয়া ভ্রম হয়।

লাঠির উপর সমস্ত শরীরের ভরটা দিয়া মাথাটা বড় বেশী-রকম একপেশে করিয়া তরুণ-সম্প্রদায়ের তীক্ষ্ণ সমালোচক বুড়ো ফোর্ড বলিল, "হ্যাঁ, একেই বলে চেহারা, যেন ছবিটি। আজকালকার ছেলেগুলো যেন সব ননীগোপাল! দূর থেকে দেখায় বটে ভাল, তবে আখেরে কাজ দেয় না গো, দেয় না। বুড়ো বয়স অবধি স্যর ক্রিষ্টফারের মত খাড়া হয়ে কাটিয়ে যাবে, এমন একটি এখন খুঁজলে মিলবে না।" বুড়ো ফোর্ড যুবকদের আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে।

আর এক বুড়ো বলিল, "দেখ, ঐ যে ছোকরা পাদ্রীর গিন্নির সঙ্গে চলেছে, ও স্যর ক্রিষ্টফারের ছেলে না হয়ে যায়ই না। বল ত আমি পাঁচটাকা বাজি ফেলছি!"

"না হে বোকারাম, অত বড়াই করে আর বাজি ফেলতে হবে না, ও ছেলে-টেলে নয়। জমিদারের ভাগ্যে, ও সব বিষয় সম্পত্তি ওই পাবে। ওগাঁয়ের গাড়োয়ান আমায় বল্লে, খুড়োর এর চেয়ে অনেক সুন্দর আর-এক ভাগ্নে ছিল, সন্ন্যাস রোগে ছেলেটা হঠাৎ মরে গেল কি না, তাই এ ছোকরা কপাল জোরে তা'র ঠাঁই জুড়ে বসেছে।"

গির্জ্জার গেটের কাছে বরকনের সুলক্ষণের জন্যে মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইবে বলিয়া মালী মিঃ বেট্‌স্ দাঁড়াইয়া ছিল। টিনি-মণির সুখের সংসার দেখিবার জন্যই সে শেভারেল-প্রাসাদ হইতে এত পথ আসিয়াছে। আনন্দটা তাহার পুরো-মাত্রাতেই হইত যদি সে বাড়ীর বাগানের ফুল দিয়া স্বহস্তে বিবাহ-সভার তোড়াগুলি বাঁধিয়া দিতে পারিত। এ গ্রামের তোড়া তাহার মনে ধরে নাই।

বরকনে কাছে আসিতেই বৃদ্ধ মালী বলিয়া উঠিল, "ভগবান তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, চিরসুখী হয়ে দীর্ঘ-কাল বেঁচে থাক।" কথাগুলি বলিতে তাহার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

মিষ্টি মিহিসুরে উত্তর হইল, "ধন্যবাদ, বেটস্‌কাকা—টিনাকে চিরদিন মনে রেখো।" বুড়ো বেটসের কানে—এ স্বর জীবনে তারপর আর কোনো দিন আসে নাই।

নবদম্পতি বিবাহের পর খানিক ঘুরিয়া শেপার্টনে যাইবেন; কয়েক মাস হইল মিঃ গিলফিল সেখানকার পুরোহিতের পদ পাইয়াছেন। মেনার্ডের বাল্যসুহৃৎ ওল্ডিন-পোর্ট পরিবারের কোনো উপকারী বন্ধুর অনুগ্রহেই এই ছোট গ্রামখানির কাজ তিনি পাইয়াছেন। শেভারেল-প্রাসাদ হইতে দূরে টিনাকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত এমন একটি গৃহ যে এত সহজেই আপনা হইতে জুটিয়া গিয়াছে ইহাতে স্যর ক্রিষ্টফার ও মেনার্ড উভয়েই খুব আনন্দিত। তাহার দুর্ব্বল শরীরে সামান্য উত্তেজনাতে এত অপকার হইতে পারে যে তাহাকে তাহার সে দুঃখস্মৃতিময় গৃহে আর দ্বিতীয়বার লইয়া যাওয়া তাঁহারা নিরাপদ মনে করেন না। দুই এক বৎসর পরে প্রাসাদের কাছের গ্রামের পাদ্রী বুড়ো ক্রিচলি বাতের রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলে এবং ততদিনে টিনার কোলে একটি শিশুর আবির্ভাব হইলে মেনার্ড তাহাকে নিরাপদে সে গ্রামে লইয়া গিয়া সংসার পাতিতে পারেন। শেভারেল-প্রাসাদে দালানে ও বাগানে আর-এক জোড়া নূতন কালো চোখের আনন্দবিহার দেখিয়া টিনার মনেও হয়ত তখন তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কোনো ভাবের উদয় হইবে না। মা কোনো দুঃখস্মৃতির ভয় করে না—খুকুর হাসির আলোয় তাহার সকল আঁধার কাটিয়া যায়।

এই আশায় বুক বাঁধিয়া আর টিনার একান্ত নির্ভর-শীল প্রেমের আনন্দে পুলকিত হইয়া মেনার্ড কয়েক মাস পরিপূর্ণ সুখের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। টিনা যে এখন কেবল তাঁহারই অনুরাগের কাছে তাহার হৃদয় মন সঁপিয়া দিয়াছে, কেবল তাঁহারই জন্য সে এ জীবনকে আবার মধুময় রূপে দেখিতেছে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া স্বভাবতই তাহার এখন সে অবসাদের ভাব ঘুচে নাই, কোনো কাজে আগ্রহও দেখা দেয় নাই; তবে তাহার আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় মেনার্ডের মনে আশা জাগিয়াছে, হয়ত ইহার পর আবার সব তেমনি আগের মত সুন্দর হইয়া উঠিবে।

কিন্তু ক্ষীণ লতিকার অঙ্গে আঘাত যে বড় গম্ভীর হইয়াছিল। তাই পুষ্পগুচ্ছকে জন্ম দিবার প্রয়াসে সে আপনার প্রাণ হারাইয়া বসিল।

টিনার দিন ফুরাইয়া গেল, মেনার্ড গিলফিলের হৃদয়ভরা প্রেমও তাহারই সঙ্গে-সঙ্গে চিরদিনের মত নীরব হইয়া সেই অজানা লোকে চলিয়া গেল।

(শেষ কথা)

শেপার্টন গ্রামের সেই নির্জ্জন ঘরখানিতে আগুনের ধারে একলা যে বৃদ্ধ জরাজীর্ণ দেহ ও পক্ককেশ লইয়া বসিয়া থাকিতেন, এই সেই মিঃ গিলফিলের সুদূর অতীতের প্রণয়-কথা। মাথা-ভরা কোঁকড়া চুল, হৃদয়-ভরা প্রেমের উচ্ছ্বাস, তরুণ জীবনের গভীর বেদনা, ইহার কোনোটাই শুভ্র বিরল কেশ, বৈরাগ্যময় তৃপ্তি ও বার্দ্ধক্যের সকল-আশা-হরা শান্তির সঙ্গে খাপ খায় না বটে, কিন্তু এসব একই জীবনপথের নানা দৃশ্য। ভোরের বেলা শস্যক্ষেত্রে কিশোরী কৃষকবালার মন-মাতান গান শুনিয়া পথিক ত সেই দিনের যাত্রার শেষেই সন্ধ্যায় শ্মশানের অন্ধকারে বিভীষিকাময় মৃত্যুর রূপ দেখিতে পারে।

যাঁহারা কেবল এই পক্ককেশ বৃদ্ধকে ঘোড়ার পিঠে মন্থরগতিতে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেই দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত যে ইনিই এককালে প্রেমে অনুরাগে হৃদয় পূর্ণ করিয়া ক্যালামের পথে তীর-বেগে ঘোড়া ছুটাইয়াছিলেন। এই কটুভাষী গ্রাম্যরুচি কৃপণ বৃদ্ধই যে এককালে প্রেমের সকল গভীর রহস্যের সন্ধান রাখিতেন, বিরহের বেদনায় দিবারাত্রি পুড়িতেন আর মিলনের আনন্দালোকের সুখস্পর্শে পুলকিত হইতেন তাহাই বা কে বিশ্বাস করিবে? বাস্তবিকই বৃদ্ধবয়সের সেই মিঃ গিলফিলের মধ্যে মানব-প্রকৃতির নীরস গ্রন্থিময় দিকটার যতখানি দেখা দিয়াছিল, তরুণ মেনার্ডের সরলদৃষ্টির মধ্যে বোধ হয় তাহার এককণারও আভাস মেলে নাই। এ বিষয়ে মানুষ তরুলতারই জ্ঞাতভাই। বৃক্ষ তাহার যে সরস সতেজ শাখাগুলিকে নবীন যৌবনের সমস্ত মাধুরী দিয়া প্রাণবান করিয়া তুলিতেছিল তুমি যদি নিষ্ঠুর আঘাতে সেগুলিকে তাহার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লও, তবে তাহার ক্ষতস্থান শুষ্ক কঠিন গ্রন্থিময়ই হইয়া উঠিবে; যে বৃক্ষ হাজার বাহু মেলিয়া ছায়ায় ধরণীকে শীতল করিতে পারিত, কঠিন আঘাতের ফলেই আজ সে একটা অদ্ভুতমূর্ত্তি বিসদৃশ গুঁড়িমাত্র। মানুষের অনেক বিরক্তিকর দোষ, অনেক অশোভন ব্যবহারই কঠিন দুঃখের ফল। বনফুলের মত অজস্র সৌন্দর্য্যে যখন মানুষের মন বিকশিত হইয়া উঠে, সেই নবীন বয়সে নিষ্ঠুর বেদনার ঘায়ে তাহার হৃদয়খানিকে দলিত করিয়া দিয়াই রুদ্র দেবতা ইহাদের সৃষ্টি করেন। কত ভ্রান্ত মানুষের পথের ভুল দেখিয়া আমরা নিন্দায় তাহাদের জর্জ্জরিত করিয়া তুলি; কিন্তু দুঃখ যে তাহাদের অন্ধ কি পঙ্গু করিয়া দেয় নাই তা' আমাদের কে বলিবে?

এই বৃদ্ধ পুরোহিতের স্বভাবেও নীরস গ্রন্থির অভাব ছিল না; কিন্তু প্রকৃতি দেবী যখন সৃষ্টির শুধু নক্সা করিয়া রাখিয়াছিলেন তখন সেটা ছিল উন্নত বিপুল বটবৃক্ষের আদর্শেই। হৃদয় তাহার খাঁটিই ছিল, কাঠামোটাও নির্দ্দোষ। একমাথা পাকাচুল লইয়া এই যে বৃদ্ধ শিশুদের খোঁজে সর্ব্বদা মিঠাই মণ্ডা লইয়া ঘুরিতেন, বিলাসী ধনীদের অনাচারের বিরুদ্ধে যাঁহার রসনা কেবলি বাণ বর্ষণ করিত, যিনি সকলের সঙ্গে একাসনে বসিয়া তামাক খাইয়া আর গল্পগুজব করিয়াও একদিনের জন্যও তাহাদের সম্মান হারান নাই, ইহাঁর মধ্যে এই বয়সেও প্রধান হইয়া ছিল সেই সাহসী বিশ্বাসী কোমল তরুণ হৃদয়টি, যে-হৃদয় তাহাঁর প্রথম ও শেষ প্রেয়সী টিনার প্রেমেই তাহার নবীন প্রাণের যাহা-কিছু সুন্দর ও সতেজ সমস্ত নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়াছিল।

(সমাপ্ত)

শ্রীশান্তা দেবী।

ফুল

দাদাঠাকুর ফুল তুলোনা বলছি পুনঃপুনঃ,
চক্ষুলজ্জা আর চলে না সাফা কথাই শুন'।
লাগালাম এই গাছগুলো সব অনেক সেঁচে খুঁড়ে,
অনেক জলে ভিজে এবং অনেক তেতে পুড়ে।
নিজের বুকের ছেলের মত দেখি ওদের আমি,
ওরা আমার চক্ষু জুড়ায়, প্রাণের চেয়ে দামী।
তোমার মতন নির্ম্মমেরা গাছের দফা সারে;
কলজে আমার ভাঙে, পরাণ সইতে নাহি পারে।
বল্‌ছো বটে, "ফুল নিয়ে তুই করবি কিরে পাজি।"
কৈফয়ৎটা দিতে আমি একবারে নই রাজী।

তোমার ঠাকুর পূজ্‌বে তুমি আমার ফুলে কেন?
আমার ঠাকুর পূজ্‌তে আমি জানিই নাকো যেন।
তুমি বামুন, তোমার আছে ঠাকুরপূজা শেখা,
দীনদুনিয়ার ঠাকুর যেন বামুন জাতির একা।
ফুল না ছিঁড়ে যেন তাঁহার হয়না পূজা কভু,
ফুটন্ত ফুল থাকতে গাছেই নেবেন আমার প্রভু।
কোল হ'তে মার ছেলেয় কেড়ে তোমার বলিদান,
আমার পূজা মায়ের বুকে শিশুর সুধাপান।
করুন তিনি পুষ্পবিলাস ফুলের বনে বনে,
চেয়ে চেয়ে দেখে আমি জুড়াই দুনয়নে।
তোমার কোপে শাপে যদি উচ্ছন্নেই যাই,
ফুলের বনে তাঁরেই পাবো দুঃখ আমার নাই।

শ্রীকালিদাস রায়।

ইতিহাসের উপদেশ

ফ্রেডরিক লিষ্ট-প্রণীত "স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিভাগের এক অধ্যায়।

দুনিয়ার সর্ব্বত্র এবং সকল যুগেই জনগণের বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র ও অধ্যবসায়ের উপর তাহাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি নির্ভর করে। কিন্তু স্বাধীনতা সুশাসন রাষ্ট্রশক্তি এবং জাতীয় ঐক্য না থাকিলে একমাত্র বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র ও অধ্যবসায়ের ফলে বিশেষ কোন উপকার হয় না।

ব্যক্তিগত চরিত্র এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা পরস্পর-সম্বদ্ধ। শাসনপ্রণালীর গুণে বা দোষে জনগণের চরিত্র উন্নত বা অবনত হয়। আবার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাবেও রাষ্ট্রশক্তির বৃদ্ধি ক্ষয় দেখা যায়। ইতালীয় এবং হান্সা-পরিষদের নগরসংবায়সমূহ, ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড, এবং ফ্রান্স ও আমেরিকা সর্ব্বত্রই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই-সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রভাবে এবং শাসনপ্রণালীর গুণে জনগণের কর্ম্মশক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইতে পারিয়াছে—তাহার ফলে সমাজে ধনসম্পদ বাড়িয়াছে। আবার ধন সম্পদ বৃদ্ধির ফলেও জনগণ অধিকতর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রশক্তির পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ইংরেজজাতি যেদিন হইতে যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিল সেইদিন হইতে তাহাদের লক্ষ্মীলাভ আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে স্বাধীনতা হারাইবার পরক্ষণ হইতেই ভেনিস, হান্সানগরপুঞ্জ, স্পেন ও পর্ত্তুগালের ধনসম্পদ ক্ষীণ হইতে শুরু হয়। স্বাধীনতার অভাব হইলে কোন জাতি অশেষ চরিত্রবলসত্ত্বেও জগতে সমৃদ্ধ হইতে পারে না। রাষ্ট্রের মুখ্য অথবা গৌণ সাহায্য পাইলেই জনগণ তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্রবল ও অধ্যবসায় প্রয়োগপূর্ব্বক লাভবান হইতে পারে।

সমুদ্রাভিযান, নৌশিল্প এবং অর্ণবপোতের ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজকর্ম্মের কথা ধরা যাউক। নৌচালন-কার্য্যে যত সাহস, শারীরিক শক্তি, চিত্তের দৃঢ়তা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং কর্ম্মক্ষমতা আবশ্যক হয় অন্য কোন কার্য্যে তত হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু এই-সকল গুণ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতির জনগণের ভিতর বিকশিত হয় না, একমাত্র স্বাধীনতার আব্‌হাওয়াতেই সমুদ্রতরঙ্গকে ভ্রূক্ষেপ না করিবার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা জন্মিতে পারে। নাবিকগণের ভিতর মূর্খতা, কুসংস্কার, আলস্য, ভীরুতা, স্ত্রৈণ স্বভাব এবং দুর্ব্বলতা থাকিলে তাহাদের পক্ষে জাহাজ চালনা একপ্রকার অসম্ভব। স্বাবলম্বন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতাই এইরূপ জীবনযাপনের পক্ষে জনগণকে বিশেষরূপে উপযুক্ত করিয়া তোলে। এইজন্যই কোন পরাধীন জাতিকে অর্ণববাণিজ্যশীল, নৌশক্তিসম্পন্ন, এবং সমুদ্রজীবনে সুপটু দেখিতে পাইবে না। তাহাদের ভিতর এই-সকল গুণের নিতান্ত অভাব। হিন্দু, চীনা এবং জাপানী জাতিরা খালে ও নদীতে নৌকা চালাইতে পারিত মাত্র। খুব জোর তাহারা সমুদ্রের কূলে কূলে তরণী ভাসাইয়া যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিল। কিন্তু উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসাগরে চলাফেরা করিবার সাহস তাহাদের ছিল না। প্রাচীন মিশরেও সমুদ্রযাত্রা একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল। পুরোহিত এবং শাসনকর্ত্তাদিগের ভয় হইত পাছে জনগণ সমুদ্রজীবনে কঠোরতা ও স্বাধীনতা শিক্ষা করিয়া পরে সমাজের ভিতর নানাপ্রকার স্বাধীন আন্দোলন ও বিপ্লবের সূত্রপাত করে। অথচ প্রাচীন গ্রীসে কি দেখিতে পাই? সেখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও শিক্ষা সভ্যতার লীলানিকেতন ছিল। সমুদ্রপ্রতাপও তাহাদের প্রত্যেকেরই চূড়ান্ত ছিল। গ্রীকজাতির স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের সাগরাধিপত্যও বিলীন হইয়া গেল। পরবর্ত্তী যুগে ম্যাসিডনরাজবংশ গ্রীক রাষ্ট্রগুলি ধ্বংস করিয়া নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। স্থলপথে এই সম্রাটগণের প্রতাপ বিশেষ প্রবলই হইতে পারিয়াছিল—কিন্তু সমুদ্রব্যবহারে তাঁহারা নিতান্ত নগণ্য ছিলেন। পরাধীনতার যুগে গ্রীকজাতি সমুদ্রজ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছিল। রোমীয়েরাই বা কতদিন অর্ণবযান ব্যবহারে দক্ষতা দেখাইতে পারিয়াছিল? কখন হইতেই বা তাহাদের জাহাজ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার পরিচয় পাই না? ভূমধ্যসাগরে ইতালীর প্রতাপ কোন্ যুগে ছিল? কখনই বা ইতালীয়গণের হস্ত হইতে এমন কি সমুদ্রোপকূল-বাণিজ্যও বিদেশীগণের আয়ত্ত হয়? ধর্ম্ম-নির্য্যাতন-নীতি

অবলম্বনপূর্ব্বক স্পেনরাজগণ দেশীয় জনগণের সকলপ্রকার শক্তি ও সাহস খর্ব্ব করিয়া ফেলে। তখন হইতেই তাহাদের নৌচালন ও অর্ণববাণিজ্য মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়। পরে ইংরেজ ও ওলন্দাজ রণতরীসমূহ স্পেনিশ রণতরীর চরম অধোগতি সাধিত করে। হ্যান্সা-পরিষদেরও এই অবস্থা। যখন হইতে ব্যবসায়ী ও ধনী সম্প্রদায় নগররাষ্ট্র-সমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব সুরু করিল, তখন হইতে জনগণের স্বাধীনতা তেজস্বিতা ও সাহসিকতা বিদায় গ্রহণ করিল। তৎসঙ্গেই হ্যান্সা-নগর-সমবায় অর্ণববাণিজ্যে অবনত হইতে থাকিল। ওলন্দাজজাতির স্বাধীনতালাভ ব্যাপারটাই বুঝা যাউক। প্রথমে এই জাতির অর্দ্ধাংশ মাত্র স্বাধীন হইতে পারে—অপরার্দ্ধ স্পেনসাম্রাজ্যের দাসত্ব ছিন্ন করিতে পারে নাই। কোন্ অর্দ্ধ স্বাধীন হইয়াছিল? যে অঞ্চলের অধিবাসিগণ সর্ব্বদা সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। সমুদ্রের আব্‌হাওয়ায় বাস করায় চিত্ত আপনা-আপনিই স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল ও প্রস্তুত হয়। এদিকে ওলন্দাজ জাতির যে অর্দ্ধ স্পেনের অধীনে থাকিয়া গেল তাহার অত্যধিক দুরবস্থা ঘটিল। এমন কি নদীপথে নৌচালন এবং বাণিজ্যনির্ব্বাহও তাহাদের বন্ধ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে ইংরেজেরা স্বাধীনতা ও সাহসিকতার প্রভাবে সমুদ্রবাণিজ্য অধিকার করিয়া নৌবল-সমন্বিত হইয়া রহিয়াছে। পরে ইংরেজ সাগরের যুদ্ধে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ওলন্দাজগণকে পরাজিত করিয়া নিলাতী রাষ্ট্রসাগরাধিপত্য লাভ করিল। তথাপি ওলন্দাজ জাতির সমুদ্রপ্রতাপ পূরাপূরি নষ্ট হইয়া গেল না। কিন্তু স্পেন ও পর্ত্তুগালের এক্ষণে সমুদ্রে কোন অধিকারই নাই বলা যাইতে পারে। স্বাধীনতায় ও পরাধীনতায় এই প্রভেদ। ফ্রান্সেও দেখিতে পাই কুশাসনপ্রিয় যথেচ্ছাচারী স্বাধীনতানাশক সম্রাটের আমলে শতচেষ্টা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সচিবগণ সমুদ্র-বাণিজ্য এবং নৌশক্তির ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ আজ দেখিতেছি ফরাসীদের নৌবল এবং অর্ণব-প্রতাপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ইয়াঙ্কি-স্থানের দৃষ্টান্তও এইরূপ। যেদিন ইয়াঙ্কিরা ইংরেজকে পরাজিত করিয়া স্বাধীনতারত্ন লাভ করিল সেইদিন হইতেই তাহারা নৌবলের অধিকারী হইয়াছে। এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ রণতরীর সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করিতে ইয়াঙ্কির রাষ্ট্র পশ্চাৎপদ নন।

জনগণের সাগরশক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রশাসন-প্রণালীর প্রভাব দেখিলাম। স্বাধীনতা ও শাসনপ্রণালীর উপর অর্ণববাণিজ্য এবং সমুদ্রযাত্রার প্রভাবও বুঝা গেল। অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসায় এবং এমন কি কৃষিকার্য্য সম্বন্ধেও এই-সকল কথা প্রযোজ্য। শিল্পকর্ম্মের বৃত্তান্ত আলোচনা করা যাউক। সমুদ্র-বাণিজ্যের ন্যায় শিল্পকর্ম্মও স্বাধীনতা ও সুশাসনের অভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। কোন কালে কোন পরাধীন জাতি শিল্পে সমৃদ্ধিলাভ করিয়া ধনসম্পদ্‌বান্ হইতে পারিয়াছে কি? ইতিহাস উত্তর দিতেছে—"না।" স্বাধীনতা নাই অথচ লক্ষ্মীলাভ হইতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত কেহ কখনও পাইবে না। কোন দেশে একবার শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইলে তাহার সুফল একসঙ্গে নানা বিভাগে দেখা যায়। প্রথমতঃ গমনাগমনের জন্য ভাল রাস্তা নির্ম্মিত হইতে থাকে। নদীপথে নৌব্যবহারের সুব্যবস্থা হয়। বাষ্পচালিত তরণী প্রচলিত হইয়া যায়। রেলপথও প্রস্তুত হইতে থাকে। বৈষয়িক ও আর্থিক শ্রী সর্ব্বত্রই ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যে সমাজে স্বাধীনতা নাই সেই সমাজে শিল্পের বীজই উপ্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতার অভাবে কত দেশের শিল্প ধ্বংস হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। যে জনপদে স্বাধীনতা নাই সেই জনপদ হইতে লক্ষ্মী বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আবার যে জনপদে স্বাধীনতা আছে লক্ষ্মী সেই জনপদে আশ্রয় লইয়াছেন। ইয়োরোপীয় জনপদসমূহে চঞ্চলা লক্ষ্মীর এইরূপ গতিবিধির সংবাদ ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এক নগর ছাড়িয়া শিল্প এবং শিল্পী অন্য নগরে গমন করিয়াছে। এক প্রদেশ ছাড়িয়া বাণিজ্য এবং বণিক অন্য প্রদেশে গমন করিয়াছে। লোকেরা কি সাধ করিয়া দেশ-ত্যাগী হয়? নানা অত্যাচার ও নির্য্যাতনের দৌরাত্ম্যে গুণী শিল্পী ও মহাজনগণ বিদেশের প্রজা হইতে বাধ্য হইয়াছে। গ্রীস ও এশিয়া হইতে গুণী লোকে ইতালীতে পলাইয়া আসে। ইতালী হইতে বহুব্যক্তি জার্ম্মানী, ফ্ল্যাণ্ডার্স ও ব্র্যাব্যান্টে আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার হল্যাণ্ড হইতেও অগণিত লোক ইংল্যাণ্ডের শরণাপন্ন হয়। এইরূপে

"একস্য সর্ব্বনাশঃ, অন্যস্য তু পৌষমাসঃ," ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই জুলুম ও যথেচ্ছাচার শিল্পনাশ ও বাণিজ্যধ্বংসের কারণ, আবার স্বাধীনতা'ও প্রজারঞ্জন শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্যসৃষ্টির কারণ। ইয়োরোপীয় রাজরাজড়ারা যদি বেকুব ও অত্যাচারী না হইতেন তাহা হইলে ইংরেজ-সমাজের বরাতে সম্পদ লেখা হইত না।

একজাতির কপাল ভাল বলিয়া কি অপর জাতি তাহার মত অদৃষ্টের লিখন, সৌভাগ্যের উদয়, শুভক্ষণ ইত্যাদির চর্চ্চা করিতে সময় কাটাইবে? অন্য দেশের লোকেরা কবে বেকুবি করিবে তাহার ফলে আমরা লাভবান্ হইবে—এইরূপ আশা করিয়া কি কাহারও বসিয়া থাকা উচিত? সকলেই জানেন যে, হাওয়ায় উড়িয়া বহুবীজ দুনিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। এই উপায়ে কতশত মরুপ্রান্তরও সুফলা শস্যভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আজ যেখানে তরুলতার চিহ্নমাত্র নাই প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে অল্পকালের ভিতরেই সেখানে হয়ত গহনকানন সৃষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু তাহা বলিয়া কি কোন মালী বা উদ্যানরক্ষক বা বনভূমির অধিকারী অলসভাবে বায়ুর গতি নিরীক্ষণ করিবে মাত্র? কবে বাতাস বীজসমূহ তাহার ভূমিতে আনিয়া ফেলিবে তাহার প্রতীক্ষা করাই কি তাহার কর্ত্তব্য? সকলেই বলিবেন "না"। তাহার যত্নে ও চেষ্টায় অল্পকালের ভিতরেই উদ্যান বা জঙ্গল রচিত হইতে পারে। প্রকৃতির কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাহার নিষ্কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। কোনো দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্যও সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া দেশের রাষ্ট্রবীরগণের নিষ্কর্ম্মা ভাবে বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। অন্য জাতিরা বেকুবি করিয়া তাহাদের লোকজনকে নির্ব্বাসিত করুক, বা না করুক, আমরা কেন দুনিয়ার নানাস্থান হইতে নানাগুণবিভূষিত নরনারীকে আমাদের দেশে অন্নবস্ত্রের সাহায্য দিয়া ডাকিয়া আনিব না? তাহাদের স্বদেশে এই-সকল গুণী লোক যে-সমুদয় সুবিধা ভোগ করে, তাহা অপেক্ষা সুখময় জীবনযাপনের আশা পাইলে তাহারা এ দেশেই বাস্তুভিটা স্থাপন করিবে না কে বলিল? ইতিহাস বলিতেছে—"এইরূপ সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবেই বহু ক্ষুদ্র ও শিশুজাতি উন্নত হইয়াছে। সমাজের কর্ণধারেরা বিচক্ষণ হইলে অল্পকালের ভিতরেই তাঁহারা স্বদেশের আকৃতি ফিরাইয়া দিতে পারেন। অসম্ভবও এই উপায়ে সম্ভব হইয়া উঠে।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর অথবা নগর-সমবায় সুবিস্তৃত প্রদেশ রাজ্য ও সাম্রাজ্য অপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ কি উপায়ে হইতে পারিত? সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক নানা গুণিজনকে অর্থসাহায্য ও বহুবিধ সুযোগ প্রদান করিয়া রাষ্ট্রবীরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্যবিকাশে সমর্থ হইতেন। ভেনিস, হান্সানগরপুঞ্জ, বেলজিয়াম, এবং হল্যাণ্ড প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ "সুযোগপ্রদাননীতির" ব্যবহার দেখিতে পাই।

এই-সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রভাব অন্য একদিক হইতেও লক্ষ্য করা আবশ্যক। সুবিস্তৃত রাজ্য ও সাম্রাজ্যসমূহ এই রাষ্ট্রপুঞ্জের বাজারস্বরূপ ছিল। এই-সকল দেশ হইতে কৃষিজাত উপকরণ নগররাষ্ট্রে আমদানি করা হইত—এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির শিল্পজাত দ্রব্য সুবিস্তৃত জনপদে রপ্তানি করা হইত। উভয়ের মধ্যে অবাধবাণিজ্যের নিয়ম-অনুসারে ব্যবসায় চলিত। এক জনপদ অন্য জনপদের বিরুদ্ধে বয়কট বা বহিষ্কার ঘোষণা করিত না। এই অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে দেশ-রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যসমূহের উপকারই সাধিত হইয়াছে। বরং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের শিল্পকেন্দ্রে তাহারা প্রাকৃতিক উপকরণসমূহ অবাধে পাঠাইতে না পারিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইত, জনগণের কার্য্যশক্তি উৎসাহ এবং অধ্যবসায় বৃদ্ধি পাইত না, এবং জাতীয় ক্ষমতা ও সভ্যতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইত না।

ইংরেজেরা এই প্রণালীতে ইতালীয়নগর, হান্সা-পরিষৎ এবং ওলন্দাজ জাতির সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া সভ্যতা ও ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করে। ক্রমশঃ দেশ-রাষ্ট্রের কর্ত্তারা বুঝিলেন যে, "একমাত্র কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশী শিল্প-কেন্দ্রে পাঠাইয়া চরম উন্নতিলাভ করা যায় না। তাহার জন্য স্বদেশেই শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া তোলা আবশ্যক এবং স্বদেশী বাণিজ্য প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।" তাঁহারা দেখিলেন যে, "নবপ্রতিষ্ঠিত স্বদেশী কারবারগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন বিদেশী কারবারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারে না। তাহার জন্য স্বদেশী শিল্প-

কেন্দ্রগুলিকে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ দেওয়া আবশ্যক—এবং বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যগুলিকে বয়কট করা কর্ত্তব্য। সেইরূপ স্বদেশী ধীবরগণের আরব্ধ মৎস্যপালন ব্যবসায় এবং নৌচালন-কার্য্যকে বিদেশী নাবিক ও মৎস্যপালকগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বিশেষভাবে রক্ষা করা আবশ্যক। অধিকন্তু স্বদেশী বণিক ও ব্যবসায়িগণের বাণিজ্যবুদ্ধি কার্য্যক্ষমতা এবং মূলধন প্রয়োগের শক্তি প্রবীণ বিদেশী মহাজনগণের তুলনায় নগণ্য মাত্র। সুতরাং দেশী ব্যবসায়িগণকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য রাষ্ট্র হইতে বিশেষ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।" এইরূপ বুঝিয়া তাঁহারা বিভিন্ন বিদেশ হইতে গুণী, ধনী, শিল্পী, কারিগর, নাবিক, বণিক ইত্যাদি শ্রেণীর জনগণকে স্বদেশে আমদানি করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এইজন্য প্রচুর অর্থব্যয় এবং ক্ষতিস্বীকার করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইলেন না। ইংরেজসমাজে এই নীতির প্রবর্ত্তন আমরা বিশেষভাবে দেখিতে পাই।

ইংলণ্ডে ষষ্ঠ এডোয়ার্ড এবং এলিজাবেথের আমলে, বিশেষতঃ বিপ্লবযুগে, এই সংরক্ষণ-নীতি নিয়মিতরূপে প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু অরাজকতা, গৃহবিবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ, অন্যায় আইন, রাজগণের মূর্খতা ইত্যাদি বশতঃ এই নীতির সুফল ফলিতে পারে নাই। তৃতীয় এডোয়ার্ড সুপথেই চলিতেছিলেন, ষষ্ঠ হেন্‌রি প্রচার করিলেন—"দেশের এক জেলা হইতে অন্য জেলায় শস্য পাঠান হইবে না! বিদেশে পাঠান ত দূরের কথা!" সপ্তম ও অষ্টম হেন্‌রির আইনে টাকার উপর সুদ গ্রহণ করা জঘন্য ব্যবসায় বিবেচিত হইত। এমন কি সেই সময়ে পশমীদ্রব্যের মূল্য রাষ্ট্র হইতে নিম্নতম হারে নির্দ্ধারিত করা হইত, এবং মেষপালন বন্ধ করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা চলিত! অষ্টম হেন্‌রি ভাবিতেন—শস্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে দেশের ক্ষতি হইবে। তিনি আর-একটা বেকুবি করিয়াছিলেন। তাঁহার আইনে বহুসংখ্যক বিদেশী শিল্পী বিলাত হইতে নির্ব্বাসিত হয়। সপ্তম হেন্‌রিও একটা ভুল করিয়াছিলেন। পার্লামেণ্ট তাঁহাকে স্বদেশী জাহাজ সংরক্ষণ করিবার জন্য আবেদন করেন—কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। যাহা-হউক ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের পর হইতে ইংরেজসমাজের কর্ত্তারা বাণিজ্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার ভুল করেন নাই।

বিলাতে বহুশতাব্দব্যাপী প্রয়াসের ফলে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য ও নৌশক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। ফরাসীসমাজে এই-সমুদয়ই একজন প্রতিভাবান রাষ্ট্রনায়কের উদ্যোগে কয়েক বৎসরের ভিতর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। যেন একজন যাদুকর তাহার যষ্টি ঘুরাইয়া দেশের মধ্যে শিল্প বাণিজ্য অর্ণবযান গড়িয়া তুলিল। কিন্তু পলকের ভিতরেই আবার ধর্ম্মে গোঁড়ামি এবং কুশাসনের ফলে সেই-সমুদয় লুপ্ত হইয়া যায়।

চারিদিককার জাতিপুঞ্জ সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্ত্তন করিলে কোন জাতি তাহার অবাধ বাণিজ্যনীতি ফলবতী করিতে পারে না। হ্যান্সাপরিষৎ অবাধ বাণিজ্যনীতি চাহিত, ওলন্দাজেরাও এই নীতির পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উভয় রাষ্ট্রই বিদেশীদ্রব্য বয়কট করিয়া স্বদেশী-আন্দোলন সুরু করিলেন। কাজেই হ্যান্সা ও হল্যাণ্ড এই-সকল দেশে মাল পাঠাইতে পারিল না—অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

সংরক্ষণ-নীতি সম্বন্ধে দুইটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ কেবলমাত্র এই নীতির জোরেই যেখানে-সেখানে সোনা ফলান যায় না, এবং 'না'কে 'হাঁ' করা যায় না। দেশের সমাজ এবং শাসনপ্রণালী স্বদেশী-আন্দোলনের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই সুফল ফলিতে পারে। স্বদেশী-আন্দোলন সংরক্ষণ-নীতি এবং বিদেশীবর্জ্জন সত্ত্বেও ভেনিস অবনত হইল, স্পেন ও পর্ত্তুগাল অবসন্ন হইল, ফ্রান্স ন্যান্টেস্-বিধি রদ করিয়া অধোগতির চরমসীমায় উপস্থিত হইল। কিন্তু বিলাতে স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে স্বাধীনতা সুশাসন এবং শিক্ষা-প্রচার অগ্রসর হইয়াছে। এইজন্য বিদেশীবর্জ্জন ও স্বদেশী সংরক্ষণের সকল সুফল ইংরেজসমাজে দেখিতে পাই।

দ্বিতীয়তঃ, সংরক্ষণ-নীতি এবং স্বদেশী-আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে সমাজের জীবনদাতা-স্বরূপ। চূড়ান্ত সভ্যতা এবং জ্ঞানবিজ্ঞান সত্ত্বেও এই নীতির অভাবে সমাজ অবনত থাকিতে পারে। ইয়াঙ্কিস্থানের ইতিহাসে এইরূপ দেখিয়াছি। বর্ত্তমান জার্ম্মানির দুরবস্থাও এইজন্যই দেখিতে পাই।

জার্ম্মানেরা বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য ছিল। তাহাদের শিল্পীরা বিদেশী শিল্পিগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইত। এদিকে বিদেশেও কোনপ্রকার মাল পাঠাইবার সুযোগ তাহাদের ছিল না। অথচ জার্ম্মানজাতির বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্রবল কি কম? একমাত্র বাণিজ্য-নীতির অভাবে জার্ম্মানেরা ইউরোপের নিতান্ত ঘৃণিতজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ইংরেজ জার্ম্মানিকে তাহাদের একটা বিজিত উপনিবেশ স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারিত। কিন্তু পূর্ব্বতন যুগে জার্ম্মানির হ্যান্সাপরিষৎই বিলাতকে একটা উপনিবেশ ও বাজার মাত্র রূপে বিবেচনা করিত। অবশেষে সম্প্রতি জার্ম্মানদের চোখ ফুটিয়াছে—তাহারা স্বদেশী-আন্দোলনের জন্য ব্রতবদ্ধ হইয়া একটা সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। এই নীতি প্রবর্ত্তন না করিলে জার্ম্মানদের দুর্গতি আরও ঘটিত।

ইয়াঙ্কিস্থানের রাষ্ট্রসমূহও প্রথম প্রথম অবাধ বাণিজ্য-নীতির ধুয়া ধরিয়া কার্য্য করিত। বিদেশ হইতে মাল ক্রয় করা তাহাদের অভ্যাস ছিল। পরে ইংলণ্ডের সঙ্গে দুইবার যুদ্ধ বাধে। দুইবারই স্বদেশে শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠে—তাহাতে ইয়াঙ্কিসমাজের উপকার যথেষ্ট হয়। কিন্তু দুই যুদ্ধের অবসানেই দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ ইয়াঙ্কিরা স্বদেশী আন্দোলন বর্জ্জন করিয়া আবার বিলাতী মাল ক্রয় করিতে অগ্রসর হয়। দুইবারই চূড়ান্ত কুফল দেখা যায়। অবশেষে ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্র বুঝিয়াছেন যে, দুনিয়ায় আত্মপর-ভেদ বুঝিয়াই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। সুতরাং স্বদেশী জনগণের স্বার্থসিদ্ধি করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। আত্মশক্তির বিকাশ না করিলে দুনিয়ায় কোন জাতির স্থান থাকে না।

ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে বুঝিলাম যে, সংরক্ষণ-নীতি ও স্বদেশী-আন্দোলন কোন জাতিবিশেষ বা পণ্ডিত-বিশেষের "বাতিক" মাত্র নয়। দুনিয়ার জাতিগণের স্বার্থ বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী। প্রত্যেকেই জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চাহে। এইজন্য বিবাদবিসম্বাদ যুদ্ধবিগ্রহ পৃথিবীতে লাগিয়াই আছে। কাজেই প্রত্যেকে অপরাপর জাতি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট। সংরক্ষণ-নীতি এই আত্মরক্ষার অন্যতম যন্ত্রস্বরূপ। সুতরাং জগতে যতদিন পর্য্যন্ত জাতিতে জাতিতে রেষারেষি আছে ততদিন পর্য্যন্ত বিদেশী-বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলন থাকিবেই। যদি কোন দূর-ভবিষ্যতে দুনিয়ার সকল জাতি সম্মিলিত হইয়া এক অখণ্ড বিশ্বমানব-রাষ্ট্র গঠন করে তখন স্বদেশী বিদেশী প্রভেদ এবং সংরক্ষণ-নীতি ও অবাধবাণিজ্য-নীতির প্রভেদ থাকিবে না। অতএব যাহারা শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে স্বদেশী বিদেশীর প্রভেদ তুলিয়া দিতে চাহেন তাঁহারা সঙ্গে-সঙ্গে জাতিতে জাতিতে রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হউন।

দুনিয়ার সকল জাতিই সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বকীয় স্বার্থ পুষ্ট করিতেছে—অথচ কোন এক জাতি হয়ত একাকী অবাধবাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তন করিল। তাহাতে মানবজাতির কোন উপকারই হয় না- কেবল সেই বেকুব জাতিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগাল এইরূপ বেকুবি করিয়াছিল—১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স এইরূপ করিয়াছিল—১৭৮৬ এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কিস্থান এইরূপ করিয়াছিল—১৮১৫ হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুশিয়াও এইরূপ করিয়াছিল। এই-সকল বেকুবির কুফল যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন বিলাত লাভবান হইয়াছিল।

ইতালীয়েরা ফরাসী রাষ্ট্রবীর কল্‌বার্টকে সংরক্ষণ-নীতির প্রথম প্রবর্ত্তক বিবেচনা করে। তাহারা এই নীতিকে কলবার্টনীতি বলিয়া জানে। প্রকৃত পক্ষে, কল্‌বার্টের বহুপূর্ব্বে ইংরেজেরাই এই ব্যবসায়নীতি উদ্ভাবন করিয়াছিল। কল্‌বার্ট এই নীতি অবলম্বন করিয়া স্বদেশের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নরপতির দুর্ব্বুদ্ধিতা এবং স্বেচ্ছাচার না থাকিলে কল্‌বার্টের চেষ্টা ফলবতী হইত। তাহা হইলে ফ্রান্সের কৃষি শিল্প বাণিজ্য নৌবল সকলই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভিতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। ফরাসী-বিপ্লব উপস্থিত হইত না—এবং সকল বিষয়ে ইংরেজের সঙ্গে ফরাসীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতে পারিত।

আর একটা কথা বলিয়া উপসংহার করিব। যেসকল দেশে প্রকৃতি মুক্ত হস্তে নানাবিধ উপকরণ দান করিয়াছেন সেই-সকল দেশের নায়কগণ চিরকাল একই নীতির বশ-বর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন না। তাঁহারা অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। প্রথম অবস্থায় সমীপবর্ত্তী কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে অবাধ-

বাণিজ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাঁহাদের স্বার্থ থাকে। স্বদেশের কৃষিজাত উপকরণ বিদেশে রপ্তানি করা এবং বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্য স্বদেশে আমদানি করা তাঁহাদের লক্ষ্য হয়। এই নীতির প্রভাবে কৃষিকার্য্য উন্নতিলাভ করে, এবং সমগ্র সমাজ সভ্যতার প্রথম স্তরে পদার্পণ করে। দ্বিতীয় অবস্থায় স্বদেশে শিল্প মৎস্যপালন নৌচালন এবং অর্ণববাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। এইজন্য বিদেশী শিল্পী ধীবর নাবিক বণিক ইত্যাদি জনগণের প্রতিযোগিতা হইতে স্বদেশের জনগণকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। ইহা বিদেশী-বয়কট এবং স্বদেশী-সংরক্ষণ, এক কথায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। তৃতীয় অবস্থায় প্রত্যেক জাতি আবার অবাধবাণিজ্য চাহে। তখন শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে চরম উন্নতিলাভ হইয়াছে। কাজেই শিশুজাতিগণের প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নাই। বরং এই যুগে বিদেশীগণের প্রতিযোগিতা না থাকিলে স্বদেশী শিল্পী ও বণিকেরা অলস ও অপটু হইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে জগতের শীর্ষস্থান হইতে নামিয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। বর্ত্তমান কালে নেপল্‌স্ পর্ত্তুগাল এবং স্পেন প্রথম অবস্থায় রহিয়াছে। জার্ম্মানি এবং ইয়াঙ্কিস্থান দ্বিতীয় অবস্থায় রহিয়াছে। ফ্রান্স প্রায় তৃতীয় অবস্থায় পদার্পণ করিতে চলিল। ইংল্যাণ্ডই একাকী এক্ষণে সেই লোভনীয় পদ ভোগ করিতেছে। ইংরেজেরাই দুনিয়ার বাজারে হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

অধিকার

কাণারে দেখালে ছবি দেখে না বাহার,
কালারে শুনালে গান কষ্ট শুধু সার ;
বিড়ালে দিলে গো বীণা ছিঁড়ে ফেলে তার,
বাদরে দিলে গো ফুল করে ছারখার ;
এ জগতে জ্ঞানীজন তাই বলে সার—
ভোগেরও ক্ষমতা চাহি, চাহি অধিকার।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

দুই তার

(২৯)

আজ জমিদারের মাতৃশ্রাদ্ধ। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের পীড়ন করিয়া সংগৃহীত অর্থে সমারোহের আয়োজন বেশ রীতিমতই হইয়াছে। আশেপাশের সমস্ত জমিদার সদলবলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, সমস্ত পণ্ডিতসমাজ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, কেবল নিমন্ত্রিত হয় নাই যাহারা এই সমারোহ করিবার অর্থ জোগাইয়াছে তাহারা, যাহাদের মুখের গ্রাস জমিদারকে দিয়া নিজের ঘরে অন্নাভাব ঘটিয়াছে তাহারা। রূপার যোড়শ দিয়া পণ্ডিত বিদায়, জমিদারদের মর্য্যাদারক্ষা বিধিমত রকমেই হইয়াছে ; পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জ্জন যদি হয় তবে সে কাজ কে না করে ? কলিকাতা হইতে পান্না কীর্ত্তনওয়ালীকে অনেক টাকা দিয়া আনা হইয়াছে—মাতার শ্রাদ্ধের সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য !

পান্না মোটা শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেরা গলায় নাকী সুরে মাথুর গাহিয়া করুণরসের উত্তেজনায় শ্রোতাদের মনে কৃত্রিম শোক সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

গুণময়ের ভাবী জামাতা রসময়-বাবু আসরে বসিয়া গান শুনিতেছে, কিন্তু তাহার মনে যে শোকের ছাপ একটুও পড়িতেছিল তাহা মনে হয় না ; কারণ সে তাহার রেশমী রুমালে টাকা বাঁধিয়া বাঁধিয়া কীর্ত্তনওয়ালীকে ছুড়িয়া ছুড়িয়া পেলা দিতেছিল, আর নিজের পাশে ভাবী পত্নী মায়াকে বসাইয়া তাহার সহিত নানা ছেলেমানুষী রঙ্গ করিয়া তাহার সহিত ভাব করিবার ও তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিতেছিল ; মায়া মুখ টিপিয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া ছিল, রসময়ের রসিকতায় না হাসিতেছিল, না কোনো কথার জবাব দিতেছিল, আর রসময় তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে যতবার কোলের কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেছিল ততবারই মায়া পিঠমোড়া দিয়া রসময়ের হাত সরাইয়া ফেলিতেছিল।

গুণময়ও ঘন ঘন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন চিকের পর্দ্দার দিকে। কিন্তু বাড়ীতে যত মেয়ে ছিল সবাই কীর্ত্তন

শুনিতে আসিয়াছিল, আসেন নাই শয্যাগত দয়াদেবী ও তাঁহাকে একলা ফেলিয়া রাজবালা।

আজ সমস্ত দিন কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাতে গুণময় একবারও রাজবালার সাক্ষাৎ পান নাই। সন্ধ্যার পর তিনি রাজ বালার সন্ধানে অন্দরে গিয়া এঘরে সে-ঘরে উঁকি মারিয়া মারিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া রাজবালার মা বলিলেন—তুমি একবার ছাতে যাও বাবা।

ছাতে মেয়েদের খাওয়ানো হইয়াছে—সিঁড়ির ঘরে ভাঁড়ার হইয়াছিল। সেখানে, কি কি খাবার জিনিস উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িয়া আছে তাহাই দেখিয়া গুছাইয়া নামাইয়া আনিবার জন্ম রাজবালা ছাতে গিয়াছিল। গুণময় পা টিপিয়া-টিপিয়া ছাতে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন রাজবালা দরজার গোড়ায় পিছন ফিরিয়া বসিয়া থালায় পরাতে বারকোষে ছড়ানো সন্দেশগুলি একত্র করিয়া সাজাইতেছে। গুণময় সন্তর্পণে ঝুঁকিয়া দুই হাতে রাজবালার চোখ টিপিয়া ধরিলেন। হাতের স্পর্শেই রাজবালা বুঝিতে পারিল সে কে। সে টপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া গুণময়ের হাত ছাড়াইয়া চকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল। গুণময়ও তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিলেন। মেয়েদের পরিবেষণ করিবার সময় সিঁড়িতে ডাল তরকারী পড়িয়াছিল; অন্ধকারে তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া তাহার উপর পা দিতেই গুণময়ের পা পিছলাইয়া গেল এবং মোটা শরীরের টাল সামলাইতে না পারিয়া তিনি পড়িয়া গেলেন ও ধাপে ধাপে গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া রাজবালা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া যখন গুণময়কে ধরিল তখন তিনি সিঁড়ির নীচে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ও অজ্ঞান হইয়া গোঁ-গোঁ করিতেছেন। রাজবালা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না; তখন সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—মোহিনী মোহিনী, শিগগির চতুরকে ডাক, জামাইদাদা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন!

এই কথা শুনিয়া সকলের আগে রাজবালার মা কপালে চড় মারিতে-মারিতে সেখানে দৌড়াইয়া আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—ওলো সর্ব্বনাশী, নিজের হাতে পতি-হত্যে করলি! ওগো বাবাগো! কী সর্ব্বনাশ হলো গো! ওরে কে কোথায় আছিস ছুটে আয়! ওরে একজন ছুটে ডাক্তারকে ডেকে আন! কেউ পাঁচুকে খবর দে! দয়া মরেও যখন মরছে না তখনি জানি একটা কিছু সর্ব্বনাশ হবে!......

রাজবালা বলিল—মা, তোমার চেঁচানি থামিয়ে একঘটী জল আনো দেখি চট করে।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়াও গুণময়ের চৈতন্ত হইল না; ঘাড় ভাঙিয়া পড়িতেছে, মুখে গাঁজলা ভাঙিতেছে। চাকরেরা ধরাধরি করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া গুণময়কে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল যে মাথায় ও পিঠের শিরদাঁড়ায় চোট লাগিয়াছে, পা মচকাইয়া গিয়াছে, পায়ে পিঠে সেক ও মালিশ করিতে হইবে, মাথায় ঔষধের পটি বসাইতে হইবে, কিছুদিন খুব সাবধানে অন্ধকার ঘরে শোয়াইয়া সেবা করিতে হইবে, দেহ ও মন যেন শান্ত নিরুপদ্রবে থাকে, ইত্যাদি।

রাজবালার কাজ বাড়িয়া গেল। এক রোগীর জায়গায় দুই রোগী হইল, এবং দুই পৃথক ঘরে। রাজবালার মা সমস্ত দিন কেবল বকিয়া বকিয়া বেড়ান, কোনো একটা কাজে যদি লাগেন। রাজবালা একাকী স্বেচ্ছায় দয়াদেবী ও গুণময়ের সেবার ভার লইয়াছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই; রোগীদের ঔষধ পথ্য সেবা শুশ্রূষা কিছুরই অনিয়ম ঘটিতে সে দ্যায় না।

গুণময়ের এখনো চৈতন্য হয় নাই; প্রবল জ্বর হইয়াছে, তিনি প্রলাপ বকিতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া বিছানা হাতড়াইয়া কেবল বলিতেছেন—রাজু কৈ? রাজু কৈ? রাজু, তুমি পালিয়ে যেয়ো না!

রাজবালা এখন গুণময়ের হাত এড়াইয়া আর পালায় না, সে গুণময়ের অন্বেষণব্যগ্র হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলে—জামাইদাদা, এই যে আমি তোমার কাছেই বসে আছি।

ইহা দেখিয়া রাজবালার মা খুশী হইয়া মনে মনে বল্লেন—ভগবান যা করেন সব মঙ্গলের জন্যেই। এই কাণ্ডটি হলো বলেই না জামাইএর ওপর রাজুর মায়া পড়ল! এখন অল্পে অল্পে জামাই সেরে উঠে দুহাত এক হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্দি হই!

রাজবালার মা রাজবালাকে গুণময়ের সেবা যত্ন করিতে দেখিলেই তাহাকে বলেন—মা মর আবাগী, সেই যত্ন আত্তি করছিস, জানিসও সব, তবে অমন হুড়কোপনা কোরে জামাইকে এই কষ্টটা দিলি কেন ?

রাজবালা এসব কথার কোনো জবাবই দিত না।

রাজবালা একদিন গুণময়ের ঘর হইতে দয়াদেবীর নিকটে আসিলে দয়াদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজু, উনি আজ কেমন আছেন ?

রাজবালা আনন্দিত স্বরে বলিল—আজকে জামাইদাদা একটু ভালো আছেন দিদি। আজকে আর প্রলাপ বক্‌ছেন না, ঘুমুচ্ছেন, ডাক্তার বলছে আজ জ্ঞান হবে।

—তাঁকে তুই একলা রেখে এলি কেন ? জ্ঞান হলেই ত তোকে খুঁজবেন।

রাজবালার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

দয়াদেবী তাহা দেখিয়া বলিলেন—আমার কাছে তুই লজ্জা করিসনে রাজু ! আমি তোকে যত জানছি ততই বুঝছি তোকে আমার অদেয় কিছুই নেই ; তুই ত আমার স্বামীকে কেড়ে নিচ্ছিসনে ; আমি যে খুসী মনে তোকে দিচ্ছি—তুই আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে আমার এয়োত রক্ষা করেছিস।

রাজবালা লজ্জিত নত মুখে বলিল—ও কি কথা দিদি ! ভুলে গেলে, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তোমার সতীন আমি কিছুতেই হব না !

দয়াদেবীর মনে পড়িল বীরেন্দ্রকে। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাজবালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া বলিলেন—রাজু, তোর মন যে কত বড় তা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি ! আমি বারবার তোকে ভুল বুঝছি।

(৩০)

চার-পাচ দিন পরে গুণময়ের যখন চেতনা হইল তখন রসময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল—আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের একটা পাকা কথা ঠিক করে যাবার জন্যে এখনো রয়েছি। আপনি ত হঠাৎ অসুখ কোরে বসলেন ; তারপর আপনার কালাশৌচ ; আপনার বিয়ে কবে হবে তার ত ঠিক নেই। আপনার মেয়ের বিয়ের দিন এই মাসেই একটা ঠিক্ করে ফেলুন ; নইলে বলুন আমি অন্যত্র চেষ্টা দেখি। .....

এমন সুপাত্র হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া অগত্যা গুণময় এই মাসেই মায়ার বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। তিনি এখন রাজবালাকে সর্ব্বদা কাছে পাইতেছেন ; তাহার সেবায় যত্নে পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন ; এখন তিনি যা-খুসী প্রণয়-বচন বা রসিকতা যখন-তখন রাজবালাকে শোনান, রাজবালা সেসব কথা শুনিতে পাইল বা শুনিয়া খুসী হইল এমন একটুও পরিচয় মুখের ভাবে না দিলেও সে যে বিরক্ত হইয়া তাঁহার কাছে হইতে পলাইয়া যায় না এই স্ফূর্ত্তিতেই তিনি মশগুল ছিলেন ; সুতরাং রাজবালাকে বিবাহ করিবার বিশেষ ত্বরা এখন তাঁহার মনের মধ্যে ছিল না।

মায়ার বিবাহের সমস্ত আয়োজনের ভার পঞ্চাননের উপরই পড়িল।

পঞ্চানন এতদিন শ্রাদ্ধের ও গুণময়ের পীড়ার গোলমালে প্রজাদের বিদ্রোহের দিকে মন দিতে পারে নাই, এইবার তাহার অবসর হইল। চিনিবাস ও ছিদাম আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে থাকো ঘাট মানিতে কিছুতেই স্বীকার না করাতে তাহাকে তাহারা বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহাতে খুসী হইয়া পঞ্চানন তাহাদের একশ টাকা জরিমানার বাবত মিথ্যা দেনার খতে পঞ্চাশ টাকা উশুল দিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখন সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না,—থাকোকে পুলিশে দিবে, না জমিদারী কাছারীর পাইক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনাইয়া নিজেই শাস্তি দিবে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, পাইক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিতে গেলে পতিত ও তাহার দলের সবাই বাধা দিবে নিশ্চয়, এবং সেই সূত্রে তাহাদের সকলকে ফৌজদারীতে জড়াইয়া ফেলিবার একটা বেশ ভালো-রকমের সুযোগ মিলিবে। পঞ্চানন ছুটাছুটি গুণময়কে মতলব জানাইয়া তাঁহার একটা মামুলি অনুমতি লইতে গেল।

পঞ্চানন গিয়া গুণময়ের বিছানার ধারে সবে বসিয়াছে, চতুর খানসামা আসিয়া খবর দিল—দারোগাবাবু বাবু-মশায় ও নায়েব-মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাচ্ছেন।

গুণময় বলিলেন—বাড়ীর দিককার্ ঐ দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দারোগাকে এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

দারোগা হংসেশ্বর আসিয়া গুণময়ের খাটের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া ঘরের আসবাব ও দেয়ালের ছবির উপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে গুণময়ের দিকে না চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছেন?

গুণময় ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—অনেকটা ভালো আছি, কোমরে আর পায়ে একটু বেদনা আছে আর মাথাটা তুফানের নৌকোর মতন টলটল করছে। বড় দুর্ব্বল করেছে!

হংসেশ্বর গুণময়ের দিকে ফিরিয়া একটু হাসিয়া বলিল—হুঁ! তা আর করবে না। কম ফাঁড়াটা গেল!...... হ্যাঁ আমি একটা খবর দিতে এসেছিলাম আপনাদের। পতিতমণ্ডল প্রভৃতি প্রায় পাঁচশ প্রজা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছে যে জমিদার তাদের ওপর খুব উৎপীড়ন করছে, এতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, জমিদার পুলিশকে হাত করবার চেষ্টা করছে, ইত্যাদি। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব আমাকে, কাৎলামারী থানার মুন্সী জহিরুদ্দীন দারোগাকে আর বাঁশজোড়া থানার গিরিশ খাস্তগীরকে রিপোর্ট পাঠাবার আর প্রজাদের ওপর যাতে জমিদারের লোক কোনো অত্যাচার উৎপীড়ন না করতে পারে তার দিকে নজর রাখতে হুকুম দিয়েছেন। আর কৈফিয়ৎ তলব করেছেন যে, শুনছি তোমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষে লোকের কষ্ট হচ্ছে, তোমরা কেন রিপোর্ট করনি। এইসব সম্বন্ধে আমি কি রিপোর্ট দেবো তারই একটা পরামর্শ করতে আপনাদের কাছে আমি এসেছি।

গুণময় নিতান্ত হাঁদারাম, তাহার উপর মাথায় চোট লাগিয়া বুদ্ধি একেবারে ঘোলাইয়া গিয়াছে। তাঁহার বুদ্ধির ঘট পঞ্চানন। গুণময় পঞ্চাননের মুখের দিকে চাহিলেন।

পঞ্চানন ধূর্ত্তের ধাড়ি। সে দুষ্টবুদ্ধির জোরেই করিয়া খাইতেছে। সে প্রভুর ইঙ্গিত আঁচে বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল—তার জন্তে আর ভাবনা কি? আমাদের তরফ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটা দরখাস্ত পড়ুক যে প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে, খাজনা আদায় দিচ্ছে না, ডিহির কাছারী লুট করবার আর দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবার ভয় দেখাচ্ছে; অতএব শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্তে ওদের মাতব্বরদের মুচলেকা নেওয়া হোক। তখন উভয়পক্ষের শুনানি হবে—আমাদের সাক্ষীর অভাব হবে না। ইতিমধ্যে আপনারা রিপোর্ট করে দিন, প্রজাদের উক্তি সম্পূর্ণ সর্ব্বৈব মিথ্যা, জমিদার বাকী বকেয়া আদায় করবার চেষ্টা করছেন, তা না-দেবার ফন্দীতে দুর্ভিক্ষের ওজুহাত তুলে তারাই বিদ্রোহ করছে এবং কয়েকজন গুণ্ডা মিলে এই সুযোগে লোক ক্ষেপিয়ে ডাকাতি করবার আয়োজন করছে। স্থানে স্থানে ফসল ভালো না হওয়াতে লোকের একটু অন্নকষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু জমিদার সেইসব জায়গায় চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন বোলে আমরা আর কোনো রিপোর্ট করিনি। ......আপনারা এই-রকম লিখে পাঠান, ইতিমধ্যে আমরাও দরখাস্ত পাঠাই, আর দু-চারটে ডিহি থেকে দুচার মণ চাল বিলি করবার ব্যবস্থা করে দি।

পঞ্চাননের প্যাঁচোয়া বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া গুণময়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল আর হংসেশ্বরের ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটা বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া কাঁকড়ার চোখের মতন মুখ ছাড়িয়া যেন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ।

এমনি যখন সকলের অবস্থা ঠিক তখনই বাড়ীর দিকের যে দরজা চতুর ভেজাইয়া দিয়া গিয়াছিল সেই দরজাটি ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল রাজবালা!

হংসেশ্বর দারোগার বিস্ফারিত চোখ দুটি ছিটকাইয়া সেই রূপের প্রতিমার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে চাহিল। হংসেশ্বর চেয়ার ঘড়ঘড় করিয়া পিছনে ঠেলিয়া লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। রাজবালা হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া আলো-আঁধারে বুঝিতে পারে নাই ঘরে অপর কেহ লোক আছে। হংসেশ্বরের অকস্মাৎ লম্ফে সে চকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মাত্র একটি মুহূর্ত্ত নিষ্কম্প মোমবাতির শিখার মতন সেই রূপসী হংসেশ্বরের বিস্মিত চোখের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই রূপশিখা নিবাইয়া দিয়া চলিয়া গেল—কিন্তু হংসেশ্বরের মনে জ্বালা ও কালি লাগাইয়া চোখে ধোঁয়ার অঞ্জন বুলাইয়া দিয়া গিয়াছিল। হংসেশ্বরের মনে হইতে লাগিল সেই তন্বী যেন একটি মাত্র চন্দ্ররশ্মি, কপাটের এতটুকু ছিদ্র দিয়া ঘরে

আসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ মিলাইয়া গেল। সে আপনার ইন্দ্রিয়কে আপনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, মানুষ কি এমন সুন্দর হয়!

দারোগা দাঁড়াইয়াই আছে দেখিয়া পঞ্চানন বলিল—বসুন দারোগাবাবু।

হংসেশ্বর যেন নিশিতে পাওয়া অবস্থার হঠাৎ জাগিয়া উঠিল এমনি ভাবে চমকিয়া বলিল—আর বসব না, আমি যাই।

—তা এ বিষয়ের মীমাংসা ঐ-রকমই ঠিক হবে ত।

—আমি এখন ঠিক বুঝতে পারছিনে; দু'দিন ভেবে বলব।...... ..

এমন সময় মায়া দৌড়িয়া আসিয়া কপাট ঠেলিয়া হাসিমুখে ঘরে একটু উঁকি মারিয়া আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

হংসেশ্বর বলিল—আমি এখন তবে যাই আজ্ঞে।

গুণময় ক্ষীণস্বরে বলিলেন—আচ্ছা।

পঞ্চাননও উঠিল। গুণময় বলিলেন—পাঁচুদা, তুমি আর-একবার এসো।

—হাঁ, আমি এই দারোগা-বাবুকে এগিয়ে দিয়েই ফিরে আসছি।—বলিয়া দারোগাকে লইয়া পঞ্চানন বাহির হইয়া গেল।

(৩১)

রাজবালা গুণময়ের ঘরে হংসেশ্বরকে দেখিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়াই খুব হাসিতে-হাসিতে মায়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। মায়া তখন টেবিলের ধারে একখানা চেয়ারে বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া সুর করিয়া পড়িতেছিল—

"রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা;
দুজনে দেখা হত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা!" .....

এই বইখানি তাহাকে তাহার বীরেন দাদা দিয়াছিল বলিয়া যখন-তখনই সে এই বইখানি টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিত। রাজবালা হাসিতে হাসিতে ঘরে আসিল দেখিয়া মায়া বই হইতে চোখ তুলিয়া তাহার দিকেই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। রাজবালা এতদিন এ বাড়ীতে আসিয়াছে, মায়া তাহাকে একদিনও হাসিতে দেখে নাই; আজ তাহার চোখে মুখে কৌতুক যেন ঝলমল করিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া মায়া জিজ্ঞাসা করিল—কি মাসী, কি হয়েছে?

রাজবালা বলিল—ওরে মায়া, তোর বাবার ঘরে একটা কেমন মজার জানোয়ার এসেছে!

মায়া তড়াক করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রাজবালার কাছে ছুটিয়া আসিয়া উৎসুক মুখ তাহার দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি জানোয়ার মাসী?

রাজবালা হাসিতে-হাসিতে বলিল—নাম ত জানিনে তার।

মায়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার জীবজন্তু কি পশুপক্ষী বইএ সে-রকম ছবি দ্যাখোনি?

রাজবালা হাসির কৌতুককে গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরাইয়া বলিল—না।

মায়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সেটাকে দেখতে কেমন?

রাজবালা গম্ভীর মুখে বলিল—ধড়টা উটের, মুখখানা বাঁদরের, চোখ দুটো কাঁকড়ার, কান দুটো গাধার, আঙুলগুলো ভালুকের আর চুলগুলো সজারুর! সে আমাকে দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিল। তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

ইহা শুনিয়া মায়ার কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল, সে "আমি দেখে আসি" বলিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজবালা হাসিতে-হাসিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার মুখ হাসির আভায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

মায়া তখনই আবার ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল, ঘরে ঢুকিয়াই খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—ওমা মাসী! ঐ বুঝি তোমার জানোয়ার! ও ত হংসেশ্বর দারোগা!

রাজবালা হাসির অবকাশে একটু দম লইয়া বলিল—কি জানি মা, ও হংসেশ্বর না বক্রেশ্বর! আমার মনে হল ওটা উট্‌ট্রু!

উষ্ট্র শব্দটাকে বিকৃত করিয়া বলাতে উষ্ট্রের কদর্য্যতা আরো স্পষ্ট হইল কি না বলা না গেলেও, মাসী বোনঝিতে তাহাতে এমন কৌতুক অনুভব করিল যে একজন টেবিলে এলাইয়া পড়িয়া ও অপরজন মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে-

হাসিতে পেট চাপিয়া ধরিয়া উঃ উঃ করিতে লাগিল ও চোখের জল মুছিতে লাগিল।

হংসেশ্বরকে উপলক্ষ্য করিয়া দুটি কিশোরী যখন হাসিতে লুণ্ঠিত হইতেছিল, তখন হংসেশ্বর বাহিরে যাইতে-যাইতে শুষ্কমুখে ইতস্তত করিতে-করিতে পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—দেওয়ানজী-মশায় ঐ যে মেয়েটি ঘরে এসেছিল ওটি কে ?

হংসেশ্বর পঞ্চাননকে হয় নায়েব-মশায় নয় ভটচায্যি-মশায় বলিয়া সম্বোধন করিত ; আজ তাহাকে দেওয়ানজী করিয়া তোলাতে ধূর্ত্ত পঞ্চানন হংসেশ্বরের মতলব বুঝিয়া মুখ ফিরাইয়া ঠোঁটের হাসি জিভ দিয়া মুছিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল—ওটি বাবুর মেয়ে !

হংসেশ্বর একবার ঠোঁট চাটিল, দুবার ঢোক গিলিল, তাহাতে তাহার কণ্ঠাটা গলার সামনে দুবার উঠানামা করিল ; একবার কাশিয়া কুণ্ঠিতভাবে সে বলিল—হ্যাঁ, ওকে ত চিনি। ঐ যিনি আগে এসেছিলেন।

পঞ্চানন যেন আর কাহাকেও আসিতে দ্যাখে নাই এমনি ভাবে বলিল আগে এসেছিলেন ? কৈ আমি ত আর কাউকে দেখিনি। বাবুর মাস্-শাশুড়ী বোধ হয়...

হংসেশ্বর পঞ্চাননের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—না না, তাঁর মাস্-শাশুড়ী গোচের চেহারা মোটেই নয়। চমৎকার সুন্দরী, অল্প বয়েস...

যেন অল্প বয়সের সুন্দরী কাহারো মাস-শাশুড়ী হইতে পারে না। পঞ্চানন হংসেশ্বরের কথায় মনের মধ্যেকার অট্টহাস্য মনেই গোপন রাখিয়া বলিয়া উঠিল ও ! তবে সে ঐ মাস-শাশুড়ীর মেয়ে, বাবুর শালী, ..ওর সঙ্গেই বাবুর বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে !

শেষের কথাটা বলিয়াই পঞ্চানন হংসেশ্বরের মুখের দিকে চাহিল। হংসেশ্বরের মুখ শুকাইয়া কালো আর এতটুকু হইয়া উঠিয়াছে। হংসেশ্বর আবার দুবার ঢোক গিলিল, কণ্ঠাটা ঘটঘট শব্দ করিয়া উঠানামা করিল, তারপর ক্ষীণ স্বর কণ্ঠ হইতে বাহির হইল,- ও- ও !

অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা বলিল না। হংসেশ্বর ক্রমশ জমিদার গুণময়ের উপর মনে মনে ভয়ানক চটিয়া উঠিতেছিল—লোকটা যে বাস্তবিকই ভয়ানক অত্যাচারী স্বার্থপর পরস্ব-অপহারী সে বিষয়ে হংসেশ্বরের আর কিছু-মাত্র সন্দেহ রহিল না। সে ঐ অত্যাচারী চোর জমিদারের বিরুদ্ধে কি বলিয়া রিপোর্ট খুব জোরালো করিবে মনে মনে তাহারই মুসাবিদা করিতে লাগিল।

বাড়ীর সদর-দরজায় হংসেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া পঞ্চানন বলিল—তাঁ হলে আসুন দারোগাবাবু। রিপোর্টটা হপ্তাখানেক বাদে করবেন, তার মধ্যে আমাদের দরখাস্তটা দাখিল হয়ে যাবে।

হংসেশ্বর অকারণে চটিয়া উঠিয়া বলিল—আমার রিপোর্টে আপনাদের কিছু সুবিধে হবে না ভটচায্যি-মশায়, আমাকে বৃথা অনুরোধ করবেন না।

ধূর্ত্ত পঞ্চাননও হংসেশ্বরের মনস্তত্ত্বের হদিস না পাইয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। হংসেশ্বর চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া পঞ্চানন দু পা আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দারোগা-বাবু, আপনার মত এমন হঠাৎ বদলে গেল যে ?

হংসেশ্বর চটিয়া বলিয়া উঠিল শুধু-শুধু আপনাদের সঙ্গে অধর্ম্ম করতে যাব কেন মশায় !

আজ হঠাৎ হংসেশ্বরের ধর্ম্মে মতি দেখিয়া পঞ্চানন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—শুধু-শুধু আপনাকে আমরা কোনো কাজ কি করতে বলতে পারি ? দুহাজার টাকা ত ঠিক হয়েই আছে।

হংসেশ্বর বিরক্তির সহিত বলিল—ছোঃ ! দুহাজার টাকায় এসব কাজ হয় না নায়েব-মশায়।

পঞ্চানন বুঝিল হংসেশ্বর কিছু বেশী টাকা আদায় করিবার ফন্দিতে মোচড় দিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি তবে কত চান ?

হংসেশ্বর আবার দমিয়া গেল। নম্র মৃদু স্বরে আমতা-আমতা করিয়া বলিল—দেখুন, আপনি হলেন বন্ধু মানুষ আপনাকে বলতে বাধাই বা কি, লজ্জাই বা কি, আপনি বরাবর আমার বিশেষ উপকার করে আসছেন......

পঞ্চানন আশ্বস্ত হইয়া বলিল—আপনার আঁচটা আন্দাজ পেলে সেই-রকম চেষ্টা করতে পারি।

হংসেশ্বর মাথা নীচু করিয়া লাঠি দিয়া মাটিতে আঁক কাটিতে কাটিতে বলিল—আমি এক পয়সাও নেবো না...

পঞ্চানন ত শুনিয়া অবাক—জগতে এমন অভাবনীয় অঘটনও ঘটা সম্ভব! পঞ্চাননের বক্র নাসা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, সে হংসেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হংসেশ্বর বলিতে লাগিল—যদি ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে দ্যান! বাবুর যখন শালী, আর আমরা বাবুর স্বঘর, তখন বিয়েতে আটকাবে না।

পঞ্চানন বলিয়া উঠিল—সে অসম্ভব দারোগাবাবু।

হংসেশ্বরও এই কথায় কঠিন হইয়া উঠিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল—তবে আমার কাছে কোনো সাহায্য পাওয়াও অসম্ভব নায়েব-মশায়।

—আপনাকে পাঁচহাজার......

হংসেশ্বর মাথা নাড়িয়া জেদ ধরিয়া বলিল—হয় ঐ মেয়ে নয় ত কোন সম্পর্কই না।

হংসেশ্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া পঞ্চানন বলিল—আচ্ছা, দুটো দিন সময় দিন, বাবুকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেখি একবার।

হংসেশ্বর আজ পঞ্চাননকে নমস্কার না করিয়াই চলিয়া গেল। পঞ্চানন আবার গুণময়ের ঘরে ফিরিয়া চলিল।

(২২)

অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া চোখের জল মুছিয়া রাজবালা আবার গুণময়ের ঘরে আসিল। আগে দরজা একটু ফাঁক করিয়া দেখিল তখনো কেহ আছে কি না; কেহ নাই দেখিয়া রাজবালা ঘরে ঢুকিল।

রাজবালার মুখে চোখে কৌতুকের হাসি তখনো মাখানো ছিল। তাহার এই অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া গুণময় অধিকতর মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—রাজু, তুমি বড় সুন্দর! ভাগ্যিস আমার অসুখ করেছিল, তাই ত তোমাকে এমন কোরে পেতে পারলাম।

ঘরে যে কেহ কোনো কথা বলিতেছে বা সেইসব কথা তাহারই কাছে প্রণয়-নিবেদন তাহা যেন রাজবালা শুনিতেও পায় নাই এমনি ভাবে কাচের গেলাসে এক-দাগ ঔষধ ঢালিয়া গুণময়ের মুখের কাছে হাত বাড়াইয়া ধরিল। গুণময় হাত বাড়াইয়া ঔষধের গেলাস না ধরিয়া রাজবালার গালে হাত দিলেন। রাজবালা চমকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার বিস্তারিত হাতের উপর গুণময়ের অবলম্বনহীন বিস্তারিত মোটা ভারী হাতখানা হঠাৎ আসিয়া পড়াতে রাজবালার হাত হইতে ঔষধ-সুদ্ধ কাচের গেলাসটা ছিটকাইয়া মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল; রাজবালা সম্ভ্রস্ত হইয়া পিছু হঠিতে গিয়া ঔষধের-শিশি-বোতল-সুদ্ধ একটা ছোট হাল্কা টেবিল ঝনঝন করিয়া উল্টাইয়া ফেলিল।

গুণময় অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিলেন—থাকগে যাকগে—আবার ওষুধ আনিয়ে নিলেই হবে। তুমি আমার কাছে থাকলে আমার আর ওষুধেরই বা দরকার কি!......

সে যে এত শিশি বোতল ভাঙিল, ঔষধ অপচয় করিল, তাহার জন্য একটুও কুণ্ঠিত না হইয়া দৃপ্ত গম্ভীর মুখে ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া রাজবালা বলিল—আপনাকে দিদির ঘরে গিয়ে থাকতে হবে, নইলে আপনাকে ওষুধ পথ্যি দেওয়া আর আমার সুবিধা হবে না।

গুণময় মনে করিলেন দুই ঘরে দুই রোগীর সেবা করার অসুবিধার কথাই রাজবালা বলিল বোধ হয়। তিনি মুচকি হাসিয়া রসিকতা করিয়া বলিলেন—তোমার দিদির সেবা করবার তোমার দরকার কি? ও ত মরার দাখিল হয়েই আছে, ওকে চটপট মরতে দাও না। আমি একটু ভালো হয়ে উঠলেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে, আমরা দুটিতে জোড়ের পায়রা হয়ে থাকব!......

রাজবালার মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল—আপনাকে আমি বিয়ে করব মনে করেছেন? কক্‌খনো না! যে লোক বারবার স্ত্রীহত্যা করেছে, তার স্ত্রী হয়ে দগ্ধে মরার চেয়ে বিয়ের আগেই নিজেই মরা ভালো!......

সেই ঘরের ঠিক বাহিরের দালানে রাজবালার মা বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। শিশি বোতল ভাঙার শব্দ শুনিয়া তিনি মনে করিলেন উহা কন্যার সহিত জামাতার কোনো-রকম রসিকতার ফল; কন্যা-জামাতার রসিকতায় শিশি-বোতলগুলা অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেও সেদিকে কান দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নহে বলিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়াই ছিলেন। কিন্তু যখন কন্যার উচ্চ তীব্র কণ্ঠস্বর কানে গেল, তখন তাঁহার আর উদাসীন থাকা চলিল না। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া বঁটীতে হাত কাটিয়া ফেলিলেন।

সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি দরজার কাছে ছুটিয়া আসিয়া চাপা গলায় তিরস্কার ভরিয়া বলিতে লাগিলেন—ওলো আবাগী শতেক্‌খোয়ারী! তোর চোপা থামিয়ে বেরিয়ে আয়! ওলো শুনছিস! বেরিয়ে আয়......

তাঁহার হাত হইতে টপটপ করিয়া রক্তের ফোঁটা দরজায় সামনে পড়িয়া জমা হইতেছিল।

এমন সময় পঞ্চানন ঘরের অপর দিকের দরজার কাছে আসিয়া গলা-খাঁখারি দিল। রাজবালা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজবালা মায়ের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দৃপ্তভঙ্গিতে ঋজুভাবে দয়াদেবীর ঘরে চলিয়া গেল; রাজবালার মা বরাবর রক্তের ফোঁটা ফেলিতে ফেলিতে তাহার পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন—ওলো রাজু, দাঁড়া দাঁড়া ··নিজের হিত বুঝবিনে, মায়ের সলা শুনবিনে, আর যে তোর শত্রু সেই হলো তোর আপনার...ওলো একটা কথা শুনে যা......

রাজবালা একবার ফিরিয়াও না তাকাইয়া দয়াদেবীর ঘরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। দয়াদেবী নীরবে হাত বাড়াইলেন; রাজবালা সেই স্নেহাশ্রয়ে শান্তি পাইবার জন্য দয়াদেবীর বুকের কাছে বিছানায় মুখ চাপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়াদেবী তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে মমতা-বিগলিত স্বরে বলিলেন—মানুষের জীবন, রাজু, ফুলের মতন; দিনে দিনে একটি একটি কোরে তার পাপড়ি খোলে; আমাদের ঝরে যাবার সময় হয়েছে, তোদের জীবনের কুঁড়ি সবে ফুটছে; জীবনের দলগুলি ত হাসি-কান্নার স্তবকেই সাজানো; জীবনের অতীত দিয়েই ভবিষ্যৎকে গড়া হয়; আজকের দুঃখ কষ্ট তুই যতখানি সহ্য করতে পারবি, কাল তোর কষ্ট দুঃখ তত্‌খানি কম লাগবে; শান্ত ধীর হয়ে দুঃখ সইতে শেখো ভাই; ধীর হয়ে সইলে দুঃখ কষ্ট বেশী লাগে না।

তখনো বাহিরে রাজবালার মা বকবক করিতেছিলেন—নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা। রাহুতে যে ওঁর সুখ গিলছে তা বুঝতে পারেন না।—এখনো ত আর কচি খুকীটি নেই! পরে পস্তাতে হবে—কে বন্ধু কে শত্রু পরে বুঝবেন!

(৩৩)

পঞ্চানন ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। গুণময় কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া শুইয়াই রহিলেন। পঞ্চানন রাজবালার কথা শুনিতে পাইয়াছিল; তাহাতে সে মনে মনে খুসীই হইয়াছিল যে ইহাতে হংসেশ্বরের প্রস্তাবটা পাড়া তাহার পক্ষে সহজ হইবে এবং গুণময়কে সেই প্রস্তাবে সম্মত করাইতেও বেশী বেগ পাইতে হইবে না। পঞ্চানন যেন কিছুই শোনে নাই বা ঘরে ভাঙাচুরা শিশিবোতল ছড়াইয়া নাই, টেবিলটা উল্টাইয়া পড়িয়া নাই, ঘরময় ঔষধ মলম মালিশ থইথই করিতেছে না, এমনিভাবে অতি সংক্ষে পূর্ব্বকথার অনুবৃত্তির মতন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—হংসেশ্বর দারোগা ত বেঁকে বসেছে!

"কেন?"—বলিয়া গুণময় তৎক্ষণেই পঞ্চাননের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

—তার ভয়ানক খাঁই!

—কত চায় আবার সে?

পঞ্চানন মিথ্যা কথা অসঙ্কোচে বলিল—টাকা যা দেবার কথা হয়েছে তার ওপরে সে অপর-রকমের বকশিশ চায়। আমি অনেক কোরে বোঝালাম যে সে হবার জো নেই—তার বদলে তোমাকে বরং দশ হাজার টাকা দেওয়া যাবে! কিন্তু সে খোট ধোরে বসেছে, হয় সে যা চায় তাই দিতে হবে, নয় সে বিরুদ্ধ রিপোর্ট করবে।

—কি চায় সে?

পঞ্চানন একটু ইতস্তত করিয়া বলিয়া ফেলিল—সে তোমার শালীকে বিয়ে করবে বলে ঝুঁকে পড়েছে!

—রাজবালাকে?

—হ্যাঁ। আমি যদিও হংসেশ্বরকে বলে দিয়েছি সে-সব হবে-টবে না, তবু তোমাকে বলতে কি, ও মেয়েকে বিয়ে করা তোমার ঠিক হবে না—দেখছ না কতরকম বাধা পড়ছে!......সুন্দর ডাগর মেয়ের অভাব কি?...

গুণময় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—আমি প্রাণ থাকতে রাজুর আশা ত্যাগ করতে পারবো না।

পঞ্চানন বলিল—জোর কোরে প্রজা বশ করা যায় ভায়া, কিন্তু জোর কোরে মন ত বশ করা যায় না, বিশেষ কোরে মেয়েমানুষের মন।

গুণময় আবার একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি তার পায়ে আমার জীবন যৌবন ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি সব ঢেলে দিয়েও কি তার মন পাবো না?

গুণময়ের যৌবনের কথা শুনিয়া পঞ্চাননের অত্যন্ত হাসি আসিল। সে কষ্টে হাসি দমন করিয়া বলিল তাতেও ত সে বাগ মানছে না; আর হংসেশ্বর' বিরুদ্ধ হলে ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিই বা থাকবে কোথায়?

গুণময় উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—একটা দারোগা বিরুদ্ধ হলেই আমার ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি সব যাবে?

পঞ্চানন বলিল—প্রজারা সব বেঁকে বসে আছে, দারোগা তাদের পৃষ্ঠবল হলে তারা আর কি আমাদের আমল দেবে? প্রজার পয়সা নিয়েই ত জমিদারদের নাচন-কোঁদন!

গুণময় বলিয়া উঠিলেন—তুমি এত লোককে খুন করতে পেরেছ আর আমার সুখের কাঁটা ঐ দারোগাটাকে সরিয়ে ফেলতে পারবে না?

পঞ্চানন জিভ কাটিয়া বলিল—বাপরে! ওরা সরকারী লোক।

গুণময় একেবারে দমিয়া গেলেন; হতাশ কাতর স্বরে বলিলেন—তবে কি হবে পাঁচুদা!

পঞ্চানন বলিল—দারোগাকে হাত করা ছাড়া আর উপায় নেই।

গুণময় বলিলেন—তাকে বলো দশ হাজার বিশ হাজার টাকা দেবো,......

পঞ্চানন বলিল—তা ত আমি আগেই বলেছি, কিন্তু সে ও-কথা কানেই তোলে না।......

গুণময় বলিলেন—আচ্ছা আমি দুদিন ভেবে পরে বলবো।

পঞ্চানন চলিয়া গেল। গুণময় কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি? একদিকে তাঁহার এই পঞ্চান্ন বৎসরের মমতা দিয়া ঘেরা জমিদারীতে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা, প্রজাদের কাছে হার মানিয়া উঁচু মাথা হেঁট করা, আর অপর দিকে এই দুইমাসের লালসার তাড়নায় সকল-ভুলানো রাজবালা হাতছাড়া হইয়া যাইবার আশঙ্কা; কাহার বিয়োগে তাঁহার মনে অধিক আঘাত লাগিবে তাহা তিনি ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

পঞ্চানন বাহির হইয়া চলিয়া গেলে রাজবালার মা গুণময়ের ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় গুণময় কড়িকাঠের দিকে মুখ করিয়াই হাঁকিয়া বলিলেন—চতুর, একবার রাজুকে ডেকে দে ত।

সেই কথা শুনিয়া রাজবালার মা যে-পাখানি ঘরের চৌকাঠের ওপারে ফেলিয়াছিলেন তাহা নিঃশব্দেই ফিরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি আড়ালে চলিয়া গেলেন। উঁকি মারিয়া দেখিলেন একটু পরেই রাজবালা হনহন করিয়া গিয়া গুণময়ের ঘরে ঢুকিল।

রাজবালা ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল- জামাইদাদা আমায় ডেকেছেন?

গুণময় কথায় আদর গলাইয়া ঢালিয়া দিয়া মোটা গলায় সুর করিয়া বলিলেন—

তোমার ক্ষণেক অদর্শনে প্রাণ যে করে পালাই পালাই,
নয়ন-পুতলি তুমি চোখের আড়াল হতে নাই।
যে অবধি হেরিয়াছি......

রাজবালা বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। গুণময় ব্যস্ত হইয়া গান থামাইয়া বলিলেন—রাজু রাজু শোনো, বিশেষ দরকারী কথা আছে.....

রাজবালা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গুণময় কনুইয়ের উপর ভর করিয়া বিছানার উপর একটু উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিলেন—আবার জীবন যৌবন...

রাজবালা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—থাক্ জামাইদাদা, বুড়োর মুখে ঐসব কথা ভালো শোনায় না।

গুণময় চটিয়া উঠিলেন—কী আমি বুড়ো!

রাজবালা হাসিয়া বলিল—একশো বার! অসুখে পোড়ে অবধি চুলে কলপ পড়েনি, চুলগুলো যে শণের নুড়ি হয়ে উঠেছে সেদিকে খেয়াল আছে?

গুণময়ের বুকে যেন শেল বাজিল—তাইত! এতদিন অসুখে পড়িয়া থাকিয়া তিনি ত বিশ্বাসঘাতক চুলগুলোর কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়া ছিলেন! এতবড় পরাজয়ের ধ্বজা তাঁহারই মাথার উপর উড়িতেছে সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, আর তাহা দেখাইয়া দিল কি না সেই যাহাকে যৌবনের মোহে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন! গুণময় মুখ কালো করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বেশ! আমার

যা আছে তা আছে। তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না বলো।

রাজবালা হাসিমুখেই বলিল—কতবার বলবো? না, না, না, কক্খনো না।

গুণময় সেই ব্যঙ্গের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তোমায় আমি জোর কোরে বিয়ে করবো, একবার মন্তর কটা পোড়ে ফেললে তখন কি করবে?

রাজবালা শান্তস্বরে বলিল—তার পরদিনই বিষ খেয়ে মরবো।

গুণময় বলিলেন—তোমার ভারী অহঙ্কার হয়েছে! জানো আমি ইচ্ছে করলে তোমার মতন একশো সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারি?

—সেটা বাহাদুরী নয়। আর সেই একশো আমার মতন হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে আমি থাকবো না, নিশ্চয়।

যে গুণময়কে সকল লোক বাঘের মতন ভয় করে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সমানে জবাব করিতেছে একটা মেয়ে! গুণময়ের জ্ঞানগোচরে এমন ঘটনা এই প্রথম। তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—তোমায় আমি নাকের জলে চোখের জলে কোরে ছাড়বো।

—তা এ বাড়ীতে পা দিয়ে অবধিই আরম্ভ হয়েছে, ও আর বেশী কি ভয় দেখাচ্ছেন!—বলিয়া রাজবালা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গুণময়ের গর্জ্জন শুনিয়া ও রাজবালাকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া রাজবালার মা আবার গুণময়ের ঘরের দিকে চলিলেন, কিন্তু আবার তাঁহার যাওয়ায় বাধা পড়িল, গুণময় হাঁকিলেন—চতুর, পাঁচুদাকে ডাক।

পঞ্চানন আসিয়া দাঁড়াইতেই গুণময় বলিয়া উঠিলেন—হংসেশ্বরকে বলে দাও তাই হবে। ও শালী রাজরাণী যখন হবে না তখন দারোগার হাতেই ও পড়বে, এই ওর কপালের লিখন!... ..আর তুমি একটি বেশ ভালো দেখে মেয়ের খোঁজ কর।......

পঞ্চানন খুসী হইল—হংসেশ্বর দারোগা হাতে রহিল ও তাহাকে ঘুষ দিবার জন্য মঞ্জুরী দুই হাজার টাকাটা নিজের হাতে আসিল!—এক ঢিলে যদি এমন সুন্দর দুটি পাখী মরে ত মন্দ কি!

পঞ্চানন বলিল—তা মেয়ে আমি শিগগিরই ঠিক করে ফেলব। আপাতত আগে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্তটা করে দিতে হয়; আর জেলায় একজন উকিল নিযুক্ত করে রাখতে হয় যে খবরাখবর নিয়ে খবরদারী করবে।

গুণময় বলিলেন—বীরে জেলায় আছে শুনেছি; তাকেই এখানে আসতে টেলিগ্রাম করো, মোকাবেলায় সব তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ো, এখন তাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নাও, বিনা পয়সায় কাজ হয়ে যাবে। পরে উকিল দিলেই হবে।

"আচ্ছা" বলিয়া পঞ্চানন বিদায় লইল।

পঞ্চানন চলিয়া গেলে কন্যার উদ্ধত অবিনয়ের মার্জ্জনা অনুরোধ করিবার জন্য রাজবালার মা গুণময়ের ঘরে আসিয়া মাথার ঘোমটা একটু নামাইয়া দিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন আছ বাবা?...ওমা, সব ওষুধ-পত্তর ছড়াছড়ি!...বাছারে! সকাল থেকে একদাগও ওষুধ পেটে পড়েনি! আ আমার পোড়া কপাল!...ও মোহিনী মোহিনী, চতুরকে ডেকে দে ডাক্তারখানা থেকে চট করে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসুক।......

গুণময় চুপ করিয়া পড়িয়াই রহিলেন, রাজবালার মায়ের দিকে একবারও চাহিলেন না।

তাহা দেখিয়া রাজবালার মা বলিলেন—তুমি ত বাবা জ্ঞানমান বুদ্ধিমান, রাজু বালা-স্বভাব থেকে যদি কিছু অন্যায়ও বলে থাকে তাতে তুমি কিছু মনে কোরো না। রাজু আমার বড় ভালো মেয়ে গো, ও শুধু ঐ দয়ার কুপরামর্শ শুনে এমন বিগড়ে দাঁড়িয়েছে—রাজু পাছে তার সতীন হয় এই হিংসেতেই দয়া গেল! আরে বাছা, তুই ত মরতে বসেছিস, তোর এত সোয়ামী আগলানো কেন? বরং সোয়ামীকে থিতু করে সংসার বজায় রাখিয়ে সোয়ামীর হাসিমুখ দেখতে-দেখতে তুই মর না কেন।......

গুণময় এইবারে কথা কহিলেন—আমি এই মাসেই দয়াকে সতীন দিয়ে ওর সব নষ্টামি ভাঙব তবে আমার নাম গুণময় রায়! আমার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, দয়া ত কোন্ ছার!

রাজবালার মা খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ বাবা, শুভ কর্ম্মটা এই মাসেই সেরে ফ্যালো; বিয়েটা হয়ে গেলে রাজু শান্ত হয়ে যাবে। দেখলে ত বাবা তোমার ব্যামোতে আহারনিদ্রা ছেড়ে কি সেবাটাই করলে! দিন কি স্থির হয়েছে?

—হ্যাঁ, রাজুর বিয়ের দিন স্থির হয়েছে এই ২৪এ মাঘ, আর বর স্থির হয়েছে হংসেশ্বর দারোগা—আমি নই;—আমাকে স্বামী পেলে যে ভাগ্য বলে মানবে এমন অপর মেয়ে খোঁজা হচ্ছে!

গুণময়ের এই কথা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন রাজবালার মায়ের দারুণ বলিয়া মনে হইল, তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কথাটা উপলব্ধি করিয়া কপালে নির্ঘাত এক চড় মারিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—এত আশা দিয়ে শেষ কালে রাজুর কপাল এমনি করে ভাঙবে বাবা?

গুণময় গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে বলিলেন—যার সঙ্গে যার ভবিতব্য!

রাজবালার মা কাঁদো-কাঁদো হইয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—রাজুর হয়ে আমি তোমার কাছে ঘাট মানছি বাবা.. ...

—এর আর নড়চড় হবার জো নেই মাসী···হংসেশ্বরকে আমি কথা দিয়েছি।

রাজবালার মা ঘর হইতে দালানে বাহির হইয়া আছড়াইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—ওরে বাবারে আমার একি সর্ব্বনাশ হলো রে!......

তাহা শুনিয়াই দয়াদেবী কপালে চোখ তুলিয়া ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ ···কি হলো? ওঁর কি কিছু হলো?... ..

দয়াদেবীর দুর্ব্বল হৃদযন্ত্র অল্পেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তিনি মূর্চ্ছা যাইবার অবস্থায়।

তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি রাজবালা বলিয়া উঠিল—দিদি দিদি, ওসব কিছু নয়, এই আমি দেখে আসছি জামাইদাদা বেশ ভালো আছেন। তুমি স্থির হও। ..মায়া তুই একটু হাওয়া কর, আমি ছুটে দেখে আসি......

রাজবালা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, সম্মুখেই দেখিল মোহিনী আসিতেছে, ভয়ব্যাকুল শুষ্ক মুখে উদ্বিগ্ন স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি মোহিনী, কি হলো?

—বাবু হংসেশ্বর দারোগার সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করেছেন তাইতে......

রাজবালা আর বেশী কিছু শুনিবার জন্য না দাঁড়াইয়া হাসিমুখে ছুটিয়া দয়াদেবীর ঘরে ফিরিয়া গেল।

তাহাকে হাসিমুখে ফিরিতে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া দয়াদেবী রাজবালার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন। রাজবালা হাসিতে হাসিতে বলিল—জামাইদাদা হংসেশ্বর দারোগার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করেছেন তাই আমার মা মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছেন।

মায়া শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে লুণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার সেই হাঁসজারু বকচ্ছপ জানোয়ারটার সঙ্গে বিয়ে হবে?

রাজবালা তেমনি হাসিতে-হাসিতে বলিল—হাঁরে!

—সেই তোমার বক্রেশ্বর?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—তুমি মাসী বরের নাম করেছ?

—আরে এখনো ত বিয়ে হয়নি বিয়ের পর বক্রেশ্বর বলে ডাকব।

—আমি ভাই মাসী তোমার বরকে মেসোমশাই বলতে পারব না।

রাজবালা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—মেসো-মশাই কেন বলতে যাবি? বকচ্ছপ কি হাঁসজারু বলবি।

দয়াদেবী এতক্ষণ একদৃষ্টে রাজবালার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। একটু দম লইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—রাজু, তুই হাসছিস? তোর হাসি দেখে আমার কেমন ভয় হচ্ছে।

—দিদি, তুমিই ত এখনি বল্লে, হাসিমুখে সকল অবস্থাকে সয়ে যেতে হবে; তাই আমি হাসছি—বলিতে-বলিতে রাজবালা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আবার বীরেন্দ্রকে দয়াদেবীর মনে পড়িল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মায়া, তোর মাসীকে আমার কাছে সরিয়ে নিয়ে আয়।

তখনো বাহির হইতে রাজবালার মায়ের আর্ত্তনাদ আসিতেছিল—আমি এমন হতভাগা মেয়েও পেটে ধরে-ছিলাম—কোথায় রামের অধিবাস, না রাম চললো বনবাস ! ..

(৩৪)

বীরেন টেলিগ্রামে গুণময়ের আহ্বান পাইয়া মহা সমস্যায় পড়িল। টেলিগ্রাম লোককে শুধু ইঙ্গিত করে, হুকুম করে, কোনো কথা সে খুলিয়া ত বলে না, এমনি তাহার ব্যস্ততা আর এমনি তাহার গুমোর ! বীরেন বুঝিতেই পারিতেছিল না, অকস্মাৎ হাতীকান্দায় কেন তাহার ডাক পড়িল। দয়াদেবী কি তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন ? কিংবা তিনি কি মারাই গিয়াছেন ? তা ত বোধ হয় নয়. টেলিগ্রামের চারটি কথা Come sharp important business ত সে রকমের কোনো আভাস দিতেছে না। ঐ businessটা কি ? রাজবালার সঙ্গে কি তাহার বিবাহ দেওয়া হইবে ? হে ভগবান ! তা যদি হয় ! মায়ার সঙ্গে কি ? তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি তাহাকে কি ফিরাইয়া দিবে ? কিংবা গুণময় উইল করিবেন, তাহার সাক্ষী হইতে হইবে বা ট্রাষ্টি হইতে হইবে ?......

এইরূপ হাজারো অনুমান বীরেনকে ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু সেইসঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল তাহার হাতী-কান্দায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত কি না। সে যে অপমানিত হইয়া একরকম প্রতিজ্ঞা করিয়া সে-বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এই দুদিন আগেই ত তাহাকে সে-বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়া পত্র আসিয়াছিল, আজ আবার এ আমন্ত্রণ কেন ? আবার সেইসঙ্গে যাইবার লোভও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছিল গেলে একবার রাজবালার সঙ্গে দেখা হয়, দয়াদেবীকে দেখিতে পায়, মায়াকে দেখিতে পায়, আর কিসের জন্য ডাক পড়িয়াছে তাহাও সে জানিতে পারে।......আর মায়ের মৃত্যুর স্থান নিজের ভিটাটির উপর একবার মাথা ঠেকাইয়া আসিতে পারে......

লোভ ও কৌতূহলে পড়িয়া বীরেন যাওয়াই ঠিক করিল। যেমন ঠিক করা আর অমনি একটা ব্যাগে খান-কতক কাপড় জামা ভরিয়া বাহির হইয়া পড়া, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব আর সহিল না।

রাজবালা গুণময়ের মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় নিজের মনের কথা প্রকাশ করিয়া শুনাইয়া কাল হইতে গুণময়ের ঘরে আর পা দ্যায় নাই, গুণময়ও ডাকিয়া পাঠান নাই। গুণময় এখন চতুর-খানসামার হেফাজতে।

পরদিন রাজবালা গুণময়ের ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল, শুনিতে পাইল চতুর খানসামা গুণময়কে বলিল —বীরেনদাদাবাবু এসেছেন।

রাজবালা চমকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল, বীরেন দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিবা।

গুণময় চতুরকে বলিলেন—ডেকে আন বীরেনকে।

রাজবালার মুখ একবার উজ্জ্বল হইয়া ম্লানতর হইল, পরক্ষণেই লজ্জার আভা তাহার মুখে পূর্ব্বাকাশে অরুণছটার মতন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রাজবালা গুণময়ের ঘরে ঢুকিয়া-পড়িয়া বলিল—জামাইদাদা, সকালে ওষুধ খাওয়া হয়নি ? দেবো ?

গুণময় বলিলেন—দাও, আজ শেষ দিন তোমার একটু সেবা পেয়ে নি। কাল থেকেই ত তুমি হংস-দারোগার। রাজবালা তোমার নাম, রাজরাণী হলে কেমন মানাত! তা না, তুমি হচ্ছ হংসেশ্বরের রাজহংসী !......

রাজবালা গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া লজ্জিত মুখে গুণময়ের দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিল।

বীরেন ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। দুটি বড় বড় চোখের বিষণ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টি পরম আগ্রহে তাহারই পথের দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহাদের চারিচোখের দৃষ্টি পরস্পরকে মধ্যপথে আলিঙ্গন করিল। অতুল আনন্দ ও বিপুল ব্যথা বীরেন্দ্রের বক্ষে তুফান জাগাইয়া তুলিল। এই চার মাসের অদর্শনের ফাঁকেই সেই রূপের প্রতিমা অনেকখানি দীর্ঘতর ঋজুতর সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। এ যে অপরূপ !

গুণময় রাজবালার হাত হইতে গেলাস লইয়া ঔষধটা গলায় ঢালিয়া রাজবালার হাতে গেলাস ফিরাইয়া দিলেন, ঔষধটা গিলিয়া বিকটভাবে মুখ বিকৃত করিয়া গুণময় বীরেন্দ্রকে বলিলেন—তোমাকে একটু কাজের জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। পতে হাড়িটা প্রজাদের বিদ্রোহী করে

তুলছে; ওদের টিট করে দিতে হবে; ওরা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে দরখাস্তও করেছে; আমরাও ওদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত নালিশ যত-রকম পারি রুজু করে ওদের জেরবার করে ফেলব। তুমি নতুন পাশ করে ওকালতীতে বসছ; আমাদের এই-সবের তদ্বির তদারক করবে তুমি—অভিজ্ঞতাও বাড়বে, লোকের কাছে পরিচয়ও হবে......

বীরেনের আর গুণময়কে প্রণাম করা হইল না। সে জোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—এ ভার ত আমি নিতে পারব না।

গুণময় তাহার স্থিরসংকল্পের দৃঢ় উত্তর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

—আমি প্রজাদের পক্ষে অনেক দিন আগে থেকেই নিযুক্ত হয়েছি।

—আমার বিরুদ্ধে?

—আজ্ঞে হাঁ।

গুণময় ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া বিছানায় জোর করিয়া উঠিয়া বসিয়া খাটো খাটো ফুলো হাতে তাকিয়া বালিশের উপর গোটাকতক জোরে ঘুষি কষাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—বেইমান নিমকহারাম! আমি কি দুধকলা দিয়ে কাল-সাপ পুষেছিলাম? পাঁচুদা তখনি বলেছিল—ঋণের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ রাখতে নেই,—যে পথে ওর মা গেছে সেই পথে ওর ছাঁকেও পাঠিয়ে দাও। আমি বললাম—আহা ছেলেমানুষ, থাকুক। কি বলব, আজ আমি পড়ে রয়েছি, নইলে ঐ মুখ জুতিয়ে ভাঙতাম! বেরো আমার বাড়ী থেকে।......চতুর! এর কান ধরে বার কোরে দে ত......

বীরেন্দ্র একবার রাজবালার দিকে চাহিয়া নীরবে ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল; রাজবালা তাড়াতাড়ি বলিল—একবার দিদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না।

বীরেন বিষণ্ণ কাতর স্বরে বলিল—মাকে বোলো তেমন পুণ্য আমার ভাগ্যে নেই।

বীরেন্দ্র আবার চলিয়া যায় দেখিয়া রাজবালার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইল; সে দুই পা আগাইয়া গিয়া বলিল—কালকে আমার গায়েহলুদ!

বীরেন থমকিয়া ফিরিয়া একবার গুণময়ের দিকে চকিতে চাহিয়া রাজবালাকে বিস্ময়-পূরিত ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কালই?

রাজবালা তাহার প্রশ্নের মানে বুঝিয়া বলিল—হাঁ। বিয়ে হবে হংসেশ্বর দারোগার সঙ্গে।

"ও!"—বলিয়া বীরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাজবালাও গুণময়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার দুঃখদিনের একমাত্র আশ্রয় দয়াদেবীর ঘরে গিয়া ঢুকিল। আস্তে আস্তে দয়াদেবীর কাছে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বীরেন্দ্র বারান্দা দিয়া নীচে নামিবার পথে যাইতে যাইতে দেখিল অপর দিক হইতে বধূবেশে সজ্জিতা মায়া আসিতেছে। মায়া তাহাকে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে বীরেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে-হাসিতে মায়া জিজ্ঞাসা করিল—বীরেন-দা, তুমি কখন এলে?

বীরেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—এই আসছি ভাই।

তখনই মায়ার মনে হইল নিশ্চয় বীরেনদা তাহার বিবাহ-উপলক্ষ্যে ভোজ খাইতে আসিয়াছে; তাহার লজ্জাও হইল, রাগও হইল—বীরেন-দা তাহাকে বিয়ে করিল না, বিয়ে হইবে কি না সেই বুড়োটার সঙ্গে! মায়া বীরেনের গায়ে মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইল।

বীরেন দুই হাতে মায়ার দুই বাহু ধরিয়া সামনের দিকে একটু ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল—মায়া, ছাড় ভাই, আমায় এখনি যেতে হবে......

মায়া আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখনি এসে এখনি যাবে কি?

—তোমার বাবার হুকুম।

মায়ার অনেক পুরাতন কথা মনে পড়িল; একরকম সে-ই তাহাকে এ বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছে। সে বড় ম্লান মুখে বিষণ্ণ স্বরে বলিল—আমি মাসীর হিংসেতে বাবাকে বোলে এই কাণ্ডটি করেছি! আমি ঘাট মানছি বীরেন-দা!

বীরেন একবার চারিদিকে চাহিয়া মায়ার গালে চুম্বন করিল।

মায়ার মন তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—মায়ের সঙ্গে দেখা করেছ?

—না ভাই, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই।

—মাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে? সে তোমার জন্যে রোজ কাঁদে......

বীরেন মায়াকে ছাড়িয়া দিয়া তীরের মতন সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মায়া মাকে ও মাসীকে বীরেন-দাদার আগমনের সংবাদ দিতে চলিল।

রাজবালা দয়াদেবীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি, বীরেন এসেছিল।

দয়াদেবী পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কৈ, কৈ বীরেন? তাকে ডাক, তাকে একবার দেখি। বীরেন এখনো যে আমার কাছে এল না?

—জামাইদাদা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সে বোলে গেল, মাকে বোলো তাঁকে দেখতে পাবো তেমন পুণ্য আমার ভাগ্যে নেই!

দয়াদেবী চোখ বুজিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মায়া ঘরে ঢুকিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল—মা, মাসী, বীরেনদাদা এসেছিল, চলে গেল।

দয়াদেবী বা রাজবালা কেহই কোনো কথা বলিতে পারিল না।

রাজবালা দয়াদেবীর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া যেমন ফিরিয়াছে বাহির দিকের জানলা দিয়া দেখিতে পাইল বীরেনদের বাড়ী যেখানে ছিল সেইখানে একটা শিউলি-গাছের তলায় মাটিতে পড়িয়া বীরেন ধূলার উপর মুখ গুঁজিয়া আছে, বোধ হইল কাঁদিতেছে। বীরেনদের বাড়ী ভাঙিয়া সেই ইটে গুণময় হরিমতি-বষ্টমীর সুন্দরী মেয়ে কাঞ্চনের জন্য বাড়ী তৈরী করিয়া দিয়াছেন, বীরেন-দের ভিটা এখন সমভূম; তাহার মা যে-গাছটিতে গলায় দড়ি দিয়াছিলেন, সে গাছটি এখনো তেমনি আছে; বীরেন তাহারই তলায় যেন মায়ের কোলে শুইয়া কাঁদিতেছে। রাজবালা দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—দিদি, বীরেন তার ভিটের ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে!

"আহা বাছারে!" বলিয়া দয়াদেবী ধীরে ধীরে চেষ্টা করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন ও মায়াকে বলিলেন—মায়া এই জানলাটা খুলে দে ত।

বিছানার কাছের জানলাটা দিয়া বীরেনের ভিটা ও তাহার মায়ের ফাঁশির গাছটা দেখা যায় বলিয়া দয়াদেবী সেটি খুলিতে দিতেন না। আজ তাহা খুলাইয়া বীরেনের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন—আহা বাছারে!

কিছুক্ষণ পরে মাটি হইতে মাথা তুলিয়াই বীরেনও দেখিতে পাইল জানলা হইতে দয়াদেবী রাজবালা ও মায়া ম্লান বিষণ্ণ মুখে তাহাকেই দেখিতেছে। বীরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ধূলার উপর মাথা রাখিয়া উদ্দেশে দয়াদেবীকে প্রণাম করিল; তারপর সেদিকে আর না চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দয়াদেবী আস্তে-আস্তে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাতৃভূমি

(লাওয়েল্ হইতে)

খাঁটি যে মানুষ বল' দেখি তার কোথায় মাতৃভূমি?
জন্ম-ভূমির অছিলায় তারে খাটো করিবে কি তুমি?
ওগো মাতৃভূমিটি তার
নীল আকাশের মতন স্বাধীন অমনি সুপ্রসার।

সেকি শুধু যেথা চির স্বাধীনতা, দেবতা দেবতা যেথা,
মানুষ মানুষ? মানব-মনের তৃপ্তি আছে কি সেথা?
ওগো মাতৃভূমিটি তার
সাগরের মত বিরাট অতল অমনি সুপ্রসার।

প্রাণে প্রাণে যেথা প্রীতির বাঁধন, দুখের অজানা ঠাঁই,
ব্যাকুল মানব উন্নততর হইতে সর্ব্বদাই!
খাঁটি মানুষের সেইখানে দেশ, ধন্য সে দেশ তার
মাতৃভূমি সে পৃথিবীর মত বিপুল সুপ্রসার।

পরসেবা-রত পড়শী যেথায়, নাহিক একটি দাস—
ধন্য রে ভাই জন্মেছ সেথা, সে দেশে আমারও আশ!
খাঁটি মানুষের সেইখানে দেশ, ধন্য সে-দেশ তার,—
মাতৃভূমি সে সার্ব্বভৌম অসীম সুপ্রসার।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জর্ম্মণ্যদর্শনের দুর্ভেদ্য গিরি-সংকটের মধ্যদিয়া সাংখ্য-বেদান্তে প্রবেশ

অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিভাজনে প্রবৃত্ত হইয়া মোটের উপরে পাওয়া গেল—

(১) অন্তঃকরণের মূলপ্রান্তে অহঙ্কার-গর্ভ বুদ্ধি =অহংবৃত্তি।

(২) অন্তঃকরণের চরমপ্রান্তে ইন্দ্রিয়-গর্ভ মন= ইদংবৃত্তি।

(৩) অন্তঃকরণের মধ্য-ভূমিতে চিন্তা-লক্ষণাক্রান্ত চিত্তবৃত্তি।

জিজ্ঞাসু॥ এই বই না?! আমি ভাবিয়াছিলাম কত-কী না-জানি বিস্তীর্ণ ফালাও ব্যাপার?

প্রবোধয়িতা॥ "অন্তঃকরণের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গণিয়া-গাঁথিয়া হাতের মুঠার মধ্যে পাইলাম" মনে করিয়া তোমার আনন্দ ধরিতেছে না, তাই তুমি হর্ষ-বিস্ফারিত লোচনে বলিলে, "এই বই না!" কিন্তু হায়! তোমার ঐ সাধের সুখ-স্বপ্নটি ঝড়ের মুখে খড়ের ন্যায় উড়িয়া যাইবে একটু-পরেই-যখন তুমি শুনিবে যে, ঐ-টৈব-না পরিসর টুকুর ভিতরে দর্শন-সমুদ্রের তলা-ঘ্যাঁসা নিগূঢ় কথা চাপা দেওয়া রহিয়াছে অ্যাতো যে, সে-সমস্ত কথা একত্রে জড়ো করিয়া প্রদর্শন করিতে হইলে এখানকার এই ক্ষুদ্র নৈবেদ্য-ডালিটাতে তাহার স্থান-সংকুলন হওয়া একান্ত পক্ষেই অসম্ভব।

জিজ্ঞাসু॥ দর্শন-সমুদ্রের গভীর অন্তস্তরে অসংখ্য সারস্বত রত্ন গড়াগড়ি যাইতেছে—এটা আমি বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি, পরন্তু, সেই সমুদ্রে ডুব দিয়া আপনার মতো একজন ওস্তাদ্-ডুবুরী আমাহেন অনন্য-পরায়ণ শিষ্যকে তাহার কিয়দংশের ভাগী করিতে কেন-যে কার্পণ্য করিতেছেন, সেইটি আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রবোধয়িতা॥ তোমাকে যদি আমার লাভের অংশ কিছুই আমি না-দিব, তবে বোঝা-দুই তল্পিতল্পা-সমেত তোমাকে এতটা পথ হাঁটাইয়া এই সমুদ্রতীরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলাম কিসের জন্য? এইটিই কেবল তুমি জানো যে, সমুদ্রের গভীর অন্তস্তরে অসংখ্য রত্ন গড়াগড়ি যাইতেছে—এটা জানো না যে, সমুদ্রের অন্তস্তরে যেমন অসংখ্য রত্ন গড়াগড়ি যাইতেছে—সমুদ্রের উপরি-স্তরে তেম্নি অসংখ্য ডুবুরীর দল রাত্রি-দিন আনা-গোনা করিতেছে। দুঃখের কথা কী আর বলিব—ডুবুরী ভায়াদের উপদ্রবে সমুদ্রের রত্নভাণ্ডার খালি হইবার যোগাড় হইয়াছে। কি ভাগ্যি—দর্শন-সমুদ্রের এই সুনিভৃত স্থানটিতে এখনো পর্য্যন্ত সর্ব্বলুট্ ভায়াদের দৃষ্টি পড়ে নাই। এই সুনিভৃত স্থানটি কোন্ স্থান তাহা শুনিবে? এটা হ'চ্চে—সাংখ্য, বেদান্ত এবং জর্ম্মণ্য-দর্শনের সাগর-সঙ্গম, কিনা ঐক্যস্থান। এই স্থানটিতে ডুব দিয়া তোমার জন্য আমি গোটা-চা'র পাঁচ রত্ন আহরণ করিবার মৎলবে কোমর বাঁধিতেছিলাম:—কিন্তু তুমি যেরূপ বে-আন্দাজ অধৈর্য্য হইয়াছ—সব চেয়ে ভাল হয় আপ্নি-ভুমি যদি ঐ স্থানটিতে ডুব দিয়া দশ-বিশ গণ্ডা রত্ন সংগ্রহ করিয়া তাহার কিয়দংশ গুরুদক্ষিণা-স্বরূপে আমাকে প্রদান কর।

জিজ্ঞাসু॥ একটি দরিদ্র-সন্তানকে আপনি রাতারাতি বড়মানুষ করিয়া দিবার উপায় ঠাহরিয়াছেন অতি চমৎকার! ক্ষুদ্র-একরত্তি নালা'র হাঁটু-পরিমাণ জলে নাবিতে যাহার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়—তাহাকে আপনি বলিতেছেন সমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভের মধ্য হইতে মুঠা-মুঠা রত্ন হরিয়া আনিয়া পাড়াপ্রতিবাসী-দিগকে তাক্ লাগাইয়া দিতে! আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কথাটা তবে আপনাকে বলি:—আমার পাড়া'র কয়েকজন বিলাত-ফের্তা মহা-মহোপাধ্যায়ের পাল্লায় পড়িয়া আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়াছি। এই যে, একটি ঐতিহাসিক রহস্য-সমাচার বিগত বৎসরে আমি আপনার শ্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম—যে, কপিল-মুনি প্রভৃতি দেশীয় আচার্য্যেরাই দর্শন-শাস্ত্রের আদি গুরু; আর, পুরাতন গ্রীসের থেলীস্ হিরাক্লিটস্ পিথাগোরাস্ প্লেটো প্রভৃতি আচার্য্যেরা তাঁহাদের খাইয়াই মানুষ; তেম্নি আবার, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মধ্যমাব্দীয় এবং নবাব্দীয় আচার্য্যেরা পুরাতন গ্রীকাচার্য্যদিগের খাইয়াই মানুষ—আপনার মুখে শোনা এই প্রকৃত বৃত্তান্তটি খাঁটি সত্য-কথা বলিয়া আমার মনে হয়; কিন্তু আমার পাড়া'র ঐ মহা-পণ্ডিতদিগের মতে দর্শন-শাস্ত্রের একটি চির-প্রসিদ্ধ তত্ত্ব

হেগেলের পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না—সে তত্ত্বটি হ'চ্চে—"Becoming"! এই ধরণের প্রলাপ-বাক্য আরো কত কী যে, আমাকে দায়ে পড়িয়া ঘড়ি ঘড়ি শুনিতে হয়—কী আর বলিব! তাহার এক-একটি কথার বিষের ছিটায় আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া যায়। এ বিপদে আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কাণ্ডারী আমি কোথাও দেখিতে পাইতেছি না;—আপনি যদি আমাকে কাণ্ট্ এবং হেগেলের সহিত সাংখ্যবেদান্তের কোথায় কিরূপ মিল আছে তাহা দ্যাখাইয়া দ্যান্, তবে আমার কী যে উপকার করেন, তাহা একমুখে বলিতে পারি না; আর, তাহার পাল্টা প্রতিদান আপনাকে দিবার যোগ্যতা যদিচ আমার নাই, কিন্তু তাহা দিবার যিনি কর্ত্তা তিনি তাহা অজস্র পরিমাণে আপনাকে দিবেন—সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই।

প্রবোধয়িতা॥ সাংখ্যদর্শনের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কথাটি বিশেষ-মতে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে—ছোটো বড় মাঝারি—যেখানে যত বস্তু আছে, তাহার মধ্যেকার একটি-কোনো ক্ষুদ্রাৎক্ষুদ্র রেণু-কণাও অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিণত না হইয়া মুহূর্ত্ত-কালের জন্যও স্থির থাকিতে পারে না। এটা সাংখ্যেরই কথা যে, "পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপি অবতিষ্ঠন্তে।" এ যদি Becoming না হয়—তবে Becoming যে, কাহাকে বলে, তাহা জানি না! Becoming তো আর গাছে ফলে না! হেগেলের সহিত সাংখ্য-দর্শনের এ তো অতি সামান্য ঐক্য, ইহা অপেক্ষা গভীর মর্ম্মঘাঁসা গোড়ার ঐক্য যে, দুয়ের মধ্যে কিরূপ চমৎকার, তাহা ক্রমে দেখাইতে বাকি রাখিব না;—সে জন্য তুমি চিন্তা করিও না। কিন্তু—তুমি যদি আমার পরামর্শ শোনো—তবে, মহামহোপাধ্যায় বিলাতফের্ত্তা পণ্ডিতই হৌন্ আর যিনিই হৌন্—কাহারো সহিত বৃথা বাদ-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইও না; কেননা তাহা করিলে তোমার প্রকৃত জ্ঞানানুশীলনের পথে কাঁটা পড়িয়া যাইবে। দর্শন-রত্নাকরের পাশ্চাত্য ডুবুরীগণের মধ্যে হেগেল সর্ব্বাগ্র-গণ্য—এ কথা তো জগতে রাষ্ট্র! কিন্তু সেই কথাটার উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া যাঁহারা বলেন যে, দেশীয় সাংখ্য-বেদান্তের আচার্য্যগণ হেগেলের অপেক্ষা কোনো অংশে কম-ডুবুরী ছিলেন, তাঁহারা সাংখ্য-বেদান্তের উপরি-স্তরের গোটা চা'র-পাঁচ বাঁধী-গৎ ভিন্ন কিছুই জানেন না—নিতান্তই তাঁহারা "অল্প জলের তিত-পুঁটি—করেন তাই ভিরকুটি!" যাহাই হোক্ না কেন—হেগেলের Dialectic-প্রণালীটা একটা সর্ব্বনেশে কিম্ভূত-কিমাকার সৃষ্টি-ছাড়া বিদ্ঘুটে কাণ্ড! খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের জীর্ণ নৌকাখ'নি ডোবো-ডোবো করিতেছে দেখিয়া খ্রীষ্টীয় কাণ্ডারীরা অনতিপূর্ব্বে এক সময়ে হা'ল ছাড়িয়া দিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিলেন। ইতিমধ্যে হেগেলের Dialectic-রূপী শত যোজন-পরিমাণ পাকচক্রময় জল-সর্পটা সমুদ্র-বক্ষে ভাসিয়া উঠিল। খ্রীষ্টানধর্ম্মের কাণ্ডারীরা সেই বাসুকির প্রপৌত্রটিকে ডাঙা মনে করিয়া তাহার গাত্রে ক্রুশাকৃতি নোঙড় নিবদ্ধ করিয়া কিছুকালের মতো নৌকাটাকে আসন্ন বিপদ হইতে আটকাইয়া রাখিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের কাণ্ডারীরা প্রথমে সর্পের মস্তক-স্থানটিতে নোঙড় নিক্ষেপ করিলেন; কিয়ৎপরে মস্তকের নাড়া-চাড়া দৃষ্টে ভয় পাইয়া তাঁহারা সেখান হইতে সরিয়া আর-এক স্থানে নোঙড় করিলেন; তাহার পরে, সেই দ্বিতীয় স্থানের নাড়াচাড়া দৃষ্টে পূর্ব্ববৎ ভয় পাইয়া তৃতীয় আর-একটি স্থানে নোঙড় করিলেন। এই-রকম করিয়া দণ্ডে দণ্ডে সরিয়া সরিয়া পলাইয়া বেড়ানো'র নাম তাঁহারা দিয়াছেন—"Transcending business"।

কখনো বা তাঁহারা Hebrew Theism transcend করিয়া Christian Theismএ আড্ডা গাড়েন; কখনো বা Christian Theism transcend করিয়া Christian Pantheism-এ আড্ডা গাড়েন; কখনো বা Christian Pantheism transcend করিয়া Christian occul-tismএ আড্ডা গাড়েন।

এইরূপ করিয়া কুণ্ডলী-পাকানো প্রকাণ্ড সর্পদেহটার চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া এযাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা কষ্টে-স্রেষ্টে কোনো-মত-প্রকারে নৌকা-ডুবি হইতে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু আর বেশী দিন তাঁহাদিগকে এরূপ ঘোর-পাক খেলিতে হইবে না:—সর্প-বেচারীটা নোঙড়ের ঘায়ে আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত হওনের জ্বালায় অধীর হইয়া পাতালে ডুব দিবার উপক্রম করিতেছে। হেগেলীয়

Dialectic-এর ভেল্কিবাজির প্যাঁটরা'টা আপাতত-কা'র মতো তোমার স্মরণাগারের নিভৃত কোটরে ঢাকাঢুকি দেওয়া থা'ক্; পরে সাংখ্যের চাবি দিয়া তাহার ডালা খুলিয়া তাহার ভিতরে কি আছে না-আছে তাহার সন্ধান লওয়া যাইবে। এখন কিন্তু ক্যান্টের প্রকল্পিত অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিভাগ হইতে যাত্রারম্ভ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের নবাব্দীয় দর্শনকারদিগের আদিগুরু যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তবে তিনি হ'চ্চেন—জগদ্-বিখ্যাত Immanuel Kant। কাণ্ট্ আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের ন্যায় সত্যৈকলক্ষ্য তদ্গতচিত্ত সাধু মহাত্মা ছিলেন—Dialecticবাজ-দিগের ন্যায় লুকাচুরি খেলিতে জানিতেন না মূলেই। তাই, কাণ্টের প্রকল্পিত অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিভাগের সহিত সাংখ্য-বেদান্তের ঐক্যই দেখিতে পাওয়া যায় ভূরি পরিমাণে—অনৈক্য একটু আধ্টু যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নাম-মাত্র। অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিভাগ-সম্বন্ধে কাণ্টের গোড়া'র কথাটি এই :—

Our knowledge springs from two fundamental sources of our soul ; the first receives representations, the second is the power of knowing an object by these representations. By the first an object is given us, [এটা হ'চ্চে ইদংবৃত্তি = ইন্দ্রিয়গর্ভ মন], by the second the object is thought, [এটা, যেমন শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "চিত্তং অর্থস্ত চিন্তনাৎ," বিষয়ের চিন্তন—এই অর্থে চিত্ত]·········The understanding (বুদ্ধি) cannot see, the senses (ইন্দ্রিয়) cannot think. By their union only can knowledge be produced.

দেশীয় আচার্য্যদিগের ন্যায় কাণ্ট্ বুদ্ধি (understanding) এবং চিত্ত (Faculty of thinking) এই দুই অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে আবশ্যক-মতে কখনো বা অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন, কখনো বা বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। দেশীয় আচার্য্য-দিগের ভিন্নাভিন্ন দৃষ্টির দুইটি নমুনা দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

চিত্ত এবং বুদ্ধিকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখনের নমুনা।

সাংখ্যদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০শ সূত্রের প্রবচন-ভাষ্যে লেখে—"চিন্তাবৃত্তির্হি ধ্যানাখ্যা সর্ব্ববৃত্তিভ্যঃ শ্রেষ্ঠা। তদাশ্রয়তয়া চ চিত্তাপরনাম্নী বুদ্ধিরেব শ্রেষ্ঠা।" ইহার বাংলা :—

ধ্যানাখ্যা চিন্তা-বৃত্তি সকল-বৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠা; আর, সেই চিন্তা-বৃত্তির আশ্রয়তা-প্রযুক্ত বুদ্ধি—যাহার আরেক নাম চিত্ত, তাহাই শ্রেষ্ঠা।

চিত্ত এবং বুদ্ধিকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখানোর নমুনা।

সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহের ৩৪৫ শ্লোকে শঙ্করা-চার্য্য বুদ্ধি এবং চিত্তের মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন এইরূপ :—"বুদ্ধি রর্থস্য নিশ্চয়াৎ—চিত্ত মর্থস্ত চিন্তনাৎ" ইহার ভাবার্থ এই যে, বুদ্ধি অর্থ নিশ্চয় করে, কিনা বিষয় অবধারণ করে ; চিত্ত বিষয় চিন্তা করে।

কাণ্টের পরিভাষায়—Cognitive faculty as চিন্তা-লক্ষণাক্রান্ত চিত্ত = Understanding ; the same as নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি = Judgment।

ইন্দ্রিয়-গর্ভ মন বা ইদংবৃত্তি, এবং, চিন্তালক্ষণাক্রান্ত চিত্তবৃত্তির ব্যাপার-ভেদ-সম্বন্ধে কাণ্টের গোড়ার কথা এইটি :—

"The manifold [বিষয়-বৈচিত্র্য] of representations may be given in an intuition [in ইদংবৃত্তি] which is purely sensuous [ঐন্দ্রিয়ক], that is, nothing but receptivity [বিষয়-গ্রাহিতা] ... ... But the connection (*conjunctio* = সংযোগ) of anything manifold can never enter into us through the senses,······for it is a spontaneous act of the power of representation ; and as, in order to distinguish this from sensibility [from ইন্দ্রিয়-চেতনা], we must call it understanding [চিত্ত-বৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি], we see that all connecting [অন্বয়-ক্রিয়া], whether we are conscious of it or not, and whether we connect the manifold of intuition [ঘটপটাদি বিষয়-বৈচিত্র্য'কে] or several concepts [ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান বৈচিত্র্য'কে] together, and again, whether that intuition be sensuous or not [ঐন্দ্রিয়ক or not], is an act of the understanding. This act we shall call by the general name of synthesis in order to show that we cannot represent to ourselves anything as connected in the object, without having previously connected it ourselves and that of all representations connection [সংযোগ] is the only one which cannot be given through the objects, but must be carried out by the subject itself, because it is an act of spontaneity [এক কথায়—বিষয়ের reception = ইদংবৃত্তি, বিষয়ের connection = অহংবৃত্তি"].

পঞ্চদশী-প্রণেতা যে কথাটি বহুপূর্ব্বে বলিয়া পাট্টি হইয়া বসিয়া আছেন—কাণ্ট সেই কথাটিই বলিলেন ;

তবে কি না—**খুব বিচক্ষণতার সহিত আট-ঘাট বাঁধিয়া**। কথাটি সে এই বই না :—

"অহংবৃত্তি রিদংবৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদ্ অহংবৃত্তি রিদংবৃত্তি র্মনো ভবেৎ॥"

ইহার বাংলা :—অন্তঃকরণ বৃত্তি-ভেদে দুইপ্রকার; তাহার মধ্যে—(১) অহংবৃত্তি=বুদ্ধি, (২) ইদংবৃত্তি=মন।

মনে কর একটি পাঠশালার বালক—"রা" "মা" "য়" "ণ"—এই চারিটি অক্ষর একে একে মুখে উচ্চারণ-পূর্ব্বক লেখ্য কাগচে ধীরে-ধীরে লিপিবদ্ধ করিতেছে। কাণ্ট্ বলিতেছেন যে, ওরূপ স্থলে অক্ষর-চারিটির উচ্চারিত-ধ্বনি এবং লিখিত-মূর্ত্তি-চারিটিই **কেবল-মা** বালকটির ইন্দ্রিয়-গোচরে একে-একে উপস্থিত হয়; তা বই—উহাদের মধ্যেকা'র সংযোগ-সূত্রটি (synthesis) ইন্দ্রিয়-গোচরে উপস্থিত হয় না;—**সংযোগ-সূত্রটি** শিশু-লেখক নিজে হইতে প্রসারণ করিয়া তাহা দিয়া লিখিত-মূর্ত্তি এবং উচ্চারিত-ধ্বনি-চারিটা গাঁথিয়া ফ্যালে, গাঁথিয়া ফেলিয়া —"রামায়ণ"—এই গোটা-শব্দটা'কে জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচরে আনিয়া দাঁড়-করায়। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়-গোচরে বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থিত হওয়া-টা জ্ঞাতা পুরুষের কর্ত্তৃত্ব-নিরপেক্ষ; আর, ইন্দ্রিয়-গত বিভিন্ন বিষয়'কে সংযোগ-সূত্রে গাঁথিয়া জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচরে আনিয়া দাঁড়-করানো-টা জ্ঞাতা পুরুষের কর্ত্তৃত্ব-সাপেক্ষ। বুদ্ধি-বৃত্তি বা চিত্ত-বৃত্তি জ্ঞাতাপুরুষের কর্ত্তৃত্ব-সাপেক্ষ গাঁথন ক্রিয়া (synthesis) বলিয়া পঞ্চদশীতে বুদ্ধি-বৃত্তি "অহংবৃত্তি" নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে, আর, কাণ্ট্ পঞ্চদশীর সেই অহং-বৃত্তিটির উপরেই বুদ্ধি-তত্ত্বটিকে নানাপ্রকার যুক্তির বাঁধুনি দিয়া অটল-রূপে দাঁড় করাইয়াছেন।

জিজ্ঞাসু॥ এটা যেন বুঝিলাম যে, "ইন্দ্রিয়গত **বিভিন্ন** বিষয়কে সংযোগ-সূত্রে গাঁথিয়া জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচরে আনিয়া দাঁড়-করানো-টা জ্ঞাতা পুরুষের কর্ত্তৃত্ব-সাপেক্ষ"। কিন্তু, যদি **বিভিন্ন** বিষয়ের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ-কেবল **একটি মাত্র** বিষয়—যেমন এই একটি-মাত্র ধ্বনি—ইন্দ্রিয়-গোচরে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির গাঁথন-ক্রিয়া (synthesis) **চলিবে** যে কেমন করিয়া, সেইটি আমি এখনো পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না :—একটি-মাত্র পুষ্পে তো আর মালা-গাঁথা চলিতে পারে না।

প্রবোধয়িতা॥ এটা তো তুমি জানো যে, বৈয়াকরণিক ভাষায়—হ্রস্ব ই+হ্রস্ব ই=দীর্ঘ ই (অর্থাৎ ঈ), এবং **পাণিত** ভাষায়—৷৷০ই+৷৷০ই=১ই। এটাও তেম্নি তোমার জানা উচিত যে, ৷০ই+৷০ই=৷৷০ই; ৵০ই+৵০ই=৷০ই; ⁄০ই+⁄০ই=৵০ই। এমতে পাইতেছি—

১ই (অর্থাৎ ঈ)=৷৷০ই+৷৷০ই
=৷০ই+৷০ই+৷০ই+৷০ই
=৮(৵০ই)=১৬(⁄০ই)

গানের গিট্‌কিরিতে ৵০ই'র অভাব নাই; আর, মীড় বা গমকে ⁄০ অপেক্ষাও হ্রস্বতর ই'র অভাব নাই। তবেই হইতেছে যে, তুমি যাহাকে বলিতেছ "একটি-মাত্র দীর্ঘ ই" তাহা অসংখ্য হ্রস্বাৎ হ্রস্বতম ই'এর সমষ্টি। অতএব এটা স্থির যে, ইন্দ্রিয়ের জল-স্রোতে বিষয়-সকল সফরী-বৃন্দের ন্যায় দল বাঁধিয়া যাওয়া-আসা করে, আর, ধী-ধীবর সেই পলায়ন-পরায়ণ বিষয়-বৃন্দ'কে সংযোগ-সূত্রের (synthesis-এর) জালে বাঁধিয়া জল হইতে ডাঙায়—ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞানে—টানিয়া তোলে। আমার ঘর-গড়া রূপকের ভাষায় এ-যাহা আমি বলিলাম, ইহাতে যদি তোমার প্রত্যয় না হয়, তবে কাণ্ট্ তাঁহার চাঁচা-ছোলা বৈজ্ঞানিক ভাষায় তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির কিরূপ উত্তর প্রদান করিতেছেন তাহা মুহূর্ত্তেক ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ কর :—

কাণ্ট্ বলিতেছেন—

If every single representation stood by itself, as if isolated and separated from the others, nothing like what we call knowledge could ever arise, because knowledge forms a whole of representations connected and compared with each other. If therefore I ascribe to the senses a synopsis,* because in their intuition they contain something manifold, there corresponds to it always a synthesis, and (অর্থাৎ and because) receptivity [ইদংবৃত্তি] can make knowledge possible only when joined with spontaneity [*i.e.* with অহংবৃত্তি].

* সাংখ্যের পরিভাষায়, synopsis=আলোচন। opsis=sight=লোচন; synopsis=আলোচন। সাংখ্যকারিকা'র ২৮শ সূত্রে লেখে "শব্দাদি পঞ্চানাং আলোচনং ইষ্যতে বৃত্তিঃ"। ইহার

জিজ্ঞাসু ॥ আপনিই বলিতেছেন "spontaneity = অহংবৃত্তি", কিন্তু কাণ্ট্ তাঁহার অতগুলি কথার মধ্যে অহংবৃত্তির, একটিবার, নামও তো করেন নাই।

প্রবোধয়িতা ॥ এ'কেই বলে "গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি!" কাণ্ট্ কী বলেন—শুনিবে? শোনো তবে!

কাণ্ট্ বলেন—

"It must be possible that *the I think* [অহং-বৃত্তি] should accompany all my representations : for otherwise something would be represented within me that could not be thought, in other words, the representation would either be impossible or nothing. That representation which can be given before all thought, is called intuition [ইদংবৃত্তি], and all the manifold of intuition [ইদংবৃত্তির বিচিত্র বিষয়-সকল] has therefore a necessary relation to *the I think* [to অহংবৃত্তি] in the same subject in which that manifold of intuition is found. That representation, however (that *I think*), is an act of *spontaneity*, that is, it cannot be considered as belonging to sensibility."

অতএব, "spontaneity = অহংবৃত্তি" এটা কাণ্টেরই একটি গোড়া'র কথা, তা'বই, আমার ওটা-একটা স্বকপোলকল্পিত গোঁজা-মিলন নহে। কাণ্ট আর-খানিকটা পরে বলিতেছেন—

"The thought that the representations given in intuition belong all of them to me, is therefore the same as that I connect them in one self-consciousness, or am able at least to do so......Connection, however, does never lie in the objects, and cannot be borrowed from them by perception [by ইদংবৃত্তি], and thus be taken into the understanding, but it is always an act of the understanding, which itself is nothing but the faculty of connecting *a priori*, and bringing the manifold of given representations [উপস্থিত বিষয়-বৈচিত্র্য'কে] under the unity of apperception [of অহংবৃত্তি], which is in fact, the highest principle of all human knowledge."

বাংলা :—শব্দাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি = আলোচন। তত্ত্ব-কৌমুদী ভাষ্যে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইরূপ :—"বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং সম্মুগ্ধ-বস্তু-দর্শনং আলোচনং উক্তং"। ইহার বাংলা :—জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগের কর্তৃক সম্মুগ্ধ-বিষয় দর্শন আলোচন শব্দের বাচ্য। 'সম্মুগ্ধ বিষয়-দর্শন' অর্থাৎ উপস্থিত দৃশ্য বিষয়-টা'কে জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচরে আনিয়া দাঁড় করাইবার পূর্ব্বে "কী দেখিতেছি তাহা জানি না—কেবল দেখিতেছি-মাত্র" এই-রকম সমুগ্ধ ভাবে, কিনা জ্ঞানশূন্য ভাবে, দৃশ্য বিষয়টা'র পানে জ্যাল্-জ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকা।

কাণ্ট্ কী বলেন—শুনিলে? এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্যাঁকরা'র ঠুক্ঠাক্ ভালবাসো—না কামারের অ্যাক্ ঘা ভালবাসো?

জিজ্ঞাসু ॥ যে ব্যক্তির হাতে অবকাশের অন্ত নাই—স্যাঁকরা'র ঠুক্ঠাক্ সে ব্যক্তি'র কাণে ভাল বই মন্দ লাগে না; পরন্তু, যে ব্যক্তি কাণে শোনা সামগ্রী কাজে খাটাইয়া তাহা হইতে ফল ফলাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দণ্ডায়মান, সে ব্যক্তি কামারের অ্যাক্ ঘা' শুনিতেই ইচ্ছা করে।

প্রবোধয়িতা ॥ কাণ্টের এই যে—"Synthesis = spontaneity = the I think = the understanding," তথৈব, "Intuition = Receptivity = That representation which can be given before all thought"—এই সকল স্যাঁক্‌রার ঠুক্ঠাক্ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তবে পঞ্চদশীর লোহা'র কারখানা'র ভিতরে প্রবেশ করিলেই তুমি আনন্দিত-হইবে-শুনিয়া—"বিজ্ঞানং স্যাদ্ অহংবৃত্তি রিদংবৃত্তি র্মনো ভবেৎ" "অহংবৃত্তি = বুদ্ধি, ইদংবৃত্তি = মন"। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—সেটি ভুলিলে চ'লিবে না;—সে কথাটি এই :—

কামারের অ্যাক্ ঘায়ে শুধু-কেবল, দা, কোদাল, লাঙলের ফাল প্রভৃতি স্থূল-ধাঁচা'র লৌহ-সামগ্রী-সকলের প্রণয়ন-কার্য্যই চলিতে পারে—বিধিমত-প্রকারে, তা বই, বলয় কঙ্কণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ধাঁচার অলঙ্কারের প্রণয়ন-কার্য্য, কিম্বা, স্বর্ণরজতময় লতা-পত্রাদির জাল-বুনানি-কার্য্য (filigree work) চলিতে পারে না। আছেই তো কথা—"যা'র কাজ তা'কেই সাজে, অন্যের মাথায় লাঠি বাজে।" কর্ম্মকারের কাজ কর্ম্মকার'কেই সাজে—স্বর্ণকারের কাজ স্বর্ণকার'কেই সাজে। পঞ্চদশী-প্রণেতা'র ন্যায় যাঁহারা সাধকদিগের উপকারার্থে দর্শন-শাস্ত্রের মোট্ মোট্ কথাগুলি লোহা'র পদ্য-কোষে সম্বৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন—কামারের অ্যাক্ ঘা তাঁহাদের লৌহপিণ্ডের উপরে দণ্ড-নিপাতক কড়া-পড়া হস্তেই মানায়; তা বই, কাণ্টের ন্যায় যাঁহারা দার্শনিক তত্ত্ব-সকলের দশ-পুরু খোসা একটি একটি করিয়া ছাড়াইয়া তাহার ভিতর হইতে সন্তর্পণের সহিত শাঁস্ বাহির করিতে,

চেষ্টা করেন, তাঁহাদের বালির মধ্য হইতে চিনি-বাছা চুল-চিরণ-পটু হস্তে তাহা মানায় না। পঞ্চদশী-প্রণেতা, কামারের অ্যাক্ ঘায়ে অন্তঃকরণ'কে—অহংবৃত্তি এবং ইদংবৃত্তি—এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াই শুধু সন্তুষ্ট না হইয়া, তেমিতর আর অ্যাক্ ঘায়ে খণ্ডাংশ-দুটা একত্রে জোড়া দিয়া বেস্-একটি দার্শনিক কাজের-জিনিস্ গড়িয়া-তুলিয়াছেন। 'জিনিস্টা-সে এই :—

"অহং প্রত্যয়-বীজত্বং ইদংবৃত্তে রতিস্ফুটং।
অবিদিত্বা স্ব মাত্মানং বাহ্যং বেদ নতু ক্বচিৎ॥"

ইহার বাংলা।

"ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কী হইতে পারে যে, অহংবৃত্তিই ইদংবৃত্তি'র বীজ? এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, আপনাকে না-জানিয়া কেহ কখনও বাহ্য বিষয় জানে না।" ইদংবৃত্তির সহিত অহংবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা-টি পঞ্চদশী অ্যাক্ ঘায়ে এই যাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন -এই কথাটিই কাণ্ট্ তন্ন-তন্ন-রূপে বিবৃত করিয়া ভাঙিয়া বলিয়াছেন এইরূপ :—

"The highest principle of the possibility of all intuition, in relation to sensibility, was according to the transcendental Æsthetic, that all the manifold in it should be subject to the formal conditions of space and time. The highest principle of the same possibility in relation to the understanding is that all the manifold in intuition must be subject to the conditions of the synthetic unity of apperception."

কাণ্ট্ বলিতেছেন—দুইটি বিষয় দ্রষ্টব্য :—একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, intuitionএর (অর্থাৎ ইদংবৃত্তির) বিষয়-বৈচিত্র্য (manifold) প্রথম দফায় দেশ-কালের বাঁধে আটকানো থাকে; আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, ঐ-যে manifold of intuition কিনা ইদংবৃত্তির বিষয়-বৈচিত্র্য যাহা প্রথম দফায় দেশ-কালের বাঁধে আট্কানো থাকে, উঁহাই দ্বিতীয় দফায়—synthetic unity-of-appcerptionএর, অর্থাৎ অহংবৃত্তির সংযোগাত্মক ঐক্য-সূত্রের, টানা জালে আটক-পড়িয়া যায়। যে ইদংবৃত্তি, প্রথম দফায়, শুধু-কেবল দেশ-কালের বাঁধে আটক-পড়িয়া-থাকা বিক্ষিপ্ত বিষয়-বৈচিত্র্যে ব্যাপৃত হয়, সেই ইদংবৃত্তি দ্বিতীয় দফায়—অহংবৃত্তির সংযোগাত্মক ঐক্যসূত্রের জালে-জড়ানো জমাট্ বাঁধা বিষয়-বৈচিত্র্যে ব্যাপৃত হয়। প্রথম দফার ইদংবৃত্তি=একমেটে ইদংবৃত্তি=কাঁচা intuition; দ্বিতীয় দফার ইদংবৃত্তি=দোমেটে ইদংবৃত্তি=পাকা intuition। পাকা intuitionই প্রকৃত প্রস্তাবে intuition—কাঁচা intuition intution-এর অপরিস্ফুট আভাস-মাত্র। কাণ্টের মোট মন্তব্য কথাটা এই :—জ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে, ইদংবৃত্তির পক্ষে দেশকালের বাঁধে আট্কানো থাকা যেমন আবশ্যক—বুদ্ধির উপলব্ধি-গোচরে উপস্থিত হইতে হইলে অহংবৃত্তির সংযোগাত্মক ঐক্য-সূত্রের জালে ধরা পড়া তাহাদের পক্ষে তেমি আবশ্যক। সংক্ষেপে :—দেশকালাবচ্ছিন্ন একমেটে কাঁচা ইদংবৃত্তির বিষয়-বৈচিত্র্য'কে বুদ্ধির উপলব্ধি-গোচরে আনিয়া দাঁড় করাইতে হইলে—বিষয়-বৈচিত্র্যটার গায়ে অহংবৃত্তির বজ্র-লেপ (অর্থাৎ জমাট্ বাঁধনী প্রলেপ—cement) মাখাইয়া একমেটে কাঁচা ইদংবৃত্তিটা'কে দোমেটে করিয়া পাকাইয়া তোলা আবশ্যক *। 'বুঝিতে পারিলে কি?

জিজ্ঞাসু॥ আমার মন (=কল্পনা) বলিতেছে—"ভাবটা যেন কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছি"; চিত্ত (=চিন্তা) বলিতেছে—"তাহা না-বুঝিতে পারা'র-ই আর এক নাম"। একটা দৃষ্টান্ত দ্যাখান্ যদি—ভাল হয়।

প্রবোধয়িতা॥ "শ্রী" এই শব্দটি'র কয়-টি অবয়ব, তাহা কখনো ঠাহরিয়া দেখিয়াছ কি?

জিজ্ঞাসু॥ তিনটি মাত্র। তা'র সাক্ষী—শ্রী=শ্+র্+ঈ।

প্রবোধয়িতা। দীর্ঘ ই (কিনা ঈ) কয়টি অবয়বে বিভক্ত?

জিজ্ঞাসু॥ কিয়ৎপূর্ব্বে দীর্ঘ-ই'এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আমাকে আপনি যেরূপ ভাগ ভাগ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাই আমার বিবেচনায় খুব ঠিক। আপনি দেখাইয়াছিলেন—"১ই (অর্থাৎ ঈ)=॥০ই+॥০ই
=।০ই+।০ই+।০ই+।০ই
=৮(৶০ই)=১৬(৵০ই)

---

* বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায়—বজ্রলেপ=plaster of-Paris-এর ন্যায় শক্ত cement।

প্রবোধয়িতা॥ তবেই হইতেছে যে,

শ্রী = শ্‌ + র্‌ + /০ই + /০ই + /০ই + /০ই + /০ই + /০ই
+ /০ই + /০ই + /০ই + /০ই + /০ই + /০ই
+ /০ই + /০ই + /০ই + /০ই

এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, ঐ যোলো-টি /০ইএর কোনোটিকে তাহার দুই পার্শ্বের দুইটি সঙ্গীর সংস্রব হইতে ছাড়াইয়া লইয়া- কেবলমাত্র সেই সঙ্গ-বিহীন /০ই-ধ্বনিটি, তুমি, মুখে উচ্চারণ করিতে বা কর্ণে শ্রবণ করিতে পারো কি না?

জিজ্ঞাসু। সঙ্গ-বিহীন হসন্ত হল-বর্ণ—যেমন শ্‌, র্‌, আর, সঙ্গ-বিহীন এক আনা-মাত্রা স্বরবর্ণ—যেমন /০ই, দুইই এক বিষয়ে সমান:—দুয়ের কোনোটিই মুখে উচ্চারণ করা-ও যায় না, কাণে শুনিতে পাওয়া-ও যায় না; অনুচ্চারণীয়তা এবং অশ্রবণীয়তা বিষয়ে দুইই নিক্তির ওজনে সমান।

প্রবোধয়িতা॥ আমি তাই বলি যে, অ্যাক-যাত্রায় পৃথক্ ফল যেহেতু দেখিতে ভাল দ্যাখায় না—এই হেতু অনভিব্যঞ্জ্য (অর্থাৎ অনুচ্চারণীয় এবং অশ্রবণীয়) বর্ণ-সাধারণের সংকেত-চিহ্ন একই রকম হইলে ভাল হয়। "/০ই" ইহার পরিবর্ত্তে—এক আনা মাত্রা স্বরের সংকেত, "ই্‌", এইরূপ হইলেই মানায় ভাল। এমতে পাইতেছি—

শ্রী = শ্‌ + র্‌ + ১৬ই্‌

অতঃপর নিম্নে চাহিয়া দেখ :—

ক॥ শ্‌, র্‌, ই্‌, ই্‌,...১৬শ ই্‌—

দেশকালের বাঁধে আট্‌কানো—একমেটে কাঁচা ইদংবৃত্তির বিক্ষিপ্ত বিষয়-বৈচিত্র্য।

খ॥ + + + + ...১৭শ + = অহংবৃত্তির সংযোগাত্মক ঐক্য-সূত্রের টানা জাল = অহংবৃত্তির বজ্র-লেপ।

গ॥ ক-স্থানীয় বিক্ষিপ্ত বিষয়-বৈচিত্র্যের গায়ে খ-স্থানীয় বজ্রলেপ মাখাইয়া একমেটে কাঁচা ইদংবৃত্তিকে দোমেটে করিয়া পাকাইয়া তোলা হয় এইরূপে :—

শ্‌ + র্‌ + ই্‌ + ই্‌ + ই্‌ + ... + ১৬শই = অহংবৃত্তির বজ্র-লেপ-মাখানো—দোমেটে পাকা ইদংবৃত্তির বিষয়-বৈচিত্র্য।

ঘ॥ অহংবৃত্তির কিনা বুদ্ধিবৃত্তির গোটা বিষয় = শ্রী। *

এখন বুঝিতে পারিলে?

জিজ্ঞাসু॥ অনেকটা বুঝিয়াছি—কেবল একটি বিষয় এখনো আমার বুঝিতে বাকি আছে। সে বিষয়টি এই :—গায়ক যেমন গমকের মধ্যদিয়া বিস্পষ্ট গীত স্বরে অবতরণ করে, অদ্বৈত-বাদী তেমি "সোঽহং" বলিবার সময় মাঝের লুপ্ত অকারটা ঈষৎ ছুঁইয়া শেষের "হং" শব্দটিতে অবতরণ করেন। লুপ্ত অকার, গীতের গমকের ন্যায় অতীব দ্রুত-মাত্রা অকার। আপনার প্রস্তাবিত নূতন স্বর-লিপি অনুসারে—

দীর্ঘ অ = আ = ১অ = ২(৷৷০অ) = ৪(৷০অ) = ৮(৵০অ)।

ইহা দৃষ্টে, এটা বেস্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ৵০ অকারটিই = লুপ্ত অকার = গমক-অকার।

এখন আমি বলিতে চাই এই যে, নিঃসঙ্গ হসন্ত বর্ণ—যেমন, শ্‌, কিংবা, র্‌,—উচ্চারণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই যখন আমি তাহা মুখে আনিতে পারিয়া উঠি না, তখন খাঁটি হসন্ত বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বরবর্ণ-মিশ্রিত একপ্রকার মেকী হসন্ত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া দুধের সাধ ঘোলে মেটাই? "শ্‌" বলিতে না পারিয়া—বলি "হশ্‌", "র্‌" বলিতে না পারিয়া—বলি "হর্‌"। হশ্‌ = ৵০অ + শ্‌, তা বই, তাহা খাঁটি শ্‌ নহে, তথৈব, হর্‌ = ৵০অ + র্‌, তা বই, তাহা খাঁটি র্‌ নহে, ইহা বলা বাহুল্য। ফল কথা এই যে, দ্বিতীয় বর্ণের সঙ্গবর্জ্জিত একটি-মাত্র-শুধু খাঁটি হসন্ত বর্ণ উচ্চারকের মুখেও বেরো'য় না—শ্রোতার কাণেও ধরা দ্যায় না। তেমি আবার, যাহাকে আপনি বলেন

* কোনো প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, শ্রী-ধ্বনিটা percept মাত্র—intuitionএর বিষয় মাত্র, তা বই, তাহা বুদ্ধির উদ্ভাবিত concept নহে। তাহা যদি বলেন, তবে তাঁহার জানা উচিত যে, 'this man is mortal" এই ন্যায়-শাস্ত্রীয় propositionটার Subject (লক্ষ্য বিষয়)—this man; আর সেই জন্য "this man" Singular শ্রেণীর concept ইহা বলা বাহুল্য। প্রতিবাদীর এটাও জানা উচিত যে, কাণ্টের—"Quantity" নামক একটি categoryর তিনটি অবান্তর বিভাগ—(১) Universal, (২) Particular, (৩) Singular; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, Singular শ্রেণীর conceptকে (অথবা, যাহা একই কথা, intuitionএর বিষয়কে—Perceptকে) conceptএর কোটা হইতে বর্জ্জিত করা কাণ্টের মত-বিরুদ্ধ। তা' শুধু না—কাণ্টের এটা একটা বিশেষ-প্রকারের মন্তব্য কথা যে, শ্রী-ধ্বনি এবং this-man-Johnএর ন্যায় ইদংবৃত্তির বিষয়ের মধ্যেও—perceptএর মধ্যেও—বুদ্ধি-সম্ভূত concept সংভুক্ত রহিয়াছে। কাণ্টের এই বিশেষ-ধাঁচার মন্তব্য-কথাটিরই দৃষ্টান্ত উপরে দেখানো হইল।

"ই্" কিনা /০ই, তাহাও তদ্বৎ। তবেই হইতেছে যে, দ্বিতীয় বর্ণের একেবারেই সংস্রব-রহিত নিঃসঙ্গ শ্, বা নিঃসঙ্গ র্, বা নিঃসঙ্গ ই্ শ্রবণে শুনিতে পাওয়া একান্ত-পক্ষেই অসম্ভব। তাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য; আর সেই-জন্য, তাহা কোনো প্রকার ইদংবৃত্তিরই বিষয় নহে; একমেটে ইদংবৃত্তিরও না—দোমেটে ইদংবৃত্তিরও না। তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, নিখুঁত খাঁটি নিঃসঙ্গ শ্, বা র্, বা ই্=একমেটে কাঁচা ইদংবৃত্তি'র দেশকালাবচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিষয়? যাহা মূলেই ইন্দ্রিয়ের গম্য নহে, তাহাকে কেমন করিয়া বলিব "ইদংবৃত্তির দেশকালাবচ্ছিন্ন বিষয়?"

প্রবোধয়িতা॥ আমার এই মোটামুটি-ভাবে প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত-বেচারীটির উপরে কূট-প্রশ্নের খোঁচা-খুঁচি যেরূপ তুমি আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে কেঁচো খুঁড়িতে-খুঁড়িতে সাপ বাহির হইবার আটক নাই। কিন্তু, তথাপি, তোমার মনের ধুক্‌পুকুনি ঠাণ্ডা করিবার জন্য—এখানকার এই স্থূল-ধাঁচার দৃষ্টান্তটির ভিতরে সূক্ষ্ম-ধাঁচার যে-একটি নিগূঢ় রহস্য চাপা দেওয়া আছে, তাহা তোমাকে খুলিয়া-খালিয়া দেখানোই শ্রেয়ঃকল্প মনে করিতেছি; অতএব প্রণিধান কর:—কাণ্টের মতে—দেশকালের ও-পিঠের অতীন্দ্রিয় বিষয়—যেমন শ্, র্, ই্ ইত্যাদি—দেশকালের জোয়ালে ঘাড় পাতিবা-মাত্রই তাহা অহংবৃত্তির টানা জালে আটক পড়িয়া যায়। পঞ্চদশী-প্রণেতা যেমন বলিয়াছেন "আপনাকে না জানিয়া কেহ কখনো বাহ্য বিষয় জানে না", কাণ্ট্‌ও তেমি বলেন যে, দেশকালের ওপিঠের বস্তু অহংবৃত্তির সংযোগ-সূত্রে গাঁথন-যোগ্য জ্ঞেয়-মূর্ত্তি পরিগ্রহ না-করিয়া অজ্ঞেয় নিজমূর্ত্তিতে দেশকালের চৌকাট মাড়াইতে পারে না। তবে কি না—প্রথমাবস্থায় একমেটে ইদংবৃত্তির বিষয়-বৈচিত্র্যের তলে-তলে অহংবৃত্তি এরূপ নিগূঢ় এবং অনির্ব্বচনীয় ভাবে কার্য্য করে যে, যে তাহা না বোঝে তাহাকে তাহা বোঝানো কঠিন;* আর, কঠিন বলিয়া এ জায়গাটিতে আমি তাহাকে ঘাঁটাইতে অনিচ্ছুক। যাহাই হোক্ না কেন—এটা খুব সহজ বোঝা যাইতে পারে যে, একমেটে ইদংবৃত্তির বিষয়-বৈচিত্র্য দেশকালের বাঁধে আট্‌কা পড়িলে—অহংবৃত্তি দৌড়িয়া আসিয়া সেই এক-মেটে ইদংবৃত্তির দেশকালাবচ্ছিন্ন বিষয়-বৈচিত্র্যকে আপনার বজ্রলেপের আঁটুনি'র গুণে জমাটবদ্ধ করিয়া দোমেটে ইদং-বৃত্তির হস্তে তাহাকে সঁপিয়া দ্যায়।

এটা অবশ্য তুমি মানো যে, "শ্রী" এই গোটা শব্দটা যখন বহিরাকাশ হইতে আসিয়া তোমার শ্রবণাকাশে ধ্বনিত হইয়াছিল তখন—প্রথম মুহূর্ত্তে শ্, দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে র্, তৃতীয় মুহূর্ত্তে প্রথম ই্, চতুর্থ মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় ই্, পঞ্চম মুহূর্ত্তে তৃতীয় ই্—এইরূপ করিয়া আঠারোটি শব্দাঙ্গ একটির পর আর-একটি তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে পৌঁছিয়াছিল। এটাও বোধ করি তুমি মানো যে, এক-একটি শব্দাঙ্গ এক-একটি **কাল**-মুহূর্ত্তে ভর করিয়া তোমার শ্রবণের **দেশ**-খণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিল, তবেই হইতেছে যে, শব্দাঙ্গগুলির প্রত্যেকেই ছিল **কালে** এবং **দেশে** ব্যবচ্ছিন্ন। তাহা যদি কালে ব্যবচ্ছিন্ন না হইত, তাহা হইলে তুমি বলিতে পারিতে না যে, শব্দাঙ্গগুলি একে একে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে পৌঁছিবার সময় যে-শব্দাঙ্গটা প্রথম মুহূর্ত্তে পৌঁছিয়াছিল সেটা "র্" না—সেটা "শ্"; দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে যেটা পৌঁছিয়াছিল সেটা শ্ না—সেটা র্; তৃতীয় মুহূর্ত্তে যেটা পৌঁছিয়াছিল সেটা শ্-ও না, র্-ও না,—সেটা ই্। আর, শব্দাঙ্গগুলির প্রত্যেকে যদি দেশে ব্যবচ্ছিন্ন না হইত, তাহা হইলে তুমি বলিতে পারিতে না যে, শব্দাঙ্গগুলি যখন একে একে তোমার উপলব্ধিগোচরে পৌঁছিতেছিল—পৌঁছিতেছিল তাহা তোমার **কর্ণদেশে**; তা বই চক্ষু-দেশেও না, নাসিকাদেশেও না। অতএব এটা স্থির যে, গোটা "শ্রী"-শব্দটা তোমার জ্ঞান-গোচরে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে, উহার দেশকালাবচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে একে-একে উপস্থিত হইয়াছিল; আর, এটাও স্থির যে, শেষের /০ই-টি তোমার কর্ণে উপস্থিত হইবামাত্র বিক্ষিপ্ত শব্দাঙ্গ-গুলির গাত্রে অহংবৃত্তি'র বজ্র-লেপ মাখাইয়া

* এমন অনেক কথা আছে—যাহা বোঝা খুব সহজ অথচ বোঝানো বড্ড কঠিন, যেমন—"জ্যামিতিক রেখা = বিন্দু-মালার সমষ্টি"—এই কথাটি। এ কথাটির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কেহ যদি বলে—"ইউক্লিডের পরিভাষায়—বিন্দু=শূন্যায়তন, রেখা=দীর্ঘায়তন; সহস্রাধিক শূন্য একত্রে জোড়া দিলেও দৈর্ঘ্য হয় না; অতএব, এ কথা কোনো কাজের কথা নহে যে, রেখা=বিন্দুসমষ্টি," তবে সে-ব্যক্তিকে এ সোজা কথাটি বোঝানো ভয়ানক কঠিন।

সেগুলিকে তুমি জমাটবদ্ধ করিয়াছিলে—জমাটবদ্ধ করিয়া "শ্রী" এই গোটা-শব্দটিকে তোমার জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিলে। কাণ্ট্ তাই বলেন যে, জ্ঞাতব্য বিষয়'কে বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে বাগাইয়া আনিতে হইলে—অহংবৃত্তির সংযোগাত্মক ঐক্য-সূত্রের বজ্র-বাঁধনে বাঁধিয়া একমেটে কাঁচা ইদংবৃত্তির দেশকালাবচ্ছিন্ন বিষয়-বৈচিত্র্য'কে দোমেটে ইদংবৃত্তির জমাট্‌বাঁধা বিষয়-বৈচিত্র্য করিয়া পাকাইয়া তোলা একান্ত পক্ষেই আবশ্যক। বুঝিলে?

জিজ্ঞাসু॥ হাঁ—কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে। কিন্তু আমার দুর্নিবার জিজ্ঞাসা এখনো নিবৃত্তি মানিতেছে না। বিষয়-বৈচিত্র্য জ্ঞান-গোচরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দেশকালের বাঁধে আট্‌কানো থাকে—তাহা যেন বুঝিলাম; কিন্তু দেশকালের বাঁধে আট্‌কা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা কী অবস্থায় কোন্ রাজ্যে অবস্থান করে—ইহার উত্তর কাণ্ট্ কী দ্যা'ন্, সেই কথাটি এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

প্রবোধয়িতা॥ **শক্ত প্রশ্ন** আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ এবার! কাণ্ট্ বলেন—দেশ-কালের ওপিঠে একটা কিছু অবশ্যই আছে; কিন্তু **সে একটা-কিছু** যে, পদার্থটা কি, তাহা বলিতে পারা মনুষ্যের অসাধ্য—তাহা একপ্রকার গণিতের x। বেদান্তের সঙ্গে কাণ্টের একটা পাকা-পোক্ত রকমের বোঝা-পড়া না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার এবারকার কূট-প্রশ্নটির মীমাংসা এইস্থানে স্থগিত রাখাই শ্রেয় বোধ করিতেছি। আগামী মাসে ঐ শেয়ানে-শেয়ানে বোঝা-পড়া ব্যাপারটির রহস্যকাহিনী শুনাইয়া তোমাকে সন্তোষ দিতে পারি যদি—তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একটি উপমা

বায়স ঠোকর মারে নৈবেদ্যের পরে
সজ্জন লাঞ্ছিত যথা পাপিষ্ঠের করে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

ফুলের জন্ম

সৃষ্টির আদি যুগে পুষ্পরাজি বিচিত্র বর্ণগন্ধ নিয়ে তখনো জন্মেনি। মাতা বসুন্ধরার অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠেছিল শুধু ঘনবিন্যস্ত শষ্পগুল্মের গাঢ় সবুজ আভা। তাদেরও প্রাণ ছিল, তাদের প্রাণেও প্রণয়ের স্নিগ্ধতা ছিল, কিন্তু তখনো তা' সবুজ রংএর বেড়া ভেঙে বাইরে আত্মপ্রকাশ করেনি। অন্তঃপুরচারিণী নববধূটিরই মত তারা আপন রহস্যে আপনি ভরা ছিল, তাদের প্রাণের গোপন-কথা তখনো ফুল হয়ে ফুটে ওঠেনি।

কবে কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে সবুজের এই একঘেয়ে রাজত্বের মাঝখানে ফুল তার বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠল, তা' তোমরা কেউ জানো? বৈজ্ঞানিক তাঁর অভিব্যক্তি-বাদের মারপ্যাঁচে ফেলে এর যা ব্যাখ্যা করবেন, তার চেয়ে কবির কল্পনা-রঙিন কাহিনীটি শোনো।

ভগবান যখন আমাদের এই মহীয়সী ধরণীকে রূপ দিয়ে গড়ে তুলছিলেন তখন স্বর্গবাসী সবাই একান্ত উৎসুক হয়ে রইলেন কি হয় তা' দেখবেন বলে। নবজাত ধরণীর গায়ে যখন সমুদ্র আনন্দে লুটোপুটি খেতে লাগল, অতিকায় জন্তুগুলি খেলা করতে লাগল, নীল আকাশে মেঘগুলি মুক্তির আনন্দে ছুটে বেড়াতে লাগল, যখন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য আদরে পৃথিবীর গায়ে কিরণধারা বুলিয়ে দিতে লাগলেন, তখন দেবতারা সব স্বর্গের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন মহিমান্বিতা পৃথিবীর অপরূপ গিরিউপত্যকা।

তারপর যেদিন আদি-মানবের জন্ম হ'ল, সেদিন দেবতাদের বিস্ময়কৌতূহল আরো বেড়ে উঠল। ভালো করে দেখবার জন্যে সকলে অমরা থেকে নেমে বজ্রবাহী মেঘের ওপর চড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

তাঁরা দেখলেন লোকটির দৃপ্ত মূর্ত্তি, প্রশস্ত ললাট, তীব্র চাহনি, আর চমৎকার চাল-চলন। বাতাস তার চুলগুলি চোখে মুখে উড়িয়ে খেলা করচে। তবু কেমন করে তাদের যেন মনে হ'ল যে এই জীবটি তাঁদের অনেক ভোগাবে। অন্য কেউ হ'লে হয়ত আদিসৃষ্টির সেই নরমূর্ত্তিটির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে যেত, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি দেবতারা দেখলেন এই অসীম সৌন্দর্য্যের আনাচেকানাচে তীব্রপ্রবৃত্তির দারুণ জ্বালা মাখা!

এই নূতন জীবটির কথা আলোচনা করতে-করতে দেবতারা স্বর্গে ফিরে গেলেন।

*　*　*　*

আদি নর তখন ঘুমুচ্ছিল, এমনি সময়ে ভগবান আদি-নারী সৃষ্টি করলেন। বোধ হয় মনে মনে একটু গর্ব্বমিশ্রিত আত্মপ্রসাদও অনুভব করলেন যে এ সৃষ্টি সব সৃষ্টির সেরা, এর চেয়ে মহত্তর আর-কিছু হতেই পারে না।

মনে থাকে যেন যে তখনো পৃথিবীতে ফুলের সৃষ্টি হয়নি।

তখনো শুধু প্রভাতকুহেলির গায়ে সোনা মাখিয়ে সূর্য্য উঠতেন, পশ্চিম গগনে সিঁদুর মাখিয়ে অস্ত যেতেন। ঝড়ো হাওয়া মেঘ উড়িয়ে আনত। বরষা এসে নদী হ্রদ কানায়-কানায় ভরে ফেলত, তরুবল্লরীর সবুজ শোভা আরো গাঢ় করে তুলত। আর সমস্ত পৃথিবী একটা গভীর সরসতায় ঝলমল করত।

ধরণীর শ্যাম অঙ্গে ফুটে উঠল দুটি মর্ম্মরশুভ্র অনবদ্য মূর্ত্তির নগ্নসৌন্দর্য্য।

এই নূতন সৃষ্টির সংবাদ স্বর্গে যেতেই দেবসমাজ আবার তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। দেবদূত, অপ্সর, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, সকলে মিলে নীচে আকাশের জানলা দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাতে লাগলেন।

কিন্তু অতদূর থেকে ভালো দেখা যায় না বলে তাঁরা নেমে এলেন, মেঘলোক পর্য্যন্ত এসে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে পড়লেন। পৃথিবীতে নেমে এসে এই মূর্ত্ত লাবণ্যের গায়ে নিজেদের সূক্ষ্ম পাখনা দিয়ে হাওয়া করে কৃতার্থ হতে তাঁদের খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু ভগবানের অনুমতি ছাড়া নীচে নামতে সাহস হল না। শুধু বিস্ফারিত নেত্রে আদি-মানবীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁদের প্রাণের জ্বালা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

তখন তরুণ তপনও এই তরুণীটিকে দেখবার জন্যে ধীরেধীরে পূর্ব্বগগনে উঠছিলেন। আগের রাত্রের ঝড়ে মেঘগুলি ভাঙা-ভাঙা হয়ে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল, স্ফটিকস্বচ্ছ জলকণা বর্ষণ করছিল। পৃথিবীর ওপর আকাশের গায়ে নানারঙে উজ্জ্বল একটি রামধনু উঠেছিল।

দেবতাদের মধ্যে যাঁরা একটু বেশী সাহসী, তাঁরা মেঘলোক থেকে শুভ্র পাখনায় ভর করে এসে রামধনুর ওপর বসলেন। তখন তাঁদের দেখাদেখি সবাই নেমে এলেন। বর্ণ-উজ্জ্বল রামধনুর ওপর দেবতাদের সারি—দৃশ্যটি খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ধরণীতে শ্যামল শষ্পশয্যায় আদি-মানবী, আর আকাশের গায়ে দেবগণের স্বচ্ছ ফিনফিনে পাখনা আর মাথার সোনালি আভা চমৎকার ফুটে উঠেছিল।

ক্ষীণ রামধনুটির ওপর দলে দলে দেবদূত, অপ্সর, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব। তাঁরা অবশ্য হালকা খুবই, তবু তরুণীটি তাঁদের যা' আকর্ষণ করছিলেন, তা'তে রামধনুটির ওপর খুবই চাপ পড়ছিল। হঠাৎ রামধনুটি ভেঙে গিয়ে তার স্ফটিক-চূর্ণের মত চোখভুলানো অযুত অযুত রেণুগুলি সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল।

পৃথিবীর গাছপালাগুলি নিজেদের ভাবাবেশে উন্মুখ হয়ে ছিল। রামধনুর রংভরা রেণুগুলিকে তারা আদরে বরণ করে নিয়ে নিজের নিজের বুকে ঠাঁই দিলে। সেই দিন থেকেই চিরসবুজ গাছে ফুল ফুটতে সুরু হ'ল, আর পৃথিবীর মাঠ ঘাট বন ফুলে ফুলে ভরে উঠল।

তখন থেকে ফুল ফুটেই চলচে—লাল শাদা নীল পীত নানান রঙের ফুল ইন্দ্রধনুরই বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হয়ে তারা সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়েচে।

রামধনুটি ভেঙে যাওয়ার সময়ে তার ওপরকার রূপমুগ্ধ দেবগণের মনে মোহের ঝড় বইছিল, তাই প্রেমের সঙ্গে ফুলের এত নিকট সম্বন্ধ। আর রামধনুটি ভেঙে যাওয়ার কারণ আদি-নারীর আকর্ষণ, তাই আজো নারীগণ ফুল এত ভালো বাসেন। কাহিনীটিতে বেচারা আদি-মানবের আর কোনো কথা নেই, বোধ হয় তার গায়ে রামধনুর ছিটে-ফোঁটাও লাগেনি।

দেবগণের মধ্যে কারো-কারো ফিরে যেতে বড্ড কষ্ট হচ্ছিল, বোধ হয় পড়ে গিয়ে বেচারাদের খুবই চোট লেগেছিল। আবার এও হতে পারে যে ফুলরাশির মাঝ-খানে ফুলরাশিরই মত তরুণীকে ছেড়ে যেতে তাঁদের ইচ্ছা হচ্ছিল না।

কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা সে বিচার তোমাদের হাতে। আমার কিন্তু সত্য বলেই মনে হয়—অন্ততঃ সত্য হওয়া উচিত।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

স্পেনীয় নাট্যকার José Echegarayর গল্প A Legendএর ইংরেজী অনুবাদ হইতে।

মা

(গল্প)

আকাশ উজ্জ্বল নীল। বাতাস স্তব্ধ। গ্রীষ্মের তপ্ত নিশ্বাস সারা দেশ আচ্ছন্ন করে' রেখেছে। কিন্তু পাখীর কণ্ঠ নীরব, ফুলের চারিদিকে ভ্রমর-গুঞ্জন নেই, ধরিত্রী রিক্ত ছিন্নভিন্ন। ভূমির ওপর গভীর পিঙ্গলবর্ণ খাদের মধ্যে শত শত অশান্ত লোক, কেউ শুয়ে কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বা হাঁটু গেড়ে বসে'।

সমস্ত দেশ যেন একটি প্রাণপূর্ণ জীবন্ত নিস্তব্ধতায় স্পন্দমান। মাঝে-মাঝে কেবল একএকটা ভয়ানক কড় কড় শব্দ সেই গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রচুর ধূলাবালি, সৈনিকের টুপি বা শতছিন্ন পোশাক এবং মানবদেহের খণ্ডাংশ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

এইরূপ একটা ওলটপালটের পর একটা প্রকাণ্ড ডানাওয়ালা পদার্থ উত্তরদিক থেকে হু হু করে' ছুটে এল। নীচু হয়ে খাদের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে ঝুপ করে' একবার ডুব দিলে, তারপর চক্রাকারে ঘুরে-ফিরে ইংরেজ সৈন্যশ্রেণীর ওপর স্থির হয়ে দাঁড়ালো। মনে হল বিরাট ঈগলের মত ঐ পদার্থটা এখনি ভূমি লক্ষ্য করে' ছোঁ মারবে তারপর শিকারকে মুখে করে' উড়ে পালাবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ দিক থেকে ঐরূপ আর-একটা প্রকাণ্ড জীব বোঁ বোঁ শব্দ করতে-করতে ওপরে উঠলো। উড়ে গিয়ে ঠিক আততায়ীর ওপরে উঠে নীচু দিকে মুখ ফিরিয়ে হুস্ করে' ডুব দিলে। বড় বড় কামানগুলো স্তব্ধ হয়ে গেল। খাদের মধ্যেকার নগণ্য মানুষগুলো আকাশের পানে মুখ তুলে চেয়ে রইল। ধরিত্রী যেন নিশ্বাস রোধ করে' দাঁড়িয়ে। আকাশ ও সূর্য্য ঠিক আগেকার মতই জল্‌জল্ করতে লাগলো,—অনন্ত শূন্যে এই যে দুটো পক্ষযুক্ত পদার্থের উন্মত্ত যুদ্ধ তার কথা কানেকানেও বলাবলি করলে না।

কয়েক মুহূর্ত্ত তারা পরস্পরের দিকে ছুটোছুটি করলে। তারপর যে-পাখীটার শাদা ডানা সে সাঁ সাঁ করে' উঁচুতে উঠে গিয়ে চকিতে ফিরে দাঁড়ালো, তারপর বিরাট কৃষ্ণ ক্রুশচিহ্নধারী জীবটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

শীকার ফসকে গেল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কড়াক করে' শব্দ হল। লোহার ক্রুশপরা পাখীটার মধ্যে থেকে ভক করে' উষ্ণ নিশ্বাসের মত খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে গেল। সে কেঁপে উঠলো, ঘুরে গেল, তারপর মাথা নীচু করে' গোঁৎ খেয়ে পড়ে' গেল। যে ওপরে পড়েছিল সে-ও পিছু পিছু চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে এসে ভূমি স্পর্শ করলে। কৃশকায় এক তরুণ ইংরেজ ধ্বক্-ধ্বক্-শব্দকারী ইঞ্জিন থেকে লাফিয়ে পড়লো। উত্তেজনায় তার সারা দেহ কাঁপছিল। ভূমির ওপর যে ভাঙা পদার্থটা পড়ে' ছিল সে সেই দিকে ছুটতে ছুটতে অগ্রসর হল। তোবড়ানো ছিন্নভিন্ন বস্তুপিণ্ডটার পাশে 'হাঁটুগেড়ে বসে' দেখতে পেলে লোহা আর কাঠের টুকরোর নীচে একটি বালকের মূর্ত্তি স্থির নিস্পন্দ। ধীরে ধীরে দেহটি সে টেনে বার করলে। এক সুকুমার তরুণ জার্ম্মান। তার মাথার ওপর গভীর আঘাতচিহ্ন—ঐখানে একটি আঘাতেই নিমেষে প্রাণ বার হয়ে গেছে! ঋজু বলিষ্ঠ দেহ, মুখখানি সুন্দর সুগঠিত। সরল নির্ভীক মুখখানি তরুণ ইংরেজের পানে তাকিয়ে আছে। সে-চোখে বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই, আছে কেবল বিস্ময়। ইংরেজ, বালকের নিস্পন্দ বুকের ওপর হাত রাখলে। একখানা শক্ত কার্ড হাতে ঠেকলো। কোটের পকেট থেকে টেনে বার করে' দ্যাখে একখানি ছবি—স্ত্রীলোকের ছবি—তাঁর মাথায় শুভ্রকেশ, করুণায় ভরা চোখদুটি, মুখে নীরবে-সহা কষ্টের রেখা পরিস্ফুট। ছবির নীচে বালকের হাতের কাঁচা লেখা, "আমার মা।"

ইংরেজ যুবকের বুকফেটে কান্না আসতে লাগলো। সন্তর্পণে সস্নেহে সে ঐ প্রাণহীন দেহ আপনার বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে তুলে নিলে। তারপর অবিচলিত পদে উন্মুক্ত রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে সে চলতে লাগলো। তাকে লক্ষ্য করে' কেউ গুলি ছুড়লে না। খাদের মধ্যেকার সৈনিকেরা সব দেখলে, সব বুঝলে। সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাতে সে মৃতদেহটি রাখলে। ছোট্ট ছবিখানি সামনে রেখে পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার ক'রে সে লিখতে বসলো।

লেখা শেষ হলে চিঠিখানি আর ছবিখানি একখানি ঠিকানা-লেখা খামের মধ্যে পুরে সে ক্ষিপ্রপদে গিয়ে ওড়ন-জাহাজে আরোহণ করলে। ক্ষণকালের মধ্যেই শত্রু-খাদের ওপর দিয়ে সে ভেসে চল্‌লো। ঝুঁকে পড়ে' খামখানি

সে ফেলে দিলে। কামান গর্জ্জে' উঠলো, কিন্তু ঐ উজ্জ্বল মূর্ত্তির পানে কেউ বন্দুক তুললে না। সৈনিকেরা তার সাধু সংকল্প বুঝতে পেরেছে। ছোট খামখানি ঘুরে ঘুরে যখন তলায় এসে পড়লো, তখন উৎসুক সৈনিকদল তাড়াতাড়ি তা তুলে নিলে, শতকণ্ঠে একবার হর্ষধ্বনি উঠলো। দূতের হাতে চিঠি সৈন্যশ্রেণীর পিছনে পাঠানো হল, অচিরে লিপিখানি গন্তব্যপথে অগ্রসর হতে লাগলো।

• •

চব্বিশ ঘণ্টা পরে এক মা বিবর্ণমুখে কম্পিত হাতে শাদা একটুকরো কাগজ নাড়াচাড়া করছেন। তাঁর দৃষ্টি হাস্যোজ্জ্বল প্রকৃতির ওপর নিবদ্ধ, কিন্তু চোখে তিনি কিছুই দেখছেন না। গ্রীষ্মের তপ্ত সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত সবুজ মাঠের মাঝে রাইন নদীর জল ঝিকমিক্ করছে। কিন্তু তাঁর চোখের সামনে সব কালো হয়ে গেছে, অন্ধকারে ভরে' গেছে। তাঁর সোনার বাছা যে মারা গেছে! তার স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে' ফেলেছে। তিনি অনুভব করছেন শিশুকালে সে কেমন করে' তাঁর বুক আঁকড়ে পড়ে' থাকতো, ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দিয়ে তাঁকে ধরে' টানতো! তারপর সে যখন একটু বড়সড় হয়ে উঠলো কী চঞ্চল ছেলেই সে হয়েছিল! তিনি যেন শুনতে পাচ্ছেন তার ছুটে আসার শব্দ, কানে বাজছে যেন তার "মা" "মা" ডাক! কিন্তু আজ সব শেষ হয়ে গেছে! সব শেষ! যাদুমণি চিরদিনের জন্যে চলে' গেছে! দুই ছেলে গিয়ে ঐ ছোটটিতে এসে ঠেকেছিল, এখন সে-ও চলে' গেল!

কোলের ওপর খোলা চিঠিখানা প'ড়ে ছিল। আঙুল দিয়ে তিনি সেখানা নাড়তে লাগলেন। পেন্সিলের লেখার ওপর তাঁর চোখ পড়লো। আস্তে আস্তে কথাগুলোর মানে পরিষ্কার হয়ে এল। যে-ছেলেটি চিঠি লিখেচে সে তাঁর বাছার চাঁদমুখ দেখেচে! তাঁর মরা যাদুকে সে বুকে ধরেছে! অনুশোচনায় তার মন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে! সে যে লিখেচে—

"সে আপনারই ছেলে। জানি আমাকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন না, কারণ আমিই যে তাকে মেরেছি। আমি খালি আপনাকে বলতে চাই সে কষ্ট পায়নি। এক নিমেষে সে মরে' গেছে। বড় সাহসী সে, বড় ভালোও ছিল সে নিশ্চয়। আপনার ছবি তার পকেটে ছিল। সেখানি ফেরত পাঠাচ্ছি, ইচ্ছে যদিও হয়েছিল ওখানি আমার কাছেই রাখি। ধরে' নিতে হবে আমি তার শত্রু, কিন্তু কৈ মনে তা কিছুতেই ভাবতে পারছি না। আমার প্রাণ দিয়ে যদি তাকে ফিরিয়ে আনা যেত তবে তা-ও দিতুম! যখন তার যন্ত্র লক্ষ্য করে' বোমা ছুড়েছিলুম তখন তার কথাও মনে আসেনি, আপনার কথাও মনে আসেনি। সে শত্রু, আমাদের সৈন্যদল দেখে বেড়াচ্ছিল। তাকে কেমন করে' ফিরে গিয়ে নিজের দলে খবর দিতে দিই? তাহলে যে আমাদের লোকেরা মারা যায়। কিন্তু অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছে সে। আমরা ঝোপঝাড়ে ঢাকা ছিলুম। আমাদের দেখবার জন্যে তাকে খুব নীচে আসতে হয়েছিল। সে প্রায় আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিল আর কি! কী চমৎকার সে উড়ছিল, একেবারে ওস্তাদ! ভাবছিলুম আমিও যদি ওর সঙ্গে উধাও হয়ে উড়তে পাই। কিন্তু সে যে শত্রু—তাকে ধ্বংস করতেই হবে! বোমা ছুড়লুম। এক নিমেষেই সব শেষ! হুড়মুড় করে' যন্ত্রটা যখন নীচে পড়লো তখন মাথার ওপর এক ঘা। তার মুখে কোনো কষ্টের চিহ্ন নেই, আছে কেবল উত্তেজনা। তার চোখদুটি বড় উজ্জ্বল, নির্ভয়। আমি জানি আপনি তাকে কত ভালোবাসতেন। দেখুন আমি যখন খুব ছোট তখন আমার মা মারা যান। তাই মা যে কেমন তা জানি না। তবুও আমি মারা গেলে তাঁর কত লাগতো তা বেশ বুঝতে পারি। যুদ্ধ নারীর পক্ষে বড় মর্ম্মান্তিক, বড় মর্ম্মান্তিক! এ একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন! মনে হচ্ছে যদি আপনার ছেলেকে একবার স্পর্শ করি তো সে যেন এখুনি জেগে উঠবে, আমরা দুজনে বন্ধু হয়ে যাব! আপনি ভাববেন না, তার দেহের অযত্ন হবে না, তার সমাধিটি ছোট একটি ক্রুশচিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করে' রাখব। যুদ্ধের পর আপনি তার দেহ বাড়ী নিয়ে যেতে পারবেন। আহা সে দেহ আপনার কত প্রিয় তা তো জানি।

আজ এই প্রথম আমার মা বেঁচে নেই মনে করে' আমি যেন প্রায় আনন্দ বোধ করছি। কারণ আমি যা করেছি তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এযে বড় দুঃখ! বড় দুঃখ! দুঃখের ভারে আমার মন ভেঙে পড়ছে!

মনে করেছিলুম কর্ত্তব্য করছি। কিন্তু এখন যখন দেখছি আপনার ছেলের মৃতদেহ আমার সামনে, হাতে আপনার ছবি,—এখন সবই অন্যায়, বড় নিষ্ঠুর বলে' বুঝতে পারছি। জগৎ আমার পক্ষে আঁধার হয়ে গেছে। মা আমার! একটুখানি আমারও মা হোন, বলে' দিন আমায়, এখন কি করি।—হিউ।

ধীরে ধীরে রমণীর গণ্ড বয়ে বড় বড় অশ্রুবিন্দু ঝরে' পড়তে লাগলো। এ কোন্ রাক্ষস মানুষকে এমন করে' গুঁড়ো করে' ফেলছে? তাঁর ছেলে আর এই যে আর-একটি ছেলে এরা তো একই রকম। তাদের মনে তো হিংসা নেই। অথচ তারা কষ্ট পেলে, সারা জগৎ কষ্ট পাচ্ছে। তাঁর দেশ ক্ষুধা নিবারণ করতে পারছে না। আশপাশের ঘরের শিশুগুলি একটুখানি দুধের অভাবে দিন দিন ক্ষীণ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। একথা তিনি ঐ ইংরেজ ছেলেটিকে কেমন করে' বলেন। তার যে বুক ভেঙে যাবে। কেন এত কষ্ট? এর দরকার কি? এতে তাঁর কি কোনো দোষ আছে? ঐ যে ইংরেজ ছেলেটির মা নেই! তিনি তো তার কথা আর তার মত আরো যারা আছে তাদের কথা ভাবেননি! তাঁর বাড়ী, তাঁর ছেলেরা, তাঁর স্বদেশ—এই তো তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল! এ ছাড়া তো আর কারো কথা মনে আসেনি! কিন্তু প্রত্যেক জীবন অন্য প্রত্যেক জীবনের সঙ্গে যে এক গ্রন্থিতে বাঁধা। মাতৃত্ব যে শাশ্বত।

সহসা তাঁর মনে এল কি লিখতে হবে। ঐ দুঃখক্লিষ্ট ইংরেজ ছেলেটিকে তিনি কী সান্ত্বনা দিবেন। তিনি লিখলেন—

বাছা,

ক্ষমা করবার কিছু নেই। তোমার ক্ষমা চাইবার দরকারও নেই। তুমি যে কেমন তা আমি বুঝতে পারছি, তোমার মনের ব্যথা আমি অনুভব করছি। তুমি ঠিক যেন একটি ছোট ছেলের মত, ভালো মনে কিছু করতে গিয়ে মন্দ করে' ফেলে যেন অবাক হয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছ! তুমি যেন আমারই ছেলে! আমার সেই আরেকটি ছেলের জন্যে তুমি যা করেছ তার জন্যে বড় সুখী হয়েছি বাবা। তার দেহ তুমি ছাড়া আর কেউ যে স্পর্শ করেনি এ ভালোই হয়েছে। সে আমার সবার ছোট ছিল। দেখেছ তো সে কেমন সুন্দর! তুমি তাকে মেরে ফেলেছ, তোমার অনুশোচনা আমি বুঝতে পারছি। আমরা মেয়ে; আমাদের কাছে ভ্রাতৃত্ব মিথ্যা নয়। কারণ সকল মানুষেরই যে আমরা জননী। তাইতো যুদ্ধ একটা নৃশংস রাক্ষস, যে ভাইকে দিয়ে ভাইকে হত্যা করায়। কিন্তু তবুও, তবুও হয় তো এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জন্যে পুরুষের চেয়ে মেয়েই বেশী দোষী। জগতের ছেলেদের কথা তো আমরা ভাবিনি, তারা যে আমাদেরই ছেলে সে কথা তো ভাবিনি। যে-সব কচি হাত আমাদের বুক জড়িয়ে ধরেছিল তারা কত মধুর! কিন্তু আমরা ভুলে গেলুম আরো কত শত কচি হাত আমাদের দিকে প্রসারিত! কিন্তু ধরিত্রী তো কাকেও ভোলে না, সে তো সকলকেই পালন করে। সেই তো সত্যিকার মা! এখন আমার অন্তরও অনুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছে। আমার মন চাইচে তোমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে' তোমার মাথাটি আমার বুকের ওপর রাখি; আমার মধ্যে দিয়ে সারা বিশ্বের সঙ্গে তোমার আত্মীয়তা অনুভব করাই। আমায় সাহায্য কর বাছা, আমার হাত ধর। তোমাকে যে আমারো দরকার। বিশ্বময় একতা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা কর। যুদ্ধ শেষ হলে তুমি যেদিন আমার কাছে আসবে আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় রইলুম।—তোমার মা। *

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Madeleine Z. Dotyর ইংরেজি হইতে।

গুণের আদর

(সাদী)

মুক্তা যদি বা দূরে ফেলে দাও,
ধূলি-নীচে যদি রাখগো তারে,—
জ্যোতি কি তাহার হীন হবে কভু?
মূল্য কি তার কমিতে পারে?

ধূলিগুলি যদি স্বর্গে পাঠাও,
আদর ত তার কভু না হবে,—
ধরায় যেমন ম্লান ছিল তাহা,
স্বর্গেও ঠিক্ তেমনি রবে।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

পঞ্চশস্য

জোনাকীর আলো—

পিণ্ডশরীর হইতে শক্তির বিকিরণ হইয়া থাকে, তাহারই একাংশ আলোক ও অপরাংশ তাপ, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। মানুষের শরীর হইতে শক্তির বিকিরণ তাপ প্রভৃতি অপরবিধ প্রকারে এত বেশী হয় যে আলোকের রূপ ফুটিবার অবকাশ ঘটে না। কার্ব্বন-ল্যাম্পের বিকিরিত শক্তির মাত্র শতকরা আধ ভাগ আলোক হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু জোনাকীর শরীর হইতে বিকিরিত শক্তির শতকরা ৯৬ ভাগ আলোক হইয়াই প্রকাশ পায়। জোনাকীর আলো একরকমের মৃদু অক্‌সিডেশান অর্থাৎ অক্‌সিজেন গ্যাসের সঙ্গে অপর পদার্থের সংযোগ অর্থাৎ দহন; এই দাহ হইতে তাপ নাম মাত্র ও আলোক প্রচুর উদ্গত হয়। এই আলোক জোনাকীরা নিজের শরীরের অক্‌সিজেন জোগাইয়া কম বেশী করিতে পারে। এই পতঙ্গের পুচ্ছ-প্রদীপ তাহাদের মিথুন-সম্পর্কের ইঙ্গিত ও ইসারা মাত্র, যেমন অনেক কীটপতঙ্গের ইসারা ডানার বা পায়ের বা মুখের বা কণ্ঠের শব্দ। মিথুনতা সম্পাদনের জন্য কাহারও ইসারা শাব্দ বা শ্রাব্য ও কাহারও বা চাক্ষুষ।

জোনাকীর পুচ্ছাংশের আলোক বিকিরণের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সরু সরু নল আছে। সেই নল পতঙ্গের প্রধান বায়ুনালীর সঙ্গে সংযুক্ত; সুতরাং সেই সরু নলগুলি অক্‌সিজেন জোগানের পথ। আলোকেন্দ্রিয়ের একাংশ যদি চাপ দিয়া অসাড় করিয়া দেওয়া যায় তবে দেখা যায় সেই অংশের আলো আর মিটমিট করিয়া কমে বাড়ে না, একই ভাবে জ্বলিতে থাকে, কিন্তু অপরাংশের আলো মিটমিট করে; ইহার কারণ এই যে চাপ লাগিয়া সে অংশের সরু নলগুলির ছেঁদা বুজিয়া যায় সেগুলি দিয়া পুনঃপুনঃ অক্‌সিজেন সরবরাহ হয় না ও সেইজন্য আলোও বারবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, যতটুকু অক্‌সিজেন চাপ পাইবার আগে আসিয়াছিল তাহাই একই ভাবে জ্বলিতে থাকে।

জোনাকীর আলোকেন্দ্রিয় ও নার্ভাস-সিষ্টেমের মধ্যে একটা আয়নার মতন পর্দ্দা আছে; এই পর্দ্দা হইতে পুচ্ছদেশের আলোক ঠিক প্রতিফলিত না হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতে মনে হয় জোনাকীর সমস্ত পেটটাই উজ্জ্বল। এই পর্দ্দা নার্ভাস-সিষ্টেমের উপর নিরন্তর আলোকপাত নিবারণ করিয়া নার্ভাস-সিষ্টেমকে বাঁচাইয়া রাখে; এবং সেখানে আলোক উৎপাদনের একরকম উপকরণও সঞ্চিত হইয়া থাকে।

জোনাকীর পুচ্ছদেশের আলোকেন্দ্রিয়ের আলোক-দানের ক্ষমতা জোনাকীর জীবনের অধীন নহে; যদি তাহার আলোকেন্দ্রিয় তাহার দেহ হইতে ছিঁড়িয়া শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া ফেলা যায়, তবু জলো হাওয়া লাগিলে তাহা হইতে আলোক উদ্গত হয়।

জোনাকীর ডিম যখন গর্ভে থাকে তখনই ডিমে আলোকজননের ক্ষমতা জন্মে; ডিম হইতে নির্গত কীড়াগুলিরও আলোক বিচ্ছুরিত হয়। অনুমান হয় জোনাকীর যৌবন পর্য্যন্ত সে আলোক-বিকিরণের শক্তি সঞ্চয় করে; বার্দ্ধক্যে তাহাই খরচ করিতে করিতে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়।

জোনাকীর আলোর উজ্জ্বলতা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। উহার আলোর আভা এক-বাতির আলোর পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ; কিন্তু উহার স্ফুরণের প্রভা এক-বাতির আলোর মাত্র ৪০০ ভাগের এক ভাগ। যদিও ইহা যৎসামান্য বলিয়া মনে ঠেকিবে, কিন্তু পতঙ্গের আকারের তুলনায় এই উজ্জ্বলতা খুব বেশী।

জোনাকীর আলোতে অদৃশ্য কিরণ কিছুই না থাকাতে, তাহাতে তাপও নাই; কেবল প্রভাই আছে। বিজ্ঞানের সন্ধানে এর চেয়ে উজ্জ্বল এত ছোট আলো আর নাই; জোনাকীর পুচ্ছে আলোকেন্দ্রিয় যতবড় ততটুক জায়গায় ঐ পরিমাণ উজ্জ্বল আলোক কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করিতে হইলে ২০০০ ডিগ্রি তাপ উৎপন্ন করিতে হয়।

জোনাকী-পোকার আলোকেন্দ্রিয়।

জোনাকী-পোকাকে যদি কোনো উত্তেজক ঔষধ দিয়া ক্রমাগত আলোক স্ফুরণ করানো যায় তাহা হইলে ক্লান্তিবশতঃ শীঘ্রই তাহার মৃত্যু ঘটে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জোনাকীর জীবনীশক্তিই আলোক উৎপাদনে খরচ হইতে থাকে।

জোনাকীর আলোক স্ফুরণের সময় একটুও তাপ বিকিরিত হয় না; আলোকছটায় লালরঙের (infra red) কিরণ দেখা যায় না; ঐ লাল কিরণই তাপ উৎপন্ন করে; যদি ঐ লাল কিরণ জোনাকীর আলোতে থাকিত তবে পোকা নিজের আলোর তাপে নিজে দগ্ধ হইয়া মরিত। তবে জোনাকীর দেহের তাপ অপেক্ষা পুচ্ছদেশের তাপ অধিক।

সাধারণের বিশ্বাস যে জোনাকীর আলো ফস্ফরাস-সম্পর্কীয়। কিন্তু তাহা ভুল। আর্দ্রতা, অক্‌সিজেন, আর একটা অজ্ঞাত চর্ব্বী বা এল্‌বুমেন জাতীয় পদার্থ থাকাতে ঐ আলো উদ্গত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ফস্ফরাস-যুক্ত হাইড্রোজেন অক্‌সিজেনে যুক্ত হইয়া ঐ আলোক উৎপন্ন করে। প্রত্যেক অনুমানেরই কিছু-না-কিছু কারণ আছে, কিন্তু সমস্তই অনুমান মাত্র, এখনো বিজ্ঞান নিঃসন্দেহ প্রমাণ পায় নাই।

চুন-সুরকী-জমানো তক্তা—

আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া ষ্টেটের লস্ এঞ্জেলেস শহরে একটি বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে, তাহাতে কাঠের তক্তার বদলে চুন-সুরকী-জমানো তক্তা লাগানো হইতেছে। কাঠের তক্তার বাড়ীর সুবিধা এই যে তাহা হাল্কা হয় ও ঘরের মধ্যে জায়গা বেশী পাওয়া যায়, কারণ ইটের দেয়ালের মতন তক্তার দেয়াল পুরু হয় না; কিন্তু কাঠের তক্তার বাড়ীর অসুবিধা এই যে উহা সহজেই পুড়িবার আশঙ্কা থাকে। চুন-সুরকী-জমানো তক্তা দিয়া বাড়ী করাতে তক্তার বাড়ীর সুবিধা পুরা রকমই রহিল অথচ তাহা পুড়িয়া যাইবার আশঙ্কা দূর হইল।
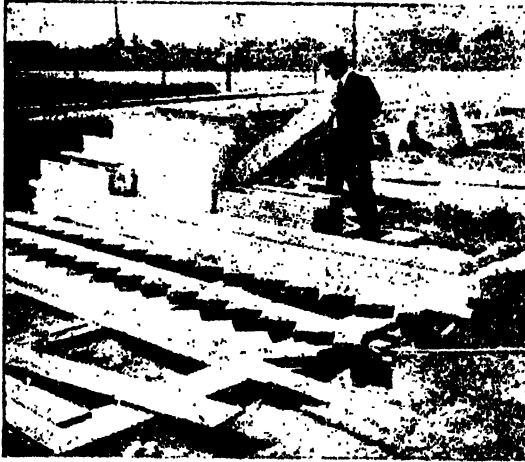
চুনসুরকী-জমানো তক্তা।

চুন-সুরকী-জমানো তক্তা ধাতুনির্ম্মিত পত্তর বা সিমেণ্ট দিয়া পরস্পরের সঙ্গে আঁটা হয়। চুন-সুরকী-জমানো-তক্তা আগে আবশ্যক মত মাপ লইয়া তবে জমানো হয়, এবং যেখানে যেখানে জোড় লাগাইবার দরকার হইবে সেখানে সেখানে পেরেকের মাপের লোহার তার পুতিয়া জমিতে দেওয়া হয়। তক্তা জমিয়া গেলে তার টানিয়া খুলিয়া ফেলা হয় ও সেইখানে ছিদ্র থাকিয়া যায়।

সাজেস্টোমিটার বা মনের উপর কথার প্রভাব মাপিবার কল—

মানুষের মন কতখানি দৃঢ়, সে অনিচ্ছাতেও কথায় কতখানি ভোলে, তাহা মাপিয়া দেখিবার এক কল হইয়াছে। তাহার উদ্ভাবনকর্ত্তা ডাক্তার ডারভিল (Dr. Durville)। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে শতকরা ৮০ জন লোক মাত্র কথার ইঙ্গিতে (suggestion) ভোলে। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটি একটি কড়া অথচ নমনীয় তারের বেড়, ও ঐ বেড়ের মধ্যে একটা ছককাটা কাঁটাওলা ডালা আছে; তারের বেড়টা যে-পরিমাণ চাপা হয়, কাঁটাটি ডালার উপর সরিয়া বেড়ায় ও ছকে আঁকা দাগ ও সংখ্যা দেখিয়া চাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়। পরীক্ষিত ব্যক্তি ঐ যন্ত্রটি হাতের তেলোয় ধরিয়া তেলোর উপর আঙুলের চাপ দিয়া যতদূর শক্তি তারের বেড়টিকে টিপিয়া ধরে; তখন কাঁটাটি সরিয়া তাহার শক্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করে; তারপর তাহাকে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিতে দিয়া যদি তাহার সামনে
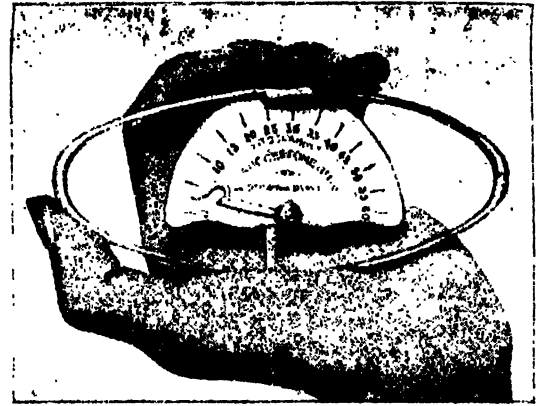
সাজেস্টোমিটার।

কিছু মিথ্যা মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইয়া বা বুজরুকীর অনুষ্ঠান করিয়া বা হাতের উপর গোটাকতক পাস দিয়া বা হাত চালিয়া তাহাকে বলা যায় যে তুমি আর ঐ তার মোটেই চাপিতে পারিবে না, তবে দেখা যায় যে শতকরা ৮০ জন লোক আর তাহা চাপিয়া নোয়াইতেই পারে না। এই যন্ত্র দিয়া রোগীর nervousness কি পরিমাণ তাহা সহজেই মাপা চলে; এবং চিকিৎসায় কিরূপ ফল হইতেছে তাহাও নির্ণয় করা চলে।

পাহাড়ের গায়ে খোদকারী—

ভারতবর্ষে অজন্তা এলোরা হস্তী বাঘ প্রভৃতি গুহা পাহাড় কাটিয়া তৈয়ারী। পাহাড়ের গায়ে চিত্র অঙ্কন ও মূর্ত্তি তক্ষণ প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এইবার এই নবীন যুগে নবীনতম সুসভ্য দেশ আমেরিকাতে পাহাড়ের গায়ে চিত্র ও মূর্ত্তি খুদিয়া আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের একত্র সম্মিলনে যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা স্মরণীয় করিবার আয়োজন চলিতেছে। আটলাণ্টার নিকটে ষ্টোন পর্ব্বতের একটি খাড়া দিক আছে, উহা ৮০০ × ১৫০০ ফুট; উহা গ্রানাইট পাথরের, তাহার গায়ে কাটা চটা নাই। এই পাহাড়ের দেয়ালে ছবি খুদিবার ভার পাইয়াছেন ভাস্কর শ্রীযুক্ত গুট্জোন বরগ্লাম (Gutzon Borglum)। ঐ ছবিতে দেখানো হইবে একদল সৈন্য কলাসঙ্গত ভাবে দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিয়া চলিতেছে, এবং সেই সৈন্যদলে উত্তর ও দক্ষিণ ষ্টেটগুলির গৃহবিবাদের যুদ্ধে লিপ্ত প্রধান প্রধান লোকদের মূর্ত্তি সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া থাকিবে। এই ছবির প্রধানগুলি রিলিফ বা তুলিয়া খোদা হইবে, অপর সমস্ত বাটালি দিয়া কুঁদিয়া কাটা হইবে। ঘোড়-সওয়ার মূর্ত্তিগুলি ৫০ ফুট করিয়া করিলে তবে মানানসই দেখাইবে।

পাহাড়ের গায়ে ৫০০ ফুট চাপ্‌তক্তার সিঁড়ি করিয়া ভারা বাঁধা শেষ হইয়াছে। ভারার উপর বিদ্যুৎচালিত গাড়ী চলিবে ও ঝোলা ঝুলিবে; সেই ঝোলায় চড়িয়া মিস্ত্রীরা পাহাড়ের গা খুদিবে।

প্রথমে আসল ছবির ছোট মডেল গড়া হইবে; তাহা হইতে মানুষ-প্রমাণ আকারে মডেল গড়া হইবে; সেই মডেল হইতে পাহাড়ের গায়ে অতিকায় মূর্ত্তি পাহাড়ের দেয়ালের আকারের সঙ্গে মানানসই করিয়া খোদা চলিবে।

খোদকারী হইবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দিয়া; যুবক শিল্পীদের অধীনে ৩৪ জন মিস্ত্রী এক এক দল করিয়া খোদাই করিতে করিতে সমস্ত ছবিটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে।
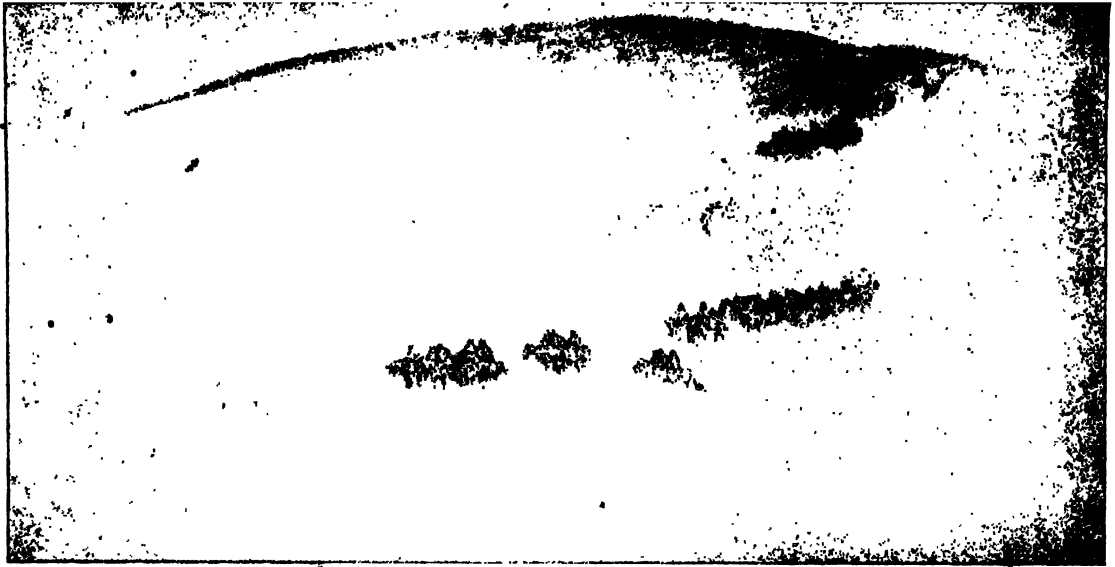
পাহাড়ের গায়ে চিত্রাঙ্কণ

গ্রানাইট পাথরে রোদ জল বাতাস লাগিলে লালচে রং ধরে; অতএব ছবিটি দেখাইবে সুন্দর। এই পাহাড়ের দেয়ালটা উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণপশ্চিমে থাকাতে তাহার উপর যথেষ্ট আলোর অভাব হইবে না।

এত বড় সাহসিক কর্ম্ম নাকি ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন মিশর আসীরিয়া বা ভারতে অনুষ্ঠিত হয় নাই। রোড্‌স দ্বীপের কলোসাস-মূর্ত্তি ৮০০ ফুট উঁচু ছিল না নিশ্চয়। ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেড ডেন-শত্রুদের পরাজিত করাতে মাটি দিয়া একটি শাদা ঘোড়া তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহা মাত্র ৩৭৪ ফুট লম্বা ছিল।

কলে রাস্তা ঝাঁট—

আমেরিকার শহরের রাস্তা ঝাঁটা দিয়া পথিকদের ধূলিধূসর করিয়া ঝাঁট দেওয়া হয় না; সেখানে মোটর গাড়ীর সঙ্গে সংযুক্ত বুরুশ দিয়া সমস্ত রাস্তা বনাত ঝাড়ার মতন ঝাঁটানো হয় এবং সংগৃহীত ধূলি ও আবর্জ্জনা গাড়ীর মধ্যে শোষণ করিয়া লওয়া হয়। গাড়ীর উদরের গহ্বরে নিঃশ্বাসের মতন বাতাসের টানে সমস্ত ধূলা শোষিত হয় এবং সেই বাতাস জলের ভিতর দিয়া বিশুদ্ধ করিয়া বাহিরে ছাড়া হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে লোক রাখিয়া ঝাঁটাইয়া রাস্তা সাফ করার চেয়ে এই উপায়ে কাজ ত ভালো হয়ই, খরচও কম পড়ে। ৮ ঘণ্টায় ২০০০ বর্গগজ জায়গা এই কলে সাফ করা যায়।

কলিকাতায় এইরূপ একটি কল আনাইবার কথা হইতেছে। কিন্তু তাহা আমাদের পয়সায় কেনা হইলেও ইংরেজটোলার সেবায় মোতায়েন হইবে নিশ্চয়।

চ।

রাস্তা-ঝাঁটাবার গাড়ী।

স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে

নীচ জন হলেও উচ্চ দৃষ্টি রহে নিম্নে।
ঊর্দ্ধে উড়ি শকুনিরা খোঁজে ভাগাড় কমনে॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ

ভারতবর্ষে দেশীয় রাজার অধীন রাজ্যের সংখ্যা শতাধিক, কিন্তু সকলরাজ্যের উন্নতি সমগতিতে অগ্রসর হইতেছে না। কোনও রাজ্য অতিদ্রুত, কেহবা মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। দেশীয় এরূপ বহুরাজ্য আছে যেখানকার উন্নতি ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা দ্রুতগতিতে হইতেছে। সেদেশের পরিচালকগণকে এজন্য নিশ্চয়ই বাহাদুরী দিতে হইবে। এইরূপ দেশীয় রাজ্যের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের মহীশূর রাজ্যের নাম করা যাইতে পারে। দেশের যেখানে যে অভিযোগ, অন্যায়, অনিয়ম, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি আছে, তাহা দূর করিবার জন্য মহীশূর-সরকার সুবিধা পাইলেই ও সাধ্যায়ত্ত হইলেই চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। গত কয়েক বৎসরের সরকারের কার্য্যবিধি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কিরূপ তৎপরতা ও উৎসাহের সহিত এই-সব কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারীদের, বিশেষতঃ দেওয়ানের, কার্য্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। মহীশূররাজ্য কৃষিপ্রধান দেশ। এই কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন দেওয়ান নানারূপ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। কৃষির সহায়ক নানারূপ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ কৃষির জন্য জলসেচন প্রয়োজন সেইরূপ মহীশূরেও। এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য মারিকানাবের বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মহীশূর-সরকার ইহা অপেক্ষা বৃহৎ জলাশয় আর করেন নাই এবং ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে যে স্থাপত্য-কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা বোধ হয় সমগ্র ভারতে অদ্বিতীয়। ইহাকে জলাশয় বা বাঁধ বলিলে ইহার অপমান করা হয়—ইহাকে একটি হ্রদ বলিলেই চলে। কারণ ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮ মাইল ও ৩০ বর্গমাইল ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহা অপেক্ষা বৃহদাকার আরও কয়েকটি কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করা হইতেছে, কিন্তু সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার।

প্রায় শতাব্দী ধরিয়া মারিকানাবে হ্রদে পরিণত করিবার মতলব ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যকালে কোনটিই অবলম্বিত হয় নাই। ১৮৯২ খ্রীঃ কার্য্যটি আরম্ভ করা হয়। চারিদিকের পাহাড়ও বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করা হয়, কারণ বাঁধে বিশাল জলরাশি ধরিয়া রাখিতে হইলে দৃঢ়ভিত্তির প্রয়োজন। প্রথম প্রথম অনেকে ইহা অনুপযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু অবশেষে বিশেষজ্ঞেরা ইহার উপযোগিতা স্বীকার করেন। তখন পর্য্যবেক্ষক ইঞ্জিনীয়র কার্য্যের নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। এই বিশাল কার্য্য যখন সম্পন্ন হইল তখন দেখা গেল যে, ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে—রাজসরকার ও জনসাধারণ সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

চিতলদ্রুগ জেলার হিরিয়ুর সহরের চারিদিকের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্যই প্রধানতঃ মারিকানাবে হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভূভাগটি রাজ্যের অন্যান্য ভূভাগের তুলনায় মরুময়। এখানে বৎসরে সাধারণতঃ ১৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু এমনও ঢের বৎসর দেখা গিয়াছে যে বৎসরে মাত্র ৬।৭ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে। হ্রদ প্রস্তুত হওয়াতে এই ফল হইয়াছে যে বৃষ্টির জল এখন আর নষ্ট হয় না ও অভাবকালে প্রচুর পরিমাণে জল ক্ষেত্রে সেচন করা যায়। যদিও এখনও ইহার সম্পূর্ণ সাহায্য অনেকে লয় নাই, কিন্তু আশা করা যায় শীঘ্রই কৃষককুল ইহা জ্ঞাত হইবে ও অধুনা জলাভাবে অকৃষ্ট ভূমি-সকল শস্যফসলে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই হ্রদ হইতে হিরিয়ুর ব্যতীত অন্য আর-একটি তালুকেও একটি প্রণালীর সাহায্যে জল বিতরণ করা হয়।

স্থপতিরা মনে করিয়াছিলেন যে, বাঁধের উচ্চতা ১৪২ ফুট ও ভিত্তি ২০ ফুট হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ ১৬২ ফুট গাঁথিতে হইবে। পাথরের বড় বড় খণ্ড জমাইয়া বাঁধের দেওয়াল তুলিতে হইবে। প্রতিঘনফুট দেওয়ালের ওজন ১৫০ পৌণ্ড হইবে ও প্রতিঘনফুটে জলের চাপ যাহাতে ৮ টনের বেশী না পড়ে সে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাঁধের যেটুকু গাঁথিতে হইয়াছে তাহা দৈর্ঘ্যে ১৩৩০ ফুট ও প্রস্থে ১২ ফুট। বেশী জল হইলে তাহা ধরিবার জন্য ৪৭০ ফুট লম্বা আর-একটি বাঁধ গাঁথা হইয়াছে। কিন্তু এই বাঁধের সম্পূর্ণ প্রয়োজন কোনও দিন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

১৮৯৮ খৃঃ হ্রদে কাজ করিবার লোকজন ও কর্ম্মচারী-বৃন্দের জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত হয় ও ভিত্তি গাঁথার কাজও
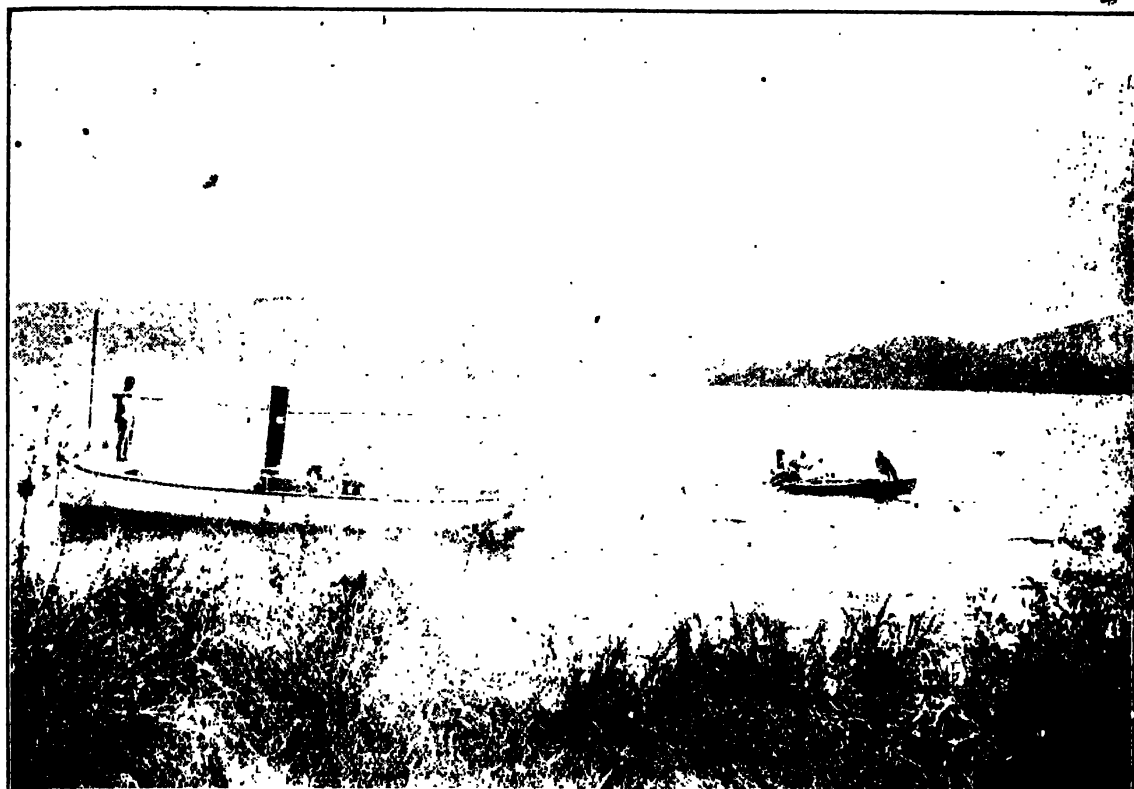
ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ মারিকানাবের সাধারণ দৃশ্য
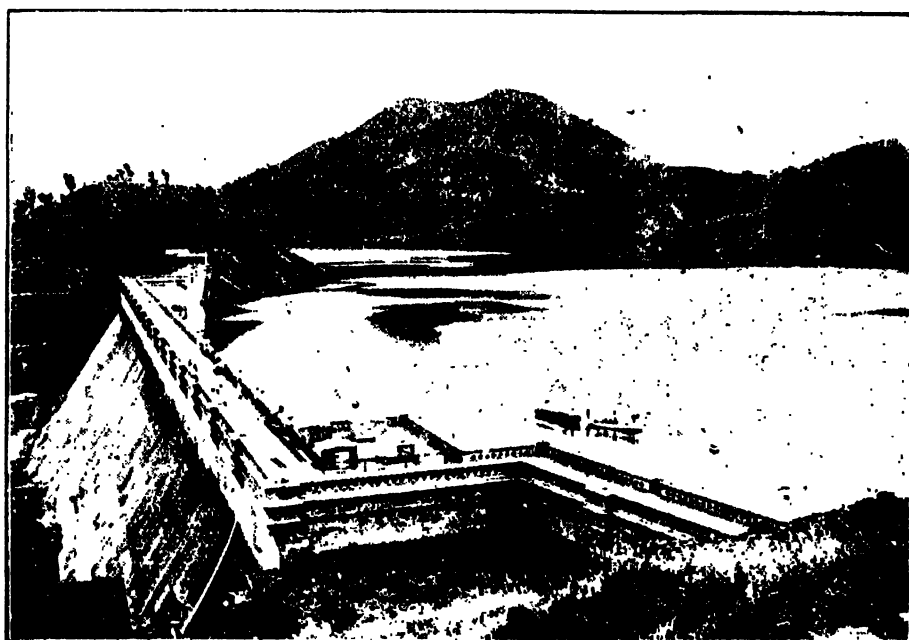
ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ-মারিকানাবের দৃশ্য নিকটস্থ পাহাড়ের উপর হইতে।

ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ মারিকানাবের বাঁধ নির্ম্মাণ।

ধীরে-ধীরে চলিতে থাকে। কিন্তু কাজ আরম্ভ হইবার চারিমাস পরে কলেরা ভীষণ প্রকোপে দেখা দিল। ঘনসন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরের বাসিন্দা পঞ্চসহস্র কুলী-মজুরদিগের মধ্যে ইহা অতি সহজেই আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কলেরাক্রান্ত রোগীদিগকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করিয়া রাখা হইতে লাগিল। সকলকে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ করা হইল ও কদর্য্য স্রোতস্বতীর জলপান বারণ করিয়া দেওয়া হইল। কুটীরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা ও কূপাদি বিশুদ্ধ করিয়া দেওয়া গেল। তবুও প্রায় চারিশত লোক প্রাণ হারাইল। প্রায় চারিহাজার লোক শ্রমাধিক্য দেখিয়া অগ্রিম টাকা দাদন লওয়া সত্ত্বেও পলায়ন করিল। এইরূপে প্রায় ২০০০ টাকা ক্ষতি হইল। কিন্তু পরে এই টাকা অবশ্য আদায় হইয়াছিল। এইরূপে লোকসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় কলেরাদি বন্ধ হইয়া গেল বটে, কিন্তু কার্য্যের ভয়ানক ক্ষতি ও দেরী হইয়া গেল। আবার কিছুদিন পরে আর-এক বিপদ উপস্থিত। বাঁধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভয়ানক এক জলপ্লাবন উপস্থিত হইল। জলে বাঁধের অসম্পূর্ণ নবগঠিত প্রাচীর ও কর্ম্মক্ষেত্র ডুবিয়া গেল। বহুকষ্টে জল ও বালি সরাইয়া ফেলিয়া পুনঃ কার্য্যারম্ভ হইল। ইহার পর আর কোনও বিশেষ বাধা উপস্থিত হয় নাই।

কিরূপ পাথরে প্রাচীর প্রভৃতি গাঁথা হইবে তাহা অনেক পরীক্ষার পর স্থির হয়। একরকম পাথর চারিদিকের পর্ব্বতশ্রেণীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়—দেখা গেল সেই জাতীয় পাথরে অল্পখরচে ইহা সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইবে। নানারূপ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডও ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রথমে ট্রলীতে করিয়া পাথর কুড়াইয়া আনা হইত, কিন্তু পরে আরও সস্তায় পাথরকুড়ানীদের দ্বারা ইহা সম্পাদিত হয়। কিছুদিন কাজ করিয়া জল আনিবার প্রণালী প্রস্তুত যখন আরম্ভ হইল সেই সময় টাকার অভাব পড়িয়া গেল। কাজেকাজেই কার্য্যের বিলম্ব ঘটিল। তারপর প্রায় দশবৎসরে ইহা সম্পূর্ণ হয়। বাঁধের পিছনের দিকের ঢালুর উপরিভাগ সিমেণ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে,
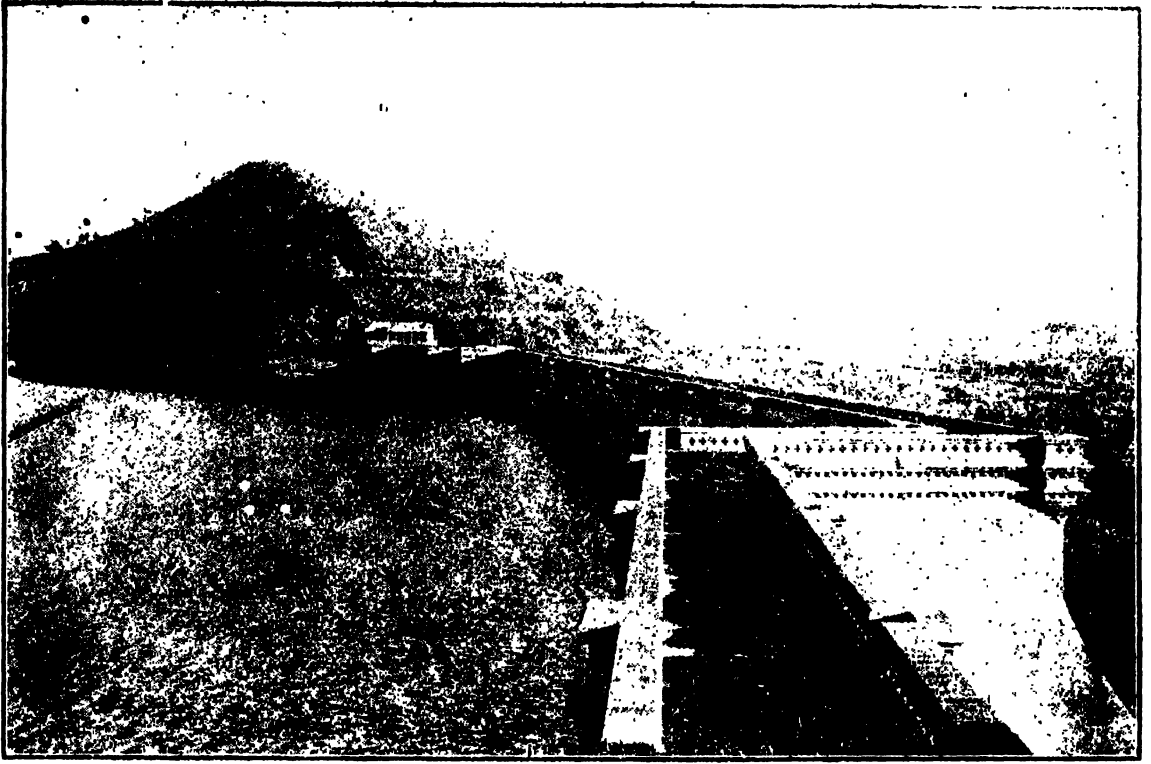
ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ মারিকানাবের সম্পূর্ণ বাধ

ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ মারিকানাবের পয়োনালি।
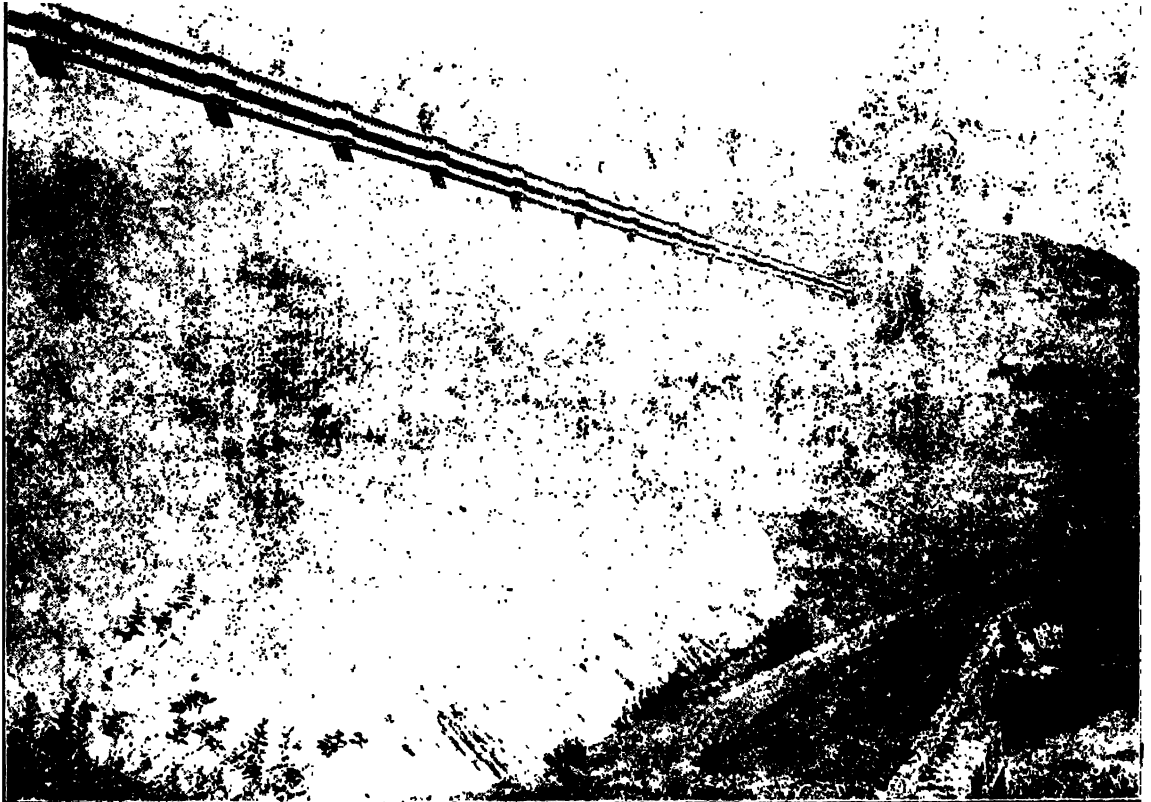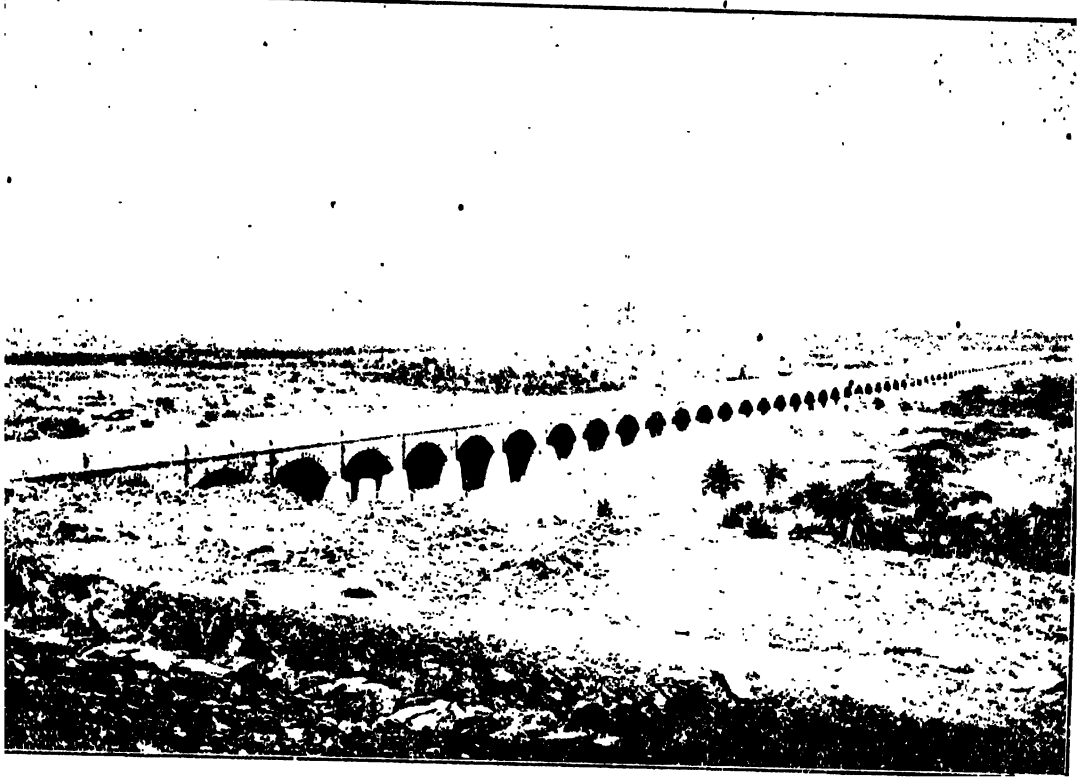
কারণ সিমেণ্টের উপর কোনওরূপ গাছগাছড়া জন্মিতে পারিবে না।

জলের গতিবিধি পরিমাণ লক্ষ্য করিবার যন্ত্রগুলিকে ষ্টোনীর পেটেণ্ট গেট বলে। প্রত্যেক খোলা অংশেই দুইটি করিয়া ঐ গেট আছে। প্রতি খোলা অংশ দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৬ ফুট ও মাথা দিয়া ১০০০ ঘনফুট জল বাহির হয়। প্রত্যেকটি গেটের ওজন ৬ টন, কিন্তু ইহা এমন সুকৌশলে স্ক্রুর মত পেঁচে সন্নিবিষ্ট যে মাত্র চারজন লোকে অনায়াসে উহা খুলিতে তুলিতে পারে। জল এই বাঁধ হইতে বাহির হইয়া পুনরায় নদীতে পতিত হয়, সেখানে একটা বাঁধে ধরিয়া দুইটি বৃহৎ প্রণালী দিয়া ইহা প্রবাহিত করা হয় ও যেখানে দরকার সেখানকার লোকেরা ইহা লয়। ইহা এরূপ সুন্যস্ত যে যখন যে-পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় তখন সেই পরিমাণ জল ছাড়া যায়।

বাঁধের নীচে একটি ছোট মন্দির আছে। মন্দিরটি মারী-দেবীর। এখানকারঅধিবাসীরা বলে যে, যদি দেবী কোনও দিন কোনও কারণে অপমানিত বোধ করেন তবে সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং জলপ্লাবনে সমস্ত দেশ ভাসিয়া যাইবে; তখন জলের উচ্চতা হিরিয়ুর মন্দিরের স্তম্ভের সমান হইবে ও স্তম্ভোপরি-উপবিষ্ট বাসব সব পান করিয়া লইলেন।

প্রকাণ্ড একটি ভূভাগ ব্যাপিয়া হ্রদটি অবস্থিত। ৩২টি গ্রাম উঠাইয়া ক্ষতিপূরণ দিয়া ও অন্যত্র জমি বিতরণ করিয়া হ্রদের জন্য ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে। যদিও যত জল ধরা যাইবে আশা করা গিয়াছিল বৃষ্টির অল্পতাবশতঃ তাহা হয় নাই, তথাপি ২০০০০ unit জল ধরা যায়। এই বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রথম হইতেই জানা ছিল যে ইহা বিশেষ লাভের ব্যবসায় হইবে না। কিন্তু এইরূপ আশা করা যায় যে, শেষে মূল অর্থের শতকরা ৩ টাকা হিসাবে লাভ পাওয়া যাইবে, এবং জনসাধারণের বহু উপকার হইবে। যদি জলপতন-সঞ্জাত শক্তি হইতে তুলা বা অন্য কোনও কল চালনা করা হয়, তাহা হইলে আরও লাভের সম্ভাবনা।

এখন পর্য্যন্ত প্রস্তুতের ইতিহাস বলা হইয়াছে। এইবার ইহার সৌন্দর্য্যের কথা কিছু বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বাঁধের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলে দেখা যায় বিশাল জলরাশি ধীরস্থিরভাবে সূর্য্যকিরণে ঝকমক করিতেছে—চারিদিকে ত্রিভূজাকৃতি পর্ব্বতমালা সবুজের ঢেউ খেলাইতেছে, ও হ্রদের মাঝে দুই একটি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দ্বীপ উঁকিঝুঁকি দিতেছে। হ্রদে বহুপ্রকারের অসংখ্য মৎস্য আছে। ডিসেম্বর মাসে বহু হাঁসের আমদানী হয়। সময়ে চারিদিকের দৃশ্যাবলী অনেক উন্নত হইবে আশা করা যায়, কারণ আর্দ্রবায়ুতে বৃক্ষাদি জন্মিবার সম্ভাবনা।

মারিকানাবের পথ দুরধিগম্য। হসদুর্গা ষ্টেশনই ইহার সবচেয়ে নিকটে। এখান হইতে কানাবে ত্রিশ মাইল, পথে পোল নাই। মহারাজার জন্য একটি সহজগম্য পথ হইয়াছে—এইটির সাহায্যে পশ্চিম হইতে তিনি ষ্টিমলাঞ্চে চড়িয়া অনায়াসে বাঁধে যাইতে পারেন। বাঁধের কাছে দর্শক ও পথিকগণের অবস্থানের জন্য একটি সুন্দর "বাংলা" আছে —পূর্ব্ব হইতে সময়মত সংবাদ দিলে বেশ ভালভাবে থাকা যায়।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

দেশের কথা

এই দুর্ভাগা অভিশপ্ত দেশের প্রধান কথাই অভাব। স্বাস্থ্যের অভাব, শিক্ষার অভাব, অন্নবস্ত্রের অভাব, সর্ব্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাব, সুতরাং মনুষ্যত্বের অভাব। এই দারুণ সর্ব্বাঙ্গীন অভাবের মধ্যে সম্প্রতি উগ্র হইয়া লবণ ও বস্ত্রের অভাব। মফস্বলের যে-কোন কাগজ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে হাট লুটের সংবাদ; যে দেশের লোক দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়ও অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া নীরবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে, তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া হাট লুট করিয়া নুন আর কাপড় সংগ্রহ করিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে দেশের লোকের একবেলার এক মুঠো নুন-ভাতেরও অভাব ঘটাতে তাহাদের সহ্যের অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, দেশের দুঃখের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। তাই সমস্ত দেশ যখন নিজের দেশে স্বয়ম্প্রভুতা পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তখনও মফস্বলের সংবাদপত্রে নুন আর কাপড়ের অভাবে লোকের কষ্টের কথাই আলোচনা দেখিতেছি, প্রত্যক্ষ কষ্ট ছাড়িয়া সুদূর ভবিষ্যতে প্রতিকারের উপায় ভাবিবার অবসরও কাহারো নাই। লবণ ও বস্ত্রের অভাব মোচনের পক্ষে মফস্বলের সংবাদপত্রে যে-সমস্ত আলোচনা হইয়াছে, তাহার সামান্য অংশ আমরা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি—

লবণের অভাব।

কলিকাতা সহরে ময়দা ও চিনিতে এক প্রকার চীনা মাটির গুঁড়া অনেক স্থলেই ভেজাল চলিতেছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্যকমিটি এই সংবাদ পাইয়া স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর স্বাস্থ্যবিভাগ কর্ত্তৃক এই দুই জিনিষের ঘৃতের মত রাসায়নিক পরীক্ষা চলিবে। লবণেও ভেজাল চলিতেছে। লবণ অতি দুর্ম্মূল্য হওয়ায় অনেক দোকানদার নাকি তাহাতে বালি মিশ্রিত করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছে, এরূপ একটি জনরব আমরা কিছুদিন হইল শুনিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি ইহা লইয়া পাবনার ফৌজদারী আদালতে একটি মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বাজারের কয়েকজন মহাজন গোকুলচন্দ্র সাহা তারকচন্দ্র সাহা রামকমল সাহা ও গৌরচন্দ্র সাহা লবণে বালি মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করার অপরাধে ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হয়। বিচারে প্রত্যেকের ৭৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। ভেজালে কি সর্ব্বনাশই হইতে চলিল। গবরমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রতিকার করুন। —পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী।

লবণের মূল্য এখন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি হওয়ায় দেশের সর্ব্বসাধারণের যারপরনাই ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সাড়ে তিন পয়সায় পাঁচ পোয়া লবণ পাওয়া যাইত, এখন হাটে বাজারে লবণের সের প্রায় চারি আনা হইয়াছে। লবণের দর এখন চাউলের দরের তিন গুণ বাড়িয়াছে। লবণ না হইলে কাহারও দিন চলে না। এই দরিদ্র দেশের অধিকাংশ লোকে অন্য কিছু না পাইলেও নুনেভাতে দিন কাটাইয়া দিত; কিন্তু এখন লবণের এই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া জনসাধারণ ভীত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা ক্রমে সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক, এই ব্যাপারে এখন ভারত গভর্ণমেণ্টের পর্য্যাপ্ত মনোযোগ পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভারত-গবর্ণমেণ্ট লবণের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি নিবারণের জন্য উপায় নির্দ্ধারণে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে লবণের আড়ত খুলিয়া দর কমাইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন এবং এই মর্ম্মে সকল প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে, পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট যেমন লবণ বিক্রয়ের জন্য সরকারী ও মিউনিসিপ্যাল ডিপো খুলিয়াছেন, অপর গভর্ণমেণ্টগুলি তেমন ভাবে লবণ বিক্রয়ের ডিপো খুলিতে চেষ্টা করুন। এই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইলে লবণ-ব্যবসায়ীরা আর বেশী লাভে লবণ বিক্রয় করিয়া দরিদ্রের সর্ব্বনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা আশা করি, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টও বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র এই লবণ বিক্রয়ের ডিপো স্থাপনপূর্ব্বক দরিদ্র প্রজাসাধারণকে রক্ষা করিবেন। এ সম্বন্ধে সহযোগী "বাঙ্গালী" একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন,—"বাঙ্গালা দেশের

সর্ব্বত্রই যদি উক্তরূপ লবণ বিক্রয়ের ডিপো স্থাপন করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে লবণ তৈয়ারীর জন্ম অস্থায়ী ভাবে হুকুম দিন। যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন যাহাতে বাঙ্গালার লোকে বাঙ্গালার লবণ সরবরাহের জন্য অবাধে লবণ প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট করুন্। ইংরেজ-শাসন এদেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এদেশবাসী লবণ প্রস্তুত করিত; লবণ তৈয়ার করিতে কোনও রাজাই বাধা দেন নাই। লবণ মাদক দ্রব্য নহে; সুতরাং ইহা অবাধে তৈয়ারী হইলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। এমন অবস্থায় প্রজাকে লবণ তৈয়ারী করিতে না দেওয়া কি ন্যায়সঙ্গত?"—নীহার।

বর্ত্তমান সময়ে লবণের মূল্য যেরূপ হারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে এবং লবণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে সাধারণ লোকের জীবন-রক্ষা কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যা প্রদেশে বহু পূর্ব্বে সমুদ্রজল দ্বারা যেরূপ ভাবে লবণ প্রস্তুত হইত বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ ভাবে লবণ প্রস্তুতের নিমকি মহালের কারখানা স্থাপন করিলে, এতদ্দেশে লবণের অভাব দূরীভূত হইতে পারে এবং পক্ষান্তরে বহুতর দেশীয় ও বিদেশীয় লোক এবং বিস্তর শ্রমজীবী তাহাতে কার্য্য করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে। বিহার এবং যুক্ত প্রদেশে এক-প্রকার মৃত্তিকা হইতে পূর্ব্বে তদ্দেশীয় নুনিয়া সম্প্রদায় লবণ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। বর্ত্তমান সময়ে তাহারা বিদেশে মাটির কার্য্য করিয়া কোন-প্রকারে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন লোক দ্বারা চেষ্টা করিলে এখনও সেইরূপ ভাবে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। লবণ গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসা। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত শুল্কের হার পূর্ব্ববৎ বহাল রাখিয়া যাহাতে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হইতে পারে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সেইরূপ কার্য্য করা প্রজাসাধারণের জন্য একান্ত কর্ত্তব্য। মনে করি যখন প্রকৃতি দেবী প্রচুর পরিমাণে লবণ আমাদের সম্মুখে রাখিয়াছেন তখন গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে একটু চেষ্টা করিলেই এক দিকে আমাদের লবণের অভাব দূরীভূত হইতে পারে এবং অন্য দিকে বহুতর শ্রমজীবীর জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান করিতে পারে। আশা করি সকল সংবাদপত্র সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ বিষয়ের সম্যক-প্রকার আলোচনা করিবেন, যাহাতে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।—রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

মফঃস্বল হইতে সংবাদ আসিতেছে যে কোন কোন স্থানে লবণ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। প্রতি সের ।/০ পাঁচ আনা পর্য্যন্ত বিকাইতেছে। চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জে ৮।০ মণ দর বিকাইতেছে। শুনিতেছি, কলিকাতার বড় বড় ব্যবসায়ীরাই ষড়যন্ত্র করিয়া লবণের দর এত চড়াইয়া দিয়াছে। ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত দেখিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট সম্বর ক্রুদের লবণ অতঃপর তাহাদের কাছে কিছুকাল বিক্রয় করিবেন না, গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী যেখানে ডিপো খুলিতেছে সেই-খানেই পাঠাইবেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থার সুফল ভারতের উত্তরপশ্চিম ও মধ্যভাগের লোকেরাই ভোগ করিবে। কিন্তু এতদ্-অঞ্চলের লোকের উপায় কি? আমরা মাননীয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে সকাতরে নিবেদন করিতেছি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের লোকদিগকে অনুমতি দান করুন, লাইসেন্স দিন; তা'হলে জনসাধারণ এই অকারণ যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা পাইবে। আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি সমুদ্রতীরে লবণ তৈয়ার করিতে প্রতি সের ১০ পয়সার বেশী খরচ পড়িবে না। তদুপরি গবর্ণমেণ্টের শুল্ক ১০ পয়সা ও অন্য খরচ ৫ পয়সা ধরিলেও /৫ পয়সার বেশী প্রতি সেরের দর পড়িবে না। অদ্য জানা গেল ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন যেন গবর্ণমেণ্ট নিজে ও মিউনিসিপালিটীকে দিয়া লবণের গোলা খোলেন। তা'হলে লবণের ব্যবসায়ীরা আর নৃশংসভাবে দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিতে পারিবে না।—জ্যোতি।

লবণের দর অত্যধিক চড়িয়াছে বলিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে দেশের স্থানে স্থানে লবণের খটি খুলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সেইসকল খটি হইতে দরিদ্র লোকদিগকে উচিত মূল্যে লবণ সরবরাহ করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে লবণ সরবরাহ করিবেন, এবং তৎপরে দোকানদারদিগের নিকট উহা বেচিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে দোকানদারগণ আর অন্যায়রূপে দাম চড়াইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট লবণের ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিলেন, কিন্তু এই ব্যবস্থা যাহাতে সত্বর কার্য্যে পরিণত হয় সে পক্ষে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তৎপর হউন। পক্ষান্তরে কাপড় সম্বন্ধেও সরকার এইরূপ একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। কাপড়ের অনিয়ম মূল্য বৃদ্ধিতে একদিকে যেমন লোকসাধারণের অকথনীয় কষ্ট হইয়াছে, অন্য দিকে সেজন্য দেশে অশান্তি বাড়িয়া চলিয়াছে।—মোহাম্মদী।

পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক কমিনিক প্রচার করিয়াছেন যে, মান্দ্রাজে ত্রিশ লক্ষ মণ লবণ মজুত আছে। বাঙ্গলার ব্যবসায়ীরা অনায়াসে ঐ লবণ খরিদ করিয়া আনিতে পারেন। মদ্র-গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, (১) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর-পূর্ব্বদিকে যে রেলওয়ে গিয়াছে, তাহার ষ্টেশনে বা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে ১৭ লক্ষ মণ লবণ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাহাদের লবণ বিক্রয়ের 'পাশ' আছে তাহারা উহা ক্রয় করিয়া বাঙ্গলা দেশে আনিতে পারেন। (২) এতদ্ব্যতীত মদ্রগবর্ণমেণ্ট ঐ অঞ্চলে প্রতি মাসে ৪ লক্ষ মণ লবণ বিক্রয় করিতেছেন। লবণের মহাজনেরা তাহাও খরিদ করিয়া আনিতে পারেন। (৩) চিঙ্গলপট্ট জিলার দক্ষিণদিকে ৭।০ লক্ষ মণ লবণ মজুত আছে। ঐ লবণের মূল্য প্রতি মণ তিন আনা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত। কোলভং বন্দর অথবা মান্দ্রাজ হইতে ঐ লবণ রেলপথে বা জাহাজে কলিকাতায় আনা যাইতে পারে। (৪) টিনিভেলী জিলার টিউটিকরিন এবং কয়লাপটম এই দুই স্থানেও ৫ লক্ষ মণ লবণ পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কমিনিক পাঠ করিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছি; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গের হাটে বাজারে সুলভ মূল্যে লবণ না পাওয়া যাইবে, ততদিন দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে শান্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তার পর, মান্দ্রাজের লবণ যাহাতে এদেশে আমদানী করা যাইতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। কেবল বাঙ্গলার লবণব্যবসায়ীদিগের উপর নির্ভর করিলে বর্ত্তমানে লবণের অভাব দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মান্দ্রাজ হইতে আজকাল কোনও জিনিষপত্রের আমদানী করা ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে একান্ত সহজসাধ্য নহে। অধিকন্তু ব্যবসায়ীরা মান্দ্রাজের লবণ সস্তা দরে খরিদ করিয়া আনিলেই যে, তাহারা সুলভ মূল্যে উহা বিক্রয় করিবে, বর্ত্তমান লবণ ও কাপড়ের বাজার দেখিয়া আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের মতে আপাততঃ কতক সময়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এদেশে লবণ ও বস্ত্র বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিলেই গরীব প্রকৃতিপুঞ্জের যথেষ্ট কল্যাণ হইবে।—ঢাকা-প্রকাশ; মোসলেম-হিতৈষী; বাঁকুড়া-দর্পণ।

সংবাদপত্রে প্রকাশ দ্বারভাঙ্গা মিউনিসিপালিটী টাকায় বার সের করিয়া লবণ বিক্রয় করিবার জন্য সহরের মধ্যে চৌদ্দখানা লবণের দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার চট্টগ্রামেও সাধারণে যাহাতে লাইসেন্স লইয়া সমুদ্রজলে লবণ প্রস্তুত করিতে পারে তজ্জন্য

গবর্ণমেণ্ট হইতে ব্যবস্থা করা হইতেছে। এসব দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই যে আমাদের লবণের অভাব ঘুচিয়া যাইবে তাহার আশা করা যায়। তবে এসঙ্গে বস্ত্রাভাব নিবারণের জন্যও গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে কি?—বীরভুমবার্ত্তা।

বস্ত্রের অভাব।

তাঁতের বস্ত্র—কাপড়ের বাজার অগ্নিমূল্য হওয়ায় অনেকেই তাঁতের বস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। আজকাল এ অঞ্চলের হাটে বাজারে প্রচুর তাঁতের কাপড় আমদানী হইয়া কাটতিও খুব হইতেছে। স্থানে স্থানে বস্ত্রবয়ন-জন্য উন্নত ধরণের তাঁতেরও প্রতিষ্ঠা হইতেছে; ইহা আশার বিষয় বটে, কিন্তু এখন এই সুযোগ পাইয়া তন্তুবায় কিম্বা তাঁতের বস্ত্রের ব্যবসায়ীগণও কাপড়ের মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া দিতেছে। এটা কিন্তু তাহাদের পক্ষে শুভজনক নহে। এখন এই বস্ত্র-সমস্যার দিনে লোকে যে-কাপড়ের দর একটু সস্তা পাইবে তাহাই আগ্রহের সহিত ক্রয় করিবে। সুতরাং তাঁতের কাপড়ের দর বেশী হইলে লোকে তাহা লইবে কেন? এ অবস্থায় এখন তন্তুবায় কি তাঁতের-বস্ত্র-ব্যবসায়ী কাহারও এই একটি স্বদেশী ব্যবসায়ের প্রথম উন্নতির সময় এরূপ অধিক লাভের চেষ্টা করিয়া অঙ্কুরেই তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। সাধারণতঃ তন্তুবায়গণ হাত-প্রতি দুই পয়সা তিন পয়সা বুনানি লইয়া কাপড় বুনিয়া দিয়া থাকে। এখন সুতার দাম বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐসঙ্গে বুনানির দরও বাড়াইয়া দিয়া অধিক লাভের চেষ্টা করা সুবিবেচকের কার্য্য নহে। ইহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবে। তাঁতের কাপড়ের দর অধিক চড়া হইলেই উহার কাটতি কমিয়া যাইবে, লোকে আর এই কাপড় ক্রয় করিতে চাহিবে না। সুতরাং এই বিষম সমস্যার দিনে সকল বিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া কার্য্য করা তন্তুবায় কি তাঁতের-বস্ত্রব্যবসায়ীদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।—নীহার।

সুখের বিষয় এখন কার্পাস চাষের প্রতি অনেকের আগ্রহ জন্মিয়াছে। কোন কোন স্বদেশ-হিতৈষী জমিদারও নিজ জমিদারীর মধ্যে কার্পাস চাষ বিস্তৃতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এখনও কার্পাস চাষের সময় অতীত হয় নাই। দেশের এই কঠিন বস্ত্র সমস্যার দিনে এখন সর্ব্বত্রই যাহাতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস চাষ এবং ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন হইতে পারে, সে বিষয়ে সকলেরই সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। নচেৎ সুতা ও কাপড়ের দাম দিন দিন যেরূপ অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে বস্ত্রাভাবে আমাদের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না।—নীহার।

গবর্ণমেণ্ট ভোলা সবডিবিজানে ভদ্রসন্তানদিগকে ২ বৎসর কৃষি শিক্ষা দিয়া হাতে লাঙ্গলে চাষ করিবে এই সর্ত্তে ১৫ বিঘা করিয়া জমি বন্দোবস্ত দিতে চাহিয়াছেন।—সম্মিলনী।

অন্নবস্ত্রের অভাবের পরই আমাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অভাব মোচনের দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কারণ—

স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তিই দেশের প্রকৃত সম্পদ। যে দেশের মানুষ সুস্থ সবলদেহ, সেই দেশই ত প্রকৃত বিত্তশালী। ইংরেজগণ এই মহাযুদ্ধে এই সত্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই সাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। দুঃস্থব্যক্তিগণ বিনা ব্যয়ে যাহাতে চিকিৎসিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। খাদ্যাদির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে। ভারতে এমন ব্যবস্থা কবে হইবে? ভারতের লোক এখন স্বাস্থ্যহীন; ভারতকে প্রকৃত সম্পদশালী করিতে হইলে ভারতবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতিসাধনে যত্নপর হওয়া আবশ্যক।—রঙ্গপুর-দর্পণ।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বুরোক্রাটিক গভর্মেণ্ট দেশী লোকদের শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত উদাসীনতা ও তাহার সাহায্যে দেশী লোকদেরই প্রদত্ত রাজস্ব খরচ করিতে অত্যন্তই কৃপণতা দেখাইয়া আসিতেছেন। যখন দেশের লোকে শিক্ষালাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া গভর্মেণ্টকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে ও বিলাতের পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত তাহাদের কৃপণতা ও উদাসীনতার জবাবদিহি করিতে বাধ্য করিয়া অপ্রতিভ করিয়া ছাড়িয়াছে, তখন গভর্মেণ্ট শিক্ষা বিস্তারের অছিলায় য়ুনিভার্সিটি কমিশন, রেসিডেন্‌শিয়াল য়ুনিভার্সিটি, রেসিডেন্‌শিয়াল কলেজ, প্রভৃতি বড় বড় নামের আড়ম্বর করিয়া শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে যতরকম বিলম্ব ও বিঘ্ন উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের এই অতি দরিদ্র নিরক্ষর দেশে যে ঐসমস্ত ব্যয়সাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা অপেক্ষা বহুসংখ্যক স্কুল কলেজ গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া দেওয়া বেশী দরকারী, তাহা প্রবাসীতে বহুবার যুক্তি ও তথ্য এবং ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য অতিধনী দেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিয়া দেখানো হইয়াছে। আমরা খবর পাইলাম—

সম্প্রতি ঢাকার বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন যে, ঢাকাতে আপাততঃ নূতন একটা "রেসিডেন্সিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপনের কোনই প্রয়োজন নাই। পরন্তু, যাহাতে ঢাকা নগরে আরও দুইটি আর্ট ও বিজ্ঞান কলেজ, একটি ইঞ্জিনীয়ারী কলেজ, একটি কৃষি-কলেজ, একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইয়া এদেশের যুবকগণের সুশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে পারে, বর্ত্তমান কমিশন তদ্রূপ ব্যবস্থা করিলেই এতদঞ্চল—এমন কি, সমগ্র বঙ্গের যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। এই আবেদনপত্রে এ বিষয়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এদেশের মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ছাত্রগণ যাহাতে অল্পব্যয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে, কমিশনের সদস্যগণ যেন তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আমরা এই আবেদনকারীদিগের পূর্ণ সমর্থন করি।—ঢাকা-প্রকাশ।

ভারতবর্ষ সমুদ্রমেখলা দেশ। একদিন ভারতের জাহাজ পারস্য আরব মিশরে ও ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জে চীন জাপান আমেরিকায় বাণিজ্য ও যাত্রী বহন করিত, তাহাতে বিদেশের অর্থ ঘরে আনিয়া ভারত ধনসম্পদে পূর্ণ হইতে পারিত। কিন্তু ইংরেজ-আমলে ভারতের নৌবিদ্যা রাজশক্তির প্রতিকূলতায় নষ্ট হইয়া গেল; ভারতকে বিদেশী জাহাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে

হইতেছে। এখন য়ুরোপের যুদ্ধে বিদেশী জাহাজ লিপ্ত থাকায় ও বহু জাহাজ জার্ম্মানের টর্পেডো খাইয়া জলমগ্ন হওয়ায় জাহাজের অভাব ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন ও ভারতবাসীকে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতবাসী বহুদিন ধরিয়া আন্দোলন আলোচনা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এতদিন তাহাদের আলোচনা সফল হয় নাই। সুখের বিষয় এই যে এবার ভারত-গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় জাহাজ নির্ম্মাণের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বিলাতের নৌ-বিভাগ-পরিচালন কমিটীর একজন সদস্য এই কারখানা স্থাপন-বিষয়ে পরামর্শাদি দিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীদিগকে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে সমধিক সুখের কারণ হইবে।—যশোহর।

আমাদের এই দুর্ভাগা দরিদ্র দেশের অভাব মোচনের জন্য যাঁহারা যতটুকু সাহায্য করেন তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা জানিয়া সুখী হইয়াছি—

ময়মনসিংহের উকিল বাবু অনাথবন্ধু গুহ তথায় দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কলেজ করার জন্য ১২০০০০ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।—বরিশাল-হিতৈষী।

শ্রীযুত রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন তাঁহাদের জন্মস্থান আলমগঞ্জে (কাটোয়ার ৭ মাইল দক্ষিণে) বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ উহাঁদের মাতৃদেবীর নামে 'বিরাজ-সুন্দরী দাতব্য ঔষধালয়' স্থাপন করিয়াছেন। ডাক্তারি এবং হোমিও-প্যাথি বিভাগে শতাধিক লোক ইতিমধ্যেই চিকিৎসিত হইয়াছেন। সৎপ্রবৃত্তি পিতৃমাতৃপুণ্যেই হয়।—এডুকেশন-গেজেট।

শ্রীরামপুরের ৺হেমচন্দ্র গোস্বামীর উইলের সর্ত্তানুসারে প্রতি বৎসর দরিদ্রদিগকে কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা আছে। এ বৎসর "আওয়ার ডে"র উপলক্ষ্যে ঐসকল কম্বল বিতরিত হইয়াছিল। এডুকেশন-গেজেট।

কলিকাতার স্বর্গীয় পরাণচন্দ্র দত্তের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী হরিমতী দাসী ৺কাশীধামস্থ রামকৃষ্ণ মিশন হোমের পরিচালকগণের হস্তে এই সর্ত্তে ৪২০০০ টাকা দান করিয়াছেন যে মিশন হোমে ২৫০০ টাকা দিয়া তাঁহার স্বামীর নামে একটি ওয়ার্ড খুলিতে হইবে এবং একটি রোগীর আংশিক সেবা-শুশ্রূষার জন্য বাকী টাকা ব্যয় করিতে হইবে।—কাশীপুরনিবাসী।

মানভূম জেলার কুণ্ডলার অন্যতম জমিদার সানুজ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সানুজ শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কুণ্ডলাগ্রামে 'কৃপাসিন্ধু গোপেন্দ্রচন্দ্র হাই ইংলিশ স্কুল" স্থাপন করিয়া তত্রত্য একটা বিশেষ অভাব মোচন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আগামী ১৯১৮ সালের ২রা জানুয়ারী এই স্কুল খোলা হইবে এবং একটি নব-নির্ম্মিত অট্টালিকা-গৃহে উক্ত স্কুলের অধ্যাপনাদির কার্য্য আরম্ভ হইবে।—বীরভূম-বার্ত্তা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঐক্য।

এবার কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রারম্ভে যে বেদমন্ত্র গীত হইয়াছিল, তাহা জাতীয় মহাসমিতির মূলমন্ত্র হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

ঋগ্বেদ, ১০,১৯১,২।৩।৪।

"তোমরা সংগত হও (একত্র মিলিত হও), অবিরোধ করিয়া বাক্য বল, তোমাদের মন অবিরোধ জ্ঞানলাভ করুক। ইহাদের মন্ত্র, সমিতি, মন (অন্তঃকরণ), ও চিত্ত (বিচারজ জ্ঞান) সমান (একরূপ) হউক। তোমাদের আকূতি সমান হউক, হৃদয় সমান হউক, মন সমান হউক, যেন তোমাদের সাহিত্য (সহের ভাব অর্থাৎ একসঙ্গে হওয়ার ভাব) শোভন হইয়া উঠে।"

এই মন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন ও গৌরব উপলব্ধি করিয়া ইহার সাধন করিলে আমাদের সিদ্ধিলাভ হইবে।

ঐক্যের মূল।

সিদ্ধির মূলমন্ত্র ঐক্য; ঐক্যের মূল তিনি যিনি এক, এবং জনগণমন-ঐক্যবিধায়ক। তাঁহাকে বাদ দিয়া, তাঁহার জায়গায় আর-কিছু বা আর-কাহাকেও বসাইলে প্রকৃত ঐক্য হইতে পারে না।

তোমারে শতধা করি' ক্ষুদ্র করি' দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলা-ভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।
মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি' যারা সারা বেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজাখেলা
মুগ্ধ ভাবভোগে,—সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুতুল।

তোমারে আপন সাথে করিয়া সমান
যে খর্ব্ব বামনগণ করে অবমান
কে তাদের দিবে মান ? নিজ মন্ত্রস্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্দ্ধা করে
কে তাদের দিবে প্রাণ ? তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্যধারা ?

একনিষ্ঠা ও একপূজার রাষ্ট্রীয় শক্তি।

ওয়াল্টার ব্যাজট্ তাঁহার ফিজিক্স্ এণ্ড পলিটিক্স্ নামক বহিতে লিখিয়াছেন—

"Those kinds of morals and that kind of religion which tend to make the firmest and most effectual character are sure to prevail, all else being the same; and creeds and systems that conduce to a soft limp mind tend to perish, except some hard extrinsic force keep them alive. Thus Epicureanism never prospered at Rome, but stoicism did; the stiff, serious character of the great prevailing nation was attracted by what seemed a confirming creed, and deterred by what looked like a relaxing creed. The inspiriting doctrines fell upon the ardent character, and so confirmed its energy. Strong beliefs win strong men, and then make them stronger. Such is no doubt one cause why Monotheism tends to prevail over Polytheism; it produces a higher, steadier character, calmed and concentrated by a great single object; it is not confused by competing rites, or distracted by miscellaneous deities. Polytheism is religion *in commission*, and it is weak accordingly. But it will be said the Jews, who were monotheist, were conquered by the Romans, who were polytheist. Yes, it must be answered, because the Romans had other gifts; they had a capacity for politics, a habit of discipline, and of these the Jews had not the least. The religious advantage was an advantage, but it was counter-weighed."—Walter Bagehot's *Physics and Politics*.

যুদ্ধে জয়ী হওয়া ও বিদেশ অধিকার করা ব্যক্তি এবং জাতির জীবনের চরম সফলতা, আমরা এরূপ মনে করি না। যুদ্ধ আর যাহাই করুক, ব্যাজট্ই বলিতেছেন, "All which may be called 'grace' as well as virtue it does not nourish; humanity, charity, a nice sense of the rights of others, it certainly does not foster." একনিষ্ঠা ও এক-পূজার রাষ্ট্রীয়শক্তি বাড়ে; কিন্তু সেই শক্তির যদি কেহ অপপ্রয়োগ করে, তাহার জন্য ঐক্যবিধায়িনী শক্তিকে দায়ী করা যায় না।

ভারতবর্ষের প্রার্থনা।

বেদমন্ত্র গীত হইবার পর কংগ্রেস-মণ্ডপে আরও কিছু গান হইয়াছিল। তাহার পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "India's Prayer" বা ভারতবর্ষের প্রার্থনা নাম দিয়া স্বরচিত দুটি প্রার্থনা ইংরেজীতে পাঠ করেন। প্রথমটির অনেক ভাব তাঁহার "নৈবেদ্য" গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় আছে। গোড়ার কথাগুলি নৈবেদ্যের সেই কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়, যাহাতে আছে—

"আমারে সৃজন করি' যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি!
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্ব্বরী
তার ঊর্দ্ধশিখা যেন সর্ব্বউচ্চে রাখি,
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি!
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর! সেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অবমান বহি' আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক্ না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে,......

"দেবদ্রোহী বলে সর্ব্বশক্তি লয়ে মোর" তাহারও সেই দেবদ্রোহচেষ্টা যেন প্রতিহত করিতে পারেন, কবি এই প্রার্থনা করিয়াছেন।

"যাক্ আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব!"

ইংরেজী প্রথম প্রার্থনাটি পড়িয়া আরো মনে পড়ে নৈবেদ্যের সেই কবিতা যাহাতে আছে—

"ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীনপ্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়!—দুর্ব্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে;
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে

আপনার মত,—যত আদেশ তোমার
পড়ে থাকে—আবেশে দিবস কাটে তার!
পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে
চতুর্দ্দিকে; মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তক মাড়ায়ে,
না পারে তাড়াতে তারে উঠিয়া দাঁড়ায়ে!
অপমানে নতশির ভয়ে ভীতজন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন!"

কিন্তু ইংরেজী এই প্রথম প্রার্থনাটি কবির কোন বাংলা কবিতার অনুবাদ নহে। ইহা সময়োপযোগী নূতন রচনা।

দ্বিতীয় ইংরেজী প্রার্থনাটির সহিত তাঁহার নিম্নলিখিত গানটির মিল আছে।

"আমার এই যাত্রা হ'ল সুরু এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার!
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরব না গো আর
তোমারে করি নমস্কার!
আমি দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি, বিপদ বাধা নাহি জানি
ওগো কর্ণধার—
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী দাও গো করি পার,
তোমারে করি নমস্কার!
এখন রইল যারা আপন ঘরে, চাবো না পথ তাদের তরে,
ওগো কর্ণধার—
যখন তোমার সময় এলো কাছে, তখন কেবা কার,
তোমারে করি নমস্কার!
আমার কেবা আপন কেবা অপর, কোথায় বাহির
কোথায় বা ঘর,
ওগো কর্ণধার—
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার,
তোমারে করি নমস্কার!
আমি নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরগো হাল,
ওগো কর্ণধার।
আমার মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কিবা তার;
তোমারে করি নমস্কার!
আমি সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে,
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ, আমিই আছি, এই জেনেছি সার,
তোমারে করি নমস্কার!"

কলিকাতার কংগ্রেস।

এবারকার কলিকাতার কংগ্রেসে খুব লোকসমাগম হইয়াছিল। প্রতিনিধির সংখ্যাই চারি হাজার নয়শতের উপর হইয়াছিল। তাহার উপর দর্শকশ্রোতার ভীড়। প্রতিনিধিদের নিকট হইতে ও দর্শকশ্রোতাদের নিকট হইতে প্রায় এক লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন তাঁহার অভিভাষণে সাহসের সহিত অনেক স্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে এই সাতাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ বয়ঃকনিষ্ঠদের অনুকরণীয়। সভানেত্রী মিসেস বেসান্টের বক্তৃতা সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ হইয়াছিল। অন্য কোন কোন বক্তৃতাও ভাল হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা বলিতেছেন, পুরাতন দল পদচ্যুত ও নূতন দল তক্ত পাওয়ায় এবার কংগ্রেস এত সফলতা লাভ করিয়াছে! কারণ লইয়া ঝগড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না,—বিশেষতঃ যখন ফলটা সম্বন্ধেই সন্দেহ রহিয়াছে। আগে আগেও কংগ্রেসওয়ালারা বৎসরে তিন চারি দিন হৈ চৈ করিয়া সুবোধ বালকের মত বৎসরের বাকী কটা দিন বেশ ঠাণ্ডা হইয়া নিদ্রা দিতেন। এবারে অন্ততঃ "আন্দোলন"টা বর্ষব্যাপী হয় কি না, বাঙ্গালাদেশে বর্ষব্যাপী হয় কি না, দেখিয়া তবে কংগ্রেসের সফলতা সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করিলে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে।

মিসেস বেসান্ট তাঁহার অভিভাষণে কেবল নজরবন্দী মোহামেদ আলী ও শৌকৎআলী ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; যেন ভারতবর্ষে মুসলমান ও হিন্দু আর কেহই বিনাবিচারে স্বাধীনতা হারায় নাই। তাহার পর, বোধ হয় চাপ পড়ায়, শেষদিন অধিবেশনের সবকাজের সমাপ্তি ঘোষণা করিবার সময় তিনি বিনাবিচারে-আবদ্ধ অন্যান্য শত শত লোকদের কথা বলিয়াছিলেন।

নিরপরাধ আবদ্ধ ব্যক্তিদের সান্ত্বনা।

আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা নিরপরাধ তাহাদের

প্রকৃত বল, ভরসা ও সান্ত্বনার পথ কারাগারের নির্জ্জন কক্ষেও সর্ব্বদা খোলা রহিয়াছে।

"তুমি সর্ব্বাশ্রয়, একি শুধু শূন্য কথা?
ভয় শুধু তোমা পরে বিশ্বাসহীনতা
হে রাজন্! লোকভয়? কেন লোকভয়
লোকপাল? চিরদিবসের পরিচয়
কোন্ লোক সাথে?
রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র! তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারায় মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়,—স্বাধীন সে বন্দীশালে! মৃত্যুভয়
কি লাগিয়া, হে অমৃত! দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান
এত প্রাণদৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব!
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব?
কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার!
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার!"

লাঞ্ছিত শ্রেণীদিগকে স্মরণ।

আমাদের দেশে অনেক জাতির মানুষকে ছুঁইলে অশুচি হইতে হয়, যদিও মাছি, মশা, ইঁদুর, ছাগল, বিড়াল, ইত্যাদিকে ছুঁইলে কেহ স্নান করে না, কাপড়ও ছাড়ে না! অনেক জাতির রান্না খাওয়া যায় না; আবার কাহারো কাহারো তৈরী লুচি সন্দেশ ভাজী খাওয়া চলে, কিন্তু ভাত ডাল খাওয়া চলে না! তাহাদের সঙ্গে "উচ্চ" জাতির একত্র ভোজন এবং বৈবাহিক আদান প্রদান ত চলেই না। কাহারো কাহারো তোলা ছোঁওয়া জলে স্নানও চলে না, খাওয়া ত চলেই না; কাহারো জলে স্নান চলে, কিন্তু তাহা খাওয়া চলে না! দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও কোন কোন জাতির সরকারী রাস্তা দিয়া চলা দায়; কেননা, তাহাদের কাহারো সান্নিধ্য একশত হাত দূর হইতে, কাহারো পঞ্চাশ হাত হইতে, কাহারো বা দশ হাত হইতে, ব্রাহ্মণদিগকে অপবিত্র করে! কাহারো বা ছায়া মাড়াইলে ব্রাহ্মণ অপবিত্র হন, ব্রাহ্মণ ভোজন করিবার সময় যদি কোন কোন জাতির লোক তাঁহার ভোজ্যদ্রব্য ও ভোজনকার্য্য দর্শন করে, তাহা হইলে আহার্য্যগুলি নষ্ট হয়, এবং তিনিও অশুচি হন। এইরূপ আরো ব্যাপার আছে। এইরূপ কারণে দক্ষিণ-ভারত এবং অন্যত্র কোথাও কোথাও "নিম্ন" শ্রেণীর বালকবালিকারা "উচ্চ" শ্রেণীর বালক-বালিকাদের সহিত এক ইস্কুলে বা এক বেঞ্চে বসিয়া পড়িতে পায় না।

এইসব কুসংস্কার, অবিচার, অত্যাচার এবং মনুষ্যত্বলোপী ব্যবহার লুপ্ত না হইলে দেশের মঙ্গল নাই; তাহা না হইলে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমরা যে জাতীয় আত্মশাসন-অধিকার লাভ করিবার অনুপযুক্ত, আমাদের বিপক্ষেরা তাহার অন্যতম প্রমাণস্বরূপ আমাদের এইসব কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এইসব আছে বলিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে একদল লোক ব্রাহ্মণেতর জাতির বহুসংখ্যক লোককে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে খুব ক্ষ্যাপাইয়া তুলিয়াছে। বাংলাদেশেও নমঃশূদ্রদিগকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই-প্রকারে গৃহবিবাদ জন্মিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্য বাড়িতে দিতেছে না। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আমরা লাভ করিতে পারি বা না পারি, কর্তৃত্ব থাক্ বা যাক্, মানুষকে মানুষ মনে করিতে হইবে, মানুষের সহিত মানুষের মত ব্যবহার করিতে হইবে, আমাদের এই মত। ইহা আমরা বারবার বলিয়াছি। ইহাও বলিয়াছি, আমরা আমাদের জাতভাই কোটি কোটি লোককে যেমন অস্পৃশ্য মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে অমানুষের মত ব্যবহার কত শতাব্দী ধরিয়া করিয়া আসিতেছি, তেমনি আমরা, বুদ্ধিতে হীন বস্তুসম্ভারে দরিদ্র না হইলেও, যে, জগতে ঘৃণিত অস্পৃশ্য জাতি হইয়া আছি, ইহা ন্যায্য প্রতিফল।

যদি রাজনৈতিক কারণেও হয়, তাহা হইলেও এবারকার কংগ্রেস যে সেই-সব জাতিকে স্মরণ করিয়াছেন যাহাদিগকে সমাজ চাপা দিয়া দাবিয়া রাখিয়াছে, যাহারা নানাপ্রকারে উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, অবমানিত, নিগৃহীত, উৎপীড়িত ও মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে,—ইহা সুখের বিষয়। মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত জী এ নটেশন্ এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, যে, এই-সব জাতির উপর সামাজিক প্রথা যে সকল অসামর্থ্য চাপাইয়াছে এবং যেগুলি

নানাবিধ ক্লেশ ও অত্যাচারের কারণ, তৎসমুদয় রহিত করা হউক। এই প্রস্তাবটির প্রতিবাদ কেহ করেন নাই। পাঁচহাজার প্রতিনিধির প্রত্যেকেরই ইহাতে আন্তরিক সম্মতি ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না; কাহারো কাহারো হয়ত ছিল না। কিন্তু কেহ মুখ ফুটিয়া অসম্মতি জানান নাই। সুতরাং ইহা, সর্ব্বসম্মতিক্রমে না হউক, কাহারো বিনা অসম্মতিতে গৃহীত হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাও মন্দের ভাল, যে, ব্যক্তিগত আচরণে যিনি যাহাই করুন, এইরূপ একটি অতি ন্যায্য ও আবশ্যক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে কেহ সাহস করেন নাই, বা বলিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন, কিম্বা রাজনৈতিক কারণে বলাটা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম মনে করেন নাই।

বিষয়টির ইতিহাস ও কুফল বিবেচনা করিলে লঘুচিত্ততা দূরে যায়। ইহা আমাদের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ইতিহাসের একটি অতি শোকাবহ ব্যাপার; ইহার জন্য আমাদের অন্তরে ও বাহিরে শোকচিহ্ন ধারণই শ্রেয় মনে হয়। ইহার প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকে করিতে হইবে। অকপট অনুতাপ তাহার প্রধান উপকরণ।

কংগ্রেস-মণ্ডপে কোন-কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইবার সময় এবং তৎসংপৃক্ত বক্তৃতার সময় খুব উৎসাহ উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল, এবং করতালিধ্বনি ও "ধিক্" "ধিক্" (shame, shame) শব্দ শোনা গিয়াছিল। বক্ষ্যমান প্রস্তাবটি সম্বন্ধে তাহা হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। না হওয়া স্বাভাবিক। খুব আন্তরিক উৎসাহ না থাকিলে মানুষ নির্ব্বাক্ থাকে, বেশী লজ্জা বোধ হইলে বা গভীর দুঃখ হইলেও চুপ করিয়া থাকে। এস্থলে কি কারণ ঘটিয়াছিল জানি না। তবে ইহাও দেখা গিয়াছে, যে, মানুষ অনুতপ্ত হইলে খুব বিলাপও করে। জগতের অনেক অতি-সাধুপুরুষ অনুতপ্ত হইয়া আপনাদিগকে যতদূর পাপী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন বাস্তবিক তাঁহারা তত পাপী নহেন। আমরা যদি কখন উপেক্ষিত শ্রেণীসকলের প্রতি আমাদের ব্যবহারে আন্তরিক অনুতাপ বোধ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের মুখ হইতে বিলাপ শোনা যাইবে।

কংগ্রেসের অন্য নানা প্রস্তাব ছাড়িয়া দিয়া এইটির বিষয় এত করিয়া লিখিবার কারণ আছে। আমরা রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতির প্রতি উদাসীন নহি। প্রবাসী মাসিক কাগজ হইলেও আমরা সমসাময়িক অনেক রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদের সামাজিক ও অন্য অনেক দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যে আমাদের আত্মকর্তৃত্ব লাভ করা উচিত, আত্মকর্তৃত্ব লাভ না করিলে যে সামাজিক ব্যাধিরও প্রতিকার হইতে পারে না, তাহা আমরা অনেকবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমরা ইহা বিশ্বাস করি এবং না বলিয়া থাকিতে পারি না, যে, ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার চেয়ে গুরুতর; অন্ততঃ দুটিই যে অতিশয় কঠিন, সে বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যদি মিল থাকিত, যদি কোন একটা ধর্ম্মানুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া উভয় সম্প্রদায়ে ঝগড়া বাধিবার বা বাধাইবার সম্ভাবনা না থাকিত, যদি হিন্দু সমাজের নানাশ্রেণীর মধ্যে মিল থাকিত, যদি কেহ আপনাকে অবমানিত, অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত বা নিগৃহীত মনে না করিত, যদি পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ জন্মিবার ও জন্মাইবার কারণ না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের শক্তি কত বাড়িত, রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভ, আত্মকর্তৃকত্ব লাভ কত সহজ হইত, তাহা কোন বুদ্ধিমান লোককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

এই প্রস্তাবটি আরও কয়েকটি কারণে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ও আদরণীয়। ইহাতে আমাদের নিজের দোষ স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা পরের সমালোচনা নহে। কংগ্রেসে সম্মিলিত প্রতিনিধিগণ যদি কেবল ইংরেজের সমালোচনা না করিয়া সত্যসত্যই আপনাদেরও দোষ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা খুব সুলক্ষণ বলিতে হইবে। এই প্রস্তাবে আমাদের নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অন্যের নহে। এই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করাও সম্পূর্ণরূপে আমাদের সাধ্যায়ত্ত। ইহাতে অন্যের কাছে কোন দাবী বা ভিক্ষা নাই। সত্য বটে, উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত জাতিদের অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতি করিতে হইলে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করা আবশ্যক, এবং তাহাদের আয় বাড়ান দরকার; এই কাজটি যদিও আমরা অনেক দূর

পর্য্যন্ত করিতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে হইলে রাষ্ট্রীয়শক্তির সাহায্য দরকার। কিন্তু এই প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল এই, যে, এইসব জাতির উপর এমন কোন কৃত্রিম অসামর্থ্য সামাজিক বলের দ্বারা চাপাইয়া রাখা হইবে না, যাহা তাঁহাদের পক্ষে ক্লেশকর অপমানজনক ও তাহাদের প্রতি অত্যাচারের কারণ। এই কাজটি করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্যের আবশ্যক নাই। আমরা কাহার জলে স্নান করিব, কাহার জল খাইব, কাহার রাঁধা ভাত খাইব, কাহার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া খাইব, গবর্ণমেণ্টের কোন আইন দ্বারা তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কাহাকে ছুঁইলে অশুচি হইতে হয়, কাহার দৃষ্টিতে আহার্য্য দ্রব্য কলুষিত হয়, কে কত দূর হইতে ব্রাহ্মণকে অশুদ্ধ করিতে পারে, ইহা ইংরেজের কোন স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা নাই। এসব আমাদেরই সৃষ্টি, এসব বিনষ্ট করিবার ক্ষমতাও সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই আছে।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ।

এ বৎসর বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ভারতবর্ষীয় সমাজসংস্কার-মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে সুযুক্তি দ্বারা সমর্থিত সত্য কথা ছিল। পড়িলেই বুঝা যায়, উহা স্বদেশ-ও-স্বজাতিপ্রীতি-প্রণোদিত। কিন্তু সমাজসংস্কার-চেষ্টার মানেই এই, যে, সমাজে ব্যাধি ঢুকিয়াছে, সমাজ দুর্ব্বল হইয়াছে; তাহার চিকিৎসা চাই, ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। নির্বোধ শিশু চিকিৎসককে শত্রু মনে করে; সুবোধ রোগীরাও ঔষধকে সন্দেশের মত মিষ্ট ভাবে না। সুতরাং রায় মহাশয়ের অভিভাষণে যে ব্যবস্থা ও ঔষধ আছে, তাহা যে সামাজিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের ভাল লাগিবে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার মধ্যে আবার ব্যবসাদার লোক আছে, যাহারা কুসংস্কারের সমর্থন করিয়া, জাত্যহঙ্কার ও জাত্যভিমানকে প্রশ্রয় দিয়া ও স্ফীত করিয়া, দুপয়সা রোজগার করে। কাহারও কাহারও বা ব্যবসা লোককে গালি দেওয়া; কারণ পরনিন্দা বড় মুখরোচক, তাহাতে একশ্রেণীর লোকের কাছে কাগজের কাট্‌তি বাড়ে।

এইসব নানা কারণে রায়মহাশয়ের অভিভাষণের প্রতিকূল সমালোচনা হইতেছে। অমৃতবাজার পত্রিকা ইহার বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন,—সুখের বিষয় ভদ্রভাবে লিখিয়াছেন অমৃতবাজার ডাক্তার রায়ের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব, তাঁহার অনাড়ম্বর দেশসেবা, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবন, তাঁহার নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম, প্রভৃতির প্রভূত প্রশংসা পত্রিকা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার উপর মুরুব্বিয়ানাও করিয়াছেন; কতকটা এরূপ যেন ডাক্তার রায় পাঠশালার ছাত্র এবং পত্রিকা সম্পাদক গুরুমহাশয়। অমৃতবাজার বলিতেছেন:—

> But though a great scientist, Dr. P. C. Ray is not in any sense, a specialist in social philosophy or social science. In social matters, he is only a great enthusiast, an honest reformer of the Brahmo Samaj school. And it is, therefore, not at all matter for surprise that his presidential address failing to take a truly scientific view of the problem of social reform in India, but simply emphasising the ethical need for it, on grounds of abstract justice and humanity, has failed either to convince or to please.

ইহা সত্য, যে, ডাক্তার রায় যেমন রসায়ন-বিজ্ঞানে আবিষ্কার করিয়াছেন এবং রাসায়নিক বহি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সমাজবিজ্ঞানে সেরূপ কিছু করেন নাই সুতরাং তিনি সে অর্থে সমাজবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ নহেন। কিন্তু তিনি যে সমাজতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন নাই ঐ বিদ্যা জানেন না, ইহা ধরিয়া লইবার কোন কারণ নাই তবে, এটা সত্য বটে যে তিনি বিদ্যা জাহির করেন নাই কিন্তু সমাজসংস্কার-সমিতির অভিভাষণে সমাজবিজ্ঞানে বিদ্যা না ফলাইলে যে চলে না, তাহা কে বলিল? আসল কথা এই, যে, ডাঃ রায় যে-যে বিষয়ে সংস্কার চাহিয়াছেন তাহা বিজ্ঞানসম্মত কি না তাহারই আলোচনা করা দরকার। অমৃতবাজার ত একটি একটি করিয়া দেখাইতে পারিতেন যে ডাক্তার রায়ের সমর্থিত সংস্কারগুলি অবৈজ্ঞানিক; কিন্তু সম্পাদক তাহা করেন নাই। নৈতিক জ্ঞানে, বিবেকে, যাহা আবশ্যক বলে, সমাজ-বিজ্ঞান তাহা অনাবশ্যক বলিবে, আমরা এরূপ মনে করি না। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিতে ও সমাজ-বিজ্ঞানে যদি বিরোধ ঘটেই, তাহা হইলে আমরা সমাজ-বিজ্ঞানকেই ভ্রান্ত মনে করিব। আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের পূর্ব্বতন ধর্ম্মোপদেষ্টারা সমাজবিজ্ঞান নামক একটা বিজ্ঞান পড়ে

নাই, তখন ওরূপ একটি বিদ্যা ছিল না; তাঁহাদের নৈতিক জ্ঞানে যাহা ভাল মনে হইয়াছিল, তাঁহারা তাহাই বলিয়াছিলেন ও করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা সমাজতত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতিতে পণ্ডিত না হইলেও সমাজের মঙ্গল অন্বেষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

কিছুদিন হইতে দেখিতেছি অমৃতবাজার মিসেস্ বেসাণ্টের খুব ভক্ত হইয়াছেন; তাঁহার অবিমিশ্র প্রশংসা ঐ কাগজে খুব বাহির হয়। মিসেস্ বেসাণ্টের লেখা "Wake up India" ("ভারতবর্ষ জাগ") নামক একটি বহি আছে। তাহাতে দেখিতেছি তিনি সমুদ্রযাত্রার সমর্থন করিয়াছেন, বাল্যবিবাহের দোষ দেখাইয়াছেন ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর বিবাহকেই আর্য্য আদর্শ বিবাহ বলিয়াছেন, অবজ্ঞাত "অস্পৃশ্য" ও "অন্ত্যজ" জাতিদের উন্নতির জন্য এবং তাহাদিগকে সামাজিক অবজ্ঞা ও নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন, নারীদের সকলের জন্য শিক্ষা এবং অনেকের জন্য ইংরেজী শিক্ষা ও উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চাহিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান জাতিভেদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই-সব কারণে ত মিসেস্ বেসাণ্টের বিরুদ্ধে অমৃতবাজারকে কখন কিছু লিখিতে দেখি না? মিসেস্ বেসাণ্ট যে-সব সামাজিক প্রথার দোষ উদ্‌ঘাটন ও সংস্কার সমর্থন করা সত্ত্বেও কেবলই পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট পাদ্য অর্ঘ্য পাইতেছেন, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই-সব সংস্কার চাওয়াতেই কেন প্রতিকূল সমালোচনার পাত্র হইলেন? সত্য বটে, তিনি বক্তা নহেন; তাঁহার ভাষাটাও মোলায়েম নহে; তিনি সত্য কথা বেশ স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু জিনিষটা ত একই? ডাক্তার রায়ের অভিভাষণের সমালোচনাচ্ছলে পত্রিকা বলিতেছেন

There are many things in it that will arouse needless antagonism from the spokesmen of the prevailing orthodoxy, and give a good handle to the enemies of our political progress to create wrong and mischievous notions abroad, regarding what they are pleased to call our fitness to govern ourselves. Already the "Statesman" newspaper has taken up Dr. Ray's utterances on the Hindu system of caste, to have a fling at our Home Rule propaganda. Dr. Ray will not, we are confident, accept the interpretation that has been sought to be put upon his words by the Chowringhee journal. But why give men of this class an opportunity to even make this attempt?

আমাদের শত্রুরা আমাদের দোষ কীর্ত্তনের সুবিধা পাইবে বলিয়া আমাদিগকে সত্য গোপন করিতে হইবে? ইহা অনুসরণীয় নীতি নহে। আমরা হোমরূল বা স্বরাজের সমর্থন খুবই করিয়াছি, কিন্তু আমাদের একটা দোষও ঢাকিয়া রাখি নাই। সে-সব দোষ সত্ত্বেও, সে-সব দোষ সংশোধন করিবার সামর্থ্য লাভের জন্য, আমাদের হোমরূল চাই, উহা পাইতে আমরা অধিকারী, ইহাই বলিয়াছি। ডাক্তার রায়ের যেরূপ কথায় ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সুবিধা হইয়াছে বলিয়া পত্রিকা লিখিতেছেন, "অস্পৃশ্য" জাতিদের সম্বন্ধে মিসেস্ বেসাণ্টের একটি বক্তৃতা হইতে সেইরূপ কথা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"Can you for shame's sake, ask for that larger liberty for yourselves, unless you break the chains on the limbs of these out-casts that you have bound around them? It is useless to cry out to God, to cry out to England, to let you be free citizens in a free land, if the curse of this slavery is to remain upon the land and freedom is to be only the freedom of the educated people. You are educated, yes; but does that mean the sole enjoyment for yourselves of literature, of art, of all that makes life fair, and that to these are to be added liberty, and public life, and the pride of the citizen in a free land? Power means responsibility. Power and responsibility go hand in hand; and how dare we ask for Indian freedom if Indian slavery is the basis on which the pyramid of freedom is to be reared? It cannot be. You must rescue your own people, before you can stand up with your faces to the sun and declare that you are worthy of freedom. These slaves condemn you."—*Wake Up India*, lecture on "Our Duty to the Depressed Classes," pp. 105-6.

ডাক্তার রায় ইহা অপেক্ষা শক্ত কথা বলেন নাই। এইরূপ সত্য কথাই বলিয়াছেন। অমৃতবাজার-পত্রিকা "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" গল্পটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রায়ই বলিয়া থাকেন। ডাক্তার রায় মাকড় মারিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দোষ ধরা হইয়াছে; কিন্তু মিসেস্ বেসাণ্ট সেই মাকড় মারিলেও পত্রিকার নিকট হইতে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাই পাইয়া আসিতেছেন।

ডাক্তার রায় বলিয়াছেন, প্রাচ্য লোকেরাও যে রাষ্ট্রীয়

বিষয়ে উন্নতি করিতে পারে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা জাপানের দৃষ্টান্ত বার বার উল্লেখ করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে "উদীয়মান সূর্য্যের দেশ" (জাপান) নিজের উন্নতির জন্য কি করিয়াছে।

"We are never tired of citing the example of Japan when we want to prove that political progress can be achieved even in an Asiatic country. But it suits our convenience to forget all that the Land of the Rising Sun has done for her social regeneration. There, up till the seventies of the last century, the *Samurai* clans had monopolised to themselves all the privileges now arrogated by our Brahminical castes. The *Eta* and the *Hinin* (the *untouchables* of Japan) were regarded so impure and unclean that they were not even allowed to dwell in the ordinary villages, but had locations assigned to them,—a state of things now met with in some parts of the Southern Presidency. But on the memorable day of 12th October in 1871, the *Samurai*, in a spirit of chivalry no less than of patriotism, voluntarily parted with their vested interests and abolished the artificial and invidious caste distinctions and thus laid the foundations of a compact and homogeneous nation.

"What was possible in Japan in 1871 is found to be impossible in India even towards the close of the second decade of the 20th century."

ডাক্তার রায় জাপানের যে দৃষ্টান্তটি দিয়াছেন, তাহা মিসেস বেসাণ্টের পুস্তকের ২৯২ ও ২৯৩ পৃষ্ঠাতেও আছে, দেখিতেছি। প্রভেদ এই যে মিসেস্ বেসাণ্টের ভাষা বাগ্মীর ভাষা বলিয়া অধিক উদ্দীপনাপূর্ণ। তিনি বলিতেছেন—

"You have to choose between isolation and subjection inside your caste, or, on the other hand, perfect political and social equality outside the barriers of caste. Inevitably it is coming, whether you will or not."

"But you have a choice between two ways of change...... There are two ways in which privilege disappears: one when the people, who no longer respect the privilege-holders, are angry with these privileges which outrage their sense of justice; and if it goes too far, you get a great uprising like the French Revolution, and the privileged aristocracy perish by violence and are lost in the midst of the nation. Or you may have the wonderful action of the privileged class in Japan, as privileged as any of the Brahmana caste here, who, called on for their country's sake, stripped off every privilege they held and threw them at the feet of the Motherland, in order that she might become free and great. Their privileges were even greater than the Brahmana privileges here. They might strike down a man in the street who they thought insulted them, striking him down with the sword which they alone might wear. None could say them nay, none could arrest or save; and yet that warrior caste, proud with the pride of warriors, flung all aside and stepped down amongst the people content to justify their warrior spirit in the war against Russia, where those very Japanese who had thrown away their privileges showed their Kshattriya spirit, lived on the battle-fields in defence of their country."—Mrs. Annie Besant's "Wake up India,' pp. 292-3.

যে মাকড় মিসেস্ বেসাণ্ট মারিয়াছেন, ডাক্তার রায়ও তাহাই মারিয়াছেন। কিন্তু বাগবাজারের স্বার্থ উভয়ের জন্য এক ব্যবস্থা করেন নাই।

যাহা হউক, ইহা সুখের বিষয় যে অমৃতবাজার-পত্রিকায় ডাক্তার রায়ের উপর ব্যক্তিগত কোন আক্রমণ নাই। প্রতিকূল সমালোচনা যাহা করা হইয়াছে, তাহাও ভদ্র ভাবেই করা হইয়াছে। কিন্তু আর-একখানা কাগজ হইতে ——কোন্ কাগজ জানিনা, দেখি নাই,—"সঞ্জীবনী" যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ভদ্র সমালোচনা নহে। তাহা গালাগালি মাত্র, এবং এমন গালাগালি, যাহাতে সত্যের লেশ মাত্রও নাই। "সঞ্জীবনী" নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"মুখে অনবরত কবলাও যে আমরা দেশহিতৈষী * * কিন্তু দেশে কতটুকু তোমরা ভালবাস? * * কখনও পল্লীগ্রামে যাওন পল্লীসমাজের সুখদুঃখের খোঁজ খবর রাখ না। * * গ্রামের শিল্পী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, স্বজন পরিজন কেহই তোমাদের ধনৈশ্বর্য্যে অর্থ প্রাপ্তিতে কোনরূপ লাভবান হইতে পারে না। * * সহরে লক্ষ্মীছাড়া বাবুয়ানীতে সে টাকা ব্যয় করিয়া থাক।"

"তোমাদের চেহারা দেখিলে সাজ সজ্জা অশন ভূষণ রুচি প্রবৃত্তি চলন বলন দেখিলে এবং শুনিলে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে তোমরা কোন্ জাতীয় মনুষ্য? * * চাকরী ও ব্যবসায়ের খাতিরে হ্যাটকোট পরিতে পার, সাহেব সাজিতে পার; সে বৈদেশিক পরিচ্ছদ ব্যবহারের জন্য তোমাদের ক্ষমা করিতে পারি; কিন্তু তোমরা যে ঘরে বাহিরে হ্যাটকোটধারী। তোমাদের বাটীতে যাইলে মনে হয় না যে একজন বাঙ্গালীর বাটীতে আসিলাম। সেই বাবুর্চ্চি খানসামার ছুটাছুটি, * * কাঁটা চামচের ঠনঠনানি * * শুনিয়া মনে হয় যে একজন গোরার বাটীতে * * আসিলাম।"

সাদাকে কাল বলিলে তাহা যেমন সত্য হয়, ডাক্তার

রায় সম্বন্ধে এই মিথ্যাবাদী নিন্দুকের ঐ বর্ণনাও ঠিক্ তেমনি। এই বর্ণনার একটি অক্ষরও তাঁহার সম্বন্ধে সত্য নহে। শত শত ছাত্র যাঁহার সাহায্যে বিদ্যালাভ করিয়াছে, যিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও মোটা ভাত ও মোটা ছেঁড়া কাপড়ে আনন্দিত থাকিয়া সর্ব্বস্ব মানুষের কল্যাণার্থ ব্যয় করেন, যিনি ছুটির সময় ম্যালেরিয়াপূর্ণ গ্রামে গিয়া চাষাভূসাদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে মিশেন এবং তাহা করিতে গিয়া জ্বরে ভোগেন, সেই চিরকুমার ব্রহ্মচারী জ্ঞানতপস্বী সম্বন্ধে যে পূর্ব্বোদ্ধৃত সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা লিখিয়াছে, ভগবান্ তাহাকে সুমতি প্রদান করুন।

নারীর সামর্থ্য ও অধিকার।

সমাজসংস্কারকেরা বিশ্বাস করেন, যে, নারী গৃহকার্য্য করিয়াও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনেক সার্ব্বজনিক কাজ করিতে পারেন। এই ধারণা তাঁহাদের অনেক দিন হইতেই আছে। নারী এরূপ কোন কাজ করিতে চাহিলে তাঁহারা বাধা দেন নাই,—যদিও তাঁহারা নারীকে ঘরের বাহিরে কাজ করিয়া যথেষ্ট সুযোগ এখনও দিতে পারেন নাই। মিসেস্ বেসাণ্ট এবারকার কংগ্রেসের সভানেত্রী হওয়ায় ও তাঁহার কাজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করায় সংস্কারকদের ধারণা সমর্থিত হইয়াছে। মিসেস বেসাণ্টের ভক্তদের মধ্যে বাংলাদেশে সমাজসংস্কারবিরোধী লোকই বেশী। তাঁহারা তাঁহার সার্ব্বজনিক কাজের দৃষ্টান্ত বঙ্গনারীগণের অনুকরণযোগ্য কেন মনে করেন না, এবং তাঁহার সমাজসংস্কারসমর্থক বক্তৃতাগুলির সমর্থনই বা কেন করেন না, তাহার কৈফিয়ৎ তাঁহাদের দেওয়া উচিত। অবশ্য কোন মানুষেরই সব মত সমর্থনযোগ্য ও অনুকরণীয় না হইতে পারে। কিন্তু তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে তাহার নিছক প্রশংসা করা চলে না, এবং তাহার যে-সব মতের কোনই সমালোচনা করি না, সেই-সব মত আর কেহ প্রকাশ করিলে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতেও পারি না। কিন্তু মিসেস্ বেসাণ্টের অনেক ভক্ত এইরূপ অসঙ্গত আচরণ করিয়া থাকেন।

সাহিত্যিকের দেহান্ত।

"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও।"

এবং

"কতকাল পরে বল, ভারত রে,
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।"

ইত্যাদি প্রাণস্পর্শী জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী মীরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের বহু বৎসর আগ্রা-শহরে যাপিত হয়। সেখানে তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেন। আগ্রায় অবস্থানকালেই তিনি তাজমহলের "ধবল সৌধছবি"র ছায়াতলে বসিয়া "যমুনালহরী" রচনা করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে ভারতের অতীত ইতিহাসের কত সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা দেখিলে অকবিরও হৃদয় উদ্বেলিত হয়! আগ্রায় থাকিয়া প্রবাসী কবি যে মর্ম্মস্পর্শী বহু সঙ্গীত রচনা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের জীবনচরিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" গ্রন্থে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন।

"প্রেম", "আমি", "বনফুল", "নির্ব্বাণ", প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, পঞ্চাশবৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। "প্রেম" গ্রন্থ বহুসমালোচক কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে, ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদ লংম্যান্স কোম্পানী কর্ত্তৃক বিলাতে প্রকাশিত করাইবার জন্য হেমেন্দ্রবাবু কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ আমাদের যৌবনের বন্ধু ছিলেন। পাঠদশায় আমরা বহুবৎসর এক বাসায় বাস করিয়াছি। তাহার পরও বহুবৎসর ধরিয়া তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সহিত আমাদের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিতেছে। অতীত জীবনের অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি তাঁহার সহিত জড়িত। তিনি বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামের বিখ্যাত

জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ও অন্যত্র সুখ্যাতির সহিত উচ্চ কাজ করিয়াছিলেন।

সাধক ও সেবক ইন্দুভূষণ।

প্রেমিক সাধক ও সেবক ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় গত পৌষমাসে ৬৫ বৎসর বয়সে গয়ানগরে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি সর্ব্বসাধারণের পরিচিত বিখ্যাত লোক ছিলেন না। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে চিনিতেন।

তিনি সংগীত ও কবিতা রচয়িতা কবি, ভক্ত সাধক, সুগায়ক, এবং দরিদ্র ও আর্ত্তের প্রেমিক নির্ভীক অক্লান্ত সেবক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "অঞ্জলী" সুন্দর কবিতা-পুস্তক। তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে অনাসক্ত থাকায় ইহা দ্বিতীয় বার ছাপাইবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহার "রসলীলা" ও "আনন্দলীলা"য় তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট গান আছে। "প্রকৃতির বাণী" নামক আর একখানি বহি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন; উহা এখনও ছাপা হয় নাই।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় "দাসাশ্রম" নামক একটি সেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরাশ্রয়, চিররুগ্ন, দুশ্চিকিৎস্যরোগগ্রস্ত লোকদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া ইহাতে রাখা হইত, এবং তাহাদের সেবাশুশ্রূষা করা হইত। স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় সস্ত্রীক ইহার সেবকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, এবং আন্তরিক অনুরাগের প্রেরণায় নির্ভয়ে প্রেমের সহিত আর্ত্তদের সেবা করিতেন। বাঁকীপুরে ও এলাহাবাদে তিনি অসঙ্কোচে কত কত প্লেগরোগীর সেবা করিয়াছেন, কখনও ভীত হন নাই। অন্য-রকমের উৎকট সংক্রামক রোগে পীড়িত লোকদেরও তিনি সেবা করিতেন। দুর্ভিক্ষে অনশনক্লিষ্ট ও পীড়িত লোকদের সাহায্য ও সেবাও করিতেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জানিতেন, এবং অবৈতনিক চিকিৎসা করিতেন।

তিনি বিশ্বাসী ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখে ধর্ম্মসংগীত ও ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া বিস্তর লোক উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার প্লেগে মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার শেষ চিকিৎসক এইরূপ সন্দেহ করেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনার কি বড় কষ্ট হইতেছে?" তিনি বলেন, "হাঁ, যেন তপ্ত খোলায় ভাজিতেছে।" "আপনি কি নাম ভুলিয়া যাইতেছেন?" "না, এখনও ভুলি নাই; পরে বিধাতার কি ইচ্ছা হইবে জানি না।"

স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত আমরা বহুবৎসর একত্র এক পরিবারের মত বাস করিয়াছি। তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট আমরা ও আমাদের সন্তানবর্গ স্নেহের ও স্নেহপ্রণোদিত উপকারের ঋণে আবদ্ধ। এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে সংযত ভাষা প্রয়োগ করিতে হইতেছে।

তাঁহার সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতেন, যে, তিনি কোন অবস্থাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই, যে, তিনি আহ্বান শুনিয়াছিলেন ও সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। যাঁহার অনুসন্ধানে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে স্থির থাকিতে দেন নাই। এখন তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতর ভাবে পাইবেন; প্রেমিকদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান হইবে।

নজরবন্দী ও নির্ব্বাসিতদের সংবাদ।

২৬শে পৌষ বৃহস্পতিবারের "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন :—

> গত শনিবার হইতে বাঙ্গলার ষড়যন্ত্র অনুসন্ধান কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই কর্ম্ম শেষ করিতে ৩ মাস সময় লাগিবে। কমিটি স্থাপন করাতে অনেকে অনেক কথা বলিতেছিলেন। আমরা অবগত হইলাম, কমিটির কার্য্যারম্ভের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রায় ৬৫ জন আবদ্ধকে তাহাদের বাড়ীতে অভিভাবকের জিম্মায় রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে প্রায় ২৫০ আবদ্ধকে তাহাদের অভিভাবকদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। যাহারা নরহত্যা, ডাকাইতি করিয়াছে বা যাহাদিগকে দলের নায়ক বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে, কেবল তাহাদিগকেই আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে।

সঞ্জীবনী ঠিক্ খবর পান নাই মনে করিবার কোন কারণ নাই। সংবাদ ঠিক্ হইলে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে এইপ্রকার মুক্তিদানের কার্য্য প্রশংসনীয় হইয়াছে বলিতে হইবে। একবারে ছাড়িয়া দিলে চলিত না কি? কমিটির কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই প্রায় ৬৫ জনকে কার্য্যত ছাড়িয়া দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে তাহাদের বিরুদ্ধে সন্দেহই পর্য্যন্ত করিবার এমন কিছু কারণ নাই, যাহা কমিটির বিচারে যথেষ্ট মনে হইতে পারে। আরও যে ২৫০ জনকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন, সম্ভবত তাহারাও ঐরূপ নির্দোষ। এই ৩১৫ জনের বিরুদ্ধে কাগজপত্র যাহাতে

কমিটির কাছে না যায়, হইতে পারে যে সেইজন্যই গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন বা দিবেন। তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে গবর্ণমেণ্ট ভালই করিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে যে প্রথমোক্ত ৬৫ জনের বিরুদ্ধে কাগজপত্র কমিটির নিকট যায় নাই। শেষের ২৫০ জনের গিয়াছিল কি? যাহাই হউক, মোট কথা এই, যে, ৩১৫ জনের অর্থাৎ আবদ্ধদের প্রায় এক তৃতীয়াংশের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সেদিন পর্য্যন্তও বঙ্গের গবর্ণর এরূপ বক্তৃতা করিতেছিলেন যাহাতে মনে হইতে পারে যে আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিই খুন, ডাকাতী, ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন-প্রকারে লিপ্ত ছিল, এবং সকলেরই বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী।

এবারকার ভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক নূতন চিত্রকরের ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। খড়ির ও পাথরের মূর্ত্তিও কিছু প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমরা নানা কারণে এবার একবার মাত্র অল্প সময়ের জন্য প্রদর্শনী দেখিতে যাইতে পারিয়াছিলাম। এইজন্য বিশেষ বৃত্তান্ত দিতে পারিলাম না। প্রদর্শনী দেখিলে বেশ বুঝা যায়, শিল্পীগণ প্রাণে কিছু পাইয়াছেন, কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহারা অনুকারী মাত্র নহেন।

মস্‌লেম লীগ।

এবারকার মস্‌লেম লীগের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মোহাম্মেদ আলি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি না দেওয়ায় তাঁহার আসন শূন্য ছিল। তাঁহার বৃদ্ধা জননী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় সকলের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। সভাপতির পরিবর্ত্তে মামুদাবাদের রাজা অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহা খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার দুই একটি মাত্র কথার মর্ম্ম দিতেছি। তিনি বলেন মস্‌লেম লীগ কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া যে শাসন-সংস্কার-বিধি প্রণয়ন করেন, তাহা লীগের খুব গৌরবের জিনিষ। উহা ১৯১৫ সালে প্রণীত হয়। তিনি লীগের পক্ষ হইতে এ বৎসরও উহা সমর্থন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যে, প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইয়া হিন্দু মুসলমান এক হইবেন ও ভারতবর্ষকে উভয়ের সাধারণ মাতৃভূমি রূপে দর্শন করিবেন, ইহা কি কল্পনা মাত্র? আবার ভীষণ হাঙ্গামায় যে কুফল ফলিয়াছিল, হিন্দু ও মুসলমান নেতাগণ তাঁহাদের সম্মিলিত শুভ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাহা প্রায় দূর করিতে পারিয়াছেন। ঐ হাঙ্গামা দেশহিতৈষীদের ভয়ের এবং শত্রুদের উল্লাসের কারণ হইয়াছিল। ইহাতে আমাদের যেন চোখ ফুটে, আমরা যেন বুঝিতে পারি যে, যাহারা আমাদের উন্নতির বিরোধী, তাহারা ঘুমাইয়া নাই, তাহাদের দ্বারা আমাদের বিরোধিতা বরাবর চলিতেছে। কল্পনানেত্রে হিন্দুমুসলমান দেশহিতৈষীগণ ভবিষ্যৎ ভারতের যে গৌরবময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা হইবে? মহরম, দশহরা, বকরীদ, আদি পর্ব্ব উপলক্ষ্যে যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ে বিরোধ না ঘটে, তাহার উপায় করিতে হইবে। তাহা না পারিলে আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্বের দাবী কোথা হইতে জোর পাইবে? এইরূপ অনেক কথা তিনি বলেন।

বসু বিজ্ঞান-মন্দির।

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রথম বক্তৃতায় বিজ্ঞানাচার্য্য বসু মহাশয় ফরিদপুরের একটি গ্রামে একটি খেজুরগাছ কেন দিবারাত্রির মধ্যে কোন সময়ে মাটীতে মাথা ঠেকাইত এবং অন্য সময়ে তাহা অপেক্ষা খাড়া হইয়া দাঁড়াইত, তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। ভবিষ্যতে এই মন্দিরে আরও অনেক নূতন নূতন বিষয়ে বক্তৃতা হইবে। বিজ্ঞান ছাড়া বিদ্যার অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও বক্তৃতা হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বক্তৃতা করিবেন। এখানে কয়েকজন যুবক বসু মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে গবেষণা কার্য্য করিতেছেন ও শিখিতেছেন। ইহা দ্বারা ভারতের ও জগতের কল্যাণ হইবে।

সুখের বিষয় কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ইহার প্রয়োজন ও উপকারিতা বুঝিয়া ইহাকে সকল-রকম ট্যাক্স হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

চিকিৎসকদের সম্মিলনী ও মন্ত্রণাসভা।

ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদের সম্মিলনী ও মন্ত্রণাসভার এই বৎসর কলিকাতায় প্রথম অধিবেশন হয়। ডাক্তার

নীলরতন সরকার মহাশয় ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণের এক স্থানে তিনি চিকিৎসকদের ক্ষমতা ও তাঁহাদের ব্যবসায়ের দায়িত্ব ও মহত্বের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে যিনি ভগবানের নিকট হইতে যত বেশী পান, তাঁহাকে তত বেশী দিতে হইবে। এই কারণে মানুষ তাঁহাদের নিকট হইতে বহুসেবা ও জ্ঞানালোচনার প্রত্যাশা করেন।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ডাক্তার রাঘবেন্দ্র রাও মহাশয় সভাপতি মনোনীত হন। তিনি বলেন, যে, মহৎ ত্যাগের জন্য ডাক্তারদিগকে দলবদ্ধ হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে এমন ভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের সহায় হইতে ইচ্ছুক হন। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেও চিকিৎসকদিগকে জনসাধারণের চক্ষে আপনাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাঁহারা যদি ব্রতী হইয়া মহৎ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ভগবানের সেবক বলিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ করিতে পারিবেন।

নানা সম্মিলনী ও মন্ত্রণাসভা।

এবৎসর কলিকাতায় বহু শুভ উদ্দেশ্যে নানাবিধ সম্মিলনী ও মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশেরই আমরা উল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে পারিলাম না। বাকী কয়েকটির প্রায় উল্লেখমাত্রই হইয়াছে। জাতীয় চিন্তা, উন্নতির চেষ্টা, ও হিতসাধনসংকল্প যে সকল দিকেই ধাবিত হইতেছে, ইহা দেখিলে প্রাণে উৎসাহ আসে।

সমগ্র ভারতের হিতসাধনমণ্ডলীসমূহের সম্মিলনী ও মন্ত্রণা-সভা এইবার নূতন গঠিত হইয়াছে। প্রথম অধিবেশন কলিকাতায় হয়, এবং শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্ম্মচাঁদ গান্ধী মহাশয় তাহার সভাপতি হন। তদ্ভিন্ন ভারতীয় অর্থকর শিল্পের উন্নতিসমিতি, একেশ্বরবাদীগণের সম্মিলন, ভারতীয় মাদকনিবারিণী সভা, মুসলমান শিক্ষাসমিতি, কৃষি ও কৃষকদের উন্নতি বিধায়িনী মন্ত্রণাসভা, কোঅপারেটিভ কন্‌ফারেন্স, গোজাতির উন্নতির জন্য সভা, প্রভৃতি নানা সভার অধিবেশন হয়।

মন্ত্রী ব্যালফুরের উক্তি।

গত ১লা নভেম্বর অন্যতম ব্রিটিশ মন্ত্রী পার্লেমেণ্টে একটি বক্তৃতায় বলেন: "It was impossible for one country to dictate to another under what form of government that country should live." অর্থাৎ, "একদেশের পক্ষে অন্য কোন দেশকে জোর করিয়া ইহা বলা অসম্ভব যে তোমাকে এইরূপ শাসনপ্রণালীর অধীন থাকিতে হইবে।" সত্য কথা। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও অতীতকালে নিজের অধিকৃত সকল দেশে এই নীতি অনুসারে চলেন নাই; ভবিষ্যতে চলিবেন কি না, তাহা এখনও দেখিতে বাকী আছে।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর উক্তি।

গত ৫ই জানুয়ারী ২১ পৌষ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী একটি বক্তৃতায় বুঝাইয়াছেন যে, ইংরেজরা কেন যুদ্ধ করিতেছেন ও কিরূপ সর্ত্তে সন্ধি করিতে পারেন। এই বক্তৃতায় তিনি একটি কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যে-সব দেশে যুদ্ধ হওয়ায় এখন সমস্ত দেশ বা তাহার কোন অংশ অন্যজাতির অধিকৃত হইয়াছে, যাহাদের পুরাতন প্রভুদের জায়গায় নূতন প্রভু হইয়াছে, যাহারা আগে যে জাতির অধীন ছিল এখনও তাহাদেরই অধীন আছে, ইত্যাদি নানা প্রকারের পরাধীন দেশের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যে, প্রত্যেক দেশের লোকই স্থির করিবে যে তাহারা কিরূপ শাসনপ্রণালী চায়। সে অধিকার তাহাদেরই আছে, বিদেশীদের নাই। তিনি ভারতবর্ষের নাম করেন নাই। কিন্তু self-determination of nations কথাগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন। মানুষ যতটা নিজে আপনাদের ভাগ্যবিধাতা হইতে পারে, ভারতবর্ষীয় লোকদিগকেও তাহা হইতে দেওয়া চাই। আমাদের ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

সিটি কলেজের নূতন গৃহ।

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে একটি সুন্দর নূতন অট্টালিকায় সিটি কলেজ স্থানান্তরিত হইয়াছে। পুরাতন অট্টালিকা হইতে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী সরাইয়া লইয়া গেলে উহা সম্পূর্ণরূপে স্কুলের জন্য ব্যবহৃত হইবে। তখন স্কুলটির অনেক উন্নতি হইতে পারিবে। সিটি স্কুল ও কলেজের কখনও কোন

স্বত্বাধিকারী ছিল না, এখনও নাই। ইহার আয়ের সমস্তই ইহার জন্য ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে! অনেক ঋণ করিয়া পুরাতন অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহা শোধ হইয়াছে। নূতন অট্টালিকাটির জন্যও বিস্তর ঋণ হইল। ভগবানের কৃপায় তাহাও শোধ হইবে। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় ও অন্যান্য কর্ম্মীগণ তাঁহাদের বিশ্বাস, সাহস ও একাগ্রতার জন্য সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। আমরা সিটি কলেজের ছাত্র বলিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন।

একটি আটপৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রিত কাগজ আমাদের হাতে আসিয়াছে। গতবর্ষে বাঁকীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারী করিবার জন্য যে প্রস্তাব যথেষ্ট নোটিশ ব্যতিরেকেও গৃহীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কি করা হইয়াছে, ঐ কাগজে তাহা লিখিত আছে। কাগজটির প্রথম অংশ একটি চিঠির আকারে লিখিত। দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি নিয়ম আছে। চিঠিটির ঠিকানা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির। এখান হইতে এই চিঠিটি কেন লিখিত হইল জানি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কি ইহা লিখিতে অনুমতি দিয়াছেন, বা ইহার অনুমোদন করিয়াছেন? লোকের হঠাৎ তাহাই মনে হইবে। ইহাতে কোন কৌশল আছে কি? মুদ্রিত কাগজটিতে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার জন্য গঠিত শাখা-সমিতি দ্বারা প্রণীত মূল নিয়মাবলীর প্রথম নিয়মে সম্মিলনের যে উদ্দেশ্য লেখা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিষদের উদ্দেশ্যের মিল আছে বোধ হয়। পরিষদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকায় উহার উদ্দেশ্য কিরূপ বর্ণিত আছে জানি না। কিন্তু পরিষদের কাজ দেখিয়া বোধ হয় সম্মিলনের প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের সহিত উহার উদ্দেশ্য অনেক মিলে :—

"সুধীগণের মধ্যে ভাববিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্য নির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার।"

সুতরাং পরিষদের কাজে এই প্রস্তাবিত সম্মিলনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবার সম্ভাবনা। একই উদ্দেশ্যে কোন দেশে একাধিক সমিতি বা সভা থাকিলে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবেই, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু যখন একটি পুরাতন সভাই জনসাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পায় না, তখন কতকটা সেই উদ্দেশ্যে আর-একটি সভা করিলে, পুরাতন সভার আরো কম সাহায্য পাইবার কথা; সুতরাং উভয়ের কিছু সংঘর্ষও অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য আমরা পুরাতনকেই পুষ্ট করিবার পক্ষপাতী।

যখন বাঁকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত হঠাৎ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় ও উহা গৃহীত হয়, তখন আমরা, গত বৎসর মাঘ মাসের প্রবাসীতে, লিখিয়াছিলাম;

"এতদিন সাহিত্যপরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, সম্মিলনের সাধারণ সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত দশজন সভ্যের সহযোগিতায়, সম্মিলনের কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। এই পরিচালন-সমিতিকে কি অকস্মাৎ উড়াইয়া দেওয়া হইল? পরিষদ, কয়েকমাস হইল, বাংলা দেশের ও তাহার বাহিরের সমুদয় বঙ্গীয়-সাহিত্যিক সভাসমিতির সহযোগিতালাভের চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন। সম্মিলনেরও উদ্দেশ্য যখন সমুদয় বাংলাসাহিত্য-বিষয়িণী চেষ্টাকে একলক্ষ্য ও পরস্পর সহযোগিতা-সূত্রে আবদ্ধ করা, তখন সাহিত্যপরিষদের এই চেষ্টাকেই সাহায্যদানে প্রবলতর করিলে কি ক্ষতি হইত?......শুনিলাম, বাঁকিপুরে কমিটি নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে অনেক সভ্য বিষয়টির ভাল করিয়া আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদের মত লইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু সভাপতির শাসনদণ্ড-পরিচালনে এসব চেষ্টা ভূমিসাৎ হইয়াছিল।"

যাহা হউক, আমরা এখনও বলি, প্রস্তাবটি পরিষদ-সমূহের ও সাহিত্যসভার সকল সভ্য এবং সমুদয় সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র-সম্পাদককে পাঠাইয়া রীতিমত আলোচনার পর সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিলে ভাল হয়। চিঠিখানির তারিখ ২৮শে কার্ত্তিক, ১৩২৪; উহার লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত উহা আমাদিগকে না পাঠাইলেও উহা আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু খুব বিলম্বে, ২৬শে পৌষ, পৌঁছিয়াছে। এইজন্য বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। চিঠিখানি কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছে এবং কাহাদিগকে পাঠান হইয়াছে জানি না; কোথাও তাহা লেখা নাই। কেবল দেখিতেছি উহার নিম্নলিখিত বাক্যে ও অন্যত্র বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে :—"এখন আপনাদের পক্ষে বিচার্য্য এই যে, আপনারা দেশে একটি সাহিত্য-সম্মিলন চান, কি একাধিক সাহিত্য-সম্মিলন চান?" এই "আপনারা" কাহারা?

পুস্তক-পরিচয়

লহর—'সচিত্র ছোট উপন্যাস'। শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ প্রণীত। প্রকাশক—সাহিত্যপ্রচার সমিতি লিমিটেড, ২৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ছাপা ও কাগজ বাঁধাই বিশেষত্বহীন।

গ্রন্থে 'ইজ্জতের দাম,' 'সেবার অধিকার' প্রভৃতি দশটি ছোট উপন্যাস আছে। দু'একটি চরিত্র আমাদের মন্দ লাগে নাই। 'গৃহদেবীতে' সুলতা'র ও 'বীণা'য় বীণা'র চরিত্র আমাদের ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিয়া যে মীমাংসায় আসিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের একমত আছে। ছবিগুলি না দিলে কোন ক্ষতি ছিল না।

অহম্।

কুমার পরিব্রাজক গ্রন্থমালা, সংখ্যা ১৬, **বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত**, প্রকাশক শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন কবিভূষণ, বিনামূল্যে বিতরণার্থ। (ডাকে লইলে ১০ পয়সার টিকিট পাঠাতে হইবে)। পুস্তক পাইবার ঠিকানা—ম্যানেজার, কালী-যোগাশ্রম, বেনারস সিটী।

দেবপূজায় সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু সকলেই সমান অধিকারী নহে; কোনো পূজক নিজের প্রকৃতিগুণে সত্ত্বগুণপ্রধান, কেহ রজোগুণপ্রধান, এবং কেহ বা তমোগুণপ্রধান। প্রকৃতি অনুসারে ইহাদের পূজার উপকরণও আপনা-আপনিই ভিন্ন-ভিন্নরূপ হইয়া উৎসবাদিও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের হয়। কিন্তু পূজা করিতে হইবে সকলকেই, পূজার ফল (মুক্তি) পাইতে হইবে সকলকেই। একজন পাইবে, আর-একজন পাইবে না, শাস্ত্র ইহা বলে না, বলিতে পারেও না, কারণ ইহা সকলেরই হিতের জন্য প্রচারিত। যে যে-রকম, তাহাকে আর-একরকমে চলিতে বলিলে সে তাহা করিয়া উঠিতে পারে না—যদিও ঐরূপ করায় তাহার মঙ্গল হয়। সে তাহার অভ্যাসের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে প্রস্তুত হয় না, অথচ তাহা না করিলেও তাহার উদ্ধার নাই। যথার্থ মঙ্গল লাভ করিতে হইলে সত্ত্বগুণ লাভ করা চাই-ই চাই। তাই শাস্ত্র বন্ধুবুদ্ধিতে তমোগুণপ্রধান ও রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিদিগকে তাহাদেরই ইচ্ছা অনুসরণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কৌশলে সত্ত্বগুণে আনয়ন করে; তাহা তাহাদের তামস ও রাজস আচার-ব্যবহারই প্রথম-প্রথম অনুমোদন করিয়া, ঐ তামসী ও রাজসী প্রবৃত্তিকেই একবারে সহসা ধ্বংস না করিয়া বিশেষ-বিশেষ নিয়মবিধানে সংশোধন করিয়া, তাহার পরিচিত স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করাইয়া পবিত্র সত্ত্বপ্রবাহের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, এবং ইহাতেই তাহা সমস্তমলবিনির্মুক্ত হইয়া সত্ত্বরূপেই পরিণত হইয়া উঠে। তাই শাস্ত্রে রজস্তমোগুণপ্রধান পূজকদের রাজসী ও তামসী-পূজায় পশুবলির ব্যবস্থা পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিধি প্রবর্ত্তনা নহে, ইহাতে "নিবৃত্তিরিষ্টা"—নিবৃত্তিই এখানে অভিপ্রেত। বিশেষ নিয়মবিধি অনুসরণ করিয়া এই-সকল অধম ও মধ্যম সাধক যাহাতে সত্ত্বগুণপ্রধান হইয়া উত্তম হইয়া উঠে, উত্তম সাত্ত্বিকী পূজা অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাই বিধান করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। যাহার মধ্যে সত্ত্বগুণের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, হিংসার দিকে তাহার প্রবৃত্তিই যাইবে না, অতএব তাহার পূজায় পশুহিংসার কথাও নাই। সাত্ত্বিকী পূজাই শ্রেষ্ঠ, ইহাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। পূজা-উপলক্ষে নানাস্থানে অবৈধ পশুবলি প্রদান করা হয়। আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশক মহাশয় নানাস্থান হইতে নানা যুক্তিপ্রমাণ আহরণ করিয়া এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা ইহা পড়িয়া সুখী হইলাম। পূজকেরা ইহা পা[ঠ] করিয়া দেখুন।

ব্রহ্মসূত্র—প্রথম অধ্যায়, প্রথম খণ্ড (ব্রহ্মসূত্র, বঙ্গানুবা[দ] এবং সরলা-নাম্নী বঙ্গব্যাখ্যা), হিন্দুপত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযদুনাথ মজুমদা[র] এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তবাচস্পতি দ্বারা ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, দ্বিতী[য়] সংস্করণ, হিন্দুপত্রিকার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যা[য়] কর্ত্তৃক যশোহর হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ১২+২০২, মূল্য ১।০ একটাক[া] চারি আনা মাত্র।

ইহাতে কোনো পাঠকের ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বুঝিতে কোনো উপকা[র] হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ব্যাখ্যা নিজের সরলা নাম [সা]র্থক করিতে পারেই নাই, বরং কেবল জটিলা নহে, অত্যন্ত কুটিলা[ও] হইয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলি[ত] ও সম্পাদিত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়া[ন] পাবলিশিং হাউস কলিকাতা। বড় আড়ার ১৫৭৭ পৃষ্ঠা। শক্ত বাঁধ বাইণ্ডিং। দাম ৭৲ টাকা।

এই অভিধানে বাংলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত প্রাকৃত আরবী ফার্সী হিন্দী ইংরেজী ও দেশজ প্রায় সমস্ত শব্দ ও প্রবচন, তাহাদে[র] উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি, অর্থ, প্রয়োগ প্রভৃতি বিশদভাবে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় সংস্কৃত ধাতু ও ধাত্বর্থ; বাংলা কাব্য ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ স্থানের উচ্চারণ সহ ভৌগোলিক সংস্থান; প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রা পরিমাণ সংখ্যা ও পরিমাপ-বাচক শব্দ; সমোচ্চার্য অথচ বিভিন্নার্থক শব্দ; প্রবাদ বা উল্লেখের সহিত সংস্পৃষ্ট পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ব্যক্তিদের নাম; বঙ্গীয় নরনারীর প্রচলিত নাম-সংক্ষেপ ও ডাকনামবোধক শব্দ; বাঙালী মুসলমানদিগের আরবী ও ফারসী নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণসঙ্গত বানান ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ; বিদেশী নামের লিপ্যন্তর উচ্চারণ ও পরিচয়; সংক্ষেপে লিখিত শব্দের আসল রূপ ও অর্থ; লেখার মধ্যে চিহ্ন বা সঙ্কেতের অর্থ; ছাপাখানার প্রুফ সংশোধনের সঙ্কেত ও আদর্শ; মুদ্রা বিনিময়ের হার; মূকবধিরদিগকে শিক্ষা দিবার সাঙ্কেতিক বর্ণমালা; ইত্যাদি বহু দরকারী বিষয় এই প্রকাণ্ড অভিধানে স্থান পাইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত বাংলায় যত অভিধান বাহির হইয়াছে তাহাদের সকলের চেয়ে যে এই অভিধানখানি শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ তাহা জোর করিয়া বলা যায়। প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা অভিধানে সংস্কৃত শব্দই অধিক, গোটাকতক অন্য ভাষার শব্দ হয় দেশজ নয় যাবনিক বলিয়া নির্দেশ করা আছে মাত্র। তাহার পর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়েরা বাংলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃতশব্দ ছাড়া অপর শব্দের অভিধান প্রণয়ন করেন। সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী সংযোজিত হয়। এইরূপে যাহা এতদিন ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে পৃথক হইয়া থাকাতে জিজ্ঞাসুর অসুবিধা হইতেছিল, তাহার প্রায় সমস্তই ও তদতিরিক্ত অনেক কিছু এই অভিধানে একত্র সঙ্কলিত হওয়াতে জিজ্ঞাসুর, বিশেষতঃ বিদেশী বাংলাপাঠকের, বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এত বড় ও এমন বহুজ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ অভিধান বাংলা ভাষায় এই প্রথম। ইংরেজী ভাষায় ওয়েবষ্টারের সঙ্কলিত অভিধানের সহিত ইহার তুলনা নিঃসঙ্কোচে করা যাইতে পারে।

এত বড় প্রকাণ্ড অভিধানের বিশদ সমালোচনা করা একলার ও এক আধ মাসের কর্ম্ম নয়। বিরাট আয়োজনে ত্রুটি থাকেই। ইংরেজী ভাষায় মারে'র অভিধান সংকলনের সময় তাঁহাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শব্দ শব্দার্থ জোগাইয়া, সংগৃহীত শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও উচ্চারণ জানাইয়া, ভুল দেখাইয়া সাহায্য করিয়াছিল। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা যদি সেই উপায়ে এই উৎকৃষ্ট অভিধানখানির অঙ্গরাগ ও সৌষ্ঠব সম্পাদনে সাহায্য করেন, তবে পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা বাংলাভাষার কীর্ত্তিস্তম্ভ-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

অবসর-সময়ে মাঝে-মাঝে এই অভিধান উল্টাইয়া আমার যাহা চোখে ঠেকিয়াছে তাহারই দুই চারিটা কথা নমুনা-স্বরূপ লিখিতেছি।—উৎকট আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ আরো ছাঁটিয়া বাদ দিলে চলিতে পারিত হয়ত। স্থানে-স্থানে ছাপার, বিশেষ করিয়া ইংরেজী শব্দের প্রুফ দেখার টেক্‌নিক্যাল ভুল আছে; তবে সেগুলি সাধারণের অসুবিধার কারণ হইবার মতন নহে। 'হাপ' শব্দের মধ্যে বাংলার বিশেষ জিনিস 'হাপ-আখড়াই' শব্দের পরিচয় নাই। প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে এমন অনেক স্থান পাইয়াছে যাহা হয়ত পশ্চিমের বাঙালীরা ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু খাস বাংলায় তাদের চলন নাই; অথচ বাংলার চলিত প্রবাদ প্রবচন অনেক বাদ পড়িয়াছে। 'আবুহোসেন' নামের পরিচয়ে উহা গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাটকের প্রধান চরিত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু আসলে উহা যাহার চরিত্র সেই আরব্য-উপন্যাসের নাম করা হয় নাই। পরিশিষ্টের এই-সমস্ত তালিকাই অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও তাহাদের পুঁজি যৎসামান্য; পরবর্ত্তী সংস্করণে এইগুলিকে সম্পূর্ণ ও ব্যাপক করা নিতান্ত দরকার হইবে।

যাহা নির্দ্দেশ করিলাম তাহা সামান্য ত্রুটি, না করিলেও চলিত। অনুষ্ঠিত কাজের ত্রুটি ধরা খুব সহজ ও সমালোচক মক্ষিকাবৃত্তি বলিয়া একটু নির্দ্দেশ করিলাম। কিন্তু যখন এই অভিধানের বিরাট কলেবর, ক্ষেত্রের ব্যাপকতা আর বাংলা দেশের অসুবিধার কথা ভাবি তখন ইহা একজন লোকের চেষ্টার ফল মনে করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া সম্পাদককে ও প্রকাশককে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা এই মহৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

নাগকেশর—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

বইখানির বাহিরের রূপ সুন্দর। কবিতার বই। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাবান প্রিয় কবির পরিণত হাতের রচনা। সুতরাং ইহা যে পরম উপভোগ্য হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। যতীন্দ্রমোহনের কবিত্বরসমধুর শব্দ নির্ব্বাচন ও ছন্দের পারিপাট্য পাঠকের মন অনায়াসে হরণ করিয়া বসে। তাহার উপর যখন বর্ণনার চাতুর্য্য, ইংরেজীতে যাহাকে expression বলে তাহার মাধুর্য্য ও ভাবের গাম্ভীর্য্য বা নূতনত্ব যোগ হয় তখন মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনাতেই কবির দর যাচাই হইয়া যায়। অতএব প্রথমেই আমরা সেই কষ্টিপাথরে কবির নিরিখ পরখ করিতে গিয়া দেখিতে পাই বসন্তকালের আগমনের সূচনায় কবি অনুভব করিয়াছেন—

"পোষের সঙ্গে বিবাহ আজিকে বোশেখ মাসের।"

এই একটি লাইনে সমস্ত বসন্তের স্নিগ্ধতার আভাস ফুটাইয়া তুলিয়া কবি মননশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 'ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো' ও 'মধুমাসে' কবিতায় বসন্তের মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'কলঙ্কভঞ্জন' কবিতাটিতে বর্ষার ছবি চমৎকার ফুটিয়াছে। গোড়ার চারটি লাইন তুলিয়া দেখাই—

"শ্রাবণ-মেঘের ভুষায় লেখা আকাশ-ভূর্জ্জপাতে
কোন্ মিনতির বার্ত্তা এল পৃথ্বীরাণীর হাতে?
কৃষ্ণমেঘের অশ্রুধারায় আর্দ্র প্রেমাঞ্জন
করল কি আজ সৃষ্টি-রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন!"

আমাদের এই কবিটির আর-একটি বিশেষত্ব ঘরোয়া ব্যাপারকে কবিত্বে মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করায়। শারদীয়া পূজার সময় প্রবাসী পতির প্রত্যাগমন-ব্যাকুল বধূর ছবিটি সহজভাবে চমৎকার ফুটিয়াছে—

'ঘর হতে ছাদে ছাদ হতে ঘরে
দ্বার হতে বাতায়নে,
একই পড়া-বই পালটিয়া' পড়ি
বারবার আনমনে;
খোলা-চুল বাঁধি বাঁধা-চুল খুলি,
ফিরিয়া সাজাই ঘর,
শতবার করি সিন্দুর-কৌটা
পরি যে সিঁথার পর,
খড়ির আঁচড়ে দিন আঁকি, আর
এক এক করে মুছি,
পাঁজি কাছে তবু পূজার তারিখ
প্রতি জনে জনে পুছি;—ইত্যাদি

বাংলার প্রতি গৃহস্থ-ঘরের ছবি। আবার এই সময়ে বঙ্গবধূর বাপের বাড়ী যাইবার যে ব্যাকুলতা তাহাই 'আশ্বিনের ব্যথা'। 'বঙ্গবধূ' নিপুণ শিল্পীর রঙিন চিত্র।

'উৎসবে' নামক কবিতাটি অতি সুন্দর; উহাতে উৎসবের মধুর মূর্ত্তি আর তার অন্তরগত ভাবরস ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কবিতাটি দীর্ঘ, সমস্তখানি না পড়িলে স্বল্প উদ্ধারে উহার রসবোধ হইবে না।

'প্রণাম' 'সন্ধান' 'প্রেমোন্মাদ' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা উৎকৃষ্ট হইলেও রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট নকল বলিয়া কানে বাজে।

রবীন্দ্রনাথের নব-উদ্ভাবিত 'পাগলা-ঝোরা' বা 'অসম' ছন্দের কবিতা রচনায় যতীন্দ্রমোহন খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

'বহ্নিশিখা' কবিতাটি উৎকৃষ্ট। তার প্রথম ও শেষ শ্লোক দুটি উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

"দীপ্তিরূপিণী হে বহ্নিশিখা, হে মোর অমৃত আলো,
আমারে তোমার দীপটি করিলে, ওগো ভালো সেই ভালো!
জ্বালাও বন্ধু জ্বালাও—
এমনি করিয়া জীবন-রাত্রে যাত্রীয়ে তব চালাও!

* * *
* *

হে মোর মরণ! শেষ নিবেদন—নির্ব্বাণে শুধু তার
ধূম-অঙ্কিত লাঞ্ছনা-কালী লিখো না ললাটে আর;
দীপ্তি—সে থাক পরে,
দাহ থাক তার গোপন গর্ব্ব আপনার অন্তরে!"

'পত্র-লেখা' কবির ভাষায়—

"ক্ষুদ্র-পরিমাণ শুভ্র কাগজের পরে
মর্ম্মের মালাটি যেন গাঁথিছে আখরে!"

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই এই নাগকেশরের মধু ও গন্ধের আস্বাদ পাঠক পাইবেন এবং মধুপের মতন আকৃষ্ট হইবেন আশা করি।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠানদিদির কবিরাজী বা সরল গৃহচিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীনীলমাধব সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও জনষ্টনগঞ্জ, এলাহাবাদ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩৬ পৃঃ। মূল্য ১৲ টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম ভাগ।

এই গ্রন্থ স্বাস্থ্যোপচার, হিতাহিতাচার প্রভৃতি দ্বাদশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা, গর্ভিণী প্রভৃতি ও শিশুপালন ও তাহাদের সম্বন্ধে নানাবিধ ব্যাধির প্রতিকার সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদের মতগুলি বিশদ বাঙ্গালায় বিবৃত হইয়াছে। আমাদের আহার্য্য দ্রব্যসমূহের গুণাগুণ সরল ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় ইহার সাহায্যে অনেকেই পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে অম্লপিত্ত ও মধুমেহ ব্যাধির প্রাচুর্য্যের কারণ যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা বিশেষ উপাদেয়। মোটের উপর এই পুস্তক পড়িয়া ঘরের ঝি বৌ শুধু কেন গৃহস্থগণও বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে।

এই পুস্তকে উপাদেয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনুবাদের অনবধানতায় পুস্তকের স্থানে স্থানে যথার্থের যে বিচ্যুতি হইয়াছে তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নির্ম্মল দেখিতে পাইব। গ্রহণীনাড়ীর স্থান আমাশয় ও মলাশয়ের মধ্যে নহে (১৯ পৃষ্ঠায়)। আমাশয় ও পক্বাশয় সন্ধির চতুরঙ্গুল স্থানকে গ্রহণী বলে। পক্বাশয়ের অধোভাগ মলাশয় হইলেও পক্বাশয় অর্থে মলাশয় (২৬ পৃঃ) লিখা সঙ্গত হয় নাই। অজীর্ণ হইলে স্নান অভ্যঙ্গাদি না করিবার হেতু (৩৮ পৃষ্ঠায়) অযৌক্তিক হইয়াছে। অজীর্ণের পক্ষে মাত্রাধিক আহারই হেতু বলা প্রশস্ত, কেবল দূষিতাগ্নি নহে। সবল ও অদূষিত অগ্নিও মাত্রাধিক আহারে নষ্ট হইয়া থাকে। ত্বক্‌গত ভ্রাজক পিত্ত বা অগ্নি স্নান ও অভ্যঙ্গাদিতে শরীরে প্রবিষ্ট জল স্নেহাদি পরিপাক করিয়া থাকে। তাহার মূল পক্বামাশয়-গত পাচক পিত্ত অজীর্ণাদিকালে ক্ষীণ হওয়ায় ত্বক্‌গত পিত্তও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং অজীর্ণ হইলে স্নান অভ্যঙ্গাদি জীর্ণ হইতে না পারায় আরও অজীর্ণের বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। এই-হেতুতেই অজীর্ণে স্নানাদি নিষিদ্ধ।

প্রসবের পর অপরা (ফুল) না পড়িলে যে চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদসম্মত তাহা (১১১ পৃঃ ও ১১৮ পৃঃ) দ্বিরুক্ত হইয়াছে।

মকল্লশূলের বিবরণ (১২০ পৃঃ) যেরূপ ভাষায় লিখা হইয়াছে তাহা বোধগম্য হয় না। "নাভেরধস্তাৎ" পদে "নাভির নীচে" এইরূপ আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সুবিধা হইত, অথবা ঐ ব্যাধির ভাষায় নাম (ভাদালেব্যথা—রাজসাহী) লিখিলেই কোন গোলোযোগ ছিল না।

ইহা ব্যতীত 'কৃষ্ণসর্প' 'প্রয়োজনীয়তা' প্রভৃতি ভাষার ত্রুটি না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

হারামণি

[গত ২০শে নভেম্বর রবিবার ঢাকা হইতে কলিকাতা ফিরিবার কালে জাহাজে এই গানগুলি সংগ্রহ করি। জাহাজে যাত্রী মুসলমান কৃষক ও ভদ্রবংশ লোকদের সহিত আলাপ করিয়া সময় কাটাই। আমাদের দেশের সাধারণ কৃষক, কি হিন্দু কি মুসলমান, এমন সরলপ্রাণ ও স্বাভাবিক ভদ্রতায় ভূষিত যে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হয়; কেবল দুইটি মিষ্ট কথায়, আন্তরিক সহানুভূতির বাক্যে ইহাদিকে শিক্ষিত লোকে সহজেই আপনার করিয়া লইতে পারেন। ময়মনসিংহ ঢাকা ফরীদপুরের কতকগুলি লোক জাহাজে ভাটিয়াল ও বাউলের গ[ান] গাহিতেছিল, তাহাদের কাছে শুনিয়া গানগুলি লিখিয়া লই। আম[ার] এই প্রথম পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ ও পদ্মা-দর্শন; একদিনেই বিনা আয়াসে আ[মি] এই কয়টি গান পাইয়াছি; পূর্ব্ববঙ্গবাসী যে-সকল ছাত্র ও সাহিত্[য]মোদী লোক জাহাজে যাতায়াত করেন তাঁহারা অতি সহজেই এইর[ূপ] অনেক 'হারামণি' উদ্ধার করিয়া আমাদের জাতীয় প্রাণের পরিচায়[ক] লোক-গীতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সাহায্য করিতে পারেন।

এই গানগুলি লিখিয়া লইবার সময় জাহাজের সহযাত্রী শ্রীযু[ক্ত] মন্মথনাথ বসু (বর্দ্ধমান বিভাগের ইস্কুল পরিদর্শকের খাস-মুন্শী) আমাকে সাহায্য করেন। ইনি ৭ বৎসর ঢাকায় ছিলেন, স্থানীয় চলি[ত] ভাষা বেশ ভাল জানেন; ইঁহার সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকা[র] করিতেছি।

সাধারণ পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য গানগুলি পূর্ব্ববঙ্গের চলি[ত] ভাষা ও সাধুভাষার বানানের সামঞ্জস্য করিয়া লেখা গেল; একেবা[রে] বিশুদ্ধ ধ্বনিদ্যোতক phonetic বানানে বাঙ্গালিয়া ভাষা লিখিলে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িত। গানগুলি 'সংশোধন' করিবার চেষ্টা হ[য়] নাই।]

১। ভাটিয়াল।

তুমি আমায় ছাইড়্যা যাইও না।
তুমি আমি ওক্য[১] হইলে তবে কি আছে ভাবনা।
শিক্ষা-গুরু গোলোকপতি, দীক্ষা-গুরু হইবে সাথী,
জ্বালাইয়া গিয়ানের বাতি দিবে উপোসোনা[২] ॥

১ ঐক্য। ২ উপাসনা।

২। ভাটিয়াল।

মনের মানুষ পাইবার আশে
ঘুইর‍্যা ফিরি দেশ বৈদেশে।
কতো মানুষ আইল গেল,
মনের মানুষ না মিলে।
মনের মানুষ কে, তারে পাই কই[১] গেলে,
মনের মানুষ গওর-মণি,[২] দর্শনেতে নেয় গো প্রাণী!
কাইন্দ্যা ফিরি পাগলিনী, বুক ভাসে চইক্ষের জলে ॥

১ কোথায়। ২ গওর=ফার্সী গওহর্=জহর, রত্ন (?); গৌরম[ণি] =গৌরচন্দ্র (?) - ঢাকা নিবাসী জনৈক সহযাত্রী দ্বিতীয়-প্রকারে ব্যাখ্[যা] করেন।

৩। ভাটিয়াল।

আমি কার কাছে কইব মনোদুঃখের বেদনা।
পুরান বাকসের তালা নতুন চাবি ঘুরে না।
মনে মন মিশাইয়া গো বন্ধুর মন আর পাইলাম না।
ফুল-তলাতে চাবী লইয়া প্রাণবন্ধু যায় গো চইল্যা,
এখন তালা খুইল্‌বার পারি না।
ও তালা খুইল্‌বার আশে বইস্যা রইলাম গো সখি ॥

৪। ভাটিয়াল।

ও ভমরা, নিশাতে যাইও ফুল-বনে।
ওরে নয় দরজা বন্ধ কইরে লইও ফুলের গন্ধ রে।
ওরে অন্তরে জপিও বন্ধুর নাম রে।
ওরে আন্ধার ঘরে জ্বালাইয়া বাতী
ফুল ছিটাইছে, নানান্ জাতি;
ওরে তবু না ছিটে ফুলের কলি রে।[১]

১ ফুটিয়াছে ?

৫। ভাটিয়াল।

তোরে বলি ওরে অবুঝ মন
আল্লা নবীর নাম তুমি নাওরে অথন।
এক দিনে জগৎ অন্ধকার
আর এক দিনে বন্ধু ভবে নাই এ সংসার।
ওরে মূলেতে মূল ঠিক রাখিও,
মাজনকে[১] রে দিও না ফাঁকী;
ভাবিয়া দেখো রে মন আর কি তোর আছে বা কি॥

১ মহাজনকে।

৬। ভাটিয়াল।

মনের মানুষ না হইলে মনের কথা কইও না।
কথা কইও না, কথার প্যাঁচে থাইকো না।
পুরুষেরি এমনি ধারা, চোরের নায়ে সাউধের[১] পারা—
দেখ্‌তে দেখি সাধুর মত কাজে দেখি না।
আপনার তালে তাল না পাইলে রঙ্গে নাইচো না।
মাকাল গোটা দেখতে ভালো, উপরে লাল ভিতরে
কালো;
শিমুল ফুলে ভমর বসে না।
চাম্পা ফুলে ঝাম্প দিও না;
প্রাণসুজনী[২] গো
মনের মানুষ না হইলে মনের কথা কইও না।

১ সাধুর। ২ সজনী।

৭। ভাটিয়াল।

মনের কথা রইল মনে, এই দেশে দরদী নাই,
সই গো, বন্ধুরে কোথায় পাই।
বন্ধুরে, তুই-বন্ধুর পীরিতি লাগি
দেশান্তরী হইয়া যাই।
শুনা বন্ধু, মইর্যা গেলে, চরণতলে রাইখো ঠাঁই।
বন্ধুরে, তুই-বন্ধুর পীরিতি লাগি জ্বইলা পুইড়া হইলাম ছাই।
আনরে কাটারী ছুরী, বুক চির্যা তোমারে দেখাই॥

৮। ভাটিয়াল।

আগুন পানি হাওয়া মাটি
যখনি না ছিল,
কি দিয়া দমেরি জাহাজ
তইয়ার করিল?
দমেরি জাহাজ বানাইয়া
কি কল কাটাইছে,
দুই বারা দুই বাঁকা[১] যেমন
হামেশে ঘুইর্‌তেছে।
বাঁকাতে নাই গো বাঁকা;
আস্‌মানে জমীনে ঠেকা
তারে কেও চিনে না।

১ গায়কের ব্যাখ্যা অনুসারে 'বারা' অর্থে পার্শ্ব, 'বাঁকা' অর্থে সুন্দর।
৯।১০ লাইনের ব্যাখ্যা গায়ক করিতে পারিল না।

৯। বাউল।

হরি বল্‌লি না মন আমার,
একদিন ভবে দেখ্‌বিরে অন্ধকার।
ভবে কয়বার এলি, কয়বার গেলি,
ভবে আসা যাওয়া হ'ল সার।
কোথায় রবে এ ঘর বাড়ী,
কোথায় রবে সুন্দরী নারী,
কোথায় রবে যৈবনের বাহার।
যেদিন দেহ ছেড়ে প্রাণ পালাবে,
সেদিন বল্‌বে না কেউ তালুকদার।
কোথা রবে জামা জোড়া
কোথা রবে নীলা ঘোড়া,
কোথা রবে পালকীর সওয়ার।
যেদিন শমন এসে করবে বন্ধন
সেদিন পড়ে' র'বে এ সংসার।
ভবে এসে এই করিলি—
রঙ্গে বসে কাল কাটালি,
দালান কোঠা কতই দিলি দেখ্‌তে চমৎকার।
যেদিন ভবের খেলা সাঙ্গ হবে
সেদিন দেখ্‌বি রে ঘোর অন্ধকার।

[১, ২, ৩, ৫ সংখ্যক গান, জেলা ঢাকা, মনোহরদী থানা, বাব্‌লা ডাকঘর, নজরী গ্রামের ছমরদ্দী দফাদার ও এলাহিবক্‌শ দফাদারের নিকট প্রাপ্ত; ৪ সংখ্যক এলাহিবক্‌শ ও উক্তগ্রামের সুন্দর আলীর নিকট হইতে। ৬, ৭ সংখ্যক গান ময়মনসিংহ-গোবরিয়াচর-নিবাসী পীর মামুদ মিয়ার নিকট প্রাপ্ত। ৭ সংখ্যক গান ছয়বদ্দী ও এলাহীবক্‌শ কর্ত্তৃকও গীত হয়। ৮ সংখ্যক গান ময়মনসিংহ ডুমরাকান্দি ডাকঘর, বাজিতপুর থানা, লক্ষ্মীপুরা গ্রামের আন্‌ছর মিঞার কাছে পাওয়া। ৯ সংখ্যক গান ফরীদপুর হইতে নবদ্বীপ যাত্রী কতকগুলি বৈষ্ণবের নিকট প্রাপ্ত; জাহাজ গোয়ালন্দে আসিয়া পড়ায় ইহাদের পরিচয় পাই নাই।]

কলিকাতা। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২৪

৫ম সংখ্যা

আত্ম শাসন

'হোমরুল' কথাটার বাঙ্গলা কি? দুঃখ এই যে ইংরেজী কথা ও তাহার বাঙ্গলা অর্থ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মত নিত্যই একসঙ্গে যুক্ত পাওয়া যায় না। মোক্ষ কি, তাহা কেউ জানে না, তবুও সকলেই সেই অলৌকিক পদার্থটা চান; এই লৌকিক মোক্ষের বেলায়ও আমাদের পল্লীতে-পল্লীতে একটা দুর্ব্বোধ্য নাম লইয়া 'বিনামা-সাধন' চলিবে কি? আমাদের সহরের ইংরেজী-পড়া গীর্ব্বাণেরা এই মোক্ষকে নির্ব্বাণ মনে করেন নাই, 'ছোট মোক্ষ' বা 'পাতি-মোক্ষ' (যথা, পাতি নেবু) মনে করেন নাই—ইহা নিশ্চিত। তবে এই হোমরুলের 'হোম' বৈদিক ভাষায় 'অস্ত' বটে। বৈদিকে 'অস্ত' অর্থ গৃহ; 'গৃহ-শাসন' বলিলে বড় ছোট-কথা বুঝায়, তাই 'গৃহ' অর্থে বৈদিক ভাষায় 'অস্ত' ব্যবহার করিলাম। ইহাতে 'গৃহ' অর্থও রহিল, অজানা ভাবের জন্ত অপ্রচলিত শব্দও রহিল ও তাহার উপর ব্যাকরণের সূত্র খাটাইয়া ('অস্ত' বিবর্ত্ত ইতি 'আস্ত') 'আভাঙ্গা' কথার ধ্বনিতে 'আস্ত-শাসন' পাওয়া গেল। আপনার আয়ত্তে আপন দেশের শাসন অর্থে 'স্বায়ত্ত-শাসন' চলিতে পারিত, কিন্তু ঐ 'বুলি'টি আমাদের উত্তেজিত 'জনবুল-প্রতিপক্ষের' সামনে 'লাল-ন্যাকড়া'।

আপনার দেশ অর্থে Home শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহার 'বিলাত' অর্থই এখন 'ত্যজনেষু রূঢ়ঃ'। 'মেম্ সাহেব' বলিতে যখন আমাদের সাড়ী-পরা লক্ষ্মীদের মধ্যে জনকতককে বুঝিতে বাধ্য হই, তখন 'হোম' বলিতে বিলাতি দেশ ছাড়িয়া এ দেশকেও বুঝিতে গোল না হইতে পারে; তবে এ দেশটা আমাদের কি না তাহা ভাবিয়া দেখিলে হয়।

ইতিহাসে লেখে, যে, এই দেশটি এখন ইংরেজের অধিকারে ও ইহার নাম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া। এখন যে দেশের নাম ভারতবর্ষ নয়, হিন্দুস্থান নয়, কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, সে-দেশের 'আস্ত-শাসন' কেমন করিয়া আমাদের হাতে পড়িল বা পড়িবে তাহা বুঝিয়া লইবার কথা। গৃহকর্ত্তা যখন চাকরের হাতে লোহার সিন্দুকের চাবি দেন কিংবা চাকরের পরামর্শ লইয়া কোন কাজ করেন কিংবা কোন বিশেষ কাজের ভার পূরা মাত্রায় কোন চাকরের উপর পড়ে, তখন সে চাকর গৃহ ও পরিবারের 'আস্ত-শাসনের' মালিক হয় না। ইংরেজ যদি শাসন-দণ্ডটা নিজের হাতের মুঠায় ধরিয়া রাখেন, আর লাট্-সভার সদস্য থেকে ডেপুটীবাবু পর্য্যন্ত এদেশের অনেককেই ঐ দণ্ড বা লাঠিটির আগাটি ধরিয়া একটু হেলাইতে-দোলাইতে বলেন, তাহা হইলে হাতের মুঠায় টিপটির ওজনেই লাঠি ঘুরাইবার ক্ষমতা থাকে। এ শাসনকে 'আস্ত-শাসন' বলিলে কিংবা স্বায়ত্ত-শাসন বলিলে কথার অপব্যবহার হয়। ইংরেজের হাতে কড়া পড়িবার ভয়ে লাঠির মুঠাটি একেবারে ছাড়িয়া দিবেন, আর আমরা ঐ লাঠি-গাছটি আপন মুঠায় পাই

ইংরেজদের নাকের গোড়ায় বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরাইব,— এ আশা কেমন করিয়া জন্মিল ? ইংরেজ আমাদিগকে কিছু দিবেন বলিয়াছেন আর আমরা দাতার সে আহ্বানে হাত পাতিয়াছি, এই ভিক্ষা চাহিবার সময় যদি চোখ রাঙ্গাইয়া কড়া কথা বলি, তবে আমাদের সঙ্গীভিক্ষুকেরা বুকের পাটার প্রশংসা করিতে পারে বটে, কিন্তু দাতা সেই রূঢ় কথার গূঢ় মাধুরী বুঝিয়া তাঁহার মাথার ছাতিটি ছাড়াও চড়িবার হাতীটি দিবেন কি না তাহা বুঝিতে চাহিতেছি। আমাদের আবেদন ও আবদার যে, লাঠিগাছটির হেলাইবার অধিকার যেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার প্রজাবর্গেরই বেশী থাকে ; আমরা বেশীর ভাগ ঐ লাঠি দোলাইব, আর জেতা পক্ষের লোকেরা অল্প হেলাইবে, এ আবেদন যদি ষোল আনা মঞ্জুর হয়, তবুও তাহা 'আত্ম-শাসনে' দাঁড়ায় না। এই যখন আমাদের অবস্থা তখন ভিক্ষার ঝুলিতে কি পড়িবে না জানিয়াই উহার প্রকৃতি লইয়া ও ভাগবখ্‌রা লইয়া নিজেরা মারামারি করিয়া মরিতেছি কেন ?

ইংরেজ-সরকার বলিতেছেন যে আমাদিগকে নাকি বিলক্ষণ কিছু দিবেন ; যাহা দিবেন, তাহা উত্তম-মধ্যম হইতে পারে, কিন্তু অধম হইবে না। শিশুরা যখন কোন-একটা জিনিস পাইবার জন্য আবদার জুড়িয়া দেয় তখন তাহাদের মন ভুলাইয়া অল্প কিছু দিয়া ঠাণ্ডা করিবার একটা কৌশল আছে ; মা বাপ জিনিসটির যৎসামান্য অংশকে বড় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ও শিশুর পক্ষে 'অতটা' পাওয়া উচিত নয় বলেন ; শিশুরা তখন সেই 'অতটা' পাইয়া বড়ই খুসী হয়। দাতা কি দিবেন তাহা জানিবার পূর্ব্বে আমরা দুএকজনের হাতে 'অতখানির' নামে কিছু কিছু দেখিতেছি, আর আমাদের বুড়া খোকারা সেই 'অতখানি' পাইব বলিয়া চতুরের হাতের কাগজে মোটা মোটা দস্তখত দিতেছে। আমাদের চাওয়ার উপর যখন কিছুই নির্ভর করে না, আমরা কি পাইব তাহা যখন কিছুই জানা নাই, তখন তফাৎ থাকাই সার কথা নয় কি ?

নেতারা বলিবেন যে তফাৎ থাকা অসম্ভব ; দাতার প্রতিনিধি স্বয়ং আমাদের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে আসিয়াছেন, আমরা আশ মিটাইয়া সকল কথা বলিব। রাজ-পক্ষের লোকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে হয়, স্বীকার করি ; কিন্তু আমার সন্দেহ যে কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। এখন সন্দেহ কেন হইল, তাহা বুঝাইয়া বলিতেছি। প্রথমে দেখুন, যে, আমরা কি চাই, তাহা শুনিতে কাহারও বাকী ছিল না ; আর হুকুম করিলে আমাদের সকল প্রদেশের সকল দেশের লোক আপনাদের আকাঙ্ক্ষার কথা লিখিয়া-পড়িয়া বিলাতে পাঠাইতে পারিতেন ; এ অবস্থায় কেবল আমাদের প্রাণের আশা ও মুখের ভাষা শুনিবার জন্য প্রতিনিধি মহাশয় যে এই বিপদ-আপদের দিনে এত দীর্ঘ পথ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন, তাহা যেন একটুখানি অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়। আমাদের এদেশের রাজনীতি-সমালোচনার হাঁড়ি বেশি-মাত্রায় উথ্‌লাইয়া উঠিয়াছিল, প্রতিনিধি মহাশয়ের হাতের তেলের ছিটায় অনেক উপকার হইয়াছে। আমরা এখন স্নেহ-সিক্ত গদ্‌গদনাদে ভারতসচিবকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার আগমনে সুফল ফলিয়াছে ; কিন্তু তিনি কি অজানা নূতন কথা শুনিতে আসিয়াছেন, তাহা বুঝি নাই। মুখে-মুখে কথা হইলে, তর্কে-বিতর্কে অনেক প্রশ্নের বিচার হইতে পারে বটে, কিন্তু মহামান্য সচিব মহাশয় যখন গোড়াতেই এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছেন, যে, তিনি কেবল শুনিবেন, কিছু বলিবেন না, তখন তর্ক ও বিচার চলিতে পারে না ; তাঁহার নিজের তর্ক কূট-প্রশ্নের (cross examination) আকার ধরিতে পারে, আর আমাদের মধ্যে একটা বিতর্কের ঝড় উঠিতে পারে। উহাতে কোন কথার বিচার হয় না, সন্দেহের কুয়াসা ঘুচিয়া আশার পথ পরিষ্কার হয় না। যাহা কানের ভিতর দিয়া গেল, তাহা কি-ভাবে মরমে পশিল, বোঝা যায় না। যাঁহারা অনেক দিয়াছেন, তাঁহারা যে ভবিষ্যতে আরও অনেক দিবেন, তাহা সকলেই জানি ও বিশ্বাস করি ; কিন্তু এবারকার দানে কি বিশেষত্ব থাকিবে, তাহারই আভাস পাইতে চাহিতেছি। আমাদের নেতারা হয়ত বলিবেন, যে, রাজপুরুষেরা পূর্ব্বেই সেকথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন। সেই স্পষ্ট কথাটি কি, তাহার আলোচনা করিতেছি।

উদ্দিষ্ট বচনটিতে আছে যে আমরা Responsible Government পাইব। কথাটিতে এ-প্রকার ধ্বনি নাই (থাকিতেও পারে না) যে এতদিনের শাসনতন্ত্রটা

Irresponsible বা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ছিল; তবে একথা ঠিক যে এই শাসনতন্ত্রের কোন অংশের পরিচালনাতেই এ দেশের প্রজাসাধারণকে দায়ী করা হয় নাই। দু একটি কথার পর এই মূলমন্ত্রটির বিচার করিতেছি। শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের 'অনেকখানি' যোগ বাড়িবে, আর সেই শাসনতন্ত্র 'দায়ী' হইবে; কিন্তু 'কাহার কাছে' ও 'কি ভাবে' দায়ী হইবে, সে কথা মূল বচনে নাই। আমাদের সুচতুর বাগ্মী নেতারা বলেন, যে, সেই কথাটি উহ্য আছে দেখিয়াই সুযোগ বুঝিয়া উহার কোল-টানা ব্যাখ্যা করিয়াছি। নেতারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে, ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্র ভারতের প্রজাসাধারণের কাছে দায়ী হইবে; অর্থাৎ বড়লাট ও জঙ্গীলাট প্রভৃতি এদেশের প্রজাসাধারণকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইবেন, ও প্রয়োজন হইলে প্রজা-সাধারণের বিচারে দণ্ডিত হইতে পারিবেন। সুচতুর নেতাদের কথা এই যে তাঁহাদের ব্যাখ্যাটা যখন মণ্টেগু মহাশয় ভুল বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই ও ঐ ব্যাখ্যা যখন তাঁহারা মণ্টেগু মহাশয়কে চেঁচাইয়া শুনাইয়াছেন, তখন ঐ ব্যাখ্যাকে ঠিক বলিয়া লইতে সকলেই বাধ্য হইবেন। আমি আইনজ্ঞ নেতাদের অন্ধ-ভক্ত (Blind admirer) বটে, কিন্তু সচিব মহাশয় যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে, তিনি তোমাদের যথা-অযথা সকল কথাই শুনিবেন কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বলিবেন না, তখন Estoppelএর আইনে রাজসরকারকে জড়াইয়া ফেলা চলিবে কি? আগেকার একটা পরিচিত অবস্থার দৃষ্টান্তে, 'দায়িত্বের পাত্র' সম্বন্ধে একটু বিচার করিব। আমাদের জেলার সরকারী শাসনকর্তারা যখন সহরের স্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাট রক্ষা করিতেন, তখন সে-সম্পর্কের সকল কাজের ঝুঁকি ও দায়িত্ব জেলার কর্তার উপরই পড়িত, আর জেলার কর্তারাই টেক্স আদায়ের জন্য সহরবাসীর অনুরাগ বা বিরাগের পাত্র হইতেন। তাহার পর যখন স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের আইন হইল, তখন জেলার কর্তাদের মনের মত ব্যবস্থাগুলি চালাইবার জন্য, যে বে-সরকারী মিউনিসিপালিটী হইল, সকল ঝুঁকি সেই মিউনিসিপালিটীর ঘাড়ে পড়িল; সহরের কাজ দুর্ব্বাক্য হাতের টিপে চলিতে লাগিল, আর টেক্স বসাইবার জন্য দায়ী ও গালি খাইবার পাত্র হইলেন মিউনিসিপ্যালিটীর বে-সরকারী সভ্যেরা। এই ক চালাইয়া যাঁহারা 'রায়-বাহাদুর' হইতেছেন, তাঁহারা [illegible] বলিতে পারেন, এক্ষেত্রে কে কাহার কাছে দায়ী। যাঁহা[illegible] কোন-প্রকার দায়িত্ব ছিল না, যাঁহারা কেবল জে[illegible] কর্তাকে সমালোচনা করিয়াই বিজ্ঞতা দেখাইতেন, তাঁহ[illegible] এ নূতন ব্যবস্থায় দায়ী হইয়া উঠিলেন; অর্থাৎ আ[illegible] একটা Responsible Local Self-governme[illegible] পাইলাম।

এখন পৃথিবী জুড়িয়া একটা মহাসমর চলিতেছে, অ[illegible] ইংরেজরা সেই যুদ্ধে ভিড়িয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে [illegible] করিতেছেন বলিতেছেন। সাধু চেষ্টার সহায়তার [illegible] আমাদের সকলেরই অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। যাঁহ[illegible] সরকারী চাকর নহেন, অথচ যাঁহাদের কথায় কিছু ক[illegible] হইতে পারে, সেইসকল গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে যখন সর[illegible] বাহাদুর অনুরোধ করিলেন, যে, তোমরা চেষ্টা করিয়া রা[illegible] রক্ষার জন্য সৈন্যদল রচনা করিয়া দাও, তখন এই [illegible] সরকারী ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা আপনাদের সুবিধা [illegible] অবকাশ অনুসারে গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছে[illegible] খুব বেশী কিছু করিতে পারেন নাই বলিয়া, ইঁহারা কে[illegible] বিশেষ ঝুঁকি বা দায়িত্বে পড়েন নাই। এখন দে[illegible] লোকেরা কেবল সমালোচক, কিন্তু কাজ সরবরাহের [illegible] 'দায়ী' নহেন। এরূপ অবস্থায় যে Responsib[illegible] Governmentএর কথা উঠিয়াছে, তাহা সকলের কা[illegible] একই অর্থে সুস্পষ্ট না হইতে পারে। যে কথার নানা [illegible] হইতে পারে, তাহার সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা হওয়া উচিত ছি[illegible] আমাদের 'ঘোড়া দেলায়-দে রাম' প্রার্থনাটিতে রাম [illegible] উল্টা না বুঝেন।

প্রশ্নকর্তার কোন প্রশ্নের জবাব দিবার পূর্ব্বে প্রশ্নের [illegible] বুঝিয়া লওয়া উচিত। আমরা নিজে পরের কথার কো[illegible] টানা অর্থ করিয়া যখন লাভবান হইতে পারি না, ত[illegible] কি বক্তাকে তাঁহার ব্যবহৃত কথাটির অর্থ বুঝাইয়া দি[illegible] অনুরোধ করিতে পারি না? তিনি ভবিষ্যতে কি দি[illegible] বা না দিবেন তাহা না বলিতে পারেন, কিন্তু তিনি মু[illegible] যে শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার যখন নিশ্চয়ই এক[illegible] সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকা চাই, তখন সে অর্থটা প্রকাশ

করিলে চলিবে কেন? প্রশ্ন না বুঝিয়া আমরা কেমন করিয়া তাহার উত্তর দিতে অগ্রসর হইব? হেঁয়ালি জিনিসটি দার্শনিক ধর্ম্মতত্ত্বেই শোভা পায়; কারণ উহাতে যে তত্ত্ব-বিদ্যার সাহিত্য বাড়িয়া উঠে, তাহা কেবল কর্ম্মবিমুখ মহাপুরুষদেরই উপভোগ্য।

রাষ্ট্র-শাসনের যে-প্রকারের ব্যবস্থা হইলে দেশের সকল লোকের কাছেই উন্নতিলাভের সুবিধাগুলি সমানভাবে উন্মুক্ত থাকে, সে ব্যবস্থার সহিত আমাদের সচিব মহাশয় ও রাজন্যবর্গ অত্যধিক পরিচিত। মানুষ যাহাতে কোনরকমে তাহার উন্নতির পথে বাধা পায়, কোন দেশের শাসনেই তাহা রক্ষা করা চলে না; ক্ষমতা থাকিতেও কোন এক শ্রেণীর লোক শ্রেণীবিশেষের কাছে খাটো হইয়া থাকিবে, ইংলণ্ডে এমন কোন ব্যবস্থা নাই। পেটের ভাত জুটিলে মানুষের আয়ু কমে, অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবিলে মনুষ্যত্ব বাড়ে, আত্মসম্মানের বোধ হারাইলে চরিত্রের ভিত্তি দৃঢ় হয়,—এরূপ মূলমন্ত্রের সাধনার সহিত আমাদের শাস্তা-জাতির লোকেরা পরিচিত নহেন। বিদ্যালয়ে এত ছাত্র পড়িতে আসিল কেন, এত ছাত্র অমুক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল কেন,—পার্লামেণ্টে এমন কোন প্রশ্ন তুলিয়া ইংলণ্ডের কোন লোককে কেহ চাপিয়া রাখিবার কল্পনাও করিতে পারে না। যদি দৈবাৎ কোন লোক পার্লামেণ্টে বলে যে দেশের লোক ভুল করিয়া অনেক লেখাপড়া শিখিয়াছে, আর তাহারা কি করিয়া দু পয়সা রোজগার করিতে পারিবে না-জানিয়া মিছাই গোল পাকাইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, তাহা হইলে বক্তাকে নিশ্চয়ই পাগ্‌লা গারদে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইবে। যদি দুদশ জন লোক একসঙ্গে জুটিয়া বলে, যে, তাহাদের রোজগারের ক্ষমতা আছে কিন্তু পন্থা নাই, তাহা হইলে পার্লামেণ্টে তোলপাড় পড়িয়া যায়; কেমন করিয়া নূতন রোজগারের পন্থা খুলিয়া মানুষের প্রাণ বাঁচাইতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। তোমরা অল্প খাইয়া তুষ্ট থাকিবার অভ্যাস ছাড়িয়া দিলে কেন, অথবা নূতন আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া নিজের দোষে ভুগিতেছ কেন, অথবা আর যখন চাকরী নাই তখন তোমরা ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা করিয়া দুঃখের শরশয্যায় শুইয়া মরিবে না কেন, এমন কথা কেহ কাহাকে বলিবে বলিয়া স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। কেবল housing the poor নহে, homing the poorএর জন্যও কোটী কোটী টাকা খরচ করিবার আয়োজনে ইংলণ্ড ব্যস্ত হইয়াছে। কাজেই বলিতে পারি যে শাসনের কি ব্যবস্থা করিলে মানুষ বাঁচে ও বড় হয়, তাহা কাহারও জানিতে বাকি নাই। মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িবার শাসন, কখনও যে দেশভেদে স্বতন্ত্র হইতে পারে, একথা কি কেহ কখনও সাহস করিয়া বলিতে পারে? তবে এদেশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া; যাহাতে চিরদিন এই দেশটি জেতাদের হাতে সুরক্ষিত থাকে, সে ব্যবস্থা করিতেই হইবে; আমরা যতই চেঁচাইয়া হাত পাতিনা, ছাতি পাইয়াছি বলিয়াই হাতী পাইব না।

'আরও চাই' বলিলে কাঁদিয়া হাত পাতিতে হয়, আর বিশেষ অধিকারের ভিক্ষা করিলে জোড়হাতে সবিনয়ে বুঝাইয়া বলিতে হয়। আমরা যাহা ভিক্ষা চাহিতেছি তাহা দিলে রাজকোষের ক্ষতি হইবে না, এ দেশের রাজার জাতির লোকের স্বার্থে বাধা পড়িবে না, ও চিরদিনের জন্য ইংলণ্ডের শাস্তিপূত স্বর্ণ-সিংহাসনখানি ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার পক্ষে তিলমাত্রও বাধা ঘটিবে না—এইরূপে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলে আমরা যাহা লাভ করিতে পারি তাহা আমাদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ; কিন্তু সে সম্পদকে Home Rule নাম দিলে মিথ্যা কথা শিখিতে হয় ও মিথ্যার সাধনা করিতে হয়।

ইংরেজ যদি অকপটে বুঝিতে পারিতেন যে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ার লোকেরা ঠিক ইংরেজ-জাতির লোকের মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ণগৌরব রক্ষার জন্য উৎসাহী ও সচেষ্ট, তাহা হইলে কেবল দেশের নামের বিচারে মানুষের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কথা উঠিত না। ইংরেজের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গৌরবরক্ষার জন্য ব্রিটিশ কলোনীর লোকের যে স্বাভাবিক প্রাণের টান আছে, যদি এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার লোকের প্রাণেও তাহা আছে বলিয়া ইংরেজের বিশ্বাস জন্মে, তবে শাসনতন্ত্র চালাইবার কার্য্যবিধি লইয়া বেশী গোল উঠিবে না। কিন্তু আমাদের নেতামহাশয়েরা যখন তাঁহাদের বুকের পাটার প্রদর্শনীতে বলিলেন, যে, যে-সকল ইংরেজ এখানে ব্যবসাবাণিজ্য করিতে আসিয়াছে, তাহারা বোঁচকা বাঁধিয়া জাহাজে উঠুক, অথবা যখন বলিলেন, যে,

Home Rule হাতে পাইলে উঁহারা ঐ বণিক-সম্প্রদায়কে যাহা আছে তাহার কিছু

মজা দেখাইবেন, তখন ইংরেজেরা আমাদের গাছে উঠিবার আগেই বড় এক কাঁদি পাইবার লোভ দেখিয়া অনেককেই চিনিয়া ফেলিয়াছে। শনির তাড়নাতেই ভিক্ষুকের কণ্ঠে দুষ্ট সরস্বতী বসিয়া থাকেন। ভিক্ষার জোরে আমাদের পক্ষে কতদূর পাওয়া সম্ভব, কর্ত্তব্যের খাতিরে ইংরেজের পক্ষে আমাদিগকে কতদূর দেওয়া সম্ভব, এ-সকল কথা বিচার করিয়াই আশার মাত্রা বাড়াইতে বা কমাইতে হয়; নহিলে অযথা কল্পনার মোহে পড়িয়া কষ্ট ভুগিতে হয়। কাল্পনিক কথা লইয়া আপনাদের মধ্যে দলাদলি পাকাইলে সুফল ফলিবে না। ইংরেজ-সরকার যখন সত্য-সত্যই কিছু দিতে বসিবেন, আর সেই দানের সময় যদি আমাদিগকে কোন কথা কহিবার সুবিধা দেন, তাহা হইলেই সমালোচনা চলিতে পারিবে। অমুক অধিকার দিলেন না, কেন না আমরা অযোগ্য—এরূপ কথা বলিলে আমরা তর্ক করিয়া বুঝাইতে পারি যে আমরা অযোগ্য নহি। একথা ইংরেজও জানেন আমরাও জানি, যে, কাজ না করিলে কেহ কাজের যোগ্য হয় না, ও দেশের কাজের ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে না পড়িলে কাহারও দায়িত্ববোধ জন্মে না। মানুষ উচ্চ চাকরী করিলেও যে সে চাকরই থাকে, সে কথাও ইংরেজকে বুঝাইতে হইবে না। জেতাজাতির লোকেরা চাকর হইয়াও অনেকখানি কর্ত্তাগিরি করিতে পারেন; এই জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরেজ মুনিব পাইলে এ দেশের লোকের বেশী উপকার হয়। শাসনের মূলতন্ত্র পরিবর্ত্তিত না হইলে যে দেশের লোকে দেশী হাকিম অপেক্ষা বিদেশী হাকিম পাইয়া বেশী খুসী হইবে, সে কথাও দেশের ভুক্তভোগীরা বিলক্ষণ জানেন। আমাদের বাগ্মীরা অনেকেই সংসার-অনভিজ্ঞ না হইলে এংলো-ইণ্ডিয়ানদের এ উক্তিকে পরিহাস করিতেন না, যে, কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের দেশের লোকেরা উঁহাদের প্রতি অধিক অনুরক্ত। অবস্থার ফলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ষোল আনা বুঝিয়া না লইলে চলিবে না; কলিকাতার বালকেরা হাতে তালি দিলেই কোন বচনের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। আমরা যদি অন্যের হাতের কলকাঠির চালনাতেই চলিতে বাধ্য, তাহা হইলে আমাদের লব্ধ অধিকারের প্রকৃতি বদলাইবে না, কেবল অধিকারে দেশের সুখ বাড়িবে না, কর্মক্ষেত্রে দেশের লোকেরা ইংরেজ মুনিব ধরিয়া যে সুবিধা পাইবে দেশী কর্ত্তা বাড়িলে সে সুবিধা বাড়িবে না। যদি আমাদের আইনজ্ঞ বক্তারা দেশের কর্ম্মচারী-মহলে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ চালান, তবে এ তথ্য পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারিবেন।

শাসনের কল-কাঠিটি যে আমাদের হাতে ছুঁইবার যোগ্যতা নাই, এই কথাই স্বয়ং আমাদের নেতামহাশয়েরা মণ্টেগুমহাশয়কে শুনাইয়া আসিয়াছেন আর বাড়ীতে ফিরিয়া জাঁক করিয়া বলিতেছেন যে এবার আমরা 'হোমরুল' হাসিল করিব। প্রশ্ন উঠিল, যে, যুদ্ধ চালাইবার যে নীতি ও ব্যবস্থা আছে তাহা ভারতবর্ষের লোকেরা হাতে লইতে চাহে কি না; আমাদের নেতারা উত্তর করিলেন, যে, সে কাজটা ইংরেজের হাতেই থাকুক। রাষ্ট্ররক্ষার মহাবিপদের দিনে যাহারা মূলমন্ত্র আঁটিয়া ও নীতি রচনা করিয়া যুদ্ধ চালাইবে তাহাদের হুকুম মানিয়া যদি লোক ও টাকা সংগ্রহ করা না হয়, তবে কোন কাজই চলিতে পারে না;—টেক্স বসাইবার কর্ত্তারা ও দেশের সাধারণ শান্তি রাখিবার কর্ত্তারা যদি স্বাধীন ব্যবস্থা চালাইতে থাকেন, যদি যুদ্ধনীতি ও সাধারণ শাসননীতি একই পরিচালকের হাতে চালিত না হয়, তবে ভারত-মহাসাগরের হাঁটুজলের কূলেই আমাদের নৌকা ডুবি হইবে। আমরা যে যুদ্ধ-নীতির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া, প্রবর্ত্তিত নীতির উপযোগিতা ও গুরুত্ব না বুঝিয়া, সামরিক ব্যাপারটাকে ভণ্ডুল করিয়া দিতে চাই, তাহা আমাদের বিপুল-আয়তন কংগ্রেস-শরীরের শ্বেতমুণ্ডের রাঙামুখে সুবোধ্য ইংরেজী ভাষায় শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। ভারতনেত্রী বেশান্ত ঠাকুরাণী সরকারী কাগজপত্র থেকে যুদ্ধের খরচের একটা দীর্ঘ তায়দাদ তুলিয়াছেন, ও বলিয়াছেন, যে, যদি এদেশে হোমরুল থাকিত, তবে Imperial রাজদরবারে ঐ-সকল সামরিক ব্যাপারের জন্য আমরা টাকা দিতাম না অথবা অনেক কম করিয়া দিতাম। টাকার হিসাবের কড়াক্রান্তি বুঝাইতে গিয়া তাঁহার অতিদীর্ঘ বক্তৃতার এক তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হইয়াছে। তিনি যদি কেবল মোটামুটি ঐ বড় খরচের অঙ্কটা বসাইতেন, তাহা হইলেও ক্ষতি

ছিল না ; কারণ যে কারণে যুদ্ধগুলি বাধিয়াছিল, তাহা যে কাল্পনিক কারণ তাহা তিনি প্রমাণ করেন নাই, ঐ যুদ্ধগুলি যুদ্ধবাধিবার পূর্ব্বেই যুদ্ধচালকেরা ভারত-রক্ষার জন্য যে নিরর্থক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধে প্রমাণিত হয় নাই। কাজেই দেখিতেছি তাঁহার বক্তৃতায় দীর্ঘ দেউলের এই তেহাইটুকু জ্ঞান-সলিলেই ডুবাইয়া রাখিলে ক্ষতি ছিল না। যেখানে Imperial রাজদরবারের প্রাণের টান আছে, সেখানে যদি এদেশের Home Governmentএর কোন টান না থাকে, তবে কেমন করিয়া এক মহানীতিতে বিপুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা হইতে পারে, সেকথা নেত্রীঠাকুরাণী আমাদিগকে বুঝাইবার অবসর পান নাই। ইংরেজ-সরকার আমাদিগকে কি দিতে চাহিতেছেন তাহা জানিবার পূর্ব্বেই আমরা নিজেরা নানা কথায় আপনাদিগকে ধরা দিতেছি কেন ? এই ভারত-জাতির মাথা তুলিবার পথে যাহা কিছু বাধা, তাহাই ত সরাইয়া দিবেন বলিয়া ইংরেজ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বা হইবেন, মনে করা যায়। ইহার জন্য যদি ভারতের উচ্চতম শাসনকর্ত্তার পদ পর্য্যন্ত এ দেশের লোকের অধিকারে দিতে হয়, ইংরেজ তাহা (প্রতিশ্রুতির মূলমন্ত্র বা Principle অনুসারে) দিবেন বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। একটা জাতিকে মানুষ হইতে হইলে যে কি চাই, ইংরেজ যখন তাহা জানেন, তখন অন্যের হাতের কল-কাঠির অধীনে আমরা কতখানি নড়িতে-চড়িতে পাইব, তাহার একটা দীর্ঘ ফর্দ্দের মুসাবিদা করিয়া ফল কি ? যে-কোন বিভাগে হউক, যে-কোন কাজে হউক, আমরা অবাধগতিতে অগ্রসর হইতে পারিব, এ কথার প্রতিশ্রুতি চাই ; আর এই প্রতিশ্রুতির অনুরূপ কাজ দেখিতে চাই। ইংলণ্ডের সকল লোকই যুদ্ধ-চালাইবার কাজের কর্ত্তাগিরি জানে না, কিন্তু সমর-বিভাগে কাহারও প্রবেশের অনধিকার নাই বলিয়া, কাজের সময় সেখানে কাজের লোক পাওয়া যায়। এই মুহূর্ত্তেই আমাদের বঙ্গের হাটে জঙ্গী লাটের সওদা না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সমরবিভাগ হইতে আমরা হাত গুটাইতে চাহিব কেন ? আমরা আপাতক্ এতখানি পাইলাম, পরে অতখানি পাইব, এসকল কথা কোন্ নীতির সূত্র ধরিয়া বলিতেছি বা বলিতে পারি ? কর্ম্মক্ষেত্রে যেখানে সকলের সমান প্রবেশ-অধিকার থাকে, তখন যেজন কাজ শিখিয়া বড় (senior) হয়, যে দক্ষ হয়, সেই কর্ত্তাগিরি পায়। এ নিয়মে ৫ বছরেও কর্ত্তাগিরি জুটিতে পারে, বিশ বছরেও জুটিতে না পারে ; কিন্তু আমরা কি ওজুহাতে ও কি নীতিতে একটা পরীক্ষার সময় বা শিক্ষানবীশির সময় চাহিতেছি তাহা ত পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল না।

সামরিক বিভাগের কথাটা উঠিয়াছিল বলিয়াই ঐ কথাটার বিচার করিলাম ; নহিলে আমাদের অক্ষমতার হিসাবে আরও অনেক বিভাগের কর্ত্তাগিরির কথা তুলিতে পারা যাইত। আমরা শিখি নাই বলিয়াই যে শিখিবার প্রয়োজন, আমাদের অবাধগতির অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই বলিয়াই যে আমাদিগের বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হইয়া পা ফেলিবার প্রয়োজন, ইহা ত বোকায়ও বোঝে। দেশের দায়িত্ব মাথায় করিয়া কেহ কখন কাজ করি নাই বলিয়া সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ঝগড়া আছে, ঘরে-ঘরে বিবাদ আছে ; যোগ্যতা দেখাইবার উৎসাহে আমরা মিথ্যা কথা বলিব কেন ? আমরা যথার্থ ঝগড়া বিবাদ অস্বীকার করিব কেন ? কাজের মানুষ না হইলে ও কাজে না ভিড়িলে যে দোষ শত সহস্র "গুণসন্নিপাতে"ও নিমজ্জিত হয় না, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কেহ জাত মারিতে পারিবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যে, যদি সকলেই মনে করিয়া থাকেন যে চেঁচাইয়া হাতী চাহিলে নিদান পক্ষে ছাতিটি মিলিবে আর এই ভিক্ষায় যাহা কিছু পাইব তাই পরম লাভ হইবে, তাহা হইলে বক্তৃতা চলিতে থাকুক, কিন্তু ভিক্ষা চাহিবার সুরটি যেন বে-পরদা না হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে কথা এই যে, যখন ইংরেজ-সরকার কি প্রয়োজনের তাড়নায় কোন্ নীতির বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে কিছু দিতে চাহিতেছেন, তাহা জানা নাই, তখন দাতার মুখে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা না শুনিয়া কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা এই জাতির উন্নতির পক্ষে হিতকর, অর্থাৎ যাহা বিশ্বজনীন, তাহাকে নিশ্চয়ই বিশ্বজনীন অর্থাৎ সাধারণের প্রাপ্য করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। এই ভারত-জাতির পক্ষে যাহা উন্নতির বাধা, তাহা যদি প্রাণের দায়ে ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করিতে পারি, তবে দেশের

লোকেরও শিক্ষা হইবে, ইংরেজকেও সাধুনীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে এই লাভ হইবে, যে, এই জাতিকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে যাহা চাই তাহা যদি কোন বিশেষ কারণে ইংরেজ-সরকার তাড়াতাড়ি দিয়া উঠিতে না পারেন, তবে উহার যতখানি নিজেদের কর্ম্মে ও উদ্যোগে লাভ করা যাইতে পারে ততটুকু লাভ করিবার জন্য দেশের লোক উদ্যোগী হইবে। ইংরেজের দান হাতে পাইলে আমরা সেই দানের পুণ্যে আপনাদের সামাজিক দুর্গতি দূর করিব এরূপ নির্বুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধির কথা অলস কাপুরুষের মুখেই শোভা পায়। ইংরেজ যখন এদেশের অধিকার ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করেন নাই বা করিবেন না, তখন আমাদের অধিকার যত অধিক হউক না কেন, উহা কলের চাবির মোচড়ে শাসিত হইবে। যতদিন না বুঝাইতে পারি, যে, এদেশের ও ইংলণ্ডের ইংরেজদের-স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের কোন বিরোধ নাই, ততদিন আমাদের অধিকারের পরিমাণ লইয়াই কিছু কিছু বিচার হইবে কিন্তু ইহার প্রকৃতি তিলমাত্রও বদ্‌লাইবে না। যতদিন সেকথা বুঝাইতে না পারিতেছি, ততদিন একজাতি হইবার পথে ও মানুষ হইবার পথে আমাদের নিজেদের হাতে সরাইবার মত আর যে-সকল বাধা বিঘ্ন আছে তাহা যেন অবিরত-চেষ্টায় দূর করিতে চেষ্টা করি। এ ব্রতে রাজনীতির চেয়ে সমাজ-নীতি অধিক ফলপ্রদ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কাণ্টে বেদান্তে বোঝা-পড়া

কাণ্টের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-তত্ত্বের গোড়া'র বৃত্তান্তটি এই :—

"We call sensibility [ইন্দ্রিয়-বৃত্তি] the receptivity of our soul, or its power of receiving representations [or its বিষয়-গ্রহণী শক্তি] whenever it is in anywise affected [whenever বিষয়-দ্বারা উপরক্ত হয়], while the understanding [ধীশক্তি], on the contrary, is with us the power of producing representations [understanding — বিষয়ের উদ্ভাবনা-শক্তি অথবা, যাহা একই কথা, ভাবনা-শক্তি], or the spontaneity of knowledge [or জ্ঞান-ক্রিয়ার স্বাভাবিকী স্ফূর্ত্তি]."

জিজ্ঞাসু॥ কাণ্টের এ কথা যদি সত্য হয় যে, বুদ্ধি—বিষয়ের উদ্‌ভাবনা-শক্তি, তবে অর্থাভাবে ম্রিয়মাণ দীন-দ্বিজদিগের বিজ্ঞান-ময় কোষে তো বুদ্ধির অভাব নাই—তাঁহাদের **ধন-কোষের** এরূপ হীনাবস্থা কেন। মনে করিলেই যদি তাঁহারা বুদ্ধির প্রভাব দ্বারা প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রাদি উদ্‌ভাবন করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের খাঁক্তি পূরণের এমন সহজ উপায় থাকিতে তাঁহারা ভিক্ষার ঝুলি হস্তে করিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া বেড়া'ন কেন?

প্রবোধয়িতা॥ দীনদ্বিজ-বিদ্যাবাগীশ যদি তাঁহার প্রতিবাসী লক্ষপতি সওদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে বিশ ভরি কাঞ্চন দান প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ-ভরে মনে করেন যে ইহার দুই ভরি হইতে ব্রাহ্মণীর জন্য দুই গাচি বালা স্যাক্‌রাকে দিয়া গড়াইয়া লওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তবে **যে মাপের** এবং **যে-ছাপের** বালা যেমন-তর সুন্দর মানান্‌-সই করিয়া গড়াইয়া লইতে হইবে তাহা তিনি বুদ্ধি খাটাইয়া মনোমধ্যে উদ্ভাবন করিতে পারেন না কী? অবশ্যই তিনি তাহা পারেন। ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণ আর কী হইতে পারে যে, বিদ্যাবাগীশের বুদ্ধি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উদ্ভাবন-কার্য্যে অণুমাত্রও বাধা অনুভব করে না?

জিজ্ঞাসু॥ চাহিলাম আমি **বিষয়ের** উদ্‌ভাবনা শক্তি—দিলেন আপনি **বিশেষ একপ্রকার বিষয়ের** উদ্‌ভাবনা-শক্তি—মনঃকল্পিত বিষয়ের উদ্‌ভাবনা-শক্তি! চাহিলাম আমি **অন্ন**—দিলেন আপনি **বিশেষ একপ্রকার অন্ন**—দিলেন সেই সপ্ত জাতির প্রাণধারণোপযোগী **অদৃশ্য অন্ন** যাহার আর এক নাম **বাতাস**! বিদ্যাবাগীশ-খুড়ো যাহা মনোমধ্যে উদ্‌ভাবন করিতে বাধা অনুভব করেন না, তাহা বিষয়ের প্রতিরূপ মাত্র ভিন্ন সত্যসত্যই কিছু-তো-আর **বিষয়** নহে।

প্রবোধয়িতা॥ কাণ্টের গোড়া'র কথাটির সম্বন্ধে এই যে একটা খট্‌কা তোমার মনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে তাহার জন্য তোমাকে আমি আঁদবেই দোষ দিই না—

দোষ দিই আমি কাণ্টের কাণ্ড-কারখানাকে। তাঁহার প্রণীত মূল দর্শন-গ্রন্থটির নাম যখন তিনি দিয়াছেন "বিশুদ্ধ জ্ঞানের পর্য্যালোচনা", তখন তাঁহার উচিত ছিল, অবশ্য, বিশুদ্ধ জ্ঞানের গোড়া'র তত্ত্বটি হইতে যাত্রারম্ভ করা ; তাহা না করিয়া—যাত্রারম্ভ করিয়াছেন তিনি দেশ-কালাবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকলের সহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের সম্বন্ধ-পর্য্যালোচনা হইতে। তিনি এইপ্রকার বিপরীত প্রথা অবলম্বন করা'তে তাহার ফল এই হইল যে, আষাঢ়-শ্রাবণের ভরা-গঙ্গার বিশুদ্ধ জল যেমন গৈরিক-মিশ্রিত বিবর্ণ জলের অনেক হাত নীচে চাপা পড়িয়া যায়, তাঁহার অভিপ্রেত বিশুদ্ধ জ্ঞানের গোড়া'র তত্ত্বটি তেম্নি বৈজ্ঞানিক মূল-তত্ত্ব-নিচয়ের অনেক হাত নীচে চাপা পড়িয়া গেল। এই কারণেই, নূতন ব্রতীরা যখন কাণ্টের গোড়া'র কথা-গুলির নিগূঢ় তাৎপর্য্যের ভিতরে তলাইতে গিয়া হাবুডুবু খাইতে-খাইতে ডাঙায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহাদের তখন অনেকক্ষণ লাগে লুপ্তাবশিষ্ট চেতন পুনঃপ্রাপ্ত হইতে। তা ছাড়া—কাণ্টের দার্শনিক ভাষার ভঙ্গীভাব দেখিলে নূতন ব্যক্তিদিগের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সকলের ভুয়োদর্শন হইতে মনুষ্যের মনোমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-ঘটিত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান যতকিছু উৎপন্ন হয়—কাণ্টের ভাষায় তাহার নাম empirical consciousness ; আর, সেই-সকল বিভিন্ন-বিষয়-ঘটিত বিভিন্ন জ্ঞানের মূলে একই অভিন্ন জ্ঞান যাহা *a priori*, অর্থাৎ গোড়া হইতেই, বর্ত্তমান রহিয়াছে—কাণ্টের ভাষায় তাহার নাম "transcendental consciousness"। আবার "সূর্য্যালোকের একত্ব যেমন সূর্য্যের একত্বেরই আর-এক নাম—বহুধা-বিভিন্ন empirical consciousness-সমূহের গাঁথন-সূত্রের একত্ব, তেম্নি, একই অভিন্ন transcendental consciousnessএর একত্বেরই আর-এক নাম"—এতগুলি কথা এক-কথায় বলিয়া খালাস হইবার মানসে কাণ্ট্ শেষোক্ত একত্বের (অর্থাৎ গাঁথন-সূত্রের একত্বের) নাম দিয়াছেন synthetical unity of apperception ("apperception" কিনা consciousness)। এই synthetical unity of appreceptionই, কাণ্টের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ গোড়া'র তত্ত্ব। কাণ্ট্ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন,—

"The highest principle of the possibility of all intuition in relation to the understanding is, that all the manifold in the intuition must be subject to the condition of the original synthetic unity of apperception."

ইহার কিয়ৎপরে বলিতেছেন—

"The first pure cognition of the understanding, therefore, on which all the rest of its employment is founded, and which at the same time is entirely independent of all conditions of sensuous intuition, is this very principle of the original synthetical unity of apperception.

Transcendental consciousness সম্বন্ধে কাণ্ট্ বলিয়াছেন এইরূপ :—

"All empirical consciousness has a necessary relation to a transcendental consciousness, which precede all single experiences, namely, the consciousness of my own self as the original apperception. It is absolutely necessary therefore that in my knowledge all consciousness should belong to one consciousness of my own self,............ The synthetical proposition that the different kinds of empirical consciousness must be connected in one self-consciousness, is the very first and synthetical foundation of all our thinking."

ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, কাণ্ট্ বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই গোড়া'র কথাটি (অর্থাৎ transcendental consciousnessএর কথাটি) তাঁহার মূলগ্রন্থের একস্থানে পাদ-টিপ্পনীর মধ্যে অর্থাৎ foot-noteএর মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছেন ; পরন্তু, শ্রীমদ্ ভারতী-তীর্থ বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর ঐ কথাটি তাঁহার প্রণীত পঞ্চদশী-নামক বৈদান্তিক পুস্তকের গোড়াতেই অবতারণ করিয়া তাহারই উপরে পরম পরি-শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের গোড়াপত্তন করিয়াছেন। মুনীশ্বর-স্বামী তত্ত্ব-বিবেকের দুরারোহ পার্ব্বত্যপথের যাত্রীদিগের জন্য সুখারোহ সোপান-শ্রেণী গাঁথিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন এইরূপ :—

তত্ত্ববিবেক-শিরস্ক
পঞ্চদশীর প্রথম পরিচ্ছেদের
নয়টি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ।

মহামোহ এবং তাহার কার্য্য-কলাপ-রূপ কুম্ভীরকে গ্রাস করাই যাহার একমাত্র কার্য্য—শ্রীশঙ্করানন্দ গুরুর সেই পাদপদ্মকে নমস্কার। তাঁহার পাদপদ্ম-যুগলের সেবায়

দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে—তাঁহাদের যাহাতে সহজে তত্ত্বজ্ঞান করায়ত্ত হইতে পারে সেই উদ্দেশে জ্ঞাতব্য তত্ত্বটিকে বিবেকদ্বারা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখানো যাইতেছে।

জাগ্রৎকালে শব্দস্পর্শাদি বেদ্য বস্তুসকল [manifold of intuition] বিভিন্ন প্রকার, আর, সেইজন্য, পৃথক্ পৃথক্; পরন্তু তৎতদ্‌বিষয়ক সম্বিৎ'কে [consciousnessকে] তৎতদ্ বিষয় হইতে বিভক্ত করিয়া লইলে [অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি-ঘটিত সম্বিৎকে শব্দস্পর্শাদি বিষয় হইতে বিভক্ত করিয়া লইলে] সেই বিভিন্নরূপা সম্বিতের মধ্য হইতে [অর্থাৎ manifold empirical consciousnessএর মধ্য হইতে] বিষয়-ঘটিত ভেদ অপসারিত হইয়া-গিয়া অভিন্ন-রূপা একমাত্র গোড়া'র সম্বিৎ [Transcendental consciousness] উদ্‌বৃত্ত হয়।

স্বপ্ন-কালেও তাই :—প্রভেদ কেবল এই—যে, স্বপ্ন-কালে বেদ্যবস্তু-সকল অব্যবস্থিত—জাগ্রৎকালে বেদ্যবস্তু-সকল সুব্যবস্থিত; দুই কালের দুইরূপ সম্বিৎকে দুই কালের দুইরূপ বিষয় হইতে বিভক্ত করিয়া লইলে, সেই দুই বিভিন্ন রূপা সম্বিতের মধ্য হইতে বিষয়-ঘটিত ভেদ অপসারিত হইয়া-গিয়া অভিন্ন-রূপা একমাত্র গোড়া'র সম্বিৎ [অর্থাৎ transcendental consciousness] উদ্‌বৃত্ত হয়।

সুনিদ্রার আরাম-শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ স্মরণ হয় যে, "কা'ল রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম—কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি চলিয়া গেল তাহা আমি জানিতেও পারি নাই।" এটা যখন স্থির যে, পূর্ব্বে যাহা সম্বিতে [অর্থাৎ consciousnessএ] অনুভূত হইয়া চুকিয়াছে—পশ্চাতে তাহারই স্মরণ সম্ভবে, তখন, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হইতেছে সেই যে ভূতপূর্ব্ব সুনিদ্রার সুখভোগ, সেই সুখ-ভোগের বর্ত্তমান টাট্‌কা অবস্থায় তাহা তাঁহার সম্বিতে অনুভূত হইয়াছিল। তবেই হইতেছে যে সুনিদ্রার সুখ-ভোগ সুষুপ্তি-কালীন সম্বিতের অনুভব-গম্য বিষয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি-কালের তিন বিভিন্ন-রূপা সম্বিৎ'কে ঐ তিন কালের তিন প্রকার বিষয় হইতে বিভক্ত করিয়া লইলে সেই তিন বিভিন্ন-রূপা সম্বিতের মধ্য হইতে ভেদ অপসারিত হইয়া-গিয়া অভিন্ন-রূপা একমাত্র গোড়া'র সম্বিৎ—transcendental consciousness উদ্‌বৃত্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সম্বিতের বিষয় হইতেই সম্বিৎ ভিন্ন, তা বই, সম্বিৎ হইতে সম্বিৎ ভিন্ন নহে। একদিনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকালের বিভিন্ন-রূপা সম্বিৎ যেমন স্বরূপত একই অভিন্নরূপা গোড়া'র সম্বিৎ বই না—দুই বা ততোধিক দিনের বিভিন্ন-রূপা সম্বিৎও, তেম্নি, স্বরূপত একই অভিন্ন-রূপা গোড়া'র সম্বিৎ বই না [অর্থাৎ সব সম্বিৎই স্বরূপতঃ transcendental সম্বিৎ]। মাস, অব্দ, যুগ, কল্প, অনেকধা গতাগত হইতেছে—স্বয়ম্প্রভা গোড়া'র সম্বিৎ কেবল অ্যাক্‌। উদয়ও জানে না—অস্তও জানে না। ইনিই (অর্থাৎ এই গোড়া'র সম্বিৎই) পরমানন্দ-স্বরূপ আত্মা। ইহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতেছি কেন? না যেহেতু ইনি প্রেমের বস্তু। প্রেমের বস্তুকে নিরন্তর নিকটে পাইলে কে না আনন্দিত হয়।* আত্মার এই যে একটি স্বভাবসিদ্ধ ইচ্ছা—যে, "আমি যেন চিরকাল বর্ত্তিয়া থাকি—কোনো-কালেই যেন বিনাশ না-পাই"—ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ আর কী হইতে পারে যে, আত্মা আপনাকে আপনি ভালবাসে, আর সেইজন্য, আপনার প্রেমের বস্তু এক মুহূর্ত্তও আত্মার কাছ-ছাড়া নহে; তাহাতে আবার, আত্মার জন্যই কেবল-যখন আত্মাকে ভালবাসা সম্ভবে, তা বই, অনাত্মার জন্য আত্মাকে ভালবাসা সম্ভবে না, তখন, আত্মা আপনার প্রেমের বস্তু শুধু না—আত্মা আপনার মুখ্যতম প্রেমের বস্তু—পরম প্রেমের বস্তু। এটা যখন স্থির যে, আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমের বস্তু, আর, সেইজন্য, আপনার প্রেমের বস্তু এক মুহূর্ত্তও আত্মার কাছ-ছাড়া নহে, তখন, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, আত্মা পরম আনন্দ সাক্ষাৎ বিরাজমান। এমতে পাইতেছি—

* কোনো-একটি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের এক স্থানে লেখা আছে যে, দূরগতা সীতার বিরহে রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন—"হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ-ভীরুণা। ইদানী মাবয়ো র্মধ্যে সরিৎ-সাগর-ভূধরাঃ॥" "ব্যবধানের ভয়ে আমি গলায় হার পরিতাম না—এখন আমা-দুজনার মধ্যে সরিৎ-সাগর-ভূধরের ব্যবধান।" এমতাবস্থায় সীতাদেবীকে নিকটে পাইলে রামচন্দ্রের কত না আনন্দ হইত?

(১) আত্মা = স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ = চিৎ

(২) আত্মা = পরম প্রেমের বস্তু = সৎ

(৩) প্রেমের বস্তু জ্ঞানে প্রকাশিত হইলে অথবা, যাহা একই কথা—সৎ এবং চিৎ মাখামাখি-ভাবে একীভূত হইলে—উভয়ের মধ্যস্থলে আনন্দের কপাট আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া যায়। যুক্তি দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ = অন্তরতম আত্মা = সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। বেদান্ত-শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেও তা'ই *॥" অনুবাদ সমাপ্ত॥

পঞ্চদশীর অভিপ্রেত বিশুদ্ধ জ্ঞানের গোড়া'র তত্ত্ব তো দেখা গেল এইরূপ; এখন কাণ্টের অভিপ্রেত বিশুদ্ধ জ্ঞানের গোড়া'র তত্ত্ব কিরূপ তাহা দেখা যা'ক্ :—

কাণ্ট বলিতেছেন—

"No knowledge can take place in us, no conjunction or unity of one kind of knowledge with another, without that unity of consciousness which precedes all data of intuition, and without reference to which no representation of objects is possible. This pure original, and unchangeable consciousness I shall call transcendental apperception."

এমতে পাইতেছি :—প্রতীচ্য ভাষায় যাহার নাম transcendental consciousness, এবং প্রাচ্য ভাষায় যাহার নাম স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ, সেইটিই যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান গোড়া'র তত্ত্ব এ বিষয়ে কাণ্ট্ এবং বেদান্ত উভয়েই একবাক্য।

হিউমের উত্থাপিত কূটতর্কের খোঁচাখুঁচিতে কাণ্টের মনে উপনিষদ তত্ত্বজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী উমা-দেবী জাগিয়া উঠিয়া কাণ্ট্‌কে যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখর-পানে চাহিয়া দেখিতে বলিলেন, তখন কাণ্ট্ সেই অভ্রভেদী শিখরে চিৎস্বরূপিণী transcendental সম্বিৎ'কে দেখিতে পাইয়া একদিকে যেমন হর্ষে পুলকিত হইলেন, আর-এক-দিকে তেমি transcendental সম্বিতের পার্শ্বে transcendental objectকে দেখিতে না পাইয়া—চিতের পার্শ্বে সৎকে দেখিতে না পাইয়া—ভগ্নমনোরথ হইলেন। কাণ্ট্ যখন একাকিনী চিতের দর্শনলাভে সন্তুষ্ট না হইয়া চিতের পার্শ্বে সৎ'কে দেখিতে চাহিলেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেবী কখন্ যে অন্তর্ধান করিলেন তাহা তিনি জানিতে না পারিয়া মিনিট্-দুইচারি বাতাসের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন; পরক্ষণে তাঁহার যেই চটক্ ভাঙিয়া গেল—আবার তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তাঁহার এবারকার চিন্তার বিষয় হইল—

Transcendental সম্বিতের সহিত transcendental objectএর সম্বন্ধ কিরূপ? এই দুস্তর চিন্তা-সাগরে মনস্তরী ভাসাইয়া দিয়া কাণ্ট্ যে, কী ধন লাভ করিলেন, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* গণিতের "( )" এ চিহ্নটা equal to, পরন্তু সাহিত্য-মহলের "(=)" এ চিহ্নটা double dash বই না। প্রচলিত "(!) (!!)" এই দুটা চিহ্ন যেমন যথাক্রমে একগুণ দ্বিগুণ চমৎকারিতা ব্যঞ্জক—এখানকার অভিপ্রায় মতে, সাহিত্য-মহলের "(—) (–)" এই দুটো চিহ্ন, তেমি, যথাক্রমে একগুণ দ্বিগুণ তাদাত্ম্য (কিনা indentity)-ব্যঞ্জক। পুনশ্চ প্রচলিত single dash যেমন দ্রষ্টব্য-চিহ্ন বই পঠিতব্য-চিহ্ন নহে, সাহিত্য-মহলের double dashও তেমি দ্রষ্টব্য বই পঠিতব্য নহে। পাঠকবর্গের প্রতি আমার তাই বিনীত অনুরোধ এই যে, উপরে যেখানে লেখা আছে "স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ = অন্তরতম আত্মা = সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" সেখানে পড়েনযেন তাঁহারা "স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ—অন্তরম আত্মা—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম"; তা বই, এরূপ যেন না পড়েন—"স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ equal to অন্তরম আত্মা equal to সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

স্বরলিপি

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে॥
চলে গেল বেলা রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড় কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা' পাস তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চল ঘরে ফিরে।
নাহি জানি মনে কি বাসিয়া
পথে বসে' আছে কে আসিয়া?
কি কুসুম-বাসে ফাগুন-বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।
চলরে এই ক্ষ্যাপা বাতাসেই
সাথে নিয়ে সেই উদাসীরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II মপা মা মজ্ঞা । রা -জ্ঞা । জ্ঞপা -া -া I পমা -রা মা । মজ্ঞা রা ।
কে ন সা রা ০ দিন ০ ০ ধী ০ রে ধী ০

। স্া -া -া I সপা পা পা । পধা -ণর্সা । র্সধা র্সণা -ধা I পধা -পা মা ।
রে ০ ০ বা লু নি য়ে ০ শু ধু ০ খে ০ ল

গা -মা । গমা -পদা -া II
তী ০ রে ০ ০

II ন্া নপ্া ন্া । ন্া -সা । সা সা -া I সন্া নপ্া ন্া । ন্া -সা ।
চ লে গে ল ০ বে লা ০ রে খে মি ছে ০

। সা সা -া I সা -জ্ঞা জ্ঞরা । জ্ঞা -া । জ্ঞরা জ্ঞা -া I রজ্ঞা -মপা পা ।
খে লা ০ ঝাঁপ ০ দি য়ে ০ প ড় ০ কা ০ লো

। পমা -জ্ঞরা । সা -া -া I সা পা পা । পা -া । পা পা -ধা I ধর্সা র্সা -া ।
নী ০ রে ০ ০ অ কূ ল ছা ০ নি ০ য়ে যা পাস্ ০

। র্সণা -া । ণধা র্সণা -ধা I পা ধা ধপা । মা -া । গা গা -া I সগা -া মা ।
তা ০ নি য়ে ০ হে সে কেঁ ০ দে ০ চ ল ০ ঘ ০ রে

। মা -া । গমা -পদা -া II
ফি ০ রে ০ ০

II মপা পা পা । মপা -মা । জ্ঞা জ্ঞা -মা I পা -র্না না । ণর্সা -না ।
না হি জা নি ০ ম নে ০ কি ০ বা সি ০

। র্সা -া -া I র্সনা র্সজ্ঞা জ্ঞর্রা । র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞর্রা র্মজ্ঞা -া I র্রজ্ঞা -র্মা র্জ্ঞা ।
য়া ০ ০ প থে ব সে ০ আ ছে ০ কে ০ আ

। র্রা -া । র্সা -া -া I ণর্সা র্সা ণা । ণা -া । ণধা ণা -া I
সি ০ য়া কি কু সু ম ০ বা সে ০

I ণর্সা ণা ধা । পা -া । পা পা -া I সপা পা পা । পা -া । পধা পা -মা I
ফা গু ন বা ০ তা সে ০ হৃ দ য় দি ০ তে ছে ০

I পা -ণা ণা । ণা -া । র্ণা -া -া I ণর্সা -া সা । ণা -ধা । সণা -া ধা I
উ ০ দা সি ০ য়া ০ ০ চ ০ ল রে ০ এই ০ ০

I ধপা ধা ধা । ধপা -া । ধপা -া -মা I মা পা পমা । গা -া । গা -া -া I
জ্যো পা বা তা ০ সেই ০ ০ সা থে নি য়ে ০ সেই ০ ০

I গা -মা মা । মা -া । গমা -পদা -া II II
উ ০ দা সী ০ রে ০ ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুসলমানের কবিতা

ভাবগ্রাহী।

(ফরিদুদ্দীন্ আত্তার্)

নীল আকাশে ফির্‌ছিল দেব্‌দূত
বিশ্বরাজের জয়গানে মস্‌গুল্;
হঠাৎ একি! একিরে অদ্ভুত!—
শুন্‌তে কানে বিমান্‌চারীর হচ্ছে না তো ভুল!

স্বর্গ হ'তে আস্‌ছে অভয়বাণী—
"এই যে আমি! এই যে আমি!"...ওরে—
কে ভক্ত আজ ডাক্‌ছে নাহি জানি
আপ্‌নি সাড়া দ্যান্ ভগবান কারে এমন ক'রে?

কৌতূহলী চল্‌ল তীরের বেগে
আকাশ ঘুরে এল পাখার ভরে,
সপ্ত স্বর্গ দেখ্‌ল একে একে
সপ্ত অতল তন্ন তন্ন খুঁজ্‌ল পরে পরে।

তেমন-ধারা প্রাণের কান্না কোথা?—
তেমন ভক্ত মিল্‌ল না একজনও;
কই রে কোথা তেমন ব্যাকুলতা?—
টল্‌তে যাতে পারে বিধির অটল সিংহাসনও।

দ্বিধার ভরে চল্‌ল বাতাস বিঁধে
এবার গতি ধূলার ধরার পানে—
ঘুর্‌ল কত মস্‌জিদে মস্‌জিদে,
স্বর্গ বিভোল্ যে বোলে, হায়, ঠেক্‌ছে তা কই কানে?

দুনিয়া খুঁটে গির্জ্জাতে গির্জ্জাতে
ঘুরে এল,—মিল্‌ল না লোক তবু!
সিনাগগে ঢুঁড়্‌ল দিনে রাতে,—
মিল্‌ল না লোক! কার ডাকে সায় দ্যান্ তবে
আজ প্রভু?

অনেক ভেবে এবার স্বর্গচারী
চল্‌ল ধেয়ে অগ্নি-পূজা-গেহে;
আবার নিরাশ! এ আশ্চর্য্য ভারি!
কার ডাকে, হায়, দ্যান্ প্রভু সায় এমন গভীর স্নেহে?

তন্ন তন্ন সব দেখেছে ঘুরে,—
যা চায় তবু মিল্‌ল না সে নিধি;
যায় নি শুধু পুতুল-পূজার পুরে
দূত সে ভাবে আপন মনে, বিস্ময়াকুল হৃদি।

"ভালো, দেউলগুলোই আসি দেখে!"
হেলার ভরে চল্‌ল শ্লথগতি;
দেখ্‌ল দেউল অনেক একে-একে,
এক ঠাঁয়ে শেষ থম্‌কে গেল দেখে অবাক্ জ্যোতি!

বেদীর পরে মাটির মুরৎ খাড়া
সাম্‌নে তারি লুটিয়ে কে ওই কাঁদে!
কি আশ্চর্য্য! "এই যে আমি"র সাড়া
স্পষ্ট হেথাই যাচ্ছে শোনা মন্দ্র-মধুর নাদে!

দ্বিধার দ্বন্দ্বে ফির্‌ল বিমানচারী
করজোড়ে কয় সে বিভুর পায়—
"সংশয়ে মন ব্যাকুল প্রভু, ভারি,
পুতুলকে তার ডাক্‌ছে কাফের, দিচ্ছ তুমি সায়?

জ্ঞানী যারা তত্ত্ব তোমার জানে
তাদের ডাকে টনক নড়ে না তো?
ভ্রান্ত কাফের ডাক্‌লে, আকুল প্রাণে—
আপ্‌নি তুমি দাও সাড়া? তার ধ্যানে আসন পাতো?"

কন্ কৃপাময় "আমি ভাবগ্রাহী,
আমি দেখি প্রাণের আকুলতা,
আমার কাছে কাফের কেহ নাহি,
ভক্তিতে যে ডাকে আমি তার সাথে কই কথা।

ভুল করে যে পুতুল-পূজা করে—
ভুল দেখি নে, ভাব দেখি তার আমি।"
নষ্ট-দ্বিধা বিমানচারী নমে হরষ-ভরে
গায় হরষে স্বর্গমর্ত্ত্য "জয় অন্তর্যামী!"

মেষপালক ও হজরৎ মুশা

(ফরিদুদ্দিন আত্তার)

সাধক মুশার চল্‌ত কথা ভগবানের সনে,
তাইতে তাঁরে মান্‌ত সকল জনে।
মেষ চরাত রাখাল ছেলে একলা মরুদেশে,
সে একদা মুশার কাছে এসে
বলছিল তার সরল মনের আকিঞ্চনের কথা,—
অনাবিল সে স্বভাব-সরলতা—
বল্‌ছিল সে,—"দুপুর বেলা ছাগল ভেড়া চরে,—
একলা আমি নিরালা প্রান্তরে
মনে মনে করি সেবা আমার ভগবানে;
সাধ কত হয়, মনটা আমার টানে
আমার কাঁকুই দিয়ে প্রভুর আঁচড়ে দিতে চুল,
পরিয়ে দিতে চুলে বনের ফুল;
ঝর্ণাতে হাত ধুয়ে, নিজের হাতে ছাগল দুয়ে
মন করে তাঁর সামনে আসি থুয়ে।"
চম্‌কে মুশা বলেন "থামো; হায়রে মনস্তাপ!
এ-সব কথা মনে করাও পাপ!—
সদাপ্রভুর আঁচড়াবে চুল?—তাঁর কি আছে কায়া?
হায়রে কাফের শয়তানের এ মায়া!
দূর করে দাও, উপ্‌ড়ে ফ্যালো ওভাব হৃদয় থেকে।
তোমার মনের এ দুর্গতি দেখে
কাঁপছে আমার অন্তরাত্মা।"......ভয়ে রাখাল ছেলে
ফ্যাল্‌ফেলিয়ে ডাগর দু'চোখ মেলে
রইল ক্ষণেক শূন্যে চেয়ে, হঠাৎ কেঁপে উঠে
সংজ্ঞাহারা পড়ল ধূলায় লুটে।
বারেক শুধু কাঁপল দু'ঠোঁঠ, তারপরে নিশ্চল,
গড়িয়ে চোখের পড়ল বিন্দু জল,
তার পরে সব সাঙ্গ হ'ল ধীরে ধীরে ধীরে,
চেতনা আর এলনা তার ফিরে।

* * * *

সেদিন যখন গেলেন মুশা বাণী লাভের আশে
অগম গিরির গগন-ছোঁয়া চূড়ে,
আগুন হাওয়ায় ভর্‌ল আকাশ, কাঁপেন সাধক ত্রাসে,
নীরবতা রইল পাহাড় জুড়ে।
নয়ন মুদে থাকেন মুশা ডাকেন ভগবানে
নুইয়ে মাথা কঠিন শিলার পরে,
এম্‌নি করে কত বেলা কাট্‌ল কেবা জানে
শেষে বাণী জাগ্‌ল নীলাম্বরে;—
"মুশা! মুশা! বিরক্ত আজ আমি তোমার পরে।"
"কেন প্রভু" সুধান্‌ সাধক ভয়ে।
"ভক্তে তুমি বধেছ আজ জ্ঞানের গর্ব্বভরে।"
মৌন মুশা বিমূঢ় বিস্ময়ে।
"সরল রাখাল পূজ্‌ত আমায় সরল হৃদয় দিয়ে
বুঝ্‌ত যেমন পূজ্‌ত সেই বিধানে।
ঘুরিয়ে দিলে পূজা তাহার, কর্‌লে তুমি কি এ?
হুতাশে হায় মর্‌ল সে যে প্রাণে।
সকল জনে ডেকে তুমি আন্‌বে আমার কাছে
তোমায় আমি এই দিয়েছি কাজ;
কর্‌তে নিরাশ, কর্‌তে বিমুখ কী অধিকার আছে?
জ্ঞানের গর্ব্বে কী ঘটালে আজ!"

—

আমি-তুমির পারে

(ফরিদুদ্দীন আত্তার)

"অন্ধকারে রুদ্ধ গুহার দ্বারে
কে করাঘাত কর্‌ছ বারে বারে?"
প্রশ্ন হ'ল গুহার ভিতর হ'তে।
"আমি, ওগো খোলো দ্বারের খিল্‌!"
ভিতর বলে "ঠাঁই নাহি একতিল,
ক্ষুদ্র এ ঘর, আঁটবে নাকো দুজন কোনোমতে।"

আস্‌ল শব্দ।...প্রহর খানেক পরে—
"আবার দ্বারে কে করাঘাত করে?"
হাওয়ার মতো আওয়াজ বলে 'তুমি।'
ভিতর বলে "আমি তো অন্দরে,—
সেই আমি ফের বাইরে?—কেমন ক'রে?
খুল্‌ব না খিল্‌; দুষ্টু লোকের বুঝেছি দুষ্টুমি।"

আবার স্তব্ধ।...আবার প্রহর-শেষে
অতিমৃদু আঘাত দুয়ার দেশে।
আবার প্রশ্ন "ফের কে কপাট নাড়ে?"
দিল না কেউ জবাব এবার কোনো
খুল্‌ল কপাট,—দুলিয়ে আঁধার ঘন,—
মিলন হ'ল এক নিমিষে আমি-তুমির পারে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দুই তার

(৩৫)

বীরেন্দ্র আপনার ভিটা হইতে উঠিয়া সাঁড়াশিয়া গ্রামের দিকে চলিল—সে গ্রাম হাতাকান্দা হইতে বেশী দূর নয়, একেবারে লাগাও।

বীরেন্দ্র গ্রামে ঢুকিয়াই দেখিল যে আজ সাঁড়াশিয়ার হাট; হাটে বেশ লোক জমিয়াছে, কিন্তু সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রক্ষাকালীর মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া আছে, যেন একজন কাহারও কথা মন দিয়া শুনিতেছে। কৌতূহলী হইয়া বীরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া গিয়া ভিড়ের পশ্চাতে দাঁড়াইল—দেখিল পতিত হাড়ি বক্তৃতা করিতেছে। পতিত সকলকে বুঝাইতেছে—জমিদারের যেমন ডিহিতে-ডিহিতে এক-একজন তহশীলদার থাকে, সে তার এলাকার রায়তদের খাজনা আদায় করে' সদরে জমা দ্যায়, তেমনি জমিদার স্বয়ং গভর্মেণ্টের তহশীলদার মাত্র; ইংরেজ যখন রাজা হল তখন দেশময় লোক নিযুক্ত করে খাজনা আদায় করবার জন্যে জমিদারী সৃষ্টি করলে; তারপর দশ-শালা বন্দোবস্তে ইংরেজ গভর্মেণ্ট তার তহশীলদার জমিদারদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করলে যে তোমাকে এত তোমাকে এত টাকা শালিয়ানা লাটের খাজনা দিতে হবে—হাজা শুখা ফৌত মৌত অনাদায় সকল ঝুঁকি তোমাদের। এই সুবিধে পেয়ে জমিদাররা কষে প্রজাপীড়ন করে বেশী-বেশী খাজনা-আদায় সুরু করে দিলে; যার লাটের খাজনা দিতে হয় বিশ হাজার, সে শালিয়ানা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতে লাগল একলক্ষ টাকা। এই-রকমে বছর বছর খরচখরচা বাদে জমিদার হাজার হাজার টাকা নিজের মালখানায় জমাতে লাগল। জমিদার পরের টাকায় পোদ্দারী করে বিলাসে অপব্যয় করতে লাগ্‌ল; তাদের ভুঁড়ির বহর যত বাড়তে লাগল, আমরা গরিবেরা পেটের ভাতের জন্যে ততই কাঙাল হয়ে উঠতে লাগলাম। ওরা আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গাড়ীজুড়ী হাঁকায় আর আমাদের কাচ্চা-বাচ্চারা না খেতে পেয়ে মারা যায়। এই দ্যাখো সেদিন তোমাদের জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধে কত টাকা খরচ হল। সে টাকা জমিদার কোথায় পেয়েছিল? তোমাদের কাছ থেকে। জমিদার নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে কাদের? তারই মতন পেটমোটা জমিদারদের, আর তোমরা যারা টাকা জোগালে তোমরা রইলে উপবাসে। যখন তোমরা ঘরে ঘরে দুতিন দিন ধরে উপোষ করে হা অন্ন জো অন্ন করছিলে, তখন কলকাতার একটা বেশ্যা-কীর্ত্তনওয়ালী এসে তোমাদের কাচ্চাবাচ্চার মুখের গ্রাস থেকে কেড়ে হাজার টাকা—দশ শো টাকা—নিয়ে চলে গেল! সেই দশ শো টাকা তোমরা পেলে দশ শো লোক চার পাঁচ দিন খেয়ে বাঁচতে! কালকে যে জমিদারের মেয়ের বিয়ে হবে তাতে তোমাদের কয়জনের নিমন্ত্রণ হয়েছে? কিন্তু বেগার খাটতে ধরে নিয়ে গেছে কত জনকে? সুতরাং আমরা জমিদারকে তার হক পাওনার বেশী কেন দেবো?—জমিদার আমাদের পথঘাট করে দিচ্ছে না, স্কুল-পাঠশালা করে দিচ্ছে না, জলকষ্ট অন্নকষ্ট নিবারণ করবার কোনো উপায়ই করে না; তবে তাদের বংশানুক্রমে বিলাস আর বদমায়েসী করবার সুবিধের জন্যেই কি আমরা বংশানুক্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বুকের রক্ত জল করব! কক্‌খনো না—কক্‌খনো না! জমিদারের অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়ে আর আমরা মাথা নীচু করে থাকব না......

অমনি জনতা হইতে বিপুল রব উঠিল—না, না। মারো জমিদারদের—ফাঁসাও তাদের ভুঁড়ি—জান্‌ কবুল, তবু একপয়সা বেশী জমিদারকে দেবো না......

জনতা চঞ্চল হইয়া অল্পে-অল্পে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ পতিতের নজর পড়িল বীরেন্দ্রের দিকে—সে স্মিত উজ্জ্বল মুখে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পতিত কালীমন্দিরের রক হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া খুব নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল "বীরেন-বাবু, আপনি কতক্ষণ?"

বীরেন্দ্র পতিতকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—পতিত, তুই আমাকে প্রণাম করছিস কিরে? আমি তোর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করব।

পতিত জিভ-কাটিয়া বলিল—অমন কথা মুখে আনবেন না, আমি অন্ত্যজ হাড়ি!

তুই হাড়ি নোস পতিত, তুই ক্ষত্রিয়—অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিস; তুই ব্রাহ্মণ—আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে দুঃখ বরণ করেছিস। পেঁচো ব্রাহ্মণ, আর তুই হাড়ি? এ যে বলে বলুক, আমি স্বীকার করব না।

পতিত লজ্জিত হইয়া সে কথা চাপা দিবার জন্য বলিল—আপনি এদিকে এসেছেন কোথায়?

—তোর কাছেই। আচ্ছা পতিত, যখন আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম তখন তুই আমাকে আপনি বলতিস? আজ অকস্মাৎ আপনি বলতে আরম্ভ করলি কেন? আপনি-টাপনি চলবে না বলে দিচ্ছি।

পতিত হাসিয়া বলিল—তুমি এখন বিদ্বান উকিল হয়েছ......

বীরেন পতিতের গালে আস্তে একটি চড় মারিয়া হাসিয়া বলিল—তাতে আমার পদ বেড়েছে—দ্বিপদ ছিলাম চতুষ্পদ হয়েছি?

পতিত হাসিতে হাসিতে বলিল—তুমি আমাকে বারবার ছুঁচ্ছ, সবাই অবাক হয়ে দেখছে।

—দেখুক না, আমরা স্কুলে এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসতাম মনে আছে?

পতিতের মন বাল্যস্মৃতিতে আনন্দিত হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি জেলা থেকে কখন এলে?

—এই ঘণ্টা দুই হবে। গুণময় তোদের সঙ্গে মকদ্দমা করবে, তাই আমায় মকদ্দমার তদ্বির করবার ভার দেবে বোলে ডেকেছিল।

—তবে তুমি আমাদের এখানে যে?

—আমি গরিব, গরিবের মকদ্দমারই তদ্বির করব বোলে সে পক্ষ ছেড়ে দিয়েছি। গুণময় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে তাই তোর আশ্রয়ে এসেছি।

—তাহলে খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়নি? চলো, বেলা হয়েছে। আমাদের গোয়াল-ঘরে তোমার রান্নার জোগাড় করে দেবো, দুটো সেদ্ধ করে নাবিয়ে নিতে পারবে ত?

—আমি সেদ্ধ করতে যাব এমন কি দায় পড়েছে। তোর বাড়ীতে অতিথি, তোর বউ আমায় রেঁধে দেবে। তোদের রান্নাঘরের চেয়ে গোয়ালঘরটা নিশ্চয়ই বেশী পরিষ্কার নয়।

পতিত হাসিয়া বলিল—তুমি একেবারে কালাপাহাড় হয়ে উঠেছ দেখছি!

(৩৬)

পঞ্চাননের নিকট খবর পৌছিল পতিত কি বলিয়া প্রজাদের বিদ্রোহী করিতেছে এবং কেমন করিয়া তাহার সহিত বীরেন্দ্র গিয়া জুটিয়াছে। পঞ্চাননের বীরত্ব অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি গুণময়কে গিয়া বলিল—এমন করলে ত জমিদারী করা চলে না! তুমি হুকুম দাও ভায়া, ঐ ছোঁড়া দুটোর কাঁচা মাথা কেটে নিয়ে আসি!

গুণময়ের মনের মধ্যেও ক্রোধের আগুন তখনো জ্বলিতেছিল; তিনি হুকুম দিলেন—তুমি পতে হাড়ি আর বীরে ছোঁড়াকে যেমন করে পার জব্দ কর—তাতে লক্ষ টাকা খরচ হলেও পিছপাও হয়ো না।

প্রভুর দরাজ হুকুম পাইয়া পঞ্চানন রণসজ্জার আয়োজন করিতে গেল।

রাজবালা বাহিরে দাঁড়াইয়া পঞ্চানন ও গুণময়ের কথা কয়টা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল।

বীরেনের প্রতি রাজবালার অনুরাগ জন্মিয়াছিল মাত্র চারটি দিনের পরিচয়ে দুঃখের সমবেদনায়। তার পর ছাড়াছাড়ি হইয়া অদর্শনে বীরেনের উপর রাজবালার মনের টান অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছিল; তবে সে জেদী মেয়ে বলিয়া নিজে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহাই কর্ত্তব্য-বোধে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল। সে যে এখনও গুণময়কে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিতেছিল তাহার কারণ—গুণময়ের অভদ্র ব্যবহার, গুণময়কে তাহার অপছন্দ ও দয়াদেবীকে কষ্ট দিবার অনিচ্ছা যতটা, বীরেনের উপর অনুরাগ ঠিক ততটা নহে। কিন্তু আজ আবার অকস্মাৎ বীরেনের সঙ্গে দেখা হইয়া যাওয়াতে রাজবালার মনের ভিতরকার থিতানো ভাবগুলি আলোড়িত হইয়া উঠিল;

বীরেনের কাতর ম্লান দৃষ্টি, তাহার নির্ব্বাক দুঃখ, তাহাকে গুণময়ের নূতন অপমান, পোড়ো ভিটার ধূলায় পড়িয়া মায়ের জন্য তাহার কান্না, দেখিয়া রাজবালার মন অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বেদনা প্রবলতর বোধ হইতেছে যে সে বীরেনকে একটিও সান্ত্বনার কথা বলিবার অবকাশ পাইল না। এই যে তরুণ সুকুমার সুশ্রী যুবক বীরের মতন দুঃখ সহিতেছে, তাহার সহিত গুণময়ের তুলনা করিয়া রাজবালার অনুরক্ত মন অতি সহজেই তার অধিকতর পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। তাহার তুলনায় হংসেশ্বর দারোগাকেও কত ক্ষুদ্র কত নীচ কত কুৎসিত মনে হইতে লাগিল। এই বীরেন্দ্রকে পীড়ন করিবার জন্য রাজবালা হইতেছে হংসেশ্বরের ঘুষ! রাজবালা পরোক্ষভাবে বীরেন্দ্রকে পীড়ন করিবার সহায়তা করিবে!—ইহা মনে করিয়া রাজবালার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল, তাহার নিজের প্রতি ধিক্কার আসিতে লাগিল, সে নিরুপায়ের উদ্বেগে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

কাল সকালেই তার গায়ে-হলুদ, কাল রাত্রেই তার বিয়ে! কেমন করিয়া সে নিজেকে বাঁচাইবে, কেমন করিয়া সে বীরেনকে রক্ষা করিবে, এই ভাবনাতে সে অস্থির হইয়া উঠিল। সে মরিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু মরিতে তার বড় ভয়; আর মনে হইল অপঘাতে মৃত্যু দেখিয়া দয়াদেবী মৃতকল্প হইয়া আছেন, আবার সে মরিয়া তাঁহাকে একেবারে বধ করিবে হয়ত।

সমস্তদিন সে বাদলা দিনের মতন থমথমে বিমর্ষ হইয়া কাটাইল। সন্ধ্যাবেলা মাকে খুঁজিতে গেল। হংসেশ্বরের সঙ্গে রাজবালার বিবাহ স্থির হইয়াছে শুনিয়াই রাজবালার মা যে আগা-গোড়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছেন, আর তিনি উঠেন নাই। রাজবালা মায়ের শিয়রে বসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল—মা।

রাজবালা মায়ের কোন সাড়া পাইল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার ডাকিল—মা।

তবু মায়ের সাড়া নাই।

রাজবালা আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মা, এর চেয়ে চল না আমরা বাড়ী চলে যাই।

তাহার মা কোনো সাড়া দিলেন না।

আবার রাজবালা বলিল—মা, চল, হোবপুরে চলে যাই।

এবার তাহার মা লেপের ভিতর হইতেই উত্তর দিলেন—তোর যেখানে খুসি যেতে হয় যা, আমাকে জ্বালাসনে।

রাজবালা চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আস্তে-আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি তখন প্রায় দুটো। রাজবালা বিছানায় উঠিয়া বসিল, ভাবনায় তাহার ঘুম আসিতেছিল না। বিছানায় একটুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিল। আলনা হইতে নিজের র‍্যাপারখানি লইয়া গায়ে দিয়া দয়াদেবীর খাটের কাছে গেল।

দয়াদেবীর রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, প্রায়ই জাগিয়া থাকেন, অল্প তন্দ্রা আসিলেও অল্প একটু শব্দেই তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়। রাজবালাকে অতি সন্তর্পণে তাঁহার খাটের কাছে আসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে রাজু?

নিশীথ রাত্রে সেই ক্ষীণ স্বর শুনিয়াই রাজবালা খুব বেশী-রকম চমকাইয়া উঠিল, যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছে এমনি তার মুখের ভাব হইল। তাহা দেখিয়া দয়াদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার কাছে আয় রাজু।

রাজবালা আস্তে আস্তে গিয়া দয়াদেবীর পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

দয়াদেবী রাজবালাকে বলিলেন—দেখ্ রাজু, কোনো দুঃখকেই ভেবে ভেবে বড় করে তুলতে নেই। বীরেনকে তোর ভালো লেগেছিল, সে ক দিনের কতটুকু পরিচয়ে? যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তাকে এখন ভালো লাগছে না, কিন্তু ক্রমে পরিচয় হলে দেখবি সেই তোর সবার চেয়ে আপন হয়ে উঠবে। ভবিতব্যের ওপর ত মানুষের হাত নেই ভাই। মিছে মন খারাপ করিসনে, যা ঘুমুগে যা।

রাজবালা আস্তে আস্তে বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজবালা পা টিপিয়া টিপিয়া নীচে নামিল, তারপর খিড়কীর দরজা সন্তর্পণে খুলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে পড়িয়াই রাজবালার বুকের মধ্যে দুরদুর করিয়া উঠিল, গা ছমছম করিতে লাগিল। শীতকালের স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কিন্তু এ-সমস্ত কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া রাজবালা এক-রকম ছুটিয়া চলিল। কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানে না, পথঘাট সে চেনে না; তবু সে ছুটিয়া চলিয়াছে বন্দীশালা হইতে দূরে গিয়া পড়িবার জন্য। তারপর দিনের বেলা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পথ জানিয়া লইয়া সে তাহাদের বাসগ্রাম হোবপুরে চলিয়া যাইবে।

রাজবালা কতক্ষণ চলিয়াছে তাহা ঠিক নাই। ভয়ে উদ্বেগে ও ক্লান্তিতে সে হাঁপাইতেছে। তবু সে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল সেই পথের বিপরীত দিক হইতে কে একজন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। রাজবালার মনে হইল—যাঃ! বাড়ীতে জানাজানি হইয়া গিয়াছে, গুণময়ের চর তাহাকে ধরিতে ছুটিয়াছে।

রাজবালা থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পিছন দিকে ছুটিয়া গেলেও ঘোড়ার সঙ্গে ত সে ছুটিয়া উঠিতে পারিবে না! সে পথের ধারে পগারে নামিয়া পড়িয়া ঝোপের আড়ালে লুকাইবে ঠিক করিল। সে এই-সমস্ত ভাবিয়া ঠিক করিতে-না-করিতে ঘোড়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার সামনে পড়িল এবং সামনে কালো-র‍্যাপার জড়ানো মূর্ত্তি দেখিয়া ঘোড়া ভড়কাইয়া হঠাৎ পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিল। ঘোড়সওয়ার নিমেষ মধ্যে ছিটকাইয়া মাটিতে গিয়া পড়িয়া "বাবারে!" বলিয়া কাতর চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ঘোড়া ভার-মুক্ত হইয়া ও ছাড়া পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

রাজবালার আর পলায়ন করা হইল না, তার করুণ নারীহৃদয় তখনি নিজের কথা ভুলিয়া বিপন্নের দুঃখে কাতর হইয়া উঠিল, না জানি লোকটির কত চোটই লাগিয়াছে! সে তাড়াতাড়ি পতিত লোকটির কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াই চমকাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—সে যে হংসেশ্বর দারোগা!

হংসেশ্বরের ঘোড়া ভড়কাইয়া খাড়া হইয়া উঠিতেই হংসেশ্বর ঘোড়ার পিছনেই সরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সেজন্য তাহার বেশী চোট লাগে নাই, সে আতঙ্কেই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সে মাটিতে পড়িয়া থাকিয়া অনুভব করিয়া দেখিয়া লইতেছিল তাহার চোটটা কি পরিমাণ লাগিয়াছে। সেই সময় তাহার মুখের উপর রাজবালার সুন্দর মুখখানি করুণায় উদ্বেগে ব্যাকুল হইয়া নত হইয়া আসিতেছে দেখিয়াই হংসেশ্বর আঘাত বিপদ সব ভুলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি......তুমি এখানে? তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?"

রাজবালা একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—আমি হোবপুরে যাচ্ছিলাম।

হংসেশ্বর গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—একলা তুমি হোবপুরে যাচ্ছিলে!...... রাত পোয়ালেই না আমাদের বিয়ে হবার কথা?...... আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই বলে আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন?

রাজবালা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ।

হংসেশ্বর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনাকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে বলেই যে আপনার আমাকে ভালো লাগবে তার কোনো মানে নেই। বেশ! আপনি হোবপুরেই যাবেন; কিন্তু একলা যাবেন না, পথে বিপদ-আপদে পড়তে পারেন। এখন আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনার সঙ্গে একজন মেয়েলোক আর জন দুই চৌকীদার দিয়ে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।

রাজবালা অবাক হইয়া হংসেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইল। হংসেশ্বর রাগ করিল না, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিবার কোনো কথা বলিল না, বরং উল্টা লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিবে! ইহা রাজবালার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য্য ঠেকিল। এতদিন গুণময়ের যে ব্যবহার সে দেখিয়া আসিয়াছে তাহাতে পুরুষের উপর তাহার বড় একটা বিশ্বাস ছিল না, তাহাতে আবার এই হংসেশ্বর তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। রাজবালার মনে হইল হংসেশ্বর হয়ত তাহাকে স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া বন্দী করিবার ফন্দি করিয়াছে। কিন্তু রাজবালা ভোরের আলোতে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, তথাপি হংসেশ্বরের মুখে দুষ্ট অভিসন্ধির আভাস দেখিতে পাইল না, হংসেশ্বরের কথাতেও প্রতারণার সুর সে ধরিতে পারে নাই।

রাজবালাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাবিতে দেখিয়া হংসেশ্বর বলিল—আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না? বিশ্বাস করুন আমাকে, আপনি যা হুকুম করবেন আমি তাই করব। বাড়ীতে গিয়েই ঝি সঙ্গে নিয়ে আমিই না হয় আপনাকে রেখে আসব।

রাজবালা আর-একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল—তবে শিগ্‌গির চলুন, বেলা হলে রায়-মশায় টের পাবেন।

হংসেশ্বর পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিল। দুজনেই নির্ব্বাক।

কাল একটা খুনের তদন্তে হংসেশ্বর গ্রামান্তরে গিয়াছিল। আজ তাহার বিবাহ বলিয়া সে রাতারাতি ঘোড়া ছুটাইয়া থানায় ফিরিতেছিল, পথে সাক্ষাৎ তাহারই ভাবী বধূর সঙ্গে। ব্যাপারটা একেবারে উপন্যাসের উপযুক্ত। কিন্তু তাহা যে এমন বিয়োগান্ত হইবে তাহা হংসেশ্বর ভাবে নাই। যে মেয়েটিকে তাহার ভালো লাগিয়াছে সে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অসহায় অবস্থায় পলাইতেছে, তাহার সামনে না পড়িলে নাজানি কোন্ বিষম বিপদে পড়িতে পারিত। এই চিন্তাতে হংসেশ্বরকে এমন উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল ও সে নিজের কাছে ও রাজবালার কাছে এমন একটা লজ্জা অনুভব করিতেছিল যে সে আর কিছু ভাবিতেছিল না, কেবল ভাবিতেছিল কেমন করিয়া গুণময়ের অজ্ঞাতসারে রাজবালাকে তাহার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে পারিবে। রাজবালাকে হাতে পাইয়া বাধ্য করিয়া বিবাহ করিবার সম্ভাবনা দেখিয়াও সে দেখিতে চাহিল না।

হংসেশ্বর আপনার বাড়ীর উঠানে গিয়া ঢুকিল, পিছনে পিছনে ঢুকিল রাজবালা। হংসেশ্বরের মাতৃহীন শিশু-পুত্রটি উঠানের যে-পাশে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে সেখানে খেলা করিতেছিল, তাহার পাশে তাহার ঝি বসিয়া তাহাকে আগলাইতেছিল। বাবাকে আসিতে দেখিয়াই শিশু খেলা ফেলিয়া "বাবা এচেচে লে।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাবার কাছে ছুটিয়া যাইতে গিয়া তাহার বাবার পশ্চাতে আর-একজন কাহাকেও আসিতে দেখিয়া দুই বছরের খোকা থমকিয়া দাঁড়াইল। হংসেশ্বর ও রাজবালাকে আসিতে দেখিয়া ঝিও তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া রাজবালাকে দেখিতেছিল—এই অপরূপ রূপসী কে? খোকা এক মুহূর্ত্ত রাজবালার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে তাহার হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়া উঠিল—"মা এলি!" শিশু আজ মাসাধিক হইল তাহার মাকে হারাইয়া ব্যাকুল হইয়া আছে; তাহাকে প্রতিদিন এই বলিয়া ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে যে মা অসুখ সারিতে ভালো জায়গায় গিয়াছেন, ভালো হইলেই খোকার কাছে ফিরিয়া আসিবেন। তাই আজ এই শীতকালের প্রভাতের অস্পষ্ট আলোতে রাজবালাকে দেখিয়া মা বলিয়া ভুল করিয়া খোকা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

রাজবালা তাড়াতাড়ি সেই ব্যথিত শিশুকে কোলে তুলিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। খোকা তাহার দুই হাতে রাজবালার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গালের উপর গাল রাখিয়া মিনতির স্বরে বলিল—"মা তোল্ কোকাকে চেলে আল্ যাচ্‌নে!"

এই মাতৃহীন শিশুর এই মিনতিতে রাজবালার কোমল মন আর্দ্র হইয়া গেল, তাহার অক্ষিপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল। রাজবালা সম্মুখে চাহিয়া দেখিল হংসেশ্বরের চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছে, ঝিও আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছে।

রাজবালা এ কোথায় আসিয়া কাহার কাছে বন্দী হইল! এই বাড়ীতে আসিবে না বলিয়াই ত সে পলাইতেছিল!

হংসেশ্বর চোখ মুছিয়া ম্লান মুখে রাজবালাকে বলিল—খোকা আজকে আবার মা-ছোড় হবে! খোকাকে হয়ত আর আমি বাঁচাতে পারবো না।

রাজবালার মন এই অচেনা শিশুর অশুভ আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া উঠিল, সে দুই হাতে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহা দেখিয়া ভরসা পাইয়া হংসেশ্বর বলিল—তোমাকে খোকা মা বোলে এ বাড়ীতে অভ্যর্থনা করেছে, তুমি আর আপত্তি কোরো না; তুমি খোকার মা হয়েই এই বাড়ীতে এস; তুমি যদি কখনো দয়া করে আমার সম্পর্ক স্বীকার কর আমি কৃতার্থ হব, নইলে আমি তোমার থেকে পৃথক থাকব কথা দিচ্ছি।

রাজবালা হংসেশ্বরের চেহারা দেখিয়া তাহাকে যতটা কদর্য্য ভাবিয়াছিল, ব্যবহারে দেখিল সে ততটা নয় ; তাহার কেমন মনে হইল হংসেশ্বর তাহাকে ভালো বাসিয়াছে ; যদি সে হংসেশ্বরের গৃহিণী হইয়া তাহার কাছে আসে তবে হয়ত বীরেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইতেছে তাহা হইতে হংসেশ্বরকে অন্তত দূরে রাখিতে পারিবে। জমিদারের অত্যাচারের সহায় পুলিশ হইলে বীরেনের অবস্থা যত বিপদসঙ্কুল হইত, হংসেশ্বরকে নিবৃত্ত রাখিতে পারিলে ততটা হইবে না। তারপর বিবাহ যখন তার অনিবার্য্য ও বীরেনকে পাইবার যখন সম্ভাবনা নাই, তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হংসেশ্বরকে বিবাহ করাই তাহার মন্দের ভালো। এই ভাবিয়া রাজবালা হংসেশ্বরের মুখের দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—খোকার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করুন।

হংসেশ্বর ব্যথিত হইয়া বলিল—এত বড় অবিশ্বাস আমাকে আমি পুলিশ বলে। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, এর অন্যথা হবে না—আমার খোকার কল্যাণ এর জামিন।

রাজবালা খুসী হইয়া বলিল—আমায় জমিদার-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন তবে।......আমি খোকাকে নিয়ে যাব ?

হংসেশ্বরও আনন্দিত হইয়া বলিল—ও খোকা ত তোমারই।

(৩৭)

সকাল হইলে মোহিনী দাসী রাজবালাকে খুঁজিয়া পাইল না। দয়াদেবীর ঔষধ পথ্য দেওয়া হয় নাই, রাজবালা গেল কোথায় ? মায়া জানে না। রাজবালার মা জানেন না, তিনি লেপের মধ্য হইতে ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—কে জানে সে আবাগী কোন্ চুলোয় আছে না-আছে ?

মোহিনী আসিয়া অবশেষে ভয়ে ভয়ে শুকনো মুখে দয়াদেবীকে বলিল—মা, মাসিমাকে বাড়ীতে দেখতে পাচ্ছি না ত!

দয়াদেবী শঙ্কিত হইয়া বিছানার উপর কনুইএ ভর দিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন—অ্যা! সব জায়গা খুঁজেছিস ?

—সকাল থেকেই ত খুঁজছি, কোথাও নেই।

—তাইতে সে কাল রাতে আমার কাছে বিদেয় নিয়ে গেল। রাজুও কি শেষে মরল নাকি ?......

দয়াদেবী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দাসী-চাকরদের মধ্যে ছুটাছুটি লাগিয়া গেল, মায়া উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিল।

রাজবালার মা লেপের মধ্য হইতে আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—আজ বাড়ীতে বিয়ে কিনা তাই মড়াকান্না উঠেছে! কি হল আবার, দেখি।

তিনি বাহির হইয়া আসিয়া একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ব্যাপার লা ?

—মাসিমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই শুনে মা মূর্চ্ছো গেছেন।

রাজবালার মা বলিয়া উঠিলেন—মরেছে! আপদ গেছে!

তিনি আবার গিয়া আগাগোড়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ক্রমে কথাটা গুণময়ের কানেও পৌঁছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—এ সমস্ত সেই বীরে ছোঁড়ার কারসাজি! কাল এসে রাজুকে নিয়ে ভেগেছে! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! জানে না ত গুণময় রায় কি-রকম লোক!—এই চতুর, পাঁচু-দা'কে শিগ্গির ডাক্।

পঞ্চানন আসিতেই গুণময় বলিয়া উঠিলেন—শুনেছ ত বীরে ছোঁড়ার বুকের পাটার কথা। এখুনি হুলিয়া করে দাও, তার মাথাটা কেটে নিয়ে আসুক। হংসেশ্বর দারোগাকেও খবরটা পাঠিয়ে দিয়ো—পুলিশের ক্রোধ জিনিষটা যে কেমন বীরেটা একটু চেখে দেখুক।

এমন সময় সেই ঘরে হংসেশ্বর আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই গুণময় বলিয়া উঠিলেন—বীরে যে তোমার বউকে নিয়ে কাল রাতে ভেগেছে!

হংসেশ্বর বলিল—আমি তাঁকে রাস্তায় পেয়ে ফিরিয়ে এনেছি।

গুণময় জিজ্ঞাসা করিলেন—আর বীরেটা ?

—তাকে ত কৈ দেখতে পেলাম না!

—সট্‌কেছে! পুলিশ লেলিয়ে গেরেপ্তার করো তাকে।

—এর মধ্যে বীরে ছিল নাকি ? তবে যাই দেখি গে।

হংসেশ্বর. বীরেনের উপর জাতক্রোধ হইয়া তাহাকে গেরেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিতে গেল।

ওদিকে যখন ডাক্তার আর চাকর-দাসীরা দয়াদেবীর চেতনা ফিরাইবার জন্য নানাবিধ তাছত করিতেছিল, তখন হংসেশ্বরের খোকাকে কোলে করিয়া রাজবালা সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই মোহিনী বলিয়া উঠিল—এই যে মাসিমা! ভ্যালা মেয়ে বাবা তুমি! কোথায় লুকিয়েছিলে বাছা! মা যে ভির্মি গিয়ে যায়-যায় হয়েছিল!

রাজবালা লজ্জিত ম্লান-মুখে আগাইয়া গিয়া দয়াদেবীর শিয়রের কাছে দাঁড়াইল। দয়াদেবী হাতের ইসারা করিয়া সকলকে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে ক্ষীণ কণ্ঠে দয়াদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—ওটি কার ছেলে রাজু ?

খোকা দিব্য সপ্রতিভ ভাবে রাজবালার গলা দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমি মাল্ চেলে!

রাজবালা, লজ্জিত হইয়া বলিল—আমি পালিয়ে যাচ্ছিলাম দিদি। পথে পড়ে গেলাম দারোগার সামনে। তিনি সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন, লোক সঙ্গে দিয়ে আমায় হোবপুরে পাঠিয়ে দেবেন বলে। বাড়ীতে যেতেই খোকা আমায় মা বলে জড়িয়ে ধরলে......

খোকা বলিয়া উঠিল—মা দুত্তু! কালি কালি পালিয়ে দায়! আমি আল্ দেতে দেবো না......

বলিয়া খোকা মাথা নাড়িতে লাগিল।

রাজবালা পরম স্নেহে খোকাকে চুম্বন করিল।

দয়াদেবী বলিলেন—দেখ রাজু, ভবিতব্য যেখানে তোকে টানছে, তা তুই খণ্ডাতে চাসনে! আমাকে কথা দে, আর তুই কিছু অনর্থ ঘটাবিনে।

রাজবালা মাথা নত করিয়া বলিল—না দিদি, আমি হার মেনেছি।

মায়া আস্তে আস্তে রাজবালার কাছে আসিয়া ম্লান মুখে তাহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মাসি, তোমাকে সেই দারোগাকেই বিয়ে করতে হবে? আমাকেও সেই বুড়োটাকেই বিয়ে করতে হবে?......

বলিতে বলিতেই মায়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাজবালা কিছু না বলিয়া মায়াকে গায়ের কাছে টানিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। দয়াদেবীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

(৩৮)

পরদিন প্রভাতে দুইজন পাইক গিয়া পতিতকে খবর দিল—নায়েব-মশায় ডাকছেন।

পতিত বলিল—আমি ত নায়েবের এক কড়াও ধারি না, নায়েবের দরকার থাকে তাঁকেই গরিবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে বলগে।

—তুমি না গেলে তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন।

—তা তোমরা ত পারবে না। কেন মিছেমিছি দাঙ্গা ফসাদ করবে। আমরা কোনো দোষ করে থাকি নালিশ করতে বলগে, আদালত যে শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে নিতেই হবে।

পাইক দুজন পতিতের কথা বুঝিল না বলিয়া বারণ শুনিল না, পতিতকে দুই দিক হইতে ধরিতে গেল। পতিত চকিতে একজন পাইকের হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। পাইক দুজন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

অল্পক্ষণ পরেই স্বয়ং পঞ্চানন কয়েকজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া পতিতকে শিক্ষা দিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বোধ হইল সে নিকটে কোথাও প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

পতিতকে দাঙ্গায় জড়াইবার আয়োজন দুতিন দিন হইতেই হইতেছিল। সুতরাং গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল যে নায়েব পতিতের সঙ্গে দাঙ্গা করিবে; তাই যে যেখানে ছিল লাঠি-সোঁটা সংগ্রহ করিয়া পতিতকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিতেছিল। জমিদারের লাঠিয়াল ও ক্ষিপ্ত প্রজাদের মধ্যে মহা দাঙ্গা বাধিয়া গেল।

পতিত ও বীরেন্দ্র তাড়াতাড়ি দাঙ্গা থামাইতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু গণ্ডগোলে কে বা তাহাদের কথা শোনে।

হঠাৎ দেখা গেল পুলিশের জমাদার ও রাইটার কনষ্টেবল থানার সমস্ত কনষ্টেবল ও চৌকীদার লইয়া বড় বড় লাঠি কাঁধে করিয়া ছুটিয়া সেই দিকে আসিতেছে।

তাহারাও দাঙ্গা বাধিবার প্রতীক্ষায় নিকটেই কোথাও লুকাইয়া ছিল।

পুলিশের লাল পাগড়ী দেখিয়াই প্রজাদের যুদ্ধস্পৃহা দূর হইয়া গেল; সকলে লাঠি গুটাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে বিপরীত দিকে দৌড় মারিল।

যুদ্ধক্ষেত্র মুক্ত দেখিয়া জমিদারের লাঠিয়ালেরা হুঙ্কার করিয়া পতিত ও বীরেন্দ্রকে ঘেরাও করিল।

পঞ্চানন হুকুম দিল—বাঁধ ওদের পিঠমোড়া করে!

একা পতিত লাঠি ধরিয়া অসংখ্য লাঠিয়ালের আঘাত হইতে বীরেনকে ও আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। ভাইকে বিপন্ন দেখিয়া ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পতিতের ভগিনী একটা বন্দুক ভরিয়া আনিয়া পঞ্চাননের দিকে ফিরাইয়া নিশানা করিতেছিল, কিন্তু তাহার গুলি করিবার আগেই থাকো তাঁতিনী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একটা শাবলের বাড়ি পঞ্চাননের মাথায় সজোরে এক ঘা কষাইয়া দিল। পঞ্চানন "বাপরে" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। এই দুই রণরঙ্গিণী স্ত্রীলোকের আবির্ভাবে ভয় পাইয়া লাঠিয়ালেরা থতমত খাইয়া হটিয়া পিছাইয়া গেল; এবং সেই ফাঁকে ছাড়া পাইয়া পতিত ছুটিয়া গিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত রক্তাক্ত পঞ্চাননকে ধরিয়া তুলিয়া কোলে শোয়াইল এবং বীরেন্দ্র গিয়া পতিতের ভগিনীর হাত হইতে বন্দুকটা কাড়িয়া লইল। আর অমনি পুলিশের জমাদার আসিয়া তাড়াতাড়ি পতিত ও বীরেন্দ্রের হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল। থাকোকে সেখানে দেখিতে পাওয়া গেল না। একজন চৌকীদার পতিতের ভগিনীকে ধরিতে যাইতেছিল; পতিত বলিল—খবরদার, মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিও না, তাহলে ভয়ানক খুনোখুনী হবে।

কি ভাবিয়া জমাদার বলিল—মেয়েদের ছেড়ে দাও, এই দুজন প্রধান আসামী গেরেপ্তার হয়েছে, এতেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

(৩৯)

কাল রাত্রে মায়া ও রাজবালার চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে; আজ বরকনে বিদায় হইবে। তাহাদের জন্য জমিদারবাড়ীর সদর দরজায় চারখানা পাল্কী অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারই একখানা আনাইয়া পঞ্চাননকে ধরাধরি করিয়া তাহাতে উঠাইল, এবং সেই পাল্কীর পিছনে পিছনে হাতকড়ি-দেওয়া বন্দী বীরেন্দ্র ও পতিতকে পুলিশের লোকেরা ঘিরিয়া লইয়া চলিল।

গাঁটছড়া-বাঁধা মায়া ও রসময় এবং রাজবালা ও হংসেশ্বর পাল্কীতে চড়িবে বলিয়া যেমন দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে ঠিক সেই সময় বীরেন ও পতিতকে পুলিশের লোকেরা হাতকড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়া সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। রাজবালা ও মায়ার মুখের দিকে লজ্জিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বীরেন মুখ নত করিল। তাহা দেখিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুসাগর গোপন করিবার জন্য রাজবালা মুখের উপর খুব বড় করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। হংসেশ্বর জমাদারকে বলিল—ওদের নিয়ে গিয়ে হাজতে বন্ধ করে রাখগে, আমি এখনি যাচ্ছি।

বরকনেকে বিদায় দিবার জন্য গুণময় লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া নীচে নামিয়াছিলেন; রাজবালার মা সেই যে লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিলেন যথাসময়ে স্নানাহার করিতে ওঠা ছাড়া তিনি আর শয্যা ত্যাগ করিতেন না। গুণময় বীরেনকে দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—এইবার পতিতের ওকালতী করতে চললে ত?

বীরেন সে কথার কোনো উত্তর দিল না।

ইতিমধ্যে মোহিনী ঝি বীরেনকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া দয়াদেবীকে বলিল—মা গো মা, বীরেন-দাদাবাবুকে পুলিশে হাতকড়ি দিয়ে ধরে এনেছে!

দয়াদেবী হঠাৎ এক দমকে বিছানা হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় রে?

মোহিনী বলিল—সদর দেউড়ীতে।

দয়াদেবী পাগলের মতন সদর দেউড়ীর উদ্দেশে ছুটিলেন। মোহিনী পিছনে পিছনে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল—ওমা, তুমি পড়ে যাবে! ওমা, তুমি পড়ে যাবে!

দয়াদেবী এক ছুটে একেবারে সদর-দেউড়ীতে গিয়া বীরেনকে দূর হইতেই দেখিতে পাইয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—"বাবা বীরেন!" তারপর সকল লোককে

ঠেলিয়া সরাইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া বীরেনের গলা জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। বীরেনের বুকের উপর তাঁহার দেহ এলাইয়া ঢলিয়া পড়িল। বীরেন তাড়াতাড়ি হাতকড়ি-বাঁধা যুক্ত করে কোনোরকমে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া আস্তে-আস্তে বসিয়া নিজের কোলের উপর শোয়াইল। চাকরদাসীরা ছুটাছুটি পাখা জল ডাক্তার আনিতে গেল।

ডাক্তার আসিয়া বলিল, যে দয়াদেবীকে ধরিয়া বিছানায় বসাইতে হইত, তিনি অকস্মাৎ উত্তেজনায় এতখানি পথ দৌড়িয়া আসার শ্রম সহ্য করিতে না পারাতে তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

বীরেন তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—মা, আমাকে আবার মাতৃহীন করে গেলে!

এই কথা শুনিয়া রাজবালা দয়াদেবীর বুকের উপর আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—দিদিগো!....

রাজবালার কান্না দেখিয়া মায়াও কাঁদিয়া উঠিল। মোহিনী ডুক্‌রিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজবালার মা লেপ একটু সরাইয়া কান পাতিয়া কান্না শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ভ্যালা জ্বালাতন! একটু নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোবার জো নেই!

গুণময় মোহিনীকে ধমক দিয়া উঠিলেন—থাম্ না মাগী, কী হাউমাউ করে চেঁচাচ্ছিস!......রাজু, মড়া ছেড়ে ওঠো, এই সময় আবার মড়া ছোঁয়া হল!...মায়া, আঃ! থাম্ বলছি! কী পিঁপি করে কাঁদিস!......

তারপর রসময়কে ও হংসেশ্বরকে বলিলেন—তোমরা পাল্কীতে উঠে চলে যাও। আমরা তারপর সৎকারের ব্যবস্থা করছি। গিন্নি গেছেন ভালোই গেছেন, হাতের নো সিঁথের সিঁদুর নিয়ে গেলেন। তবে দুদিন আগে গেলেই সব দিকে ভালো হত! যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি!...তোমরা পাল্কীতে উঠে পড়, উঠে পড়।....

রসময় মায়াকে এবং হংসেশ্বর রাজবালাকে টানিয়া জোর করিয়া পাল্কীতে চড়াইয়া দিল। রাজবালা পাল্কীতে চাড়য়াই দেখিল, তাহার পাল্কীময় রক্ত। সেই পাল্কীতে করিয়া জখমী পঞ্চাননকে উঠাইয়া আনা হইয়াছিল।

দয়াদেবীর মৃতদেহ সমাগত লোকেরা ধরাধরি করিয়া তুলিয়া বাড়ীর উঠানে লইয়া আসিল।

হংসেশ্বর দারোগার পাল্কীর পিছনে-পিছনে হাতকড়ি-বাঁধা বীরেন্দ্র ও পতিত থানায় চলিল।

রাজবালা পাল্কীতে বসিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ভাবিতেছিল—চমৎকার বিবাহ! চারিদিকে রক্ত মৃত্যু বন্ধন! সে যেখানে স্বামীর ঘর করিতে যাইতেছে, বীরেন্দ্র যাইতেছে সেইখানেই বন্দী হইয়া!

(৪০)

মারপিট দাঙ্গা খুন জখমের দায়ে বীরেন্দ্র ও পতিত দায়রায় অভিযুক্ত হইয়াছে।

পতিত বক্তৃতা দিয়া প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল; বীরেন্দ্র গুণময়ের খাইয়া মানুষ, তবু সে নিমকহারামী করিয়া তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া পতিতের দলে গিয়া ভিড়িয়াছিল;—ইহা সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল এবং পতিত ও বীরেন্দ্রও এ কথা অস্বীকার করিল না।

নায়েব পঞ্চানন বিদ্রোহী প্রজার আক্রমণের ভয়ে সর্ব্বদা আরদালী লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া ফিরিত; সেদিন জমিদার-বাড়ীতে বিবাহ ছিল, বরকন্যার বিদায়ের আয়োজন করিবার জন্য সে পতিতের বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতেছিল; বিনা কারণে অকস্মাৎ পতিত চড়াও হইয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দ্যায় ও বীরেন বন্দুক লইয়া গুলি করিতে আসে; পুলিশের জমাদার সেই সময় সেই পথে দারোগার বিবাহের পর দারোগাকে আনিতে যাইতেছিল; সে আসিয়া বন্দুক-সুদ্ধ বীরেন্দ্রকে ও পতিতকে গেরেপ্তার করে, নতুবা আরো খুনখারাপী হইত।

পতিত ও বীরেন্দ্র জমিদার-পক্ষের এই উক্তির কতক স্বীকার করিল, কতক করিল না। পতিত পঞ্চাননকে মারে নাই বলিল; কিন্তু কে মারিয়াছে তাহা সে বলিল না। বীরেন্দ্রের হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল ইহা সে স্বীকার করিল, কিন্তু কাহাকেও মারিবার জন্য নহে, বাঁচাইবার জন্য; কেমন করিয়া সে বন্দুক তাহার হাতে আসিল তাহা সে কিছুতেই বলিল না। বন্দুক পতিতেরই, তাহা উভয়েই স্বীকার করিল।

আসামীরা অপরাধ স্বীকার না করিলেও তাহাদের অপরাধ পাকে প্রকারে প্রমাণ হইয়া গেল। বিচারে পতিতের যাবজ্জীবন ও বীরেন্দ্রের দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হইল।

সেইদিন গুণময় ও পঞ্চানন উল্লাসের আতিশয্যে কালীকে জোড়া পাঁঠা দিয়া পূজা দিয়া খুব ধুম করিয়া ভোজ দিল।

রাজবালা স্বামীর মুখে খবর শুনিয়া লুকাইয়া-লুকাইয়া খুব কাঁদিল।

গুণময় এতকাল পরে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—দয়াদেবী মরিয়াছেন, বীরেনটা দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে গিয়াছে, হয়ত আর ফিরিতে হইবে না। পতিতের অভাবে সকল প্রজা কাবু হইয়া বশ মানিতেছে। এখন তিনি বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া একটি মেয়ে দেখিতে মন দিবার অবসর পাইয়াছেন। তিনি হাসিমুখে পঞ্চাননকে বলিলেন—পাঁচুদা, আর কতকাল গৃহশূন্য হয়ে থাকবো? ছোট ভাইটির একটা হিল্লে লাগিয়ে দাও।

পঞ্চাননও হাসিভরা মুখে বলিল—সে আর আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না ভাই।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

হজ

মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক প্রতি বৎসর হজ করিতে গিয়া থাকেন। হজ করিলে তাঁহারা আজীবন "হাজি" নামে পরিচিত হন। বোধ হয় অনেকে জানেন না যে হজ যাত্রা ইচ্ছামত যে-সে সময়ে হয় না। মুসলমানদের বৎসরের শেষ মাসের নাম "জি-উল-হজ্জ" (এ বৎসর ৩রা আশ্বিন আরম্ভ হইয়াছিল)। এই মাসের দশম দিবসে যে "ঈদ" বা উৎসব হয় তাহাকে সচরাচর বকরা-ঈদ বলে। এই দিবস মক্কার প্রধান মসজিদে উপস্থিত থাকিয়া বলিদান করিলে হজ করা হয় ও যাত্রী হাজি উপাধি পায়।

মক্কা মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান। এখানকার প্রধান উপাসনালয়ের নাম "মসজিদ-অল-অহরাম" বা পবিত্র মন্দির। এখানে মনুষ্যসৃষ্টির পর আদি পিতা হজরৎ আদমকে ঈশ্বর-দূত জিব্রঈল উপাসনা-পদ্ধতি শিখাইয়াছিলেন। কালে পুরাতন চিহ্ন লোপ পাইয়াছিল। পরে ঠিক সেই স্থানে হজরৎ ইব্রাহিম আপন পুত্র হজরৎ ইসমাঈলের সাহায্যে এই মসজিদ-অল-অহরাম নির্ম্মাণ করেন। প্রথমে কেবল একটি অনুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ছাদশূন্য স্থানমাত্র ছিল। ক্রমে এই উপাসনালয়টি দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চে প্রায় সমান করা হয়। দেখিতে ঠিক একটি (cube) ঘনক্ষেত্র, সেইজন্য "কাবা" নামে প্রসিদ্ধ। কোরানে অল্লাতালা আপন রসুলকে আজ্ঞা করেন যে তুমি ও তোমার মতাবলম্বীরা পৃথিবীর যে-কোন দেশে থাক না কেন, এই মক্কার পবিত্র মসজিদের দিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিবে।(১) সেইজন্য ইহার নাম "কিবলা"। দেশ-দেশান্তর হইতে ভক্ত মুসলমানেরা জিয়ারত (দর্শন) করিতে প্রতিবৎসর এই মন্দিরে আসিয়া থাকেন। হজরৎ মহম্মদ একস্থানে বলিয়াছেন "যে মুসলমান জীবনে অন্তত একবার হজ না করিয়াই দেহত্যাগ করে তাহার জীবনই বৃথা।" এইরূপ বাক্য—যাহা ঈশ্বরের আজ্ঞা নহে, কেবল রসুলের বাক্য—"হদীস" নামে প্রসিদ্ধ।

মসজিদ হইতে কয়েক মাইল দূরে তীর্থসীমা। এখানে উপস্থিত হইয়াই যাত্রী প্রথমে ক্ষৌর ও স্নান (জলাভাবে বজু অর্থাৎ জল বা বালুকাদ্বারা শরীর শুদ্ধ) করিয়া তীর্থযাত্রীর বেশ (অহরাম) ধারণ করে ও হজ করিবার "নিয়ৎ" (সঙ্কল্প) করে। তীর্থযাত্রীর বেশ—একখানি পরিষ্কার ধুতি (ইজার) কটিদেশে জড়াইতে হয় ও একখানি চাদর (রেদ্দা) উপরার্দ্ধ শরীরে জড়াইতে হয়। এ ছাড়া জুতা বা কোন-প্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করিতে নাই। এই বেশ যতক্ষণ ধারণ করিয়া থাকিবে ততক্ষণ যাত্রীকে সংযত থাকিতে হইবে। তীর্থকৃত্য শেষ হইলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া অহরাম ত্যাগ করিয়া আবার সংসারী বেশ ধারণ করিতে পারিবে। অহরাম ধারণ করিয়া জীবহত্যা করিতে নাই, গ্রাম্য কথা কহিতে বা শুনিতে নাই, ঈশ্বর ও ধর্ম্ম-চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করিতে নাই, গাছ কাটিতে নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপে সংযতভাবে আপন পাণ্ডা বা পথপ্রদর্শকের সহিত কাবা অভিমুখে যাত্রা করিতে হয় ও উচ্চস্বরে "লব্যাকা-লব্যাকা" বলিতে হয়। লব্যাকা শব্দের অর্থ "আমি উপস্থিত হইয়াছি।" এইরূপে কাবার নিকট উপস্থিত হইয়াই দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে প্রাচীর-গাত্রে যে কৃষ্ণ-প্রস্তর (সঙ্গ্ অস্‌বদ্) বসান আছে তাহাতে চুম্বন করিতে হয় অথবা হাত দিয়া ছুঁইয়া সেই হাত চুম্বন করিতে হয়। পরে কাবার চারদিকে দলবদ্ধ হইয়া প্রথম তিনবার উদ্ধতভাবে ও শেষ চারবার সংযতভাবে পরিক্রমণ করিতে হয়। পরে সফা ও মর্‌বা নামক গিরিশৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে সাতবার উদ্ধতভাবে দৌড়াইতে হয়। দেশে যখন

(১) কোরান্ ২।১৩৬-১৩৯।

মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল তখন সফা শৃঙ্গে অসাফ ও মরবা শৃঙ্গে নায়লা নামক দুইটি মূর্ত্তি ছিল। অসাফ পুরুষ ও নায়লা স্ত্রীমূর্ত্তি। এই দুইটি আগে জরহম গোত্রীয় মক্কাবাসী লোক ছিল; একবার কাবার পবিত্র প্রাঙ্গণে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল বলিয়া অল্লা রোষভরে তাহাদের প্রস্তর-মূর্ত্তি করিয়া দেন। দুষ্কর্ম্মরত মক্কাবাসীরা এই পাপীদের প্রস্তর-দেহের প্রথমে সম্মান পরে পূজা করিত। হজরৎ মহম্মদ যখন একেশ্বরবাদ প্রচার করেন তখন দেশের বহু মূর্ত্তির সহিত এগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, কিন্তু তাহাদের পূজার অঙ্গ অর্থাৎ শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে দৌড়ান আগেকার মত রহিয়া গেল। অন্য প্রবাদ যে অরবদের আদি পিতা হজরৎ ইসমাঈল ও তাঁহার মাতা হজরতা হাজিরাকে যখন ইব্রাহিম বিবাহিতা স্ত্রী সারার অনুযোগে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন একবার জলাভাবে ইসমাঈলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। তাঁহার মাতা শোকে অধীর হইয়া এইস্থানে জল অন্বেষণ করিয়াছিলেন, পরে জমজম্ উৎস দেখিতে পাইয়া পুত্রের প্রাণরক্ষা করেন। যাত্রীরা সেই কাতরা মাতার জল-অন্বেষণের অভিনয় বা অনুকরণ করিয়া থাকে।

পরে যাত্রীরা মীনা উপত্যকায় রাত্রি যাপন করে। সূর্য্যোদয়ের সময়ে অরাফাত পর্ব্বতে যায়। এইস্থানে সমস্ত দিবস উপাসনা করিয়া ও কোরান পাঠ করিয়া কাটায়। সন্ধ্যার সময়ে মুজদলিফা নামক স্থানে যায় ও সেইখানে রাত্রি জাগরণ করে। শেষ রাত্রে মশের-অল-হরম দর্শন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বতন-ই-মুহাসর পথে মীনা উপত্যকায় ফিরিয়া আসে। এই মীনা উপত্যকার একস্থানে তিনটি নির্দ্দিষ্ট স্তম্ভ আছে (বা এককালে ছিল), সেখানে সাতটি বা তদোধিক প্রস্তর-খণ্ড ছুড়িতে হয়। প্রবাদ আছে যে এখানে ইব্রাহিমকে (যখন তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞায় পুত্র ইসমাঈলকে বলি দিতে লইয়া যাইতেছিলেন) শয়তান লোভ দেখাইয়া কুপথে লইবার চেষ্টা করিয়াছিল ও তিনি ঢিল মারিয়া তাহাকে তাড়াইয়াছিলেন। মতান্তরে, আদমকে এইখানে শয়তান লোভ দেখায়। বাইবেল (ওল্ড টেষ্টেমেণ্ট) মতে ঈশ্বর ইব্রাহিমের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য পুত্র ইসহাককে শাম দেশে (Syria) বলি দিতে বলেন। তাহার বহু পূর্ব্বে ইসমাঈল নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। আধুনিক মুসলমান বিদ্বানেরা বাইবেলের কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সম্ভবতঃ পৌত্তলিক কালে ঐরূপ ঢিল ছোড়া হইত, এখনও তাহা প্রচলিত আছে; তবে পৌত্তলিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া পাছে কেহ দোষ দেয় সেইজন্য এই গল্পটি সৃজন করা হইয়াছে।

পরে মীনা উপত্যকায় যাত্রীরা আপন আপন ক্ষমতানুসারে উট, মেষ, ছাগল বলি দেয়। বলির মাংস দুঃখীদের বিতরণ করা হয়। বলি হইলেই তীর্থকৃত্য শেষ হইল। যাত্রী অহরাম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পুনরায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া চুল সেইখানেই পুতিয়া দেয়।

এই ক্রিয়াগুলি ইসলাম প্রচারের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, পরে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যথা কাবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে মূর্ত্তি-উপাসকেরা উলঙ্গ হইয়া প্রদক্ষিণ করিত বলিয়া বর্ণিত আছে, তবে কৌপিন ব্যবহার করিত কি না কোন পুস্তকে পাই নাই। অরব দেশে জলাভাব, কাপড় কাচার পাট নাই। মূর্ত্তি-উপাসকেরা বলিত তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র অশুদ্ধ হওয়া সম্ভব, অশুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া উপাসনা করা অনুচিত। এবং সেইজন্য উপাসনার সময় তাহারা বস্ত্র ত্যাগ করিত।

হজরৎ মহম্মদ মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন ঐতিহাসিকেরা অতি সূক্ষ্মভাবে সেগুলি লিখিয়া রাখিয়াছে। যাত্রীরা যথাসম্ভব তাহার অনুকরণ করে। এমন কি তিনি পরিক্রমণ করিয়া পিপাসা বোধ করেন; তখন একজন খেজুর-জল-বিক্রেতার কাছে এক পাত্র জল পান করেন। যাত্রীরা এখনও সেই জল-বিক্রেতার বংশধরের কাছে এক এক পাত্র খেজুর-জল পান করিয়া থাকে। এইরূপ অনুকরণকে "সুন্নত" বলে।

কাবার পাশেই জমজম কূপ। ইহার জল পান করিতে হয়। যাত্রীরা একটি ছোট টিনের শিশিতে জল পুরিয়া মুখ আঁটিয়া লইয়া যায়। এরূপ শিশিকে জমজমি বলে। জেরুসেলেমের খৃষ্টীয় যাত্রীরা জর্ডন নদীর জল এইরূপে লইয়া যায়।

ইহা ছাড়া মক্কাযাত্রীদের একখানি প্রস্তর দেখান হয়। কোরানের আজ্ঞামতে এই প্রস্তর বা ইব্রাহিমের স্থান দর্শন করা উচিত। প্রবাদ আছে যে ইব্রাহিম এই পাথরের উপর দাঁড়াইয়া কাবার প্রাচীর গাঁথিয়াছিলেন। এই প্রস্তর দর্শন করিবার কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই।

মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী হইয়াও "হজ" করা জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। হজরত মহম্মদের দ্বারা ইসলামধর্ম্ম প্রচারের বহুকাল পূর্ব্বেও পৌত্তলিক অরবদের মধ্যে ঐসকল কৃত্য প্রচলিত ছিল। সেইসব প্রথাই অল্প পরিবর্ত্তিত আকারে একেশ্বরবাদী মুসলমানধর্ম্মের কৃত্য রূপে এখনও বর্ত্তিয়া আছে। বোধ হয় হজরত মহম্মদ বর্ব্বর পৌত্তলিকদিগকে আপন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া পৌত্তলিক ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করেন নাই।

হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য। শ্রীঅমৃতলাল শীল।

ভাবিবার কথা

মানুষ ভাবিতে পারে। মানুষের ভাবা উচিত। মানুষ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। অনেক সময়েই তাহার ভাবনাগুলি এলোমেলো, খাপছাড়া, একের সঙ্গে অপরের কোনো সম্পর্ক নাই। বেশীর ভাগ লোকেরই ভাবনা শুধু খেয়ালমাত্র। তার না আছে শৃঙ্খলা, না আছে উদ্দেশ্য, না আছে কোনো-একটা অর্থ। তাই লোকের ব্যবহারে ও কাজে ভাবের বা ভাবনার কোনো ছাপ নাই। বাহিরের জগতের আঘাতে যখন যেরকম সাড়া আসে, তখনই তার কাজ সেই মূর্তিতে প্রকাশ পায়। ভিতরের কোন চিন্তা বা সংকল্প বাহিরের ধাক্কার অপেক্ষা না করিয়া কাজকে ঠেলিয়া জাগাইয়া তোলে না। বাহিরের আঘাতের অনুসারী হইয়া মানুষ ভিতরকে একেবারে দেউলিয়া করিয়া ফেলে। সে পুরাপুরি অবস্থার দাস হইয়া পড়ে। তাহার কথা, ভাবনা ও কাজ,—ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতাতপ প্রভৃতি অনিবার্য্য প্রবৃত্তির এবং বাহিরের ঘটনা-সমষ্টির ষোলআনা অধীন। না খাটিলে উদরান্ন জুটিবে না, তাই সে পরিশ্রমী। ঠিক সময়ে হাজির না হইলে চাকরী থাকে না, অথবা রেলের গাড়ী ধরা যায় না, কাজেকাজেই সেইসব ক্ষেত্রে সে নিয়মমত সময় মানিয়া চলে। বাহিরের চাবুক যেখানে নাই, সে সেখানে নিয়মের কোনো ধারই ধারে না। ভিতরকে সে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। কাজেকাজেই ভিতরের কোনো তাড়না এবং সংযম তাহার "স্বাধীন" কাজে শৃঙ্খলা বা শক্তি জোগাইয়া দেয় না।

ধর্ম্ম তাহার কাছে সংস্কারের বোঝা। অজানা ভয়ে আর চিরাচরিতের চাপে সে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানকে মানিয়া লইয়াই খালাস। রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে খবরের কাগজে সে চোখ বুলায় উহার আওড়ান বুলিই তাহার মত। চুটকি, ডিটেক্টিভের গল্প, আর ছোট গল্প এবং প্রেমের অনতিদীর্ঘ উপন্যাস তাহার পাঠ্য। কারণ ইহাতে সবই ভাসাভাসা, এবং ইহা সুড়সুড়ি ও চুলকানির মত অমনি উপরে উপরে একটা বোধ জাগায়, ভিতরের সঙ্গে ইহার যোগের কোনো বালাই নাই। মুরব্বিয়ানার সর্দ্দার, সভ্যতার ইলেক্‌ট্রিক এবং গ্যাসের আলোকে দীপ্ত ইউরোপ ও আমেরিকা এ বিষয়ে অবশ্য পেছুহটা জাতিদের ওস্তাদ।

উদরান্নের জন্য খাটিয়া যে সময়টা খালি থাকে তাহা কাটাইবার উপায়—খেয়াল, আড্ডা আর হুজুগ। কাজেই মানুষ মরিয়াছে ও মরিতেছে। কোথাও কোথাও মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে—ভূতের মত শারীরিক শক্তি লইয়া খাটে, ভূতের মত অমানুষিক আমোদস্ফূর্ত্তিতে মাতে। মাথায় খুলি আছে, ছোটবড় চুল আছে, কিন্তু চিন্তার কেন্দ্র মস্তিষ্ক নাই। পেটে নাড়িভূঁড়ি আর বুকে শ্বাসপ্রশ্বাসের কল ফুস্‌ফুস্‌ আছে, অনুভূতির কেন্দ্র হৃদয় নাই। হাটে-পথে ফড়িয়া ও ফেরিওয়ালা হাঁকাহাঁকি করিয়া 'প্রেম' বলিয়া যে বেসাত বেচিতেছে তাহা রক্তমাংসের দুর্দ্দাম দুর্দ্ধর্ষ ক্ষুধা এবং সম্ভোগলিপ্সার উৎকট জ্বালা।

আর আমরা মরিয়া গাছপালা হইয়া আছি। কেহ কেহ পুত্তলিকা হইয়া খাসা রং মাখিয়া সাজগোজ করিয়া পুরাতত্ত্বের পুতুলের মত বসিয়া আছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিও—পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, ইত্যাদি।

বাহিরকেই সর্ব্বস্ব করিয়া পুরাদস্তুর বহির্মুখ হইয়া, ভিতরের সম্পর্ক জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াই মানুষের এই দুর্গতি। প্রকৃতির বিস্তৃত সাম্রাজ্যের দিকে একবার চাহিয়া দেখ দেখি! ফুল ভিতরকে ফুটাইয়া সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ বুকে ধরিয়া বাহিরে তাহার সাড়া পাঠাইয়াছে। ফল কোন নিভৃত শক্তির বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে রসে ও স্বাদে ভরিয়া উঠিয়াছে। এখানে ভিতরের আত্মপ্রকাশে বাহির সহায়। ভিতর কর্ত্তা,—বাহির করণ। বাহির টানিয়া ফুল ফল ফোটায় না, ফোটাইতে পারে না।

অভ্যন্তরের প্রকৃতি ও শক্তির তত্ত্ব বুঝিয়া বাহ্যপ্রকরণ যেখানে তাহার অনুবর্ত্তী, সেইখানেই সিদ্ধি, সেখানেই জয়। দৃষ্টান্ত Scientific agriculture, বিজ্ঞানসেবিত কৃষি। ফল ছিল তের আঙুল। তাহার পুষ্টির ভিতরকার তত্ত্ব বুঝিয়া লইয়া বিজ্ঞান তাহাকে তেত্রিশ আঙুল করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষ কথা কহিতে পারে, মনুষ্যেতরেরা পারে না। সুতরাং বাক্য মানুষের আভিজাত্যের সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদ প্রায় বিপদ হইয়া উঠিয়াছে। বেশীর সময় তাহার উদর

হইতে কথা আসে অর্থাৎ মানুষ উদরান্নের জন্য কথা বলে, তাহা ছাড়া প্রায় সর্ব্বত্রই তাহার বাক্যের উৎপত্তি জিভের ডগায় আর ঠোঁটে। মস্তিষ্কের গভীর কেন্দ্র অথবা হৃদয়ের অভ্যন্তর-দেশ হইতে উঠিয়া জিহ্বাকে জাগাইয়া ঠোঁটকে নাড়াইয়া যে-কথা আত্মপ্রকাশ করে না, সে কেবল বকর-বকর। তাহা কানের পর্দ্দায় আসিয়াই নিঃশেষ হইয়া যায়, মরমে প্রবেশ করিতে পারে না। তাই এত অশ্রান্ত বচনহিল্লোল ও বক্তৃতাকল্লোল চিন্তা অথবা ভাব জাগাইতে অক্ষম। খানিকটা frictional heat ঘষাঘষির গরম (ভাল কথায়, সংঘর্ষজনিত উত্তাপ) জন্মায়, তাহা আবার অল্প-কালেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ইহাকে খেয়াল, হুজুগ, হৈচৈ যাহা খুসি বলিতে হয় স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।

সংকল্প স্থির করিয়া লাভক্ষতি ও ভালমন্দ বিচারের পর কাজকরা মানুষেরই একচেটিয়া অধিকার। পশুপক্ষী প্রভৃতির কাজে অপর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না—শুধু পেটভরানো এবং আত্মরক্ষা। কল্পনা ও বিচারণার শক্তি মানুষ ছাড়া আর কাহারও নাই। সাহিত্য, শিল্প, কলা, সঙ্গীত বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে মানুষের কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে নূতন চেতনা পাইয়া মানবসভ্যতাকে বিচিত্র, জীবন্ত ও শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। কল্পনার সাড়ায় ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ের গোপনকক্ষে উৎসবের দীপালীর আলো নৃত্য করিয়াছে। মানুষ তাহার আটপৌরে জীবনের মাপজোক ছাড়াইয়া উঠিয়া অজানাকে জানিতে চাহিয়াছে, অচেনাকে চিনিবার আনন্দে ও প্রয়াসে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। আকাশে যে আলো কখনও খেলে নাই, যাহার কিরণ কোনো দিন পৃথিবীর বুকে আসিয়া পড়ে নাই, সেই আলো মানুষের চোখের তারায় ভাসিয়া উঠিয়াছে। কাব্য-কলা শুধু সেই ভিতরের আলোর বাহিরে প্রতিবিম্ব। কম্পাস্ ও তুলি ধরা আয়ত্ত করিয়া অথবা ছন্দের মাত্রা গুনিয়া কোনো দিন বাহির হইতে কেহ ইহাদের সৃষ্টি করে নাই, সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাজমহল ও ভুবনেশ্বরের মন্দির বাহিরে ইটপাথর সাজাইয়া, রং মাখাইয়া, ছবি আঁকিয়া কোনো শিল্পী এমন অপূর্ব্ব সুন্দর করিয়া তোলে নাই। তাজমহল ও ভুবনেশ্বরের মন্দির তাহাদের সৌন্দর্য্যমুকুট পরিয়া, ভাষা যাহার কাছে মূক সেই শোক ও প্রেম এবং ভক্তির মূর্ত্তিরূপে আগে মানুষের মনে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার পর বাহিরের উপকরণ লইয়া সেই ভিতরের সৃষ্টি বহির্জ্জগতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। বাহিরে যাহা দেখিতেছ উহা ছায়া অথবা কায়া। উহাদের আত্মা নির্ম্মাতার অন্তরের ভিতরে। তাজমহল ও ভুবনেশ্বরের সৃষ্টি হইত না, যদি উহাদের উপযোগী কল্পনা চিন্তা ও ভাব না থাকিত। বাহির অবশ্য উপকরণ জোগাইয়াছে। তাহাকে চিরদিনই উপকরণ জোগাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যাহা দেখিয়া বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে, আনন্দে ও আবেগে প্রাণ নাচিয়া উঠে, অনুভূতির ভিতে ভিতে ভূমিকম্পের ধাক্কা লাগে, মনে রাখিও তাহা আগে ভিতরে গড়িয়া উঠিয়াছে। বাহির ভিতরের ফটোগ্রাফ।

ইহার আর-একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষের ইতি-হাসের সবচেয়ে বড় যুগ অশোকের যুগ। ইহার কল্যাণেই ভারতের ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া, সাগর পার হইয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এসিয়ার সভ্যতায় ও অধ্যাত্মজীবনে ভারতের গুরুগিরির প্রকৃষ্ট পত্তন এই সময়েই। ভারতবর্ষের বিরাট দেহ অশোকের রাজত্ব-কালেই একসাড়ায় নড়িয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, পশুপক্ষীর চিকিৎসা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি শত অনুষ্ঠানের কাহিনীতে মণ্ডিত হইয়া এই যুগই আমাদের ইতিহাসকে এখনও উজ্জ্বল রাখিয়াছে। ভারতবাসী সাম্রাজ্য গড়িতে পারে (Capable of empire building) এই আশা ও শ্লাঘার কথার অমোঘ প্রমাণ মহারাজ অশোকই দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই অশোক কোন্ অশোক? চণ্ডাশোক না ধর্ম্মাশোক? অশোকের ভিতর যখন 'চণ্ড', 'রুদ্র', তখন বাহিরে কাটাকাটি, মারামারি ও উৎপীড়ন। যখন ভিতর বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, প্রাণে যখন করুণা মৈত্রী ও প্রেমের বান ডাকিয়াছে, অন্তর যখন নিখিল মানবকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখনই এই গৌরব কীর্ত্তি অনুষ্ঠান ও অবদানের সমৃদ্ধিসম্ভার লইয়া "অশোকের যুগ" পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়।

ঝাঁকামুটে

স্বাধীন, ভাবনাহারা প্রাণ,
খাটিত সে রাত্তি-দিনমান,
সহরে গরীব ঝাঁকামুটে ;
গোলামী ছিল না কভু জানা,
খাইত গতর-খেটে-আনা
দুবেলা দুমুটো যাহা জুটে !
অন্ধ আতুর দেখে গ'লে
খুলিয়া কোমরে-বাঁধা থলে
আধেলা বাহির কা'র' দিত,
'চুকে-কথা' ছিল না ক তার,
বাঁশের ঝাঁকাটা ছাড়া আর
কারো ধার কভু ধারেনি তো !
কখন বা কোন বড়লোক
চাহিত করিয়া রাঙা-চোখ
মজুরী চাহিলে কিছু বেশী ;—
জবাবে একটি কথা ক'লে
"ছোটলোক লাই পেল" ব'লে
ডাক দিত পাড়া প্রতিবেশী !
স্পর্দ্ধা দেখিয়া, উঁচু স্বরে
হিন্দী বলিয়া, শ্রমভরে
চুরুট কিনিত ভালো দেখি' ;
সে যেন দুখেরই শুধু ভাগী,
সে যেন এসেছে নিতে মাগি'—
ভাবিত অবাক্ হয়ে—"একি !"
শরীরে শকতি ছিল, খেটে
বছরে বছর গেছে কেটে
মোট বহি'·গনি গাহি গাহি' ;
দ্বিগুণ হয়েছে মোটে ভার ;—
আজ সে হয়েছে বুড়ো, আর
শরীরে সে বল তার নাহি।
পারেনা খাটিতে তত রোখে—
তেমন আসেনা ঘুম চোখে,
থরথর কাঁপে শীতে দেহ ;
কাপড় আঁটেনা খোলা বুকে,
সময়ে পড়েনা জল মুখে,
মাথাটি রাখিতে নাহি গেহ !
সেদিন সারাটি রাত ধ'রে
বেচারা পথের পরে প'ড়ে
যাতনা পেয়েছে কত শীতে ;—
চেষ্টা করেছে কত গিয়া
শিথিল দুবাহু পসারিয়া
বৃথাই ঝাঁকাটা মুড়ি দিতে !
ভোর হ'ল—অচল অসাড়,
হিম-জমা দেহটি তাহার,—
কষ্টে টানিছে গুরুশ্বাসে !—
কপালে উঠেছে আঁখিতারা
পাঁজর ভাঙিয়া হ'ল সারা—
সব বুঝি শেষ হ'য়ে আসে !
তপন গরম আলো নিয়ে
যখন ঢাকিল তারে গিয়ে
সে তখন নাই পৃথিবীতে !—
কাশ্মীরী শাল দিয়ে গায়
কত লোক দেখে বলে যায়—
"মুটেটা মরিল বুঝি শীতে !"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

একটি নূতন ব্যবসায়

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে ব্যবসায়ের প্রতি বাঙ্গালীর যত্ন লক্ষিত হইতেছে। ছোটবড় নানাবিধ ব্যবসায়ের সূত্রপাত নানাস্থানে হইয়াছে ও হইতেছে। লক্ষ্মীর আরাধনার জন্য যে বাণিজ্যের নৈবেদ্য সাজাইতে হয়—ব্যবসায়ের কনক-শতদলের উপরই যে কমলা তাঁহার রাতুলকোমল চরণ দু'খানি অর্পণ করিতে ভালবাসেন তাহা বাঙ্গালী ক্রমশঃ বুঝিতেছেন। দেশের ভাবী উন্নতিসাধনের পক্ষে ইহা অতি শুভসূচনা।

বাঙ্গালায় নানাস্থানে দেশের শ্রীবৃদ্ধিজ্ঞাপক নানাবিধ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা আছে ও হইতেছে। যশোহরের চিরুণী,

ঢাকার সাবান বোতাম কলম, রঙ্গপুরের তামাক ও দিনাজপুরের চিনির কল, কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের কাপড় এবং পাবনা ও বেলেঘাটার গেঞ্জি—ইত্যাদির সংবাদ অনেকেই জানেন এবং এই-সমস্তের খ্যাতি সমুদয় বঙ্গ জুড়িয়া ব্যাপ্ত আছে। এইসব অনুষ্ঠান বাঙ্গালার জাগরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে হইতে বাঙ্গালার একটি অজ্ঞাত অখ্যাত জেলায় বাঙ্গালীর স্বল্প অর্থে ও স্বল্পতর সামর্থ্যে যে অসীম লাভজনক একটি ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহার কোন সংবাদ কেহ পরিজ্ঞাত নহেন। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ একটি একটি করিয়া তদনুরূপ প্রায় ৪০ টি অনুষ্ঠান গঠিত হইয়া নীরবে বাঙ্গালার বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, সে সংবাদও কেহ রাখেন না। আমি তাহাদেরই একটি ক্ষুদ্র পরিচয় লইয়া আজ আসিয়াছি।

এই স্থানটির নাম জলপাইগুড়ী। ইং ১৮৭৯ সালে সর্ব্বপ্রথম এস্থানে চা-বাগানের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর হইতে প্রায় প্রতিবৎসর একএকটি করিয়া বর্ত্তমান সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত প্রায় ৪০টি যৌথকারবার স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্তগুলির সমবেত-মূলধন অর্দ্ধকোটী টাকার অধিক। সমস্ত অনুষ্ঠানই সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত—সুন্দরভাবে গঠিত। বাঙ্গালীর অর্থ ও সামর্থ্য যে কী সাধন করিতে পারে তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

এই ক্ষুদ্র সহরের লোকসংখ্যা একাদশ সহস্রের অধিক হইবে না। এইপ্রকার ক্ষুদ্র স্থানে ৪টি দেশীয় ব্যাঙ্ক ও একটি বেঙ্গলব্যাঙ্কের শাখা আছে। প্রাগুক্ত কারবারসমূহের সদর কার্য্যালয়ও এই স্থানে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন আরও শতাধিক বিদেশীচালিত বাগান এই জেলায় প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বসমেত এই প্রদেশ হইতে প্রায় তিনকোটী টাকার মাল আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। আমরা যতদূর জানি বাঙ্গালার আর কোনও জেলা বাণিজ্যে এত সমৃদ্ধ নহে।

আমাদের নিজস্ব চা-বাগানসমূহ হইতে অংশীদারগণ অসম্ভব-প্রকার বেশী লাভ পাইয়া থাকেন। ইয়ুরোপীয় কোন বাগান এত লভ্যাংশ বিতরণ করিতে এযাবৎ সমর্থ হয় নাই। এই-সব কারবারের অংশীদার হইয়া টাকা খাটাইলে ব্যাঙ্ক অথবা কোম্পানীর কাগজ অপেক্ষা খুব বেশী লাভ পাওয়া যায়। নিম্নে মাত্র দুইটি উদাহরণ দিতেছি :—

১। চামুর্চ্চী নামক একটি চা-বাগান আছে। ইহার মূলধন ৫০ হাজার টাকা এবং প্রতি-অংশ ৫০৲ টাকায় বিভক্ত। এ বৎসর এই বাগানে ৮০ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে—অর্থাৎ অংশীদারগণ শতকরা বার্ষিক ১৬০ টাকা, অর্থাৎ ৫০টাকার অংশে ৮০ টাকা করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ ৫০ টাকার অংশ এখন বাজারে এক হাজার টাকায় বিক্রয় হয়। সুতরাং এক হাজার টাকা দিয়া কেহ ঐ অংশ ক্রয় করিলে বৎসরে ৮০ বা তাহার বেশীও পাইবেন। বেঙ্গলব্যাঙ্কে বা কোম্পানীর কাগজে হাজার টাকার সুদ বৎসরে ৩৫ টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং এস্থানে তাহার দ্বিগুণ লাভ পাওয়া যাইতেছে। আবার বাজারের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ঐ হাজার টাকার অংশ দেড় বা দু-হাজারেও বিক্রয় করিতে পারা যায়। তাহা ততোধিক লাভজনক। কোম্পানীর কাগজ কখনও এত মূল্যে বিক্রয় হইবে না।

২। মোগলকাটা নামে আর-একটি বাগান আছে। উহার প্রতি অংশের মূল্য ২৫০৲। এ বৎসর ঐ বাগানে শতকরা ৮৫৲ লাভ পাওয়া গিয়াছে। ঐ ২৫০৲ টাকার এক-একটি অংশ এখন বাজারে প্রায় দুই হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। কেহ দুই হাজার টাকা দিয়া ঐ অংশ ক্রয় করিলে বৎসরে তিনি ২১২॥০ টাকা বা তাহার অধিকও পাইতে পারেন। এস্থলে কোম্পানীর কাগজের তিনগুণ সুদ পাওয়া যাইতেছে।

এ স্থানে এবম্বিধ আরও বহু কোম্পানী আছে যাহারা শতকরা ২৫৲ টাকা হইতে উক্ত ১৬০৲ পর্য্যন্ত লাভ প্রতিবৎসর অব্যর্থভাবে বিতরণ করিয়া আসিতেছে। এই-সমস্ত কোম্পানীর অংশ যে-কেহ ইচ্ছা করিলে ক্রয় করিতে পারেন। জিজ্ঞাসুগণ এ সম্বন্ধে এই নিবন্ধ-লেখকের নিকট পত্র লিখিলেই জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

বাঙ্গালার ধনকুবেরগণের দৃষ্টি আমরা এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। ব্যাঙ্কে টাকা-গচ্ছিত না রাখিয়া তাঁহারা এই দিকে প্রেরণ করুন। এই-সমস্ত কারবারে নিযুক্ত হইয়া

তাঁহাদের অর্থ জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হউক। যে ব্যবসা প্রদেশে গুপ্ত রহিয়াছে তাহা তাবৎ বাঙ্গালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় হউক। কমলাসনা-কমলার স্মেরাননের শুভ্রহাস্যে অবার সারা বঙ্গ বৈভবোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

সুকুমার বিদ্যাবিনোদ।
মেসার্স ঘোষ এণ্ড দাস,
ব্যাঙ্ক-সৌধ,
জলপাইগুড়ী।

স্পেনে ধানের চাষ

ইউরোপের ধান্যোৎপাদক দেশের মধ্যে ইটালিই সর্ব্বপ্রথম, স্পেনের স্থান তাহার পরেই। ইটালিতে প্রায় ১০৮২২৫০ বিঘা এবং স্পেনে ২৮৮৬০০ বিঘা জমীতে ধানের চাষ হয়।—(ভারতবর্ষে ধানের জমী প্রায় ২১২০০০০০০ বিঘা)। দক্ষিণ ইউরোপের অন্যান্য দেশে ধানের চাষের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য। বুল্‌গেরিয়ায় ইহার চাষ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, গ্রীসে ধানের জমী খুব বেশী ত ১০০০ বিঘা। ফ্রান্সে রোন নদীর মোহানার নিকট কিয়ৎপরিমাণে ধানের চাষ হইতেছে এবং ইহার বিস্তারের জন্য সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ খুব চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের লোকের ধারণা ধানজমীর বদ্ধজল হইতেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয় এবং এই কুসংস্কারই ধানচাষের বিস্তারের প্রধান অন্তরায়। আন্তর্জাতিক ধান্যমহাসভার (International Rice Congress) ৫ম অধিবেশনে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছিল এবং অনেক তর্কবিতর্কের পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইউরোপের লোকের এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক এবং ধানজমী লোকালয়ের নিতান্ত সংলগ্ন না হইলে তাহা হইতে স্বাস্থ্যহানির কোন আশঙ্কা নাই। স্পেনে এই বিষয়ে অনেক আইনকানুন আছে; সেখানের আইন-অনুসারে ধানজমী লোকালয় হইতে অন্ততঃ ১৫০০ "মিটার" (প্রায় আধ ক্রোশ) দূরে হওয়া চাই। ভারতবর্ষে এসব বিষয়ে কোন আইন নাই এবং দরকারও হয় না।

স্পেনে ধানের চাষ পূর্ব্বোপকূলের মধ্যেই আবদ্ধ এবং মোট ধানজমীর প্রায় ১২ আনা ভাগ এই ভ্যালেন্‌সিয়া প্রদেশেই অবস্থিত। এই ভ্যালেন্‌সিয়া প্রদেশেই ধানের চাষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইটালী, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে ধানজমীতে নিয়মিত শস্য-পর্য্যায় (Rotation of Crops) অনুসারে অন্যান্য শস্যেরও চাষ হয়, কিন্তু স্পেনে প্রায় সকল ধানজমী কেবলমাত্র ধানের জন্যই নির্দ্দিষ্ট এবং সাধারণতঃ তাহাতে অন্য কোন শস্য বোনা হয় না। ভারতবর্ষেও ধানজমীতে কোন নিয়মিত শস্য-পর্য্যায় নাই, তবে সাধারণতঃ আমাদের চাষীরা ধানজমীতে তিসি, যব, ছোলা, মসুর, খেঁসারি প্রভৃতি কোন রবিশস্য লাগায়। স্পেনে ধানের চাষ অবিকল ভারতবর্ষেরই মতো, প্রভেদ শুধু এই যে সেখানকার চাষীরা অশ্রান্ত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া উন্নত উপায়ে জমী চাষ করে, জমীতে ভাল করিয়া সার দেয় এবং বিঘাপ্রতি ভারতবর্ষের প্রায় সাড়ে তিনগুণ শস্য পায়; চাষের উন্নতি করিতে তাহারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট, কারণ পুরাতনের মোহ তাহাদের আবিষ্ট করিতে পারে নাই এবং জাত নষ্ট হইবার ভয় তাহাদের নাই; আর আমাদের চাষীরা চাষের উন্নতির বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, বিশেষ কোন চেষ্টা বা যত্ন না করিয়া সেই মামুলী কৃষি-যন্ত্রাদির সাহায্যে যাহা পায় তাহাই লাভ বলিয়া মনে করে এবং শস্য পায় তাহারা পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম।

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের ন্যায় স্পেনে ধান-ক্ষেতে কাদাচাষ (Puddling) করা হয়, চারা বীজজমী হইতে নাড়িয়া পোঁতা হয় (Transplanting) এবং প্রয়োজন হইলে চাষীরা জলসেচন করে। স্পেন ও প্রাচ্যদেশের ধানের চাষে এতাদৃশ সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে মূররাই (Moors) স্পেনে ধানের চাষ প্রথম প্রচলিত করে এবং তাহাদের কাছ হইতেই স্পেন ধানচাষ করিতে শিখিয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় স্পেনের ধানজমী সাধারণতঃ নিম্ন ও জলা, এবং বীজজমী মাঠ হইতে অনেক উচ্চে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক চাষী নিজের নিজের বীজজমী তৈয়ারী করে। কিন্তু স্পেনের চাষীরা সকল

জমীকেই বীজ বুনিবার যোগ্য মনে করে না এবং সাধারণতঃ তাহারা চারাগাছ (Seedlings) অন্য চাষীর কাছ হইতে কেনে। অ্যাল্‌বারিক (Alberique) প্রদেশের জমী চারা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ এবং সেখান হইতে চারাগাছ প্রচুর পরিমাণে নিম্নস্থ প্রদেশে রপ্তানী হয়। স্পেনের চাষীরা সজীসার (green-manure) ও সাল্‌ফেট্ অফ্ অ্যামোনিয়া, সুপার্‌ফস্ফেট্ অফ্ লাইম্ প্রভৃতি রাসায়নিক সার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া বীজজমীকে উর্ব্বর করিয়া তোলে। জমীকে অছিদ্র (Impervious) করিবার নিমিত্ত বীজ ছিটাইবার পূর্ব্বে একটা বা দুইটা কাদাচাষ দেওয়া হয়; ভারতবর্ষের ন্যায় লাঙ্গল দিয়া কাদাচাষ হয়, আবার অনেক সময়ে শুধু দাঁড়ানো জলে চষা মাঠের উপর দিয়া ঘোড়াকে ইতস্ততঃ চালানো হয় এবং তাহাতেই কাদাচাষের কাজ হয়।

সেপ্টেম্বর্ অক্টোবর্ মাসে যখন ধান কাটা হয় তখনও অবধি মাঠে তিন চার ইঞ্চি জল থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা শুকাইয়া যায়। জল একেবারে শুখাইয়া যাইবার পূর্ব্বে জমী অনুসারে জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে একবার লাঙ্গল দেওয়া হয়। স্পেনে ধানক্ষেতে একপ্রকার অত্যন্ত অনিষ্টকর আগাছা (Leersia Oryzoides) জন্মায়, এই চাষের দ্বারা সেই-সকল আগাছা উপড়াইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই কাজের জন্য জমীর আঁশ (texture) অনুসারে স্পেনে অনেকপ্রকার লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। যখন জল একেবারে শুখাইয়া যায় তখন, মাটী উল্‌টাইয়া দেয় এরকম কোন লাঙ্গলের দ্বারা, খুব ভাল করিয়া একটা গভীর চাষ দেওয়া হয়; এই চাষকেই স্পেনের কৃষকেরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও উপকারী বলিয়া মনে করে। মাটী উল্‌টাইয়া যাওয়ার দরুণ নীচের মাটী আলো ও হাওয়ার সংস্পর্শে উর্ব্বর হইয়া ওঠে (Weathering) এবং অবশিষ্ট আগাছা-সকল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্তও স্পেনের চাষীরা আমাদের লাঙ্গলের মতো একপ্রকার লাঙ্গল ব্যবহার করিত, তাহার নাম ছিল Forcat, কিন্তু তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে মাটী-উল্‌টাইয়া-দেওয়া লাঙ্গল সে লাঙ্গলের অপেক্ষা ঢের বেশী উপকারী। যে মাসে ধানচারা নাড়িয়া পুতিবার দিনকতক পূর্ব্বে মাঠে দুই তিনটা কাদাচাষ দেওয়া হয়, ইহার দ্বারা অবশিষ্ট দুএকটা আগাছা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, জমী নরম এবং অছিদ্র হয়।

ধানক্ষেতগুলিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া হয়। সজী-সার ছাড়া সাল্‌ফেট অফ্ অ্যামোনিয়া, সুপারফস্ফেট অফ্ লাইম প্রভৃতি কৃত্রিম সারও ব্যবহৃত হয়; কেহ কেহ পটাস্-ঘটিত সারও (Potassic manures) ব্যবহার করেন, তবে ইহার উপকারিতার বিষয়ে এখনও অনেক মতভেদ আছে। সাধারণতঃ শতকরা ৪০ ভাগ সাল্‌ফেট্ অফ্ অ্যামোনিয়া, ৫৪ ভাগ সুপার্‌ফস্ফেট্ ও ৬ ভাগ সাল্‌ফেট্ অফ্ পটাস্ একসঙ্গে মিশাইয়া বিঘাপ্রতি আড়াই মণ বা তিন মণ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। অ্যাল্‌বারিক্ প্রদেশে গুয়ানো (Guano) প্রচুর ব্যবহৃত হয়। স্পেনে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ধানক্ষেতে নাইট্রেট্ অফ্ সোডা বা নাইট্রেট্ অফ্ পটাস্ বিশেষ কার্য্যকর নয়, সুতরাং ধানের চাষে ঐ-সকল সার একেবারেই ব্যবহৃত হয় না।

চারা মাঠে পুতিবার সময় তিন চার ইঞ্চি জল থাকে; চারা পুতিবার প্রণালী অবিকল ভারতবর্ষেরই মতো। চারাগুলি যখন ৯ ইঞ্চি বা ১ ফুট লম্বা হয় তখন তাহাদের বীজজমী হইতে উঠাইয়া শিকড়ের মাটি ধুইয়া ফেলিয়া আঁটি বাঁধা হয়; এক আঁটিতে ৪০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত চারা থাকে এবং একবিঘা জমীতে প্রায় ৮৫ আঁটি লাগে। একবিঘা বীজজমী হইতে ১০।১২ বিঘার চারা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ৮।১০ ইঞ্চি তফাতে ৪।৫টি চারা একসঙ্গে পোতা হয়, ছয়টা কুলী একদিনে এক "হেক্টার" (প্রায় ৭½ বিঘা) জমীতে চারা পুতিতে পারে। চারা পোতা হইবার পর ধানকাটার আগে অবধি বিশেষ কোন কাজ নাই, কেবল জুন্ বা জুলাই মাসে মাঠ হইতে জল বাহির করিয়া দিয়া আগাছা তুলিয়া ফেলা হয় এবং এই সময়ে প্রায়ই কিছু সার দেওয়া হয়। ধান পাকিলে কাস্তে দিয়া কাটিয়া খামার-বাড়ীতে (Farmyard) লইয়া যাওয়া হয়। যাহারা একটু অবস্থাপন্ন তাহারা ধান আছড়াইবার ও ভানিবার জন্য কল ব্যবহার করে; যাহাদের জমী অল্প তাহারা মজুর এবং ঘোড়ার পায়ে দলিয়া ধান পৃথক করে, মধ্যে মধ্যে উলটাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত প্রত্যেক মজুরের হাতে একটা করিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত কাঁটা থাকে। ধান

আছড়ানো হইবার পর তাহাদের হাওয়ায় ছুড়িয়া দেওয়া হয় তাহাতে কুটা প্রভৃতি জঞ্জাল পৃথক হইয়া যায়; স্পেনে কুলা বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। সম্প্রতি স্পেনে বড় বড় কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ধান আছড়ানো, পরিষ্কার করা প্রভৃতির খরচ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে যদি এই-বিষয়ে কেহ মন দেন তাহা হইলে তিনি নিজে খুব উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং দরিদ্র কৃষকদেরও অনেক উপকার হয়। প্রাদেশিক কৃষিবিভাগসকল এই বিষয়ে চেষ্টা করিতেছে এবং সর্ব্বত্রই পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই-সকল কলে দেশী উপায়ের অপেক্ষা অনেক শস্তায় এবং শীঘ্র কাজ হয়। সাবোর কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে (Agricultural Experiment Station—Sabour) একটা ধান-আছড়ানো কল আছে, তাহাতে একমণ ধান আছড়াইতে ও পরিষ্কার করিতে মোট খরচ পড়ে ৬ পয়সা, দেশী উপায়ে একমণ ধান আছড়াইতে খরচ পড়ে ৬ আনা হইতে ৮ আনা। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে একমণ ধান আছড়াইতে ও পরিষ্কার করিতে ১ টাকা পর্য্যন্তও খরচ পড়ে।

স্পেন ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধানের চাষের পরিমাণের একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

দেশ	ধানজমীর পরিমাণ	মোট ধানের ফসল	"একার"-প্রতি ধানের ফসল
স্পেন্	৯৭,০০০ "একার"	২৪৬,০০০ "টন্"	৫,৭০০ "পাউণ্ড"
ইটালি	৩৬০,০০০ ,,	৫৩৪,০০০ ,,	৩,৩০০ ,,
মিশর	২৫৪,০০০ ,,	৩৭৫,৩০০ ,,	৩,৩০০ ,,
জাপান	৭,৩৯৩,০০০ ,,	৭,০২৬,০০০ ,,	২,১০০ ,,
মার্কিন্	৮২৭,০০০ ,,	৫১৭,০০০ ,,	২,০০০ ,,
ভারতবর্ষ	৭০,৫৮০,০০০ ,	২৮,১৬৭,০০০,,	১,৬০০ ,,

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে স্পেনে ধানের ফসল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কম, অথচ এই দুই দেশের ধানচাষের প্রণালীতে প্রভেদ বিশেষ কিছুই নাই এবং স্পেনের জমী যে ভারতবর্ষের অপেক্ষা উর্ব্বরা তাহাও নয়; প্রভেদ শুধু চেষ্টা ও যত্নের। *

শ্রীনির্ম্মল দেব, এল্. এজি.

* Bulletin of Agricultural Statistics of the International Institute of Agriculture, Rome, March, 1914.

খেজুর-গুড়ের বিষয়ে কয়েকটি কথা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষিসভায় কিছুদিন হইল এনেট্ সাহেব খেজুর-গুড় প্রস্তুত সম্বন্ধে কয়েকটি খুব কাজের কথা বলিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সরকার হইতে এই কাজের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশেষ পরীক্ষার ফল সভায় পাঠ করেন।

তিনি বলেন যে চাষীদের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য যে রস ধরিবার হাঁড়িতে চুন দিয়া গাছে টাঙান উচিত। ইহা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হাঁড়ি পোড়ান অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। হাঁড়িতে চুন দিলে রসের ভিতর যে-সব জীবাণু থাকে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এইসব জীবাণু বাড়িতে পাইলে রসের ভিতর ইক্ষুশর্করাকে নষ্ট করিয়া ফেলে, সুতরাং দানাদার গুড় পাওয়া যায় না। এইজন্য রস হইতে আশানুরূপ গুড় পাওয়া যায় না। ইহাতে আর-একটি বিশেষ লাভ এই যে খেজুর-গাছ হইতে দিনের বেলায় যে রস উৎপন্ন হয় তাহাও চূনের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তম গুড়ে পরিণত হইতে পারে। বাংলাদেশে চলিত প্রথা-অনুসারে দিনের বেলায় রস গুড়ের জন্য সংগ্রহ করা হয় না। কারণ সূর্য্যের উত্তাপে রস খারাপ হইয়া যায় এবং ইহা হইতে গুড় পাওয়া যায় না। চুন দিলে এই দোষ নিবারিত হয়। মাদ্রাজে এই প্রথা প্রচলিত থাকায় দিনের বেলার রস হইতেও ভাল গুড় প্রস্তুত হয়, সুতরাং গাছপেছু সেখানে বাংলাদেশ অপেক্ষা বেশী গুড় প্রস্তুত হয়। এই প্রথা অনুসারে বাংলাদেশেও যে বেশী গুড় হইতে পারে তাহা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে দিনের বেলার রসে রাত্রের

* The Agricultural Journal of India, Vol. IX, Part IV.

রস অপেক্ষা শতকরা বেশীভাগ চিনি পাওয়া যায়। সুতরাং রসের হাঁড়িতে চুন দিলে যে গুড়ের পরিমাণ অনেক বেশী হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতে আর-এক সুবিধা আছে। চুন দিয়া রাখিলে দিনের রস সন্ধ্যা-বেলায় পাক না করিলেও চলে। রাত্রের রস সকালে একত্রিত হইলে, ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া একত্র পাক হইতে পারে। এইপ্রকারে দুইবারের কাজ একবারে সিদ্ধ হয়।

গুড় প্রস্তুত করিবার আর-একটি পদ্ধতির উন্নতি-সাধন আবশ্যক। সাধারণত দেশী চুলীতে একমণ গুড় প্রস্তুত করিতে ৬৷৷০ মণ কাঠ আবশ্যক হয়, কিন্তু চুলীর নীচে লোহার শিক দিয়া তাহার উপর আগুন জ্বালিলে, শিকের নীচে হইতে বাতাস আসিয়া অধিক উত্তাপ উৎপন্ন করে। সুতরাং এই-প্রকারে ৫ মণ কাঠে একমণ গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাতে মণকরা ৶১০ আনা লাভ হইতে পারে। যে-সকল স্থানে কয়লা সস্তা পাওয়া যায় সেখানে কয়লা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত।

খেজুরগুড়ের রংয়ের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। দেশী-প্রথা অনুসারে প্রস্তুত খেজুরগুড় সাধারণতঃ কাল রং ধারণ করে। ইহাতে খেজুরগুড়ের দাম ও আদর কমিয়া যায়। ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। দেখা গিয়াছে, খেজুরগুড়ে একপ্রকার ক্ষারজ পদার্থ আছে (alkaline substance)। ইহা উত্তপ্ত হইলে গুড়কে নষ্ট করে এবং তাহা কাল রং ধারণ করে। ইহা নিবারণের নিমিত্ত রসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অম্লজান-পদার্থ মিশ্রিত করিয়া পাক করিলে গুড়ের রং স্বর্ণাভ হয়। তেঁতুল, লেবুর রস কিম্বা ফিট্‌কারি (alum) অথবা Sulpherine কিম্বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা কাজ হইতে পারে।

এখন চিনি প্রস্তুতের প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া কথা শেষ করি। দেশপ্রথা অনুসারে 'দল' বা 'পানা' দিয়া চিনি প্রস্তুতের প্রণালী অনেক-সময়-সাপেক্ষ এবং তাহাতে অনেক চিনি নষ্ট হয়। এই প্রথা উঠাইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী সেণ্ট্রিফুগেল (centrifugal) যন্ত্র দ্বারা চিনি প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই যন্ত্রের নির্ম্মাণপ্রণালী অতি সহজ। সহজ কথায় বলিতে গেলে ইহা একটি বড় পিত্তলের বাটির (cup) ভিতর আর-একটি বাটি। ভিতরের বাটির চারিধারে অসংখ্য ছিদ্র আছে। এই ভিতরের বাটির মধ্যে গুড় রাখিয়া ইহা খুব জোরে একটি চক্রের সাহায্যে ঘোরানো হয়। মিনিটে ১০০০, ১২০০ বার ঘোরান হয়। তাহাতে গুড় হইতে সমস্ত তরল পদার্থ বহির্গত হইয়া বড় বাটির মধ্যে চলিয়া যায়। কেবল চিনির দানা ছোট বাটির মধ্যে থাকিয়া যায়। এই-প্রকারে ২০।৩০ মিনিটে যতখানি চিনি প্রস্তুত হয় তাহা দেশী প্রথায় করিতে এক সপ্তাহ লাগে।

পরীক্ষা দ্বারা ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে দেশী প্রথা অনুসারে উৎপন্ন খেজুর-রসের গুড় হইতে শতকরা ৩১ ভাগ চিনি প্রস্তুত হয় এবং পাত্রে চুন দিয়া যে রস ধরা হয় তাহা হইতে প্রস্তুত গুড় হইতে শতকরা ৫৮ ভাগ চিনি প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় প্রথা অনুসারে প্রস্তুত চিনি অপেক্ষাকৃত শাদা হয়। এই-সমস্ত প্রথা অবলম্বন করিলে দেশী চিনির যে যথেষ্ট উন্নতি হইবে তাহাতে ভুল নাই।

"The Agricultural Journal of India" হইতে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্যে সমালোচনার স্থান ও সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ।

সমালোচনা মানে বিচার। সমালোচক উকীল নন্—তিনি জজ্। একার্য্যে তাঁর বিশেষ শিক্ষা ও দক্ষতা থাকা চাই। তাঁর সেই শিক্ষা ও দক্ষতার ফ্রেমে সমালোচ্য গ্রন্থের একখানি 'ফটো' তিনি উঠিয়ে নেবেন—এই তাঁর কাজ। সমালোচনা নানারকমের হ'তে পারে। কালের হিসাবে অর্থাৎ ইতিহাসের দিক্ দিয়ে, ভাষার হিসাবে, সাহিত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি খুলে খুলে ব্যষ্টিভাবে বা সমগ্র অঙ্গ-সমষ্টিভাবে, ভাবের, চিন্তার বা কল্পনার হিসাবে—অথবা এই সবগুলির সমগ্রভাবে বিচার চল্‌তে পারে। সাহিত্য জীবন-স্রোতের দিক-নির্ণয়-যন্ত্র; সমালোচনা এই দিক-নির্ণয়-যন্ত্রের কাঁটাগুলিকে চালিত করে—অথবা তার গতি নিরূপণ করে। সাহিত্য নানারূপ শিল্পের সাহায্য

নয়,—সমালোচনা ভাবের অভিব্যক্তি-কয়ে সেই শিল্পের উপযোগিতার বিচার করে।

কথা উঠে—সমালোচনার প্রয়োজন কি? উপভোগ্য আছে, উপভোক্তা আছে; জ্ঞান আছে, জ্ঞাতা আছে;—তার মাঝে এ ওকালতী কেন? এ নিয়ে বই লেখা হয় কেন? এ অপরের মুখে খাওয়ায় আমার লাভ কি? যতক্ষণ অপরের মুখে চেখে দেখা যায়—ততক্ষণ নিজে খেয়ে দেখাই ভাল। এ দিক-নির্ণয়-যন্ত্রের গতি সম্বন্ধে অত কথায় কি লাভ? এ পরগাছায় যে সাহিত্যবৃক্ষকে ঢেকে ফেলছে। চশমা ব্যবহার করলে চোখের স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়। রবিবাবু গ্রন্থ লিখলেন—তার সমালোচনা বাহির হল—আবার সেই সমালোচনার সমালোচনা বাহির হল—আমরা এই সহস্র-পুটিত-কাব্য-ভ্রংশ এই উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট খেয়ে ক্ষুধা মিটালাম। এতে ক্ষুধাকে একরকম গোঁজামিল দিয়ে মিটান হল। এ পুত্রের অভাবে পোষ্য-পুত্র নেওয়া হল। এই পরের মুখে খেয়ে কি ক্ষুধা মেটে? উচ্ছিষ্ট খেয়ে রোগও হতে পারে, আবার কেউ খেয়ে যদি বলেন 'কটু'— তা'হ'লে অনেক সময় আমাদের খেতেই ইচ্ছা হয় না। সাহিত্য-বৃক্ষ যেরূপ দিন-দিন এই সমালোচনা-রূপ পরগাছায় পরিপূর্ণ হচ্ছে—তাতে এই প্রশ্নগুলি ঠিক সময়োপযোগী। কিন্তু তাই বলে এই পরগাছাগুলির নির্ব্বিশেষে সমূলে উৎপাটন করলে চলবে না। তার মধ্যে অনেক সঞ্জীবনীলতা আছে। মহাজনের উচ্ছিষ্ট খেতে দোষ কি? সমালোচনার স্থান সাহিত্য-জগতে আছে। কিন্তু কোথায়?—তাই আমাদের নির্ণয় করতে হবে।

এই যে সমালোচনার সৃষ্টি, এই যে গুরুকরণ-প্রণালী, এটা শিষ্যকে চোখবুজে গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করাবার জন্য নয়; স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন উপভোগ বাদ দেওয়ার জন্য নয়। গুরু দোষগুণ দেখিয়ে দেবেন, কার্য্যপ্রণালী শেখাবেন, উপকরণের ফর্দ্দ করে দেবেন।—এইখানে গুরুর স্থান। নারিকেলের শাঁস তোমাকে নিজেই খেতে হবে, কিন্তু সেই পশ্চিমেটির মত নয়—যে নারিকেলটির কোন্‌ভাগটা খেতে হয়, কেমন করে খেতে হয় তা জানত না—কামড়ে ছোবড়ার কটু তিক্ত রসটি আস্বাদন করে দাঁত ভেঙে বাঙালীজাতির নারিকেল-প্রিয়তাকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে গিয়েছিল। দাঁ চাই; কেমন করে খেতে হয়, কোন জায়গাটা খেতে হয় তা দেখিয়ে দেবার জন্যে গুরু চাই;—তার যে তা ছিল না।

সমালোচনা-গ্রন্থের সাহায্যে অনেকে জ্ঞানজগতে short cut বা রাস্তা-সংক্ষেপ করছেন— জ্ঞান যে তাঁদের চাইই। জগতে যত গ্রন্থ আছে সব ত তাঁরা পাঠ করতে পারেন না—'চয়নিকা' তাঁদের দরকার, এ কথা স্বীকার্য্য। বিদ্যাহীনতার চেয়ে অল্পবিদ্যা যে ভয়ঙ্করী নয়—তার উদাহরণ একেবারে দুর্লভ নয়। মানুষের কৌতূহলের একটা খোরাক ত চাই। আদি রামায়ণ পড়বার যাঁর সময় বা অধিকার নেই, তাঁর তাড়াতাড়ি কাজ সারার চেয়ে বা অনধিকার-চর্চ্চা করার চেয়ে বা গ্রন্থখানিকে তুলসীচন্দন দিয়ে পূজা করার চেয়ে—তাঁর একখানি ভাল বাঙ্গালা ভাষ্য কিনে পড়ায় লাভ আছে। বেকন্ (Bacon) বলেছেন, distilled books are like common distilled water, flashy things—অর্থাৎ চোয়ানো বইগুলি সাধারণ চোয়ানো জলের মত একটু বেশী ঝাঁঝালো। ভাষ্য পড়ে' আদি গ্রন্থ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। সমালোচনা-গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন—মূলগ্রন্থে যে সজীবতা আছে যে অনুপ্রাণনা-শক্তি আছে, এতে তা নেই। সমালোচক যতই বুদ্ধিমান নিরপেক্ষ বিচারক হোন না কেন - তাঁর হাতে আমাদের সহজে আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। আমরা সমালোচককে সাহিত্যালোচনায় চশমারূপে ব্যবহার করতে পারি—কিন্তু সে চশমার কাঁচটি বা পাথরটি স্বচ্ছ এবং রংহীন হওয়া চাই। আবার সমালোচককে একেবারে 'নগণ্য' করাও যা আর আমার অপেক্ষা সাহিত্যের বড় সমজদার কেউ নেই—এ মনে করাও তাই।

সকল দেশেই সমালোচকদের দুটি দল আছে। এক দল বলেন, "সাহিত্য-জগতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আইন আছে। সেগুলি অলঙ্ঘনীয়, অপরিবর্ত্তনীয়। অতি পুরাকালের মনীষীগণ কোন অমানুষিক অতিপ্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা আদিষ্ট হয়ে সেগুলি codify বা ধারাবদ্ধ করে গিয়েছেন।" অপর দল এ কথা মানেন না। তাঁরা বলেন এরকম নিয়মের অস্তিত্বের সম্ভাবনাও তাঁদের যুক্তিতে

আসে না। সমাজের রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, কালের নিয়মে পৃথিবীর সকল জিনিষই ত পরিবর্ত্তনশীল। ধর্ম্মজগতে ঈশ্বর-প্রকটিত-সত্য আছে, সাহিত্য-জগতেও কি তাই থাকবে? সাহিত্যের সাধনায় যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন—তাঁদের কেউই ত এই ঈশ্বর-প্রকটিত সত্যের (revealed truth) গোঁড়া ছিলেন না। বন্ধনকে ছাড়ানই যে মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম।

সমালোচনায় আমরা সাহিত্যিকের জীবনের গতি, লক্ষ্য, ব্যক্তিত্ব দেখতে পাই—এই হিসাবে একে সাহিত্যের একটা অংশ বলতে হবে। শুধু পরগাছা বললে চলবে না।

সমালোচকের নিরপেক্ষ হওয়া চাই। তিনি কোন দল বা জাতি বা ভাষা বা কালের কোল-টেনে কথা বলতে পারেন না। তিনি বিচারক—তাঁর কেবল দোষ দেখলে চলবে না, কেবল গুণ দেখলে চলবে না। অথবা আলোচ্য গ্রন্থকে নিজের পাণ্ডিত্য বা চাতুর্য্য দেখাবার একটা অজুহাত মনে করলে চলবে না। এ সাহিত্যের আদালতে জজকে কেবল ধারাবদ্ধ আইন বা অতীতের নজীর দেখে বিচার করলে চলবে না, তাঁকে সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নূতন আইন সৃষ্টি বা নূতন আদর্শ স্থাপন করতে হবে অর্থাৎ তিনি 'আসামী'-সাহিত্যের সহিত অপর সাহিত্যের বা অন্য সময়ের সাহিত্যের বা অন্য ভাষার সাহিত্যের বা অন্য সাহিত্যিকের সাহিত্যের তুলনা করেই তার সৌন্দর্য্য নিরূপণ করবেন। এ আইন a priori নয়—এ a posteriori। অর্থাৎ কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট আদর্শানুযায়ী বিচার চলবে না, কার্য্য হতেই কারণানুসন্ধান করতে হবে।

সমালোচনার সমালোচনা।

একটি গ্রন্থের একটি সমালোচকের সহিত অপর সমালোচকের তুলনা করে দেখতে হবে। গ্রন্থের কোন্ দিক্‌টি নিয়ে কে বেশী আলোচনা করেছেন? কোন্‌টিকে বাদ দিয়েছেন? কেন দিয়েছেন? তাদের কোথায় কোথায় ঐক্য ও কোথায়-কোথায় পার্থক্য আছে সেটা দেখতে হবে। কোন্ বিশেষ অংশকে বিশেষ জোর দিয়ে দেখিয়েছেন? কার কিরূপ রুচি, কিরূপ আদর্শ, কিরূপ স্বভাব, কিরূপ সমালোচনা-প্রণালী, এবং সেই পার্থক্যগুলির কোন্‌টুকু তাঁদের শিক্ষাবৈষম্যের ফল—কোন্‌টুকু উদ্দেশ্য-বৈষম্যের ফল সেটা দেখতে হবে। এতে আমরা প্রত্যেক সমালোচনা-গ্রন্থের ও প্রত্যেক সমালোচকের বিশেষত্বটুকু বেশ বুঝতে পারব।

সমালোচকদের এইরূপ নানাবিধ বৈষম্যের জন্যই তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে পশার জমাতে পারেন না। লোকে এখনও সাধারণ সাহিত্যিককে যেরূপ চোখে দেখে, তার তুলনায় সমালোচককে একটু খাটো করেই দেখে।

সমালোচকদের একটা বিশেষ অক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তাঁরা কোন সমসাময়িক সাহিত্যিকের গ্রন্থ সমালোচনা করতে বসেন। এই সাহিত্যক্ষেত্রের গণকেরা সমসাময়িক সাহিত্যিকের কোষ্ঠি দেখে তাঁর যেরূপ পরমায়ু নির্ণয় করে এসেছেন,—সাহিত্যের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত তার একটিকেও অভ্রান্ত দেখতে পাওয়া যায়নি। আর্নল্ডের মত যে সমালোচক অতীতযুগের সাহিত্যের সমালোচনায় পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন—তিনি সমসাময়িক টেনিসনের বেলায় ভ্রান্তমত প্রকাশ করেছেন। টেনিসনকে তিনি বলেছেন "deficient in intellectual power" অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে অপক্ব। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের "Ode on the Intimation of Immortality"কে সমসাময়িক সমালোচকেরা (Edinburgh Review) illegible and unintelligible—অস্পষ্ট এবং অবোধ্য বলেছেন। সাহিত্যের এই কবিরাজেরা যাঁদের ধাত্ টিপে দীর্ঘায়ু বলে ঘোষণা করেছিলেন—দেখা গেছে তাঁরা তৎপরদিনই ভবলীলা শেষ করেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আবার সমালোচকদের এই বৈষম্য যে শুধু ব্যক্তিগত তা নয়—অনেক সময় দলগত। একদল যাঁর ডঙ্কা পেটাচ্ছেন, অপরদল তাঁরই পশ্চাতে উল্টা কুলার বাতাস দিচ্ছেন।

সমালোচকেরা অধিকাংশই conservative দলের বা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের। তাঁরা পরিবর্ত্তনের বিরোধী। তাঁরা অতীতের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। তাঁদের মতে সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরে—যা হয়ে গেছে—এই ঘোর কলিতে সাড়ে তিনহাত মানুষে কি তা করতে পারে? এঁরা সংযমের লাগাম ধরেই আছেন। এজন্য সাধারণ সাহিত্যিকের সঙ্গে সমালোচকের সম্বন্ধটা জনসাধারণের

সঙ্গে পুলিশের সম্বন্ধের মত, মৌলিকতার সঙ্গে পূর্ব্ব-সংস্কারের বা প্রথার সম্বন্ধের মত, নবীনের সহিত প্রবীণের সম্বন্ধের মত। এইজন্ত কোন সমালোচকের নাম শুনলেই আমরা অম্‌নি কল্পনা করে নি যে তিনি নিশ্চয়ই পক্ককেশ প্রবীণ।

কিন্তু সমালোচকের প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং গোঁড়ামি যেরূপ ভয়াবহ, সাহিত্যিকের স্বাধীনতাপ্রিয়তা বা মৌলিকতার কণ্ডূয়ন যদি যথেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয় তাও তদ্রূপ ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

সাহিত্যক্ষেত্রে সমালোচকগণকে অগ্রণী হতে খুব কমই দেখা গিয়েছে। সমালোচকেরা সব সময়ই লাগাম ধরে পিছু হাঁটেন। সাহিত্যিক যায় আগে আগে। কখন লাগামের টানে তিনি সাহিত্যিককে আগাতে দেন না, কখন বা সাহিত্যিকের দমকাটানে নিজেই হোঁচট খেয়ে পড়েন—আঘাতটা বরদাস্ত হ'লে আবার ধূলো ঝেড়ে উঠে নিজেকে মানানসই করে নিয়ে চলতে আরম্ভ করেন।

অনেক সময় দেখা যায় যিনি স্রষ্টা, তিনিই বিধাতা। কোন কোন কবি আইনও গড়েন, কাব্যও লেখেন। আদর্শের ধ্বজা ধরে থাকেন—আবার সেই আদর্শ-মাফিক সৃষ্টিও করেন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, ম্যাথু আর্নল্‌ড্‌ এবং আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথকে উদাহরণ-স্বরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা সৃষ্টিও করেছেন, সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁরা যখন নিজ আদর্শ-মাফিক সৃষ্টি করতে যান তার চেয়ে যখন প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বভাবতই সৃষ্টি করেন—Reason বা যুক্তি যখন impulse বা আবেগকে চালনা করে না, আবেগই যখন সৃষ্টির কারণ হয়, তখনই তাঁরা বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সাহিত্যের পরমায়ু বা মূল্য নিরূপণ।

একই বই পাঠ করে এক-একজন সমজ্‌দার্‌ যখন্‌ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন, আবার একই সমজদার্‌ এক সময়ে যে মত প্রকাশ করেন, কিছুদিন পরে আবার দেখতে পাওয়া যায় যে তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে—তখন কোন পুস্তকের একটা মূল্য নির্দ্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সেক্‌শ্‌পীয়রকে 'অমর' বলেই এতদিন লোকের ধারণা ছিল—কিন্তু তাঁর পরমায়ু আর কতদিন এ বিষয়েও অনেকে গণনা করতে আরম্ভ করেছেন। মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাঁর idea বা রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে তাঁর মত পরিবর্ত্তন হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু জগতে যেটা সত্য (absolute truth), যেটা যথার্থ সুন্দর, সেটা কোন ব্যক্তি বা যুগের রুচির উপর নির্ভর করে না। সেটা নিত্য, অব্যয়, অজর, অমর, সেটা পরিবর্ত্তনের উপরে ; সেটা যাঁর সাহিত্য-সিন্দুকে আছে, হাজার রুচির পরিবর্ত্তনের মধ্যেও নিজেকে মানানসই করে নেবার ক্ষমতাও তাঁর কাব্যে অন্তর্নিহিত আছে। হাজার অবস্থা-পরিবর্ত্তনেও তিনি দেউলিয়া হবেন না। তবে আর-একটা সন্দেহ উত্থাপিত হয় যে সেই absolute truth, সেই নিত্য অব্যয় অখণ্ড সত্যকে এবং সেই সত্যের প্রভারূপ সৌন্দর্য্যকে—আমাদের রুচির প্রক্ষেপ দিয়ে ঘন না করে—মানুষ কখন উপভোগ করতে পেরেছে কি? পারবে কি? সেই সৌন্দর্য্যে আমাদের চক্ষু ঝলসে যায় না কি? আমরা মুগ্ধ হ'তে পারি কি? সে সত্য—সে সৌন্দর্য্য আমাদের কাব্যক্ষেত্রে কখন এসেছে কি? মানুষ-কবি 'অমর' হ'তে পারবে কি?—যাক্‌ এত সন্দেহের কথা। মানুষ-কবি অমর হ'তে পারুক আর নাই পারুক—সে যে সাধনা-বলে দীর্ঘায়ু হ'তে পারে সে বিষয়ের প্রমাণ ত ইতিহাস দিচ্ছে।

অনেক কবি সমসাময়িক লোকরঞ্জনে বিশেষ পটুতা দেখিয়েছেন—কিন্তু স্থায়ী যশ লাভ করতে পারেন নি। আবার অনেকের অবস্থা তার বিপরীত। এ অবস্থা-বৈষম্যের কারণ বিচার করা যাক।

ছেলেবেলায় সাময়িক পত্রে অনেক কবির খ্যাতি শুনতে পেতাম। তাঁদের যশঃসৌরভে আমাদের মন মাতোয়ারা হয়ে উঠ্‌ত। তখন ভাবতাম এঁরা সাহিত্য-জগতে অমর হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আজ ৭।৮ বৎসর পরে যখন অবসরক্রমে সেই তাৎকালীন অমর-কল্প কবিদের কথা মনে পড়ে, তখন হাসিও পায়, কান্নাও আসে। একদিন যাকে সাহিত্যাকাশের ধ্রুবতারা মনে করতাম,—আজ বুঝতে পারছি—সেগুলি সাময়িক পত্রের পুচ্ছালম্বিত ক্ষণস্থায়ী প্রদীপবিশেষ, জোনাকীপোকার টিপটিপানি, মিথ্যা আশার উদ্রেককারী আলেয়া বা মরীচিকা।

সাহিত্যাকাশে তখন বহু দীপ্তিমান নক্ষত্র শোভা পাচ্ছিল, তাদের দীপ্তিতে আমাদের চক্ষু ঝল্‌সে গিয়েছিল। এখন বুঝ্‌ছি—ঐসকলের অধিকাংশ নক্ষত্রই বাস্তব আকাশের নয়, রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিম আকাশের—এবং পশ্চাতে রক্ষিত বৈদ্যুতিক আলোর দীপ্তিতে দীপ্তিমান। আজ সর্ব্ব-সত্য-সংরক্ষণশীল, সর্ব্ব-অসত্য-পরিহারপ্রিয় কালের অভ্রান্ত নিয়মে তাঁদের দীপ্তি ম্লান হয়ে গিয়েছে। দিবালোকের নির্ম্মম পরিহাসে রঙ্গমঞ্চাকাশের ছেঁড়া ন্যাকড়ার সুতা বাহির হয়ে পড়েছে। অদৃষ্টের কি মর্ম্মান্তিক পরিহাস! আজ বৈদ্যুতিক আলোকের অভাবে সে রৌপ্যশুভ্র-কিরণমণ্ডিত গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আর দেখা যাচ্ছে না। নলিনীদলগত জলের ন্যায় চপল আমাদের জীবন—তদপেক্ষা চপল আমাদের যশ, এত অলীক, এত ক্ষণস্থায়ী—তথাপি তার আকাঙ্ক্ষা মানুষ ত্যাগ করতে পারে না। এ আমাদের স্বাভাবিক মোহ। কবির ভাষায় "The last frailty of a noble mind"—যশাকাঙ্ক্ষা মহাপুরুষদিগের শেষ দুর্ব্বলতা।

দিবালোকে রঙ্গমঞ্চের বৈসাদৃশ্যের জন্য শিল্পী দায়ী নন—তিনি রঙ্গমঞ্চের বাস্তবতার দাবী রাখেন না। সুতরাং তাঁকে আমাদের এই মোহ উৎপাদনের জন্য দায়ী করতে পারা যায় না। আমরা যে মোহে পড়ে রঙ্গমঞ্চের আকাশের গ্রহগুলিকে বাস্তব মনে করেছিলাম, আজ দিবালোকে সে মোহ ছুটে যাওয়াতেই এই বৈসাদৃশ্য প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িক ধুয়াগুলিকে অবলম্বন করে সাময়িক পত্রে সংবাদপত্রে হুজুকগুলিকে ফেনিয়ে তুলে যে-সাহিত্যিক অমরত্ব-লাভে প্রয়াসী হন, মেকী সত্য বাজারে চালাতে চেষ্টা করেন, কালের কঠোর নিয়মে তাঁরা প্রতারিত হবেনই। মানবপ্রকৃতি মিথ্যা কতদিন সহ্য করবে? যশ লাভের চেষ্টায় বিফলমনোরথ কবিগণ মনকে প্রবোধ দিবার জন্য এই মান এবং অপমানের সমজ্ঞান করবার গীতোক্ত উপদেশের আশ্রয় লন অথবা তাঁরা বলেন বা ভাবেন যে "খাঁটি প্রতিভাকে সাধারণে কি করে সমাদর করতে পারবে। প্রতিভা যতই উচ্চ হবে ততই তা দৃষ্টিছাড়া হবে, সমাজ হতে দূরে পড়বে, ইত্যাদি। তাঁরা অনাদর, উপেক্ষা, গালাগালি, এসব কিছুই গ্রাহ্য করেন না।" এ যুক্তিকে ঠেকাবার ক্ষমতা আমার নেই। দুঃখের বিষয় এই যে—সমাজ কি এতই পাগল যে যথার্থ প্রতিভাকে নির্ব্বিচারে কোণঠাসা করে রাখে। লোক রঞ্জন করবার ক্ষমতাটা কি এতই 'তুচ্ছ' করবার জিনিষ। যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য, মহম্মদ, কালিদাস, সেক্‌শ্‌পীয়র, জনসন, মধুসূদন-প্রভৃতিকে কষ্ট পেতে হয়েছিল, সমাজের উপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছিল, স্বীকার করি, কিন্তু তাঁদের আদরও কি হয় নি? সমাজই ত তাঁদের চিরস্থায়ী সিংহাসন দিয়েছে—অমর করে দিয়েছে। অবশ্য অর্থলাভের দ্বারা কবির যশ মাপ করা যায় না। লক্ষ্মীসরস্বতীর বিবাদের কথা কারও অবিদিত নেই। শুধু ভাব-রাজ্যে বিচরণ করা স্বভাবের নিয়ম নয়। আস্‌মানে মনের খোরাক থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব রাজ্যেই দেহের খোরাকটা জোগাড় করতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলেই ফলভোগ করতে হয়, সেজন্য সমাজকে সম্পূর্ণ দায়ী করতে পারা যায় না। যাঁরা লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন সে-সকল সাহিত্যিকের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ভাবের সহিত বাস্তবের পূজা একাধারে খুব কম লোকই করতে পারেন। এক সেক্‌শ্‌পীয়র লক্ষ্মীসরস্বতীকে এক বেদীতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেক্‌শ্‌পীয়রের ন্যায় ভাব এবং রসের (Emotion and Passion), কল্পনা এবং সত্যের ঘাত-প্রতিঘাতের অকৃত্রিম চিত্র খুব কম কবিই অঙ্কিত করতে পেরেছেন—ভাবের বেলুনে তাঁর মত উচ্চে এ পর্য্যন্ত কেউ উঠ্‌তে পারেন নি। রসের খনিগর্ভের প্রত্যেক স্তরেই তিনি বিচরণ করেছেন। কল্পনার তরঙ্গগুলি একটি-একটি করে গণনা করেছেন। সত্যের অন্দর-মহলেও তাঁর অপ্রতিহত গতি ছিল—অথচ তিনিই একদিন তাঁর অমর লেখনীতে একহাতে পৃথিবীর নশ্বরতা সম্বন্ধে লিখছিলেন ও অপর হাতে একজন অধমর্ণের নিকট মাত্র সতেরো পাউণ্ডের দাবীর নালিশের খসড়া করছিলেন (Dowden's Shakespeare)! ভাবের এবং বাস্তবের এরূপ সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সেজন্য সমাজকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করলে চলবে কেন? সমাজ যে কবির ভরণপোষণের জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী একথা কেউই অস্বীকার করেন না।

প্রতিভা সাধারণই হোক বা অসাধারণই হোক, ন্যূনাধিক লোকরঞ্জন করবেই। তবে লোকরঞ্জন করাই প্রতিভার অমরত্বলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, একথা বলা যেতে পারে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ সমসাময়িক সমাজে এবং আমার বোধ হয় এখনও জনসাধারণের কাছে খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি। তার কারণ আছে। তাঁর খনি হতে যে স্বর্ণরেণু উত্থিত হয়েছিল, তাতে স্ফটিক পাথরের রেণু মিশ্রিত ছিল। এই খনিজ মিশ্রধাতুতে স্বর্ণরেণু অপেক্ষা স্ফটিকের দীপ্তি বেশী হওয়ায়—স্বর্ণরেণুর বাহ্য-প্রকাশ ছিল না। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কথায় বিশ্বাস করে অথবা তাঁর নামের মাহাত্ম্যে দুই-একজন বহুমূল্যে এই মিশ্রধাতু ক্রয় করলেন বটে, এবং বহু পরিশ্রমের পর তা হতে স্বর্ণরেণু বাহির করে আশাতীত ফললাভ করলেন বটে, কিন্তু সাধারণে এ স্ফটিকপিণ্ডে স্বর্ণরেণুর অস্তিত্ব বিশ্বাস করলে না। অমরত্ব লাভ করতে হলে কবির-প্রতিভারূপ খনিতে স্বর্ণরেণু না থাকলে চলবে না—কিন্তু এই অপরিচিত স্বর্ণরেণুকে পরিচিত করবার জন্য সমাজের ছাঁচে ফেলে, নিজের নামাঙ্কিত করে সুগঠন করে সমাজের সৌন্দর্য্যের আদর্শানুযায়ী অলঙ্কারের আকারে লোকপরিচিত করাতেই কবির বাহাদুরী ও লোকরঞ্জনের প্রতিষ্ঠা—ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ তা পারেন নি। তাই তিনি অমর হয়েছেন বটে কিন্তু দুইএকজনের হৃদয়মন্দিরে। লোকরঞ্জন করতে হলে সমাজের সৌন্দর্য্যের আদর্শের জ্ঞানকে অনুসরণ করতে হবে। সত্যকে সাময়িক ধূয়ার ভিতর দিয়েই দেখাতে হবে। তাতে সত্য খর্ব্ব হয় না। একই সত্যের নানা দিক আছে। তাঁর সমসাময়িকেরা যে দিকটি ধরে আছেন অমরত্বলাভ-এবং লোকরঞ্জনপ্রয়াসী কবি সেইদিকের ভিতর দিয়েই সত্যকে দেখাবেন। তাতে সমাজের রুচি বা সৌন্দর্য্যের আদর্শ-জ্ঞান মার্জ্জিত হবে। অমর হওয়া আবার নানারকমের আছে। এসভের সাহায্যে দেহটিকে পচন হতে রক্ষা করে অথবা দীর্ঘকাল রোগশয্যায় ছটফট করেও একরূপ অমর হওয়া যায়! সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারের শোভাবর্দ্ধন করে বা কেতাবকীটের রসদ যুগিয়ে অনেক সাহিত্যিক অমর হয়ে আছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌দের সোনার কাঠির স্পর্শে তাঁরা মাঝে মাঝে পুনর্জ্জীবিত হন। কিন্তু এরূপ অমরত্বে লাভ কি?

কি গুণে কবি অমরও হতে পারেন, সাধারণের মনোরঞ্জনও করতে পারেন? সেক্‌শ্‌পীয়র, হোমার, কালিদাস—এঁদের কি গুণ ছিল? মৌলিকতা, বাগ্মিতা, বুদ্ধি, কল্পনা এবং রসকে আনন্দজনকরূপে সমাবিষ্ট করাই এঁদের একমাত্র তপস্যা।

কবি শুধু কল্পনা-প্রভাবেই তাঁর কাব্য-দেহকে পচন হতে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু সত্য, ভাব এবং রসের অনাড়ম্বর-অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে অমর হওয়া যায় না। পচন হতে রক্ষা করাই ত অমরত্ব নয়, জরাবার্দ্ধক্যশীল অমরত্বে কি লাভ? অজর ও অমর হওয়া চাই।

কেহ বলেন কবির যশোলাভ অদৃষ্ট-সাপেক্ষ। "পড়লো দাঁও ত বাজি মাৎ"। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এরূপ রাতারাতি বাজিমাতের অর্থ নিয়ে কে কবে কতদিনের জন্য বড়লোক হয়েছেন? সাহিত্যে জুয়াখেলার অদৃষ্টও বিভিন্ন নয়। লোকরঞ্জন করার প্রধান কৌশল হচ্ছে—কবির বক্তব্য-টিকে এমনভাবে কল্পনা ও ভাবমণ্ডিত করে'—সাময়িক ধূয়ার ভাবনা দিয়ে—স্বভাব-তিক্ত সত্যকে Sugar-coating বা চিনির প্রলেপ মাখিয়ে—পাঠকের সমীপে উপস্থিত করতে হবে যে, পাঠক যেন বিনাক্লেশে তাঁর বক্তব্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। লোকরঞ্জন করতে হলে কবির শিল্পচাতুর্য্যও থাকা চাই। তাঁকে শুধু ভাবুক বা রসিক বা কল্পনা-প্রবণ হলে চলবে না—তাঁর বক্তব্যটি ভাষার সাহায্যে বেশ সরল এবং সহজ করতে হবে—এমন কি—শিল্প-নিপুণ কবির ভাষা বা ছন্দ শব্দার্থের সাহায্য ব্যতিরেকেও পাঠকের হৃদয়ে অনুরূপ ভাবকে মথিত করতে পারে। শিল্পক্ষেত্রেও তাঁকে কৃতিত্ব দেখাতে হবে। শুধু ন্যায়ের অকাট্য যুক্তির অবতারণা দ্বারা আমাদের ভাবকে 'মথিত' করতে বা রসের উদ্দীপনা করতে পারা যায় না। অপরপক্ষে লোকরুচির অনুসরণ করে আর্টের সাহায্যে সাময়িক লোকের মনোরঞ্জন করা যায় বটে কিন্তু 'আদর্শ-সত্য'রূপ মালমসলা না থাকলে অমরত্বের প্রাসাদ নির্ম্মিত হতে পারে না।

মৌলিকতা না থাকলেও কবি অমর হতে পারেন। গ্রে-কবি তার উদাহরণ। তিনি কাব্যোদ্যানের ভ্রমর। নানা ফুলের মধু সঞ্চয় করে একত্র করেছিলেন। ভাবের এবং ভাষার নির্ব্বাচনক্ষমতাই তাঁকে অমর করে দিয়েছে। সুমধুর শব্দ-বিন্যাস, মধুর ভাবের সমাবেশ, ঘটনা-পারম্পর্য্যের সাহায্য দ্বারা অতীতের কোন সুমধুর স্মৃতির পুনরাস্বাদ,—এই-সকলের সাহায্যে তাঁর পাঁচফুলের সাজিটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার হয়েছে। আমাদের কবি শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ দত্তও এই কার্য্যটি সবিশেষ বা অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করছেন।

বর্ত্তমানের কথা।

আজকাল অনেকের মত যে দীর্ঘ মহাকাব্যের দিন চলে গেছে। অলঙ্কারের ঝনঝনানি বা নীরস বাক্য-বিস্তারের পক্ষপাতী এখন আর কেহ নয় বটে, কিন্তু পদে-পদে বাক্যের পিরামিড বা শব্দের গোলকধাঁদা গড়া বা কথার চকমকি ঠোকা হচ্ছে। 'ভাবের ফোয়ারা' 'রসের কূপ' বা 'কল্পনার বেলুন' এখন পদে-পদে চাই—নচেৎ মাসিকপত্রের যুগে লোকরঞ্জন করা চলে না। আজকাল কবিকে শুধু অন্তঃসলিলা নদীর মতন হলে চলবে না—বাহ্য তরঙ্গও থাকা চাই। আবার এ জীবনসংগ্রামের ঘোর দুর্দ্দিনে কচিৎ-সমাগত স্বাভাবিক তরঙ্গমালা লক্ষ্য করবার জন্য কাব্যনদীর তীরে ধৈর্য্য ধরে কয়জন কাব্য-প্রেমিক বসে থাকবেন। কিন্তু আড়ম্বরই কি সৌন্দর্য্যের আধার? লাঠির আঘাতের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কি স্বাভাবিক তরঙ্গের ভঙ্গী থাকে? অনাড়ম্বর ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলাই কি শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব নয়?

আমাদের যুগের সমালোচকগণও কাব্যের নাক-চোখ-মুখের খণ্ডিত ভাবে সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে আরম্ভ করেছেন। অখণ্ডিতভাবে, সমগ্রভাবে রসাস্বাদ করতে তাঁরা যেন ভুলে যাচ্ছেন। তাঁরা কাব্যের সমস্ত তন্ত্রীতে হস্তক্ষেপ করছেন, এমন কি তাঁদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করা অসম্ভব বলে কাব্যদেহের সকল জায়গায় কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়ে 'Record' নিচ্ছেন। সমগ্রভাবে চিন্তা করতে বা স্বভাবোত্থিত ভাবতরঙ্গ বা হাস্যরস উপভোগ করবার জন্য বসে থাকার সময় বা ধৈর্য্য তাঁদের নেই। কিন্তু 'খণ্ডিত'কে অখণ্ডের কোলে বসিয়ে না দেখলে তার সৌন্দর্য্য কি উপভোগ্য হয়?

কাব্যে পদে পদে ভাষার সাহায্যে ভাবের কৃত্রিম উত্তেজনা সম্পাদন সম্বন্ধে একটি গল্পের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদা আমেরিকার একটি গ্রামে পর্ব্বতের উপর একটি গৃহে আগুন লেগেছিল; গৃহটি পর্ব্বতের উপর অধিষ্ঠিত থাকায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত অগ্নিকাণ্ড একাধারে চিত্তাকর্ষক ও ভীতিপ্রদ হয়েছিল। যখন প্রায় সমস্ত ভস্মস্তূপে পরিণত হল, কচিৎ কোথায়ও একএকটি অগ্নিশিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করছিল, তখন একজন কৃষক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে বললে "ঘণ্টা বেজেছে কি? "গির্জ্জার বিপদ্-পাতের সঙ্কেতঘণ্টা বেজেছে কি?" কৃষকটি এখন পর্য্যন্তও এ আগুনের 'অসাধারণত্ব' কিছুই বুঝতে পারে নি বা বিপদপাতের জন্য স্বাভাবিক ভীতির ভাবের উদ্রেক তার এখনও হয় নি। তার বাড়ীর অগ্নিকুণ্ডে সে নিত্য অগ্নি দেখে আসছে। গির্জ্জার ঘণ্টা না বাজলে সে অগ্নিকাণ্ডের বিশেষত্বের কিছুই আভাষ পাবে না, বা সময়োপযোগী ভয়ের ভাবের উন্মেষও তার হবে না। আমাদের কাব্যের সৌন্দর্য্য-রসাস্বাদ করবার ক্ষেত্রেও এইরূপ 'মোহ' এসে পদে পদে ভাষার 'ঘণ্টা' না বাজালে, কৃত্রিম উত্তেজনা না থাকলে আমরা আর সৌন্দর্য্যের আস্বাদ পাই না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে পদে পদে 'ঘণ্টা' বেজে বেজে ঘণ্টাও একঘেয়ে হয়ে গেল, আমাদের কানেও তালা ধরতে চলল। কবি যখন কোন বিশেষ সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করবেন তখন কতগুলি ঘণ্টার আবশ্যক হবে? আজকালকার কাব্যগুলি নবদম্পতীর প্রণয়-পত্রের মত প্রতি ছত্রে উচ্ছ্বাস-ক্রন্দন-দীর্ঘনিশ্বাস এবং হাহুতাশে পরিপূর্ণ। নির্জ্জন প্রান্তরে যে স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গহীনা নদীটি প্রবাহিত হয় যথার্থ প্রেমিকেরাই তার তীরে সঞ্চরণ করেন। আর সংসারের মাঝে জলের-কলের কৃত্রিম জলোচ্ছ্বাসের নিকটেই সাধারণে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে থাকে। একথা স্মরণ থাকা সকলেরই দরকার। এককালে ইন্দুর-কুল বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে অমর হতে চেষ্টা করেছিল। এই মাসিকপত্রের যুগের সাহিত্যিকরা

কি ভাবের গলায় ভাষার ঘণ্টা বেঁধে অমরত্ব লাভের চেষ্টা করছেন? যেমন ফরমায়েস তেমনই সৃষ্টি। এতে শুধু সাহিত্যিক দায়ী নন্—সমাজ-রুচিই সাহিত্যিককে এইরূপ বানিয়ে তুলছে। সংস্কার পুরুষকার ও সময়-সাপেক্ষ।

Wm. Henry Hudson's "An Introduction to the Study of Literature" এবং Lowell's "My Study Windows" অবলম্বনে লিখিত।

শ্রীগঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।

রং

সুন্দরের সৃষ্ট জীব, সৌন্দর্য্যের মুগ্ধ উপাসক। প্রকৃতির অন্তরে-বাহিরে কোথাও কোন কিছু সুন্দর দেখিলেই তাহার অন্তরে-বাহিরে যেন আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়! সেই আনন্দই তাহার প্রাণ—আনন্দে হইয়াছে, আনন্দে চলিতেছে—আনন্দেই তাহার শেষ হইবে। অতীতের কোন এক বিস্মৃত যুগে ভারতের কোন পুণ্য-তপোবনে সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষ সুদীর্ঘ সাধনবলে একদা এই সত্য আবিষ্কার করিয়া আনন্দোদ্বেলিত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়-
ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

উপনিষদের রত্নভাণ্ডারে আজিও ইহা সযত্নে রক্ষিত আছে।

এই আনন্দ সৌন্দর্য্য-সাগরের মন্থনোত্থিত মণি। আর রং সেই অপার আনন্দ-পারাবারের এক-এক নব-নব তরঙ্গ। সে তরঙ্গের বিরাট উচ্ছ্বাস নিখিলবিশ্বের নীলাকাশ চুম্বন করিয়া তাহারই অসীম পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছে। বিহঙ্গিনীর বিচিত্র পক্ষপুটে, কুরঙ্গিনীর চঞ্চল আঁখিতটে, লতায়-পাতায় ফলে-ফুলে তৃণে শস্যে সে তরঙ্গের নৃত্যরঙ্গ খেলিয়া চলিয়াছে। এ ঢেউ কখনও অরুণোদয়ে স্বর্ণাভ রক্তিম, আবার বা কখনও পূর্ণেন্দুর রজতহাস্যে শুভ্রোজ্জ্বল!

সৌন্দর্য্য-সাগরের এই বিচিত্র বর্ণহিল্লোলে মানবের মানসসরোবরে কখন কি ভাব কমলদলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠে, ইহা দেখানই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

একথা বোধ হয় সকলেই জানেন, যে, সূর্য্যালোকই উদ্ভিদ্‌জগতের প্রাণ—মৃত্তিকারস তাহার খাদ্যমাত্র। সেইরূপ পুষ্টিকর আহার্য্যের পরই জীবজগতেরও জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন রবির কর।

সূর্য্যকিরণে আমরা সর্ব্বসমেত সাতটি রং দেখিতে পাই; ইহার মধ্যে প্রধানবর্ণ তিনটি—লোহিত, পীত ও নীল। মেঘ-মেদুর অম্বরে অরুণ-কিরণে প্রতিফলিত রামধনুতে ঐ বর্ণত্রয়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বর্ণত্রয় ভিন্ন-ভিন্ন মানবশরীরে বিভিন্ন-প্রকারের গুণ প্রকাশ করে। ক্রোমোপ্যাথিতে উল্লিখিত আছে যে, মানবদেহে লোহিত বর্ণের অভাব হইলে আলস্য ও অবসন্নতা আসে, এবং নীলবর্ণের অভাবে বিরক্তি ও চাঞ্চল্য আসে। রোগী যদি কখনও তাহার নষ্টচক্ষু ফিরিয়া পায়, তখন তাহার নিকট লোহিত বর্ণটাই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক বোধ হয়, এবং হরিদ্রা-বর্ণকে সে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলিয়া মনে করে।

ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও বর্ণের ক্রিয়া বিশেষভাবে বর্ত্তমান। গো-মহিষাদি শ্বাপদগণ রক্তবর্ণ দর্শনে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়, ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। আমার কোনও বন্ধুবরকে একবার এইজন্য বড় বিপদে পড়িতে হইয়াছিল;—পশ্চিমে অবস্থানকালে একদিন তিনি নদীর ধারে বেড়াইতেছিলেন, কতগুলি মহিষ তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল;—অপরাধ তাঁহার গাত্রে একখানি রক্তিমবর্ণের আলোয়ান ছিল।

এতদ্ভিন্ন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী, যাহাদের দর্শনেন্দ্রিয় একেবারেই নাই, তাহাদেরও দেহ এবং মনের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণসকল বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। এমিবা নামক একপ্রকার জীবপঙ্ক বেগুনি বা শুভ্রবর্ণ অপেক্ষা লোহিতবর্ণের প্রিয়। ভ্যালেণ্টাইন সাহেব এবিষয়ে পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি কতকগুলি কেঁচো লইয়া একটি ফাঁপানলসংযুক্ত দুইটি কাঁচের বাক্সে সমানভাবে বিভক্ত করিয়া রাখিলাম, এবং একটি বাক্সের উপর লাল-বর্ণের আলোক, এবং অপরটির উপর সবুজ-বর্ণের আলোক ফেলিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, সবুজ-বর্ণের বাক্সটির মধ্যে, অপর বাক্সটি প্রায় শূন্য করিয়া, চতুর্গুণ কীট আসিয়া জমিয়াছে।" ঠিক উক্ত উপায়ে আরও দেখা গিয়াছে যে, ইহারা সবুজ অপেক্ষা বেগুনি বর্ণ অধিক পছন্দ করে। যদিও তাহাদের কোন-

প্রকার দর্শনেন্দ্রিয় নাই, তথাপি তাহারা স্পর্শের সূক্ষ্ম অনুভূতিশক্তি দ্বারা বর্ণের পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম হয়। যদি এই-সকল দৃষ্টিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের উপর বিভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বর্ত্তমান থাকে, তবে এই ইন্দ্রিয়সমূহের-শ্রেষ্ঠ-কারখানা মনুষ্যশরীরের উপরও তাহাদের আধিপত্য থাকা কি বিশেষ আশ্চর্য্যজনক?

ফরাসী ডাক্তার ফেয়ার মনুষ্যের দেহের উপর বর্ণের যে কিরূপ আধিপত্য তাহা স্বীয় উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। উক্ত যন্ত্রে হস্তমুষ্টির গুরুত্ব বা শক্তি নিরূপিত হয়। তিনি প্রথমে অল্পআয়াসবদ্ধ মুষ্টির গুরুত্ব, এবং তৎপরে উক্তমুষ্টির উপর বিভিন্ন বর্ণের আলোক প্রতিফলিত করিয়া মুষ্টির গুরুত্বের পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন। নিম্নে তাহার সবিশেষ বিবরণ দিতেছি। সাধারণ মুষ্টির গুরুত্ব যদি '২৩' হয়, তাহা হইলে বেগুনি বর্ণের আলোকপ্রভাবে ইহার গুরুত্ব '২৪', সবুজ বর্ণে '২৮', হরিদ্রাবর্ণে '৩০', গোলাপী বর্ণে '৩৫', এবং রক্তিম বর্ণে '৪২' হইবে। আমাদের দেহের মধ্যে রক্তিম বর্ণের আধিক্যবশতঃ লোহিতবর্ণের প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এক্ষণে দেখা যাক যে, মানবের মনোরাজ্যে বর্ণের কিরূপ আধিপত্য। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদ্রেক করে। কেহ রক্তিম বর্ণের দর্শনে সুখী হন, কেহ সবুজ বর্ণের দর্শনে সুখী হন। কিন্তু কেন যে এইরূপ হয় তাহার সঠিক কারণ সকল সময় নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে ইহার কতগুলি মোটামুটি কারণ আছে, যেজন্য বিশিষ্ট বর্ণ আমাদের হৃদয়ে কোন কোন বিশিষ্ট-ভাবের স্পর্শ দিয়া থাকে।

সকল মনুষ্য-হৃদয় তাহার বিকাশোন্মুখ অবস্থায় প্রায় একরূপ থাকে, তবে কোন ইন্দ্রিয় বিকৃত হইলে মনের অবস্থাও অন্যরূপ হয় এবং ক্রমে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে সকলের হৃদয় পরস্পর হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। ঐ-সকল বিভিন্ন ভাবের হৃদয়গুলিকে অবস্থাভেদে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, প্রথম Objective type, দ্বিতীয় Physiological type, তৃতীয় Character type, এবং চতুর্থ, Assiociative type.

পদার্থগত ভাবের হৃদয় বা Objective type অর্থাৎ যাঁহাদের কেবল বর্ণের উপরই লক্ষ্য স্থির—বর্ণটি বিশুদ্ধ বা উজ্জ্বল কি না মাত্র ইহাই লইয়া যাঁহারা বিচার করেন। এই জাতীয় লোকের নিকট বর্ণ বিশুদ্ধ এবং গভীর হইলেই প্রিয়, অন্যথা বিরক্তিজনক।

শরীরগত ভাবের হৃদয় বা Physiological type অর্থাৎ যাঁহারা কোন বর্ণের দর্শনে স্বীয় ইন্দ্রিয়ের উপর একটা কিছু ভাবের প্রবাহ উপলব্ধি করেন। ইঁহারা কোন কোন বর্ণের দর্শনে একটা স্নিগ্ধকর শান্তভাব, এবং কোন কোন বর্ণের দর্শনে একটা উদ্দাম উত্তেজক ভাব পাইয়া থাকেন। উজ্জয়িনীর সভাকবি বোধ হয় এমনই কোন এক ভাবের অনুপ্রেরণায় একদিন শীপ্রাতটে দাঁড়াইয়া গাহিয়াছিলেন:—

"নিতান্ত লাক্ষারস-রাগরঞ্জিতৈঃ
নিতম্বিনীনাং চরণৈঃ সনূপুরৈঃ
পদে পদে হংসরুতানুকারিভির্
জনস্য চিত্তং ক্রিয়তে সমন্মথম্"—ঋতুসংহারম্।

এখানে চরণের অলক্তক, এবং নূপুরধ্বনি হৃদয়ের মধ্যে উত্তেজনার প্রবাহ আনিয়া দিতেছে।

সৈনিকগণ সাধারণতঃ এই Physiological জাতীয় হওয়ায় সকল বর্ণ অপেক্ষা লোহিত বর্ণ অধিক পছন্দ করে। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি তাহার শত্রুকে হত্যা করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে সম্মুখে পাইলে তাহাকেও হত্যা করিতে উদ্যত হয়। তখন তাহার হৃদয়ে একটা জিঘাংসা বৃত্তি জাগিয়া উঠে—তাহার ঐ হিংস্র উত্তেজনার জন্য রক্তের লোহিত বর্ণকে আংশিকরূপে দোষী করা যাইতে পারে।

বিলাতের অনেক রঙ্গালয়ের এবং অভিনেত্রী ও নর্ত্তকীগণের আবাসগৃহের কক্ষ-গাত্র লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। যেহেতু উত্তেজনার উৎসাহকল্পে দর্শকের পারিপার্শ্বিক দৃশ্য-সকলও উত্তেজক হওয়া প্রয়োজন। এই হিসাবেই রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও নর্ত্তকীগণ তাহাদের নাট্যশালা ও বিলাসভবন উত্তেজক বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখে।

চরিত্রগত ভাবের হৃদয় বা Character Type অর্থাৎ

কোন বর্ণের দর্শনে যাঁহারা উহার মধ্যে একটা সজীব প্রাণীর চরিত্র চিত্রিত দেখিতে পান। তাঁহাদের কোন বর্ণ দর্শনমাত্র মনে হয়, যেন বর্ণ আপনিই হাসিতেছে অথবা কাঁদিতেছে—যেন সে কখনও আনন্দে উজ্জ্বল, কখনও বা দুঃখে ম্রিয়মাণ। এই Character জাতীয় এবং Physiological জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রভেদ এই, যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাদের দৃষ্ট বর্ণের মধ্যেই একটা সজীবভাবের আভাষ দেখিতে পান, আর শেষোক্ত ব্যক্তিরা বর্ণদর্শনে স্বীয় অন্তরের মধ্যে একটা কোন ভাবের উপলব্ধি করেন। নিম্নে বিভিন্ন বর্ণের কতগুলি 'চরিত্রগত' ভাবের অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করিলাম। এগুলি ভ্যালেন্টাইন সাহেবের কতকগুলি subject অর্থাৎ পরীক্ষাধীন ব্যক্তির অভিমত।

গোলাপীবর্ণ—"সে যেন রহস্যময়—যেন বড় সুখী—তার ঐ নবনীত তনু যেন পালকের মত লঘু—যেন কত কমনীয়!"

গভীর রক্তবর্ণ—"যেন মূর্ত্ত সজীবতা—কি ভীষণ বীর্য্যবান, ও যেন মদমত্ত কামাতুর, ওর কি তীব্র আনন্দময় সুখ!"

লঘু নীলবর্ণ—"ও যেন গম্ভীর অথচ সরল, ওর স্বভাব যেন নিয়ত বিশ্রামশীল, ওর ওই তেজোগর্ব্বহীন মুখে যেন সতত একটা পরিতৃপ্ত ভাব বর্ত্তমান!"

পীতবর্ণ—"ও যেন কার্ত্তিকের মত শক্তিমান্ সুপুরুষ—আপন ক্ষমতাবলে ও যেন সদাই আনন্দোৎফুল্ল!"

সবুজবর্ণ—"ওর কি স্নিগ্ধ মধুর অথচ তেজব্যঞ্জক সুকুমার মূর্ত্তি, ও যেন কোন সুন্দরী মূক নারীর নীরব সৌন্দর্য্য—ও নীরব বটে কিন্তু প্রাণহীন নহে।"

মিশ্রবর্ণের ক্রিয়া আবার অন্যরূপ। কোন এক বর্ণ অন্য বর্ণের সামান্য স্পর্শে অন্য প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে।

স্বীয় পারিপার্শ্বিক বস্তুনিচয় ও চিরপরিচিত দৃশ্যাবলীর বা বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কোন পদার্থের বর্ণের সদৃশ বর্ণ দেখিয়া যাহাদের হৃদয়ে কোন ভাবের উদয় হয়, তাহাদিগকে সংস্কারগত ভাবগ্রাহী বা Associative Type বলা হয়। পল্লীবাসীগণের নিকট সবুজবর্ণ অতি প্রিয়, যেহেতু উক্ত বর্ণের সহিত তাঁহারা দিবারাত্রি সংশ্লিষ্ট। গ্রাম্য প্রকৃতি ধীর মধুর ও শান্তিদায়িনী বলিয়া উক্ত বর্ণের দর্শনে পল্লীবাসীদের হৃদয়ে ঐসকল দীর্ঘসহবাসজনিত বদ্ধমূল ভাবের অতি সহজেই পুনরুদ্রেক হয়।

এমন দেখা যায় যে, মনুষ্যের বাহিরের ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন বিশেষ পদার্থের পরিচয় না থাকিলেও, অন্তরের ধ্যান-পরিচয়ে ঠিক 'দৃষ্টিপরিচিত' ভাবের ন্যায় ভাব সৃষ্ট হইয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে সমুদ্র দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণভ্রমে ইহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃষ্ণমূর্ত্তিই একমাত্র ধ্যান ছিল, সুতরাং সুনীল সাগরকে তাঁহার নিকট যশোদার নীলমণি বলিয়া ভ্রম হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্য নয়।

আমি একজন ভদ্রলোককে জানি যিনি গোলাপীবর্ণ পছন্দ করা দূরের কথা, বরং ভয় করিতেন। আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুর সময় একখানি গোলাপী বর্ণের পীতবস্ত্র গায়ে দিয়া ছিলেন। সেইজন্য আজ পর্য্যন্ত তিনি কখনও উক্ত বর্ণের জিনিষ ব্যবহার করেন না। তাঁহার এই যে গোলাপীবর্ণের প্রতি বিরাগ, ইহাও সংস্কারজাত।

কোন বর্ণের দর্শনে মনের মধ্যে সচরাচর যে সংস্কারজাত ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সংস্কারগত সহজভাব বা General Associations বলা হয়, যেমন—নীলবর্ণ দর্শনে আকাশের কথা, রক্তিমবর্ণ দর্শনে রক্তের কথা প্রভৃতি মনে পড়িয়া থাকে। যেদিন হইতে আমাদের জ্ঞান হইয়াছে, সেইদিন হইতে আকাশ দেখিতেছি, আর দেখিতেছি যে আকাশ নীল; সুতরং নীল বর্ণের দর্শনে সাধারণতঃ আমাদের আকাশের কথাই সর্ব্বত্র মনে পড়ে।

যখন কোন একটি বর্ণের দর্শনে হৃদয়ে কোন একটা বিশেষ ভাবের উদয় হয়, তখন ইহাকে সংস্কারগত বিশিষ্টভাব বা Individual Associations নামে অভিহিত করা হয়, যেমন পথে রক্তিম বর্ণের চিহ্ন দর্শনে বিপদে সাবধান হইবার কথা মনে হয়, কেননা বিপদের স্থলে সাবধানের জন্যই রক্তিম বর্ণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন (Red signal) দেওয়া হয়। নীলবর্ণের দর্শনে হৃদয়ে একটা অসীমতার ভাব আসে, যে-হেতু নীলবর্ণ কোন্

অনাদিকাল হইতে সাগর এবং অম্বরের দুই নীলিমায় সীমাহারা। বঙ্গদেশে একটা প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।" এই প্রবাদ বাক্যটির মূলেও একটা সংস্কারজাত বিশিষ্টভাব বর্ত্তমান।

ডাক্তার ভ্যালেণ্টাইন এই সংস্কারজাত বিশিষ্টভাব শ্রেণীর একটি অতি সুন্দর উদাহরণ দেখাইয়াছেন:—"An even more remote association was that in the case of a subject who disliked a colour, because it was the colour of a tie constantly worn by a teacher whom she had greatly disliked."

আমাদের মধ্যে আরও একটা Subconscious Association বা মগ্নচেতন সংস্কার আছে—যেটা আমরা সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। নীল ও লাল এই দুইবর্ণের পরস্পর আলিঙ্গনচিত্র আমার চক্ষে অপূর্ব্ব শোভাময়—আমি এই দুই বর্ণের মিশ্র সৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু কি কারণে যে এই দুইয়ের সংমিশ্র বর্ণ আমার নয়নে এত মধুর লাগে, ইহার কোনও সদুত্তর জানি না—ভাবিয়াও ইহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাই না। তবে কি ইহার কোনও যুক্তিপূর্ণ কারণ নাই? অবশ্যই আছে। যদি কোনও মনস্তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত আমার চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, বহুদিন পূর্ব্বে আমার জীবনের এক অতীত পরিচ্ছেদে একদা কোন নদীকূলে সূর্য্যাস্তবেলায় এই নীলের ও লালের সংমিশ্রিত চন্দ্রাতপতলে আমি হৃদয়ের মধ্যে এক দুর্লভ ধন কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, যাহার লাভে আমার সেই নবীন প্রাণ সেদিন বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল। তারপর কতদিন চলিয়া গিয়াছে—কত দীর্ঘ বৎসর অতীতে মিশিয়াছে, আমি সে ঘটনা ভুলিয়াছি, সে স্মরণীয় দিনটিও বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্তু সে দিনের যে বর্ণ আমার নয়ন মধু-অঞ্জনে রঞ্জিত করিয়াছিল, আজিও তাহা চক্ষের কোণে লাগিয়া আছে।

আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর বর্ণের আর-একটা ক্রিয়া আছে—সেটা বর্ণের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব। প্রায় সকলের মধ্যেই দেখা যায় যে, গুরু বর্ণটি নিম্নে এবং লঘু বর্ণটি উপরে থাকিতে দেখিলেই যেন তাঁহারা সুখী হন। যদি একটা ঘরের উপরের দেয়াল কোন গভীর বর্ণে; এবং নীচের দেয়াল কোন তরল বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, তাহা হইলে ঘরটা দেখিলেই মনে হইবে যেন "মাথাভারি" ঘর। বুলো সাহেব বর্ণের এই গুরুত্ব এবং লঘুত্ব আবিষ্কার করেন। নিম্নে তাঁহারই কৃত কতগুলি পরীক্ষা দেখাইতেছি।

১ম চিত্র। ২য় চিত্র। ৩য় চিত্র। ৪র্থ চিত্র।

উপরোক্ত উপায়ে বুলো সাহেব প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দ্বিতীয় ও চতুর্থ চিত্র দুইটি পছন্দ করিয়াছিলেন। কারণ উক্ত চিত্র দুইটি 'মাথাভারি' নয়। এ বিষয়ে এখন একটা প্রশ্ন মনে আসিতে পারে যে, "মাথাভারি" চিত্র আমরা পছন্দ করি না কেন? ইহার কি কোন গূঢ় কারণ আছে? অবশ্যই আছে।—এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রাকৃত দৃশ্যে আমরা আশৈশব দেখিতেছি যে, ইহার ঊর্দ্ধের বর্ণ অপেক্ষা নিম্নের (Base) বর্ণ গাঢ়। সেইজন্য কোথাও ইহার বিপরীত দেখিলে আমাদের চক্ষে উহা বিসদৃশ ঠেকে—যেন 'মাথাভারি' বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বর্ণ-বিশারদ বুলো সাহেব এ যুক্তির সমর্থন করেন না। তিনি বলেন যে, এমনও দুই একটি জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের ঊর্দ্ধের বর্ণ বেশী গভীর। *

বর্ণের এই বিভিন্ন অভিব্যক্তি সকলের উপর সমভাবে ক্রিয়াশীল নহে। পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের উপর ইহার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া। কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, শিশুদের নিকট সকল বর্ণের অপেক্ষা রক্তিম ও হরিদ্রাবর্ণই অধিক প্রিয়তম; তৎপরে গোলাপী, ধূসর, কৃষ্ণ, নীল, সবুজ এবং ভায়োলেট বর্ণ প্রভৃতি। বর্ণের

* Bullough সাহেব লিখিত, "The Aparent heaviness of colours"—British Journal of Psychology. Vol II দ্রষ্টব্য।

ঔজ্জ্বল্যের উপর ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। ভ্যালেণ্টাইন সাহেবের মতে Infants are notoriously attracted to white colour for its brightness, কিন্তু আমি কতকগুলি শিশুকে দেখিয়াছি যে, ইহারা দুগ্ধের প্রিয় নয় বলিয়া গাঢ় শুভ্রবর্ণ মোটেই পছন্দ করে না। এটা বোধ হয় সংস্কারজাত ভাব।

নারীজাতি সাধারণতঃ বিশ্রামশীল আরামপ্রিয় হওয়ায় যে সকল বর্ণের মধ্যে উত্তেজক (warmer) ভাব আছে সেই সকল বর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করেন—যেমন রক্তিমবর্ণ। তবে সকল অবস্থায় নয়। সধবানারীর নিকট উত্তেজক বর্ণ সকল প্রিয় ও স্পৃহনীয় বটে, কিন্তু বিধবার নিকট একেবারেই নয়। আমাদের হিন্দুনারীগণ বিবাহের পর হইতে উত্তেজক বর্ণের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। সেইদিন হইতে অঙ্গের বস্ত্র, সীমন্তের সিন্দূরবিন্দু, চরণের অলক্তকরাগ তাঁহাদের গর্ব্বের ভূষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিধবা আপনাকে উত্তেজনা হইতে বহু দূরে রাখিতে চান,—সীমন্তের সিন্দূরবিন্দু ও চরণের অলক্তক মুছিয়া ধুইয়া পবিত্র শুভ্রবাসে ব্রহ্মচারিণী তাঁহার নিরাভরণ অঙ্গ ঢাকিয়া রাখেন। নারীগণের মধ্যে সধবাগণ রক্তিম, গোলাপী, নীল ও হরিদ্রা প্রভৃতি তীব্র উজ্জ্বল বর্ণ ভালবাসেন, এবং বিধবাগণ শ্বেত, সবুজ এবং নীল প্রভৃতি শান্ত ও স্নিগ্ধ বর্ণ ভালবাসেন।

পুরুষজাতি সাধারণত নারীজাতি অপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠ হওয়ায় স্নিগ্ধকর বর্ণের পক্ষপাতী যেমন সবুজবর্ণ। নীল, রক্তিম, শুভ্র, হরিদ্রা এবং কৃষ্ণবর্ণও পুরুষজাতিগণের প্রিয়।

সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধারণের বর্ণাভিমতের সহিত দুই-একজন লোকের বর্ণমতের ঐক্য হয় না। দেশ এবং জাতির সমাজগত ও প্রকৃতিগত বা পারিপার্শ্বিক বস্তুসকলের সামান্য তারতম্যে ইহাদের বর্ণাস্বাদও পরিবর্ত্তিত হয়।* আবার সময়ে সময়ে দেখা যায় যে কোনও দেশে যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের লোকের স্বাদও বদলাইয়া যায়। যখন বর্ষার বন্যার মত একটা কিছু রকম দেশের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন সেই জিনিষই সকলের প্রিয় হইয়া উঠে। খাকিবর্ণ প্রথম দেখিলাম সৈন্যবিভাগের মধ্যে, তৎপরে দেখিতে দেখিতে ট্রামের কণ্ডাক্টর ও মোটর-চালক হইতে আরম্ভ করিয়া পথে ঘাটে সকলের অঙ্গেই উঠিয়াছে। আবার হয়ত কোনদিন দেখিব যে, কালধর্ম্মে খাকি মরিয়া অন্য কোন বর্ণে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের উপরেও বর্ণের বিভিন্ন-প্রকারের ক্রিয়া আছে। কীটপতঙ্গগণ সাধারণতঃ উজ্জ্বলবর্ণের পক্ষপাতী, এবং সেইজন্য নিত্য কত অসংখ্য পতঙ্গ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইতেছে। কীটগণ সাধারণতঃ পুষ্পের রূপ রস ও গন্ধের জন্য ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু অতি অল্প পুষ্পের মধ্যে এই তিনটির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন জাতীয় কীট পুষ্পের মধু অপেক্ষা বর্ণের পক্ষপাতী, এবং কোন জাতীয় কীট বর্ণ অপেক্ষা মধুর অধিক প্রিয়। প্রজাপতিরা পুষ্পের রস এবং গন্ধ অপেক্ষা বর্ণই অধিক ভালবাসে। ইহারা হরিদ্রা এবং গোলাপী বর্ণের পুষ্প ব্যতিরেকে সাধারণতঃ অন্য কোন পুষ্পে বসে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহারা উত্তেজক বর্ণের পক্ষপাতী। ভ্রমরের দল শ্বেত এবং রক্তিম বর্ণের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। ইহারা রসপ্রিয়। শ্বেত এবং রক্তিম বর্ণের পুষ্পে যে-পরিমাণ মধু থাকে, অন্য কোন পুষ্পে সেরূপ থাকে না। সেইজন্যই বোধ হয় ইহারা উক্ত বর্ণদ্বয়ের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট।

এখন উপসংহারে একটি কথা বলিবার আছে। আমরা কতকগুলি মনজ পদার্থের কাল্পনিক বর্ণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকি, অর্থাৎ উহাদের নিজস্ব বর্ণ কিছুই নাই, আমরা উহাদের গুণানুসারে একএকটা বর্ণ স্থির করিয়াছি মাত্র। যেমন—

"মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে,
যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ,
রক্তৌ চ ক্রোধরাগৌ।"

—সাহিত্যদর্পণ।

* The southern nations of Europe and tropical peoples seem to prefer warmer and more striking colours than do the people of the colder north. Nor does this appear to be merely a question of degree of culture. The cultured women of Germany are fonder of strong, intense colours than the women of Scotland appear to be."—Valentine's Psychology of Beauty.

—আকাশ এবং পাপ মলিন (অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ) ; যশ, হাস্য এবং কীর্ত্তি শ্বেতবর্ণ ; ক্রোধ এবং অনুরাগ রক্তবর্ণ। কিন্তু পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ পাপ এবং হাস্যকে অন্য বর্ণে রঞ্জিত করেন।

যথা, পাপ—"Our sins are red as crimson, they shall be white as snow."

হাস্য—"and I all the while bask in heaven's blue smile, whilst he is dissolving in rains."—Shelley.

নৈরাশ্য, দুঃখ এবং অপযশ কৃষ্ণবর্ণে ; এবং পবিত্রতা, সুখ এবং পুণ্য প্রভৃতিও শ্বেতবর্ণে বর্ণিত করা হয়। কিন্তু কিহেতু আমরা ইহাদের ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কল্পনা করিয়া থাকি ? এইরূপ কাল্পনিক বর্ণের কি কোন সার্থকতা নাই ? আমরা যে-সকল অবস্থা ও পদার্থের মধ্যে একটা বাঞ্ছনীয় বস্তুর অভাব দেখিতে পাই, সেই-সকল অবস্থা ও পদার্থের রূপই আমরা কৃষ্ণবর্ণ কল্পনা করিয়া থাকি। কারণ, কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কোন বর্ণই নাই, বর্ণ-বিহীনতাই (Lackness of Colour) ইহার সত্তা। যেমন আমরা বলি 'কলঙ্কিত চরিত্র', অর্থাৎ কলঙ্কিত চরিত্র একটা অবস্থা, যাহার মধ্যে চরিত্র এই বাঞ্ছিত বস্তুটির একান্ত অভাব দেখিতে পাই। এইজন্যই কলঙ্কিত চরিত্রকে আমরা কৃষ্ণবর্ণের তুলিকাতেই রঞ্জিত করি।

শ্বেতবর্ণের কল্পনা ঠিক কৃষ্ণবর্ণের বিপরীত অবস্থায়, অর্থাৎ যেসকল অবস্থা এবং পদার্থের মধ্যে আমাদের স্পৃহনীয় বস্তু সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে, সেই-সকল অবস্থার ও পদার্থের শ্বেত রূপ কল্পনা করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণ-বর্ণের যেমন বর্ণহীনতাই সত্তা, সেইরূপ শ্বেতবর্ণের সত্তা আবার সপ্তবর্ণেরই সমষ্টিতে ; অতএব ইহারা উভয়েই পরস্পরের গুণের বিরোধী !

ক্রোধ এবং অনুরাগকে রক্তিমবর্ণের সহিত তুলনা করা হয় কেন, সেবিষয় প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বিশেষভাবে বলিয়াছি। ইহারা উভয়েই উত্তেজক ; সুতরাং ইহারা উত্তেজক ভাবাপন্ন রক্তিমবর্ণের দ্বারাই রঞ্জিত হইয়া থাকে।

আমাদের সকলেরই চিত্তপটে আর-একটি মানসকল্পিত অপরূপ বর্ণ আছে—সে বর্ণ এই নিখিল বিশ্বজগতের নিয়ন্তার। ভিন্ন ভিন্ন ভক্তহৃদয়ে তিনি বহুভাবে রঞ্জিত—কাহারও নিকট তিনি "নবদূর্ব্বাদলশ্যাম", কাহারও নিকট "চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর", কাহারও নিকট "ঘোরা রক্ত-বর্ণা", কাহারও নিকট বা "কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা", কাহারও নিকট বা তিনি "কালী করালী"। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত রূপ কি ? তিনি ত একে বা দু'য়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন ! উপনিষদে ইহাঁর রূপ কি দেখি ?

— "তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

তিনি অপরূপ, তিনি অরূপ, তাই তিনি বহুরূপ !

শ্রীহরিচরণ মিত্র।

দর্ভনগর

দেশের ইতিহাস লেখা থাকে দেশের নগরে, গ্রামে, গল্পে গুজবে, এমন কি উপকথায় পর্য্যন্ত। দেশটা যদি প্রাচীন হয় ও বহুদিনের সভ্যতার ধারাটা তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া থাকে তবে ইতিহাসের পরিচয়টা পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। তাই কোনও প্রাচীনদেশে গেলেই সে দেশের ধ্বংসস্তূপ যেন তাহার প্রাচীন কাহিনী ও বিগতগৌরবের দীর্ঘশ্বাস পর্য্যটককে শুনাইয়া দেয়। এই-সব ধ্বংসসমষ্টির মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেশের প্রাচীন ইতিহাসটা ক্রমে ক্রমে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। বড়োদা ভ্রমণ করিতে গেলে ঠিক ঐরূপ ঘটে, গুজরাটের সমগ্র ইতিবৃত্তটা যেন বড়োদার মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠে, কেননা গুজরাটের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপের বেশীর ভাগই বড়োদারাজ্যেই অবস্থিত —বড়োদা যেন গুর্জ্জরের হৃতস্বাধীনতার অতীত স্মৃতিকে জোর করিয়া বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছে। পট্টন, সিদ্ধপুর, মধোরা, প্রভৃতি উত্তর গুর্জ্জরে ; ধাবই, চাণোদ প্রভৃতি দক্ষিণ গুর্জ্জরে থাকিয়া অতীতের কঙ্কালকে চাপিয়া ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমান সময়ের গুর্জ্জর-গৌরবের পরিচয় দিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। এই-সকল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ধাবোই গুণগৌরবে ও অক্ষতাবস্থার পরিমাপে শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

ইহা বর্ত্তমান বড়োদা সহরের ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। কবে যে ধাবোইএর উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সুদূর অতীতের যবনিকা ভেদ করিয়া জানিবার উপায় নাই বলিলেই হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার

ধাবোইএর হীরাতোরণ বা পূর্ব্বদ্বার।
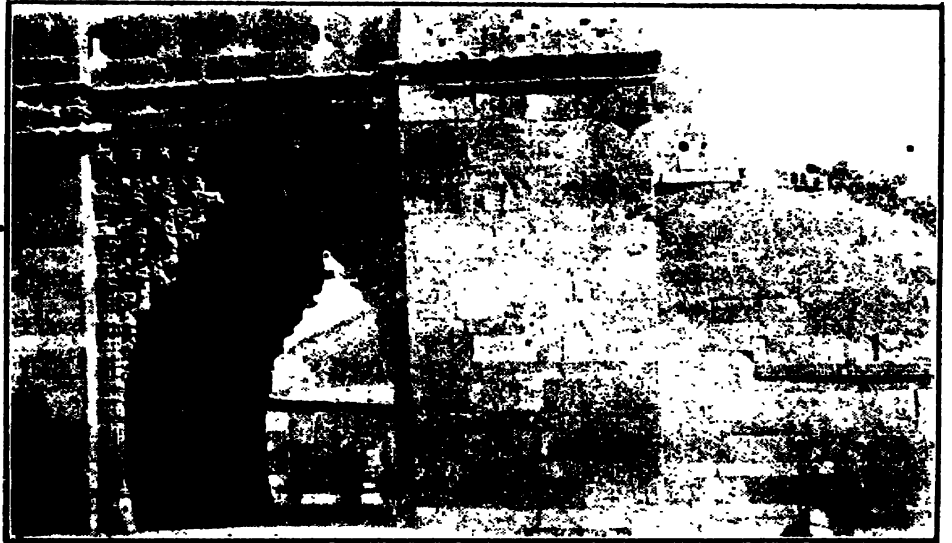
ধাবোইএর বরদাতোরণ বা পশ্চিমদ্বার।
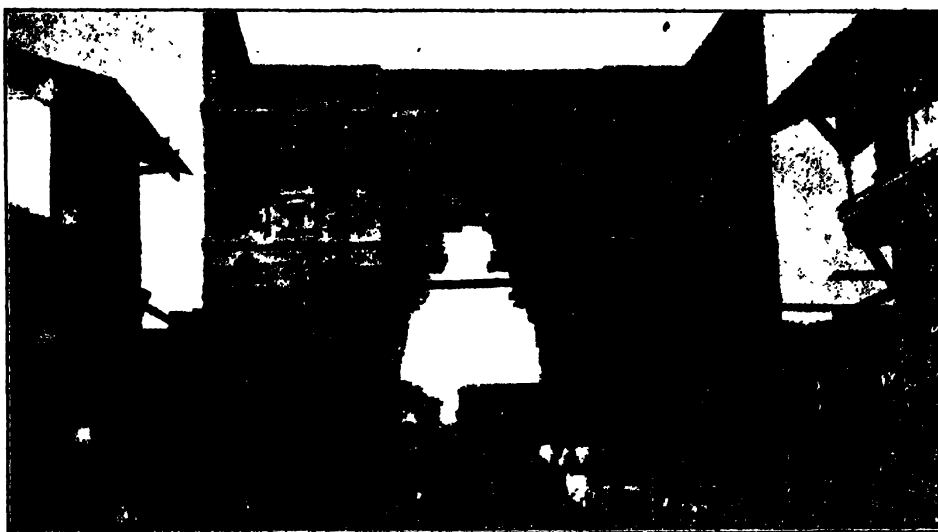
ধাবোই-এর চম্পানীর তোরণ বা উত্তরদ্বার

কালিকামাতার মন্দির, ধাবোই

বৈদ্যনাথের মন্দির ধাবোই

ধাঁবোই সরোবরের মধ্যে দ্বীপের উপর অর্দ্ধপ্রোথিত শিবমন্দির।

ধাবোই-সরোবরে প্রবিষ্ট জিহ্বাকৃতি স্থানে শিবমন্দির।
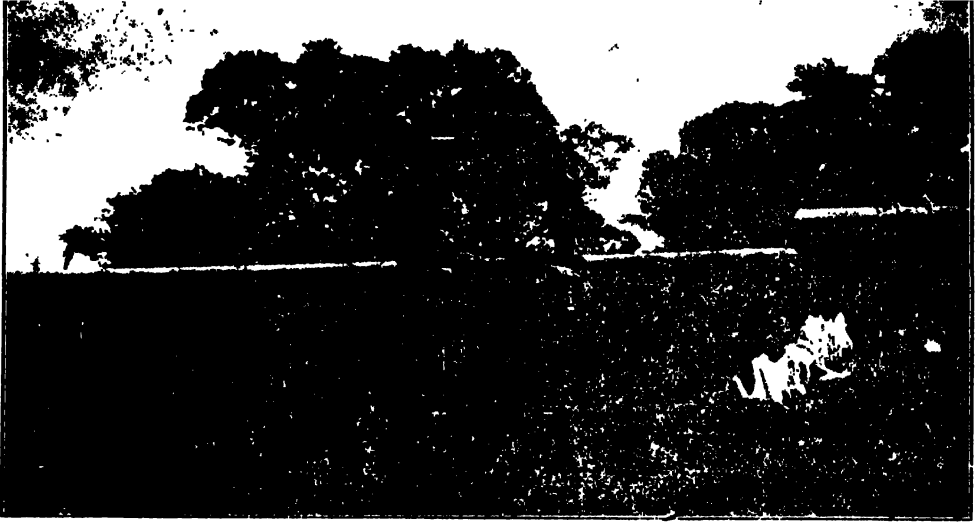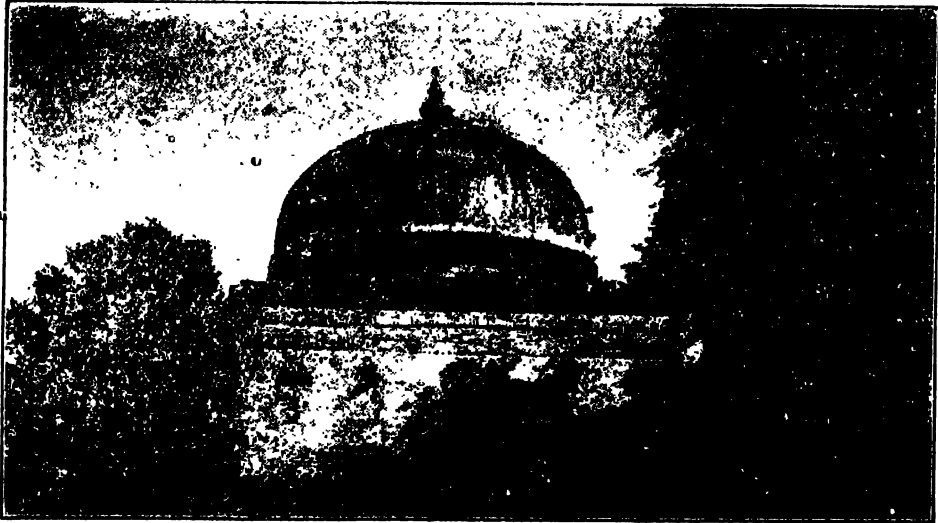
মাম্মাদোকরীর সমাধি, ধাবোই

পাঁচ-প্রকার সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল। এই সিদ্ধান্তের অন্যতম রোমক সিদ্ধান্তে ধাবোইএর উল্লেখ আছে। তাহাতে লেখা হইয়াছে সংস্কৃত দর্ভকুশ হইতে দর্ভবতী নামের উৎপত্তি ও তাহা হইতে অপভ্রংশে ধাবোই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু অনেকে এই উৎপত্তিকাহিনী-সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন ও সন্দেহ উপস্থিত করিয়া থাকেন। যাহা হউক ইতিহাসজ্ঞগণের বিপুল চেষ্টায় হয়তো একদিন ইহার প্রকৃত ইতিহাস বাহির হইয়া পড়িবে—আমরা সেই আশায় বসিয়া থাকিলাম—না থাকিয়াই বা করিব কি? ধাবোইএর জন্ম যেদিনই হইয়া থাকুক, ইহা যে উত্তর কালে নানা কারণে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা ও-দেশের সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রাচীন চাণ্ডোদ ও কার্ণলিতে যাইবার পথে এই ধাবোই; উত্তর গুর্জ্জর হইতে যাইবার কালে পুণ্যলোলুপ তীর্থযাত্রীরা পথের ক্লান্তি হরণ করিবার জন্য এখানে দুইএকদিন বিশ্রাম করিয়া যাইত। সহরের ঠিক মাঝখানে যে একটি সুন্দর সরোবর আছে তাহারই চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া ধাবোই গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এই সরোবরই ইহার উৎপত্তির অন্যতম কারণও বোধ হয়। চালুক্য ও সোলাঙ্কি (৯৬১-১২৪২ খৃঃ) রাজাদের সময় ধাবোই ছিল গুর্জ্জরমণ্ডলের শেষ সীমা। দুর্দ্ধর্ষ কোল ও ভিলদের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য সোলাঙ্কি রাজারা এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে বহুকারণ একত্রিত হইয়া ধাবোইএর সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি ঘটাইয়াছিল।

এই তো গেল ধাবোইএর যথাসম্ভব ইতিহাস। কিন্তু ইহার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নানারূপ গল্পগুজবের অভাব নাই। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে পট্টন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বিজয়সিংহ সর্দ্দার, জয়সিংহ। জ্ঞানী সলোমানের মত তাঁহার বহু বিবাহিতা ও অবিবাহিতা স্ত্রী ছিল। ইহাদের মধ্যে পাটরাণী ছিলেন রত্নাবলী। নামও যেমন গুণও তাঁহার তেমনি ছিল। তন্বী সুন্দরী রত্নাবলী রাজাকে প্রায় বশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, এরূপ ক্ষেত্রে পাটরাণী অন্যদের চক্ষুশূল হইয়া থাকেন। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, ক্রমে রত্নাবলী সকলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন, বিশেষতঃ হিংসার মাত্রাটা একেবারে চড়িয়া উঠিল যখন রত্নাবলীর সন্তানসম্ভাবনা প্রকাশ পাইল। তাহারই সন্তান তো ভবিষ্যতে রাজা হইবে ও সপত্নী রত্নাবলী রাজমাতা হইবে আশঙ্কায় অপর রাণীরা বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। এদিকে পাটরাণীও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, গর্ভের সন্তানের অনিষ্টাশঙ্কায় মাতৃহৃদয়ও উদ্বেল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বেশ জানিতেন পূর্ব্বকৃত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের জন্য ক্ষমা সপত্নীরা কখনই করিবে না, বরং অনিষ্টের খড়্গ সর্ব্বদাই উদ্যত করিয়া রাখিবে, কখন্ কোথায় কিরূপ ভাবে ইহা পড়িবে কে জানে? দোদুল্যমান খড়্গের তলায় কোন্ বুদ্ধিমান স্বেচ্ছায় থাকিতে চাহে? অতএব রাণী নর্ম্মদাতীরে চাণ্ডোদে পূজা দিতে রওনা হইলেন। পথশ্রমক্লান্ত রাণী একদিন গোধূলিতে নর্ম্মদা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে স্থিত পবিত্র উদ্যান ও সরোবর-তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গস্থ পুরোহিত গোস্বামী রাণীকে তথায় কিছুদিন অবস্থান করিতে উপদেশ দিলেন। তথায় উপযুক্ত সময়ে রাণীর একটি পুত্র হইল। বিনা বিঘ্ন বাধায় সহজে এই সন্তান লাভ হওয়ায় রাণীর মনে হইল এই স্থানের গুণ আছে; অতএব এইখানে সন্তানের মঙ্গলের জন্য কিছুদিন থাকিয়া যাই। এইরূপ মনে করিয়া রাণী রাজার নিকটে তথায় থাকিবার অনুমতি চাহিলেন ও রাজাও সম্মতি দিলেন। রাজা প্রিয়তমা পত্নীর প্রিয়স্থানকে সুন্দরতর ও আরও মনোরম করিয়া তুলিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিবেন স্থির করিলেন। রাজা এই উদ্দেশ্যে সরোবরটি কাটাইয়া বৃহদায়তন করাইলেন, সুদৃশ্য মনোহর উদ্যান রচনা করাইলেন ও তাঁহার প্রেমের চিহ্নস্বরূপ সুন্দর নগর গড়িয়া তুলিলেন। পুত্রের নাম হইল বিশাল-দেব। তিনিও মাতার এই পছন্দসই স্থানকে পছন্দ করিতে লাগিলেন; এমন কি পট্টনের সিংহাসনে অধিরোহণের পরও তিনি কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন ও তথাকার জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তথায় রাজদরবার বসিবে। বিশালদেব শিল্পীগণের অনুরোধে এই স্থানের নাম ধ্রুবনগর রাখেন ও তাহারই অপভ্রংশ ধাবোই। বিশালদেব এই নাম তাঁহার নিজ নামানুসারে রাখেন। ইহা হইল গুজবের কথা। ফর্‌বস্ দেশীয় কবি ও চারণদের নিকট ধাবোইএর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ

কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বারজেস্ সাহেব বলেন যে, বিশালদেব হইতে যে কিরূপে ধাবোই নামের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা বুদ্ধির অগম্য, আরও এই যে বিশালদেবের বহুপূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও ধাবোইএর পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের স্বভাবই এই যে, কোনও সমৃদ্ধিশালী নগরের নামোৎপত্তির ইতিহাস্ কোনও পৌরাণিক নামের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। রোমের সহিত রোমিউলাসের নামের যে সম্বন্ধ এ ক্ষেত্রেও বিশালদেবের নামের সহিত ধাবোইএরও সেই সম্বন্ধ। অপর প্রচলিত প্রবাদ এই যে, বিশালদেবের মনে আশঙ্কা জন্মিল এই সুনিপুণ শিল্পী যদি অন্য রাজাদের নিকট যাইয়া তাঁহাদের নগর নির্ম্মাণে যোগ দেয় তবে ধাবোই হয়তো হটিয়া যাইবে। এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া বিশালদেব এই শিল্পীকে কালিকা-মাতার মন্দির তলের ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। গ্রামবাসীরা এখনও সেই করুণ কাহিনী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় পর্য্যটকগণকে বলিয়া সেই স্থান দেখায় ও শিল্পীর পতিব্রতাপত্নীর পতিপ্রেমের পরিচয় দিয়া থাকে। কেমন করিয়া প্রেমিকা পত্নী পতির জন্য জীবনদণ্ডকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া স্বামীর জন্য প্রত্যহ খাবার যোগাইত সেই কাহিনী কহিতে-কহিতে গ্রামবাসীরা করুণায় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। কিছুদিন গত হইলে স্বেচ্ছাচারী রাজার আবার শিল্পীকে প্রয়োজন পড়িল। কিন্তু রাজা মনে করিলেন অনাহারে শিল্পী জীবন-ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু শিল্পী বাঁচিয়া ছিল, তাহাকে হাজির করা হইল। তাহাকে তখন কতকগুলি শিল্পের কার্য্য দেওয়া হইল।

ইতিহাস বিচারে বসিয়া প্রবাদপ্রবচনকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া বিদায় করিয়াছে, কিন্তু কি যে প্রকৃত তাহা সে এ পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারে নাই। চৌদ বা চাপটকটদের (৭৪৬—৯৪১ খৃঃ) রাজ্য যে ধাবোই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। দক্ষিণ গুর্জ্জরাধিপতি রাষ্ট্রকূটদের অধীনেই ইহা খুব সম্ভব ছিল। সোলাঙ্কি বা চালুক্যরা ধাবোইদুর্গ নির্ম্মাণ করান। শ্রেষ্ঠ চালুক্য-নৃপতি জয়সিংহ (১০৯৩ - ১১৪৩ খৃঃ) নাকি দুর্গ ও তোরণাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধরাজ জয়সিংহ সম্বন্ধে ইহা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না; কারণ এমন ঢের সৎকার্য্যের সহিত তাঁহার নাম জড়িত করা হইয়াছে দেখা গিয়াছে যাহাদের সহিত জয়সিংহের কোনই সম্বন্ধ ছিল না। যাহা হউক ইহা ঠিক যে, সীমান্তস্থিত ধাবোইকে যে তিনি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে—অন্ততঃ মনু ও হিতোপদেশের দুর্লভবাক্য অনুসরণ করিয়া ইহার রক্ষণ-কার্য্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ।

সিদ্ধরাজ ও কুমারপালের মৃত্যুর পর চালুক্যবংশের অধঃপতন আরম্ভ হয় ও অবশেষে ধোলকার বগহেলাবংশের রাণা বিরাধবালের পুত্র বিশালদেব অনহিলবাড়ের সিংহাসন অধিকার করেন (১২৪৩—১২৬১ খৃঃ)। বিশালদেবের জন্ম ধাবোইএ হয় এবং তিনি তথায় একটি যজ্ঞ সমাধা করেন। গিরনারের (১২৩১ খৃঃ) শিলালেখে লেখা আছে যে, বস্তুপাল ধাবোইএর মন্দিরের যত্ন করিতেন। গিরনার শিলালেখ তেজপাল ও বস্তুপাল নামক জৈন ভ্রাতৃদ্বয়কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। এই ভ্রাতৃদ্বয় তৎকালে মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বারজেস্ সাহেবের মত এই যে, বিশালদেব হীরাতোরণ ও তৎসন্নিহিত মন্দিরাদি সংস্কার করিয়াছিলেন। বস্তুপালচরিতে দেখা যায় যে, তেজপাল বিশালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। এই সময় ধাবোইএ চতুর্দ্দিকের দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীরা বড়ই উৎপাত করিত। তেজপাল এই উৎপাত বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে গোধরার রাজা গোগলকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়া খাঁচায় পুরিয়া লইয়া আসেন এই উদ্দেশ্যে যে, অন্যান্য লোকেরা তাহার অদৃষ্ট দেখিয়া যেন সুশিক্ষা পায়। বিজয়ী তেজপাল ধাবোইএ উপস্থিত হইয়া দুর্গপ্রাচীর, পার্শ্বনাথের মন্দির ও বৈদ্যনাথের মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ দেন।

১২৯৮ খৃঃ গুর্জ্জরমণ্ডল মুসলমানেরা হস্তগত করেন—ধাবোইও সেই সময় বিজয়ীদের হস্তগত হয়। কি করিয়া যে ইহা হিন্দুর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল তাহা জানা যায় না। এ সম্বন্ধে ভারী সুন্দর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাণীর প্রিয় তীর্থস্থান বলিয়া ধাবোইএর আয়তনের মধ্যে কোনও মুসলমানের বাস ও সরোবরে স্নান করিবার অধিকার ছিল না। একদিন বিদেশী যুবক মুসলমান পথিক সৈয়দ বুলহা মাতা মাম্মাদোকরীর সহিত মক্কা যাইতে-

যাইতে এখানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি চুপে-চুপে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছ সরোবর দেখিয়া এতই বিমোহিত হইয়া পড়েন যে, স্নান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মোহের বশে রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া যুবক বিপদে পড়িলেন—রাজাদেশে তাঁহার হাত দুইটি কাটিয়া লওয়া হইল। মাতার বৃদ্ধবয়সের একমাত্র সম্বল পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া মাতৃহৃদয় প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল, তিনি কোরানের নামে শপথ করিয়া বলিলেন—যাহারা আমার পুত্রের রক্তপাত করিয়াছে, যত দিন না তাহাদিগকে এই রক্তের পরিবর্ত্তে রক্তদান করিতে হয় ততদিন তাঁহার আত্মার শান্তি হইবে না। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া রাজাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিলেন। মুসলমানের রক্তপাতের প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষায় মুসলমান রাজা জ্বলিয়া উঠিয়া বিপুল বাহিনী লইয়া যাত্রা করিলেন—ধাবোই অবরুদ্ধ হইল। গর্ব্বিত হিন্দুনগর মুসলমানের পদতলে লুটাইয়া পড়িল! নগর ধ্বংস হইল—লুটপাটে ধনগৌরব অন্তর্হিত হইয়া গেল। অবরোধকালে মাম্মাদোকরীর মৃত্যু হয়—নগরাধিকারের পর তাঁহাকে পূর্ব্বদিকের তোরণের নিকট সমাধিস্থ করা হয়। এখনও সে সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ধাবোই মরিয়াও বাঁচিয়া ছিল। দিল্লীর সম্রাটদের (১২৯৭—১৪০৩), আহম্মদাবাদের সুলতানদের (১৪০৩—১৫৭৩) ও মুঘলসম্রাটদের অধীনে ধাবোই বহুদিন ছিল। মিরাৎ-ই-আহ্‌মেদীতে লিখিত আছে যে, ধাবোই বড়োদা রাজ-সরকারের অধীনে একটি পরগণাবিশেষ। ৪৪টি গ্রাম ইহার অধীনে। বার্ষিক রাজস্ব আদায় হয় ৮,০০,০০০ চানগেজি। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীতেও ধাবোইএর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুঘলদরবারের কাগজপত্রে বড়োদাসরকারের মহাল সম্বন্ধে লেখা আছে যে, ধাবোই ১৬৭,০০৯ বিঘা জমি ব্যাপিয়া অবস্থিত, এখানে একটি প্রস্তরগঠিত দুর্গ আছে, বার্ষিক রাজস্ব ৬,২৫২,৫৫০ দাম, ৪০০শত অশ্বারোহী ও ৫০০ পদাতিক সৈন্য। তারপর বহুদিন আর ধাবোইএর কথা শুনা যায় নাই। ১৭২৫ খৃঃ পিলাজী গায়কবাড়ের সেনাপতি ত্রিম্বকরাও দাবাড়ে এখানে সেনানিবাস স্থাপন করেন। পেশোয়া'র অধীনস্থ উদয়জী পাওয়ার দাবাড়েকে বিতাড়িত করিয়া ইহা অধিকার করেন। কিন্তু ১৭২৭ খৃঃ পিলাজী ইহা পুনঃ অধিকার করিয়া পুত্র দামাজীকে এখানকার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। এমন কি ১৭৩২ খৃঃ যখন পিলাজীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ও কিছুদিনের জন্য বড়োদারাজ্য তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে তখনও ধাবোই দামাজীর অধীনে ছিল। সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত ইহা বড়োদারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, কেবল মাঝখানে কিছুদিনের জন্য ছিল না। সময়ের গতিতে হিন্দু-নগর আবার হিন্দুরাজার হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছে।

বড়োদা হইতে ছোট রেলে চড়িয়া ধাবোইএ উপস্থিত হইতে হয়। ষ্টেশনে পৌছিলেই দেখা যায় অসংখ্য কলের চিমনী ধূমোদ্গার করিয়া বায়ু ভারাক্রান্ত ও ধূমমলিন করিয়া তুলিতেছে। ইহা এখন বড়োদারাজ্যের তুলার ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ষ্টেশনের সীমা ত্যাগ করিয়াই প্রাচীন ধাবোইনগরে উপনীত হইতে হয়।

প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীর ষ্টেশন হইতে কয়েক-হাত দূরেই পশ্চিমদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। পর্য্যটক-গণকে এখন আর পুরাতন নগরতোরণ দিয়া প্রবেশ করিতে হয় না—পুরাতন প্রাচীর ভেদ করিয়া নূতন যে রাস্তা হইয়াছে তদ্দ্বারাই প্রবেশ করিতে হয়। নগরপ্রাচীর বড়বড় প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদিন যে কিয়দংশ বিদ্যমান আছে তাহা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে কতদূর কৌশলের সহিত এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদিন অযত্নে পড়িয়া থাকিয়াও শত্রুর গোলাগুলি সহ্য করিয়াও ইহা এখনও কি করিয়া টিকিয়া আছে! অসামান্য শিল্পী তাহারা যাহারা এমন পাথর জমাইতে জানিত। ঢুকিয়াই দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গেলেই বড়োদাতোরণ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা পশ্চিমদিকের তোরণদ্বার, ইহা সুসম্পূর্ণ অবস্থায় এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই তোরণের মাঝখানে মুসলমানশিল্পপদ্ধতি-অনুযায়ী একটি খিলান না থাকিলে ইহাকে ধাবোইর শিল্পের একটি নিদর্শন বলা যাইতে পারিত। খিলানটি শিল্পের হিসাবে অতি সুন্দর। কয়েকটি চতুষ্কোণ বাহির-হওয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর স্থাপিত বন্ধনী-সংযোগে গঠিত এই তোরণটি স্থপতি ও শিল্পীর বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে। বন্ধনীগুলি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে

খিলানের প্রয়োজন হয় নাই। এই-সকল বন্ধনী ও মুসলমানী খিলানের উপর একটি আস্ত পাথরের ছাদ।

আরও তিনটি তোরণদ্বার আছে, যেমন হীরাতোরণ, (পূর্ব্বদিকে), চম্পানীর তোরণ (উত্তরে), ও নান্দদ বা চাণ্ডোদ তোরণ (দক্ষিণ দিকে)। এই তোরণ কয়েকটির মধ্যে চাণ্ডোদটির সকলের চেয়ে দুরবস্থা—তাহা কালের গতি প্রতিরোধ করিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে নাই। চম্পানীর বড়োদা তোরণদ্বারের মত অত বৃহদাকার নহে, হীরাগেটটি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণান্তর টিকি কাটিয়া চটি ছাড়িয়া চাদর ত্যাগ করিয়া আব্বা জোব্বা পরিয়া সম্পূর্ণ নূতনাকার ধারণ করিয়াছে। হীরাতোরণের সহিত সমসূত্রে দুইটি মন্দির আছে—উত্তরেরটি কালিকামাতার ও দক্ষিণেরটি মহাদেব বৈদ্যনাথের। মহাদেবের মন্দিরটি এখন একরূপ ধ্বংস পাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কালিকামাতার মন্দিরটি তাহার কারুকার্য্য-সমন্বিত শিল্পসম্ভার লইয়া এখনও সুস্থভাবে বিরাজ করিতেছে। এখনও এখানে পূজা হয়। কিন্তু হায় কালের গতি কি বিচিত্র! একদিন ধাবোইএর পূর্ব্বপুরুষগণ যাহার শিল্প রচিয়াছিল তাহারই বংশধরেরা চুন গুলিয়া সেগুলি নষ্ট করিতেছে। এ মন্দিরটি ক্ষুদ্রায়তন। এক যায়গায় ইহা নগরপ্রাচীরের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে ও অন্যত্র ২৫ ফুট নগরের মধ্যে ঢুকিয়া রহিয়াছে। এক শতের বেশী লোক ইহাতে কোনওক্রমেই ধরিতে পারে না। ইহার সংস্থান ও শিল্প ইত্যাদি দেখিলে বুঝা যায় যে, নগর-তোরণের পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত নয়। ইহা ধাবোই দুর্গের মন্দির ছিল।

শিল্পের হিসাব ছাড়িয়া দিলে ধাবোইএর গরিমা তাহার বিশাল সরোবরে। ইহার পরিধি ⅔ মাইল ও চতুর্দ্দিকে আস্ত আস্ত পাথরের সিঁড়ি জল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ফরবস্ সাহেব অনুমান করেন যে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ইহার খনন ও নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছিল। উদ্বেগহীন অচঞ্চল স্নিগ্ধ ধাবোই-জীবনের ইহা কেন্দ্রস্থল। এখানে স্নান, গল্পগুজব প্রভৃতি সাংসারিক সকল কার্য্যই সমাধা হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিকে সরোবরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে যে মন্দিরটি তাহা মৃত্তিকায় অর্দ্ধপ্রোথিত। মন্দিরের নীচু মেঝে দেখিয়া অনেকে মনে করেন পূর্ব্বে এখানে মন্দিরটি ছিল, তাহার পর সরোবরটি কাটা হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাতে একটি সুন্দর উদ্যানে এই ধাবোইএর মুসলমান শাসকদের ভবন ছিল। সরোবরের চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ গৃহসকল সরোবরের রমণীয়তা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু আবার অনেকের চক্ষে যেদিকে বাড়ীঘর নাই সেই দিকই সুন্দরতর বোধ হয়। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

ব্রিটীশরা যখন কিছুদিনের জন্য ধাবোই অধিকার করিয়া লয়েন সেইসময় ১৭৮০-৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ফর্‌বস্ সাহেব এখানকার কলেকটার ছিলেন। তাঁহার কথা মানিয়া লইলে বলিতে হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধাবোইএর শ্রীসমৃদ্ধি দেখিতে লোকসমাগম হইত। সুন্দর সরোবর, সন্নিহিত চারু মনোরম উদ্যান, বিথীকা, সরুগলিগুলি, ধনীদের মনোমুগ্ধকর বিশাল প্রাসাদ, শাসকভবন হইতে দৃশ্যমান চতুর্দ্দিকের শ্যামল ক্ষেত্রাবলী প্রভৃতি ফর্‌বস সাহেবকে মুগ্ধ করিত। প্রেমিকের ধর্ম্মই প্রেমের জিনিস হইতে বিচ্ছেদকালে প্রেমাস্পদের স্মরণে কবিতা লেখা - ফর্‌বস সাহেবও সেইরূপ এই ধাবোই সম্বন্ধে এক কবিতা লেখেন। ইহা হইতে বুঝা যায় তিনি ধাবোইকে কত সুন্দর দেখিতেন।

ধাবোই তাহার উচ্চ আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সে পূর্ব্বের শিল্পসাধনা নাই—অপিচ যাহা আছে তাহারও রক্ষার বন্দোবস্ত নাই। এখন নীচে টিনের ছাদবিশিষ্ট দ্বিতল, ত্রিতল ভবনগুলি সুরুচির পরিচয় না দিয়া বরং বিকৃতরুচিরই পরিচয় দিয়া থাকে। রাস্তা ঘাটগুলির অবস্থা শোচনীয়। গভর্ণমেন্টের অবশ্য এখানে ডিস্‌পেনসারী, স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতি আছে, কিন্তু ধাবোই-এর পূর্ব্বগৌরব যাহা ছিল এখন সে তাহা হারাইয়া বসিয়াছে। অতীতের শ্মশানে বসিয়া ধাবোই কি তাহার চিরনিদ্রার দিন গণিতেছে?

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

পিতৃদায়

(গল্প)

পৌষ মাসের শীতে সকাল বেলাই স্নান করে এসে অলকার হাড়ে-হাড়ে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। পরণের কালাপেড়ে শাড়ীখানাই পাকিয়ে-পাকিয়ে গায়ের চারিধারে জড়িয়ে সে উত্তরে হাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে মনে করছিল। উঠানের এক কোণে তখন সবে রোদ এসে পড়েছে। পোষা বিড়ালটা সেইখানে চোখ বুজে জড়সড় হয়ে পড়ে আছে দেখে অলকার কি মনে হল জানি না, সেও গিয়ে সেইখানে তুলসীমঞ্চের দিকে পিছনফিরে একঢাল চুলের আগায় একটা গিঁট বেঁধে বিড়ালটাকে কোলে করে পা-ছড়িয়ে বসল। পুষির মাথায় নরম হাতের থাবড়া দিতে-দিতে অলকা নিজেও সঙ্গে-সঙ্গে দুলছিল্ আর সেই-সঙ্গে তার পাক-দেওয়া আঁচলের কোণের চাবিটা তার বুকের উপর ঝম্ ঝম্ করে তাল দিচ্ছিল।

বৈঠকখানা-ঘরের পিছন-দিকের বারাণ্ডা দিয়ে অন্দরের উঠানে ঢুকে ত্রৈলোক্যনাথ সবুজ বালাপোষখানা গায়ে জড়াতে জড়াতে সদ্যস্নাতা কন্যার রাঙা মুখখানির দিকে তাকিয়ে যেন নিজেও খানিকটা সতেজ হয়ে উঠে বল্লেন, "কিগো রাণী, অলকমণি, সকালবেলা উঠে বুড়ো ছেলের খোঁজখবর না নিয়ে পুষি মেনিকে আদর দেওয়া হচ্ছে যে দেখ্‌ছি।"

বাবার সামনে এমন ছেলেমানুষীটা ধরা পড়ে যাওয়াতে লজ্জিত হয়ে অলকা পুষিকে এক ঠেলা দিয়ে দূর করে হেসে বল্লে, "না বাবা, আজ কিনা সইয়ের সঙ্গে ভোরবেলা বড়-দীঘিতে স্নান করতে গিয়েছিলাম, তাই তুলসীতলায় একটু রৌদ পোয়াচ্ছি। সই বলেছিল—ভোর পাঁচটায় নাকি পৌষ মাসে বড় দীঘির জলে কেউ স্নান করতে পারে না।"

বাবা মেয়ের রাঙামুখে ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হাতখানা বুলিয়ে বল্লেন, "তা বেশ মা, এখন আমার খাতাপত্রগুলো একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে দাও দেখি। আর কাউকে দিতে ত আমার সাহস হয় না।"

গৃহিণী রাজেশ্বরী রান্নাঘরের দাওয়ায় ঘড়া-কাঁকালে উদয় হয়ে বিরক্ত মুখে ঝঙ্কার দিয়ে বল্লেন, "বলি হ্যাঁগা, সকাল বেলাই উঠে ত মেয়েকে নিয়ে খুব আদর সোহাগ হচ্ছে, এদিকে জলটি আন্‌তে দোরের বার হ'তে-না-হ'তে লোকে যে আমার হাড়-মাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। মেয়ে কি তোমার আজও কোলে করে আদর করবারই মতন আছে? বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে মেয়ের বয়স তের আর পার হয় না, বল্লে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তাদের কি আর মাথায় এক কড়ার বুদ্ধি নেই! বলে, পরের মেয়ের বয়সের হিসেব করতে আবাগীদের এক বেলার ভুলও হয় না। এই বেলা খুঁজে-পেতে একটা দেবে ত দাও, নইলে আমায় এই সানে মাথা খুঁড়ে মরতে হবে। লেখাপড়া নিয়ে শামলা মাথায় ধিঙ্গি হয়ে বেড়ালে, কি কথায়-কথায় ঝাঁকি দিয়ে নাক ঘুরিয়ে দাঁড়ালেই ত আর মেয়েমানুষের চল্‌বে না।

কর্ত্তা বল্লেন, "বড় মেয়ের বিয়েতেই ত' হাতে মালা হবার যোগাড় হয়েছিল, এরি মধ্যে আবার পয়সা কোথায় পাব? শুধু হাতে খুঁজতে বেরলে ত আর বর মেলে না।"

গিন্নি বল্লেন, "সব ত বুঝি! কিন্তু তার বিয়ের সময় এ মেয়ে যে জন্মায় নি, এমন ত আর নয়। তবে তখন থেকে এইটি মনে ভেবে দেখনি কেন যে গলায় আর-এক বোঝা ঝুলছে, তাকেও একদিন পার না করলে লোকে ঘরে আর পাও দেবে না, মরণকালেও হাড়িমুদ্দফরাসে ছোঁবে না!"

অভিমানে গৃহিণীর চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠল, তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। মা-বাবার কথায় অলকার প্রফুল্লমুখ অপমানের ঘায়ে যেন কালি হয়ে গেল। সেও ঘাড় হেঁট করে উঠে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু ত্রৈলোক্যনাথ। শীতের বাতাস যেখানে গাছের মাথায়-মাথায় নিঃশেষে উজাড় করে পাতার মাশুল আদায় করে নিচ্ছিল, তাঁর শূন্যদৃষ্টি তখন সেইখানে উদাসভাবে চেয়ে রইল। তিনি নিশ্চয় জানতেন, তাঁর এ আদরিণী মেয়েটির মুখ সহজে হেঁট হয় না। সে সব দুঃখকষ্ট হাসিমুখেই সইতে পারে, কেবল পারে না তার নারী-মহিমার অপমান সইতে। তাঁর দুঃখের সংসারে অলকার হাসিমুখের আলোক-ছটাই দারিদ্র্যের অন্ধকারকে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে। জমিদার-বাড়ীর মেয়ের বিয়েতে শুধু কাচের

চুড়ি আর লালপেড়ে শাড়ী পরে যেতে মা লজ্জা বোধ করাতে যে মেয়ে দৃপ্তমুখে মাথা উঁচু করে তার নিরলঙ্কার দেহের সৌন্দর্য্য শতগুণ বাড়িয়ে সতেজে গিয়ে পাল্কীতে উঠেছিল আজ সেই মেয়ের কালী-পারা মুখ দেখে বৃদ্ধের মনে কেবলি তার সেই সেদিনকার সগর্ব্ব হাসিটুকু ফুটে উঠ্‌ছিল। তিনি বুঝেছিলেন কত বড় কঠিন অপমানে সে আজ বিমুখ হয়েছে। তাই বৃদ্ধ পিতার ব্যথিত হৃদয় কিছুতেই সেই মুখ ভুলে অন্য কাজে লাগতে পারছিল না।

মেয়ের বিয়ে নিয়ে স্বামীস্ত্রীতে মান-অভিমানের পালা এ বাড়ীতে চার-পাঁচ বছর ধরেই চল্‌ছে, কিন্তু মেয়ের সামনে বড় বেশী হয়নি। ত্রৈলোক্যনাথের ইচ্ছা মেয়ের বিয়ে এমন ঘরে হয়, যেখানে একদিনের জন্যেও তার মানের একচুল হানি না হয়। কিন্তু হাতে একটা কাণা-কড়িও না থাকাতে কল্পনাটা এতদিন ধরে তাঁর মনের ভিতরেই থেকে গিয়েছে। বড় মেয়ের বিয়েতে বড় ঠকেছেন, তাই এবার পণ করে বসে আছেন, কিছুতেই ঠক্‌বেন না। অথচ বিধাতা তাঁর পণকে নিঃশব্দে পরিহাস করে মেয়ের বয়সটা আশ্চর্য্য-রকম বাড়িয়ে তুলেছেন! আজ মেয়ের সামনে এমন নির্লজ্জ কাণ্ডটা হয়ে যাওয়াতে তিনি সেটা পরিষ্কার দেখ্‌তে পেলেন। মনে হ'ল— তাই ত, আমার অলকমণি যে বড় হয়ে উঠেছে, আর ত তার কাছে কিছু লুকোনো যাবে না। অথচ তার জন্যে আমাদের অপমান সে কিছুতেই সইবে না। মেয়ে যে-রকম আশ্চর্য্য জেদী, না জানি কি করে বসে! আজকাল যেরকম দিনকাল! সত্যিই, যেমন করে হোক আসচে মাঘফাল্গুনের মধ্যে একটা কিছু করে ফেলতে হবে।

কি একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ত্রৈলোক্যনাথ শিউরে উঠলেন। বালাপোষখানা মুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ হাতের কাছের গাড়ু গামছা ফেলে রেখেই অন্যমনে আমতলার রাঙা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

(২)

অরুণকুমারের বন্ধুর বাড়ী সেই গ্রামে। বড়দিনের ছুটিতে সে কলেজের বইখাতাগুলোকে একটু বিশ্রাম দিয়ে দু-চারদিনের জন্যে বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে এসেছে। শহরে ছাত্রমহলে তার বেশ নামডাক। ছাত্রসভায় যেদিন তর্ক-যুদ্ধে সে একপক্ষের মহারথী হয়ে দাঁড়ায় সেদিন তার বাক্যজালের ঘনঘটায় অপর পক্ষের দৃষ্টি কিছুতেই ছিদ্র খুঁজে বার করতে পারে না। স্বপক্ষের দল মহা আনন্দে তার আড়াল থেকে মেঘনাদের মত দুটোচারটে শক্ত-শক্ত অস্ত্র প্রয়োগ করে তর্ক শেষে হল্ কাঁপিয়ে কলরব করতে-করতে বিপক্ষদের শুক্‌নো মুখের দিকে সগৌরবে কটাক্ষ-পাত করে বড়রাস্তার উপরের কোনো পরিচিত হোটেলে গিয়ে দ্বিতীয় আর-একটা সভা জম্‌কিয়ে বসে। এ সভায় মুখের কাজ দুইভাবেই চলে। কথার অবকাশে যেটুকু সময় পাওয়া যায় টেবিলের উপর সাজানো গরম-গরম সুখাদ্য তা' তখনি পূর্ণ করে তোলে। অরুণের ভাষার, যুক্তির, ভাবের ও সাহসের প্রশংসা বন্ধুরা যেখানে কথায় মনের মত প্রকাশ করে উঠতে না পারে, সেখানে পরস্পরের পিঠ চাপড়িয়ে ও হাসির ফোয়ারা তুলেই সেটা সেরে নেয়। অরুণের বুক তখন দশহাত ফুলে ওঠে। সাময়িক বড় বড় আন্দোলনে প্রতিজ্ঞাপত্রে নামস্বাক্ষর করবার পালা এলে আর-সকলে যখন পিছনে হাঁটে অরুণ তখন চট করে উঠে-পড়ে' সবার আগেই দস্তখতটা করে আসে। মাঝে-মাঝে যুবকবন্ধুদের ভীরুতার জন্যে দুটোচারটে কড়া কথাও যে শুনিয়ে দেয় না তা নয়। এ ছাড়া অরুণের আর-একটা গুণও ছিল। সে আধুনিক সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব টাটকা রকমের অনেক খবর রাখত। তার মত সমঝদার লোক খুঁজলে দুটোচারটেও মেলে কি না সন্দেহ। নিজে যে সে বড় কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল কি সামাজিক সমস্যা পূরণের চেষ্টা করেছিল তা নয়; তবে নব্যতম যুগে যে যেখানে যা কিছু নূতন কথা বলেছে সে-সবের খবর রয়টারের তারের আগেই অরুণের কাছে এসে পৌঁছত। তরুণ অরুণের মতই আমাদের অরুণ প্রথমে তাঁর বন্ধুমহল নূতন খবরের আলোকে উদ্ভাসিত করতেন। তার একটা বড় দুঃখ ছিল যে এক-রকম বিষয়ের উপর টান থাকা সত্ত্বেও হাতে-কলমে সে আজ অবধি কিছুই করে উঠতে পারে নি। তার যা কিছু কীর্ত্তি সবই কল্পনালোকের স্বপ্নপুরীতে হাওয়া খেয়ে নধর সুন্দর হয়ে উঠ্‌ছে, বড় জোর মাঝে মাঝে মা সরস্বতীর কাঁধে ভর দিয়ে ছাত্রসভায়

বিদ্যুৎলতার মত একবার চকিতের দেখা দিয়ে যায়; কিন্তু মর্ত্ত্যলোকের কঠিন মাটির উপরে সূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলোকের সামনে আজও তারা কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারে নি।' তাই শুধু 'থিওরির' মহাপুরুষ অরুণের মনে একটা বড়-রকম বেদনা অহর্নিশি খোঁচা দিয়ে দিয়ে তাকে উত্যক্ত করে তুলেছে। সে ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে বই লিখে যশ পাওয়া তার পক্ষে শক্ত; কেননা তার মত মূর্ত্তিমান যৌবনের পক্ষে স্থির ধীর বৃদ্ধের মত বসে বসে দশ পাতা লেখা অসম্ভব, তা' যতই কেন না তার বচনবিন্যাসের মধ্যে ভাবরসের প্রাচুর্য্য আর ভাষার ছটা থাকুক। আর সমাজতত্ত্বসম্বন্ধে কোনো গবেষণা করা ত আরোই কঠিন; কারণ বড় বড় পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে নিতান্ত চুনোপুঁটি পর্য্যন্ত যতলোকের বই সে পড়েছে সবগুলোই বেশ জলের মত সে বুঝেছে এবং সভাসমিতিতে সেসব কথা অনেক বারই উদ্গার করেছে, কিন্তু তার উপরে নূতন কিছু বলবার ত সে খুঁজে পায় না। সব কথাই ত তারা একটানে বলে শেষ করে দিয়েছে। কাজেই করবার মধ্যে বাকি থাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিম্বা সৎসাহসের কাজ। তা' এটা বোধ হয় সকলেই অনায়াসে বুঝবেন যে মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব যার ব্যবসা, সে কি আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রাণহীন কলকব্জা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে? কাজেই অরুণ স্থির করেছিল বিনাপণে দরিদ্রের কন্যা গ্রহণ কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু একটা সোজাসুজি উপায়ে নিজের অসাধারণত্ব প্রকাশ করবে। এতে খুব বেশী বিদ্যাবুদ্ধি কি পাণ্ডিত্য কোনোটারই দরকার হবে না। ভগবান দয়া করে তাকে যে পুরুষ-জন্ম দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে বিজয়গৌরব শুধু সেই আজন্ম-লব্ধ পৌরুষেই অনায়াসে লাভ করা যাবে। অক্লেশে এই যে মহাকীর্ত্তি স্থাপন সে করবে বিশ্বের দরজায় দুন্দুভি বাজিয়ে কোনো হিতৈষী বন্ধু যদি সেটা প্রচার নাই করে দেয় তবে সেটাও না হয় অরুণ স্বয়ং একটা ছদ্মনামে খবরের কাগজের পাতায়-পাতায় তুলে বিশ্ববাসীর ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেবে। কিন্তু বেচারা অরুণ এই যে এত বড় ত্যাগস্বীকারটা করবে তার বিনিময়ে কি কেবল খবরের কাগজের রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শহীন ফাঁকা বাহবাটুকুই পাবে? অন্ততঃ জয়মাল্যটা রূপসী ষোড়শীর পদ্মহস্তে তার কণ্ঠে এসে যদি না পড়ে তবে ত সবই বৃথা। তার অন্তরের সৌন্দর্য্য-পিয়াসী তরুণ প্রাণটি এটুকু দাবী ছেড়ে দিতে পারছিল না। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের জোরে সে ত মুখের একটা কথা ফেল্লেই সোনায় রূপায় মোড়া একটি পত্নী এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চিরদিনের মোটামুটি খোরাকপোষাকটা পেয়ে যেতে পারে। এমন কি ও-ছাপটুকু না থাকলেও কোন্ কম-সম দু-চার-হাজার সে না পেত? তাই যখন সে মানসচক্ষে তার অদূর ভবিষ্যতের বিবাহবাসর কল্পনা করে তখন সেই তরুণী বধূর অঙ্গে অঙ্গে স্বর্ণ-আভরণ ঝিলিক দিয়ে না উঠলেও তার লজ্জারুণ মুখ আর ক্ষীণ দেহলতার অপূর্ব্ব সুষমাতেই সভা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মনের মধ্যে ঐ লোভটুকু গোপন রেখে দরিদ্রকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার ইচ্ছায় তার এই বয়সেই অরুণ অন্ততঃ বার দশেক কনে দেখ্‌তে গিয়েছে। কিন্তু বিধি এমনি বাম যে খোঁপায়-জরি-মোড়া নোলক-নাকে বিবাহবাজারের এই সুলভ পণ্যগুলির মধ্যে সে আজও তার কল্পনালোকের মানসী বধূর একটুখানি আভাস পায় নি। এদের কারো মধ্যে যদি বা একটুখানি সহজ শ্রী উঁকি দিতে দেখা যায়, তাও প্রসাধনের কঠিন শাসনে আধমরা হয়ে আছে। অগত্যা অরুণকে হতাশ মনে কোনো একটা বাজে ছুতো দেখিয়ে দশ-দশবারই ফিরতে হয়েছে। বন্ধু-মহলে ঠাট্টাতামাসার ধুয়া উঠ্‌লে সে মুখ উঁচু করে বলত, "আরে দূর, ওসব ফন্দিবাজের বাড়ী আবার বিয়ে করে, টাকার ঘড়া মাটিতে পুঁতে গরীব সাজবার চেষ্টা। আমি যার মেয়ে বিয়ে করব সে আমার মত সোজাসুজি নির্ভীক হবে, তবে না। আর মেয়েটাও নেহাৎ অমন ছিঁচকাঁদুনে ধাঁচের হ'লে আমার জীবনটাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

এমনি করে অরুণের খ্যাতিলাভের দিনটা ক্রমেই ভবিষ্যতের ছায়ালোকে মিলিয়ে যেতে লাগল। এমন সময় নিতান্ত নিরাশ হয়ে সে একদিন বন্ধুমহলের আদর-অভ্যর্থনা ঠাট্টাতামাসা এবং শহরের নানা উত্তেজনা ছেড়ে তার অমন অবসরহীন জীবনেও একটা ছোটখাট অবসর করে নিয়ে পাড়াগাঁয়ের শান্তশ্রীতে মনটা একটু জুড়িয়ে নিতে

বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বিধি যে কার উপর কখন কেমন ভাবে সদয় হয়ে ওঠেন তা' ত বলা যায় না।

(৩)

বাঙালী পাড়ায় হঠাৎ একটি পাত্রনামক জীব যদি নূতন দেখা দেন তা' হ'লে পাড়ার এ-মোড় থেকে ও-মোড়ের মধ্যে তার খবর প্রচার হতে দু দশ মিনিটই বোধ হয় যথেষ্ট হয়। বিশেষ তিনি যদি যোগ্যপাত্র হন তবে ত কথাই নেই।

ত্রৈলোক্যনাথ সংসারে চেনেন শুধু নিজের বইগুলি আর অলকমণি। গিন্নি যে কখন কিসের জন্যে তাঁর উপর খড়্গহস্ত হন আর কেনই বা অকস্মাৎ হাসিমুখে পুরাতন প্রেম জাগিয়ে তুলে সেকালের মত মান-অভিমানের পালা সুরু করেন তা বুঝে ওঠা তাঁর পক্ষে একান্ত কষ্টকর। তাই তিনি সরস্বতীর সেবা করে আর অলকার সেবা পেয়ে তৃপ্ত হৃদয়ে ঘরেই দিন কাটান। কেবল মাঝে মাঝে গৃহিণী যখন কথার ঘায়ে চেতনা দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে অলকার সত্যিকারের বয়স অনেক বছর আগেই তেরোর কোঠা পার হয়ে গেছে তখন ভদ্রলোককে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বিশুবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে পাত্রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। দিনকতক অনেক খোঁজাখুঁজি করে যাকে পাওয়া যায় কন্যা তাকেই দেখানো হয় বটে, এবং তাঁদের মেয়ে পছন্দও হয়, কিন্তু মেয়ের বাপের শীর্ণদেহ আর শূন্যমুষ্টিটা কোনোমতেই তাঁরা বরদাস্ত করে যেতে পারেন না। অগত্যা ঘরের মেয়ে ঘরে রেখে তাঁদের বিদায় করে দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আবার ঘরের মধ্যে অচল আসন গ্রহণ করেন।

তাই সেদিন শীতের সকালে ম্লান মুখে আমতলার পথ দিয়ে যেতে যেতে ভট্‌চাযি্য মশায়ের মুখে নবাগত পাত্রটির রূপগুণ বর্ণনা শুনে ত্রৈলোক্যনাথ যখন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "কোন্ ছেলেটি হে?" তখন দীর্ঘ শিখা দুলিয়ে ভট্টাচার্য্য বল্লেন, "রামঃ! মেয়ের বাপ হয়েছ কি করতে? পা বাড়ালেই যে হরিষখুড়োর বাড়ী এসে পড়ে; সেখানে আজ তিন দিন ধরে অমন সাগর-ছেঁচা মাণিকের মত ছেলেটা এসে রয়েছে আর তুমি কোন্ মুলুকে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে হে? আবার শুনছি নাকি ছেলেটা কোথায় সভাসমিতি করে লেখাপড়া করে দিয়েছে যে বিয়ে করে টাকা নেবে না। এই বেলা গিয়ে গলায় গামছা দিয়ে হাতে পায়ে ধরে পড়, এ যাত্রা উদ্ধার হয়ে যাবে, মেয়েটাও সৎপাত্রে পড়বে।"

ত্রৈলোক্যনাথ গলায় গামছা দিয়েছিলেন কি না ঠিক বলা যায় না, তবে অরুণ এই নিয়ে একাদশ বার কনে দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়ল। ত্রৈলোক্যনাথ এবার সত্যিসত্যিই বুঝেছিলেন যে প্রত্যেকটি দিনের সঙ্গে মেয়ের বয়স বাড়তে থাকবে এবং তাই নিয়ে তার সামনেই নিত্যনূতন পালার অভিনয় হবে, কাজেই তিনি আদরিণী অলকমণির মানরক্ষার জন্য আজই কন্যা দেখাবার প্রস্তাব করে বসেছিলেন। অপরিচিত বৃদ্ধের এই প্রস্তাবে অরুণও বিশেষ কিছু আপত্তি করলে না; সেও বোধ হয় ভেবেছিল অজানা মুলুকেই একবার ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখা যাক না। রোমাণ্টিক-রকম কিছু একটা ঘটে যেতেও ত পারে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় মেয়ে দেখানো হবে। মেয়ের মা খবর শুনে আহ্লাদে আটখানা। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর দুঃখ উথ্‌লে উঠ্‌ল, যদি টাকা থাক্‌ত তবে বিয়েতে মেয়েকে জমিদারের মেয়ে বিধুর মত হালফ্যাশনের পুষ্পহার আর আটগাছা বসন্তবাহার চুড়ি গড়িয়ে দিতেন; তা' কপালে ত আর অত সুখ লেখা নেই, যাক্ দুগাছা আঙুরপাতা ফারফোর ফাঁপা বালা গড়িয়ে দিলেই হবে। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহিণী বাইরের ঘরের কুলুঙ্গির ছেঁড়া-মলাট-দেওয়া আবর্জ্জনাগুলো একটানে বিদায় করে দিয়ে, কর্ত্তার তক্তপোষের ছেঁড়া তোষকখানার উপর নিজের গায়ের পুরাণো শালখানা ঢাকা দিয়ে, ঘরখানাকে একটু ভদ্র করবার চেষ্টায় লেগে গেলেন। ঘরদোর-গোছানো, খাবার-করা হতে-না-হতে অরুণ এসে উপস্থিত।

মা ডাকলেন, "আয় মা অলক, তোর চুল ক'গাছা বেঁধে দি। সন্ধ্যে হয়ে এল গা ধুয়ে নীলাম্বরী কাপড়খানা পরে আয়।"

মা জানতেন, কেউ দেখ্‌তে এসেছে বল্লে মেয়ে কখনই সাজসজ্জা করতে রাজি হবে না, তাই সত্যিকারের খবরটা মেয়ের জানা থাকলেও মিথ্যা কথা বলেই তার প্রসাধন

করে দিতে হয়। আজ কিন্তু অলকা বলে বসল, "না মা, আমার এখন চুল বাঁধতে ভাল লাগছেন্না। আমার মাথা ধরেছে।"

মা মনে মনে ভাবলেন—থাক্, আমার মায়ের অমনি রূপেই জগৎ ভুলে যাবে। তবে কপাল ঢেকে চুলটা বেঁধে দিলে মস্ত কপালটা আর খাঁড়ার মত নাকটা একটু কম দেখাত। যাক্, ভাগ্যে থাকে ত এইতেই হবে। টাকার জোর থাক্‌লে কি আর কিছু ভাবতাম। মেয়ে এতদিনে কবে রাজরাণী হয়ে মোতির মালা গলায় দিয়ে সোনার খাটে পা ঝুলিয়ে দিন কাটাত।

বৈঠকখানা-ঘর থেকে ডাক এল, "মা অলক, পান নিয়ে এস দেখি মা।"

ঘরের ভিতর অরুণ তখন সুখস্বপ্নে বিভোর। একটি শ্যামাভ উজ্জ্বল মসৃণ মুখ আর একজোড়া ডাগর সলজ্জ চক্ষু আবছায়াভাবে কেবলি তার মনের মধ্যে ফুটে উঠ্‌ছে। মেয়েটি একহাতে নীলাম্বরীর একটুখানি কোণ মুখের কাছে টেনে ধরে ঘাড় হেঁট করে আর-এক হাতে পানের ডিবেটা তার কাছে এগিয়ে দিচ্ছে। প্রথম প্রণয় সঞ্চারের গোপন পুলকের স্পর্শ ও প্রথম দর্শনের লজ্জার মধুর মিশ্রণে তার তরুণ কোমল মুখখানি রক্তাভ হয়ে উঠেছে, মাধুরী যেন ফেটে পড়তে চায়। পায়ের মলের মৃদু শব্দ যেই রূপমাধুরীর সঙ্গে একটুখানি মোহন সুরের আমেজ দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অরুণের এই স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে ফেলে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে অলকা এসে দাঁড়াল। অলঙ্কারের মধুর নিক্কণ কি মাথাঘসার স্নিগ্ধ গন্ধ তার আগমনী ঘোষণা করেনি। দেবতার অকস্মাৎ আবির্ভাবের মত সে হঠাৎ উদয় হয়ে স্বপ্নবিভোর অরুণকে সচকিত করে তুললে। অরুণের দিকে প্রাণ ফিরে পানের ডিবেটা তার বাবার হাতে তুলে দিয়ে সে এমনভাবে ফিরে দাঁড়াল যেন শুধু ডিবেটা দেবার জন্যই তাকে নেহাৎ একবার এসে পড়তে হয়েছে। ঘরে যে আর-একজন নবাগত তৃতীয় প্রাণী রয়েছে সেটা অলকার চোখে পড়েও যেন পড়েনি। এই নূতন প্রাণীটির আগমনের সঙ্গে যে বিশেষ করে তারই একটা সম্পর্ক আছে সেটা মনে করে তার মনে তরুণ-স্বভাবসুলভ যে লজ্জা আসন বিস্তার করবার চেষ্টা করছিল, তার এই স্পর্দ্ধায় অলকা আরও লজ্জিত হয়ে উঠছিল। এই দরিদ্রের মেয়েটির গৌরব কি অহঙ্কার করবার কোনো কিছুই প্রায় ছিল না, কিন্তু তার তেজস্বী মনটি পরাভবকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারত না। এমন কি লোকের চোখের কুতূহলী দৃষ্টি যে তার বাহিরের আবরণ ভেদ করে অন্তরের দৈন্য কি দুঃখের দিকে একটু কটাক্ষ করবে তাও তার অসহ্য ছিল। তাই সে নিজের স্বাভাবিক লজ্জাতেও লজ্জিত হয়ে শক্ত সারথির মত উচ্ছ্বসিত লজ্জার রাশ টেনে ধরে রেখেছিল। জোর করেই সে মাথাটা খাড়া করে রেখে সশব্দে চাবির গোছা পিঠের উপর ফেলে ঘর থেকে বাহিরে যাবার উপক্রম করতেই ত্রৈলোক্যনাথ বল্লেন, "অলকা, অরুণবাবুকেও না হয় তুমিই পানটা দাও।"

অলকা দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ঘাড় ফিরিয়ে অরুণের হাতের কাছে পানের ডিবেটা এগিয়ে ধরলে। প্রসাদদাত্রী দেবীর মত সে অকম্পিত হস্তে অরুণের হাতের প্রায় উপরেই পানের ডিবেটা তুলে দিলে; কৃপাভিক্ষুর মত, দেবীর কর-স্পর্শে, অরুণেরই হাত কেঁপে উঠল। কৃপাভিখারিণী হলেও অলকা যে মহিমাময়ীর মত অরুণের এত ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তাতে অরুণের মনটা আপনি যেন কেমন নত হয়ে পড়ল। অগ্নিবরণা অলকার নিরাভরণ হাতের লাল কাঁচের চুড়ি দুটিই আজ তার চোখে পদ্মরাগ মণির মত জ্বলে উঠল। মনে মনে এতদিন সে যে কুসুমকোমলা আনত-মুখী কিশোরীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের আশায় পথ চেয়ে ছিল,—অলকার প্রশস্ত কপাল, খাঁড়ার মত নাক, আর আগুনের মত জ্বলজ্বলে রং তার কাছ দিয়েও ঘেঁসে না। অরুণের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ, বিবাহকল্পনায় লজ্জা কি ভয়ের লেশ সে-মুখে কোথাও একটু ছায়া ফেল্‌তে পারেনি। আগুন যেমন বিশ্বগ্রাস করেও সেই এক রক্ত মূর্ত্তিতে বিরাজ করে, কোনো পরিবর্ত্তনের দাগও তার গায়ে পড়ে না, তেমনি এই মেয়েটির মনে সুখ দুঃখ লজ্জা ভয় আনন্দ কি নিরানন্দ যারই স্রোত বয়ে থাকুক না কেন বাইরে তার কোনো প্রকাশই হয়নি। কিন্তু কেন জানিনা এই মেয়েটিই আজকার মত অকস্মাৎ অরুণের হৃদয় জুড়ে বসল। তার কল্পনার কিশোরীর রূপ কোথায় মিলিয়ে গেল; একটি আঙুলও না হেলিয়ে রাজলক্ষ্মীর মত এই

তরুণী সে সিংহাসন আলো করে আপনার দখল জানিয়ে দিলে।

অরুণের ভাবুক মন ভেবে কোনো কাজ কখনও করে না। ভাবের প্রবাহ যখন তাকে যেদিকে ঠেলে নিয়ে যায়, নিশ্চিন্ত মনে মহানন্দে সে তখন সেইদিকেই ভেসে চলে যায়। নিজের মনকে সে কখনও কোনো কাজে বিশেষ বাধা দেয়নি। এই অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র গৃহস্থের বয়স্থা কুমারীটি যেই তার মনে একটা তরঙ্গ তুলে দিয়ে সগর্ব্বে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল, অমনি সে বলে উঠল, "তবে আর কি! আমার ত কোনো আপত্তির কারণ দেখছি না, আপনি যা মনে করবেন তাই হবে।" তখনও অলকার আঁচলের কোণটা দরজার আড়ালে মিলিয়ে যায়নি, এরি মধ্যে বিবাহ স্থির হয়ে গেল। খবরটা বোধ হয় সে শুনেই গিয়েছিল।

আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গে অরুণের মনে গর্ব্বও কম হয়নি। সে শুনেছিল,—অলকা আজ যে লাল কাঁচের চুড়ি আর কালাপেড়ে শাড়ী পরে দেখা দিতে এসেছিল, বধূবেশে তার সজ্জা এর চেয়ে বড় বেশী হবে না। বড়জোর শাড়ীখানার রং লাল হবে এবং যে সোনারূপাটুকু না হলে মেয়ের বিবাহ হয় না, সেইটুকুর স্পর্শ তার অঙ্গে থাকবে। সভায় বরাভরণ কি দানসামগ্রীর ঘটাও যে খুব হবে এমন কথা এই জীর্ণ কুটিরখানির অধিবাসীদের দেখে মনে করা পক্ষীরাজ-ঘোড়ায়-বহা কল্পনার রথে চড়ে এলেও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অরুণ ভাবছিল—এতদিনে আমি একটা কীর্ত্তি স্থাপন করতে চল্লাম। দরিদ্রের অরক্ষণীয়া কন্যাটিকে এক কথায় উদ্ধার করে দিচ্ছি, একি কম কথা! ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্যে ভগবান যে এদের হাতে এককণা সোনাও দেননি, সে আমার পরম ভাগ্য। কারণ, আমি না চাইলেও, যার আছে সে তার মেয়েকে শূন্যহাতে পরের বাড়ী পাঠাত না। কিন্তু কন্যার হাত যত পূর্ণ হয়ে উঠত, আমার যশের জয়ধ্বজা সোনার ভারে ততই ধূলায় লুটিয়ে পড়ত। আজ সে বাধাহীন আনন্দে আকাশে মাথা তুলে উড়তে পারবে।

অলকার অতলস্পর্শ মনের মধ্যে সেদিন বেশ তোলা-পাড়া লেগে গিয়েছিল। বিবাহ যে শুধুই সানাই বাঁশি শাঁখ আর ফুলের মালার মেলা নয়, শ্বশুরবাড়ী যে নিছক মেয়ে কাঁদাবার একটা কল নয়, একথা বোঝবার বয়স তার যথেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু নবযৌবনের বাসন্তী রঙে তখন তার কল্পনা উজ্জ্বল। বালিকার পিতৃগৃহমুখী মন এখন আর তার নয় বটে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে পরগৃহের নানা দায়িত্ব ভাবনা ও বিভীষিকাও তার মনে প্রবেশ লাভ করেনি। মানুষ যে বহুরূপী, তার মন যে নদীর জলের স্রোতের মত কত বাঁকে বাঁকে ঘুরে চলে সেসব কথা আজও অলকার অজানা। আজ মুহূর্ত্তের জন্যে যে মানুষটিকে সে দেখেছিল, যার কথা সে আড়াল থেকে একটিবার মাত্র শুনেছিল, তার সহৃদয়তায় অলকার মন তখন পরিপূর্ণ। অলকার মনে হচ্ছিল,—এই মানুষটি যেন তার আজন্মপরিচিত, তার রূপগুণের যেন তুলনা হয় না। এইটুকুতেই যে মানুষের সমস্ত পরিচয় হয়ে যায় না সে কথা অলকা আজ ভুলে গিয়েছিল; যাকে আজ সে বরণ করতে দাঁড়িয়েছে, তার রূপও যে অলকারই মনের রঙে রাঙা তাও সে আজ বোঝেনি।

অরুণের প্রতি অলকার মন সম্ভ্রমে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হ'লেও সেই সঙ্গে তার মধ্যে একটা গোপন ব্যথা তাকে অনুক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল। যার কাছে আজ সে একবার মাথাও নোয়ায়নি, এমন কি পাছে কোনো মনের কথা ধরা পড়ে এই ভয়ে যার দিকে সে ভাল করে একবার তাকায়ওনি, সেই নিতান্ত পরের কাছেই হয়ত পিতা দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে করুণা ভিক্ষা চেয়েছেন। হয়ত সেই কাতর ভিক্ষার বলেই আজ তার এ সৌভাগ্য! ছি, ছি, ছি! লজ্জায় অলকার মাথা হেঁট হয়ে আসছিল, অপমানে দুঃখে ক্ষোভে তার রাঙা মুখ ফেটে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিল। তার পিতা কন্যার বিবাহ ক্রয় করবার উপযুক্ত মূল্য দিতে অক্ষম! এই কথা আজ আনন্দের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাকে বলে যাচ্ছিল,—অরুণের গৃহে তোমার অধিকার নেই। অরুণ মহৎ বটে, কিন্তু তোমার দেনা পরিশোধ না করে কোন্ মুখে তুমি সে মহতের গলায় চির-প্রেমের মালা দেবে? শুধু প্রেমে হবে না, মূল্য চাই যে।

অলকা দরিদ্রের মেয়ে বলেই বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে কারো ভালবাসার উপহারও গ্রহণ করতে

পারেনি। তার মনে হ'ত করুণা যেন ভালবাসার ওড়না পরে তার সঙ্গে ছলনা করতে এসেছে। এমন কি যে-সইকে সে আজন্ম প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছে সেই সই যেবার সই-পাতানোর উপলক্ষ্য করে তাকে আঁচলাদার ঢাকাই কাপড় দিয়েছিল, সেবার ভাবনায় তিন রাত্রি তার ঘুম হয়নি। কেবলি মনে হ'ত বিজয়ার দিন সই বোধ হয় তার পুরানো ঢাকাই-পাড় বসানো নয়নসুকের শাড়ীর ছলটা ধরে ফেলেছে, তাই এই দয়া! নিজের হাতে শিউলি ফুলের রং করে সেই কাপড়খানারই একটু চেহারা ফিরিয়ে সইকে ফেরত দিয়ে তবে সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। দেবার সময় বলেছিল, "সই এ কাপড়-খানা প্রায় তোমার-খানারই মতন, কেবল সুন্দর দেখাবে বলে আমি যা একটু রং করে দিয়েছি।"

(৭)

ত্রৈলোক্যনাথের অলকমণির বিবাহ। মায়ের এত সাধের পুষ্পহার কি বসন্তবাহার চুড়ি কিছুই গড়ানো হল না। এমন কি চিড়িতন-চুড়ি কি আঙুরপাতা বালাও জুটল না। জমিদার-কন্যা বিধুর সভা-উজ্জ্বল-করা গহনার বাহার আজ তাঁকে কেবলি উন্মনা করে তুলছিল। ওই মেয়ের গায়ে অত হীরে মোতির ছটা, আর আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মত মেয়ের গায়ে কিনা সোনার আঁচড়টুকুও পড়ল না। অলকার গহনা হ'ল—আটগাছা ডায়মণ্ড-কাটা রূপোর মল, আর একজোড়া হাল্কা-রকম ইহুদি মাকড়ী। হাতে চারগাছা দিল্লীদরবার-কাঁচের-চুড়ির সঙ্গে এক জোড়া শাঁখা পরিয়েই কনের অলঙ্কার শেষ হয়ে গেল। কোথায় রইল মোতির মালা, কোথায়ই বা হীরার বালা! শুনেছিলেন অরুণের বাবা খুব মস্ত বড়লোক, লাখপতি বল্লেই হয়। অরুণ এখন সেখানে খবর দিতে কিছুতেই রাজি হ'ল না। একেবারে জয়শ্রী ও জয়মাল্য সঙ্গে করে বিজয়গৌরবে সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। সকলকে এমন একটা চমক্ দেবে যা আর কেউ কখনও দেয়নি। আগে থেকে এমন কীর্ত্তিটা সে ফাঁস করতে চায় না। তাই আজ একমাস হ'ল সেখানে সে বিশেষ কোনো খবর দেয় না। কেবল মাসের গোড়ায় একবার জানিয়ে রেখেছিল যে সে কিছুদিনের মত দেশভ্রমণে বেরিয়েছে।

হাতে টাকা নেই, কাজেই অরুণ নিজেও কিছু দিতে পারেনি। তবে শাশুড়ী জামাই দুজনেরই আশা ছিল অমন রূপের বউ পেলে শ্বশুর কোন্ পাঁচ দশ হাজার টাকার গয়না না দেবেন।

ছোট উঠানে জন পঞ্চাশ-ষাট লোকের মাঝখানে গোটা-দশেক আলো জ্বেলে কোনো-রকমে অলকার বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েরা সানাই বসাতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু টাকা কে দেবে? তাই ঘন ঘন উলু দিয়ে আর জোড়া শাঁখ বাজিয়েই সে সাধটুকু মেটাতে হ'ল।

অরুণের মনটা আজ কেমন যেন একটু খুঁৎখুঁৎ করছিল। শীতের সন্ধ্যায় একে দেশটাই কেমন ম্লান, গাছপালাগুলো নিঃঝুম, বেরালকুকুরগুলো জড়সড় হয়ে কোণে-কোণে পড়ে আছে, মানুষের চেহারাও এখন কেমন যেন ফাটা চটা। তার উপর আলো সানাই লোকলস্কর কিছুরই সমারোহ নেই, বিয়ে বলে মনে হয় কি করে? বড়লোকের ছেলে কল্পনায় দরিদ্রের বিবাহটা যেমন করে এঁকেছিল, দেখলে বাস্তব তার চেয়ে ঢের বেশী ম্লান বিষণ্ণ। সে ভাব্‌ত কনের গায়ে গয়না না থাক্‌লেও পুষ্প-আভরণের অভাব হবে না। সানাই না বাজলেও বাসর আলোয় উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে থাকবে। গালিচা না থাক্‌লেও পদ্মহস্তের নিপুণ আলপনায় স্নিগ্ধ দেখাবে, কিন্তু গরীবের বাড়ী অত করে কে? কোনো-রকমে একটু পিঁড়ির উপর আলপনা দিয়ে আবার তখনি অন্য কাজে ছুটতে হচ্ছে। সব দিক থেকে দারিদ্র্য আজ ফেটে বেরিয়ে পড়তে চায়।

অরুণ আজ নিজেও তাই একটু ম্লান মুখেই বিবাহ-সভায় এসেছিল। শুভদৃষ্টি মালাদান সব হয়ে গেল; অরুণের মন খুব যে খুসী হয়ে উঠ্‌ল তা মনে হ'ল না।

কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অবসানে যখন অলকার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হ'ল, তখন তার চোখের সম্ভ্রমপূর্ণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অরুণের মন আবার যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। আজ প্রায় একমাস হ'ল অরুণের সঙ্গে অলকার বিয়ের কথা হয়েছে, পাড়াগাঁয়ের

ঘাটে পথে নির্জ্জনে দেখাও হয়েছে, কিন্তু অলকা একদিনও ত তার দিকে ভাল করে চায়নি, কথা বলা ত দূরে থাক! যদি বা কখনও চেয়েছে তাও নেহাৎ পথের পথিক পথিককে চেয়ে দেখার মত। আজ প্রথম তাকে নিতান্ত আপনার জেনে সে তার কৃতজ্ঞতার উৎস চোখের দৃষ্টিতে ভরে এনেছিল। অন্যের সাম্‌নে তার সে অসীম কৃতজ্ঞতা সে জানাতে চায় নি। শুভদৃষ্টির দৃষ্টি তার একেবারেই নিরর্থক শূন্যদৃষ্টি। দরিদ্রার প্রেম কি কৃতজ্ঞতা সভার সামনে কেন সে স্বীকার করবে? উদাসিনী তেজস্বিনী অলকা তাই আজ একমাস পরে আপনার জেনে নিজের অনধিকারের দাবীর কথা ভুলে গিয়ে কল্যাণী বধূর বেশে স্বামীর পায়ে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি নিয়ে এসেছে। অরুণের বিমুখ মন তাই দেখে ক্রমে প্রসন্ন হয়ে এল।

(৫)

দিন সাতেক শ্বশুরবাড়ীতে কাটিয়ে অরুণ মহা ফাঁপরে পড়্‌ল—কি করে হঠাৎ বউ নিয়ে বাড়ী গিয়ে হাজির হবে? অথচ এখন না গেলেও নয়, বিয়ে যখন করেছে তখন নিয়ে একদিন যেতেই হবে। কিন্তু যে বেচারা এত কাল কেবল কথার ব্যবসা করে' কথায় কথায় বিশ্বসংসার ছেয়ে বেড়িয়েছে, সত্যি কাজ করবার শক্তি তার বড় বেশী বাকি ছিল না; এমন কি একটা উপায় ভেবে বের করবার মত মস্তিষ্কের জোরও তার ছিল কি না সন্দেহ। তার মনে হচ্ছিল,—এই সাতটা দিন যেমন পরিপূর্ণ আনন্দে কেটেছে, তেমনি নিশ্চিন্তে নিছক আনন্দ-সুধায় জীবনটা যদি ভরে থাক্‌ত, যদি কোনো ভাবনা কোনো চিন্তা না থাক্‌ত, তবে সে তার চির-আকাঙ্ক্ষার ধন যশোগীতির বাসনাও তুচ্ছ বলে ভাসিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু সে ত হবার নয়। এ বিশ্বে নিরালায় লুকিয়ে আনন্দ সম্ভোগ করবার জায়গা কোথাও মিলবে না।

অলকার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা ছেড়ে, ওই পাষাণপ্রতিমার অন্তরের সুধা-নির্ঝরে শুধু ক্ষণিকের মত স্নান করে' তাকে উপায়ের সন্ধানে একদিন কলিকাতা যাত্রা করতে হল। যাবার সময় সে প্রতিজ্ঞা করে গেল—অলকাকে রোজ একখানা করে চিঠি লিখবে।

সত্যিই প্রতিদিন সকাল বেলা স্নান-আহারের আগে অলকার নামে একখানা করে চিঠি আসত। সে সময়টা তার এত স্থির জানা ছিল যে একদিনও বোধ হয় ডাক হরকরাকে ডেকে চিঠি দিতে হয়নি। কোনো-না-কোনো কাজের ছলে অলকা ঠিক সেই সময়টা বাইরের ঘরে গিয়ে হাজির হত। তার দুর্ভাগ্যের যত কিছু নিদর্শন সে সমস্তই সে এত দিন ধরে লোকের চোখের আড়াল করে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে; কিন্তু আজ পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনেও,—কোনো মানুষ যে তাকে অতখানি ভালবাসে—সে সৌভাগ্যের কথা সে লোককে জানতে দিতে চায় না। রোজ যে তার চিঠি আসে এবং তার জন্য যে সে এতখানি ব্যগ্র একথা তার বাড়ীর লোকেও জানত কি না সন্দেহ। এমন কি যে পিয়ন নিত্য সেই আনন্দের বার্ত্তা বহন করে আন্‌ত, সেও বোধ হয় অলকার প্রাত্যহিক উপস্থিতিটাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করত।

অলকার আনন্দধনি ওই চিঠিখানি সারাদিন অমনি নীরবভাবে তার বুকের কাছে ঘুমিয়ে থাক্‌ত। অনেক রাত্রে যখন পাড়াশুদ্ধ ঘুমের কোলে ক্লান্ত শরীর আনন্দে মেলে দিত, যখন তাদের মেটে ঘরে পাশের খাটে তার পিসীমা কোলের ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে লেপের তলায় গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন, তখন প্রদীপের ওই অতটুকু আলোকের স্পর্শে সেই ঘুমন্ত চিঠিখানি শতকণ্ঠে তার হৃদয়ের সমস্ত গোপন কথা নিয়ে জেগে উঠ্‌ত। ঘুমোবার আগে রোজ অলকা ওই সুখস্পর্শটুকু নিয়ে বিছানায় ঢলে পড়ত।

এমনি শান্তভাবে বুকের মধ্যে কোমল সুখের অনুভূতি নিয়ে যখন অলকার দিন কাটছিল, তখন একদিন হাজার দুই টাকার নানা অলঙ্কার সঙ্গে করে হাসিমুখে অরুণ এসে হাজির। বাবার একজন পুরাতন বন্ধুর কাছে টাকা ধার করে সে তার প্রেয়সীর জন্য বহু আভরণ সংগ্রহ করে এনেছে।

আর দেরী করা চল্‌বে না। কালই অলকাকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। সারাদিন বাপমায়ের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে চব্বিশ ঘণ্টা কেঁদে-কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে একরকম অনাহারে দিন কাটিয়ে পরদিন স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর

করে নিজের জন্ত ভবিষ্যতের কোনো ভাবনা চিন্তা না রেখে ম্লান মুখে অলকা শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। কন্যার পিতার চিরন্তন ব্যথা নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আপনার ঘরের কোণে নীরবে বসে রইলেন। সরস্বতীর সহস্র রূপও আজ তাঁকে সেই অশ্রুধৌত মুখের শোভা ভোলাতে পারলে না। গৃহিণী ক্ষণেক্ষণে কাঁদছিলেন, আর ভাবছিলেন আমিও এক দিন এমনি করে মাকে কাঁদিয়ে এসেছি।

(৬)

অলকার শ্বশুর মস্ত বড়লোক। দুতিন পুরুষের সঞ্চিত ধনের উপর তিনি নিজে যা রোজগার করেছেন, তাতে এক পয়সাও না উপার্জ্জন করে আরো চারপাঁচ পুরুষ বেশ নিশ্চিন্ত আরামে খেতে পরতে পারে।

অনেককালের বনিয়াদী ঘর বলে সে বাড়ীর আদব-কায়দাও একটু উঁচু রকমের। মেয়েমহল আর পুরুষ-মহল সেখানে কোনোদিনও কাছাকাছি হয়েছে বলে বাইরের লোকে টের পায় না। যে মায়ের কোলে জন্মেছে, সেই মাকে দশবারো বছর যেতে-না-যেতেই ছেলেরা আপান বলে, হাজার ঠাট্টার সম্পর্ক হলেও বয়সে ছোট বড় ভাজকে দেওররা কোনো দিন হেসে দুটো কথা বলে না। মেয়েদের বাইরের সম্মান সে বাড়ীতে খুব বেশী। তাদের সঙ্গে কি বিষয়ে কেমন ব্যবহার করতে হয়, সে সম্বন্ধে বাঁধা আইনকানুন আছে বল্লেই চলে। চৌধুরী-বাড়ীর কোনো মেয়ে বউ কখনও পুরুষের বকুনি খেয়েছে বলে প্রায় শোনা যায় না।

তা' ছাড়া এ বাড়ীর কুটুম্বিতাও প্রায় গোনা গাঁথা কয়েকটা বাড়ীর সঙ্গে ছাড়া হতে দেখা যায় না। বুনো, জংলী অসভ্য লোকেদের উপর এদের এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। তাই অচেনা অজানা মানুষকে চৌধুরীদের বড় ভয়।

ঘণ্টা চারেক আগে একখানা টেলিগ্রামে খবর দিয়ে এ হেন বাড়ীতে বউ নিয়ে অরুণ যখন এসে উঠল, তখন বাইরে প্রশান্ত মূর্ত্তি হলেও ভিতরে ভিতরে বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের মনে যেন আগুন জলছিল। চৌধুরী-পরিবারের এমন অপমান আজ পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে কেউ শোনেনি। অরুণ এই বাড়ীরই ছেলে, বাইরের নানা আন্দোলনের স্রোতে সে কথাটা ভুলে গেলেও বাড়ীতে পা দিলেই এ বাড়ীর সমস্ত বিধান তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আজ বাড়ীর চেহারা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে তার এক বিন্দুও গোলমাল হয়নি। অপমানের প্রচ্ছন্ন আগুনই যে তাদের মধ্যে জলছিল, তা নয়, আর একটা কিসের আভাসও যেন তাদের মুখের চেহারায় পাওয়া যাচ্ছিল। অরুণ ভেবে পাচ্ছিল না, বাড়ীতে এমন কি দুর্ঘটনা ঘটেছে যাতে সমস্ত বাড়ীর উপরেই একটা ঘন অন্ধকারের ছায়া পড়েছে। কাউকে সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করতেও তার সাহস হচ্ছিল না, কারণ এতদিন পরে বাড়ী ফিরে আসার পরও কেউ তার সঙ্গে একটাও কথা কয়নি। দরোয়ান-চাকরেরা নিঃশব্দে গাড়ীর মাথা থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া আর একটি দাসী এসে বৌকেও ঘরে নিয়ে গেল, তবে তার মধ্যে কোনো আদর-অভ্যর্থনার চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু অরুণকে কেউ ঘরে ঢুকতেও বল্লে না।

বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অরুণ দেখলে, তিনি শয্যাশায়ী। আজ একমাস হ'ল সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাতপা পক্ষাঘাতে অচল হয়ে আছে। তবে জ্ঞান বেশ টনটনে, কথা বলবার শক্তিও ভাল রকম। বাবাকে প্রণাম করে অরুণ জানতে পারলে, যাঁর কাছে সে দুই হাজার টাকা ধার করেছিল সেই বন্ধুই তাঁর রোগের চিকিৎসক। অরুণের ধারের কথাটা তবে জানা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু পিতার রোগশয্যার কথা সে ইতিপূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও জানতে পায়নি। অরুণ বলবার কোনো কথা না পেয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

আজ অরুণের অবস্থা যেন দুকূলহারা। খবরের কাগজে তার সুকীর্ত্তির খবর দিয়ে জয়ডঙ্কা বাজাবার সাহস কিম্বা ইচ্ছা আজ তার আর বিশেষ নেই। বাড়ীর লোকের চোখে ত সেটা দুষ্কীর্ত্তি বলেই ঠেকেছে, তার উপর কঠিন-পীড়াগ্রস্ত পিতার এত দিন খোঁজখবর নেয়নি বলে লজ্জায় তার মুখ কালি হয়ে গিয়েছিল। কলেজের ছেলেদের সামনে তার যে বক্তৃতার স্রোত বিনা বাধায় হু হু করে বয়ে যেত, যে তর্কযুক্তির জালে অপর পক্ষকে সে আধমরা করে

কেল্‌ত, সেসব আজ এমন নিঃশেষে কোন্ অতলে যে ডুব দিয়েছে তার ঠিক নেই। নিজের কাজটাকে যতখানি সমর্থন করা নিতান্তই সোজা, সেটুকুও আজ সে পেরে উঠ্‌ছে না। তা' ছাড়া সমর্থন করবেই বা কার কাছে? কেউ ত তাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেনি।

অলকা সারাদিন নিরানন্দ বাড়ীর এক কোণে দুটি-একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে একটু-আধটু ভাব করে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় মনটাকে একটু খুসী করবার জন্মে এবং অরুণকেও একটু আনন্দ দেবার জন্তে তার নূতন অলঙ্কার-গুলি পরে, ভাল করে এলো খোঁপা বেঁধে ছোট একটি সিঁদুরের টিপ কেটে একখানা সোনালিরঙের শাড়ী পরে নিজের ঘরে যাবার উদ্যোগ করছিল। তার সাজসজ্জাটা বাড়ীর ছোট মেয়েরাই বিশেষ উৎসাহে করে দিয়েছিল। কারণ তারা জান্‌ত বাড়ীতে নূতন বৌ এলে সারাদিন তাকে ঘিরে আনন্দ করতে হয়; বধূবিশেষকে নিয়ে যে করতে নেই, এ বুদ্ধিটা তাদের মাথায় ঢোকেনি, এবং তাদের এ বিষয়ে কেউ কোনো উপদেশও দিয়ে যায়নি। ছোট একটি জাস্থরঝির হাত ধরে সলজ্জ হাসিতে মুখখানি উজ্জল করে এ বাড়ীতে তার একমাত্র আপনার জন অরুণের ঘরে গিয়ে যখন সে উঠ্‌ল, তখন রাত প্রায় দশটা। মেয়েটি তাকে রেখে চলে যেতে অলকা দেখলে অরুণ টেবিলের পাশে কি একখানা কাগজ নিয়ে মহা চিন্তাকুল হয়ে বসে আছে।

সেখানা অরুণের পিতা চৌধুরী মহাশয়ের জবানী পত্র। পত্রে তিনি অরুণকে জানিয়েছেন যে যখন তাঁর মত না নিয়েই অরুণ তার জীবনের এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলেছে তখন বুঝতে হবে যে সে এখন সব বিষয়ে উপযুক্ত হয়েছে। তাই তাঁর অনুরোধ যে পিতার কাছে পাবার আশায় যে ঋণটা সে করেছে, সেটা যতদিন না নিজে শোধ করে ততদিন যেন সে এ বাড়ীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখে। এবং কোনো কাজে তাঁর পরামর্শ নেওয়া যখন সে দরকার মনে করেনি, তখন গলগ্রহের মত পিতার উপার্জ্জিত অন্ন ধ্বংস করতেও বোধ হয় সে লজ্জা বোধ করবে। বৌমা দরিদ্র গৃহস্থের নির্দ্দোষী কন্যা, ইচ্ছা করেন ত এই বাড়ীতেই কিছুদিন কাটাতে পারেন। দরিদ্রকে অন্নদান এ বাড়ীর সনাতন ধর্ম্ম; পুত্র যাঁকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার করেছেন তাঁকে কন্যার ভরণপোষণের জন্ম আবার পীড়া দিতে চৌধুরীবংশ কখনও অগ্রসর হবেন না। আর এতে যদি বৌমার অপমান হয় তবে তিনিও স্বামীর সঙ্গ নিতে পারেন।

অলকা চিঠির খবর কিছুই জান্‌ত না। তার ইচ্ছা ছিল আজকের তার এমন মনোমোহন সাজ দেখে অরুণ তারিফ করে অন্ততঃ দুটো কথা বলে। সে হাসিমুখে এগিয়ে এসে অরুণের কাঁধের উপর হাত রেখে বলে উঠ্‌ল "কাগজখানা নিয়ে কি এমন ভাবনা ভাব্‌ছ যে একবার ফিরে তাকাবারও অবসর হ'ল না।"

অরুণ কি করে এই সংবাদটা স্ত্রীকে দেবে সে সম্বন্ধে অনেক সুশোভন বক্তৃতা ঠিক করবার ইচ্ছায় ছিল; কিন্তু বড়লোকের ছেলে সে, আজও তার কলেজের শেষ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, অর্থোপার্জ্জন কাকে বলে সে কথা তাকে একদিনও ভাবতে হয়নি, আজ অকস্মাৎ গোপন ঋণের বোঝাটা এমন নির্দ্দয়ভাবে ঘাড়ে তার চড়ে বসাতে তার আর কোনো কথা মনেই আসছিল না। অগ্নিবরণা অলকার রূপ আজ তার চোখে গাঢ় অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অলকার কথার উত্তরে সে হঠাৎ বলে বস্‌ল, "ভাবছিলাম অন্য কোথাও বিয়ে করলে আজ আমি পাঁচ-দশ হাজার টাকার মালিক হতাম, আর তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে, দু হাজার টাকা ঋণ মাথায় তুললাম আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ঘর সব হারালাম।"

অলকা চম্‌কে উঠে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে দাঁড়াল। এমন কঠিন কথাগুলো বলবার ইচ্ছা অরুণের মোটেই ছিল না; কিন্তু যখন বলে ফেলেছে তখন আর উপায় নেই। দারিদ্র্যের দুঃখ তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে দিয়েছিল। চিঠিখানা অলকার গায়ে ফেলে দিয়ে সে সেইখানেই চুপ করে বসে রইল।

চিঠি পড়ে অলকার যৌবনস্বপ্ন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে টুটে গেল। নিজের প্রতি ধিক্কারে তার মন ভরে উঠ্‌ল। ছি, ছি, কি নির্লজ্জ, কি কাঙাল সে! শুধু দয়া করে, শুধু দরিদ্রের দুঃখ মোচন করবার জন্ম যে তাকে বিবাহ করেছে, তার কাছে সেইটুকু উপকার পেয়েই তুষ্ট না থেকে, সে

কিনা পথের কাঙালের মত ভালবাসা ভিক্ষা করতে এসেছে ! সাজসজ্জার ছলনায় ভুলিয়ে ফুসলিয়ে দয়ালুর কাছ থেকে তার সর্ব্বস্ব আদায় করে নিতে এসেছে। ভিখারীর কন্যা সে, তার এত স্পর্দ্ধা! অলকা ভুলে গেল, যে, কাউকে ভোলাতে সে আসেনি; আনন্দ পেয়ে আনন্দ দিতেই সে এসেছিল। কিন্তু এই তীব্র বেদনা তাকে নিজের উদ্দেশ্যও ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই তার সমস্ত আভরণ প্রসাধন তাকে ঘিরে ধরে ধিক্কার দিচ্ছিল; সোনালি শাড়ীখানা যেন বেড়া-আগুনের মত জ্বলে উঠে তার প্রতি-অঙ্গ জ্বালাময় করে তুলছিল।

অলকা বল্লে, "তবে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

অরুণ বল্লে, "তুমি থাক না, তুমি বউ, তোমার ত অধিকার আছে। কিন্তু ঘরের ছেলে আমি, পরের দুঃখ সইতে পারিনি, তাই যত দোষ ত আমারই।"

অলকা খাড়া দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে, "আমার আবার কিসের অধিকার? আমার খাওয়া-পরার দাম আগাম না দিয়ে কেবল নিরন্নের শুকনো মুখ দেখিয়ে অমনি ঢুকেছি, এখানে থেকে পিতৃঋণ আর বাড়াতে চাইনে।"

কথা বলবার সময় অলকার মুখে একটু দুঃখের রেখা কি চোখে একবিন্দু জলও দেখা যায়নি, আগুনের জ্বালার মত সমস্ত মুখটাই রাঙা হয়ে উঠেছিল। যদি তার মুখে একটু বেদনা ফুটে উঠ্‌ত, যদি চোখের দৃষ্টিতে প্রেমের দাবী নিজের অধিকার ব্যক্ত করত, তাহ'লে হয় ত অরুণ দুঃখের মধ্যেও তাকে সঙ্গিনী করে সুখ পেতে চাইত, হয়ত বা তাতে ফলও পেত। কিন্তু আজ যশোগীতি ধ্বনিত হবার আশাও টুটল, প্রেমের আলোও বুঝি নিভে গেল, রইল শুধু অপমান, দারিদ্র্য আর দুঃখ! কেন তবে সে অন্যের মুখের দিকে চাইবে?

নিজেকে চাপা দেবার শক্তিটা, রুদ্র তেজের আগুনটা অলকার মন থেকে তখনকার মত যদি সরে যেত, তবে, হয়ত বা সবই অন্য রূপ ধরত, এই আঘাতে তার হৃদয় ছিন্ন না হয়ে ব্যাকুল আগ্রহে শেষ অবলম্বনটুকু আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরত। কিন্তু অলকার সমস্ত মন সে-মুহূর্ত্তে তাকে ঝাঁকি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল,—তোমার কোনো অধিকার নেই, যেচে আর অপমানের ভার বাড়িও না। তাই সে সেই কুমারী অলকার মত দৃপ্তমুখে ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে দাঁড়াল। একবার মুখ তুলে চাইলেও না। অরুণ মুখে কিছু বল্লে না, মনে মনে ভাবলে, "ভিখিরীর মেয়ের এত তেজ!"

* * * *

পরদিন অলকা আর অরুণ একসঙ্গে চৌধুরী মহাশয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বিদায় হ'ল। বাড়ীর লোকে ভাবলে—একসঙ্গেই যাচ্ছে।

অলকাকে রেখে অরুণ যখন ঋণশোধের পথ খুঁজতে যাবে তার আগে অলকা শুধু একটা অনুরোধ করেছিল, "দেখ, তোমার উপর আমার কোনো অধিকার না থাক্‌লেও, একটি অনুরোধ আমার রেখ। রোজ না হোক, দুচারদিন অন্তর অন্ততঃ একখানা শুধু খামের উপর আমার নাম লিখে পাঠিও। কারণ তোমার কাছে আমার অধিকার নেই বল্লেও আর কারুর কাছে সেটা স্বীকার করতে আমি পারব না।" এ ছাড়া আর কোনো কথাই অলকা বলেনি। অরুণ ভাবলে,—আমার খবরের জন্যে নয়, কেবল নিজের মান বজায় রাখবার জন্যেই এ অনুরোধ! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কোন্‌টা যে অলকার মনে বেশী ছিল, তা অবশ্য ঠিক বলা যায় না। যা হোক অরুণ রাজি হয়েই গেল।

(৭)

প্রতি সপ্তাহে দু চার বার এক লাইন লেখা কিম্বা শূন্য কাগজভরা একখানা খাম অলকার নামে আসত এবং অলকার তরফ থেকে কেবলমাত্র কুশল প্রার্থনা করে সেই-রকম চিঠি অরুণের নামে প্রায়ই যেত। এবার ডাক-হরকরা প্রতিদিনই ডেকে চিঠি দিয়ে যায়। এবারও অলকা সকলের চোখের আড়ালে চিঠি খোলে, কিন্তু সে অন্য কারণে। মাঝে মাঝে চিঠি পেতে দেরী হলে বার বার শূন্য চিঠির তাগিদ দিয়ে অলকা চিঠি আনিয়ে তবে ছাড়ে।

তার অত তেজ, অত মান যে কোথায় গিয়েছিল জানি না। চিঠি খুলে বস্‌লেই সেই প্রথম-দেখা অরুণের প্রশংস-মান দৃষ্টি তার মনে পড়ে যেত, ইচ্ছা করত অনধিকারের সমস্ত শাস্তি নিয়েও একবার সেখানে ছুটে চলে যায়,

একবার দেখে আসে নির্ম্মমের মত এই অর্থহীন শূন্য চিঠি পাঠাবার সময় তার মুখখানা কেমন হয়। এ তারই অনুরোধ হলেও অরুণ কি ইচ্ছা করলে দুটো কথা লিখ্‌তে পারে না? আগেকার সেই চিঠির মত না হোক, তার শতাংশের একাংশ আনন্দও কি দিতে নেই! একদিন চিঠি এল,— এরকম ছেলেখেলা করবার সময় অরুণের নেই। সে নিজের অঙ্গীকার থেকে মুক্তি চায়। তাকে এখন জীবন-সংগ্রামে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে।

শূন্য চিঠির নিষ্ঠুর খেলাও অল্প দিনেই শেষ হয়ে গেল। ভাষাহীন তাগিদে আর ফল ফলে না। অলকার মান বুঝি আর বাঁচে না! কিন্তু যেমন করে হোক সে তার উপায় করবেই।

চোখের জলে অনেক খাম কাগজ নষ্ট করে এক দিন সে একটা উপায় স্থির করলে। নিজের হাতেই খামের উপর অরুণের হাতের লেখা নকল করে একাধারে অরুণ আর অলকা দু-জনের কাজই সে এবার থেকে করবে।

পাড়ার যে নিরক্ষর ছেলেটিকে ধরে সে চিঠি ডাকে দেওয়াত, এখন তার কাজ আরো বেড়ে গেল। কারণ এখন পালা করে দুজনের চিঠিই তাকে ডাকে দিতে হয়।

পুরোনো চিঠি কখানা খুলে কতদিন অলকা মনে করত,— একখানা এই চিঠি খামে করে নিজের নামে ডাকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কি জানি কেন সেগুলো খোয়া যাবার ভয় তার প্রায়ই হত। তবু সেইগুলো নূতন করে ডাক-ঘরের ছাপ নিয়ে তার চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে হয়ত সেই হারানো দিনের আনন্দ আবার জেগে উঠ্‌তে পারত!

হাত তুলে খামে ভরতে গিয়ে কত দিন সে ফিরে এসেছে। ভেবেছে, এমন করলে চলবে না—আমাকে পাথরের মত কঠিন হতে হবে! স্বামীর সেই সব চিঠিতে আর তাঁর মুখের কথাতেও অলকা এক দিন শিক্ষা পেয়েছিল যে মানুষের মন বদ্‌লায়। তখন সেটা তত্ত্বকথার মত ছিল; নিজের ক্ষেত্রেও যে একদিন লাগ্‌বে তা সে ভাবেনি। শুনেছিল মানুষের মন নদীর স্রোত; সে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লে যাচ্ছে। কিন্তু মন যদি চিরকাল এক জায়গায় নাই থাকে, যদি একদিনের পরিচয় চিরদিনের না হয়, তবে মানুষ অত নিষ্ঠুরের মত অন্যের মন নিয়ে খেলা করে কেন? কেন সে বলে যাহনা তার সেসব দিনের কথা শুধু সেইসব দিনেরই? অলকা এর মীমাংসা করে উঠ্‌তে পারত না। যদি নদীর স্রোতই মানুষের মন হয়, তবে দুটো নদীর স্রোত কেন একই ভাবে বয় না? দুটো মানুষের মন কেন একই সঙ্গে বদ্‌লায় না? ভগবানের এ বড় অবিচার! তিনি যদি মনটা গতিশীল করেছেন, তবে তার গতি অমন এলোমেলো কেন? সে কেন তাল কাটিয়ে অমন বেতালা চলে যায়?

মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা করত, স্বপ্নের বিভীষিকার মত সব দূর হয়ে যাক্। কিন্তু সে জান্‌ত, বিধির বিধান অতি কঠোর, এ বিধানে অসম্ভব সম্ভব হয় না। তবু মানুষের মন তারি পথ চেয়ে থাকে, নিজেকে সে ওই তুচ্ছ আশার মোহেই ভুলিয়ে রাখে।

নিজের এইসব দুর্ব্বলতায় অলকা নিজের উপর রেগে আগুন হয়ে উঠ্‌ছিল। কেন সে পরের জন্যে অমন করে কেঁদে মরবে? তার নারী-গৌরবে অত বড় ঘা সে কিছুতেই সইবে না।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে অলকার শরীর মন উদ্যত বজ্রের মতন হয়ে উঠ্‌ছিল। এ বজ্র যে কার বুকে পড়বে, কার সর্ব্বনাশ করবে, তা সে নিজেই ভেবে পাচ্ছিল না। তার মনে হত হয়ত, আর কাউকে না পেয়ে সে নিজেকেই সংহার করবে, নিজের অন্তরের অমূল্যধন স্নেহ প্রেম সব সে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলবে।

যখন তার অন্তর চাইত স্নেহে প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে তখন সে বসে বসে মনে মনে সূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তার করে মনের সঙ্গেই লড়াই লাগিয়ে দিত। বাস্তবিক স্নেহ প্রেম ভালবাসা এ-সবের প্রয়োজন কি? কেন, এমনি কি দিন চলে না? মানুষ যদি নিজের কাজগুলো করে যায়, কেউ যদি কারুর জন্যে না তাকায়, কেবল প্রয়োজন বুঝে কর্ত্তব্য দেখে করে যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? লোকে বলে বটে অমন করলে আর সৃষ্টি চলে না! তাই অলকা কখনও কখনও ভাবত—আচ্ছা, নাই বা চলল সৃষ্টি! এতদূর পর্য্যন্ত ভাব্‌তেও তার বাধা পড়ত না—মনে হ'ত, হাঁ, হয়ত এসবের প্রয়োজন আছে। হয়ত স্নেহ প্রেমই জগতের কেন্দ্র। দুরন্ত ঝড়ের ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ

হয়েও ঐ প্রেমকে মানুষ ঠেলতে পারে না, প্রেমে যে বেদনা আনে তারি তীব্র মধুর আনন্দ শূন্য হৃদয়ের দুঃখহীন চির নিশ্চিন্ততার চেয়ে বরণীয়। কিন্তু থাকলই বা প্রয়োজন, হ'লই বা জগতের কেন্দ্র! জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? যে জগৎ তাকে অস্পৃশ্যের মত দূরে ঠেলে রেখেছে, সে-জগতের সঙ্গে ছন্দে তালে ঐক্য রেখে সে কেন চলতে যাবে? সে সৃষ্টিছাড়াই হবে। কেউ যা হতে পারেনি, হতে পারবেও না, তাই সে হবে। আর এত করে ঠেকা দিয়ে, তালি দিয়ে নিজের অবস্থাটা জগতের ছাঁচে ঢালা নিটোল সুন্দর করতে চাইবে না। এই-রকম সব ভাবনা ভেবে ভেবে অলকা দেখত মনটা যেন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠছে, কোনো-রকম ভাবের কি রসের লেশ খুঁজে-পেতে বের করা কষ্টকর। নিজের মনের এই শুষ্ক কঠিন মূর্ত্তিতেই সে বেশ একটা নিষ্ঠুর আনন্দ বোধ করত। এমন পাষাণ প্রাণে বেদনা দিয়ে কেউ কাঁদাতে পারবে না; এমনি করেই মাথাটাকে চিরদিন উঁচু করে চলা সহজ। নত হবার আর কোনো ভয় থাকছে না।

অলকা তার মনটাকে কেবল বিচারবুদ্ধি দিয়ে সাজিয়ে কঙ্কালের মত আনন্দহীন কঠিন করে তুলতে পারলেই যেন বাঁচত। বিচারবুদ্ধির উপরে প্রয়োজনের অতীত যে একটা হৃদয়ের রাজ্য আছে, আজ সেটাকে অস্বীকার করতে পেলেই তার মুক্তি। সে রাজ্যের বেদনা ও ব্যথার আনন্দ আর পরাজয়ের সুখ আজ তার অসহ্য। সে নিজে যেখানে জয়ী হতে চেয়েছিল, স্বেচ্ছায় যেখানে সে মাথা হেঁট করেনি, ঘাড় টিপে সেখানে তাকে ধূলিশায়ী করে দিলে সে সইতে পারবে না। আনন্দে যদি সে পরাজয় স্বীকার করতে পারত তবেই ছিল তার সুখ। ফলে ফুলে শস্যক্ষেত্রে সকল শোভার মধ্যে সেই যে হৃদয়রাজ্যের উপভোগের জন্য ডালি সাজানো, সকল জিনিষের রঙে, সকল গানে গন্ধে যে রাজ্যের অধিকার, অলকা আজ সে রাজ্য ছেড়ে মুক্ত হতে চায়। সে চায় শুষ্ক কঠিন মূর্ত্তিতে শুধু সত্য আর প্রয়োজন দেখতে।

এমনি ভাবের সময় সে মানুষের মিষ্টি কথায়, প্রিয়জনের আদরের মূল্য বুঝে উঠতে পারত না। তার স্বামীর লেখা পুরানো চিঠিগুলো তখন তার কাছে অর্থশূন্য হাস্যকর জঞ্জাল মনে হত। সে ভেবে পেত না, সময় নষ্ট করে' অকারণে এই রকম কতকগুলো পাগলামির উচ্ছ্বাস করে মানুষের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সেই কোন্ আদি যুগ থেকে মানুষের এই যে চিরন্তন বিরহবেদনা, যা নিয়ে যুগে যুগে কালে কালে কবিরা কত গান গেয়ে গেছেন, একদিন সেই-সবের মাধুর্য্যে সে ডুবে থেকেছে, তাতে কত আনন্দই পেয়েছে; কাব্যের মত অত বড় সত্য আর কোনো জিনিষকে ভাবেনি। কিন্তু আজ ভাবছে—তার মধ্যে আছে কি? আশ্চর্য্য এই, এত বড় একটা মিথ্যা কি করে অনাদিকাল ধরে তেমনি ভাবে মানুষের মনকে ঘিরে আছে! তার অন্ধ চোখ কি কোনো দিনই খুলবে না? ঝড়ঝঞ্ঝার কঠোর নিষ্ঠুর মূর্ত্তিই ত জগতে সত্য। তাই ত চোখে কানে ঠেকে, আর কিছুই ত নেই।

অলকা এত তর্কযুক্তি করেও কিন্তু নিজেকে পরাস্ত করতে পারছিল না। মনটা তার কঠিন হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সুযোগ পেলেই সে সেই দুঃখের রাজ্যেই ছুটতে চাইত। কঠিন নিগড়ে বাঁধা হয়ে দুঃখহীন লোকে থাকতে সে কেমন হাঁপিয়ে উঠত। দুঃখ নির্ব্বাণ করবার এ উপায়টা সে ভাল করে মানিয়ে নিতে পারছিল না।

(৮)

সেদিন সকালে অলকার চিঠিখানা বেশ ভারী ভারী ঠেকছিল। তা ছাড়া সেটা যে তার নিজেরই জাল নয়, তা এক নিমিষেই অলকা বুঝে ফেলেছিল। আজকে যে তাতে কি থাকতে পারে অলকা অনেক ভেবেও ঠিক করে উঠতে পারছিল না। সারাদিন চিঠিখানা লুকিয়ে রেখে রাত্রে দেখলে—স্বামী তাকে মস্ত একখানা চিঠি লিখে ফেলেছেন। অতবড় চিঠি দেখেই আনন্দে অলকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কি মনে করে তখনি আবার আগের মত ঔদাস্যমাখা স্থির নিশ্চল হয়ে গেল।

অরুণ এত দিনের অনাদরের জন্য ক্ষমা চেয়ে জানিয়েছে, দারিদ্র্য তার হৃদয় এতদিন কঠিন চাপে চেপে রেখেছিল; আত্মীয়বন্ধু সব সে ভুলে গিয়েছিল। আজ পিতা তার অপরাধ ক্ষমা করেছেন; এই দীর্ঘকালে ত্রিহাজারের মধ্যে পাঁচ শত টাকা মাত্র শোধ হয়েছে, তবু তার চেষ্টা ও পিতৃ-আদেশে অচলা নিষ্ঠা দেখে পিতা খুসী হয়ে সব

দোষ মার্জ্জনা করেছেন। তাই অরুণ দুদিনের মধ্যে অলকাকে নিতে আস্‌ছে। এবারে আর কোনো অনাদর হবে না। তার দারিদ্র্যের সমস্ত অপমান মুছে যাবে।

বার চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে চিঠিতে এই কথাগুলিই নানা ভাবে নানা সুরে সাজানো ছিল। অলকা চিঠি শেষ করে একবার হাস্‌লে। তার পর আর না দেখে তুলে রেখে দিলে।

জামাই শ্বশুর-শাশুড়ীকেও মেয়ের দ্বিরাগমনের খবর দিয়েছিলেন। এত বড় মেয়ের যে দ্বিরাগমন করতে হ'ল এই তাঁদের ক্ষোভের কারণ ছিল। যাক্ তবু যে এতদিনে বেয়াইএর বৌ নেবার সময় হল এই ঢের।

জামাই এলে পাড়ার যত মেয়ে মিলে মহা কলরবে অলকাকে সাজাতে বস্‌ল। সে কি পাতাকাটা চুল টেপার ঘটা! আল্‌তা কাজলেরই বা কি বাহার! সিঁদুরের টিপ সাত জনে সাত রকম পরিয়েও পছন্দ করে উঠ্‌তে পারছিল না। শাড়ীর বাহারও কম হয়নি। অলকা মনে মনে হাস্‌ছিল। সেদিনকার তার প্রসাধনের অপমানের ব্যথা আজও ত সে ভোলেনি।

ঘরে ঢোকবার আগে আড়ালে সমস্ত সাজ ঘুচিয়ে ফেলে শুধু একখানা কালাপেড়ে শাড়ী আর চারগাছা কাঁচের চুড়ি পরে অলকা স্বামীসন্দর্শনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলে।

অরুণ কাছে এগিয়ে আস্‌তেই তার পায়ে প্রণাম করে অলকা বল্লে, "আমাকে রেখে যাবার দিন তুমি কেন জানি না আমার গয়নাগুলো চাওনি; আমিও তখন লজ্জার মাথা খেয়ে নিজে হতে দিতে পারিনি, পাছে লোকে আমার অপমানের কথা জেনে যায়। আজ আমি এই সব ধরে দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও।"

অরুণ গহনার পুঁটুলি ঠেলে ফেলে বল্লে, "ওকি! আমি ত ও নিতে আসিনি। আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

অলকা বল্লে, "সে ত এখন হবার জো নেই। যদি কোনো দিন ঋণ শোধ করতে পারি তবেই যাব। তুমি পিতৃআদেশ পালন করে পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছ, আমি পিতৃঋণ শোধ না করে তোমার সংসার দখল করি কি বলে?"

নদীর স্রোতের মত আজও মানুষের মন বদ্‌লেছিল, কিন্তু সে অন্য দিকে।

শ্রীশান্তা দেবী।

তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর

[জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত]

৪৬ অধ্যায়।

সেরার যোদ্ধ পুরোহিতগণ।

তিব্বতে দুই শ্রেণীর পুরোহিত দেখিতে পাওয়া যায়—পণ্ডিত পুরোহিত, যোদ্ধ পুরোহিত। ইহাদিগকে যথাক্রমে "লবনর" ও "থাবটো" বলে। প্রথম শ্রেণীর পুরোহিতগণ সেরায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসিয়া থাকে। মাসে তাহাদের ৩ হইতে ৮ ইয়েন পর্যান্ত ব্যয় করিতে হয়। সেরাবিহারে ২০ বৎসর বাস করিয়া তাহাদের বৌদ্ধশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা করিতে হয়। কিঞ্চিৎ লেখাপড়া না শিখিয়া কেহ সেরাবিহারে আসে না—সুতরাং ৩৫।৩৬ বৎসরের পূর্ব্বে কেহ এখানকার বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতে পারে না। যাহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান তাহারা ২৮ বৎসরের মধ্যে এখানকার পাঠ সমাধান করে।

যোদ্ধ পুরোহিত অর্থাৎ পড়ায়ে লামাদের কিছুমাত্র ব্যয় করিতে হয় না। পড়াশুনা তাহাদের কাজ নয়, তাহারা চারিদিক হইতে চমরীর করীষ সংগ্রহ করে কিম্বা কিচু-নদীর তীর হইতে কাষ্ঠ বহন করিয়া আনে। ইহারা পণ্ডিত লামাদের ভৃত্যের কাজ করে। ইহা ব্যতীত ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, শিঙ্গা, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের চর্চ্চাও ইহাদিগকে করিতে হয়। ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পূজার আয়োজন করা ইহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। প্রতিদিন নিকটস্থ পর্ব্বতে গিয়া ইহাদের পাথর ছোড়া, পাহাড়ে উঠা, লম্ফ দেওয়া প্রভৃতি অভ্যাস করিতে হয়। মাঝে-মাঝে উচ্চস্বরে গান করিয়া গলা সাধাও ইহাদের কাজ। এদিকে রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা ত আছেই। লড়াই করিতে শিক্ষা করাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পাঠকপাঠিকাগণ হয়ত ভাবিতেছেন যে পুরোহিত-দিগের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় কি প্রয়োজন? প্রয়োজন কত তাহাও বলিতেছি। বড় বড় লামারা যখন দূরদেশে ভ্রমণে বহির্গত হন তখন ইহারা প্রহরী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। ইহারা অত্যন্ত সাহসী। স্ত্রীপুত্র না থাকাতে সংসারে কোন বন্ধনই নাই—তাই প্রাণ দিতে ইহাদের

কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। ইহাদের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা তিব্বত রাজ্যে নাই—ইহাদের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহারা বড় কলহপরায়ণ, ইহারা কেবল অর্থের জন্য যুদ্ধ করে না। সুন্দর সুন্দর বালক চুরি করা ইহাদের বিদ্যা আছে, সেইজন্য সর্ব্বদাই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডাকিলে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তাহা হইলে তাহাকে বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়—এ বড় লজ্জার কথা। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত প্রধান ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে কোন-প্রকার অন্যায় উপায় গ্রহণ করা না হয় তাহা দেখিয়া থাকেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধ কোথায় এবং কোন্ সময়ে হইবে তাহা ঠিক হইলে বিবদমান ব্যক্তিদ্বয় তথায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়। সচরাচর বিকালেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া থাকে। মল্লযুদ্ধে তরবারি ব্যবহৃত হয়। যদি কেহ কোন-প্রকারে রীতিবিরুদ্ধ কাজ করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণহানি হইলেও মধ্যস্থরা কোন-প্রকারে বাধা দেন না। যদি উভয়েই বীরের মত যথারীতি লড়াই করে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কেহ আহত হইলেই মধ্যস্থরা যুদ্ধ স্থগিত করিয়া দেন—এবং উভয়ের ভিতর শান্তি স্থাপন করিয়া দেন। তখন তাহারা লাসায় গিয়া একপাত্রে মদ্যপান করিয়া সদ্ভাব স্থাপন করে। সেরা বিহারে মদ্য পান করিবার বিধি নাই—কিন্তু লাসায় গিয়া লামাগণ প্রচুর মদ্য পান করিয়া অনেক কুকার্য্য করিয়া থাকে।

আমার যে কিঞ্চিৎ ডাক্তারি বিদ্যা আছে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন হইতে সেরাবিহারে আমার যে পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইল তাহা আর বলিবার নয়। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার সময়, বা অন্য কোন কারণে কেহ আহত হইলেই আমার নিকট উপস্থিত হইত। কি আশ্চর্য্য! আমি অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইতাম। আমার মনে হয় সুসভ্য অপেক্ষা অসভ্য লোকেরা সহজেই আরোগ্যলাভ করে। আমি হাড় সরিয়া গেলেও অতি সহজেই ঠিক করিয়া দিতাম। আমাকে সেরা বিহারের সকলে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত। আমি কেবল চিকিৎসা করিতাম না, বিনামূল্যে ঔষধও বিতরণ করিতাম। এই কারণে সকলে আমার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। সকলেই আমায় দেখিবামাত্র জিহ্বা বাহির করিয়া অভিবাদন করিত। তাহারা দেশীয় চিকিৎসকের নিকট সহজে যাইত না। আমি যোদ্ধা লামাদিগের বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম, ইহারা বড় সরল-বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ। তিব্বতের বড়লোকদের চেয়ে ইহারা অনেক ভাল। ইহারা যথার্থই বিশ্বাসী বন্ধু।

আমি প্রায় ১০ মাস ক্ষৌর করি নাই। একদিন একজন লামাকে আমার কেশ ও দাড়ি কাটিয়া দিতে বলিলাম। শ্মশ্রু এখানে এক গৌরবের বস্তু। আমার কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি মনে করিল আমি বোধ হয় তামাসা করিতেছি। তার একান্ত অনুরোধে আমার দাড়ি কাটা হইল না। এদেশের লোক দাড়ি এত ভালবাসে যে ঔষধ দিয়া দাড়ি গজাইবার জন্য আমায় কতবার অনুরোধ করিয়াছে।

আমি ত পড়াশুনা করিতে আসিয়াছি। বিহারের নিয়মানুসারে এক টুপী, এক জোড়া জুতা ও এক ছড়া জপের মালা কিনিলাম। পুরোহিতের পোষাক পাইয়াছিলাম, সুতরাং সেটা আর কিনিতে হইল না। আমি প্রাথমিক পরীক্ষা দিবার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাকে পরীক্ষা করা হইল না। তখন সে-দেশের উৎকৃষ্ট চা লইয়া প্রধান শিষ্যদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমায় দেখিয়া বলিলেন "তোমাকে মঙ্গলিয়ানের মত দেখছি, তুমি কোথা হতে আসছ?" আমি মঙ্গলিয়ান নই বলিলাম। তখন তিব্বতের অনেক ভৌগোলিক প্রশ্ন করিলেন। আমি সেই দেশের মধ্য দিয়া পদব্রজে আসিয়াছি, সুতরাং ভূগোলের পরীক্ষায় অতি সহজে উত্তীর্ণ হইলাম। আমি বিহারে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলাম। পরীক্ষক মহাশয়কে জিহ্বা বাহির করিয়া অভিবাদন করিলাম। তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমার মস্তকে রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমাকে দুই হাত পরিমাণ এক টুকরা লাল কাপড় গলায় বাঁধিবার জন্য দেওয়া হইল। ইহাই সেখানকার ছাত্রের চিহ্ন। ইহার পর প্রধান পুরোহিতের নিকট হইতেও অনুমতি পাইলাম। এখন আমি তর্কশাস্ত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আমি নানা বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিলাম এবং বিদ্যাশিক্ষায় মন দিলাম।

আমি যে-ঘরে থাকিতাম, তার ঠিক বিপরীত দিকে একজন বিপুলদেহ লামা বাস করিতেন। একদিন সে ব্যক্তি আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে "আমার এক শিষ্যের মুখে শুনলাম তুমি ডাংথং হতে তাঁদের দলের সঙ্গে শাক্যবিহারে এসেছিলে—তুমি ত ডাংথংএর লোক নও। আমি শুনছি তুমি চীন।" আমি দেখিলাম, এ ব্যক্তি ধরিয়া ফেলিয়াছে, আর সত্য গোপন করা চলে না, কাজেই বলিলাম "আমি তিব্বতের লোক নই।" সে ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হইয়া বলিল "কি সর্ব্বনাশ করেছ তুমি! কেন এখানে ভর্ত্তি হয়েছ—কেন এ প্রতারণা করেছ? চীন দেশের লোকেরা অন্য বিভাগে পড়ে—একথা প্রকাশ হলে মহা অনর্থ উপস্থিত হবে।" আমি বলিলাম "পথে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, ব্যয়ভার বহন করতে পারি না বলে এখানে এসেছি, যা হবার হয়েছে, আমায় দয়া করে এখানে থাকতে দিন।" তিনি বলিলেন "যদি কেহ না আপত্তি উত্থাপন করে থাকতে পার।

কেহ কিছু বলিল না, আমিও নির্ব্বিবাদে থাকিয়া গেলাম। আমি দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পড়িতে লাগিলাম—হঠাৎ আমার দুই কাঁধ ফুলিয়া উঠিল, আমি নিজেই অস্ত্র করিলাম, নিজেই ঔষধ আনাইয়া প্রলেপ দিয়া সুস্থ হইলাম।

৪৭ অধ্যায়।

তিব্বত ও উত্তর চীন।

তখন চীনে বক্সার-যুদ্ধ চলিতেছিল। ৭ই এপ্রিল চীন-সম্রাটের কল্যাণার্থ এক বিশেষ পূজার আয়োজন হইল। আমি তাহা দেখিতে গেলাম। কেবল সেরা বিহারে নয়, তিব্বত রাজ্যে যেখানে যত মন্দির আছে সর্ব্বত্র এই মহা-পূজার আয়োজন। আমাদের বিহারে ৭দিন পূর্ব্ব হইতেই লামারা গোপনভাবে নানাপ্রকার ক্রিয়াকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম চীনে বড় অশান্তি। বিদেশী জাতিদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে; এবং চীনেরাই এই যুদ্ধে পরাজিত হইতেছিল। যাহাতে চীন-সম্রাটের জয় হয়, এই কামনায় তিব্বতের মন্দিরে মন্দিরে পূজার আয়োজন। আমি সমুদায় ঘটনা জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু কেহ আমায় কিছুই বলিতে চায় না। সকল ব্যাপারই সংগোপনে চলিতেছিল। সেরা বিহারের এক প্রশস্ত গৃহে পূজার আয়োজন হইল। পূজার প্রারম্ভে এক মিছিল বাহির হইল প্রথমে বাদ্যকরগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে চলিল; তাহাদের পশ্চাতে ধূপ ধুনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লইয়া আর-এক দল অগ্রসর হইল; তাহার পশ্চাতে একদল সঙ্গীনধারী, সঙ্গীনগুলির নীচে ১৬ হাত চীনদেশীয় রেশমি কাপড় বাঁধা; চতুর্থ দলে ত্রিকোণ টেবিলের উপর মাখমের নির্ম্মিত নানা-বিধ মূর্ত্তি চলিল; তাহার পশ্চাতে ময়দা মাখম ও মধু দিয়া গড়া অনেকগুলি রক্তবর্ণ মূর্ত্তি চলিল; সর্ব্বশেষে অতি উজ্জ্বল শোভন পরিচ্ছদ পরিয়া ২০০ লামা পদব্রজে অগ্রসর হইল, ইহাদের মধ্যে ১০০ জনের হস্তে ঢাক, ১০০ জনের হস্তে করতাল; এইবারে প্রধান লামা অগ্রসর হইলেন, তাঁহার শিষ্যদল পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। মোটের উপর দৃশ্যটি বড়ই জমকাল। লাসা হইতে দলে দলে লোক এই দৃশ্য দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিছুদূর গিয়া এক পর্ণকুটীরের সম্মুখে গিয়া সকলে উপস্থিত হইল। প্রধান পুরোহিত সেই-সকল মাখম ও ময়দার মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল আর ২০০ লামা উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ঢোল করতাল বাজিতে লাগিল। প্রধান পুরোহিত যেন তাঁর জপের মালা সেই পর্ণকুটীরের দিকে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলেন, অমনি সেই-সকল সঙ্গীন ও মাখম-ময়দার মূর্ত্তি সেখানে ফেলা হইল। তারপর সেই চালা ঘর-খানিতে আগুন লাগান হইল। অমনি সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "ঠাকুরের জয় হবে।" পরদিন আমাদের বিহারের পুরোহিতগণ লাসায় দলাইলামার কল্যাণার্থ এক মহাপূজায় যোগ দিতে গেলেন। প্রায় মাসাবধি এই পূজা চলিল। আমিও লাসায় গিয়া এক নেপালী সওদাগরের গৃহে আশ্রয় লইলাম। লাসায় চীনের বকসার-যুদ্ধের কিছু কিছু সংবাদ পাইলাম; সেইসঙ্গে কত যে অদ্ভুত কথা প্রচারিত হইতেছে শুনিয়া ভারি কৌতুক বোধ হইল। নানা জনের মুখে নানা কথা, সবই আজগুবি কথা। যাহোক তথ্য এইটুকু সংগ্রহ করিলাম যে চীনেদের

সহিত বিদেশীদের যুদ্ধ বাধিয়াছে। আমি যে-নেপালীর বাড়ীতে বাস করিতেছিলাম, সে দেশে গেল, আমি তার হাতে শরৎচন্দ্রদাসকে এবং জাপানে বন্ধু হিগোকে পত্র দিলাম। আমার সৌভাগ্যবশতঃ পত্রদ্বয় যথাস্থানে পৌঁছিয়াছিল।

এই "চোয়ানজো" অর্থাৎ দলাইলামার কল্যাণার্থ যে ক্রিয়া কর্ম্ম ও পূজা, এমন ব্যাপার আমি কখন দেখি নাই। শাক্য-মন্দিরে এই-সকল অনুষ্ঠান হইল। এখানে পুরোহিত ভিন্ন অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। মন্দিরের ভিতর দলাইলামা এবং প্রধান পুরোহিতগণ ছাড়া আর কেহই যায় না। প্রায় ২০ হাজার পুরোহিত এই ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল আর দর্শকও ২৫ হাজার হইবে। ভোর ৫টার সময় বাঁশী বাজাইয়া পুরোহিতগণকে মন্দিরে সমবেত হইতে আহ্বান করা হইত। তাহারা আসিয়া শাস্ত্র পাঠ করিত। আট ঘণ্টা অন্তর প্রত্যেককে মাখনমিশ্রিত চা দেওয়া হইত। এই ২০ হাজার লামা সকলেই পুরোহিত নয়, ইহার মধ্যে যোদ্ধ পুরোহিত এবং বাজে লোকও অনেক ছিল, তাহারা কেবল আহারের চেষ্টায় আসিয়াছে—তাদের ভিতর গাম্ভীর্য্য কিছুমাত্র দেখিলাম না; এদিকে শাস্ত্র পাঠ হইতেছে, ওদিকে তারা মারামারি ঝগড়া ঠাট্টা তামাসা অশ্লীল আলাপ সবই করিতেছে। একজন শান্তিরক্ষক লামা দাঁড়াইয়া আছে, সেব্যক্তি গোলোযোগ দেখিলেই আচ্ছা করিয়া বেত লাগাইতেছে। এ-ব্যক্তি অত্যন্ত নির্দ্দয়রূপে প্রহার করে, মার খাইয়া যদি কেহ মারিয়া যায় তাহাতে দৃক্‌পাত নাই, যদি কেহ মরিয়া যায় ত তাহার দেহটা শকুনির পেট ভরাইবার জন্য ফেলিয়া দেওয়া হয়।

যোদ্ধ লামারা প্রাতে দুই ঘণ্টা করিয়া যুদ্ধ অভ্যাস করে। সেই সময় গমের রুটি বা ভাত মাংস প্রভৃতি তাহারা বিনা মূল্যে পায়। ইহাঁরা এই সময় ধনীদিগের নিকট হইতে বিস্তর দক্ষিণা পাইয়া থাকে। কখন কখন এক-একজন ৫০ ইয়েন পর্য্যন্ত দক্ষিণা পায়। এই বিষয়ে তিব্বতের ধনীগণ মুক্তহস্ত। সময়ে সময়ে এক-একজন ৮০০০।৯০০০ ইয়েন পর্য্যন্ত দক্ষিণার জন্য ব্যয় করে। মঙ্গোলিয়া হইতেও এইজন্য টাকা আসে। সেবার একজন রুষিয়ার চর এই দলের ভিতর ছিল; এই ব্যক্তিও খুব দক্ষিণার জন্য ব্যয় করিত। এইরূপ দানে কি পুণ্য আছে? কখনই নয়। বৎসরের মধ্যে এই সময়টা লামাদিগের স্ফূর্ত্তির সময়। হাতে দুপয়সা পাইয়া এই সময় তাহাদের বদ্‌মায়েসীও খুব বাড়িয়া উঠে। এ সময় যত দ্বন্দ্বযুদ্ধ মারামারি হয় এমন কোন সময় নয়। কিন্তু বড় আশ্চর্য্য, লাসায় এসব মল্লযুদ্ধ হয় না। সব তোলা থাকে, যে যার আপন আপন বিহারে গিয়া সময়-মত লড়াই করে—কিন্তু লড়াইটা করাই চাই। লাসার বিচারকটা বড় কড়া লোক, তাই সেখানে পারকপক্ষে কেহ যুদ্ধ করে না।

এই মহাপূজা শেষ হইবার পূর্ব্বদিন এক মিছিল বাহির হইল। প্রথমেই ৪জন ৪ দেবতার সাজে সজ্জিত হইয়া আসিলেন। তার পশ্চাতে ৮ জন শয়তানের মূর্ত্তি। সঙ্গে ৪০০০।৫০০০ পুরোহিত। তারপর কত বাদ্যকর, কত ধনরত্ন সুগন্ধ সাজসজ্জা বহন করিয়া দলে দলে লোক, কত-প্রকার যে মূর্ত্তি চলিয়াছে তার সংখ্যা নাই। মিছিলটি ২—২॥০ মাইল ব্যাপিয়া চলিয়াছে। আমি এ দৃশ্য আর পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। কি সমারোহ! কি জনসমাগম! শুনিয়াছি কে স্বপ্নে স্বর্গে এরূপ দৃশ্য দেখিয়া এইপ্রকার পূজার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

৪৮ অধ্যায়।

সেরা কলেজে প্রবেশাধিকার।

আমি এই উৎসব-ব্যাপার ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই—কারণ আমাকে পড়াশুনায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত। সেরা কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে সেখানকার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হয়। আমি দিবানিশি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলাম। তখন আবার নিজেই নিজের চিকিৎসা করিতে হইল, ঔষধ আনিয়া খাইয়া সুস্থ হইলাম। সেখানকার লোকেরা মনে করিল আমি "মস্ত ডাক্তার", নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে পারি। তখন হইতে আমাকে রীতিমত চিকিৎসক হইয়া দাঁড়াইতে হইল।

১৮ই এপ্রিল তারিখে অন্যান্য পরীক্ষার্থীদিগের সহিত আমায় পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইতে হইল। আমার সহিত ৪০ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত—লিখিত এবং মৌখিক উত্তর-

বিধ পরীক্ষায় পাস হইলাম। আমি যতদূর ভাবিয়াছিলাম পরীক্ষা ততদূর শক্ত হয় নাই, যদিও ৪০ জনের মধ্যে কেবল ৭টি পাস হইল। এই ৭ জনের মধ্যে কয়েকটি যোদ্ধ পুরোহিত ছিল। ঋণগ্রস্ত হওয়াতে ইহারা কঠিন পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষা দিয়াছে। মাসে দুই এক ইয়েন করিয়া ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়। এই বৃত্তির জন্যই ইহারা পরীক্ষা দিয়াছে। পরীক্ষায় পার হইয়া আমি প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। ছাত্রগুলি নিতান্ত বালক নয়, ১৫।১৬ বৎসর হইতে ৪০।৫০ বৎসরের ছাত্র পর্য্যন্ত আমার শ্রেণীতে পড়িতেছিল—ইহাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় বৌদ্ধধর্ম্মের মতবাদ। ইহাদের পাঠের পদ্ধতি কিছু নূতন রকমের। এমন উৎসাহের সহিত প্রশ্নোত্তর চলিতে থাকে যে মনে হয় যেন তুমুল বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছে। এই প্রশ্নোত্তর-ব্যাপারটি ভারি চমৎকার। প্রবল উৎসাহে উচ্চস্বরে যেরূপ ভাবে প্রশ্ন করা হয় তাহা বড়ই মজার। ছাত্র একভাবে বসিয়া থাকে, প্রশ্নকারী তাহার সম্মুখে বামহস্তে জপের মালা লইয়া প্রশ্ন করিতে থাকে। প্রশ্ন করিতে করিতে ছাত্রের দিকে একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইয়া প্রশ্নকারী ডান হাতের উপর বামহাত সজোরে ঠুকিয়া বলিয়া উঠেন "জগতের প্রত্যক্ষ সত্যের সাহায্যে এস আমরা তর্কে প্রবৃত্ত হই"। তারপর ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইয়া যায়। কিরূপভাবে প্রশ্ন হইয়া থাকে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রশ্ন—বুদ্ধ মানব না দৈবশক্তিবিশিষ্ট দেবতা ছিলেন? তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই?

উত্তর—বুদ্ধ দেবতা ছিলেন বটে, তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন।

উত্তরের মধ্যে যদি কিছু ভুল থাকে তাহা হইলে প্রশ্ন করিয়া করিয়া বেচারাকে আপনার কথার জালে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়।

অধিকাংশ সময়ে প্রশ্নকারী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন, ছাত্রও সেইরূপ উত্তেজিতভাবে উত্তর দিয়া থাকেন। তখন তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, যে, তাহারা ভয়ানক ঝগড়া করিতেছে, কারণ কেবল কথার যুদ্ধ নয়, রীতিমত যষ্টি-চালনাও হইয়া থাকে। বিশেষভাবে পড়াশুনা না থাকিলে এই-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। বিশ বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিলে কেহ সেরা কলেজের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি পায় না। এইরূপভাবেই পুরোহিতগণ এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই প্রশ্নোত্তর ব্যাপার এমন উৎসাহের সহিত চলে, যে, দর্শকগণ পর্য্যন্ত প্রচুর আনন্দ এবং শিক্ষালাভ করেন। সেরা বিদ্যালয়ের খ্যাতি এরূপ সুদূরবিস্তৃত যে শত শত ছাত্র মঙ্গোলিয়া হইয়া তিব্বতে শিক্ষার জন্য আসিয়া থাকেন। আমি যখন ছিলাম তখন সেরা বিদ্যালয়ে ৩০০ মঙ্গোলিয়ার শিক্ষার্থী ছিলেন। মঙ্গোলিয়া হইতে শত শত লোক অন্যান্য বিষয়েও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিব্বতে আসিয়া থাকেন। এদেশে যাহারা পণ্ডিত তাহারা যুক্তি-তর্কে অদ্বিতীয়।

এই প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শিক্ষাদান যেখানে-সেখানে হয় না। সচরাচর প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যভূষিত কোন স্থানে বৃক্ষের ছায়ায় সকলে সমবেত হয়। বৃক্ষের তলদেশ শুভ্র বালুকায় আচ্ছাদিত করা হয়—সেখানে সকলে উপবেশন করে। এখানে শিক্ষা সমাপন হইলে "সত্যের উদ্যান" নামে সুন্দর ফুলের বাগানে আরও উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা হয়, এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে নানা প্রশ্ন করিয়া থাকে। ইহা শিক্ষার অতি উৎকৃষ্ট উপায়। অন্যত্র একজনই প্রশ্ন করে, এবং একজনেই উত্তর দেয়, কিন্তু বাগানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রশ্ন করিতে পারে। এই সভায় যে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হয় তাহা অবর্ণনীয়।

আমি এই সেরা বিদ্যালয়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিলাম। সেরা কলেজের এক অদ্ভুত নিয়ম আছে, নূতন ছাত্রদিগকে তথায় গিয়া দুইদিন অগ্নির জন্য কাষ্ঠ ভিক্ষা করিতে হয়।

শ্রীহেমলতা দেবী।
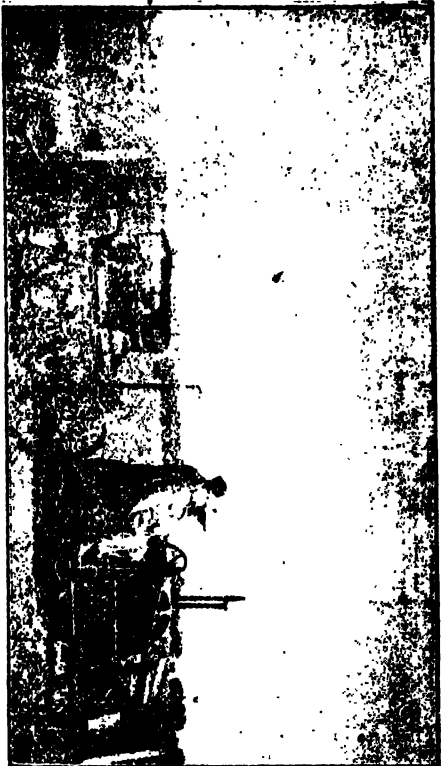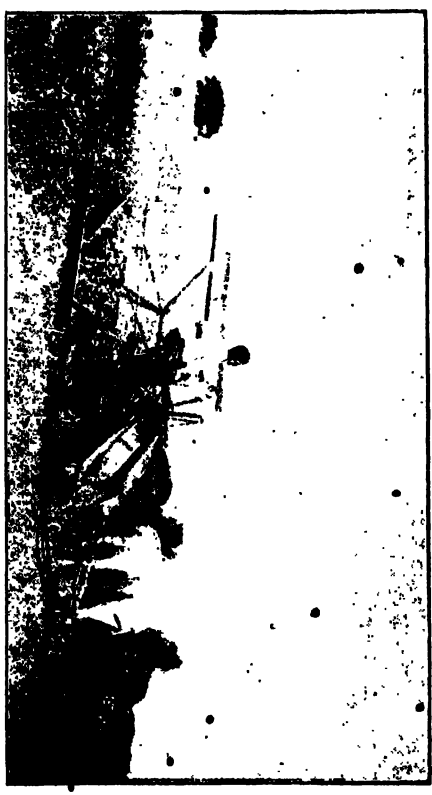
—

তিন-ফলা লাঙল কেরোসিন-জ্বালানি কলে চালিত।
(স্পেনে ধানের চাষ।)

শস্য কাটিয়া আঁটি বাঁধিবার কল।
(স্পেনে ধানের চাষ।)

অতিকায় কলে ধান আছড়ানো।
(স্পেনে ধানের চাষ।)

ক্ষেতে বিধে দেওয়া।
(স্পেনে ধানের চাষ।)

শিশুদের শহর।
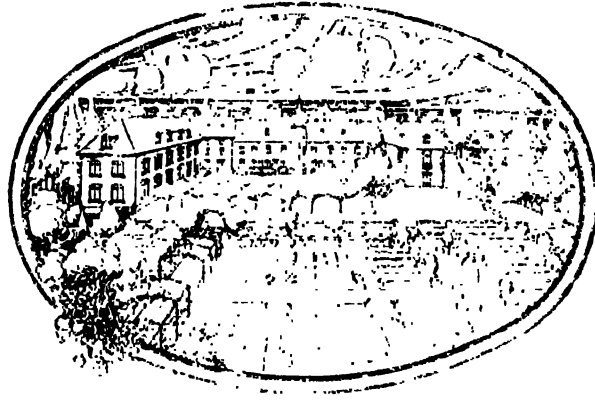
ফরাশীরা বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে অনাথ দশ লক্ষ শিশুর বাসের জন্য এইরূপ একটি উদ্যান-নগরের প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

নায়াগ্রা নদীতে নূতন প্রপাত সৃষ্টির নক্সা

সুস্থ ও অসুস্থ লোকের কথার রেকড্।

পঞ্চশস্য
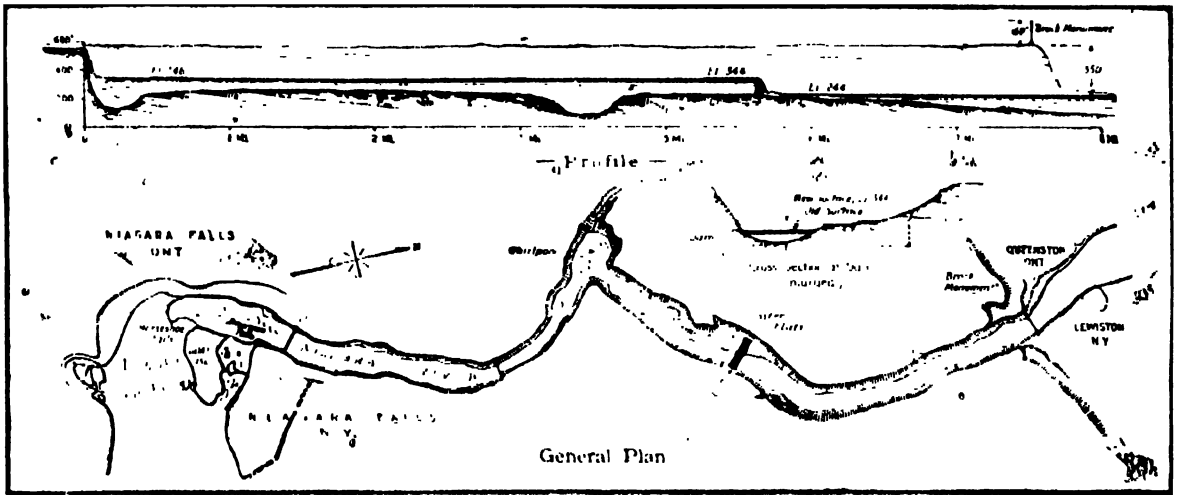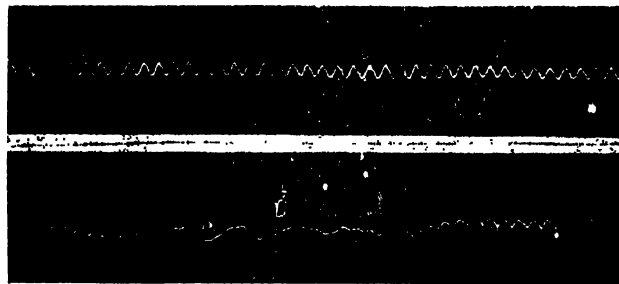
চুন-সুর্কী-জমানো তক্তার জাহাজ—

গেল বারের প্রবাসীতে আমরা জানিয়াছি যে আমেরিকায় চুন-সুর্কী জমাইয়া তক্তা করিয়া তাহাতে বাড়ী তৈয়ারি হইতেছে। সম্প্রতি লণ্ডনের টাইম্‌স্ পত্রে খবর বাহির হইয়াছে যে চুন-সুর্কী-জমানো তক্তার জাহাজ তৈয়ারি হইবে শুধু নয়, বহু পুরাকাল হইতে হইতেছে। টাইম্‌স্ পত্রের লেখক অর্ণবযানের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। তিনি বলিতেছেন যে ইস্পাতের পাতে জাহাজ তৈয়ারির বহু পূর্ব্বকাল হইতে কংক্রীটের তক্তায় জাহাজ গড়া হইয়াছিল ; ১৮৪৯ সালে একজন ফরাশী প্রথম কংক্রীটের তক্তার জাহাজ গড়িয়াছিল, সেই জাহাজ এখনো সমুদ্র পাড়ি দিতেছে, প্রায় ৭০ বৎসর বয়সেও তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে নাই। ১৮৫০ সালে ফরাশী গভর্মেণ্ট ঐ জাহাজের খবর পাইয়া উহা পরিদর্শনের জন্ত এক কমিটি নিয়োগ করেন ; গভর্মেণ্টের কমিটি ও কমিশনের ফল সর্ব্বত্রই সমান, ঐ নূতনতর প্রচেষ্টা কমিটি ও কমিশনের ফল গভর্মেণ্টের সাহায্যলাভে বঞ্চিতই রহিয়া গেল। গত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কংক্রীট দিয়া নানা-রকম সামগ্রী গড়িবার সম্ভাবনা বিস্তৃতভাবে স্বীকৃত হইতে লাগিল, এবং পাশ্চাত্য দেশের নানা স্থানে নানা আকারের জাহাজ কংক্রীটের তক্তা দিয়া গড়া হইয়াছিল। ১৮৯৭ সালে রোমে ও পর বৎসর আমেরিকায় দুখানি কংক্রীট জাহাজ বাণিজ্য যাত্রায় নিযুক্ত হয়। আমেরিকার জাহাজখানি চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়াও জখম না হইয়া কংক্রীটের জাহাজের শ্রেষ্ঠতা ও উপযোগিতা প্রমাণ ও প্রতিপন্ন করিয়া দিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফ্রান্সে আর-একখানি কংক্রীট জাহাজ নির্ম্মিত হয়, তাহা এখনো অটুট থাকিয়া বরাবর কাজ চালাইতেছে। কংক্রীট জাহাজ গড়িতে কাঠের বা ইস্পাতের জাহাজের চেয়ে খরচ ঢের কম পড়ে। রোমের এক কারখানা ১৯১২ সালে ২০ খানা ছোট জাহাজ আর ভাসন্ত পুলের জন্ত ৬০ খানা পণ্টুন নৌকা কংক্রীটে তৈয়ারি করিয়াছিল। এই কারখানা ইটালির গভর্মেণ্টকেও জল-রোধক (water-tight) ঘরওয়ালা ডবল-হালের জাহাজ কংক্রীটে তৈয়ারি করিয়া যোগাইতেছে। জার্ম্মানীতে মোটর লাঞ্চ ও বজরা প্রভৃতি কংক্রীটে শতকরা ২৫ টাকা কম খরচে তৈয়ারি হইতেছে। গত দশ বৎসরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশে বহুসংখ্যক বজরা নৌকা পণ্টুন কংক্রীটে তৈয়ারি হইয়াছে। এই বজরাগুলি ১৩০ × ৩০ ফুট পর্য্যন্ত; এগুলি সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্যপণ্য ফেরি করিয়া ফিরে। নরওয়ে দেশে কংক্রীটের জাহাজের কারবার খুব ফলাও হইয়া উঠিতেছে ; সম্প্রতি ৩০০০ টনের একখানা জাহাজ গড়া হইতেছে। ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বন্দরে ৮০টন ও ৪৩ টনের দুখানা ছোট জাহাজ তৈয়ারি হইতেছে, এই গ্রীষ্মেই তাহারা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

এই-সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে জানা যাইতেছে যে কংক্রীটের তক্তায় জাহাজ-গড়ার প্রচলন ক্রমশ বাড়িয়াই চলিবে; বড় বড় ষ্টিমার ও সমুদ্র-পারানি জাহাজ কংক্রীটে তৈয়ারি হইতে পারিবে কি না তাহা কালের অভিজ্ঞতা ও প্রমাণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। কংক্রীট করিয়া জাহাজ গড়িবার সুবিধা অনেক—সহজে ও শীঘ্র তৈয়ারি করা যায়, অনায়াসে মেরামত করা চলে, অত্যন্ত ঘাতসহ অদাহ্য, তৈয়ারি করিতে খরচ কম লাগে এবং রক্ষা করিতে খরচ নাই বলিলেই হয়। কংক্রীট জাহাজের গা মসৃণ ও তেলা হয় বলিয়া এবং তাহাতে জোড় থাকে না বলিয়া জল ভেদ করিয়া চলিবার সময় বাধা অল্প পায় ; এবং ঘাতসহ বলিয়া যুদ্ধের সময় টর্পেডো হইতে কোনো ভয়ই ইহার নাই বলিলেও চলে। কংক্রীটের তক্তা খুব নমনীয় বলিয়া কাঠ বা ইস্পাতের তক্তার সকল সুবিধাও ইহা হইতে পাওয়া যায়। কংক্রীট তক্তা ইস্পাতের পাতের চেয়ে পুরু করিতে হয়, কিন্তু ৩ ইঞ্চি পুরু কংক্রীট-তক্তা ১ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাতের চেয়ে হাল্কা। সুতরাং কংক্রীটে জাহাজ গড়ার সকল দিকেই সুবিধা দেখা যাইতেছে।

নগর পত্তন—

প্রাচীন কালে গ্রাম ও নগরের পত্তনে কোনো কেন্দ্রগত উদ্দেশ্য বা শৃঙ্খলা দেখা যায় না। কতকগুলি লোক সম্পর্ক প্রণয় আত্মীয়তা বা স্বার্থের টানে একত্র বাসা বাঁধিত এবং ক্রমে সেই জায়গায় দরকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর স্থান হইতে সেখানে নূতন লোকের আমদানি হইত ও তাহাদের বংশবিস্তারে গ্রাম বা নগরের আয়তনেরও বিস্তার ঘটিতে থাকিত। ইহাতে গ্রাম ও নগরের পথগুলি সরু গলি ও আঁকাবাঁকা, আবাসগৃহগুলি ঘেঁসাঘেঁসি আলোবাতাস-শূন্ত হইয়া উঠিত। পরে যখন মানুষের মনে আবাস-স্থানের সুবিধা অসুবিধা শৃঙ্খলা পারিপাট্য প্রভৃতির বোধ জন্মিল, তখন হইতে তাহারা গ্রাম ও নগরগুলিকে বিশেষ একটি নক্সা অনুসারে পত্তন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভারতবর্ষের জয়পুর নগরের সমস্ত বড় রাস্তা সোজা ও একটা রাস্তা আর-একটার সঙ্গে সমকোণ করিয়া কাটাকাটি করিয়াছে; কলিকাতায় ও এলাহাবাদের রাস্তাগুলিকে চওড়া ও সোজা এবং বাড়ীগুলিকে ফাঁকফাঁক করিবার কাজ সুরু হইয়াছে। আমেরিকার নগরগুলি আধুনিক ; সেই সেই স্থানে আগে হইতে মতলব আঁটিয়া নগর পত্তন হইয়াছিল বলিয়া নগরগুলি পরিপাটি শৃঙ্খলায় নির্ম্মিত।

গত শতাব্দীতে বহু ভাবুক ভবিষ্যতের নগর সম্বন্ধে অনেক কল্পনা-রঙিন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এখন য়ুরোপের মহাযুদ্ধ পুরাতন নগর গ্রাম ধ্বংস করিয়া তাঁহাদের কল্পনাকে সত্যে পরিণত হইবার রাস্তা করিয়া দিতেছে। ভাবুকেরা এখন হইতে ভবিষ্যৎ নগরগুলিকে কিরূপ আদর্শে সৌন্দর্য্যে ও শিল্প-মাধুর্য্যে ভূষিত করিয়া তুলিবেন তাহার জল্পনা করিতেছেন, নগরপত্তনের ব্যাপার একটা বিশেষ বিদ্যায় পরিণত হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের ধ্বংস-শক্তির মধ্য হইতে একটি নূতন শিল্পবিদ্যা জন্মলাভ করিতেছে। যুদ্ধের অবসানে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, প্রুশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চল, পোলাণ্ড, রুশিয়া, গ্যালিসিয়া, সার্বিয়া, আলবেনিয়া, মণ্টিনিগ্রো, রুমানিয়া, তুর্কী, উত্তর ইটালী, গ্রীস, প্রভৃতি বহুদেশেই ধ্বংস-সংস্কার করিতে হইবে। তখন নূতন নগর পত্তনে স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চরিত্রসংরক্ষা, এবং সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই লক্ষ্যের প্রধান বিষয় হইবে।

বর্ত্তমান নগরগুলির বায়ু ধোঁয়া-ধূলা-গ্যাস-দুর্গন্ধে ভরা ; তাহা বাড়ী কালো কুৎসিত করে আর বাসিন্দাদের বিষে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। পল্লীগ্রাম—যেখানে প্রকৃতির শোভা সম্পদ মুক্ত অবাধে ভোগ করিবার কথা, সেখানও অস্বাস্থ্যে ও কুশ্রীতায় বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই হীনতা পরিহার করিয়া নূতন নগর শিল্পসৌন্দর্য্যে স্বাস্থ্যসম্পদে ভূষিত করিয়া তুলিবার জন্ত ফ্রান্সে বহু শিল্পবিশারদ 'নগরের পুনর্জন্ম' নাম দিয়া এক সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং ইহারই মধ্যে প্যারীতে তাহার কয়েকটা অধিবেশন হইয়া গেছে। লণ্ডনেও The International Association of Garden Cities অর্থাৎ সার্ব্বভৌম উদ্যান-নগর পত্তন সমিতি, ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে নূতন নগর পত্তনের প্রণালী ও আদর্শ আলোচনা সুরু করিয়া দিয়াছে। ইহাদের সকলের অভিমত যে, ভবিষ্যৎ নগর পত্তনে নগরবাসীর সামাজিক

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিতে হইবে। যুদ্ধে যে-সব লোকের বাড়ীঘর সম্পত্তি উচ্ছেদ হইয়াছে, তাহারা নিজেদের গভর্মেণ্টের কাছে তাহার দাবী করিতেছে; কিন্তু এইসব সমিতি বলিতেছেন, ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে বটে, কিন্তু সমাজের অসুবিধা করিয়া ব্যক্তির সুবিধা হইতে দেওয়া হইবে না; কেহ আশপাশের আলো বাতাস বন্ধ করিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী করিবেন আর তাহার আওতায় হাজার লোক বস্তীতে জড়াজড়ি করিয়া পচিবে, তাহা ভবিষ্যতের নগরে হইতে দেওয়া হইবে না; কাহারও স্বার্থ বা ব্যবসায়বাণিজ্যগত উদ্দেশ্য প্রধান হইয়া বহুর পীড়ার কারণ হইতে পারিবে না। গভর্মেণ্ট ব্যক্তির ক্ষতি যথাসাধ্য পূরণ করিয়া সমস্ত ভূমি সকলের মধ্যে সমান ভাগ করিয়া ভূমিকে সাধারণের সমান সম্পত্তি করিয়া দিবেন। কদর্য্য করিয়া বাড়ী গড়িতেও যে খরচ, সুন্দর সুশ্রী প্ল্যানে গড়িতেও সেই খরচ; সুতরাং নূতন নগরে কাহাকেও এমন কুশ্রী বাড়ী করিতে দেওয়া হইবে না যাহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও দেহ-মন-চরিত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নগরগুলিকে উদ্যান-নগর প্রণালীতে গড়িতে হইবে।

আদর্শ উদ্যান-নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবেনেজার হাওয়ার্ড, ইংলণ্ডের লেচওয়ার্থ নামক স্থানে। উদ্যান-নগর পত্তন করিবার নিয়ম এই—সহরের চতুর্দ্দিকে মাঠ ও ক্ষেত থাকিবে, কোনো কালেই সে জায়গায় কেহ বাড়ী তুলিতে পারিবে না; সহরের আয়তনের পনেরো-ভাগের এক ভাগের বেশী জায়গায় কলকারখানা হইতে পারিবে না; বাড়ীগুলি সব উঁচু পোঁতার উপর একতলা হইবে, প্রত্যেক বাড়ীর হাতার চারিদিকে বাগান থাকিবে ও বাড়ীগুলিতে আলো বাতাস জল প্রচুর পাইবার ব্যবস্থা থাকিবে; এক বাড়ীতে বহুলোক গাদাগাদি করিয়া থাকিতে পারিবে না, প্রত্যেক পরিবার স্বতন্ত্র বাস করিতে পারে এরূপ ধরণের ছোট-বড় বহু বাড়ী অল্পখরচে পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং এক শহরের সঙ্গে অপর সকল শহরের সংযোগ নানা-রকমে করিতে হইবে।

এই-সমস্ত ব্যবস্থা যেন কেহ ভাবুকের রঙিন অকেজো কল্পনা বলিয়া না ভাবেন। বহু প্রাচীন কালেও এরূপ উদ্যান-নগর অন্য দেশে ছিল জানা গেছে। চীনে পিকিনের কাছে ওয়াং-মো-থী নামে একটি বহু প্রাচীন উদ্যান-নগর আছে, তাহাতে পল্লীগ্রামের সমস্ত শ্রী ও সহরের সমস্ত সুবিধা একত্র পাওয়া যায়। গত শতাব্দীতে য়ুরোপে সার্ব্বভৌম উদ্যান-নগর পত্তন সমিতি গঠিত হইয়া এই বিষয়ে বহু মনোরম সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে—পোর্ট সানলাইট, লেচওয়ার্থ ও লণ্ডনের সংলগ্ন হ্যাম্পষ্টেড; জার্ম্মানীতে—ড্রেসডেনের সন্নিকট হেলেরো, ষ্ট্রাস-বুর্গের সন্নিকট ষ্টকফেল্ট, গুষ্টো, ওয়াণ্ডস্‌বেক; এবং হলাণ্ড, ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় এইরূপ উদ্যান-নগর বহু আছে। আমাদের দেশেও ইহার পত্তন সুরু হইয়াছে—এলাহাবাদের জর্জটাউন, বৈদ্যনাথ দেওঘরের পল্লীগুলি অনেকটা এই প্রণালীর অনুগত।

উদ্যান-নগরের সমর্থকেরা বলেন এই কার্য্যসম্পাদনের প্রধান অন্তরায় দেশের আইন-প্রণেতারা। তাহারা এমন সতর্ক যে ভীরু হইয়া পড়ে, এমন কি তাহাদিগকে বোকা বলাও চলে। মানুষের প্রকৃতিগত ও সমাজগত নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টতা অতিক্রম করিয়া দুর্গন্ধ কুদৃশ্য ধূমাচ্ছন্ন নগরগুলিকে সুন্দর শোভন স্বাস্থ্যকর করিয়া তোলা এক কঠিন ব্যাপার। যুদ্ধ এইসব জড় নিষেধস্তূপ আর কুশ্রীতা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছে। ফ্রান্সে এমন একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইতেছে যাহা কাহাকেও খাম-খেয়ালি-রকমে ঘিঞ্জি বা বড় বাড়ী গড়িতে দিবে না।

যাঁরা মনে করেন যে উদ্যান-নগর পত্তনে বহু জমি পতিত থাকিয়া অনর্থক হইবে, তাহাতে চাষবাসের জমির অভাব ঘটিবে, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া জানানো হইয়াছে যে ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ড আয়াল্যাণ্ডের সমস্ত লোককে যদি ১৩৫০টি উদ্যান-নগরে বাস করানো যায় তাহা হইলে সমস্ত দেশের মাত্র বিংশভাগ অধিকৃত হইবে—চাষের জন্য দেশের ৮০ ভাগ জমি থাকিবে।

কেমব্রিজের অধ্যাপক মার্শাল উদ্যান-নগর পত্তনের আইডিয়া প্রথম প্রচার করেন; তাঁহার ধুয়া ধরেন উইলিয়াম মরিস ও জন রাস্কিন। দেশের শহরের সমস্ত জমি সাধারণের সম্পত্তি করিয়া মিউনিসিপালিটির অধীনে জমি বিলির ব্যবস্থা করিয়া তুলিতে পারিলেই ঐসব কল্পনা-কুশল সৌন্দর্য্যরসিকদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়া উঠিবে এবং যুদ্ধ তাহার প্রধান উত্তরসাধক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

নূতন নায়াগ্রা-প্রপাত—

উদ্যোগী জাতি প্রকৃতির কোনো শক্তিকে বাজে খরচ হইতে দ্যায় না; নদীর জল বহিয়া চলে, তাহার গতিশক্তি কাজে লাগাইয়া বিদ্যুৎ-উৎপন্ন কলচালানো এখন অনেক দেশেই হইতেছে; আমাদের দেশেও কানপুরের খালের জলের স্রোতে পানচাক্কী (water-mill) ও কাবেরী প্রপাত হইতে কোলার স্বর্ণখনিতে বিদ্যুৎ জোগানো চলিতেছে। নদীর স্রোতের চেয়ে নদীর প্রপাতের বেগ ও বল বেশী। এইজন্য আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের সরকারী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত টি কেনার্ড টমসন নায়াগ্রা-প্রপাতের পরে আর-একটি কৃত্রিম প্রপাত সৃষ্টি করিবার ফন্দি আঁটিয়াছেন। এই কৃত্রিম প্রপাত সৃষ্টি হইলে কুড়ি লক্ষ ঘোড়ার জোর কাজে লাগানো যাইবে, এখন তাহা বৃথাই বহিয়া চলিয়াছে।

নদীর গর্ভে একটি খাড়া প্রাচীর গাঁথিয়া এখনকার জলের প্রবাহের চেয়ে ১০০ ফুট উঁচু করিয়া তুলিলে স্রোতের জল প্রাচীরে বাধা পাইয়া প্রাচীরের এক পাশে জমা হইয়া ফুলিয়া উঠিবে এবং উঁচু হইয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া ১০০ ফুট নীচে বেগে লাফাইয়া পড়িয়া প্রপাতের সৃষ্টি করিবে। নায়াগ্রা নদীর দুই পাড়ে পাহাড়, তাই তাহার পাড় ৩০০ হইতে ৩৫০ ফুট উঁচু; সুতরাং ১০০ ফুট নূতন প্রপাত সৃষ্টি করিলে পাড় ছাপাইবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। নদীটির গর্ভ ৫০০ফুট চওড়া, আর দুই পাড়ের মাথায় মাথায় ব্যবধান ১০০০ ফুট। নায়াগ্রা নদীর স্রোতও বিষম, প্রতি সেকেণ্ডে ২২০০০০ ঘনফুট জল বহিয়া চলে। সুতরাং নদীর গর্ভের প্রাচীরটি কত বড় ও ইহার নির্ম্মাণ কত কঠিন ব্যাপার হইবে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। ইঞ্জিনিয়ার-সাহেব তাহারও একটা আন্দাজ দিয়াছেন—প্রাচীরটি লম্বা হইবে ১২০০ ফুট, খাড়া হইবে ১৫০ ফুট; ইহার দুই পাড়ে বহুদূর ব্যাপিয়া শক্তিসঞ্চয়ের কারখানা (power-houses) বসিবে।

কথা ও রোগ—

ইহা স্থির হইয়াছে যে অনেক রোগের লক্ষণ যখন দেহের কুত্রাপি স্পষ্ট হয় নাই তখন তাহার অস্তিত্ব কণ্ঠস্বরের বিকৃতিতে ধরা পড়ে। এই স্বরবিকৃতি ধরিবার জন্য একটি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহাতে কথা বলিলে একটা পর্দায় কাঁপন জাগে আর সেই কাঁপনে চালিত হইয়া একটা সূচি একটা ঘুরন্ত ঢোলের গায়ে আঁচড় কাটিয়া কথার নক্সা আঁকে। সুস্থ স্বরের নক্সা আর রুগ্ন স্বরের নক্সা দেখিলেই বুঝা যায়; আবার কোন্ রোগে কি-রকম স্বর-বিকৃতি হয় তাহার নক্সা কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তাহাদের সঙ্গে মিলাইয়া নূতন রোগীর রোগনির্ণয়

খুব সহজেই করা যায়।" ছবিতে যে দুটি স্বর-চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে তাহার উপরেরটি সুস্থ স্বরের ও নীচেরটি Sclerosis নামক রোগের; এই রোগ অল্প বয়সের লোকেরই বেশী হয়, কেন হয় বলা যায় না; যখন ইহার লক্ষণ দেহে স্পষ্ট না হইয়াছে তখনও ইহার অস্তিত্ব স্বর-বৈলক্ষণ্য হইতে সহজে ধরা যায়; এই রোগে স্বরচিহ্ন অসম-বক্র ও হঠাৎ-কুটিল হয়, এমন হঠাৎ-কুটিলতা আর কোনো রোগে হয় না, এ রোগে হয়ই হয়।

এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধিতে স্বরবিকৃতির নক্সা লওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে কোন্ রোগ মানসিক পর্য্যায়ের ও কোন্‌টা বা স্নায়বিক পর্য্যায়ের তাহা নির্ণয় করা সহজ হইয়াছে, আগে মানসিক ও স্নায়বিক রোগ পৃথক করিয়া চিনিয়া লওয়া অনেক স্থলে কঠিন হইত। এখন হিষ্টিরিয়া ও মৃগী স্বরচিহ্ন দেখিয়া সহজেই চেনা যায়। এইরূপে নক্সা সংগ্রহ করিয়া সমস্ত-রকম রোগ অতি সহজেই নির্ণয় করা চলিবে। এক্‌স্-রে যেমন দেহের কঠিন অংশের বিকৃতি নির্ণয়ে সাহায্য করে, এই স্বরযন্ত্র তেমনি মানসিক ও স্নায়বিক বিকৃতি নির্ণয়ে কাজে লাগিবে।

গী দ্য মোপাসাঁ—

প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পলেখক গী দ্য মোপাসাঁর সম্বন্ধে দুজন ফরাশী লেখক 'মার্কিয়ার দ্য ফ্রাঁস' পত্রে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—গী দ্য মোপাসাঁর নিজের জীবনটাও একটা ছোটগল্পের মতন আবছায়া বিচিত্র রহস্যময়; কোথায় তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু তাহার ঠিক নাই—কেহ বলে নর্মাণ্ডির একটা অজ্ঞাত গাঁয়ে কুঁড়ে ঘরে তাঁর জন্ম, কেহ বলে শাতো দ্য মিরমেস্‌নিল্ প্রাসাদে তাঁহার জন্ম, আবার মৃত্যুর সার্টিফিকেটে তেস্‌রা অপর একটা জায়গার নাম আছে। কোথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তাহারও ঠিকানা নাই। তাঁহার সাহিত্য-গুরু ফ্লোবেয়ার বলিতেন "যে লোক নিজেকে আর্টিষ্ট বলিয়া প্রচার করে, তাহার জীবনযাত্রাও আর্টিষ্টের মতন হওয়া দরকার, অন্যরূপে জীবনযাপনে তাহার অধিকার নাই।" মোপাসাঁ গুরুর এই মত নিজের জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনকে সম্ভোগ করিবার জন্য বহুব্যাপক ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা এত বিচিত্র হইয়াছিল যে গল্পের ভূরি-পরিমাণ খোরাক জোগাইয়াও তাহা অফুরন্ত ও উদ্বৃত্ত থাকিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার মধ্যে পাগলামির একটু ছিট ছিল, তাহার বীজ আসিয়াছিল তাঁহার মায়ের কাছ হইতে; তাঁহার মা মতিভ্রম-বশতঃ কেবল খেয়ালী স্বপ্ন দেখিতেন; তিনি বিষ খাইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন; শেষে তাঁহার লম্বা চুল কাটিয়া তাঁহাকে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইয়াছিল—চুল গলায় জড়াইয়া তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেন।

ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের রক্তসিক্ত ভূমি হইতেই মোপাসাঁর গল্পলেখার প্রতিভা মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল; ঐ যুদ্ধে স্বদেশের দুর্গতি, স্বজাতির দুঃখ, যুবক মোপাসাঁর মনের উপর এমন চাপিয়া বসিয়াছিল যে সারা জীবনে তিনি তাহার ভীষণ স্মৃতি মন হইতে দূর করিতে পারেন নাই; এক-একটা স্বপ্ন যেমন করিয়া আমাদের বুক চাপিয়া ধরে ঐ যুদ্ধের ব্যাপারগুলা তেমনি করিয়া মোপাসাঁকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি যুদ্ধে স্বদেশের জয় নিশ্চয় মনে করিয়া সানন্দে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে স্বদেশের পরাজয় তাঁহার মনে বড় বেশী বাজিয়াছিল। তিনি যুদ্ধের সময় মাকে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

'আমাদের পলাতক সৈন্যের সঙ্গে আমিও আমাকে কোনোমতে বাঁচিয়ে এনেছি। একটা হুকুম নিয়ে সমুখ থেকে পিছনের ঘাটিতে আমাকে যেতে হল। ১৫ মাইল হাঁটলাম। সমস্ত রাত ছুটে চলে একটা পাহাড়ের গুহায় ঘুমোলাম। ভাগ্যিস আমার পা-জোড়া বেশ জোরালো আর দ্রুত তাই কোনোরকমে প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেছি।'

এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তাঁর প্রথম গল্প Boule-de-Suif অর্থাৎ মোমের বড়ি লিখিয়াছিলেন। অনেকের মতে ঐটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। সেইদিনের পশ্চাৎধাবিত শত্রুর পদধ্বনি সারা-জীবন তাঁর কানে বাজিয়াছিল; তার আতঙ্ক তাঁর অনেক গল্পেই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রতিহিংসা তাঁকে পীড়া দিত। জোলা যে বিশ্বমৈত্রী ও ক্ষমার স্বপ্ন দেখিতেন, মোপাসাঁর জাতীয় অপমানে প্রতিহিংসা-লোলুপ রচনা তাতে অনেকখানি বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল। ২২ বৎসর পরে, ১৮৯২ সালে, তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর আগে, প্রায়-পাগল মোপাসাঁ তাঁর খানসামাকে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"ফ্রাঁসোআ, তৈরি আছিস ত? আমরা চলেছি! যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে! তোতে আমাতে ত কথা আছে—একসঙ্গে প্রতিহিংসা নিতে যাত্রা করব........ প্রতিহিংসা আমরা নেবই নেব!"

ঐ দারুণ যুদ্ধে মোপাসাঁর সর্ব্বস্বান্ত হয়। তিনি সামুদ্রিক সচিবের দপ্তরে বাৎসরিক হাজার টাকা বেতনে কেরানীর কাজ লন; তারপর তিনি শিক্ষাবিভাগে বদলি হন। ঐ যুদ্ধই তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশে প্রণোদিত করে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, যে-সব সাহিত্যিক অল্প বয়সে মোপাসাঁকে জানিতেন তাঁহারা কেহই জানিতেন না যে তাঁহার মধ্যে অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভা প্রচ্ছন্ন আছে। জোলা বা জুল লেমৈৎর্ বা যেসব কাগজে তিনি কাজ করিতেন তাহাদের সম্পাদকেরা অনুমান করিতেও পারেন নাই যে ঐ চুপচাপ লোকটির মধ্যে শমীগর্ভগত অগ্নির মতন প্রতিভা লুক্কায়িত আছে। তাঁহার প্রথম গল্পই সকলকে তাক লাগাইয়া অবাক করিয়া দিয়াছিল। সেই গল্পটিই তাঁহাকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ ও সাহিত্যিক মহলে সমাদৃত এবং তাঁহার সাহিত্যসাধনার পথ সুগম ও প্রতিভা স্ফুরণের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল।

সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইয়াই মোপাসাঁ আমোদে আহ্লাদে প্রণয়কলায় আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন। অনেকে মনে করেন তাঁর জীবনের আতিশয্যই তাঁর দৈহিক ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পক্ষাঘাতের কারণ। মোপাসাঁর জীবনের এইটিই সবচেয়ে শোচনীয় বিশেষত্ব যে তাঁর প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁকে পাগলামির দিকেই টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। মোপাসাঁ ইচ্ছা করিয়া নানা রমণীর শিকার হইয়া যে খেলা আনন্দে করিতেছিলেন তাহাই তিলে-তিলে তাঁহাকে দেহে ও মনে মারিতেছিল, তবু তাইতেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু তাঁর সচেতন অবস্থায় তিনি এক-একবার এই ব্যাধবৃত্তি ছাড়িয়া মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করিতেন; কিন্তু আফিঙের মৌতাতের মতন দুঃখ পাইয়া আনন্দ সম্ভোগের নেশা তাঁহাকে মুক্তি দিত না।

চরি।

দেশের কথা

এখনো নানা স্থানে হাটবাজার লুট হইতেছে। তাহার সম্বন্ধে "নীহার" বলিতেছেন—

উপায় কি?—যেরূপভাবে হাটবাজারে লুট হইতেছে, তাহাতে শীঘ্র ইহার কোন প্রতিকার না হইলে বড়ই আশঙ্কার কথা। লবণ ও বস্ত্রব্যবসায়ীরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছে। মফঃস্বলের হাটবাজারে আর লবণ ও বস্ত্র পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। ইহাতে সাধারণের কষ্টের একশেষ হইবে। লবণ ও বস্ত্রের দুর্মূল্যতাই এই লুটের কারণ। ইহার প্রতিকারের ভার গবর্ণমেণ্ট না লইলে আর উপায় নাই। লবণসমস্যার প্রতিকার অতি সহজে হইতে পারে, যদি দীনদুঃখীদের লবণ তৈয়ারী করিয়া খাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। ইহাতে লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত দেশের লোকের লবণের অভাব অচিরে দূর হইয়া যাইবে।

বস্ত্র-সমস্যা-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব অপেক্ষা দেশের লোকের দায়িত্ব অধিক। বাড়ীতে-বাড়ীতে কার্পাস চাষ ও চরকার প্রচলন পূর্ব্বের ন্যায় করিতে হইবে। উন্নত প্রণালীর তাঁত যাহাতে প্রচুর পরিমাণে গ্রামে-গ্রামে চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে অর্থশালী ব্যক্তিদের সচেষ্ট হইতে হইবে। কাপড়ের মূল্য যে অত্যন্ত বেশী হইয়াছে, তাহার মূলে মাড়োয়ারী বস্ত্রব্যবসায়ীদের হাত। তাহারা অত্যধিক চড়াদরে বস্ত্র ছাড়িতেছে, তাই কাপড়ের দর হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে ইহার প্রতিকারের উপায় নাই।—নীহার।

কিন্তু "জ্যোতি" বলিতেছেন যে হাটবাজার লুটের কারণ বস্ত্র বা লবণের মহার্ঘতা নয়; লবণ মহার্ঘ হইলে নাকি গরিবের কিছু আসিয়া যায় না; বস্ত্র মহার্ঘ হওয়াতে নাকি মুসলমান চাষীরা আনন্দিতই হইয়াছে, কারণ ইহাতে কার্পাসের চাষ বিস্তৃত হইতেছে ও ঘরে-ঘরে চরকা তাঁত চলিতেছে।

যদি ইহা সত্য হয় ত সুখের কথা, আশার কথা। তবে লুটতরাজের যে কারণ 'জ্যোতি' দেখাইয়াছেন তাহা সত্য মনে হয় না; 'জ্যোতি' বলেন ইহা বিহারের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও লুটের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিশোধ; এরূপ অমূলক অনুমানে দেশে অসদ্ভাব ও অশান্তি বিস্তার করা হয়; আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানে অসদ্ভাব নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

লবণ ও বস্ত্রের দুর্মূল্যতা সম্বন্ধে আলোচনার সুফল ফলিয়াছে।

চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মিঃ হেটমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চট্টগ্রামের সমুদ্রজল হইতে লবণ প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স প্রার্থনা করেন। কালেক্টার সাহেব বলেন, এই বিষয় কমিশনর সাহেব বাহাদুরের নিকট লেখা হইয়াছে। কমিশনার সাহেব কালেক্টর বাহাদুরের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছেন। আবকারী বিভাগও এই প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে।—পাবনাবগুড়া-হিতৈষী।

প্রকাশ যে নোয়াখালি সন্দীপের অন্তর্গত ছত্রাখালি-অধিবাসী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম হাজ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি এক আনা সের দরে লবণ বিক্রয় করিতে এবং গবর্ণমেণ্টের সহিত দশ বৎসরের চুক্তি করিয়া শুল্ক হিসাবে এক সহস্র টাকা অগ্রিম দিতে প্রস্তুত আছেন। কর্তৃপক্ষ এই প্রার্থনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

লবণের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য দ্বারভাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটী সহরের মধ্যে চৌদ্দখানা লবণের দোকান খুলিয়াছেন। তাঁহারা টাকায় বার সের দরে লবণ বিক্রয় করিবেন। তদ্ভিন্ন চট্টগ্রামের সাধারণে যাহাতে লাইসেন্স লইয়া সমুদ্র-জলে লবণ প্রস্তুত করিতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ব্যবস্থা করা হইতেছে।

কাঁথির পাঁচ মাইল দূরে লবণ-সমুদ্র। এ প্রদেশের কেহ কেহ এ সময় লবণ প্রস্তুত জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিলে ভাল হয়।—নীহার।

সুখী হইলাম যে, গবর্ণমেণ্ট নোওয়াখালী জেলার সন্দীপ, হাতিয়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদিগকে কেবল নিজ প্রয়োজনে লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান লবণ-সমস্যার দিনে গভর্ণমেণ্টের এই সুব্যবস্থার ফলে তথাকার গরীব অধিবাসীদের বিশেষ উপকার হইবে। গভর্ণমেণ্ট এ সময় দয়া করিয়া যদি সকল স্থানের অধিবাসীদিগকে সন্দীপের ন্যায় নিজ প্রয়োজনে লবণ তৈয়ারীর অধিকার প্রদান করেন, তাহা হইলে এই দরিদ্র দেশের লোকে বাঁচিয়া যায়।

আমাদের এই হিজলী কাঁথি পূর্ব্বে "নিমক পোক্তানের" জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তখন এখানকার প্রস্তুত লবণই কত দেশবাসীর অভাব নিবারণ করিত। হিজলী-কাঁথি একরূপ লবণ-সমুদ্রের উপরই অবস্থিত। গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া এ সময় যদি এ অঞ্চলবাসীদিগকে উক্তরূপ লবণ তৈয়ারী করিবার অধিকার প্রদান করেন, তাহা হইলে এতদঞ্চলের গরীব অধিবাসীদের বিশেষ উপকার হইবে। আমরা এ বিষয়ে আমাদের গভর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।—নীহার।

লবণের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এজন্য দেশবাসী অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট নোয়াখালী জেলার সন্দীপ, হাতীয়া প্রভৃতি সমুদ্র উপকূল-বাসীদিগকে লবণ প্রস্তুতের অধিকার দান করিয়াছেন। নিজের জন্য যতটুকু প্রয়োজন গৃহস্থগণ মাত্র তত-টুকু লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। বিক্রয়ের জন্য লবণ প্রস্তুতের অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। সরকার যখন আবশ্যক অনু-রূপ লবণ প্রস্তুতের অধিকার প্রদান করিলেন তখন তাহা কেবল সন্দীপ, হাতিয়া প্রভৃতি কয়েক স্থানে সীমাবদ্ধ না করিয়া বাঙ্গালার যে যে স্থানে লবণ প্রস্তুতের সুযোগ আছে সেই-সকল স্থানের অধিবাসী-দিগকে এই অধিকার প্রদান করিলে ভাল হইত। লবণের মূল্যা-ধিক্যের জন্য দেশের সকল স্থানের অধিবাসীরাই অসুবিধা ভোগ করিতেছে।—মোহাম্মদী।

গভর্ণমেণ্ট সন্দীপের অধিবাসীদিগকে তাহাদের প্রয়োজন-মত লবণ তৈয়ার করিবার আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু লবণ-বিভাগের কর্ম্ম-চারিগণ তাহাদিগকে জ্বালাতন না করিলেই মঙ্গল।—মোসলেম-হিতৈষী।

দেশের এই দারুণ দারিদ্র্য ও অভাবের তাড়নায় দেশে কর্ম্মপ্রচেষ্টা ধীরে-ধীরে জাগ্রত হইতেছে ইহাই দুঃখের লাভ, ইহাই ভগবানের দুঃখ দিবার উদ্দেশ্য। আমরা জানিয়া সুখী হইয়াছি—

ভারতবর্ষে জাহাজ-নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। ইহা যে ভারতের পক্ষে নূতন ব্যাপার তাহা নহে। পূর্ব্বে মোসলমান-শাসনকালে এই ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে জাহাজ প্রস্তুত হইত এবং সে-সকল জাহাজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গতায়াত করিত। কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুকম্পায় তাহা লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারত-সরকার তাহার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া ভারতে আবার জাহাজ প্রস্তুতে মনোযোগী হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মিউনিশন বোর্ডের জাহাজ-নির্ম্মাণ বিভাগ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাতে ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। লেফটেনান্ট কর্ণেল ম্যাক-গ্রিগর কণ্ট্রোলার রূপে তাঁহার নিজের ষ্টাফে অনেক বিশেষজ্ঞ লোক গ্রহণ করিয়াছেন এবং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে-সকল জাহাজ নির্ম্মিত হইবে তাহার নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, ভারতে ১,৬০০ টন পর্য্যন্ত মালবাহী জাহাজ নির্ম্মিত হইবে। ভারতের পূর্ব্বসম্পদ আবার ভারত ফিরিয়া পাইতেছে ইহার বাড়া সুখের কথা আর কি হইতে পারে? ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের যে-সকল উপাদান পাওয়া যায় তাহা লইয়া এবং ভারতের টাকা খাটাইয়া এই ভারতবর্ষে যদি জাহাজ নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে যে অনেক সুবিধা হইবে তাহতে সন্দেহ নাই।—মোহাম্মাদী। জ্যোতি।

ভারতবাসীর মধ্যে মথুরার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বি, বি. রায় জাহাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া "নেভাল আর্কিটেক্ট" উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

সকলেই অবগত আছেন চট্টগ্রামের সদাগর-সমাজের মুখোজ্জলকারী উদ্যমশীল ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আবদুল রহমান দোভাসী মহাশয় এই পর্য্যন্ত ৫ খানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত এক বৎসরেই তাঁহার দু'খানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর দুইখানি বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। একখানি অতি বৃহৎ হইবে, সেইরূপ বড় পালের জাহাজ এযাবৎ আর কোন বন্দরে প্রস্তুত হয় নাই। সেইটি দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফুট হইবে। প্রায় ত্রিশ হাজার মণ মাল বহিতে পারিবে। আর-একখানিও ২০ হাজার মণ মাল বহিতে পারিবে। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া হালিসহরের ধনী শ্রীযুক্ত ওছমিঞা সদাগর একখানি ও আমাদের কুণ্ড পরিবারের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার রায় একখানি বানাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।—ত্রিপুরা-হিতৈষী। জ্যোতি।

এ সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। দেশের ধনীগণ ব্যবসায়ে যে পরিমাণ অর্থ খাটাইবেন, সেই পরিমাণে দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কারবারই অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ। পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশের লোকেরা ঘরে টাকা মজুত করিয়া রাখেন না, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব সঞ্চিত টাকা ব্যবসায়ে খাটাইয়া বিপুল ধনের অধিকারী হন, পক্ষান্তরে অনেক গরিব লোকও তাঁহাদের পরিচালিত কারবারে কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

কাজ আটকাইলেই বাধা দূর করিবার চেষ্টা জন্মে। কথায় বলে "হাভাত না মানে জাত"। অভাবের তাড়নায় লোককে দেশবিদেশে ছোটায়, কুসংস্কার ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করে, সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। আমরা দেশের চারিদিকে এইরূপ শুভসূচনা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হইতেছি।

ব্রাহ্মণ কায়স্থের হলচালনা—মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে, বাঁকুড়া জেলার প্রায় সর্ব্বত্র ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য কয়েকটি জেলার বহু স্থানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ছত্রী, করণ, প্রভৃতি জাতীয় বহুলক্ষ দরিদ্র কৃষিজীবী লোক বাস করেন। ইঁহারা অত্যন্ত নিঃস্ব, কুটীরবাসী ও ইঁহাদের জমির পরিমাণ নিতান্ত অল্প। সুতরাং ইঁহাদিগকে চাষের শ্রমজনক ও কষ্টসাধ্য সমুদয় কার্য্যই স্বহস্তে করিতে হয়, অথচ প্রচলিত কুপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া লাঙ্গলটি ধরিতে পান না। লাঙ্গল ধরিবার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। তাহাতে যথাসময়ে চাষ হয় না, জমিতে যতবার চাষ দেওয়া উচিত ততবার ত হয়ই না। সুতরাং ইহাদের জমিতে অন্যান্য জাতীয় কৃষিজীবীগণের জমি অপেক্ষা ফসল অনেক কম হয়। তাহার উপর লাঙ্গল ধরিবার জন্য মুনিষকে পয়সা দিতে হয়, অথচ নিজের ক্ষমতা থাকিতেও বসিয়া থাকিতে হয়। পয়সা দিলেও মজুর পাওয়া সহজ নয়।

আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণের স্বহস্তে হলচালন ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে বিহিত, অপর জাতির ত কথাই নাই। এই কথাটি সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার মানসে এবং লাঙ্গল ধরিলে জাতি যায় না ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার অভিপ্রায়ে সেটেলমেণ্টের প্রধান ডেপুটি কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় এম-এ ও সব ডেপুটি কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, মহোদয়গণ প্রমুখ কতিপয় শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভব ও উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ, রিভ্যাণুয়েসন অফিসার বৈদ্য বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, মহাশয়, অবসরপ্রাপ্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র দত্ত, ফৌজদারি আদালতের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার, কলেক্টরির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়গণ প্রমুখ কয়েকটি কায়স্থ, এবং খ্যাতনামা প্রফেসর শ্রীযুক্তবাবু শরৎচন্দ্র জানা, এম্-এসসি, বি-এল, মহোদয় এবং কলিকাতা ও মেদনীপুরে বি-এ ও আই-এ পড়িতেছেন এমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতীয় ১৫। ১৬ জন ছাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে এই সহরের পুরাতন জেলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কৃষিক্ষেত্রে, অধ্যাপক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক, ডাক্তার, উকীল, গবর্ণমেণ্ট অফিসের কর্ম্মচারী, প্রভৃতি বহুজন-সমক্ষে স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া ভূমি কর্ষণ করিয়াছেন। যে ছাত্রগুলি লাঙ্গল ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এই সহরের প্রধান প্রধান লোকের পুত্র।

পুনরায় আগামী ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার বেলা ৪টার সময় পূর্ব্বোক্ত স্থানে উচ্চ জাতীয় ও উচ্চপদস্থ বহুলোক নিজ হাতে হলচালনা করিবেন।

এইরূপ কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত না হইলে আশানুরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকনিন্দিত বহু জঘন্য কুকর্ম্মে ও পাপে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের বহুলোক লিপ্ত রহিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাহাতে কাহারও জাতি যায় না। কিন্তু শাস্ত্রসম্মত এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রশংসিত অনেক কর্ম্ম আছে যাহা করিলে আমাদের জাতি যায়। এই-প্রকারে জাতি যাওয়ার ভয়ে আমরা নানা-প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি ও বহুবিধ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতেছি। লাঙ্গল ধরিলে জাতি যায় এই কুসংস্কারে উচ্চজাতীয় দরিদ্র কৃষিজীবীগণের যত ক্ষতি হইতেছে, বোধ হয় এত আর কিছুতেই নয়। দর্পে মনে করিলে এই কুসংস্কার

অনায়াসেই তিরোহিত হইবে এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতীয় সহস্র সহস্র দরিদ্র কৃষকগণ দারিদ্র্য ও অনশনের কবল হইতে রক্ষা পাইবেন। নিবেদন ইতি।

বিনীত—
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, রামনারায়ণ চতুষ্পাঠী।
শ্রীদুর্গানন্দ সেন, মিরবাজার।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, কর্ণেলগোলা।
শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বিবিগঞ্জ।

—বাঁকুড়াদর্পণ।

ব্রাহ্মণ কায়স্থের হলচালনা—বিগত রবিবার দিবস মেদিনীপুর কালেক্টরীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের উদ্যোগে ভদ্র মহোদয়গণ পুরাতন জেলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডে হল চালনা করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থগণেরও হল চালনা যে শাস্ত্র-সম্মত তাহা জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন।

দিন দিন ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের অবস্থা যে-প্রকার হীন হইতে হীনতর হইতেছে, বিদ্যা বুদ্ধি অর্থসামর্থ্যে তাঁহারা যেরূপ দীনাতিদীন হইয়া পড়িতেছেন, হল-চালক ব্রাহ্মণ-কায়স্থেতর জাতিসমূহ সুসভ্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহাদেরই গুরু স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইতেছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের আর হলধর না হইয়া বাঁচিবার উপায় নাই। আর এ হলচালনা শাস্ত্রসম্মত। যদি শক্তিতে কুলায়, যদি কৃষকের পরিশ্রমোপযোগী সামর্থ্য ও অভ্যাস থাকে তবে এ কার্য্যে ঘৃণার কিছু আছে কি?

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু হরেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন যে বাঁকুড়া জেলায় প্রায় লক্ষাধিক এমন ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাদের দুই চারি বিঘা জমি আছে, কিন্তু অর্থসামর্থ্য না থাকায় হলচালনার অভাবে চাষ আবাদ করিতে পারেন না। কৃষকগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে থাকিতে চাষের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং ক্ষেত্র কর্ষণের অভাবে তাঁহাদের জমি হয় পতিত থাকে, নয় অসময়ে চাষের জন্য পরিমাণ-মত আবাদ ও শস্যোৎপন্ন হয় না। হতভাগ্য জীবগণকে দারিদ্র্য-নিষ্পেষণে ভিক্ষোপজীবী ও জীবন্মৃত হইয়া কালযাপন করিতে হয়। তিনি আরও জানিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ চাষের সমুদয় কার্য্য করেন। কেবল লাঙ্গলের "মুঠা"ই ধারণ করেন না। তাঁহারা সার মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া ক্ষেত্রে ফেলিয়া আসেন, বীজ ও চারা ধান্য বহন করেন, ধান্য রোপণ করেন, ধান্য কাটেন, ধান্য সমেত খড় বহন করিয়া লইয়া যান, ধান্য ঝাড়েন, ইত্যাদি চাষের সমুদায় কার্য্যই করেন, কেবল লাঙ্গল ধরিলেই জাতি যায় কেন?

হরেন্দ্র বাবুর হৃদয় বিশ্বপ্রেমে সম্পূরিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণকায়স্থগণের এই-প্রকার দারিদ্র্যে বিষম ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন এজন্য তিনি সহৃদয় মাত্রেরই অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

তিনি বলেন, ধর্ম্ম কি, সমাজ কি, তাহা বিশেষ-প্রকারে পর্য্যালোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। সমাজ-দেহে যে অসংখ্য ক্ষত তাহা ঢাকিয়া অখণ্ড বা অক্ষুণ্ণ সমাজের বা ধর্ম্মের অহঙ্কার আর চলে না। অশ্রাব্য পাপ করিয়াও তাহারা সমাজে অবিচারে চলিতেছে, তাহাতে জাতি যায় না, আর লাঙ্গলের কাঠে হস্তার্পণ করিলেই জাতি যায়! যে জাতি যাওয়ায় আত্মগ্লানি নাই—যে জাতি যাওয়ায় পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না, যে জাতি যাওয়ায় পাপ নাই, যে জাতি যাওয়ায় আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, সে জাতি যাওয়া ভাল।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

সমস্ত উদ্যমের ও কুসংস্কার-মুক্ত হইবার মূল শিক্ষা। শিক্ষার বিস্তার দেশে যত বেশী হইবে দেশের দুর্দ্দশা তত বেশী দূর হইবে। ইহার জন্য দেশে চেষ্টা যথোচিত না হইলেও কিছু কিছু হইতেছে। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক পাঠশালা হওয়া উচিত। কিন্তু "বরিশাল-হিতৈষী" এ বিষয়ে একটি অসুবিধা ও অসঙ্গতির দিকে সাধারণের ও কর্ত্তৃপক্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।—

সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকেরই ইংরেজি শিক্ষায় বিশেষ ঝোঁক। প্রাইমারী পাঠশালায় অনেকেই ছেলে পড়াইতে রাজি নহেন। প্রাইমারী স্কুলে ছেলে পড়াইলে class IIIর পরীক্ষায় পাশ না হইলে হাই স্কুলে class IIIতে ভর্ত্তি হইতে পারেনা। আর বাড়ী বসিয়া প্রাইভেট পড়িলে যোগ বিয়োগ অঙ্ক শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলেই ভর্ত্তি হইতে পারে। পাঠশালায় class III পড়িতে ৪ বৎসর কাটিয়া যায় আর বাড়ীতে ঐরূপ শিক্ষা পাইতে ২ বৎসরের বেশী সময় লাগে না। এই কারণে প্রাইমারী স্কুলগুলি দিন দিন শ্রীহীন হইতেছে। যদি প্রাইমারী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত তবে এরূপ হইত না। আমরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতে এবিষয়ে লিখিতেছি। কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে দৃষ্টি দিলে সুফল ফলিত। প্রাইমারী স্কুলগুলিকে হাই স্কুলের শাখা-স্বরূপ করা আবশ্যক, না করিলে হাইস্কুলের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামগুলির প্রাইমারী বিদ্যালয় দুরবস্থাপন্ন হইবে। ইহাতে দরিদ্র লোক নিজের ভাষাও শিক্ষা করিতে পারিবে না।—বরিশাল-হিতৈষী।

দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার আয়োজনও অল্প অল্প সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে—

শোলক, বড়পুর, ধামুরা, কাংশী, বাবরখানা, জল্লা, থানেশ্বর, মোহনকাঠি, ছয়গ্রাম, চাউকাঠি, দত্রাবাদ ও দত্তসার গ্রাম একত্রিত হইয়া এই-সকল গ্রামের ঠিক মধ্যস্থল শোফরার মাঠে একটি স্থান বাঁধিয়া একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করা স্থির করিয়া গত ২রা জানুয়ারী স্কুল আপাততঃ শ্রীযুক্ত রামচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে বসাইয়াছেন। এই স্কুলে কৃষিজীবী ব্যক্তির সংখ্যাই বেশী। বাবু উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সহস্র টাকা ও বাবু প্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২০০×১০০ হাত জমি দান করিয়াছেন। স্কুলটির নাম মধুসূদন ইনষ্টিটিউসন রাখা হইয়াছে। শোলক, বড়পুর, ও ধামুরার গণ্য মান্য বহু সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের এই স্কুলে বিশেষ সহানুভূতি আছে। সকলেই সাহায্য করিয়াছেন।—বরিশাল-হিতৈষী।

রাজদিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বগ্রামে একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, বর্ত্তমান জানুয়ারী মাস হইতেই এই স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ময়মনসিংহ সহরের মধ্য ইংরেজী স্কুলটি গত ২রা জানুয়ারী হইতে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। এ বৎসর এই স্কুলে Class IX (নবমমান শ্রেণী) পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।—ঢাকাপ্রকাশ।

এই নগরের পাট-ব্যবসায়ী বণিকগণ আগামী জানুয়ারী মাস হইতে Merchants' Institution নামে একটি উচ্চ-ইংরেজী স্কুল এই নগরের পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন।

—চারুমিহির।

গত ৩রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা ৮ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কর্ম্মকার মহাশয়ের দ্বিতল গৃহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিদ্যালয় নামক মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।—বরিশাল-হিতৈষী।

—কাশীপুরনিবাসী।

ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষের সুবিখ্যাত জমিদার রাণী দিনমণি চৌধুরাণী তাঁহার জন্মভূমি ও পিত্রালয় বরিশাল জেলার দেহেরগতি গ্রামে তাঁহার পিতার নামে একটি এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপনার্থ ২৫০০০৲ টাকা প্রদান করিবেন এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।—কাশীপুরনিবাসী।

নদীয়া নাটুদহের বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী তাঁহার জমিদারী বড়-আন্দুলিয়া গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একখানি ১৫০০৲ টাকা মূল্যের ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ী দান করিয়াছেন। —এডুকেশন গেজেট।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বরিশাল জেলার উলানিয়া নামক স্থানে উলানিয়ার জমীদার মিঞারা যে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা ইউনিভার্সিটি কর্তৃক এফিলেটেড বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে। স্কুলকর্তৃপক্ষ মেধাবী ছাত্রগণের আহার বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত।—মোহাম্মদী।

উত্তরবঙ্গে, বগুড়া জেলার মোসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য জেলার মোসলমানগণের তুলনায় অনেকটা অগ্রসর, ইহা অতীব আনন্দের কথা। বগুড়া জেলা হইতে এ সপ্তাহে আমরা আরও তিনটি নূতন হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া পরমপ্রীত হইয়াছি। একটি রামনগর খাদেমুল এসলাম সোসাইটির উদ্যোগে ধুনট থানার অধীন রামনগর গ্রামে বাঙ্গালী নদীতীরে; দ্বিতীয়টি এই থানার অধীন গোঁসাইবাড়ী নামক স্থানে। উভয় স্থানের পুরাতন মধ্য-ইংরাজি স্কুলটিকে হাইস্কুলে পরিণত করা হইয়াছে। গোঁসাইবাড়ীর মাইনর স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় জমিদার মুনশী মোহাম্মদ আমিরুদ্দীন তালুকদার সাহেব উক্ত স্কুলটিকে হাইস্কুলে পরিণত করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন শুনিয়া আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। তৃতীয় স্কুলটি নারচি গ্রামে অবস্থিত, ইহার উদ্যোগী কর্ম্মী যুবক মুনশী রজিবউদ্দীন তরফদার। তিনি এই স্কুলের জন্য কএকবৎসর হইতে যেরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় বাস্তবিক বঙ্গীয় মোসলেমসমাজে কর্ম্মজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। স্থানীয় ধনকুবের বাঁশগাড়ী-নিবাসী মুনশী দিদার উদ্দীন সাহেব স্কুলগৃহের জন্য এককালীন মঃ ৭০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এই দাতার দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল কামনা করিতেছি।—মোহাম্মদী।

সম্প্রতি অন্যান্য জেলার ন্যায় মালদহেরও শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই কারণে অধিক সংখ্যক স্কুলের দরকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভাব বোধ হইলে স্বতঃই তাহা পূরণের চেষ্টা জাগিয়া উঠে; তাই চতুর্দ্দিকে স্কুল স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইতেছে। কানসাটের অধিবাসীবৃন্দ একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুলের জন্য গত বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং এ বৎসর আরও একটি শ্রেণী বৃদ্ধি করতঃ নবম বার্ষিক শ্রেণী খুলিয়াছেন। গত বৎসর দুইজন উপযুক্ত শিক্ষক ও একজন মৌলবী এবং এবৎসর আরও দুইজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিদেশী ছাত্র ও শিক্ষকদিগের সুবিধার জন্য পৃথক পৃথক হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রাবাস (বোর্ডিং) খোলা হইয়াছে। গঙ্গা নদীর ধারেই নূতন স্কুলগৃহ (Building) ও ছাত্রাবাস তৈয়ারী হইতেছে। শীঘ্রই এই নূতন গৃহে স্কুল ও ছাত্রাবাস স্থানান্তরিত হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বে মালদহে তিনটি মাত্র হাইস্কুল ছিল, যথা—মালদহ জিলাস্কুল, নবাবগঞ্জ হরিমোহন হাই ও চাঁচোল সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে আরও চারিটি হাইস্কুল স্থাপিত হইল;—মালদহে অক্রুরমনি হাই, নঘরিয়া হাই, ভোলাহাট হাই (নবম বার্ষিক) ও কনসাট হাই (নবম বার্ষিক)। টাউনে দুইটি হাইস্কুল হওয়াতে ছাত্রদিগের স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না। সুতরাং আরও একটী হাই স্কুলের অভাব অনুভূত হইতেছে।—মালদহ-সমাচার।

হুগলী জেলার রাজবলহাট এচ, ই, স্কুল সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গত ৪ঠা জানুয়ারি ঐ বিদ্যালয় যথারীতি খোলা হইয়াছে।—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

ময়মনসিংহ জাফরগাঁও এসলামীয়া হাই স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্ট কলেজে পরিণত করার চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।—মোহাম্মদী। ঢাকা-প্রকাশ

ফরিদপুরে "ব্রজেন্দ্র কলেজ"-নামে একটি নূতন কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষা-মন্দির যতই বেশী হয় ততই ভাল।—বীরভূমবাসী।

স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজনের সংবাদ আরো আমরা পাইয়াছি, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাহাদের উল্লেখ হইতে বিরত রহিলাম।

স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া শিক্ষায়তনে অপরবিধ দানের সংবাদ আমরা পাইয়াছি।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে,—খিদিরপুরের বাবু তারাপদ ঘোষ মহাশয় স্থানীয় হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তিন সহস্র টাকা চাঁদা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

গতপূর্ব্ব সোমবার পরেশনাথ মন্দিরে জৈন কনফারেন্স বসিয়াছিল। জৈনগণ বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈন শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য এক লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন।—এডুকেশন গেজেট।

দেশের লোককে জাগ্রত হইতে দেখিয়া গভর্মেণ্টও নিশ্চিন্ত নাই। আমরা খবর পাইয়াছি—

বিগত সেপ্টেম্বর মাস হইতে হাওড়ায় গোয়েন্দাগিরি শিখাইবার জন্য একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা ৮ হইতে ১০ বৎসর পুলিশের চাকুরী করিতেছেন এবং গোয়েন্দাগিরি করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকেই এই কলেজে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এখন ১৫ জন কর্ম্মচারী এই কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছেন। কিং রোডে দুইখানা বাড়ী লওয়া হইয়াছে। ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মি, বি, সি, দাস প্রিন্সিপাল; পুলিশ সার্জ্জন মেজর এন, সি, সিংহ মেডিকেল জুরিস্‌প্রুডেন্স পড়াইতেছেন; কর্ণেল সাদারল্যাণ্ড রক্তচিহ্ন সম্বন্ধে, রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসু রাসায়নিক পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় আইন-কলেজের মেম্বর কর্ত্তৃক আইন এবং পেন্সনপ্রাপ্ত খ্যাতনামা পুলিশকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক তদন্ত করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।—এডুকেশন গেজেট।

পরমেশ্বর মঙ্গলময়। তাঁহার বিধানে মানুষের সকল কর্ম্ম হইতে শুভ জন্মলাভ করে ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শেষ যুদ্ধ।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ইংরেজ মন্ত্রীরা অনেকবার বলিয়াছেন, যে, জার্মেনীকে এমন করিয়া হারাইয়া দিতে হইবে, যে, জার্মেনরা আর যেন কখনও ভুবনবিজয়ী হইবার চেষ্টাও না করিতে পারে, এবং আর যেন পৃথিবী যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তপাত দ্বারা কলঙ্কিত না হয়। এ কথা এখন আর ইংরেজরা বলিতেছেন না বটে, এখন কেবল মানের সহিত শান্তি (peace with honour) স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁহারা যাহা বলিতেন, তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল কি না, বিচার্য্য।

জার্মেনরা বর্ত্তমান যুদ্ধে পরাজিত ও নিষ্পেষিত হইলেই কি চিরকালের জন্য যুদ্ধ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে? জার্মেনী পরাজিত হইলে তাহার মনে যে অপমান-বোধ, যে প্রতিহিংসা থাকিবে, তাহাই কালক্রমে আর-একটা মহাযুদ্ধের কারণ হইবে; কারণ, কোন জাতিকেই চিরকালের জন্য নির্বীর্য্য করিয়া রাখা অসম্ভব। অবশ্য আমেরিকার তাম্রবর্ণ আদিমনিবাসী ইণ্ডিয়ানদিগকে ইউরোপীয় উপনিবেশিকেরা যেমন করিয়া প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছে, জার্মেনদিগকে সেই-প্রকারে নির্ম্মূল করিতে পারিলে, জার্মেনী আর কোন কালে মাথা তুলিতে পারিত না বটে; কিন্তু তাহা এ ক্ষেত্রে ও এ যুগে অসম্ভব।

এইজন্য যেমন বিষের দ্বারা বিষের ক্ষয় হয় বলিয়া শুনা যায়, তদ্রূপ যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধের বিনাশসাধন, সম্ভবপর মনে হইতেছে না।

কিন্তু মনে করুন যেন জার্মেনী এমন ভাবে পরাজিত হইল, এবং তাহাকে জলস্থল-আকাশচারী সৈন্যদল সম্বন্ধে এমন কঠিন সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ করা হইল, যে, সে আর কোন কালেই মাথা তুলিতে পারিবে না। তাহাতেই কি ভবিষ্যতে যুদ্ধ নিবারিত হইবে? কখনই নহে। পরদেশ ও পরধনে কেবলমাত্র জার্মেনীরই লোভ নহে। বর্ত্তমানে যত প্রবল জাতি আছে এবং অতীত কালে যত জাতি প্রবল হইয়াছিল, প্রত্যেকেই দস্যুতা অপরাধে অপরাধী। সুতরাং, ন্যায্য কথা বলিতে গেলে পৃথিবীর আর-সব জাতিই কোন-না-কোন সময়ে এই অপরাধ করিয়াছে মানুষের স্বভাব যদি এমন করিয়া বদলায়, তাহার হৃদয়ের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়, যে, ব্যক্তিগত জীবনে এবং একই দেশের মধ্যে দস্যুতা ও নরহত্যা যেমন গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয়, এক দেশ ও জাতির সহিত অন্য দেশ ও জাতির ব্যবহারেও দস্যুতা ও নরহত্যা সেইরূপ গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা হইলে যুদ্ধ ধরাতল হইতে, একেবারে না হউক, বহুপরিমাণে তিরোহিত হইতে পারে। বহু-পরিমাণে বলিতেছি এইজন্য, যে, চোর ডাকাত ও নরহন্তা সমাজে নিন্দিত ও আইন দ্বারা দণ্ডনীয় হইলেও চুরি ডাকাতি নরহত্যা এখনও পৃথিবীর সকল দেশে ঘটিতেছে। সুতরাং জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে যুদ্ধ ও তজ্জনিত নরহত্যা সকল দেশের লোকমত কর্ত্তৃক গর্হিত বলিয়া বিবেচিত ও নিন্দিত হইলেও, কখন কখন যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

কেবলমাত্র যুদ্ধ দ্বারা যুদ্ধের বিনাশ সাধিত হওয়া অসম্ভব। এক-একটা যুদ্ধে (যেমন এই বর্ত্তমান যুদ্ধে) এত দেশের লোকের মনে অপমান-বোধ, প্রতিহিংসা আদি, উৎপন্ন হয়, যে, তাহার দ্বারাই ভবিষ্যতে নূতন করিয়া যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তাহার পর, যুদ্ধের সহিত মানুষের মনে বীরত্বের ও সাহসের একটা অচ্ছেদ্য যোগ স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধ যে সাহস ও বীরত্বের কাজ, এই ধারণা, উহা যে নরক তাহা মানুষকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। ইতিহাস, জীবনচরিত, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গান, জগৎ জুড়িয়া এমন একটা মোহের উৎপাদন করিয়াছে, যেন যুদ্ধ ভিন্ন বীরত্ব হইতে পারে না, যেন যুদ্ধই সাহস ও শৌর্য্যের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। যুদ্ধকে পৃথিবী হইতে দূর করিতে হইলে এই ধারণার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইতিহাস, জীবনচরিত, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গান, এমন করিয়া রচনা করিতে হইবে, যাহাতে যুদ্ধের মন্দ দিকটাও যথাযথ চিত্রিত হয়; এবং শান্তির সময়ে ও শান্তির কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ যে-সব শ্রেষ্ঠ সাহস ও শৌর্য্যের কাজ করিয়াছে ও করিতে পারে, তাহা শৈশব হইতে মানুষের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে।

অনেকে বলেন, প্রত্যেক দেশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

থাকিলে যুদ্ধ লুপ্ত হইবে, কারণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেশকে কেহ আক্রমণ করিতে চাহিবে না। ইহা কতকটা সত্য। কিন্তু এরূপে প্রস্তুত থাকাও যুদ্ধের কারণ হইতে পারে। এক দেশকে সজ্জিত দেখিলে অন্যের সন্দেহ হইতে পারে, যে, সে বুঝি অপরকে আক্রমণ করিবার জন্যই যুদ্ধসজ্জা করিতেছে। সুতরাং তাহা অন্যদের যুদ্ধসজ্জা বাড়াইবার কারণ হইবে। এই-প্রকার সন্দেহ ও রেষারেষি থাকায় হঠাৎ কেহ আক্রান্ত হইবার ভয়ে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সন্দেহভাজন দেশকে আগেই আক্রমণ করিয়া ফেলিতে পারে। তা ছাড়া, ছেলের হাতে ছড়ি থাকিলে যেমন সে মারিয়া বেড়ায়, ছুরি থাকিলে যা-তা কাটিয়া বেড়ায়, তেমনি যুদ্ধসজ্জা থাকিলেই যুদ্ধের ইচ্ছাও জন্মে। সেনানায়কগণ ও সৈন্যদল অলসভাবে কাল কাটাইতে চায় না। নিজেদের মূল্য ও আবশ্যকতা দেশকে বুঝাইবার জন্যও তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক থাকে। যশ উপার্জ্জনের জন্যও এই ঔৎসুক্য বাড়ে।

"পরের দেশ ও ধন দখল করিবার ও লুটিবার জন্য যুদ্ধ গর্হিত, ইহা বুঝি; কিন্তু কেহ যদি অন্যের দেশ ও অন্য জাতির ধন অধিকার করিতে ও তাহাদিগকে দাস করিতে আসে, তখন আক্রান্ত জাতিকেও কি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে?" যদি বলি, "হাঁ, তখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে।" তাহা হইলে আমাদিগকে কাপুরুষতার অপবাদ সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু, কর্ত্তব্যের সত্যপথ যদি দেখিতে ও দেখাইতে পারি, তাহা হইলে এই অপবাদ প্রসন্নচিত্তে সহ্য করিতে পারিব।

স্বদেশ অন্যজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, (১) আক্রমণ নিবারণ ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করা, (২) ভীরুতা বা দুর্ব্বলতা বশতঃ আত্মসমর্পণ করা, (৩) কিম্বা বলা "তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব না, কিন্তু তোমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া তোমাদের অন্যায় আদেশও পালন করিব না, তোমরা অধর্ম্ম করিতেছ"; এই তিনটি পথ আছে। প্রথমোক্ত দুই পথের কোন-না-কোনটির পথিক হইয়াছে, এরূপ জাতির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে; শেষোক্ত উপায় এপর্য্যন্ত কেহ অবলম্বন করে নাই। যদি কোন জাতি করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাপুরুষতার অপবাদ সহ্য করিতে হইবে; এবং সম্ভবতঃ আক্রমণকারী দস্যু-জাতির অত্যাচারও সহিতে হইবে। অথচ, যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ না করিয়া অপমান ও অত্যাচার সহিবার জন্য কোন-না-কোন জাতি প্রস্তুত না হইলে যুদ্ধ-প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যক্তিগত জীবনে দেখা যায়,—আত্মরক্ষার জন্য শত্রুকে আঘাত বা হত্যা করা; ভীরুতা বা দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহার অত্যাচার সহ্য করা; এবং বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যের আদর্শ-অনুযায়ী শত্রুর দ্বেষের প্রতিদানে তাহার মঙ্গল কামনা করা;—তিন প্রকার আচরণের দৃষ্টান্ত জগতে আছে। জাতীয় জীবনে শেষোক্ত প্রকার সাত্ত্বিক ব্যবহার যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবপর কি না বিবেচ্য।

যুদ্ধ-প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধনার্থ শেষোক্ত আদর্শের সমর্থন করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু তাহাতে বাধাও অনেক। কোন জাতি আক্রান্ত হইয়া যদি শত্রুদিগকে কেবল বলে, "তোমরা অধর্ম্ম করিতেছ, তথাপি আমরা যুদ্ধ করিব না, কিন্তু তোমাদের বশ্যতাও স্বীকার করিব না," তাহা হইলেও সম্ভবতঃ অধর্ম্মাচারী শত্রু তাহাদিগের দেশ দখল করিবে এবং তাহাদিগকে দাস করিবে। প্রত্যেক সভ্য দেশে আইন আছে, পুলিস আছে; তথাপিও ডাকাতরা মধ্যে-মধ্যে লুটপাট, অত্যাচার ও হত্যা করে; যাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়ে, সে ও তাহার প্রতিবেশীরা ডাকাত তাড়াই-বার চেষ্টা করিলে কখন কখন দস্যুদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, কখন বা সামান্য ফল হয়। কিন্তু দেশে শাসনযন্ত্র পুলিস ও আইন থাকায়, দস্যুরা গৃহস্থদের ধন লুট করিলেও, তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও খুন জখম করিলেও, স্থায়ী-ভাবে তাহাদের প্রভু হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। যদি পৃথিবীর সমুদয় জাতি মিলিয়া অন্তর্জাতিক আইন করেন, অন্তর্জাতিক বিচারালয় করেন, এবং অন্তর্জাতিক পুলিস-স্বরূপ খুব বলশালী এত বড় অন্তর্জাতিক সৈন্যদল রাখিতে পারেন যে কোনও এক জাতি বা জাতিসংঘের সৈন্য তত বড় ও বলশালী হইতে পারে না, যদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র লোকমত অন্তর্জাতিক দস্যুতাকে সাধারণ দস্যুতার মত গর্হিত, ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় মনে করে, এবং যদি দস্যুজাতির শাস্তিস্বরূপ তাহার সহিত অন্য সব জাতি বাণিজ্যিক ও

অন্তর্বিধ ব্যবহার আবশ্যকমত নির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে কোন জাতি ভবিষ্যতে নূতন করিয়া অন্ত জাতির দেশ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া তাহার প্রভু হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু তথাপি যেমন সভ্য দেশ-সকলে আইন পুলিস প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও লোকদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে, এবং অত্যাচার হয়, তেমনি অন্তর্জাতিক পুর্ব্বোক্ত সমুদয় ব্যবস্থা থাকিলেও জাতিবিশেষ ও দেশবিশেষের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, এবং আক্রান্ত জাতি ও দেশকে সেইরূপে দস্যুজাতির আক্রমণ প্রতিরোধের ভার লইতে হইবে, যেমন পুলিসের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সাধারণ গৃহস্থকে সাধারণ দস্যু হটাইবার ভার লইতে হয়।

তবে ইহা নিশ্চিত যে সুসভ্য সুশাসিত দেশসকলে যেমন এখন ডাকাতী পুর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে, প্রস্তাবিত সমুদয় অন্তর্জাতিক বন্দোবস্ত হইলে এবং পরদেশ জয় সাধারণ দস্যুতার সামিল বলিয়া গণ্য হইলে, অন্তর্জাতিক দস্যুতাও কমিয়া আসিবে। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ও দেশশাসকেরা সব সময়ে মনে রাখেন না, যে, সাধারণ দস্যুতা ও অন্তর্জাতিক দস্যুতার হ্রাসবৃদ্ধি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। যখন অন্তর্জাতিক দস্যুতা বাড়ে, তখন সাধারণ দস্যুতাও বাড়ে। খুব মস্ত একটা দল বাঁধিয়া বৃহৎ আয়োজন করিয়া অন্ত লোকদের দেশ লুট ও দখল করা যদি ন্যায়সঙ্গত ও বীরের কাজ হয় তাহা হইলে সাধারণ দস্যুরা যদি মনে করে যে ছোট দল বাঁধিয়া একটা গ্রাম বা একঘর গৃহস্থকে আক্রমণ করায় দোষ নাই, তাহা হইলে তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ থাকিলেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। আলেগজান্দার কর্ত্তৃক ধৃত দস্যু ঠিক্ এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই মুখামুখি জবাব দিয়াছিল। প্রবল জাতিরা অনেক সময় এই ওজুহাতে দুর্ব্বলদের দেশ দখল করেন, যে, তাহারা নিজেদের সম্পত্তির সদ্ব্যবহার ও উন্নতি করিতে পারিতেছে না। সাধারণ দস্যুরাও ত অনেক ধনী গৃহস্থ দেখাইতে পারে যাহারা নিজেদের সম্পত্তির সদ্ব্যবহার ও উন্নতি করিতেছে না। বাস্তবিক, দস্যুতা দস্যুতা ভিন্ন আর কিছুই নয়;—তা দুচার জন লোকেই করুক, বা একটা জাতিই করুক। ইহা অধর্ম্ম।

আমরা বলিয়াছি, অন্তর্জাতিক দস্যুতা অর্থাৎ একটা জাতির দ্বারা অপর একটা দেশ ও জাতির উপর ডাকাতী, সাধারণ ডাকাতীরই মত গর্হিত ও ঘৃণ্য, মানবজাতির সাধারণ মত এইরূপ হওয়া দরকার। ইউরোপের লোকেরা কতকটা এইরকমের মত আপনাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা কিন্তু উহার প্রয়োগের ক্ষেত্র আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী সংকীর্ণ করিয়াছিল, ধর্ম্ম অনুসারে উহার প্রয়োগ পৃথিবীব্যাপী করে নাই। অর্থাৎ তাহারা ভাবিয়াছিল, "আমরা শাদা রঙের মানুষ পরস্পরকে আক্রমণ ও লুট করিব না; কিন্তু যারা শাদা নয় বা জাপানের মত প্রবল নয়, তাহাদের দেশ একটা বন্দোবস্ত অনুযায়ী ভাগাভাগি করিয়া লওয়া যাক্।" সেই অনুসারে বেলজিয়ম্ আফ্রিকার কঙ্গোদেশে রবর সংগ্রহ করিবার জন্ত পৈশাচিক অত্যাচার করিলেও কোন প্রবল শ্বেত জাতি তাহাতে বাধা দেয় নাই। কিন্তু অশ্বেত লোকদের ও তাহাদের দেশগুলার প্রভুত্ব ও বাণিজ্য লইয়াই শাদায় শাদায় ঝগড়া বাধিয়া গেল। জার্ম্মেনী নিজের "সভ্যতা," বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ও কাজের সুশৃঙ্খলার অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ভাবিল, আমাদের প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্য আর-সকলের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে বেলজিয়মের ভিতর দিয়া সমুদ্রে নামিবার পথ থাকা দরকার। তাই বেলজিয়ম আক্রান্ত হইল। তখন বেলজিয়ম জার্ম্মেনীর অত্যাচারে ভূমণ্ডল নিনাদিত করিল। বেলজিয়ম স্বয়ং কঙ্গোতে কি করিয়াছিল, তাহা কি এখনও তাহার মনে পড়ে নাই? যাহা হউক, আমরা ইহাই বলিতেছিলাম, ধর্ম্মনীতির প্রয়োগক্ষেত্র স্বার্থ ও সুবিধার অনুযায়ী সংকীর্ণ করা চলে না। ইউরোপের খৃষ্টিয়ান লোকেরা অন্তর্জাতিক দস্যুতাকে অশ্বেত দুর্ব্বল লোকদের দেশে দস্যুতা মনে করে নাই, কেবল নিজেদের শ্বেত খৃষ্টিয়ান জাতভাইদের দেশেই উহা দস্যুতা এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ইহাতে ধর্ম্ম অপেক্ষা স্বার্থ ও সুবিধাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইল। যাদের শক্তি বেশী, হত্যা করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় যাহারা বেশী আয়ত্ত করিয়াছিল, সেই জার্মেনরা ভাবিল, জাতীয় স্বার্থ ও সুবিধাই যদি জাতীয় আচরণের নিয়ামক আফ্রিকা ও

এসিয়ায় হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা ইউরোপেই বা জাতীয় আচরণের মূল নীতি কেন হইবে না? এইজন্য জার্মেনী বেলজিয়ম ও ফ্রান্স আক্রমণ করিয়াছে; অষ্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করিয়াছে। অন্যেরা যাহা ইউরোপের বাহিরে করে, জার্মেনী তাহা ইউরোপেও বাহিরে এবং ভিতরে উভয়ত্রই করিতেছে। অবশ্য, অতীত কালে, ইউরোপের সকল জাতিই ইউরোপেও পরস্পরের দেশ দখল করিবার সফল বা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে; কিছুকাল হইতে মাত্র এ চেষ্টা ইউরোপীয় অন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রচারিত ও মুখে স্বীকৃত হইতেছিল।

পরাধীনতা ও যুদ্ধ।

পরাধীনতা অপেক্ষা স্বাধীনতা যে ভাল, স্বাধীনতাই যে স্বাভাবিক অবস্থা, তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া কোন জাতি স্বাধীন হইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে কি? নরওয়ে সুইডেনের অধীন ছিল না বটে, কিন্তু নরওয়ে ও সুইডেন একই রাজার অধীন ছিল, এবং পৃথিবীর জাতিসমাজে নরওয়ের স্থান সুইডেনের মত ছিল না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিনা যুদ্ধে নরওয়ে সুইডেন হইতে পৃথক হয় ও নিজের রাজা নির্ব্বাচন করে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বরাজ পাইয়াছে। তজ্জন্য ফিলিপিনোদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই। ফিলিপিনোরা যোগ্য হইলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে, বিজেতা আমেরিকানদিগের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে। ইহা কথার কথা নহে। আমেরিকানেরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করিবার পর ১৭ বৎসরের মধ্যেই ফিলিপিনোদিগকে সম্পূর্ণ স্বরাজ দিয়াছে। সুতরাং স্বাধীনতা দিবার অঙ্গীকারও তাহারা পালন করিবে, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

বিদেশীয় আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বিহিত; কিন্তু সেস্থলেও যুদ্ধ না করিলে চলে কি না, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি। স্বাধীন হইবার জন্য যুদ্ধ করার বিধানও ইতিহাসে পাওয়া যায়; কিন্তু যদি বিনা যুদ্ধে মানুষ স্বদেশের সমস্ত কাজ করিবার পূর্ণ-অধিকার পায়, তাহা হইলে যুদ্ধ করিবে কেন? এইখানেই প্রকৃত সভ্যতার পরীক্ষা। সভ্য জাতিরা পরাধীন জাতিদিগকে স্বকার্য্যসাধনের যোগ্য করিয়া আত্মকর্তৃত্ব প্রদান করুন; তবে বুঝিব তাঁহারা সভ্য। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড ও তাহার মিত্র দেশসকল বলিতেছেন তাঁহারা জগৎময় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র স্থাপন করিবার জন্য লড়িতেছেন। কাজে কি হয় দেখা যাইবে। হয়ত ভবিষ্যতে বৈধ অবাধ্যতা (Passive Resistance) দ্বারাও স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইবে। তখন প্রবল জাতিরা স্বেচ্ছায় পরাধীন জাতিদিগকে আত্মকর্তৃত্ব না দিলে তাহারা যুদ্ধ না করিয়া এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে।

তাহা হইলে কোন বৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও তখন যুদ্ধ করিয়া নরহত্যা করিতে হইবে না।

হিংসা ও অহিংসা।

যুদ্ধের উচ্ছেদসাধন কেমন করিয়া হইবে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে, হিংসা ও অহিংসার বিষয়ও বিবেচনা করিতে হয়।

একটা বাঘ যদি একজন মানুষকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে মানুষটির কর্ত্তব্য কি? এমন সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ থাকিতে পারেন, যিনি এক্ষেত্রেও বাঘকে আঘাত বা হত্যা করিবেন না, বরং নিজেই হত হইবেন। কেহ কেহ এরূপ বিশ্বাস করেন যে এরূপ মহাত্মার প্রভাবে বাঘও নিজ হিংস্র প্রকৃতি ভুলিয়া যাইতে পারে। ইহা বিশ্বাস করিতে আমাদেরও ইচ্ছা হয়, যদিও ইহার কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। মহাত্মারা যাহাই করুন, সাধারণতঃ মানুষ বাঘের সম্মুখে পড়িলে, সাহস ও সামর্থ্য থাকিলে বাঘকে জখম করে বা মারিয়া ফেলে। বাঘেরই মত হিংস্র ভাব লইয়া যদি একজন মানুষ আর-একজনকে মারিতে বা তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে আসে, তাহা হইলে সাহস ও সামর্থ্য থাকিলে তাহাতে বাধা দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু আক্রমণকারীকে মারিয়া ফেলা উচিত কি? এইস্থলে মতভেদ হইতে পারে। সাধারণতঃ আত্মরক্ষার জন্য আততায়ীর প্রাণবধও সমর্থিত হয়, আইনেও তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। এরূপ মনে হইতেও পারে, যে, যদি হিংস্রপ্রকৃতি বাঘকে মারিয়া ফেলা চলে, তাহা হইলে হিংস্রপ্রকৃতি মানুষ আততায়ীকে মারা চলিবে না কেন? কিন্তু

বাস্তবিক খুব হিংস্রপ্রকৃতির মানুষও বাঘের মত নয়। বাঘের স্বভাব বদলায় না। কিন্তু হিংস্রপ্রকৃতির মানুষের হৃদয়েও হিংসা অপেক্ষা উচ্চ প্রবৃত্তি, এবং তাহার আত্মায় ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেম পাইলে তাহারও প্রেম জাগিতে পারে। এইভাবে প্রেম যে জাগিয়াছে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ও জীবনচরিতে আছে। সুতরাং সাহসী ও সমর্থ কোন ব্যক্তি আপনার ধন ও প্রাণ-রক্ষার নিমিত্তও আততায়ীকে আঘাত বা বধ না করিয়া যদি তাহার সহিত সপ্রেম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা নমস্য বলিয়া মনে করি।

কিন্তু যদি সেই ব্যক্তিরই সম্মুখে হিংস্র কোন মানুষ দুর্ব্বল কোন পুরুষকে আক্রমণ করে, তখন তিনি কি করিবেন? অবশ্য তিনি দুর্বৃত্ত লোকটাকে উপদেশ দ্বারা নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহার ও আক্রান্তের মধ্যে পড়িয়া নিজের প্রাণ দিয়াও বিপন্নকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও ফল না হইলে কি করিবেন? যখন দেখিবেন যে, দুর্বৃত্তকে মারিলে নির্দ্দোষ বিপন্নের প্রাণরক্ষা হয়, তাহাকে না মারিলে নির্দ্দোষের প্রাণ যায়, সেস্থলে, যখন একজন-না-একজনের প্রাণ যাইবেই তখন কি করিবেন?

ধরুন, অহিংসাবাদী কেহ বলিবেন, যে, প্রাণ লইব না, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যতটা সম্ভব কেবল বাধাই দিব, তাহা হইলে তাহাতেও আমরা তাঁহার নিন্দা করিব না। কিন্তু বিপন্ন ব্যক্তিটি যদি নারী হন ও দুর্বৃত্ত লোকটা যদি নারীর চরম দুর্গতি করিবার প্রয়াসী হয়, এবং যদি তাহার প্রাণবধ না করিলে বিপন্না নারীকে রক্ষা করা না যায়, তাহা হইলেও কি অহিংসা চূড়ান্ত কর্ত্তব্য? দুর্বৃত্তের প্রাণ অপেক্ষা নারীর ধর্ম্ম কি কম মূল্যবান্?

নারী একাকী যদি এইরূপে আক্রান্ত হন, এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার কেহ না থাকে, তাহা হইলে তিনি হয় তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিতে পারেন, কিম্বা দুর্বৃত্তের প্রাণবধ করিতে পারেন। পুরুষ নিজে আক্রান্ত হইলে সকল অবস্থাতেই অহিংসা নীতি অবলম্বন করিতে পারেন। তাঁহার ধন যাক্, শারীরিক স্বাধীনতা যাক্, অঙ্গহানি হউক্, ক্ষতি নাই; প্রাণ গেলেও ক্ষতি নাই। আত্মা স্বাধীন থাকিতে পারে।

নারীর দুই পথ, আত্মহত্যা ও দুর্বৃত্তের হত্যা। তৃতীয় পন্থা নাই। কোন্ স্থলে কোন্ পথ অবলম্বনীয়, নারীই তাহা স্থির করিবেন।

পুরুষের নিজের জন্য পৌরুষের প্রয়োজন আছে; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও নারীর জন্য পুরুষের পৌরুষের দরকার। যে পুরুষ নারীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারে না, তাহাকে ধিক্।

পুরুষের নিজের জন্য এবং নারীর জন্য পৌরুষের যত প্রয়োজন, নারীর নিজের জন্য শৌর্য্যের প্রয়োজন তদপেক্ষাও অধিক। নারীকে বিধাতা মাতৃপদ দিয়াছেন; মাতৃত্ব শুধু দৈহিক নয়; আত্মারও মাতৃত্ব চাই। মাতৃত্ব নারীর ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত নারীকে দৃঢ়চিত্ত ও শক্তিশালিনী হইতে হইবে। এই-জন্য নারীর যেরূপ শিক্ষা আবশ্যক, প্রত্যেক সমাজে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সামাজিক সকল ব্যবস্থা যেমন নারীকে করুণারূপিণী করিবে, তেমনি দৃঢ়চিত্তাও করিবে।

যুদ্ধ ও নারী।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যত যুক্তি আছে, সকলের চেয়ে প্রবল যুক্তি এই, যে, ইহাতে নারীর দুঃখ ও বিপদ সকলের চেয়ে অধিক। অথচ যুদ্ধের জন্য সাক্ষাৎভাবে দায়ী তাঁহারা অল্পস্থলেই হইয়া থাকেন। যুদ্ধে মানুষ মরে খুব বেশী; কিন্তু মৃত্যু সকলের চেয়ে বড় অনিষ্ট না অমঙ্গল নহে। যুদ্ধে নারীর মৃত্যু হয় না, কারণ নারী কচিৎ সৈন্য হন। কিন্তু যুদ্ধ যে-দেশে হয়, তথায় বহু নারীকে মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়াবহ বিপদে পড়িতে হয়।

যুদ্ধে নারী পুত্রহীনা হন, পতিহীনা হন; পিতৃহারা ভ্রাতৃহারা হইয়া অসহায় হইয়া পড়েন। তাঁহাদের শোক বিপদ ও দুঃখ আমরা অনেক সময় কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু পশুস্বভাবাপন্ন লোকেরা যুদ্ধের সময় তাঁহাদের যে চরম দুর্গতি করিয়া থাকে, সর্ব্বাপেক্ষা তাহাতেই যুদ্ধকে নরক করিয়া তুলে। এইজন্য যখন রাজপুত বীরেরা এরূপ কোন যুদ্ধ করিতে যাইতেন যাহাতে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার কোন আশা নাই,

তখন রাজপুত নারীরা অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করিতেন; কারণ, তাঁহারা বন্দিনী হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিতেন।

যুদ্ধের যদি আর কোন দোষ না থাকিত, তাহা হইলেও শুধু নারীর উপর অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্যই যুদ্ধ-প্রথা উন্মূলিত করিবার আবশ্যক ছিল।

অন্যদিকে, যদি কোন জাতি, যুদ্ধ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনার্থ, আক্রান্ত হইয়াও, যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, এবং অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করিয়া আততায়ীদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলেও বিপদ আছে। কারণ শত্রুরা দেশ দখল করিয়া যখন অধিবাসীদিগকে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে বলিবে এবং তাহারা আজ্ঞা পালন করিবে না, তখন যে কেবল পুরুষেরাই উৎপীড়িত ও হত হইবে, তাহা নয়, নারীদের উপরও অত্যাচার হইবে। তাহা পুরুষনামের যোগ্য কোন ব্যক্তি সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, যুদ্ধ করা যেমন অমঙ্গলজনক, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকাও তেমনি অমঙ্গলজনক হইতে পারে।

যে-সকল নারী চিন্তা করিতে সমর্থ, তাঁহাদেরও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যুদ্ধ করা না-করা সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য।

লোকমত ও যুদ্ধ।

আমরা বলিয়াছি, যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে লোকমত পরিবর্ত্তিত না হইলে যুদ্ধ-প্রথা উন্মূলিত হইবে না। বীরত্ব সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদলান চাই; দস্যুতা একটা সমস্ত জাতি বা দেশের উপর হইলেও তাহা যে সাধারণ দস্যুতারই মত গর্হিত এইরূপ মত প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও লোকমত খুব প্রবল হওয়া দরকার। মানুষ সাধারণতঃ ক্ষুধায় মরিয়া গেলেও অপর মানুষের মাংস খায় না, অথচ অসভ্য অবস্থায় কোন কোন দেশে মানুষ নরমাংসাশী ছিল, এবং হয়ত এখনও কোথাও কোথাও আছে। নরমাংস-ভোজনের চিন্তাও যেমন ধিক্কারজনক, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লোকমত তদ্রূপ প্রবল হওয়া দরকার।

অধিকাংশ স্থলে যুদ্ধের কারণ লোভ। ঈশোপনিষদে যে আছে, মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্, কাহারও ধনে লোভ করিও না, মানুষ সেই উপদেশের অনুবর্ত্তী হইবার জন্য সাধনা করিলে লোভ অতিক্রম করিতে পারে।

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ যেমন মারাত্মক, বাণিজ্যের যুদ্ধ তার চেয়ে কম মারাত্মক নহে। অস্ত্র দিয়া মানুষকে প্রাণে মারা যে পাপ তাহা মোটামুটি স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যায় প্রতিযোগিতা দ্বারা এক জাতি অন্য জাতির ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করিলে যদি শেষোক্ত জাতি গরীব হইয়া যায়, এবং ক্রমশঃ অন্নাভাবে ও দারিদ্র্যজনিত রোগে ও অজ্ঞানতায় নির্ব্বীর্য্য হইতে থাকে, দুর্ব্বল হইতে থাকে, বর্ব্বর হইতে থাকে, মরিতে থাকে, তাহা হইলে এইরূপ প্রতিযোগিতায় জয়ী জাতিকে এখনও সাধারণতঃ অপরাধী মনে করা হয় না। চাষের নূতন উপায় উদ্ভাবন, শিল্পদ্রব্য-নির্ম্মাণের নূতন উপায় ও যন্ত্র উদ্ভাবন, ইত্যাদি, অন্যায় প্রতিযোগিতা নহে। প্রতিযোগিতার অন্যায় উপায় নানা-প্রকার আছে। এখানে তাহা বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এইসব অসদুপায়ের বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল হওয়া উচিত। নতুবা ইহাও বরাবর যুদ্ধের একটা কারণ থাকিয়া যাইবে।

নিজস্ব ও পরস্ব।

নিজস্ব ও পরস্ব সম্বন্ধেও ধারণা বদলান দরকার। পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকিতেও অনেক লোক যদি কাজ না পায়, সুতরাং পেট ভরিয়া খাইতে না পায়, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত সামান্য রকমের কাপড় ও ঘর না পায়, জ্ঞানলাভের অবকাশ না পায়, নির্ম্মল আনন্দলাভের সুযোগ ও সামর্থ্য যদি তাহাদের না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, দেশের কোন কোন শ্রেণীর লোক যাহা নিজস্ব মনে করিতেছে, তাহার সমস্ত বা কিয়দংশ পরস্ব; এবং ঐ দেশ যদি পরাধীন হয়, তাহা হইলে প্রভুজাতীয় লোকেরা যাহা নিজস্ব মনে করিতেছে, তাহার কতকটা পরস্ব, তাহা পরাধীন দেশের লোকদের নিজস্ব। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই দৈহিক শ্রমীদের যাহা ন্যায্য পাওনা, যাহা তাহাদের নিজস্ব, তাহার কিয়দংশ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়; এবং বঞ্চনা করে মূলধনীরা। এই মূলধনীরা

এ সবাই অসৎ লোক, জানিয়া শুনিয়া প্রতারণা করে, তাহা নয়; বেতনদাতা ও বেতনগৃহীতা উভয়ের সম্পর্ক, শ্রমজাত ধনের কত অংশ শ্রমীর কত অংশ মূলধনীর প্রাপ্য, ইত্যাদি বিষয়ে চিরাগত ধারণা এই বঞ্চনার মূলীভূত কারণ। গৃহস্থ-বাড়ীর দাসদাসীরা যাহা বেতন পায়, তাহাদের ন্যায্য পাওনা তদপেক্ষা অধিক; তাহা তাহারা চুরি করিয়া পোষাইয়া লয়। তাহারা যে সবাই কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং বেশী বেতন দিলেই সাধু হইবে, তাহা বলিতেছি না; এস্থলে আমাদের বক্তব্য কেবল এই যে, তাহাদের শ্রমে আমরা যতটুকু আরাম ও সময় পাই, তাহার মূল্য তাহাদের বেতন অপেক্ষা অধিক। উত্তরাধিকারসূত্রে যে যাহা পায়, তাহাই তাহার নিজস্ব, ইহা মনে করাও সকল স্থলে ঠিক্ নয়। প্রাচীন হিন্দু ব্যবস্থা অনুসারে স্ত্রীলোকদের যাহা প্রাপ্য ছিল, এখন তাঁহারা তাহা পান না। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পায়, হিন্দুস্ত্রীলোকেরা তাহা পান না। মুসলমান পুরুষেরা দূরসম্পর্কের লোকেরও সম্পত্তির যে-অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, হিন্দু বা খৃষ্টিয়ান পুরুষেরা তাহা পায় না। সুতরাং "আমি এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছি, অতএব ইহার আমি মালিক, এবং ইহা যেরূপভাবে ইচ্ছা খরচ করিতে পারি," ইহা মনে করা ভ্রম। তোমরা ধনী চাকুরে, বণিক, জমিদার, ব্যারিষ্টার বা উকীলের ছেলে, পিতার নিকট হইতে বহু সম্পত্তি পাইয়াছ, কিন্তু তোমাদের ভগিনীরা হয়ত দরিদ্র। তোমরা যে মনে করিবে, যে, তোমরা বিলাসে কালযাপন করিবে এবং তোমাদের ভগিনীরা দারিদ্র্যে কষ্ট পাইবেন, ইহা বিধাতারই বিধান, ইহা মহা ভ্রম। তুমি ধনী ইংরেজের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ব্রিটিশ উত্তরাধিকার আইন অনুসারে পিতার সমস্ত সম্পত্তি তুমি পাইয়াছ, অন্য ভাইভগিনীরা বিশেষ কিছু পায় নাই। তুমি যদি ইহাকে বিধাতার বিধান মনে কর, তাহা হইলে ইহা ভ্রম। আমাদের দেশের জমিদারেরা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রভূত সম্পত্তি পাইয়া থাকেন, কিন্তু ইহার অনেক অংশ পরস্ব; কারণ খাজনা আদায় করিবার জন্য, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য, কৃষকদের স্বাস্থ্য ও কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতির জন্য, দেশবাসীকে নির্ম্মল আনন্দ, শিক্ষা, ও জীবিকা-উপার্জ্জনসামর্থ্য দিবার জন্য তাঁহারা যে-পরিমাণে অর্থব্যয়, চিন্তা ও শ্রম করেন, সেই পরিমাণ সম্পত্তি তাঁহাদের নিজস্ব; বাকী পরস্ব, অর্থাৎ এই অবশিষ্ট অংশ চাষীদের ও মজুরদের নিজস্ব। স্বোপার্জ্জিত হইলেও কাহারও ধন কেবলমাত্র তাহার নিজের বা পরিবারবর্গের ব্যবহারের জন্য নহে। দেশের আইন যাহাই বলুক, প্রাকৃতিক নিয়ম এই, যে, মানুষ নিজের সাধুতা, বুদ্ধিপ্রয়োগ ও শ্রম দ্বারা যাহার অধিকারী হয়, তাহাই তাহার প্রকৃত নিজস্ব। ভূসম্পত্তি বা অন্যবিধ সম্পত্তি যে পুরুষানুক্রমে একবংশে স্থায়ী হয় না, তাহাতেই এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রমাণ রহিয়াছে। কোন ধনী বংশ যদি পুরুষানুক্রমে নীতিমান্ বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের সম্পত্তিও থাকিতে পারে। তাহাদের বংশে সিদ্ধার্থের মত কেহ জন্মিয়া ত্যাগী হইলে পার্থিব সম্পত্তি যাইতে পারে, কিন্তু অপার্থিব ঐশ্বর্য্যে ঐ বংশ গৌরবান্বিত ও ধন্য হয়।

যে-দেশে যাহারা জন্মে, তথাকার ভূমিতে ও অন্যবিধ সম্পত্তিতে তাহাদের অধিকার আছে, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়; এবং ইহা ন্যায্যও বটে। কিন্তু এই যে নিজের দেশে নিজের স্বত্ব, ইহাও চূড়ান্ত স্বত্ব নহে, ইহাও সর্ত্তের অধীন। যদি কোন জাতি (nation) অলস হয়, বিলাসী হয়, অসচ্চরিত্র হয়, বুদ্ধিতে হীন হয়, যদি ঐ জাতির কোন কোন শ্রেণী অন্যসব শ্রেণীর শ্রমে পুষ্ট হইয়া পরগাছা-বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে দেশ আর জাতীয় সম্পত্তি থাকে না, উহা বিদেশীর হস্তগত হয়। আমরা অন্তর্জাতিক দস্যুতার সমর্থন করিতেছি না; কিন্তু বসুন্ধরা যে বীরভোগ্যা, তাহার মানেই এই যে অলস ও অসমর্থদিগের স্বদেশও তাহাদিগের পক্ষে বিদেশে পরিণত হয়। তুমি তোমার স্বদেশে জন্মিয়াছ বলিয়াই তুমি উহার মালিক নও। তুমি দেখাও উহা প্রকৃত প্রস্তাবে দখল করিবার জন্য কতটা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছ, কতটা শ্রম করিয়াছ, কতটা দেশকে ভাল বাসিয়াছ, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ কতটা ত্যাগ করিয়াছ, ও আরও কতটা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছ। তুমি যে একটা দেশে জন্মিয়াছ, অন্য একটায় জন্মাও নাই, ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা; ইহাতে তোমার কোন হাত ছিল না, তোমার কোন কৃতিত্ব নাই। তুমি চরিত্রবল,

প্রেমবল, বুদ্ধিবল, শ্রমবল ও ত্যাগবলের মূল্য দিয়া দেশকে বিধাতার নিকট হইতে ক্রয় কর; তবে উহা তোমার "স্ব"-দেশ হইবে ও থাকিবে, নতুবা নয়।

কোন জাতি তাহাদের স্বদেশের যতটা যে-যে দিকে ও বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নিজস্ব করিতে পারে, ততটাই তাহাদের সম্পত্তি; তার বেশী নয়। অষ্ট্রেলেশিয়ায় বত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল জমীতে মোট ৬২ লক্ষ মানুষ আছে; আর ভারতবর্ষের ১৯ লক্ষ বর্গ মাইল জমীতে ৩১৫০ লক্ষ মানুষ আছে। উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির ৩৮ লক্ষ বর্গ মাইল জমীতে ৭৯ লক্ষ মানুষ আছে। শ্বেতকায়দের অধিকৃত এইসব বৃহৎ দেশে কেবল যে আরও কোটি কোটি লোক বাস করিতে পারে, তাহা নহে; ঐ-সকল দেশের কৃষি ও অন্যান্য ধনোৎপাদন-চেষ্টার জন্যও বিস্তর লোকের দরকার। তথাপি তাহারা এসিয়ার লোকদিগকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের লোকদিগকে, তথায় যাইতে দিবেনা। কিন্তু তাহারা যাহাকে এখন স্বদেশ বলিতেছে, আগে তাহা তাহাদের স্বদেশ ছিল না; তাহারা সমস্ত দেশটা কাজে লাগাইতে পারিতেছে না, অথচ অন্য অনেক দরিদ্র অনশন-ক্লিষ্ট জনাকীর্ণ দেশের লোককেও সেখানে যাইতে দিতেছে না। অতএব তাহাদের এই স্বত্ব কখনই টিকিবে না। দুর্ব্বল অদলবদ্ধ জাতিরা কিছু করিতে না পারুক, ভবিষ্যতে প্রবল দলবদ্ধ কোন-না-কোন জাতির সঙ্গে এইজন্য যুদ্ধ ঘটিতে পারে।

যুদ্ধ নিবারণের প্রধান উপায়।

যুদ্ধ নিবারণের জন্য যে-সকল উপায় অবলম্বন করা দরকার, তাহার আভাস আমরা দিয়াছি। কিন্তু কেবল যে ব্যবস্থা দ্বারা, বিশেষ কোন এক-রকমের কার্য্যপ্রণালী দ্বারা, জাতিতে জাতিতে সন্ধিসর্ত্তের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, পৃথিবীর সর্ব্বত্র লোকমতের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, তাহাও আমরা বলিয়াছি। কোন্ কোন্ দিকে লোকমত পরিবর্ত্তিত হওয়া চাই, তাহারও আভাস দিয়াছি। সকলের চেয়ে স্মরণীয় কথা এই, যে, মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হইলে যুদ্ধের উচ্ছেদ, কখনও সাধিত হইবে না। মানুষকে, সহোদর বা আত্মীয় বলিয়াই নয়, এক-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই নয়, একদেশবাসী বা একজাতীয় বলিয়াই নয়, মানুষ বলিয়াই প্রীতি করিতে হইবে। ইহা জগতের সকল সাধুর উপদেশ। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার লর্ড বিশপ গির্জ্জায় উপাসনার পর উপদেশে, "জার্ম্মেন-দিগকেও ভাল বাসিতে হইবে ও ক্ষমা করিতে হইবে," এই কথা বলিয়া ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ঠিক্ কথাই বলিয়াছিলেন।

নিজের পার্থিব সম্পত্তি বা স্বদেশের পার্থিব সম্পত্তি বাড়াইবার চেষ্টা নিন্দনীয় নহে। কিন্তু পরমার্থের বিনিময়ে তাহা করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়। ধর্ম্মই পরম ধন। মানুষের আত্মাটাই যদি ছোট হইয়া গেল, তাহা হইলে বিশাল সাম্রাজ্য ও বড় বড় কারখানা লইয়া কি হইবে?

লুণ্ঠনকারীদের দণ্ড।

বঙ্গের নানাস্থানে হাটলুণ্ঠনকারীদের দণ্ড হইতেছে। আইনের ন্যায্যবিচারে চোরডাকাতের দণ্ড হইলে, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু দণ্ড দিবার সময় শুধু আইনের অক্ষরগুলির দিকেই দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। যুদ্ধের জন্য বাণিজ্যবিষয়ে যে অস্বাভাবিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সেই সুযোগে ব্যবসাদারেরা যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছে, তাহাও কি পরস্ব অপহরণ নয়? অবশ্য, যে-সব লোকের দোকান লুট হইয়াছে, তাহারাই যে এইরূপ "আইন-সঙ্গত" চুরি করিতেছে, তাহা নয়; নিরপরাধ বিস্তর দোকানদারেরও দোকান লুট হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেমন লুণ্ঠনকারীদিগকে দণ্ডিত করিতেছেন, তেমনি পূর্ব্বোক্তরূপ "আইনসঙ্গত" চৌর্য্যকেও বে-আইনী বলিয়া ব্যবস্থা করা পূর্ব্বে হইতেই গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল।

লুণ্ঠনকারীদিগকে দণ্ড দিবার সময় ইহাও মনে রাখা উচিত যে ধন অপেক্ষা প্রাণ বড়। ক্ষুধিত ও প্রায়নগ্নের চুরিও চুরি বটে; কিন্তু তাহা কতকটা ক্ষমার যোগ্য। গবর্ণমেণ্ট, দেশ, সমাজ যদি শ্রমের বিনিময়ে সকল ক্ষুধিতের অন্ন, ও সকল নগ্নের বস্ত্র জোগাইবার ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্য এবং প্রাণগুলা কি দোকানের অন্নবস্ত্র অপেক্ষা বিধাতা তুচ্ছ মনে করিবেন? আমরা জানি না, লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে পেশাদার বদমায়েস

কত, এবং বুভুক্ষিত ও অর্দ্ধনগ্ন কেহ ছিল কি না; কিন্তু দণ্ড দিবার সময় মনে রাখিবার যোগ্য বলিয়া এইসব কথা লিখিলাম।

স্বরাজ বা হোমরূলের বিরুদ্ধে আপত্তি।

যাঁহারা আমাদের আত্মকর্তৃত্ব লাভে বাধা দিতেছেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান সমুদয় আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি আপত্তি আছে, যাহা কেবল খণ্ডন করিলেই হইবে না। আত্মকর্তৃত্ব লাভের ও রক্ষার যে-সব বাস্তবিক অন্তরায় আছে সেগুলি দূর করিতেও হইবে।

একটি আপত্তি এই, যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ; সুতরাং এখন ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিলে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে না, কেবলমাত্র কতকগুলি শিক্ষিত লোকের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে এবং তাহারা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল অপেক্ষা নিজের স্বার্থ অধিক দেখিবে। এই আপত্তির বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে, যে, যে-সব দেশ এখন স্বাধীন বা যেখানকার লোকদের আত্মকর্তৃত্ব আছে, তথায় প্রজার অধিকার প্রথম স্থাপিত হইবার সময় সেখানেও অধিকাংশ লোক অজ্ঞ ছিল। সত্য, কিন্তু সেখানে তাহার পর অধিকাংশ লোক শিক্ষা পাওয়ায় তবে প্রজার অধিকার রক্ষিত ও বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং শুধু কোন-প্রকারে আপত্তি খণ্ডন করিলেই হইবে না, প্রজাশক্তি বৃদ্ধি ও রক্ষার অন্তরায় যে অধিকাংশ লোকের অজ্ঞতা তাহা দূর করিতে হইবে।

আর-একটি আপত্তি এই যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মসম্প্রদায়-গুলির মধ্যে সদ্ভাব না থাকায় দাঙ্গা হাঙ্গামা, রক্তপাত, লুট, ও অত্যাচার হয়। সুতরাং এদেশের লোককে দেশের কাজের সম্পূর্ণ ভার দিলে তাহারা মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে। এই আপত্তির বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে। একরকম যুক্তি আছে, যাহাতে সম্প্রদায় বা ধর্ম্মগত মনোমালিন্য, বিরোধ বা বিদ্বেষের অস্তিত্বই প্রকারান্তরে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করা হয়। এরূপ মিথ্যাকথা বলার আমরা পক্ষপাতী নহি। আমাদের যে দোষ আছে, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা উচিত। আর-এক যুক্তি এই যে পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশসকলেও পূর্ব্বে এবং এখনও শ্রেণীগত স্বার্থ, এমন কি ধর্ম্মমূলক বিদ্বেষ, লইয়া মারামারি কাটাকাটি হইত এবং এখনও মধ্যে মধ্যে হয়; সুতরাং এরূপ কিছু ঘটিলেই যে দেশের লোকদের আত্মকর্তৃত্ব থাকিতে পারে না, তাহা নয়। সত্য, কিন্তু ঐসব দেশে যে পরস্পরবিরোধী দুই পক্ষ ছাড়া তৃতীয় আর-এক পক্ষ নাই, যে পক্ষ বিরোধের সুযোগে আপনাকে শক্তিশালী করিতে বা রাখিতে উদ্‌যোগী। সুতরাং আমাদিগকে স্বাধীন দেশ-সকল অপেক্ষাও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্য হইতে হইবে। শ্রেণীগত স্বার্থ, কুসংস্কার, ধর্ম্মমূলক বিদ্বেষ, প্রভৃতি হইতে যাহাতে মারামারি না হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে উদারচরিত মানবপ্রেমিক হইতে হইবে, প্রজ্ঞাবান দেশানুরাগী হইতে হইবে।

আর-একটি আপত্তি এই যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ আছে, অধিবাসীরা নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ শ্রেণীতে সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাহাদের অনেকে অন্য অনেককে এরূপ ঘৃণা করে যে তাহারা অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এইজন্য দেশের লোকদের মধ্যে ঐক্য নাই। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির মঙ্গল কেহ চাহে না, নিজ-নিজ ক্ষুদ্রশ্রেণীগত স্বার্থই দেখে। অতএব এদেশে কেমন করিয়া গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, যে, ঠিক্ আমাদের দেশের মত জাতিভেদ না থাকিলেও ইংলণ্ডে এখনও শ্রেণীভেদ আছে, শ্রেণীগত স্বার্থ এখনও লোকে দেখে, এখনও লর্ডেরা সচরাচর মজুর-দের সঙ্গে এক টেবেলে বসিয়া খায় না, বা তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। আমেরিকায় এখনও নিগ্রোদের প্রতি অতি অবজ্ঞাসূচক বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার করা হয়, এখনও তাহারা শ্বেতদের সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান, এক হোটেলে একত্র ভোজন, এক গির্জ্জায় একত্র উপাসনা, এক রেলগাড়ীতে একত্র ভ্রমণ, বা এক স্কুলে একত্র শিক্ষালাভ সচরাচর করিতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় কাফ্রিদের সহিত, এবং ভারতসন্তানদের সহিতও শ্বেতকায়রা অনেকটা ঐরূপ ব্যবহার করে। কিন্তু তথাপি ত ঐসব দেশ স্বাধীন বা তথাকার লোকেরা আত্মকর্তৃত্ব-

বিশিষ্ট। যদিও ইংলণ্ডের শ্রেণীভেদে এবং ভারতবর্ষের জাতিভেদে প্রভেদ আছে, যদিও ইংলণ্ডের মজুর শিক্ষা পাইয়া কৃতী হইয়া লর্ড হইতে পারে এবং এখনও হয়, এবং বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শূদ্র হাজার বিদ্বান্ কৃতী ও সচ্চরিত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না, তথাপি আপত্তির উত্তর হিসাবে পূর্ব্বোক্তরূপ জবাব মন্দ নয়। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, যে, সমুদয় স্বাধীন দেশেই শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত ভেদ ক্রমশঃ কমিতেছে ও কমাইবার চেষ্টা হইতেছে। আমাদের মধ্যে তাহা হইতেছে কি?

একটি অতি প্রধান কথা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। রাস্তার মধ্যে যদি গর্ত্ত খানা খন্দ বা নদী না থাকে, বা রাস্তার মাঝখানে বামদিক হইতে ডানদিক পর্য্যন্ত একটি উচ্চ প্রাচীর বা পাহাড় না থাকে, তাহা হইলে দুর্ব্বল মানুষও সহজে ঐ রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করিতে পারে। কিন্তু যদি ভ্রমণ করিতে হইলে গর্ত্ত বা নদী বা পাহাড় বা প্রাচীর অতিক্রম করিতে হয়, তাহা হইলে পথিকের নিজের বলিষ্ঠ হওয়া দরকার, নতুবা তাহাকে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করিতেই হইবে। যে কারণেই হউক, আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথে কতকগুলি বাধা আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং বাধামুক্ত পথে চলিতে যতটুকু শক্তি দরকার, তার চেয়ে বেশী শক্তি সঞ্চিত না হইলে আমরা আমাদের বাধাসঙ্কুল পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। যে স্রোতের মাঝখানে কেহ বাঁধ বাঁধে নাই, তাহাতে অল্প জল থাকিলেও তাহা প্রবাহিত হইতে থাকে; কিন্তু যদি কেহ মাঝখানে বাঁধ বাঁধিয়া দেয়, তাহা হইলে অনেক বেশী জল সঞ্চিত না হইলে স্রোত বাঁধ টপকাইয়া বা ভাঙিয়া বহিতে পারিবে না। আমাদের জাতীয় জীবনের স্রোতের মধ্যে-মধ্যে অনেক রকমের অনেক বাঁধ পড়িয়াছে। এখন ক্ষুদ্র বৃহৎ "উচ্চ" "নীচ" শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র সকল ধর্ম্মের লোকের দেশানুরাগ ও মানবপ্রীতির বারি একত্র মিলাইলে তবে ঐ-সব বাঁধ ভাঙিয়া বা ডিঙাইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইতে পারিবে।

পৈত্রিক সম্পত্তি যতক্ষণ অন্যে দখল করে নাই বা করিবার চেষ্টা করে নাই, ততক্ষণ ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য ও বিবাদ থাকিলেও জীবনযাত্রা কোনপ্রকারে নির্ব্বাহ করা যায়। কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়া গেলেও বা হইবার উপক্রম হইলেও, যদি কোন পরিবারের ভাইয়েরা গৃহবিবাদে রত থাকে, এবং সেই ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ও বিবাদ যে পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারের অন্তরায় তাহা কেহ দেখাইয়া দিলেও যদি ঐ পরস্পর ঐক্যহীন ভাইয়েরা বলে, "অমুক দেশের অমুক পরিবারের ভাইদের মধ্যে মিল না থাকা সত্ত্বেও তাহারা পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী রহিয়াছে," তাহা হইলে তাহাদিগকে তার্কিক বলিয়া স্বীকার করিলেও বুদ্ধিমান বলিতে পারি না।

আমরা ভুলিয়া যাই, যে, দোষত্রুটিতে অন্য জাতিদের মত হইলেই আমরা শক্তিতে কৃতিত্বে সিদ্ধিতে মহত্ত্বে তাহাদের সমান হইতে পারি না। হইতে পারে যে আমাদের দোষত্রুটি দুর্ব্বলতাগুলা তাহাদেরও আছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, যে, তাহাদের সদ্‌গুণগুলা, শক্তিশালী হইবার ও থাকিবার তাহাদের আয়োজনগুলা আমাদের আছে কি না। এইটা ভাবাই বেশী দরকার।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্য-সকলে বকরীদ বা অন্য ক্রিয়া-কলাপ উপলক্ষ্যে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় না, ব্রিটিশশাসিত ভারতে হয়, ইহা বলিয়া আমরা কিছু উল্লাস ও আত্মপ্রসাদ বোধ করি। কিন্তু সে-সব জায়গায় কেবলমাত্র ইংরেজ না থাকাই কি দাঙ্গা হাঙ্গামা না হওয়ার প্রধান বা একমাত্র বা অন্যতম কারণ? কতকগুলি দেশী রাজ্যের রাজা মুসলমান; সেখানে হিন্দুরা অসুবিধায় পড়িলেও উচ্চবাচ্য করিতে পারে না; অন্য দেশী রাজ্যগুলিতে রাজা হিন্দু, তথায় মুসলমানদের অধিকার খর্ব্ব হইলেও তাহারা উচ্চ-বাচ্য করে না; অবস্থাটা কি এইরূপ হইতে পারে না? আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, যে, হিন্দু মুসলমান যেখানে সমান সমান, অর্থাৎ সমান অধিকার ভোগ করে বা সমান অনধিকার বশতঃ দুঃখ ভোগ করে, এবং হয়ত যেখানে তৃতীয় পক্ষের বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা আছে বলিয়া সন্দেহ হয়, সেখানেও আমাদের মধ্যে এরূপ সম্প্রীতি আছে যে আমরা বিবাদ কলহে প্রবৃত্ত হই না। ইহা কেবল "দেখাইবার" জন্য নয়। আন্তরিক সদ্ভাবজাত প্রকৃত অবস্থা এইরূপ হওয়া দরকার।

আরেক রকমের তর্ক করা হয়, যে, সামাজিক ভেদের

সঙ্গে রাজনৈতিক ভেদের সম্পর্ক কি? সামাজিক ভেদ থাকিলেও রাষ্ট্রীয় সাম্য ও ঐক্য হইতে পারে। কিন্তু ইহা একটা বাজে কুতর্ক মাত্র। পার্থিব ব্যাপারে রাজনৈতিক ও সামাজিক বলিয়া ভগবান দুটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাগ করিয়া দেন নাই। এক যুগে ও এক দেশে যাহা সামাজিক, অন্য যুগে ও অন্য দেশে তাহা রাজনৈতিকও হইয়াছে। এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে সামাজিক উন্নতি ও শক্তির উপরই রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত। তুমি যাহার ছায়া মাড়াও না, যাহার হাতের এক গেলাস জল খাইতে পার না বা খাওনা বলিয়া ভান কর, তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে অন্তরে অন্তরে মিলিয়া পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া একযোগে রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভের চেষ্টা করিতে পার এবং পরস্পরের জন্য দুঃখ ভোগ করিতে পার, ইহা একটা বাজে কথা। ইহা সত্য নহে। জাতিভেদ অন্তরে বাহিরে খুব মানেন এরূপ লোক রাজনৈতিক কারণে জেলে গিয়াছেন, ইহার ২।১টা দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদিগকে পরাস্ত করা হইবে না।' তাঁহাদের জেলে যাওয়াটা ইংরেজ-প্রভুত্বের বিরোধিতার জন্য ঘটিয়াছে বা সাক্ষাৎভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত শ্রেণীর লোকদের হিতচেষ্টাবশতঃ ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইতে হইবে। এইরূপ চেষ্টা করিতে গিয়া গান্ধি জেলে গিয়াছিলেন এবং চম্পারণে জেলে যাইতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই চেষ্টা করিতে পারিয়াছিলেন এইজন্য যে তিনি সাম্যবাদী মানবপ্রেমিক, তিনি ছুৎপন্থী নহেন।

"ব্রাহ্মণ," "অব্রাহ্মণ", ও "অস্পৃশ্য" জাতি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে উত্তরভারত অপেক্ষা জাতিবিচারের প্রকোপ বেশী। সেখানে বিস্তর গ্রামে ও নগরে তথাকথিত "অস্পৃশ্য" জাতির লোকেরা অনেক সরকারী রাস্তা দিয়া চলিতে পারে না। আইন নিষেধ করে না, সামাজিক কুপ্রথায় এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য উত্তর ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী। সেখানে ব্রাহ্মণেতর জাতির অনেক লোক এই বলিয়া হোমরুলের বিরোধিতা করিতেছে যে ভারতে স্বরাজ স্থাপিত হইলে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব ও অত্যাচার বাড়িবে। তাহারা আপনাদিগকে নন্-ব্রাহ্মণ (non-Brahmin) বা "অ-ব্রাহ্মণ" বলে; এবং হিন্দুসমাজের সর্ব্বনিম্নশ্রেণীস্থ "অনাচরণীয়" ও "অস্পৃশ্য" জাতিরা "পঞ্চম" বলিয়া উক্ত হয়; অর্থাৎ কিনা ইহারা মনুপ্রোক্ত চারিবর্ণের বাহিরে ও নীচে। মালাবারের পালঘাট সহরের চেরুমা নামক সামাজিক-নিগ্রহভাজন "পঞ্চম" শ্রেণীর লোকেরা তথাকার হোমরুল লীগ বা স্বরাজলাভপ্রয়াসী মণ্ডলীর ব্রাহ্মণ নেতাদিগকে বলেন, "শহরের কোন কোন রাস্তা দিয়া আমাদের চলিবার সামাজিক অধিকার নাই; আপনারা দেশের সকল লোকের জন্য রাষ্ট্রীয় অধিকার চাহেন বলিতেছেন; শহরের সকল সরকারী রাস্তা দিয়া চলিবার আমাদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিউন।" তদনুসারে ব্রাহ্মণ নেতারা তাঁহাদিগকে লইয়া শহরের কোন কোন "নিষিদ্ধ" রাস্তা দিয়া মিছিল করিয়া ভ্রমণ করিয়া আসেন। তাহাতে ঐসব রাস্তার অধিবাসী "উচ্চ" বর্ণের পবিত্রদেহ "অব্রাহ্মণেরা" খুব চটেন, এবং সভা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে এই বলেন ও অনুরোধ করেন, যে, চেরুমারা আমাদের পাড়ার রাস্তা দিয়া চলায় আমাদের বড় অপমান ও মনঃকষ্ট হইয়াছে; ভবিষ্যতে তাহারা যেন এরূপ করিতে না পায়! আর-একদিন চেরুমারা, ব্রাহ্মণ নেতাদের সাহায্য না লইয়া, স্বয়ং মিছিল করিয়া ঐসব রাস্তা দিয়া যান। তাহাতে খুব উত্তেজিত হইয়া পবিত্রদেহ "অব্রাহ্মণেরা" তাহাদিগকে খুব প্রহার করে। এইজন্য মোকদ্দমা হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রদেশের সব জায়গার সব ব্রাহ্মণ পালঘাটের ব্রাহ্মণ নেতাদের মত নয় সব অ-ব্রাহ্মণও পালঘাটের ঐ যোদ্ধা অ-ব্রাহ্মণদের মত নয়। পঞ্চমদিগের মধ্যেও ভাল মন্দ আছে। আমরা কাহারও উকীল নহি। আমরা বলি, তুমি যদি কোন জাতির মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য না কর, তাহা হইলে এই কুসংস্কার অহঙ্কার ও অবজ্ঞাকে ধর্ম্মনৈতিক বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক বা সামাজিক যে নামই দাও না কেন, তোমাকেও যদি অন্য কেহ মানুষ বলিয়া না মানে, তাহা হইলে চেঁচাইও না; তুমি ঐরূপ ব্যবহার পাইবার যোগ্য। মানুষকে সরকারী রাস্তা দিয়া চলিতে দিবে না? সেখান দিয়া যে শূকর কুকুর কৃমি কীট চলে! তোমার শরীরই যে কৃমিকীটের বাসস্থান। ধিক্ কুসংস্কার ও অমূলক অহঙ্কারকে!

সেদিন কলিকাতার ব্রিষ্টল হোটেল নামক ইংরেজদের একটা হোটেলে মহারাষ্ট্রের লিম্বডি নামক রাজ্যের এক রাজকুমার কয়েকজন বন্ধুকে ভোজ দিবার জন্য ম্যানেজারকে একটি স্বতন্ত্র কক্ষে বন্দোবস্ত করিতে বলে। ম্যানেজার পাগড়িপক্ষ লোকদিগকে হোটেলে ভোজ দিবার ও খাইবার সুযোগ দিতে অসম্মত হয়। ইহাতে আমাদের দেশী অনেক কাগজে উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ঠিক্ই ত হইয়াছে। পয়সা দিয়া অপমান কিনিতে গেলে এইরূপ হওয়াই উচিত। যাহাই হউক, একজন ইংরেজ দোকানদার আমাদের একজন রাজকুমারকে অপমান করিয়াছে বলিয়া যাঁহারা গরম কথা বলিতেছেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন যে তাঁহারাও অনেকে স্বদেশবাসীদের সহিত ভাল ব্যবহার করেন না। হোটেলের ম্যানেজার রাজকুমারের প্রস্তাবে রাজী হইত যদি রাজকুমার ও তাহার বন্ধুগণ হ্যাটকোট পরিয়া ঝুঁটা-সাহেব সাজিতে সম্মত হইত। রাজকুমারের যে ততটা হীনতা স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই, ইহাও মন্দের ভাল। কিন্তু আমাদের দেশে তথাকথিত "অস্পৃশ্য" জাতিরা, ঝুঁটা'পোষাকে নয়, বিদ্যায় চরিত্রে কৃতিত্বে ভূষিত হইলেও অপাংক্তেয় থাকিয়া যায়।

রিপন কলেজ ছাত্রাবাসে জাতিবিভ্রাট।

ইহা সকলেই জানেন, যে, বাংলাদেশে শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে লোকাচার ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আহার-ব্যবহারে জাতিবিচার করিলেও, তদপেক্ষা বেশী লোক সেরূপ বিচার করে না। বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজে জাতিবিচার প্রধানতঃ বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচনেই করা হয়। রেলে, ষ্টীমারে, চা-পানের দোকানে, হিন্দু ও অহিন্দু হোটেলে, খাবারের দোকানে, বন্ধুবর্গের মধ্যে ভোজে, বরযাত্রীর ভোজে পর্য্যন্ত, পাংক্তেয়তার বিচার বড় দেখা যায় না। সুতরাং পাংক্তেয়তা লইয়া একটি কলেজের ছাত্রাবাসে জাতিতে জাতিতে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে শুনিলে বড় দুঃখ হয়। রিপন কলেজের ছাত্রাবাসের কতকগুলি ব্রাহ্মণ ছাত্র বৈশ্য সাহা জাতীয় ছাত্রদের সঙ্গে এক ভোজনকক্ষে খাইতে অস্বীকার করায় গোলমাল হইয়াছে। কলেজের স্থাপনকর্ত্তা সুরেন্দ্রবাবু ও কমিটির অন্যতম সভ্য তাঁহার জামাতা লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এরূপ মনোমালিন্যের বিরোধী। আশা করি, এত দিনে গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে। আমরা এমন কথা বলি না, যে, কাহারও অন্য জাতের লোকের সঙ্গে এক ঘরে বা পংক্তিতে বসিয়া খাইতে আপত্তি থাকিলেও তাহাকে একসঙ্গে খাইতে বাধ্য করিতে হইবে; কখনই না। কিন্তু তেমনি জোরে ইহাও বলি যে যাহাদের একত্র খাইতে আপত্তি নাই, তাহাদিগকেও স্বতন্ত্র খাইতে বাধ্য করা উচিত নয়। আবশ্যক হইলে, একত্র খাইবার ও স্বতন্ত্র খাইবার দুই রকমেরই বন্দোবস্ত থাকা উচিত; যেমন রবিবাবুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আছে। সেখানে উভয় বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও একত্র খাওয়ার দলই বড়।

যাঁহারা একত্র অন্য জাতির সহিত একঘরে খাইতে চান না, তাঁহাদের একটু আত্মপরীক্ষার দরকার। তাঁহারা রেলগাড়ীতে, রেলওয়ের প্লাটফর্মে, ষ্টীমারে, বয়স্যদের মধ্যে ভোজে, জাতিবিচার রক্ষা করিতে পারেন কি না ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহারা কেহ চা-পানের দোকানে, হিন্দু বা অহিন্দু হোটেলে, এবং খাবারের দোকানে খান কি না, ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহারা ভাতের মণ্ড দিয়া পাকান ও জড়ান চুরুট খান কি না, এই ভাত নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের রাঁধা কি না, চুরুট-প্রস্তুতকারীরা সুব্রাহ্মণ কি না, এবং যত হাত দিয়া চুরুট দোকানে আসিয়াছে ও বিক্রী হইতেছে, তাহারা ব্রাহ্মণ কি না, সব ভাবিয়া দেখিবেন। দেশী বিদেশী বিস্কুট ও অন্যান্য অনেক জিনিষ সম্বন্ধেও এইরূপ প্রশ্ন করা যায়।

বৈশ্য সাহা ছাত্রগণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করি। কিন্তু তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া যে আমরা তাঁহাদের পক্ষে, তাহা নয়; তাঁহারা মানুষ বলিয়াই আমরা তাঁহাদের পক্ষে। এই কারণে আমরা তাঁহাদিগকেও একটি কথা বলিতে চাই। ব্রাহ্মণ কোন কোন ছাত্র তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় ও ভোজনকক্ষে সাহচর্য্যের অযোগ্য মনে করায় তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; ক্ষুণ্ণ হইবার যথার্থ কারণ আছে। কিন্তু সামাজিক প্রথা অনুসারে যাঁহারা তাঁহাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া বিবেচিত হন, সাহারা কি তাঁহাদের সহিত সমান সমান

ব্যবহার করিতে ও তাঁহাদের সঙ্গে এক কক্ষে ও পংক্তিতে বসিয়া খাইতে রাজী আছেন? যদি রাজী থাকেন, উত্তম। কিন্তু যদি রাজী না থাকেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাঁহাদের ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়। ভেদ যদি মানিতে হয়, সকলের বেলায়ই মানিতে হইবে; যদি মানিতে না হয়, তাহা হইলে কাহারও বেলায় মানিতে হইবে না। এক ঘরে এক পংক্তিতে সকল জাতির সহিত বসিয়া খাইলে ঐহিক বা পারত্রিক, শারীরিক বা আধ্যাত্মিক, কোনও অকল্যাণ হয় না।

ওড়িয়া কুলির অপঘাত মৃত্যু।

কয়েকটি ইংরেজী কাগজে একজন ওড়িয়া কুলির অপঘাত মৃত্যুর বৃত্তান্ত দেখিলাম। তাহাতে অসম্ভব বা বিশ্বাসের অযোগ্য কিছু না থাকায় খবরটি সংক্ষেপে দিতেছি। একজন ওড়িয়া কুলি একখানা আফিস-যান ঘোড়ার গাড়ীর আঘাতে পড়িয়া যায়, ও গুরুতর আঘাত পাওয়ায় মুমূর্ষু দশায় উপস্থিত হয়। একজন পথিক মুমূর্ষু লোকটির মৃত্যুযন্ত্রণার লাঘব করিবার নিমিত্ত জল চাওয়ায় নিকটবর্ত্তী একটি দোকান হইতে একটি পিতলের ঘটী করিয়া জল আনীত হয়। পথিক যখন আহত লোকটির রক্ত ধুইতেছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাহাকে জল পান করাইতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ ঘটীটি তাঁহার হাত হইতে জোরে কাড়িয়া লওয়া হইল। ঘণ্টা খানেক পরে কুলিটি মারা পড়ে। তাহার স্পর্শে পিতলের ঘটীটি অপবিত্র হইবার ভয়ে বোধ হয় উহার মালিক উহা কাড়িয়া লইয়াছিল। জল পাইলে কুলিটি বাঁচিত কি না, জানি না; কিন্তু ঘটীটি কাড়িয়া না লইলে প্রমাণ হইত যে সমাজদেহে কুসংস্কার অপেক্ষা দয়ামায়ার শক্তি বেশী। কিন্তু প্রমাণ যাহা হইয়াছে, তাহা এই, যে, মরণাপন্ন একজন কুলির প্রাণরক্ষা বা দুঃখলাঘব অপেক্ষা পিতলের ঘটী "পবিত্র" রাখা বেশী বাঞ্ছনীয়, এইরূপ বিশ্বাস কোন কোন লোকের আছে। শতকরা কতজন লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে, জানি না।

সংবাদটি মিথ্যা হইলে সুখের বিষয় হয়। কিন্তু মিথ্যা কি না কেমন করিয়া জানিব?

বিহারে দাঙ্গা হাঙ্গামা।

বড়লাট সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই বিহারের কোন কোন জেলায় হিন্দুসমাজভুক্ত কতকগুলি লোক মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন, এবং সকল সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে অনুরোধ করেন যে তাঁহারা ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও বিরোধ নিবারণের জন্য যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। হইতে পারে যে ইতিপূর্ব্বে কোন বড়লাট এরূপ কোন্ দাঙ্গা হাঙ্গামা উপলক্ষ্য করিয়া কিছু বলেন নাই। কিন্তু অতীতের কথা না তোলা ভাল। বিহারের অত্যাচারের পর মুসলমানেরা কেহ কেহ বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন যে হিন্দু নেতারা ও খবরের কাগজওয়ালারা তৎসম্বন্ধে আপনাদের কর্ত্তব্য করেন নাই। মৈমনসিংহে, কুমিল্লায়, পাঞ্জাবের কয়েকটা জেলায় যখন অত্যাচার হইয়াছিল, তখনও দোষী পক্ষের নেতারা হয়ত কর্ত্তব্য করেন নাই। কথা কাটাকাটি করিয়া কোন লাভ নাই। ধর্ম্মোন্মত্ত, ভ্রান্ত বা দুর্বৃত্ত লোকেরা যাহা করে, সুস্পষ্ট ও যথেষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে আমরা তাহার জন্য তাহাদের সম্প্রদায়ের সমুদয় বা অধিকাংশ লোককে দায়ী করিতে পারি না। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার হয় ও আন্তরিক সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্যই যে আবশ্যক তাহা নয়। ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি, এবং তাহা সকলের উন্নতি-সাপেক্ষও বটে। কিন্তু সামাজিক জীব মানুষের সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার উদ্দেশ্য সামাজিকতা বৃদ্ধি ও তজ্জনিত আনন্দলাভ। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি না থাকিলে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কোন কালে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। দাঙ্গা ঘটিতে থাকিলে পুলিশ বা ফৌজ আনিয়া গুলি চালাইবার পর দাঙ্গা থামিয়া যায় বটে, এবং আদালতের বিচারে অনেকে কঠিন শাস্তিও পায়। কিন্তু বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে দাঙ্গা ও অত্যাচার হইতে পায় কেন? কোথায় কে

একটা কি সামান্ত চিঠি লিখিয়াছে, তাহার উপর একটা বিশাল সন্দেহের ইমারৎ তুলিয়া কত বালক ও যুবকের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। আর, শাহাবাদ, গয়া ও পাটনা জেলার শত শত গ্রামে হাজার হাজার লোক দলবদ্ধ হইয়া লুটপাট অত্যাচার করিল, দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাবেও ঐরূপ হইয়াছিল; এ সমস্ত ত হঠাৎ হয় নাই। ইহা অনেক দিন পরামর্শ ষড়যন্ত্র পত্রব্যবহারের ফল। এত পুলিস, এত তহসিলদার, ডেপুটি, মাজিষ্ট্রেট, তদুপরি কমিশনার, আছেন; কেহ ঘুণাক্ষরেও একটা সন্দেহের আভাসও পাইলেন না? তাহা হইলে তাঁহারা কি নিদ্রা দিবার জন্ত বেতন পান? যে-যে এলাকায় এরূপ বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে অত্যাচার হয়, তথাকার শাসন ও পুলিস বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর সমুচিত শাস্তি হওয়া উচিত। সাক্ষাৎভাবে যাহাদের এলাকায় এরূপ কিছু হয়, তাহাদিগকে পদচ্যুত করা উচিত। তৎপরিবর্ত্তে হইয়াছে কি, না, কমিশনার প্রকাশ্যভাবে বিহার গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা পাইয়াছেন! দাঙ্গা নিবারণের পথ ইহা নয়।

এংলোইণ্ডিয়ান কাগজগুলা বলে, 'তোমরা এ-সব দাঙ্গা নিবারণ করিতে পার না, তোমরা আবার স্বরাজ চাও!' লোকগুলোর যদি একটুও লজ্জা আছে। দাঙ্গা নিবারণের ভার যে তোমাদেরই জা'ত-ভাইয়ের উপর। তোমাদের নিজের স্বাধীন দেশেও যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। ভারতবর্ষে এসব অত্যাচার ত আমাদের শাসন-অসামর্থ্যের পরিচায়ক নহে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরই শান্তিরক্ষা-বিষয়ে অক্ষমতার প্রমাণ। আমাদের আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যদি আমরা এসব নিবারণ করিতে না পারি, তখন দোষটা আমাদের হইবে।

ভাগলপুরে ধৃত বালকের অপরাধ।

বিহার-ওড়িষার ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে বোলপুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ষোল বছরের অনাথবন্ধু চৌধুরী নামক যে ছাত্রকে ভাগলপুরে গেরেপ্তার করা হয়, গবর্ণমেণ্টের হস্তস্থিত প্রমাণ হইতে গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন, যে, সে ভাগলপুরের বিপ্লবপ্রয়াসী দলের একজন, এবং দলের কার্য্যের সাহায্য করিবার জন্ত ভাগলপুরে আসিয়াছিল! এই বালকের বাড়ী ত্রিপুরা জেলায়; তাহা ভাগলপুর হইতে অনেকশত মাইল দূরে। বোলপুর হইতেও ভাগলপুর বহুদূর। বালক জীবনে এই প্রথম ভাগলপুর গিয়াছিল। বোলপুর ছাড়িবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে ধৃত হয়। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নামে যত চিঠি আসে, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেখিয়া তবে ছাত্রদিগকে দেন। এ অবস্থায় এই বালক ভাগলপুরের বিপ্লবপ্রয়াসীদলের একজন লোক কেমন করিয়া হইল? ঐ দলের অন্ত লোকেরা কে? তাহাদের সঙ্গে বালকের যোগের কি প্রমাণ আছে? প্রমাণ আছে বলিলেই ত হইবে না, প্রমাণ দেখাইতে হইবে, নতুবা লোকে বিশ্বাস করিবে না। ডিকেন্সের পিকুইক্ পেপার্সে একজন বিচারক অভিযুক্তকে বলিতেছেন, "আমি যখন বলিতেছি তুমি মাতাল হইয়াছ, তখন তুমি কোন্ সাহসে বলিতেছ যে তুমি মাতাল নও?" এরূপ প্রবল যুক্তি কে খণ্ডন করিবে?

নাম করণে বিপদ্।

বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামের সিন্ধুবালা নাম্নী এক অন্তঃপুরিকাকে গেরেপ্তার করিবার জন্ত পুলিসের উপর হুকুম হয়। সশস্ত্র কন্‌ষ্টেবল আদি আনিয়া যথাসম্ভব আড়ম্বর সহ গেরেপ্তার-কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর পুলিসের কর্ত্তার কর্ণগোচর হইল যে নিকটবর্ত্তী আর-এক গ্রামে আর-এক সিন্ধুবালা আছেন। সুতরাং তাঁহাকেও গেরেপ্তার করা হইল! এত আতঙ্ক ও ভীতিবিহ্বলতা! তাহার পর উভয়কে রাস্তা দিয়া হাঁটাইয়া জমীদারের কাছারীতে লইয়া যাওয়া, তথায় এক রাত্রি বন্ধ করিয়া রাখা, তৎপরে আবার হাঁটাইয়া দূরবর্ত্তী ইন্দাস থানায় লইয়া যাওয়া, সেখান হইতে রেলযোগে বাঁকুড়ায় লইয়া যাওয়া, ষ্টেশন হইতে হাঁটাইয়া থানায় লইয়া যাওয়া, তদনন্তর কয়েকদিন জেলে আবদ্ধ রাখা, ইত্যাদি লাঞ্ছনারপর নির্দোষ বলিয়া উভয়েই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা। কি আর বলিব!

পুলিস এখন একজন সিন্ধুবালার স্বামী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষকে গেরেপ্তার করিয়াছেন। এই সিন্ধুবালার ভাই নজরবন্দী আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষকে কেন

গেরেপ্তার করা হইয়াছে জানি না। ধরুন যেন তাঁহার দোষ আছে। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার স্ত্রী বা অন্য আত্মীয়াকে লাঞ্ছিত করা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল বা পুলিসের কর্ম্মচারী-বিশেষের কর্ম্মিষ্ঠতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইয়াছিল, ইহা কোন্ মূর্খ বিশ্বাস করিবে? কিন্তু যদি দেবেন্দ্রবাবু নির্দ্দোষ হন, তাহা হইলে ত বড় মুস্কিলের কথা। কাহারও স্ত্রী এবং অন্য আত্মীয়া বিনাদোষে কোন কোন পুলিসের লোক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হওয়ায় ঐসব কর্ম্মচারীকে যদি অপ্রতিভ হইতে হয়, তাহা হইলে পরিবারস্থ কোন পুরুষেরও লাঞ্ছনা হওয়াটা কি একান্ত আবশ্যক ও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত? আমাদের বোধ হয় দেবেন্দ্রবাবুর দোষ আদালতে প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যক। শচীন্দ্র দাসগুপ্তের আত্মহত্যার পর যখন তাহার এক ভাই তাহার অনেক চিঠি খবরের কাগজে বাহির করিয়া দেয়, তাহার পর ঐ ভাইকে গেরেপ্তার করিয়া আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। একটা ঘটনার পর আর-একটা ঘটনা ঘটিলেই কাকতালীয় ন্যায় অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তীকে পরবর্ত্তীর কারণ মনে করা ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু লোকের সন্দেহ ও আশঙ্কা ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলে না। এইজন্য সব স্থলে না হউক, অন্ততঃ দুএকটি স্থলে, ধৃত লোকদের দোষ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ করা দরকার। নতুবা লোকের মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়। তবে যদি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা বলেন, লোকের সন্দেহে কি আসিয়া যায়?—তবে তাহার উত্তর আমরা দিতে চাই না।

গবর্ণমেণ্টকে আমরা কিছু অনুরোধ করিতে না পারিলেও দেশের লোককে বলি, ছেলেমেয়ের নাম রাখিবার সময় পুলিসের পরামর্শ লইয়া রাখিবেন; ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন আসামী বা সন্দেহভাজন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের নামে নাম রাখিবেন না। কি জানি যদি ভয়ে বা ভ্রমে তাহাদের গেরেপ্তার ঘটিয়া যায়।

জেলার বড় কর্ত্তা কে?

সম্প্রতি বঙ্গেয় ব্যবস্থাপক সভায় দুটি প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে, রাজনৈতিক কারণে আবদ্ধ বাবু নগেন্দ্রকুমার গুহ-রায়ের সপক্ষে জেলার ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডিবিজনের বাঙ্গালী কমিশনার সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। তথাপি তিনি আবদ্ধ হইয়াছেন। বাবু জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সপক্ষেও হুগলীর ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট কিছু বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি আবদ্ধ হইয়াছেন। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, যে, হয় ম্যাজিষ্ট্রেটরা জেলার খবর জানেন না, কিম্বা কোন কোন খবর তাঁহাদের নিকট হইতে গোপন রাখা হয়; নয়, তাঁহারা খবর জানিলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচারশক্তির উপর ততটা আস্থাবান্ নহেন, যতটা পুলিসের উপর।

অতএব, চতুর ভাইরা, কেহ পুলিসের কুনজরে পড়িও না। ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটও তোমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবেন না।

বোম্বাইয়ে আচার্য্য বসুর অভ্যর্থনা।

বোম্বাইয়ের লোকেরা মৌখিক আদর করিয়া ও ভিড় করিয়া মালা পরাইয়া আচার্য্য বসু মহাশয়কে বিদায় দেয় নাই। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকে ৫০,০০০ টাকার টিকিট কিনিয়াছিল। ছাত্রেরা ও অন্যেরা চাঁদা করিয়া তাঁহাকে একাধিক জায়গায় বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য টাকার থলি উপহার দিয়াছে। তাহার পর বোম্বাইবাসীরা সভা করিয়া তাঁহার বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য দুইলক্ষ টাকা দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইবাসী শ্রীযুক্ত এস্ আর বোমাঞ্জী এক লক্ষ, শ্রীযুক্ত মূলজি খাটাউ সওয়া দুই লক্ষ, এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ যমুনাদাস ২৫,০০০ টাকা দিয়াছেন। বোম্বাই হইতে নিউইণ্ডিয়ার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে বড়োদার মহারাজা গায়কবাড় বসুবিজ্ঞানমন্দিরে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বাঙ্গালী ও অন্য প্রদেশবাসী।

আচার্য্য বসু যখন বোম্বাইয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, প্রায় সেই সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে মান্দ্রাজে বক্তৃতা করিতেছিলেন, এবং সমাদর লাভ করিতেছিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে দিয়া দাদাভাই নৌরোজি মহাশয়ের একটি চিত্রের আবরণ উন্মোচন করান হয়। মান্দ্রাজে তিনি যাওয়ায় বিজ্ঞানচর্চ্চার উৎসাহ ও প্রকৃত

দেশপ্রীতি জাগিয়াছে, এবং লোকে বুঝিয়াছে যে অনাড়ম্বর খোসার ভিতরে মনুষ্যত্ব থাকে। আর একটা এই দেখিলাম, যে, যেমন বোম্বাইয়ে নানা ভিন্নপন্থী দলের লোক আচার্য্য বসুর প্রশংসা করিয়াছে, মান্দ্রাজেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দলের কাগজ আচার্য্য রায়ের প্রশংসায় একমত। তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বক্তৃতার জন্য যে ৭৫০৲ টাকা দক্ষিণা পাইয়াছিলেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়কেই দিয়া আসিয়াছেন। উহার সুদ হইতে "সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ পুরস্কার" নামক একটি বার্ষিক পুরস্কার রসায়নবিজ্ঞানে গবেষণায় উৎসাহ দিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী গ্রাজুয়েটকে দেওয়া হইবে।

যোগ্য বাঙালীর গুণের আদর বাংলার বাহিরে হয়। আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে অন্য প্রদেশের যোগ্য লোকদের আদর করিতে, এমন কি, অন্যপ্রদেশে যে যোগ্যতা থাকিতে পারে তাহা অন্তরে বিশ্বাস করিতে, আমরা রাজী কি না। বাংলাদেশের অভাবের সময়, কিম্বা বাংলাদেশের বা ভারতের কাজে, অন্য প্রদেশবাসীরা যেরূপ টাকা দেন, আমরা কি সমগ্র ভারতের কাজে বা অন্য-প্রদেশের অভাবের সময় সেরূপ টাকা দিতে ইচ্ছা করি?

বঙ্গে গোধন, চাষের জমী ও শস্য।

পাশ্চাত্য প্রায় সকল দেশেই কারখানায় নানাবিধ কলের সাহায্যে যত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়, বঙ্গে তাহা হয় না। শিল্পে আমরা পাশ্চাত্য দেশ-সকলের এবং জাপানের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। কিন্তু এরকম ধারণা অনেকের আছে, যে, গোধন, চাষের জমী ও উৎপন্ন শস্যে অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের অবস্থা ভাল না হউক, আমরা মোটের উপর তাহাদের সমকক্ষ। কিন্তু অন্য দেশের সহিত আমাদের অবস্থার তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আমরা এসব বিষয়েও পশ্চাতে পড়িয়া আছি। শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ গত মার্চ মাসে আমাদিগকে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন; তাহা অবলম্বন করিয়া তুলনার ফল পাঠকদিগকে জানাইতেছি।

বাংলা দেশে চাষের জমী যত আছে, তাহা সকল অধিবাসীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকের অংশে দু বিঘারও কম পড়ে। বিলাতে প্রত্যেকের ভাগে সাড়ে তিন বিঘা পড়ে। ফ্রান্সে সাড়ে চারি বিঘা পড়ে। জার্মেনীতে ৩·৯ বিঘা পড়ে। ইটালীতে সাড়ে তিন বিঘা পড়ে। বঙ্গে যত গোচারণ-ভূমি আছে, তাহাতে প্রতি আশীটি গোরুর ভাগে কেবলমাত্র মোট এক বিঘা পড়ে। বিলাতে প্রত্যেক গরুর ভাগে ৩·০৬ বিঘা পড়ে। ফ্রান্সে গরু-প্রতি ১·৮ বিঘা গোচারণের মাঠ আছে। জার্মেনীতে গোরু প্রতি ·৮৭ বিঘা আছে। ইটালীতে আছে ·৮৮ বিঘা। বাংলাদেশে যত গরু আছে তাহাতে প্রতি-দুজন মানুষের ভাগে একটি গরু পড়ে। বিলাতে প্রত্যেক মানুষের ভাগে দুটিরও বেশী পড়ে। ফ্রান্সে প্রতি-দুজনের তিনটি পড়ে। জার্মেনীতে প্রত্যেকের ভাগে একটির কিছু বেশী পড়ে। ইটালীতে জন-প্রতি প্রায় একটি পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই সকল বিষয়েই বাংলা দেশের অবস্থা ইউরোপের কয়েকটি প্রধান দেশের অবস্থা অপেক্ষা খারাপ।

বাংলার চাউলের পরিমাণ।

বাংলার লোকসংখ্যা মোটামুটি ৪ কোটি ৬০ লক্ষ। প্রত্যেকের জন্য বৎসরে গড়ে ৭মণ চাউল দরকার হয়। সমস্ত অধিবাসীর জন্য প্রয়োজন হয় ৩২ কোটি ২০ লক্ষ মণ। কিন্তু বঙ্গে উৎপন্ন হয় ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ মণ, এবং তাহার মধ্যে রপ্তানী হয় এক কোটি মণ। বাকী থাকে ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ মণ। সুতরাং কম পড়ে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ মণ, অর্থাৎ ১ কোটি ২০ লক্ষ জন মানুষের খাদ্য। ইহার মানে এই যে বাংলা দেশকে হয় শতকরা ছাব্বিশ জন মানুষের জন্য চাউল অন্য দেশ হইতে আমদানী করিতে হয়, কিম্বা বিস্তর লোক যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায় না।

বাংলাদেশে চাষের যোগ্য পতিত জমী বিস্তর আছে। চাষ করিলে তাহা হইতে খাদ্যশস্য বিস্তর উৎপন্ন হইতে পারে। তাছাড়া যেসব জমী এখন চাষ করা হয়, উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হইলে তাহা হইতেও অনেক বেশী পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি-একার (acre) জমীতে ইংলণ্ডে জার্মেনীর দেড় গুণ শস্য জন্মিত; কিন্তু এখন জার্মেনী ইংলণ্ডকে পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এই পঁচিশ বৎসরে,

জার্মেনীতে আগে যে-জমীতে ১০০ মণ শস্য জন্মিত, এখন তথায় ১৭০ মণ জন্মে। তা ছাড়া, জার্মেনী পূর্ব্বে যে-সব জমীতে কম পুষ্টিকর শস্য জন্মাইত, এখন তথায় অধিক-পুষ্টিকর শস্য জন্মায়।

ধানের চাষ আমাদের দেশ অপেক্ষা স্পেন, জাপান, প্রভৃতি দেশে ভাল হয়। তথাকার প্রণালীর উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা আমাদের কৃষকদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া দিলে সুফল হইবার সম্ভাবনা।

ধনী ও গরীবের প্রতি রেলওয়ের ব্যবহার।

১৯১৫-১৬ সালে ভারতবর্ষের সমুদয় রেলওয়ের মোট আয় ৬০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক তৃতীয় ও ইণ্টারমীডিয়েট শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অধিকাংশ ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী। রেল কোম্পানীরা তৃতীয় ও ইণ্টারমীডিয়েট শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে আলোচ্য বৎসরে ১৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছে পাইয়াছিলেন ১ কোটি ৬০ লক্ষ মাত্র। কিন্তু অপমান, ধক্কাধাক্কি, ও কষ্টভোগ করে গরীব যাত্রীরা; আর সম্মান ও আরাম জুটে ধনীদের ভাগ্যে। ওয়েটিং রুমের অভাব, টিকিট কিনিবার অসুবিধা, পানীয় জল ও খাদ্য দ্রব্য পাইবার অসুবিধা, গরীবদেরই বেশী। ১ম ও ২য় শ্রেণীর যাত্রীরা যত সহজে রিজার্ভ গাড়ী পায়, গরীবেরা তত সহজে পায় না।

ধনী ও দরিদ্র যাত্রীদের জন্য রেলকোম্পানীদের ব্যবস্থা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে। এই কোম্পানীর যাত্রী-গাড়ীর সংখ্যা ২৩১০; তন্মধ্যে ২৮৮টা ১ম ও ২য় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য এবং রিজার্ভ গাড়ী; ১৩৮৭টা ৩য় ও ইণ্টার শ্রেণীর জন্য; বাকী ৬৩৫টা সাধারণ যাত্রীদের জন্য নয়। নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের জন্য গাড়ীর সংখ্যা উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের গাড়ীর সংখ্যার প্রায় পাঁচগুণ মাত্র; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর যাত্রীরা সংখ্যায় উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের এক-শত গুণেরও অধিক। ইণ্টার ও ৩য় শ্রেণীর যাত্রীদের সংখ্যা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৯ শত; ১ম ও ২য় শ্রেণীর যাত্রীদের সংখ্যা মোটে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩ শত মাত্র। যাহারা সংখ্যায় ১০০ গুণ, তাহারা জায়গা পায় মোটে ৫ গুণ। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে উপরের দুই শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে যত টাকা পায়, নীচের দুই শ্রেণীর লোকদের নিকট হইতে তাহার দশগুণ টাকা পায়। এই-সব সংখ্যা সিটী কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংকলিত।

সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ন।

যে কয়জন অল্পসংখ্যক ইংরেজের কথায় ও কাজে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজজাতির ধর্ম্মবুদ্ধির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইত, সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ন তাদের একজন ছিলেন। তিনি ভারতের নুন খাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞ হন নাই। ভারতবাসীদের সহিত তিনি কেবলমাত্র মৌখিক "সহানুভূতি" প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে তিনি ভারতবর্ষের সেবায় সময় শক্তি ও সম্পত্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এখন ভারত-শাসনের মূল বিধি পরিবর্ত্তিত করিয়া ভারতবাসীদিগকে ক্রমে ক্রমে আত্মকর্ত্তৃত্ব দিবার কথা চলিতেছে। এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় আমাদের ক্ষতি হইল; যদিও বয়সের হিসাবে তাঁহার মৃত্যুকে কোনক্রমেই অকালমৃত্যু বলা যায় না।

ভ্রম সংশোধন

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের দেহান্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রবাসীতে লেখা হইয়াছিল "তিনি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী মীরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।" কিন্তু শ্রীযুক্ত নবকুমার সমদ্দার আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে "১৭৬০ শকে (১২৪৫ সালে) ৬ই কার্ত্তিক ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কানড়গাঁ গ্রামে প্রসিদ্ধ রায়-পরিবারে গোবিন্দচন্দ্রের জন্ম হয়।" তিনি আরও জানাইয়াছেন যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' পুস্তকে কবি গোবিন্দচন্দ্রের যে পরিচয় আছে তাহাতে ভুল আছে ও তাহা অসম্পূর্ণ। সমদ্দার মহাশয় কবি গোবিন্দচন্দ্রের জীবনের মোটামুটি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 'উৎসব' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে 'একটি উপমা' ও 'স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে' শীর্ষক দুটি ছোট কবিতার লেখকের নাম লেখা হইয়াছে নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র, কিন্তু তাহাদের রচয়িতার নাম শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাসীর সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুরোহিত

চিত্রকর শ্রীযুক্ত নটেশনের সৌজন্যে

I. B. SONS, CALCUTTA
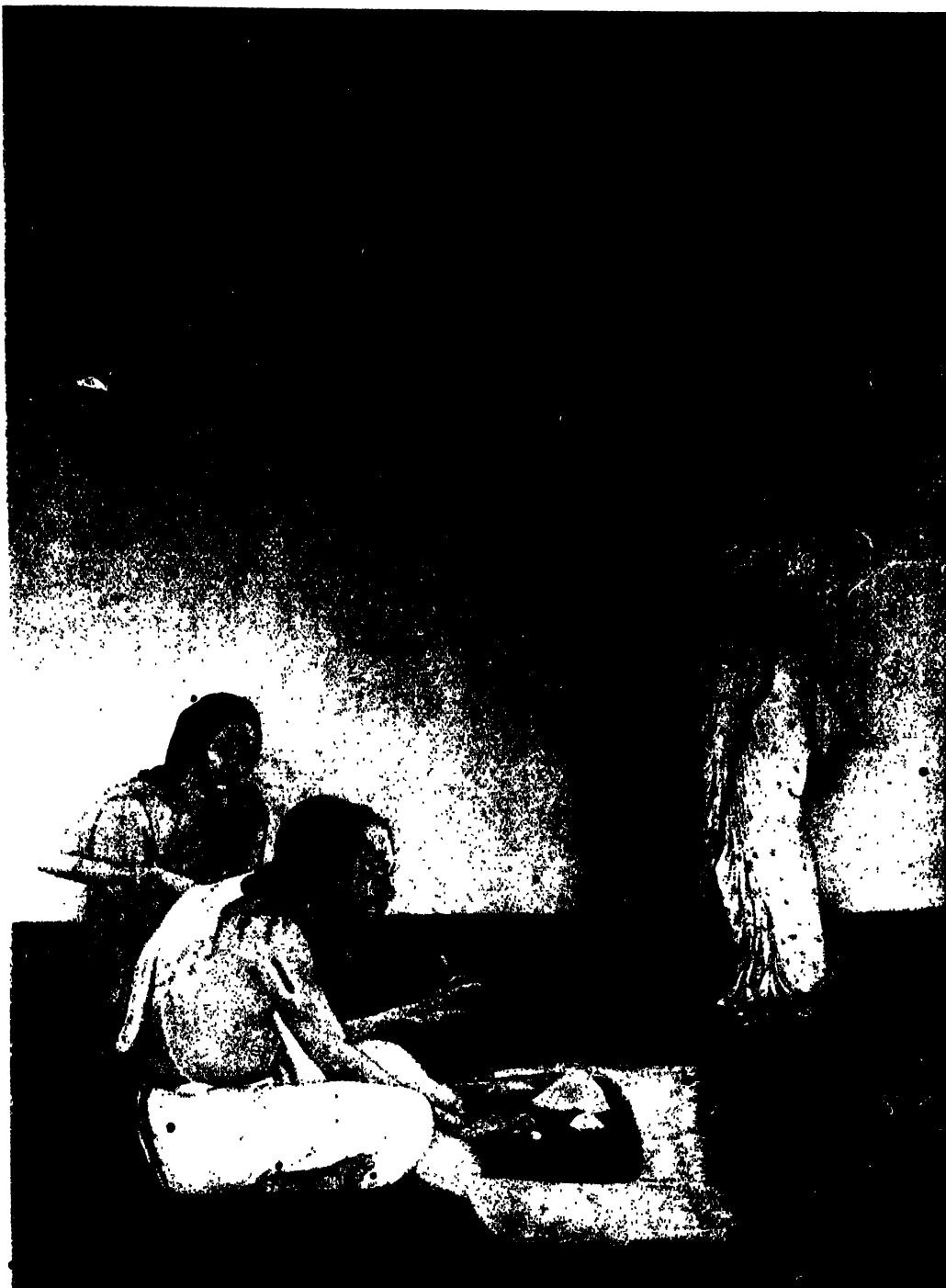
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২৪

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিজয়ী

তখন্ তারা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে
ছুটেছিল বীর মত্ত অধীর, রক্ত ধূলির পথ-বিপথে।
তখন তাদের চতুর্দ্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক-মত
মন্দ-গমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্ত বায়ে;
বিহঙ্গ-গান শান্ত তখন্ গহন রাতের বসন ছায়ে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠ্‌ল জ্বলে'।
অন্ধকারের ঊর্দ্ধতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুট্‌ল যেন দম্ভভরে;
দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার পরে।
ভাব্‌ল পথিক, এই যে তাদের মশাল-শিখা,
নয় সে কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা।
ভাব্‌ল তা'রা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাব্‌ল তা'রা, এই শিখারই ভীষণ বলে

রাত্রি-রাণীর দুর্গপ্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধকপাট দীর্ণ করে' ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

ঐ বাজেরে ঘণ্টা বাজে।
চম্‌কে উঠেই হঠাৎ দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রামাঝে।
আপ্‌নাকে হায় দেখ্‌ছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষমণির রাজার বেশে;
মহেশ্বরের বিশ্ব যেন লুঠ করেচে অট্ট হেসে।

শূন্যে নবীন সূর্য্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্বচেতন কেতন-আগে
জ্বলচে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্রপ্রাগে;
মশাল-জ্বালা লুপ্তি ধূলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেচে, আকাশ পুলকময়!
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবনের হিসাব

জীর্ণপ্রায় বৎসরের আয়ু ফুরাইতে-না-ফুরাইতে যখন মাসিক-পত্রিকার কবিদলে নববর্ষের কবিতা লিখিবার তাড়া পড়িয়া যায়, তখন সেই একই কাব্যধর্মের প্রেরণায় কতগুলি মামুলি ভাবুকতা, বৎসরের পর বৎসর মাথা জাগাইয়া বাহির হয়। এই-সকল জল্পনার মধ্যে একটি অতি পরিচিত প্রস্তাবনা এই যে, অতীত বৎসরের হিসাব-নিকাশ করিয়া নূতন হালখাতার সূচনা কর। পাপ-পুণ্যের লাভ-লোকসান খতিয়া, সার্থক-চেষ্টা ও ব্যর্থ-সংগ্রামের দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেখ, নূতন বৎসরের জন্য জীবনের ভাণ্ডারে তোমার কতটুকু সম্পদ্ উদ্বৃত্ত থাকে।

জানি না, যথার্থই কেহ জীবনটাকে এই ভাবে যাচাই করিয়া দেখেন কি না, অথবা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য বোধ করেন কি না। কিন্তু এই এক আশ্চর্য্য দেখি যে সংসারে সকলেই নানারকম মাপ-কাঠি লইয়া নিজের ও দশের জীবনের মূল্য ও মর্য্যাদা বিচার করিয়া ফিরি।

সাংসারিক তৈজস হিসাবে যে-সকল মানযন্ত্রাদির ব্যবহার চলে, তাহাদের প্রত্যেকের এক-একটা আদর্শ প্রমাণ বা "Standard" আছে। তাহাতে অসংখ্য জড় ব্যাপারের শক্তি সময় গুরুত্ব আয়তন প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ ও পরিচয়ের ওজন ও অনুপাত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। বিরাট কলকব্জাসমন্বিত জটিল এঞ্জিন, তাহারা কি পরিমাণ কয়লা খাইয়া কি পরিমাণ কাজ দেয়, তাহার স্পষ্টরকম হিসাব আদায় হইতেছে। এই-সকল হিসাব কাহারও মন-গড়া অনির্দ্দিষ্ট খামখেয়ালির ব্যাপার নহে। কারণ ইহারা প্রমাণ-সিদ্ধ। যাহার ওজন সাত সের তাহা রামের কাছেও সাত সের শ্যামের কাছেও সাত সের। রেলওয়ে লগেজের কেরাণীর কৃপায় তাহার ওজনের অঙ্ক নড়িলেও তাহার যথার্থ গুরুত্বের হিসাব ক্ষুণ্ণ হয় না।

কিন্তু জীবনের মর্য্যাদা মাপিবার এমন কোন সরকারী মাপকাঠি নাই। থাকিলেও, তাহার প্রয়োগ-কালে সকল সময়েই প্রত্যেকের রুচি ও সংস্কারমত কিছু-না-কিছু তফাৎ হইয়া পড়িবেই। পুরাদস্তুরভাবে কোন মানুষ কোন মানুষকে জানিতে পারে না, একেবারে পক্ষপাতশূন্য হইয়া কেহ কাহাকেও বিচার করিতে পারে না। প্রাণে যাহার সম্বন্ধে দরদ আছে বিচারের সময় তাহার জমার হিসাবে বিচারকের মমতার অঙ্কগুলাও অলক্ষিতে যুক্ত হইয়া থাকে। যেখানে সে দরদ নাই, বিচারপদ্ধতি সেখানে নির্ম্মম ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে কোনই দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এত অসম্ভব বাধা সত্ত্বেও দেখি মানুষে আপন আপন ঘরাও মাপকাঠি লইয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে যে-কোন জীবনের উচ্চতা ও গভীরতার বিষয়ে বিচার-কোলাহলে প্রবৃত্ত হয়। মহর্ষির আত্মজীবনী পাঠ করিয়া ইংরেজসমালোচক তাঁহার খৃষ্টানী মাপকাঠির দোহাই দিয়া বলিলেন "ইহার মধ্যে গভীরতার অভাব—কেননা, এখানে পাপবোধ ও অনুতাপের কোন চিত্র বা পরিচয় নাই।" হিন্দু-নামধারী পণ্ডিত তাঁহার সন্ন্যাসাভিমানের মামুলি মাপকাঠি উচাইয়া বলিলেন, "উচ্চতায় কিছু খাটো দেখিতেছি; কেননা, লোকটি সংসারী।"

এইরূপে আপন-আপন খাস্ বিচারপদ্ধতি অনুসারে সকলেই সকলকে অল্পাধিক পরিমাণে যাচাই করিয়া ফিরি। একই জীবনের হিসাব দশজনের বিচারে দশ রকম হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে কাহারও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার বড় একটা ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সহস্র বিচার অবিচার সত্ত্বেও প্রত্যেক জীবনের যথার্থ মূল্য ও গৌরব আসলে যেমন তেমনই থাকে। যাচকভেদে ও জহুরীভেদে তাহার বাজার-দরের তারতম্য হয় বটে, কিন্তু তাহার নিজস্ব প্রাণগত মর্য্যাদা তাহাতে বাড়েও না কমেও না। বাহির হইতে জীবনটাকে নানারূপ মতামতের সূত্রে গাঁথিয়া, তাহাকে নানা 'থিওরি'র নির্দ্দিষ্ট স্তর ও পর্য্যায়ে ফেলিয়া, নানা নামধারী বিশেষ বিশেষ খোপের মধ্যে পুরিয়া, তাহার সম্বন্ধে নানারকম সহজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি; কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, যাহাকে লইয়া নাড়ি চাড়ি, লেবেল মারি, তাহা জীবন নয়, জীবনের কতগুলি খণ্ড পরিচয় মাত্র, জীবনস্রোতের ফেনোচ্ছ্বাস মাত্র। আসলে যাহা জীবনের যথার্থ পরিপূর্ণ হিসাব, তাহা তর্কাতীত সত্যের জীবন্ত রহস্যের মধ্যে নিহিত থাকিয়া যায়।

স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিচারকালে স্বাস্থ্যব্যাপারটাকে ভাঙিয়া

তাহার কলকব্জা বাহির করিয়া দেখিতে হয়। প্রশান্ত সুনিদ্রা ও কর্ম্মের উৎসাহ, পরিপাকশক্তির অক্ষুন্নতা ও রক্তপ্রবাহের স্বচ্ছন্দ চলাচল, সকল ইন্দ্রিয়ের নিরাময় প্রসন্নতা ও সমস্ত শরীরক্রিয়ার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, এইরূপ অসংখ্য জটিলতার সমষ্টিরূপেই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। তত্ত্বের এই জটিল সন্ধান সেই পরিমাণেই সার্থক, যে পরিমাণে তাহাতে স্বাস্থ্যনামক পরিপূর্ণ তথ্যটির যথার্থ মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার সহায়তা করে। ভিতরের ও বাহিরের যে-সকল অবস্থাচক্রের মধ্যে মানুষ জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের প্রভাব কাহার পক্ষে কি পরিমাণে স্বাস্থ্যপ্রদ বা অস্বাস্থ্যজনক বাহির হইতে মানুষে নানা তর্ক গবেষণা করিয়া সে বিষয়ে নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক স্বাস্থ্যজীবনের বোঝাপড়ার মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ ফলাফল অকাট্য নির্ভুলরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতেছে। দূষিত বায়ু সেবন করি, কদর্য্য আহার করি, অপরিমিত আলস্যের প্রশ্রয় দেই, অথবা যে-কোন অভ্যাস ও প্রভাবের মধ্যে জীবনযাপন করি, কাগজে-কলমে তাহার হিসাব মিলুক আর নাই মিলুক, হাতেকলমে যে জীবন্ত স্বাস্থ্যকে লইয়া কারবার করি তাহার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন হিসাবের গলদ থাকে না। ভিতরের ও বাহিরের ভালমন্দ ছোটবড় ঘাতপ্রতিঘাত সমস্তই সেখানে যথাযথরূপে সমন্বিত হইয়া আপন-আপন গুরুত্বের হিসাব অঙ্কিত রাখিয়া যায়।

সেইরূপ, কেহ দেখি আর না দেখি, হিসাব লই আর না লই, পরিপূর্ণ জীবনের গ্রহণ-বর্জ্জনের হিসাব এই জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই সন্দেহাতীত নির্ভুলরূপে আবহমানকাল আপনার জের টানিয়া চলিতেছে। জন্মগত ও জাতিগত প্রকৃতি ও সংস্কার, শিক্ষা ও দীক্ষালব্ধ রুচি ও মতামত, ভিতরের ও বাহিরের শারীরিক ও মানসিক আবেষ্টন ও প্রভাব, যাহা দেখি যাহা শুনি যাহা পাঠ করি ও যাহা চিন্তা করি, এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যে-কোন শক্তি জীবনের উপর আপনার ছাপ রাখিয়া যায়, সমস্তই মানুষের অখণ্ড ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমন্বিত হইয়া সাক্ষাৎ জীবনরূপে গড়িয়া উঠে। জ্ঞানের আলোকে ও অজ্ঞতার মোহে, মনের উন্মুখতায় ও বিমুখতায়, সাময়িক নানা অবস্থার অবসাদ ও উত্তেজনায়, জীবনযন্ত্রের কত বিকার কত ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, তাহাদেরও হিসাব জীবনের মানদণ্ডে অব্যর্থরূপে নিরূপিত হইয়া থাকিতেছে। কত অসংখ্য দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে কত বিরুদ্ধশক্তির আকর্ষণের মধ্যে তোমার জীবনপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তুমি নিজেই তাহার মূল্য ও সংবাদ জান না, কিন্তু তোমার জীবনের মগ্নচৈতন্যের মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকের প্রভাব অঙ্কিত ও সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ যাহাকে ভুলিয়া থাকে, হিসাবের মধ্যে যাহাকে ধরে না, সেও জীবনের বিরাটদৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া "প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর, ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।"

শুধু মানুষের জীবনে নয়, এই বিশ্বজীবনের প্রত্যেক অণুতে-পরমাণুতে বিশ্বপ্রবাহের সংহত ইতিহাস জীবন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। বিজ্ঞান তাহারই খণ্ডখণ্ড জুড়িয়া কত তত্ত্ব কত law কত সিদ্ধান্তের কাঠাম গড়িয়া তুলিল। প্রত্যেক জড়কণার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের আকর্ষণবিকর্ষণের প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়া বলিল, এই জড়কণার এই বর্ত্তমানের মধ্যেই তাহার জাগ্রত অতীতের সমস্ত কাহিনী ও অনাগত ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের পুঁথিতে দেখ জড়কণার গতিস্থিতির কত হিসাব কত গণিতচিত্র; কিন্তু এক-একটি জীবন্ত জড়কণা সমগ্র বিশ্বশক্তির অমোঘ সঙ্কেতে কাহারও গণিতপ্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া যে অলক্ষ্য বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, বিজ্ঞানের সাধ্য নাই সে জটিলতার জট্ ছাড়াইয়া দেখে। বিজ্ঞান তখন থই পায় না, সে কেবল অকূল বিশ্বপ্রাণেরই দোহাই দিয়া বলে, এই প্রত্যক্ষ যাহা ঘটিতেছে তাহাই আমার যথার্থ হিসাব, তাহাই আমার চূড়ান্ত বাণী—আমার পুঁথির বিদ্যা তার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র। ইহারই জীবন্ত আদর্শে আমার সিদ্ধান্ত গড়ি, আমার মাপকাঠির পরিমাণ করি; এবং যতক্ষণ সে সাক্ষাৎ তথ্যের সঙ্গে সায় দিয়া চলে ততক্ষণ তাহার সমাদর করি। যখন সে প্রত্যক্ষের মর্য্যাদা রাখে না, তখন আপন মাপকাঠি আপন আপন হাতে ভাঙিয়া ফেলি।

তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের তল্পি বহিতে বহিতে মানুষ কেমন করিয়া জীবন্ত সত্যের মর্য্যাদা ভুলিয়া বসে, আমাদের

দেশের আধুনিক পঞ্জিকারচনায় তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। জ্যোতিষবিদ্যা যখন এদেশে জীবন্ত বিজ্ঞান ছিল, তখন আচার্য্যগণ চোখে দেখিয়া বেধযন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া গ্রহগণনা করিতেন। সেই গণনার সূত্র ধরিয়াই প্রত্যক্ষ চন্দ্রসূর্য্যের সাক্ষ্য লইয়া অসংখ্য জ্যোতিষগ্রন্থের উৎপত্তি। কিন্তু হায়! অভাগার দেশে বুঝি আজ চোখে দেখিবার উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসও জোটে না। তাই দেখি, আকাশের গ্রহচন্দ্র আকাশেই থাকে, আর পঞ্জিকার আবদ্ধ প্রাঙ্গণে গর্গ ভাস্কর বরাহাদির প্রামাণ্য বিচার চলিতে থাকে। "আমার পঞ্জিকা বড় বিশুদ্ধ, কেননা আমি সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনুসরণ করি"—"আমার পঞ্জিকা আরও প্রামাণ্য, আমি বীজসংস্কৃত ভাস্বতীর দোহাই দেই"। জিজ্ঞাসা করিতে পার—তবে ভাই, তোমার পঞ্জিকাগগনের সূর্য্যদেব যখন রাহুগ্রাসে কবলিত হইবার উপক্রম করিয়াছেন, আকাশের পরিচিত সূর্য্যের প্রসন্ন মুখে তখনও ম্লানতার চিহ্ন দেখিনা কেন? পঞ্জিকার বৃহস্পতি যখন দণ্ড পল অনুপলের সূক্ষ্ম হিসাব ধরিয়া বক্রভাব ত্যাগ করিতেছেন, আকাশপথের প্রত্যক্ষ বৃহস্পতি তখনও বক্রিমতার ঝোঁক ছাড়েন না কেন? কিন্তু সে প্রশ্নবিচারের অবকাশ কাহারও নাই। এই মিথ্যাগণনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্দ্দেশ-মতেই শতসহস্র লোকের ধর্ম্মকর্ম্মের আচারতন্ত্র অবাধ নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতেছে।

এইরূপে পুঁথির হিসাবে আর জীবনের হিসাবে ফারাক্ যখন বাড়িয়া চলে, তখন এমন দিন আসে যখন মানুষের জাগ্রত সংশয়কে আর ঠেকাইয়া রাখা চলে না। তখন মানুষ প্রত্যক্ষ দেখিবার দাবী করে, যুগযুগান্তের অতর্কিত সিদ্ধান্তকে তথ্যের সঙ্গে মিলাইয়া জীবনের হিসাব আদায় করিতে চায়। "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের চূড়ায় বসিবার দাবী করে, কিন্তু গুণকর্ম্মের প্রমাণ চাহিলে সে তাহার পৈতা তুলিয়া দেখায়। সমাজ তাহাতে আপত্তি নাও করিতে পারে, কিন্তু জীবনের তলে-তলে তাহার অকাট্য প্রতিবাদ সঞ্চিত হইতে আর বাকী নাই। আজও যদিও সমাজের ঠাট বজায়ের ত্রুটি নাই, তবু কে জানে কালের ভাঙনধরার শেষ কোথায়? জাগ্রতকালের জীবন্ত বাণী ঘোষণা করিতেছে, বিশ্বমানবের বিপুল দৃষ্টি বিরাট জীবন; আর, আচারতন্ত্রের জীর্ণ আয়ু গণনা করিতেছে, অতীতে মাহাত্ম্য ও কলির দুর্গতি। সংগ্রামকাতর অন্ধ মানুষ প্রাণপণ শক্তিতে কল্পনা করিতেছে, "যাহা কিছু হিসাব হইতে বাদ দিলাম, জীবন তাহার কোন হিসাব রাখিবে না"। কিন্তু জীবন আমার পছন্দ-অপছন্দের দাস নয়, তাহা কল্পনার গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে স্বপ্নের সঞ্চয় জমিয়া জমিয়া আবার জীবনপ্রবাহের তরঙ্গমুখেই ভাসিয়া যায়। তখনও যদি মানুষের মোহনিদ্রা না ভাঙে, তখনও যদি সে কল্পনার গগনপটে অস্তমিত গৌরবরবির মূঢ় প্রহসন জাগাইয়া রাখিতে চায়, তবে তাহার জন্য "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" শাশ্বতকাল জাগ্রত রহিয়াছে।

সুরসিক মার্কিন লেখক মার্ক্ টোয়েন্ এক কৃষক দম্পতীর গল্প লিখিয়াছেন। তাহারা বিদেশস্থ কোন আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। আত্মীয়ের ধনলাভের প্রত্যাশায় সংসারে তাহারা যন্ত্রবৎ কাজ করিয়া যাইত, কিন্তু সমস্ত মনটি থাকিত ঐ অনাগত শুভসংবাদের উপর। ধনের স্বপ্ন ধনের কল্পনা তাহাদের বাস্তব জীবনকে ছাপাইয়া উঠিত, কল্পনায় সেই সম্পদ্ তাহারা নানা ব্যবসায়ে মহাজনীতে নিয়োগ করিত, কল্পনায় তাহার লাভ-লোকসানের হিসাব রাখিত, এবং সঞ্চিত সুদের কাল্পনিক ব্যয়ের ফর্দ্দ লইয়া দাম্পত্যকলহের সম্ভাবনা ঘটাইত। অতি সাবধানে, ব্যবসাভিজ্ঞ বিচক্ষণের দৃষ্টান্ত ও পরামর্শে তাহারা কল্পিত ধনের তদ্বির করিয়া, আশায় ও আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া ফিরিত। ক্রমে কল্পনায় উপর্য্যুপরি দাঁও মারিয়া যখন তাহারা ঐশ্বর্য্যের চরমসীমায় উঠিল, তখন কল্পনার মোহপ্রভাব তাহাদের বাস্তবজীবনেও সংক্রামিত হইয়া পড়িল। কল্পিত ধনের কল্পিত অভিমানে তাহারা সংসারকে মাপিয়া দেখিল, সংসারে তাহাদের আসন অসম্ভব উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। তখন আত্মমর্য্যাদার গৌরবে বহুদিনের নগণ্য বন্ধুবান্ধবকে একে একে বিদায় দিয়া, তাহারা বাহিরের তুচ্ছ আবেষ্টন হইতে আপনাদের জীবনকে অল্পে অল্পে গুটাইয়া লইল। এমন সময় একদিন দৈবাৎ সংবাদ পাওয়া গেল যে, প্রবাসী আত্মীয় বহুকাল হইল গতাসু হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ধনের প্রতিপত্তি আপনার প্রমাণস্বরূপ কপর্দ্দকচিহ্নও রাখিয়া যায় নাই। সত্যের নির্দ্দয়

আঘাতে কাল্পনিক সাধনার বিরাট সৌধ এক মুহূর্ত্তেই ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

জীবনের দৈন্যের উপর কল্পিত স্বর্গলোকের আবরণ দিয়া মানুষ অপরকে ভুলাইতে পারে, আপনাকেও ভুলাইতে পারে, কিন্তু জীবন তাহাতে প্রতারিত হয় না। যাত্রার শ্রীকৃষ্ণ বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসরে নামিয়াছিল; পালায় যখন সেবিষয়ে প্রশ্ন উঠিবে তখন সে বিনাইয়া বিনাইয়া ভৃগুপদচিহ্নের ব্যাখ্যা করিবে। কিন্তু অধিকারী যখন যথার্থই বিকট গম্ভীর বদনে ভ্রূভঙ্গী জুড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, "কৃষ্ণ তোমার বুকে কি ?" তখন ভয়বিহ্বল অনভ্যস্ত বালক বলিল, "আজ্ঞে খড়িমাটি"! এইরূপ কাল্পনিক অভিমানের কত ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়া মানুষ সংসার-যাত্রায় বাহির হয়, কিন্তু জীবনের অধিকারীর কাছে তাহার খড়িমাটিত্ব কবুল করিয়া ফেলে। মানুষ নিছক পরনিন্দা করে, এবং বলে "কর্ত্তব্যের অনুরোধে অপ্রিয় সত্য বলিতেছি"; সৌখিন মনের খেয়ালে পড়িয়া সহস্র মূঢ়তার দাসত্বে আপনাকে জড়বৎ করিয়া রাখে, আর "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর" বলিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা করে।

"কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"—কিন্তু কালের অসীমধৈর্য্যেরও সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রান্ত হয়, মানুষ যখন জীবন্ত সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও দেখিতে চায় না। অনন্ত দেশকালের সাক্ষী এই প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান জগৎ! এই বর্ত্তমানের এই বিশ্বজগতের পরিপূর্ণ উন্মুক্ত সত্য তোমার আমার মধ্যে অনুভূত ও সমন্বিত হইয়া যাহা গড়িয়া উঠে, তাহারই নাম জীবন; এবং এই অনুভূতি ও সমন্বয়ের পরিপূর্ণতাই জীবনের পরিপূর্ণতা। জীবনসংগ্রামে এই পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করিবার দুরন্ত সংকল্প লইয়া, সহজে মানুষ পরাজয় স্বীকার করে না, কিন্তু পদে পদেই আপোষ করিতে চায়। তাই জীবনের তুমুল মন্থনে যে কোন সম্পদ উদ্ভূত হয়, মানুষ তাহাকেই অমৃত জ্ঞানে চরম নিশ্চিন্তভাবে গ্রহণ করিতে চায়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে Reason বা বিচারবিবেককেই মানুষ পুরুষকারের প্রধান সাক্ষী ও নিয়ামকরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অনেক লাঞ্ছনা ও অনেক নির্য্যাতনের কশাঘাতে যুগযুগব্যাপী দাসত্বের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে এই Reasonএর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু যে reason মুক্তিপ্রদ জীবন্তশক্তিরূপে ইতিহাসের পর্ব্বে পর্ব্বে মানুষকে সহস্র বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়াছে, যে reason এই modern spirit এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিভূস্বরূপ, যে reasonএর প্রদীপ্ত আলোকে মানুষ তাহার অন্ধতার আবরণ ভেদ করিয়া জীবনের নব-নব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, সেই reason সেই বিচার-বুদ্ধিই আবার আত্মশক্তির অভিমানে আপনার যথার্থ মর্য্যাদা ভুলিয়া, আপনাকেই পরিপূর্ণ জীবনরূপে কল্পনা করিয়া, আপনার বিরাট দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আপনার পরিমিত শক্তির দ্বারা অপরিমেয় জীবনপ্রবাহকে খর্ব্ব করিয়া দেখিতেছে। তাই জাগ্রত বুদ্ধির আলোকে যাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে, যাহা ধরা যায় ছোঁয়া যায় মাপিয়া দেখা যায়, বুদ্ধির হিসাবে তাহাই বিরাট হইয়া উঠিতেছে; আর বিচারের অস্ফুটচ্ছায়ালোকে যাহার সম্যক্ পরিচয় মিলিতেছে না, তাহাই নগণ্যরূপে হিসাবের অঙ্কে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জীবনের অঙ্কে বৈষম্য ঘটাইবার সুযোগ খুঁজিতেছে। কিন্তু আবহমানকাল জীবনের সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। তাই বিচারবুদ্ধি যখন অভিমানভরে জীবনের পরিপূর্ণ দাবীকে অস্বীকার করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত পরিমাপ করিতে থাকে, তখন কালের চাঞ্চল্যে চিরজাগ্রত জীবনের কাছে তাহা দুঃসহ হইয়া উঠে।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ যখন স্বপ্ন দেখিতেছিল যে সভ্যজগতে যুদ্ধের বর্ব্বরতা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তখন বিচারবুদ্ধিই সেই স্বপ্নের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা ছিল। বিচারবুদ্ধিই বলিয়াছিল, যুদ্ধবিদ্যার সাংঘাতিক উন্নতির ফলে অসম্ভব লোকক্ষয়ের আশঙ্কায় মানুষের যুদ্ধোৎসাহ নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। স্বার্থসূত্রে ও ব্যবসাসূত্রে জাতিতে-জাতিতে যে আদানপ্রদান চলিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক জাতির জীবন বৈচিত্র্যে ও জটিলতায় অপর প্রত্যেক জাতির জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তাই বিশ্বমানবের জীবন্ত দেহকে একস্থানে আহত করিলে, তাহার বিরাট দেহের সর্ব্বত্র সেই আঘাত অনুভূত হইবে। এক জাতি অপর জাতিকে আঘাত করিতে গিয়া আপনাকেও সাংঘাতিকরূপে আহত করিবে। সুতরাং স্বার্থ

বুদ্ধিই নাকি মানুষকে এমন দুঃসাহস হইতে নিবৃত্ত করিবে। কিন্তু জীবনের প্রচণ্ড আঘাতে সে দুরাশার স্বপ্ন আজ ভাঙিয়াছে।

যে মানুষ আপনাকে বুদ্ধিজীবী rational জীব বলিয়া অহঙ্কার করে, সেই মানুষের সুসভ্য ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া জীবনের ভিতর হইতে তাহার আদিম রক্তলোলুপ বর্ব্বর-মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের উদ্দাম স্বার্থলালসা ত মরে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত বাসনার অসংযম ত দূর হয় নাই, অন্ধবিদ্বেষের দুর্দ্দান্ত হিংস্রতা ত ঘুচে নাই সভ্যতার নানা আবরণের কৃত্রিম মুখোস পরিয়া জীবনের তলে তলে বিচার-বুদ্ধির অন্তরালে তাহারা নিজ-নিজ প্রভাব সঞ্চিত করিতে-ছিল। বিচারবুদ্ধি তাহা দেখিয়াও দেখে নাই, আপনার শক্তির অভিমানে আচ্ছন্ন (hypnotized) হইয়া তাহার শক্তিকে ধারণা করিতে পারে নাই। তাই জীবন আজ দম্ভমানবচিত্তকে নিংড়াইয়া আপনি তাহার প্রত্যক্ষ হিসাব আদায় করিয়া দেখাইতেছে। এই জীবনমরণসংগ্রামে মানবচিত্তের কত গোপন পঙ্কিলতা আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে; কত স্বপ্ন, কত কল্পনা, কত যুগযুগান্তের সঞ্চিত জড়স্তূপ, ভাঙিয়া পড়িতেছে। সেই অস্থিরতার ভিতর হইতে মানবের নবজাগ্রত বিচারদৃষ্টি বিরাটতররূপে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় বিশ্বমানব-জীবন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপে সাধনের বিচিত্র পথে মানুষ পদে-পদেই তাহার জীবনের হিসাব মিলাইতে বাধ্য হয়। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সাধন ও সমাধান জীবনের ভিতরে-বাহিরে যে-সকল ভেদ-রেখা আঁকিয়া চলে, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্তি (evolution) প্রতিনিয়তই তাহাকে মুছিয়া চলিতেছে। জীবনের প্রবাহে পড়িয়া যখন মানুষের সহজ বিচারের কৃত্রিম গণ্ডী ভাঙিয়া যায়, তখন মানুষ অভিজ্ঞতার তাড়নায় নূতন করিয়া বৃহত্তর গণ্ডীরচনায় প্রবৃত্ত হয়। সহজ বিচার বলিল, "দেশের ও সমাজের কল্যাণ কর।" জীবন প্রশ্ন করিল, "কল্যাণ কি?" সংসারবুদ্ধি আপন মানদণ্ডে হিসাব করিয়া বলিল, "জাতীয়সম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাই কল্যাণ।" কথাটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, কারণ 'সম্পদ' বলিতে কি যে বুঝায় তাহাও প্রশ্নের ব্যাপার। জীবনের চিঁড়ে কথার তৃপ্তিতে ভিজে না, জীবন তাহার অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সম্পদের যথার্থ হিসাব পরখ করিয়া লয়। মানুষের স্থূলবুদ্ধি যখন কৃষিসম্পদ ও বাণিজ্যসম্পদ, ক্রয়শক্তি ও উৎপাদনশক্তির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিল হিসাব করিতে থাকে, অলক্ষিত জীবন তখন অব্যর্থ ইঙ্গিতে দেখাইতে থাকে প্রত্যেক জাতির জীবনসম্পদকে। কেবল লোকসংখ্যা নয়, মানুষের শ্রমশীলতা ও জীবনীশক্তি, মিতাচার ও সংযম, আত্মবিশ্বাস ও পরিবর্ত্তন-সহিষ্ণুতা জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে জাতীয় সম্পদরূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে। জাতীয় সাধন ও অভিজ্ঞতা, জাতীয় tradition ও culture, বন্ধুতাসূত্রে ও বিরোধ-সূত্রে জাতীয় জীবনের পরিধিবিস্তার মানুষের জীবনতন্ত্রকে গড়িয়া তোলে। সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষভাবে তাহারাও জাতীয় সম্পদ। মুষ্টিমেয় মানুষের অপ্রতিহত মননশক্তি যখন ফরাসী-জীবনে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিপ্লবমন্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইল, তখন জাতীয় জীবনের হিসাবে কে তাহার শক্তিসম্পদের পরিমাপ করিয়াছিল? সহরের রাস্তা যেমন সঞ্চিত জঞ্জাল-রূপে municipalityর কলঙ্কচিহ্ন ধারণ করে, তেমনি জাতীয় জীবনপথের কিনারে-কিনারে মানুষের ধর্ম্ম-সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নানা গলদ্ জমিয়া থাকে। মানুষ তাহাকে উপেক্ষা করিলেও কালেকালে জীবনের উদ্দাম বরষার প্লাবনে তাহার অবসান অনিবার্য্য। জীবনের এই-সকল ক্ষণিক উচ্ছ্বাসও জাতীয় সম্পদ। আর বুদ্ধিজীবী মানুষ যাহাকে অকাজের কাজ বলে, যাহাকে সকল প্রয়োজনের নীচে তুচ্ছ কল্পনার আসনে বসাইতে চায়, সেই কবির দৃষ্টির, কবির সার্থক অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশের,—জাতি ও সমাজের জীবন-সম্পদ হিসাবে মূল্য কে নিরূপণ করিবে? এই প্রবাহিত বিশ্বজগতের রসসৌন্দর্য্য, নরনারীর প্রেমলীলা ও সুখদুঃখ-ছন্দিত জীবনোচ্ছ্বাস কেবল নির্ম্মম শক্তির অন্ধ পরিহাস নহে, ইহারই অব্যক্ত আনন্দের মধ্যে অনন্ত মুক্তজীবনের স্বাদ ও আশ্বাস নিহিত রহিয়াছে, এই অনুভূতিকে ধারণ করিয়া সার্থক কবিজীবন হইতে যে অভয় মন্ত্র নিঃসারিত হয়, অন্ধ মানুষ কোন্ হিসাবে তাহার পরিমাপ করিয়া দেখিয়াছে?

পৃথিবীটা শূন্যের মধ্যে নিরালম্ব থাকিলে, পাছে তাহার

পতন ও বিনাশ ঘটে, এই আশঙ্কায় মানুষের উর্ব্বরকল্পনা তাহাকে সাপের মাথায় ও অষ্টদিগ্‌গজের স্কন্ধে বসাইয়াছিল। চিন্তা উঠিল যে ইহারাই বা শূন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে কিরূপে? তাই বিরাট কচ্ছপের অবতারণা হইল। অষ্টদিগ্‌গজ তাহার পিঠের উপর আশ্রয় পাইল, কিন্তু কূর্ম্ম দাঁড়াইবে কিসের ভরসায়? নিছক কল্পনা বলিল, "ক্ষীরোদ সমুদ্রে ভাসাইয়া রাখ"—শুনিয়া পৌরাণিকের শঙ্কিত চিত্ত আশ্বস্ত হইল। কিন্তু মানুষ যখন স্পষ্ট দেখিল যে পৃথিবীটা স্থবিরনিশ্চলরূপে বসিয়া নাই, সে আপনার অবাধ গতিবেগে অনন্ত আকাশপথে চক্রচিহ্ন আঁকিয়া চলিতেছে, তাহার পক্ষে আধার ও আশ্রয় কল্পনা তখন সম্পূর্ণ নিরর্থক হইল। কল্পনা তাহাকে সাপের মাথায়ই বসাক্ আর ক্ষীরোদ সমুদ্রেই ভাসাক্, পৃথিবীর বাস্তব জীবন এই জীবন্ত জগতের সূর্য্যচন্দ্রগ্রহশক্তির মধ্যেই পরিপূর্ণ নিরাপদভাবে বিধৃত হইয়া আছে। সহজবুদ্ধিও সায় দিয়া বলিল, "চারিদিকেই সমানভাবে অনন্তপ্রসারিত আকাশ, পৃথিবী তাহার মধ্যে কোথায় পড়িবে?" "সমে সমন্তাৎ কঃ পতত্বিয়ং খে?"

প্রতি জীবনের চারিদিকে আশ্রয় ও আধাররূপে এক অনন্ত বিস্তৃত বিরাট জীবন—জীবন কক্ষভ্রষ্ট হইয়া কোথায় পড়িবে? অনন্ত জীবনের বিচিত্র আহ্বান ও প্রেরণায়, আপনার গতিবেগে আপনি বিধৃত হইয়া জীবন ছুটিয়া চলিতেছে। মানুষ তাহাকে স্থাবর জড়পদার্থের মত নানা আশ্রয়ের মধ্যে বাঁধিয়া কল্পনার নানা হস্তিকূর্ম্মক্ষীরোদ-সমুদ্রের আধারে বসাইয়া নানা আচারবিচারমতামতের কাঁথাকম্বল চাপাইয়া নিরাপদ হইতে চায়। কিন্তু কল্পনা-জীবনের গুটিকাকে মানুষ যে স্বপ্নের রেশমসূত্রে মুড়িয়া রাখিতে চায়, কালে কালে জাগ্রত জীবনের প্রজাপতি সেই রেশমজাল কাটিয়া মুক্ত আকাশের সন্ধানে বাহির হয়। অবাধ উন্মুক্তভাবে জীবন চলিতে চায়, অবাধ উন্মুক্তভাবে, বিশ্বপ্রাঙ্গণে তাহাকে চলিতে দাও, একথা বলিবার সাহস মানুষের জোটে না।

বড় বেশীদিনের কথা নয়, একসময়ে জীবন্ত মানব-শিশুকে ধরিয়া নানা শাসনের সাহায্যে কতগুলা শব্দ ও অঙ্কের কসরৎ, এবং ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের কতগুলা তথ্য বা fact, বলপূর্ব্বক তাহার মধ্যে গিলাইয়া মানুষ ভাবিত ইহার নাম 'শিক্ষা'। এই নবজাগ্রত যুগের মানুষের মন সে কথা ভাবিতেও আজ শিহরিয়া উঠিতেছে। আজ মানুষ বলিতেছে মনের মধ্যে কি পরিমাণ স্পষ্ট তথ্য বা শব্দ ঠাসিয়া দিলাম, তাহার দ্বারা শিক্ষার প্রমাণ হয় না। জীবনের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে মন তাহার খোরাক সংগ্রহ করিবে, নানা সংশয়বিচারের মধ্য দিয়া তাহার সত্যাসত্য পরখ করিয়া লইবে, তাহার জন্য অবাধে ও বিনা তাড়নায় মনকে উন্মুখ ও উন্মুক্ত করাই শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ।

শিক্ষার আদর্শ যাহাকে 'মন' বলিল, মানুষের সমগ্র সাধনা তাহাতে আপন আপন সুর মিলাইয়া বৃহত্তররূপে তাহাকেই বলিল "জীবন"। মানুষ যেখানে মানুষকে ধরিয়া ধর্ম্মের নামে নীতির নামে তত্ত্বের বচন ও লোকমতের সংস্কার গিলাইত, আচারের কসরৎ শিখাইত, যেখানে সুস্থজীবনকে predigested অর্দ্ধজীর্ণ পথ্য খাওয়াইয়া কৃত্রিম মানদণ্ডে তাহার হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করিত, সেখানে মানুষ বলিতেছে, মানপরিমাণের ও ভাষাপরিভাষার মোহ ভাঙিয়া জীবনকে জীবনরূপেই দেখ। বিশ্বজীবনের কাছে তোমার জীবনকে উন্মুক্ত ও উন্মুখ করিয়া রাখ।

এই পরিপূর্ণ বিশ্বজীবন, এই যাহা সত্যরূপে প্রতিজীবনের ভিতরে-বাহিরে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে—আত্মবিস্মৃত মানবচিত্তে প্রাণস্পন্দনরূপে, চিরন্তন আস্তিক্যবুদ্ধিরূপে, প্রতিনিয়তই যাহা নবনব কলেবর ধারণ করিতেছে—তাহারই আশ্বাসকে রক্ষাকবচরূপে ধারণ করিয়া মানুষ তাহার অনন্ত জীবনপথে যাত্রা করিয়াছে। কেবল ধর্ম্মজগতে নয়, কেবল ধর্ম্মতন্ত্রে নয়, ধর্ম্মের নামে মানুষ জীবনের অখণ্ডতার মধ্যে যে-সকল দ্বৈত ও স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে, কেবল তাহার মধ্যে নয়; সমগ্র জীবনের সকল সাধনা ও সকল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া মানুষ জীবনের সহস্র মোহনাস্তিকতার আবরণ ভেদ করিয়া এই বিশ্বজীবনব্যাপী 'অস্তি'র সন্ধানে ফিরিতেছে। কত optimism কত আশাশীলতার সফল সাধনের মধ্যে, কত ব্যর্থ জীবনসংগ্রামের মৃত্যু-কামী বেদনার মধ্যে, কত নাস্তিকতার অতৃপ্তির মধ্যে, সে বিরাট সন্ধান জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। কতবার কত বিশেষ আকারে মানুষ বিশ্বজীবনের

আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কত বিশেষ নামে তাহার বিশেষ পরিচয়কে অস্বীকার করিয়াছে, আবার অলক্ষিতে হৃদয়ের কত গোপনদ্বার দিয়া তাহার অবাধ যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বিধাতৃত্বের লীলারূপে যাহাকে স্বীকার করিল না, অমোঘ নিয়মবন্ধনরূপে তাহাই সমাদর লাভ করিল,—মানুষ বুঝিল না এ কাহার নিয়ম! বিশ্বশক্তির মঙ্গল অভিপ্রায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াও আত্মশক্তির সম্মোহন-মূর্ত্তিতে জীবনকে অধিকার করিল,—কেহ জানিল না জীবনে জীবনে পুরুষকাররূপে কে আবির্ভূত! শাস্ত্রগুরু অতীতের সাক্ষ্য মহাজনগতমার্গ কতরূপে কতবার আসিল, কতবার ফিরিল, তাহারই ভিতর হইতে নবনব বিচিত্ররূপে বিকশিত হইয়া উঠিল প্রত্যক্ষ জীবনধর্ম্মে অদম্য বিশ্বাস—ব্যক্তি-মানবের স্বাধীনজীবনস্রোতের অবাধপ্রসারণে বিশ্বাস, বিশ্ব মানবের আগত অনাগত সার্থক পরিণতিতে বিশ্বাস, মানব-জীবনের উত্থানপতনের মধ্যে তাহার চরম কল্যাণে বিশ্বাস, প্রতি মানবের অন্তর্নিহিত বিশ্বজীবনের অব্যক্ত প্রেরণায় বিশ্বাস এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বজীবনের সাক্ষী ও প্রতিনিধি প্রত্যেক স্বতন্ত্র আত্মার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার গৌরব ও মর্য্যাদায় বিশ্বাস।

এ বিশ্বাসের অর্থ যে কি, এ সাধন যে কত বিস্তারিত কত জটিল কত গভীর, মানুষের সাধনা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আজও তাহা সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আজও নানাদিক হইতে নানা বিচ্ছিন্ন সূত্র ধরিয়া মানুষ এই সাধন ক্ষেত্রে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। ভবিষ্যৎ-বংশ তাহারই উপর কত নবনব আদর্শের পূর্ণতর সৌধ প্রতিষ্ঠা করিবে তাহারই প্রতীক্ষায় আজও মানবচিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে।

এই বিরাট জীবনের আহ্বানে মানবের আদর্শ নানা দ্বন্দ্ব ও আপাতবিরোধের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া ফিরিতেছে। দৈব ও পুরুষকার, ব্যক্তি ও সমাজ, জাতীয়তা ও সার্ব্ব-জাতিকতা, দয়াধর্ম্মের ন্যায়তত্ত্ব ও অতিমানবতার নিষ্ঠুর কল্পনা, একই বিরাট জীবনসমস্যাকে নানা দিক হইতে আঘাত করিয়া দেখিতেছে, কেবল তত্ত্বের মধ্যে নয়, কেবল চিন্তাজগতের বিচার-প্রাঙ্গণে নয়, মানুষের কর্ম্মজীবনের নিত্য সচেষ্টতার মধ্যেও মানুষ দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্ব ভাঙিয়া আদর্শের সমগ্রতাকে হাতেকলমে অর্জ্জন করিতেছে। সেই একই সার্থক বিপুল জীবনকে লক্ষ্য করিয়া কত ধর্ম্মতত্ত্ব কত নীতিতন্ত্র, কত সাধনপ্রণালী, কত সামাজিক বিধিব্যবস্থা, কত অসংখ্য বিচিত্র নামধারী কত সম্প্রদায়ের কত সমন্বয়সাধনা গড়িয়া উঠিল। কেহ বিশ্ববিধানের বিধাতাকে দেখিল, কেহ দেখিল না; কেহ তাহাকে শক্তিমাত্র জ্ঞান করিয়া উদাসীন রহিল, কেহ তাহারই উদ্দেশে ব্যাকুল হইয়া জীবনের তীর্থে তীর্থে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিল; কেহ ব্যক্তির জীবনকে, সমাজতন্ত্রের নির্দ্দেশমত নিয়ন্ত্রিত করিয়া জন্মগত ও সাংসারিক অবস্থাগত নানা ভেদবৈষম্য দূর করিতে চাহিল, কেহ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সমাজবন্ধনকে ভাঙিয়া পিটিয়া সহজ করিতে চাহিল। কিন্তু আদর্শের সমগ্রতাকে ধারণ করিল ও প্রকাশ করিল অতি অল্প লোকেই। সহস্র জটিলতার অন্ধ সংগ্রামে পরিশ্রান্ত, সহস্র হিসাবের ব্যর্থতায় বিভ্রান্ত মানুষ বাধাবিমুক্ত হইয়া জীবনের বিশ্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিল অতি অল্প স্থানেই। ব্রাহ্মসমাজ এই দৃষ্টিলাভের জন্যই জগতে আসিয়াছিল। কেবল কতগুলি মূঢ়সংস্কারের প্রতিবাদের জন্য নয়, কেবল কতগুলি সামাজিক কুব্যবস্থার মোচনের জন্য নয়, কেবল বাহিরের কতগুলি দ্বন্দ্বের সহজ সমন্বয়ের জন্য নয়, জীবনের এই বিরাট পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগৎকে উজ্জ্বল করিয়া দেখিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের ডাক পড়িয়াছিল।

এই বিশ্বমানবজীবন আপনাকে দেখিয়া আপনাকে জানিয়া পরিতৃপ্ত হইবে, জড়তার তামসজালে মানুষ যেখানে অন্ধ হইয়া হতবীর্য্য হইয়া ঘুরিতেছে, সেখানে জ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত হইবে, মানুষ উদ্‌বুদ্ধ আত্মশক্তির প্রেরণায় জীবনকে অতীত জঞ্জালভার হইতে বিমুক্ত করিবে, "চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্‌" সহস্রদ্বার উন্মুক্ত করিবে, স্বাধীন মানবচিত্তকে আহ্বান করিবে। জীবনের প্রত্যক্ষ প্রবাহে মানুষের সহস্র হিসাব, সহস্র বিচার আচার স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে, জাগ্রত মানুষ তাহাতে বিচলিত হইবে না।

মানবচিত্তের বিস্ময়াতীত বৈচিত্র্য এই বিরাট জীবনের

উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া আপন-আপন দেশ-জাতি-সমাজগত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাধনাকে সেই জীবন্ত আদর্শেরই অঙ্গীভূত করিয়া লইবে। দেশ জাতি সমাজ সম্প্রদায় মণ্ডলীর নানা সোপানপরম্পরায় বিশ্বমানবের ও ব্যক্তিমানবের মধ্যগত সকল কৃত্রিম ব্যবধানকে নানা সম্পর্ক-সূত্রে বন্ধন করিবে। একদিনে নয়, একযুগে নয়, যুগযুগান্তে সমগ্র মানব ইতিহাসের অতীত ও অনাগত সমুদয় জীবনের ব্যর্থতা ও সফলতার মধ্যে এই সাধনায় ডুবিয়া থাকিবে।

সাধকমণ্ডলী চাই, উপাসকসম্প্রদায় চাই, আদর্শ-বহনকামী সমাজ চাই, কর্ম্মের নিয়মতন্ত্র বিধিবিধান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, এ সমস্তই চাই; কিন্তু সর্ব্বোপরি চাই অন্ধ-সংস্কারমুক্ত উদারচিত্ত প্রশস্তপ্রাণ ব্যক্তিমানবকে—সত্যের জন্য অকুতোভয় সর্ব্বত্যাগীকে, যে সত্যের জন্য এমন সংস্কার নাই এমন বন্ধন নাই যাহা ছাড়িতে পারে না। চাই বিশ্বমানবের সেই-সকল প্রতিনিধিকে, যাহারা এই জীবনকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিবে না, যাহারা জীবনের সার্থকতার জন্য অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না, যাহাদের জীবনপটে এই জগৎছবির জীবন্ত রূপ প্রকাশ লাভ করিবে, এই মুহূর্ত্তকে এই বর্ত্তমানকে এবং প্রতি মুহূর্ত্তকে যাহারা ভগবানের পূর্ণতম সার্থকতম বিধাতৃত্বের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিবে। যাহারা সত্যের জন্য জীবনের সকল সাধনকে সার্থক সাধন জ্ঞান করিয়া ভালমন্দের উন্মত্তবিচারে উদ্‌ভ্রান্ত ভীরু মানবচিত্তকে এই উন্মুক্ত জীবনের আশ্বাস-বাণী শুনাইয়া বলিবে—

"মনেরে আজ কহ যে
ভালমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"

শ্রীসুকুমার রায়।

লীলা

বিন্দু কাছে অব্ধি কহে, 'এ যে কেমন লীলা—
ক্ষুদ্র হ'ল মুক্তাগুলি, বৃহৎ হ'ল শিলা!'
'ক্ষুদ্র যে গো ব্যর্থ নহে জানিয়ে দিতে তাই,
বিশ্বপতি ক্ষুদ্র করে মুক্তা গড়ে ভাই।'

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

রূপান্তর

(গল্প)

ঘন বনের পাশ দিয়া পথটি অজগর সর্পের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা এখনও হয় নাই, কিন্তু সূর্য্যদেব বনপ্রান্তবর্ত্তী পাহাড়ের আড়ালে ডুব দেওয়াতে বনে এখনই আঁধার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আলোর চিহ্ন আর কোথাও নাই, কেবল পাহাড়ের তলদেশে কোনো এক গুহা হইতে মাঝে মাঝে একটা উজ্জ্বল তীব্র আলোর রেখা গভীর কালো আঁধারের মধ্যে কালনাগিনীর জিহ্বার মত লক্‌লক্‌ করিয়া উঠিতেছে।

চিত্রকর সুপ্রিয় ঐ পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে নিজের গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তার বয়স বেশী নয়, কিন্তু তাহার সুকুমার তরুণ মুখে এখনই চিরসন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার ক্ষীণ দেহ যেন আর পৃথিবীবাসের বোঝা বহিতে চায় না। তাহার পা চলিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু একেবারে অন্ধকার হইবার আগে তাহাকে বনের সীমা ছাড়াইতেই হইবে, কাজেই সে কোনও-রকমে নিজেকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ তাহার সামনে কে একজন আসিয়া পড়িল। সুপ্রিয় চমকাইয়া দাঁড়াইয়া, মুখ তুলিয়া চাহিল; আগন্তুককে দেখিয়া মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল "ও! বসুদত্ত তুমি!"

নবাগত হাসিয়া বলিল "হাঁ আমিই বটে। রাত্তির-বেলা এ হেন রাস্তায় কার ধ্যান করতে করতে চলেছ? কোথায় গিয়েছিলে?"

"মহারাজের প্রমোদবনে।"

"কিছু সুবিধা হল?"

"হাঁ, একটা ছবি বিক্রী হয়েছে, আর-একখানা আঁকবার আদেশ পেয়েছি।"

"আচ্ছা বাহোক! তবে এমন কালপেঁচার মত মুখ করে চলেছ কেন? বনের অন্ধকারও যে তোমার মুখের কাছে আলো বলে ভ্রম হচ্ছে। এতেও তুষ্ট নও, আর কি চাই শুনি? আমার অমন জোর কপাল হলে এতক্ষণ পায়ে হাঁটব না মাথায় হাঁটব তা ঠিক করতে পারতাম না।"

সুপ্রিয় হঠাৎ পথের ধূলায় বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে

বলিয়া উঠিল "জোর কপাল হতে একটু বেশী দেরী হয়ে গেছে ভাই, আর কোনো কাজে লাগবে না।"

বসুদত্ত ভয় পাইয়া গেল, একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "কেন, কি হয়েছে ?"

"আর কিছু নয়, আজ রাজ-কবিরাজের কাছে খবর পেলাম যে টাকা এসে পৌছবার আগেই আমাকে বিদায় নিতে হবে।"

"সে কি ?"

"রাজসভা থেকে বেরিয়েই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম, যখন জ্ঞান হল তখন এই সংবাদ পেলাম।"

সুপ্রিয়কে সান্ত্বনা দিবার কোন কথা তাহার বন্ধু খুঁজিয়া পাইল না, নীরবে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরেই সুপ্রিয় উঠিয়া পড়িল, বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিল "দুঃখ কোরোনা, তাতে কোন লাভ হবে না।" বসুদত্ত উত্তর দিবার আগেই সুপ্রিয় দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সুপ্রিয় যখন নিজের গম্যস্থানে আসিয়া পৌছিল, তখন রাত্রির অন্ধকার নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া সে শ্রান্ত কণ্ঠে ডাকিল, "দীপিকা!"

দরজা খুলিয়া গেল, প্রদীপ-হাতে একটি তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল "এত দেরি হল কেন তোমার? আমি যে কখন্ থেকে পথ চেয়ে বসে আছি তার ঠিক নেই। আর বাইরে দাঁড়িও না, শিগ্‌গির ভিতরে এসো, যে ঠাণ্ডা হাওয়া!"

সুপ্রিয় দীপিকার পিছন-পিছন ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরটি প্রায় শূন্য, কেবল একপাশে একটি বৃহৎ পালঙ্ক, আর তাহারই মাথার কাছে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত একটি দীপাধার। ঘরে আর-একখানি উল্লেখযোগ্য জিনিষ ছিল, কিন্তু সেখানা ঘরে ঢুকিবামাত্র চোখে পড়ে না। সেখানি একটি তরুণীমূর্ত্তির চিত্র। ছবিখানিতে রংচংএর বাহার বেশী নাই, কিন্তু চিত্রিতা রমণীর অসামান্য রূপ দর্শকের চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়। ছবিখানি দীপিকার।

সুপ্রিয়ের পিতাও একজন চিত্রকর ছিলেন। চিরকাল রাজ-অনুগ্রহ লাভ করাতে, তাঁহার সংসারে কোনোদিন দারিদ্র্যের করাল ছায়াপাত ঘটে নাই। পিতার উত্তরাধিকার-সূত্রে সুপ্রিয়ও এই অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী একই পরিবারে চিরদিন বাঁধা থাকিতে চাহিলেন না। রাজভবনের নাট্যশালায় ছবি আঁকা লইয়া সুপ্রিয়ের সঙ্গে মহারাজার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। এই কলহেই তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। রাজভবনের দ্বার তাহার কাছে রুদ্ধ হইবামাত্র, তাহার আর-সকল বন্ধুবান্ধবও একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যৌবনের উৎসাহে সুপ্রিয় প্রথমে নিরাশাকে আমলই দিল না। স্বামীর হাসিমুখ দীপিকাকেও ভুলাইয়া রাখিল।

কিন্তু নিছক উৎসাহে কোনো মানুষেরই বেশী দিন চলেনা। তাহাদের সুসজ্জিত সংসারে এইবার দুর্ভিক্ষের কঙ্কালসার মূর্ত্তি উঁকি মারিতে আরম্ভ করিল। দাসদাসী এক-একে বিদায় লইল, সুপ্রিয়ের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছবিগুলি একে একে অল্পমূল্যে বিক্রয় হইয়া গেল। তারপর গৃহের তৈজসপত্রও তাহাদের অনুসরণ করিল, দীপিকার অঙ্গের আভরণগুলিও বাদ গেলনা। সমস্ত দিন অনাহারক্লিষ্ট সুপ্রিয় শেষে একদিন দীপিকার ছবিখানি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল। দীপিকা ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া ছবি চাপিয়া ধরিল, বলিল "না, এ ছবি তুমি বিক্রি করতে পাবে না। আমি যা ছিলাম, তা আর কখনও হব না, কিন্তু কি যে ছিলাম তার একটা চিহ্ন থাক।" দীপিকার শেষ অলঙ্কার, তাহার মাতার একটি অঙ্গুরীয়ক। তাহাই বিক্রয় করিয়া সে চিত্রটিকে রক্ষা করিল।

লক্ষ্মীদেবী এ গৃহে অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন পুরানো ভিটা দেখিতে হঠাৎ একবার ফিরিয়া আসিলেন। রাজার মন ফিরিয়া গেল, বহুকাল পরে সুপ্রিয়ের ডাক পড়িল। রাজভবন হইতে ফিরিবার পথেই আমরা তাহার দেখা পাইলাম।

অলক্ষ্মী দীপিকার ঘর ছাড়িলেন। পাড়াপ্রতিবেশী দেখিল, চিত্রকর-পরিবারের যাহা গিয়াছিল তাহা যেন সুদ-সুদ্ধ ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে সকলেই যে পুলকিত হইয়া উঠিল তাহা নয়।

কিন্তু দারিদ্র্যরাক্ষসী যাইবার সময় লুকাইয়া দুটি জিনিষ লইয়া পালাইয়াছিল, তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। দীপিকার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি হঠাৎ চিররাহুগ্রস্ত

হইয়া পড়িল, দারিদ্র্যের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার অঙ্গে অকাল জরা আসিয়া দেখা দিল। দর্পণের সামনে দাঁড়াইয়া একদিন সে-দেখিল, মুখে বার্দ্ধক্যের বলীরেখা ক্রমেই গভীর হইয়া আসিতেছে, ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের মধ্য হইতে জরার শ্বেতপতাকা জয়ের হাসি হাসিতেছে। দীপিকা-দর্পণ আছড়াইয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিল, তারপর নিজের বিগত রূপের প্রতিমার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

দীপিকার জীবনে পূর্ণিমার পরেই আঁধারবসনা অমাবস্যার উদয় হইল। সুপ্রিয়ও দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকলার সৌন্দর্য্য কম নয়, লোকের মন তাহাতেই ভোলে, কিন্তু অন্তহীন নিশীথিনী যে তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তাহা কে বুঝিতে পারে? মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সুপ্রিয় একলাই নিজের বুকের বোঝা বহন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দীপিকার শীর্ণ মুখে আবার হাসি ফুটিতেছিল, তাহাকে ম্লান করিয়া দিতে তাহার মন কিছুতেই উঠিল না। কাজে সে সারাদিন নিজেকে ডুবাইয়া রাখিল। দীপিকার সম্মুখে তাহার মনের কথা গোপন করা সহজ ছিল না, সেইজন্য দিনের মধ্যে সে এমন কোনো অবসর রাখিল না, যেখানে দীপিকা আসিয়া তাহার মন জুড়িয়া বসিতে পারে।

(২)

সুপ্রিয় নিজের ঘরে বসিয়া ছবি আঁকিতেছিল। এ ছবিখানিও মহারাজের ফরমাসী। ছবিখানা শীঘ্র শেষ করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ কাজ করিবার সামর্থ্য তাহার আর কতদিন থাকিবে বলা যায় না। ইহার পারিশ্রমিক মহারাজ যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা দীপিকার জন্য রাখিয়া যাইতে পারিলে তাহাকে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট কখনও পাইতে হইবে না।

কিন্তু পৃথিবীতে অন্নবস্ত্রের কষ্টই ত একমাত্র কষ্ট নয়। সুপ্রিয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, সেই সকল যন্ত্রণার সেরা যন্ত্রণা যে দীপিকার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে তাহার হাত হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? নিজের অবস্থার কথা সুপ্রিয় প্রথমে তাহাকে বলে নাই, কিন্তু তখন বলিলেই বুঝি ভাল ছিল। তাহার জীবনের দিন যত ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, দীপিকাকে সে-কথা বলাও যেন ততই শক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। আহা, এমন আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাত সে সহ্য করিবে কি করিয়া!

সুপ্রিয়ের পিতামাতা তাহার বাল্যকালেই মারা যান। প্রথম যৌবনে তাহার জীবনে কোনো স্নেহ-প্রতিমার অধিষ্ঠান ছিল না। কলালক্ষ্মীকেই সে নিজের একমাত্র সম্বল বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাহার তরুণ মানবপ্রাণ শুধু পূজা করিয়া তৃপ্তি পাইত না। আর-একটা কিসের তীব্র অভাবে তাহার মন থাকিয়া-থাকিয়া হাহাকার করিয়া উঠিত, তাহার আরাধ্যা দেবী তখন তাহার কাছে ছায়ারই মত শূন্য হইয়া উঠিতেন। তাহার বক্ষশায়ী ক্ষুধিত মানুষ উঠিয়া পড়িয়া পূজারীকে যেন সবলে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিত।

দেশের আর-এক কোণে অনাথা দীপিকা তাহার মুকুলিত যৌবনের অর্ঘ্য সাজাইয়া যেন এই তরুণ শিল্পীরই পথ চাহিয়া ছিল। বিধাতা যেদিন এই দুটিকে মিলাইয়া দিলেন, সেদিন কলালক্ষ্মী অভিমানে সুপ্রিয়ের পাটরাণীর আসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। দীপিকাও বুঝিল, পৃথিবীতে সে ব্যর্থ হইবার জন্য জন্মায় নাই। জগৎসংসারকে ত্যাগ করিয়া দুটি নবীন প্রাণ যে পরস্পরকেই সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিল, ইহা ভাগ্যলক্ষ্মী সহিলেন না, তাঁহার বজ্র উদ্যত হইয়া উঠিল।

শতসহস্র চিন্তা আসিয়া সুপ্রিয়কে খানিকক্ষণ কাজ ভুলাইয়া দিল। তুলি হাতে করিয়া সে খোলা জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। নীল আকাশ যেন শীতের ভয়ে কুয়াসার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, প্রকৃতি-রাণীর মুখও অশ্রুভারাক্রান্ত। পৃথিবীর হরিৎ যৌবনশ্রী জরার সর্ব্বগ্রাসী শুভ্রতার কাছে হার মানিয়া লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে, মৃত্যুর কঙ্কালসার মূর্ত্তিরই আজ জয়। তাহার মরণ-অভিসারের সজ্জা চারিদিকেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এতকাল দীপিকাই তাহার দুই চোখ জুড়িয়া ছিল, আজ তাহাকে ছাড়িয়া-যাইবার মুখে সুপ্রিয় জোর করিয়া মনকে ফিরাইয়া লইল। জগতে আর যাহা কিছু এক-

কালে তাহার কাছে সত্য ছিল, সকলকেই বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া যাইতে হইবে ত? তারপর ত অনন্ত বিস্মৃতি, তার মধ্যে কি দীপিকার মুখ স্থান পাইবে?

সুপ্রিয়ের চোখ ছিল বাহিরে, কিন্তু দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান আর-একজনের নিমেষহীন দৃষ্টি জগৎসংসার ভুলিয়া তাহাতেই বদ্ধ হইয়াছিল। সুপ্রিয় কাজের মধ্যে দীপিকাকে ভুলিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু দীপিকার সে-সম্বলও ছিল না। অসংখ্য দাসদাসীপূর্ণ সংসারে কাজ তাহার কোথায়? প্রথম যখন এ সংসারে কম্পিতবক্ষ নববধূ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল তখনও ত কাজ ছিল না? কিন্তু অবসরই কি ছিল? দিনরাত্রির কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া যে আনন্দের জোয়ার বহিত, তাহার মধ্যে কোথাও যে ফাঁক ছিল না। তারপর দারিদ্র্য আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও ত এমন শূন্যতা তাহার বুক জুড়িয়া বসে নাই। বাহিরের সংসারের দুর্ভিক্ষের কোলাহল ত কখনও তাহার অন্তরের উৎসবের বাঁশীকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। অলক্ষ্মীর কঠোর হাত তাহার অঙ্গের রূপ আর নিভৃত বিরামের অবসর দুই-ই হরণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অন্তরের গোপনমন্দিরে চন্দনচর্চ্চিতা রক্তচেলীপরিহিতা নববধূর অভিসারযাত্রা একদিনও বন্ধ হয় নাই। কিন্তু এখন একি? বিশ্বসংসারে এখন যে সে ধরিবার-ছুঁইবার কিছু পায় না! তাহার চিরআনন্দ-নিকেতন সুপ্রিয়ের চিত্রশালাটির দিকে মন তার কেবলি ছুটিয়া যাইত। কিন্তু সে-ঘর আর তাহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে না। আজ তাহার ব্যাকুল মন তাহাকে এই ঘরের দরজার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু দরজা পার হইবার শক্তি যেন তাহার দেহে ছিল না। সুপ্রিয় এক-মনে ছবি আঁকিতেছিল, দীপিকার আগমন সে জানিতে পারে নাই।

দীপিকার শীর্ণ হাত হইতে হঠাৎ একগাছি কঙ্কণ খসিয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িল। শব্দে চমকিত হইয়া সুপ্রিয় ফিরিয়া চাহিল। দীপিকার জলভরা কাতর চোখ ঐ-যে একদৃষ্টে তাহার দিকেই চাহিয়া আছে। ওরে এখনি চোখের জলের বিরাম নাই, এখনও ত চোখের সামনে? এর পর তোর সান্ত্বনা জগতে কোথায় মিলিবে? সুপ্রিয়ের বুকের রক্ত যেন চোখ ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, চোখের জল অনেক দিন হইল শুকাইয়া গিয়াছে। সে মুখ ফিরাইয়া বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দীপিকা, কি চাই তোমার?"

তাই ত, কি চাই? ইহাও এখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, সুপ্রিয়ের নিজের হৃদয় বুঝি আর ইহার উত্তর দিতে পারে না? সুপ্রিয় মুখ ফিরাইয়াই শুনিতে পাইল দীপিকা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "কিছু না," তারপর ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ওরে ভিখারিণী কি চাহিতে গিয়াছিলি? রিক্ত হাতে ফিরিয়া আসিলি কেন? বিনা প্রয়োজনে যাইবার অধিকার আর তোর নাই, এখন হইতে যাইতে হইলে আবেদন প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। মূক হৃদয়ের ভাষা যে কথার চেয়ে ভাল করিয়া বুঝিত সে ত ত আর নাই। আপনার অনাদৃত শয়নকক্ষের ধূলিশয্যায় পড়িয়া দীপিকা কঠিন পাষাণকেই নিজের বেদনার অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। শীতের বাতাস পত্রপুষ্পহীন গাছের সারির মধ্যে মরণের রাগিণী বাজাইয়া ফিরিতেছিল। পশ্চিমাকাশে গভীর কালো মেঘের রাশি দিনের শেষ আলোকরশ্মিকে গ্রাস করিবার জন্য হিংস্র-উৎসাহে ঘনাইয়া উঠিতেছিল। দীপিকা তখনও আঁধার ঘরের পাষাণশয্যা ছাড়িয়া উঠে নাই। ঘরে আলো নাই, দাসী প্রদীপ আনিয়াছিল, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহার মনের আঁধারের কাছে কোজাগর লক্ষ্মীকে হার মানিয়া ফিরিয়া যাইতে হইত, ক্ষুদ্র রজতপ্রদীপ ত কোন্ ছার!

দাসী চতুরিকা আবার প্রদীপ হাতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দীপিকা উঠিয়া বসিয়া তীব্র বিরক্তির সুরে বলিল "আবার মরতে এল্মি কেন? তোকে না যেতে বললাম?"

দাসী ভয় পাইয়া বিনীতভাবে উত্তর করিল "ঠাকুরাণি, চিত্রশালায় এখনও দীপ জ্বালা হয়নি, আমি আলো দেবো কি না জানতে এলাম।"

শত দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও চিত্রশালার ভার দীপিকা কোনো দিন কাহারও হাতে দেয় নাই। এই ঘরখানি

সাজাইয়া-গুছাইয়া, নিজের হাতে এইখানে স্বর্ণদীপ জ্বালিয়া সে বড়ই আনন্দ পাইত। এই ঘরেই তাহার ফুলশয্যা হইয়াছিল, সেই গতদিনের সৌরভ যেন এখনও এ ঘর ছাড়িয়া যায় নাই।

দাসীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে তাহার হাত হইতে প্রদীপ কাড়িয়া লইয়া দীপিকা ঘরের বাহির হইয়া গেল। গৃহিণীর অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারে চতুরিকা কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সুপ্রিয়ের ঘরের দ্বার তখনও বন্ধ দীপিকা প্রদীপ হাতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর ত সাড়া শব্দ নাই। ঘরে কি কেহ নাই? দরজায় একটা মৃদু আঘাত করিল। দরজা ভেজান ছিল মাত্র, ঐ অল্প আঘাতেই খুলিয়া গেল। প্রদীপ-হাতে দীপিকা ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, চিত্রে সুসজ্জিত ঘর উজ্জ্বল আলোতে হাসিয়া উঠিল। এ-কি সপত্নীর জয়ের হাসি? কলালক্ষ্মী আজ কি আবার নিজের হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইল?

সুপ্রিয়ের আসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সামনে পীত রেশমের আচ্ছাদনে ঢাকা ওখানা কি? সেই চিত্র নাকি, সুপ্রিয়ের হৃদয়রাজ্যের নূতন রাণী? ব্যগ্র হাতে সে ছবিখানা তুলিয়া লইল। একি এ কার ছবি? দীপিকার চোখের সামনে হাস্যবিকশিতা চঞ্চলনয়না যুবতী-মূর্ত্তি যেন কালান্তক যমের মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইল। কে রে তুই রাক্ষসী, তোর সর্ব্বনাশী হাসি হাসিবার স্থান জগতে কি আর কোথাও ছিল না? পৃথিবীতে কত রত্ন ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, দরিদ্রার শেষ সম্বল হরণ না করিয়া তোর কাল ক্ষুধা মিটিল না? হত্যাকারিণীর মুখ কি এত সুন্দর হয়? আজ তার রূপ রাহুগ্রস্ত, আজই তোর আসিবার সময় হইল? সেদিন কোথায় ছিলি যেদিন কন্দর্প-প্রণয়িনীর রূপও সামান্যা চিত্রকরপ্রিয়ার কাছে পরাভবের লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছিল?

পিছনে কাহার পায়ের শব্দ শোনা গেল। দীপিকার শিথিল হাত হইতে ছবিখানা পড়িয়া গেল, সে ফিরিয়া তাকাইল। এ যে বসুদত্তের স্ত্রী বাসন্তী! দীপিকাকে ফিরিতে দেখিয়াই সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার শিঞ্জিত করিয়া বাসন্তী ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। দীপিকার হাত ধরিয়া খুব জোরে নাড়া দিয়া বলিল, "কি গো ঠাকরুণ, তোমার দেখাই যে আর মেলে না! বড়মানুষ হয়ে একেবারেই ভুলে গেলে নাকি? আমার নেহাৎ প্রাণের টান, তাই ঝড়জল মাথায় করেও ছুটে এলাম। আসচে মাসের বসন্তোৎসবে ভাই তোমাকে অনেক কাজের ভার নিতে হবে। ঋতুরাজের পূজার অর্ঘ্য কিভাবে সাজালে ভাল হয় তা কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করে নিও।"

দীপিকার মুখে একটা তীব্র হাসির রেখা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল, সে বলিল, "বাসন্তি, আমি তোমার ফুলের হাটে পা দিতে না-দিতে সব ফুল ঝরে পড়বে। ঋতুরাজ নয়, যমরাজের অর্ঘ্যের যদি কখনও দরকার হয় সেইদিন আমায় ডেকো, এমন পুরোহিত আর পাবে না।"

কি কথার কি উত্তর! বাসন্তী হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ কি ঠাট্টা নাকি? কিন্তু কথার সুরে ত ঠাট্টার লেশও নাই। বাসন্তী বলিল "কি যে বল ভাই তার ঠিক নেই। তোমার মত ভাগ্যবতী স্বামী-সোহাগিনী যদি বসন্তোৎসবে গেলে ফুল ঝরে যায়, তাহলে কে গেলে ফুটবে শুনি?"

"ভাগ্যবতী কাকে বলিস্ রে? ভাগ্য যে চোরে নিয়ে গেছে, ভাগ্য দেখতে চাস্ ত এর দ্যাখ।" ভূপতিত ছবিখানা সে ক্ষিপ্রহস্তে বাসন্তীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তুলিয়া ধরিল।

"কার ছবি গো? ওমা, এ যে দেখছি রাজনর্ত্তকী ইন্দ্রলেখা! হ্যাঁ ওর আবার ভাগ্যি, ঝাঁটা মার অমন ভাগ্যের মুখে। কি রত্ন যে তুই পেয়েছিস তা ত জানিস্ না, ভাবিস্ বুঝি রাজা-উজীরের টাকার রাশি ঘরে আনছে বলে ওর মস্ত ভাগ্য। ওর মত পোড়াকপালী আর জগতে আছে নাকি?"

ছবিখানা ফেলিয়া দিয়া দীপিকা মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার সেই রত্নই যে চুরি গিয়াছে, এই পোড়াকপালীর পোড়ার মুখ যে তাহার স্বামীকে কাড়িয়া লইয়াছে। এরই স্থান এখন ঘরের মধ্যে, দরজার কাছে দাঁড়াবার অধিকারটুকু তাহার আর নাই।

বাসন্তীর চোখেও জল ঝরিতেছিল। সকল নারীর হিংসার পাত্রী আদরের আদরিণী দীপিকার আজ এই দশা!

সঙ্গিনীর পাশেই খাটীতে বসিয়া সে নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে আমায় বলবি না ভাই ?"

দীপিকা চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিল। অন্যের কাছে মনের রুদ্ধ বেদনা প্রকাশ করিয়া ফেলাতে তাহার দৃপ্ত মন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে প্রাণপণে মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল "কিছু না ভাই, আমার মাথা খারাপ হয়েছে, তাই শুধুশুধু কেঁদে তোকে ভয় পাইয়ে দিলাম।"

বাসন্তী তাহার হাসিতে ভুলিল না, বলিল "যাও, যাও, আমায় আর ছেলে ভুলোতে হবে না, আমিও মেয়েমানুষ সেটা মনে রেখো। আমার কাছে কেন লুকোনো, তোমার দুঃখ আমার বুকে কতখানি বাজছে তা কি বুঝছ না ? তোমার সত্যিই কপাল খারাপ, তা না হলে তোমার স্বামী ঐ পোড়ারমুখীর রূপে ভুলল।"

দীপিকা চুপ করিয়া রহিল, তাহার বলিবার কিছু ছিল না। খানিক পরে বাসন্তী আবার বলিল "কিন্তু তুমি এত সহজে হাল ছেড়োনা। আমার এক দূর সম্পর্কের বোন আছে, তারও একবার তোমার মত দশা হয়েছিল। নগরের মধ্যেই পিশাচসিদ্ধ কামন্দকের একজন শিষ্য আছে জান বোধ হয়, সে এমন একটা বশীকরণের ওষুধ দিলে যে তিন দিনের মধ্যে ডাকিনীর মায়া ভুলে ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে এল।"

বাসন্তীর কথায় এত দুঃখেও দীপিকার হাসি আসিল। ভগবানের বশীকরণমন্ত্র যেখানে হার মানিল, সেখানে এইবার পিশাচের সাহায্যই ত প্রয়োজন !

বাহিরের ঝড় ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতেছিল, বাসন্তী আর বসিতে পারিল না। তাহাকে বিদায় দিয়া দীপিকা আবার নিজের শয়নকক্ষে গিয়া ঢুকিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া দাসীরা কেহই সাহস করিয়া সে ঘরে ঢুকিতে চাহিল না, কাজেই সে-রাত্রে চিত্রকর-সংসারের সকল কাজ গৃহিণীকে বাদ দিয়াই সম্পন্ন হইল।

খোলা জানলা দিয়া ঝড়ের বাতাস হু হু করিয়া দীপিকার শরীরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। বৃষ্টি এখনও নামে নাই, অশ্রুহীন বেদনাকাতর মুখের মত বিরাট আকাশ পীড়িত স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। রাত্রি বোধ হয় অনেক হইয়াছে, কারণ এতবড় বাড়ীর কোনো খানে ত মানুষের গলার স্বর শুনা যায় না। সুপ্রিয় কি এখনও বাড়ী ফিরে নাই ? এই কথার সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা কথা দীপিকার মনে আসিয়া পড়িল, বাড়ী যদি নাই তাহা হইলে আছে কোথায় ? সে তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া পড়িল, নিজের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া একবার কান পাতিয়া দাঁড়াইল। কই কিছুই ত শোনা যায় না। ঘর হইতে বাহির হইয়া সে চিত্রশালার দিকে চলিল। ঐ যে সুপ্রিয়ের ঘরের আলো দেখা যায়। কম্পিতপদে দীপিকা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অনাহূতভাবে এ ঘরে প্রবেশ করিবার অধিকার কি আর তাহার আছে ? কিন্তু এতদূর আসিয়া কি আর ফেরা যায় ? দীপিকা দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

ছবি আঁকিবার আসনের উপর সুপ্রিয় ঘুমাইয়া রহিয়াছে, পাশেই ইন্দ্রলেখার সেই ছবি। দীপিকার দুই চোখ হৃত-শাবক ব্যাঘ্রীর মত জ্বলিতে লাগিল, সর্বনাশের শেষসীমায় পৌঁছিয়াও সে এতদিন কোন্ মোহে অন্ধ হইয়া ছিল ? পিশাচি, কোন মন্ত্রবলে তুই এত অল্পদিনে এতবড় জয় লাভ করিলি ?

ভাল, দেখা যাক পিশাচীর সঙ্গে পৈশাচিক অস্ত্রেই যুদ্ধ চলে কি না। দীপিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার হৃদয়ের প্রেমের সিংহাসনে হিংসা নিজের অগ্নিদণ্ড হাতে করিয়া আসিয়া বসিল। এই নূতন অধীশ্বরের মহিমায় দীপিকা সুপ্রিয়ের রক্তহীন মূর্চ্ছিত মুখকে সুখনিদ্রাভিভূত বলিয়াই দেখিল। এ যে ইন্দ্রলেখার সুপ্রিয়, এর দিকে কি ভাল করিয়া চাহিবার অবসর আছে ?

দীপিকা একবার নিজের ঘরে ঢুকিয়া অল্পক্ষণ পরেই আবার বাহির হইয়া আসিল। তারপর নিদ্রামগ্ন ভবন ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল, ঝটিকাকুল রজনীর গভীর অন্ধকার তাহাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রাস করিয়া ফেলিল।

(৩)

শ্যামল-স্নিগ্ধ বনপথটিকে আর চেনা যায় না। কোন্ ক্রুদ্ধ দানবের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার সকল শ্রী লুপ্ত হইয়াছে। পথ দিয়া চলা সহজ নয়,—গাছের ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া, বড় বড় পাথর গড়াইয়া আসিয়া মাঝে মাঝে পথ একেবারেই

বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত বন যেন কোন্ যন্ত্রণাকাতর ডাকিনীর আর্ত্তনাদে ভরিয়া উঠিয়াছে। আলোর লেশমাত্র কোথাও নাই, শুধু এক-একবার বিদ্যুতের প্রখর আলো চকিতের মত চারিদিকের ভয়াবহ দৃশ্য দেখাইয়া দিয়া তখনই আঁধার-সাগরে মিলাইয়া যাইতেছে।

এই কাল রাত্রিতে কে একজন বনপথ দিয়া আকাশভ্রষ্ট উল্কার মত ছুটিয়া চলিয়াছে। তড়িতালোক একবার তাহার মুখের উপর ঝিলিক হানিয়া গেল। এ মুখ ত মানুষের নয়, এ যেন এই উন্মাদিনী ঝটিকারই কন্যা. পথহারা হইয়া ঘুরিতেছে। তাহার দৃষ্টি সেই পাহাড়ের তলদেশে, যেখানে নরকের আগুন পাতাল ফুঁড়িয়া দেখা দিয়াছে, শ্মশানের অধীশ্বরের প্রতিনিধির বাসভবন যে স্থানে। ওকি বিদ্যুৎ না কামন্দকের গুহারই বহ্নিশিখা?

দীপিকার পায়ের উপর দিয়া একটা আশ্রয়চ্যুত সর্প সভয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল। ভয় এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার গতিরোধ করিল। তখনই আবার কঠিন মুখে সে চলিতে আরম্ভ করিল। ধিক্ তোকে নারী, এত অল্পেই ভয়? ওরে সাহসে বুক বাঁধ, যমরাজের হাত হইতে যে আজ মৃত প্রেমকে ভিক্ষা করিয়া আনিতে হইবে। এই মরণ-অভিসারে ওরে সাবিত্রি, ভয়-লজ্জার স্থান আছে কি? ঘরে যে প্রেমের মৃতদেহ পড়িয়া!

এই ত কামন্দকের গুহার দ্বার! রক্তাক্ত চরণে ছিন্ন বসনে দীপিকা সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা তীব্র হিম বাতাস তাহার অঙ্গে অঙ্গে কম্পন জাগাইয়া বহিয়া গেল। এ সেই লোকের হাওয়া যেখানে আলোক-উত্তাপের চির নির্ব্বাসন, এ যেন সহস্র অমুক্ত আত্মার অশ্রুবাষ্প বহন করিয়া আসিয়াছে। গুহামুখে মাঝে-মাঝে আলো দেখা যাইতেছে, চারিপাশের অন্ধকার যেন তাহাতে আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্ধকার ত শূন্য নয়, অদৃশ্য প্রেত-মূর্ত্তি যেন ইহাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

যাক, আর ভাবনা নয়, ফিরিবার চিন্তার আর সময় নাই। ইন্দ্রলেখার বিদ্রূপপূর্ণ হাসি দীপিকার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া গুহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ঢুকিবামাত্র একটা কঠিন তীব্রকণ্ঠ তাহার কানে আসিয়া বাজিল "কি চাই তোমার?

দীপিকা চাহিয়া দেখিল, বিরাট অগ্নিকুণ্ডের সামনে যেন একটা কালো কুয়াসার পরদা দুলিতেছে, তাহা ভেদ করিয়া আগুনের হল্কা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ অগ্নি-বর্ষণের মধ্যে একজন কে দাঁড়াইয়া, তাহার দুই চোখের জ্বালাময় দৃষ্টি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গকেও ম্লান করিয়া দিতেছে। দীপিকা বুঝিল এই কামন্দক।

আবার প্রশ্ন আসিল, "কি চাই?"

এইবার দীপিকা উত্তর দিল, তাহার স্বরে কম্পনের লেশও ছিল না, "প্রভু, আমার সর্ব্বস্বধন চুরি গিয়েছে, আমি চোরের হাত থেকে তা আবার ফিরে চাই।"

ঘরে একটা পৈশাচিক হাসির ঢেউ বিদ্যুৎতরঙ্গের মত খেলিয়া গেল, তারপর সেই কঠিন কণ্ঠ আবার শোনা গেল, "চোরের কাছ থেকে চুরি করতে চাস? আচ্ছা এইদিকে আয়।"

দীপিকা স্থিরপদে অগ্রসর হইয়া গেল। অগ্নিকুণ্ডের কাছে আসিবামাত্র তাহার মনে হইল একটা কঙ্কালসার হাত অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। সে তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া গুহার পাষাণবক্ষে পড়িয়া গেল।

(৪)

মুখে বৃষ্টির জলের ঝাপটা লাগিয়া দীপিকার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, তাহাকে কে গুহার বাহিরে রাখিয়া গিয়াছে, রাত্রির অন্ধকার তেমনই গভীর, কিন্তু ঝড়ের বেগ কমিয়া গিয়া মুষলধারে বৃষ্টি ঝরিতেছে।

দীপিকা মৃত্তিকাশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুহার ভিতর হইতে সেই স্বর আবার শোনা গেল, "ফিরে যা, তোর জিনিষ আবার তোর কাছে ফিরে আসবে।"

কৈ এ-কথায় ত মনে আনন্দের ঢেউ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না? দীপিকা কোন্ অজানা আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তারপর অন্ধকার বনের বিপদসঙ্কুল পথে ছুটিয়া চলিল।

নগরপ্রান্তে সে যখন আসিয়া পৌছিল তখন বৃষ্টিধারা থামিয়া গিয়াছে, মেঘের ঘন যবনিকা ভেদ করিয়া এক এক জায়গায় আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে। আর দেরি

নাই, ঐ যে সুপ্রিয়ের গৃহের দ্বার দেখা যায়। দীপিকার হৃৎপিণ্ড যেন বুকের মধ্যে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল, সে কোনোপ্রকারে বাকী পথ অতিক্রম করিয়া উন্মুক্ত দ্বারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

পৌরজন এখনও সকলেই নিদ্রিত। ভালই, মানুষের চোখের সামনে দাঁড়াইবার সামর্থ্যও যেন আর দীপিকার ছিল না। আগে তাহার ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া যাক্।

সে ধীরে ধীরে চিত্রশালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঘের পর্দা ছিঁড়িয়া চন্দ্রালোকের উজ্জ্বল ধারা ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলোর স্রোতে সুপ্রিয়ের মুখ শ্বেতপদ্মের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। একি, এই বিবর্ণ মুখ কি সত্যই তার?

দীপিকা তাহার পার্শ্বে নিজেকে টানিয়া আনিয়া ফেলিল, দাঁড়াইবার ক্ষমতা আর নাই। ওগো এ কালনিদ্রা কি আর ভাঙিবে না, ঐ আনন্দের উৎস চোখ কি আর এ পৃথিবীর দিকে চাহিবে না?

একটা হিম হাওয়া ঘরের মধ্যে খেলিয়া গেল। তাহার তুষারশীতল স্পর্শে সুপ্রিয় হঠাৎ চোখ মেলিয়া চাহিল। দীপিকার মুখ তাহার মুখের উপর নত হইয়া ছিল, সুপ্রিয়ের চোখ তাহার চোখেই প্রথম আসিয়া মিলিল। দীপিকার বুকের রক্ত উন্মত্ততালে নাচিয়া উঠিল, এই কি তাদের দ্বিতীয় শুভদৃষ্টি?

কিন্তু ওকি! সুপ্রিয় চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল কেন? দীপিকা তাহার কম্পমান দেহ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেই সে তাহাকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল "দূর হও, দূর হও! এখনও তুমি, আমার শেষ মুহূর্ত্তেও তোমার ঐ কালমুখ আমার চোখের সামনে! দীপিকা, দীপিকা আমার, একবার এসো, ক্ষমা চাইবার অবসর আর হল না, শুধু তোমার মুখ একবার দেখে যাই।"

সুপ্রিয় কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। দীপিকা দুই ব্যাকুল বাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল "ওগো আমায় চিনতে পারছ না? আমিই দীপিকা।"

মরণাহত সুপ্রিয় তাহার দৈব শক্তি দিয়া দীপিকার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "পিশাচি ইন্দ্রলেখা, তোর মুখ কি আমি চিনি না? ও মুখ যে রাহুর মত এতদিন আমার দীপিকাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দূর হ, দূর হ!... ..দীপিকা......"

সুপ্রিয় মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। উন্মাদিনীর মত ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দীপিকা দেখিল সম্মুখের দর্পণে ইন্দ্রলেখার মুখ!

শ্রীসীতা দেবী।

অহুর-মজ্‌দার নামাবলী

অবেস্তার পরমেশ্বরের নাম অ হু র ম জ্‌ দা। কখনো কখনো কেবল অ হু র অথবা কেবল ম জ্‌ দা শব্দও পরমেশ্বর-অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণত মজ্‌দ বলা হয়। অবেস্তার অ হু র সংস্কৃতের অ সু র ভিন্ন কিছুই নহে। অ হু র শব্দের অর্থ প্রাণপ্রদ; অঙ্‌হু বা অহু=সংস্কৃতের অসু, অর্থ জীবন বা প্রাণ; এবং র-শব্দ অবেস্তা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই দানার্থক রা-ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন। উভয় ভাষাতেই ঐ ধাতুর অপর পদ রা তি (=দত্ত) শব্দের প্রচুর প্রয়োগ আছে। অবেস্তায় অ হু র শব্দের যে অর্থ প্রদর্শিত হইল, বেদেও ইহা ঠিক ঐ অর্থেও বহু স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিতেছি। বাজসনেয়ি সংহিতায় (৩।২৬) সবিতার বিশেষণরূপে অ সু র শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। উবট ও মহীধর উভয় ভাষ্যকারই ঐ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"অ সূ ন্ প্রাণান্ দদাতীতি অ সু রঃ" (উবট); "অ সূ ন্ প্রাণান্ রা তী তি অ সু রঃ" (মহীধর)। সায়নও অনেক স্থানে এই অর্থ ধরিয়াছেন (ঋগ্বেদ, ১.৩৫.৭, ১০; ইত্যাদি।) আবার স্থানে স্থানে মত্বর্থীয় (অস্ত্যর্থে) র প্রত্যয় করিয়া তিনি ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—অসুমান্, অর্থাৎ প্রাণবান্, বলবান্ (১০.১০.২, ইত্যাদি)। আবার কোনো কোনো স্থলে উহার অর্থ প্রজ্ঞাবান্ লিখিয়াছেন (৭.৫৭.২৩)। কোনো কোনো স্থলে আবার উণাদি-সূত্র-অনুসারে (১.৪৫ "অসেরুরন্") মূলত নিরাসকারী অর্থ ধরিয়া ভাষার্থ লিখিত হইয়াছে—শত্রুনিরাসকারী (১.১৪৩.৩; ১.১৩১.১) অথবা অনিষ্ট-

নিবারণকারী (২.২৭.১০, ২৮.৭)। কোথাও বা অর্থ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে দানশীল – ধনত্যাগকারী (১.১২৬.২)। আবার কোথাও কোথাও সুপ্রসিদ্ধ দৈত্য-অর্থেই ঐ শব্দ প্রযুক্ত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে (১.১২২.১)। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে বেদে অসুর-শব্দটি অগ্নি (২.১.৬; ৩.৩.৪, ৪.২.৬; ৫.১৫.১), বরুণ (১.২৪.১৪, ২.২৭.১০, ২৮.৭; ৮.৪২.১), ইন্দ্র (১.৫৪.৩, ১৭৪.১), সবিতা (১.৩৫.৭, ১০), রুদ্র (৫.৪২.২), দেবই (১.১৩১.১) ও অন্যান্য আরো অনেককে (ত্বষ্টা, ১.১১০, ৩; পূষা, ৫.৫২.১১; পর্জন্য, ৫.৫৩.৬) বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বৈদিক মন্ত্রসমূহে অসুর শব্দ কখনো কখনো দৈত্য-অর্থে প্রযুক্ত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই তাহা বিশেষণ রূপে উল্লিখিত অর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। এক স্থানে (৭.৫৭.২৪) ঋষি তাঁহার অ সু র (=প্রজ্ঞাবান্—সায়ণ) পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন যে, সে যেন বলবান্ হয়।

অবেস্তায় এই অসুর বা অহুর শব্দ একমাত্র পরমেশ্বরের বিশেষণ রূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অথবা বিশেষ্য রূপে প্রযুক্ত হইলেও তাহা পরমেশ্বরকেই বুঝায়, এবং 'প্রাণ-প্রদ' এই একটি মাত্র অর্থ প্রকাশ করে।

ম জ্‌ দা শব্দটি ম জ্‌ ও দা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ম জ্‌=বৈদিক সংস্কৃত ম হ্‌=মহৎ, মহান্; এবং দা= সংস্কৃত √ধ্যৈ হইতে নিষ্পন্ন বৈদিক ধ্যা (ঋগ্বেদ, ৪-৩৬ ২) =ধ্যান। অবেস্তার দা ধাতু অর্থভেদে চারিটি; এই ধাতু-কয়েকটিকে সংস্কৃতে প্রকাশ করিতে হইলে দানার্থক √দা, ধারণ-ও-পোষণার্থক √ধা, খণ্ডনার্থক √দো, ও চিন্তার্থক √ধ্যৈ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রকৃতস্থলে অবেস্তার দা সংস্কৃতের √ধ্যৈ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অর্থ অবেস্তায় জানা ও চিন্তা করা উভয়ই হয়। এখানে ইহার জানা অর্থই ধরিতে হইবে। আবার দা পদের অর্থ জ্ঞাতা ও জ্ঞান এই উভয়ই হয়, এবং এই উভয় অর্থ হইতেই আলোচ্য পদটি হইতে পারে। ম জ্‌ অর্থাৎ মহান্, দা অর্থাৎ জ্ঞাতা, ম জ্‌ দা অর্থাৎ মহাজ্ঞাতা, মহাজ্ঞানী। অথবা ম জ্‌ মহৎ, দা জ্ঞান যাহার, সে ম জ্‌ দা অর্থাৎ মহাজ্ঞান, মহাজ্ঞানী; ইহা হইতেই ঐ পদটি সর্ব্বজ্ঞ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে অ হু র ম জ্‌ দা শব্দের আক্ষরিক অর্থ প্রা ণ প্র দ ম হা জ্ঞা নী (=সর্ব্বজ্ঞ)। দস্তুর নের্যোসঙ্গ ধবল গুজরাটের রাজা রাণা যাদবের জন্য অবেস্তার কিয়দংশ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। তিনি অ হু র শব্দের সর্ব্বত্র অনুবাদ করিয়াছেন স্বামী। ম জ্‌ দা শব্দের অনুবাদ তাঁহারো মতে মহাজ্ঞানী।

পরমেশ্বর-সম্বন্ধে অবেস্তাপন্থীর কিরূপ বিশ্বাস, তাহা তাঁহাদের এই অহুর, বা মজ্‌দা, বা অহুর মজ্‌দার নামাবলী আলোচনা করিলে অনেকটা জানিতে পারা যাইবে। বেদ-পন্থীরা ভগবানের গুণরাশি সহজে স্মরণ ও চিন্তা করিবার জন্য এক-একটি গুণের প্রকাশক এক-একটি নাম রচনা করিয়া দ্বাদশ নাম, ষোড়শ নাম, শত নাম, সহস্র নাম ইত্যাদি রূপে সংখ্যানুসারে সেই নামগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্তিভাবে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। বাজসনেয়ি-সংহিতার রুদ্রাধ্যায় (১৬শ অধ্যায়) দর্শন করিলে জানা যাইবে বেদপন্থীদের বেদ হইতেই এই ধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং পরবর্ত্তী কালে ইহা নানা মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। ইস্‌লাম-ধর্ম্মে আল্লার ১০০১ নাম আছে। ইহুদী ধর্ম্মেও আছে। অবেস্তার অ হু র মজ্‌দ য শ্‌ ত নামক অংশে (হোর মজ্‌দ বা ওরমজ্‌দ যশ্‌ত,—খুরদে অবস্তা, দীনশাহজী, ৩০৯পৃঃ; The Sacred Books of the East, Zend-Avesta, Part II, p. 21) অহুর মজ্‌দারও এইরূপ কতকগুলি নাম ও তাহাদের ফলশ্রুতি লিখিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট সংক্ষেপে উপহৃত হইতেছে।

জরথুস্ত্র অহুর মজদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভূতময় জগতের বিধাতা, হিতকরতম, পুণ্যাত্মা অহুর মজদা, অভ্যুদয়কর মন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি দৃঢ়তম, কোন্‌টি জেতৃতম, কোন্‌টি উজ্জ্বলতম, কোন্‌টি অধিকতম ফলকর, কোন্‌টি অধিকতম শত্রুবধকর, কোন্‌টি ভেষজতম, কোন্‌টি দেব (=দানব) ও মনুষ্যগণের দ্বেষকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিনষ্ট করে, কোন্‌টি ভূতময় বিশ্বজগতের মনোরথকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণ করিয়া থাকে, এবং কোন্‌টি ভূতময় বিশ্বজগতের আত্মা বা জীবনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার্জ্জন (শোধন) করিতে পারে (অথবা বিতর্কসমূহকে...অপনয়ন করিতে পারে)?

ইহাতে অহুর মজ্দা উত্তর করিলেন—হে স্পিতম-পুত্র জরথুস্ত্র, আমি * অমৃত ও অভ্যুদয়কর ("স্পেন্ত"), আমার নামই তাহা (সেই); অভ্যুদয়কর মন্ত্রের মধ্যে তাহাই দৃঢ়তম, তাহাই জেতৃতম, উজ্জ্বলতম, অধিকতম ফলপ্রদ, ও অধিকতম শক্রবধকর; তাহাই ভেষজতম, তাহাই দেব ও মনুষ্যগণের দ্বেষকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিনষ্ট করে, তাহাই ভূতময় বিশ্বজগতের মনোরথকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণ করিয়া থাকে, এবং তাহাই ভূতময় বিশ্বজগতের আত্মা বা জীবনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার্জ্জন (শোধন) করিয়া থাকে।

জরথুস্ত্র উত্তর করিলেন—হে পবিত্র অহুর মজ্দা, আমার নিকটে আপনার সেই নাম প্রকাশ করুন—যে নাম মহিষ্ঠ (মহত্তম), বশিষ্ঠ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), শ্রেষ্ঠ ও ফলপ্রদতম, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুবধকর ও ভেষজতম, এবং যাহা দেব ও মনুষ্যগণের দ্বেষকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিনষ্ট করিয়া থাকে; যাহাতে আমি সমস্ত দেব (=দানব) ও মানবকে পরাহত করিতে পারি; সমস্ত যাদুকর ও পরীকে পরাহত করিতে পারি; যাহাতে দেব ও মানব, অথবা যাদুকর ও পরী কেহই আমাকে পরাহত করিতে পারিবে না।

অহুর মজ্দা উত্তর করিলেন—হে পুণ্যাত্মা জরথুস্ত্র আমার নাম প্র ষ্ট ব্য (ফ্রথ্শ্তো) †।

আমার দ্বিতীয় নাম (মনুষ্য ও পশু) গণের দা তা অথবা র ক্ষ ক ("বাংথ্বা")।

আমার তৃতীয় নাম ব্যা প ক ("অবিতঞ্জ", সং অভি+তন্ 'বিস্তার')। ‡

আমার চতুর্থ নাম ঋ ত ব সি ষ্ঠ ("অস বহিশ্ত") অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র।

আমার পঞ্চম নাম ম জ্ দা-নি র্ম্মি ত ঋ ত-মূ ল ক স ম স্ত উ ত্ত ম বস্তু ("বীস্প বোহু মজ্দা-ধাত অষ-চিথ্র")।

আমার ষষ্ঠ নাম ক্র তু অর্থাৎ প্রজ্ঞা ("খ্রতু")।

আমার সপ্তম নাম ক্র তু মা ন্ অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্ ("খ্রতুমন্ত")।

আমার অষ্টম নাম চি ত্তি অর্থাৎ চিৎ ("চিশ্তি")।

আমার নবম নাম চি ত্তি মা ন্ অর্থাৎ চিত্তি বা চিৎ-যুক্ত ("চিশ্তিবন্ত")।

আমার দশম নাম শু ভ ("স্পান")। *

আমার একাদশ নাম শু ভ জ ন ক ("স্পানঙুহ")। *

আমার দ্বাদশ নাম অ সু র ("অহুর")। †

আমার ত্রয়োদশ নাম শ বি ষ্ঠ ‡ ("সেবিশ্ত") অর্থাৎ হিতকরতম।

আমার চতুর্দ্দশ নাম দ্বে ষ হী ন ("বীষএশ্‌খ্য")।

আমার পঞ্চদশ নাম অ বি জে য় ("অ-বনেম্ম")।

আমার ষোড়শ নাম ভূ ত স মূ হে র গণনা কা র ক ("হাত মরেনু")। §

আমার সপ্তদশ নাম বি শ্ব দ্র ষ্টা ("বীস্পহ্বর্স্")।

আমার অষ্টাদশ নাম ভে ষ জ অর্থাৎ ভি ষ ক্ ("বএষজ্য")।

আমার ঊনবিংশ নাম ধা তা ("দাত")।

আমার বিংশ নাম ম জ্ দা (অর্থাৎ মহাজ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞ)।

অহুর মজ্দা জরথুস্ত্রকে প্রতি অহোরাত্রে এইসকল নাম কীর্ত্তন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া আবার বলিলেন—

"আমি পা তা ("পায়ু"), আমি ধা তা ("দাতা") অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, ও আমি ত্রা তা ("থ্রাতা")। আমি জ্ঞাতা ("জ্ঞনাতা") ও হি ত ত ম আত্মা ("মইন্যু স্পেন্তোতেম"), মইন্যু=সং মন্যু=মন, আত্মা।

আমি ভিষক্ ("বএষজ্য"), আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভিষক্ ("বএষজ্যোতেম")।

---

* মূলে বহুবচন আছে।

† অহুর মজ্দা শাস্ত্র বা ধর্ম্মবিধির প্রকাশক। জরথুস্ত্র অহুর মজ্দাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং ইনি উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার নিকটে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন। হিতাহিত ও বিধি-নিষেধের সমস্ত তত্ত্বের নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকেই প্রশ্ন করিতে হয়।

‡ কেহ কেহ ইহার অর্থ সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টিসম্বন্ধে শক্তিমান্ এই অর্থ করিয়া থাকেন।

* Mill এইশব্দ দুইটির অর্থ যথাক্রমে 'Weal' ও 'He who produces weal' লিখিয়াছেন। এখানে তাহাই অনুসৃত হইল। কিন্তু অভিধানে (Kanga) ঐ উভয় শব্দেরই অর্থ বিবেক বা প্রজ্ঞা (discretion, wise) লিখিত হইয়াছে।

† পূর্ব্বে দেখ।

‡ ইহা বৈদিক শব্দ, কিন্তু বেদে ইহার অর্থ বলিষ্ঠ।

§ সংস্কৃতানুবাদক নেরোসঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'যিনি স্পষ্টরূপে পাপপুণ্যের সংখ্যা করেন।'

আমি অ থ র্ব্বা ("আথ্রবন"), আমি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অ থ র্ব্বা ("অ'থ্রবশ্তেম")। *

আমি অ সু র ("অ হু র")।

আমি ম জ্‌ দা।

আমি ঋ তা বা ("অষবন্‌") অর্থাৎ পবিত্র, আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঋ তা বা ("অষবস্তেম")।

আমি জ্যো তি র্ম্ম য় ("খ্‌ রে ন ঙ্‌ হ ন্‌"), আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যো তি র্ম্ম য় ("খ্‌রেনঙ্‌হস্তেম")।

আমি পু রু দ্র ষ্টা ("পৌউরু দরশ্‌তর্‌"), অর্থাৎ যিনি পূর্ণভাবে দর্শন করেন, বিচক্ষণ; আমি পু রু দ্র ষ্টৃ ত ম পৌউরু-দরশ্‌তো-তেম)।

আমি দূ র দ্র ষ্টা ("দূরএ-দরেশ্‌তর্‌"), আমি দূ র-দ্র ষ্টৃ ত ম ("দূরএ-দরেশ্‌তো তেম") আমি প র্য্য বে ক্ষ ক ("স্পশ্‌তর্‌") † অর্থাৎ নিরীক্ষক, রক্ষক; ‡ আমি ম ঙ্গ ল ("বীত") ‡, আমি ধা তা ("দাতর্‌"), আমি পা তা ("পাতর্‌"), এবং আমি ত্রা তা ("থ্রাতর্‌")।

আমি জ্ঞা তা ("স্নাওর্‌"), আমি জ্ঞা তৃ ত ম ("স্নোইশ্‌ত")।

আমি বৃ দ্ধি ক র ("ফ্‌স্নৎ") এবং আমার নাম বৃ দ্ধি ক র ম ন্ত্র ("ফ্‌স্নবো-মন্থ্র")।

আমি স্বৈ র শা সক ("ইসে-খ্‌ষথ্র"), ॥ আমি স্বৈ র শা স ক ত ম।

আমি না ম ক্ষ ত্র অর্থাৎ নামজাদা প্রসিদ্ধ রাজা ("নাংমো-খ্‌ষথ্র"), আমি না ম ক্ষ ত্র ত ম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামজাদা রাজা ("নাংমো-খ্‌ষথ্রো-তেম")।

আমি অ ব ঞ্চ ক ("অ-ধবি") ও আমি অ ব ঞ্চি ত ("বী-ধবি")।

আমি প তি পা তা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রক্ষক ("পইতি-পাথ্র"), আমি দ্বে ষ বি না শ ক ("ত্‌ বএষো-তউর্বস্ত্‌"), আমি স ত্রা জি ৎ অর্থাৎ সতত বিজয়ী (অথবা সদ্যোহন্তা, "হথ্‌ৰন"), আমি বি শ্ব বি জে তা ("বীস্পবন"), আমি বি শ্ব ত ক্ষা ("বীস্পতম্‌") ।+

আমি বি শ্ব-ম ঙ্গ ল। ("বীস্প-খাথ্র"), আমি পু রু ম ঙ্গ ল (অর্থাৎ প্রচুর বা পূর্ণমঙ্গল, "পোউরু-খাথ্র"), আমি ম ঙ্গ ল বা ন্‌ ("খাথ্রবস্ত্‌")।

আমি উ প কা র ক ‡ ("বেরেজ্রি-সওক"), আমি ক র্ম্মো প যো গী ("বেরেজি-সবঙ্‌হ্‌"), আমি হিতকারী ("সেবু"), আমি শূ র ('স্থর") অর্থাৎ সাহসী, আমি শ বি ষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকর ("সেবিশ্‌ত") ।§

আমার নাম ঋ ত ("অষ"), আমি বৃ হ ৎ ("বেরেজ্র"), আমি ক্ষত্র অর্থাৎ শাসক রাজা (খ্‌ষথ্র"), আমি ক্ষ ত্র ত ম ("খ্‌ষথ্রোতেম"), আমি সু প্র জ্ঞ ("হুধাহু"), আমি সু প্র জ্ঞ ত ম ("হুধাহুশ্‌তেমো"), এবং আমি দূ র দ র্শী (দূরএহ্‌ক)।

এই সমস্ত নাম আমার।

অহুর মজ্‌দা এই বলিয়া জরথুস্ত্রকে বলিলেন যে, হে স্পিতমপুত্র জরথুস্ত্র, যে ব্যক্তি দিবা বা রাত্রিতে, শয়নে বা উত্থানে, মেখলার ॥ বন্ধনে বা উন্মোচনে, বাসস্থান বা নগর হইতে বহির্গমনে, দেশ হইতে গমনে বা অপর দেশ হইতে আগমনে এইসকল নাম, উচ্চারণ করে, সে ঐ দিবা বা রাত্রিতে দুষ্টবুদ্ধি বৈরীর অস্ত্রে আহত হয় না; কর্ত্তরী (কাটারি), চক্র, শর, শস্ত্রিকা ও বজ্রে আহত হয় না। এইসকল নাম তাহাকে সম্মুখে ও পশ্চাতে রক্ষা করে, বিবিধ অপকারকদের নিকট হইতে রক্ষা করে, এবং অঙ্‌রমইন্যু হইতে রক্ষা করে!

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

* অবেস্তায় 'আথ্রবন্‌' শব্দের আসল অর্থ অগ্নির রক্ষক (আতর্‌ 'অগ্নি' + √বন্‌ 'ভালবাসা শ্রদ্ধায় সহিত সম্মান করা')। ইহা হইতে এই শব্দটি পুরোহিত অর্থে প্রযুক্ত হয়। বেদে অগ্নিকেও পুরোহিত বলা হইয়াছে।

† সংস্কৃতেও, বিশেষতঃ বৈদিক সংস্কৃতে দর্শনার্থক √স্পশ্‌ আছে। এ সম্বন্ধে অবেস্তা শব্দপ্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

‡ অর্থাৎ যিনি কাহাকেও দেখা-শুনা করিয়া রক্ষা করেন, "নগেহবানী রাখনার।"

§ মঙ্গলেচ্ছু, Mill.

॥ ই সে—সং ইষ্‌ 'ইচ্ছা করা' হইতে, খ্‌ ষ থ্র—ক্ষত্র—রাজা, রাজা, রাজশক্তি, যিনি নিজের ইচ্ছায় রাজ্য পরিচালন করেন।

+ অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে তক্ষণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

। অথবা বি শ্ব সু খ, যিনি বিশ্বের মঙ্গল বা সুখস্বরূপ; অথবা যিনি নিজেই পূর্ণ সুখ, "All weal"—Mill. "Enjoying perfect ease or comport"—Kanga.

‡ অর্থ সন্দিগ্ধ, Mill—"He who can benefit at his wish" Kanga—'active in work' (Dictionary).

§ সংস্কৃতে শবিষ্ঠ শব্দের অর্থ বলিষ্ঠ।

॥ মূলে "অইব্যাওনহন"। ইহা বেদপন্থীর উপনয়নে মৌঞ্জীবন্ধন। উপনয়নে ব্রাহ্মণবটুকে মৌঞ্জী (মুঞ্জনামক-তৃণ-নির্ম্মিত) মেখলা ধারণ করিতে হয়। অবেস্তাপন্থীরা এই মেখলাকে সাধারণতঃ 'কোস্তি' বা 'কুস্তি' (কোমরবন্দ, 'কমরবন্দ্‌') বলিয়া থাকে।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

[জাপানী শ্রমণ একাই কাওগুচির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।]

৪৯ অধ্যায়।

একদিন আমার পার্শ্বের ঘরে দুইজন পুরোহিতের ঝগড়া হয়, শেষে হাতা-হাতি; তখন একজন অপর একজনকে পাথর দিয়া হাতে এমন প্রচণ্ড আঘাত করে যে হাতের হাড় সরিয়া যায়। সে দেশে হাড় সরিয়া গেলে তাহা যথাস্থানে কি করিয়া বসাইয়া দিতে হয় তাহা কেহ জানেও না কখন শোনেও নাই। অস্থি যদি স্থানচ্যুত হয় লোহা তপ্ত করিয়া সেখানে লাগানই প্রশস্ততম ব্যবস্থা। আহত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম ডান হাতের হাড় সরিয়া গিয়াছে, হাড় ঠিক করিয়া দিবার প্রস্তাবে সকলের চক্ষুস্থির। তারপর যখন আমি সত্যসত্যই তাহার হাড় যথাস্থানে বসাইয়া দিলাম তখন সকলের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না।

সিদ্ধহস্ত চিকিৎসক বলিয়া আমার খ্যাতি চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক চিকিৎসার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি যতই বলিতাম যে আমি চিকিৎসা করিতে অসমর্থ, ততই লোকে আরও আসিতে আরম্ভ করিল। তখন অগত্যা লাসা হইতে কিছু ঔষধ আনাইয়া রাখিলাম। বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার, যাহাকেই ঔষধ দিই সেই সুস্থ হইয়া উঠে। ইহা ঔষধের গুণ কি বিশ্বাসের গুণ তাহা বলিতে পারি না। তিব্বতীরা শোথ রোগকে মারাত্মক বলিয়া মনে করে। এইরূপ রোগী বিস্তর আসিত। এক তিব্বতী সাধু আমায় শোথ রোগের একটা ঔষধ বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই ঔষধ দিয়া আমি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনকে আরোগ্য করিতে পারিলাম। এখন আমার খ্যাতিপ্রতিপত্তির সীমা রহিল না। আমাদের বিহারের কথা ছাড়িয়া দিই, সমুদায় লাসা সহরে, এমন কি সিগাটসি পর্য্যন্ত ধন্বন্তরি চিকিৎসক বলিয়া আমার খ্যাতি রাষ্ট্র হইয়া গেল। দুইতিন দিনের পথ হইতে আমায় লইয়া যাইবার জন্য ঘোড়া আসিত। আমি রোগীর নিকট হইতে অর্থ লইতাম না, এমন কি ঔষধ পর্য্যন্ত বিনামূল্যে বিতরণ করিতাম, আমার খ্যাতির প্রধান কারণ এই। বাস্তবিক লোকে আমায় সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি বলিয়া বিশ্বাস করিত। তিব্বতে ক্ষয়রোগ বড় প্রবল। আমি সচরাচর এসকল রোগীকে মৃত্যুর সন্নিকট বুঝিয়া ঔষধ না দিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতাম। সেইজন্য এসকল রোগী আমার নিকট আসিতে ভয় পাইত। এদেশের লোক চিকিৎসক ডাকিবার পূর্ব্বে গণৎকার ডাকিয়া কোন্ ডাক্তার ডাকিতে হইবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। অনেক সময় চিকিৎসকেরা এই-সকল গণৎকারকে ঘুষ দিয়া তাহাদের ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলে। আমি বড় অবাক হইয়া গেলাম যে গণৎকারেরা রোগীদের আমায় ডাকিবার জন্য পরামর্শ দিত। আমি তাদের রূপও কখন দেখি নাই। বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত আমায় চিকিৎসার জন্য লইয়া যাইত। আমি সেখানেও পদার্পণ করিয়া সমাদরের একশেষ দেখিতে পাই। লোকে যেন আমায় প্রাণদাতা দেবতা বলিয়া ভাবে। লোকের যখন নাম পড়িয়া যায়, তখন কি করিয়া যে লোকের মুখে মুখে নাম ফিরে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। আমার নাম সকলের মুখে, খ্যাতি আর ধরে না। একদিন সত্যসত্যই রাজপ্রাসাদে ডাক পড়িল। দলাই লামার পীড়ার জন্য নহে—যে ব্যক্তির যশঃসৌরভে তিব্বতরাজ্য আমোদিত সেই অসাধারণ ব্যক্তিকে তিনি একবার দেখিয়া লইবেন।

এদেশে মহাপ্রভু দলাই লামার সাক্ষাৎ, মহাপুণ্য-বলেই মানুষ লাভ করিয়া থাকে। প্রধান প্রধান লামারা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারে না। আমার পরম সৌভাগ্য যে সেই সর্ব্বজনবরেণ্য দলাই লামার সহিত সাক্ষাৎকার লাভের অধিকার প্রাপ্ত হইলাম। আমি দলাই-লামার পোটালা প্রাসাদে গিয়া দেখি তিনি সেখানে নাই—কিন্তু নদীর তীরে নোলপুলিংথ-নামক উদ্যান-বাটিকায় গিয়াছেন। বনের মধ্য দিয়া অনেক দূর গিয়া বিশ ফুট উচ্চ এক প্রাচীর দেখিলাম। পশ্চিম দিকে এক প্রকাণ্ড ফটক পার হইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। রাস্তার দুই ধারে ছোট ছোট-থামের মত জিনিষ দেখিলাম। শুনিলাম দলাই লামা যখন পথ দিয়া যান তখন দুই ধারে ঐ

থামের মাথায় ধূপধুনা জ্বালান হয়। ভিতরে অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সুন্দর সুন্দর বাড়ী। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, এবং সম্মুখে চমৎকার পুষ্পোদ্যান। তিব্বতে যত-প্রকার, বৃক্ষ পুষ্প লতা আছে, সকলই এখানে দেখিলাম। প্রাঙ্গণের চারিকোণে ছোট-ছোট ঘরে ৫০।৬০টি কুকুর বাঁধা রহিয়াছে। দলাই লামা অত্যন্ত কুকুর ভাল বাসেন, তাই দেশদেশান্তর হইতে তাঁর জন্য কুকুর আসে। আমাকে দলাই লামার প্রধান চিকিৎসকের বাড়ী লইয়া গেল। চিকিৎসকের বাড়ীটি অতি সুন্দর, সম্মুখেই ফুলের বাগান। চিকিৎসকের গৃহে বুদ্ধের ছবি, সর্ব্বাঙ্গে রৌপ্যময় প্রদীপ জ্বলিতেছে। চিকিৎসক অতি সুন্দর শয্যায় বসিয়া আছেন। আমাকে তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন। শীঘ্রই ভৃত্য উৎকৃষ্ট চা পাত্র ভরিয়া লইয়া আসিল।

চিকিৎসকমহাশয় বলিলেন-তিনি বড় ব্যস্ত, আমার সহিত আলাপ করিবার সময় নাই—দলাইলামার কোন পীড়া হয় নাই, তিনি কেবল আমার সহিত আলাপ করিতে চান। আমাকে তখনই দলাইলামার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। দ্বারে মুদ্গর হস্তে এক প্রহরী লামা দণ্ডায়মান। প্রাঙ্গণ পার হইয়া আর-একটি ফটক দেখিলাম, সেখানে ৪ জন প্রহরী মুদ্গর হস্তে দণ্ডায়মান। চারিদিকের প্রাচীরে শার্দ্দূলের ছবি—উপরে ছাদ আছে বটে, কিন্তু চারিদিক খোলা। এখানে পশ্চিমদিক দিয়া কিছুদূর যাইতে-না যাইতে দলাইলামা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইলেন। দলাই-লামার অগ্রে দুইজন প্রধান পুরোহিত এবং পশ্চাতে তাঁহার শিক্ষক আসিলেন। দলাইলামা আসিয়া দক্ষিণদিকে এক আসনে বসিলেন। পুরোহিতদ্বয় উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল, শিক্ষক সম্মুখে আর-এক আসনে বসিলেন -আরও ৫।৬ জন লামা দলাইলামার সম্মুখে বসিলেন। প্রধান চিকিৎসক মহাশয় আমায় লইয়া অগ্রসর হইলেন। আমি দলাইলামাকে তিনবার কুর্ণিশ করিয়া স্কন্ধ হইতে বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি আমার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া চিকিৎসকের পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। দলাইলামা বলিলেন, তুমি সেরাতে অনেক দরিদ্র লামাকে আরোগ্য করিয়াছ। আমি তোমার এই কার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও অনেক দিন এখানে থাকিয়া এইরূপে কার্য্য কর। তারপর চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলাপ করিলেন। তখন আমার জন্য চা আসিল, আমি পাত্র গ্রহণ করিলাম। দলাইলামাও গাত্রোত্থান করিলেন। দলাইলামা অনন্যসাধারণ বেশে সজ্জিত ছিলেন—বহুমূল্য রেশমী এবং পশমী বস্ত্র তাঁহার দেহে দেখিলাম, মস্তকে কিরীট, বাম হস্তে জপের মালা। দলাইলামার বয়স ২৬ বৎসর মাত্র—লম্বায় ৫ ফুট আট ইঞ্চি। ইহা সে-দেশের পক্ষে দীর্ঘকায় নহে। দলাইলামার আকৃতি বীরত্বব্যঞ্জক—চক্ষু উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ, স্বর গম্ভীর। তাঁর আকৃতির ভিতর এমন কিছু আছে যাহাতে তাঁহাকে সম্ভ্রম না করিয়া থাকা যায় না। পরে আমার অনেকবার দলাইলামার দর্শনলাভ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস তিনি ধর্ম্মচিন্তা অপেক্ষা রাজ-নৈতিক ব্যাপারে অধিক মনোনিবেশ করেন। ইংরেজজাতির গতিবিধির উপর তাঁহার সম্যক দৃষ্টি; কি উপায়ে তাহাদিগকে তিব্বতরাজ্য হইতে দূরে রাখিতে পারা যায় এই চিন্তায় তিনি নিয়ত নিযুক্ত থাকেন। দলাইলামার প্রাণটি হাতে করিয়া বাস করিতে হয়, সর্ব্বদাই তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। কতবার ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখনই অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে। তিব্বতের দলাইলামাদের ৯ জনের মধ্যে কেবল ৫ জন ২৫ বৎসর পার হইয়াছিল, সকলকেই তৎপূর্ব্বে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে। দলাইলামা উপযুক্ত ব্যক্তি হইলে কুচক্রীগণের মনস্কামনা পূর্ণ হয় না—কাজেই দলাইলামার প্রাণ সংহারের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। দলাই-লামাই ত প্রকৃতপক্ষে তিব্বতের রাজা। অন্যান্য দেশের মত তাঁর অনুচরদিগের মধ্যে অনেক স্বার্থপর ধূর্ত্ত আছে—যাহারা সম্মুখে চাটুকারিতা এবং পশ্চাতে শত্রুতা করে। ইহাদের চক্রান্তে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু দেশের আপামরসাধারণ লোক দলাইলামাকে দেবতার মত ভক্তি করে। আমি দলাইলামার প্রাসাদের অনেক প্রকোষ্ঠ দেখিয়াছি, যথার্থই তাহা অতি সুন্দর, গৃহের মেজে কত বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত। কিন্তু ভিতরের ঘর কখন দেখি নাই, বাহির হইতে দেখিতে অতি সুন্দর।

দলাইলামার প্রধান চিকিৎসকের সহিত চিকিৎসা সম্বন্ধে

অনেক আলাপ হইল। তিনি আমাকে অনেক ঔষধ শিখাইয়া দিলেন। আমাকে দলাইলামা লাসা সহরে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বলিলেন। চিকিৎসক মহাশয়ও আমাকে কোনমতে লাসা ত্যাগ করিতে দিবেন না। আমি বলিলাম "ধর্ম্মশিক্ষাই আমার উদ্দেশ্য, আমি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে যাইব।" বৈদ্যশ্রেষ্ঠ বলিলেন "তুমি দেহ এবং আত্মার পরিচর্য্যা কর—জীবের উপকার করাই বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা, তুমি সেকথা ভুলিও না।" আমি ভাবিলাম কেনই বা আমি ইহাকে ভারতবর্ষে যাইবার কথা বলিলাম, না বলিলেই ছিল ভাল। যাহোক এমন কিছু ঘটিল যাহাতে আমার এসকল প্রস্তাব অন্য রূপ ধারণ করিল।

৫০ অধ্যায়।

সেরা বিহারে জীবনযাত্রা।

"দলাইলামা ও রাজকর্ম্মচারীগণ আমাকে একজন বড় চিকিৎসক বলিয়া যখন গ্রহণ করিলেন, তখন সেরা বিহারের লামাদিগের মধ্যে আমার সেখানে অবস্থান সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ উপস্থিত হইল। আমি যখন এত বড় একজন লোক, তখন সাধারণ শিক্ষার্থীর মত সেখানে থাকি কি করিয়া। অনেক আলোচনার পর তাঁহারা স্থির করিলেন যে আমার জন্য তাঁহারা বিশেষ নিয়ম করিবেন, আমাকে স্বতন্ত্র একটি ঘর দেওয়া হইবে। ২১এ জুলাই আবার দলাইলামার সহিত সাক্ষাৎ হইল—ঐ মাসের শেষে আমি একটি স্বতন্ত্র গৃহ পাইলাম। সেরা বিহারে ৪ শ্রেণীর লামা থাকে। নবাগতগণ কখন একটি স্বতন্ত্র ঘর পায় না—কেহ ধনী হইলে একটি অতি নিকৃষ্ট ঘর পায়। আমি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘর পাইলাম—প্রধান লামা ভিন্ন কেহ প্রথম শ্রেণীর ঘর পায় না। আমি দোতলায় ঘর, রন্ধনগৃহ প্রভৃতি সবই পাইলাম। আমার নিকট যে অর্থ ছিল তাহা দিয়া আসবাব কিনিয়া ঘর সাজাইলাম। লামারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রথম, মধ্যম ও নিম্ন। প্রথম শ্রেণীর লামাদিগের মাসে ৭ ইয়েন ব্যয় হয়। ২০ ইয়েন ব্যয় করিলে লামার সম্পূর্ণ পোষাক হইতে পারে—যথা, মাথার গরম টুপি, জামা, জুতা ইত্যাদি। সহরের সমুদায় বিহারবাসী লামা বিনামূল্যে চা পায়, যাহারা ধনী তাহারা নিজে চা করিয়া খায়—তাহারা গমের রুটী, মাংস, চা, মাখম সবই আহার করে। তিব্বতীরা যে পরিমাণে মাংস খায় সে পরিমাণে তরিতরকারি খায় না—চা অতিরিক্ত মাত্রায় পান করে। চাএর পেয়ালার উপর রূপার ঢাকনি থাকে। অধিকাংশ লামার জমিজমা চাষবাস আছে। অনেকে চমরী, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগলের ব্যবসায় করে। মধ্যবিত্ত লামাদিগের ৫০টি চমরী ১০টি ঘোড়ার বেশী থাকে না। চমরী ও ঘোড়ার দ্বারা কৃষিকার্য্য হয়। দুটি চমরী ১০খানি ছোট ক্ষেত একদিনে চাষ করিতে পারে। চাষবাস ব্যবসাবাণিজ্য না করিলে লামাদিগকে নিতান্ত দুর্দ্দশায় কাটাইতে হয়।

এদেশে উৎকৃষ্ট চা করিতে হইলে ১২ ঘণ্টা চা সিদ্ধ করিতে হয়—ক্রমে যখন ঘন কৃষ্ণবর্ণ হয় তখন তাহাতে চমরীর মাখম ও লবণ দিয়া ঘুঁটিতে হয়। এইপ্রকার এক বড় চাদানির চা করিতে ৩৮ সেন ব্যয় হয়।

আমি প্রথম প্রথম এই-রকম ঘন তেলের মত চা কিছুতেই খাইতে পারিতাম না—ক্রমে অভ্যাস হইয়া আসিল। মাখম বা ছানা চিনির একপ্রকার শুষ্ক খাদ্য প্রস্তুত হয়—তাহাকে "সু" বলে। এদেশের লোক চার সঙ্গে তাহাই আহার করে। ইহারা অত্যন্ত মাংসপ্রিয়, একদিন মাংস না পাইলে বলে "আমি রোগা হইয়া গেলাম"—শুষ্ক মাংস, সিদ্ধ মাংস, এমন কি আমমাংস পর্য্যন্ত অক্লেশে আহার করে। ধনীরা উত্তম আহার করে, বেশ থাকে। দরিদ্র লামাদিগের দুর্দ্দশা দেখিলে চক্ষে জল রাখা যায় না। যাহারা পাঠে মগ্ন থাকে তাহারাই দারিদ্র্যের জাঁতায় সবচেয়ে পিষিয়া যায়। বিহারে যাহা কিছু দক্ষিণা পায় তাহাই জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন, কিন্তু তাহাতে দেহরক্ষা করা অসম্ভব। অগ্নি করিতে এদেশের চমরীর করীষই প্রধান উপকরণ—দরিদ্র লামার ভাগ্যে তাহাও জোটে না। ধনীরা মাসে তিনচার থলে খরচ করে, দরিদ্র ব্যক্তি বৎসরে এক থলে পায় না। দরিদ্র লামার একখানি কম্বল, একটি কাঠের পাত্র, জপের মালা, খানকয়েক ধর্ম্মপুস্তক—ইহাই সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি। পরীক্ষার পর পুস্তকগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলে, সুতরাং এগুলি সাময়িক সম্পত্তি মাত্র।

এই দারিদ্র্য পীড়িত লামাদিগকে দেখিলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইত। আমার হাতে দু-পয়সা থাকিলেই ইহাদের দান করিতাম। এইহেতু এই-সকল ব্যক্তি আমাকে অত্যন্ত সম্মান করিত—আমাকে দেখিলেই শ্রদ্ধাভরে দণ্ডায়মান হইত।

৫১ অধ্যায়।

আমার তিব্বতের বন্ধু।

এখন আমার নিজের কথা বলি। ডাক্তারিতে আমার পসার এতদূর বাড়িয়া গেল যে আমার সর্ব্বদা ঔষধপত্র কিনিতে হইত। ঔষধ কিনিবার জন্ম লাসায় থিন হো-থাং নামে যে বড় দোকান আছে সেখানে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতে হইত। দোকানটি মুন্নু নামক একজন চীনের। চীন দেশে গাছ গাছড়া শিকড় হইতে নির্য্যাস করিয়া ঔষধ প্রস্তত করিতে হয়, কিন্তু তিব্বতের নিয়ম সেরূপ নয়। এখানকার সকল ঔষধই গুঁড়ার মত। এদেশে গাছ, শিকড়, শিং, পাথর প্রভৃতি দিয়া ঔষধ প্রস্তত হয়। আমাকে এত অধিক পরিমাণে ঔষধ কিনিতে হইত যে, দোকানদারের সহিত অত্যন্ত খাতির হইয়া পড়িল। সে ব্যক্তি আমায় মাঝে মাঝে ডাক্তারি বই পড়িতে দিত, তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইত। বাস্তবিক আমার অজ্ঞতাহেতু চিকিৎসাবিভ্রাট যে অনেক ঘটিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কিন্তু বাস্তবিক সেদেশে আমার মতও শরীরতত্ত্ব কাহারও জানা ছিল না। অন্ধের দেশে আমি হলাম পরম পণ্ডিত।

আমি সর্ব্বদাই লি মুন্নুর দোকানে ঔষধ কিনিতে যাইতাম। লাসায় তিনটা প্রধান ঔষধের দোকান আছে, তার মধ্যে এই ব্যক্তির দোকান সর্ব্বপ্রধান। লোকটির সঙ্গে আমার বড়ই হৃদ্যতা জন্মিল। ভদ্রলোকটি সপরিবারে চমৎকার একটি বাড়ীতে থাকে। লোকটি যুবাপুরুষ, বয়স ৩০ বৎসর হইবে। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা। গৃহে শ্বশ্রুঠাকুরাণী বাস করেন। ইহা ভিন্ন দাস দাসী আছে। ইঁহারা আমাকে যেন পরিবারের একজন এইরূপ মনে করিতেন। আমিও সদাসর্ব্বদা তাঁহাদের জন্ম নানাপ্রকার উপহার লইয়া যাইতাম। বিশেষতঃ ছেলেমেয়ে দুটিও আমার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। দুদিন যাইতে বিলম্ব হইলে সকলেই অস্থির হইতেন।

এই ব্যক্তির দোকানে অনেক গণ্যমান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আসিতেন, তন্মধ্যে চীন আম্বানের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মা সেং একজন। এই ব্যক্তি অত্যন্ত পণ্ডিত, এবং সাংসারিক জ্ঞানে অত্যন্ত পাকা। এ লোকটির পিতা চীনে, মা তিব্বতী। চীনে এবং তিব্বতী ভাষায় তার তুল্যরূপ দখল,—দুই ভাষাই নির্ভুলরূপে বলিতে ও লিখিতে পারে। এই ব্যক্তি বিস্তর ভ্রমণ করিয়াছে, দুইবার পিকিংএ, তিনবার ভারতবর্ষে গিয়াছে—এমন কি কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি সহরেও ব্যবসায়ের জন্ম গিয়াছে। লোকটির সাধারণ জ্ঞান অত্যন্ত বেশী, বড়ই আমুদে এবং বাকপটু, মনটিও সরল। আমাকে কত যে চীন ও তিব্বতের রাজ্যসংক্রান্ত গোপনীয় কথা বলিয়াছে। আশ্চর্য্য, এই লোকটি একটিও মিথ্যাকথা বলে নাই। যখনই ক্লান্তি বোধ করিতাম—এই সদালাপীর নিকট গিয়া বসিতাম।

একদিন এই ঔষধের দোকানের সম্মুখে দাড়াইয়া আছি, একজন পার হইয়া গেল। গিয়া ক্রমাগত ফিরিয়া ফিরিয়া আমায় দেখিতে লাগিল। আমি শুনিলাম সঙ্গীকে বলিতেছে "হাঁ এই সেই লোক।"— বলিয়াই ফিরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল "তুমিই না?" আমি প্রথমতঃ চিনিতেই পারি না, পরে চিনিলাম দারজিলিং-প্রবাসী প্রধান মন্ত্রী পংবার পুত্র, সে ব্যক্তি এত রোগা হইয়া গিয়াছে। আমি শুনিয়াছিলাম এ ব্যক্তি উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি ত তাহার উন্মত্ততার কোন লক্ষণই দেখিলাম না। আমরা যে উভয় উভয়কে দারজিলিংএ দেখিয়াছি একথা কাহাকেও জানিতে দিলাম না। লোকটি বলিল যে তিন মাস পূর্ব্বে তার বড় বিপদ গিয়াছে—তার একটা চাকর কি চুরি করিয়াছিল, তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করাতে, সে ব্যক্তি হঠাৎ তাহার উপরে ছোরা বসাইয়া দেয়, তাহাতে তাহার অন্ত্র বাহির হইয়া পড়ে, বাঁচিবার আশা ছিল না, অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়াছে, কিন্তু শরীরটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এইপ্রকার নানাবিধ কথা বলিবার পর লোকটি চলিয়া গেল। সে ব্যক্তি বিদায় লইলে, দোকানদারের পত্নী

আমায় বলিল যে, তোমায় ও-লোকটা সব মিথ্যা বলিয়াছে। ওর নিজের অপরাধেই ঐ দশা ঘটিয়াছে। লোকটা বড় খরচ করে; আর লোকের কাছে টাকা লইতে খুব মজবুত। ওদের ঘরের কথা সব আমি জানি, ওর বড় ভাইএর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু ওরা আমাকে লইয়া ঘর করিতে দেয় নাই, কাজেই সেব্যক্তি আমায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ও-লোকটা পাগল নয়, সুবিধামত পাগল সাজে।

তিব্বতে ফুলের উৎসব হয়। এদেশে বসন্তকাল অতি অল্পদিনস্থায়ী—সে সময় দিন কয়েক ফুলের শোভা দেখা যায়। তখন এদেশের লোকে বনে, জঙ্গলে, গমের ক্ষেতে গিয়া ফুলের উৎসব করে। তখন সকলেই বনের মাঝে তাঁবু পাতিয়া নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হয়। এই ফুলের উৎসবে এদেশের লোকে প্রাণ ভরিয়া আনন্দ করে। একবার আমি নিমন্ত্রিত হইয়া এই ফুলের উৎসবে গিয়াছিলাম—এদেশের লোক ইহাকে "লিংকা" বলে। আমি গিয়া দেখি ৬০ বৎসরের এক বৃদ্ধা ৭.৮ জন সঙ্গিনী লইয়া এক কাঠের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। এ গৃহ যেমন দৃঢ়নির্ম্মিত তেমনি সুদৃশ্য। গৃহটি বাহিরে শ্বেত বস্ত্র দ্বারা এবং ভিতরে নানাবিধ চিত্রিত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। বৃদ্ধা আমায় তাঁহার চিকিৎসার জন্য ডাকিলেন—বলিলেন ১৫ বৎসর তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি ভোগ করিতেছেন, আরোগ্যের আশা নাই, যদি আমি তাঁর যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। আমি দেখিলাম তিনি বাতগ্রস্ত—কর্পূরের আরক দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। বিশ্বাসে কি না হয়? ১৫ বৎসরের ব্যাধি দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল, বৃদ্ধা যেন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন, তিনি স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পারিলেন। তাঁর আনন্দ আর ধরে না—আত্মীয়স্বজনের নিকট আশ্চর্য্য চিকিৎসকের বিষয় বলিয়া পাঠাইলেন। আমি পরে শুনিলাম ইনি ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিবের পত্নী, যদিও পরিণীতা পত্নী নহেন। কি লজ্জা! কি ঘোর পরিতাপ—বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর এমন পাপ প্রবেশ করিয়াছে। এদেশে নাকি এই রীতি। ধর্ম্মযাজকগণ এইপ্রকার অবৈধ প্রণয়-ব্যাপারে কলঙ্কিত। ঘটনাক্রমে সেই অর্থসচিবের একজন ভৃত্য পীড়িত হইল। আমি তাহার চিকিৎসার জন্য আহূত হইলাম। সচিব মহাশয় অতি পণ্ডিত ও জ্ঞানী। বয়স ৬২ বৎসর হইবে। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘকায় পুরুষ আমি তিব্বত রাজ্যে আর দেখি নাই। তিনি ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা। লোকটি অতি সজ্জন, দোষের মধ্যে এই অবৈধ বিবাহ। এইজন্য পতি পত্নী উভয়েই অনুতপ্ত। আমি চিকিৎসকের কার্য্যে এতদূর বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি যে পাঠের সময় পাইনা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি সাবধান হও, আর চিকিৎসা করিও না—আমার গৃহে শান্তিতে বাস কর—পড়াশুনা কর। অন্য চিকিৎসকের অন্ন মাটি করিতেছ তোমার বিপদ হইবে।" আমি অতি আনন্দিত চিত্তে এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। যেজন্য আমার লাসায় আগমন তাহাই ঠিক পণ্ড হইতে বসিয়াছে।

৫২ অধ্যায়।

লাসায় জাপান।

আমার দিন বেশ ভালই চলিতে লাগিল। আমি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি। এদিকে সচিব মহাশয়ের গৃহে আমার কিছুই অভাব নাই। সেরায় যে গৃহে বাস করিতাম তাহার ভার একজনের উপর দিয়া আসিলাম। তাহাকে বলিলাম, তুমি খবরদার কাহাকেও বলিও না যে আমি অর্থসচিবের বাড়ী আছি। আমি তাহার ভরণপোষণের ভার লইলাম। আমি ১২ হাত লম্বা ৮ হাত চওড়া এক সুসজ্জিত গৃহ বাসের জন্য পাইয়াছিলাম। লোকের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইয়া পরম শান্তিতে দিন যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে সেরা কলেজে পাঠের জন্য যাইতাম। আমার সৌভাগ্যবলে আমি একজন উপযুক্ত গৃহশিক্ষক পাইলাম। ইনি পূর্ব্বতন অর্থসচিবের ভাই, ইঁহার নাম টি-রিনপোচি। সহোদর ভাই বটে, তবে ইঁহার পিতা চীনদেশীয়, ইনি যখন ৭ বৎসরের বালক তখন হইতে পৌরোহিত্যের জন্য শিক্ষিত। এখন বয়স ৬৭। গত বৎসর তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাজকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন ইঁহাকে গানডেনের রিনপোচি বলে। গানডেনের নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার ব্যবহৃত

এক আসন আছে, সেখানে ইনি এবং দলাইলামা ভিন্ন আর কেহ বসিতে অধিকারী নয়। একদিক দিয়া দেখিলে দলাই লামা অপেক্ষা ইনি শ্রেষ্ঠ, কারণ কেবল পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-বলে, এবং চিরজীবনের কঠোর সাধনার পরে ইনি এই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য ও চরিত্রবল ভিন্ন এ পদ কেহ পায় না। আমার কতদূর সৌভাগ্য যে এই ব্যক্তি আমার শিক্ষক, যাঁর সহিত আলাপ করিলে লোকে ধন্য হইয়া যায়। প্রথম দর্শন মাত্রই তিনি আমায় বুঝিয়া লইলেন। ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব আমার পরম উপকারী বন্ধু—তাঁর কৃপায় আমি এতদূর অনুগ্রহভাজন হইলাম, যদিও তাঁর অবৈধ প্রণয়ব্যাপার স্মরণ করিয়া আমি দুঃখিত। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। বাস্তবিক ইঁহারা এখন বড় অনুতপ্ত। শুনিলাম ইঁহার পত্নী দুইবার পাপ মোচনের জন্য নেপালের কাটা-মুণ্ডুতে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। ইঁহাদের গৃহে বাস করিয়া আমি সবই দেখিলাম। বর্ত্তমান অর্থসচিব ইঁহাদের পার্শ্বেই এক প্রশস্ত বাড়ীতে বাস করিতেন। তাঁর সহিত আলাপের সুযোগ বড় ঘটিত না, তিনি এতই কাজে ব্যস্ত। ইঁহার নাম টেন-জিন-ছো-গ্যাল। ইনি আমার সহিত আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতেন। যখনই কোন রাজ্য-সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নের উদয় হইত ইনি ভূতপূর্ব্ব সচিবের নিকট সুমন্ত্রণার জন্য আসিতেন। এই সূত্রে আমি অনেক গুপ্ত ব্যাপার জানিয়া ফেলিলাম।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিরূপে মন্ত্রীপুত্রের সহিত দোকানে সাক্ষাৎ হয়। আমার আবার দারজিলিংএর পরিচিত এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে লাসায় সাক্ষাৎ হইল। ইহার নাম সা-রোং-বা। তিব্বত হইতে যাত্রার সময় এ ব্যক্তি আমায় অনেক সাহায্য করিয়াছিল। একদিন লাসার এক জনতা-বহুল পথ দিয়া যাইতেছি—দুধারেই সারি সারি দোকান নানাদেশীয় পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ। হঠাৎ দেখিলাম এক দোকানে জাপানী দেশলাই। বাঁশের চিত্রিত চিরুণি দেখিলাম। জাপানী কাচের বাসন ধনীর গৃহ ভিন্ন কোথায়ও দেখা যায় না—দোকানে দেখা যায় না—দোকানে তাহা নাই। দোকানে জাপানী জিনিষ দেখিয়া ভাবিলাম জাপানী মানুষের চেয়ে তবে দেখিতেছি জাপানী জিনিষের সমাদর বেশী, তাই সগর্ব্বে লাসার দোকানে বিরাজ করিতেছে। জাপানী সভ্যতার এই সকল নিদর্শন দেখিয়া ভাবিলাম তিব্বতের অন্ধকার ভেদ করিয়া এই-সকল দ্রব্য জাপানের সভ্যতার আলোক এদেশে আনিবে। এই-সকল ভাবিতে ভাবিতে রাস্তা বাহিয়া চলিলাম। দেখি এক দোকানে উৎকৃষ্ট সাবান রহিয়াছে! এমন সাবান লাসায় কিরূপে আসিল। আমি দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই সাবানখানির দাম কত?" সে ব্যক্তি হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি ভাবিলাম দারজিলিংএর পরিচিত এক ব্যক্তির মত ইহার চেহারা, তার ভাই হবে—না সেই ব্যক্তি স্বয়ং? লোকটি বলিল সাবানের অত্যন্ত বেশী দাম। আমি সেই মূল্যেই দুখানি সাবান কিনিয়া গৃহে ফিরিলাম। সচিব মহাশয় একখানি সাবান চাহিলেন, আমিও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দুখানিই দিলাম। পাছে এই সাবান ফুরাইয়া যায় এই ভাবিয়া আমি আবার সেই দোকানে সাবান কিনিতে গেলাম। যখন দাম চুকাইয়া দিতেছি লোকটি তখন আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল "আগে কোথায় দেখেছি না?" আমি হাসিয়া বলিলাম "হাঁ আমরা পরিচিত।" তখন লোকটি তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়া তাহার ঘরে আমায় লইয়া গেল। সেখানে তাহার স্ত্রীকে দেখিলাম। তার স্ত্রীকে দারজিলিংএ দেখিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাকে কিছুতেই চিনিতে পারিলেন না। একবার দারজিলিংএ অসুখের সময় আমি তাঁহাকে ঔষধ দিয়াছিলাম, বলিতে আমায় চিনিতে পারিলেন। আমাকে লাসায় দেখিয়া স্বামী-স্ত্রীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না—"এ রাজ্যে প্রবেশ করা আপনাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, আপনি কেমন করে এলেন?" আমি যে-পথে আসিয়াছি বলিলাম। তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। আমার ভয় হইল ইহারা যদি আমায় এখন জাপানী বলিয়া ধরাইয়া দেয়! যাহোক বুঝিয়া লইতে হইবে। আমি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলাম "এখন তোমাদের এক কাজ করিতে পারলে বড় ভাল হয়—আমাকে জাপানী বলে ধরিয়ে দাও—তোমরা প্রচুর পুরস্কার পাবে, তাতে তোমাদের সুবিধাই হবে।" আমি

কতদিন হতে ভাবছি যে নিজেই আত্মপরিচয় দিয়ে তিব্বত-রাজের নিকট আত্মসমর্পণ করব, তা তোমরা আমায় ধরিয়ে দিলে তোমাদের লাভ, আমারও কাজ সিদ্ধ হয়।” তারা ত আমার কথা শুনিয়া অবাক। স্ত্রীলোকটির মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল—আমি দেখিলাম বেচারী কাঁপিতেছে। কাহারও মুখে কথা সরে না। তারপর পুরুষটি বলিয়া উঠিল “চোও-রিনপোচির দিব্য, প্রাণ দিব তবু তোমায় ধরাইয়া দিব না।” আমি তবু সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলাম। তারা লাসার বুদ্ধমন্দিরের দিকে হাত তুলিয়া দুজনেই শপথ করিয়া বার বার বলিতে লাগিল “প্রাণ গেলে এ সকল কথা কাহাকেও বলিব না।” তিব্বতীরা কথায় কথায় শপথ করে বটে। আমি ইতিমধ্যে প্রায় ৪৫টা চলিত “দিব্য” শিখিয়া লইয়াছি। তবু “চো-ও রিনপোচি”র দিব্য বড় শক্ত। যাহোক আমার মন শান্ত হইল, ইহারা আমার শত্রুতা করিবে না। আমার আবাস কোথায় তাহারা জিজ্ঞাসা করিল। যখন শুনিতে পাইল যে লোকের মুখে-মুখে সেরার যে-ধন্বন্তরি চিকিৎসকের কথা শুনিয়াছে আমি সেই ব্যক্তি তখন তাহারা আমার সহিত পূর্ব্বপরিচিত এই গর্ব্বে পুলকিত হইয়া উঠিল। আমিও আবার লাসায় এই দুই বন্ধু পাইলাম, ইহাদের সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতাম এবং নানা উপহার দিয়া সদ্ভাব জানাইতাম।

৫৩ অধ্যায়।

তিব্বতের ছাত্রবৃন্দ।

তিব্বতে যে তিনটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র আছে, সেখানে সচরাচর যে-সকল শিক্ষার্থী আসে, তাহারা অধিকাংশই তিব্বতের লোক নয়। সংখ্যার হিসাবে বর্ণনা করিলে মোঙ্গলীয় অধিক—তার পর তিব্বতীয় এবং খামের অধিবাসী। এই তিন দেশের ছাত্রদিগের প্রকৃতি পরস্পর হইতে বিভিন্ন। তিব্বতীয় ছাত্রগণ শান্ত শিষ্ট বুদ্ধিমান, কিন্তু একেবারে শ্রমবিমুখ। শ্রমবিমুখ বলিলে ঠিক হইবে না—একেবারে অলস। এত অলস বলিয়াই এতদুর অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন। দীর্ঘ শীতকাল রৌদ্র পোহাইয়া কাটাইয়া দিবে যদি অন্নের সংস্থান কাহারও থাকে। এক পা নড়িতে কেহ রাজি নয়। অন্য দেশে বৃদ্ধেরা যাহা করে, এদেশে যুবা পুরুষে তাহা করিতে লজ্জা পায় না। মোঙ্গলীয়রা এমন প্রকৃতির নয়। তাহারা অত্যন্ত শ্রমশীল, পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগী। স্বদেশ স্বজন ত্যাগ করিয়া কেবল বিদ্যার্জ্জনের জন্য প্রবাসে আসিয়াছে, একথা তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হয় না। শ্রমের ফল তাহারা লাভ করে। যদি ৫০ মোঙ্গলীয় ছাত্র থাকে, তন্মধ্যে ৪০০জন অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র। তিব্বতী ছাত্রেরা ঠিক অনুরূপ, ৫০০ তিব্বতী ছাত্রের মধ্যে ৪৫০ জন নগণ্য। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা প্রায় তিব্বত এবং খামের লোক। মোঙ্গলীয়রা যথার্থ ছাত্র—যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহারা মন দেয় না। মোঙ্গলীয় ছাত্রের একটা গুরুতর দোষ যে তাহারা প্রচণ্ড রাগী, এক কথায় ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা যে ভাল ছাত্র এবং যথার্থ পণ্ডিত এই জ্ঞানেই সর্ব্বদা স্ফীত হইয়া থাকে। এমন অহঙ্কৃত উদ্ধত ছাত্র কোথায়ও দেখা যায় না। এমন জাতির মধ্যেই চেঙ্গিসখাঁর আবির্ভাব হয়। দাবানলের মত যেমন জ্বলিয়া উঠে তেমনি শীঘ্র নিবিয়া যায়। এ জাতি যথার্থ বড় কোন কাজ করিতে পারে না। খামের লোকেরা ডাকাত বলিয়া বিখ্যাত—কিন্তু খামের লোকেদের মত যথার্থ বিশ্বাসী লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই। ইহারা সরল; স্বাভাবিক কোনপ্রকার খোসামুদির ধার ধারে না; ইহারাও সহজে রাগিয়া উঠে কিন্তু আত্মসংবরণের শক্তি রাখে। খামের লোকেরা ডাকাত বলিয়া পরিচিত কিন্তু তিব্বতীদের মত ইহারা ক্রূরহৃদয় নয়। খামের ডাকাতেরাও বিপন্ন ব্যক্তির সহায়তা করে, তিব্বতীরা কদাচ তাহা করে। তিব্বতীরা ভদ্রতা করিতে জানে, ব্যবহারেও শিষ্ট, পোষাক পরিচ্ছদও ভাল, খামের লোকেরা ভাল লোক হইলেও অসভ্য। আমি মোটামুটভাবে তিন শ্রেণীর ছাত্রের বিভিন্নতা দেখাইলাম, বাস্তবিক বিভিন্নতা আরও অনেক আছে—তা এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তিব্বতী লামারা কেবল অর্থের লোভে বিদ্যাভ্যাস করে। পৌরোহিত্য করিয়া যতটুকু যশ লাভ করা যায়, সেই যশ-টুকুর ইহারা প্রয়াসী। যথার্থ জ্ঞান যথার্থ ধর্ম্মের কোন আস্বাদন তাহারা জানে না। ধর্ম্মশিক্ষার্থীর নিকট এদেশে জ্ঞান ও ধর্ম্মের কোন মহিমাই নাই। ঐদেশের যাজকদিগের মন্ত্র "পাওয়াতেই স্বর্গলাভ ও চরম সুখ।” পুরোহিত-সম্প্রদায়

এবং ছাত্রগণই মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠভূষণ। এদেশে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। এদেশে পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকের মূল্য অর্থ-হিসাবে নির্ণীত হয়। যে ধার্ম্মিক ও পরোপকারী সে যদি দরিদ্র হয় তবে তার কোন মূল্য নাই—যাহার যত সঙ্গতি ও সম্পত্তি আছে, সে তত বড় লোক। পুরোহিতেরা দক্ষিণা লাভ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল। এ দেশের ছাত্রসম্প্রদায় অত্যন্ত দুরবস্থায় ও দারিদ্র্যে বাস করে। কলেজের সর্ব্বোচ্চ উপাধি পাইতে প্রায় ২০ বৎসর দুরন্ত শ্রম ও কঠোর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জীবনের অর্দ্ধেক সময় এইপ্রকারে অতিবাহিত হয়। ইহারা নীরবে ধৈর্য্যের সহিত সমুদায় সহ্য করে, আশা এই জীবনের শেষাবস্থা সুখে ও অনায়াসে কাটিবে। এখানকার উপাধিলাভ এক ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিলে সমুদায় শিক্ষকদিগকে এক ভোজ দিতে হয়। যদিও কেবল মাংস এবং অন্ন এই ভোজের প্রধান অঙ্গ, কিন্তু তাহাই প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়, কারণ শিক্ষকমহাশয়দিগের উদরের প্রসার অপরিমেয়—বিপুল খাদ্যসামগ্রী তথায় অবাধে স্থানলাভ করে। ৫০০ ইয়েনের কম এমন একটি ভোজ সম্পন্ন হইবার নয়। অবশ্য দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে ৫০০ ইয়েন সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার—কিন্তু উপাধির এমনি মহিমা যে পূর্ব্বে যাহারা দরিদ্র বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিত, তাহারা এখন সুদের আশায় ঋণ দিবার জন্য ব্যস্ত হয়—সুতরাং ৫০০ ইয়েন সংগ্রহ করিতে অধিকক্ষণ লাগে না। কিন্তু এই ঋণ শোধ করিতে পরে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়—সহজে কেহই এ ঋণ শোধ করিতে পারে না। বাস্তবিক তিব্বতের ছাত্রজীবনের কথা ভাবিলে আমার বড়ই ক্লেশ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা দেবী।

আকৃতি ও প্রকৃতি.

আকৃতি সুন্দর নহে, সে দোষ আমার নহে
অভিযোগ কর গিয়া কাছে বিধাতার—
প্রকৃতি বিচারি' যাহা জানিলে বলিও তাহা,
সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র আমিই যাহার।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

পঞ্চশস্য

জার্ম্মানীর নূতন আবিষ্কার—

বিনা তারে খবর গৃহীতাকে কান দিয়া শুনিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু যুদ্ধের ভীষণ গোলমালে নিজের কথাই নিজে শুনিতে পাওয়া যায় না, তা আবার যন্ত্রের টিকটিকানি; বিশেষতঃ এরোপ্লেন প্রভৃতি উড়ন-জাহাজের চড়নদারেরা কলের ভনভনানি আর কামানের দমদমানিতে বিনাতারের খবর শুনিতে পায় না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জার্ম্মানরা একরকম নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে চোখ দিয়া বিনাতারের খবর দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই যন্ত্রটি দুচোখো দূরবীনের মতন ও সেই রকমেই তৈয়ারী। এই যন্ত্রে টেলিগ্রাফের বিন্দু ও রুখি শব্দ-সঙ্কেত আলোর বিন্দু ও রুখি হইয়া দেখা দ্যায়।

আমেরিকায় চাষ—

আমেরিকায় চাষ ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমেরিকার 'কারেন্ট ওপিনিয়ন' নামক মাসিকপত্র বলে Farming in the United States represents our most backward industry অর্থাৎ ক্ষেতখামার করা আমেরিকার সবচেয়ে অনুন্নত ব্যবসায়। এই অনুন্নত ব্যবসায়েও বুদ্ধি ও পরিশ্রমে আমেরিকার চাষীরা কি-রকম লাভ করে তাহা আমাদের এই কৃষিসম্বল দেশের লোকের জানা উচিত। একজন চাষী ৬০০ বিঘা জমি লইয়া চাষ আরম্ভ করে; জমিতে প্রচুর সার দিয়া, উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন করিয়া এবং মাথার উপর হইতে জলধারা দিয়া ক্ষেত্রসেচন করিয়া প্রথম বছরেই ২৪০০০টাকা মুনাফা পায়। সেই টাকা আবার চাষে লাগাইয়া, বেশী জমী লইয়া ভালো সার দিয়া গত বৎসর ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার ফসল বেচিয়াছে। ঐ টাকার শতকরা ২০ টাকা লাভে দাঁড়াইবে। আমেরিকার অন্যান্য ক্ষেতখামারে শতকরা ৫ টাকার বেশী লাভ হয় না। কিন্তু এই চাষীটি প্রতি একার (৩ বিঘা) জমীতে চল্লিশ ৩০।৪০ টন সারের বদলে ১০০ টন (প্রায় ২৮০০ মন) সার লাগায়; প্রতি টন সারে খরচ লাগে প্রায় ৮ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে এই চাষী প্রতি একার জমীতে কেবল সারের জন্যই ৭৫০ টাকা করিয়া খরচ করে। ইহা ছাড়া মাথার উপর হইতে জলসেচনের জন্য সচ্ছিদ্র নল পাম্প প্রভৃতির খরচ একার-প্রতি ৬০০ টাকা, এখন যুদ্ধের বাজারে প্রায় হাজার টাকা। ক্ষেতের মাঝখানে একটা পুকুরে নিকটবর্ত্তী একটা সোঁতা হইতে জল ধরা হয়, এবং সেই পুকুরের জল ক্ষেতে সেচা হয়।

এই ক্ষেতের স্থানে স্থানে ৩০০ ফুট লম্বা ৬০ ফুট চওড়া সব্জীঘর আছে; একএকটি তৈয়ারী করিতে ৩০ হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছে। প্রত্যেক গরমঘর গরম করিতে ৫০।৬০ টন কয়লা লাগে অর্থাৎ বছরে ৬০০ টাকা খরচ। কিন্তু এইসব সব্জীঘরের মধ্যে যে-সব ফসল হয় তাহা হইতে বছরে আয় হয় ১৫০০০ হইতে ১৮০০০ টাকা। এক রবী ফসল হইতে বছরে এক লক্ষ হইতে সওয়া লক্ষ টাকা হস্তবুদ হয়।

এই প্রকাণ্ড ক্ষেত খণ্ড খণ্ড ভাগে একএকজন সর্দ্দার কৃষাণের জিম্মা থাকে, সে তার মুনিষ লইয়া সেই অংশটির পাট আর খবরদারী করে। খামারেই যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা ইত্যাদিও আছে।

খামারের সঙ্গে সব বড় বড় শহরের টেলিফোন যোগ আছে। টেলিফোনে শহরের দোকানীরা গাড়ী গাড়ী তরিতরকারী ফসল অর্ডার দিতেছে আর মাল চালানের সঙ্গে-সঙ্গে নগদ দামের চেকও রওনা হইয়া আসিতেছে। আধুনিক কারবারের সুব্যবস্থা সুশৃঙ্খলা ও সুযোগের সঙ্গে সুনাম ও সুখ্যাতি লাভ হইতেছে যেন সে এই আদর্শ ক্ষেতটি

সেইরূপ। বছরের মধ্যে ৩১২ দিন বা তারও বেশী দিন এখান হইতে মাল রপ্তানী হয়, এমনি ইহার ফলাও কারবার।

ষ্ট্রবেরী নামক জাম পাকার সময় ৩০০।৪০০ মজুর ফল তুলিতে নিযুক্ত হয়। ইহা হইতেই এই কারবারের বৃহত্ত্ব অনুমান করা যাইবে।

এই কারবারের সফলতার কারণ (১) কোথাও মাটি জীর্ণ অসার হইয়া থাকিতে পায় না; (২) চাষের গোড়ায় জমীর পাট রীতিমত হয়; (৩) প্রত্যেক বৎসর জমীকে সার জোগানো হয়, তাহাতে খরচের চেয়ে জমা বরাবরই উদ্বৃত্ত থাকে; (৪) অত বড় ক্ষেতের সর্ব্বত্র বৃষ্টিধারার মতন জলসেচনের ব্যবস্থা থাকাতে জমী বা ফসল যেখানে যেমন জল চায় সেখানে তেমনি জোগানো যায়, জলাভাবে শুখা হইবার আশঙ্কা মোটেই নাই; (৫) এইসব ব্যবস্থা থাকাতে একই জমী হইতে বৎসরে ২।৩ রকম ফসল আদায় করা হয়।

আমাদের দেশেও এইরূপ সাহসী ও উদ্যমী চাষীর আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

কমলা লেবু—

কমলা লেবু আমরা খাইয়া থাকি বছরের একটা ফল বলিয়া সখ করিয়া; কিন্তু উহা যে খাদ্য হিসাবে কতখানি পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ তাহা আমরা ঠিক জানিনা। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কেলগ, গুড্ হেল্থ্ নামক কাগজে কমলা লেবুর গুণ ব্যাখ্যা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

এক গেলাস ঘোল আর এক গেলাস কমলা লেবুর রস তুলনা করিলে কমলার রসে ঘোলের চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পুষ্টিকর সামগ্রী পাওয়া যায়। এক গেলাস কমলার রস, পৌনে এক গেলাস খাঁটি দুধের সমান পুষ্টিকর। কলিকাতায় খাঁটি দুধ যেমন দুষ্প্রাপ্য তাহাতে কমলার রস খাইয়া দুধের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে।

লেবুর মধ্যে যে অম্লরস থাকে তাহা হজমের সহায়তা করে; কমলা লেবুর মধ্যে যে মিষ্টরস থাকে তাহা সহজেই শরীরে গৃহীত হয়, হজম করিয়া লইতে হয় না। শর্করা বা দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট ছাড়া কমলার রসে শতকরা একভাগ প্রোটিন বা পোষ্টাই সামগ্রী আছে। সুতরাং কমলা লেবুর রস মুখরোচক স্বাদু ও পুষ্টিকর একাধারে।

রোগেও ইহা সুপথ্য। জ্বর হইলে রোগীর শরীর দূষিত বিষাক্ত হইয়া জ্বলিতে থাকে, এবং সেই বিষ নিষ্কাশনের জন্য শরীরের কোষ ও যন্ত্রগুলি প্রাণপণে লড়িতে থাকে। সেই সময় দিনে ৪ সের থেকে ৬ সের জল পান করিয়া রোগীকে জ্বরের দাহ নিবারণ করিতে হয় এবং ঘাম ও মূত্রের ভিতর দিয়া বিষ বহিষ্কারের সাহায্য করিতে হয়। কমলা লেবুর রসে যে জল থাকে তাহা নির্ম্মল পরিস্রুত জীবাণুরহিত জলের সমতুল্য। রসের অম্লতা তৃষ্ণা নিবারণ করে, পানে রুচি জন্মায়; আর সুগন্ধ বলিয়া প্রচুর পানেও গা বমি-বমি করে না। যে বিষক্রিয়ায় জ্বরো রোগী দগ্ধ হইতে থাকে সেই বিষপ্রলেপে তাহার জিহ্বা এমন পুরু হইয়া উঠে যে তখন মুখে জল বা খাদ্য রুচে না। কিন্তু কমলা লেবুর রসের অম্ল ও সুগন্ধ জিহ্বার বিষপ্রলেপ দূর করিয়া মুখে রুচি জন্মায়।

জ্বরো রোগীর পাচনরস ও হজমী শক্তি থাকে না বলিলেই হয়; তখন কোনো খাদ্যই শরীরে গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে না বলিয়া অল্পেই তাহার বমি হয়। কমলার রসে এলবুমেন না থাকাতে তাহা বৃহদন্ত্রে গিয়া পচিয়া উঠে না, এবং শর্করা ও প্রোটিন অল্প যাহা থাকে তাহা এমন দ্রব অবস্থায় থাকে যে তাহা শরীরে শোষিত হইতে পাক-ক্রিয়ার সাহায্য দরকার হয় না। সুতরাং জ্বরে কমলা লেবুর রস উৎকৃষ্ট পথ্য।

ছোট ছোট দুগ্ধপোষ্য শিশুরা পুরামাত্রায় শুদ্ধ দুগ্ধ না পাইলে বা সেই দুগ্ধ সুস্থ ও পুষ্টিকর না হইলে কৃশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহাদের পক্ষে কমলা লেবুর রস অমৃতোপম, ইহা তাহাদের বাড়ের সহায়তা করে। ইহা শুধু মনুষ্যশিশুর পক্ষেই সুপথ্য নয়, পশুশিশুদেরও ইহা পরম রসায়ন।

যে লোক কেবল কাড়া চালের ভাত অথবা সাদা ময়দার রুটি, আর আর মাংস খায় তাহার খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন বা সঞ্জীবন না থাকাতে তাহার পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। সে যদি আপনার আহারের মধ্যে কমলা লেবুকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে পারে তবে তাহার সে অভাব পূর্ণ হয়।

কমলা লেবুর রসের অম্ল ও শর্করা পাকাশয়ের গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করিয়া পাকরস ক্ষরণ করায় ও তাহাতে পরিপাকের সুবিধা হয়। সেইহেতু কমলার রস ক্ষুধাপ্রবর্দ্ধকও বটে।

খালি পেটে এক গেলাস কমলা লেবুর রস চমৎকার জোলাপের কাজ করে। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে ও প্রভাতে উঠিয়া এক এক গেলাস কমলার রস পান করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, শরীরে স্ফূর্ত্তি সঞ্চার হয়, হজমের শক্তি বাড়ে, ক্ষুধা হয়, শরীরের কান্তিপুষ্টি বাড়ে।

সুতরাং রোজ অন্তত একবার কমলা লেবু খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

উদ্ভিদের সামাজিকতা—

আমরা কেবলমাত্র মানুষকেই সামাজিক জীব বলিয়া জানি। কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার উন্নতির ফলে এখন জানা যাইতেছে যে উদ্ভিদের মধ্যেও সামাজিকতা বড় কম নয়। ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদের উদ্ভব নানা রকমে হয়—অরণ্য, বন, ঝোপ, ঝাড়, মাঠ, ক্ষেত, ঘাসবন হইতে একেবারে মরুভূমিতে শেষ। দেশ ভেদে উদ্ভিদের জাতিও ভিন্ন ভিন্ন, প্রকৃতিও পৃথক। এক এক স্থানে যে জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হয় সদ্ভাব নয় শত্রুতা জন্মিতে দেখা যায়; হয় তাহারা প্রতিবেশী-সুলভ সদ্ভাবে গলাগলি করিয়া বাড়ে, নয়ত 'চাচা আপনা বাঁচা' নীতি অনুসরণ করিয়া দুর্ব্বলের গলা টিপিয়া আপনি বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা করে।

উদ্ভিদের সামাজিকতায় একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় উদ্ভিদের উত্তরাধিকারী-পর্য্যায়। এক স্থানে যে জাতীয় উদ্ভিদ অনেক দিন ধরিয়া ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে মরিয়া লোপ পাইয়া স্বতন্ত্র অন্য-রকমের উদ্ভিদকে জমীর দখল ছাড়িয়া দিতে থাকে।

দাবানল উদ্ভিদ-সামাজিকতার একটি অঙ্গ। উদ্ভিদের জাতি ও প্রকৃতি অনুসারে বনে দাবাগ্নির আবির্ভাব বিলম্বে বা ঘনঘন হয় এবং তাহার ফলে কেহবা শীঘ্র জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, কেহবা সহ্য করিতে পারে বলিয়া টিকিয়া যায়।

বড় বড় মাঠে ঘাসের জঙ্গল হয়, কিন্তু সেখানে একটাও বড় গাছ কেন হয় না? ইহাও উদ্ভিদের সমাজিকতার একটা সমস্যা; এ পর্য্যন্ত ইহার কারণ কোনো লোকেই নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

ঐরূপ আরো কতকগুলি প্রশ্ন সমাধানের অপেক্ষা করিতেছে।

কোনো জঙ্গলে বড় গাছগুলি নানাজাতীয় হইলেও মাথায় সমান উঁচু হয় কেন?

পৃথিবীর কোন্ অংশের বন সবচেয়ে ঘন? কোথাকার দ্রুত বাড়ে?

গাছের জঙ্গল না ঘাসের জঙ্গল, কে মাটি হইতে বেশী জল ও খাদ্য শোষণ করে?

সারালো জমীতে বারমেসে সবুজপাতার গাছ (evergreens) কেন জন্মে না?

ঘাস ফসলের ক্ষতি ঘটায় কেন?

ঋতুর পরিবর্ত্তনে, উষ্ণতায় বা শীতে, শুখায় বা জলে কোন্ গাছ কেন বাড়ে বা মরে?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধানের চেষ্টায় এই নবপ্রবর্ত্তিত উদ্ভিদ-সমাজতত্ত্ব নিযুক্ত হইয়াছে; আর তার সাহায্যে নিযুক্ত হইয়াছে—ভূগোল, ভূতত্ত্ব, ঋতুতত্ত্ব ইত্যাদি।

পায়ের গড়ন—

আমাদের দেশের অনেক লোকের বিশ্বাস যে গ্রীক শিল্পীরা যে-সব মূর্ত্তি গড়িয়াছেন তাহা প্রকৃতির হুবহু নকল, এবং তাহার অনুকরণে য়ুরোপীয় শিল্প প্রকৃতিরই নকল করিতেছে, আর আমরা য়ুরোপের শিষ্য—আমাদের প্রকৃতির নকল করিয়া শিল্প রচনা করা উচিত।

কিন্তু প্রসিদ্ধ অস্থিবিদ্যাবিশারদ (Anatomist) ডাক্তার উড্ জোন্‌স দেখাইয়াছেন যে গ্রীক শিল্পের আদর্শ পা প্রকৃত মানুষের পায়ের মতন মোটেই নয়। মানুষের পায়ের বুড়ো আঙুলটা সবচেয়ে লম্বা হয় ও তার পরের আঙুলগুলি ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া আসে। কিন্তু গ্রীক শিল্পের আদর্শ পায়ে বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলটা বড় ও তাহার দুপাশের আঙুলগুলি ক্রমে খাটো হইয়া পাখানিকে পত্রাকৃতি দান করে। মানুষের পা যে এমন একেবারে হয় না তা নয়, তবে সেরূপ পা বানরদেরই বেশী দেখা যায়। সুতরাং যাহাদের পায়ের তর্জ্জনী আঙুলটা বড়, তাহাদের পা গ্রীকশিল্পের আদর্শ বলিয়া গর্ব্ব করা উচিত বা বানরের পায়ের কাছাকাছি বলিয়া লজ্জা বোধ করা উচিত তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। রয়াল কলেজ অফ সার্জ্জন্‌স নামক ডাক্তারখানায় একটা কঙ্কাল আছে, তার পায়ের মাঝের আঙুলটাই সবচেয়ে বড়।
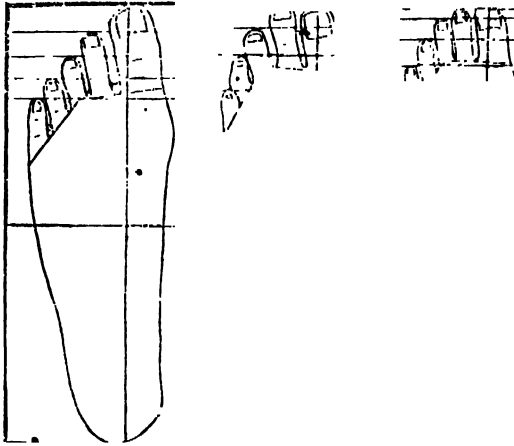
স্বাভাবিক পায়ের আঙুল — গ্রীক শিল্পীর আদর্শ পায়ের আঙুল — ছোট ছেলের পায়ের আঙুল।

বানর গাছে বিচরণ করে বলিয়া তাহার পা গাছ আঁকড়াইয়া ধরিবার শক্তি রাখে। বানরের বিবর্ত্তনে যখন মানুষের উদ্ভব হইল তখন তাহার পা মাটিতে হাঁটিবার উপযুক্ত হইল। এই মাটিতে হাঁটার কাজে পায়ের বুড়ো আঙুলটাই যা একটু সাহায্য করে, অন্যগুলা বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। সুতরাং বিবর্ত্তনের নিয়মে এক বুড়ো আঙুলই বর্ত্তিয়া থাকিবে, অন্য আঙুলগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্র হইয়া হয়ত একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। সভ্য মানুষের পায়ের আঙুল ঐ পথেই যাইতেছে, কড়ে আঙুলটা ত খর্ব্ব হইয়া দুড়মুড়ি গোছের হইয়া উঠিয়াছে, তাহার নখটাও লুপ্ত হইয়া চামড়া হইয়া আসিতেছে। গোরু ছাগল হরিণ বা অষ্ট্রিচের পায়ে যেমন পাঁচটা আঙুলের মাত্র দুটিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে, ঘোড়া গাধা জেব্রার পায়ে যেমন একটা মাঝের আঙুল মাত্র অবশিষ্ট আছে, তেমনি কালে মানুষের পায়ের আঙুলের সব কটি লোপ পাইয়া কেবল মাত্র বুড়োটি বাঁচিবে।

অনেকে মনে করেন যে সভ্য লোকেরা জুতা আঁটিয়া আঁটিয়া পায়ের আঙুলগুলাকে খর্ব্ব ও লুপ্ত হইবার সাহায্য করিতেছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যেসব অসভ্য জাত কোনো পুরুষে জুতা পরে নাই তাহাদেরও পায়ের কড়ে আঙুল না-থাকার সামিল। যে পরিমাণে বুড়ো আঙুলটা প্রধান হইতেছে সেই পরিমাণে কড়ে আঙুলটা লুপ্ত হইবার দিকে যাইতেছে।

শিম্পাঞ্জী ও ওরাংউটাং বনমানুষের পায়ের পাতার মধ্যরেখা ঠিক মাঝের আঙুল দিয়া টানা যায়, কিন্তু মানুষের পায়ের মধ্যরেখা পড়ে দ্বিতীয় আঙুলের উপর। মানুষের পায়ের বুড়ো আঙুল ও তাহার হাড় পুষ্ট হইয়া পায়ের প্রধান আধার হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য শরীরের সমস্ত ভারটা পায়ের ভিতরদিকের অর্থাৎ যেদিকে বুড়ো আঙুল আছে সেইদিকের লাইনের উপর পড়ে। বানররা যখন পায়ে হাঁটিয়া বেড়ায় তখন তাহারা পায়ের বাহিরের দিকে শরীরের ভার দ্যায়; শিশুরাও যখন হাঁটিতে শিখে তখনও পায়ের বাহিরের দিকে অর্থাৎ কড়ে আঙুলের টানে ভর দ্যায়; তাই তাহারা টলিয়া টলিয়া চলে। মানুষ বানরের মতন গাছ-চড়া পা লইয়া জন্মিয়া মাটিতে হাঁটা অভ্যাস করিতেছে। সুতরাং তাহার পায়ে যেসব পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা মনুষ্যোচিত। অতএব সেইসব পরিবর্ত্তনে পায়ের চেহারা যেরূপই হোক তাহাতে ক্ষুণ্ণ বা লজ্জিত হইবার কিছু নাই, বরং ভালো করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতেছি বলিয়া গর্ব্ব করা যাইতে পারে তা হোক না সে পা ঠুঁটা, কুষ্ঠরোগীর পায়ের মতন।

চারু।

কষ্টিপাথর

তোতা-কাহিনী।

(১)

এক যে ছিল পাখী। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখী ত কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখীটাকে শিক্ষা দাও!"

(২)

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখীটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, "উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কি?"

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখী যে-বাসা বাঁধে, সে-বাসায় বিদ্যা বেশী ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুসি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

(৩)

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ!" কেহ বলে, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা ত হইল। পাখীর কি কপাল!"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিস্ পাইল। খুসি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখীকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন "অল্প পুঁথির কর্ম্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথি-লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না!"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত ত লাগিয়াই আছে। তারপরে ঝাড়া মোছা পালিস করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে!" লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তন্খা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুসি হইয়া কোঠা বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

(৪)

সংসারে অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক যথেষ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে কিন্তু পাখীটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

(৫)

শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তূরী ভেরি দামামা কাঁশি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিস্তুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য্য! শব্দ কম নয়!"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয় পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুসি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখীটাকে দেখিয়াছেন কি?"

রাজার চমক লাগিল, বলিলেন, "ঐ যা! মনে ত ছিল না। পাখীটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখীকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই!"

দেখা হইল। দেখিয়া বড় খুসি! কায়দাটা পাখীটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখীটাকে দেখাই যায় না, মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখীর মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান ত বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দ্দারকে বলিয়া দিলেন নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

(৬)

পাখীটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখী চায় আর অন্যায়রকমে পাখা ঝটপট্ করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "একি বেয়াদবি!"

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কি দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখীর ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখীদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয় কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা!

কামারের পসার বাড়িয়া কামার-গিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁসিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

(৭)

পাখীটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ ত ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখী মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখীটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়?"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে?"

"না।"

"আর কি গান গায়?"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখীটাকে আন ত, দেখি।"

পাখী আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

(সবুজপত্র, মাঘ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাজের বর্ত্তমান অধোগতির কারণ ও তন্নিবারণের উপায়।

সমাজের বর্ত্তমান অধোগতির কারণ—প্রথমতঃ, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে শিক্ষার অভাব। ২য়, কুসংস্কার। জাতিভেদও একরকম কুসংস্কার। ৩য়, সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় সমাজের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করা এবং তাহাদের সমাজের ইতিহাস অধ্যয়ন না করা ও তাহাদের সমাজের অবস্থা আমাদের সমাজের অবস্থার সহিত তুলনা ও বিশ্লেষণ করিয়া না দেখা ও তাহাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক উত্থান পতনের ইতিহাস ঐরূপ করিয়া অধ্যয়ন না করা। ৪র্থ, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তুলনা করিয়া অধ্যয়ন না করা। ৫ম, বৈজ্ঞানিক আলোচনা না থাকা। ৬ষ্ঠ, দৈহিক বলচর্চ্চার অভাব। ৭ম, প্রকৃত বীরত্বের পূজা না করা। ৮ম, সত্যানুরাগবিহীনতা। ৯ম, স্বার্থত্যাগের অভাব। ১০ম, দেশের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ মনে না করা। ১১শ, যিনি যাহা সমাজের জন্য করিতেছেন তাহার দোষ অন্বেষণ করা, নিজ নিজ কর্ত্তব্য নীরবে করিয়া না যাওয়া। ১২শ, নারীর পূজা করিতে না জানা। ১৩শ, দুর্ব্বল ও অধঃপতিত জাতির উন্নয়নে ব্রতী লোকের অভাব। ১৪শ, সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন না করা।

(নমঃশূদ্র-হিতৈষী, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ।) শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন।

বাল্যবিবাহ।

ভারতবর্ষে যতগুলি জাতীয় জীবন-ক্ষয়কারী সামাজিক কুপ্রথা আছে, তন্মধ্যে বাল্যবিবাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, বাল্যবিবাহ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাপথের প্রধান কণ্টক। সুশিক্ষার অভাবে জীবনসংগ্রামে পরাভূত হইয়া তাহাদিগকে সারাজীবন কষ্ট পাইতে হয়। সুতরাং বাল্যবিবাহ বর্জ্জনীয়। দ্বিতীয়তঃ, বালমাতৃত্ব মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির ও অকালবার্দ্ধক্যের প্রধানতম কারণ এবং বালমাতৃত্ব বাল্যবিবাহেরই শোচনীয় পরিণতি। তৃতীয়তঃ, বাল্যবিবাহ বালবৈধব্যের কারণ। বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুমোদিত হইলেও যে সমাজে বালবিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ, সে সমাজে বাল্যবিবাহ একটা ভীষণ বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। চতুর্থতঃ, বাল্যবিবাহ শিশুমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। পঞ্চমতঃ, বাল্যবিবাহ মাতৃত্বসাধনের বিরোধী। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "the hand that rocks the cradle rules the world." বাস্তবিক, সন্তানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও গুরুই জননী; সন্তান স্তন্য পানের সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের নিকট হইতে যে শিক্ষা পায়, সে শত চেষ্টা করিয়াও সে-শিক্ষার প্রভাব ভুলিতে পারে না। বস্তুতঃ সন্তানের চরিত্র গঠনে মাতার জীবন ও চরিত্রের প্রভাব বিশেষরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবল সন্তানকে ভালবাসিলে ও যত্ন করিলেই মা হওয়া যায় না। মায়ের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। এ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি জানা দরকার। কিন্তু বালিকা মাতার পক্ষে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা এক-প্রকার অসম্ভব। সুতরাং বাল্যবিবাহ প্রথার আশু বিনাশ সাধনে বিলম্ব করা উচিত নয়।

(নমঃশূদ্র-হিতৈষী, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ) শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ গুহ।

হিন্দু রমণীর স্বাস্থ্য।

হিন্দু রমণীদের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ কি? প্রথমতঃ, বাল্যবিবাহ। বাল্যমাতৃত্ব বাল্যবিবাহেরই শোচনীয় পরিণতি। দ্বিতীয়তঃ, অবরোধ। তৃতীয়তঃ, অসংযম। চতুর্থতঃ, অত্যধিক পরিশ্রম। গৃহকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা নারীর অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহা শতবার স্বীকার করি। কিন্তু সকল কর্ত্তব্যেরই একটা সীমা আছে। আর সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির চর্চ্চা, নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদিতে যোগদান, সামাজিকতা রক্ষা করা পুরুষদের ন্যায় মেয়েদেরও দরকার। আমাদের দরিদ্রতা সত্ত্বেও আমরা চেষ্টা করিলে মেয়েদের স্বাস্থ্যের নিশ্চয়ই অনেকটা উন্নতি হয়। দরিদ্রতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি অন্যান্য নানাকারণে মেয়েদের স্বাস্থ্যের হানি হইতেছে। যাহা হউক, অচিরেই আমাদের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, নতুবা আমাদের জাতির অস্তিত্বও পৃথিবীতে থাকিবে না। যে সমাজে নারীর দুর্গতি, সে সমাজের মঙ্গল অসম্ভব।

(নমঃশূদ্র-হিতৈষী, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

সেই প্রকাণ্ড মনুষ্যত্বকে কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিলে চলিবে না; বৃহত্তর হিন্দু সমাজের মধ্যে তাঁহার যে সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তাহার আলোচনা না করিলে তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রতি অবিচার হইবে। ভারতবর্ষের এই বৃহত্তর সমাজ হইতে তিনি আপনাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করেন নাই, বৃহত্তর হিন্দু-সমাজও কখনও তাঁহাকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারিবে না।

একটা আত্যন্তিক সমাজবিপ্লবের অবসরে সমাজের রক্ষাকর্ত্তারূপে তাঁহাকে অবতীর্ণ দেখিয়া আমি আনন্দ লাভ করি। বাহির হইতে যখন একটা প্রবল আক্রমণ আসিয়া জীবের উপর আপতিত হয়, তখন জীবের প্রাণশক্তি অভ্যন্তর হইতে তাহার প্রতিঘাতের ব্যবস্থা করে। যে সেই প্রতিঘাতের ব্যবস্থা করিতে পারে, সেই বাঁচিয়া যায়। সেই প্রতিঘাতের শক্তিই প্রাণশক্তির অন্যতম প্রধান লক্ষণ। আমাদের ভারতীয় সমাজে সেই প্রাণশক্তি এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়াই যথাসময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমাদের সমাজে শত বৎসর পূর্ব্বে যে সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহাই আমার ধারণা।

বেদবিদ্যারূপিণী সনাতনী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আজি পর্য্যন্ত এই সমাজে শ্রুতি ও অনুশ্রুতি সহকারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রবণে তাহার প্রতিধ্বনি লাগিয়াছিল এবং সেই বীণার প্রেরণা অবলম্বন করিয়াই তিনি বীরের মত সমাজরক্ষার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই পুরাতনী ব্রহ্মবাণী রক্ষার ভার যে শ্রেণীর উপর রক্ষিত আছে, সমাজে তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মণ; এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আমি বর্ত্তমানযুগের ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়াই জানিয়া আসিতেছি। এই ব্রাহ্মণের কয়েকটা লক্ষণ আছে। ব্রাহ্মণ একদিকে অন্তরে প্রজ্ঞার বাণী শুনিয়া থাকেন; জড়জগৎকে ও মানবজগৎকে যে সত্য, যে ঋত, দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে, সেই সত্যের প্রতি ও ঋতের প্রতি শীর্ষ অবনত করিয়া তিনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। সেই ঋতের মহিমা দেখিয়া অন্তরে তাঁহার ভাবাবেশ হয়, কিন্তু সেই ভাবাবেশে তিনি অধীর হন না; কঠোর কর্ম্মপথে পদক্ষেপে তিনি সঙ্কুচিত হন না; বা ভাবোন্মাদে পথভ্রষ্ট হন না। তাঁহার চরিত্রের একটা দিক শান্ত, মধুর; অন্যদিক কঠোর ও দীপ্তিময় উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। তিনি দৃঢ়, তিনি সংযত, তিনি আচারনিষ্ঠ। মহর্ষিচরিতে এই ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণসমূহ অত্যন্ত

পরিস্ফুট দেখিতে পাই। এইজন্য আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণোত্তমরূপে নির্দিষ্ট করিতে চাই।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন কালে তিনি বিদেশের আশ্রয় আবশ্যক বোধ করেন নাই। যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ঢকানাদ এই দেশকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি সেই ঢকানাদে বধির হন নাই; বরং তাহার প্রতিকূলে বেদবাণীর বিজয়দুন্দুভি ধ্বনিত করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারবশে তিনি পরধর্ম্মের প্রতি কতকটা সন্দিহান বলিয়াই বোধ হয়। হয়ত তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি তেমন সুবিচার করেন নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এ বিষয়ে হয়ত অন্তরাল ছিল। পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ, এই ভাবটা বোধ করি তাঁহার সমস্ত জীবনকে কতকটা আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছিল। বিদেশীয় পরিচ্ছদ, বিদেশী আচার, বিজাতীয় ভাষার আশ্রয় তিনি বোধ করি কখনও লন নাই। ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকট প্রতিপত্তি ও সম্মানলাভের প্রলোভন কখনও তাঁহাকে প্রলোভিত করে নাই। ইহাতেও আমি তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পরিচয় পাই। এই যে একটা আত্মাভিমান, এই যে একটা দর্প, এই যে পরাশ্রয়ের ও পরমুখাপেক্ষিতার প্রতি উৎকট অবজ্ঞা, ইহা আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে ইহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার মহনীয় চরিত্রের সম্মুখে প্রণত হই।

(তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, ফাল্গুন) শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

দুই তার

(৪১০)

বীরেন্দ্রের দশবৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ড হওয়ার বছর ছয় পরে কাৎলামারী গ্রামের পথ দিয়া প্রভাতে একটি তরুণ সুকুমার প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসী যাইতেছিল; তাহার কৃশ ঋজু গৌর দেহ, বড় বড় চোখ দুটি বিষাদে আনত, প্রিয়দর্শন সুন্দর মুখখানি দুঃখে ম্লান; দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো, সেজন্য বয়সের চেয়েও তাহাকে তরুণ দেখাইতেছিল—বয়স ২০।২১ বৎসরের বেশী হবে না। তাহার এক হাতে একটি ছোট পোঁটলা, একহাতে একগাছি লাঠি। সে পথ চলিতে চলিতে আপন মনে গুনগুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

"তুমি শ্যামল ব্রজ ছেড়ে কেন শ্যাম এলে এই পুরে?
তোমার পথ-পাথরে নাই যে তৃণ ওগো রস দূরে দূরে!—
হেথায় পথ-পাথরে নাই যে তৃণ হেথায় রস দূরে দূরে!
হেথায় বসে তোমার সিংহাসন কঠিন পাষাণে,
হেথা কোমল ব্রজের তৃণের রেখা না দেখি নয়ানে,
হেথা কোমল ব্রজের শ্যামল তৃণ না দেখি নয়ানে;
হেথায় কতই শোভা মনোলোভা তোমার রতন মণি,
আমার নীরস ভূঁয়ে প্রাণ কাঁদে যে হেথায় মরণ গণি

তাহার সুমধুর কণ্ঠ, সুশ্রী চেহারা, আর তরুণ ব[য়স] পথের ও পথপার্শ্বের সকল লোকেরই মন মুগ্ধ করিতেছি[ল]।

সন্ন্যাসী একজন চাষীকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ ভাই, তু[মি] বলতে পারো এখানকার থানার দারোগার নাম কি?

সন্ন্যাসী তাহার সহিত কথা কহিয়াছে এই গৌর[বে] উৎফুল্ল হইয়া সে ব্যগ্রভাবে বলিল—এজ্ঞে, হংসে[শ্বর] দারোগা!

—তিনি কি এখানে সপরিবারে থাকেন?

—হাঁ, তানার ইস্তিরী আর ছেলে থানার বাসা[য়] আছেন।

—তারা বেশ ভালো আছে?

এ কথার উত্তর কি দিবে সে ভাবিয়া ঠিক করি[তে] পারিল না। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী সনাতন চাষার সঙ্গে ক[থা] কহিতেছে দেখিয়া সেখানে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও বাল[ক] বালিকা আসিয়া জড়ো হইয়াছিল। সনাতন তাহা[দের] মুখের দিকে চাহিল। কান্ত জেলেনী বলিয়া উঠিল-হাঁ, দারোগা-বাবুর বাড়ীতে সবাই ভালো আছে; আ[মি] রোজ মাছ বেচতে যাই। গিন্নি খুব ভালো লোক। ত[বে] দারোগা-বাবুর গরিবের ওপর দয়াটা কিছু কম......

সনাতন ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—তুই চুপ থাক; তোর ওসব কথায় কাজ কি?

কান্ত লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইল।

সন্ন্যাসী কান্তর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দারোগা বাবুর ছেলেপুলে কি?

কান্ত বলিল—মেটের কোলে একটি খোকা, বছরসাতে বয়েস হল, তারপর আর হয়নি-মিন্সে ত অমন বৌ[কে] দেখতে পারে না ....

সন্ন্যাসী সেইখানে গাছতলায় মাটিতে বসিল।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথায় যাবা?

—এইখানেই থাকবো ভাই।

—খাবা কি?

—যা তোমরা দেবে।

—তবে আমাদের বাড়ী চলেন, পাক-সাক করে খাবেন

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—আমি পাক-সাক করতে পারবো না ভাই, তোমাদের পাক-সাক ত হবে, তাই দুটি দুটি দিয়ো।

সনাতন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমাদের ছোঁয়া খাবা? তুমি কি জাত্?

সন্ন্যাসী মিষ্ট হাসিতে সকলকার মন ভুলাইয়া বলিল—আমি ভাই মানুষ, সকল মানুষই আমার জাতভাই, আমি সকলকার ছোঁয়াই খাই।

বেণী ময়রা পরম বিজ্ঞভাবে সনাতনকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—লোকে তবে তোদের চাষা বলবে কেন যদি এই কথাই তুই জানবি, সন্ন্যেসীরা পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হয় জানিস?

পৈতা যে পুড়াইতে পারে সে যে ভগবান হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। সকলে সবিস্ময়-সম্ভ্রমে সন্ন্যাসীর স্মিত প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিল।

সনাতন হাত জোড় করিয়া বলিল—ঠাকুর, তবে পা তুলে অধমের বাড়ীতে চলেন।

সন্ন্যাসী উঠিয়া সনাতনের কাঁধে হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিল—অধম কি রে! যে লোক পথ থেকে অচেনা অতিথিকে ডেকে নিয়ে ঘরে আশ্রয় দিতে পারে সে ত উত্তম।

সকলে ভাবিল সনাতনের অদৃষ্টে খুব শুভগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে, সনাতন এইবার রাং হইতে সোনা করা শিখিয়া লইবে। কিন্তু বেণীময়রা বিজ্ঞভাবে বলিল—বেটা পাকা জোচ্চোর! নইলে যার অমন সুন্দর চেহারা সে কি কখনো সন্ন্যেসী হয়। সনাতন ঘরে ঠাঁই দিলেন, শেষে পস্তাতে হবে! তোমরা সব বৌ ঝি একটু সামলে রেখো।...

সন্ন্যাসী সনাতনের বাড়ীতে গিয়া দাওয়ায় বসিয়া আপনার পোঁটলাটি খুলিল; তাহার মধ্যে কি শিকড়-বাকড় জড়ি-বটী আছে দেখিবার জন্য ছেলে-বুড়ো সবাই ঝুঁকিয়া পড়িল; পোঁটলায় আছে খান দুই কাপড়, খান দুই উত্তরীয়, খানকতক বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বই, একটা ছোট কাঠের বাক্স, আর একটা বিস্কুটের কৌটা। সন্ন্যাসী কৌটাটি খুলিয়া কিছু লোজেঞ্জেস বাহির করিয়া সমাগত উৎসুক শিশুদের হাতে হাতে বণ্টন করিয়া দিল। মিষ্টির ঘুষ দিয়া দিয়া এক একটা ছেলেমেয়েকে বশ করিয়া কাছে টানিয়া টানিয়া সন্ন্যাসী তাহাদের সহিত গল্প জুড়িয়া দিল—বাঘের রাক্ষসের ভূতের গল্প, কত দেশ-বিদেশের কাহিনী। অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ন্যাসী শিশুদের প্রিয় হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিল—তোমাদের মধ্যে যে যে আমার কাছে রোজ সকালে বিকেলে পড়তে আসবে, তাদের আমি রোজ খেতে দেবো, গল্প বলবো, বাঁশী পুতুল ঘুড়ি তৈরী করে দেবো.....

অমনি সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—ঠাকুর, আমি আসবো।

গাঁয়ে খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; দলে দলে লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী হাসিয়া সকলকে বলিল—আমি ভাই, তোমাদেরই মতন সামান্য গরিব মানুষ; বেশী কাপড় নেই বলে পথ হাঁটবার কাপড়খানা গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নিয়েছি। তোমরা প্রণাম করে করে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ; অল্পক্ষণ পরে আমার মনেও ধারণা হবে যে আমি একটা মহাপুরুষ। আসলে আমি ভাই অতি সামান্য লোক!

সকলে বলিয়া উঠিল—আপনি দেবতা! আমাদের কিছু উপদেশ দিতে হবে আপনাকে!

সন্ন্যাসী একটু ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা, তোমরা একটা জায়গা ঠিক কোরো; আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা কথকতা করব। আজ থেকেই সুরু করে দেওয়া যাবে, কি বলো?

সকলে কৃতার্থ হইয়া বিদায় লইল।

সনাতনের বাড়ীর সামনে পথে খানিকটা জায়গায় কাদা জমিয়া ছিল; যত লোক আসা যাওয়া করিতেছিল সেই কাদা ভাঙিয়া; গাঁয়ের বৌঝিরা ঘাটে জল আনিতে যাইতেছিল সেই কাদা ভাঙিয়া; বোঝাই গরুর-গাড়ীর চাকা সেই কাদায় বসিয়া গিয়া গরুগুলির ক্লেশ হইতেছিল। সন্ন্যাসী বসিয়া বসিয়া দেখিয়া ছেলেদের বলিল—ওরে বাঁদররা! খেলা করবি?

"করবো ঠাকুর!" বলিয়া সকলে লাফাইয়া নাচিয়া উঠিল।

—তবে খানকতক কোদাল জোগাড় কর।

তৎক্ষণাৎ কোদাল হাজির। স্বয়ং সন্ন্যাসী ও জনকয়েক বড় ছেলে পথের নয়নজুলিতে মাটি কাটিতে লাগিয়া গেল; ছোট ছোট ছেলেরা সেই মাটি ঝুড়িতে ভরিয়া রাস্তার কাদার উপর ঝুপঝাপ ফেলিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে রাস্তা মেরামত হইয়া উঠিল।

সনাতন তাড়াতাড়ি আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রভু, আমাদের অপরাধ হবে যে, আপনি কোদাল রাখুন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—না সনাতন, এই কাদা তোমার বাড়ীর সামনে এতদিন থেকে জমে রয়েছে, কত লোকের কষ্ট হয়েছে, তোমাদের ত হুঁস হয়নি।......আমরা এমনি করে গাঁ-ময় খেলা করে বেড়াবো রোজ, কি বলিস রে বাঁদররা!

ছেলেরা উল্লসিত হইয়া নাচিতে নাচিতে বলিল—হাঁ ঠাকুর!

বিকেল বেলা ছেলেমেয়ে গাঁ ঝাঁটাইয়া আসিয়া জড়ো হইল। সন্ন্যাসী সকলকে এক-একবার দুই হাতে কোলের কাছে টানিয়া, কাহারো কান ধরিয়া নাড়িয়া, কাহারো গোঁজ খোঁপাটা ঘুরাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—এইবার আমাদের পাঠশালা বসবে। তোদের মধ্যে যে যে পড়তে জানিস ছুটে ঐ গাছতলায় গিয়ে দাঁড়া।

২টি ছেলে ও একটি মেয়ে গেল; আর সকলে ক্ষুণ্ণ লজ্জিত দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী পরিচয় লইয়া জানিল—একটি ছেলে বেণী ময়রার, আর অপর ছেলে ও মেয়ে কায়েতদের।

সন্ন্যাসী তাহাদের বলিল—আচ্ছা তোরা সর্দার পোড়ো হবি। বসে যা সব।......

সন্ন্যাসী প্রত্যেকের হাতে ২টি করিয়া লোজেঞ্জেস ও একখানি করিয়া প্রথম ভাগ দিয়া পাঠশালা পত্তন করিয়া বসিল।

হাসি-গল্প মস্করার মধ্যে শিশুদের বর্ণপরিচয় হইতেছে, সনাতন আসিয়া বলিল—ঠাকুর আপনি আজ বারোয়ারি তলায় কথকতা হবেন।

সন্ন্যাসী ছেলেদের বলিল—আজ এখন তবে ছুটি; কাল সকালে উঠেই আবার আসবি। বই সব আমার কাছে রেখে যা। কাল নাইতে যাবার সময় আমরা বন-কাটা খেলা করবো, কি বলিস রে বাঁদররা!

—হাঁ ঠাকুর! হাঁ ঠাকুর!—বলিয়া ছেলেরা উল্লসিত হইয়া নাচিতে নাচিতে সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া লইয়া বারোয়ারি-তলার দিকে চলিল।

সন্ন্যাসী বারোয়ারি-তলায় গিয়া দেখিল অনেক মেয়ে পুরুষ সমবেত হইয়াছে। সে বেদীতে গিয়া বসিল। গ্রামের পুরোহিত জনার্দ্দন একছড়া ফুলের মালা দুই হাতে বিস্তারিত করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল—অনুমতি করুন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া গলা বাড়াইয়া মালা পরিল।

জনার্দ্দন পাশের সিধার ডালা ও সন্দেশের রেকাবী দেখাইয়া বলিল—দেবতাকে নিবেদন করে দেন—আপনার যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা।

সন্ন্যাসী হাসিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমার বাঁদররা হাজির আছিস?

"আছি ঠাকুর" বলিয়া জনতার মধ্য হইতে অনেকগুলি কচি কচি হাসিমুখ উঁচু হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী ডাকিল—তোরা সব আয়, সন্দেশ খাবি।

সকলে ভয়ে-ভয়ে একএকবার নিজেদের বাপখুড়ার মুখের দিকে চাহিল।

সন্ন্যাসী আবার ডাকিল—আয় না রে!

বাপখুড়া বারণ করিল না দেখিয়া সকলে গুটিগুটি গিয়া হাসিমুখে সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী তাহাদের ও সন্দেশের সংখ্যা গণিয়া সমান ভাগ করিয়া বাঁটিয়া দিতে লাগিল।

জনার্দ্দন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—আগে নারায়ণকে ভোগ দিলেন না?

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—ওরাই আমার নারায়ণ!......ওরে এই চাল-ডালগুলো কি হবে জানিস? কাল আমাদের চড়িভাতি হবে!

শিশুদের মুখ উৎসাহের আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কথকতা আরম্ভ হইল। পুরাণকথার মধ্যে মধ্যে আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিজ্ঞানতত্ত্ব ভূগোল ইতিহাস সমাজ-তত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব সুযোগ-মত সংযোগ করিয়া সুললিত

কণ্ঠে ব্যাখ্যা ও গান চলিতে লাগিল, শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া শুনিল।

কথকতার শেষে সকলে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—তোমরা তাড়িয়ে না দিলে আমি আপনি যাবো না ভাই।

বেণীময়রা জিভ কাটিয়া বলিল—হরেকেষ্ট! অমন কথা বলবেন না ঠাকুর, আমাদের অকল্যেণ হবে!

(৪২)

সকালে মাছের পেথে কাঁকালে করিয়া ক্ষান্ত জেলেনী থানায় দারোগা-বাবুর বাসার উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—মাঠাকরুণ কোথায় গো, মাছ নেবে এস।

ঘর হইতে ম্লান কাতর মুখে রাজবালা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—আজ আর মাছ নেবো না ক্ষান্ত, আমার খোকার গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে।

ক্ষান্ত ব্যথিত হইয়া বলিল—আহা বাছারে! তা মা ভয় কোরো না, মায়ের কৃপা হয়েছে, মা-ই পদ্মহস্ত বুলিয়ে আরাম করে দেবেন।.....তা মা, এক কাজ করো, গাঁয়ে একজন সন্নোসী এসেছে—তার কিবে রূপ! গা থেকে যেন সূর্যোর আভা বেরুচ্ছে! কোনো শাপ-ভেরষ্ট দেবতা হবে! উত্তম কৈবর্ত্তর ছেলেটা পেটের দরদে কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করছিল, একরত্তি এতটুকু শিশি থেকে কোন্ দেবতা-পীরের চর্ণামেরৃত কি জলপড়া একফোঁটা একটু জলে দিয়ে খাইয়ে দিলে আর ছেলেটা অমনি চাঙ্গা হয়ে উঠে বসলো। আমাদের বংশীর বৌএর ওপর ভূতের নজর ত লেগেই আছে, কত রোজা গুণী কত ঝাড়ফুঁক করে তাগা মাদুলি দিয়ে কিছু করতে পারেনি; কাল যেমন তার ওপরে ভর হওয়া আর অমনি সন্নোসী ঠাকুর গিয়ে সেই সেই জল-পড়া একফোঁটা দেওয়া......

রাজবালা অধীর হইয়া বাধা দিয়া বলিল—খোকা ভালো হয়ে উঠলে একদিন তোর সন্নোসীর গপ্প শুনবো ক্ষান্ত; আজ আর আমি দাঁড়াতে পারছি না, খোকা আমার কাতরাচ্ছে।

ক্ষান্ত জিভ কাটিয়া বলিল—অমন হেনস্তা কোরো না মা—দেবতা গোসাইরা মনের কথা টের পায়। কাল ঠাকুর গাঁয়ে ঢুকে সকলকার আগে তোমাদের কথাই জনে জনে পুছ করেছে—সেও আসা আর খোকার ওপর মায়ের কৃপাদিষ্টি হওয়া, এ ত সামান্যি নয়—হয়ত মা-শীতলা তাঁর বাহনকে সন্নোসীর রূপ ধরে খোকাকে ভালো করবার জন্যেই পাঠিয়েছেন!

রাজবালা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সন্নোসী আমাদের কথা জিজ্ঞেস করছিল? তাকে কি-রকম দেখতে? বয়েস কত?

—কাঁচা বয়েস গো একেবারে কাঁচা, এক-কুড়ি দু-কুড়ি বছর হবে আর কি! দেখতে যেন রাজপুত্তুর—বাঁশের কোঁড়ার মতন সোজা ছিপছিপে!

এমন সময়ে কায়েত-গিন্নি আসিয়া বলিলেন—সন্নোসীর কথা হচ্ছে বুঝি! আহা! কাল কি কথকতাই কইলে—গলা নয়ত যেন মা-সরস্বতীর হাতের বীণা! কী দুঃখে সে সন্নোসী হল জানিনে! মুখে হাসি লেগেই আছে, কিন্তু সে হাসতে যেন প্রাণ নেই।

রাজবালার কেমন মনে হইল সে তাহাকে চিনে—সে জিজ্ঞাসা করিল—তার বাঁ দিকের কপালে রগের কাছে একটা কালো তিল আছে?

ক্ষান্ত বলিয়া উঠিল—হাঁ গো হাঁ, তবে তুমি তানাকে চেনো!

রাজবালা আবার জিজ্ঞাসা করিল—মাথায় কোকড়া-কোঁকড়া বড় বড় চুল—অল্প গোপ দাড়ির রেখা দেখা দিয়েছে?

কায়েতগিন্নি বলিল—না মা, মাথায় চুল নেই বল্লেই হয়, গোপদাড়ি ত কিছু দেখলাম না; আর তিলের কথাও যা বল্লে তাও ত কৈ ঠাহর করে দেখিনি। তুই দেখেছিস ক্ষান্ত?

ক্ষান্ত বলিয়া উঠিল—হ্যা দ্যাখো কায়েতদিদির কথা, তা আবার দেখিনি? এই ঠিক এমন জায়গায় তিল রয়েছে!

রাজবালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কায়েতগিন্নিকে বলিল—মাসী, আমার খোকার গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে—আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে।

কায়েতগিন্নি বলিয়া উঠিল আহারে! তা বাছা, তুমি ঐ সন্ন্যাসীকে ডেকে একবার দেখাও—আমার ছেলে যে

তার পাঠশালার সর্দ্দার পোড়ো হয়েছে; বলো ত তাকে ডেকে দিতে বলি।

রাজবালা বলিল—দেখি ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে।

ক্ষান্ত বলিল—তুমি দারোগা-বাবুকে জোর করে বোলো মা—সন্ন্যেসীঠাকুর তোমার খোকার পেরমাই নিয়েই এ গাঁয়ে এসেছে; নইলে তোমাদের কথা অত করে জিজ্ঞেস করবার মানে কি?

রাজবালার মনের মধ্যে অস্বীকৃত সংশয় ও অকথিত কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল—এই সন্ন্যাসী কে?

(৪৩)

হংসেশ্বর দারোগা হাতীকান্দা থানা হইতে এই কাংলামারী থানায় বদলী হইয়া আসিয়াছে। কাংলামারীও গুণময়-বাবুর এলাকা; সুতরাং হংসেশ্বর দারোগা জমিদারের ভায়রা-ভাই হইয়া দ্বিগুণ প্রতাপে নিরীহ শাসন ও দুর্ব্বল দমন করিতেছে। সে সকালে উঠিয়াই থানায় গিয়াছিল; স্নানাহারের বেলা হইলে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—খোকা কেমন আছে?

রাজবালা অত্যন্ত কাতর স্বরে ম্লান মুখে বলিল—খোকার গায়ে বসন্ত লেপে বেরিয়েছে।

হংসেশ্বর তাহার কাঁকড়ার মতন ডাবা-ডাবা চোখ বিস্ফারিত করিয়া উটের মতন গলা বাকাইয়া আঁৎকাইয়া উঠিল—আঁা! বসন্ত!

তারপর একটু সহজস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—পানি-বসন্ত বুঝি?

—না, আসল বসন্ত বলেই বোধ হচ্ছে।

—আঁা! আসল!—বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া হংসেশ্বর একবার দুই হাত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল তার গায়েও বাহির হইয়াছে কি না; একবার জামার মধ্যে অঙ্গটাকে সঞ্চালিত করিয়া অনুভব করিয়া দেখিল গায়ে ব্যথা আছে কি না, গা পিটপিট কুটকুট করিতেছে কি না। তারপর সেখান হইতে সরিয়া পড়িবার উদ্যম করিল।

রাজবালা বলিল—তুমি একবার এসে দেখ-দেখি।

হংসেশ্বর চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—ও আর আমি কি দেখবো? আমি ত ঠিক চিনি না। আমাকে আবার এক্ষুণি মফস্বলে যেতে হবে......

রাজবালা ভীত হইয়া বলিল—তুমি চলে গেলে আমি একলাটি খোকাকে নিয়ে কেমন করে থাকবো?

—আমি হাতীকাঁদা থেকে তোমার মাকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছি......

রাজবালা ব্যাকুল হইয়া বলিল-খোকার চিকিচ্ছের কি হবে?

—ওর আর চিকিচ্ছে কি? শীতলার বামুন একজন আনতে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।......আর হ্যাঁ দ্যাখো, শুনছি গাঁয়ে একজন সন্ন্যাসী এসেছে—সে নাকি অনেক ওষুদ-বিষুধ মন্তর-তন্তর জানে, সবাই বলছে। তাকেও ডেকে পাঠাচ্ছি—ও সব রোগের দৈব ওষুধই চিকিচ্ছে!

রাজবালা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ভাত খাবে না?

হংসেশ্বর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে, বলিল—না, বড় জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে, ভাত খাবার সময় হবে না।

হংসেশ্বর চলিয়া গেল। রাজবালা চোখে কাপড় দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৪৪)

তরুণ সুন্দর সন্ন্যাসী একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় বসিয়া তাহার পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের পড়াইতেছিল। তাহার পোড়োর দলে বড় বড় বয়সের চাষারাও যোগ দিয়াছে; এবং গুরুদক্ষিণার সর্ত্ত এই ঠিক হইয়াছে যে প্রত্যেক ছাত্র নিজের নিজের বাড়ীতে মা-বোন মাসী-পিসীদের পড়াইবে ও বই পড়িয়া পড়িয়া শুনাইবে।

সন্ন্যাসী বলিল—আজ এইখানে থাক! এখন চলো খানিকটা বন কাটা যাক; বন জঙ্গল সাফ হয়ে গেলে গাঁয়ের মাঝখানে একটা ইঁদারা খুঁড়তে হবে আর সনাতন দাসের বাড়ীর সামনে যে মজা ডোবাটা আছে, সেটা ঝালিয়ে পুকুর করে তুলতে হবে। সেই পুকুরে আমরা রোজ সাঁতার দেবো, মাছ ধরবো। কেমন পারবি ত রে।

ছেলেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—খুব পারবো ঠাকুর।

বড় বড় যে-সব চাষা ছাত্র ছিল তাহারা লজ্জিত হইয়া বলিল—ঠাকুর, আপনি ওসব করতে যাবে কেন? আমাদের আপনি হুকুম কোরো, বন কাটা হবেন, কুয়ো হবেন, পুকুর হবেন, সব হবেন; আমাদের গতর আছে,

মগজ ত নেই, আপনারা ভদ্দর লোকে একটু বাৎলে দিয়ে দেখো দেখি আমরা কি না করতে প্যারি।

সন্ন্যাসী খুশী হইয়া তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল —তোরা সব করতে পারিস ভাই, সব করতে পারিস, তোদের ক্ষমতা আছে, বলেই ত আমার ভরসা; কিন্তু তোদের হুকুম করবার আমি কে ভাই, আমিও যে তোদেরই একজন!

—আপনি দেবতা!—বলিয়া তাহারা সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো লইতে উদ্যত হইল।

সন্ন্যাসী সরিয়া গিয়া হাসিমুখে চোখ রাঙাইয়া তিরস্কার করিয়া বলিল—ফের অমন করবি ত আমি তোদের গা থেকে চলে যাবো!

ছেলেরা চারিদিকে সন্ন্যাসীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—আমরা যেতে দিলাম আর কি!

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—নে এখন চ, আমাদের জঙ্গল-ঝোরার খেলা সুরু হোক! আমাকে আবার সনাতনের ক্ষেতে লাঙল দিতে যেতে হবে।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—সে কি ঠাকুর! তুমি লাঙল দেবে কি!

সন্ন্যাসী বলিল—আমি যে সনাতনের খাচ্ছি, তার কাজ করে দেবো না? কোনো কাজই ত লজ্জার নয়; যা থেকে লোকের অন্ন বস্ত্র ধন দৌলত, সে কাজ কি কম গৌরবের।

উত্তম কৈবর্ত্ত বলিল—তবে ভদ্দর লোকে চাষা বলে গাল দ্যায় কেন?

—যারা চাষা তারা লেখাপড়া করে না, তাই তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম হয়, তাই চাষা মানে অসভ্য নির্বুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন তোদের ছেলেমেয়েরা এম-এ বি-এ পাশ করে ক্ষেতখামারের কাজ করবে তখন জমিদারও তাদের ভয় করবে, তারাও ভদ্র চাষা হবে, ভদ্রলোকেও আর চাষা বলে ঠাট্টা করতে পারবে না।

উত্তম গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নিয্যস!

এমন সময় একজন পুলিশ-কনষ্টেবল আসিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে খানিকটা গাঁজা রাখিয়া বারকতক জোড় হাত একবার মাটিতে ঠেকাইয়া তারপর নত অবস্থাতেই কপালে ঠেকাইয়া বলিল—পাঁও লাগি বাবা!

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—গেরুয়া কাপড়খানার ত খুব জোর দেখছি—যারা মানুষকে মানুষই জ্ঞান করে না সেই পুলিশও গেরুয়া কাপড়খানার কাছে মাথা নত করে! মানুষটাকে খাতে ঢেকে রাখে সেই খোলসটা আজই ছেড়ে ফেলতে হল।......কনষ্টেবল সাহেব, গাঁজা কি হবে?

—আপকা সেবা-কা লিয়ে বাবা!

—আমি ত গাঁজা-সেবা করিনা।

—তব কৈসা সাধু?

—সাধু হলে কি আর পুলিশের নজর পড়ে? আমি গাঁজাখোরও নই, সাধুও নই। অতএব তুমি তোমার গাঁজাটুকু নিয়ে যেতে পারো।

—দারোগা-সাহেব আপকো সেলাম দিয়া।

—কেন বলো ত? আমি কিসের আসামী?

—আরে রাম রাম! উ নেহি। দারোগা-সাহেবকা লেড়কাকা গুটি নিকলা হ্যায়; আপ আগর কুছ দাবা আউর দোআ দেঁ......

সন্ন্যাসী অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়া বলিল—দারোগা-বাবুর ছেলের বসন্ত হয়েছে? চলো আমি যাচ্ছি!

উত্তম কৈবর্ত্ত বলিল—নেয়ে খেয়ে গেলে হত না ঠাকুর?

—না ভাই, নাবার খাবার সময় আমার এখন নেই।—বলিয়া সন্ন্যাসী একরকম দৌড়িয়া থানার দিকে চলিয়া গেল।

উত্তম সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবতা!

(৪৫)

সন্ন্যাসী দারোগার বাড়ীতে আসিয়া ঘরের দরজার বাহিরে লজ্জিত স্মিতমুখে দাঁড়াইল।

রাজবালা চমকিয়া ফিরিয়া বলিল—বীরেন তুমি! আমার শুনেই সন্দেহ হয়েছিল—

বীরেন বলিল—চুপ! বীরেন দ্বীপান্তরে! আমি এখানে নতুন নাম পেয়েছি—ঠাকুর! বীরেনের কথা না তোলাই ভালো।

—তুমি এখন ছাড়া পেলে কি করে?

—নতুন রাজার অভিষেকের জন্যে।

রাজবালা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গলায় আঁচলখানি ফিরাইয়া দিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—খোকার বাবা তোমার কাছে অপরাধী! তুমি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করো—আমি তাঁর হয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি। তুমি প্রসন্ন না হলে খোকা আমার বাঁচবে না!

বীরেন রাজবালার হাত ধরিয়া বলিল—ও কি রাজু! আমি দ্বীপান্তর গিয়ে নূতন জীবন লাভ করে এসেছি, বুঝতে পেরেছি আমাদের সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে কি চমৎকার পদার্থ আছে, অশিক্ষায় কুশিক্ষায় অত্যাচারে অবিচারে তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে শিখে এসেছি। এর জন্যে আমি সুখী, কারো ওপর আমার বিদ্বেষ নেই। তোমার খোকা ভালো হবে, ভয় কি? তোমার স্বামী কোথায়?

রাজবালা বিষণ্ণ ভাবে বলিল—খোকার বসন্ত হয়েছে শুনেই তিনি পালিয়েছেন। তুমি আমার খোকাকে দেখো।

বীরেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খোকার বিছানার পাশে বসিল। আজ কতকাল পরে রাজবালার সাক্ষাৎ পাইল, সে আনন্দ কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় মলিন বিবর্ণ! রাজবালা খোকাকে দেখিবার জন্য স্বামীকে জোর করিয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু বীরেনকে সে অনায়াসেই জোর করিয়া বলিতে পারিল।

(৪)

বীরেন্দ্রের ঐকান্তিক সেবা ও যত্নের জোরে রাজবালার খোকা সারিয়া উঠিয়াছে; বীরেন্দ্রের সাবধানতায় গ্রামে আর কাহাকেও ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে নাই। খোকা যত ভালো হইয়া উঠিয়াছে, বীরেন তাহার কাছে যাওয়া তত কম করিয়াছে; এখন আর সে মোটেই যায় না। ইহাতে গ্রামের লোকেরা খুসী হইয়াছে,—এই কয়দিন ঠাকুরকে একরকম তাহারা দেখিতেই পায় নাই; দেখিতে যদি বা একবার পাইয়াছে, কিন্তু ঠাকুর তাহাদিগকে কাছে যাইতে দ্যায় নাই। ঠাকুরকে তাহারা ফিরিয়া পাইল, কিন্তু এ যেন সে ঠাকুর নয়। ছেলেদের আর সে কথায় কথায় আদর করিয়া বাঁদররা বলিয়া ডাকে না, তাহাদের পুকুর-কাটার খেলা আর তেমন জমিতেছে না, ঠাকুর কেমন গম্ভীর বিষণ্ণ অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। গাঁয়ের লোকে ভয়ে-ভয়ে চুপিচুপি বলাবলি করিতে লাগিল—ঠাকুরের এখানকার কাজ হয়ে গেল, এইবার উনি অন্তর্ধান করবেন।

রাজবালার মা একদিন রাজবালাকে বলিলেন—রাজু, তোর ছেলে ভালো হয়ে উঠলো, তবু তোর মুখে হাসি নেই কেন?

রাজবালা মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার চোখের কোলে জল টলটল করিতেছিল, কিন্তু তাহা সে কিছুতেই ঝরিতে দিতে চাহিতেছিল না।

কন্যার হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা মাতা বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বীরেন আর একবারও আসে না কেন? বড় ভালো ছেলেটি আহা ওকে বিয়ে-থা করে সংসারী হতে বলিসনি কেন রাজু এই বয়সে কি সন্ন্যাসী হওয়া ওকে মানায়!

রাজবালা মায়ের মৌখিক মমতায় বিরক্ত হইতেছিল তবু সে বিরক্তি চাপিয়া বলিল—বলেছিলাম, সে বল্লে আমার দণ্ড হয়েছিল, আর ত ওকালতী বা চাকরী করতে পাবো না, বিয়ে করে খাওয়াব কি? জীবনটা গোড়াতেই ভেঙে গেছে, এমনি করেই জীবনটা কোনো রকমে ফুঁকে দিতে হবে।

রাজবালার মাতা মমতায় আর্দ্র স্বরে বলিলেন—আহা বাছারে! দয়া যদি বেঁচে থাকতো।

দয়াদেবীর নামটিকে অবলম্বন করিয়া রাজবালার রুদ্ধ অশ্রু ঝরিয়া বাহিল। রাজবালা বলিল—দিদির মতন লোক হবে না! বড় কষ্ট পেয়ে মরেছেন, জুড়িয়েছেন!

এমন সময় হংসেশ্বর কুণ্ঠিত মুখে চোরের মতন সেখানে আসিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি কাঁদছ কেন? খোকা কেমন আছে?

রাজবালার মা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একটি বসন্ত-লাঞ্ছিত বালক দৌড়াইয়া আসিয়া হংসেশ্বরের হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল—বাবা, আমি ভালো হয়েছি, সন্ন্যেসী-ঠাকুর আমাকে ভালো করে দিয়েছে।

হংসেশ্বর তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল—সোনার খোকা এমন হয়ে গেছে?

রাজবালা অভিমান-মিশ্র তিরস্কারের স্বরে বলিল—তুমি যে হঠাৎ এলে?

হংসেশ্বর পলাইয়া গিয়া অবধি একখানা চিঠি পর্য্যন্ত স্ত্রীকে লিখিয়া খোকার কুশল জিজ্ঞাসা করে নাই; ভয়, পাছে চিঠির মধ্যে বসন্তর বিষ সেখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করে। স্ত্রীর প্রশ্নে কুণ্ঠিত হইয়া হংসেশ্বর বলিল—যে কাজের ঝঞ্ঝাটে পড়ে গিয়েছিলাম! এখনো ঝঞ্ঝাট মেটেনি, ফেলে রেখেই আসতে হলো—এখানে আবার কাৎলামারী বিলের দখল নিয়ে শশী জেলের সঙ্গে জমিদারের দাঙ্গা বাধবার সম্ভাবনা হয়েছে। পাঁচু-বাবু আসছেন···

রাজবালা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—আবার জমিদারে প্রজায় দাঙ্গা! পাঁচু আসছে! বীরেন যে এই গাঁয়ে আছে!

হংসেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য দেখাইয়া বলিল—সে ছোঁড়া এর মধ্যে খালাস পেলে কেমন করে? এত দেশ থাকতে এখানে এসে জুটেছে কি মতলবে?

রাজবালা মনের ব্যথা গোপন করিয়া বলিল—সেই ত সন্ন্যাসী, সেই ত খোকাকে ভালো করলে।

হংসেশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—তিনি আবার সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে বুজরুকী জুড়ে দিয়েছেন বুঝি!

রাজবালা উঠিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। একজন চাকর আসিয়া হংসেশ্বরকে খবর দিল—জমিদার-বাবুর নায়েব-মশায় এসেছেন।

(৪৭)

শশীজেলে কাৎলামারী বিল জমিদারী নিলামে সবার বেশী চড়া ডাকে জমা লইয়াছিল; পাঁচশত টাকা পাটা-সেলামী ও আঠারো শত টাকা জমা, চার কিস্তিতে শোধ করিবার কথা। হঠাৎ জমিদারের হুকুম হইল—জমা ও সেলামীতে মিলাইয়া পুরা তিন হাজার টাকা আগাম দিতে হইবে। শশীজেলে জমীদারের কাছে দরবার করিল; গুণময় বলিলেন—নূতন রাজার অভিষেকে চেরাকবাতি আর আতসবাজি জ্বালাইতে এবং উৎসবে চাঁদা দিতে অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, সে টাকাটা তাঁহার তুলিয়া লইতে হইবে ত!

শশীজেলে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর সেটা কি এই গরিবদের গলার মাস কেটে তুলতে হবে?

ছোটলোকের মুখে এই ব্যঙ্গ শুনিয়া গুণময় চটিয়া গিয়া বলিলেন—তোদের কাছে ত আমি ভিক্ষে চাই নি; আমার বিল নিয়েছিস, যা চাইব সেই টাকায় জমা নিতে হবে; না পারিস বিল ছেড়ে দে. আমি দোসরা বন্দোবস্ত করব।

শশীজেলে হাত জোড় করিয়া বলিল—আমি নিলামের ডাকে যাতে পেয়েছি তার বেশী আর কেন দেবো, আর বেশী দিতেই বা পাবো কোথায়? বিল আমি বাড় দিয়ে ঘিরেছি, তাতে আমার খরচ হয়েছে; এ বছর আমি বিল ছাড়তে পারব না।

গুণময় হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—তুই ত তুই, তোর বাপ যে সে ছাড়বে!

শশীজেলে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াই নিজের ছেলে ভাইপো জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই বলিল—বিল কিছুতেই ছাড়া হইবে না; জমিদারের খামখেয়ালী অত্যাচার যত সহ্য করা যাইতেছে তত তাহার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে! এতজন জেলের হাত হইতে বিল অমনি ছাড়াইয়া অপরকে দিলেই হইল! দেখি কে দখল লইতে আসে!

শশী বলিল—তবে তোরা সবাই একটু হুঁসিয়ার থাকিস, লাঠিগুলো হাতের মাথায় ঠিক রাখিস।

কোদালিয়ার বশীর মিঞা তিন হাজার টাকায় বিল জমা লইয়া দখল করিতে আসিয়াছিল। শশী তাহাদের মারিয়া ভাগাইয়া দিয়াছে। তাই এখন স্বয়ং পঞ্চানন পুলিশের সাহায্য লইয়া বিল দখল দেওয়াইতে আসিয়াছে।

পঞ্চানন হংসেশ্বরকে লইয়া বিলের ধারে গিয়া দেখিল শতাবধি জেলে বড় বড় লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হংসেশ্বর তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া বশীর মিঞাকে বলিল—তোমার জাল ফেলাও।

বশীর মিঞার লোক জাল লইয়া অগ্রসর হইল। অমনি জেলেরা চিলের মতন ছোঁ মারিয়া সেই জাল কাড়িয়া লইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

হংসেশ্বর কনষ্টেবল-চৌকীদারদের হুকুম দিল—ওদের গেরেপ্তার করো।

জেলেরা লাঠি উচাইয়া দাঁড়াইল।

হংসেশ্বর কনষ্টেবলদের হুকুম দিল—থানা থেকে বন্দুক নিয়ে এসে বন্দুক চালাও!

পুলিশের লোক সরিয়া যাইতেই শশী বলিয়া উঠিল—ওরে আমরা ত মরেইছি, ঐ পেঁচো-বামনা আর রাজহাঁসটা কি অমনি যাবে?

অমনি সকল জেলে মার মার করিয়া হংসেশ্বর ও পঞ্চাননের উপর পড়িল। হংসেশ্বর পলায়ন করিল, পঞ্চানন ধরা পড়িল। শশীর এক ভাইপো হাসুয়া-দা দিয়া পঞ্চাননের গলা হাঁসাইয়া দ্যায় আর কি!—শশী বাধা দিয়া বলিল—বামনাকে প্রাণে মারিসনে; ওর দুকান কেটে ছেড়ে দে!

বলিতে না বলিতে তৎক্ষণাৎ পঞ্চাননের দুটি কান কাটিয়া তাহার দুই হাতে দুটি কান দিয়া তাহাকে জেলেরা বলিল—যা বেটা, তোর জমিদারকে সেলামী দিগে যা!

একশত জেলের অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি প্রকাণ্ড বিলের উপর দিয়া হাহা করিয়া ছুটিয়া গেল।

দুই কান দুই হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়া পঞ্চানন তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল—এইবার আর যাবে কোথায়? সব বেটাকে জেল-খানায় পুরবো!

এমন সময় হংসেশ্বর বন্দুক লইয়া ও কনষ্টেবল চৌকী-দারেরা বন্দুক শড়কী লইয়া আসিতেছে দেখা গেল। শশী বলিল—ওরে, শালারা আসছে! ওরা বন্দুক চালাবার আগে ওদের ওপর গিয়ে পড়ি চ!

জেলের দল ঝড়ের মতন ছুটিয়া গিয়া পুলিশের উপর পড়িল; পুলিশের লোকেরা মনে করিয়াছিল বন্দুক দেখিয়াই জেলেরা ভাগিবে, তাহারা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রথম চোটে পুলিশের লোকেই বেশী মার খাইল ও হটিয়া পলাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ক্ষান্ত জেলেনী দৌড়িয়া গিয়া বীরেনের পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল—বাবাঠাকুর, আমার শশীকে তুমি বাঁচাও! জেলেরা ধনে প্রাণে মারা যেতে বসেছে।

বীরেন তখন তাহার বৈকালী কথকতা করিতে যাইতে-ছিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন, কি হয়েছে?

ক্ষান্ত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল—বিলের দখলী স্বত্ব লইয়া জমিদারে জেলেতে দাঙ্গা বাধিয়াছিল, জেলেরা পঞ্চাননের দুকান কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা লাগিয়াছে, পুলিশ বন্দুক আনিয়াছে!

বীরেন এই খবর পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে বিলের দিকে ছুটিল গিয়া দেখিল দাঙ্গা চলিতেছে।

তাহাকে আসিতে দেখিয়াই জেলেরা উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। শশী বলিয়া উঠিল—ঠাকুর এসেছে আর আমাদের পায় কে?

জেলেরা দ্বিগুণ উৎসাহে পুলিশের লোকদের আক্রমণ করিল। বীরেন ছুটিয়া দুই হাত তুলিয়া সেই মারামারির মধ্যে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—ওরে শশী তোরা থাম হংসেশ্বর-বাবু আপনার লোকদের থামতে বলুন।......

দুই দলের মাঝে পড়িয়া বিষম আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া বীরেন মাটিতে পড়িয়া গেল। শশী চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে তোরা লাঠি থামা, ঠাকুর জখম হয়েছে!

জেলেদের লাঠি হঠাৎ থামিয়া গেল এবং সেই সুযোগে পুলিশের লোক পলায়ন করিল।

শশী বলিল—এখনি শালারা আবার আসবে, ঠাকুরকে উঠিয়ে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাই চ!

অজ্ঞান বীরেন্দ্র ও নিজেদের দলের জখমী লোকদের বহন করিয়া লইয়া জেলেরা গাঁ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

জেলেরা ভাগিয়াছে জানিয়া পঞ্চানন বশীর মিঞাকে বিলের দখল দিয়া কাটা কানের চিকিৎসা করাইতে কলিকাতায় গেল।

হংসেশ্বর দারোগা আসামী গেরেপ্তার করিবার ফন্দি আঁটিতে লাগিল।

(৪৮)

জেলেরা এমন লুকাইয়াছিল যে পুলিশ তাহাদের পাত্তাই পাইতেছিল না। জেলেরা নানান জায়গা ঘুরিয়া নীলমহানি গ্রামের পোড়ো নীলকুঠিতে গিয়া আশ্রয় লইল দেশের সকল লোকই জেলেদের পক্ষে; পুলিশ আর তাহাদের কোনো সংবাদই পাইতেছিল না।

গুণময় হংসেশ্বরকে আড়াইয়া লইয়া গিয়া বলিলেন—বীরে ছোঁড়া ফিরে-এসে জেলেদের সঙ্গে জুটে দাঙ্গা করেছিল নাকি ?

—হাঁ, তাইত শুনছি।

—সেও কি ফেরার হয়েছে ?

—হাঁ, দাঙ্গার পরে আর তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি।

—তাকেও আসামী করবে ত ?

—লোকে বলছে সে দাঙ্গা থামাতে গিয়েছিল, দাঙ্গা করতে যায়নি।

—লোক মানে ত জেলেদের তরফের লোক ! বীরেকে ছেড়ে দিলে তোমার সে সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে, তা বুঝতে পারছ ?

হংসেশ্বর কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার আর কি সর্ব্বনাশ করবে ?

গুণময় বলিলেন—খালাস পেয়েই এত রাজ্য থাকতে কাৎলামারীতে গিয়ে জুটেছিল কেন, খোঁজ রাখ কি ?

হংসেশ্বর সন্দিহান হইয়া বলিল—না।

—রাজুর সন্ধানে ! রাজুর ওপর ওর মন পড়েছিল বলেই না আমি ওকে বাড়ী থেকে দূর করে দি ! রাজুকে ও এখনো ভুলতে পারেনি ; রাজুরও ওর ওপর বিলক্ষণ টান আছে !

হংসেশ্বরের বুকের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। এই এতদিন তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু রাজবালার মন ত সে এখনো পাইল না ; রাজবালা তাহার বাড়ীতে থাকে, ঘরকন্নার সব কাজ করে, তাহার ছেলের সে মা, কিন্তু তাহার ছেলেকে লইয়া সে পৃথক ঘরে থাকে। হংসেশ্বরের তখন মনে হইল সে যখন বসন্তর ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, তখন সে নিজেই তাহার স্ত্রীর প্রেমাস্পদকে স্ত্রীর কাছে ডাকিয়া দিয়া গিয়াছিল ! তাহার অনুপস্থিত সময়ে তাহারা প্রত্যহ একত্র হইয়াছে ! তাহার মনে পড়িল, তাহার মুখে দাঙ্গা হইবার খবর শুনিয়া রাজবালা কি-রকম ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—বীরেন যে এই গাঁয়ে আছে !

হংসেশ্বরকে চুপ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া গুণময় মনে মনে খুসী হইয়া বলিলেন—এইসব বুঝে শুনে কাজ কোরো—আমি আর বেশী কি বলবো।

হংসেশ্বর কিছু না বলিয়া বিদায় লইল ; গুণময় তাহাতে আরো খুসী হইলেন। বীরেনকে ভালো বাসিয়া রাজবালা যে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এই অপমানের ক্রোধ গুণময় কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। তাই হংসেশ্বরের মনে ঈর্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিয়া পুলিশের বেড়াজালে ফেলিয়া বীরেনকে নির্য্যাতন করিবার সম্ভাবনায় গুণময়ের মন খুসী হইয়া উঠিতেছিল।

হংসেশ্বর গম্ভীর হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। রাজবালা প্রথম সাক্ষাতেই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—বীরেনের কোনো খোঁজ পেলে ?

হংসেশ্বর গম্ভীর হইয়া বলিল—না। এইবার ভালো করে খোঁজ করা হবে।

রাজবালা বীরেনের সংবাদ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল।

সকালবেলা মাছের খেপে কাঁকালে করিয়া ক্ষান্ত জেলেনী রাজবালার সঙ্গে দেখা করিয়া এদিক-ওদিক ভয়ে-ভয়ে তাকাইয়া চুপিচুপি অনুযোগের স্বরে বলিল—এ কি করলে মা ? যে ঠাকুর নিজের প্রাণের মায়া ছেড়ে তোমার খোকাকে বাঁচালে, গরীবদুঃখীদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে জখম হল, সেই লোকের নামে ওয়ারেণ্টো জারি করলে !

রাজবালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—তার নামেও ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে ?

ক্ষান্ত দুঃখকাতরস্বরে ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে তাকাইয়া বলিল—হ্যাঁ মা। শশী বলছিল, ঠাকুরের ওয়ারেণ্টো দারোগাবাবু ফিরিয়ে নিক, তাহলে আমরা সবাই আপনি এসে ধরা দেবো।

রাজবালা একটু ভাবিয়া বলিল—ক্ষান্ত, তুই একবার করে রোজ আমার কাছে আসিস। দেখি আমি কি করতে পারি।

ক্ষান্ত কতকগুলা মাছ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল ; যেন সে মাছ বেচিতেই আসিয়াছিল।

রাজবালা গিয়া হংসেশ্বরকে বলিল—বীরেনের নামেও ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে নাকি ?

হংসেশ্বর অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া উঠিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—হুঁ।

—কেন, তার কি অপরাধ ?

—দাঙ্গা খুন করেছে।

—মিথ্যা কথা।

রাজবালার এই তীব্র প্রতিবাদে হংসেশ্বর রুষ্ট হইলেও থতমত খাইয়া গিয়া বলিল—দাঙ্গার মধ্যে ছিল; দাঙ্গায় জখম হয়েছে; তারপর ফেরার হয়ে আছে; এই ত তার প্রমাণ।

রাজবালা রূঢ় তীব্র ভাষায় উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—তোমরা দাঙ্গা খুন করতে গিয়েছিলে সেজে-গুজে, সে তোমাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে জখম হয়েছিল; তোমার ছেলের বসন্ত হলে তুমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে ছিলে আর সে প্রাণের মায়া ছেড়ে আহার নিদ্রা ভুলে চিকিৎসা আর সেবা করে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়েছিল; তার এই পুরস্কার যে তাকে হাতকড়ি দিয়ে থানায় টেনে আনবে, নির্দোষকে জেল খাটাবে!

তিরস্কারে অভিভূত হইয়া হংসেশ্বর কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—নির্দোষ হয়, বিচারে খালাস পেয়ে যাবে।

—যেমন খালাস পেয়েছিল সেবার! ও কথা আমি শুনব না—বীরেনকে তুমি আসামীর দলে ফেলতে পারবে না। বীরেনকে ছেড়ে দিলে জেলেরা সব আপনি এসে ধরা দেবে বলেছে।

হংসেশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—বীরেনের দূত তোমার কাছে আনাগোনা করছে বুঝি? কাউকে আমি ছাড়বও না, কাউকে আপনি ধরা দিতেও হবে না।

রাজবালা স্বামীর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া এবার কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এমন অধর্ম্ম কোরো না।

হংসেশ্বর পা ছাড়াইয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—অধর্ম্ম কি, এ ত কর্ত্তব্য!

রাজবালা চট করিয়া চোখের জল পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পুলিশের দারোগার হৃদয় আছে মনে করে আমি ভুল করেছিলাম!

রাজবালা যতই বীরেন্দ্রকে মুক্ত করিবার জন্য আগ্রহ ও বেদনা প্রকাশ করিতেছিল, হংসেশ্বরের সঙ্কল্প তত দৃঢ়তর হইতেছিল, বীরেনের উপর ক্রোধ তত বাড়িয়া চলিয়াছিল, স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ তত ঘনাইয়া উঠিতেছিল; অথচ সে মনে মনে রাজবালার দৃপ্ত তেজস্বিতাকে ভয় করিত, মুখ ফুটিয়া তাহার কাছে কিছু বলিতেও পারিতেছিল না।

রাজবালা অনেক দিন পরে মায়াকে চিঠি লিখিতে বসিল—

স্নেহের মায়া,

তোমার বীরেন-দাদাকে তুমি ভুলে যাওনি বোধ হয়। তিনি দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসেছেন। আবার তিনি দাঙ্গার আসামী। সেবারকার মতন বিনা দোষে দণ্ড পেতে দেওয়া আমাদের উচিত হবে না। মকদ্দমা চালাতে টাকার দরকার। আমার নিজের কিছুই নেই। দিদি বেঁচে নেই তাই তোমাকে জানাচ্ছি! আমাকে সাহায্য করতে যদি পারো। —— তোমার মাসী রাজবালা

(৪৮)

সকাল-বেলা ক্ষান্ত জেলেনী আসিয়া ডাকিল—মা-ঠাকরুণ, মাছ নেবে এস।

ক্ষান্তর গলা শুনিয়া রাজবালা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল; চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল—তোদের ঠাকুরের কিছু খবর পেলি ক্ষান্ত।

ক্ষান্ত ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—ঠাকুরের বড় অসুখ; চিকিচ্ছে আর তাদ্বত বিনা মারা যাবে গতরে দরদ হয়েছে, তার ওপর জ্বর হতে লেগেছে, বেহুঁস বে-চৈতন্য হয়ে আবোল-তাবোল বকতে থাকে—ওরে শশী, তোরা হংসেশ্বর-দারোগাকে খুন করিসনে, সে যে রাজবালার স্বামী! আমায় না খুন করে তোরা হংসেশ্বরের গায়ে হাত দিতে পারবিনে!......সারাক্ষণ কেবল রাজু রাজু করছে—রাজু কি তোমার নাম মা?......

রাজবালা সে কথার উত্তর না দিয়া মলিন বিবর্ণ মুখে পাল্টা প্রশ্ন করিল—ক্ষান্ত, আমায় বলতে পারিস, তোদের ঠাকুর কোথায় আছে এখন?

ক্ষান্ত জিভ কাটিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—ঐ কথাটি জিজ্ঞেস কোরো না মা, বলতে পারবো না।

—তোর কিছু ভয় নেই। আমি ঠাকুরের সেবা করতে যাব। আমি তাকে আগলে থাকলে দারোগার সাধ্য হবে না তাকে গেরেপ্তার করবে।

—তুমি কি করে যাবে?

—আমি দারোগাকে লুকিয়ে যাবো হাতীকাঁদা যাচ্ছি বলে যাবো।

—আচ্ছা, আমি শশীকে জিজ্ঞেস করি আগে; সে যদি বলতে বলে, বলবো এসে।

কান্ত চলিয়া গেলে রাজবালা চিন্তাকুল মুখে তাহার মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজু, তুই অমন মুখ ভার করে আছিস কেন?

—বীরেনের বড় অসুখ, মা। চিকিৎসা কি সেবা কিচ্ছুই হচ্ছে না।

—কোথায় আছে সে? এইখানে তাকে নিয়ে আসা না, আমরা ত রয়েছি, দেখি শুনি।

—তা হবার জো নেই মা। তাকে খুনের দায়ে ফেলে তার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে, হুলিয়া হয়েছে; ধরতে পারলে তার জেল হবে।

রাজবালার মাতা উৎসাহশূন্য হইয়া বলিলেন—তবেই ত!

রাজবালা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মা, তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। তোমা হতেও তার ঢের ক্ষতি হয়েছে, তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করো।

তাহার মা লজ্জিত ও আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি করবো?

—তুমি কাল বাড়ী চলে যাও; আমিও তোমার সঙ্গে যাবো; পথে যেখানে বীরেন লুকিয়ে আছে সেখানে একবার তাকে দেখে যাবো। তুমি এখন ওকে কিছু বোলো না, পরে আমি সব বলবো। এইটুকু তোমাকে করতে হবে মা।

রাজবালা যেমন কাতর ভাবে সমস্ত প্রাণের আবেগ ঢালিয়া কথা কয়টা বলিল তাহাতে এবং বীরেনকে একমাস ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিয়া তাহার প্রতি একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া রাজবালার মা রাজবালার প্রস্তাবে সম্মত হইবার পূর্ব্বাভাসের স্বরূপে বলিলেন—জামাই টের পেলে রাগ-টাগ করবেন না ত?

—সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, সে আমি বুঝবো।

রাজবালার মা আর কিছু বলিলেন না, কারণ তিনি দেখিতেন তাঁহার জামাই তাঁহার মেয়ের কি-রকম অনুগত।

রাজবালা গিয়া হংসেশ্বরকে বলিল—মা কালকে বাড়ী যেতে চাচ্ছেন।

হংসেশ্বর গম্ভীর হইয়া বলিল—আচ্ছা।

—আমিও দিন কতকের জন্যে মার সঙ্গে যাব?

হংসেশ্বর একবার রাজবালার মুখের দিকে চাহিল। একটু ভাবিল। তাহার মনে হইল—এখানে রাজবালা থাকিলে বীরেনের গেরেপ্তার লইয়া ঘ্যানরঘ্যানর করিবে, তার চেয়ে দিনকতক দূরে যায় ত মন্দ না। এই ভাবিয়া গম্ভীর ভাবে শুধু বলিল—আচ্ছা।

এত সহজে নিষ্কৃতি পাইয়া রাজবালা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রভাতে রাজবালা ও তাহার মা যখন পাল্কীতে চড়িয়া রওনা হইল তখন কান্ত জেলেনী তাহাদের পাল্কীর কাছে আসিয়া রাজবালাকে চুপিচুপি বলিয়া গেল—বেহারারা সব আমাদেরই দলের লোক; তারা তোমাকে ঠিক নিয়ে যাবে।

রাজবালার পাল্কী নীলমহানি গ্রামের পোড়ো নীলকুঠির কাছে গিয়া নামিল। রাজবালা পাল্কী হইতে নামিয়া মাকে বলিল—মা, তুমি খোকাকে নিয়ে বাড়ী চলে যাও; বীরেন একটু ভালো হলে তাকে নিয়ে কাৎলামারীতে ফিরে গিয়ে খোকাকে আনিয়ে নেবো।

তাহার মা আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন—সে কি লো! এই জঙ্গলে একলা তুই থাকবি কি? জামাই এর পর তোকে ঘরে নেবে কেন?

রাজবালা সহজ ভাবে বলিল—যদি না নেয় ত এখনো নেবে না তখনো নেবে না। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভেবো না মা, আমি সব ঠিক করে নেবো। আমি ছেলের মা; আমার ছেলেকে যে বাঁচিয়েছিল তাকে আমাকে বাঁচাতে দাও।

রাজবালার সমস্ত চেহারায় ও কথায় এমন একটা অসাধারণ দৃঢ়তা ও আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল যে তাহার মা আর তাহাকে বারণ করিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন —কি জানি বাছা এ সব তুই কি করছিস। কি অলক্ষণ

যে আগাগোড়া লেগেছে! শেষে যে কি সর্ব্বনাশ হবে কিছু বুঝতে পারছিনে।

রাজবালা ক্ষুব্ধ ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—অর্থ দেখে তুমি মেয়ে বেচতে চেয়েছিলে, আমার সুখের দিকে ত চাওনি মা, এখন সর্ব্বনাশের ভয় করলে কি হবে। সুখ গেছে, এখন ধর্ম্ম রাখতে দাও। সব গিয়েও ধর্ম্ম যদি থাকে তবে সর্ব্ব নাশ হবে না।

রাজবালা মায়ের আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজবালার মা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা বক্ষে বহিয়া বন ছাড়িয়া রওনা হইলেন।

তখন জেলেরা বসিয়া স্বরচিত গানে রাজবালার স্বামী হংসেশ্বর-দারোগারই উদ্দেশে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া চাপা গলায় গাহিতেছিল—

পেঁচার পরামর্শ শুনে হংস বেচারা
প্রাণে বুঝি যায় মারা রে যায় মারা!

রাজবালাকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া গান থামাইয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাজবালা গিয়া বীরেন্দ্রের শয্যার শিয়রে সন্তর্পণে বসিল। বীরেন্দ্র চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। রাজবালা আস্তে আস্তে তাহার কপালে হাত দিল। বীরেন সেই স্পর্শে আরাম বোধ করিয়া বলিল—আঃ!

রাজবালা জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ?

বীরেন চমকিয়া "রাজু!" বলিয়া চোখ মেলিয়া মাথা তুলিয়া তাহার দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

রাজবালা বলিল—অমন করে তাকাচ্ছ কেন, আমি তোমার সেবা করতে এসেছি।

বীরেন মাথা বিছানায় রাখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। রাজবালা এক হাত তাহার কপালে রাখিয়া আর-এক হাতে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বীরেন বলিল—আমার মনে হচ্ছিল আমি বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি। তুমি এসেছ!......তোমার আসা ভালো হয়নি রাজু! আমার জন্যে যদি তোমার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় তবে......তবে এখন তোমার আসাতে আমার যে আনন্দ তা চিরকাল আমাকে তিরস্কার করবে!

রাজবালা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—তবে কি আমি ফিরে যাবো?

বীরেন আবার চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। অনেক ক্ষণ পরে বলিল—না এলেই ভালো করতে। এসেছ যখন তখন অনিষ্ট যা হবার হয়ে গেছে......এখনি তুমি চলে যেয়ো না, একটু পরে যেয়ো।

বীরেন্দ্রের শেষ কথায় এমন অসহায়ের বেদনা-ভরা মিনতি বাজিল যে রাজবালা গভীর মমতায় তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরম স্নেহের সহিত বলিল—আমি তোমায় ভালো করে তুলে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবো।

বীরেন আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজবালার কোলের কাছে মাথাটিকে সরাইয়া গুঞ্জনের মতন অস্ফুট স্বরে বলিল—মনে পড়ে রাজু, আমি মঘা-অশ্লেষার ছুতো করে তোমার কাছে লুকিয়ে থেকে কি লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলাম! তুমি কি তারই শোধ দিতে এসেছ! তোমার বিয়ের দিনে আমি হাতকড়ি পরেছিলাম; এবার আবার স্বেচ্ছায় হাত-কড়ি পরে তোমার স্বামীর পায়ে ধরে তোমাদের মিলন ঘটিয়ে দিয়ে যাবো, তুমি কিছু ভয় কোরো না!

রাজবালা বীরেনের মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া পরম স্নেহে কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে দৃঢ়তার সহিত বলিল—তোমার হাতে হাতকড়ি পড়তে দেবো না বলেই ত আমি এসেছি—

বীরেন আর কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না, রাজবালার স্পর্শ ও তাহার কথার মাদকতার নেশায় সে অভিভূত হইয়া শুধু রাজবালাকেই অনুভব করিতেছিল, আর কিছু নয়।

সমস্ত দিন এইভাবে কাটিল। সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। শশী আসিয়া ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল।

রাজবালার মা খোকাকে লইয়া নিজের বাড়ীতে যাইতে পারেন নাই, মেয়ের আচরণ দেখিয়া তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল, আর জামাই যখন জানিতে পারিয়া ভাবিবে যে এতে তাঁরও যোগসাজস ছিল তখন মেয়েকে বাঁচানো কঠিন হইবে ভাবিয়া তাঁহার মনের মধ্যে ছমছম করিতেছিল। তিনি কাৎলামারীতে ফিরিয়া গিয়া জামাইকে খবর

দিলেন তাঁর কন্যা কি কাণ্ড করিয়াছে। তাঁর কাছে ফেরারী আসামীদের সন্ধান পাইয়া রাগে আর খুশীতে উৎসাহিত হইয়া হংসেশ্বর আসামী সহিত রাজবালাকে গেরেপ্তার করিতে ছুটিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে হংসেশ্বর দারোগা বনের ধারের কামরাঙা-গাছের উপরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। পোড়ো বাড়ীতে আলো জ্বলিতে দেখিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়া আসিয়া হংসেশ্বর দরজায় ঘা মারিয়া বলিল—ঘরে কে আছ দরজা খোলো।

তাহার স্বর চিনিয়া রাজবালা হাতের তাড়নায় তৎক্ষণাৎ প্রদীপটি নিবাইয়া দিল।

তারপর কি হইয়াছিল তাহা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে জানিয়াছি।

(৪৯)

হংসেশ্বর বীরেনকে আনিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছে; রাজবালা হাতীকান্দা হইতে ডাক্তার ডাকাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইতেছে; নিজে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার সেবা করিতেছে।

হংসেশ্বর জেলেদের জেলায় চালান করিয়া দিয়াছে, রাজবালার ভয়ে সে বীরেন্দ্রকে চালান দিতে পারে নাই। ইহাতে তাহার মনে সুখ ছিল না—বীরেন্দ্রকে বাড়ীতে রাখিয়া সে দুই রকমের অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল; এক, রাজবালা যেরূপ একাগ্রতার সহিত তাহার সেবা করিতেছিল তাহা তাহার ভালো লাগিতেছিল না; আর, বীরেন্দ্রকে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়ার কথা গুণময় টের পাইলে ক্রুদ্ধ হইবেন ও আসামীকে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়ার কথা ম্যাজিষ্ট্রেট জানিতে পারিলে তাহার চাকরীটি ত যাইবেই, অন্যরকম বিপদেও পড়িতে হইতে পারে।

চারপাঁচ দিন পরে বীরেন্দ্র অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল, এখন সে উঠিয়া অল্প অল্প চলিতে পারে।

এই কয়দিনের নিরন্তর পরিশ্রমের পর বীরেনকে সুস্থ দেখার আনন্দে রাজবালা দুপুর বেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; তাহার মুখে সন্তোষের স্মিত আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তাহা দেখিয়া হংসেশ্বর শিকার ধরিবার সময় বিড়ালের মতন পা টিপিয়া-টিপিয়া বীরেন্দ্রের ঘরে আসিয়া চাপা গলায় বলিল—কাপুরুষ কোথাকার! মেয়েমানুষের আঁচল ধরে আত্মরক্ষা করতে লজ্জা করে না?

বীরেন্দ্র এই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া মুখ লাল করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

হংসেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিল—চুপ! গোল কোরো না। যদি এ না চাও যে রাজবালাকে আমি বাড়ী থেকে দূর করে দি, তা হলে এইবেলা চুপিচুপি আমার সঙ্গে বেরিয়ে এস—রাজবালা এখন ঘুমুচ্ছে।

বীরেন্দ্র কিছু না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হংসেশ্বর বলিল—দাঁড়াও, দেখে আসি।

হংসেশ্বর পা টিপিয়া-টিপিয়া বাহির হইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল রাজবালা তখনো তেমনি ঘুমাইতেছে। হংসেশ্বর হাতছানি দিয়া বীরেনকে ডাকিল। বীরেন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

বীরেন যাইতে যাইতে একবার রাজবালার ঘুমন্ত মূর্ত্তির অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া লইল। গাঢ় নিদ্রার গভীর নিশ্বাসে তাহার বক্ষ ছন্দে তালে ওঠা-নামা করিতেছিল, তাহার মুখে হাসির আভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

হংসেশ্বর বীরেনকে বাহিরে লইয়া গিয়াই বাহিরের দরজায় শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

একখানা গরুর গাড়ী প্রস্তুত ছিল; হংসেশ্বর বলিল—দেরী নয়, গাড়ীতে ওঠ। বীরেন ও হংসেশ্বর নিঃশব্দে গাড়ীতে উঠিল। হংসেশ্বরের সঙ্গে তাহার দারোগার উর্দ্দি আর গুলিভরা রিভলভারও গাড়ীতে উঠিল, এবং গাড়ী ঘিরিয়া চলিল আটজন কনষ্টেবল, ভরা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া; হংসেশ্বরের ভয় হইতেছিল পাছে গাঁয়ের লোক বীরেনকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লয়!

রাজবালার যখন ঘুম ভাঙিল তখন একেবারে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাজবালা চোখ চাহিয়াই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া নিজের মনেই হাসিয়া বলিল—ওমা! একেবারে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বীরেনকে বিকেল বেলা কিছু খেতেও দেওয়া হয়নি।

সে আপনার এই বিশ্রামসুখের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেল; উনানের ছাইঢাকা আগুন একটু উস্কাইয়া দিয়া দুধ গরম করিতে দিল;

একখানা রেকাবিতে কিছু ফল সন্দেশ সাজাইয়া তাহার উপর একপাশে গরম দুধের বাটি বসাইয়া এক হাতে লইল ও অপর হাতে এক গেলাস জল লইয়া বীরেনের ঘরে গেল।

ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল বীরেন নাই। সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইয়া খাবার ও জল সেইখানে নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে আসিল। বারান্দায় উঠানে ঘরে ঘরে খুঁজিল বীরেন নাই। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল—হয়ত বা বীরেন না বলিয়া তাহার নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছে। রাজবালা মাকে আর খোকাকে জিজ্ঞাসা করিল; তাহারা ঘুমাইতেছিল, তাহারা কিছু জানে না। রাজবালা বাড়ীর চাকরকে ডাকিল—কালো কালো, ও কেলে!—কেহ উত্তর দিল না। রাজবালা ছুটিয়া দেখিতে গেল বাহির-বাড়ীতে বীরেন বা হংসেশ্বর বা কালো আছে কি না। বাহির-বাড়ীতে যাইবার দরজা বাহির হইতে বন্ধ! রাজবালা দরজা টানাটানি করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—কালো, কালো, ওরে কালো! —কেহ কোনো সাড়া দিল না। রাজবালা মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার মন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় তোলপাড় করিতেছিল।

খানিকক্ষণ পরে ঝনাৎ করিয়া শিকল খোলার শব্দ হইল। রাজবালা দাঁড়াইয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল কালো।

রাজবালা তাহাকে দেখিয়া সমস্ত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ ক্রোধে পরিণত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এতক্ষণ কোথায় ছিলি বাঁদর!

—আজ্ঞে আমি কেন বন্ধ করবো? বাবু নিজে বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

—এতক্ষণ ডাকাডাকি করছি শুনতে পাস না, দরজা খুলছিলিনে কেন?

—সাতটার আগে দরজা খুলতে বাবুর মানা ছিল।

রাজবালা ক্রোধে তীব্র উচ্চ স্বরে বলিল—তোদের বাবু কোথায়?

কালো ঢোক গিলিয়া বলিল—বাবু ঠাকুরকে নিয়ে জেলায় চলে গেছে।

রাজবালা আকাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাগে অভিমানে, আপনার অসাবধান ঘুমের জন্য পরিতাপে তার কান্না পাইতেছিল। চাকরের সামনে অশোভন কান্না দমন করিয়া রাজবালা জিজ্ঞাসা করিল—কতক্ষণ হল গেছে?

—সেই দুপুর বেলা।

রাজবালা ঘরে গিয়া খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িল, সে আজ কিছুতেই আপনাকে কাঁদিতে দিতে ছিল না।

কালো ঘরের বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিল—উনুনে আগুন দেবো মা।

রাজবালা জোর করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া সহজ স্বরে উত্তর দিল—আজ আর রাঁধবো না; উনুনে দুধ বসানো আছে খোকার জন্যে একটু রেখে তুই সবটা নিস, চিঁড়ে গুড় নিস, ফলার করিস। আমায় আর ডাকিসনে।

মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া খোকার বড় ভয় করিতেছিল সে মায়ের কোলে বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঢুলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাজবালা খোকাকে বলিল—খোকনমণি, যাও দিদিমার কাছ থেকে দুধ নিয়ে খেয়ে এসে ঘুমোও।

খোকা আসিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাজবালার মা কন্যার আচরণে রুদ্ধ ক্রোধে জ্বলিতেছিলেন, বীরেন তাঁর কে যে তার জন্য এত আপ্‌সানি! অথচ মেয়ের ভয়ে কিছু বলিতেও পারিতেছিলেন না; তিনিই যে বীরেনকে সরাইয়া দিয়াছেন এই লজ্জায় মেয়ের কাছে কুণ্ঠিতও হইতেছিলেন। তিনি দরজার বাহির হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই কিছু খাবি আয়।

রাজবালা যেমন করিয়া 'না' বলিয়া উঠিল, তাহাতে তাহাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা চলিল না।

সকালে উঠিয়া রাজবালা দুখানা চিঠি পাইল—একখানা হংসেশ্বরের, ষ্টেসন হইতে গরুর-গাড়ীর গাড়োয়ানের হাতে পাঠাইয়াছে; অপরখানি মায়া লিখিয়াছে।

হংসেশ্বর লিখিয়াছে—

আমি বীরেনকে আমার বাড়ীতে আমার স্ত্রীর যত্নে সুখে থাকতে দিয়ে আমার মনের সুখ আমার বাড়ীর সুখ নষ্ট করতে পারলাম না। বীরেন দাঙ্গা সম্বন্ধে নির্দ্দোষ বটে

কিন্তু আমার কাছে সে অপরাধী; তাই যেমন করেই হোক তাকে আমি জেলখানায় আটক করিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারবো।—

হংসেশ্বর।

মায়া লিখিয়াছে—

মাসী, বীরেন-দাদাকে কি আমি ভুলতে পারি। তুমি যদি একবার তোমার বোনঝির বাড়ীতে পায়ের ধূলো দাও তা হলে পরামর্শ ঠিক করতে পারি। হাঁসজারু (অর্থাৎ মেসো) মশায়কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একবার এস না। তোমার জামাইএর খুব অসুখ, নইলে আমিই যেতাম।

— তোমার স্নেহের মায়া।

রাজবালা কালোকে ডাকিয়া বলিল—একখানা গরুর-গাড়ী নিয়ে আয়, আমি বিলাসপুরে রসময়-বাবুর বাড়ীতে আমার বোনঝির কাছে যাবো, তোকে সঙ্গে যেতে হবে।

রাজবালার মা অবাক হইয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

(৫০)

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জেলেদের দাঙ্গার মকর্দ্দমা হইতেছে। জেলেরা সকলেই স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা নিজেদের ন্যায্য স্বত্ব রক্ষার জন্য ও জমিদারের ক্রমাগত অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া। বীরেন নিজে ও জেলেরা সকলেই বলিয়াছে বীরেন দাঙ্গার মধ্যে ছিল না, বীরেন তাহাদের দাঙ্গা করিতে উত্তেজিত করে নাই, বা তাহার আদেশে পঞ্চাননের কান কাটা হয় নাই। কিন্তু পঞ্চানন প্রভৃতি জমিদার-পক্ষের সাক্ষীরা ও হংসেশ্বর প্রভৃতি পুলিশ পক্ষের সাক্ষীরা বীরেনকেই মূল সর্দ্দার বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। অধিকন্তু হংসেশ্বর ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইল যে বীরেন স্বদেশীব্রত প্রচার করে, অবৈতনিক পাঠশালা করিয়া চাষামজুরদের লেখা-পড়া শেখায়, কথকতা করিয়া রাজদ্রোহ সঞ্চার করে, নিজে সংসারী হয় নাই এবং একবার দাঙ্গা করার জন্য তাহার দশবৎসর দ্বীপান্তর হইয়াছিল। বীরেন হংসেশ্বরের সমস্ত কথাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, কেবল স্বীকার করিল না সে রাজদ্রোহী। তাহা স্বীকার না করিলেও যে লোক সংসারাশ্রমী হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে দরিদ্রদের শিক্ষা-দীক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে এবং স্বদেশীব্রত যাহার লক্ষ্য সে ব্যক্তি যে প্রজাদিগকে জমিদার ও পুলিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছিল সে বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের একরকম দৃঢ় ধারণা হইয়া উঠিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের মনের ভাব বুঝিয়া বীরেন্দ্রের উকিল ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিবেদন করিল—আমাদের উপস্থিত সাক্ষীর কথায় আসামীর নির্দ্দোষিতা যখন পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে না, তখন আদালতের অনুমতি হলে আমি আর-একজন সাক্ষী উপস্থিত করি—যার দ্বারা নিঃসংশয়ে আসামীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যাবে।

গুণময় রায়ও মোকদ্দমা দেখিতে আদালতে আসিয়া একপাশে চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। তিনি ও হংসেশ্বর উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন; পঞ্চানন বেচারার কান ছিল না বলিয়া সে উৎসুক হইয়াও উৎকর্ণ হইতে পারিল না। বীরেন্দ্রও কৌতূহলী হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল, এ আবার কে নূতন সাক্ষী তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে আসিতেছে!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষী আনিতে হুকুম দিলেন।

উকিল বাহিরে গিয়া একটি অবগুণ্ঠিতা তরুণী মহিলাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। আদালত স্তব্ধ।

মহিলাটিকে দেখিয়াই বীরেন বলিয়া উঠিল—রাজবালা!

তাহার কথা শুনিয়া হংসেশ্বর ঢেলা-ঢেলা চোখ ঠেলিয়া বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল - অ্যাঁ রাজু!

গুণময় ও পঞ্চানন ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিল—রাজু বলেই ত মনে হচ্ছে।

রাজবালা সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখের ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। তারপর অসঙ্কোচ দৃপ্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিল—হুজুর, আমি দারোগার স্ত্রী, গুণময়-বাবুর শালী। এঁরা আক্রোশ করে নির্দ্দোষকে বারবার বিপন্ন করেছেন। তার কতক প্রমাণ আমার স্বামীর এই চিঠিতে পাওয়া যাবে......

হংসেশ্বর বাড়ী হইতে চুরি করিয়া বীরেনকে লইয়া যাওয়ার পর রাজবালাকে যে চিঠি লিখিয়াছিল রাজবালা সেই চিঠিখানি ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়া বলিল—যদি এতেও বীরেন্দ্রের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ না হয়, তবে আমি আর আমার স্বামী দোষীকে ছ দিন বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিলাম, আমরাও তা হলে দণ্ডনীয়।

হংসেশ্বর মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া গলগল করিয়া ঘামিতে ঘামিতে ঘটঘট করিয়া ঘনঘন ঢোক গিলিতেছিল আর তাহার কণ্ঠাটা তাড়াতাড়ি উঠানামা করিতেছিল।

বীরেন্দ্র বিস্ময়পুলকে অবাক হইয়া রাজবালার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

রাজবালা কাঠগড়া হইতে নামিয়া মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিল।

উকিল বলিল—আদালতের অনুমতি হলে আমি আর-একটি সাক্ষী হাজির করি।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কৌতূহল অতিমাত্রায় জাগ্রত হইয়াছিল, তিনি অনুমতি দিলেন। উকিল আবার বাহির হইয়া গেল।

আবার আদালত স্তব্ধ। সকলেই ভাবিতেছিল আবার কে আসিবে?

উকিলের সঙ্গে একজন ঝিয়ের হাত ধরিয়া আদালতে প্রবেশ করিল একটি নিরাভরণা শুক্লাম্বরা ষোড়শী বিধবা!

সকলেই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, কেহই তাহাকে চিনেনা।

তরুণী বিধবা কাঠগড়ায় উঠিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দাঁড়াইল।

বীরেন বলিয়া উঠিল—মায়া! আহা মায়া বিধবা হয়েছে!

গুণময় চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—মায়া, তোর এ বেশ কেন, তুই এখানে কেন?

মায়া সেসব কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—আমার নাম মায়া, আমি জমিদার গুণময় রায়ের মেয়ে, বিলাসপুরের জমিদারের স্ত্রী। আমার স্বামী হঠাৎ পীড়িত হয়ে অল্প কয়েক দিন পরেই মারা গেছেন; আমার বাবা তা জানতেন না, তিনি আমার স্বামীকে জীবিত মনে করে এই পত্র লিখেছিলেন; তার মধ্যে তিনি লিখেছেন—বীরেনটা আমায় যেমন রাজবালা থেকে বঞ্চিত করেছে, হংসা দারোগাটা যেমন আমার হাত থেকে রাজবালাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনি আমি কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার করছি; হংসাকে লেলিয়ে দিয়েছি বীরেনের পিছে, বীরেনের দাঙ্গার দায়ে জেল হবে নির্ঘাত; আর হংসাটাও হিংসার বিষে জ্বলে জ্বলে মরবে। পেঁচোর কান দুটো কাটা গেছে, তার জন্যে দুঃখ নেই, সে ত চিরকা[ল] দুকান-কাটাই ছিল......

আদালত-সুদ্ধ লোক হোহো করিয়া হাসিয়া উঠি[ল]। গুণময় ও পঞ্চানন একেবারে অধোবদন। আজ অনেকে[র] স্বরূপ-পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িল; তাহাতে মর্ম্মান্তি[ক] চটিতেছিল গুণময় তাঁহার কন্যা মায়ার উপরে, পঞ্চান[ন] চটিতেছিল অকৃতজ্ঞ প্রভু গুণময়ের উপরে, হংসেশ[্বর] চটিতেছিল স্ত্রী রাজবালা ও গুণময়ের উপরে।

মায়া বলিতে লাগিল—আমার বীরেন দাদা যে নির্দ্দো[ষ] তা প্রমাণ হয়ে গেছে। এখন আদালত ওঁকে ছেড়ে দিন অথবা জামিন মঞ্জুর করুন, আমরা আপিল করবো। আ[মি] আমার সমস্ত গহনা জামিন-স্বরূপ আমানত রাখছি......

মায়া ঝিএর হাত হইতে একটি বাক্স লইয়া খুলি[য়া] ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে ধরিল।

বীরেন দেখিল সেই অলঙ্কারগুলি ঐ বাক্সে করি[য়া] দয়াদেবী তাহাকে দিয়াছিলেন; সে উহা মায়াকে বিবাহে যৌতুক বলিয়া দিয়া আসিয়াছিল; বিধবা হইয়া মায়া সে আভরণ নিজের অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া তাহার বীরে[ন] দাদাকে মুক্তি দিতে আনিয়াছে! এই দুটি মেয়ে তাহা[র] জন্য কি দুঃসাহসিক কঠিন দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করি[য়া] লইয়াছে তাহা ভাবিতে-ভাবিতে বীরেন্দ্রের দুই চক্ষু দি[য়া] স্নেহ-কৃতজ্ঞতা-আনন্দ-বেদনার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ি[তে] লাগিল। (সমাপ্ত)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূপুর

যে সুর ফোটেনি গানে, যে ভাষা অধীর
গুমরি' মরিছে রুপা কণ্ঠে অনিবার,
পঞ্চমে সহসা থামি' স্তব্ধ বনানীর
যে ধ্বনি লুকায়ে রল কানন মাঝার,—

রুনুঝুনু রুনুঝুনু দু'গাছি নূপুর
কোমল চরণ দুটি চুমি' অবিরত
রণিয়া রণিয়া ছন্দে জাগায় মধুর
নিরুদ্ধ সঙ্গীতরাশি, ব্যর্থ আশা যত!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

উদ্ভিদের জিজীবিষা

বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাটা যাহাকে ইংরেজীতে First principle বলে তাহা মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুগণের একচেটিয়া নহে। উদ্ভিদের মধ্যেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে। মনুষ্যাদির মত উদ্ভিদেরও একটা কার্য্যকরী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

উদ্ভিদের জিজীবিষা।
কাটা গুলঞ্চ-লতার মাটিতে শিকড় প্রেরণ।

প্রায় ১৪।১৫ মাস পূর্ব্বে একটা বাগান পরিষ্কার করিবার সময় একটি গুলঞ্চের লতা মাটী হইতে প্রায় তিন ফুট উর্দ্ধে কাটিয়া ফেলা হয়। তখন ইহা একবারও মনে হয় নাই যে উহা হইতে পুনরায় শিকড়ের উদ্ভব হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে দেখা গেল ঐ কর্ত্তিত স্থান হইতে ১২টি শিকড় বাহির হইয়াছে। ক্রমে সেই-সকল শিকড় মাটীতে পঁহুছিয়া মাটী হইতে রস লইয়া লতাটিকে পুষ্ট করিতে লাগিল। এখন এইরূপে রস পাইয়া লতাটি পূর্ব্ববৎ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইহার পরও কি বাঁচিবার ইচ্ছা ও কার্য্যকরী শক্তি মানুষের একচেটিয়া বলা চলে আর সত্যই কি মনে হয় না যে—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতা"? পাঠকগণের দৃষ্টার্থ ইহার একখানি ফটোগ্রাফ দেওয়া গেল। "ক" চিহ্নিত স্থানে লতাটি কাটিয়া ফেলা হয় এবং এই স্থান হইতে শিকড়গুলি মাটীতে নামিয়া আসিয়া রস সঞ্চয় করিয়া লতাটিকে মঞ্জরিত ও পুষ্ট করিয়াছে।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

আদর্শ গ্রাম

আমরা গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে বড়োদা রাজ্যের একটি আদর্শ গ্রামের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি মহীশূর রাজ্যের একটি আদর্শ গ্রামের বিবরণ দিতেছি।

মহীশূর রাজ্যের কোলার জেলার চিন্তামণি তালুকের সদর মহকুমা চিন্তামণি। এই গ্রামের উত্তরপাড়ার নাম নাকুন্দি। সেখানে একটি উৎকীর্ণ লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে এই গ্রাম হাজার বছরের পুরাতন। ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন পহ্লব জাতীয় নোল্লাম্বা এই অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন তখন ঐ নাকুন্দি গ্রামের পত্তন হয়। তারপর একজন মহারাষ্ট্র সামন্ত চিন্তামণি রাও ঐ গ্রামকে প্রসারিত করেন বলিয়া উহার নাম চিন্তামণি হইয়াছে। গ্রামের বৈশ্য অধিবাসীরা বলে যে পূর্ব্বকালে বৈশ্য বণিকেরা এই গ্রামে চিন্তামণি নামক রত্নের ব্যবসায় করিত; তাহা হইতে গ্রামের নাম হইয়াছিল।

এই গ্রামটি একটি ছোট পাহাড়ের তলায় সমুদ্রতল হইতে ৩০০০ ফুট উঁচু অধিত্যকায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নরঞ্জন।

চিন্তামণি একটি বড় গঞ্জ। প্রতি রবিবারে হাট বসে ও সেদিন হাজার কুড়ি টাকার কেনা বেচা চলে।

গ্রামের আয়তন মাত্র সওয়া মাইল। এখানে মাত্র ২১০০ ঘর লোকের বাস; বাসিন্দার সংখ্যা ৫৭৬৮, তার মধ্যে পুরুষ ২৮৩৩ আর স্ত্রীলোক ২৯৩৫ জন। গ্রাম ক্রমশ বড় হইয়া উঠিতেছে এবং গ্রামের দক্ষিণপশ্চিম দিকে একটি
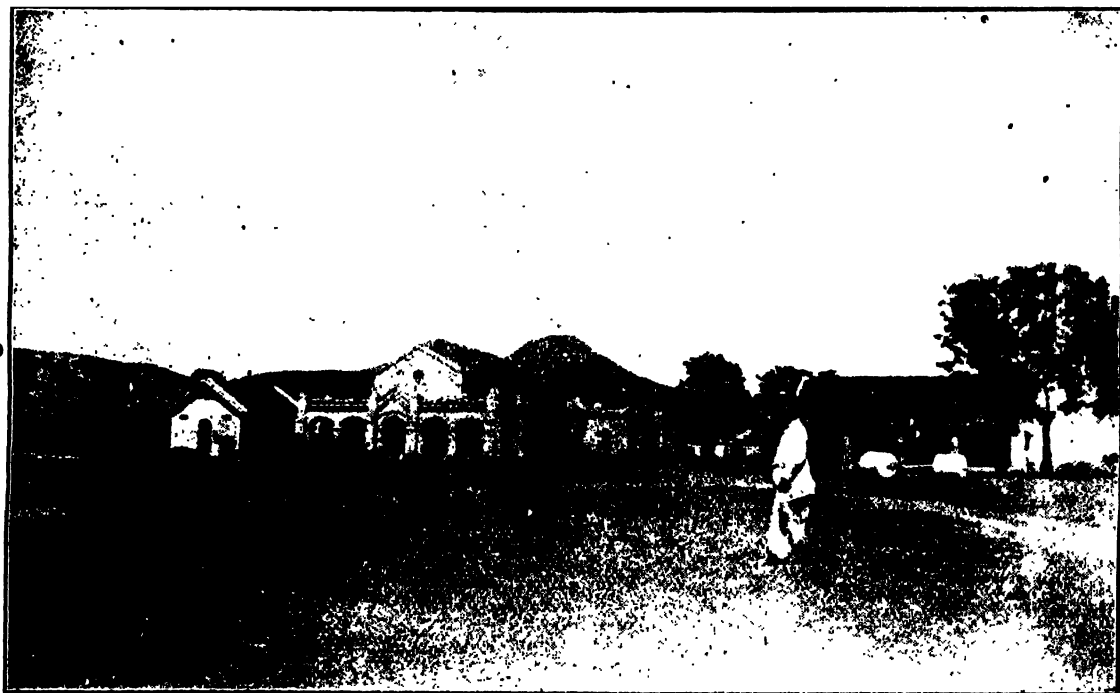
চিন্তামণি গ্রামের কাছারী ও আপিস।

চিন্তামণি গ্রামের পাঠাগার।

চিন্তামণি গ্রামের ইংরেজী ও দেশীভাষা শিক্ষার স্কুল।

সুবিন্যস্ত পাড়া যোগ করা হইতেছে। সেই পাড়ার নাম মহীশূরের রাজার নামে রাখা হইয়াছে—কৃষ্ণরাজ-পেট (পেট মানে পাড়া)। এই গ্রাম যে আমাদের বাংলা দেশের অনেক গ্রামের চেয়ে ছোট তাহা সেন্সস-রিপোর্টে লোকসংখ্যা অথবা গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীর ১৯১ পৃষ্ঠার ২য় কলম্ দেখিলেই বুঝা যাইবে।

সম্প্রতি এই গ্রাম হইতে মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোর ও জেলার সদর কোলার পর্য্যন্ত সরু রেল-লাইন খোলা হইয়াছে। এরূপ রেল-লাইন মহীশূর-রাজ্যে এইই প্রথম।

চিন্তামণি গ্রাম তালুকের সদর বলিয়া এখানে তালুক-কাছারী, সাব্-রেজিষ্ট্রার, পাবলিক ওয়ার্কস্-ডিপার্টমেণ্ট, সাব-ডিভিজানাল অফিসার, রেলওয়ের অ্যাসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্ প্রভৃতির আপিস, হাজত ও থানা এবং কয়েকটি স্কুল আছে।

এই গ্রামে মিউনিসিপালিটি আছে, ১৫ জন নির্ব্বাচিত সভ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে। মিউনিসিপালিটির অবস্থা দিন দিন সচ্ছল হইয়া উঠিতেছে। ৫০, হাজার টাকা খরচ করিয়া গ্রামে জলের কল বসাইয়াছে; গ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে দু মাইল দূরে একটি পুষ্করিণীতে জল ধরিয়া রাখা হয়, সেখান হইতে নলের ভিতর দিয়া মাধ্যাকর্ষণের টানে জল গড়াইয়া আসিয়া গ্রামে বিলি হয়। আরো ২৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া বর্ত্তমান পুষ্করিণীটিকে বাঁধাইবার ও জলের ফিল্‌টার বসাইবার আয়োজন হইতেছে। কিন্তু এই-সমস্ত সুখ-সুবিধা দিবার জন্য মিউনিসিপালিটিকে বাসিন্দাদের উপর নূতন কর বসাইতে হয় নাই। মিউনিসিপালিটি কর্ম্মচারীদের উপযুক্ত বেতন দিতেও অনেক খরচ করে এবং গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান তাহার প্রধান লক্ষ্য। গ্রামে স্নান ও ধোয়া-মাজার জন্য ছোট ছোট পুষ্করিণী আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রামের পথ সমস্ত পাকা, পথের দুপাশে সিমেণ্ট-করা নালা। গ্রামের জন্মমৃত্যুর তালিকা রাখা হয় ও তাহা দেখিয়া গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্ধান পাইয়া যথোচিত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। গ্রামের সকল লোকই টীকা লইতে বাধ্য। গ্রামে পীড়িতদের চিকিৎসার জন্য উৎকৃষ্ট ডাক্তারখানা আছে;

চিন্তামণি গ্রামের চৌরাস্তা।

তাহা সরকারী খরচে চলে, মিউনিসিপালিটি মাসে ২০০ টাকা বখরা দেয়। পাঁচ বৎসর আগে ডাক্তারখানার সঙ্গে একটা রোগী থাকিবার হাসপাতালও ৪০০০ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

মিউনিসিপাল কাউন্সিল মহারাজের দরবারে প্রার্থনা করাতে গ্রামে শিক্ষা সার্ব্বজনিক ও অবশ্য-দেয় হইয়াছে। একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাঁহারাই শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ও তদারক করেন। গ্রামে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে—(১) এংলোভার্ণাকুলার স্কুল; (২) মুসলমান ছেলেদের স্কুল; (৩) বয়স্ক লোকদের জন্য দুটি নাইট স্কুল বা রাত-স্কুল; এই দুটি স্কুলেই অনেক লোক পড়ে; (৪) এংলো-ভার্ণাকুলার বা মাইনর স্কুলের সংলগ্ন কারিগরী স্কুল; (৫) সরকারী হিন্দু মেয়েস্কুল; (৬) গোশা মেয়েদের স্কুল; (৭) পঞ্চম জাতের ছেলেদের স্কুল গেল বছর সরকারী সাহায্যে খোলা হয়, তাহার পর এই স্কুলের উন্নতি দেখিয়া শিক্ষা-কমিটি ইহা খাস সরকারী স্কুল করিবার জন্য অনুমোদন করিয়াছেন; (৮) (৯) (১০) তিনটি সরকারী-সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুল। শিক্ষা-কমিটি আরো দুটি স্কুল খুলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহা হইলে একটা গ্রামে ১২টা স্কুল হইবে!

শিক্ষাদানের জন্য মিউনিসিপালিটি বৎসরে ৫০০ টাকা ব্যয় করে। যে-সব জাতের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয় নাই সেইসব জাতের ছেলেদের উৎসাহ দিবার জন্য মহারাজার গভর্মেণ্ট একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন; সেই টাকার ভাগ চিন্তামণি গ্রামও পাইয়াছে। গ্রামের সকল শ্রেণীর লোকই শিক্ষার উপকারিতা ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া গভর্মেণ্ট মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির সাধুচেষ্টার অনুকূলে সাহায্য করিতেছে। গ্রামে ৭ হইতে ১১ বৎসর বয়সের ছেলে আছে ৩৬০ জন; তার মধ্যে ২৫৪ জন স্কুলে পড়ে। গ্রামে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ৬০.৮। গ্রামে শিক্ষা অবশ্যলভ্য হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামে আর কেহ মূর্খ নিরক্ষর থাকিবে না। একটা গ্রামের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্য ও গর্ব্বের কথা নহে।

গ্রামে আগন্তুক অতিথি অভ্যাগতদের থাকিবার সুবি-

চিন্তামণি গ্রামের দ্বিতীয় চৌরাস্তা।

ধার দিকেও গ্রামের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। এখানে একটি পথিকদের বাংলো ও ছটি মুসাফিরখানা, ও চারখানি চৌলট্রি আছে। বাংলোতে থাকিতে হইলে সামান্য কিছু ভাড়া দিতে হয়; মুসাফিরখানায় থাকিতে কিছু খরচ লাগে না। চৌলট্রিগুলি বৈশ্য বণিকেরা পথিকদের আশ্রয়ের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এসব ছাড়াও গ্রামে হোটেল ও সরাই অনেকগুলি আছে। যাতায়াতের জন্য জট্‌কা নামক ঘোড়ার গাড়ী সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, বিশেষত উদ্ভিদরাজ্যের বড় আত্মীয় সম্পর্ক। চিন্তামণির মিউনিসিপালিটি তাহা ভুলিয়া বসে নাই। তাই সেখানকার পথগুলির দুধারি তরুবীথিকা পত্রল ছত্র ধরিয়া পথিকদের ছায়া দ্যায়। গ্রামের মাঝখানে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক স্মরণীয় করিবার জন্য একটি উদ্যান 'করোনেশন পার্ক' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই উদ্যান ক্লান্ত ব্যবসায়ী ও স্ফূর্ত্তিভরা স্কুলের ছেলেদের প্রিয় স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া গ্রামে একটি হস্‌ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার জমি মিউনিসিপালিটি অমনি দিয়াছে। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকের সময় গ্রামে লাইব্রেরী ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহার বাড়ীটা সাধারণের চাঁদায় তৈয়ারি; এখন মিউনিসিপালিটি তাহার রক্ষা ও তদারকের সাহায্য করিতেছে। গ্রামে একটি ক্লাব আছে; সেখানকার টেনিস-কোর্টে গ্রামের গণ্যমান্য চাকুরে ও ব্যবসায়ী একত্র হইয়া আনন্দে সন্ধ্যা যাপন করিয়া দিবসের ক্লান্তি দূর করেন। মিউনিসিপালিটির কন্‌ট্রাক্‌টারেরা নিজেদের খরচে ঐ ক্লাবের সংলগ্ন একটি লাইব্রেরী-বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দিতেছে, ইহা তাহারা মিউনিসিপালিটিকে দান করিবে।

গ্রামের মিউনিসিপাল কাউন্সিল ছাড়া সাধারণ পূর্ত্ত-কার্য্য রক্ষা ও তদারকের জন্য তালুক-বোর্ড আছে; তাহা সমস্ত তালুকের পথ ঘাট কূপ মুসাফিরখানা প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করে। তা ছাড়া 'তালুক প্রোগ্রেস কমিটি' আছে—তাহা তালুকের উন্নতির জন্য কি কি করা দরকার তাহার অনুসন্ধান করিয়া অভাব অভিযোগ পূরণের ব্যবস্থা করে। ইহার চেষ্টাতে কারিগরী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; রায়তদিগকে উন্নতপ্রণালীর নূতন নূতন চাষের যন্ত্র

চিন্তামণি গ্রামের তৃতীয় চৌরাস্তা।

জোগাইবার জন্য একটা চাষযন্ত্রের ডিপো খুলিয়াছে, চাষের উন্নতি ও চাষীর সুবিধার জন্য চাষী-সমিতি ও চাষী-পরস্পর সাহায্য-সমবায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ১৪১৫৬ টাকা মূলধন ও ৩১০ জন মেম্বর সংগ্রহ করিয়া পরস্পর-সাহায্য-সমবায় কাজ আরম্ভ করিয়াছে; এই সমবায় চাষীদের কেনা বেচা ঋণ দাদন প্রভৃতিতে সাহায্য করিয়া থাকে; গেল বছরে ৪১৪৪৮ টাকার লেনদেন কারবার ইহার হাত দিয়া হইয়াছে। এ ছাড়াও দেশী মহাজনেরা ত পুরাদমে তেজারতী কারবার করিতেছেই।

গ্রামের বাসিন্দাদের চেষ্টা নানা দিকে ধাবিত হইতেছে। চিন্তামণি গ্রাম সোনারূপার উৎকৃষ্ট জিনিস তৈয়ারির জায়গা। চামড়া কষের কারখানা (ট্যানারী) বছরে ৫০ হাজার টাকার কারবার ফাঁদিয়াছে। রেশমের সুতা কাটা আর হাতের তাঁতে কাপড় বোনার কারবার নিত্য বাড়িয়া চলিয়াছে। রেলওয়ে ও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে বাহিরের সঙ্গে গ্রামবাসীর লেনদেনের সুবিধা যত বাড়িতেছে গ্রামের ব্যবসাবাণিজ্য ধনসম্পদও ততই বাড়িতেছে।

রাজার নিকট হইতে একটু সাহায্য ও উৎসাহ পাইলে মফঃস্বলের একটা গণ্ডগ্রাম যে স্বাস্থ্যে সম্পদে শিক্ষায় চেষ্টায় কেমন উন্নত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উদাহরণ এই চিন্তামণি গ্রাম। এইরূপ অনেক গ্রাম মহীশূর রাজ্যে উন্নতির পথে চলিয়াছে এবং তাদের দেখাদেখি আরো ভালো হইবার রেষারেষিতে সমস্ত রাজ্যে গ্রামে গ্রামে উৎসাহ উদ্‌যোগের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

চা।

অভ্যাস মাহাত্ম্য

নিমগাছ কাঁদি কয়, "মোরে কেন ধরা
দিয়েছ অজস্র ফল তিক্ত রসে ভরা?"
ধরা কহে, "মোর কিবা দোষ আছে তায়
আমারি রসে ত' পুষ্ট রসালের কায়!
অভ্যাসে শুষিয়া যদি তিক্ত রসটুকুও
ফল তব মিষ্ট হবে কেমনে তা কও?"

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

নাড়ায়ণ।

শিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব

নানাপ্রকার কার্য্য-সূত্রে বহু শিক্ষিত বাঙালী বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। এলাহাবাদ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐরূপ প্রবাসী বাঙালীর অন্যতম। ইঁহার আদি বাসস্থান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত দত্তপুকুর রেলষ্টেশনের নিকট-বর্ত্তী সন্তোষপুর গ্রাম। আমরা এস্থলে উক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় B. Sc. মহাশয়ের কয়েকটি অনন্যসাধারণ সদ্‌গুণের বর্ণনা করিব।

বাল্য হইতেই লালমোহন বাবুর নানাপ্রকার সৎকার্য্যে অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যৌবনে সেই অনুরাগ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কুসুমিত হইয়াছে। স্থানীয় যুবকগণের চরিত্র যাহাতে পবিত্র থাকে, যুবকগণ যাহাতে নৈতিক ও চরিত্রবল লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য-পদ-বাচ্য হয় এদিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি। এতদুদ্দেশ্যে তিনি এলাহাবাদে কর্ণেলগঞ্জ মহল্লায় "হররুক্‌স্" (Horrocks) নামক ক্লবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লালমোহন বাবুর প্রচেষ্টায় এই ক্লবের সভ্যগণ দেশীয় ও ইউরোপীয় নানাপ্রকার ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া আসিতেছেন। এতদ্ভিন্ন লালমোহন বাবু ও তাঁহার অধিনায়কত্বে "হররুক্‌স্" ক্লবের সভ্যগণ আর্ত্তের অশ্রু মুছাইতে, অসহায় ব্যক্তির সাহায্যকল্পে ও রোগীর সেবায় যেরূপ অক্লান্তভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা দেখিলে তাঁহাদিগের অশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

লালমোহন বাবুর সন্তরণ-ক্ষমতা ও নৌচালনদক্ষতা অতুলনীয়। গত বর্ষার সময়—যখন এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার বিস্তার ২ মাইল ৪ ফার্লং—সেই সময়ে তাঁহার সহিত একদিন এলাহাবাদ-ফোর্টের কয়েকজন গোরার সন্তরণ দ্বারা গঙ্গা পার হইবার প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগী সন্তরণকারীগণ যথাসময়ে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গোরাগণ সেদিন বর্ষার বিপুলায়তন গঙ্গার ভয়ঙ্কর স্রোত ও তরঙ্গের ভয়ে গঙ্গাপার হইতে অসম্মত হইলে লালমোহন বাবু একাকী সেই ভীষণা তরঙ্গময়ী গঙ্গা পার হইবার জন্য গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইলেন। লালমোহন বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েকখানি নৌকা বহু উৎসুক দর্শক বক্ষে লইয়া গমন করিতেছিল। তিনি প্রায় ৩ মাইল সন্তরণ করিয়া সমবেত জনগণের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ও জয়ধ্বনির মধ্যে নিরাপদে অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। এই ঘটনায় লাল-মোহন বাবুর নাম এলাহাবাদের বহু উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর গোচরে আসিল। গুণগ্রাহী মিলিটারী বিভাগ এজন্য লালমোহন বাবুকে তাঁহার সাহসিকতার পুরস্কারস্বরূপ এক মেডেল পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।
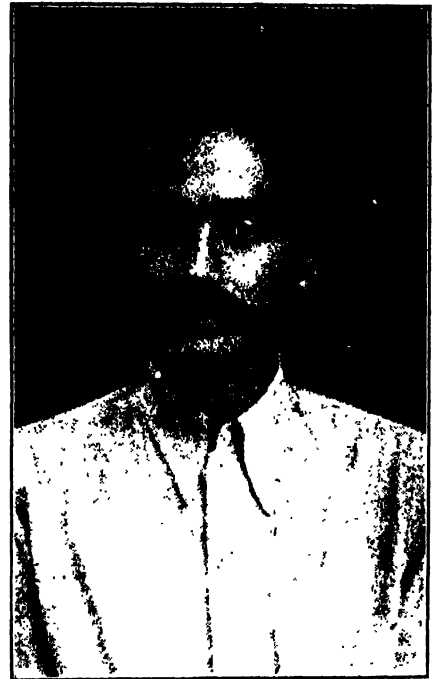
শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান বর্ষে এলাহাবাদের কুম্ভমেলা শেষ হইয়া গেল। গত পৌষমাসে এক সাধু গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নানার্থ গমন করিয়া হঠাৎ যমুনার গভীর জলে পতিত হয় এবং স্রোতে ভাসিয়া যায়। "নৌবিভাগের পুলিস" বহু চেষ্টা করিলেও ঐ সাধুকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এবার কুম্ভমেলায় অত্যধিক জনসমাগমের কল্পনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই "নৌ-পুলিসের" সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সাধুর মত কেহ স্রোতে পড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে বিভাগীয় কমিশনার

ফ্রিম্যান্‌টাল্ (S. H. Fremantle) সাহেবের অনুমোদনে মাঘমেলা কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ালেস (A. R. Wallace) সাহেব লালমোহন বাবুকে "স্পেশ্যাল রিভার-গার্ড" পদে নিযুক্ত করেন। লালমোহন বাবু ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের অন্যতম সদস্য—অধিকন্তু তিনি পরার্থ-পরতার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত। তিনি মাঘমেলার বহুপূর্ব্ব হইতেই "স্পেশ্যাল রিভার গার্ড" পদে নিযুক্ত হইয়া বেলা ৬টা হইতে ১ টা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে নিজহস্তে নৌকা চালনা করিয়া স্নানার্থীগণের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। বিগত মাঘমেলার সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে তিনি বাঁশ বা দড়ি ফেলিয়া আশ্রয় দিয়া যে কত মজ্জমান ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। এস্থলে কয়েকটির উল্লেখ করিয়া লালমোহন বাবুর কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

গত ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ তারিখে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দুস্থানী বালক গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিতে গিয়া সহসা যমুনার গভীর জলে নিপতিত হয়। বালকটি সন্তরণ জানিত না। সুতরাং বালকটি ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। এই ব্যাপার দর্শনে বালকের আত্মীয়গণ ও অপরাপর স্নানার্থী নরনারী চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বে "রিভার পুলিসের" নৌকা উপস্থিত হইল। "রিভার পুলিস" মজ্জমান বালকটির সম্মুখে বাঁশ ফেলিয়া দিলেও বালক তাহা দেখিতে না পাইয়া যমুনার গভীর তলদেশে নিমগ্ন হইয়া গেল। এমন সময়ে লালমোহন বাবু নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সমবেত লোকগণের নির্দ্দেশমত ঐ স্থানে মগ্ন হইয়া নিমজ্জিত বালকটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বালকটিকে খুঁজিয়া না পাইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিলেন। বালকের আত্মীয় ও সমবেত ব্যক্তিগণের কাতরোক্তিতে তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মগ্ন বালকটির উদ্ধারার্থ পুনরায় জলমগ্ন হইলেন। সেবারেও বালকটির কোনো সন্ধান পাইলেন না। বালকটিকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছিল—সহসা ভগবানের করুণায় তাঁহার কোমল প্রাণে বালকটির উদ্ধারের আশা জাগিয়া উঠিল—তিনি উৎসুকভাবে যমুনার নির্ম্মল জল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে অদূরে ৫।৬ হাত জলের নীচে যেন কৃষ্ণবর্ণ কি-একটা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ জলে ডুবিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন সে-ই জলমগ্ন বালক! তিনি ঐ বালককে যখন ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন, তখন বালক সংজ্ঞাহীন—নৌকা আশ্রয় করিবার মত শক্তি তাহার নাই—এজন্য লালমোহন বাবু এক হস্তে বালকটিকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ও অন্য হস্তে সন্তরণ দিয়া যমুনার অপর পারে আরাইল নামক স্থানে পৌছিলেন। লালমোহন বাবু অচেতন বালকটিকে যমুনার সৈকত-ভূমিতে শায়িত করিলেন। অবিলম্বে রিভার পুলিস ঐ সংজ্ঞাহীন বালকটিকে ডুলি করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করেন। অন্যূন চারি ঘণ্টার পরে বালকের চৈতন্য হয়। গত ৫ঠা ফেব্রুয়ারির স্থানীয় "লীডার" (Leader) পত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

Saved from Drowning : A local correspondent writes:—On the last of February a respectable Hindu lad while bathing was seen sinking in the Jumna, near the *Sangam*. The Police with their boats were promptly on the scene of occurence but none of them ventured to dive down. They, however, held out a bamboo which escaped the notice of the drowning lad and had it not been for the plucky intervention of Mr. Lal Mohan Banerjee, the expert swimmer of Allahabad, at present deputed by Mr. Fremantle as special river guard, the poor boy would not have escaped a watery grave. Mr. L. M. Banerjee dived down twice but could not trace him. All of a sudden the boy's head was seen just below the surface of water, when Mr. Banerjee caught hold of him and landed him safely on the bank. Mr. Banerjee belongs to the I. D. F., and Messrs. Fremantle and Wallace have done well in securing the service of the gallant swimmer in connection with the Mela.

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ তারিখে এক ভদ্র বাঙালী মহিলা যমুনার পরপারবর্ত্তী সোমেশ্বর মহাদেব দর্শনার্থ নৌকাযোগে গমন করিতেছিলেন। নৌকা পরপারে উত্তীর্ণ হইলে যেমন তিনি নৌকা হইতে অবতরণ করিতে যাইবেন হঠাৎ পদস্খলন হওয়াতে তিনি যমুনার গভীর জলে নিপতিত হইলেন। সেই স্থানে যমুনার স্রোতের প্রতিঘাতে নদীতীর ভগ্ন হইতেছিল। সুতরাং নিপতিত মৃত্তিকাস্তূপের সংঘাতে তথায় ভয়ানক ঘূর্ণি উৎপন্ন হইয়াছিল। রমণী সেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া গেলেন। লালমোহন বাবু গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম হইতে এই শোকাবহ ঘটনা দেখিতে পাইয়া তীরবেগে নৌচালনা করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া

সেই মজ্জমানা মহিলার উদ্ধারসাধন করিলেন। সেবা-সমিতির পক্ষ হইতে ঐ মহিলাকে পরিধেয় বস্ত্র ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কম্বল দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সুস্থ হইলে তাঁহার আত্মীয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়ের নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। রমণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমরা তাঁহার নামোল্লেখ করিতে বিরত থাকিলাম।

গত কুম্ভমেলার দিন (১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) এলাহাবাদে বিপুল জন-সমাগম হইয়াছিল। মেলার কর্ত্তৃপক্ষ যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, প্রায় ২৫ লক্ষ লোক ঐ দিন গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নানার্থ সমবেত হইয়াছিল। যাহাতে উক্ত দিবস পূর্ব্বোক্তরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে এজন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইলেও বহু ব্যক্তি গঙ্গার প্রখর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। ঐ দিন হঠাৎ গঙ্গার স্রোত-পথ কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—এবং গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের নিকট এক ঘূর্ণি উপস্থিত হয়। অত্যধিক জনতার জন্য অনেক ব্যক্তি সেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়া জলমগ্ন হইতেছিল। লালমোহন বাবু সেদিন অন্যূন ত্রিশবার জলে ডুবিয়া ১৫ জন জলনিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করেন। এতদ্ব্যতীত যে-সকল লোক গঙ্গার প্রখর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন লোককে বাঁশ বা দড়ি ফেলিয়া ধরিয়া ও আপনার নৌকায় তুলিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করেন। এ-সম্বন্ধে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারির (Leader) "লীডার" পত্রে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, M. Sc., M. B., B. S., মহাশয় লিখিয়াছেন :—

The great bathing day has smoothly passed away. The number of people actually drowned on the Amavas day cannot be ascertained with exactness. Those who were entrusted with rescuing them say that probably one old woman is missing. This is very creditable indeed; and had not the course of the Ganges changed during the night, the arrangements made by the mela authorities would have saved the hard work done by the rescuing party headed by Mr. L. M. Banerji. Mr. Banerji personally rescued no less than 60 lives. These people were carried away into deep waters of the Sangam by the strong current of the Ganges and soon became helpless. About 15 of those who were rescued by Mr. L. M. Banerji were picked up in a senseless condition and some of these were restored to life by actual artificial respiration. While I was taking my bath, I saw Mr. Banerji help these persons out of the water and in my presence he jumped out thrice from his boat and at the risk of his own life saved the three drowning sadhus one of whom was resuscitated by artificial respiration by me. Very great credit is due to Mr. Banerji, the noted swimmer of Allahabad for his courage and self-sacrifice on the Amavas Day for without his timely aid several persons would have been drowned.'

লীডারে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে—

The current at the *Sangam* was exceptionally strong and several persons were carried away by it. These were brought back by the volunteers. In this connection special mention should be made of Mr. Lal Mohan Banerjee, the well-known swimmer of Allahabad, who in co-operation with Bani Prasad, Government 'mallah,' at considerable risk to himself, rescued about 60 drowning persons.

এলাহাবাদের 'পাইওনিয়র' পত্রে লিখিত হইয়াছে—

Wednesday, 20th February.

Rescues at the Kumbh Mela.—It is understood that Mr. Lal Mohan Banerjee, of the I. D. F., and Secretary of The Horrocks, rendered good services to the pilgrims during the big festival days of the Kumbh Mela. He was instrumental in helping a large number of bathers, who got into difficulties, notably some 60 persons on the Amabasya day. Two instances, which deserve special mention, were the rescue of a Bengalee lady and a boy, both of whom got out of their depth and would have been drowned, but for Mr. Banerjee's prompt help.

লালমোহন বাবুর এই সৎসাহস ও কৃতিত্বের জন্য কমিশনার ফ্রিম্যানট্যাল (S.H. Fremantle) সাহেব তাঁহাকে গয়াপ্রসাদ লাইফ সেভিং মেডেল (Gaya Prasad Life Saving Medal) পুরস্কার দিবার জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বিলাতের হিউম্যানিটেরিয়ান সোসাইটির (Humanitarian Society) গৌরবময় মেডেল দিবার জন্য লিখিবেন।

লালমোহন বাবু এইরূপ মেডেল বা সুখ্যাতির আশায় যে এতাদৃশ মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার অন্তরে ভগবানের শুভ-আদেশের প্রেরণাই তাঁহাকে এই মহৎ কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে। এতাদৃশ উচ্চ-হৃদয় লৌকিক সাধুবাদের প্রলোভনে লালায়িত নহে। মনুষ্যত্বের হৃদয় জীবপ্রেমের মধুরমন্ত্রে দীক্ষিত। আমরা ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে লালমোহন বাবুর বিজয়-গৌরব কামনা করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব।

সন্তরণে বাঙ্গালী।

১৩২১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে "সাঁতারের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়াছিলাম যে বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত স, ক, সাধুখাঁ ৪৪০ গজ সাঁতার কাটিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ইহা অপেক্ষা অধিক দূর সাঁতারের কথা বাঙ্গালী সম্বন্ধে অল্প দিনের মধ্যে শুনা যায় নাই। সম্প্রতি এলাহাবাদে জনৈক যুবা সাঁতার সম্বন্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৩২৩ সালে বর্ষাকালে ভরা গঙ্গায় দুইজন সন্তরণনিপুণ ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত সাঁতারে প্রতিযোগিতা করেন; এবং তিনিই কেবল নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন--কর্ম্মচারীদ্বয় পারেন নাই। তিনি ইহার জন্য এক পদক পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছেন। তাঁহার এই সাঁতার অন্যূন দুই মাইল হইবে। এ বৎসর গত ভাদ্র মাসে তিনি পুনরায় এলাহাবাদ ফোর্টের কয়েক-জন সন্তরণপটু কর্ম্মচারীর সহিত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া জাহ্নবী ও যমুনার সঙ্গম উত্তীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করেন। সে সময়ে গঙ্গা ও যমুনার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে উক্ত কর্ম্মচারী-গণ বিপদের আশঙ্কা করিয়া সন্তরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই সাঁতার দেখিবার জন্য প্রায় সহস্রাধিক লোক সঙ্গম-স্থলে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা বিফলমনোরথ হইতেছে জানিয়া শ্রীযুক্ত লালমোহন একাই দুই মাইল ও দুই ফার্লং ব্যাপী উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল গঙ্গাগর্ভ উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় সন্তরণ দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতি অল্প দিনের চেষ্টাতেই তিনি এই-প্রকার সাফল্যলাভ করিয়াছেন। নদীতে শিক্ষাহেতু, কি প্রতিকূল কি অনুকূল উভয় দিকে তিনি সমান দক্ষতার সহিত সাঁতার কাটিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি-এসসি, উপাধি লাভ করিয়া আইন পাঠ করিতেছেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারি অত্রস্থ সম্ভ্রান্ত বংশের একজন যুবা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হন। পুলিশ ও মাঝিদের উদ্ধারের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত লালমোহন সেস্থানে আসিয়া পড়াতে যুবকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে আর দুই জন জলমগ্ন ব্যক্তিকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। অপর চেষ্টার দ্বারা ইহাদের উদ্ধারসাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

এই প্রকার কীর্ত্তি শুনিয়া এলাহাবাদ ডিভিসনের কমিশনর, শ্রীযুক্ত লালমোহনকে "গয়াপ্রসাদ লাইফ্-সেভিং" পদক দানের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। তিনি সত্বর ঐ পদক পুরস্কার পাইবেন। এলাহাবাদে এ বৎসর "কুম্ভ মেলার" সময়ে "স্পেশাল রিভার গার্ডের" পদে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি অবৈতনিক কার্য্য করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট একজন উপযুক্ত বাঙ্গালীকে এই-প্রকার কাজে নিযুক্ত করাতে অনেক সুফল হইয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত।

বসন্তে

এল আজি ঋতুরাণী কুঞ্জে।
তাই বুঝি ধরণীর বিপুল পুলকব্যথা—
জাগিলরে মঞ্জরী-পুঞ্জে।
এল আজি ঋতুরাণী-কুঞ্জে।
ছুটিল মধুর মৃদু সমীরণ চঞ্চল
স্পর্শি মোহন তার কাঞ্চন-অঞ্চল,
চরণ-পরশ লভি ফুটিল কুসুমদল,
অলিকুল তারি বাণী গুঞ্জে।
এল আজি ঋতুরাণী কুঞ্জে।

মৌন মেদিনী হ'ল সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত,
নবীন আবেশ ভরে দিগন্ত কম্পিত,
শুধু মঞ্জীর-ধ্বনি উঠে আজি অম্বরণি,
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু রুন্ যে।
এল আজি ঋতুরাণী কুঞ্জে।
জাগিয়াছে জগজুড়ি যদি কল-ঝঙ্কার,
ঝেড়ে ফেল হৃদি হ'তে গুরু বেদনার ভার,
ওই দেখ দেখ চেয়ে রসের সাগরে নেয়ে,
নিখিল প্রমোদ-মধু ভুঞ্জে।
এল আজি ঋতুরাণী কুঞ্জে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

বন্দী-জননীর নিবেদন

সরকারী বন্দী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এম্‌এর জননী পুত্রের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া বড়লাট বাহাদুরের নিকট একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। দরখাস্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।

১। আমার পুত্র জ্যোতিষকে দেখিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও আমার আত্মীয়েরা ইতিপূর্ব্বে দেখা করিতে পারে নাই। দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, কথায়। কার্য্যে, দেখা করিবার সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করা হইয়াছিল। বিগত ২২শে জানুয়ারি তারিখের ব্যবস্থাপক সভায়, যে-কথা আমার নিকট গোপন রাখিবার এতদিন দৃঢ় চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। জ্যোতিষের উন্মত্ততার কথা শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠি। আমার মনের শান্তিও লোপ পাইয়াছে। আমার আত্মীয়েরা পুনরায় দেখা করিবার জন্য আবেদন করে। এবার আবেদন মঞ্জুর হয়।

২। গত রবিবার ১০ই ফেব্রুয়ারি সকালে জ্যোতিষকে দেখিয়া আসা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, মিঃ এডি, (Mr. W. S. Adi) অতি-সজ্জন ব্যক্তি। প্রাতঃকালে আমার আত্মীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করে। সাহেব স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাগলা গারদে লইয়া যান। প্রায় ৮॥ টা ৯টার সময় উভয়ে পাগলা গারদে জ্যোতিষকে দেখিতে উপস্থিত হন।

৩। একটা ঘরের বারান্দায় লোহার খাটে জ্যোতিষ শায়িত রহিয়াছে। দেহ কম্বলে ঢাকা, চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, তাহাও প্রায় সব পাকিয়া গিয়াছে। মুখ চোখ বসা ও শীর্ণ। দৃষ্টি শূন্য, মধ্যে মধ্যে পলক পড়িতেছে। দেহের কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়িতেছে না। আমার আত্মীয় ও মিঃ এডি যে সেখানে তাহাকে দেখিতে গিয়াছেন তাহা বোধ নাই। তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া আমার আত্মীয় চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন "জ্যোতিষ, জ্যোতিষ, আমি তোমার মামা এসেছি, তোমাকে দেখতে এসেছি।" কোনও সাড়া নাই। আমার আত্মীয় পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "জ্যোতিষ ডাক্তারেরা বলিতেছেন তুমি পাগলের ভান করছ; আমরা তোমার কথা নিয়ে খুব লড়ালড়ি করছি।" কোনও প্রত্যুত্তর নাই, শব্দও নাই, ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত নাই। কেবল দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনই শব্দ পাওয়া যায় না। পায়ের দিক থেকে দাঁড়াইয়া, মাথার দিকে দাঁড়াইয়া, উভয় পার্শ্ব থেকে দাঁড়াইয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আমার আত্মীয় জ্যোতিষকে অনেক ঠেলাঠেলি করে, চোখের পাতা তুলিয়া ধরে, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়াছিল, চুল ধরিয়াও টানিয়াছিল; নানা প্রকারে অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া তাহার বোধশক্তি পরীক্ষা করিয়াছিল ও তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। তারপর আমার আত্মীয় মিঃ এডির দিকে ফিরিয়া বলিল, "সাহেব একে তোমরা বল পাগলের ভান করছে, এ যে পাগলের চেয়েও ভীষণ অবস্থা।" * * * *

৪। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা থাকিয়া মিঃ এডি আমার আত্মীয়কে আর কিছুক্ষণ থাকিবার অনুমতি দিয়া অন্য দিকে চলিয়া যান। তখন পাগলদের খাওয়াইবার সময় হইয়াছিল। ওয়ারডার (warder) ও অন্য একজন নিম্ন কর্ম্মচারী, কিছু কাঁচা ডিম গোলা ও কিছু দুধ লইয়া আসিল। একটা সাঁড়াশীর মত যন্ত্র, একটা লম্বা রকমের নল ও একটু ঔষধের লোসনও আনিল। * *

৫। দাঁতীলাগার মত জ্যোতিষের উভয় চোয়াল চাপিয়া বসিয়া গিয়াছে। সেই সাঁড়াশীর মত যন্ত্র দ্বারা জোর করিয়া কোনোরকমে মুখটা একটু ফাঁক করিয়া ঔষধের লোসনটা তাহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইল। ও পরে মাথাটা একটু কাত করাইয়া লোসনটা বাহির করিয়া ফেলা হইল। মুখ ধোয়ান শেষ হইলে সেই রব্যরের নলটার প্রায় এক হাত পরিমাণ তাহার নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করান হইল; তাহা দ্বারা সেই ডিম গোলা ও সেই অর্দ্ধসের পরিমাণ দুগ্ধ তাহার উদরের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইল। যখন সাঁড়াশীর দ্বারা জোর করিয়া তাহার মুখ ফাঁক করা হয়, এবং রবারের নলটা তাহার নাকের মধ্যে প্রবেশ করান হয়, ও তদ্বারা তাহার আহার্য্য খাওয়ান

হইতেছিল, তখনও জ্যোতিষের কিছুমাত্র মুখবিকৃতি দেখা যায় নাই ; কিম্বা কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক চুল মাত্রও নড়ে নাই। তখনও সেই শূন্য দৃষ্টি এক ভাবের। আমার দৃঢ় ধারণা, জ্যোতিষের বোধশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মস্তিষ্কের যে সকল সেল (cell) অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কাজ করে তাহা হয় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা কিছুকালের জন্য অসাড় হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিষের এই শেষ চিত্র দেখিবার জন্য আমি এখনও বাঁচিয়া আছি। তাহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার আত্মীয় আর স্থির থাকিতে পারে নাই, সে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

৬। আমার আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "এ রকম করিয়া কত দিন খাওয়ান হইতেছে ?" তাহাতে উত্তর পায়, "আজ ছয়মাস হইল ওঁকে এখানে আনা হইয়াছে, বরাবরই ওঁকে এই ভাবে খাওয়ান হইতেছে।" আমার আত্মীয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "এখন যে-রকম দেখিতেছি এ-রকম তোমরা কতদিন দেখিতেছ ?" "যত দিন এখানে আনা হয়েছে, উনি ঐ একই ভাবে আছেন।" তারপর আমার আত্মীয় পুনরায় জ্যোতি-ষের হাত পা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছিল, হাত বেশ খেলিতেছে, কিন্তু উভয় পা খেলিতেছে না। পা দুটো শক্ত, ধনুকের মত একটু বাঁকা, এবং জোড়-ভাবে রহিয়াছে, বোধ হয় পক্ষাঘাত হইয়াছে। সোজা করিবার চেষ্টা করাতে একজন বলিল, "পা খেলেনা আমরা বরাবরই দেখছি।"

"বাবু কি চলা ফেরা করতে পারে ?" সে উত্তর করিল "বাবু চলতে পারে না, পাও সোজা হয় নি।" আরও জানা গিয়াছিল যে জ্যোতিষের সেইভাবেই মলমূত্র ত্যাগ হয়। তারপর তাহার দাঁতের গোড়াতে একটু ঔষধ লাগাইয়া দিল। জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "দাঁতের গোড়া ফুলিয়াছে।" বোধ হয় খাওয়াইবার সময় বিছানা হইতে জ্যোতিষকে নীচে নামান হইয়া থাকে, কারণ তখন বিছানা নষ্ট হওয়াতে তাহারা নামানোর কথা বলাবলি করিতেছিল। হইতে পারে আমার আত্মীয় উপস্থিত থাকাতে তাহারা নামাইতে ভরসা করে নাই। বেলা ১০টা ১০॥০ টা পর্য্যন্ত প্রায় দেড় ঘণ্টা সেখানে উপস্থিত থাকিয়া জ্যোতিষের অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখিয়া আমার আত্মীয় চলিয়া আসে।

৭। জ্যোতিষ যে শুধু উন্মাদ হইয়াছে তাহা নহে, তাহার অবস্থা উন্মাদ অপেক্ষাও অধিক ভীষণ ও আশঙ্কা-জনক। জীবন্মৃতের মত সে গত ছয়মাস যাবত পড়িয়া আছে। বহরমপুর জেলেও তাহার অবস্থা ঐরূপ ছিল শুনিয়াছিলাম। মৃত দেহের মত তাহার দেহ জ্ঞান ও বোধশক্তি শূন্য। শুধু প্রাণ বায়ু এখনও রহিয়াছে। তাহাও আর অধিক দিন থাকিবে না। চক্ষুতে দৃষ্টি নাই, মুখে বাক্য নাই, কর্ণে শ্রবণ-শক্তি নাই, পদে চলৎ-শক্তি নাই ও দেহে স্পর্শ-শক্তি-বোধ নাই। বিচার ও স্মরণ-শক্তি'ত নাইই। জড়ের সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে তাহার নিঃশ্বাস বায়ু এখনও বহিতেছে। আমার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, অন্ধের যষ্টি জ্যোতিষ—তার আজ এই শোচনীয় পরিণাম। গত বৎসর এমন সময়, এরও কিছু আগে, সে সুস্থ শরীরে, সুস্থ মনে, আনন্দে ও শান্তিতে আমাদের সংসার প্রতিপালন করিতেছিল।

৮। জ্যোতিষের প্রকৃত অবস্থার কথা কিছুমাত্র চিফ সেক্রেটারী মিঃ কার জানেন বলিয়া মনে হয় না, জানিলে তিনি কখনও বলিতেন না "বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ (অর্থাৎ তাহার পাগলামির ভান) তাহাতে তাহাকে সর্ত্তে বা বিনা-সর্ত্তে মুক্তি দিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন।" মিঃ কারের কোনও দোষ নাই। তিনি তো স্বচক্ষে জ্যোতিষকে দেখেন নাই, তিনি যাহা রিপোর্ট পাইয়াছিলেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই নির্ম্মম উত্তর দিয়াছিলেন। নিজচক্ষে যদি দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহারও অন্তর বিগলিত হইতই হইত। জ্যোতিষের সম্বন্ধে আমার শেষ প্রার্থনা এই, মিঃ কার একবার স্বয়ং বহরমপুর গিয়া স্বচক্ষে জ্যোতিষের প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া আসুন, যে পাগলামির ভান করিতেছে কি সে নীরবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। মহামান্য লাটসাহেব বাহাদুরের নিকট আমার করজোড়ে নিবেদন, তিনিও একবার স্বয়ং গিয়া স্বচক্ষে জ্যোতিষের অবস্থা দেখিয়া যেন আসেন। আর উচ্চ নিম্ন যে সকল কর্ম্মচারী জ্যোতিষের কথা সামান্য কথা, বলিয়া উড়াইয়া দিয়া

আসিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেও একবার স্বচক্ষে তাহার অবস্থা দেখিয়া আসিতে আদেশ দেওয়া হয়। যদি তাহারা জ্যোতিষকে দেখিতে যাইতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে, কারণ জ্যোতিষের প্রাণবায়ু দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, সে আর বেশীদিন এজগতে থাকিবে না। যদি তাঁহারা জ্যোতিষের অবস্থা স্বয়ং গিয়া দেখিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, মিঃ এডিকে ন্যায় ও ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া স্বাধীনভাবে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। তিনি সহৃদয়, ন্যায়বান, ও ধার্ম্মিক, উপর হইতে যদি চাপ না দেওয়া হয় তাহা হইলে সত্যের অমর্য্যাদা তিনি কখনই করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহাও যদি অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে দেশের গণ্যমান্য ন্যায়পরায়ণ কয়েকজনকে অনুমতি দেওয়া হউক তাঁহারা স্বচক্ষে জ্যোতিষকে দেখিয়া আসুন, এবং তাহার প্রকৃত অবস্থার কথা প্রকাশ করুন।

৯। আটক-পদ্ধতি আগাগোড়া তমসাচ্ছন্ন। সে অন্ধকার ভেদ করা আমার সাধ্য নয়। তাই আমি আজ আমার দেশবাসীর নিকট জ্যোতিষের মর্ম্মান্তিক কাহিনী প্রকাশ করিতেছি। তাহাকে যখন ধৃত করা হয় তাহার দেহ সুস্থ ও মন সুস্থ ছিল। বন্দী-অবস্থায় কয়েক মাসের মধ্যে তাহার এই দারুণ অভাবনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেন, কি কারণে ইহার সদুত্তর আমরা চাই, কারণ চাহিবার আমার অধিকার আছে। মানুষের প্রাণের যেমন একটা মূল্য আছে, তেমনি তাহার জন্য একটা দায়িত্বও আছে। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই দায়ী তাহারা যাহাদের কাছে সে আবদ্ধ আছে। সহজভাবে, সহজ অবস্থায় মানুষ যেমনই থাকুক, কখনও 'জীবন্মৃত' অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। জ্যোতিষকে কিছু দিনের জন্য (প্রায় ৫৬ দিন) নির্জ্জন কারাগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, একথা স্বীকৃত হইয়াছে। আমার ঘোর সন্দেহ জ্যোতিষের উন্মত্ততা ও এই শোচনীয় অবস্থার কারণ ইহা ছাড়াও আরও ভীষণতর অন্য কিছু।

১০। বড়লাট ও ছোটলাট বাহাদুরগণের নিকট আমার কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা অবিলম্বে জ্যোতিষকে পাগলা-গারদ হইতে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে আনান হউক, আনাইয়া তাহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করান হউক এবং তাহার রোগের প্রতিকারের যাহা কিছু উপায় আছে অবলম্বন করা হউক, এবং তৎপরে তাহাদের আদেশে ও তত্ত্বাবধানে সরকারী ও বেসরকারী বিচক্ষণ ডাক্তারগণকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করা হউক, যাঁহারা জ্যোতিষের এই শোচনীয় উন্মত্ততা ও জীবন্মৃত অবস্থার নিগূঢ় কারণ-সমূহতন্ন তন্ন করিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন। আর আমার এই শেষ চরম প্রার্থনা—যদি তাঁহারা তাহা করিতে না পারেন, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার পুত্রকে আমার নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হউক, আমার কোলে মাথা রাখিয়া সে পরলোকে যাইবে, ইহাও আমার শান্তি।

১১। শেষে একটি কথা আমার দেশবাসীকে ও গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া রাখিতে চাহি। জ্যোতিষের কথা অতি গুরুতর কথা। সত্য কথা রাজাকে ও দেশের লোককে জানান উচিত মনে করি, বলিয়াই আজ তাহা জানাইলাম। কিন্তু ইহার ফলে আমি, আমার আত্মীয়স্বজন, যাঁহারা আমাকে সভয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সাহায্য করিতেছেন, বা যাঁহারা আমাকে সহানুভূতি করিয়া থাকেন, ইঁহাদের কাহারও প্রতি নিগ্রহ, দলন বা আবদ্ধ করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা না হয়।

দেশের কথা

মানুষের মতন জীবন ধারণ করিয়া সমাজে থাকিতে হইলে প্রধান আবশ্যক—অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, সদ্ভাব, স্বাধীনতা।

অন্ন ও বস্ত্র।

আমাদের দেশে এ বৎসর আশাতীত রকমে শস্য সস্তা হইলেও আমাদের অভাব ঘুচিতেছে না; দেশে এমনই টাকার অভাব যে সস্তা চাল কিনিয়া পেট ভরিয়া খাইবারও লোকের সঙ্গতি নাই। গরিব লোকে নুন ভাত খাইয়া থাকে; সেই নুনও গভর্মেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসায়, সমুদ্র-মেখলা দেশে বিদেশ হইতে নুন আমদানী করিয়া আমরা বিদেশীদের পকেট ভরাই, এখন বিদেশে সকলে যুদ্ধে ব্যাপৃত, কাজেই নুনের অভাব ঘটিয়াছে। দেশবাসীর আন্দোলনে সুফল ফলিয়াছে,

লবণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—লবণ বিভাগের কর্ম্মচারীগণ যদি দেখেন যে কেহ কেবল নিজের আহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করে তাহা হইলে তাঁহারা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন না। এরূপ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রশংসনীয়। লবণের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রয়াস পাইতেছেন। জনরব, আবশ্যক হইলে বাঁকুড়া জেলাবোর্ডও লবণ আনাইয়া নির্দ্ধারিত দরে বিক্রয় জন্য প্রয়াস পাইবেন। যাহা হউক লবণের সম্বন্ধে বেশ সুব্যবস্থা হইতেছে। এখন বস্ত্রের মূল্য সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া আলোচনা চলিতেছে। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতার জন্য আত্মহত্যার সংবাদ গবর্ণমেণ্ট অবগত আছেন কি না? তদুত্তরে অনারেবল কার সাহেব বলিয়াছেন যে এ সম্বন্ধে পুলিসের রিপোর্ট এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। হাবড়া-উলুবেড়িয়া মহকুমার এইরূপ দুইটি ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জেলার মাজিষ্ট্রেট তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন অবশ্য যথাসময়ে তাহা প্রকাশিত হইবে। —বাঁকুড়াদর্পণ

লবণের মূল্য নির্দ্ধারণ—গবর্ণমেণ্ট এই লবণাম্বু-পরিবেষ্টিত দেশের অধিবাসীদিগকে নিজ-নিজ ব্যবহারের জন্য লবণ তৈয়ারী করিবার অধিকার প্রদান করিয়া জনসাধারণের অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন দোকানদারেরা যাহাতে অধিক মূল্যে লবণ বিক্রয় করিতে না পারে, সে জন্য লবণের একটা দরও নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিয়াছেন, যে, বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সী ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমস্ত স্থানে খুচরা /১৫ পয়সা সেরের অধিক মূল্যে এবং ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগে খুচরা ৵০ আনা সেরের অধিক মূল্যে লবণ বিক্রয় করিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট আরও আদেশ দিয়াছেন যে, সালকিয়া ও চট্টগ্রামের গোলা হইতে ১০০ মণ লিভারপুল লবণ ২৪৮৲ টাকায়, স্পেলিস ২৪৩৲, পোর্টসৈয়দ ২৪০৲, মাসোয়া ২৪০৲, এডেন ২৪০৲, ইণ্ডোএডেন ২৩৯৲ টাকায় বিক্রয় করা হইবে।

গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ প্রচারিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কর্ম্মতৎপর সবডিবিজনাল অফিসার মহাশয় কাঁথি মহকুমার লবণ ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়াছেন যে, কেহই লবণের সের /১৫ পয়সার অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে না। সুতরাং এতদঞ্চলের হাট বাজার সমূহে এখন নুনের সের খুচরা /১৫ পয়সা হিসাবে বিক্রীত হইতে থাকিবে। —নীহার

দেশের অবস্থা এমন হইয়াছে যে বস্ত্রের অভাবে লোককে আত্মহত্যা করিতে হইতেছে। এখানেও সেই টাকারই অভাব। আমাদের দেশের লোকের এখন নির্ভর জমীর উপর; মাটি চষিয়া যে ফসল হয় তাহাই বেচিয়া আমাদের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সমস্ত-কিছুর ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে হয়; এক মাটির উপর এমন জুলুম আর কোনো দেশে নাই—আর তবু যদি মাটি সার পাইত, উন্নত প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা থাকিত। কৃষির উন্নতি আর নব নব শিল্পের প্রবর্ত্তন না করিলে দেশের অর্থাভাব ঘুচিবে না। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম—

মেদিনীপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্প্রতি এই জেলার কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইয়াছেন অবগত হইয়া আমরা প্রীতিলাভ করিলাম। সেদিন এই সোসাইটির ডাইরেক্টরগণের এক সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলার কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে এই সোসাইটী বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়ের দ্বারা বিবিধ উৎকৃষ্ট বীজ আনাইয়া পল্লীগ্রামের কৃষকদের মধ্যে ঐ সমুদয় বীজ বিতরণ করিবেন। সোসাইটির এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহাদের এই চেষ্টার ফলে জেলার কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইলে সুখের বিষয় হইবে। —নীহার।

জ্যোতি একটি নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তনের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

বেণ্ট উডের পরিবর্ত্তে বাঁশ।—জনৈক ইংরাজ লেখক "ক্যাপিটাল" পত্রে লিখিয়াছেন, আদ্রিয়াতিক সাগরের দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় ইউরোপ হইতে বেণ্ট উডের দ্রব্যজাত এদেশে আসিতে পারিতেছে না। এদেশে বেণ্ট উডের দ্রব্যজাতের ব্যবহার যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং বর্ত্তমানে তাহা যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তাহার একটা বিস্তৃত ব্যবসা এখানে অনায়াসে চলিতে পারে। বেণ্ট উড প্রস্তুতের কলকারখানা আমেরিকায় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত এদেশের বাঁশ ও বেত দ্বারাও বেণ্ট উডের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। জাপানবাসীরা তাহাদের গৃহের যাবতীয় সরঞ্জাম পত্র বাঁশ হইতেই প্রস্তুত করিয়া থাকে। সেসব দ্রব্যজাত তাহারা এইক্ষণ ভারতে আসিয়াও বিক্রয় করিতেছে এবং যথেষ্ট লাভ করিতেছে। ভারতের লোকেরা কেন নিজের দেশের বাঁশ ও বেত দ্বারা সেই সব দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতেছে না? জাপানের অনুকরণে অষ্ট্রেলিয়ায় বেতকে শাদা করিবার এক প্রকার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই শাদা বেত ভারতে আনিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। ভারতের লোকেরা নিজের দেশের বাঁশ ও বেত হইতে কেন সেরূপ সুন্দর সুন্দর গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে না? শীতকালে যখন বাঁশ ও বেতের রস শুকাইয়া যায় তখন সেগুলি কাটিয়া সেঁকিয়া রং করিলে দু'পুরুষেও তাহাতে ঘুণ ধরে না। বিভিন্ন রকমের বাঁশ ও বেতের জন্য চট্টগ্রামই ভারতে প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রামের উদ্যমশীল সঙ্গতিশালী কেহ কি এদিকে মনোযোগ দিবেন? —জ্যোতি।

বাঙালীর ডালভাতের পরেই প্রধান খাদ্য ঘি দুধ। কিন্তু তাহা যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি ভেজাল হইয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে যশোহরের রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এবং মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী মহাশয় এবং সহরস্থ কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের উদ্যোগে ৫০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া যশোহরে একটী ডেয়ারী ফারম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, শীঘ্রই কোম্পানী আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী হইবে।

এই ফারম লাভজনক হইলে মফঃস্বলেও অনেক ফারম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ফলে একদিকে দেশে বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ঘৃত, মাখমের অভাব দূর হইবে, অন্যদিকে দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা লাভজনক ব্যবসার দ্বার উন্মুক্ত হইবে। —যশোহর।

এইরূপে আমাদের চেষ্টা ও বুদ্ধিকে নানাদিকে নিযুক্ত করিতে হইবে। সকল কাজকে সহজ করিয়া তুলিবার

চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা এইরূপ উদ্যমের একটি নমুনা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি—

কলের নৌকা।—সহযোগী "যশোহর" লিখিয়াছেন,—"যশোহর সহরের অনতিদূরে কনোজপুর নিবাসী বাবু গঙ্গাচরণ মজুমদার বহু যত্ন চেষ্টায় এবং অর্থব্যয়ে একখানি কলের নৌকা প্রস্তুত করিয়া যশোহর সহরস্থ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণকে দেখাইবার জন্য যশোহর নদীবক্ষে আনিয়া অনেককে তাঁহার নৌকাখানি দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার উৎসাহ উদ্যম এবং নৌকার কল-কৌশলগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই কলের নৌকার কল-কৌশল এবং পরিচালন প্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই কলগুলি একটু উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া নৌকার সহিত সংযুক্ত হইলে নৌকাগুলি অতীব দ্রুতগতিতে চলিতে পারে, এমন কি ঘণ্টায় ১০—১২ মাইল দ্রুতবেগে চালাইয়া লইয়া যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

—সম্মিলনী।

স্বাস্থ্য।

পেটে যথেষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য জুটিলে মানুষের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে, দেহ বলশালী ও কর্মিষ্ঠ হয়, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে। অন্নাভাবে দেশের দুর্ব্বল লোকদের রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে; দেশের ধনীরা গ্রাম ত্যাগ করাতে পল্লীর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। দেশে উপযুক্ত চিকিৎসকেরও অত্যন্ত অভাব; আবার চিকিৎসক থাকিলেও অর্থাভাবে সকলে চিকিৎসিত হইতে পারে না। দেশের স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীতে পল্লীতে চিকিৎসক ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে যশোহরের সুসন্তান রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহোদয় তাঁহার স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যশোহর জেলা বোর্ডের হস্তে ৯৫০০৲ টাকা প্রদান করিতেছেন। এই টাকা লইয়া জেলাবোর্ড একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পরিচালন ব্যবস্থা করিবেন। রায় সাহেব ঘোষ মহাশয় বহুদিন যশের সহিত শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই দেশহিতকর কার্য্য শিক্ষা-বিভাগের লোকের পক্ষে বিশেষ শোভন হইয়াছে। যিনি দেশের শিক্ষিত শিক্ষক, তাঁহার পক্ষে এরূপ আদর্শ কার্য্যই অবশ্য করনীয়। আমরা সেজন্য রায় সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দেশের শিক্ষিত সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা যদি এরূপ দেশহিতকর কার্য্যে অর্থদান করেন, তবেই তাঁহার শিক্ষার দেশ লাভবান হয় এবং অর্থের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। —যশোহর।

যশোহর একটি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জেলা, এ জেলার পল্লীবাসীরা অনেক সময় ম্যালেরিয়া এবং কলেরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু পল্লীগ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসক না থাকায় পরন্তু দরিদ্র পল্লীবাসীরা সহর হইতে সুচিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসিত হইতে পারে না, ফলে অনেককে বিনা চিকিৎসায় অথবা হাতুড়ে চিকিৎসকগণের কু-চিকিৎসায় পঞ্চত্ব লাভ করিতে হয়। যশোহর জেলাবোর্ড পল্লীবাসীগণের এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। জেলাবোর্ড মাসিক ৩৫৲ টাকা সাহায্য দিয়া নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে কয়েকজন ডাক্তার বসাইতেছেন, ইঁহারা পল্লীবাসীগণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশাদি দিবেন এবং যথ সম্ভব সুলভে পল্লীবাসীগণের চিকিৎসা করিবেন। নিতান্ত দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিবেন। এই নিয়মে যাহাতে যশোহরের সমস্ত পল্লীবাসী চিকিৎসকের সহায়তা লাভ করিতে পারে ক্রমে-ক্রমে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে, আপাততঃ যে সকল স্থানে ডাক্তার দেওয়া হইল আমরা সে সকল স্থানের নাম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

সদর মহকুমার অন্তর্গত:—

১। নন্দবিলা ২। বসুন্দিয়া ৩। বাঘারপাড়া।

মাগুরা মহকুমা।

৪। মহম্মদপুর ৫। ছান্দড়া।

বনগ্রাম মহকুমা।

৬। বগুড়া।

নড়াইল মহকুমা।

৭। আলফাডাঙ্গা।

ঝিনাইদহ।

৮। কালীগঞ্জ ৯। সাধুহাটী।

জেলাবোর্ড-কর্তৃপক্ষ দরিদ্র পল্লীবাসীগণের রক্ষা কল্পে বিশেষভাবে যত্ন লইতেছেন সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। —যশোহর।

জ্ঞান।

দেশে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিলে অস্বাস্থ্য দারিদ্র্য অভাব সঙ্কীর্ণতা কুসংস্কার অনেক পরিমাণে দূর হইয়া যায়। জ্ঞানবিস্তারের প্রধান উপায় শিক্ষার বিস্তার। সকল সভ্য দেশে এইজন্য গভর্মেণ্ট সকল প্রজাকে বিদ্যালাভ করিতে বাধ্য করেন। আমাদের দেশেও দেশবাসীর আন্তরিক ইচ্ছায়

গবর্ণমেণ্ট নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে কি না তাহা নিরূপণের জন্য মিঃ ওয়েষ্টকে নিযুক্ত করিয়াছেন। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া একান্ত আবশ্যক তাহা এই কার্য্য দ্বারাই প্রতীয়মান হইতেছে। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে তাহা সর্ব্বত্র বাধ্যতামূলকই করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সহরে মিউনিসিপালিটির এলাকায় মাত্র করিলে কোন ফল হইবে না, কারণ সহরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, সেখানে সহরের অধিকাংশ লোকদিগেরই পড়িবার সুবিধা আছে। দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহেই এই সুবিধা নাই। সেজন্য যে সমস্ত গ্রামের এক মাইলের মধ্যে কোনও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নাই, তাহাতে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। এই বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার স্থানীয় পঞ্চায়তী ইউনিয়নের উপর প্রদান করা যাইতে পারে। যাহারা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় অথবা অন্য কোন প্রকার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে—তদ্ব্যতীত অন্য সমস্তকে আইন করিয়া স্কুলে পড়িতে বাধ্য করা উচিত। বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধেও বাধ্যতামূলক নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। নিজ নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া বালিকাগণ যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলে স্ত্রীশিক্ষা

বিষয়েও বাধ্যতামূলক নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। কিন্তু এখন গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে ব্যাপৃত, এই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ অর্থাভাব ঘটিতে পারে।

নিম্নপ্রাইমেরী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইলে ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতে হয়। কারণ এমন অনেক দরিদ্র আছে যাহারা নিয়মিতরূপে মাসিক বেতন দিয়া স্কুলে আপনাদিগের সন্তানগণকে পড়াইতে অক্ষম। অনেকে পাঠ্য পুস্তকও ক্রয় করিতে পারে না। নিম্ন প্রাইমেরী স্কুল প্রতি গ্রামে গ্রামে স্থাপন করিলে গড়ে প্রতি স্কুলে যে ছাত্র সংখ্যা হইবে তাহা বোধ হয় পড়াইতে ৪।৫ জন শিক্ষকের প্রয়োজন হইতে পারে। এই অল্প কয়েকজন শিক্ষকের ব্যয় নির্ব্বাহ বোধ হয় তত অসাধ্য না হইতেও পারে। এখন গ্রামের চৌকীদারগণের বেতন দেওয়ার জন্য যেরূপ কর আদায় হয় সেইরূপ শিক্ষা-করও সেই চৌকীদারি করের সঙ্গে একই নিয়মে আদায় করা যাইতে পারে। যদি শিক্ষা-কর স্থাপন করিলে লোকের উপর করভার গুরুতর হয় তবে চৌকিদারদিগের সংখ্যা হ্রাস করিয়া চৌকিদারি কর হ্রাস করিলে বোধ হয় শিক্ষা-কর প্রদান করিতে ক্লেশকর হইবে না। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এখন শিক্ষার জন্য যাহা ব্যয় করেন তাহাও এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রাইভেট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে এখন যে সাহায্য প্রদান করেন তাহা কমাইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রদান করিতে পারেন। এখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংখ্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট উঁহাদিগের সাহায্য কমাইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদান করিলে বোধ হয় উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের কোনও অনিষ্ট হইবে না। এইরূপে উপরোক্ত প্রণালীসমূহ দ্বারা যে-অর্থ সংগ্রহ হইবে তাহাতেও যদি ব্যয় নির্ব্বাহ না হয়, তবে অতিরিক্ত টাকা গবর্ণমেণ্ট কোন দ্রব্যের উপর কর স্থাপন দ্বারা সংগ্রহ করিতে পারেন। এই প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিলে গবর্ণমেণ্ট এখন যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিব্রত থাকিলেও প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থাভাব ঘটিবে না।　　　　—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির সৎকার্য্য—মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি অবৈতনিক নিম্ন শিক্ষা দান প্রথা প্রচলনের অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালায় এই প্রথম। এই জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমরা আশা করি বাঙ্গালার প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া দেশবাসীর হিতসাধনে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবেন। আমরা আশা করি সত্বরই মেদিনীপুরে ইহার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। ইহার জন্য কি কর বসাইতে হইবে?　　　　—মেদিনীপুর হিতৈষী।

যশোহর মিউনিসিপ্যালিটি বাধ্যতামূলক নিম্ন শিক্ষা বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। যথাসময়ে সহরে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচারার্থ পাঠশালাসমূহ স্থাপিত হইবে।　　　　—যশোহর।

খুলনার মিউনিসিপালিটি ট্যাক্স আদায় করিবার এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে।—

খুলনায় নূতন ট্যাক্স।—সহযোগী 'খুলনা' বলেন তত্রত্য স্কুল-সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ যাহারা সাবান মাখে ও চুল আঁচড়ায় তাহাদের উপর মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে।

অর্থাৎ কিনা ছেলেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চাহিলে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে হইবে।

নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষারও যেমন দরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষারও তেমনি দরকার। ইহার সাহায্যের খবর এমাসে আমরা এইরূপ পাইয়াছি—

কালীশচন্দ্র একাডেমি—গত ৭ই জানুয়ারি তারিখে স্থানীয় প্রসিদ্ধ বিবির পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ভাড়াটিয়া ঘরে "কালীশচন্দ্র একাডেমি" নামে একটি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। মহাত্মা কালীশচন্দ্র ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত থাকিয়া জীবনে বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য এই নব বিদ্যালয়ের নাম কালীশচন্দ্র একাডেমি রাখা হইয়াছে। এই বিদ্যালয় দ্বারা বরিশাল সহরের দক্ষিণ পাড়াসমূহের ছাত্রদিগের অধ্যয়নের সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।　　　　—কাশীপুর নিবাসী।

সৎকার্য্য।—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম থানার অধীন জামবণী ষ্টেটের রাজা শ্রীজগদীশচন্দ্র দেও ধবল দেব বি-এ বাহাদুর কুমারের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাচীন চিল্কীগড় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে জানুয়ারি মাস হইতে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন; এবং ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।—

এডুকেশন গেজেট।

নূতন হাই স্কুল—আমাদের মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত কঁকড়াহাটিতে তথাকার কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ভদ্রলোকের উদ্যমে সম্প্রতি একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় ভদ্রলোকগণের বিদ্যালয়টির প্রতি বিশেষ যত্ন ও আন্তরিক অনুরাগ রহিয়াছে। আমরা এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

—নীহার।

বিদ্যালয়।—রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার নিজগ্রাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত শেখরনগরে সম্প্রতি একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দেশে কেবলমাত্র লেখাপড়া শিক্ষার প্রসার হইলেই চলিবে না; সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ শিল্প শিক্ষারও ব্যবস্থা করা দরকার। এইদিকে একটি চেষ্টার সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।—

যশোহর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এবং মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে, ডিঃ বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটীর সাহায্যে যশোহরে একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে আপাততঃ সার্ভে বা জরিপের কার্য্য, ড্রইং, সূত্রধরের কার্য্য, কর্ম্মকারের কার্য্য এবং টেলারিং বা পোষাক প্রস্তুতের কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষের যত্ন চেষ্টায় এবং জেলাবাসীর সহায়তায় শীঘ্রই এই বিদ্যালয়ে সাবওভারসিয়ারী পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং এই বিদ্যালয়ের দ্বারা জেলাবাসীর যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে। আমরা উদ্যোক্তাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।　—যশোহর।

অন্যান্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেরও এদিকে দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সদ্ভাব।

শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তৃত হইলে মানুষ অনেক পরিমাণে স্বার্থত্যাগ ও পরার্থকে সম্মান করিতে পারে, সঙ্কীর্ণতা ও

কুসংস্কার পরিহার করিতে পারে ; শিক্ষায় ও জ্ঞানে উন্নত হইলে মানুষ অপরের নিকট হইতে সম্মান পায়। দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতেছে তার পরিচয় আমরা পাইতেছি। মান্দ্রাজের অস্পৃশ্য জাতি চেরুমারা শহরের রাস্তা দিয়া হাঁটিতে পায় না ; তারা আত্মমর্য্যাদায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জোর করিয়া হাঁটিয়াছিল বলিয়া উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া সনাতনপন্থী 'এডুকেশন গেজেট' বলিয়াছেন—

উত্তর ভারতে এ ভাব অচিন্ত্যনীয়। ডোম মুদ্দাফরাশকেও ছুরি ভোজনের দিন উঠানে বসাইয়া খাওয়ান হয়। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অসহনীয় ঔপনিবেশিক গর্ব্ব ত্যাগ করুন। নেটালের এবং ট্রান্সভালের ভাব বড়ই অশোভন।

—এডুকেশন গেজেট।

গোঁড়া লোকেও বুঝিতেছে আমি আমার দেশের লোককে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ যবন বলিয়া ঘৃণা করি, কিন্তু আমি নিজে ইংরেজের শ্রেষ্ঠতাভিমানের কাছে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য ছাড়া কিছু নই—ইংরেজের উপনিবেশে ভারতবাসীর পা দিয়া মাটি ছুঁইবার অধিকার নাই। তাদের কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব সমান।

ভারতবর্ষে আর্য্যরা আসিয়া দেশের লোককে অনার্য্য দস্যু দাস অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিত ; এখন আর্য্যরক্ত আমাদের ধমনীতে হোমিওপ্যাথী ঔষধের দশলক্ষ ডাইলিউশানের মতন থিওরীতে আছে, তথাপি আমরা বিজেতার গর্ব্ব ত্যাগ করি নাই। তারপর যখন বিদেশ বাহির হইতে ভিন্ন ধর্ম্মের ও ভিন্ন আচারের লোকেরা আমাদের বারবার জয় করিয়া পদানত করিতে লাগিল তখন আমরা পরাজয়ের গ্লানি ভুলিবার জন্য ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য তাদের ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিলাম। কিন্তু এখন সেই ঘৃণার ভাব ত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। ভারতবর্ষে এখন প্রধানত চার ধর্ম্মসম্প্রদায়—হিন্দু (বৌদ্ধ ও জৈন ইহারই অন্তর্গত), পার্সী, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান। পার্সী, মুসলমান, ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম ভারতের বাহিরে জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের আচার অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন ; সেই অমিল হইতে মনের অমিল হওয়া প্রতিবেশীর উপযুক্ত নয়। এক হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যেই বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ভেদে আচার অনুষ্ঠানের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় ; পশ্চিমের ও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুর সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান মেলে না। সুতরাং আচার অনুষ্ঠানে না মিলিলেও হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান পার্সী যে একই দেশের প্রতিবাসী তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সদ্ভাবে দেশহিতে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। আমরা এই সদ্ভাবের দুটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাস্তবিক আনন্দিত হইয়াছি।—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, যশোহরের মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর মহোদয়ের জেলা বোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হওয়া উপলক্ষে একটি প্রীতিসম্মিলনের আয়োজন হইতেছে ; দেশের লোক কোন উচ্চপদে আসীন হইলে দেশবাসী হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে যে আনন্দানুভব করে ইহা তাহারই পরিচায়ক। ইহা দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে যে, এ দেশবাসী জাতি, বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই দেশে দেশবাসীর প্রাধান্য কামনা করিতেছে। দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতি নাই, বর্ণ নাই, এখানে স্বদেশ জননীর মঙ্গল পূজা মন্দিরে সকলেই পূজক ও সেবকরূপে জননী জন্মভূমির মঙ্গল বাসনা হৃদয়ে লইয়া অর্ঘ্য, পুষ্পাঞ্জলী হস্তে দণ্ডায়মান। —যশোহর

চেয়ারম্যানের সম্মান :—গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার স্থানীয় টাউনহল গৃহে যশোহরের মুসলমান সম্প্রদায় জেলাবোর্ডের নবনির্ব্বাচিত বেসরকারী চেয়ারম্যান রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরকে এক সান্ধ্য সম্মিলনে অভ্যর্থিত করেন।

যশোহর জজ কোর্টের উকিল মৌলবী মুজিদ বক্স এবং একজন স্কুল সব ইনস্পেক্টর বেসরকারী, বিশেষতঃ আপনাদিগেরই সুখ দুঃখে সমান অংশভাগী, একজন জেলাবাসীকে চেয়ারম্যান স্বরূপে পাওয়ায় দেশবাসীর লাভের ও আশা ভরসার কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

যাহাতে মুসলমান সমাজের উপকার হয়, এমন কিছু করিবার জন্য কেহ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর বলেন, "যে দেশে হিন্দু মুসলমান একই পুকুরের জল পান করে, একই দোকানের ডাল চাউল খায়, একই ক্ষেত্রের শস্যে জীবন ধারণ করে, সে-দেশে হিন্দু মুসলমানের স্বতন্ত্র উপকার অনুপকার কি থাকিতে পারে, তাহা আমি বুঝি না। যাহাতে যাহাতে হিন্দুর উপকার, তাহাতে মুসলমানেরও উপকার ; আর যাহাতে মুসলমানের অপকার, তাহাতে হিন্দুরও অপকার।" বাস্তবিকই হাত, পা, দাঁত, জিহ্বা প্রভৃতি ধর্ম্মঘট করিয়া যদি পরিপাক-যন্ত্রকে এই অজুহাতে একঘরে করে,—তাহাকে অন্ন জল না দেয়, তাহা হইলে পরিণাম কি দাঁড়ায় ? ভারতে হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ কি ঠিক সেইরূপ নয় ?

আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য, আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার যত অপবাদ তাহার অধিকাংশই অশিক্ষিতেরা অদৃষ্ট এবং শিক্ষিতেরা গবর্ণমেণ্টের উপর চাপাইয়া দিয়া দায়মুক্ত হই। বিজিত এবং বিধর্ম্মি অধ্যুসিত দেশের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের ত্রুটী বিচ্যুতি সম্বন্ধে সমালোচনা করার পূর্ব্বে সাধারণ গৃহস্থ প্রজার এ কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে আমার পুকুরের পানা বা কানাচের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য খোদাতালা কান্তে কোদাল হাতে করিয়া আসিবেন না, আর জমীদার তালুকদারেরও এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যাহাদের রক্ত-কণিকার

বিনিময়ে তাঁহারা অট্টালিকা এমারত ফাঁদিয়া, গাড়ী মটর হাঁকাইয়া চলেন, সেই গরীব প্রজাদের প্রতিও তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। তাহাদের সুপেয় জলের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদের রাস্তা ঘাট অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাহাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখা ত তাঁহাদেরই সনাতন ধর্ম্ম। আমার দেশের প্রতি আমারই যখন ধর্ম্মবুদ্ধি বিচলিত, তখন বিদেশী বিধর্ম্মী গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করা নির্লজ্জতার পরিচায়ক নয় কি?

—যশোহর।

সকলে জ্ঞাত আছেন চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল খাঁন সাহেব বাখরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে গত ২রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের গৃহপ্রাঙ্গণে এক বিরাট সম্মিলনীর আয়োজন করা হইয়াছিল, তথায় সর্ব্বশ্রেণীর উচ্চপদস্থ প্রায় ৪০০ সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।

—বরিশাল-হিতৈষী।

সান্ধ্য সম্মিলন—বরিশাল ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল খাঁ ১ম বাঙ্গালী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এজন্য গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অত্রত্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের বাস-প্রাঙ্গণে এক সান্ধ্যসমিতিতে হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বহু ভদ্রলোক আগমন করিয়াছিলেন।

যাঁহার জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আদর অভ্যর্থনায় এবং ব্যয়সাধ্য ভোজে নানা শ্রেণীর লোক সন্তুষ্ট, ভগবান-প্রদত্ত তাঁহার এই সম্মানে সকলেই উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বজাতিবৎসল খানবাহাদুর মৌলবী হেতায়েত উদ্দীন আহাম্মদ বি, এল, পূর্ব্ব হইতেই ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য্যে পদ-গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি, আর-একজন উদার-হৃদয় মুসলমান জমিদার চৌধুরী সাহেব, সর্ব্বোপরি এই সভার কর্ণধার হইলেন। এইক্ষণ খান বাহাদুরের কার্য্যভার আরও অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ। চৌধুরী সাহেব ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের আইন-সভার সদস্য পদে থাকিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জনহিতকর কার্য্যও প্রশংসনীয়।

—কাশীপুরনিবাসী।

এই যে মুসলমান যোগ্য লোকের দায়িত্বপূর্ণ প্রধান পদে নিয়োগে হিন্দুর আনন্দ ও হিন্দুর নিয়োগে মুসলমানের আনন্দ ইহাই প্রকৃত দেশানুরাগ; জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যোগ্য লোককে কর্ণধার করিতে হইবে, তবেই জাতীয় জীবনের তরণী সকল তুফান উত্তীর্ণ হইয়া চলিতে পারিবে। লাটসাহেবদের 'ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রদায়গত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা' এইজন্য আমাদের কাছে সমীচীন বোধ হয় না। সম্প্রদায়ভেদে আত্মীয়তা ও সদ্ভাব বৃদ্ধির অন্তরায় ঘটে।

গরিবেরা নানা প্রকমে ধনীদের সেবা ও সাহায্য করিয়া থাকে, এ কথা ধনীদের মনে রাখিয়া তাদের সাহায্যের বিনিময়ে সাহায্য করা উচিত। সেই সাহায্যকে দয়া নাম দিয়া অগৌরব করা উচিত নয়, তাহা প্রতিদান মনে করিয়া সম্মানের সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা পারিবারিক বৈষয়িক ও সামাজিক সম্পর্কের লোকেদের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাবের কয়েকটি সংবাদ পাইয়া প্রীত হইয়াছি—

সৌভ্রাত্র—মেদিনীপুর জজ আদালতের সেরিস্তাদার বাবু রজোবিহারী বসু মহোদয়ের আদর্শ ভ্রাতৃভাব দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তিনি তাঁহার সমুদায় পৈত্রিক সম্পত্তি অন্য দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিভাগ করিয়া দিয়া বণ্টননামা রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছেন। পিতৃভক্তির চিহ্নস্বরূপ তাঁহার বাটী-সংলগ্ন পিতার নামিত শ্রীকৃষ্ণ বাজার নামক ক্ষুদ্র স্থানটি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা জানি বাবু রজোবিহারী বসু মহাশয়ের পিতা ৺শ্রীকৃষ্ণ বসু মহাশয় কোন কারণে কনিষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার সম্পত্তি বিচ্যুত করিয়া জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রকেই বিষয়ের অধিকারী স্বরূপ উইল করিয়া যান। রজোবিহারী বাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতার সদাচরণে মুগ্ধ হইয়া আপনি কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কেই সমুদায় বণ্টন করিয়া দিয়া এই ঘোর স্বার্থপরতার যুগে এক আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

কলেক্টরের মহানুভবতা—মেদিনীপুরের মহানুভব কলেক্টর মিঃ ডবলি, এ, মার মহোদয়ের অসীম দয়ার কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। নয়াবসান ওয়ার্ডস এষ্টেটের রামচন্দ্র দাস ও রুদ্রনারায়ণ দাস নামক দুইজন মুহুরী তহবিল তছরূপাতের অপরাধে অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত হয়। তাহাদের কাগজপত্র আনীত হইয়া প্রায় বৎসরাধিককাল তাহা কলেক্টর মহোদয়ের নিকট পড়িয়া থাকে। এই-ভাবে কর্ম্মচ্যুত হইয়া মুহুরীদ্বয় অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে ইহা কলেক্টর মহোদয়ের গোচরীভূত হইলে তিনি মুহুরীদ্বয়কে ডাকিয়া পাঠান। তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলেন "আমার দোষেই তোমরা কষ্ট পাইয়াছ অদ্য তোমরা ২৫৬ টাকা তোমাদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ লইয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার আপন তহবিল হইতে তাহা প্রদান করেন। এমন মহানুভাব দুর্লভ!

মেদিনীপুর হিতৈষী।

গত ২৯শে পৌষ রবিবার পৌষ সংক্রান্তির দিন স্থানীয় খ্যাতনামা মোক্তার স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয়ের পত্নী প্রায় ৬০০ শত কাঙ্গালীকে বস্ত্রদান করিয়াছিলেন। এই দান অক্ষয় বাবুর স্বর্গীয়া মাতা "ব্রহ্মময়ীর দান" নামে খ্যাত। ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতি সংক্রান্তিতে এইরূপ দরিদ্রনারায়ণগণের সেবা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এ বৎসর বস্ত্র যেরূপ মহার্ঘ হইয়াছে এই সময়ে ইঁহার বস্ত্রদানে দরিদ্রনারায়ণগণের বিশেষ উপকার হইয়াছে ভগবান এইরূপ সৎকার্য্যেই ইহার মতি রাখুন।

—মেদিনীবান্ধব

ছাত্রদের সদনুষ্ঠান—কাঁথি মডেল ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্রবৃন্দ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নিজেদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থ বৃথা আমোদ প্রমোদে ব্যয় না করিয়া গত শনিবার দিন তদ্দ্বারা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন ব্যঞ্জনাদির দ্বারা পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়াছে। ছাত্রেরা নিজেরাই পরিবেশনাদি কার্য্য অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিল। স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক এবং এই বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ গুচ্ছাইত বি-এ, প্রমুখ কয়েকজন সদুৎসাহী শিক্ষক ভোজন স্থলে উপস্থিত থাকিয়া বালকদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। দীন কাঙ্গালদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত হইয়াছিল। কিশোরনগরের জমীদার শ্রীযুক্ত রাজা রমাপতি মিত্র মহাশয় এই রন্ধন কার্য্যে পাচক প্রদান করিয়া বালকদের সাহায্য করিয়াছিলেন।

—নীহার।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর প্রতি:—শ্রীযুক্ত মাখনলাল দত্ত মহাশয় তাঁহার স্বশ্রেণীর দুইজন মফঃস্বলের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার কয়েক দিন আহার ও বাসের স্থান দিতে ইচ্ছুক আছেন। যাঁহারা তাঁহার স্বজাতি তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

—স্বরাজ।

স্বাধীনতা।

এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দেশে শিক্ষা জ্ঞান স্বাস্থ্য সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে আমরা স্বাধীনতা লাভের ততই উপযুক্ত হইতে থাকিব। আমাদের শাস্ত্রের সমাজের কুসংস্কারের জমিদারের মহাজনের পরাধীনতা পরিহার করিয়া স্বরাট হইয়া পূর্ণ স্বাধীন মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল

[নক্সা]

(স্বরে—অ!)

ডেপুটি দেবীপ্রসাদ বাবু অত্যন্ত রাশভারি জবরদস্ত হাকিম। আইনে তাঁহার সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচারকার্য্যেও তিনি সুকঠোর ন্যায়পরায়ণ লোক। পার্থিব জগতে হাকিমী কার্য্যে নিয়োগ করিবেন বলিয়াই যেন প্রকৃতি দেবী তাঁহার সুদীর্ঘ আকৃতিটি সযত্নে কালো বার্ণিশে মাজিয়া উপযুক্তরূপে ঝকঝকে চকচকে করিয়া চুনীয়ায় পয়দা করিয়াছিলেন। এক গেলাসের সুহৃদ্বর্গ বলিত, তিনি অমায়িকচিত্ত খোলা-প্রাণ মানুষ। প্রতিবেশী ও অধীনস্থ জনগণ বলিত, তাঁহার মুখের বাঘা-হাসিটুকু বড় ভয়ানক বস্তু!—মাথাটি খাইয়া, সর্ব্বনাশটি সাধিয়া, তবেই সেই হাসির মনোরম চমৎকারিতা ডেপুটিবাবুর মুখে সুপরিস্ফুট হয়।

আদালতে ডেপুটিবাবুর অসীম প্রতাপ; কিন্তু গার্হস্থ্য-জীবনের সঙ্কীর্ণ আয়তনে, সে প্রতাপের প্রভাবটা অত্যন্তই সঙ্কোচ-খর্ব্ব! কারণ গৃহলক্ষ্মী 'মহোদয়া 'ভারে-বাড়া' জবরদস্ত মানুষ। ডেপুটিবাবু মুন্সেফের পুত্র, কিন্তু গৃহিণী উকীলের কন্যা; সুতরাং বিবেচনা-শক্তিতে যাহাই হউন, বলিবার শক্তিটা তাঁহার অসাধারণ! বাড়ীর কর্ত্তা হইতে চাকর-বাকর সকলেই তাঁহাকে সমীহা করিয়া চলিত।

শক্তি-সাধকের "কারণ" বা পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত "স্বাস্থ্যপান" ব্যাপারটিতে সপারিষদ ডেপুটি বাবুর প্রগাঢ় অনুরক্তি। কিন্তু এ অনুরাগের অবশ্যম্ভাবী ফল—বীভৎস কাণ্ডকারখানার ঝঞ্ঝাট পোহাইয়া, ডেপুটি-গৃহিণীর মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এ বিষয়ে তিনি নিদারুণ খড়গহস্তা ছিলেন। কিন্তু আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। যাহাই হউক সুখের বিষয় যে ডেপুটিবাবুর কিঞ্চিৎ চক্ষুলজ্জা ছিল, সেইজন্য আত্মীয়-সমাজে কেলেঙ্কারী প্রকাশ হইবার ভয়ে তিনি উকীল-কন্যাকে কিছু খাতির করিয়া চলিতেন।—অর্থাৎ নিরীহ ভালমানুষ সাজিয়া লুকাইয়া মদ খাইতেন, তারপর মাতলামি-টা অবশ্য প্রকাশ্যে হইত এবং নেশা ছুটিয়া সুস্থ হইলে স্ত্রীর নিকট যেরূপ সসম্মান অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইতেন, তাহা অবর্ণনীয়!—মর্ম্মান্তিক মনস্তাপে কখনও বা নিজের কান মলিয়া শপথ করিয়া বসিতেন, এবং পরের শনিবারে অন্তরঙ্গ সুহৃদ্বর্গকে পোলাও-কালিয়ার নামে সাড়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন,—কলিকাতা হইতে ফরমাসী-পোষাক আনাইবার অছিলায়, প্যাক করা কাঠের বাক্সে প্রচুর পরিমাণে রাঙা জলের বোতল আনাইয়া, মহোল্লাসে বন্ধুগণকে স্বাস্থ্যপান করাইতেন! শেষে অনেক রাত্রে নেশা জমিবার পর বন্ধুগণ যখন আহারে বসিয়া—বা শুইয়া, মদিরালস কণ্ঠে যথেচ্ছ আনন্দে হো-হা শব্দে চীৎকার করিয়া কালিয়ার আলু চট্‌কাইয়া মাথায় মাখিত ও পোলাওয়ের পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পরস্পরের আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত,—তখন অন্তরালে গৃহলক্ষ্মীর অন্তরটা অনাচারের ভয়ে অত্যন্তই অস্থির-চঞ্চল হইয়া উঠিত! বন্ধু-বর্গের নিরঙ্কুশ কৌতুক-আনন্দে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বন্ধুবৎসল মুন্সেফবাবু প্রীতিভোজের মাঝখান হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া, হঠাৎ এক সময় সামনের আঁস্তাকুড়ে, "ড্যাং গড়াগড়ি" যাইতেন এবং সহানুভূতি-প্রবণ চৈতা সহৃদয় বন্ধুগণ, পরম ঔদার্য্যের নিদর্শন দেখাইয়া মিত্রোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইতে গিয়া, আবর্জ্জনাপূর্ণ আঁস্তাকুড়ের ক্লেদ-পঙ্কিল পিছল পথে পা পিছলাইয়া,—ধড়াধ্বড় আছাড় খাইয়া,

সুহৃদ্বরের সাযুজ্য, সালোক্য, ও স্বারূপ্য লাভে ধন্য হইতেন! অন্তরালে ডিপুটি-গৃহিণীর বক্রকুটিল ললাট-রেখা তীব্র কঠিন হইয়া উঠিত, তাঁহার তৎকালিন মানসিক অবস্থাটা আজিও কোন মনোবিজ্ঞানবিদ্ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, সুতরাং আমরাও এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে সাহসী নহি!

পরদিন, রবিবারের ছুটির আনন্দ আরামটা ডেপুটি-বাবু পরিপূর্ণরূপে বিমল তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেন। সোমবারে তাঁহার মেজাজের রুক্ষতায় আদালতে সেরেস্তা-দার হইতে আর্দ্দালীরা পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়া থাকিত, সেদিন এজলাসে উপস্থিত মামলাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইত!

(স্বরে—আ!)

ইতিমধ্যে ডেপুটিবাবুর বিশ্বস্ত আর্দ্দালী কৃপারাম পাঁড়ে গিন্নিমা'র নিকট ধমক-চমক খাইয়া, প্যাক্-করা পোষাকের বাক্সটার গুপ্ত রহস্য একদিন উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিয়াছে! সঙ্গে-সঙ্গে মদ্যগুলি সবই গৃহিণী ঠাকুরাণীর গহনার সিন্দুকে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে! মদের অভাবে সে শনিবারের আমোদটা সাজ্ঘাতিকরূপে "মাটী" হইয়া গেল! ডেপুটিবাবু চটিয়া খুন!—তাহার পরই হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' বলিয়া, তিনি এক বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলিলেন! প্রত্যেক শনিবারে, ও পর্ব্বোপলক্ষে আদালত বন্ধ হইলে, বন্ধুবর্গকে লইয়া তিনি বাগান-বাড়ীতে হাজিরা দিতে লাগিলেন; বে-দরদে পয়সা উড়াইতে লাগিলেন। ডেপুটিবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ হইয়াছিল, সন্তানাদি হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না; কাজেই উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে, কে তাঁহার ক্লেশার্জ্জিত সম্পদ ভোগ করিবে ভাবিয়া, সদ্বিবেচক ডেপুটিবাবু অগত্যা নিজেই তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উড়াইয়া, উপভোগ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

গৃহ-সংসারের কাজে বিষম বিশৃঙ্খলা বাধিল! ডেপুটি-গৃহিণী বিশ্বস্তর মূর্ত্তি ধরিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ডেপুটিবাবুর উচ্ছৃঙ্খলতা-বিকার সংশোধনের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

(হ্রস্ব—ই!)

সে শনিবারে আদালত হইতে ফিরিতে, ডেপুটিবাবুর একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া পোষাক ছাড়িয়া, জল খাইয়া, গোটাকতক সরকারী কাগজে তাড়াতাড়ি সহি করিয়া দিতেছিলেন। বাহিরে সহিস-কোচম্যান গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, ডেপুটিবাবুকে লইয়া এখনই বাগান-বাড়ী যাইতে হইবে।

বাহিরের সদররাস্তার উপর হইতে, ইন্‌চার্জ্জ ডেপুটি রাধাশ্যামবাবু ডাকিলেন, "দেবীবাবু, এখনো বাড়ীতে বসে কেন?"

অর্দ্ধ-সমাপ্ত সহিকরা কাগজ ফেলিয়া, ডেপুটিবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, এই যে যাই!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একগাছি ছোট রুল হাতে করিয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গে দুয়ার বন্ধ করিয়া, শিকল আঁটিয়া, সশব্দে চাবিকুলুপ লাগাইয়া চক্ষের নিমিষে চাবিটা জানলা গলাইয়া বাহিরের বারাণ্ডায় ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "নতুন-ঝি, যাও চাবিটা মোনসোববাবুর স্ত্রীর কাছে রেখে এস, রাত্রি আটটার পর তিনি যখন বেড়াতে আসবেন, তখন এটা আনতে বোলো..."

'নতুন-ঝি' উক্ত মুন্সেফপত্নীর বাপের বাড়ীর দেশের মানুষ, মুন্সেফপত্নীই তাহাকে এখানে চাকরী করিতে ঢুকাইয়া দিয়াছেন, দিন পনের মাত্র সে এখানে বাহাল হইয়াছে। ডেপুটিবাবু যে তাহার সামনে কোন-কিছু বলিতে পারিবেন না, তাহা গৃহিণী নিশ্চয় জানিতেন; সুতরাং নিরুদ্বিগ্নভাবে উল-কার্পেট পাড়িয়া ডেপুটিবাবুর জন্য জুতা বুনিতে বসিলেন। ঝি গুম্ গুম্ শব্দে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া ডেপুটিবাবু বলিলেন "ব্যাপার কি?"

ব্যাপার কি তাহা যে ডেপুটিবাবু খুব ভালরূপেই বুঝিয়াছেন তাহাতে গৃহিণীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সুতরাং উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক বোধে, নিশ্চিন্তমুখে নীরবে কার্পেটের ঘর গুনিতে লাগিলেন।

নিষ্ফল আক্রোশে ঘরময় লাফালাফি ছুটাছুটি করিয়া,

কাঁচের ফুলদানি, গ্লাশকেশ, আয়না ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, টেবিলের জিনিসপত্র টান মারিয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া, ডেপুটিবাবু বিপর্য্যয় উৎপাত বাধাইয়া তুলিলেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী শান্ত-অবিচল-মুখে বসিয়া বসিয়া সমস্ত দেখিলেন, কিছু বলিলেন না।

উপরের ঘরে ডেপুটিবাবুর চীৎকার, গর্জ্জন, বকাবকি শুনিয়া রাধাশ্যামবাবু গতিক ভাল নহে বুঝিয়া নিঃশব্দে রাস্তা হইতে চম্পট দিলেন। ডাকাডাকি করিয়া তাহার সাড়া না পাওয়ায় ডেপুটিবাবু ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করিয়া, বিকট ভঙ্গিতে মুখ খিঁচাইয়া, প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে চেয়ারের বেত ছিঁড়িয়া, লাথি মারিয়া পোষাকের আলনাটা উল্টাইয়া ফেলিয়া, চীৎকার করিয়া ডেপুটিবাবু বলিলেন "কার হুকুমে, মুন্সেফ-বাবুর স্ত্রীর কাছে চাবি পাঠালে!"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া ডেপুটি-গৃহিণী শান্তস্বরে বলিলেন "মাতলামি কোর না—"

ঘুষি পাকাইয়া উন্মাদ হুঙ্কারে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তোমার বড় বাড়্‌ হয়েছে, যা খুসি তাই করছ, জানো তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেল্‌ব, রক্তারক্তি কর্‌ব, খুন কর্‌ব!"—

কার্পেট ফেলিয়া, কোলের উপর হইতে রুলটা তুলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া, ডেপুটি-গৃহিণী ধীরভাবে বলিলেন, "যা পারো কর, কিন্তু মাতালকে জব্দ করতে আমিও জানি! আমি তোমার মাথাও ভাঙ্গব না, রক্তারক্তিও করব না, খুনও করব না, কিন্তু এই রুল ছুড়ে তোমার পায়ের গোছে এমন মারব, যে, পনেরো দিন যেন বিছানা ছেড়ে না উঠতে পার! তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে খবর দেব, যে, আমার স্বামী মদ খেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করছিল বলে, আমি নিজেই তার পা ভেঙ্গে শয্যাশায়ী করে রেখেছি, এতে আদালতের কার্য্যক্ষতির জন্য, মাতাল ডেপুটির যা দণ্ড হওয়া উচিত হোক,—আর আমারও......"

হতবুদ্ধি ডেপুটিবাবু অবসন্ন দেহে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। ডেপুটি-গৃহিণী পুনশ্চ কার্পেট সেলায়ে মনোযোগী হইলেন। সেদিন বাগানবাড়ীতে বন্ধুগণ আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন!

(দীর্ঘ—ঈ!)

পরের শনিবারে ডেপুটিবাবু আদালত হইতে বাহির হইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া সরাসর বাগান-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কোচম্যানকে বলিয়া দিলেন, "আজ রাত্রে তিনি বাড়ী ফিরিবেন না, সে গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাউক।"

সহিস কোচম্যান বাড়ী ফিরিয়া বিন্দুদাসীর মারফৎ অন্তঃপুরে সুসংবাদ পাঠাইয়া দিল।

এদিকে ডেপুটি-গৃহিণীও বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলেন, যে, ডেপুটিবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণের সকলেই আজ রাত্রে গরহাজির থাকিবেন। কারণ ডেপুটিবাবুর বাগান-বাড়ীতে আজ নাকি মহা মহোৎসব হইবে। শহরের সুপ্রসিদ্ধা চারিজন নর্ত্তকী আজ সেখানে মজুরা করিতে যাইবে। আজ সারারাত্রি সেখানে নাচ গান ও পানের স্রোত চলিবে।

গৃহিণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলেন। তারপর বাহিরে বলিয়া পাঠাইলেন, "কোচম্যান গাড়ী লইয়া পুনশ্চ বাগান-বাড়ী গিয়া সত্বর বাবুকে লইয়া আসুক, কারণ তাঁহার পেটে কলিক ব্যথা ধরিয়াছে, অতএব বাবুর এখনই আসা চাই... .."

ঘণ্টা তিন পরে কোচম্যান ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আসিতে পারিবেন না, কারণ শহরের বড় বড় লোক সবাই আজ সেখানে সমবেত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের একা (?) ফেলিয়া চলিয়া আসাটা অত্যন্ত অভদ্রতা হয়, সেজন্য বাবু বলিয়া দিলেন যে পরিচিত ডাক্তার ভাদুড়ী মহাশয়কে ডাকিয়া রোগপ্রতীকারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাইতে......ইত্যাদি।"

যোগ্য কর্ত্তব্যটা গৃহিণী পূর্ব্বাহ্ণেই ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন; বাহিরে বলিয়া পাঠাইলেন, "কোচম্যানকে ঘোড়া খুলতে বারণ কর, আমি ঐ গাড়ীতে এখনি বাগানে যাব!"

নূতন ঝি নিজের গালে চড় মারিয়া বলিল, "ওমা কি ঘেন্নার কথা......"

গৃহিণী এক ধমকে তাহাকে থ করিয়া দিলেন। মাথায় বাঘাগুরবা বসাইলে কে ভিজা-বিড়াল সাজিয়া তাহা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিবে? স্বামী যখন আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান হারাইয়া ইতর আমোদে মত্ত হইয়াছেন, তখন স্ত্রী

কাহার সম্মানের ভয়ে শঙ্কিত থাকিবে? মাতালের স্ত্রীকে মাতাল স্বামীর উপযুক্তই দজ্জাল হইতে হইবে, নচেৎ তাহার সহধর্ম্মিত্ব বজায় থাকিবে কি করিয়া? এবং সংসার-ধর্ম্মই বা একাত্মা না হইলে টিকিবে কিরূপে?

এ-সকল যুক্তির উপর তর্ক চালাইবার ক্ষমতা ঝিয়ের ছিল না, সে শঙ্কিতভাবে নীরবই রহিল।

বুড়া দ্বারবানটা গৃহিণীর বাপের বাড়ীর পুরান আমলের বিশ্বাসী লোক। গৃহিণীর হুকুম শুনিয়া সে মাথা চাপড়াইয়া বলিল, "হায়রে বাপ, দিদিমণি এ কা বোলে হো! জামাই-বাকু আজ হাম্‌কো মারডালেগা!......"

নূতন-ঝিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া গৃহিণী বলিলেন, "দরওয়ানজি এস, গাড়ীর পিছনে ওঠো—"

দ্বারবান হাত জোড় করিয়া অনুনয়-কাতরকণ্ঠে ব্যাপারটার অযৌক্তিকতা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। গৃহিণী তীব্রস্বরে বলিলেন, "তুমি থাম, লাঠি বাগিয়ে গাড়ীতে চুপচাপ বসে থাক,—আমার হুকুম—"

দ্বারবান সভয়ে বলিল, "মগর্ জামাই-বাবুকো হাম মু' দেখানে নেই সেকেঙ্গে—"

গৃহিণী বলিলেন, "না পার নেই-নেই, বাগানে ঢুকে গাড়ীর কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেক—"

গাড়ী আসিয়া বাগানবাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। কোচম্যান দাসীর আদেশমত বাগানের দ্বারবানকে কর্ত্তার কাছে পাঠাইল। কর্ত্তা শুনিলেন, "বাড়ীর গৃহিণীর অসুখ দেখিয়া ডাক্তার বাবু এখানে আসিয়াছেন—বিশেষ জরুরি কোন কথা বলিয়া যাইতে চাহেন।"

সেই সবে-মাত্র গান ও পান সুরু হইতেছে, কর্ত্তা স-টাট্‌কা ছিলেন, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন। গাড়ীর দ্বার খুলিয়া "গুড্ ইভনিং ডক্টর" বলিয়া হাত বাড়াইয়া, সহসা ভিতরে দৃষ্টি পড়িতেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন "এ কি?—"

গৃহিণী তাঁহার হাতটা শক্তজোরে চাপিয়া ধরিলেন, অবশ্য আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ শুভরাত্রি ঘোষণার করমর্দ্দনের জন্য নহে, গাড়ীতে টানিয়া তুলিবার জন্যই!—কর্ত্তা হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে ভয়-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিলেন, "কি সাহস! কি সাহস! মেয়েমানুষের এত সাহস! ওঃ, অবাক করলে!..."

গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গাড়ীতে ওঠো, বাড়ী যেতে হবে।"

কর্ত্তা আকুল হইয়া বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ! বাগানে উকীল মোনসোব, ডেপুটিরা সবাই এসেছেন,—এ কি কেলেঙ্কারী করতে এলে, আমার জ্যান্ত মুখটা পুড়িয়ে দেবে?"

গৃহিণী ততোধিক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আগুন জেলেছ, বাতাস দিয়েছ, নিজে মুখ বাড়িয়েছ, না হলে আমার ক্ষমতার কি এত কুলোয়? এখন ভাল চাও ত বাড়ী চল—"

মুখ কাঁচুমাঁচু করিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "ভদ্রলোকরা সবাই রয়েছেন, কি বল্‌ব ওঁদের কাছে? দোহাই তোমার, বাড়ী ফিরে যাও—"

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া গৃহিণী বলিলেন, "মাত্‌লামি করবার লোভে যাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তারা ত খুব ভদ্দর!—তুমি মানের কান্না রাখ,—ওঠো বলছি গাড়ীতে—"

প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া, মরীয়া-ভাবে কর্ত্তা বলিলেন "আমি যেতে পারব না—"

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যেতে পারবে না? বেশ চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি,—"

কর্ত্তা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ কর কি? কর কি? পাগল হলে না কি?—"

গৃহিণী বলিলেন "মাতালের স্ত্রীর পক্ষে পাগল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক!—"

গাড়ীর ও-পাশের দ্বার খুলিয়া গৃহিণী ডাকিলেন, "দরওয়ানজি—"

সামনে আসিয়া, লাঠি ঘাড়ে দ্বারবান মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া বলিল "হুজুর—"

গৃহিণী তর্জ্জনী উচাইয়া বলিলেন, "তুমি, আমার বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ, হুঁসিয়ার হয়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে চোলো, মাতালের আড্ডায় যেতে হচ্ছে, সাবধান থেকো,—হুকুম দিয়ে রাখ্‌ছি, যাহাতক বেয়াদবি দেখবে, বে-দরদে লাঠি

চালিও, তারপর মামলাবাজীর ঠেলা সাম্লাবে তোমার ডিপুটি মনীব! বলে রাখ্‌ছি, লাট সাহেবের নাতিই হোক্‌, নাৎজামাই-ই হোক্‌, কারুর খাতির কোরো না—চলো ঐ নাচের মজ্‌লিশে—!"

সভয়ে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর—আমার ঝকমারি হয়েছে,—পাঁচ-মিনিট সময় দাও, ওঁদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে আসি—"

একটু ভাবিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা যাও, দশ মিনিটের মধ্যে না ফেরো ত আমিও ঝিকে আর দরওয়ানকে নিয়ে বরাবর তোমাদের মজলিশে গিয়ে হাজির হব, মনে রেখো—"

ত্রাহি মধুসূদন জপিতে জপিতে ডেপুটিবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন, তারপর পাঁচ মিনিট পার হইতে না-হইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুনশ্চ আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী সবেগে ছুটিয়া চলিল।

পরদিনই ভাড়া চুকাইয়া ডেপুটিবাবু বাগান-বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধুবিচ্ছেদের বিপুল বেদনা সহিয়া সুরা সেবা পরিত্যাগ করিলেন। জীবনে আর তাহা স্পর্শ করেন নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি গৃহিণীর সুশাসন-মাহাত্ম্যে আজকাল ডেপুটিবাবুর গৃহে শান্তিদেবী স্থির-প্রতিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

"প্রথম পত্র"

হয়নিকো তাতে রসের সৃষ্টি,
ভাষার ছিল না চমক তত,
অক্ষরগুলি বাম হতে ক্রমে
দক্ষিণে আসি হয়েছে নত।
কলা কৌশল ছিল না তেমন,
গোষ্ঠীর শুধু খবরে ভরা,
"সেবীকা" "দুগ্‌গা" 'মেয়া' ও 'খেমা'
নূতন নূতন বানান-করা।
তবুও কেমন মলয়-পবন
মৃদু সন্তোষ আনিল টানি'—
বিরহ-ব্যথিতে সান্ত্বনা সে যে
প্রিয়ার প্রথম পত্রখানি।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

মৃত্যুভয় ও পাপের শাস্তি।

অসৎকার্য্য করিলে ইহজীবনে ও মৃত্যুর পরে শাস্তি পাইতে হইবে, এই ভয়ে অনেকে অসাধুতা হইতে নিবৃত্ত থাকে। ইহা প্রকৃত সাত্ত্বিকতা না হইলেও ইহা দ্বারাও জগতের কল্যাণ হয়। ভয়ে যে পাপ করে না, তাহার জীবন কতকটা ভাল থাকে, এবং তাহার দ্বারা অপরের অনিষ্ট হয় না।

শ্রেয়ের প্রতি অনুরাগ-বশতঃ যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল থাকে ও যাঁহার কার্য্য জগতের পক্ষে কল্যাণকর হয়, তিনিই প্রকৃত সাধুপদবাচ্য।

ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভয়।

শ্রেয়ের প্রতি অনুরাগ-বশতঃ যে-জাতির চিত্ত নির্ম্মল ও অপর জাতির সহিত ব্যবহারে জাতীয় আচরণ অনিন্দ্য,—এরূপ কোন একটি জাতি এখনও দেখা যায় নাই। জাতীয় সম্পত্তি ও প্রভুত্ব বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে, ইতিহাসে দেখা গিয়াছে এপর্য্যন্ত সবজাতিই অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। এরূপ কাজ করিতে গেলে অন্য প্রবল জাতির সহিত বিরোধ বাধিয়া পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকিলে তবে তাহারা অসাধু আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে।

সকল-প্রকার ক্ষতি, উপহাস, বিদ্রূপ, উৎপীড়ন, অত্যাচার, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া, শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ পুরুষ ও নারী পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দেখা গিয়াছে। কিন্তু এরূপ একটিও জাতি এপর্য্যন্তও দেখা যায় নাই, এরূপ উচ্চ আদর্শ কোন জাতি অবলম্বন করিতে পারে নাই। ব্যক্তি যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, জাতি ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। রুশিয়া এইরূপ আদর্শকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিতে না পারিলেও, ইহাকে যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, তাহা জানিয়াও সুখ হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল যে, রুশীয়েরা জার্মেনীর প্রস্তাবিত সন্ধিসর্ত্ত-সকলে সম্মত হইতে পারে নাই, কারণ তাহা হইলে জার্মেনীকর্ত্তৃক অনেক পরদেশ-দখলে সম্মতি দিতে হয়, এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও শ্রমজীবীর উপর অত্যাচার হয়। অন্য দিকে, রুশীয়েরা বলে, অধিকাংশ জার্মেন ও অষ্ট্রীয় আমাদেরই

মত কৃষক ; তাহাদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করিব না।” কিন্তু জার্মেনীর জুলুমে রুশীয়েরা অপমানকর ও অন্যায় বহু সন্ধি-সর্ত্তে মত দিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহাও রুশিয়ার সকলের অনুমোদিত নহে। এইজন্য খুব গোলযোগ চলিতেছে।

অনেক মানুষ যেমন মৃত্যুভয়ে ও মৃত্যুর পর শাস্তির ভয়ে অপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে, তেমনি যদি একএকটা জাতিরও মৃত্যু হইবার এবং মরণান্তে শাস্তি পাইবার ভয় থাকিত, তাহা হইলে অনেক অন্তর্জাতিক দস্যুতা, নরহত্যা ও প্রতারণা নিবারিত হইত।

কিন্তু একএকটা জাতির মৃত্যু ঘটিতে পারে,—তাহা যে কারণেই হউক,—এরূপ বিশ্বাস জাতিসকলের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। জাতীয় অপকার্য্যের জন্য জাতীয়-বিনাশ ঘটিতে পারে, এরূপ বিশ্বাসও জাতিসাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। অথচ, কারণ যাহাই হউক, জাতীয় অস্তিত্ব লোপের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নহে। আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত যে কয়েক কোটি লোক ছিল, তাহারা কয়েক হাজারে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের একএকটা জাতি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডেও এইরূপ ঘটিয়াছে। এই-সব জাতি সাধারণতঃ অসভ্য ছিল, এবং প্রবলের সংঘর্ষে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশের ইঙ্কারা অসভ্য ছিল না; তাহারা বিনাশ পাইয়াছে, তাহারাও ইউরোপীয়দের দ্বারা নিহত হইয়াছে।

এসিয়ার সভ্য আক্কাডীয়, কাল্‌ডীয়, আসীরীয়, ও বাবিলোনীয় জাতিদের এখন কেহ অবশিষ্ট নাই ; তাহাদের ভাষাও লুপ্ত হইয়াছে। যে ফিনিকীয়রা এক সময়ে রোমানদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল, যাহাদের বাণিজ্যতরী ও যুদ্ধজাহাজ তৎকালে অতুলনীয় ছিল, এবং যাহাদের কার্থেজ প্রভৃতি নগর সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় ছিল, তাহারা এখন কোথায়? প্রাচীন ইট্রুস্কানদিগের সভ্যতার পরিচয় তাহাদের কারুকার্য্যের ভগ্নাবশেষে পাওয়া যায়। তাহারা এখন কোথায়? প্রাচীন মিসরীয়দের নিকট প্রতীচ্য ও প্রাচ্য নানা জাতি সভ্যতার নানা ক্ষেত্রে ঋণী। কিন্তু তাহাদের, ভাষা ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে ; জাতীয় অস্তিত্বও তাহাদের আর নাই। আমরা ভারতবর্ষে বাস করি, এবং প্রাচীনকালে শাক্য, লিচ্ছবি, প্রভৃতি কত জাতি ভারতবর্ষে বাস করিত। বর্ত্তমান ভারতবাসীরা যে প্রাচীন ভারতবাসীদের সঙ্গে রক্তসম্পর্কে সম্বদ্ধ ; ব্যাস, বাল্মীকি, মহাবীর, বুদ্ধ, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, কালিদাস, প্রভৃতি এবং তাঁহাদের সমসাময়িকগণ যে বর্ত্তমান ভারতবাসীদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ; তাহার অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া কঠিন। কারণ, সেকালও একালের মধ্যে কত বিদেশীর আক্রমণ ও ভারতে বসবাস স্থাপন, কত বিপ্লব, কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে।

জাতীয় মৃত্যু ও বিনাশ যে ঘটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য কারণের মধ্যে জাতীয় অকর্ম্মণ্যতা ও জাতীয় পাপের জন্যও যে জাতীয় অস্তিত্ব লোপ পায়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিশ্বাস সহজে প্রবল হয় না। তাহার একটা কারণ এই, যে, একএকজন মানুষের মৃত্যু যে ৬০, ৭০, কিম্বা ১০০, ১৫০, বৎসরে হইবেই হইবে, তাহা আমরা প্রত্যেকে দেখিতেছি ; মানুষের পরমায়ুর একটা সীমা আছে। কিন্তু জাতির এরূপ নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু নাই ; কোন জাতি ২০০, ৫০০ কিম্বা ১০০০, ২০০০ বৎসর বা চিরকাল বাঁচিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই, এবং কোন জাতি এই আজ মরিল ও তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ইহাও আমরা দেখিতেছি না। এইজন্য জাতীয়-মৃত্যুর সম্ভাবনায় মানুষের তেমন বিশ্বাস নাই। কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ, তাহা অনেক সময় প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও ধ্রুবসত্য।

বিলাতে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণ।

সমগ্র ভারতের কংগ্রেস-কমিটি স্থির করিয়াছেন, যে, এখন স্বরাজলাভার্থ আন্দোলন করিবার জন্য বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ অনাবশ্যক। ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব বিলাতে ফিরিয়া গেলে অন্যান্য ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতবর্ষের লোকদিগকে প্রথমে কতটুকু আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হইবে, তাহা প্রকাশ করিবেন। তাহার পর ভারতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। তাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা না-করার কথা নির্দ্ধারিত হইবে। সমগ্র ভারতের কংগ্রেস-কমিটির এই নির্দ্ধারণ সমীচীন হইয়াছে আমরা মনে করি না। ভারতবর্ষের

শত্রুরা আমাদের সম্বন্ধে বিলাতে নানা মিথ্যা ও অর্দ্ধমিথ্যা কথার রটনা করিতেছে। বিলাতে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দ্বারা এবং বিলাতী খবরের কাগজে লিখিয়া এই-সকল অলীক কথার অসত্যতা ইংরেজদিগকে জানান উচিত। কারণ, আজকাল না হউক, অন্ততঃ ভবিষ্যতেও, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আমাদের ভালমন্দ করিবার যতটুকু হাত আছে, তাহা ব্রিটিশ জাতির মতের উপর নির্ভর করিবে। এখানকার রাজপুরুষ ও আমলাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মণ্টেগু যাহা স্থির করিয়া যাইতেছেন, ব্রিটিশ মন্ত্রীরা তাহাতেই যে সায় দিবেন, তাহা নয়। তাঁহাদেরও কিছু বলিবার থাকিবে। এইজন্য, বিলাতে আন্দোলন করিলে মন্ত্রীরা সাক্ষাৎভাবে কিছু জানিতে পারিবেন, এবং ব্রিটিশ জাতির মত আমাদের প্রতিনিধিরা কতকটা গঠন করিতে পারিলে, সেই মতও ব্রিটিশ মন্ত্রীদের মতকে পরোক্ষভাবে গঠিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। তাহার পর ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার নির্দ্ধারণও চূড়ান্ত নহে; পার্লেমেন্টে শেষ নির্দ্ধারণ হইবে। এখন হইতে বিলাতে আন্দোলন করিলে পার্লেমেন্টের সভ্যেরা আমাদের কথা জানিয়া নিজ নিজ মত গঠন করিবার যথেষ্ট অবসর পাইবেন। ইতিমধ্যেই একজন ভারতবাসী শ্রীযুক্ত জোসেফ বাপ্‌টিষ্টার চেষ্টায় বিলাতের শ্রমজীবীদল ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের দুইটি কনফারেন্সে ভারতবাসীদের স্বরাজলাভের অনুকূলে প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, এবং পার্লেমেন্টে তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে ভারতবর্ষের পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

সুখের বিষয়, হোমরুললীগ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধির শীঘ্রই বিলাত পৌঁছিবার কথা,—অবশ্য যদি তাঁহারা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইবার পাসপোর্ট বা অনুমতি পান। ভারতশাসনের মূলবিধি ঠিক্ যে ভাবে প্রণীত হইলে আমাদের উপকার ও জগতের কল্যাণ হইতে পারে, আমাদের প্রতিনিধিরা তাহা ইংরেজ জাতিকে বুঝাইবেন। বঙ্গে না হউক, বোম্বাই মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে কয়েকজন উপযুক্ত লোককে পাঠাইবার ও তাঁহাদিগকে বিলাতে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতে সমর্থ করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা চাই, কেহ যেন সেখানে গিয়া ভিক্ষুকের মত কাঁদুনি না গান, অথবা, অন্যদিকে, ভুয়ো জাতি-উৎপাদক কথাও না বলেন। তথ্যমূলক ও সুযুক্তিপূর্ণ এমন সত্য কথা বলিতে হইবে যাহাতে বিলাতের লোকে বুঝিতে পারে যে ভারতের কল্যাণ ব্যতীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণ নাই, জগতেরও কল্যাণ নাই। অন্য সব জাতির মত ইংরেজ জাতিরও ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। আমাদের কল্যাণ যতটুকু ইংরেজদের উপর নির্ভর করে, তাহা তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি না জাগিলে সাধিত হইবে না।

ইংরেজদের বুঝা উচিত, যে, যে দাস রাখিতে চায়, বা মুরুব্বি থাকিতে চায়, সে নিজেও মানুষ হইতে পারে না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাহচর্য্যের দ্বারা ভ্রাতৃত্বের পথেই পাওয়া যায়,—প্রভুত্বের দ্বারা নয়, দাসত্বের দ্বারা নয়, মুরুব্বিয়ানার দ্বারাও নয়।

আমাদেরও আচরণ দ্বারা দেখান উচিত, যে, আমরা যেমন দাসত্ব করিব না, ও অনুগ্রহ চাই না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তেমনি অন্যকেও দাস করিতে বা অনুগ্রহজীবী রাখিতে চাই না।

ভারতবর্ষবাসীরা দরিদ্র হইলেও তাহাদের দেশ কামধেনু। ইহার অধিবাসীরা যদি ইহা দোহন করিবার অধিকারী হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক হয়। আর যদি ইংরেজ ইহাকে নিজের ধেনু করিয়া রাখিতে চান, তাহা হইলে চিরকাল ইহাই অন্য প্রবল বিদেশী জাতি-সকলকে তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত করিবে, ও এই ঈর্ষ্যা যুদ্ধের কারণ হইবে। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, যুযুৎসু-জাতিরা ভাবিবে, যে, আমাদের জন্মভূমি অন্যের ধেনু হওয়ায় আমরা অসন্তুষ্ট এবং তজ্জন্য যে-কেহ ইংরেজকে পরাস্ত করিতে চাহিবে আমরা তাহার সহায় হইব; যেমন, শুনিতে পাই, জার্ম্মেনরা ভাবিয়াছিল, এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

ধর্ম্মতঃ যেরূপ ব্যবস্থা ঠিক্ তাহা ইংরেজকে বুঝাইয়া বলিতে কোন অপমান নাই। তাহাতে কোন ফল না হইলে, তখন যে-কেহ ইচ্ছা করেন, ইংরেজকে বলিতে পারেন, "যদি তোমরা আমার কথা না শোন, আমিও তোমাদের কথা শুনিব না; তোমাদের শক্তি আছে, তোমরা শাস্তি

দিতে পার, আমি তাহার প্রতিশোধ না দিয়া তাহা সহ্য করিব বটে, কিন্তু তথাপি তোমাদের কথা শুনিব না।" এরূপ অবস্থা না ঘটিলেই ভাল। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে ইংরেজরা একান্ত অবুঝ কিম্বা স্বার্থান্ধ হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীদের জুজুর ভয় ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে এবং তাহারা দলে দলে অন্যায়-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়া ভারতবর্ষকে বৃহৎ জেলে ও ইংরেজকে জেলদারোগা ও পাহারাওয়ালায় পরিণত করিতে পারে।

চম্পারন জেলায় নীলকর ইংরেজদের অন্যায় বন্দোবস্তে দুর্দ্দশাগ্রস্ত রায়তদের সাহায্য করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধি ও তাঁহার সহচরেরা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভয় ভাঙ্গার কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি গুজরাটে কায়রা জেলার দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে গুজরাটসভার নেতাদের দৃঢ় ব্যবহারেও কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

কায়রা জেলায় দুর্ভিক্ষ।

গুজরাটের কায়রা জেলায় দুর্ভিক্ষ হওয়ায় গুজরাটসভা গবর্ণমেণ্টকে খাজনা মাফ করিতে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীরা রায়ৎদিগকে খাজনার জন্য পীড়াপীড়ি করায় অনেকে চাষের বলদ আদি বেচিয়া খাজনা দিতে আরম্ভ করে। গুজরাটসভা তাহাদিগকে বলেন, আমরা গবর্ণমেণ্টকে যে অনুরোধ করিয়াছি, তাহার উত্তর না আসা পর্য্যন্ত তোমরা খাজনা দিতে ক্ষান্ত থাক। ইহাতে বোম্বাই-গবর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া গুজরাটসভাকে ধমক দেন এবং বলেন তোমরা প্রজাদিগকে অবাধ্য হইতে উত্তেজিত করিতেছ। সভা ইহার যথোপযুক্ত উত্তর দেন। শ্রীযুক্ত গান্ধি, পারেখ, প্রভৃতি এই সভার নেতা। গান্ধি এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছেন, যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পাইবার জন্য অন্যকে আঘাত না করিয়া স্বয়ং দুঃখভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। অর্থাৎ গুজরাট-সভা যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা অবৈধ নহে, এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি নেতাদিগকে শাস্তি দেন, তাহার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত আছেন।

ইহার পর গুজরাটসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজপুরুষদের কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেও গবর্ণমেণ্ট নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন। তাহার পর ভারতসেবক সমিতির (Servants of India Society) কয়েকজন সভ্য কায়রা জেলার একটি অংশের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ফল জানাইয়াছেন। তাহাতেও এপর্য্যন্ত রায়তদের কোন উপকার হইয়াছে বলিয়া কাগজে দেখি নাই।

হিন্দুদর্শন-শিক্ষা-সম্বন্ধে লর্ড রোনাল্ডশের মন্তব্য

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান-সভায় বঙ্গের লাট বিস্ময় প্রকাশ করেন যে বি-এ পরীক্ষায় দর্শন যাহাদের অন্যতম অধীতব্য বিষয় থাকে, তাহারা হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে কিছুই শিখেনা, কেবল পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করে। যাঁহারা দর্শনবিদ্যায় বি-এ পরীক্ষা দেন, তাঁহাদের যে হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন করা উচিত, ইহা আমরাও মনে করি; কারণ, উহা অতি উচ্চ জ্ঞানের পরিচায়ক। কিন্তু উহা শিখাইবার ভার হয়ত গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় অধ্যাপকদের হাতে দিতে চাহিবেন। কিন্তু হিন্দুদর্শন সম্যক্ শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের সহিত এবং সুফলপ্রদ করিয়া শিখাইতে পারেন, এরূপ ইউরোপীয় অধ্যাপক দুর্লভ এবং ভারতবর্ষের জন্য পাওয়া দুর্ঘট। হিন্দুদর্শন হিন্দুধর্ম্মের সহিত জড়িত। দর্শনশাস্ত্র কেবল জ্ঞানসমষ্টিরূপে শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক পাওয়াও খুব সহজ নহে। এ কথা বলিবার কারণ অনেক আছে। একটি এই, যে, হিন্দুদর্শন বি-এ পরীক্ষার অধীতব্য বিষয় হইলে উহা মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগকেও পড়িতে হইবে। সুতরাং উহাকে বিশেষ কোন ধর্ম্মমতের বা সংস্কারের সহিত জড়িত করিয়া না শিখাইয়া কেবল বিদ্যার একটি শাখা বলিয়া শিখাইতে হইবে; অর্থাৎ এখন যেমন পাশ্চাত্য দর্শন খ্রীষ্টিয়ান বা অন্য কোন ধর্ম্মের সহিত না জড়াইয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের অঙ্গ বলিয়া শিখান হয়, সেইরূপ করিয়া শিখাইতে হইবে। এই-প্রকারে শিখাইতে সমর্থ অধ্যাপক যথেষ্ট-সংখ্যক পাওয়া দরকার। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বেদাধ্যাপক যেমন মুসলমান ছাত্রকে বেদ শিখাইতে আপত্তি করিয়াছিলেন, সেরূপ কোন আপত্তি করিতে পারেন, এমন অধ্যাপক হইলে চলিবে না।

ভারতবর্ষের সকল দর্শন,—ষড় দর্শনের মধ্যেও সকল দর্শন,—বিদ্যা হিসাবে সমান মুল্যবান্ নহে। অনেক দর্শনে এরূপ কথা আছে, যাহার কুব্যাখ্যা হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, এবং যাহার কুব্যাখ্যাতারা ক্ষমতাশালী লোকদের দ্বারা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইবার সম্ভাবনাও আছে। এইরূপ নানা কারণে, লাট সাহেবের ইঙ্গিত গৃহীত হইলে, কোন্ কোন্ দর্শন বা দর্শনাংশ শিখাইতে হইবে, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপন্ন বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক হইবে; এবং অধ্যাপক নির্ব্বাচনও খুব বিবেচনা করিয়া করিতে হইবে।

এরূপ কথাও উঠিবে, যে, বিশ্ববিদ্যালয় যদি হিন্দুদর্শন বি-এ পরীক্ষার অধীতব্য অন্যতম বিষয় করেন, তাহা হইলে (অন্ততঃ মুসলমান ছাত্রদের জন্য) আরব্য দর্শনও বিকল্পে অধীতব্য করিবেন না কেন? কেননা, আরব্য দর্শনও মুল্যবান্, অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্রায় কেবল বাঙালীরই বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে।

লর্ড কার্জ্জন ও স্বর্গীয় গঙ্গাধর শাস্ত্রী।

লর্ড কার্জন যখন ভারতের বড়লাট ছিলেন, তখন একবার বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ দেখিতে গিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে গিয়া কার্জ্জন বেদান্তের খুব প্রশংসা করেন ও বলেন "আপনারা বেদান্তের দেশের লোক, আপনারা ইহার সম্বন্ধে কি ভাবেন, জানি না, কিন্তু আমরা ইহার উৎকর্ষে ও গভীরতায় বিস্মিত হই।" তাহার পর কার্জন জিজ্ঞাসা করেন, "বেদান্তের উপদেশ এই নয় কি যে সৃষ্টির সব-কিছু মিথ্যা ও মায়াময়?" শাস্ত্রীজি বলিলেন, "বেদান্ত কতকটা এইরূপ বলেন বটে, কিন্তু জগতে সত্য যাহা তাহাও নির্দ্দেশ করেন। বেদান্ত বলেন, আত্মা সত্য, এবং আত্মার ঈপ্সিত মুক্তিও সত্য। আত্মার সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মিথ্যা, মুক্তির পথে আত্মার যে-সব বাধা আছে, যে-সব দুঃখ পাইতে হয়, যে-সব বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়, সেই-সমুদয়ই মিথ্যা।" কার্জন বলিলেন, "বেদান্তের উপদেশ এইরূপ?" শাস্ত্রী মহোদয় উত্তর করিলেন, "হাঁ, এইরূপ।" অতঃপর বড়লাট আর বাক্যব্যয় না করিয়া অন্য একজন অধ্যাপকের সহিত কথা কহিতে গেলেন। বোধ হয় অনুমান করিয়া গেলেন, যে, এই বৈদান্তিক পণ্ডিতটির বেদান্ত কার্জনীয় রাজনীতির অনুকূল নহে, ইঁহার বেদান্ত ভারতবর্ষের মানুষকে আফিংখোরের স্বর্গে বাস করিতে উপদেশ দেয় না।

কার্জনের সহিত স্বর্গীয় গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহাশয়ের কথোপকথন দ্বিভাষীর সাহায্যে হইয়াছিল। আমরা তাহার তাৎপর্য্য মাত্র দিলাম। এই গঙ্গাধর শাস্ত্রী যখন সী-আই-ঈ (যাহা সন্ধি করিলে 'স্যাঈ' হয়) উপাধি পান, তখন কেহ কেহ তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে গেলে তিনি পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, যে, উপাধিদানের মালিক রাজপুরুষেরা তাঁহার নামের উপর "স্যাহী ডাল্ দিয়া।" অর্থাৎ আমার নামে মসী নিক্ষেপ করিয়াছে।

ষড়দর্শন সম্বন্ধে বঙ্গের লাটের মন্তব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ-সভায় লর্ড রোনাল্ডশে বলেন:—

If there is one doctrine which may be said to be held universally among Hindu people it is surely the doctrine of Karma and re-birth. Indeed, so universal is this belief that I remember once reading in a census report that it constitutes the sole criterion which need be taken to determine whether or not a man is a genuine Hindu in the popular acceptation of the term. The Hindu student probably accepts the doctrine as axiomatic. He would understand instinctively the connection between it and the whole vast fabric of Hindu philosophy. He would perceive without effort that in this the familiar doctrine of his own experience, was to be found the parent of all the great schools of Indian philosophic thought—the central reservoir, so to speak, from which have flowed the teaching of Buddha and Mahavira no less than that of the six great systems.

হিন্দুসমাজে কর্ম্মফলে ও পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণে বিশ্বাস খুব প্রচলিত। এই দুটি মতকে একই অভিন্ন মত মনে করা ঠিক্ কি না, এবং এই দুটি মতে বিশ্বাসই হিন্দুত্বের সর্ব্বত্র লক্ষিত একমাত্র লক্ষণ কি না, তাহার আলোচনা এখানে করিব না। মত দুটির সহিত হিন্দু দর্শনসমূহের সম্বন্ধ আছে তাহাও স্বীকার্য্য; কিন্তু সকল দর্শনেই উহা স্বীকৃত এরূপ বলা যায় না। লাট সাহেব মূল সংস্কৃতে হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন

করিয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, মনে হয় না। সম্ভবতঃ তিনি অধ্যাপক মোক্ষমূলর প্রণীত ষড়দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের মত কোন ইংরেজী বহি পড়িয়াছেন। মোক্ষমূলর বলিয়াছেন—"We find a number of ideas in all, or nearly all, the systems of Indian philosophy which all philosophers seem to take simply for granted, and which belong to no one school in particular." তাহার পর তিনি ছয়টি এইরূপ আইডিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। (১) সংসার অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার নূতন নূতন প্রাণী-শরীরে,—মানুষের, ইতর প্রাণীর, এমন কি উদ্ভিদের দেহে,—প্রবেশ ও পরিভ্রমণ। মোক্ষমূলর বলেন, সাংখ্যদর্শন প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী পুনর্জন্ম মানেন না; সাংখ্যের মতে পুরুষ অর্থাৎ আত্মন্ দেহ হইতে দেহান্তরে যান না, তিনি দর্শক মাত্র; সূক্ষ্ম শরীরই নূতন নূতন শরীর ধারণ করেন। (২) আত্মার অমরত্ব। (৩) দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উপায় অন্বেষণ-রূপ সাধারণ উদ্দেশ্য। (৪) কর্ম্ম। (৫) বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা। (৬) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণে বিশ্বাস। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, সংসার অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম, এবং কর্ম্ম, এদুটিকে মোক্ষমূলর অভিন্ন মত বলেন নাই, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে সাংখ্য-মতে আত্মন্ পুনঃপুনঃ দেহধারণ করেন না।

লাট্ সাহেব বলিয়াছেন, কর্ম্মবাদ ও সংসারবাদ সমুদয় প্রধান প্রধান হিন্দুদার্শনিকসম্প্রদায়ের চিন্তার জন্মদাতা, উহাই সেই কেন্দ্রস্থ সরোবর যাহা হইতে বুদ্ধ, মহাবীর, ও ষড়দর্শনের উপদেশের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা অন্ততঃ হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে ঠিক এভাবে স্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ের আলোচনা সংক্ষেপে করা যায় না।

কর্ম্মবাদ, অদৃষ্টবাদ ও দৈব।

আমাদের দেশের অনেক লোক মনে করেন, যে কর্ম্মফল মানিলেই দৈব মানিতে হইবে, এবং অদৃষ্টবাদী হইতে হইবে। অনেক ইংরেজেরও এই ধারণা আছে বলিয়া, এবং হিন্দুদর্শনে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে কর্ম্মবাদ আছে বলিয়া, তাঁহারা হিন্দুদিগকে হিন্দুদর্শন ও হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিতে উৎসুক। কারণ, অদৃষ্টবাদী মানুষ নিজ পরাধীনতা ও দুরবস্থা বিধির নির্বন্ধ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিলেই যে অদৃষ্টবাদী ও দৈবে বিশ্বাসী হইতে হইবে, এরূপ মনে করা মহা ভ্রম। সব দেশের সব মানুষই কর্ম্মফলে বিশ্বাস করে, যদিও তাহারা সকলে জ্ঞাতসারে ইহাকে কর্ম্মবাদ বলে না। খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ পরিশ্রম-বিশ্রাম যে যাহা করুক, সকলেই এই অন্তর্নিহিত বিশ্বাসে করে, যে তাহার অনুযায়ী একটা ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সকল জাতি ও সব মানুষ এইভাবে কর্ম্মফল মানিলেও, তাহারা সকলেই ত দৈব বা অদৃষ্টে বিশ্বাস করে না। কথা উঠিতে পারে, যে, যদি কর্ম্ম মান, তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহার ফলেই ইহজন্মে দুঃখ বা সুখ ভোগ করিতেছ, ইহা কেন মান না? অর্থাৎ প্রাক্তন, অদৃষ্ট, বা দৈব কেন মান না? প্রথম কথা এই যে, পূর্ব্বজন্ম ছিল কি না, আগে তাহাই প্রমাণ করা দরকার। আচ্ছা, তাহা না হয় মানিয়াই লওয়া যাক্। মানিয়া লইলেও, পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই বর্ত্তমান জন্ম নিয়ন্ত্রিত হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? পূর্ব্বজন্মে প্রত্যহ আহার করিয়াছিলাম বলিয়া তাহা হইলে ইহজন্মে আর ক্ষুধা পাওয়া উচিত ছিল না। তাহার পর দেখুন, পূর্ব্বজন্ম মানিলে পরজন্মও সাধারণ ভাবে মানিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, বর্ত্তমান জন্মে যাহা করিতেছি, তাহার ফল এ-জন্মে না পাইয়া পরজন্মে পাইব। কিন্তু বাস্তবিক তাহাই কি ঘটে? সন্দেশ খাইলাম অদ্য ১৩২৪ সালের ২৩শে ফাল্গুন, আর মিষ্ট লাগিবে ও পেট ভরিবে পরজন্মে ১৩৭৪ সালের ১০ই চৈত্র; ভ্রমক্রমে একটা আস্ত মাছি খাইলাম আজ ২৩শে ফাল্গুন, এবং তাহার ফলে পরজন্মে ১৩৫৯ সালের ৩রা আষাঢ় বমি হইবে; কেহ ১৩১১ সালে নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়া তখন হইতে চালাইতেছিলেন, তাহার ফলে এখন পুলিশের সন্দেহভাজন এবং তজ্জন্য রাজবন্দী বা অন্তরায়িত (interned) না হইয়া পরজন্মে ১৩৯৯ সালে তিনি দণ্ডিত হইবেন;—এইরূপ কি ঘটিয়া থাকে? সচরাচর যখন এরূপ ঘটে না, ইহজীবনে কৃত সুকর্ম্ম কুকর্ম্মের ফল চোখ থাকিলে যখন ইহজীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলের জের বিধাতা নিশ্চয়ই

বর্ত্তমান জন্মে টানিয়া আনেন, ইহা মানিয়া লইতে পারি না। যদিই বা মানিয়া লই, তাহা হইলেও, যখন দেখিতেছি যে ইহজন্মের এক-রকম কর্ম্মের ফল বিপরীত-রকম কর্ম্ম দ্বারা নষ্ট করা যায়, তখন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলও নিশ্চয়ই ইহজন্মের কর্ম্মের দ্বারা পুষ্ট পরিবর্ত্তিত বা নষ্ট হইতে পারে। অতিভোজনের কুফল উপবাস দ্বারা নষ্ট হয়, অতিরিক্ত ভিজিয়া সর্দ্দি হইলে তাহার কুফল অস্নাত থাকিয়া ঔষধ সেবন দ্বারা নষ্ট করা যায়। আলস্যের কুফল পরিশ্রম দ্বারা নষ্ট করা যায়।

দৈব ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত।

কর্ম্মফল, দৈব ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে সহজবুদ্ধিতে যাহা মনে হয়, সংক্ষেপে তাহার দু-একটা কথা বলিলাম। এখন দেখা যাক্ হিন্দু নীতিকার, শাস্ত্রকার ও বেদ এ বিষয়ে কি বলেন।

নীতিকার ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন :—"উদ্যোগিনম্ পুরুষ-সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?" লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহকে আশ্রয় করেন; দৈব দিবেন, ইহা কাপুরুষেরা বলে। দৈবকে হত্যা করিয়া আত্মশক্তিদ্বারা পৌরুষ কর। যত্ন করিবার পরও যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাতে দোষ কি?"

হিন্দুদিগের দ্বারা পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকৃত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে :—"দৈবং তাত ন পশ্যামি, নাস্তি দৈবস্য সাধনম্। স্বভাবতো হি সংসিদ্ধা দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ॥ লোকযাত্রাশ্রয়শ্চৈব শব্দো বেদাশ্রয়ঃ কৃতঃ। শাস্ত্যর্থং মনসস্তাত নৈতদ্ বৃদ্ধানুশাসনং॥ চক্ষুষা মনসা বাচা কর্ম্মণা চ চতুর্ব্বিধম্। কুরুতে যাদৃশং কর্ম্ম তাদৃশং প্রতিপদ্যতে॥" ইহাতে বলা হইয়াছে, দৈব নামে পৃথক্ কিছু নাই, লোকে যে কর্ম্ম করে তাহাতেই ফল হয়। মনের শান্তির জন্য লোকযাত্রায় দৈব শব্দ কল্পনা করা গিয়াছে; বস্তুতঃ দৈব বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই।

"যোগবাসিষ্ঠের প্রামাণিকতা কোন হিন্দু অস্বীকার করিবেন না। এই গ্রন্থের মতও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিব বলিয়া স্থানাভাবে মূল সংস্কৃত দিলাম না, কেবল (পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত) অনুবাদ দিতেছি। বাক্যগুলি মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সর্গ হইতে গৃহীত।

হে রঘুনন্দন; ইহসংসারে যথাযোগ্যরূপে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিলেই সকলে সকল বিষয় সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৈব ত মন্দমতি মূঢ়গণের কল্পিত, প্রকৃত পক্ষে তাহা অলীক। পুরুষকার দ্বিবিধ—প্রাক্তন এবং অদ্যতন (বর্ত্তমান)। প্রাক্তন পুরুষকার অর্থাৎ দৈব বর্ত্তমান পুরুষকার দ্বারা জয় করা যায়। সহায় এবং উৎসাহ-সমন্বিত দৃঢ়াভ্যাসী যত্নশীল পুরুষগণ কত শত সুমেরুকেও জীর্ণ করিতে পারে, প্রাক্তন পুরুষকারের কথা ত অতি সামান্য।

'প্রাক্তন কর্ম্ম আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে', ইত্যাকার বুদ্ধিকে জোর করিয়া নিপাতিত করিবে, প্রত্যক্ষ কর্ম্মের নিকট সে বুদ্ধির আধিক্য নাই। যতক্ষণ না ঐহিক সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয়, ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্মে যত্ন করিবে। প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়; ভাবী দোষ যে ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা দূরীভূত হয়, তাহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। উদ্যোগহীন পুরুষ-গর্দ্দভগণের সমান হওয়া অকর্ত্তব্য, শাস্ত্রানুসারী উদ্যোগ ইহলোক এবং পরলোকের উপকারী। বিষ্ণু যেরূপ অসুরপঞ্জর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সংসারকুহর হইতে স্বয়ং বলপূর্ব্বক নির্গত হওয়া আবশ্যক। নিত্যই শুভকর্ম্ম দ্বারা শুভফল প্রাপ্তি হয়, অশুভ কর্ম্ম দ্বারা অশুভ ফল প্রাপ্তি হয়; দৈব নামে স্বতন্ত্র বস্তু আর কিছু নাই (অথবা শুভ ঐহিক কর্ম্মে শুভ ফল এবং অশুভ ঐহিক কর্ম্মে অশুভ ফল লাভ হয়, দৈব কোন কার্য্যেরই নহে)। 'দৈবই আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে' এইরূপ হতবুদ্ধি-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র-প্রভৃতির-দৃষ্টান্ত জ্ঞান-শূন্য পুরুষকারহীন জনগণের মুখাবলোকন করিতে স্বয়ং লক্ষ্মী পরাঙ্মুখী।

পূর্ব্বকৃত অসৎকর্ম্ম যেমন সৎকর্ম্ম দ্বারা শুভে পরিণত করা যায়, প্রাক্তন কর্ম্মও সেইরূপ করা যাইতে পারে। যাহারা লোভপরবশ হইয়া সেই দৈবের (প্রাক্তন কর্ম্মের) জয়ার্থ যত্ন করে না, সেই দৈবপরায়ণ ব্যক্তিগণ দীনহীন পামর ও মূঢ়। সমর্থ ব্যক্তির পুরুষকার দৃশ্যই হউক বা অদৃশ্যই হউক, অক্ষম নির্বুদ্ধি ব্যক্তি তাহাকেই দৈব বলিয়া থাকে। সেই সমর্থ ব্যক্তি অপেক্ষাও আবার সমর্থ ব্যক্তি আছে, দৈব নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে হইবে। যাহা করিতে পারি না, তাহার নিমিত্ত যদি দুঃখ করি, তাহা হইলে আমি মৃত্যুকেও ত মারিতে পারি না, অতএব আমার প্রত্যহই রোদন করা উচিত। এই জগতের পদার্থসমূহ দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যের শক্তি অনুসারে স্ফুরিত হয়, ইহাতে কেবল অধিক যত্নশালীরই জয়। পুরুষকার ছাড়িয়া যে ব্যক্তি 'দৈব আমাকে কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন' এই-প্রকার অনর্থ কুকল্পনায় অবস্থিত, সেই অধমকে দূর হইতে পরিত্যাগ করা উচিত। মূঢ় ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দৈবমোহে নিমগ্ন হয়।

যাহারা দৈবপরায়ণ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে, সেই আত্মবিদ্বেষীগণ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিতয়ের নাশ করিয়া থাকে। বাল্যাবধি যে-যে বিষয়ে যেরূপ যত্ন করা হয়, ফললাভ তাদৃশ হইয়া থাকে, দৈব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; অতএব জগতে কেবল মাত্র পৌরুষই বিদ্যমান। যাহারা অল্পবুদ্ধি, দুঃখের সময় রোদন করিতে থাকে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার নিমিত্তই দৈব শব্দের ব্যবহার। হে রঘুনাথ, এ জগতে পুরুষকারই ইষ্টসিদ্ধির কারণ; হে শুভগ, এখানে চিরকাল অশঙ্ক ভাবে সেইরূপ যত্ন কর, যাহাতে পাদপ সরীসৃপ প্রভৃতির দশা প্রাপ্ত হইতে না হয়।

দৈব যে কি, তাহা বলা যায় না; উহা মিথ্যাজ্ঞানের ন্যায় রূঢ়, ঐ দৈবের আকার নাই, কোন কর্ম্ম নাই, স্পন্দ নাই ও পরাক্রম নাই।

এই জগতে দৈবেরই যদি কর্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের সকল কার্য্যেই চেষ্টার প্রয়োজন কি? হস্তপদাদি অঙ্গ নষ্ট হইলে দৈব কি কাহারও কিছু করিয়া দিয়া থাকে? এই জগত্রয়ে দৈবই যদি জীবসমূহের নিয়োগকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে জীবসমূহ সকলে শয়ন করিয়া থাকুক, দৈবই সমুদয় করিবে। 'আমি দৈবপ্রেরিত হইয়া সমুদয় কার্য্য করি, সমস্তই দৈবসম্বন্ধসিদ্ধ' ইহা আশ্বাসবাক্যমাত্র, বস্তুত দৈব নাই। মূঢ় ব্যক্তিরাই দৈব কল্পনা করিয়াছে। যাহারা দৈবপরায়ণ তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরুষাকারেই মহত্বলাভ করিয়াছেন। যাহারা শূর, যাহারা বিক্রমশালী, যাহারা বুদ্ধিমান্ ও যাহারা পণ্ডিত, বল দেখি, এই জগতে তাহারা কি নিমিত্ত দৈবের প্রতীক্ষা করিবে?

হে রাঘব! পৌরুষই সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও ফলভোক্তা, অন্য কিছুই নহে, দৈব তদ্বিষয়ে কারণ নহে। দৈব কিছুই করে না, কিছুই ভোগ করে না, দৈবের অস্তিত্ব নাই, কেহ উহাকে দেখিতে পায় না এবং উহার আদরও করে না, উহা ঐপ্রকার কল্পনা মাত্র।

বেদ হিন্দুদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক শাস্ত্র। বস্তুতঃ ইহা হইতেই অন্য সকল শাস্ত্র নিজ নিজ প্রামাণিকতা লাভ করিয়াছে, হিন্দুগণ এইরূপ বিশ্বাস করেন। এখন দেখা যাক, এই বেদে দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রোহিত নামে রাজার এক উপাখ্যান আছে। ১৩২৩ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে "চরৈবেতি, চরৈবেতি" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন তাহার আংশিক বর্ণনা করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ঋগ্বেদের কয়েকটি বাক্য মুদ্রিত করিতেছি।

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্ব্বেপাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ। —চরৈবেতি॥

হে রোহিত, যে বিচরণ করে শ্রমবশতঃ তাহার দৈহিক কান্তি বিকশিত পুষ্পের ন্যায় সুষমাময়ী হইয়া উঠে—তাহার আত্মা নিত্য বৃহৎ হইতে থাকে এবং সে নিত্যই বৃহত্বের ফললাভ করে। যে-পথ সম্মুখে নিত্য উন্মুক্ত তাহাতে যে বিচরণ করে, শ্রমের দ্বারা হতবীর্য্য হইয়া তাহার সকল পাপ মরিয়া শুইয়া পড়ে। অতএব বিচরণ কর—বিচরণ কর।

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্দ্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ॥ চরৈবেতি।

যে বসিয়া থাকে তাঁহার ভাগ্যও বসিয়া থাকে। যে উঠিয়া বসে তাহার ভাগ্যও উঠিয়া বসে। যে শুইয়া পড়িয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া পড়িয়া থাকে। যে চলিতে আরম্ভ করে তাহার ভাগ্যও চলিতে থাকে। অতএব, হে রোহিত, যাত্রা কর, যাত্রা কর।

উপরের শ্লোকটি হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বেদের মতে, দৈব ভাগ্য দান করে না, মানুষের চেষ্টা মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। এই বিশ্বাস আরো পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে।

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥ চরৈবেতি।

শুইয়া পড়িয়া থাকিলেই তাহার কলিযুগ লাগিয়াই থাকে। যে জাগিয়া উঠিয়া বসিল তাহার দ্বাপর। যে দাঁড়াইয়া উঠিল তাহার ত্রেতা উপস্থিত হইল। যে মুক্ত পথে যাত্রা করিল—তাহার সত্য যুগ সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর।

এক অবস্থায় স্থির হইয়া না থাকা, ক্রমাগত অগ্রসর হওয়া ও উন্নতি করা যে কিরূপ আনন্দের কারণ তাহা একটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদম্বরং।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥ চরৈবেতি।

যে চলিতেছে সেই মধুলাভ করিতেছে, যে চলিতেছে সেই অমৃতময় ফল লাভ করিতেছে, ঐ দেখ সূর্য্যের কি দীপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব—সে যে চলিতে-চলিতে কখনও তন্দ্রাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব, যাত্রা কর, যাত্রা কর।

স্থিতিশীলতা না গতিশীলতা ভারতের সনাতন পন্থা।

উপরে যে-সকল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা স্থিতিশীলতার অনুকূল, কিম্বা ক্রমাগত অগ্রসর হইতে বলে। অতি প্রাচীন যে বেদ, তাহাতে, এবং তাহার পরবর্ত্তী নানা শাস্ত্রে মানুষকে পৌরুষ দ্বারা উন্নতি করিতে, অগ্রসর হইতে বলা হইয়াছে। যাঁহারা কেবলমাত্র যুক্তি মানেন, আত্মার প্রেরণা মানেন, তাঁহারা ত ক্রমোন্নতির পক্ষপাতী হইবেনই। যাঁহারা কেবল শাস্ত্র মানেন, তাঁহাদিগকেও আলস্য ও জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর সমুদয় চলিষ্ণু মানুষের সঙ্গে অনন্ত যাত্রার পথের পথিক হইতে হইবে। যাঁহারা যুক্তি ও আত্মার প্রেরণা এবং শাস্ত্রোপদেশ, সকলেরই মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছেন, যাঁহারা শাস্ত্রকে আত্মারই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারাও ঐ পথের পথিক হইবেন। বাধা, বন্ধন, কণ্টক, দুঃখ, যাহা কিছু আছে, তাহা ক্ষণিক, তাহা অলীক, তাহা মায়া, তাহা মিথ্যা। আত্মা সত্য, গতি সত্য, মুক্তি সত্য। আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকারের মুক্তিলাভ করিতে প্রয়াসী হই। পৌরুষকে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। সকল বাধাকে বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে লর্ড রোনাল্ডশের মত।

উপাধিদান-সভায় লর্ড রোনাল্ডশে ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহারা যে সকলে খুব ভাল ইংরেজী শিখে না, ইহা ঠিক; কিন্তু

ইহাও ঠিক্ যে তাহাদের অনেকে মোটের উপর যেরূপ ইংরেজী শিখে এবং পাস করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া যেরূপ ইংরেজী বলে ও লেখে, ইংরেজরা সেরূপ ফ্রেঞ্চ বা জার্মেন শিখে না, এবং বলিতে ও লিখিতে পারে না। সত্য বটে, আমাদের ইংরেজী শিখিবার বলিবার ও লিখিবার যতটা গরজ আছে, ইংরেজদের ফ্রেঞ্চ বা জার্মেন শিখিবার বলিবার ও লিখিবার ততটা গরজ নাই। যাহাই হউক, আমাদের ছাত্রদের ইংরেজী-জ্ঞান আরও বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত হইলে সুখী হইব। লাটসাহেব তাঁহার বক্তৃতায় যে রকম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী পরীক্ষার প্রশ্ন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিকূল সমালোচনা করেন, আমরাও তদ্রূপ প্রশ্নের পক্ষপাতী নহি। তিনি বলিয়াছেন, যে, অধ্যাপকের নোট মুখস্থ করিয়া ওরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা অপেক্ষা, দেশী ভাষায় লেখা খবরের কাগজের লেখার কতক অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে পারায় বেশী ইংরেজীজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা সত্য; কিন্তু লাটসাহেব কি জানেন না, যে, আমাদের ছাত্রদিগকে এইরূপ অনুবাদ করিয়াও ইংরেজীজ্ঞানের পরিচয় দিতে হয়? যদি জানেন তাহা হইলে আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষা-প্রণালীর কেবল দোষেরই উল্লেখ না করিয়া, তাঁহার অনুমোদিত রীতি যাহা, তাহার অস্তিত্বের উল্লেখ করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল না? যদি জানেন না, তাহা হইলে এরূপ অসম্পূর্ণ-জ্ঞান লইয়া এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ না করিলে ক্ষতি হইত না।

লাট সাহেব চান যে ইংরেজী বর্ত্তমানে যেরূপ কথিত হয়, আমাদের ছাত্রেরা তাহা শিক্ষা করে। আমরাও যে তাহা চাই না, তাহা নয়। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া শিখান যাইবে, সে বিষয়ে ত বক্তা কিছু বলেন নাই দেখিতেছি। তিনি ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে সকল ছাত্রকে বাধ্য করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা না করিয়া যাহাদের মাতৃভাষা ইংরেজী নহে, তাহাদিগকে অন্য কি সহজ ও পরিমিত-ব্যয়সাধ্য উপায়ে ইংরেজী ভাষা শিখান যাইতে পারে, তাহা তিনিই বলুন না? অবশ্য চলিত ইংরেজী শিখিবার জন্য প্রাচীন এংলো-স্যাক্সন, বা চসার স্পেন্সার মিল্টন বেকন শেক্সপীয়ার পড়িবার দরকার নাই, ইহা তিনি বলিতে পারিতেন, এবং ইহা আমরাও মানি। তিনি বলিতে পারিতেন, আধুনিক ও জীবিত ইংরেজ গ্রন্থকারদের লেখা আরও বেশী করিয়া পড়া দরকার; আমরা ইহাও মানি। কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই। কোন দেশের সাহিত্য না পড়িয়া সেই দেশের ভাষা শিখিতে হইলে, সেই দেশে গিয়া বাস করিয়া কথাবার্ত্তা হইতে ভাষা শিখিতে হয়, কিম্বা সেই দেশবাসী লোকদিগকে শিক্ষক রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া তাঁহাদের ভাষা শিখিতে হয়। কিন্তু ইহা কি সুসাধ্য উপায়? এবং এই উপায়ে কোন ভাষা শিখিলে ও তাহার সাহিত্য না পড়িলে কি ঐ ভাষার যথেষ্ট জ্ঞান জন্মিতে পারে? কখনই না। ইংরেজের যে-সব ছেলেমেয়েরা ফ্রেঞ্চ জার্মেন শিখে, তাহারা কি সবাই বা অধিকাংশ ফ্রান্সে জার্মেনীতে গিয়া শিখে, না ইংলণ্ডেও ফরাসী ও জার্মেন জাতীয় শিক্ষকদের নিকট কেবল মাত্র কথাবার্ত্তা দ্বারা শিখে? তাহারা কি ফরাসী ও জার্মেন সাহিত্য পড়ে না?

লাটসাহেব কেরাণীর কাজ বা অন্যবিধ কাজ চালাইবার জন্য এবং ওকালতী ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য যেরূপ ইংরেজী জানা দরকার, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যদি ইংরেজী শিখিবার উদ্দেশ্য কেবল এইরূপই হয়, তাহা হইলেও বলি, উকীল ব্যারিষ্টারের কাজ, বিচারকের কাজ, শিক্ষক ও অধ্যাপকের কাজ, সংবাদপত্রের লেখক ও সম্পাদকের কাজ, এমন কি উচ্চশ্রেণীর কেরাণীরও কাজ, এমন কেহই বর্ত্তমান ভারতে করিতে পারিবেন না, যিনি ইংরেজী সাহিত্য না পড়িয়াছেন।

লাট সাহেব নিশ্চয়ই ইহা মনে করেন না, যে, ইংরেজী সাহিত্যের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করিতে হইলে কেবল ইহা বিবেচনা করিলেই হইবে, যে, উহা পড়িলে ইংরেজী ভাষা কি পরিমাণে শিখা যায় বা না যায়। ইংরেজী সাহিত্যে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা আদর্শ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; ইহাতে নানা উচ্চ ভাব, চিন্তা ও আইডিয়া আছে; ইহা হইতে মানুষ আনন্দ পাইতে এবং প্রেরণা ও অনুপ্রাণনা লাভ করিতে পারে; ইহা পড়িলে ইংরেজ জাতির শক্তি ও মহত্ত্ব এবং তাহার কারণের সহিত পরিচয় হয়; ব্যক্তিগত ও

স্বাধীনতা এবং আত্মকর্তৃত্ব লাভের ইচ্ছা, ইহা অধ্যয়ন করিলে উদ্দীপিত হয়; সকল মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার যে সমান হওয়া উচিত, এবং সকলেরই যে উন্নতি করিবার কৃত্রিম-বাধা-হীন সমান সুযোগ পাওয়া উচিত, এই বোধ ইংরেজী সাহিত্য পড়িলে উজ্জ্বল ও দৃঢ় হয়। আর কোন সাহিত্য পাঠে এইসব ফল লাভ হয় না, এমন কথা বলিতেছি না; ইংরেজী সাহিত্য পড়িলে যাহা হইতে পারে তাহাই বলিতেছি। অতএব, ইংরেজী সাহিত্য না পড়িয়াও যদি আমাদের কাজ চালাইবার মত ইংরেজী ভাষার জ্ঞান জন্মিতে পারিত, তাহা হইলেও ইংরেজী সাহিত্য পড়িবার প্রয়োজন থাকিত। কিন্তু ইংরেজী ভাল ভাল বহি না পড়িলে আমরা ভাল করিয়া ইংরেজী ভাষাও শিখিতে পারিব না। গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে দেশী লোকের মুখ দিয়া এই একটা প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে বটে, যে, ইংরেজী স্কুলসকলে ইংরেজ প্রধান শিক্ষক এবং নীচের কয়েকটি শ্রেণীতে ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হউক, তাহা হইলে আমাদের ছেলেমেয়েরা বেশ ইংরেজী শিখিবে। আর্থিক কারণে যে এই প্রস্তাব-অনুযায়ী কাজ হইতে পারে না, এবং অন্যান্য কারণেও যে ইহা অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর, তাহা আমরা পূর্ব্বে এক সংখ্যায় দেখাইয়াছি। বক্তৃতা করিবার সময় লাট সাহেবের মনের মধ্যে এই প্রস্তাবটি ছিল কি না জানি না।

মিল্টন, বার্ক, মিল্ পড়িয়া আমাদের মস্তিষ্কের রাষ্ট্রনৈতিক বিকৃতি জন্মিয়াছে বলিয়া ভারতপ্রবাসী ইংরেজ আমলা বণিক ও সম্পাদকদের ধারণা। এইজন্য তাঁহারা ইংরেজী ভাল ভাল বহি না পড়িতে দিয়া কিছু কিছু উপন্যাস ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতির সাহায্যে কেবলমাত্র কেরাণীগিরির উপযোগী কিছু ইংরেজী আমাদিগকে শিখাইতে চান। এইজন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যকে কার্য্যতঃ পরীক্ষার পৃথক পৃথক বিষয় করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। লর্ড রোনাল্ডশে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কি এরূপ অনুমান করা যায় যে ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের ধারণা ও অভিসন্ধির প্রভাব তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে? তাহা না হইয়া থাকিলে ভাল, কিন্তু হওয়াটাও বিচিত্র নহে।

যাহা হউক, এখন আমাদের বাংলা সাময়িক ও স্থায়ী সাহিত্যেও নানাবিধ প্রাণপ্রদ ও প্রাণরক্ষক ভাব, চিন্তা ও আইডিয়া স্থান পাইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে আরও পাইবে। এবং সকলের বড় কথা এই, যে, ইংরেজ বা অন্য যে-কোন শক্তিশালী জাতিদের যেমন আত্মা আছে, আমাদেরও তেমনি আত্মা আছে। সব দেশের সব ভাষার সাহিত্যই এই আত্মার সৃষ্টি। আমরা ইংরেজী সাহিত্য হইতে যেটুকু উত্তেজনা, যেটুকু চেতনা পাইয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ; কিন্তু আমরা তাহা না পাইলেও যে জাগিতাম না, বা তাহা ব্যতিরেকে আমাদের আত্মা বড় একটা সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা নহে। আত্মার উপর নির্ভর করিয়া আমরা চলিব। শিক্ষানীতি বা রাজনীতি যাহাই হউক, তাহা আমাদের সর্ব্ববিধ মুক্তির পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা স্থাপন করিতে পারিবে না।

বাবু জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের অবস্থা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের জননী বড়লাটের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছেন, অন্যত্র মুদ্রিত তাঁহার কথা হইতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। জ্যোতিষ বাবুর অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, দরখাস্ত হইতে তাহাও জানা যাইবে। দরখাস্তের ফল কিছু হইয়াছে কি না, কিম্বা এখন জ্যোতিষ বাবু কেমন আছেন, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত (২৫শে ফাল্গুন) জানিতে পারি নাই। গত বৎসর ২রা এপ্রিল মেজর পীব্‌ল্‌স্ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে, তিনি পাগলামির ভান করিতেছেন, কিন্তু তাহা করিতে করিতে সত্য সত্যই উন্মাদগ্রস্ত হইতে পারেন। ১৭ই জুন কর্ণেল ডিয়ার ও মেজর পীব্‌ল্‌স্ আবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে তিনি উন্মাদের ভান করিতেছেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া মেজর পীব্‌ল্‌স্ বলেন যে তিনি উন্মাদের ভান করিতেছেন। অথচ বহরমপুর পাগলাগারদের কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে জ্যোতিষ বাবুর মামা জানিয়াছেন যে তাঁহাকে গত ছয় মাসেরও অধিক কাল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নাকের ভিতর দিয়া নল চালাইয়া কৃত্রিম উপায়ে আহার দেওয়া হইতেছে, এবং সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়াতেও তাঁহার অবস্থার কোন নড়চড় হয় না! অদ্ভুত ভান বটে।

যাহা হউক আমরা আশা করি বড়লাট তাঁহার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, এবং ভগবানের কৃপায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইবে, এবং তিনি পুনর্ব্বার চেতনা বুদ্ধি ও চলৎশক্তি ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু, ভগবান না করুন, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আশা করি কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই বলিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিবেন না, যে, তিনি মৃত্যুর ভান করিতেছিলেন, এবং এইরূপ ভান করিতে করিতে সত্য-সত্যই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীমতী সিন্ধুবালা-দ্বয়।

গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে বাঁকুড়া জেলার সিন্ধুবালা নাম্নী দুইটি মহিলাকে গেরেপ্তার করা ভুল হইয়াছে। কিরূপে এই ভুল হইল, তাহা বলিতে গিয়া টিকটিকি পুলিস বিভাগের কাজের যে বিশৃঙ্খলা, যে স্মৃতি-বিভ্রম, প্রভৃতির পরিচয় গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন, তাহাতে ইহা ভাবিয়া সহজেই মনে ভয় হয় যে এরূপ একটা বিভাগের হাতে সরকার বাহাদুর বাঙ্গালীর সম্মান স্বাধীনতা স্বাস্থ্য ছাড়িয়া দিয়া রাখিয়াছেন। গবর্ণর বলিয়াছেন, এই ব্যাপারে যে-সব পুলিস-কর্ম্মচারীর দোষ হইয়াছে, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ জানাইবেন। ইহা যথেষ্ট নয়। তাহাদিগকে পদচ্যুত করা উচিত ছিল। ইতিমধ্যে বাঁকুড়ার পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রকারান্তরে পুরস্কৃতই হইয়াছেন। তিনি অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, অধিক বেতনে কুচবিহার রাজ্যের পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

নজরবন্দীদিগকে স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখা।

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট অতঃপর নজরবন্দীদিগকে ম্যালেরিয়া ও পীড়ার অন্যান্য কারণ যেসব স্থানে নাই, যথাসম্ভব এইরূপ স্থানে রাখিতে রাজী হইয়াছেন। ভাল কথা। কিন্তু কোথায় কে আছে তাহার তালিকা কেন সরকার প্রকাশ করিতেছেন না, এবং বেসরকারী পরিদর্শক কেন নিযুক্ত করিতেছেন না? তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারে যে নজরবন্দী ও রাজবন্দীরা কিরূপ জায়গায় কি অবস্থায় আছে। এই হতভাগ্য লোকদের মধ্যে আত্মহত্যা, ক্ষয়রোগে ও জ্বরে মৃত্যু, উন্মাদ, প্রায়োপবেশন, প্রভৃতি ঘটাতেও কি গবর্ণমেণ্ট বুঝিতেছেন না, যে, যে-সব সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর ইহাদের তত্ত্বাবধানের ভার আছে, তাঁহারা সভ্যতাসঙ্গত ভাবে কর্ত্তব্য করিতে পারিতেছেন না, এবং গবর্ণমেণ্ট আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারো কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন?

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সর্ব্ববিধ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি। আমি যতক্ষণ কোন আইনবিরুদ্ধ কাজ না করিব, ততক্ষণ কেহ আমার স্বাধীনতায় হাত দিতে পারিবে না, দেশে এই নিয়ম যদি প্রতিপালিত না হয়, তাহা হইলে আমি কোন কাজই সম্পূর্ণ শক্তির সহিত নিশ্চিন্ত মনে করিতে পারি না। প্রকাশ্যভাবে যথেষ্ট কারণ না দেখাইয়া কেহ আমাকে গেরেপ্তার করিতে পারিবে না, এবং প্রকাশ্য আদালতে আত্মপক্ষসমর্থনের সুযোগ না দিয়া কেহ আমাকে জেলখানায় বা অন্যত্র আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না, প্রধান প্রধান সভ্যদেশসকলে জনসাধারণের এই অধিকার আছে। সেইজন্য ঐসব দেশের এত উন্নতি হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেন নিতান্তই মূল্যহীন, আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট এই ভাবে পুলিসকে কাজ করিতে দিতেছেন। এইজন্য লোকের উপর উৎপীড়ন হইতেছে। সমুদয় অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা প্রকাশ পায় না। যাহা প্রকাশ পায়, তাহারও সবগুলির বৃত্তান্ত আমরা স্থানাভাবে দিতে পারি না। এইরূপ সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করা দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদকদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

কলিকাতা টাউনহলে প্রতিবাদ-সভা।

ভারতরক্ষা আইন যে-ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে এবং তাহাতে জনসাধারণের উপর যেরূপ জুলুম হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য, এবং গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জনসাধারণের মত জ্ঞাপন করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতার টাউনহলে এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন, এবং সার্ রাসবিহারী ঘোষ, সার্ বিনোদচন্দ্র মিত্র, প্রভৃতি আইনজ্ঞদিগের অগ্রণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত

ছিলেন। সভাপতির বক্তৃতা যুক্তিপূর্ণ, ওজস্বী ও সারবান্ হইয়াছিল। এই সভা বেঙ্গল সিবিল রাইট্‌স্ কমিটি নামক একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা, আবদ্ধ ব্যক্তিদের ক্লেশ মোচনের চেষ্টা করা, তাহাদের পরিবারবর্গকে প্রয়োজন হইলে অর্থসাহায্য করা, এই দেশের আইনকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবিরোধী করিবার জন্য ভারতে ও বিলাতে আন্দোলন করা, প্রভৃতি এই কমিটির কার্য্য হইবে। ইহার সভাপতি হইয়াছেন, সার রাসবিহারী ঘোষ। তাঁহার আইনজ্ঞান আছে, টাকা আছে, স্বদেশপ্রীতি আছে, বদান্যতা আছে। সুতরাং এরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে না যে এই কমিটির দ্বারা যথেষ্ট চেষ্টা হইবে;—ফল কি হইবে না-হইবে, তাহার উপর আমাদের হাত নাই। ইহার সভ্যগণের মধ্যেও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মৌলবী ফজলল হক্, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি আছেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার বাংলা অভিধান লিখিয়া যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশবাসীরা এখনও তজ্জন্য তাঁহার সমুচিত আদর করেন নাই। একজন মানুষের পক্ষে এত বড় ও এত ভাল একটি কাজ একা করা বিশেষ শক্তি অধ্যবসায় ও একাগ্রতার পরিচায়ক। বিলাতে সেকালে ডাক্তার জনসন ইংরেজী ভাষার অভিধান একা লিখিয়াছিলেন বলিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু অন্যান্য দিকে ডাক্তার জন্‌সনের সহিত তুলনীয় না হইলেও, কোষকার বলিয়া তাঁহারও বিশেষ খ্যাতি হওয়া উচিত। ইহা নিশ্চিত যে তিনি যদি স্বাধীন ও সভ্য কোন দেশে জন্মিয়া, বঙ্গদেশে এখন বৃহৎ অভিধান লিখিবার পক্ষে সহযোগিতার অভাব ও অন্যান্য যে-সব বাধা ও অসুবিধা আছে তত্তুল্য বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করিয়া, সেই দেশের ভাষার এইরূপ একটি অভিধান লিখিতেন, তাহা হইলে তিনি তদ্দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আচার্য্য উপাধি (Doctorate) পাইতে পারিতেন। আমাদের দেশও স্বাধীন নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বাধীন নয়; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভুদের মধ্যে তোষামোদপ্রিয়তা ও পরশ্রীকাতরতাও যথেষ্ট আছে। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে সম্মানিত বা পুরস্কৃত করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই;—বিশেষতঃ যখন তাঁহার মোসায়েবী করা অভ্যাস নাই। সাহিত্যসভা, সাহিত্যপরিষদ্ প্রভৃতি গুণগ্রাহিতা দেখাইলে ভাল হয়। বঙ্গের শিক্ষিত সাধারণ তাঁহার অভিধান ক্রয় করিলে এই গুণগ্রাহিতায় তিনি আনন্দিত হইবেন। এই কথাটি আমরা অসঙ্কোচে লিখিতে পারিতেছি এইজন্য, যে, ইহা তাঁহাকে কিছু টাকা পাওয়াইয়া দিবার নিমিত্ত পরোক্ষ রকমের বিজ্ঞাপন নহে। কারণ, গ্রন্থের লাভালাভের সঙ্গে তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই।

দেশী কাগজের দেশী ও ইংরেজ সম্পাদক।

কিছুদিন হইল, 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্' বোম্বাইয়ের ওাডিয়া (A. S. Wadia ?) নামক একজন লেখকের এই অদ্ভুত মতটি উদ্ধৃত করেন, যে, বড়োদার মহারাজা গায়কবাড় দেশীলোকদের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত লোক না পাইয়া একজন ইংরেজকে দেওান নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বোম্বাই ক্রনিক্‌লের স্বত্বাধিকারীরা যদিও প্রায় সকলেই ভারতবর্ষীয় তথাপি তাঁহারাও একজন উপযুক্ত ভারতীয় সম্পাদক না পাইয়া মিঃ হর্ণিম্যানকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এই মন্তব্যটি কোন কোন কারণে হাস্যকর হইলেও, এসম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বড়োদার মহারাজা জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে উপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি যেমন ইংরেজকে দেওান নিযুক্ত করিয়াছেন, তেমনি মুসলমানকে, হিন্দুকে, পার্সিকেও,—বাঙালী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয়, মান্দ্রাজীকেও,—নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ প্রধান মন্ত্রীই ভারতীয়। সুতরাং ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে উপযুক্ত লোক না থাকায় ইংরেজকে তিনি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা বলিলে সত্য কথা বলা হয় না। বোম্বাই ক্রনিক্লের স্বত্বাধিকারীরা ভারতবাসীদের মধ্যে উপযুক্ত সম্পাদক না থাকায় মিঃ হর্ণিম্যানকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই কথাটি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা সহজ নহে, কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করাও সহজ নয়। কারণ, বোম্বাই ক্রনিক্লের স্বত্বাধিকারীদের মতে যোগ্য সম্পাদক কাহাকে বলে,

তাহা আমরা জানি না, এবং তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দেশী সম্পাদকদিগকে তাঁহাদের নিকট নিজ নিজ যোগ্যতার প্রমাণ দেখাইয়া আবেদন করিতে বলিয়াছিলেন কি না, তাহাও জানি না।

বোম্বাই খুব বড় ও বাণিজ্যপ্রধান সহর। এইজন্য এখানে দৈনিক কাগজের কাটতি বেশী হয়, এবং বিজ্ঞাপনও খুব পাওয়া যায়। তা ছাড়া, সার্ ফিরোজশাহ্ মেহ্তা প্রমুখ বোম্বাইয়ের কয়েকজন নেতা কয়েক লক্ষ টাকা মূলধন তুলিয়া তবে বোম্বাই ক্রনিক্ল্ বাহির করেন। এইসব কারণে এই কাগজখানির চেহারা দেশী স্বত্বাধিকারীদের অন্যান্য ইংরেজী দৈনিক অপেক্ষা ভাল। কিন্তু ইহার লেখা অন্যান্য সমুদয় দেশী ইংরেজী কাগজের চেয়ে ভাল, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা বাংলা দেশের কোন কাগজ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিব না। অন্যান্য প্রদেশের যে-সব দেশী ইংরেজী কাগজ এখনও চলিতেছে, কিম্বা যেগুলি বন্ধ হইয়া গিয়া থাকিলেও তাহাদের সম্পাদক জীবিত আছেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাগজের নাম করিতে পারি যেগুলি বোম্বাই ক্রনিক্ল্ অপেক্ষা কম যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হয় না। ইংরেজী বর্ণমালা অনুক্রমে নাম করিতেছি। মান্দ্রাজের "হিন্দু," এলাহাবাদের "লীডার," লাহোরের "পাঞ্জাবী," ও "ট্রিবিউন," বোম্বাই ক্রনিক্ল্ অপেক্ষা কম দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয় না; অথচ, আমরা যতদূর জানি এই কাগজগুলির কোনটিরই সম্পাদক মিঃ হর্ণিম্যানের অর্দ্ধেক বেতনও পান না। দেশী ইংরেজী সাপ্তাহিক কাগজের মধ্যে দিল্লীর "কমরেড" (অধুনা লুপ্ত), পুনার "মাহারাট্টা," বোম্বাইয়ের "ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মার," এবং বাঙ্গালোরের "কর্ণাটক" কম যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হয় না। দৈনিক "নিউ ইণ্ডিয়া" ও সাপ্তাহিক "কমনউইলে"র নাম করিতেছি না, কারণ ইহাদের সম্পাদক ভারতবর্ষীয় নহেন।

ইংরেজ সম্পাদকদের একটা সুবিধা আছে। তাঁহারা ভারতবাসীদের সপক্ষে লিখিলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের যতটা স্পষ্টবাদিতা ও যত কড়া কথা সহ্য করেন, দেশী সম্পাদকদের কলম হইতে নিঃসৃত লেখায় ততটা সহ্য করেন না। এইজন্য, এবং শ্বেত চামড়া হইলেই যোগ্যতা বেশী হয় এইরূপ একটা কুসংস্কার অনেক তথাকথিত নেতাদেরও হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া থাকায়, দেশী লোকেও তিন-চারিগুণ বেতন দিয়া যে-রকম যোগ্যতার ইংরেজকে নিযুক্ত করিবেন, তাহার অর্দ্ধেক এক-তৃতীয়াংশ বা সিকি বেতন দিয়াও সমান যোগ্য বা যোগ্যতর দেশী সম্পাদক রাখিবেন না। মিঃ হর্ণিম্যান চটিয়া এই বোম্বাই ক্রনিক্লেরই সম্পাদকতা ত্যাগ করিলে স্বত্বাধিকারীরা ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউসের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডিগবী সাহেবকে মাসিক ১৪০০৲ টাকা বেতনে ঐ কাজ দিতে চান; তাহার পর, কি কারণে জানি না, হর্ণিম্যানকেই আবার তুষ্ট করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। দেশী ভৃত্য হাজার যোগ্য হইলেও, ভৃত্যের কাছে মনিবদের এরূপ পরাজয় হইত না। যাহা হউক, যখন ২৪ দিনের মত মিঃ হর্ণিম্যান কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তখন ক্রনিক্লের স্বত্বাধিকারীরা কি যোগ্যতম দেশী সম্পাদকদিগের মধ্যে একজনকেও নিজ যোগ্যতা প্রমাণ করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন? গবর্ণমেণ্টকে আমরা বলি, যে, "আমাদিগকে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ উচ্চ কাজ দেওয়া হয় না, অথচ আমাদিগকে অযোগ্য বলা হয়, ইহা অতি অন্যায়।" কিন্তু আমাদের নিজের বেলায় আমাদের দেশবাসী অনেক প্রসিদ্ধ লোক শাদা চামড়ার মোহ কাটাইতে পারেন না। মিঃ হর্ণিম্যানের গুণে তাঁহারা মুগ্ধ; এবং তাঁহার যোগ্যতা আছে ইহা আমরাও মানি। কিন্তু তিনি যে স্বার্থের সেবক নহেন, তাহার প্রমাণ কি? যখন তিনি ষ্টেট্স্ম্যানের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন, তখনও ত ঐ কাগজখানা ঠিক্ এখনকারই মত ভারতশত্রু ছিল। যদি বল, যে, তিনি কি করিবেন? তিনি কাগজখানার স্বত্বাধিকারী বা প্রধান সম্পাদক ছিলেন না, সুতরাং তাহার নীতি বদলাইবেন কেমন করিয়া? সত্য, কিন্তু, যে ব্যক্তির হৃদয় গভীর ও অকপটভাবে ভারতপ্রেমিক, সে কি টাকার জন্য ভারতবিদ্বেষী কাগজের চাকরী করিতে পারে? মিঃ হর্ণিম্যান অযোগ্য লোক, এরূপ কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহার মত যোগ্যতা একাধিক দেশী সম্পাদকের নাই, ইহা আমরা অস্বীকার করি।

সংবাদপত্র-পরিচালনের ক্ষেত্রেই যে আমাদের দেশী মনিবেরা শাদা আদমী ও কালা আদমীতে প্রভেদ করেন, তা নয়; শিক্ষালয়েও করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষের কোন কোন কলেজে, যেখানে অধ্যাপক নিয়োগের ভার দেশী কমিটির হাতে আছে, সেখানে, সমান যোগ্য বা যোগ্যতর দেশী অধ্যাপক কম বেতন পান, কিন্তু তদ্রূপ যোগ্য বা কম যোগ্য ইংরেজ অধ্যাপক বেশী বেতন পান। শুধু কি তাই? অক্সফোর্ডের তৃতীয় শ্রেণীর বিএ-পাস্-করা অধ্যাপনায় অনভিজ্ঞ. দেশীলোককে, অধ্যাপনায় অভিজ্ঞ কলিকাতার দুই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর এম্‌এ অপেক্ষা যোগ্য মনে করিয়া ও তাঁহা অপেক্ষা বেশী বেতন দিয়া দেশী কলেজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, ইহাও জানি।

ইহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আলোচনা হইলে আমরা এত কথা লিখিতাম না। ইহাতে পরাধীনতা-জনিত আমাদের একটি জাতীয় দুর্ব্বলতা ও ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া এত কথা লিখিলাম।

রয়্যাল সোসাইটীর প্রথম ভারতীয় সদস্য।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার কেম্ব্রিজ হইতে তারযোগে এই সংবাদ পাইয়াছেন যে মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত এস্ রামানুজম্ বিলাতের রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো বা সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা বিজ্ঞানজগতে অতি উচ্চস্থান; ব্রিটিশসাম্রাজ্যে ইহা অপেক্ষা উচ্চ বৈজ্ঞানিক সম্মান নাই। ভারতবাসীদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মান পাইলেন। একজন ভারতবাসীর এরূপ উচ্চ সম্মান পাওয়া সুখের ও গৌরবের বিষয়। শ্রীযুক্ত রামানুজম্ মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু এফ্‌এ পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় সামান্য বেতনে কেরানীগিরি করিতেন। ঘটনাক্রমে গণিত-বিষয়ে তাঁহার প্রতিভার প্রমাণ প্রকাশিত হয় এবং তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বৃত্তি লইয়া কেম্ব্রিজে গণিত অধ্যয়ন করিতে যান। শীঘ্রই তথায় অধ্যাপক হার্ডী তাঁহাকে "a pure mathematician of the first order" "বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তি" বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাই সকল স্থলে যথার্থ গুণ নির্ণয় করিতে পারে না; আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ত পারেই না। একটা পরীক্ষায় ফেল হইলেই মানুষটা অপদার্থ, ইহা মনে করা ভ্রম। যাঁহারা ফেল হন, তাঁহারা নিরাশ হইয়া কোন কোন স্থলে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করেন। ইহা অপেক্ষা বেকুবী আর কি হইতে পারে? প্রত্যেক মানুষেরই কোন-না-কোন দিকে বিশেষ শক্তি আছে। তাহারই বিকাশ ও প্রয়োগের চেষ্টা করা উচিত। তবে, ফেল হওয়াটাই অসাধারণ প্রতিভার লক্ষণ, এরূপ অদ্ভুত ভ্রমও যেন কেহ না করেন।

কৃতী বাঙালী ছাত্র।

বিক্রমপুর বীরতারা-নিবাসী পণ্ডিত সারদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অক্সফোর্ডের অল্‌সোল্‌স্ কলেজের ফেলো নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এইরূপ ফেলো হইলেন। তিনি ১৯১৬ সালে গ্রীক-লাটীন ভাষায় অক্সফোর্ডের বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং পারদর্শিতা অনুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে জনলক্-বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথমস্থানীয় হইয়াছেন। দেশে থাকিতেও তিনি কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বিএ পরীক্ষায় ঈশানবৃত্তি পাইয়াছিলেন, এবং এম্-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে দ্বিতীয় স্থানীয় হন।

অত্যাচার কে করে?

পুলিশের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে প্রত্যহই নানা কথা লেখা হয়। কিন্তু তাহার অর্থ এ নয় যে, পুলিশের কোন আবশ্যক নাই, পুলিশের দ্বারা কোন ভাল কাজ হয় না, বা পুলিশের সব কর্ম্মচারীই খারাপ। পুলিশের দ্বারা অতি প্রয়োজনীয় কাজ হয়, এবং পুলিশবিভাগে ভাল লোক আছেন। ঐ বিভাগের ও অন্যান্য যে-সব বিভাগের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ শুনা যায় তাহার দেশী কর্ম্মচারীদিগকে একটি কথা আমরা বলিতে চাই। প্রায়ই দেখা যায়, যে, যখন কোন অত্যাচারের কথা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়, তখন দোষটা পড়ে দেশী কর্ম্মচারীদের উপর। ইহা বড় কলঙ্ক ও লজ্জার কথা। ইংরেজরাও

একথা কখন কখন বলিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দেন যে অত্যাচার ত তোমাদের স্বদেশবাসীরাই করে। আমরা ইহা মনে করি না, যে, জুলুম ও নিষ্ঠুর অত্যাচার করা ও ঘুষ লওয়া দেশী লোকদের প্রকৃতিগত, এবং অত্যাচার না করা ও ঘুষ না লওয়া ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত। তাহা হইলে, ইউরোপে ভীষণ অত্যাচারের ও উৎকোচ গ্রহণের কলঙ্কে সমুদয় ইউরোপীয় জাতির বহু লোক কলঙ্কিত হইত না। এবং ভারতবর্ষেও ইংরেজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হইলেও, অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচার ও ঘুষ লওয়া প্রমাণিত হইত না। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীই এ-রকম যে এখানে রাজকর্ম্মচারীদের পক্ষে ধরা না পড়িয়া অন্যায় কাজ করা সহজ। ইহাও ঠিক যে কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী কোন বেআইনী কাজ বা জুলুম করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে বা কাহারও উপর ঝাল ঝাড়িতে চাহিলে অনেক স্থলে এইরূপ হীন কাজ দেশীলোকদের দ্বারা সহজেই করাইয়া লইতে পারে। এরূপ জঘন্যভাবে উদর পূর্ত্তি করিবার লোকের অভাব যে আমাদের দেশে হয় না, ইহাই লজ্জার ও শোকের বিষয়। অবশ্য দুষ্টপ্রকৃতির দেশী লোকও বিস্তর আছে, যাহারা আপনা হইতেই পদোন্নতির জন্য ও অর্থলালসা-বশতঃ অন্যায় কাজ করে। কারণ যাহাই হউক, অবস্থাটা বড়ই লজ্জাকর। ইহা নিশ্চিত, কোন ইংরেজ কর্ম্মচারী যতই দুষ্ট অসাধু জুলুমবাজ হউক, দেশী শৃগাল না হইলে কখনই তাহার কাজ উদ্ধার হইতে পারে না। আমাদের হীনতা ও অপমান এইখানে যে এরূপ শৃগালের অভাব কখনও হয় না।

সমাজসেবা-প্রদর্শনী।

বর্ত্তমান মার্চ্চমাসের ২৬শে হইতে ৩০শে মার্চ্চ কলিকাতার ওভার্টুন হলে সমাজ-সেবা-প্রদর্শনী হইবে। বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্যোগে এই কল্যাণকর প্রদর্শনীর আয়োজন হইতেছে। প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্যের উন্নতি, আর্থিক উন্নতি, শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি, এবং পানদোষাদি নিবারণের চেষ্টা, এই চারিটি বিভাগ থাকিবে। মানচিত্র, ছবি, সংখ্যাসূচিত লৌকিক তত্ত্ব (statistics), প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া এবং ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা এইসব বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে, এবং কি কি উপায়ে উন্নতি হইতে পারে তাহাও জ্ঞাপন করা হইবে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও বিদেশে কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে ও কিরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাও জানান হইবে। যাঁহারা সমাজহিতৈষী তাঁহারা প্রদর্শনী হইতে দেখিতে পাইবেন, যে, তাঁহাদের শক্তিসামর্থ্য যে-প্রকারের ও যতটুকুই হউক, তাহা মানবের হিতার্থ নিযুক্ত করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও উপায় আছে।

রোলট কমিটি।

পাঠকগণ অবগত আছেন, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইবার জন্য ষড়যন্ত্র-ও-চক্রান্তকারী দল আছে কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, এবং যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে তাহা বিনষ্ট করিবার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের যে-সব অসুবিধা ও বাধা আছে তাহা দূর করিবার জন্য কি উপায় করা যায় তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। বিলাতের হাইকোর্টের জজ রোলট (Rowlatt) সাহেব উহার সভাপতি। শুনা যাইতেছে (১০ই মার্চ্চ, ১৯১৮, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩২৪) এই কমিটির অধিকাংশ সভ্য, ১৯০৯ সালে মিশর দেশে সন্দেহভাজনদিগের বিরুদ্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়, স্থায়ীভাবে তদ্রূপ আইন ভারতবর্ষে চালাইবার পরামর্শ দিবেন। শুনিয়াছি, এই মিশরীয় সন্দেহভাজনদিগের দণ্ডবিধায়ক আইন (The Egyptian Law of Suspects of 1909) অনুসারে সরকারী কর্ম্মচারী এবং বেসরকারী "নেটিব" বাছিয়া ৬০।৭০।৮০ জন লোকের একটা ফর্দ্দ করা থাকে (যেমন জুরী বা আসেসরদের তালিকা)। তাহা হইতে, সুর্ত্তি করিয়া চারিজন বাছিয়া লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে যে কোন সন্দেহভাজন লোকের বিরুদ্ধে কাগজপত্র উপস্থিত করা হয়। অনুসারে তাঁহারা তাহাকে অন্তরীন করেন অথবা ছাড়িয়া দেন।

এই গুজব সত্য হইলে খুব ভয়ের কারণ। কেননা, খুব ভাল লোক বিচারক হইলেও, অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং ও উকীল ব্যারিষ্টার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না

পাইলে কেবলমাত্র পুলিসের পেশ্-করা কাগজপত্র হইতে কথনই সুবিচার হইতে পারে না। মিশর দেশের মত আইন হইলে, দেশে এখন যেমন নানা শহরে গ্রামে ও পরিবারে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা স্থায়ী হইবে। কারণ বেসরকারী জোহুকুম লোকের অভাব এদেশে মোটেই নাই। এ বিষয়ে সর্ব্বত্র খুব আন্দোলন হওয়া উচিত।

হাজারীবাগ জেলে প্রায়োপবেশন।

হাজারীবাগ জেলে আবদ্ধ ২৯ জন রাজবন্দী (state prisoner) প্রায়োপবেশন করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া তাহা সত্য কি না নির্ণয় করিবার জন্য আমরা উহা মার্চ্চমাসের মডার্ণ রিভিউএ প্রকাশ করি। তৎপরে তাহা অমৃতবাজার-পত্রিকাতেও উদ্ধৃত হয়। ঐ ২৯ জন বন্দী সকলেই বাঙালী। উহাদের আত্মীয়রা হাজারীবাগ জেলে টেলিগ্রাফ করিয়াও কোন খবর পান নাই, ৯ই মার্চ্চের অমৃতবাজারে এইরূপ সংবাদ দেখিলাম। গবর্ণমেণ্ট তথ্য নির্ণয় করিয়া অন্ততঃ বন্দীদের পরিবারের লোকদিগকে জানাইলে ভাল হয়। যদিও আমাদের মত এই, যে, বন্দীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহারা কি কারণে প্রায়োপবেশনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাদের অভাব অভিযোগে কান দেওয়া হইতেছে কি না, তাহারা উপবাস করিয়াই আছে, না খাইতে আরম্ভ করিয়াছে,—এই সমস্ত সংবাদ সর্ব্বসাধারণের জানিতে ঔৎসুক্য এবং জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

কলিকাতার স্বাস্থ্য।

১৯১৬ সালে কলিকাতায় হাজারকরা ২৪.৭ জন মানুষের মৃত্যু হইয়াছিল; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর-সকলের মধ্যে ন্যূনতম মৃত্যুর হার ছিল ১৯১১ সালে ২৭.২। ১৯১৭ সালে মৃত্যুর হার ১৯১৬ অপেক্ষাও কম হইয়াছিল,—হাজারে ২৩.৮ মাত্র। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ-সকলে রোগ জন্মিবার কারণ বেশী আছে; কেননা, এখানে মশা মাছি কৃমি ও রোগজনক অণুজীবের প্রাচুর্য্য অধিক, এবং জিনিষ পচে, ক্ষতে পুঁজ হয়, শীঘ্র। সকল অবস্থার লোকদের চেয়ে দরিদ্রদের পক্ষে স্বাস্থ্য রক্ষা করাও কঠিন। ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে অশিক্ষিত লোক অপেক্ষা শিক্ষিত লোকেরা স্বাস্থ্য রক্ষায় অধিক সমর্থ। এইসব কারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও নিরক্ষর কলিকাতা শহরের লোকদের স্বাস্থ্য শীতপ্রধান বিলাতের অপেক্ষাকৃত ধনী ও শিক্ষিত নগরবাসীদের অপেক্ষা মন্দ হইবারই কথা। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে কলিকাতার স্বাস্থ্য বিলাতের অনেক শহর অপেক্ষা ভাল। কয়েকটি শহরের হাজারকরা মৃত্যুসংখ্যা দিতেছি। লণ্ডন ২৪.৮, বার্মিংহাম ২৫.৮, ব্রিষ্টল ২৭.৩, চেষ্টারফীল্ড ২৭.১, ডাড্লী ২৭.৬৯, এড্মণ্টন ২৭.২, গেট্সহেড্ ৩০.১২, গ্রেট-গ্রিমস্বী ২৭.৩৮, হার্টল্পুল ২৫.৮, হারউইচ্ ২৫.১, হেডন ২৭.৭, হাল ২৪.৮, ম্যাঞ্চেষ্টার ২৫.৬, ম্যান্সফীল্ড ২৮.৬, মিড্ল্স্ব্রো ৩০.৮৭, লিভারপুল ২৭.৯, সেণ্ট হেলেন্স ৩২.১। গ্রীষ্মপ্রধান এবং দরিদ্র ও অশিক্ষিত দেশের নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কলিকাতার স্বাস্থ্য বিলাতের অনেক শহর অপেক্ষা ভাল হইবার কারণ কি? কলিকাতার স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ডাক্তার ক্রেক্কে অবশ্য প্রশংসা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে বলা যায় না, যে, বিলাতের রাজধানী লণ্ডন এবং অন্যান্য শহরের প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী তাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট দরের লোক। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারেরা স্বাস্থ্যকর্ম্মচারীর সহযোগিতা না করিলে তিনি ভাল ফল দেখাইতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহারাও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু কলিকাতার অধিকাংশ লোকে মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ম যদি প্রকাশ্যে বা গোপনে ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল হইত না। একথা এজন্য বলিতেছি না, যে, আমরা বাস্তবিক সবাই স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ে তৎপর। ইহা বলিবার এই উদ্দেশ্য যে ভারতপ্রবাসী সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরা কথন কথন বলিয়া থাকেন, যে, এ দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার যে-সব চেষ্টা করেন, তাহা বহু পরিমাণে ব্যর্থ হয় এইজন্য যে দেশের লোকেরা এইসব চেষ্টার সহযোগিতা ত করেই না বরং বাধা দেয়, এবং এইজন্য এ দেশের স্বাস্থ্য খারাপ। প্রকৃত কথা এরূপ হইলে, কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতিও সম্ভব হইত না। কোন দেশের লোকই তাহাদের মঙ্গলের জন্যও তাহাদের স্বাধীনতায় কেহ হাত দেয় ইহা চায় না; আমাদের দেশের লোকেরাই যে বিশেষ করিয়া এইরূপ তাহা নহে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক হিন্দু ও

মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অতিশয় অপরিষ্কার বিস্তর লোক আছে। তাহাদের শরীর, পরিচ্ছদ, গৃহ, গৃহের নিকটবর্ত্তী জায়গা ও রাস্তাঘাট অপরিষ্কার। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম আচার গার্হস্থ্য ও সামাজিক নিয়ম এরূপ যে তাহাতে মানুষকে দেহ ও বস্ত্র এবং কিয়ৎপরিমাণে গৃহ ও আহার্য্য সম্বন্ধে শুচিতা রক্ষা করিতে অভ্যস্ত করিয়াছে। আচারনিষ্ঠতার জন্য এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া আমাদের দেশের লোকেরা শীত-প্রধান দেশ অপেক্ষা স্নান ও জল ব্যবহার অধিক করে। মদ্যপান আমাদের দেশে ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং বহু উচ্চশ্রেণীর লোকদের সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া স্বাস্থ্যনাশের একটা প্রধান কারণ আমাদের দেশে প্রবলভাবে বিদ্যমান নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আবকারী-নীতি পরিবর্ত্তিত না হইলে বেশী দিন এ বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠতা রাখিতে হইবে না। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত আচার মানুষকে নানা বিষয়ে সংযত হইতে শিক্ষা দিয়াছে। ইহাও স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, যে, আমরা আহার্য্য শরীর বস্ত্র গৃহ রাস্তাঘাট প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করি না।

আমাদের এই প্রসঙ্গে প্রধান বক্তব্য এই যে আমরা কলিকাতার স্বাস্থ্য হইতে যেন ইহাই দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিতে শিখি, যে, গ্রীষ্মপ্রধান হইলেও আমাদের দেশকে খুব স্বাস্থ্যকর করা যাইতে পারে। সে বিষয়ে দেশের লোক, মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট ও লোক্যাল বোর্ড, গ্রাম্য ইউনিয়ন, এবং গবর্ণমেণ্টকে খুব বেশী পরিমাণে মনোযোগী হইতে হইবে।

"মাতৃহন্তা নগর"।

কলিকাতাকে অধ্যাপক গেডিস্ "মাতৃহন্তা নগর" বলিয়াছেন। কারণ, সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যে মৃত্যুর হার কম; কিন্তু কলিকাতায় নারীদের মৃত্যুর হার পুরুষদের হারের দেড়গুণ! ১৯১৬ সালে কলিকাতায় পুরুষদের মধ্যে হাজারে ২৪·১ জন মরিয়াছিল, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হাজারে ৩৭·১ জন মরিয়াছিল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। স্ত্রীলোকেরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনের (surroundings) মধ্যে দিনরাত অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, বাহিরের মুক্ত বিশুদ্ধ বাতাস পায় না, অঙ্গ সঞ্চালন যথেষ্ট করিতে পায় না, এবং শরীরের অপূর্ণ-অবস্থায় অল্পবয়সে সন্তান প্রসব করিতে বাধ্য হয়; সূতিকাগৃহের ব্যবস্থা এবং নারীদের রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থাও ভাল নয়। স্বাস্থ্য-নাশের ও ব্যাধির আর যে-সব কারণ আছে,—যেমন ম্যালেরিয়া, যথেষ্ট পুষ্টিকর বিশুদ্ধ টাটকা খাদ্যের অভাব, ইত্যাদি—সে সমস্তই পুরুষ ও নারী উভয়েরই স্বাস্থ্যের সমভাবে হানি করে; বরং বলিতে গেলে, খাদ্যসম্বন্ধে অনেক স্থলে নারীরা প্রধানতঃ পুরুষদের ভুক্তাবশিষ্ট মাত্র পায়। অন্তঃপুরে বাস, অকালে সন্তানের জননী হওয়া ও নিজে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সন্তানকে স্তন্যদান করিতে বাধ্য হওয়া,—প্রধানতঃ এইসব বিষয়েই পুরুষ ও নারীতে প্রভেদ। সুতরাং নারীর অত্যধিক মৃত্যুর প্রধান কারণ যে এই গুলি তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কলিকাতা যে পরিমাণে মাতৃহন্তা, বাংলাদেশের অন্যসব জায়গা সেপরিমাণে মাতৃহন্তা না হইলেও, আমাদের সমগ্র দেশটাই যে মাতৃহত্যার পাতকগ্রস্ত তাহা সত্যদর্শী ও সত্যবাদী লোকমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

হিন্দু ও মুসলমানের সখ্য।

হিন্দু ও মুসলমানের সখ্য ব্যতিরেকে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি ত হইতেই পারে না, শিক্ষার উন্নতি, আর্থিক উন্নতি, দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিও হইতে পারে না। আমরা প্রতি বৎসরই কোন-না-কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্য করিয়া মারামারি কাটাকাটি করি, এবং তজ্জন্য যে আমরা জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইতে অনধিকারী, একথা ইংরেজরা আমাদিগকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছে। কিন্তু যদি হিন্দুমুসলমান ও অন্যান্য সমুদয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ব্যতিরেকেও আমাদের দেশ স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লাভ ও রক্ষা করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলেও সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর ও ভারত-প্রবাসীর মধ্যে বন্ধুত্ব অনাবশ্যক হইত না। মানুষ যে সামাজিক জীব সামাজিকতাতেই তাহার সার্থকতা। ধন, বিদ্যা, শক্তি লইয়া কি হইবে, যদি আমরা ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর লোককে প্রীতি করিতে ও তাহাদের প্রীতি পাইতে না পারি? এবং আমাদের প্রীতির ক্ষেত্র ক্রমাগত বিস্তৃততর না হইতে থাকিলে, মানবজীবনের

যে চরমলক্ষ্য ঈশ্বরপ্রীতি, তাহার সান্নিধ্যে বা তাহাতেই বা আমরা কেমন করিয়া অগ্রসর হইব ?

দেশের অর্দ্ধেক লোক নারী। হিন্দু ও মুসলমান নারীদের দেখাসাক্ষাৎ ও মিলনের ক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে। হিন্দুনারীর সঙ্গে হিন্দুনারীর মিলনের, মুসলমান নারীর সহিত মুসলমান নারীর মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্রও নাই,—বিশেষতঃ বড় বড় শহরে। হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যেও কেবল মাত্র সামাজিক সম্মিলন কথাবার্ত্তারও কোন আয়োজন নাই। ইহার উপায় করা একান্ত কর্ত্তব্য। এইপ্রকার মিলন-মজলিস গৃহে গৃহে পাড়ায় পাড়ায় হইতে পারে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা এইরূপ প্রশ্নের আলোচনা ও সমাধানের জন্য এ-সকল মজলিস্ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। এগুলি কেবল প্রতিবেশীর আলাপ পরিচয় ও সদ্ভাব বৃদ্ধির জায়গা হইবে।

বাল্যবন্ধুত্বের মত বন্ধুত্ব আর নাই। এখন হিন্দুমুসলমানের বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সব পৃথক্ হইতে যাইতেছে। যাহাকে জাতীয় শিক্ষণব্যবস্থা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়, তাহাও কার্য্যতঃ হিন্দুশিক্ষণ-ব্যবস্থা ও হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা,—যদিও জাতীয় বলিলে একমাত্র হিন্দু, বা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান বা শিখ বা অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুমোদিত কিছু বুঝায় না, কারণ ইঁহারা কেহই ভারতবর্ষের একমাত্র অধিবাসী নহেন; ভারতীয় জাতি ইঁহাদের সকলের সমষ্টি। শিক্ষণ-ব্যবস্থা এইরূপ স্বতন্ত্র হইলে আগে যতটা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বালকদের একত্র বিদ্যালাভ-হেতু বন্ধুত্ব জন্মিত, ভবিষ্যতে তাহা হইবে না। ইহার প্রতীকার হওয়া কর্ত্তব্য। একই দেশে বাস করিয়া বিদেশীর মত পরস্পরের সহিত অপরিচিত থাকা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।

যেখানে ধর্ম্মে বাধে না, সেইরূপ পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপে হিন্দুমুসলমান পুরুষ নারীদের নিজ নিজ নানা সম্প্রদায়ের বন্ধুদের আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য।

পাটের দাম।

লবণের দাম খুব বাড়িয়াছে অতএব তাহার দামের ঊর্দ্ধসীমা নির্দ্দেশ করিয়া দাও, ধুতি সাড়ীর দাম খুব চড়া হইয়াছে অতএব তাহার একটা নিরিখ হউক, এইরূপ দাবী খবরের কাগজে ও সভাসমিতির আবেদনে করা হইতেছে; কিন্তু যে-সব চাষী পাট উৎপন্ন করে, তাহারা যে পাটের ন্যায্য দাম পাইতেছে না, সেদিকে গবর্ণমেণ্টের ও নেতৃবর্গের দৃষ্টি পড়িতেছে না। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের শত্রু জার্ম্মেনী অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ পূর্ব্বে পাট খুব কিনিত; এখন তাহারা আর ক্রেতা নাই। আমেরিকা প্রভৃতি মিত্রদেশ এবং নিরপেক্ষ দেশ-সকলেও যথেষ্ট জাহাজের অভাবে পাট পূর্ব্বের মত চালান হয় না। এখন কার্য্যতঃ ব্রিটিশ বণিকেরাই ইহার একমাত্র ক্রেতা। এইজন্য তাহারা যে দর দেয়, কার্য্যতঃ সেই দরেই চাষীদিগকে পাট বেচিতে হইতেছে, এবং এই দর সস্তা। অথচ ব্রিটিশ পাটব্যবসায়ীরা যুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ লাভ করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ করিতেছে, কিন্তু চাষীরা বিপন্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় নিশ্চয়ই পাটের একটা ন্যায্য দাম গবর্ণমেণ্টের বাঁধিয়া দেওয়া উচিত, যাহা অপেক্ষা কম দামে উহা বিক্রী হইবে না। ইহাতে যদি বণিকেরা একজোট হইয়া বাধা দেয়, গবর্ণমেণ্টের উচিত নিজে ঐ নির্দ্ধারিত মূল্যে সব পাট কিনিয়া লওয়া। ব্যবসাদারেরা উহা কিনিতে বাধ্য হইবে। জেদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা আপনাদের ব্যবসা মাটী করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে পাটের বণিক ও শাসনকর্ত্তা একই বিদেশী জাতি; সুতরাং দেশী চাষীর ন্যায্য পাওনা ধ্রুব করিবার জন্য বিদেশী বণিকের লাভের আতিশয্য গবর্ণমেণ্ট কমাইবেন, এরূপ আশা নাই। কিন্তু জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হইলে ইহা করা হইত। এই যুদ্ধের সময় ত ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এত বিব্রত; কিন্তু তাঁহারা আইন করিয়া ব্রিটিশ দ্বীপের চাষীদের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সেখানে তাঁহারা এই আইন করিয়া দিয়াছেন যে, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মজুরগণকে ন্যূনকল্পে আইননির্দ্দিষ্ট সাপ্তাহিক মজুরী দিতে হইবে, কেহ কম দিলে দণ্ডিত হইবেন; এবং কৃষিদ্বারা উৎপন্ন সমুদয়

দ্রব্যেরও ন্যূনতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার কম মূল্যে কেহ জিনিষ পায় না।

জেলা-বোর্ডের বেসরকারী সভাপতি।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি জেলা-বোর্ডের বেসরকারী সভাপতি মনোনয়ন মঞ্জুর করিয়াছেন। যশোরের রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সভাপতি হইয়া পানীয় জলের কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যশোর জেলার লোকদিগকে তাঁহাকে জানাইতে বলিয়াছেন যে কোন্ কোন্ গ্রামে পানীয় জলের সুব্যবস্থা নাই। তিনি জেলাবোর্ডের ব্যয়ে এই অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। যশোর জেলার ধনী লোকদেরও এ বিষয়ে তাঁহার সহায় হওয়া উচিত। সকল জেলা-বোর্ডের সভাপতি যদি বেসরকারী লোক হন, এবং তাঁহারা যদি স্থানীয় লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে সমুদয় গ্রামের উন্নতি করিতে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে খুব সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

'বড়োদা' ও মহীশূর রাজ্যে একএকটি গ্রাম আদর্শ গ্রামে পরিণত হইয়াছে। মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীর পাঠকগণ এই আদর্শের সহিত পরিচিত। বাংলাদেশে যে জেলা-নায়ক অন্ততঃ একটি গ্রামকে আদর্শস্থানীয় করিতে পারিবেন, তিনি দেশের পরম কল্যাণ করিবেন, ও কীর্ত্তিমান পুরুষ বলিয়া যশস্বী হইবেন।

আসামে পার্ব্বত্যজাতির সহিত যুদ্ধ।

আসাম গবর্ণমেণ্টের একটি জ্ঞাপনপত্র (Communique) হইতে জানা যায় যে আসামের কোন কোন পার্ব্বত্যজাতির মধ্য হইতে ফ্রান্সে যোদ্ধাদের পশ্চাতে কুলির কাজ করিবার জন্য শ্রামিক দল সংগ্রহ করিবার যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহাতে তাহারা কষ্ট দেয় (gave trouble)। কিরূপ কষ্ট দেয়, তাহা লেখা নাই। সম্ভবতঃ তাহারা বিদেশে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। যাহা হউক, "কষ্ট দেওয়ায়" আসাম ও বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া তাহাদের আরণ্য ও পার্ব্বত্য গ্রামগুলি জ্বালাইয়া দিতেছেন, শস্যাদি সম্পত্তি নষ্ট করিতেছেন। এক কথায় তাহাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, এবং ইউরোপের সভ্যতা-অনুমোদিত রীতিতে যুদ্ধ হইতেছে। অসভ্য লোকেরাও লুকাইয়া লুকাইয়া গুলি চালাইতেছে। এরূপ খণ্ডযুদ্ধ তাহারাই আরম্ভ করিয়াছিল কি না জ্ঞাপনপত্রে লেখা নাই। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রকাশ করা উচিত, এবং অসভ্য লোকদের উপরও কোন-প্রকার অন্যায় নিষ্ঠুরতা হইয়া থাকিলে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, ভারতে দেশী লোকদের সম্বন্ধে কন্স্ক্রিপশুন বা অবশ্যযোদ্ধা হইবার আইন খাটান হয় নাই। সুতরাং অসভ্য লোকদিগকেও যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রামিক রূপে যাইতে বাধ্য করা আইনবিরুদ্ধ। গ্রাম শস্যক্ষেত্র গোলা আদি জ্বালাইয়া দেওয়াকেও আমরা সভ্যতা বলিয়া মনে করি না। নারী শিশু বৃদ্ধ প্রভৃতি অযোদ্ধাদের উপর উপদ্রব বা তাঁহাদের কোন-প্রকার অসুবিধা কেবলমাত্র জার্ম্মেনরা করিলেই নিন্দার বিষয় হয়।

সমগ্র ভারতের হিন্দু কন্ফারেন্স।

হিন্দুসমাজের নেতাদের দৃষ্টি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া জাভা, বালী ও সুমাত্রা দ্বীপের হিন্দুদের উপর পড়িয়াছে। ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপানের হিন্দুদের কথাও তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা প্রয়াগের হিন্দু কন্ফারেন্সে এইসকল দেশের ও দ্বীপের এবং অন্যান্য দ্বীপের ও উপনিবেশের হিন্দুদিগকে সৌভ্রাত্র জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং হিন্দু সাধু ও প্রচারকদিগকে তাঁহাদের মধ্যে গিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এতৎদ্বারা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে যে সমুদ্র পার হইয়া গেলেও মানুষ হিন্দু থাকে, এবং সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নহে। কাশিমবাজারের মহারাজা কন্ফারেন্সের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার ইংরেজী অভিভাষণে শূদ্র ও "অস্পৃশ্য" জাতিদের অবস্থার উন্নতি করা যে আবশ্যক তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন, এবং বলেন যে বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথা প্রাচীন বর্ণভেদপ্রথার হাস্যকর ছদ্মবেশ (travesty)। কন্ফারেন্সের দুটি প্রস্তাবে সমাজকে অসহায়া বিধবাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। তাঁহারা কি-প্রকারে নিজেই নিজের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিলে ভাল হইত। আত্মরক্ষায়

সমর্থ হইলেই মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। কন্‌ফারেন্স একটি প্রস্তাবে, অনেক হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করায় হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসে উদ্বেগ ও আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সকল হিন্দুকে হিন্দুদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ নিবারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের যে-সব জাতির মধ্যে অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচারকেরা নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করেন, কন্‌ফারেন্স তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সমুদয় হিন্দু সাধু, প্রচারক ও বক্তাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে অনুন্নত ও উপেক্ষিত জাতিসকলের অবস্থার উন্নতি করিতে বলিয়াছেন। ইহা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুনেতারা মনে রাখিবেন, যে "নিম্ন"শ্রেণীর হিন্দুরা খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান হইলে তখন আর খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদের দ্বারা অনাচরণীয়, অপাংক্তেয় বা অস্পৃশ্য বিবেচিত হয় না। হিন্দুসমাজে থাকিলেও তাহাদের আত্মসম্মান এইরূপে হিন্দু নেতারাও বজায় রাখিতে যদি পারেন ও যদি তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইতে পারে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের একমাত্র কারণ নহে। বাংলাদেশে যে-সব জেলা হিন্দুপ্রধান সেইগুলিই বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত। ম্যালেরিয়া দূরীকরণে মন দিতে হইবে। বাল্যমাতৃত্ব হিন্দুর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে না বাড়িবার আর একটি কারণ। যে বয়স হইতে যে বয়স পর্য্যন্ত নারীরা সন্তানের মাতা হয়েন, সেই বয়সের খুব বেশীসংখ্যক নারী হিন্দুসমাজে বৈধব্যে কালযাপন করেন। ইহাও হিন্দুর সংখ্যা যথেষ্ট না বাড়িবার আর-একটি কারণ। আর একটি কারণ, হিন্দুর পৈত্রিক গ্রাম ও ভিটার উপর অতিরিক্ত আসক্তি। মুসলমান নূতন জায়গায়, নূতন আবাদে, নূতন চরে যত সহজে গিয়া খাদ্য সংগ্রহ করেন, হিন্দু তত শীঘ্র তত সহজে করেন না।

গবর্ণমেন্টের আবকারী নীতি।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নরসিংহেশ্বর শর্ম্মা এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে গবর্ণমেণ্ট মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিবেন, ইহা নিজ আবকারী নীতি বলিয়া ঘোষণা করুন। প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। মাদক দ্রব্যের কাটতি কিরূপ ভয়ঙ্কর বাড়িতেছে তাহা এই বলিলেই বুঝা যাইবে যে গবর্ণমেণ্টের আবকারী রাজস্ব ১৮৭৪-৫ সালে ২৩১১৫০০০৲ টাকা ছিল, কিন্তু বাড়িয়া ১৯১৫-১৬ সালে ১২৭৪৭০৩০০৲ টাকা হইয়াছিল। অর্থাৎ চল্লিশ বৎসরে পাঁচ গুণেরও অধিক হইয়াছে।

প্রবাসী-নৃত্যগোপাল-পুরস্কার।

প্রবাসী-নৃত্যগোপাল-পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় আমরা অতি অল্পসংখ্যক প্রবন্ধই পাইয়াছিলাম; এবং দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সেগুলির মধ্যে একটিও পুরস্কার-লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

চিত্রপরিচয়

মুখপাতের রঙিন ছবিতে চিত্রকর দেখাইয়াছেন যে পুরোহিত যজমানের বাড়ীতে গিয়া নৈবেদ্য উত্তরীয়-প্রান্তে বাঁধিতেই ব্যস্ত। এই চিত্রে পুরোহিতের ব্যগ্র গৃধ্নুতা ও যজমান বাড়ীর মেয়েদের সবিস্ময় কৌতূহল পরিস্ফুট হইয়াছে দেখা যায়।

'নাড়ায়ন' চিত্রে, চিত্রকর দেখাইয়াছেন বালখিল্য লোকেরা বিরাট মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষদের প্রতিষ্ঠা-ভূমি হইতে নাড়াইবার চেষ্টায় কিরূপে হাস্যাস্পদ হয় ও নিজেরাই ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে; ছদ্মবেশী বালখিল্য বাঙালীটি পল্কা সুতা দিয়া বিরাট মূর্ত্তিকে নাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, আর তাকে পিছন হইতে সাহায্য করিতেছে ও বাহবা দিতেছে পাখা-ওঠা পিপড়ে আর গুবরে-পোকা!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়

(সাল-তামামি নিকাশ-আখেরী)

১। ছবি।

অদ্ভুত লোক—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক ছবির বই। আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যা-কিছু অদ্ভুত অসামঞ্জস্য আছে তাহারই প্রতি বিদ্রূপ। ১৬ খানি নানান রঙে ছাপা ছবি। মূল্য চার টাকা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

বারোজন বাঙ্গালী—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত বারজন [illegible] ও সকল সমাজের বাঙ্গালীর ছবি। দাম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়গণের নিজ নিজ স্বাক্ষর-সম্বলিত ছবি একত্রে পুস্তকাকারে বহুমূল্য আর্ট পেপারে ইউ, রায় এণ্ড সন্স কর্তৃক ছাপা হইয়াছে। ছবিগুলি ফটোগ্রাফ দেখিয়া আঁকা নয়, চিত্রিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে সম্মুখে বসাইয়া আঁকা, সেইজন্য ছবিগুলিতে প্রত্যেক মনীষীর বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যার জন উড্রফ এই বই-খানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক ছবির সহিত সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত আছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—রায়, এম, সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

২। কাব্য।

বৌদ্ধ গান ও দোহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। ডবল ক্রাউন অষ্টাংশিত ২১০+৬৷৷/০ পৃষ্ঠা। মূল্য সাধারণ পক্ষে ৩৲, শাখা সভার সদস্যপক্ষে ২৷৷০, পরিষদের সদস্যপক্ষে ২৲। এই পুস্তকে হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষার নমুনা কতকগুলি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। মূল্য মূল পরিষদের সদস্যপক্ষে ২৲, শাখা পরিষদের সদস্যপক্ষে ২।০, সাধারণ পক্ষে ২৷৷০। চণ্ডীদাসের সময়ে বাংলা ভাষার রূপ ও তাহার ক্রম-পরিবর্ত্তন এই পুস্তক হইতে বুঝিতে পারা যায়। পুস্তকখানি পাণ্ডিত্য সহকারে সুসম্পাদিত। বাংলা-শব্দতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসুর অবশ্যপাঠ্য।

সারদা-মঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী—৺মুক্তারাম সেন বিরচিত। মুন্সি শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। মূল্য সাধারণের পক্ষে ৸০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ৷৷/০, সদস্যপক্ষে ৷৷০। প্রাচীন বাংলা কবিতার বই।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—৺বাসুদেব ঘোষ-বিরচিত। মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য সাধারণপক্ষে ।৵০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ।৵০, পরিষদের সদস্যপক্ষে ।০, প্রাচীন বাংলা কবিতার বই।

জ্ঞান-সাগর—আলী রাজা ওরফে কানু ফকির প্রণীত। মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য সাধারণপক্ষে ৷৷০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ।৵০। সদস্যপক্ষে ।৵০। প্রাচীন বাংলা কবিতার বই।

হসন্তিকা—শ্রীনবকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা ফুৎকৃত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য বত্রিশ পয়সা। ব্যঙ্গ-ও-হাস্যরসপ্রধান কবিতার বই।

স্বর্গে ও মর্ত্তে—শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। সদরঘাট চট্টগ্রাম। মূল্য ১৲।

স্তবক ও কোরক—শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যা-বিনোদ বিরচিত। প্রকাশক গুণালঙ্কার লাইব্রেরী ১নং বৃন্দিষ্ট টেম্পল লেন কলিকাতা। মূল্য ৸০।

পুষ্পাঞ্জলী—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়। প্রকাশক গুপ্ত প্রেস। মূল্য ৸০।

পূজার ফুল—শ্রীমতী রত্নমালা দেবী প্রণীত। ৺কাশীধাম; ৩৬।৩ জঙ্গমবাড়ী, বিশ্বনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

বেণু—শ্রীননীগোপাল ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, ৩০ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন ষ্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

পুষ্পাঞ্জলী—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

মহরম-চিত্র—ফজলুর রহিম চৌধুরী বি-এ প্রণীত। মূল্য বারো আনা মাত্র। প্রকাশক—মখ্‌দুমি লাইব্রেরী, ৫।এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আরাম—শ্রীরসময় লাহা। গুরুদাস লাইব্রেরী।

আমোদ—শ্রীরসময় লাহা। মূল্য ৸০ আনা।

খেলার গান ও কবিতা—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত আবৃত্তি ও অভিনয়ের উপযুক্ত বাংলা ও ইংরেজী পদ্য-গদ্যের বই। প্রকাশক গ্রেওস কোম্পানি, ৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০ আনা।

বঙ্গানন্দ—৯২৩ পৃষ্ঠায় ২৪ সর্গের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্য। শ্রীমতিলাল দত্ত, ত্রিলোচনপুর, যশোহর। মূল্য ৩৲ টাকা।

বেণুর বীণ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ। মূল্য ৷৷০ আনা। প্রকাশক শ্রীসত্যচরণ নাথ, নৈহাটি-শ্রীরামপুর (খুলনা)। নবীন লেখক ছন্দজ্ঞান ও কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

মন্দাকিনী—(গীতিকাব্য) শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত। সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

অর্ঘ্য—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়। প্রকাশক—গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা। মূল্য ৸০ বারো আনা মাত্র।

হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা—মহাকাব্য। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত, প্রথম সংস্করণ। জিলা ঢাকা, রায়পুরা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বিকাশ—শ্রীরজনীকান্ত সেন। প্রকাশক—কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩ কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

রাকা—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী। নববিভাকর প্রেস, ৯১।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲ বাঁধাই—১।০।

মা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গান। মূল্য ৷৷০ আনা।

রাজার আহ্বান—শ্রীরমণীপ্রসাদ গুহ নিয়োগী, উলুবেড়ে। কবিতায় বাঙালীকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে আহ্বান।

সমর-সঙ্গীত—রচয়িতা শ্রীকালিদাস দত্ত, সীতার, ঘাটাল। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

ঋষির গান—সুধীর। পাঁচপয়সা।

সোঽহম্ গান—সুধীর। পাঁচপয়সা।

জোয়ার—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন। প্রকাশক শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৬৮।৩ ওল্ড্ বালিগঞ্জ ফার্ষ্ট লেন। আট আনা। যে সব গান লেখকের রচিত ও মুকুন্দ-দাসের যাত্রায় অভিনীত

'অঞ্জলি' নাটকে আছে ও যে-সব গান লেখক কথকতায় গাহিয়া থাকেন তাহাদেরই সংগ্রহ।

৩। উপন্যাস ও গল্প।

চরিত্রহীন—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৫৬৬ পৃঃ। মূল্য ৩৷৹ টাকা। প্রকাশক রায় এম্ সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

চন্দ্রনাথ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দাম ৷৹ আনা। প্রকাশক রায় এম্ সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স।

নিষ্কৃতি—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দাম ৷৹ আনা। প্রকাশক রায় এম্ সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স।

স্রোতের ফুল—২৲। পরগাছা—১৷০। যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী—৸০। চাঁদমালা—১৲—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

আপেল—শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। ৩৫।৩২ পদ্মপুকুর রোড। দাম এক টাকা। ছোট গল্পের বই।

তরুতীর্থ—শ্রীহেমনলিনী দেবী। গুরুদাস লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম ১৷০। ছোট গল্পের বই।

সেখ আন্দু—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া। গুরুদাস লাইব্রেরী। দাম ১৷০।

মোতীকুমারী—অক্ষয়চন্দ্র সরকার। মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোম্পানি, কর্ণওয়ালিস বিলডিংস্। ছোট গল্পের বই।

স্নেহের বাঁধন—জর্জ্জ ইলিয়ট লিখিত "সাইলাস্ মার্ণার" নামক ইংরেজী নভেলের আংশিক ছায়া অবলম্বনে লিখিত। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ প্রণীত। দি প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

সুকুমার—ও আর চারিটি গল্প। শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ, প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৫১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

পথহারা—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, ৭৮।২ নং, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

অষ্টক—শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবী। গুরুদাস লাইব্রেরী। দাম দেড় টাকা মাত্র। আটটি ছোট গল্প।

মুরলার ভুল—উপন্যাস। শ্রীমতী অনিলবালা দেবী। দাম ১৷০। প্রকাশক রায় এম, সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ডালি—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা মাত্র। সচিত্র গল্পের বই।

অর্ঘ্য—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ৷৹ মাত্র। ছোট-গল্প।

স্বর্ণ-মরু—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। অন্নদা-বুকষ্টল, ৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম ৷৹ আনা।

প্রদীপ ও চেরাগ—শ্রীমোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত। দাম ১৲ টাকা। প্রকাশক "দি মুসলমান" বুক এজেন্সী, ৪ নং এলিয়ট লেন, কলিকাতা।

কালো বউ—ও আরো একটি গল্প। শ্রীননীগোপাল ঘোষ প্রণীত। দাম আট আনা। কলিকাতা, ষ্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৩০ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। গুরুদাস লাইব্রেরী।৵ আট আনা।

শিল্পী—শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র।

সেক্ষপিয়রের মার্চেন্ট অব ভিনিস্—শ্রীমনোমোহন রায় কর্ত্তৃক অনূদিত। ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড। দাম ১৲।

স্কটের কেনিলওয়ার্থ—শ্রীমনোমোহন রায় কর্ত্তৃক অনূদিত। ম্যাকমিলন এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড। দাম ১৷৹ টাকা।

দুই অবতার—বর্ম্মা ও শর্ম্মা। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স। ৷৹ আনা। ছোট ছেলেদের পড়িবার উপযুক্ত সচিত্র সরস গল্পের বই।

বড়বউ—(সচিত্র ধর্ম্মোপন্যাস) শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ ১৩২৪। দাম—বারো আনা। কলিকাতা ১০।২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হাতে চাঁদ কপালে সূর্য্যি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রায় এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম দশ আনা। ছেলেমেয়েদের পাঠ্য সরস সুন্দর উপকথার বই। অনেক ছবি আছে।

আলেয়া—শ্রীনিরুপমা দেবী। গুরুদাস লাইব্রেরী। আট আনা। ছোটগল্পের বই।

পঞ্চপুষ্প—পণ্ডিতা কুমুদিনী বসু। প্রকাশক শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু, ৪ নং কোর্ট হাউস রোড, ঢাকা। আট আনা। ছোটগল্পের বই।

৪। নাটক।

নেপালে বাঙ্গালা নাটক—১। কাশীনাথকৃত বিদ্যাবিলাপ, ২। কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত, ৩। গণেশকৃত রামচরিত্র, ৪। ধনপতিকৃত মাধবানল-কামকন্দলা। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে প্রকাশিত। দাম—সদস্যপক্ষে ১ টাকা। শাখাসভার সদস্যপক্ষে ১৶০। সাধারণ পক্ষে ১৷০।—এই নাটকগুলি দুই শত বৎসর পূর্ব্বে নেপাল-প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা রচিত; সেইজন্য ইহা প্রত্যেক বাঙালীর সমাদরের যোগ্য।

মোহন-মাধুরী—(নাটিকা) শ্রীঅভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, প্রণীত। দাম ৷৹ আনা।

ম্যালেরিয়া নাটিকা—শ্রীপরেশনাথ হোড় প্রণীত। দাম তিন আনা। প্রকাশক শ্রীতিমুলাল বসু, ১৪০ নং বাংলা বাজার, ঢাকা।

পতিব্রতা—বেহুলার উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত পঞ্চাঙ্ক নাটক। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, লিখিত-ভূমিকা সংবলিত। কুমার শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্ম বিদ্যার্ণব প্রণীত। আগরতলা রাজধানী, স্বাধীন ত্রিপুরা। দাম বারো আনা।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত—ঐতিহাসিক নাটক। কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় প্রণীত। শ্রীহট্ট—রাজবাটী। দাম দেড় টাকা।

শকুন্তলা গীতাভিনয়—শ্রীসীতানাথ বসু ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত। পণ্ডিতবর শ্রীযুত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। দাম ৸৹ আনা। যাত্রার পালা।

মলিনা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়। Maurice Maeterlinck প্রণীত Pelleas et Melisande নামক ফরাসী নাটিকা অবলম্বনে লিখিত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ। দাম ৸৹ মাত্র।

দুর্জ্জয় মান—(গীতিনাট্য।) শ্রীল নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় আচার্য্যরত্ন বিরচিত। বালেশ্বর শ্রীগৌরকিশোর আশ্রম হইতে শ্রীঅমরনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মুদ্রণ সাহায্য এক টাকা মাত্র।

পূজা—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন। প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেন, ১৫।২ নীলমণি দত্তের লেন, কলিকাতা। চার আনা। প্রেমপ্রমুক্ত শাশ্বত সত্য এই নাটকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। মানুষের সম্মানই দেবতার পূজা ইহাই প্রতিপাদ্য। সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৫। জীবনচরিত।

স্বর্গের জ্যোতিঃ—মিসেস্ সারা তয়ফুর প্রণীত। প্রকাশক সৈয়দ এম, এম, বাইজিদ। "মোস্তফা হাউস," সৈয়দ গোলাম মোস্তফা লেন, ঢাকা। দাম ৸৹ আনা মাত্র। হজরত মহম্মদের জীবন-কথা।

তুকারাম-চরিত—কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ প্রণীত ও প্রকাশিত। দাম ॥৵৹ আনা মাত্র।

পাগল-রাধামাধব—প্রথম খণ্ড। শ্রীরসিকলাল দে দাস, সোনামুখী-"রাধামাধব আনন্দাশ্রম।"

ঠাকুর দয়ানন্দ—ও অরুণাচল মিশন। প্রকাশক শ্রীঅটলবিহারী বসু, গিরিধি। দাম ॥৹ আট আনা।

নানক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার, ৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ॥৹ আট আনা। পদ্যে নানকের জীবনকাহিনী।

নিবেদিতা—শ্রীসরলাবালা দাসী। তৃতীয় সংস্করণ। দাম।৹ আনা। প্রকাশক—ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। এই পুস্তকের সমগ্র আয় ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে অর্পিত হয়।

সাধ্বী জ্ঞান-দেবী—ম্যাডাম গেয়োঁর জীবনচরিত। শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা কর্ত্তৃক মাতৃনিকেতন হইতে প্রকাশিত, শিমুলিয়া গ্রাম, পোঃ রনা। ঢাকা। দাম।৹ আনা।

নারীরত্ন—কোন হিন্দুরমণীর জীবন-কাহিনী। দাম।৵৹ আনা মাত্র। প্রকাশক—শ্রীসুশান্তকুমার ঘোষ, ৫১নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

তারাচরিত—শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী। দাম ॥৹ আট আনা। প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। বরেন্দ্র লাইব্রেরী।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। সিরাজগঞ্জ "দরিদ্রবান্ধব ঔষধালয়" হইতে শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দু আনা। জাতিভেদ উচ্ছেদ গৌরাঙ্গদেবের প্রধান কীর্ত্তি, গৌরাঙ্গদেবের ভক্তদেরও জাতিভেদ না মানা উচিত ও তাহার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করা উচিত—ইহাই এই পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রীঅদ্বৈতবিলাস—অর্থাৎ শ্রীমদাচার্য্য অদ্বৈত প্রভু চরিতাখ্যান। শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক গ্রথিত। শান্তিপুর হইতে শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা দুই আনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল—শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুবৃহৎ সচিত্র জীবনচরিত। আড়াই টাকা।

নুরনবী—শ্রীমোহাম্মদ এআকুব আলী চৌধুরী প্রণীত প্রকাশক নুর লাইব্রেরী, ১২।১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা। ছোট ছেলেদের জন্য হজরত মহম্মদের জীবনচরিত গল্পের আকারে লেখা, সচিত্র, দুই রঙে ছাপা।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ বিরচিত। প্রকাশক গুরুদাস লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম ১॥৹ টাকা সচিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

৬। ইতিকথা।

পূর্ব্ব কথা—শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী। দাম ॥৹ আনা। প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। সেকালের সামাজিক চিত্রের সরস বই।

নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী—অর্থাৎ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান বঙ্গের জাতিসমূহের আচার, ব্যবহার ব্যবসায়, ব্যবহৃত ভাষা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বরিশাল শাখা পরিষদের প্রকাশিত দাম এক টাকা, ছাত্রের জন্য ৸৹ আনা।

ইহাতে এই-এই বিষয় আছে—বঙ্গের আদিম অবস্থার সংক্ষিপ্ত আভাষ। সপ্তদশ শতাব্দীর জাতীয় চিত্র, অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান জাতি বা সম্প্রদায়সমূহের আচার ব্যবহার ও উপজীবিকার বিবরণ। বর্ত্তমান বঙ্গের জাতিসমূহের নাম এবং তাহাদের অবস্থান ও সংখ্যার বর্ণনা। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার অবস্থার নানাবিধ সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পূর্ব্বতন ভাষাতত্ত্ব, ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাষার নমুনা। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোকের নমুনা। পূর্ব্বতন প্রবাদ (সংস্কৃত ও বাংলা)। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় দুরূহ শব্দ ও তাহার অর্থ।

পদ্য-পুরাবৃত্ত—বা পদ্যে ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস (উচ্চপ্রাথমিক শ্রেণীদ্বয়ের বালকগণের জন্য)। আড়বালিয়া জ্ঞান বিকাশিনী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর বিরচিত। লিটারারী বুক ডিপো, কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস্ দাম আট আনা। বোর্ড বাঁধাই—॥৵৹ আনা।

মোস্লেম সভ্যতার ইতিহাস—মোস্লেম-জগতে বিদ্যা চর্চ্চা। প্রথম খণ্ড। সচিত্র। শ্রীমোহাম্মদ কে, চাঁদ প্রণীত। দাম ১৷৹। প্রকাশক—নুর লাইব্রেরী, ১২।১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা।

শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড। শ্রীবসন্তকুমার বসু প্রণীত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই—দাম সাত সিকা। সাধারণ

বাঁধাই—দাম পাঁচ সিকা। সানিপাড়া লেন, শ্রীরামপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নেপালী ছাত্র—শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং চুঁচুড়া বিশ্বনাথ টষ্ট ফণ্ড আফিসে প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য। দাম ৸৹ বারো আনা মাত্র। নেপালের ক্ষত্রিয় জাতিকে অবলম্বন করিয়া নেপালের ইতিবৃত্ত। ইহা পাঠে নেপালীদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার ও স্বাধীন থাকিবার ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। সকল লোকের পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিসিলের ইতিহাস—শ্রীভুবনমোহন বসাক। ৫নং টাকার হাট, নবাবপুর, ঢাকা। দাম ৷৹ আনা।

৭। প্রবন্ধ।

পারিবারিক প্রবন্ধ—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। অষ্টম সংস্করণ। চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড আপিসে পাওয়া যায়।

পাগলা ঝোরা—শ্রীললিতকুমার বিদ্যারত্ন এম-এ প্রণীত। কৌতুক রচনার আঠারো ধারা। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স। দাম ১৷৹ সিকা।

হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য—শ্রীযুক্ত বদ্রিদাস গোয়েনকা পুরস্কার-প্রবন্ধ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি, এল প্রণীত। কলিকাতা, ৩১ নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থ লিখিয়া লেখক এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

জ্ঞান-মালা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এসসি-প্রণীত। ঢাকা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। দাম পাঁচ আনা। স্কুলপাঠ্য সন্দর্ভপুস্তক।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও আমাদের কর্ত্তব্য—শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীহিরণ্ময় বিশ্বাস, ৪৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার আনা।

আদর্শ-গৃহিণী—২য় সংস্করণ। কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর অনুমোদিত বালিকা-বিদ্যালয়ের পাঠ্য। শ্রীমতী রত্নমালা দেবী প্রণীত। দাম ।৹ আনা মাত্র।

সাহিত্য-চিন্তা—পণ্ডিতা কুমুদিনী বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু, ৪নং কোর্টহাউস রোড, ঢাকা। দাম আট আনা। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা আছে।

১। ভারতে নারীর উন্নতি, ২। সমাজ-ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, ৩। আলোক, ৪। শ্রেষ্ঠ শিক্ষাসত্র, ৫। সূর্য্য-মণ্ডল, ৬। সার্ব্বভৌমিক প্রেম, ৭। ছায়া-পথ, ৮। প্রকৃত বন্ধুতা, ৯। আর্য্যজাতির পতনের কারণ, ১০। সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব, ১১। জ্ঞান।

৮। ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক।

ঋগ্বেদসংহিতা—প্রথম-ভাগ-উপোদ্‌ঘাত-প্রকরণম্। শ্রীউমেশচন্দ্র-বিদ্যারত্ন-প্রণীতম্। কলিকাতা-রাজধান্যাম্ ২ সরকার বাই-লেনস্থ সারস্বত-গেহাৎ শ্রীআশুতোষ-দাশ-কর্ত্তৃক-প্রকাশিতম্।

শ্রীশ্রীহরিনাম-তরঙ্গ—শ্রীরাধানাথ সেন প্রবিরচিত পোঃ হাজুলদাড়া, গ্রাম হিঙ্গাজিয়া, জিলা শ্রীহট্ট। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণাদির মতানুসারে হরির নামাবলী।

বিল্বদল—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ,ও ডাক্তার শ্রীকানাইলাল গুপ্ত বি-এ, ১২১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা মাত্র।

ইহাতে এই-এই বিষয় আছে—মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য, অরুচি, সাধনপথের সম্বল, অভ্যাস, বৈরাগ্য, ব্রহ্মবিদ্যা ও পাণ্ডিত্য, বেল পাকলে কাকের কি, কুম্ভক, জ্ঞানই অগ্নি, জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, কর্ত্তা কে, অভিনয়, জগৎ স্বপ্ন, গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং, সমুদ্র-গর্জ্জন, জ্ঞানই প্রেম বা প্রেমই জ্ঞান, সংসার ও ভগবান, শান্তিসুধা, অভিমান, বেসুরা, মুক্তি, চিত্তের প্রতি, সুন্দর, আনন্দস্বরূপ, ইন্দ্রিয়-বোধ, তুমি কে, অদৃশ্য, অলক্ষ্য (কবিতা), বাঁশরী, অকিঞ্চনের ধন, ভিক্ষাং দেহি, সুখতত্ত্ব (কবিতা), নারদের বীণা, জলসিন্ধু সুখ যাহা জলবিন্দু সুখ তাহা, পাগলের পত্র, অভিযোগ, অবিনাশী (কবিতা), মিলন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত (কবিতা), আর কি আসিবে না, পাগলের হাসি, ভক্তের অভয় ভাব (কবিতা), নির্ভাবনা, অমৃত (কবিতা), পাগলের প্রলাপ, শ্মশানবাসিনী (কবিতা), ভগবৎ-কৃপা, নির্ভীক যাত্রী (কবিতা), ভালবাসা, জগন্ময় (কবিতা), বস্ত্রহরণ, অরূপের রূপ (কবিতা), রাসলীলা।

যোগশাস্ত্রের বর্ণপরিচয়—(প্রথম ভাগ) শ্রীহরিশ্চন্দ্র প্রণীত ও প্রকাশিত। ৺কাশীধাম। দাম দুই টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের তালিকা—১। ভূমিকা। ২। শরীরতত্ত্ব।—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চৈতন্যশক্তির রহস্য; স্থানভেদে বায়ুর ক্রিয়া; শরীরে উৎপন্ন গ্যাসের কাহিনী; শরীরস্থ রক্তের বিভিন্নাবস্থা; যোগের বিভূতি; শরীরস্থ শক্তিপীঠস্থান নির্ণয়; শরীরগঠনারম্ভাবস্থা, মেরুদণ্ড, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ও শ্বাসযন্ত্রাদির ক্রিয়া বর্ণনা। ৩। ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম বিচার ও সত্যজ্ঞান ও উপসত্যজ্ঞান বিচার। ৪। মানব-জীবন;—উদ্দেশ্য ও সাফল্য লাভের উপায়। ৫। মানবের জাতিভেদ—উদ্দেশ্য, বিচার ও অপব্যবহার; শিক্ষা ও উপশিক্ষার প্রণালীর বিচার। ৬। দীক্ষা সংস্কার,—উদ্দেশ্য ও মন্ত্র। ৭। যম বর্ণনা—উদ্দেশ্য ও বিচার। ৮। নিয়ম বর্ণনা—উদ্দেশ্য ও বিচার। ৯। আসন বর্ণনা—উদ্দেশ্য ও বিচার। ১০। শরীরস্থ শক্তিপীঠস্থানের বিস্তারিত বর্ণনা ও বিচার। ১১। শরীরগঠনপ্রণালী, ষট্‌চক্রাদি যন্ত্রের পরস্পর সম্বন্ধ; ও ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর গতিস্থিতির বর্ণনা, ও চিত্রপট দ্বারা নির্ণয়করণ ও বিচার। ১২। কুম্ভক বর্ণনা—প্রকরণ, উদ্দেশ্য, উপকারিতা ও অপকারিতা ও বিচার। ১৩। ষট্‌চক্রাদি যন্ত্রের একে একে সংস্কারপ্রকরণ ও বিজ্ঞান এবং বিচার। ১৪। শাস্ত্রোক্ত মুদ্রাদির কথন-প্রকরণ, ও প্রত্যেক মুদ্রার উদ্দেশ্য ও বিচার। ১৫। মূলাধার-রহস্য। ১৬। একযোগে ষট্‌চক্রভেদ-প্রকরণ দ্বারা সমাধি লাভের সহজ উপায়। ১৭। প্রাণায়াম-পদ্ধতি-প্রকরণ, উদ্দেশ্য ও সহজ উপায়। ১৮। গান।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার—ঐতিহাসিক রহস্য। শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ১৯১৭। প্রাপ্তিস্থান—১।৩ নং মৌলবী ইস্মাইল ষ্ট্রীট, ইটালী, কলিকাতা। 'কৃষ্ট' ও খৃষ্ট যে একই ব্যক্তি তার প্রমাণের চেষ্টা। দাম চারি আনা মাত্র।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন—শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, এল্, এম, এস, এবং শ্রীহেমচন্দ্র সেন, এল, এস, এস, প্রণীত। কলিকাতা, ৭৮নং রসা রোড (নর্থ) হইতে গ্রন্থকারদ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম ১৲ এক টাকা মাত্র।

পথহারা পথিক—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট "সাধনা লাইব্রেরী", হইতে প্রকাশিত। দাম বাঁধাই এক টাকা। আবাঁধা বারো আনা।

আত্মস্মৃতি—শ্রীমনোমোহিনী গুহঠাকুরতা প্রণীত। প্রকাশক:—শ্রীপ্রভুচরণ গুহ ঠাকুরতা। ৩১, মিউনিসিপাল আফিস্ ষ্ট্রীট্। দাম।০ আনা মাত্র।

ইহাতে এই-এই বিষয় আছে।—উন্মত্ততা লাভ, প্রাণায়াম, আরাধনা ও আরাধ্য, দাস্য ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, মধুর ভাব, প্রাপ্তি-বোধের পূর্ব্বপ্রাপ্তি, প্রাপ্তি বোধ, সঙ্গ লাভ, বিদেহ ভাব, বীভৎস ভাব, বোধ, শুচি, দ্বিধা, সঙ্কল্প বিকল্প ভাব, আত্ম ভাবের নির্গুণ বিকাশ, বোধ-ক্রমবিকাশ-অনুরূপ আত্মভাবের প্রকাশ, রক্ত, মেদ বা মাংস, অস্থি, দেহ, চৈতন্য, ক্রিয়া-বিরাম জন্য ক্রিয়ার অন্তরূপ প্রাপ্তি, অনিত্য বোধ, নির্গুণ সগুণ ক্রিয়া আহার, আমি ও তুমি, ভাব গ্রহণ, ভাবের গুণ গ্রহণ, জ্ঞানের যুক্ততা, বোধ ও ভাব, ভাবের খেলা, একত্ব, আধারবোধ।

সুখমণী—পঞ্চম শিখগুরু অর্জ্জুনদাস কৃত ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি, এল, কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মোজঃফরপুর। ইহাতে নাম-মাহাত্ম্য, সাধু-মাহাত্ম্য ও গুরু-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কাপড়ে বাঁধানো ১।০। আবাঁধা দাম ১৲।

নাস্তিক ও জাপানী যোগী।—শ্রীযদুনাথ দে কর্ত্তৃক বিরচিত। দাম এক টাকা। সর্ব্বদেশব্যাপী তত্ত্ববিদ্যা-সভার (Theosophical Society) প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কীর "Bewitched Life" নামক অদ্ভুত আখ্যায়িকার অনুবাদ।

জীবন-রহস্য।—মানব-জীবনের কর্ম্মোন্নতি, জ্ঞানোন্নতি, এবং অর্থোন্নতি রহস্য। শ্রীশ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী প্রণীত। দাম বারো আনা মাত্র।

সন্তানশিক্ষা---নীতি ও ধর্ম্ম—শ্রীসত্যানন্দ দাস বি, এ, প্রণীত। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২১৩ নং লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা। দাম।০ আনা।

চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ।—শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সিরাজগঞ্জ "দরিদ্রবান্ধব ঔষধালয়" হইতে শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম ॥০ আট আনা।

মহানির্ব্বাণ দর্শন বা সার্ব্বজনীন চরম ভক্তি-মীমাংসা—ব্রহ্মর্ষি সাকেতানন্দ পরমহংস দেব প্রণীত। দাম বারো আনা। ইহাতে এই-এই বিষয় আছে—পরম-পুরুষ, সদ্গুরু, আত্মা, জীব, সাধু, সংসার। প্রণেতার ঠিকানা—পণ্ডিত শ্রীবলদেব প্রসাদ পাণ্ডের মহাশয়ের নিকট, পোঃ আঃ—লালগোলা, গ্রাম—শেখালীপুর, জেলা—মুরশিদাবাদ।

৯। স্বাস্থ্য-নীতি।

স্বাস্থ্য—শ্রীচুণীলাল বসু প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ বসু, ২৫ মহেন্দ্র বসু লেন, কলিকাতা।

জীবন-প্রহেলিকা—ডাক্তার অমৃতলাল সরকার, এল-সি-এস বিরচিত "Life—What is it?" নামক প্রবন্ধ হইতে শ্রীশরৎচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অনূদিত। সচিত্র। কলিকাতা, ১১ নং শাঁখারীটোলা।

স্বাস্থ্য ও শক্তি—(সচিত্র) শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম্, এ, বি, এল, প্রণীত। দাম এক টাকা মাত্র। প্রকাশক—"বীণাপাণি বুক ক্লাব" ২১ নং বেচু চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্যায়াম-চর্চার পুস্তক।

স্বাস্থ্য-নীতি—(ব্যক্তিগত) personal hygiene. ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম্, বি, সম্পাদিত "স্বাস্থ্য-সমাচার" হইতে পুনর্মুদ্রিত। "স্বাস্থ্য-সমাচার" কার্য্যালয়, ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা। দাম দুই আনা।

বসন্ত রোগ ও দেশীয় মতে তাহার সরল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা—প্রথম সংস্করণ। কবিরাজ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরঞ্জন প্রণীত। ৭৬/১ নং রসারোড নর্থ ভবানীপুর, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা মাত্র।

শুশ্রূষা—প্রথম ভাগ। শ্রীশ্যামাচরণ দে প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্—এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস—কলিকাতা। দাম ১॥ টাকা মাত্র।

দেহঘর—শ্রীশ্যামাচরণ দে প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রেস-এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। এক টাকা সচিত্র। সহজ ভাষায় মানবদেহের অঙ্গবিন্যাসের ও যন্ত্রাদির পরিচয়।

হোমিওপ্যাথি মতে কিরূপে রোগী দেখিতে হয় এবং সদৃশতম ঔষধ বাছিয়া লইতে হয়—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ন্যাশ কৃত পুস্তকের অনুবাদ। প্রকাশক শ্রীনীহার রায়, পানবাজার গৌহাটী। দাম আট আনা।

পশু-চিকিৎসা—অর্থাৎ গরু, ঘোড়া, হাতী, কুকুর ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর বয়সনির্ণয়, রোগ, রোগের লক্ষণ এবং সহজপ্রাপ্য দেশীয় ঔষধাদি দ্বারা তাহার চিকিৎসা। তৃতীয় সংস্করণ। গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীরঘুনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত রংপুর। দাম আট আনা।

১০। বিবিধ।

পঞ্চব্যঞ্জনের আত্মকথা।—(রঙ্গ-রস-পূর্ণ রচনা) শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এসসি, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোং, ১৫নং কলেজ্ স্কোয়ার, কলিকাতা দাম আট আনা।

ব্যঞ্জনের তালিকা। ১। শুক্তা ('শু'এর জীবন-কথা) ২। ডাল্না ('য'এর ঔদার্য্য) ৩। ভাজা ('ভ'এর ঘোষণা-পত্র) ৪। ডাল্ ('ড'এর নিবেদন) ৫। আনুবকরার টক্ ('ব'এর বর্ণনা-বৈচিত্র্য) ৬। চিংড়ি পাতা দৈ ('স'এর সওয়াল্ জবাব)। ৭। মিষ্টান্ন ('ম'এর মাতব্বরি) একএকটি সন্দর্ভ একই অক্ষর-যুক্ত শব্দে অনুপ্রাসের মালায় গাঁথা।

দরিদ্রের ক্রন্দন—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম, এ বহরমপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা অর্থসমস্যা ও ধন-বিজ্ঞানের আলোকে ভারতবাসীর অবস্থা পাঠ।

ইহাতে এই-এই বিষয় আছে—১। বর্ত্তমান দারিদ্র্য-সমস্যা, ২ পারিবারিক আয়-ব্যয়, ৩। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা, ৪। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্নসংস্থান, ৫। শিল্প ও ব্যবসা প্রচার, ৬। পল্লীচর্য্যা বিধান ৭। কৃষি ও শিল্পকর্ম্মে সমবায়, ৮। বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্যে বণিকের আধিপত্য ও প্রতিকার, ৯। পল্লীসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা, ১০। পল্লী সেবক, ১১। পল্লীসভ্যতার পুনরুত্থান, ১২। বর্ত্তমান যুদ্ধ ও বৈষম্য সমস্যা।

ভারতের আর্থিক অবস্থা।—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ প্রণীত। লিটারারি বুক ডিপো, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস, কলিকাতা দাম আট আনা।

বাঙ্গলার জমিদার—শ্রীবামাচরণ মজুমদার প্রণীত। ২১।১ নং আন্তনী বাগান লেন, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

মহাজনী শিক্ষা—পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্দের জমিদার শ্রীতারকগোবিন্দ চৌধুরী প্রণীত। দাম এক টাকা মাত্র।

ব্যাকরণ-পরিচয়—(Intended for classes III, IV & V) Inductive Method. মির্জ্জাপুর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার তত্ত্বরত্ন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সরকার, "আনন্দ-কুটীর" কয়াইল—মহেরা পোঃ, ময়মনসিংহ। দাম তিন আনা।

প্রাথমিক ভূগোল—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, এ, বি, টি, প্রণীত। শিক্ষক, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। শ্রীসীতানাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ঢাকা বাঙ্গালাবাজার ব্রাহ্মমত মন্দির হইতে প্রকাশিত। দাম ছয় আনা।

সাইকেল মেরামতী—(সাইকেল মেরামত শিক্ষা করিবার সচিত্র পুস্তক) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত এল, এম, ই প্রণীত। Hero Cycle Co., 48, Bentinck Street, Calcutta. দাম বারো আনা মাত্র।

The Bose Institute—Published by the Hindu Patriot, Calcutta. এই পুস্তিকায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে আচার্য্য বসুর অভিভাষণ, রবীন্দ্রনাথের স্বস্তিবাচন, অধ্যাপক গেডিসের লিখিত পরিচয় এবং আচার্য্য বসুর আবিষ্কার সম্বন্ধে পরিচয় ও চিত্রাদি আছে। মূল্য ১৲।

গান

ওহে সুন্দর মরি মরি!
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি!
তব ফাল্গুন যেন আসে
আজি মোর পরাণের পাশে,
দেয় সুধারস ধারে-ধারে
মম অঞ্জলি ভরি ভরি।
মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলক পূজাঞ্জলি,
মম হৃদয়ের পথতলে
যেন চঞ্চল আসে চলি,
মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরী-দীপশিখা
নীল অম্বরে রাখে ধরি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

র্সা র্সা II ণা -পা -া মা। মপা -জ্ঞা -মা -জ্ঞা। জ্ঞপা -পা না না।
ও হে সু ০ ০ ন্দ র ০ ০ ০ ম ০ রি ম

| র্সা -া র্সা র্সা I নর্সা না -র্রা র্রা। র্সা -া -ধা -া।
রি ০ তো মায় কি ০ ০ দি য়ে ০ ০

| মা পা ধা পা। র্রা -া র্সা র্সা II
ব র ণ ক রি ০ "ও হে"

র্সা র্সা II সর্মা -া -া র্জ্ঞা। র্মা -া র্রা র্সা। র্রা -না র্সা -া।
ত ব ফাল্ ০ ০ গু ন ০ যে ন আ ০ সে ০

| -া -া র্সা র্সা I নর্সা -া -না র্সা। র্সর্রা -া র্সা সপা। পণা ধণা পা -া।
০ ০ আ জি মোর ০ ০ প রা ০ ণে র পা ০ শে ০

| -া -া পা -া I পা মা -ণা ণা। ধণা -পা পা।
০ ০ দেয় ০ সু ধা ০ র স ধা ০ রে

| পধা -মা পা -া। -রা -া রা রা I সা -ন্‌া -রা রা। সা -া -া -া।
ধা ০ রে ০ ০ ০ ম ম অ ০ ন্‌ জ লি ০ ০ ০

| মা -পা ধা ণা। ণর্রা -া র্সা র্সা II
ভ ০ রি ভঁ রি ০ "ও হে"

সা স্‌া II সা সা -ণা ণা। ধা ধা -ণা পমা। পা -া -া -া।
ম ধু স মী ০ র দি গ ০ ঞ্চ লে ০ ০ ০

| -া -া পমা পা I পর্সা র্সা র্সা ণা। ধণা -পা -মা পা। রা -া -া -া।
০ ০ আ নে পু ল ক পু ঞ্জ ০ ০ ঞ্জ লি ০ ০ ০

| -া -া রা রা I রা পা পা মা। রা রা রা -সা। র্রা -া -া -া।
০ ০ ম ম হৃ দ য়ে র প থ ত ০ লে ০ ০ ০

| -া -জ্ঞা র্রা র্সা I নর্সা -া না র্রা। র্সা -া ণা ধা। ধণা -া
০ ০ যে ন চ ০ ০ ঞ্চ ল ০ আ সে চ ০

পা -া। -া -া র্রা র্রা I র্রা র্মা র্মা র্জ্ঞা। র্রা র্সা র্সর্রা -না। র্সা -া -া -া।
লি ০ ০ ০ ম ম ম নে র ব নে র শা ০ খে ০ ০ ০

| -া -া র্সা র্সা I র্সনা র্সা র্সা -না। নর্রা -া র্সা র্সপা। পণা -ধপা পা -া।
০ ০ যে নে নি খি ল ০ কো ০ কি ল ডা ০ কে ০

| -া -া পা পা I মা -ণা -া ধা। ধণা -া পা পা। পধা -মা পা -া।
০ ০ যে ন ম ০ ০ ঞ্জ রী ০ দী প শি ০ খা ০

-রা -া রা রা I সা -ন্‌া -রা রা। সা -া -া -া। মা -পা ধা ণা।
০ ০ নী ল অ ০ ০ ম্ব রে ০ ০ ০ রা ০ খে ধ

| ণর্রা -া র্সা র্সা II II
রি ০ "ও হে"

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত